'বিসর্জন'

জয়সিংহের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ

প্রথম খণ্ড

১২৮৮-১৩২৮ ॥ ১৮৮১-১৯২১

রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ

প্রথম খণ্ড

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলকাতা

সূচীপত্র

রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ

প্রথম খণ্ড

বাল্মীকিপ্রতিভা

সূচনা

বাল্মীকিপ্রতিভায় একটি নাট্যকথাকে গানের সূত্র দিয়ে গাঁথা হয়েছিল, মায়ার খেলায় গানগুলিকে গাঁথা হয়েছিল নাট্যসূত্রে। একটা সময় এসেছিল যখন আমার গীতিকাব্যিক মনোবৃত্তির ফাঁকের মধ্যে মধ্যে নাট্যের উঁকিঝুঁকি চলছিল। তখন সংসারের দেউড়ি পার হয়ে সবে ভিতর-মহলে পা দিয়েছি ; মানুষে মানুষে সম্বন্ধের জাল-বুনোনিটাই তখন বিশেষ করে ঔৎসুক্যের বিষয় হয়ে উঠেছিল। বাল্মীকিপ্রতিভাতে দস্যুর নির্মমতাকে ভেদ করে উচ্ছ্বসিত হল তার অন্তরগূঢ় করুণা। এইটেই ছিল তার স্বাভাবিক মানবত্ব যেটা ঢাকা পড়েছিল অভ্যাসের কঠোরতায়। একদিন দ্বন্দ্ব ঘটল, ভিতরকার মানুষ হঠাৎ এল বাইরে। প্রকৃতির প্রতিশোধেও এই দ্বন্দ্ব। সন্ন্যাসীর মধ্যে চিরকালের যে মানুষ প্রচ্ছন্ন ছিল তার বাঁধন ছিঁড়ল। কবির মনের মধ্যে বাজছিল মানুষের জয়গান। মায়ার খেলায় গানের ভিতর দিয়ে অল্প যে একটুখানি নাট্য দেখা দিচ্ছে সে হচ্ছে এই যে, প্রমদা আপনার স্বভাবকেই জানতে পারে নি অহংকারে, অবশেষে ভিতর থেকে বাজল বেদনা, ভাঙল মিথ্যে অহংকার, প্রকাশ পেল সত্যকার নারী। মায়াকুমারীদের কাছ থেকে এই ভর্ৎসনা কানে এল

এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মেলে না—
শুধু সুখ চলে যায়, এমনি মায়ার ছলনা।

বাল্মীকিপ্রতিভা

প্রথম দৃশ্য

অরণ্য

বনদেবীগণ

সহে না সহে না কাঁদে পরান।
সাধের অরণ্য হল শ্মশান।
দস্যুদলে আসি শান্তি করে নাশ,
ত্রাসে সকল দিশ কম্পমান।
আকুল কানন, কাঁদে সমীরণ,
চকিত মৃগ, পাখি গাহে না গান।
শ্যামল তৃণদল শোণিতে ভাসিল,
কাতর রোদনরবে ফাটে পাষাণ।
দেবী দুর্গে, চাহো, ত্রাহি এ বনে—
রাখো অধীনী জনে, করো শান্তি দান।

[প্রস্থান

প্রথম দস্যুর প্রবেশ

আঃ, বেঁচেছি এখন।
শর্মা ও দিকে আর নন।
গোলেমালে ফাঁকতালে পালিয়েছি কেমন।
লাঠালাঠি কাটাকাটি, ভাবতে লাগে দাঁত-কপাটি,
তাই মানটা রেখে প্রাণটা নিয়ে সটকেছি কেমন।
আসুক তারা আসুক আগে, দুনোদুনি নেব ভাগে—
স্যাঙাতমিতে আমার কাছে দেখব কে কেমন।
শুধু মুখের জোরে গলার চোটে লুট-করা ধন নেব লুটে।
শুধু দুলিয়ে ভুঁড়ি বাজিয়ে তুড়ি করব সরগরম।

লুটের দ্রব্য লইয়া দস্যুগণের প্রবেশ

এনেছি মোরা এনেছি মোরা রাশি রাশি লুটের ভার।
করেছি ছারখার—
কত গ্রাম পল্লী লুটেপুটে করেছি একাকার।

প্রথম দস্যু। আজকে তবে মিলে সবে করব লুটের ভাগ,
এ-সব আনতে কত লণ্ডভণ্ড করনু যজ্ঞ-যাগ।

দ্বিতীয় দস্যু। কাজের বেলায় উনি কোথা যে ভাগেন,
ভাগের বেলায় আসেন আগে আরে দাদা!

প্রথম দস্যু। এত বড়ো আস্পর্ধা তোদের, মোরে নিয়ে একি হাসি-তামাশা !
এখনি মুণ্ড করিব খণ্ড, খবরদার রে খবরদার !
দ্বিতীয় দস্যু। হাঃ হাঃ, ভায়া খাপ্পা বড়ো, একি ব্যাপার !
আজি বুঝিবা বিশ্ব করবে নস্য, এম্‌নি যে আকার।
তৃতীয় দস্যু। এমনি যোদ্ধা উনি, পিঠেতেই দাগ,
তলোয়ারে মরিচা মুখেতেই রাগ।
প্রথম দস্যু। আর যে এ-সব সহে না প্রাণে—
নাহি কি তোদের প্রাণের মায়া ?
দারুণ রাগে কাঁপিছে অঙ্গ—
কোথা রে লাঠি কোথা রে ঢাল ?
সকলে। হাঃ হাঃ, ভায়া খাপ্পা বড়ো, একি ব্যাপার !
আজি বুঝিবা বিশ্ব করবে নস্য, এম্‌নি যে আকার।

বাল্মীকির প্রবেশ

সকলে। এক ডোরে বাঁধা আছি মোরা সকলে।
না মানি বারণ, না মানি শাসন, না মানি কাহারে।
কে বা রাজা, কার রাজ্য, মোরা কী জানি—
প্রতি জনেই রাজা মোরা, বনই রাজধানী !
রাজা প্রজা, উঁচু নিচু, কিছু না গনি !
ত্রিভুবন-মাঝে আমরা সকলে কাহারে না করি ভয়—
মাথার উপরে রয়েছেন কালী, সমুখে রয়েছে জয়।

বাল্মীকির প্রতি

প্রথম দস্যু। এখন করব কী বল্।
সকলে। এখন করব কী বল্।
প্রথম দস্যু। হো রাজা, হাজির রয়েছে দল।
সকলে। বল্ রাজা, করব কী বল্, এখন করব কী বল্।
প্রথম দস্যু। পেলে মুখেরই কথা আনি যমেরই মাথা।
করে দিই রসাতল !
সকলে। করে দিই রসাতল !
সকলে। হো রাজা, হাজির রয়েছে দল—
বল্ রাজা, করব কী বল্, এখন করব কী বল্।
বাল্মীকি। শোন্ তোরা তবে শোন্।
অমানিশা আজিকে, পূজা দেব কালীকে—
ত্বরা করি যা তবে, সবে মিলি যা তোরা,
বলি নিয়ে আয় !

[বাল্মীকির প্রস্থান

সকলে। ত্রিভুবন-মাঝে আমরা সকলে কাহারে না করি ভয়—
মাথার উপরে রয়েছেন কালী, সমুখে রয়েছে জয় !

তবে আয় সবে আয়, তবে আয় সবে আয়—
তবে ঢাল্ সুরা, ঢাল সুরা, ঢাল্ ঢাল্ ঢাল্ !
দয়া মায়া কোন্ ছার, ছারখার হোক !
কে বা কাঁদে কার তরে, হাঃ হাঃ হাঃ !
তবে আন্ তলোয়ার, আন্ আন্ তলোয়ার,
তবে আন্ বরশা, আন্ আন্ দেখি ঢাল !

প্রথম দস্যু। আগে পেটে কিছু ঢাল্, পরে পিঠে নিবি ঢাল।
হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ !
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ !

উঠিয়া

সকলে। কালী কালী বলো রে আজ—
বলো হো, হো হো, বলো হো, হো হো, বলো হো !
নামের জোরে সাধিব কাজ,
বলো হো হো হো, বলো হো, বলো হো !
ওই ঘোর মত্ত করে নৃত্য রঙ্গ-মাঝারে
ওই লক্ষ লক্ষ যক্ষ রক্ষ ঘেরি শ্যামারে,
ওই লট্ট-পট্ট-কেশ অট্ট অট্ট হাসে রে—
হাহা হাহাহা হাহাহা !
আরে বল্ রে শ্যামা মায়ের জয়, জয় জয় !
জয় জয়, জয় জয়, জয় জয়, জয় জয়,
আরে বল্ রে শ্যামা মায়ের জয়, জয় জয় !
আরে বল রে শ্যামা মায়ের জয় !

[গমনোদ্যম

একটি বালিকার প্রবেশ

বালিকা। ওই মেঘ করে বুঝি গগনে !
আঁধার ছাইল, রজনী আইল,
ঘরে ফিরে যাব কেমনে !
চরণ অবশ হায়, শ্রান্ত ক্লান্ত কায়
সারা দিবস বনভ্রমণে।
ঘরে ফিরে যাব কেমনে !

এ কী এ ঘোর বন !— এনু কোথায় !
পথ যে জানি না, মোরে দেখায়ে দে-না !
কী করি এ আঁধার রাতে !
কী হবে মোর হায় !
ঘন ঘোর মেঘ ছেয়েছে গগনে,
চকিত চপলা চমকে সঘনে,
একেলা বালিকা তরাসে কাঁপে কায় !

বালিকার প্রতি

প্রথম দস্যু। পথ ভুলেছিস সত্যি বটে ? সিধে রাস্তা দেখতে চাস ?
এমন জায়গায় পাঠিয়ে দেব, সুখে থাকবি বারো মাস।
সকলে। হাঃ হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ হাঃ !

প্রথমের প্রতি

দ্বিতীয় দস্যু। কেমন হে ভাই ! কেমন সে ঠাঁই ?
প্রথম দস্যু। মন্দ নহে বড়ো,
এক দিন না এক দিন সবাই সেথায় হব জড়ো।
সকলে। হাঃ হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ হাঃ !
তৃতীয় দস্যু। আয় সাথে আয়, রাস্তা তোরে দেখিয়ে দিই গে তবে—
আর তা হলে রাস্তা ভুলে ঘুরতে নাহি হবে।
সকলে। হাঃ হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ হাঃ !

বনদেবীগণের প্রবেশ

মরি ও কাহার বাছা, ওকে কোথায় নিয়ে যায়।
আহা ওই করুণ চোখে ও কার পানে চায় !
বাঁধা কঠিন পাশে, অঙ্গ কাঁপে ত্রাসে,
আঁখি জলে ভাসে, এ কী দশা হায় !
এ বনে কে আছে, যাব কার কাছে, কে ওরে বাঁচায়।

দ্বিতীয় দৃশ্য

অরণ্যে কালীপ্রতিমা

বাল্মীকি স্তবে আসীন

বাল্মীকি। রাঙা-পদ-পদ্মযুগে প্রণমি গো ভবদারা !
আজি এ ঘোর নিশীথে পূজিব তোমারে তারা !
সুরনর থরহর— ব্রহ্মাণ্ড বিপ্লব করো,
রণরঙ্গে মাতো মা গো, ঘোরা উন্মাদিনী-পারা
ঝলসিয়ে দিশি দিশি ঘুরাও তড়িৎ-অসি,
ছুটাও শোণিতস্রোত, ভাসাও বিপুল ধরা।
উরো কালী কপালিনী, মহাকালসীমন্তিনী,
লহো জবাপুষ্পাঞ্জলি মহাদেবী পরাৎপরা !

বালিকাকে লইয়া দস্যুগণের প্রবেশ

দস্যুগণ। দেখো, হো ঠাকুর, বলি এনেছি মোরা।
বড়ো সরেস, পেয়েছি বলি সরেস—

এমন সরেস মছলি, রাজা, জালে না পড়ে ধরা
দেরি কেন ঠাকুর, সেরে ফেলো ত্বরা।

বাল্মীকি। নিয়ে আয় কৃপাণ, রয়েছে তৃষিতা শ্যামা মা,
শোণিত পিয়াও— যা ত্বরায়।
লোল জিহ্বা লক্‌লকে, তড়িৎ খেলে চোখে,
করিয়ে খণ্ড দিগ্‌দিগন্ত ঘোর দন্ত ভায়।

বালিকা। কী দোষে বাঁধিলে আমায়, আনিলে কোথায়!
পথহারা একাকিনী বনে অসহায়—
রাখো রাখো রাখো, বাঁচাও আমায়!
দয়া করো অনাথারে, কে আমার আছে—
বন্ধনে কাতরতনু মরি যে ব্যথায়!

নেপথ্যে

বনদেবী। দয়া করো অনাথারে, দয়া করো গো—
বন্ধনে কাতর তনু জর্জর ব্যথায়!

বাল্মীকি। এ কেমন হল মন আমার!
কী ভাব এ যে কিছুই বুঝিতে যে পারি নে—
পাষাণ হৃদয়ও গলিল কেন রে,
কেন আজি আঁখিজল দেখা দিল নয়নে!
কী মায়া এ জানে গো,
পাষাণের বাঁধ এ যে টুটিল,
সব ভেসে গেল গো, সব ভেসে গেল গো—
মরুভূমি ডুবে গেল করুণার প্লাবনে!

প্রথম দস্যু। আরে, কী এত ভাবনা কিছু তো বুঝি না।

দ্বিতীয় দস্যু। সময় বহে যায় যে।

তৃতীয় দস্যু। কখন্ এনেছি মোরা, এখনো তো হল না!

চতুর্থ দস্যু। এ কেমন রীতি তব, বাহ্ রে!

বাল্মীকি। না না হবে না, এ বলি হবে না—
অন্য বলির তরে যা রে যা!

প্রথম দস্যু। অন্য বলি এ রাতে কোথা মোরা পাব?

দ্বিতীয় দস্যু। এ কেমন কথা কও, বাহ্ রে!

বাল্মীকি। শোন্, তোরা শোন্ এ আদেশ!
কৃপাণ খর্পর ফেলে দে দে!
বাঁধন কর্ ছিন্ন, মুক্ত কর্ এখনি রে।

যথাদিষ্ট কৃত

তৃতীয় দৃশ্য

অরণ্য

বাল্মীকি

বাল্মীকি। ব্যাকুল হয়ে বনে বনে
ভ্রমি একেলা শূন্যমনে।
কে পুরাবে মোর কাতর প্রাণ,
জুড়াবে হিয়া সুধাবরিষনে!

[প্রস্থান

দস্যুগণ বালিকাকে পুনর্বার ধরিয়া আনিয়া

ছাড়ব না ভাই, ছাড়ব না ভাই,
এমন শিকার ছাড়ব না।
হাতের কাছে অম্‌নি এল, অম্‌নি যাবে!
অম্‌নি যেতে দেবে কে রে!
রাজাটা খেপেছে রে, তার কথা আর মানব না।
আজ রাতে ধুম হবে ভারি,
নিয়ে আয় কারণ বারি,
জ্বেলে দে মশালগুলো, মনের মতন পুজো দেব—
নেচে নেচে ঘুরে ঘুরে— রাজাটা খেপেছে রে,
তার কথা আর মানব না।

প্রথম দস্যু। রাজা মহারাজা কে জানে, আমিই রাজাধিরাজ।
তুমি উজির, কোতোয়াল তুমি,
ওই ছোঁড়াগুলো বরকন্দাজ।
যত-সব কুঁড়ে আছে ঠাঁই জুড়ে,
কাজের বেলায় বুদ্ধি যায় উড়ে।
পা ধোবার জল নিয়ে আয় ঝট্‌,
কর্‌ তোরা সব যে যার কাজ।

দ্বিতীয় দস্যু। আছে তোমার বিদ্যে-সাধ্যি জানা।
রাজত্ব করা এ কি তামাশা পেয়েছ!

প্রথম দস্যু। জানিস না কেটা আমি!

দ্বিতীয় দস্যু। ঢের ঢের জানি— ঢের ঢের জানি।

প্রথম দস্যু। হাসিস নে, হাসিস নে মিছে, যা যা—
সব আপন কাজে যা যা, যা আপন কাজে।

দ্বিতীয় দস্যু। খুব তোমার লম্বাচওড়া কথা!
নিতান্ত দেখি তোমায় কৃতান্ত ডেকেছে!

তৃতীয় দস্যু। আঃ কাজ কী গোলমালে, নাহয় রাজাই সাজালে।
মরবার বেলায় মরবে ওটাই, থাকব ফাঁকতালে।

প্রথম দস্যু। রাম রাম, হরি হরি, ওরা থাকতে আমি মরি!
তেমন তেমন দেখলে, বাবা, ঢুকব আড়ালে।

সকলে। ওরে চল্ তবে শিগগিরি,
আনি পুজোর সামিগ্‌গিরি।
কথায় কথায় রাত পোহালো এমনি কাজের ছিরি।

[প্রস্থান

বালিকা। হা কী দশা হল আমার!
কোথা গো মা করুণাময়ী, অরণ্যে প্রাণ যায় গো!
মুহূর্তের তরে মা গো, দেখা দাও আমারে—
জনমের মতো বিদায়!

পূজার উপকরণ লইয়া দস্যুগণের প্রবেশ
ও কালীপ্রতিমা ঘিরিয়া নৃত্য

এত রঙ্গ শিখেছ কোথা মুণ্ডমালিনী!
তোমার নৃত্য দেখে চিত্ত কাঁপে, চমকে ধরণী।
ক্ষান্ত দে মা, শান্ত হ মা, সন্তানের মিনতি।
রাঙা নয়ন দেখে নয়ন মুদি, ও মা ত্রিনয়নী!

বাল্মীকির প্রবেশ

বাল্মীকি। অহো আস্পর্ধা এ কী তোদের নরাধম!
তোদের কারেও চাহি নে আর, আর, আর না রে—
দূর দূর দূর, আমারে আর ছুঁস নে।
এ-সব কাজ আর না, এ পাপ আর না,
আর না, আর না— ত্রাহি, সব ছাড়িনু!

প্রথম দস্যু। দীন হীন এ অধম আমি কিছুই জানি নে রাজা!
এরাই তো যত বাধালে জঞ্জাল,
এত করে বোঝাই বোঝে না—
কী করি, দেখো বিচারি।

দ্বিতীয় দস্যু। বাঃ— এও তো বড়ো মজা, বাহবা!
যত কুয়ের গোড়া ওই তো, আরে বল্-না রে!

প্রথম দস্যু। দূর দূর দূর, নির্লজ্জ আর বকিস নে।

বাল্মীকি। তফাতে সব সরে যা। এ পাপ আর না,
আর না, আর না— ত্রাহি; সব ছাড়িনু।

[দস্যুগণের প্রস্থান

বাল্মীকি। আয় মা, আমার সাথে, কোনো ভয় নাহি আর।
কত দুঃখ পেলি বনে আহা মা আমার!
নয়নে ঝরিছে বারি, এ কি মা সহিতে পারি!
কোমল কাতর তনু কাঁপিতেছে বার বার।

[প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

বনদেবীগণের প্রবেশ

রিম্ ঝিম্ ঘন ঘন রে বরষে।
গগনে ঘনঘটা, শিহরে তরুলতা,
ময়ূর ময়ূরী নাচিছে হরষে।
দিশি দিশি সচকিত দামিনী চমকিত,
চমকি উঠিছে হরিণী তরাসে!

[প্রস্থান

বাল্মীকির প্রবেশ

কোথায় জুড়াতে আছে ঠাঁই—
কেন প্রাণ কেন কাঁদে রে!
যাই দেখি শিকারেতে,
রহিব আমোদে মেতে,
ভুলি সব জ্বালা বনে বনে ছুটিয়ে—
কেন প্রাণ কেন কাঁদে রে!
আপনা ভুলিতে চাই, ভুলিব কেমনে—
কেমনে যাবে বেদনা!
ধরি ধনু আনি বাণ, গাহিব ব্যাধের গান,
দলবল লয়ে মাতিব।
কেন প্রাণ কেন কাঁদে রে!

শৃঙ্গধ্বনিপূর্বক দস্যুগণকে আহ্বান

দস্যুগণের প্রবেশ

দস্যু। কেন রাজা, ডাকিস কেন, এসেছি সবে।
বুঝি আবার শ্যামা মায়ের পুজো হবে?
বাল্মীকি। শিকারে হবে যেতে, আয় রে সাথে।
প্রথম দস্যু। ওরে, রাজা কী বলছে শোন্।
সকলে। শিকারে চল্ তবে।
সবারে আন্ ডেকে যত দলবল সবে।

[বাল্মীকির প্রস্থান

এই বেলা সবে মিলে চলো হো, চলো হো!
ছুটে আয়, শিকারে কে রে যাবি আয়!—
এমন রজনী বহে যায় যে!
ধনুর্বাণ বল্লম লয়ে হাতে, আয় আয় আয় আয় রে।
বাজা শিঙা ঘন ঘন— শব্দে কাঁপিবে বন—
আকাশ ফেটে যাবে, চমকিবে পশু পাখি সবে,
ছুটে যাবে কাননে কাননে! চারি দিকে ঘিরে
যাব পিছে পিছে, হো হো হো হো!

বাল্মীকির প্রবেশ

বাল্মীকি। গহনে গহনে যা রে তোরা, নিশি বহে যায় যে।
তন্ন তন্ন করি অরণ্য, করী বরাহ খোঁজ্ গে!
এই বেলা যা রে।
নিশাচর পশু সবে, এখনি বাহির হবে—
ধনুর্বাণ নে রে হাতে, চল্ ত্বরা চল্।
জ্বালায়ে মশাল-আলো, এই বেলা আয় রে।

[প্রস্থান

প্রথম দস্যু। চল্ চল্ ভাই, ত্বরা করে মোরা আগে যাই।
দ্বিতীয় দস্যু। প্রাণপণ খোঁজ্ এ বন সে বন,
চল্ মোরা ক'জন ও দিকে যাই।
প্রথম দস্যু। না না ভাই, কাজ নাই।
হোথা কিছু নাই, কিছু নাই—
ওই ঝোপে যদি কিছু পাই।
দ্বিতীয় দস্যু। বরা বরা—
প্রথম দস্যু। আরে দাঁড়া দাঁড়া, অত ব্যস্ত হলে ফস্কাবে শিকার।
চুপি চুপি আয়, চুপি চুপি আয় অশথতলায়—
এবার ঠিকঠাক হয়ে সব থাক্।
সাবধান ধরো বাণ, সাবধান ছাড়ো বাণ।
গেল গেল, ওই, পালায় পালায়, চল্ চল্।
ছোট্ রে পিছে, আয় রে ত্বরা যাই।

বনদেবীগণের প্রবেশ

কে এল আজি এ ঘোর নিশীথে,
সাধের কাননে শান্তি নাশিতে!
মত্ত করী যত পদ্মবন দলে
বিমল সরোবর মন্থিয়া,
ঘুমন্ত বিহগে কেন বধে রে
সঘনে খর শর সন্ধিয়া!
তরাসে চমকিয়ে হরিণ-হরিণী
স্খলিত চরণে ছুটিছে।
স্খলিত চরণে ছুটিছে কাননে,
করুণ নয়নে চাহিছে—
আকুল সরসী, সারস সারসী
শরবনে পশি কাঁদিছে।
তিমির দিগ্ ভরি ঘোর যামিনী
বিপদঘনছায়া ছাইয়া—
কী জানি কী হবে আজি এ নিশীথে,
তরাসে প্রাণ ওঠে কাঁপিয়া।

প্রথম দস্যুর প্রবেশ

প্রথম দস্যু। প্রাণ নিয়ে তো সট্‌কেছি রে, করবি এখন কী!
ওরে বরা, করবি এখন কী!
বাবা রে, আমি চুপ করে এই কচুবনে লুকিয়ে থাকি।
এই মরদের মুরদখানা, দেখেও কি রে ভড়কালি না!
বাহবা, শাবাশ তোরে, শাবাশ রে তোর ভরসা দেখি।

খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে
আর-একজন দস্যুর প্রবেশ

অন্য দস্যু। বলব কী আর বলব খুড়ো— উঁ উঁ!
আমার যা হয়েছে বলি কার কাছে—
একটা বুনো ছাগল তেড়ে এসে মেরেছে ঢুঁ।
প্রথম দস্যু। তখন যে ভারি ছিল জারিজুরি,
এখন কেন করছ বাপু উঁ উঁ উঁ—
কোন্‌খানে লেগেছে বাবা, দিই একটু ফুঁ।

দস্যুগণের প্রবেশ

দস্যুগণ। সর্দার মশায়, দেরি না সয়—
তোমার আশায় সবাই বসে।
শিকারেতে হবে যেতে,
মিহি কোমর বাঁধো কষে।
বন বাদাড় সব ঘেঁটে ঘুঁটে
আমরা মরি খেটে খুটে,
তুমি কেবল লুটে পুটে
পেট পোরাবে ঠেসে ঠুসে।
প্রথম দস্যু। কাজ কী খেয়ে, তোফা আছি—
আমায় কেউ না খেলেই বাঁচি।
শিকার করতে যায় কে মরতে,
ঢুঁসিয়ে দেবে বরা মোষে।
ঢুঁ খেয়ে তো পেট ভরে না—
সাধের পেটটি যাবে ফেঁসে।

হাসিতে হাসিতে প্রস্থান ও শিকারের
পশ্চাৎ পশ্চাৎ পুনঃপ্রবেশ

বাল্মীকির দ্রুত প্রবেশ

বাল্মীকি। রাখ্ রাখ্ ফেল্ ধনু, ছাড়িস নে বাণ।
হরিণশাবক দুটি প্রাণভয়ে ধায় ছুটি,
চাহিতেছে ফিরে ফিরে করুণ নয়ান।
কোনো দোষ করে নি তো, সুকুমার কলেবর—
কেমনে কোমল দেহে বিঁধিবি কঠিন শর!

থাক্ থাক্ ওরে থাক্, এ দারুণ খেলা রাখ্,
আজ হতে বিসর্জিনু এ ছার ধনুক বাণ।

[প্রস্থান

দস্যুগণের প্রবেশ

দস্যুগণ। আর না, আর না, এখানে আর না—
আয় রে সকলে চলিয়া যাই।
ধনুক বাণ ফেলেছে রাজা,
এখানে কেমনে থাকিব ভাই!
চল্ চল্ চল্ এখনি যাই।

বাল্মীকির প্রবেশ

দস্যুগণ। তোর দশা, রাজা, ভালো তো নয়!
রক্তপাতে পাস রে ভয়!
লাজে মোরা মরে যাই।
পাখিটি মারিলে কাঁদিয়া খুন,
না জানি কে তোরে করিল গুণ—
হেন কভু দেখি নাই।

[দস্যুগণের প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

বাল্মীকি। জীবনের কিছু হল না হায়—
হল না গো, হল না হায় হায়!
গহনে গহনে কত আর ভ্রমিব, নিরাশার এ আঁধারে?
শূন্য হৃদয় আর বহিতে যে পারি না,
পারি না গো পারি না আর।
কী লয়ে এখন ধরিব জীবন, দিবসরজনী চলিয়া যায়—
দিবসরজনী চলিয়া যায়—
কত কী করিব বলি কত উঠে বাসনা,
কী করিব জানি না গো!
সহচর ছিল যারা ত্যেজিয়া গেল তারা। ধনুর্বাণ ত্যেজেছি,
কোনো আর নাহি কাজ—
কী করি কী করি বলি হাহা করি ভ্রমি গো—
কী করিব জানি না যে!

ব্যাধগণের প্রবেশ

প্রথম ব্যাধ। দেখ্ দেখ্, দুটো পাখি বসেছে গাছে।
দ্বিতীয় ব্যাধ। আয় দেখি চুপি চুপি আয় রে কাছে।
প্রথম ব্যাধ। আরে, ঝট্ করে এইবারে ছেড়ে দে রে বাণ।

দ্বিতীয় ব্যাধ। রোস্ রোস্ আগে আমি করি রে সন্ধান।
বাল্মীকি। থাম্ থাম্, কী করিবি বধি পাখিটির প্রাণ!
দুটিতে রয়েছে সুখে, মনের উল্লাসে গাহিতেছে গান।
প্রথম ব্যাধ। রাখো মিছে ও-সব কথা,
কাছে মোদের এসো নাকো হেথা।
চাই নে ও-সব শাস্তর কথা, সময় বহে যায় যে।
বাল্মীকি। শোনো শোনো, মিছে রোষ কোরো না।
ব্যাধ। থামো থামো ঠাকুর, এই ছাড়ি বাণ।

একটি ক্রৌঞ্চকে বধ

বাল্মীকি। মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্।

কী বলিনু আমি! এ কী সুললিত বাণী রে!
কিছু না জানি কেমনে যে আমি প্রকাশিনু দেবভাষা,
এমন কথা কেমনে শিখিনু রে!
পুলকে পুরিল মনপ্রাণ, মধু বরষিল শ্রবণে,
এ কী! হৃদয়ে এ কী এ দেখি!—
ঘোর অন্ধকার-মাঝে, এ কী জ্যোতি ভায়!
অবাক্!— করুণা এ কার!

সরস্বতীর আবির্ভাব

বাল্মীকি। এ কী এ, এ কী এ, স্থিরচপলা!
কিরণে কিরণে হল সব দিক উজলা!
কী প্রতিমা দেখি এ, জোছনা মাখিয়ে
কে রেখেছে আঁকিয়ে
আ মরি কমলপুতলা!

[ব্যাধগণের প্রস্থান

বনদেবীগণের প্রবেশ

বনদেবী। নমি নমি ভারতী, তব কমলচরণে।
পুণ্য হল বনভূমি ধন্য হল প্রাণ।
বাল্মীকি। পূর্ণ হল বাসনা, দেবী কমলাসনা!
ধন্য হল দস্যুপতি, গলিল পাষাণ।
বনদেবী। কঠিন ধরাভূমি এ, কমলালয়া তুমি যে—
হৃদয়কমলে চরণকমল করো দান।
বাল্মীকি। তব কমলপরিমলে রাখো হৃদি ভরিয়ে,
চিরদিবস করিব তব চরণসুধা পান।

[দেবীগণের অন্তর্ধান

কালীপ্রতিমার প্রতি বাল্মীকি

শ্যামা, এবার ছেড়ে চলেছি মা!
পাষাণের মেয়ে পাষাণী, না বুঝে মা বলেছি মা!

এত দিন কী ছল করে তুই, পাষাণ করে রেখেছিলি—
আজ আপন মায়ের দেখা পেয়ে, নয়নজলে গলেছি মা !
কালো দেখে ভুলি নে আর, আলো দেখে ভুলেছে মন—
আমায় তুমি ছলেছিলে, এবার আমি তোমায় ছলেছি মা !
মায়ার মায়া কাটিয়ে এবার মায়ের কোলে চলেছি মা !

ষষ্ঠ দৃশ্য

বাল্মীকি । কোথা লুকাইলে !
সব আশা নিবিল, দশ দিশি অন্ধকার,
সবে গেছে চলে ত্যেজিয়ে আমারে—
তুমিও কি তেয়াগিলে !

লক্ষ্মীর আবির্ভাব

লক্ষ্মী । কেন গো আপন মনে ভ্রমিছ বনে বনে,
সলিল দু'নয়নে কিসের দুখে ?
কমলা দিতেছি আসি, রতন রাশি রাশি,
ফুটুক তবে হাসি মলিন মুখে ।
কমলা যারে চায়, বলো সে কী না পায়,
দুখের এ ধরায় থাকে সে সুখে ।
ত্যেজিয়া কমলাসনে, এসেছি এ ঘোর বনে,
আমারে শুভক্ষণে হেরো গো চোখে ।

বাল্মীকি । কোথায় সে উষাময়ী প্রতিমা !
তুমি তো নহ সে দেবী কমলাসনা,
কোরো না আমারে ছলনা ।
কী এনেছ ধন মান, তাহা যে চাহে না প্রাণ ।
দেবী গো, চাহি না, চাহি না, মণিময় ধূলিরাশি চাহি না ।
তাহা লয়ে সুখী যারা হয় হোক, হয় হোক—
আমি, দেবী, সে সুখ চাহি না ।
যাও লক্ষ্মী অলকায়, যাও লক্ষ্মী অমরায়,
এ বনে এসো না এসো না—
এসো না এ দীনজন কুটিরে ।
যে বীণা শুনেছি কানে মন প্রাণ আছে ভোর,
আর কিছু চাহি না, চাহি না ।

[লক্ষ্মীর অন্তর্ধান
বাল্মীকির প্রস্থান

বনদেবীগণের প্রবেশ

বাণী বীণাপাণি, করুণাময়ী !
অন্ধজনে নয়ন দিয়ে অন্ধকারে ফেলিলে,

দরশ দিয়ে লুকালে কোথা দেবী অয়ি !
স্বপনসম মিলাবে যদি কেন গো দিলে চেতনা,
চকিতে শুধু দেখা দিয়ে চির মরমবেদনা,
তোমারে চাহি ফিরিছে, হেরো কাননে কাননে ওই ।

[বনদেবীগণের প্রস্থান

বাল্মীকির প্রবেশ

সরস্বতীর আবির্ভাব

বাল্মীকি । এই-যে হেরি গো দেবী আমারই !
সব কবিতাময় জগত-চরাচর,
সব শোভাময় নেহারি ।
ছন্দে উঠিছে চন্দ্রমা, ছন্দে কনকরবি উদিছে,
ছন্দে জগমণ্ডল চলিছে,
জ্বলন্ত কবিতা তারকা সবে—
এ কবিতার মাঝারে তুমি কে গো দেবী,
আলোকে আলো আঁধারি !
আজি মলয় আকুল, বনে বনে এ কী এ গীত গাহিছে,
ফুল কহিছে প্রাণের কাহিনী,
নব রাগ-রাগিণী উছাসিছে ।
এ আনন্দে আজ গীত গাহে মোর হৃদয় সব অবারি ।
তুমিই কি দেবী ভারতী, কৃপাগুণে অন্ধ আঁখি ফুটালে,
উষা আনিলে প্রাণের আঁধারে,
প্রকৃতির রাগিণী শিখাইলে !
তুমি ধন্য গো,
রব চিরকাল চরণ ধরি তোমারি ।

সরস্বতী । দীনহীন বালিকার সাজে
এসেছিনু এ ঘোর বনমাঝে
গলাতে পাষাণ তোর মন—
কেন বৎস, শোন্, তাহা শোন্ ।
আমি বীণাপাণি, তোরে এসেছি শিখাতে গান,
তোর গানে গলে যাবে সহস্র পাষাণ-প্রাণ ।
যে রাগিণী শুনে তোর গলেছে কঠোর মন
সে রাগিণী তোরই কণ্ঠে বাজিবে রে অনুক্ষণ ।
অধীর হইয়া সিন্ধু কাঁদিবে চরণতলে,
চারি দিকে দিক্-বধূ আকুল নয়নজলে ।
মাথার উপরে তোর কাঁদিবে সহস্র তারা,
অশনি গলিয়া গিয়া হইবে অশ্রুর ধারা ।
যে করুণ রসে আজি ডুবিল রে ও হৃদয়
শতস্রোতে তুই তাহা ঢালিবি জগৎময় ।
যেথায় হিমাদ্রি আছে সেথা তোর নাম রবে,
যেথায় জাহ্নবী বহে তোর কাব্যস্রোত ব'বে ।

সে জাহ্নবী বহিবেক অযুত হৃদয় দিয়া
শ্মশান পবিত্র করি, মরুভূমি উর্বরিয়া।
মোর পদ্মাসনতলে রহিবে আসন তোর
নিত্য নব নব গীতে সতত রহিবি ভোর!
বসি তোর পদতলে কবি-বালকেরা যত
শুনি তোর কণ্ঠস্বর শিখিবে সংগীত কত।
এই নে আমার বীণা, দিনু তোরে উপহার,
যে গান গাহিতে সাধ, ধ্বনিবে ইহার তার।

রুদ্রচণ্ড

রুদ্রচণ্ড।

(নাটিকা।)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রণীত।

কলিকাতা

বা ল্মী কি য ন্ত্রে

শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শকাব্দা ১৮০৩।

উপহার

ভাই জ্যোতিদাদা

যাহা দিতে আসিয়াছি কিছুই তা নহে ভাই!
কোথাও পাই নে খুঁজে যা তোমারে দিতে চাই!
আগ্রহে অধীর হ'য়ে   ক্ষুদ্র উপহার ল'য়ে
যে উচ্ছ্বাসে আসিতেছি ছুটিয়া তোমারি পাশ,
দেখাতে পারিলে তাহা পূরিত সকল আশ।
ছেলেবেলা হ'তে, ভাই, ধরিয়া আমারি হাত
অনুক্ষণ তুমি মোরে রাখিয়াছ সাথে সাথ।
তোমার স্নেহের ছায়ে কত না যতন ক'রে
কঠোর সংসার হ'তে আবরি রেখেছ মোরে।
সে স্নেহ-আশ্রয় ত্যজি যেতে হবে পরবাসে
তাই বিদায়ের আগে এসেছি তোমার পাশে।
যতখানি ভালোবাসি, ত্যর মতো কিছু নাই—
তবু যাহা সাধ্য ছিল যতনে এনেছি তাই!

রুদ্রচণ্ড

নাটিকা

প্রথম দৃশ্য

দৃশ্য— পর্বতগুহা। রাত্রি

কালভৈরবের প্রতিমার সম্মুখে রুদ্রচণ্ড

রুদ্রচণ্ড। মহাকালভৈরব-মুরতি,
শুন, দেব, ভক্তের মিনতি!
কটাক্ষে প্রলয় তব, চরণে কাঁপিছে ভব,
প্রলয়গগনে জ্বলে দীপ্ত ত্রিলোচন।
তোমার বিশাল কায়া ফেলেছে আঁধার ছায়া,
অমাবস্যারাত্রি-রূপে ছেয়েছে ভুবন।
জটার জলদরাশি চরাচর ফেলে গ্রাসি,
দশনবিদ্যুত-বিভা দিগন্তে খেলায়।
তোমার নিশ্বাসে খসি নিভে রবি, নিভে শশী,
শত লক্ষ তারকার দীপ নিভে যায়।
প্রচণ্ড উল্লাসে মেতে, জগতের শ্মশানেতে
প্রেতসহচরগণ ভ্রমে ছুটে ছুটে—
নিদারুণ অট্টহাসে প্রতিধ্বনি কাঁপে ত্রাসে,
ভগ্ন ভূমণ্ডল তারা লুফে করপুটে।
প্রলয়মূরতি ধর', থরহর সুর নর,
চারি পাশে দানবেরা করুক বিহার—
মহাদেব, শুন শুন নিবেদিনু পুন পুন
আমি রুদ্রচণ্ড, চণ্ড সেবক তোমার।
যে সংকল্প আছে মনে সঁপিনু তা ও চরণে,
কৃপা করি লও দেব, লও তাহা তুলে।
এ দারুণ ছুরিখানি অর্ঘ্যরূপে দিনু আনি,
দু-দণ্ড এ ছুরিকাটি রাখ পদমূলে।
কৃপা তব হবে কবে মনো আশা পূর্ণ হবে,
মন হ'তে নেবে যাবে প্রতিজ্ঞা-পাষাণ!
সংকল্প হইলে সিদ্ধ এ হৃদি করিয়া বিদ্ধ
নিজের শোণিত দিব উপহারদান!

দ্বিতীয় দৃশ্য

দৃশ্য— অরণ্য। রুদ্রচণ্ড ও অমিয়া

রুদ্রচণ্ড।—

বার বার ক'রে আমি ব'লেছি, অমিয়া, তোরে
কবিতা আলাপ-তরে নহে এ কুটীর,
তবু তোরা বার বার মিছা কি প্রলাপ গাহি
বনের আঁধার চিন্তা দিস্ ভাঙাইয়া !
পাতালের গূঢ়তম অন্ধতম অন্ধকার!
অধিকার কর' এর বালিকা-হৃদয়,
ও হৃদের সুখ আশা ও হৃদের উষালোক
মৃদুহাসি মৃদুভাব ফেল গো গ্রাসিয়া!
হিমাদ্রিপাষাণ চেয়ে গুরুভার মন মোর,
তেমনি উহার মন হোক গুরুভার!
হিমাদ্রিতুষার চেয়ে রক্তহীন প্রাণ মোর,
তেমনি কঠিন প্রাণ হউক উহার!
কুটীরের চারি দিকে ঘনঘোর গাছপালা
আঁধারে কুটীর মোর রেখেছে ডুবায়ে—
এই গাছে, কতবার দেখেছি, অমিয়া, তুই
লতিকা জড়ায়েছিস আপনার মনে—
ফুলন্ত লতিকা যত ছিঁড়িয়া ফেলেছি রোষে,
এ সকল ছেলেখেলা পারি নে দেখিতে!
আবার কহি রে তোরে, বসি চাঁদ কবি-সনে
এ অরণ্যে করিস নে কবিতা-আলাপ!

অমিয়া।—

যাহা যাহা বলিয়াছ সব শুনিয়াছি পিতা—
আর আমি আনমনে গাহি না তো গান,
আর আমি তরুদেহে জড়ায়ে দিই না লতা,
আর আমি ফুল তুলে গাঁথি না তো মালা!
কিন্তু পিতা, চাঁদ কবি, এত তারে ভালোবাসি,
সে আমার আপনার ভায়ের মতন—
বলো মোরে বলো পিতা, কেন দেখিব না তারে
কেন তার সাথে আমি কহিব না কথা!
সেকি পিতা ? তারে তুমি দেখেছ তো কত বার,
তবু কি তাহারে তুমি ভালোবাস নাই !
এমন মূরতি আহা, সে যেন দেবতা-সম,
এমন কে আছে তারে ভালো যে না বাসে !
এই যে আঁধার বন তার পদার্পণ হ'লে
এও যেন হেসে ওঠে মনের হরষে!

এই যে কুটীর এও কোল বাড়াইয়া দেয়,
অভ্যর্থনা করে নি যে কোনো অতিথিরে !
ভ্রূকুটি কোরো না পিতা, ওই ভ্রূকুটির ভয়ে
সমস্ত তোমার আজ্ঞা করেছি পালন।
পায়ে পড়ি ক্ষমা কর— এই ভিক্ষা দাও পিতা
এ ভালোবাসায় মোর করিও না রোষ !

রুদ্রচণ্ড। রুদ্রচণ্ড । মাতৃস্তন্য কেন তোর হয় নাই বিষ !
অথবা ভূমিষ্ঠশয্যা চিতাশয্যা তোর !

অমিয়া। অমিয়া । তাই যদি হ'ত, পিতা, বড়ো ভালো হ'ত !
কে জানে মনের মধ্যে কি হয়েছে মোর,
বরষার মেঘ যদি হইতাম আমি
বর্ষিয়া সহস্রধারে অশ্রুজলরাশি
বজ্রনাদে করিতাম আকুল বিলাপ!
আগে তো লাগিত ভালো জোছনার আলো,
ফুটন্ত ফুলের গুচ্ছ, বকুলতলাটি—
ভ্রূকুটির ভয়ে তব ডরিয়া ডরিয়া
তাহাদেরও 'পরে মোর জন্মেছে বিরাগ !
শুধু একজন আছে যার মুখ চেয়ে
বড়োই হরষে পিতা সব যাই ভুলে,
দূর হ'তে দেখি তারে আকুল হৃদয়
দেহ ছাড়ি তাড়াতাড়ি বাহিরিতে চায়!
সে আইলে তার কাছে যেতে দিও মোরে!
সে যে পিতা অমিয়ার আপনার ভাই!

রুদ্রচণ্ড। বটে বটে, সে তোমার আপনার ভাই!
শত তীক্ষ্ণ বজ্র তার পড়ুক মস্তকে,
চিরজীবী হউক সে অগ্নিকুণ্ডমাঝে!
মুখ ঢাকিস নে তুই, শোন্ তোরে বলি,
পুনরায় যদি তোর আপনার ভাই—
চাঁদ কবি এ কাননে করে পদার্পণ
এই যে ছুরিকা আছে কলঙ্ক ইহার
তাহার উত্তপ্ত রক্তে করিব ক্ষালন!

অমিয়া। ও কথা বোল' না পিতা—

রুদ্রচণ্ড। চুপ্, শোন্ বলি;
জীবন্তে ছুরিকা দিয়া বিঁধিয়া বিঁধিয়া
শত খণ্ড করি তার ফেলিব শরীর,
পাণ্ডুবর্ণ আঁখি-মুদা ছিন্ন মুণ্ড তার
ওই বৃক্ষশাখা-'পরে দিব টাঙাইয়া,
ভিজিবে বর্ষার জলে, পুড়িবে তপনে
যতদিনে বাহিরিয়া না পড়ে কঙ্কাল!
শুনিয়া কাঁপিতেছিস, দেখিবি যখন
মস্তকের কেশ তোর উঠিবে শিহরি!

আপনার ভাই তোর! কে সে চাঁদ কবি!
হতভাগ্য পৃথ্বীরাজ, তারি সভাসদ!
সে পৃথ্বীরাজের হীন জীবন মরণ
এই ছুরিকার 'পরে রয়েছে ঝুলান'!

অমিয়া। থাম পিতা, থাম থাম, ও কথা বোলো না!
শত শত অভাগার শোণিতের ধারা
তোমার ছুরিকা ওই করিয়াছে পান,
তবুও— তবুও ওর মিটে নি পিপাসা?
কত বিধবার আহা কত অনাথার
নিদারুণ মর্ম্মভেদী হাহাকারধ্বনি
তোমার নিষ্ঠুর কর্ণ করিয়াছে পান,
তবুও তবুও ওর মিটে নি কি তৃষা?

রুদ্রচণ্ড। [আপনার মনে]—
মিটে নাই! মিটে নাই! মোরে নির্বাসন!
রাজ্য ছিল, ধন ছিল, সব ছিল মোর,
আরো কত শত আশা ছিল এই হৃদে—
রাজ্য গেল, ধন গেল, সব গেল মোর,
কূলে এসে ডুবে গেল যত আশা ছিল!
শুধু এই ছুরি আছে, আর এই হৃদি
আগ্নেয় গিরির চেয়ে জ্বলন্ত গহ্বর!
মোরে নির্বাসন! হায়, কি বলিব পৃথ্বী,—
এ নির্বাসনের ধার শুধিতাম আমি
পৃথ্বীতে থাকিত যদি এমন নরক
যন্ত্রণা জীবন যেথা এক নাম ধরে,
জীবননিদাঘে যেথা নাই মৃত্যুছায়া!
মোরে নির্বাসন ! কেন, কোন অপরাধে ?
অপরাধ! শতবার লক্ষবার আমি
অপরাধ করি যদি কে সে পৃথ্বীরাজ!
বিচার করিতে তার কোন্ অধিকার !
নাহয় দুরাশা মোর করিতে সাধন
শত শত মানুষের লয়েছি মস্তক—
তুমি কর নাই? তোমার দুরাশাযজ্ঞে
লক্ষ মানবের রক্ত দাও নি আহুতি?
লক্ষ লক্ষ গ্রাম দেশ কর নি উচ্ছিন্ন?
লক্ষ লক্ষ রমণীরে কর নি বিধবা?
শুধু অভিমান তব তৃপ্ত করিবারে—
ভ্রাতা তব জয়চাঁদ, তার রাজ্য দেশ
ভূমিসাৎ করিতে কর নি আয়োজন?
পৃথ্বীতেই তোমার কি হবে না বিচার?
নরকের অধিষ্ঠাতৃদেব, শুন তুমি,
এই বাহু যদি নাহি হয় গো অসাড়,

রক্তহীন যদি নাহি হয় এ ধমনী,
তবে এই ছুরিকাটি এই হস্তে ধরি
উরসে খোদিব তার মরণের পথ!
হৃদয় এমন মোর হয়েছে অধীর
পারি নে থাকিতে হেথা স্থির হ'য়ে আর!
চলিনু, অমিয়া, আমি—তুই থাক্ হেথা,
চলিনু গুহায় আমি করিগে ভ্রমণ।
শোন্, শোন্, শোন্ বলি, মনে আছে তোর—
চাঁদ কবি পুন যদি আসে এ কুটীরে
জীবন লইয়া আর যাবে না সে ফিরে!

[প্রস্থান

অমিয়া। বড়ো সাধ যায় এই নক্ষত্রমালিনী
স্তব্ধ যামিনীর সাথে মিশে যাই যদি!
মৃদুল সমীর এই, চাঁদের জোছনা,
নিশার ঘুমন্ত শান্তি, এর সাথে যদি
অমিয়ার এ জীবন যায় মিলাইয়া!
আঁধার ভ্রূকুটিময় এই এ কানন,
সংকীর্ণহৃদয় অতি ক্ষুদ্র এ কুটীর,
ভ্রূকুটির সমুখেতে দিনরাত্রি বাস,
শাসন-শকুনি এক দিনরাত্রি যেন
মাথার উপরে আছে পাখা বিছাইয়া—
এমন ক'দিন আর কাটিবে জীবন!
থেকে থেকে প্রাণ উঠে কাঁদিয়া কাঁদিয়া!
পাখি যদি হইতাম, দু-দণ্ডের তরে
সুনীল আকাশে গিয়া উষার আলোকে
একবার প্রাণ ভ'রে দিতেম সাঁতার!
আহা, কোথা চাঁদ কবি, ভাই গো আমার!
এ রুদ্ধ অরণ্য-মাঝে তোমারে হেরিলে
দু-দণ্ড যে আপনারে ভুলে থাকি আমি!

রুদ্রচণ্ডের প্রবেশ

না—না পিতা, পায়ে পড়ি, পারিব না তাহা,
আর কি তাহারে কভু দেখিতে দিবে না?
কোন্ অপরাধ আমি করেছি তোমার
অভাগীরে এত কষ্ট দিতেছ যা লাগি!
কে জানে বুকের মধ্যে কি যে করিতেছে!
দাও পিতা, ওই ছুরি বিঁধিয়া বিঁধিয়া
ভেঙে ফেল যাতনার এ আবাসখানা!
ওই ছুরি কত শত বীরের শোণিতে
মাথা তার ডুবায়েছে হাসিয়া হাসিয়া,
ক্ষুদ্র এই বালিকার শোণিত বর্ষিতে

ও দারুণ ছুরি তব হবে না কুণ্ঠিত!
হেসো না অমন করি, পায়ে পড়ি তব,
ওর চেয়ে রোষদীপ্ত ভ্রূকুটিকুটিল
রুদ্র মুখপানে তব পারি নেহারিতে!

রুদ্রচণ্ড। ঘুমাগে ঘুমাগে তুই, অমিয়া, ঘুমাগে—
একটু রহিব একা, তাও কি দিবি না?
আজ আমি ঘুমাব না, একেলা হেথায়
ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া রাত্রি করিব যাপন।
এনে দে কুঠার মোর, কাটিয়া পাদপ
এ দীর্ঘ সময় আমি দিব কাটাইয়া।
বিশ্রাম আমার কাছে দারুণ যন্ত্রণা!
বিশ্রাম, কালের প্রতি মুহূর্ত যেমন
দংশন করিতে থাকে হৃদয় আমার।
মরুভূমিপথমাঝে পথিক যখন
দূর গম্যদেশে তার করিতে গমন
যত অগ্রসর হয়, দিগন্তবিস্তৃত
নব নব মরু যদি পড়ে দৃষ্টিপথে,
তাহার হৃদয় হয় যেমন অধীর,
তেমনি আমার সেই উদ্দেশ্যের মাঝে
প্রত্যেক মুহূর্তকাল প্রত্যেক নিমেষ
অস্থির করিয়া তুলে হৃদয় আমার!

তৃতীয় দৃশ্য

অরণ্য

চাঁদ কবি ও অমিয়া

চাঁদ কবি। কেন লো অমিয়া, তোর কচি মুখখানি
অমন বিষণ্ণ হেরি, অমন গম্ভীর?
আয়, কাছে আয়, বোন, শোন্ তোরে বলি,
গান শিখাইব ব'লে দুটি গান আমি
আপনি রচনা ক'রে এনেছি অমিয়া!
বনের পাখিটি তুই, গান গেয়ে গেয়ে
বেড়াইবি বনে বনে এই তোরে সাজে—

অমিয়া। চুপ কর, ওই বুঝি পদশব্দ শুনি!
বুঝি আসিছেন পিতা! না না, কেহ নয়!
শোন ভাই, এ বনে এসো না তুমি আর!
আসিবে না? তা হ'লে কি অমিয়ার সাথে
আর দেখা হবে নাক? হবে না কি আর?

চাঁদ কবি। কি কথা বলিতেছিস, অমিয়া, বালিকা!
অমিয়া। পিতা যে কি বলেছেন, শোন নাই তাহা—
বড়ো ভয় হয় শুনে, প্রাণ কেঁপে ওঠে!
কাজ নাই ভাই, তুমি যাও হেথা হতে!
যেমন করিয়া হোক, কাটিবেক দিন—
অমিয়ার তরে, কবি, ভেবোনাক তুমি।
চাঁদ কবি। আমি গেলে বল্ দেখি, বোনটি আমার,
কার কাছে ছুটে যাবি মনে ব্যথা পেলে?
আমি গেলে এ অরণ্যে কে রহিবে তোর!
অমিয়া। কেহ না, কেহ না চাঁদ! আমি বলি ভাই,
পিতারে বুঝায়ে তুমি বোলো একবার!
বোলো তুমি অমিয়ারে ভালোবাস বড়ো,
মাঝে মাঝে তারে তুমি আস দেখিবারে!
আর কিছু নয়, শুধু এই কথা বোলো!
তুমি যদি ভালো করে বলো বুঝাইয়া,
নিশ্চয় তোমার কথা রাখিবেন পিতা!
বলিবে?
চাঁদ কবি। বলিব বোন! ও কথা থাকুক্!—
সে দিন যে গান তোরে দেছিনু শিখায়ে,
সে গানটি ধীরে ধীরে গা' দেখি অমিয়া!

গান

রাগিণী— মিশ্র ললিত

অমিয়া। বসন্তপ্রভাতে এক মালতীর ফুল
প্রথম মেলিল আঁখি তার,
চাহিয়া দেখিল চারি ধার।
সৌন্দর্যের বিন্দু সেই মালতীর চোখে
সহসা জগৎ প্রকাশিল,
প্রভাত সহসা বিভাসিল
বসন্তলাবণ্যে সাজি গো—
একি হর্ষ— হর্ষ আজি গো!
উষারাণী দাঁড়াইয়া শিয়রে তাহার
দেখিছে ফুলের ঘুম-ভাঙা,
হরষে কপোল তাঁর রাঙা!
কুসুমভগিনীগণ চারি দিক হতে
আগ্রহে রয়েছে তারা চেয়ে,
কখন ফুটিবে চোখ ছোট বোনটির
জাগিবে সে কাননের মেয়ে।
আকাশ সুনীল আজি কিবা,
অরুণনয়নে হাসাবিভা,

বিমল শিশিরধৌত তনু
হাসিছে কুসুমরাজি গো—
একি হর্ষ— হর্ষ আজি গো!

মধুকর গান গেয়ে বলে,
'মধু কই, মধু দাও দাও!'
হরষে হৃদয় ফেটে গিয়ে
ফুল বলে, 'এই লও লও!'
বায়ু আসি কহে কানে কানে,
'ফুলবালা পরিমল দাও!'
আনন্দে কাঁদিয়া কহে ফুল,
'যাহা আছে সব লয়ে যাও!'
হরষ ধরে না তার চিতে,
আপনারে চায় বিলাইতে,
বালিকা আনন্দে কুটিকুটি,
পাতায় পাতায় পড়ে লুটি—
নূতন জগত দেখি রে
আজিকে হরষ একি রে!

—

অমিয়া। সত্য সত্য ফুল যবে মেলে আঁখি তার,
না জানি সে মনে মনে কি ভাবে তখন!

চাঁদ কবি। অমিয়া, তুই তা, বল্, বুঝিবি কেমনে!
তুই সুকুমার ফুল যখনি ফুটিলি,
যখনি মেলিলি আঁখি, দেখিলি চাহিয়া—
শুষ্ক জীর্ণ পত্রহীন অতি সুকঠোর
বজ্রাহত শাখা-'পরে তোর বৃন্ত বাঁধা
একটিও নাই তোর কুসুমভগিনী,
আঁধার চৌদিক হতে আছে গ্রাস করি—
যেমনি মেলিলি আঁখি অমনি সভয়ে
মুদিতে চাহিলি বুঝি নয়নটি তোর।
না দেখিলি রবিকর, জোছনার আলো,
না শুনিলি পাখিদের প্রভাতের গান!
আহা বোন, তোরে দেখে বড়ো হয় মায়া!
মাঝে মাঝে ভাবি ব'সে কাজ-কর্ম ভুলি,
'এতক্ষণে অমিয়া একেলা বসে আছে,
বিশাল আঁধার বনে কেহ তার নাই!'
অমনি ছুটিয়া আসি দেখিবারে তোরে!
আরেকটি গান তোরে শিখাইব আজি,
মন দিয়ে শোন্ দেখি অমিয়া আমার!

গান

রাগিণী— মিশ্র গৌড়-সারঙ্গ

তরুতলে ছিন্নবৃন্ত মালতীর ফুল
মুদিয়া আসিছে আঁখি তার,
চাহিয়া দেখিল চারি ধার।
শুষ্ক তৃণরাশি-মাঝে একেলা পড়িয়া,
চারি দিকে কেহ নাই আর।
নিরদয় অসীম সংসার।
কে আছে গো দিবে তার তৃষিত অধরে
এক বিন্দু শিশিরের কণা ?
কেহ না— কেহ না!

মধুকর কাছে এসে বলে,
'মধু কই, মধু চাই চাই।'
ধীরে ধীরে নিশ্বাস ফেলিয়া
ফুল বলে, 'কিছু নাই নাই।'
'ফুলবালা, পরিমল দাও'
বায়ু আসি কহিতেছে কাছে।
মলিন বদন ফিরাইয়া
ফুল বলে, 'আর কিবা আছে!'
মধ্যাহ্নকিরণ চারি দিকে
খর দৃষ্টে চেয়ে অনিমিখে,
ফুলটির মৃদু প্রাণ হায়
ধীরে ধীরে শুকাইয়া যায়।

অমিয়া। ওই আসিছেন পিতা, লুকাও লুকাও,
পায়ে পড়ি— লুকাও লুকাও এই বেলা,
একটি আমার কথা রাখ চাঁদ কবি!
সময় নাইক আর— ওই আসিছেন,
কি হবে ? কি হবে ভাই ? কোথা লুকাইবে ?

রুদ্রচণ্ডের প্রবেশ

পিতা, পিতা, ক্ষমা কর, ক্ষমা কর মোরে;
আপনি এসেছি আমি চাঁদ কবি -কাছে,
চাঁদের কি দোষ তাহে বলো পিতা, বলো !
এসেছিনু, কিছুতেই পারি নি থাকিতে—
নিজে এসেছিনু আমি, চাঁদের কি দোষ ?

রুদ্রচণ্ড। অভাগিনী!

চাঁদ কবি। রুদ্রচণ্ড, শোন মোর কথা।

অমিয়া। থাম চাঁদ, কোনো কথা বোলো না পিতারে,
থাম থাম।

চাঁদ কবি। রুদ্রচণ্ড, শোন মোর কথা!

অমিযা। পিতা, পিতা, এই পায়ে পড়িলাম আমি,
যাহা ইচ্ছা কর তাই এখনি— এখনি।
চেয়ো না চাঁদের পানে অমন করিয়া।

চাঁদ কবি। দাঁড়ানু কৃপাণ এই পরশ করিয়া—
সূর্যদেব, সাক্ষী রহ, আমি চাঁদ কবি
আজ হতে অমিয়ার হনু পিতা মাতা।
তোর সাথে অমিয়ার সমস্ত বন্ধন
এ মুহূর্ত হতে আজ ছিন্ন হয়ে গেল।
মোর অমিয়ার কেশ স্পর্শ কর যদি
রুদ্রচণ্ড, তোর দিন ফুরাইবে ভবে!

অমিয়ার মূর্ছিত হইয়া পতন
উভয়ের দ্বন্দ্বযুদ্ধ ও রুদ্রচণ্ডের পতন

রুদ্রচণ্ড। সম্বর সম্বর অসি, থাম চাঁদ, থাম!
কি! হাসিছ বুঝি! বুঝি ভাবিতেছ মনে,
মরণেরে ভয় করি আমি রুদ্রচণ্ড!
জানিস নে মরণের ব্যবসায়ী আমি!
জীবন মাগিতে হ'ল তোর কাছে আজ
শত বার মৃত্যু এই হইল আমার!
রুদ্রচণ্ড যে মুহূর্তে ভিক্ষা মাগিয়াছে
রুদ্রচণ্ড সে মুহূর্তে গিয়াছে মরিয়া!
আজ আমি মৃত সে রুদ্রের নাম লয়ে
কেবল শরীর তার, কহিতেছি তোরে—
এখনো জীবনে মোর আছে প্রয়োজন!
এখনো— এখনো আছে! এখনো আমার
সংকল্প রয়েছে হ'য়ে দারুণ তৃষিত!
রুদ্রচণ্ড তোর কাছে ভিক্ষা মাগিতেছে
আর কি চাহিস চাঁদ? দিবি মোরে প্রাণ?

অশ্বারোহী দূতের প্রবেশ
চাঁদ কবির প্রতি

দূত। মহাশয়, আসিতেছি রাজসভা হতে!
নিমেষ ফেলিতে আর নাই অবসর!
প্রতি মুহূর্তের 'পরে অতি ক্ষীণ সূত্রে
রাজ্যের শুভাশুভ করিছে নির্ভর!
প্রশ্নোত্তর করিবার নাইক সময়!

[সত্বর উভয়ের প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

রুদ্রচণ্ড

রুদ্রচণ্ড। অনুগ্রহ ক'রে মোরে চ'লে গেল চাঁদ!
গৃহে ব'সে ভাবিতেছে প্রসন্নবদনে
রুদ্রচণ্ডে বাঁচালেম অনুগ্রহ ক'রে?
অনুগ্রহ! রুদ্রচণ্ডে অনুগ্রহ করা!
এ অনুগ্রহের ছুরি মর্ম্মের মাঝারে
—যত দিন বেঁচে রব— রহিবে নিহিত!
দিনরাত্রি রক্ত মোর করিবে শোষণ।
দুগ্ধপোষ্য শিশু চাঁদ— তার অনুগ্রহ!
ভিক্ষা-পাওয়া এ জীবন না রাখিলে নয়!
এ হীন প্রাণের কাজ যখনি ফুরাবে
তখনি ধূলায় এরে করিব নিক্ষেপ,
চরণে দলিয়া এরে চূর্ণ ক'রে দেব'।

অমিয়ার প্রবেশ

আবার রাক্ষসি, তুই আবার আইলি!
এ সংসারে আছে যত আপনার ভাই—
সকলেরে ডেকে আন্, পিতার জীবন
সে কুক্কুরদের মুখে করিস নিক্ষেপ।
পিতার শোণিত দিয়ে পুষিস তাদের।
দূর হ রাক্ষসি, তুই এখনি দূর হ।

অমিয়া। পিতা, পিতা, পায়ে পড়ি, শতবার আমি
দূর হয়ে যাইতেছি এ কুটীর হ'তে—
বোলো না, অমন ক'রে বোলো না আমাবে
বুঝিতে পারি নে যে গো কি আমি করেছি।
চাঁদের সহিত দুটি কথা কয়েছিনু—
কেন পিতা, তার তরে এত শাস্তি কেন?

রুদ্রচণ্ড। চুপ কর্, 'কেন' 'কেন' শুধাস নে আর।
'দূর হ রাক্ষসি' এই আদেশ আমার!
দিনরাত্রি, পাপিয়সি, 'কেন কেন' করি
করিস নে মোর আদেশের অপমান।

অমিয়া। কোথা যাব পিতা, আমি পথ যে জানি নে।
কারেও চিনি নে আমি— কি হবে আমার!
পিতা গো, জান তো তুমি, অমিয়া তোমার
নিতান্ত নির্বোধ মেয়ে কিছু সে বুঝে না—
না বুঝে করেছে দোষ ক্ষমা কর তারে।

রুদ্রচণ্ড। হতভাগী!

অমিয়া। ক্ষমা কর, ক্ষমা কর পিতা!
আজ রাত্রে দূর ক'রে দিও না আমারে,

এক রাত্রি তরে দাও কুটীরে থাকিতে।

রুদ্রচণ্ড। শিশুর হৃদয় এ কি পেয়েছিস তুই!
দুই ফোঁটা অশ্রু দিয়ে গলাতে চাহিস!
এখনি ও অশ্রুজল মুছে ফেল্ তুই।
অশ্রুজলধারা মোর দু-চক্ষের বিষ।
আর নয়, শোন্ শেষ আদেশ আমার—
দূর হ রে—

অমিয়া। ধর পিতা, ধর গো আমায়—

রুদ্রচণ্ড। ছুঁস নে, ছুঁস নে মোরে, রাক্ষসি, ছুঁস্ নে।

অমিযাব মূর্ছিত হইযা পতন ও তাহাকে তুলিয়া লইয়া
বনান্ত-উদ্দেশে রুদ্রচণ্ডের প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

অমিয়া। রাজপথে প্রাসাদসম্মুখে

অমিযা। আব তো পারি না, শ্রান্ত ক্লান্ত কলেবব।
সঘনে ঘুরিছে মাথা, টলিছে চরণ।
বহিছে বহুক ঝড, পড়ুক অশনি,
ঘোব অন্ধকার মোরে ফেলুক গ্রাসিয়া।
এ কি এ বিদ্যুৎ মাগো! অন্ধ হ'ল আঁখি।
চাঁদ, চাঁদ, কোথা গেলে ভাইটি আমাব!
সাবাদিন উপবাসে পথে পথে ভ্রমি
'চাঁদ চাঁদ' ব'লে আমি খুঁজেছি তোমায়।
কোথাও পেনু না কেন ভাই গো আমার?
অতি ভয়ে ভয়ে গেছি পান্থদের কাছে—
শুধায়েছি, কেহ কেন বলে নি আমারে?
এ প্রাসাদ যদি হয় তাঁহারি আলয়!
যদি গো এখনি চাঁদ বাহিরিয়া আসে,
হেথা মোরে দেখিয়া কি করেন তা হ'লে?
হয়ত আছেন তিনি, যাই একবার।
উহু কি বাতাস! শীতে কাঁপি থর থর!
যদি না থাকেন তিনি, আর কেহ এসে
যদি কিছু বলে মোরে, কি করিব তবে?
কে আছ গো, দ্বার খোল— আমি নিরাশ্রয়,
অমিয়া আমার নাম, এসেছি দুয়ারে।

দ্বার খুলিয়া একজন। কে তুই?

অমিয়া। [সভয়ে] অমিয়া আমি।

দ্বাররক্ষক। হেথা কেন এলি?

অমিয়া। চাঁদ কবি ভাই মোর আছেন কি হেথা?
বড়ো শ্রান্ত ক্লান্ত আমি চাহি গো আশ্রয়।

দ্বাররক্ষক। এ রাত্রে দুয়ারে মিছা করিস নে গোল।
হেথা ঠাঁই মিলিবে না, দূর হ ভিখারি।

দ্বাররোধন। একটি পান্থের প্রবেশ

পান্থ। উঃ। একি মুহুর্মুহু হানিছে বিদ্যুৎ!
এ দুর্যোগে পথপার্শ্বে কে বসিয়া হোথা?
এমন বহিছে ঝড়, গর্জিছে অশনি,
আজ রাত্রে গৃহ ছেড়ে পথে কে রে তুই!

কাছে আসিয়া

একি বাছা, হেথা কেন একেলা বসিয়া?
পিতা মাতা কেহ তোর নাই কি সংসারে?

অমিয়া। কাঁদিয়া উঠিয়া
ওগো পান্থ, কেহ নাই, কেহ নাই মোর।
অমিয়া আমার নাম, বড়ো শ্রান্ত আমি,
সারাদিন পথে পথে করেছি ভ্রমণ।

পান্থ। আয় মা, আমার সাথে আয় মোর ঘরে।
অরণ্যে আমার কুঁড়ে, বেশি দূর নয়।
আহা দাঁড়াবার বল নাই যে চরণে।
আয়, তোরে কোলে ক'রে তুলে নিয়ে যাই।

অমিয়া। চাঁদ কবি, ভাই মোর, তারে জান তুমি?
কোথায় থাকেন তিনি পার কি বলিতে?

পান্থ। জানি নে মা, কোথাকার কে সে চাঁদ কবি।
আমরা বনের লোক, কাঠ কেটে খাই,
নগরে কে কোথা থাকে জানিব কি ক'রে?
চল মা, আজি এ রাত্রে মোর ঘরে চল্‌।

ষষ্ঠ দৃশ্য

চাঁদ কবি। শিবির

চাঁদ কবি। সহস্র থাকুক কাজ, আজ একবার
অমিয়ারে না দেখিলে নারিব থাকিতে।
না জানি সে অভাগিনী কি করিছে আহা!
হয়ত সে সহিছে দ্বিগুণ অত্যাচার।
তোর দুঃখ গেনু আমি দূর করিবারে,
ফেলিনু দ্বিগুণ কষ্টে অমিয়া আমার।
জানিলি নে, অভাগিনী, সুখ কারে বলে!
শাসনের অন্ধকারে, অরণ্যবিজনে,
পিতা নামে নিরদয় শমনের কাছে
দারুণ কটাক্ষে তার থরথর কাঁপি
দিনরাত্রি রয়েছিস ম্রিয়মাণ হয়ে।
প্রভাতের ফুল তুই, দিবসের পাখি—
কবে এ আঁধার রাতি ফুরাইবে তোর?
ওই মুখখানি নিয়ে প্রফুল্ল নয়নে
গান গাবি, খেলাইবি প্রশান্ত হরষে!
এই যুদ্ধ শেষ হলে, অভাগিনী তোরে
আনিব রে নিষ্ঠুর পিতার গ্রাস হতে।
আপনার ঘরে আনি রাখিব যতনে,
এতদিনকার দুঃখ দিব দূর ক'রে।
রাজপুত ক্ষত্রিয়েরে করিবি বিবাহ,
ভালোবেসে দুই জনে কাটাবি জীবন।
অন্ধকার অরণ্যের রুদ্ধ বাল্যকাল
দুঃস্বপ্নের মতো শুধু পড়িবেক মনে।

দূতের প্রবেশ

মহাশয়, এসেছে এসেছে শত্রুগণ,
তিন ক্রোশ দূরে তারা ফেলেছে শিবির।
রাত্রিযোগে অলক্ষ্যেতে এসেছে তাহারা,
সহসা প্রভাতে আজি পেলেম বারতা।

চাঁদ। চল তবে—বাজাও বাজাও রণভেরী।
সৈন্যগণ, অস্ত্র লও, উঠাও শিবির।
দুয়ারে এসেছে শত্রু, বিলম্ব সহে না।
দাও মোরে বর্ম দাও, অশ্ব ল'য়ে এসো।
ত্বরা কর, বাজাও বাজাও রণভেরী।

কোলাহল

সপ্তম দৃশ্য

বন

একজন দূতের প্রবেশ

দূত। একি ঘোর স্তব্ধ বন, একি অন্ধকার !
চারি দিকে ঝোপঝাপ, পথ নাই কোথা !
ওই বুঝি হবে তার আঁধার কুটীর,
ওইখানে রুদ্রচণ্ড বাস করে বুঝি।

রুদ্রচণ্ডের প্রবেশ

দূত। প্রণাম !
রুদ্র। কে তুই !
দূত। আগে কুটীরেতে চল !
একে একে সব কথা করি নিবেদন !
রুদ্র। পথ ভুলে বুঝি তুই এসেছিস হেথা ?
আমি রুদ্রচণ্ড, এই অরণ্যের রাজা।
নগরনিবাসী তোরা হেথা কেন এলি ?
ঐশ্বর্য্যমাঝারে তোরা প্রাসাদে থাকিস,
ননীর পুঁতুল যত ললনারে লয়ে
আবেশে মুদিত আঁখি, গদ গদ ভাষা,
ফুলের পাপড়ি, 'পরে পাড়িলে চরণ
ব্যথায় অধীর হয়ে উঠিস যে তোরা—
নগরফুলের কীট হেথা তোরা কেন ?
আমি পৃথ্বীরাজ নই, আমি রুদ্রচণ্ড।
মৃদু মিষ্ট কথা শুনি আহ্লাদে গলিয়া
রাজ্যধন উপহার দিই নাকো আমি !
বিশাল রাজসভার ব্যাধি তোরা যত
আমার অরণ্যে কেন করিলি প্রবেশ ?
পুষ্টদেহ ধনী তোরা, দেখিতে এলি কি
কুটীরে কি ক'রে থাকে অরণ্যের লোক ?
মনে কি করিলি এই অরণ্যবাসীরে
দুটা অনুগ্রহবাক্যে কিনিয়া রাখিবি ?
তাই আজ প্রাতঃকালে স্বর্ণময় বেশে
বিশাল উষ্ণীষ এক বাঁধিয়া মাথায়
এলি হেথা ধাঁধিবারে দরিদ্রনয়ন ?
জানিস কি, বনবাসী এই রুদ্রচণ্ড—
যতেক উষ্ণীষধারী আছয়ে নগরে
সবার উষ্ণীষে করে শত পদাঘাত !
দূত। রুদ্রচণ্ড, মিছা কেন করিতেছ রোষ !
উপকার করিতেই এসেছি হেথায়।

রুদ্র। বটে বটে, উপকার করিতে এসেছ!
তোমরা নগরবাসী স্ফীতদেহ সবে
উপকাব করিবারে সদাই উদ্যত!
তোমাদের নগরের বালক সে চাঁদ
উপকার করিতে আসেন তিনি হেথা,
উপকার ক'রে মোরে রেখেছেন কিনে!
এত উপকার তিনি করেছেন মোর
আব কারো উপকারে আবশ্যক নাই!

দূত। রুদ্রচণ্ড, বুঝি তুমি ভ্রমে পড়িয়াছ,
আমি নহি পৃথ্বীরাজ-রাজ-সভাসদ।
রাজ-রাজ মহারাজ মহম্মদ ঘোরী
তিনিই আমারে হেথা কবেন প্রেরণ—
অধীর হোয়ো না, সব শোন একে একে—
পৃথ্বীরাজে আক্রমিতে আসিছেন তিনি,
বহুদূর পর্যটনে শ্রান্ত সৈন্যদল—
থাম রুদ্র, বলি আমি, কথা মোর শোন—
আজ এক রাত্রি-তরে এ অরণ্য-মাঝে
রাজ-রাজ মহারাজ চাহেন আশ্রয়!

রুদ্র। কি বলিলি দূত! তোর মহম্মদ ঘোরী,
পৃথ্বীরাজে আক্রমিতে আসিতেছে হেথা!

দূত। এ বনে তো লোক নাই! ধীরে কথা কও!

রুদ্র। ধীরে ক'ব: যাব আমি নগরে নগরে,
ঊর্দ্ধকণ্ঠে কব আমি রাজপথে গিয়া,
'ম্লেচ্ছ সেনাপতি এক মহম্মদ ঘোরী
তস্করের মতো আসে আক্রমিতে দেশ!'

দূত। শোন রুদ্র, পৃথ্বী তব রাজ্যধন কেড়ে
নির্বাসিত করেছেন এ অরণ্যদেশে—

রুদ্র। সংবাদের-আবর্জনা-ভিক্ষুক কুক্কুর,
এ সংবাদ কোথা হতে করিলি সংগ্রহ?

দূত। ধৈর্য্য ধর। পৃথ্বী তব রাজ্যধন লয়ে
নির্বাসিত করেছেন এ অরণ্যদেশে!
প্রতিহিংসা সাধিবার সাধ থাকে যদি
এই তার উপযুক্ত হয়েছে সময়।
মহম্মদ ঘোরী হেথা—

রুদ্র। মহম্মদ ঘোরী?
কেন, আমার কি কাছে ছুরি নাই মূঢ়!
এত দিন বক্ষে তারে করিনু পোষণ,
প্রতি দণ্ডে দণ্ডে তারে দিয়েছি আশ্বাস
আজ কোথা হতে আসি মহম্মদ ঘোরী
তাহার মুখের গ্রাস লইবে কাড়িয়া?

যেমন পৃথ্বীর শত্রু মহম্মদ ঘোরী
তেমনি আমারো শত্রু কহি তোরে দূত !
পৃথ্বীর রাজত্ব প্রাণ এসেছে কাড়িতে,
সমস্ত জগৎ মোর ছিনিতে এসেছে ।
এখনি নগরে যাব কহি তোরে আমি ।
অশুভ বারতা এই কবির প্রচার ।

কৃপাণ খুলিয়া রুদ্রচণ্ডকে দূতের সহসা আক্রমণ
উভয়ের যুদ্ধ ও দূতের পতন

অষ্টম দৃশ্য

দৃশ্য । পথ

নেপথ্যে গান

তরুতলে ছিন্নবৃন্ত মালতীর ফুল
মুদিয়া আসিছে আঁখি তার ।
চাহিয়া দেখিল চাবি ধার !
শুষ্ক তৃণরাশি-মাঝে একেলা পড়িয়া,
চারি দিকে কেহ নাই আর,
নিরদয় অসীম সংসার ।
কে আছে গো দিবে তার তৃষিত অধরে
এক বিন্দু শিশিরের কণা ।
কেহ না, কেহ না !
মধ্যাহ্নকিরণ চারি দিকে
খরদৃষ্টে চেয়ে অনিমিখে—
ফুলটির মৃদুপ্রাণ হায়
ধীরে ধীরে শুকাইয়া যায় ।

নেপথ্যে

উত্তরের পথ দিয়া চল সৈন্যগণ !

সেনাপতিগণ সৈন্যগণ ও চাঁদ কবির প্রবেশ

চাঁদ কবি । অমিয়ার কণ্ঠ যেন শুনিনু সহসা,
এ মধ্যাহ্নে রাজপথে সে কেন আসিবে ?

সেনাপতি । সৈন্যগণ হেথা এসে দাঁড়াইলে কেন ?
বিশ্রাম করিতে কভু এই কি সময় ?

দ্বিতীয় সেনাপতি। শুনিনু যবনগণ যুঝে প্রাণপণে—
অতিশয় ক্লান্ত নাকি হিন্দু সৈন্য যত।
এখনো রয়েছে তারা সাহায্যের আশে,
নিতান্ত নিরাশ হবে বিলম্ব হইলে।
চাঁদ কবি। তবে চল, চল ত্বরা, আর দেরি নয়!

গমনোদ্যম। অমিয়ার প্রবেশ

অমিয়া। চাঁদ, চাঁদ— ভাই মোর—
সৈন্যগণ। কে তুই! দূর হ!
সেনাপতি। স'রে দাঁড়া, পথ ছাড়, চল সৈন্যগণ!
চাঁদ কবি। [স্তম্ভিত হইয়া] অমিয়া রে—
সেনাপতি। চাঁদ কবি, এই কি সময়!
আমাদের মুখ চেয়ে সমস্ত ভারত,
ছেলেখেলা পেনু একি পথের ধারেতে?
চল চল, বাজাও, বাজাও রণভেরী!
চাঁদ। [যাইতে যাইতে] অমিয়া রে, ফিরে এসে—
সেনাপতি। বাজাও দুন্দুভি!

রণবাদ্য। প্রস্থান

অমিয়ার অবসন্ন হইয়া পতন

নবম দৃশ্য

নগর। রুদ্রচণ্ড

রুদ্র। বেধেছে তুমুল রণ; কোথা পৃথ্বীরাজ!
ওরে রে সংগ্রামদৈত্য শোণিতপিপাসী,
সমস্ত হস্তিনা তুই করিস রে গ্রাস,
পৃথ্বীরাজে রেখে দিস এ ছুরিকা-তরে।
পৃথ্বীরাজ আছে কোন শিবিরে না জানি
ভ্রমিতেছি তার তরে প্রভাত হইতে।
আজ তার দেখা পেলে পূরাইব সাধ।
একি ঘোর কোলাহল নগরের পথে,
সম্মুখে, দক্ষিনে বামে সহস্র বর্বর
গায়ের উপর দিয়া যেতেছে চলিয়া!
চারি দিকে রহিয়াছে প্রাসাদের বন,
বাতায়ন হতে চেয়ে শত শত আঁখি!
এত লোক, এত গোল সহ্য নাহি হয়!

একজন পান্থের প্রতি

কে গো তুমি মহাশয়, মুখপানে মোর
একেবারে চেয়ে আছ অবাক্ হইয়া ?
কখন কি দেখ নাই মানুষের মুখ ?
যেথা যাই শত আঁখি মোর মুখ চেয়ে,
আঁখিগুলা বুঝি মোরে পাগল করিবে !
যেথা হেরি চারি দিকে সূর্য্যের আলোক,
নয়ন বিঁধিছে মোর বাণের মতন !
একটু আড়াল পাই, একটু আঁধার,
বাঁচি তবে দুই দণ্ড নিশ্বাস ফেলিয়া !
একি হেরি ? ঊর্দ্ধশ্বাস নাগরিকগণ
কোথায় ছুটেছে সব অস্ত্র শস্ত্র লয়ে ?
ওগো পান্থ, বলো মোরে ত্বরা ক'রে বলো,
মরেছে কি পৃথ্বীরাজ ? ত্বরা ক'রে বলো !

পান্থ। কে তুই অসভ্য বন্য, কোথা হতে এলি ?
অকল্যাণ বাণী যদি উচ্চারিস মুখে
রসনা পুড়াব তোর জ্বলন্ত অঙ্গারে !

[প্রস্থান

রুদ্র। [আর একজনের প্রতি]
শোন পান্থ, বলো শোন পান্থ, বলো মোরে কোথা যাও সবে,
রণক্ষেত্রে অমঙ্গল ঘটে নি তো কিছু !

[উত্তর না দিয়া পান্থের প্রস্থান

রুদ্র। [একজন পান্থকে ধরিয়া]
অসভ্য বর্বর যত, বল মোরে বল্ !
ছাড়িব না, যতক্ষণ না দিবি উত্তর !
বল শুধু পৃথ্বীরাজ রয়েছে বাঁচিয়া !

[বলপূর্বক ছাড়াইয়া লইয়া পান্থের প্রস্থান

রুদ্র। নগরকুক্কুর যত মরুক— মরুক !
হীন অপদার্থ যত বিলাসীর পাল,
যুদ্ধের হুংকার শুনে ডরিয়া মরুক !
নবনীগঠিত যত সুখের শরীর—
নিজের অস্ত্রের ভারে পিষিয়া মরুক !
ঐশ্বর্যধূলায় অন্ধ নগরের কীট
নিজের গরবে ফেটে মরুক— মরুক !

দশম দৃশ্য

অমিয়া । পথ

অমিয়া । চ'লে গেল !— সকলেই চ'লে গেল গো !
দিন রাত্রি পথে পথে করিয়া ভ্রমণ
এক মুহূর্তের তরে দেখা হল যদি,
চ'লে গেল ? একবার কথা কহিল না ?
একবার ডাকিল না 'অমিয়া' বলিয়া ?
স্বপ্নের মতন সব চ'লে গেল গো ?
অমিয়া রে, এত কি নির্বোধ তুই মেযে ?
সকলেরি কাছে কি করিস অপরাধ ?
পিতা তোরে জন্মতরে করিলেন ত্যাগ,
চাঁদ কবি ভাই তোর স্নেহের সাগর,
তাঁবো কাছে আজ কি রে হলি অপরাধী ?
তিনিও কি তোরে আজ করিলেন ত্যাগ ?
কেহ তোর রহিল না অকূল সংসারে ?
কে আছে গো, ক্ষুদ্র এই শ্রান্ত বালিকারে
একবার নেবে গো স্নেহের কোলে তুলে ?
এই তো এসেছি সেই অরণ্যের পথে ।
যাব কি পিতার কাছে ? যদি রুষ্ট হন !
আবার আমাবে যদি দেন তাডাইয়া !
যাহা ইচ্ছা করিবেন, তাঁরি কাছে যাই !
ধবিযা চরণ তাঁব রহিব পড়িয়া !
মা গো মা, হৃদয বুঝি ফেটে গেল মোর !
প্রাণের বন্ধন বুঝি ছিঁড়ে গেল সব !
চাঁদ, চাঁদ, ভাই মোর, দেখা হল যদি,
একবার ডাকিলে না 'অমিয়া' বলিয়া !

[প্রস্থান

একাদশ দৃশ্য

নাগরিকগণ

প্রথম । সমাচার দাও সবে ঘরে ঘরে গিয়া—
শুনিতেছি পরাজয় হয়েছে মোদের ।
দ্বিতীয় । অস্ত্রভার তুলিবারে সক্ষম যাহারা
আয় সবে ত্বরা ক'রে, সময় যে নাই !
নগরদুয়ারে গিয়া দাঁড়াই আমরা ।

সকলে। এখনি— এখনি চল যে আছ যেখানে !
তৃতীয়। চিতানল গৃহে গৃহে জ্বালাইতে বলো,
নগরশ্মশানে আজ রমণীরা যত
প্রাণবিনিময়ে মান রাখিবে তাহারা !
চতুর্থ। মণ-উৎসব আজ হইবে নগরে।
চিতার মশাল জ্বালি শোণিতমদিরা
যমরাজ আজ রাত্রে করিবেন পান।

দূতেব প্রবেশ

দূত। শোন, শোন, পৃথ্বীরাজ বন্দী হয়েছেন।
সকলে। বন্দী ?
প্রথম। বাজ-রাজ মহারাজ বন্দী আজি ?
দ্বিতীয়। লাগাও আগুন তবে নগরে নগরে !
তৃতীয়। ভেঙে ফেল অট্টালিকা !
চতুর্থ। ভস্ম কর গ্রাম,
সকলে। সমভূমি ক'রে ফেল হস্তিনানগরী।

দ্বাদশ দৃশ্য

রুদ্রচণ্ড

রুদ্রচণ্ড। এখনো তো কিছু তার পেনু না সংবাদ
পৃথ্বীরাজ মরেছে কি রয়েছে বাঁচিয়া।
হীন প্রাণ, কবে তোর ফুরাইবে কাজ !
ঋণ-করা প্রাণ আর বহিতে পারি না,
কবে তোরে ত্যাগ ক'রে বাঁচিব আবার !
ছিছি, তোর লাগি আমি ভিক্ষা করিলাম,
জীবন নামেতে এক মরণ পাইনু !
অদৃষ্ট রে, আরো কি চাহিস কবিবারে ?
অনুগ্রহ 'পরে মোর জীবন রাখিলি !
অনুগ্রহ— শিশু চাঁদ, তার অনুগ্রহ !

একটি দূতের প্রবেশ

দূত। বন্দী পৃথ্বীরাজ আজ হত হয়েছেন।
রুদ্রচণ্ড। [চমকিয়া]—
হত ? সে কি কথা ? মিথ্যা বলিস নে মূঢ় !
মরে নি সে, মরে নি, মরে নি পৃথ্বীরাজ।
এখনো আছে এ ছুরি, আছে এ হৃদয়,
বল্ তুই, এখনো সে আছে পৃথ্বীরাজ।
কোথা যাস বল্ তুই এখনো সে আছে !

দূত। সহসা উন্মাদ আজি হলে নাকি তুমি ?
বন্দীভাবে পৃথ্বীরাজ হত হয়েছেন
যারে বলি সেই মোরে মারিতে উদ্যত,
কিন্তু হেন রোষ আমি দেখি নি তো কারো।

[প্রস্থান

রুদ্রচণ্ড। ছুরি নিক্ষেপ করিয়া—
মুহূর্তে জগৎ মোর ধ্বংস হ'য়ে গেল।
শূন্য হয়ে গেল মোর সমস্ত জীবন !
পৃথ্বীরাজ মরে নাই, মরেছে যে জন
সে কেবল রুদ্রচণ্ড, আর কেহ নয়।
যে দুরন্ত দৈত্যশিশু দিন রাত্রি ধ'রে
হৃদয়-মাঝারে আমি করিনু পালন,
তারে নিয়ে খেলা শুধু এক কাজ ছিল,
পৃথিবীতে আর কিছু ছিল না আমার,
তাহারি জীবন ছিল আমার জীবন—
এ মুহূর্তে মরে গেল সেই বৎস মোর !
তারি নাম রুদ্রচণ্ড, আমি কেহ নই।
আয়, ছুরি, আয় তবে, প্রভু গেছে তোর—
এ শূন্য আসন তাঁর ভেঙে ফেল্ তবে।

বিঁধাইয়া বিঁধাইয়া

ভেঙে ফেল্, ভেঙে ফেল্, ভেঙে ফেল্ তবে।

অমিয়ার প্রবেশ

অমিয়া। পিতা, পিতা, অমিয়ারে ক্ষমা কর পিতা !

চমকিয়া স্তব্ধ

রুদ্রচণ্ড। আয় মা অমিয়া মোর, কাছে আয় বাছা !
এত দিন পিতা তোর ছিল না এ দেহে,
আজ সে সহসা হেথা এসেছে ফিরিয়া।
অমিয়া, মলিন বড়ো মুখখানি তোর !
আহা বাছা, কত কষ্ট পেলি এ জীবনে !
আর তোরে দুঃখ পেতে হবে না, বালিকা,
পাষণ্ড পিতার তোর ফুরায়েছে দিন।

অমিয়া। রুদ্রচণ্ডকে আলিঙ্গন করিয়া—
ও কথা বোলো না পিতা, বোলো না, বোলো না—
অমিয়ার এ সংসারে কেহ নাই আর।
তাড়ায়ে দিয়েছে মোরে সমস্ত সংসার,
এসেছি পিতার কোলে বড়ো শ্রান্ত হয়ে।
যেথা তুমি যাবে পিতা যাব সাথে সাথে,
যা তুমি বলিবে মোরে সকলি শুনিব,
তোমারে তিলেক-তরে ছাড়িব না আর।

রুদ্রচণ্ড। আয় মা আমার তুই থাক্ বুকে থাক্।
সমস্ত জীবন তোরে কত কষ্ট দিনু!
এখন সময় মোর ফুরায়ে এসেছে,
আজ তোরে কি করিয়া সুখী করি বাছা
আশীর্বাদ করি, বাছা, জন্মান্তরে যেন
এমন নিষ্ঠুর পিতা তোর নাহি হয়!
অমিয়া মা, কাঁদিস নে, থাক্ বুকে থাক

ত্রয়োদশ দৃশ্য

চাঁদ কবি

ভ্রমিব সন্ন্যাসীবেশে শ্মশানে শ্মশানে।
অদৃষ্ট রে, একি তোর নিদারুণ খেলা,
এক দিনে করিলি কি ওলট্‌পালট্!
কিছু রাখিলি নে আজ, কাল যাহা ছিল!
পৃথ্বীরাজ, রাজদণ্ড, দোর্দণ্ড প্রতাপ,
হাসি-কান্না-লীলা-ময় নগর নগরী
অচল অটল কাল ছিল বর্তমান,
আজ তার কিছু নাই! চিহ্ন মাত্র নাই!
এই যে চৌদিকে হেরি গ্রাম দেশ যত,
এই যে মানুষগণ করে কোলাহল,
একি সব শ্মশানেতে মরীচিকা আঁকা!
মাঝে মাঝে স্থানে স্থানে মিলাইয়া যায়,
জগতের শ্মশান বাহির হ'য়ে পড়ে!
চিতার কোলের পরে অস্থিভস্মমাঝে
মানুষেরা নাট্যশালা করেছে স্থাপন!
সন্ন্যাসী, কোথায় যাস্ শ্মশানে ভ্রমিতে!
নগর নগরী গ্রাম সকলি শ্মশান!
পৃথ্বীরাজ, তুমি যদি গেলে গো চলিয়া,
কবির বীণায় নাম রহিবে তোমার!
যত দিন বেঁচে রব' যশোগান তব
দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে বেড়াব গাহিয়া।
কুটীরের রমণীরা কাঁদিবে সে গানে,
বালকেরা ঘেরি মোরে শুনিবে অবাক্!
দেশে দেশে সে গান শিখিবে কত লোক,
মুখে মুখে তব নাম করিবে বিরাজ,
দিশে দিশে সে নামের হবে প্রতিধ্বনি!

এই এক ব্রত শুধু রহিল আমার,
জীবনের আর সব গেছে ধ্বংস হ'য়ে !
আহা সে অমিয়া মোর, সে কি বেঁচে আছে ?
তার তরে প্রাণ বড়ো হয়েছে অধীর !
চৌদিকে উঠিছে যবে রণকোলাহল,
চৌদিকে চলেছে যবে মরণের খেলা,
করুণ সে মুখখানি, দীনহীন বেশ,
আঁখির সামনে ছিল ছবির মতন !
আকাশের পটে আঁকা সে মুখ হেরিয়া
ভীষণ সমরক্ষেত্রে কাঁদিয়াছি আমি !
তার সেই 'চাঁদ' 'চাঁদ' স্নেহের উচ্ছ্বাস,
কানেতে বাজিতেছিল আকুল সে স্বর !
একটি কথাও তারে নারিনু বলিতে ?
মুখের কথাটি তার মুখে র'য়ে গেল,
একটি উত্তর দিতে পেনু না সময় ?
চাহিয়া পাষাণদৃষ্টি আইনু চলিয়া !
পাব কি দেখিতে তারে কোথায় সে গেল ?
যাই সে অরণ্যমাঝে যাই একবার !

চতুর্দশ দৃশ্য

চাঁদ কবি

চাঁদ কবি। উহু, কি নিস্তব্ধ বন, হাহা করে বায়ু,
পদশব্দে প্রতিধ্বনি উঠিছে কাঁদিয়া !
আশঙ্কায় দেহ যেন উঠিছে শিহরি,
অতিশয় ধীরে ধীরে পড়িছে নিঃশ্বাস !
এই যে কুটীর সেই, সাড়াশব্দ নাই,
গোপন কি কথা ল'য়ে স্তব্ধ আছে যেন !
কাঁপিছে চরণ মোর ! যাব কি ভিতরে !

দ্বার উদ্‌ঘাটন
গৃহমধ্যে রুদ্রচণ্ডের মৃতদেহ ও মুমূর্ষু অমিয়া

অমিয়া, অমিয়া মোর, স্নেহের প্রতিমা !
চাঁদ কবি, ভাই তোর এসেছে হেথায়।

অমিয়া। চাঁদ, চাঁদ, আইলে কি ? এসো কাছে এসো—
কখন আসিবে তুমি সেই আশা চেয়ে
বুঝি এতক্ষণ প্রাণ যায় নি চলিয়া !

কত দিন কত রাত্রি পথে পথে খুঁজি
দেখা হল, ছুটে গেনু ভায়ের কাছেতে,
একবার দাঁড়ালে না ? চলে গেলে চাঁদ ?
না জানি কি অপরাধ করেছে অমিয়া !
আজ, চাঁদ, জীবনের শেষ দণ্ডে মোর
শুনিতে ব্যাকুল বড়ো সে কি অপরাধ !
দেখিতে পাই নে কেন ? কোথা তুমি ভাই ?
সংসার চোখের 'পরে আসিছে মিলায়ে।
ত্বরা ক'রে বলো চাঁদ, সময় যে নাই,
একবার দাঁড়ালে না, চলে গেলে ভাই ?

মৃত্যু

চাঁদ কবি। একি হ'ল, একি হ'ল, অমিয়া, অমিয়া,
এক মুহূর্তের তরে রহিলি না তুই ?
করুণ অন্তিম প্রশ্ন মুখে রয়ে গেল,
উত্তর শুনিতে তার দাঁড়ালি নে বোন ?
যত দিন বেঁচে রব ওই প্রশ্ন তোর
কানেতে বাজিবে মোর দিবস রজনী,
জীবনের শেষ দণ্ডে ওই প্রশ্ন তোর
শুনিতে শুনিতে বালা মুদিব নয়ন।
অমিয়া, অমিয়া মোর, ওঠ একবার।
প্রশ্ন শুধাবারে শুধু বেঁচেছিলি বোন,
এক দণ্ড রহিলি নে উত্তর শুনিতে ?
ভালো বোন, দেখা হবে আর-এক দিন,
সে দিন দুজনে মিলি করিব রে শেষ
দুজনের হৃদয়ের অসম্পূর্ণ কথা।

সমাপ্ত

কালমৃগয়া

কাল-মৃগয়া।

(গীতি-নাট্য।)

বিদ্বজ্জন সমাগম উপলক্ষে
অভিনয়ার্থ
রচিত

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে
শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
প্রকাশিত।
অগ্রহায়ণ ১২৮৯।

মূল্য চারি আনা।

কালমৃগয়া

প্রথম দৃশ্য

তপোবন

ঋষিকুমারের প্রবেশ

মিশ্র ভূপালী— যৎ

বেলা যে চলে যায়, ডুবিল রবি।
ছায়ায় ঢেকেছে ঘন অটবী।
কোথা সে লীলা গেল কোথায়!
লীলা লীলা, খেলাবি আয়।

লীলার প্রবেশ

মিশ্র খাম্বাজ— কাওয়ালি

লীলা। ও ভাই, দেখে যা,
কত ফুল তুলেছি!
ঋষিকুমার। তুই আয় রে কাছে আয়,
আমি তোরে সাজিয়ে দি!
তোর হাতে মৃণাল-বালা,
তোর কানে চাঁপার দুল।
তোর মাথায় বেলের সিঁথি,
তোর খোঁপায় বকুল ফুল!

মিশ্র খাম্বাজ— আড়খেমটা

লীলা। ও দেখবি রে ভাই, আয় রে ছুটে,
মোদের বকুল গাছে
রাশি রাশি হাসির মতো
ফুল কত ফুটেছে।
কত গাছের তলায় ছড়াছড়ি
গড়াগড়ি যায়—
ও ভাই, সাবধানেতে আয় রে হেথা,
দিস নে দ'লে পায়!

মিশ্র বিভাস— আড়খেমটা

লীলা। কাল সকালে উঠব মোরা
যাব নদীর কূলে—
শিব গড়িয়ে করব পূজো,
আনব কুসুম তুলে।

ঋষিকুমার। মোরা ভোরের বেলা গাঁথব মালা,
দুলব সে দোলায়,
বাজিয়ে বাঁশি গান গাহিব
বকুলের তলায়।

লীলা। না ভাই, কাল সকালে মায়ের কাছে
নিয়ে যাব ধ'রে,
মা বলেছে ঋষির সাজে
সাজিয়ে দেবে তোরে!

ঋষিকুমার। সন্ধ্যা হয়ে এল যে ভাই,
এখন যাই ফিরে—
একলা আছেন অন্ধ পিতা
আঁধার কুটীরে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বন

বনদেবীগণ

মিশ্র সিন্ধু— ঢিমে তেতালা

প্রথম। সমুখেতে বহিছে তটিনী,
দুটি তারা আকাশে ফুটিয়া,

দ্বিতীয়। বায়ু বহে পরিমল লুটিয়া।

তৃতীয়। সাঁঝের অধর হতে
ম্লান হাসি পড়িছে টুটিয়া।

চতুর্থ। দিবস বিদায় চাহে,
সরযূ বিলাপ গাহে,
সায়াহ্নেরি রাঙা পায়ে
কেঁদে কেঁদে পড়িছে লুটিয়া!

সকলে। এসো সবে এসো সখি,
মোরা হেথা ব'সে থাকি।

প্রথম। আকাশের পানে চেয়ে
জলদের খেলা দেখি!

সকলে। আঁখি-'পরে তারাগুলি
একে একে উঠিবে ফুটিয়া।

রাগিণী মিশ্র কেদারা— একতালা

সকলে। ফুলে ফুলে ঢ'লে ঢ'লে বহে কিবা মৃদু বায়,
তটিনী হিল্লোল তুলে কল্লোলে চলিয়া যায়
পিক কিবা কুঞ্জে কুঞ্জে কুহূ কুহূ কুহূ গায়,
কি জানি কিসেরি লাগি প্রাণ করে হায় হায়!

ছায়ানট— আধ্বা

প্রথম। নেহার' লো সহচরি,
কানন আঁধার করি,
ওই দেখ বিভাবরী আসিছে।
দ্বিতীয়। দিগন্ত ছাইয়া
শ্যাম মেঘরাশি থরে থরে ভাসিছে।
তৃতীয়। আয়, সখি, এই বেলা
মাধবী মালতী বেলা
রাশি রাশি ফুটাইয়ে কানন করি আলা।
চতুর্থ। ওই দেখ নলিনী উথলিত সরসে
অফুট-মুকুল-মুখী মৃদু মৃদু হাসিছে।
সকলে। আসিবে ঋষিকুমার কুসুমচয়নে,
ফুটায়ে রাখিয়া দিব তারি তরে সযতনে।
নিচু নিচু শাখাতে ফোটে যেন ফুলগুলি,
কচি হাত বাড়াইয়ে পায় যেন কাছে!

তৃতীয় দৃশ্য

কুটীর

অন্ধ ঋষি ও ঋষিকুমার

বেদপাঠ

অন্তরিক্ষোদরঃ কোশো ভূমিবুধ্নো ন জীর্য্যতি দিশো হস্য স্রক্তয়ো দৌরস্যোত্তরং বিলং স এষ কোশোবসুধানস্তস্মিন্ বিশ্বমিদং শ্রিতম্ ॥
তস্য প্রাচী দিগ্ জুহূর্নাম সহমানা নাম দক্ষিণা রাজ্ঞী নাম প্রতীচী সুভূতা নামোদীচী তাসাং বায়ুর্ব্বৎসঃ স য এতমেবং দিশাং বৎসং বেদ ন পুত্র রোদং রোদিতি সোঽহমেতমেবং বায়ুং দিশাং বৎসং বেদ মা পুত্ররোদং রুদম্ ॥

জয়জয়ন্তী— ঝাঁপতাল

অন্ধ ঋষি। জল এনে দে রে বাছা তৃষিত কাতরে।
শুকাইয়েছে কণ্ঠ তালু, কথা নাহি সরে।

মেঘগর্জন

দেশ— ঢিমে তেতালা

না না কাজ নাই, যেয়ো না বাছা,—
গভীরা রজনী, ঘোর ঘন গরজে,
তুই যে এ অন্ধের নয়নতারা।
আর কে আমার আছে!
কেহ নাই, কেহ নাই—
তুই শুধু রয়েছিস হৃদয় জুড়ায়ে—
তোরেও কি হারাব বাছা রে,
সে তো প্রাণে স'বে না!

খাম্বাজ— ঢিমে তেতালা

ঋষিকুমার। আমা-তরে অকারণে, ওগো পিতা ভেবো না।
অদূরে সরযূ বহে, দূরে যাব না।
পথ যে সরল অতি,
চপলা দিতেছে জ্যোতি,
তবে কেন, পিতা, মিছে ভাবনা।
অদূরে সরযূ বহে, দূরে যাব না।

[প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

বন

বনদেবতা

গৌড়মল্লার— কাওয়ালি

সঘন ঘন ছাইল গগন ঘনাইয়া,
স্তিমিত দশ দিশি,
স্তম্ভিত কানন,
সব চরাচর আকুল—
কি হবে কে জানে,
ঘোরা রজনী,
দিক-ললনা ভয়বিভলা।
চমকে চমকে সহসা দিক উজলি
চকিতে চকিতে মাতি ছুটিল বিজলী
থরহর চরাচর পলকে ঝলকিয়ে।

ঘোর তিমির ছায় গগন মেদিনী,
গুরু গুরু নীরদগরজনে
স্তব্ধ আঁধার ঘুমাইছে—
সহসা উঠিল জেগে প্রচণ্ড সমীরণ,
কড় কড় বাজ !

[প্রস্থান

বনদেবীগণের প্রবেশ

মল্লার— কাওয়ালি

সকলে । ঝম্ ঝম্ ঘন ঘন রে বরষে ।
দ্বিতীয় । গগনে ঘনঘটা, শিহরে তরু লতা—
তৃতীয় । ময়ূর ময়ূরী নাচিছে হরষে !
সকলে । দিশি দিশি সচকিত, দামিনী চমকিত—
প্রথম । চমকি উঠিছে হরিণী তরাসে !

মল্লার— কাওয়ালি

সকলে । আয় লো সজনি, সবে মিলে !
ঝর ঝর বারিধারা,
মৃদু মৃদু গুরু গুরু গর্জন,
এ বরষা-দিনে,
হাতে হাতে ধরি ধরি
গাব মোরা লতিকাদোলায় দুলে !
প্রথম । ফুটাব যতনে কেতকী কদম্ব অগণন ।
দ্বিতীয় । মাখাব বরণ ফুলে ফুলে ।
তৃতীয় । পিয়াব নবীন সলিল, পিয়াসিত তরুলতা—
চতুর্থ । লতিকা বাঁধিব গাছে তুলে ।
প্রথম । বনেরে সাজায়ে দিব, গাঁথিব মুকুতাকণা
পল্লবশ্যাম-দুকূলে ।
দ্বিতীয় । নাচিব, সখি, সবে নবঘন-উৎসবে
বিকচ বকুলতরু-মূলে !

ঋষিকুমারের প্রবেশ

গারা— কাওয়ালি

ঋষিকুমার । কী ঘোর নিশীথ, নীরব ধরা !
পথ যে কোথায় দেখা নাহি যায়,
জড়ায়ে যায় চরণে লতাপাতা ।
যাই, ত্বরা ক'রে যেতে হবে
সরযূতটিনী-তীরে—
কোথায় সে পথ—
ওই কল কল রব !

আহা, তৃষিত জনক মম,
যাই তবে যাই ত্বরা।

বনদেবীগণ। এই ঘোর আঁধার, কোথা রে যাস!
ফিরিয়ে যা, তরাসে প্রাণ কাঁপে!
স্নেহের পুতুলি তুই,
কোথা যাবি একা এ নিশীথে!
কি জানি কি হবে, বনে হবি পথহারা!

ঋষিকুমার। না; কোরো না মানা, যাব ত্বরা।
পিতা আমার কাতর তৃষায়,
যেতেছি তাই সরযুনদীতীরে।

মিশ্র বেলাওল— একতালা

বনদেবীগণ। মানা না মানিলি, তবুও চলিলি,
কি জানি কি ঘটে!
অমঙ্গল হেন প্রাণে জাগে কেন,
থেকে থেকে যেন প্রাণ কেঁদে ওঠে!
রাখ্ রে কথা রাখ্, বারি আনা থাক্,
যা ঘরে যা ছুটে!
অয়ি দিগঙ্গনে, রেখো গো যতনে
অভয়স্নেহছায়ায়!
অয়ি বিভাবরী, রাখ বুকে ধরি
ভয় অপহরি রাখ এ জনায়!
এ যে শিশুমতি, বন ঘোর অতি—
এ যে একেলা অসহায়!

পঞ্চম দৃশ্য

শিকারীগণের প্রবেশ

ইমন কল্যাণ— কাওয়ালি

বনে বনে সবে মিলে চলো হো! চলো হো!
ছুটে আয়, শিকারে কে রে যাবি আয়!
এমন রজনী বহে যায় রে!
ধনু বাণ বল্লম লয়ে হাতে
আয়, আয়, আয়, আয় রে!
বাজা শিঙা ঘন ঘন—
শব্দে কাঁপিবে বন,

আকাশ ফেটে যাবে,
চমকিবে পশু পাখি সবে,
ছুটে যাবে কাননে কাননে—
চারি দিক ঘিরে যাব পিছে পিছে
হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ !

দশরথের প্রবেশ

সিন্দুড়া

শিকারীগণ। জয়তি জয় জয় রাজন্ বন্দি তোমারে,
কে আছে তোমা সমান।
ত্রিভুবন কাঁপে তোমার প্রতাপে,
তোমারে করি প্রণাম !

দশরথ। শিকারীদের প্রতি

বাহার

গহনে গহনে যা রে তোরা,
নিশি ব'হে যায় যে !
তন্ন তন্ন করি অরণ্য
করী বরাহ খোঁজ্ গে !
এই বেলা যা রে !
নিশাচর পশু সবে
এখনি বাহির হবে—
ধনুর্বাণ নে রে হাতে, চল্ ত্বরা চল্।
জ্বালায়ে মশাল আলো
এই বেলা আয় রে !

[প্রস্থান

অহং— কাওয়ালি

প্রথম শিকারী। চল চল, ভাই,
ত্বরা ক'রে মোরা আগে যাই।
দ্বিতীয়। প্রাণপণ খোঁজ, এ বন, সে বন।
তৃতীয়। চল্ মোরা ক'জন ও দিকে যাই।
প্রথম। না না ভাই, কাজ নাই,
হোথা কিছু নাই— কিছু নাই—
ওই ঝোপে যদি কিছু পাই।
তৃতীয়। বরা' ! বরা' !
প্রথম। আরে দাঁড়া দাঁড়া,
অত ব্যস্ত হ'লে ফস্কাবে শিকার।

চুপিচুপি আয়, চুপিচুপি আয়
অশথতলায়—
এবার ঠিক্‌ঠাক্ হয়ে সবে থাক্—
সাবধান, ধর বাণ, সাবধান, ছাড় বাণ—
২।৩ জন। গেল গেল ওই ওই পালায় পালায়—
চল্ চল্—
ছোট্ রে পিছে, আয় রে ত্বরা যাই।

[প্রস্থান

বিদূষকের সভয়ে প্রবেশ

দেশ—খেমটা

প্রাণ নিয়ে তো সট্‌কেছি রে,
ওরে বরা, করবি এখন কি !
বাবা রে !
আমি চুপ ক'রে এই
আমড়াতলায় লুকিয়ে থাকি।
এই মরদের মুরদখানা,
দেখেও কি রে ভড়্‌কালি না—
বাহাবা, সাবাস তোরে,
সাবাস্ রে তোর ভরসা দেখি।
গরীব ব্রাহ্মণের ছেলে
ব্রাহ্মণীরে ঘরে ফেলে
কোথা এলেম এ ঘোর বনে !
মনে আশা ছিল মস্ত
চলবে ভালো দক্ষিণ হস্ত—
হা রে রে পোড়া কপাল,
তাও যে দেখি কেবল ফাঁকি !

শিকারীগণের প্রবেশ

শংকরা

শিকারীগণ। ঠাকুরমশয়, দেরি না সয়—
তোমার আশায় সবাই ব'সে।
শিকারেতে হবে যেতে,
মিহি কোমর বাঁধ ক'ষে !
বন বাদাড় সব ঘেঁটেঘুঁটে,
আমরা মরি খেটেখুটে,
তুমি কেবল লুটেপুটে
পেট পোরাবে ঠেসেঠুসে !
বিদূষক। কাজ কি খেয়ে, তোফা আছি—
আমায় কেউ না খেলেই বাঁচি !

শিকার করতে যায় কে মরতে—
ঢুঁসিয়ে দেবে বরা' ঘোষে !
ঢুঁ খেয়ে তো পেট ভরে না,
সাধের পেটটি যাবে ফেঁসে ।

[হাসিতে হাসিতে শিকারীগণের প্রস্থান

মিশ্র সিন্ধু

বিদূষক । আঃ, বেঁচেছি এখন !
শর্মা ও দিকে আর নন ।
গোলেমালে ফাঁকতালে সটকেছি কেমন ।
বাবা ! দেখে বরা'র দাঁতের পাটি
লেগেছিল দাঁত-কপাটি,
পড়ল খ'সে হাতের লাঠি
কে জানে কখন ।
চুলগুলা সব ঘাড়ে খাড়া,
চক্ষুদুটো মশাল-পারা,
গোঁ ভরে হেঁট-মুখে তাড়া
কল্লে সে যখন—
রাস্তা দেখতে পাই নে চোখে,
পেটের মধ্যে হাত পা ঢোকে,
চুপসে গেল ফাঁপা ভুঁড়ি
শঙ্কাতে তখন ।

[প্রস্থান

শিকার স্কন্ধে শিকারীগণের প্রবেশ

এনেছি মোরা এনেছি মোরা
রাশি রাশি শিকার !
করেছি ছারখার,
সব করেছি ছারখার !
বনবাদাড় তোলপাড়,
করেছি রে উজাড় !

[গাইতে গাইতে প্রস্থান

বনদেবীদের প্রবেশ

মিশ্র মল্লার— পোস্ত

কে এল আজি এ ঘোর নিশীথে
সাধের কাননে শান্তি নাশিতে ।
মত্ত করী যত পদ্মবন দলে
বিমল সরোবর মন্থিয়া,
ঘুমন্ত বিহগে কেন বধে রে
সঘনে খর শর সন্ধিয়া !

তরাসে চমকিয়ে হরিণ হরিণী
স্খলিত চরণে ছুটিছে !
স্খলিত চরণে ছুটিছে কাননে,
করুণনয়নে চাহিছে ।
আকুল সরসী, সারস সারসী
শরবনে পশি কাঁদিছে ।
তিমির দিগভরি ঘোর যামিনী,
বিপদ ঘনছায়া ছাইয়া ।
কি জানি কি হবে, আজি এ নিশীথে,
তরাসে প্রাণ ওঠে কাঁপিয়া !

[প্রস্থান

দশরথের প্রবেশ

খাম্বাজ— কাওয়ালি

না জানি কোথা এলুম, এ যে ঘোর বন ।
কোথা গেল সে করিশিশু, কোথা লুকাল !
একে তো জটিল বন, তাহে আঁধার ঘন !
যাক্‌-না যাবে সে কত দূর, কত দূর—
যাব পিছে পিছে—
না না না না, ও কি শুনি !
ওই সে সরযূতীরে করিছে সলিল পান
শবদ শুনি যে ওই, এই তবে ছাড়ি বাণ !

নেপথ্যে বনদেবীগণ

ভৈরবী

হায় কী হ'ল ! হায় কী হ'ল !

বাণাহত ঋষিকুমারের নিকট দশরথের গমন

বেহাগ— আড়াঠেকা

কি করিনু হায় !
এ তো নয় রে করিশিশু, ঋষির তনয় !
নিঠুর প্রখর বাণে রুধিরে আপ্লুতকায়
কার রে প্রাণের বাছা ধুলাতে লুটায় !
কি কুলগ্নে না জানি রে ধরিলাম বাণ,
কি মহাপাতকে কার বধিলাম প্রাণ !
দেবতা, অমৃতনীরে হারা-প্রাণ দাও ফিরে,
নিয়ে যাও মায়ের কোলে মায়ের বাছায় !

মুখে জলসিঞ্চন

খট— ঝাঁপতাল

ঋষিকুমার । কী দোষ করেছি তোমার,
কেন গো হানিলে বাণ !
একই বাণে বধিলে যে
দুটি অভাগার প্রাণ !
শিশু বনচারী আমি
কিছুই নাহিক জানি—
ফল মূল তুলে আনি,
করি সামবেদ গান !
জন্মান্ধ জনক মম
তৃষায় কাতর হয়ে
রয়েছেন পথ চেয়ে—
কখন যাব বারি লয়ে ।
মরণান্তে নিয়ে যেও,
এ দেহ তাঁর কোলে দিও—
দেখো, দেখো ভুলোনাকো,
কোরো তাঁরে বারিদান !
মার্জনা করিবেন পিতা,
তাঁর যে দয়ার প্রাণ !

ষষ্ঠ দৃশ্য

কুটীর

অন্ধ ঋষি

মিশ্র ঝিঁঝিট খাম্বাজ— মধ্যমান

অন্ধঋষি । আমার প্রাণ যে ব্যাকুল হয়েছে—
হা তাত, একবার আয় রে !
ঘোরা রজনী, একাকী
কোথা রহিলে এ সময়ে !
প্রাণ যে চমকে মেঘগরজনে—
কী হবে কে জানে !

লীলার প্রবেশ

রামকেলী— কাওয়ালি

বলো বলো পিতা, কোথা সে গিয়েছে !
কোথা সে ভাইটি মম, কোন্ কাননে !
কেন তাহারে নাহি হেরি !

খেলিবে সকালে আজ বলেছিল সে,
তবু কেন এখন না এল ?
বনে বনে ফিরি 'ভাই' 'ভাই' করিয়ে,
কেন গো সাড়া পাই নে !

বেহাগ— কাওয়ালি

অন্ধ। কে জানে কোথা সে !
প্রহর গনিয়া গনিয়া বিরলে
তারি লাগি ব'সে আছি !
একা হেথা, কুটীরদুয়ারে—
বাছা রে এলি নে !
ত্বরা আয়, ত্বরা আয়, আয় রে—
জল আনিয়ে কাজ নাই,
তুই যে আমার পিপাসার জল !
কেন রে জাগিছে মনে ভয় !
কেন আজি তোরে,
হারাই হারাই মনে হয় !
কে জানে ! [লীলার প্রস্থান

মৃতদেহ লইয়া দশরথের প্রবেশ

সিন্ধু— চৌতাল

অন্ধ। এতক্ষণে বুঝি এলি রে !
হৃদিমাঝে আয় রে, বাছা রে !
কোথা ছিলি বনে, এ ঘোর রাতে,
এ দুর্যোগে, অন্ধ পিতারে ভুলি !
আছি সারানিশি হায় রে
পথ চাহিয়ে, আছি তৃষায় কাতর—
দে মুখে বারি, কাছে আয় রে !

রাজবিজয়ী

দশরথ। অজ্ঞানে করো হে ক্ষমা, তাত, ধরি চরণে—
কেমনে কহিব, শিহরি আতঙ্কে !
আঁধারে সন্ধানি শর খরতর
করী-ভ্রমে বধি তব পুত্রবর,
গ্রহদোষে পড়েছি পাপপঙ্কে !

দশরথ-কর্তৃক ঋষির নিকটে
ঋষিকুমারের মৃতদেহ-স্থাপন

বাহার— ঢিমে তেতালা

অন্ধ। কী বলিলে, কী শুনিলাম, একি কভু হয় !
এই যে জল আনিবারে গেল সে সরযূতীরে—
কার সাধ্য বধে, সে যে ঋষির তনয় !

সুকুমার শিশু সে যে, স্নেহের বাছা রে,
আছে কি নিষ্ঠুর কেহ বধিবে যে তারে !
না না না, কোথা সে আছে— এনে দে আমার কাছে,
সারা নিশি জেগে আছি বিলম্ব না সয় !
এখনো যে নিরুত্তর— নাহি প্রাণে ভয় !
রে দুরাত্মা— কী করিলি—

অভিশাপ

পুত্রব্যসনজং দুঃখং
যদেতন্মম সাংপ্রতম্ ।
এবং ত্বং পুত্রশোকেন
রাজন্ কালং করিষ্যসি ।।

মিশ্র ভূপালি— কাওয়ালি

দশরথ । ক্ষমা করো মোরে তাত,
আমি যে পাতকী ঘোর,
না জেনে হয়েছি দোষী,
মার্জনা নাহি কি মোর !
ও ! সহে না যাতনা আর,
শান্তি পাইব কোথায়—
তুমি কৃপা না করিলে
নাহি যে কোনো উপায় !
আমি দীন হীন অতি—
ক্ষমো ক্ষমো কাতরে,
প্রভু হে, করহ ত্রাণ
এ পাপের পাথারে ।

কাফি— আড়াঠেকা

অন্ধ । **আহা, কেমনে বধিল তোরে !**
তুই যে স্নেহের পুতলি, সুকুমার শিশু ওরে !
বড়ো কি বেজেছে বুকে, বাছা রে,
কোলে আয়, কোলে আয় একবার—
ধূলাতে কেন লুটায়ে, রাখিব বুকে ক'রে !

কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধভাবে অবস্থান ও
অবশেষে উঠিয়া দাঁড়াইয়া
দশরথের প্রতি

নটনারায়ণ

শোক তাপ গেল দূরে,
মার্জনা করিনু তোরে !

পুত্রের প্রতি

প্রভাতী

যাও রে অনন্তধামে মোহ মায়া পাশরি
  দুঃখ আঁধার যেথা কিছুই নাহি ।
জরা নাহি, মরণ নাহি, শোক নাহি যে লোকে,
  কেবলই আনন্দস্রোত চলিছে প্রবাহি !
যাও রে অনন্তধামে, অমৃতনিকেতনে,
  অমরগণ লইবে তোমা উদারপ্রাণে !
দেব-ঋষি, রাজ-ঋষি, ব্রহ্ম-ঋষি যে লোকে
  ধ্যানভরে গান করে এক তানে !
যাও রে অনন্তধামে জ্যোতিময় আলয়ে,
  শুভ্র সেই চিরবিমল পুণ্য কিরণে—
যায় যেথা দানব্রত, সত্যব্রত, পুণ্যবান,
  যাও বৎস, যাও সেই দেবসদনে !

যবনিকাপতন

পুনরুত্থান

ঋষিকুমারের মৃতদেহ ঘেরিয়া বনদেবীদের গান

ঝিঁঝিট খাম্বাজ— একতালা

সকলি ফুরাল স্বপনপ্রায়,
কোথা সে লুকাল, কোথা সে হায় !
কুসুমকানন হয়েছে ম্লান,
পাখিরা কেন রে গাহে না গান,
ও ! সব হেরি শূন্যময়,
কোথা সে হায় !
কাহার তরে আর ফুটিবে ফুল,
মাধবী মালতী কেঁদে আকুল,
সেই যে আসিত তুলিতে জল,
সেই যে আসিত পাড়িতে ফল,
ও ! সে আর আসিবে না,
কোথা সে হায় !

যবনিকাপতন

সমাপ্ত

প্রকৃতির প্রতিশোধ

উৎসর্গ

তোমাকে দিলাম

সূচনা

জীবনের প্রথম বয়স কেটেছে বদ্ধঘরে নিঃসঙ্গ নির্জনে। সন্ধ্যাসংগীত এবং প্রভাতসংগীতের অনেকটা সেই অবরুদ্ধ আলোকের কবিতা। নিজের মনের ভাবনা নিজের মনের প্রাচীরের মধ্যে প্রতিহত হয়ে আলোড়িত।

তার পরের অবস্থায় মনের মধ্যে মানুষের স্পর্শ লাগল, বাইরের হাওয়ায় জানলা গেল খুলে, উৎসুক মনের কাছে পৃথিবীর দৃশ্য খণ্ড খণ্ড চলচ্ছবির মতো দেখা দিতে লাগল। গুহাচরের মন তখন ঝুঁকল লোকালয়ের দিকে। তখনো বাইরের জগৎ সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারে নি আবেগের বাষ্পপুঞ্জ থেকে। তবু দুঃস্বপ্নের মতো আপনার বাঁধন-জাল ছাড়াবার জন্যে জেগে উঠল বালকের আগ্রহ। এই সময়কার রচনা 'ছবি ও গান'। লেখনীর সেই নূতন বহির্মুখী প্রবৃত্তি তখন কেবল ভাবুকতার অস্পষ্টতার মধ্যে বন্ধন স্বীকার করলে না। বেদনার ভিতর দিয়ে ভাবপ্রকাশের প্রয়াসে সে শ্রান্ত, কল্পনার পথে সৃষ্টি করবার দিকে পড়েছে তার ঝোঁক। এই পথে তার দ্বার প্রথম খুলেছিল 'বাল্মীকিপ্রতিভা'য়। যদিও তার উপকরণ গান নিয়ে, কিন্তু তার প্রকৃতিই নাট্যীয়। তাকে গীতিকাব্য বলা চলে না। কিছুকাল পরে, তখন আমার বয়স বোধ হয় তেইশ কিংবা চব্বিশ হবে, কারোয়ার থেকে জাহাজে আসতে আসতে হঠাৎ যে গান সমুদ্রের উপর প্রভাতসূর্যালোকে সম্পূর্ণ হয়ে দেখা দিল তাকে নাট্যীয় বলা যেতে পারে, অর্থাৎ সে আত্মগত নয়, সে কল্পনায় রূপায়িত। 'হেদে গো নন্দরানী' গানটি একটি ছবি, যার রস নাট্যরস। রাখাল বালকেরা নন্দরানীর কাছে এসেছে আবদার করতে, তারা শ্যামকে নিয়ে গোষ্ঠে যাবে এই তাদের পণ। এই গানটি প্রকৃতির প্রতিশোধে ভুক্ত করেছি। এই আমার হাতের প্রথম নাটক যা গানের ছাঁচে ঢালা নয়। এই বইটি কাব্যে এবং নাট্যে মিলিত। সন্ন্যাসীর যা অন্তরের কথা তা প্রকাশ হয়েছে কবিতায়। সে তার একলার কথা। এই আত্মকেন্দ্রিত বৈরাগীকে ঘিরে প্রাত্যহিক সংসার নানা রূপে নানা কোলাহলে মুখরিত হয়ে উঠেছে। এই কলরবের বিশেষত্বই হচ্ছে তার অকিঞ্চিৎকরতা। এই বৈপরীত্যকে নাট্যিক বলা যেতে পারে। এরই মাঝে মাঝে গানের রস এসে অনির্বচনীয়তার আভাস দিয়েছে। শেষ কথাটা এই দাঁড়ালো শূন্যতার মধ্যে নির্বিশেষের সন্ধান ব্যর্থ, বিশেষের মধ্যেই সেই অসীম প্রতিক্ষণে হয়েছে রূপ নিয়ে সার্থক, সেইখানেই যে তাকে পায় সেই যথার্থ পায়।

শান্তিনিকেতন
২৮ জানুযাবি ১৯৪০

প্রকৃতির প্রতিশোধ

প্রথম দৃশ্য

গুহা

সন্ন্যাসী

কোথা দিন, কোথা রাত্রি, কোথা বর্ষ মাস !
অবিশ্রাম কালস্রোত কোথায় বহিছে
সৃষ্টি যেথা ভাসিতেছে তৃণপুঞ্জসম !
আঁধারে গুহার মাঝে রয়েছি একাকী,
আপনাতে বসে আছি আপনি অটল।
অনাদি কালের রাত্রি সমাধিমগনা
নিশ্বাস করিয়া রোধ পাশে বসে আছে।
শিলার ফাটল দিয়া বিন্দু বিন্দু করি
ঝরিয়া পড়িছে বারি আর্দ্র গুহাতলে।
স্তব্ধ শীতজলে পড়ি অন্ধকার-মাঝে
প্রাচীন ভেকের দল রয়েছে ঘুমায়ে।
বাদুড় গুহায় পশি সুদূর হইতে
অমানিশীথের বার্তা আনিছে বহিয়া।
কখনো বা কোনো দিন কে জানে কেমনে
একটি আলোর রেখা কোথা হতে আসে,
দিবসের গুপ্তচর রজনীর মাঝে
একটুকু উঁকি মেরে যায় পলাইয়া।
বসে বসে প্রলয়ের মন্ত্র পড়িতেছি,
তিল তিল জগতেরে ধ্বংস করিতেছি,
সাধনা হয়েছে সিদ্ধ, কী আনন্দ আজি।
জগৎ-কুয়াশা-মাঝে ছিনু মগ্ন হয়ে,
অদৃশ্যে আঁধারে বসি সুতীক্ষ্ণ কিরণে
ছিঁড়িয়া ফেলেছি সেই মায়া-আবরণ,
জগৎ চরণতলে গিয়াছে মিলায়ে—
সহসা প্রকাশ পাই দীপ্ত মহিমায়।
বসে বসে চন্দ্র সূর্য দিয়েছি নিবায়ে,
একে একে ভাঙিয়াছি বিশ্বের সীমানা,
দৃশ্য শব্দ স্বাদ গন্ধ গিয়েছে ছুটিয়া,
গেছে ভেঙে আশা ভয় মায়ার কুহক।
কোটি-কোটি-যুগ-ব্যাপী সাধনার পরে,
যুগান্তের অবসানে, প্রলয়সলিলে

সৃষ্টির মলিন রেখা মুছি শূন্য হতে—
ছায়াহীন নিষ্কলঙ্ক অনন্ত পুরিয়া
যে আনন্দে মহাদেব করেন বিরাজ
পেয়েছি পেয়েছি সেই আনন্দ-আভাস।
জগতের মহাশিলা বক্ষে চাপাইয়া
কে আমারে কারাগারে করেছিল রোধ!
পলে পলে যুঝি যুঝি তিল তিল করি
জগদ্দল সে পাষাণ ফেলেছি সরায়ে,
হৃদয় হয়েছে লঘু স্বাধীন স্ববশ।

কী কষ্ট না দিয়েছিস রাক্ষসী প্রকৃতি
অসহায় ছিনু যবে তোর মায়াফাঁদে।
আমার হৃদয়রাজ্যে করিয়া প্রবেশ
আমারি হৃদয় তুই করিলি বিদ্রোহী।
বিরাম বিশ্রাম নাই দিবসরজনী
সংগ্রাম বহিয়া বক্ষে বেড়াতেম ভ্রমি।
কানেতে বাজিত সদা প্রাণের বিলাপ,
হৃদয়ের রক্তপাতে বিশ্ব রক্তময়,
রাঙা হয়ে উঠেছিল দিবসের আঁখি।
বাসনার বহ্নিময় কশাঘাতে হায়
পথে পথে ছুটিয়াছি পাগলের মতো।
নিজের ছায়ারে নিজ বক্ষে ধরিবারে
দিনরাত্রি করিয়াছি নিষ্ফল প্রয়াস।
সুখের বিদ্যুৎ দিয়া করিয়া আঘাত
দুঃখের ঘনান্ধকারে দেছিস ফেলিয়া।
বাসনারে ডেকে এনে প্রলোভন দিয়ে
নিয়ে গিয়েছিস মহা দুর্ভিক্ষ-মাঝারে।
খাদ্য বলে যাহা চায় ধূলিমুষ্টি হয়।
তৃষ্ণার সলিলরাশি যায় বাষ্প হয়ে।
প্রতিজ্ঞা করিনু শেষে যন্ত্রণায় জ্বলি
এক দিন— এক দিন নেব প্রতিশোধ।
সেই দিন হতে পশি গুহার মাঝারে
সাধিয়াছি মহা হত্যা আঁধারে বসিয়া।
আজ সে প্রতিজ্ঞা মোর হয়েছে সফল।
বধ করিয়াছি তোর স্নেহের সন্তানে,
বিশ্ব ভস্ম হয়ে গেছে জ্ঞানচিতানলে।
সেই ভস্মমুষ্টি আজি মাখিয়া শরীরে
গুহার আঁধার হতে হইব বাহির।
তোরি রঙ্গভূমিমাঝে বেড়াব গাহিয়া
অপার আনন্দময় প্রতিশোধ-গান।

দেখাব হৃদয় খুলে, কহিব তোমারে,
এই দেখ্, তোর রাজ্য মরুভূমি আজি,
তোর যারা দাস ছিল স্নেহ প্রেম দয়া
শ্মশানে পড়িয়া আছে তাদের কঙ্কাল,
প্রলয়ের রাজধানী বসেছে হেথায়।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজপথ

সন্ন্যাসী

এ কী ক্ষুদ্র ধরা ! এ কী বদ্ধ চারি দিকে !
কাছাকাছি ঘেঁষাঘেঁষি গাছপালা গৃহ
চারি দিক হতে যেন আসিছে ঘেরিয়া,
গায়ের উপরে যেন চাপিয়া পড়িবে !
চরণ ফেলিতে যেন হতেছে সংকোচ,
মনে হয় পদে পদে রহিয়াছে বাধা।
এই কি নগর ! এই মহা রাজধানী !
চারি দিকে ছোটো ছোটো গৃহগুহাগুলি,
আনাগোনা করিতেছে নরপিপীলিকা।

চারি দিকে দেখা যায় দিনের আলোক,
চোখেতে ঠেকিছে যেন সৃষ্টির পঞ্জর।
আলোক তো কারাগার, নিষ্ঠুর কঠিন
বস্তু দিয়ে ঘিরে রাখে দৃষ্টির প্রসর।
পদে পদে বাধা খেয়ে মন ফিরে আসে,
কোথায় দাঁড়াবে গিয়া ভাবিয়া না পায়।
অন্ধকার স্বাধীনতা, শান্তি অন্ধকার,
অন্ধকার মানসের বিচরণভূমি,
অনন্তের প্রতিরূপ, বিশ্রামের ঠাঁই।
এক মুষ্টি অন্ধকারে সৃষ্টি ঢেকে ফেলে,
জগতের আদি অন্ত লুপ্ত হয়ে যায়,
স্বাধীন অনন্ত প্রাণ নিমেষের মাঝে
বিশ্বের বাহিরে গিয়ে ফেলে রে নিশ্বাস।

পথ দিয়া চলিতেছে এরা সব কারা !
এদের চিনি নে আমি, বুঝিতে পারি নে
কেন এরা করিতেছে এত কোলাহল।
কী চায় ? কিসের লাগি এত ব্যস্ত এরা ?

এক কালে বিশ্ব যেন ছিল রে বৃহৎ,
তখন মানুষ ছিল মানুষের মতো,
আজ যেন এরা সব ছোটো হয়ে গেছে।

দেখি হেথা বসে বসে সংসারের খেলা।

কৃষকগণের প্রবেশ

গান

হেদে গো নন্দরানী,
আমাদের শ্যামকে ছেড়ে দাও।
আমরা রাখাল-বালক দাঁড়িয়ে দ্বারে,
আমাদের শ্যামকে দিয়ে যাও।
হেরো গো প্রভাত হল, সুয্যি উঠে
ফুল ফুটেছে বনে—
আমরা শ্যামকে নিয়ে গোষ্ঠে যাব
আজ করেছি মনে।
ওগো, পীতধড়া পরিয়ে তারে
কোলে নিয়ে আয়।
তার হাতে দিয়ো মোহন বেণু,
নূপুর দিয়ো পায়।
রোদের বেলায় গাছের তলায়
নাচব মোরা সবাই মিলে।
বাজবে নূপুর রুনুঝুনু,
বাজবে বাঁশি মধুর বোলে।
বনফুলে গাঁথব মালা,
পরিয়ে দিব শ্যামের গলে।

[প্রস্থান

বালকপুত্র-সমেত স্ত্রীলোকের প্রবেশ

স্ত্রীলোক। (ব্রাহ্মণ পথিকের প্রতি) হ্যাঁগা দাদাঠাকুর, এত ব্যস্ত হয়ে কম্‌নে চলেছ?

ব্রাহ্মণ। আজ শিষ্যবাড়ি চলেছি নাতনি। অনেকগুলি ঘর আজকের মধ্যে সেরে আসতে হবে, তাই সকাল সকাল বেরিয়েছি। তুমি কোথায় যাচ্ছ গা?

স্ত্রীলোক। আমি ঠাকুরের পুজো দিতে যাব। ঘরকন্নার কাজ ফেলে এসেছি, মিন্‌সে আবার রাগ করবে। পথে দু দণ্ড দাঁড়িয়ে যে জিগ্‌গেসপড়া করব তার জো নেই। বলি দাদাঠাকুর, আমাদের ও দিকে যে একবার পায়ের ধুলো পড়ে না!

ব্রাহ্মণ। আর ভাই, বুড়োসুড়ো হয়ে পড়েছি, তোদের এখন নবীন বয়েস, কী জানি পছন্দ না হয়। যার দাঁত পড়ে গেছে, তার চালকড়াই ভাজার দোকানে না যাওয়াই ভালো।

স্ত্রীলোক। নাও, নাও, রঙ্গ রেখে দাও।

আর-এক স্ত্রীলোক। এই-যে ঠাকুর, আজকাল তুমি যে বড়ো মাগ্‌গি হয়েছ।

ব্রাহ্মণ। মাগ্‌গি আর হলেম কই। সক্কালবেলায় পথের মধ্যে তোরা পাঁচ জনে মিলে আমাকে টানাছেঁড়া আরম্ভ করেছিস। তবু তো আমার সেকাল নেই।

প্রথমা। আমি যাই ভাই, ঘরের সমস্ত কাজ পড়ে রয়েছে।

দ্বিতীয়া। তা এস।

প্রথমা। (পুনর্বার ফিরিয়া) হ্যাঁলা অলঙ্গ, তোদের পাড়ায় সেই-যে কথাটা শুনেছিলুম, সে কি সত্যি!

দ্বিতীয়া। সে ভাই বেস্তর কথা।

[সকলের চুপি চুপি কথোপকথন

আর-কতকগুলি পথিকের প্রবেশ

প্রথম। আমাকে অপমান! আমাকে চেনে না সে! তার কাঁধে কটা মাথা আছে দেখতে হবে! তার ভিটেমাটি উচ্ছন্ন করে তবে ছাড়ব।

দ্বিতীয়। ঠিক কথা। তা না হলে তো সে জব্দ হবে না।

প্রথম। জব্দ বলে জব্দ! তাকে নাকের জলে চোখের জলে করব।

তৃতীয়। শাবাশ দাদা, একবার উঠেপড়ে লাগো তো।

চতুর্থ। লোকটার বড়ো বাড় বেড়েছে।

পঞ্চম। পিঁপিড়ার পাখা ওঠে মরিবার তরে।

দ্বিতীয়। অতি দর্পে হত লঙ্কা।

চতুর্থ। আচ্ছা, তুমি কী করবে শুনি দাদা!

প্রথম। কী না করতে পারি! গাধার উপরে চড়িয়ে মাথায় ঘোল ঢালিয়ে শহর ঘুরিয়ে বেড়াতে পারি। তার এক গালে চুন এক গালে কালি লাগিয়ে দেশ থেকে দূর করে দিতে পারি, তার ভিটেয় ঘুঘু চরাতে পারি।

[ক্রোধে প্রস্থান। হাসিতে হাসিতে অন্য পথিকগণের অনুগমন

প্রথম স্ত্রী। মাইরি, দাদাঠাকুর, আর হাসতে পারি নে, তোমার রঙ্গ রেখে দাও। ওমা, বেলা হয়ে গেল। আজ আর মন্দিরে যাওয়া হল না। আবার আর-এক দিন আসতে হবে। (সক্রোধে) পোড়ারমুখো ছেলে, তোর জন্যেই তো যাওয়া হল না। তুই আবার পথের মধ্যে খেলতে গিয়েছিলি কোথা?

ছেলে। কেন মা, আমি তো এইখেনেই ছিলেম।

স্ত্রী। ফের আবার নেই করছিস!

[প্রহার, ক্রন্দন ও প্রস্থান

দুইজন ব্রাহ্মণ-বটুর প্রবেশ

প্রথম। মাধব শাস্ত্রীরই জয়।

দ্বিতীয়। কখনো না, জনার্দন পণ্ডিতই জয়ী।

প্রথম। শাস্ত্রী বলছেন, স্থূল থেকে সূক্ষ্ম উৎপন্ন হয়েছে।

দ্বিতীয়। গুরু জনার্দন বলছেন, সূক্ষ্ম থেকে স্থূল উৎপন্ন হয়েছে।

প্রথম। সে যে অসম্ভব কথা।

দ্বিতীয়। সেই তো বেদবাক্য।

প্রথম। কেমন করে হবে! বৃক্ষ থেকে তো বীজ।

দ্বিতীয়। দূর মূর্খ, বীজ থেকেই তো বৃক্ষ।
প্রথম। আগে দিন না আগে রাত ?
দ্বিতীয়। আগে রাত।
প্রথম। কেমন করে ! দিন না গেলে তো রাত হবে না !
দ্বিতীয়। রাত না গেলে তো দিন হবে না।
প্রথম। (প্রণাম করিয়া) ঠাকুর, একটা সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে।
সন্ন্যাসী। কী সংশয় ?
দ্বিতীয়। প্রভু, আমাদের দুই গুরুর বিচার শুনে অবধি আম্‌রা দুই জনে মিলে তিন দিন তিন রাত্রি অনবরত ভাবছি স্থূল হতে সূক্ষ্ম, না সূক্ষ্ম হতে স্থূল, কিছুতেই নির্ণয় করতে পারছি নে।
সন্ন্যাসী। স্থূল কোথা ! স্থূল সূক্ষ্ম ভেদ কিছু নাই,
নানারূপে ব্যক্ত হয় শক্তি প্রকৃতির।
সবই সূক্ষ্ম, সবই শক্তি, স্থূল সে তো ভ্রম।
প্রথম। আমিও তো তাই বলি। আমার মাধব গুরুও তো তাই বলেন।
দ্বিতীয়। আমারও তো ঐ মত। আমার জনার্দন গুরুরও তো ঐ মত।
উভয়ে। (প্রণাম করিয়া) চললেম প্রভু !

[বিবাদ করিতে করিতে প্রস্থান

সন্ন্যাসী। হা রে মূর্খ, দুজনেই বুঝিল না কিছু।
এক খণ্ড কথা পেয়ে লভিল সান্ত্বনা।
জ্ঞানরত্ন খুঁজে খুঁজে খনি খুঁড়ে মরে—
মুঠো মুঠো বাক্যধুলা আঁচল পুরিয়া,
আনন্দে অধীর হয়ে ঘরে নিয়ে যায়।

একদল মালিনীর প্রবেশ

গান

বুঝি বেলা বহে যায়,
কাননে আয় তোরা আয়।
আলোতে ফুল উঠল ফুটে, ছায়ায় ঝরে পড়ে যায়।
সাধ ছিল রে পরিয়ে দেব মনের মতন মালা গেঁথে,
কই সে হল মালা গাঁথা, কই সে এল হায় !
যমুনার ঢেউ যাচ্ছে বয়ে, বেলা চলে যায়।

পথিক। কেন গো এত দুঃখ কিসের ! মালা যদি থাকে তো গলাও ঢের আছে।
মালিনী। হাড়কাঠও তো কম নেই।
দ্বিতীয় মালিনী। পোড়ারমুখো মিন্‌সে, গোরুবাছুর নিয়েই আছে। আর, আমি যে গলা ভেঙে মরছি, আমার দিকে একবার তাকালেও না ! (কাছে গিয়া গা ঘেঁষিয়া) মর্‌ মিন্‌সে, গায়ের উপর পড়িস কেন ?
সেই লোক। গায়ে পড়ে ঝগড়া কর কেন ! আমি সাত হাত তফাতে দাঁড়িয়ে ছিলুম।
দ্বিতীয় মালিনী। কেনে গা ! আমরা বাঘ না ভাল্লুক ! নাহয় একটু কাছেই আসতে ! খেয়ে তো ফেলতুম না।

[হাসিতে হাসিতে সকলের প্রস্থান

একজন বৃদ্ধ ভিক্ষুকের প্রবেশ

গান

ভিক্ষে দে গো ভিক্ষে দে।
দ্বারে দ্বারে বেড়াই ঘুরে, মুখ তুলে কেউ চাইলি নে।
লক্ষ্মী তোদের সদয় হোন, ধনের উপর বাড়ুক ধন—
আমি একটি মুঠো অন্ন চাই গো, তাও কেন পাই নে।
ওই রে সূর্য উঠল মাথায়, যে যার ঘরে চলেছে—
পিপাসাতে ফাটছে ছাতি, চলতে আর যে পারি নে।
ওরে, তোদের অনেক আছে, আরো অনেক হবে—
একটি মুঠো দিবি শুধু, আর কিছু চাহি নে।

একদল সৈনিক। (ধাক্কা মারিয়া) সরে যা, সরে যা, পথ ছেড়ে দে। বেটা, চোখ নেই! দেখছিস নে মন্ত্রীর পুত্র আসছেন!

[বাদ্য বাজাইয়া চতুর্দোলা চড়িয়া মন্ত্রিপুত্রের প্রবেশ ও প্রস্থান

সন্ন্যাসী। মধ্যাহ্ন আইল, অতি তীক্ষ্ণ রবিকর।
শূন্য যেন তপ্ত তাম্র-কটাহের মতো।
ঝাঁ ঝাঁ করে চারি দিক; তপ্ত বায়ুভরে
থেকে থেকে ঘুরে ঘুরে উড়িছে বালুকা।
সকাল হইতে আছি, কী দেখিনু হেথা?
এ দীর্ঘ পরান মোর সংকুচিত ক'রে
পারি কি এদের সাথে মিশিতে আবার।
কী ঘোর স্বাধীন আমি! কী মহা আলয়।
জগতের বাধা নাই— শূন্যে করি বাস।

তৃতীয় দৃশ্য

অপরাহ্ণ। পথ

প্রথম পথিক। পান্থগণ, সরে যাও। হেরো, আসিতেছে
ধর্মভ্রষ্ট অনাচারী রঘুর দুহিতা।

বালিকার প্রবেশ

প্রথম পথিক। ছুঁস নে ছুঁস নে মোরে—
দ্বিতীয় পথিক। সরে যা অশুচি।
তৃতীয় পথিক। হতভাগী জানিস নে রাজপথ দিয়ে
আনাগোনা করে যত নগরের লোক—
ম্লেচ্ছকন্যা, তুই কেন চলিস এ পথে!

বালিকার পথপার্শ্বে বৃক্ষতলে সরিয়া যাওন

একজন বৃদ্ধা। কে তুমি গা, কার বাছা, চোখে অশ্রুজল,
ভিখারিনী বেশে কেন রয়েছ দাঁড়ায়ে
এক পাশে ?

কাঁদিয়া উঠিয়া

বালিকা। জননী গো আমি অনাথিনী।
বৃদ্ধা। আহা মরে যাই !
পথিকগণ। ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না ওরে—
কে গো তুমি, জান না কি অনাচারী রঘু,
তাহারি দুহিতা ও যে !
বৃদ্ধা। ছি ছি ছি, কী ঘৃণা !

[প্রস্থান

দেবীমন্দিরের কাছে গিয়া

বালিকা। জগৎ-জননী মা গো, তুমিও কি মোরে
নেবে না ? তুমিও কি, মা ত্যেজিবে অনাথে ?
ঘৃণায় সবাই যারে দেয় দূর করে
সে কি, মা, তোমারও কোলে পায় না আশ্রয় ?
মন্দির-রক্ষক। দূর হ ! দূর হ তুই অনার্যা অশুচি !
কী সাহসে এসেছিস মন্দিরের মাঝে !

জননী ও দুহিতার প্রবেশ

জননী। আরতির বেলা হল, আয় বাছা আয়।
আয় রে আয় রে মোর বুক-চেরা ধন !
মন্দিরের দীপ হতে কাজল পরাব,
অকল্যাণ যত-কিছু যাবে দূর হয়ে।
কন্যা। ও কেও মা !
জননী। ও কেউ না, সরে আয় বাছা !

[প্রস্থান

বালিকা। এ কি কেউ না মা ! এ কি নিতান্ত অনাথা !
এর কি মা ছিল না গো ! ও মা, কোথা তুমি !

সন্ন্যাসীকে দেখিয়া

প্রভু, কাছে যাব আমি ?
সন্ন্যাসী। এসো বৎসে, এসো।
বালিকা। অনার্যা অশুচি আমি।

হাসিয়া

সন্ন্যাসী। সকলেই তাই।
সেই শুচি ধুয়েছে যে সংসারের ধুলা।
দূরে দাঁড়াইয়া কেন ! ভয় নাই বাছা।

চমকিয়া

বালিকা। ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না, আমি রঘুর দুহিতা।

সন্ন্যাসী। নাম কি তোমার বৎসে ?
বালিকা। কেমনে বলিব ?
কে আমারে নাম ধরে ডাকিবে প্রভু গো,
বাল্যে পিতৃমাতৃহীনা আমি।
সন্ন্যাসী। বোসো হেথা।

কাঁদিয়া উঠিয়া

বালিকা। প্রভু, প্রভু, দয়াময়, তুমি পিতা মাতা,
একবার কাছে তুমি ডেকেছ যখন
আর মোরে দূর করে দিয়ো না কখনো।
সন্ন্যাসী। মুছ অশ্রুজল বৎসে, আমি যে সন্ন্যাসী।
নাইকো কাহারো 'পরে ঘৃণা অনুরাগ।
যে আসে আসুক কাছে, যায় যাক দূরে,
জেনো, বৎসে, মোর কাছে সকলি সমান।
বালিকা। আমি, প্রভু, দেব নর সবারি তাড়িত,
মোর কেহ নাই—
সন্ন্যাসী। আমারো তো কেহ নাই।
দেব নর সকলেরে দিয়েছি তাড়ায়ে।
বালিকা। তোমার কি মাতা নাই ?
সন্ন্যাসী। নাই।
বালিকা। পিতা নাই ?
সন্ন্যাসী। নাই বৎসে।
বালিকা। সখা কেহ নাই ?
সন্ন্যাসী। কেহ নাই।
বালিকা। আমি তবে কাছে রব, ত্যেজিবে না মোরে ?
সন্ন্যাসী। তুমি না ত্যেজিলে মোরে আমি ত্যেজিব না।
বালিকা। যখন সবাই এসে কহিবে তোমারে—
রঘুর দুহিতা, ওরে ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না,
অনার্য অশুচি ও যে ম্লেচ্ছ ধর্মহীন—
তখনো কি ত্যেজিবে না ? রাখিবে কি কাছে ?
সন্ন্যাসী। ভয় নাই, চল্, বৎসে, তোর গৃহ যেথা।

[প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

পথপার্শ্বে বালিকার ভগ্নকুটির

বালিকা। পিতা!

সন্ন্যাসী। আহা, পিতা বলে কে ডাকিলি ওরে!
সহসা শুনিয়া যেন চমকি উঠিনু।

বালিকা। কী শিক্ষা দিতেছ, প্রভু, বুঝিতে পারি নে।
শুধু বলে দাও মোরে আশ্রয় কোথায়।
কে আমারে ডেকে নেবে, কাছে করে নেবে,
মুখ তুলে মুখপানে কে চাহিবে মোর?

সন্ন্যাসী। আশ্রয় কোথায় পাবি এ সংসারমাঝে!
এ জগৎ অন্ধকার প্রকাণ্ড গহ্বর—
আশ্রয় আশ্রয় বলে শত লক্ষ প্রাণী
বিকট গ্রাসের মাঝে ধেয়ে পড়ে গিয়া,
বিশাল জঠরকুণ্ডে কোথা পায় লোপ।
মিথ্যা রাক্ষসীরা মিলে বাঁধিয়াছে হাট,
মধুর দুর্ভিক্ষরাশি রেখেছে সাজায়ে,
তাই চারি দিক হতে আসিছে অতিথি।
যত খায় ক্ষুধা জ্বলে, বাড়ে অভিলাষ,
অবশেষে সাধ যায় রাক্ষসের মতো
জগৎ মুঠায় করে মুখেতে পুরিতে।
হেথা হতে চলে আয়— চলে আয় তোরা।

বালিকা। এখানে তো সকলেই সুখে আছে পিতা।
দূরেতে দাঁড়িয়ে আমি চেয়ে চেয়ে দেখি!

সন্ন্যাসী। হায় হায়, ইহাদের বুঝাব কেমনে!
সুখ দুঃখ সে তো, বাছা, জগতের পীড়া!
জগৎ জীবন্ত মৃত্যু— অনন্ত যন্ত্রণা!
মরণ মরিতে চায়, মরিছে না তবু—
চিরদিন মৃত্যুরূপে রয়েছে বাঁচিয়া।
জগৎ মৃত্যুর নদী চিরকাল ধরে
পড়িছে সমুদ্রমাঝে, ফুরায় না তবু—
প্রতি ঢেউ, প্রতি তৃণ, প্রতি জলকণা
কিছুই থাকে না, তবু সে থাকে সমান!
বিশ্ব মহা মৃতদেহ, তারি কীট তোরা
মরণেরে খেয়ে খেয়ে রয়েছিস বেঁচে—
দু দণ্ড ফুরায়ে যাবে কিলিবিলি করি,
আবার মৃতের মাঝে রহিবি মরিয়া।

বালিকা। কী কথা বলিছ, পিতা, ভয় হয় শুনে।

পথে একজন ভিক্ষুক পথিকের প্রবেশ

পথিক। আশ্রয় কোথায় পাব? আশ্রয় কোথায়?

সন্ন্যাসী। আশ্রয় কোথাও নাই— কে চাহে আশ্রয় ?
আশ্রয় কেবল আছে আপনাব মাঝে।
আমি ছাড়া যাহা-কিছু সকলি সংশয়।
আপনারে খুঁজে লও, ধরো তারে বুকে,
নহিলে ডুবিতে হবে সংশয়পাথারে।

পথিক। আশ্রয় কে দেবে মোরে ? আশ্রয় কোথায় ?

বাহিরে আসিয়া

বালিকা। আহা, কে গো, আসিবে কি এ মোর কুটিরে ?
কাল প্রাতে চলে যেয়ো শ্রান্তি দূর করে।
একপাশে পর্ণশয্যা রেখেছি বিছায়ে,
এনে দেব ফলমূল নির্ঝরের জল।

পথিক। কে তুমি গো ?

বালিকা। তোমাদেরি একজন আমি।

পথিক। পিতার কী নাম তব ? কে তুমি বালিকা ?

বালিকা। পরিচয় না পেলে কি আসিবে না ঘরে ?
তবে শুন পরিচয়— রঘু পিতা মম,
অনার্যা অশুচি আমি, বিশ্বের ঘৃণিত।

চমকিয়া

পথিক রঘুর দুহিতা তুমি ? সুখে থাকো বাছা !
কাজ আছে অন্যত্তরে, ত্বরা যেতে হবে।

[প্রস্থান

একটা খাট মাথায় হাসিতে হাসিতে পথে একদল লোকের প্রবেশ

সকলে মিলিয়া। হরিবোল— হরিবোল !

প্রথম। বেটা এখনো জাগল না রে।

দ্বিতীয়। বিষম ভারী।

একজন পথিক। কে হে, কাকে নিয়ে যাও ?

তৃতীয়। বিন্দে তাঁতি মড়ার মতো ঘুমোচ্ছিল, বেটাকে খাটসুদ্ধ উঠিয়ে এনেছি।

সকলে। হরিবোল— হরিবোল !

দ্বিতীয়। আর ভাই, বইতে পারি নে, একবার ঝাঁকা দাও, শালা জেগে উঠুক।

বিন্দে। (সহসা জাগিয়া উঠিয়া) অ্যাঁ অ্যাঁ উঁ উঁ !

তৃতীয়। ওরে, শব্দ করে কে রে।

বিন্দে। ওগো, ওগো, এ কী ! আমি কোথায় যাচ্ছি

সকলে। (খাট নামাইয়া) চুপ কর্ বেটা !

দ্বিতীয়। শালা মরে গিয়েও কথা কয় !

চতুর্থ। তুই যে মরেছিস রে ! হাত-পাগুলো সিধে করে চিত হয়ে পড়ে থাক্।

বিন্দে। আমি মরি নি, আমি ঘুমোচ্ছিলুম।

পঞ্চম। মরেছিস তোর হুঁশ নেই, তুই তর্ক করতে বসলি ! এমনি বেটার বুদ্ধি বটে !

ষষ্ঠ। ওর কথা শোন কেন ! বিপদে পড়ে এখন মিথ্যে কথা বলছে।

সপ্তম। মিছে দেরি কর কেন ? ও কি আর কবুল করবে ? চলো ওকে পুড়িয়ে নিয়ে আসি গে।
বিন্দে। দোহাই বাবা, আমি মরি নি। তোদের পায়ে পড়ি বাবা, আমি মরি নি।
প্রথম। আচ্ছা, আগে প্রমাণ কর্ তুই মরিস নি।
বিন্দে। হাঁ, আমি প্রমাণ করে দেব, আমার স্ত্রীর হাতে শাঁখা আছে দেখবে চলো।
দ্বিতীয়। না, তা না, ওকে মার্, দেখি ওর লাগে কি না।
তৃতীয়। (মারিয়া) লাগছে ?
বিন্দে। উঃ !
চতুর্থ। এটা কেমন লাগল ?
বিন্দে। ও বাবা !
পঞ্চম। এটা কেমন ?
বিন্দে। তুমি আমার ধর্মবাপ।

[সহসা ছুটিয়া পলায়ন ও হাসিতে হাসিতে সকলের অনুগমন

সন্ন্যাসী। আহা, শ্রান্তদেহে বালা ঘুমিয়ে পড়েছে !
ভুলে গেছে সংসারের অনাদর-জ্বালা।
কঠিন মাটিতে শুয়ে শিরে হাত দিয়ে
ঘুমের মায়ের কোলে রয়েছে আরামে।
যেন এই বালিকার ছোটো হাত দুটি
হৃদয়েরে অতি ধীরে করিছে বেষ্টন।
পালা, পালা, এইবেলা, পালা এইবেলা।
ঘুমিয়েছে, এইবেলা ওঠ্ রে সন্ন্যাসী !
পলায়ন ! পলায়ন ! ছিছি পলায়ন !
অবহেলা করি আমি বিশ্বজগতেরে,
বালিকা দেখিয়া শেষে পলাইতে হবে !
কখনো না, পালাব না, রহিব এমনি।
প্রকৃতি, এই কি তোর মায়াফাঁদ যত !
এ ঊর্ণাজালে তো শুধু পতঙ্গেরা পড়ে।

চমকিয়া জাগিয়া

বালিকা। প্রভু, চলে গেছ তুমি ! গেছ কি ফেলিয়া !
সন্ন্যাসী। কেন যাব ! কার ভয়ে পলাইব আমি !
ছায়ার মতন তোরে রাখিব কাছেতে,
তবুও রহিব আমি দূর হতে দূরে।
বালিকা। ওই শোনো, রাজপথে মহা কোলাহল।
সন্ন্যাসী। কোলাহল-মাঝে আমি রচিব নির্জন,
নগরে পথের মাঝে তপোবন মোর,
পাতিব প্রলয়াসন সৃষ্টির হৃদয়ে।

একদল পুরুষ ও স্ত্রীলোকের প্রবেশ

প্রথম স্ত্রী। (কোনো পুরুষের প্রতি) যাও, যাও, আর মুখের ভালোবাসা দেখাতে হবে না !
প্রথম পুরুষ। কেন, কী অপরাধ করলুম ?

স্ত্রী। জানি গো জানি, তোমরা পুরুষ-মানুষ, তোমাদের পাষাণ প্রাণ।

প্রথম পুরুষ। আচ্ছা, আমাদের পাষাণ প্রাণই যদি হবে, তবে ফুলশরকে কেন ডরাই ?

অন্য সকলের প্রতি

কী বল ভাই ? যদি পাষাণই হবে তবে কি আর ফুলশরের আঁচড় লাগে !

দ্বিতীয় পুরুষ। বাহবা, বেশ বলেছ।

তৃতীয় পুরুষ। শাবাশ খুড়ো, শাবাশ !

চতুর্থ পুরুষ। (স্ত্রীলোকের প্রতি) কেমন ! এখন জবাব দাও।

প্রথম পুরুষ। না, তাই বলছি। তোমরা তো দশজন আছ, তোমরাই বিচার করে বলো-না কেন, যদি পাষাণ প্রাণই হবে তবে—

পঞ্চম পুরুষ। ঠিক কথা বলেছ। তুমি না হলে আমাদের মুখরক্ষা করত কে !

ষষ্ঠ পুরুষ। খুড়ো এক-একটা কথা বড়ো সরেস বলে।

সপ্তম পুরুষ। হাঁঃ, আমিও অমন বলতে পারতুম। ও কি আর নিজে বলে ? কোন্ এক পুঁথি থেকে পড়ে বলছে।

অষ্টম পুরুষ। (আসিয়া) কী হে, কী কথাটা হচ্ছে ? কী কথাটা হচ্ছে ?

প্রথম পুরুষ। শোনো, তোমায় বুঝিয়ে বলি। এই উনি বলছিলেন, তোমরা পুরুষ-মানুষ, তোমাদেব পাষাণ প্রাণ। তাইতে আমি বললেম, আচ্ছা যদি পাষাণ প্রাণই হবে, তবে ফুলশরের আঁচড় লাগবে কী করে ? বুঝেছ ভাবখানা ? অর্থাৎ যদি—

অষ্টম পুরুষ। আমাকে আর বোঝাতে হবে না দাদা ! আমি আর বুঝি নি ! আজ বাইশ বৎসর ধবে আমি নিজ শহরে গুড়েব কারবার করে আসছি, আর একটা মানে বুঝতে পারব না এ কোন্ কথা !

প্রথম পুরুষ। (স্ত্রীলোকের প্রতি) কেমন, এখন একটা জবাব দাও।

সকল স্ত্রীলোকে মিলিয়া গান

কথা কোস নে লো রাই, শ্যামের বড়াই বড়ো বেড়েছে।
কে জানে ও কেমন করে মন কেড়েছে।
শুধু ধীরে বাজায় বাঁশি, শুধু হাসে মধুর হাসি,
গোপিনীদের হৃদয় নিয়ে তবে ছেড়েছে।

একজন পুরুষের গান

প্রিয়ে, তোমার ঢেঁকি হলে যেতেম বেঁচে
রাঙা চরণতলে নেচে নেচে।
টিপ্‌টিপিয়ে যেতেম মারা, মাথা খুঁড়ে হতেম সারা,
কানের কাছে কচ্‌কচিয়ে মানটি তোমার নিতেম যেচে।

দ্বিতীয় পুরুষ। বাহবা দাদা, বেশ গেয়েছ।

তৃতীয় পুরুষ। বেশ, বেশ, শাবাশ !

সপ্তম পুরুষ। আবে দূর, ওকে কি আর গান বলে ! গাইত বটে নিতাই, যে হাঁ, শুনে চক্ষু দিয়ে অশ্রু পড়ত।

[প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

গুহাদ্বারে

বালিকা। না পিতা, ও-সব কথা বোলো না আমারে—
শুনে ভয় করে শুধু, বুঝিতে পারি নে।

সন্ন্যাসী। তবে থাক্, তবে তুই কাছে আয় মোর,
দেখি তোর অতিমৃদু স্পর্শ সুকোমল।
আহা, তোর স্পর্শ মোর ধ্যানের মতন—
সীমা হতে নিয়ে যায় অসীমের দ্বারে।

.

এ কি মায়া ? এ কি স্বপ্ন ? এ কি মোহঘোর ?
জগৎ কি মায়া করে ছায়া হয়ে গিয়ে
করিছে প্রাণের কাছে অনন্তের ভান ?

দূরে সরিয়া

বালিকা, এ-সব কথা না শুনিবি যদি
সন্ন্যাসীর কাছে তবে এলি কী আশায় ?

বালিকা। আমি শুধু কাছে কাছে রহিব তোমার,
মুখপানে চেয়ে রব বসি পদতলে।
নগরের পথে যবে হইবে বাহির
ওই হাত ধরে আমি যাব সাথে সাথে।

সন্ন্যাসী। পিঞ্জরের ছোটো পাখি আহা ক্ষীণ অতি,
এরে কেন নিয়ে যাই অনন্তের মাঝে !
ডানা দিয়ে মুখ ঢেকে ভয়ে হল সারা,
আমার বুকের কাছে লুকাইতে চায় !
আহা, তবে নেবে আয়। থাক্ মুখ ঢেকে।
বুকের মাঝেতে তবে থাক্ লুকাইয়া।
এ কি স্নেহ ? আমি কি রে স্নেহ করি এরে ?
না না। স্নেহ কোথা মোর ! কোথা দ্বেষ ঘৃণা !
কাছে যদি আসে কেহ তাড়াব না তারে,
দূরে যদি থাকে কেহ ডাকিব না কাছে।

প্রকাশ্যে

বাছা, এ আঁধারে তুই কেমনে রহিবি ?
তোরা সব ছোটো ছোটো আলোকের প্রাণী।
কুটির রয়েছে তোর নগরের মাঝে,
সেথা আছে লোকজন, গাছপালা, পাখি—
হেথায় কে আছে তোর !

বালিকা। তুমি আছ পিতা।
যে স্নেহ দিয়েছ তুমি তাই নিয়ে রব।

হাসিয়া। স্বগত

সন্ন্যাসী। বালিকা কি মনে করে স্নেহ করি ওরে ?
হায় হায়, এ কী ভ্রম ! জানে না সরলা
নিষ্কলঙ্ক এ হৃদয় স্নেহরেখাহীন।
তাই মনে করে যদি সুখে থাকে থাক্।
মোহ নিয়ে ভ্রম নিয়ে বেঁচে থাকে এরা।

প্রকাশ্যে

যাই বৎসে, গুহামাঝে করি গে প্রবেশ,
একবার বসি গিয়ে সমাধি-আসনে।

বালিকা। ফিরিবে কখন পিতা ?

সন্ন্যাসী। কেমনে বলিব !
ধ্যানে মগ্ন, নাহি থাকে সময়ের জ্ঞান।

[প্রস্থান

ষষ্ঠ দৃশ্য

অপরাহ্ণ

গুহাদ্বারে সন্ন্যাসীর প্রবেশ

বালিকা। এলে তুমি এতক্ষণে, বসে আছি হেথা—
পিতা, আমি তোমা তরে গিয়েছিনু বনে,
এনেছি আঁচল ভরে ফলফুল তুলে।
দেখো চেয়ে কী সুন্দর রাঙা দুটি ফুল।

হাসিয়া

সন্ন্যাসী। দিতে চাস যদি বাছা, দে তবে যা খুশি।
মোর কাছে কিছু নাই সুন্দর কুৎসিত।
এক মুঠা ফুল যদি ভালো লাগে তোর
এক মুঠা ধুলা সেও কী করিল দোষ ?
ভালো মন্দ কেন লাগে ? সবই অর্থহীন।
আজ বৎসে, সারাদিন কাটালি কী করে ?

বালিকা। ওই দেখো— চুপি চুপি এসো এই দিকে।
সারাদিন মোর সাথে খেলা করে করে
সাঁঝেতে লতাটি মোর ঘুমিয়ে পড়েছে।
নুইয়ে পড়েছে ভুঁয়ে কচি ডালগুলি,
পাতাগুলি মুদে গেছে জড়াজড়ি করে।
এসো পিতা, এইখানে বোসো এর কাছে—
ধীরে ধীরে গায়ে দাও হাতটি বুলিয়ে।

স্বগত

সন্ন্যাসী। এ কী রে মদিরা আমি করিতেছি পান!
এ কী মধু অচেতনা পশিছে হৃদয়ে!
এ কী রে স্বপন-ঘোরে ছাইছে নয়ন!
আবেশে পরানে আসে গোধূলি ঘনায়ে।
পড়িছে জ্ঞানের চোখে মেঘ-আবরণ।
ধীরে ধীরে মোহময় মরণের ছায়া
কেন রে আমারে যেন আচ্ছন্ন করিছে!

সহসা ফুল ফল ছুঁড়িয়া ফেলিয়া
ভূমিতে পদাঘাত করিয়া

দূর হোক— এ-সকল কিছু ভালো নয়—
বালিকা, বালিকা, তোর এ কী ছেলেখেলা!
আমি যে সন্ন্যাসী যোগী মুক্ত নির্বিকার,
সংসারের গ্রন্থিহীন, স্বাধীন সবল,
এ ধুলায় ঢাকিবি কি আমার নয়ন!

কিয়ৎক্ষণ থামিয়া

বাছা রে, অমন করে চাহিয়া কেন রে!
কেন রে নয়ন দুটি করে ছল ছল।
জানিস নে তুই মোরা সন্ন্যাসী বিরাগী,
আমাদের এ-সকল ভালো নাহি লাগে।
ছিছি, জনমিল প্রাণে এ কী এ বিকার!
সহসা কেন রে এত করিল চঞ্চল!
কোথা লুকাইয়া ছিল হৃদয়ের মাঝে
ক্ষুদ্র রোষ, অগ্নিজিহ্ব নরকের কীট!
কোন্ অন্ধকার হতে উঠিল ফুঁসিয়া!
এতদিন অনাহারে এখনো মরে নি!
হৃদয়ে লুকানো আছে এ কী বিভীষিকা!
কোথা যে কে আছে গুপ্ত কিছু তো জানি নে।
হৃদয়শ্মশান-মাঝে মৃতপ্রাণী যত
প্রাণ পেয়ে নাচিতেছে কঙ্কালের নাচ,
কেমনে নিশ্চিন্ত হয়ে রহি আমি আর!

প্রকাশ্যে

দাও, বৎসে, এনে দাও ফলফুল তব,
দেখাও কোথায় বাছা লতাটি তোমার—
না, না, আমি চলিলাম নগরে ভ্রমিতে।
দু দণ্ড বসিয়া থাকো, আসিব এখনি।

[প্রস্থান

সপ্তম দৃশ্য

পর্বতশিখরে সন্ন্যাসী

পর্বতপথে দুইজন স্ত্রীলোকের প্রবেশ

গান

বনে এমন ফুল ফুটেছে,
মান করে থাকা আজ কি সাজে !
মান-অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে
চলো চলো কুঞ্জমাঝে।
আজ কোকিলে গেয়েছে কুহু, মুহুর্‌মুহু
আজ কাননে ওই বাঁশি বাজে।
মান করে থাকা আজ কি সাজে !
আজ মধুরে মিশাবি মধু, পরান-বঁধু
চাঁদের আলোয় ওই বিরাজে
মান করে থাকা আজ কি সাজে !

সন্ন্যাসী। সহসা পড়িল চোখে এ কী মায়াঘোর।
জগতেরে কেন আজ মনোহর হেরি !
পশ্চিমে কনকসন্ধ্যা সমুদ্রের মাঝে
সুধীরে নীলের কোলে যেতেছে মিলায়ে।
নিম্নে বনভূমিমাঝে ঘনায় আঁধার,
সন্ধ্যার সুবর্ণছায়া উপরে পড়েছে।
চারি দিকে শান্তিময়ী স্তব্ধতার মাঝে
সিন্ধু শুধু গাহিতেছে অবিশ্রাম গান।
বামে, দূরে দেখা যায় শৈলপদতলে
শ্যামল তরুর মাঝে নগরের গৃহ।
কোলাহল থেমে গেছে, পথ জনহীন
দীপ জ্বলে উঠিতেছে দু-একটি ক'রে—
সন্ধ্যার আরতি হয়, শঙ্খঘণ্টা বাজে।
প্রকৃতি, এমন তোরে দেখি নি কখনো—
এমন মধুর যদি মায়ামূর্তি তোর,
দূর হতে বসে বসে দেখি-না চাহিয়া !
হেথায় বসি-না কেন রাজার মতন,
জগতের রঙ্গভূমি সম্মুখে আমার !
আমি আজি প্রভু তোর, তুই দাসী মোর,
মায়াবিনী দেখা তোর মায়া অভিনয়,
দেখা তোর জগতের মহা ইন্দ্রজাল।
খেলা কর্‌ সমুখেতে চন্দ্রসূর্য নিয়ে,
নীলাকাশ রাজছত্র ধর মোর শিরে,
সমস্ত জগৎ দিয়ে কর্‌ মোরে পূজা।

উঠুক রে দিবানিশি সপ্তলোক হতে
বিচিত্র রাগিণীময়ী মায়াময়ী গাথা।

আর-একদল পথিকের প্রবেশ

গান

মরি লো মরি,
আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে!
ভেবেছিলেম ঘরে রব, কোথাও যাব না—
ওই যে, বাহিরে বাজিল বাঁশি বলো কী করি?
শুনেছি কোন্ কুঞ্জবনে যমুনাতীরে
সাঁঝের বেলা বাজে বাঁশি ধীর সমীরে—
ওগো তোরা জানিস যদি
আমায় পথ বলে দে।
আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে!
দেখি গে তার মুখের হাসি,
তারে ফুলের মালা পরিয়ে আসি,
তারে বলে আসি তোমার বাঁশি
আমার প্রাণে বেজেছে।
আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে!

সন্ন্যাসী। জগৎ সম্মুখে মোর সমুদ্রের মতো,
আমি তীরে বসে আছি পর্বতশিখরে—
তরঙ্গেতে গ্রহতারা হতেছে আকুল,
ভাসিতেছে কোটি প্রাণী জীর্ণ কাষ্ঠ ধরি।
আমি শুধু শুনিতেছি কলধ্বনি তার,
আমি শুধু দেখিতেছি তরঙ্গের খেলা।
কিরণকুন্তলজাল এলায়ে চৌদিকে
রুদ্র তালে নৃত্য করে এ মহাপ্রকৃতি।
আলোক আঁধার ছায়া, জীবন মরণ,
রাত্রি দিন, আশা ভয়, উত্থান পতন,
এ কেবল তালে তালে পদক্ষেপ তার।
শত গ্রহ, শত তারা, শত কোটি প্রাণী
প্রতি পদক্ষেপে তার জন্মিছে মরিছে।
আমি তো ওদের মাঝে কেহ নই আর,
তবে কেন এই নৃত্য দেখি-না বসিয়া!

একজন পথিক

গান

যোগী হে, কে তুমি হৃদি-আসনে।
বিভূতিভূষিত শুভ্র দেহ,
নাচিছ দিক্ বসনে।

মহা আনন্দে পুলককায় গঙ্গা উথলি ছুলি যায়,
ভালে শিশুশশী হাসিয়া চায়,
জটাজূট ছায় গগনে।

প্রস্থান

অষ্টম দৃশ্য

গুহাদ্বারে

সন্ন্যাসীর প্রবেশ

সন্ন্যাসী। আয় তোরা, কাছে আয়, কে আসিবি আয়—
সকলি সুন্দর হেরি এ বিশ্বজগতে।

বালিকা। আমিও কি কাছে যাব! ডাকো পিতা ডাকো!
কী দোষ করিয়াছিনু বলো বুঝাইয়া!

সন্ন্যাসী। কিছু ভয় করিস নে, কোনো দোষ নেই—
তোরে ফেলে আর কভু যাব না বালিকা।

গুহার কাছে গিয়া

এ কী অন্ধকার হেথা! এ কী বদ্ধ গুহা!
আয় বাছা, মোরা দোঁহে বাহিরেতে যাই,
চাঁদের আলোতে গিয়ে বসি একবার।

বাহিরে আসিয়া

আহা এ কী সুমধুর! এ কী শান্তিসুধা!
কী আরামে গাছগুলি রয়েছে দাঁড়ায়ে!
মনে সাধ যায় ওই তরু হয়ে গিয়ে
চন্দ্রালোকে দাঁড়াইয়া স্তব্ধ হয়ে থাকি।
ধীরে ধীরে কত কী যে মনে আসিতেছে।
অতীতের অতি দূর ফুলবন হতে
বায়ু যেন বহে আসে নিশ্বাসের মতো,
সাথে লয়ে পল্লবের মর্মরবিলাপ,
মিলিত জড়িত শত পুষ্পগন্ধরাশি।
এমনি জোছনা-রাত্রে কোন্‌খানে ছিনু,
কারা যেন চারি পাশে বসে ছিল মোর!
তোরি মতো দু-একটি মধুমাখা মুখ
চাঁদের আলোতে মিশে পড়িতেছে মনে।
আর না রে, আর না রে, আর ফিরিব না।
তোদের অনেক দূরে ফেলিয়া এসেছি।
অনন্তের পারাবারে ভাসায়েছি তরী,
মাঝে মাঝে অতি দূরে রেখা দেখা যায়—

তোদের সে মেঘময় মায়াদ্বীপগুলি।
সেথা হতে কারা তোরা বাঁশিটি বাজায়ে
আজিও ডাকিস মোরে! আমি ফিরিব না।
বন্দী করে রেখেছিলি মায়ামুগ্ধ করে,
পালায়ে এসেছি আমি, হয়েছি স্বাধীন।
তীরে বসে গা তোদের মায়াগানগুলি—
অনন্তের পানে আমি চলেছি ভাসিয়া।
বাছা, তুই কাছে আয়, দেখি তোরে আমি,
মুখেতে পড়েছে তোর চাঁদের কিরণ।

কাছে আসিয়া

বালিকা। গান পড়িতেছে মনে, গাই বসে পিতা!

গান

মেঘেরা চলে চলে যায়,
চাঁদেরে ডাকে 'আয় আয়'।
ঘুমঘোরে বলে চাঁদ, 'কোথায়— কোথায়!'
না জানি কোথা চলিয়াছে,
কী জানি কী যে সেথা আছে,
আকাশের মাঝে চাঁদ চারি দিকে চায়।
সুদূরে— অতি— অতি দূরে,
বুঝি রে কোন্ সুরপুরে
তারাগুলি ঘিরে বসে বাঁশরি বাজায়।
মেঘেরা তাই হেসে হেসে
আকাশে চলে ভেসে ভেসে,
লুকিয়ে চাঁদের হাসি চুরি করে যায়।

সন্ন্যাসী। এ কী রে চলেছি কোথা, এসেছি কোথায়?
বুঝি আর আপনারে পারি নে রাখিতে।
বুঝি মরি, ডুবি, বুঝি লুপ্ত হয়ে যাই।
ওরে কোন্ অতলেতে যেতেছি তলায়ে—
সর্বাঙ্গে চাপিছে ভার, আঁখি মুদে আসে।
চৌদিকে কী যেন তোরে আসিছে ঘিরিয়া!
কোথায় রাখিলি তোর পালাবার পথ!
ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যে রে যেতেছিস চলি,
সহসা চরণে কোথা লাগিবে আঘাত,
বিনাশের মাঝখানে উঠিবি জাগিয়া।
এখনি ছিঁড়িয়া ফেল্ স্বপনের মায়া।
চল্ তোর নিজ রাজ্যে অনন্ত আঁধারে।
যত চন্দ্র সূর্য সেথা ডুবে নিবে যাবে।
ক্ষুদ্র এ আলোতে এসে হনু দিশেহারা,
আঁধার দেয় না কভু পথ ভুলাইয়া।

নবম দৃশ্য

গুহায় সন্ন্যাসী

সন্ন্যাসী। আহা এ কী শান্তি, এ কী গভীর বিরাম !
অন্তর বাহির যাবে, যাবে দেশ কাল—
'আছি' মাত্র রবে শুধু, আর কিছু নয়।

দীপ হস্তে বালিকার প্রবেশ

বালিকা। দুই দিন দুই রাত্রি চলে গেছে পিতা,
গুহার দুয়ারে আমি বসিয়া রয়েছি,
তাই আজ একবার এসেছি দেখিতে।
একটিও জনপ্রাণী আসে নি হেথায়,
দীর্ঘ দিন, দীর্ঘ রাত্রি গিয়েছে কাটিয়া,
কেন হেথা অন্ধকারে একা বসে আছ !
কতক্ষণ বসে বসে শুনিনু সহসা
তুমি যেন স্নেহবাক্যে ডাকিছ আমারে।
নিতান্ত একেলা তুমি রয়েছ যে পিতা—
তাই আর পারিনু না, আসিলাম কাছে।
ওকি প্রভু, কথা কেন কহিছ না তুমি !
ও কী ভাবে চেয়ে আছ মোর মুখপানে !
ভালো লাগিছে না পিতা ? যাব তবে চলে ?

সন্ন্যাসী। না না, এলি যদি, তবে যাস নে চলিয়া।
আমি তো ডাকি নি তোরে, নিজে এসেছিস !
একটুকু দাঁড়া, তোরে দেখি ভালো করে।
সংসারের পরপারে ছিলেম যে আমি,
সহসা জগৎ হতে কে তোরে পাঠালে ?
সেথা হতে সাথে করে কেন নিয়ে এলি
দিবালোক, পুষ্পগন্ধ, স্নিগ্ধ সমীরণ !
কিবা তোর সুধাকণ্ঠ, স্নেহমাখা স্বর !
মরি কী অমিয়াময়ী লাবণ্যপ্রতিমা !
সরলতাময় তোর মুখখানি দেখে
জগতের 'পরে মোর হতেছে বিশ্বাস।
তুই কি রে মিথ্যা মায়া, দু দণ্ডের ভ্রম !
জগতের গাছে তুই ফুটেছিস ফুল,
জগৎ কি তোরি মতো এত সত্য হবে !
চল্ বাছা, গুহা হতে বাহিরেতে যাই।
সমুদ্রের এক পারে রয়েছে জগৎ,
সমুদ্রের পরপারে আমি বসে আছি,
মাঝেতে রহিলি তুই সোনার তরণী—

জগৎ-অতীত এই পারাবার হতে
মাঝে মাঝে নিয়ে যাবি জগতের কূলে।

[প্রস্থান

দশম দৃশ্য

গুহার বাহিরে

সন্ন্যাসী। আহা একি চারি দিকে প্রভাতবিকাশ!
এ জগৎ মিথ্যা নয়, বুঝি সত্য হবে,
মিথ্যা হয়ে প্রকাশিছে আমাদের চোখে।
অসীম হতেছে ব্যক্ত সীমারূপ ধরি।
যাহা-কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, অনন্ত সকলি!
বালুকার কণা সেও অসীম অপার,
তারি মধ্যে বাঁধা আছে অনন্ত আকাশ—
কে আছে, কে পারে তারে আয়ত্ত করিতে?
বড়ো ছোটো কিছু নাই, সকলি মহৎ।
আঁখি মুদে জগতেরে বাহিরে ফেলিয়া
অসীমের অন্বেষণে কোথা গিয়েছিনু!
সীমা তো কোথাও নাই— সীমা সে তো ভ্রম।
ভালো করে পড়িব এ জগতের লেখা,
শুধু এ অক্ষর দেখে করিব না ঘৃণা।
লোক হতে লোকান্তরে ভ্রমিতে ভ্রমিতে,
একে একে জগতের পৃষ্ঠা উলটিয়া,
ক্রমে যুগে যুগে হবে জ্ঞানের বিস্তার।
বিশ্বের যথার্থ রূপ কে পায় দেখিতে!
আঁখি মেলি চারি দিকে করিব ভ্রমণ,
ভালোবেসে চাহিব এ জগতের পানে,
তবে তো দেখিতে পাব স্বরূপ ইহার।

দুই জন পথিকের প্রবেশ

প্রথম। আর কত দূরে যাবি, ফিরে যা রে ভাই!
আয় ভাই, এইখানে কোলাকুলি করি।
দ্বিতীয়। কে জানে আবার কবে দেখা হবে ফিরে।
প্রথম। আবার আসিব ফিরে যত শীঘ্র পারি।
দ্বিতীয়। যাবে যদি, একবার দাঁড়াও হেথায়।
একবার ফিরে চাও নগরের পানে।
ওই দেখো দূরে ওই গৃহটি তোমার—
চারি দিকে রহিয়াছে লতিকার বেড়া,
ওই সে অশোক গাছ বামে উঠিয়াছে,

ওই তরুতলে বসে আমরা দুজনে
কত রাত্রি জোছনাতে কথা কহিয়াছি।

প্রথম। দুদিনের এ বিরহ ত্বরায় ফুরাবে,
আনন্দের মাঝে পুন হইবে মিলন।

দ্বিতীয়। মনে যেন রেখো, সখা, সুদূর প্রবাসে—
পুরাতন এ বন্ধুরে ভুলিয়ো না যেন।
দেবতা রাখুন সুখে, আর কী কহিব।

[প্রস্থান

সন্ন্যাসী। আহা, যেতে যেতে দোঁহে চায় ফিরে ফিরে,
অশ্রুজলে ভালো করে দেখিতে না পায়।
বিপুল জগৎ-মাঝে দিগন্তের পানে
সখা ওর কোথা গেল, কে জানে কোথায়!
এ কী সংশয়ের দেশে রয়েছি আমরা,
চোখের আড়ালে হেথা সবি অনিশ্চয়।
বারেক যে কাছ হতে দূরে চলে গেল
হয়তো সে কাছে ফিরে আর আসিবে না।
তাই সদা চোখে চোখে রেখে দিতে চাই,
তাই সদা টেনে নিই বুকের মাঝেতে।
কোথা কে অদৃশ্য হয় চারি দিক হতে,
যাহা-কিছু বাকি থাকে ভয়ে তাহাদের
আরো যেন দৃঢ় করে ধরি জড়াইয়া।
সবাই চলিয়া যায় ভিন্ন ভিন্ন দিশে,
অসীম জগতে মোরা কে কোথায় থাকি,
মাঝে লোক-লোকান্তের ব্যবধান পড়ে।
তবু কি গলায় দিবি মোহের বন্ধন!
সুখ দুঃখ নিয়ে তবু করিবি কি খেলা!
যে রবে না তবু তারে রাখিবারে চাস!
ওরে, আমি প্রতিদিন দেখিতেছি, যেন
কে আমারে অবিরত আনিতেছে টেনে।
প্রতিদিন যেন আমি ঘুরিয়া ঘুরিয়া
জগৎ-চক্রের মাঝে যেতেছি পড়িতে—
চারি দিকে জড়াইছে অশ্রুর বাঁধন,
প্রতিদিন কমিতেছে চরণের বল।

যাক ছিঁড়ে! গেল ছিঁড়ে! চল্ ছুটে চল্!
চল্ দূরে— যত দূরে চলে রে চরণ।
কে ও আসে অশ্রুনেত্রে শূন্যগুহা-মাঝে,
কে ও রে পশ্চাতে ডাকে 'পিতা পিতা' ব'লে!
ছিঁড়ে ফেল্, ভেঙে ফেল্ চরণের বাধা—
হেথা হতে চল্ ছুটে, আর দেরি নয়।

একাদশ দৃশ্য

পথে সন্ন্যাসী

সন্ন্যাসী। এসেছি অনেক দূরে— আর ভয় নাই।

পায়েতে জড়ালো লতা, ছিন্ন হয়ে গেল।
সেই মুখ বার বার জাগিতেছে মনে।
সে যেন করুণ মুখে মনের দুয়ারে
বসে বসে কাঁদিতেছে, ডাকিতেছে সদা!
যতই রাখিতে চাই দুয়ার রুধিয়া—
কিছুতেই যাবে না সে, ফিরে ফিরে আসে,
একটু মনের মাঝে স্থান পেতে চায়।

নির্ভয়ে গা ঢেলে দিয়ে সংসারের স্রোতে
এরা সবে কী আরামে চলেছে ভাসিয়া।
যে যাহার কাজ করে, গৃহে ফিরে যায়,
ছোটো ছোটো সুখে দুঃখে দিন যায় কেটে।
আমি কেন দিবানিশি প্রাণপণ করে
যুঝিতেছি সংসারের স্রোত-প্রতিকূলে।
পেরেছি কি এক তিল অগ্রসর হতে!
বিপরীতে মুখ শুধু ফিরাইয়া আছি,
উজানে যেতেছি বলে হইতেছে ভ্রম,
পশ্চাতে স্রোতের টানে চলেছি ভাসিয়া—
সবাই চলেছে যেথা ছুটেছি সেথাই!

দরিদ্র বালিকার প্রবেশ

বালিকা। ওগো, দয়া করো মোরে, আমি অনাথিনী।

সহসা চমকিয়া উঠিয়া

সন্ন্যাসী। কে রে তুই? কে রে বাছা? কোথা হতে এলি?
অনাথিনী? তুইও কি তারি মতো তবে?
তোরেও কি ফেলে কেউ গিয়েছে পলায়ে?
তারেই কি চারি দিকে খুঁজিয়া বেড়াস?
বৎসে, কাছে আয় তুই— দে রে পরিচয়।

বালিকা। ভিখারি বালিকা আমি, সন্ন্যাসী ঠাকুর,
অন্ধ বৃদ্ধ মাতা মোর রোগশয্যাশায়ী।
আসিয়াছি এক-মুঠা ভিক্ষান্নের তরে।

সন্ন্যাসী। আহা বৎসে, নিয়ে চল্ কুটিরেতে তোর।
রুগ্‌ণ তোর জননীরে দেখে আসি আমি।

[প্রস্থান

কতকগুলি সন্তান লইয়া একজন স্ত্রীলোকের প্রবেশ

স্ত্রী। দেখ্ দেখি, মিশ্রদের বাড়ির ছেলেগুলি কেমন রিষ্টপুষ্ট ! দেখলে দু-দণ্ড চেয়ে থাকতে ইচ্ছে করে— আর এঁদের ছিরি দেখো-না, যেন বৃষকাষ্ঠ দাঁড়িয়ে আছেন, যেন সাত কুলে কেউ নেই, যেন সাত জন্মে খেতে পান না।

সন্তানগণ। তা আমরা কী করব মা ! আমাদের দোষ কী ?

মা। বললেম— বলি, রোজ সকালে ভালো করে হলুদ মেখে তেল মেখে স্নান কর, ধাত পোষ্টাই হবে, ছিরি ফিরবে— তা তো কেউ শুনবে না ! আহা, ওদের দিকে চাইলে চোখ জুড়িয়ে যায়, রঙ যেন দুধে আলতায়—

সন্তানগণ। আমাদের রঙ কালো তা আমরা কী করব ?

মা। তোদের রঙ কালো কে বললে ? তোদের রঙ মন্দ কী ? তবে কেন ওদের মতো দেখায় না ?

[প্রস্থান

সন্ন্যাসীর প্রবেশ। একটি কন্যা লইয়া স্ত্রীলোকের প্রবেশ

সন্ন্যাসী। কোথায় চলেছ বাছা ?
স্ত্রী। প্রণাম ঠাকুর !
ঘরেতে যেতেছি মোরা।
সন্ন্যাসী। সেথায় কে আছে ?
স্ত্রী। শাশুড়ি আছেন মোর, আছেন সোয়ামী,
শত্রুমুখে ছাই দিয়ে দুটি ছেলে আছে।
সন্ন্যাসী। কী কাজে কাটাও দিন বলো মোরে বাছা !
স্ত্রী। ঘরকন্না-কাজ আছে, ছেলেপিলে আছে,
গোয়ালে তিনটি গোরু তার করি সেবা,
বিকেলে চরকা কাটি মেয়েটিরে নিয়ে।
সন্ন্যাসী। সুখেতে কি কাটে দিন ? দুঃখ কিছু নেই ?
স্ত্রী। দয়ার শরীর রাজা প্রজার মা-বাপ,
কোনো দুঃখ নেই প্রভু ! রামরাজ্যে থাকি।
সন্ন্যাসী। এটি কি তোমারি মেয়ে বাছা !
স্ত্রী। হাঁ ঠাকুর।

কন্যার প্রতি

যা না রে, প্রভুরে গিয়ে কর্ দণ্ডবৎ।
সন্ন্যাসী। আয় বৎসে, কাছে আয়, কোলে করি তোরে।
আসিবি নে ! তুই মোরে চিনেছিস বুঝি—
নিষ্ঠুর কঠিন আমি পাষাণহৃদয়,
আমারে বিশ্বাস করে আসিস নে কাছে !

মাকে টানিয়া

কন্যা। মা গো, ঘরে চলো।
স্ত্রী। তবে প্রণাম ঠাকুর।
সন্ন্যাসী। যাও বাছা, সুখে থাকো আশীর্বাদ করি।

[সন্ন্যাসী ব্যতীত সকলের প্রস্থান

বসে বসে কী দেখি এ, এই কি রে সুখ !
লঘু সুখ লঘু আশা বাহিয়া বাহিয়া
সংসারসাগরে এরা ভাসিয়া বেড়ায়,
তরঙ্গের নৃত্য-সনে নৃত্য করিতেছে ।
দু দিনেতে জীর্ণ হবে এ ক্ষুদ্র তরণী,
আশ্রয়ের সাথে কোথা মজিবে পাথারে ।
আমি তো পেয়েছি কূল অটল পর্বতে,
নিত্য যাহা তারি মাঝে করিতেছি বাস ।
আবার কেন রে হোথা সন্তরণ-সাধ !
ওই অশ্রুসাগরের তরঙ্গহিল্লোলে
আবার কি দিবানিশি উঠিবি পড়িবি !

চক্ষু মুদিয়া

হৃদয় রে, শান্ত হও, যাক সব দূরে—
যাক দূরে, যাক চলে মায়া-মরীচিকা ।
এসো এসো অন্ধকার, প্রলয়সমুদ্রে
তপ্ত দীপ্ত দগ্ধ প্রাণ দাও ডুবাইয়া ।
অকূল স্তব্ধতা এসো চারি দিকে ঘিরে,
কোলাহলে কর্ণ মোর হয়েছে বধির ।
গেল, সব ডুবে গেল, হইল বিলীন,
হৃদয়ের অগ্নিজ্বালা সব নিবে গেল !

বালিকার প্রবেশ

বালিকা । পিতা, পিতা, কোথা তুমি পিতা !

চমকিয়া

সন্ন্যাসী । কে রে তুই !
চিনি নে, চিনি নে তোরে, কোথা হতে এলি !
বালিকা । আমি, পিতা, চাও পিতা, দেখো পিতা, আমি ।
সন্ন্যাসী । চিনি নে, চিনি নে তোরে, ফিরে যা, ফিরে যা !
আমি কারো কেহ নই, আমি যে স্বাধীন ।

পায়ে পড়িয়া

বালিকা । আমারে যেয়ো না ফেলে, আমি নিরাশ্রয় ।
শুধায়ে শুধায়ে সবে তোমারে খুঁজিয়া
বহু দূর হতে পিতা, এসেছি যে আমি ।

সহসা ফিরিয়া আসিয়া, বুকে টানিয়া

সন্ন্যাসী । আয় বাছা, বুকে আয়, ঢাল্ অশ্রুধারা !
ভেঙে যাক এ পাষাণ তোর অশ্রুস্রোতে !
আর তোরে ফেলে আমি যাব না বালিকা,
তোরে নিয়ে যাব আমি নূতন জগতে ।

পদাঘাতে ভেঙেছিনু জগৎ আমার—
ছোটো এ বালিকা এর ছোটো দুটি হাতে
আবার ভাঙা জগৎ গড়িয়া তুলিল।
আহা তোর মুখখানি শুকায়ে গিয়েছে,
চরণ দাঁড়াতে যেন পারিছে না আর।
অনিদ্রায়, অনাহারে, মধ্যাহ্নতপনে
তিন দিবসের পথ কেমনে এলি রে!
আয় রে বালিকা, তোরে বুকে করে নিয়ে
যেথা ছিনু ফিরে যাই সেই গুহামাঝে।

[প্রস্থান

দ্বাদশ দৃশ্য

গুহার দ্বারে

সন্ন্যাসী। এইখানে সব বুঝি শেষ হয়ে গেল!
যে ধ্যানে অনন্তকাল মগ্ন হব বলে
আসন পাতিয়াছিনু বিশ্বের বাহিরে,
আরম্ভ না হতে হতে ভেঙে গেল বুঝি!
তারি মুখ জাগে মনে সমাধিতে বসে,
তারি মুখ হৃদয়ের প্রলয়-আঁধারে
সহসা তারার মতো কোথা ফুটে ওঠে,
সেই দিকে আঁখি যেন বদ্ধ হয়ে থাকে,
ক্রমে ক্রমে অন্ধকার মিলাইয়া যায়,
জগতের দৃশ্য ধীরে ফুটে ফুটে ওঠে—
গাছপালা, সূর্যালোক, গৃহ, লোকজন
কোথা হতে জেগে ওঠে গুহার মাঝারে।
সদা মনে হয় বালা কোথায় না জানি,
হয়তো সে গেছে চলে নগরে ভ্রমিতে,
হয়তো কে অনাদর করেছে তাহারে,
এসেছে সে কাঁদো-কাঁদো মুখখানি করে
আমার বুকের কাছে লুকাইতে মাথা।

এইখানে সব বুঝি শেষ হয়ে গেল!
মিছে ধ্যান, মিছে জ্ঞান, মিছে আশা মোর!
আকাশবিহারী পাখি উড়িত আকাশে—
মাটি হতে ব্যাধ তারে মারিয়াছে বাণ,
ক্রমেই মাটির পানে যেতেছে পড়িয়া—
ক্রমেই দুর্বল দেহ, শ্রান্ত ভগ্ন পাখা,
ক্রমেই আসিছে নুয়ে অভ্রভেদী মাথা।
ধুলায়, মৃত্যুর মাঝে লুটাইতে হবে।

লৌহপিঞ্জরের মাঝে বসিয়া বসিয়া
আকাশের পানে চেয়ে ফেলিব নিশ্বাস।
তবে কি রে আর কিছু নাইকো উপায়!

বালিকা। দেখো পিতা, লতাটিতে কুঁড়ি ধরিয়াছে,
প্রভাতের আলো পেলে উঠিবে ফুটিয়া।

সন্ন্যাসী সবেগে গিয়া লতা ছিঁড়িয়া ফেলিল

বালিকা। ওকি হল! ওকি হল! কী করিলে পিতা!

সন্ন্যাসী। রাক্ষসী পিশাচী, ওরে, তুই মায়াবিনী—
দূর হ, এখনি তুই যা রে দূর হয়ে।
এত বিষ ছিল তোর ওইটুকু-মাঝে
অনন্ত জীবন মোর ধ্বংস করে দিলি!
ওরে, তোরে চিনিয়াছি, আজ চিনিয়াছি—
প্রকৃতির গুপ্তচর তুই রে রাক্ষসী,
গলায় বাঁধিয়া দিলি লোহার শৃঙ্খল!
তুই রে আলেয়া-আলো, তুই মরীচিকা—
কোন্ পিপাসার মাঝে, দুর্ভিক্ষের মাঝে,
কোন্ মরুভূমি-মাঝে, শ্মশানের পথে,
কোন্ মরণের মুখে যেতেছিস নিয়ে!
ওই-যে দেখি রে তোর নিদারুণ হাসি,
প্রকৃতির হৃদিহীন উপহাস তুই—
শৃঙ্খলেতে বেঁধে ফেলে পরাজিত মোরে
হা হা করে হাসিতেছে প্রকৃতি রাক্ষসী!
এখনো কি আশা তোর পুরে নি পাষাণী?
এখনো করিবি মোরে আরো অপমান!
আরো ধুলা দিবি ফেলে এ মাথায় মোর!
আরো গহ্বরেতে মোরে টেনে নিয়ে যাবি!
না রে না, তা হবে না রে, এখনো যুঝিব—
এখনো হইব জয়ী, ছিঁড়িব শৃঙ্খল।

সন্ন্যাসীর সবেগে গুহা হইতে বহির্গমন
ও মূর্ছিত হইয়া বালিকার পতন

ত্রয়োদশ দৃশ্য

অরণ্য

ঝড়বৃষ্টি। রাত্রি

সন্ন্যাসী। কে ও রে করুণকণ্ঠে করে আর্তনাদ!
এখনো কানেতে কেন পশিছে আসিয়া!
প্রলয়ের শব্দে আজি কাঁপিছে ধরণী—

বজ্রদন্ত কড়মড়ি ছুটিতেছে ঝড়,
ক্ষুব্ধ সমুদ্রের মতো আঁধার অরণ্য
তরুর তরঙ্গ লয়ে উঠিছে পড়িছে !
তবুও ঝটিকা, তোর বজ্রগীত গেয়ে
ক্ষুদ্র এক বালিকার ক্ষীণ কণ্ঠধ্বনি
পারিলি নে ডুবাইতে ! এখনো শুনি যে !
ওই-যে সে কাঁদিতেছে করুণ স্বরেতে,
নিশীথের বুক ফেটে উঠিছে সে ধ্বনি।
কোথা যাব, কোথা যাব, কোন্ অন্ধকারে—
জগতের কোন্ প্রান্তে, নিশীথের বুকে—
ধরণীর কোন্ ঘোর, ঘোর গর্ভতলে—
এ ধ্বনি কোথায় গেলে পশিবে না কানে !
যাই ছুটে আরো, আরো অরণ্যের মাঝে—
মহাকায় তরুদের জটিলতা-মাঝে
দিগ্‌বিদিক হারাইয়া মগ্ন হয়ে যাই।

চতুর্দশ দৃশ্য

প্রভাত

অরণ্য হইতে ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া

সন্ন্যাসী। যাক, রসাতলে যাক সন্ন্যাসীর ব্রত !

ছুঁড়িয়া ফেলিয়া

দূর করো, ভেঙে ফেলো দণ্ড কমণ্ডলু !
আজ হতে আমি আর নহি রে সন্ন্যাসী !
পাষাণসংকল্পভার দিয়ে বিসর্জন
আনন্দে নিশ্বাস ফেলে বাঁচি একবার।
হে বিশ্ব, হে মহাতরী, চলেছ কোথায়,
আমারে তুলিয়া লও তোমার আশ্রয়ে—
একা আমি সাঁতারিয়া পারিব না যেতে।
কোটি কোটি যাত্রী ওই যেতেছে চলিয়া,
আমিও চলিতে চাই উহাদেরি সাথে।
যে পথে তপন শশী আলো ধ'রে আছে
সে পথ করিয়া তুচ্ছ, সে আলো ত্যজিয়া,
আপনারি ক্ষুদ্র ওই খদ্যোত-আলোকে
কেন অন্ধকারে মরি পথ খুঁজে খুঁজে !
জগৎ, তোমারে ছেড়ে পারি নে যে যেতে,
মহা আকর্ষণে সবে বাঁধা আছি মোরা।

পাখি যবে উড়ে যায় আকাশের পানে
মনে করে 'এনু বুঝি পৃথিবী ত্যজিয়া',
যত ওড়ে— যত ওড়ে— যত ঊর্ধ্বে যায়—
কিছুতে পৃথিবী তবু পারে না ছাড়িতে,
অবশেষে শ্রান্তদেহে নীড়ে ফিরে আসে।

চারি দিকে চাহিয়া

আজি এ জগৎ হেরি কী আনন্দময়!
সবাই আমারে যেন দেখিতে আসিছে।
নদী তরুলতা পাখি হাসিছে প্রভাতে।
উঠিয়াছে লোকজন প্রভাত হেরিয়া,
হাসিমুখে চলিয়াছে আপনার কাজে।
ওই ধান কাটে, ওই করিছে কর্ষণ,
ওই গাভী নিয়ে মাঠে চলেছে গাহিয়া।
ওই-যে পূজার তরে তুলিতেছে ফুল,
ওই নৌকা লয়ে যাত্রী করিতেছে পার।
কেহ বা করিছে স্নান, কেহ তুলে জল,
ছেলেরা ধুলায় বসে খেলা করিতেছে,
সখারা দাঁড়ায়ে পথে কহে কত কথা।

আহা সে অনাথা বালা কোথায় না জানি!
কে তারে আশ্রয় দেবে, কে তারে দেখিবে!
ব্যথিত হৃদয় নিয়ে কার কাছে যাবে,
কে তারে পিতার মতো বুকে নিয়ে তুলে
নয়নের অশ্রুজল দিবে মুছাইয়া!
কী করেছি, কী বলেছি, সব গেছি ভুলে,
বিস্মৃত দুঃস্বপ্ন শুধু চেপে আছে প্রাণে—
একখানি মুখ শুধু মনে পড়িতেছে,
দুটি আঁখি চেয়ে আছে করুণ বিস্ময়ে।
আহা, কাছে যাই তার— বুকে নিয়ে তারে
শুধাই গে কী হয়েছে, কী করেছি আমি!
একটি কুটিরে মোরা রহিব দুজনে,
রামায়ণ হতে তারে শুনাব কাহিনী—
সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বেলে, শাস্ত্রকথা শুনে,
বালিকা কোলেতে মোর পড়িবে ঘুমায়ে।

[প্রস্থান

পঞ্চদশ দৃশ্য

পথে

লোকারণ্য

প্রথম পুরুষ। ওরে, আজ আমাদের রাজপুত্রের বিয়ে।

দ্বিতীয় পুরুষ। তা তো জানি।

তৃতীয় পুরুষ। ছুটে চল্, ছুটে চল্, ছুটে চল্।

চতুর্থ পুরুষ। রাজার বাড়ি নবৎ বসেছে, কিন্তু ভাই আমাদের ডুগ্‌ডুগি না বাজলে আমোদ হয় না। তাই কাল সারা রাত্রি মোধোকে আর হরেকে ডেকে তিন জনে মিলে কেবল ডুগ্‌ডুগি বাজিয়েছি।

স্ত্রীলোক। হাঁ গা, রাজপুত্তুরের বিয়ে হবে, তা মুড়িমুড়কি বিলোনো হবে না?

প্রথম পুরুষ। দূর মাগি, রাজপুত্তুরের বিয়েতে কি মুড়িমুড়কি বিলোনো হয়? গুড়, ছোলা, চিনির পানা—

দ্বিতীয় পুরুষ। না রে না, খুড়ো আমার শহরে থাকে, তার কাছে শুনেছি, দই দিয়ে ছাতু দিয়ে ফলার হবে।

অনেকে। ওরে, তবে আজ আনন্দ করে নে রে, আনন্দ করে নে।

প্রথম পুরুষ। ওরে ও সর্দারের পো, আজ আবার কাজ করতে বসেছিস কেন। ঘর থেকে বেরিয়ে আয়।

দ্বিতীয় পুরুষ। আজ যে-শালা কাজ করবে তার ঘরে আগুন লাগিয়ে দেব।

তৃতীয় পুরুষ। না রে ভাই, বসে বসে মালা গাঁথছি, দরজায় ঝুলিয়ে দিতে হবে।

স্ত্রীলোক। (রুদ্যমান সন্তানের প্রতি) চুপ কর্, কাঁদিস নে, কাঁদিস নে, আজ রাজপুত্তুরের বিয়ে— আজ রাজবাড়িতে যাবি, মুঠো মুঠো চিনি খেতে পাবি।

[কোলাহল করিতে করিতে প্রস্থান

সন্ন্যাসীর প্রবেশ

সন্ন্যাসী। জগতের মুখে আজি এ কী হাস্য হেরি!
আনন্দতরঙ্গ নাচে চন্দ্রসূর্য ঘেরি।
আনন্দহিল্লোল কাঁপে লতায় পাতায়,
আনন্দ উচ্ছ্বসি উঠে পাখির গলায়,
আনন্দ ফুটিয়া পড়ে কুসুমে কুসুমে।

কতকগুলি পথিকের প্রবেশ

প্রথম পথিক। ঠাকুর, প্রণাম হই।
দ্বিতীয় পথিক। প্রভু গো, প্রণাম।
তৃতীয় পথিক। এই ছেলেটিরে মোর আশীর্বাদ করো।
চতুর্থ পথিক। পদধূলি দাও প্রভু, নিয়ে যাই শিরে।
পঞ্চম পথিক। এনেছি চরণে দিতে গুটি-দুই ফুল।
সন্ন্যাসী। কেন এরা সবে মোরে করিছে প্রণাম,
আমি তো সন্ন্যাসী নই। ওঠো ভাই, ওঠো—
এসো ভাই, আজ মোরা করি কোলাকুলি।

আমিও যে একজন তোমাদেরি মতো,
তোমাদেরি গৃহমাঝে নিয়ে যাও মোরে।

জান কি কোথায় আছে মেয়েটি আমার ?
শুধাইতে কেন মোর করিতেছে ভয় !
তার ম্লান মুখ দেখে কেহ কি তোমরা
ডেকে নিয়ে যাও নাই গৃহে তোমাদের !
সে বালিকা কোথাও কি পায় নি আশ্রয় ?

ষোড়শ দৃশ্য

গুহামুখ

ধুলায় পতিত বালিকা

সন্ন্যাসীর দ্রুত প্রবেশ

সন্ন্যাসী। নয়ন-আনন্দ মোর, হৃদয়ের ধন,
স্নেহের প্রতিমা ওগো, মা, আমি এসেছি—
ধুলায় পড়িয়া কেন— ওঠ মা ওঠ মা—
পাষাণেতে মুখখানি রেখেছিস কেন ?
আয় রে বুকের মাঝে— এও তো পাষাণ !
ও মা, এত অভিমান করেছিস কেন !
মুখখানি তুলে দেখ্‌, দুটো কথা ক !
এ কী, এ যে হিম দেহ ! না পড়ে নিশ্বাস—
হৃদয় কেন রে স্তব্ধ, বিবর্ণ মুখখানি !

বাছা, বাছা, কোথা গেলি ! কী করিলি রে—
হায় হায়, এ কী নিদারুণ প্রতিশোধ !

নলিনী

নলিনী।

(নাট্য)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক

প্রণীত।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃব

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৯১।

নলিনী

প্রথম দৃশ্য

অপরাহ্ণ

কানন

নীরদ

গান

পিলু—কাওয়ালি

হা কে ব'লে দেবে
সে ভালোবাসে কি মোরে !
কভু-বা সে হেসে চায়, কভু মুখ ফিরায়ে লয়,
কভু-বা সে লাজে সারা, কভু-বা বিষাদময়ী,
যাব কি কাছে তার শুধাব চরণ ধ'রে !

নলিনী ও বালিকা ফুলির প্রবেশ

নীরদ। (স্বগত) এ রকম সংশয়ে তো আর থাকা যায় না! এমন ক'রে আর কত দিন কাটবে! এত দিন অপেক্ষা ক'রে ব'সে আছি— ওগো, একবার হৃদয়ের দুয়ার খোল, আমাকে এক পাশে একটু আশ্রয় দাও— যে লোক এত দিন ধ'রে প্রত্যাশা ক'রে চেয়ে আছে তাকে কি একটিবার প্রাণের মধ্যে আহ্বান করবে না ? আজকের কাছে গিয়ে একবার জিজ্ঞাসা ক'রে দেখব ! যদি একেবারে বলে— না ! আচ্ছা, তাই বলুক— আমার এ সুখ দুঃখের যা হয় একটা শেষ হয়ে যাক্ ! (কাছে গিয়া) নলিনী !—

নলিনী। ফুলি, ফুলি, তুই ওখেনে ব'সে ব'সে কি করচিস, ফুল তুলতে হবে মনে নেই ! আয়, শীগগির ক'রে আয় ! ও কি করেচিস, কুঁড়িগুলো তুলেচিস কেন— আহা ওগুলি কাল কেমন ফুটত ? চল্ ঐদিকে গোলাপ ফুটেচে যাই। আজ এখনো নবীন এল না কেন ?

ফুলি। তিনি এখনি আসবেন।

নীরদ। আমার কথায় কি একবার কর্ণপাতও করলে না ? আমি মনে করতুম, প্রাণপণ আগ্রহকে কেউ উপেক্ষা করতে পারে না। নলিনীর কি এতটুকুও হৃদয় নেই যে আমার অতখানি আগ্রহকে স্বচ্ছন্দে উপেক্ষা করতে পারলে ? নাঃ— হয়ত ফুল তুলতে অন্যমনস্ক ছিল, আমার কথা শুনতেও পায় নি ! আর একবার জিজ্ঞাসা ক'রে দেখি। নলিনী !—

নলিনী। ফুলি, কাল এই বেলফুলের গাছগুলোতে মেলাই কুঁড়ি দেখেছিলেম, আজ তো আর একটিও দেখচি নে! চল দেখি, ঐদিকে যদি ফুল পাই তো তুলে নিয়ে আসি! (অন্তরালে) দেখ ফুলি,

নীরদ আজ কেন অমন বিষণ্ণ হয়ে আছেন তুই একবার জিজ্ঞাসা ক'রে আয় না ! তুই ওঁর কাছে গিয়ে একটু গান-টান গেয়ে শোনালে উনি ভালো থাকেন। তাই তুই যা, আমি ফুল তুলে নিয়ে যাচ্ছি।

ফুলি। কাকা, তোমার কী হয়েছে !

নীরদ। কী আর হবে ফুলি !

ফুলি। তবে তুমি অমন ক'রে আছ কেন কাকা ?

নীরদ। (কোলে টানিয়া লইয়া) কিছুই হয় নি বাছা !

ফুলি। কাকা, তুমি গান শুনবে ?

নীরদ। না রে, এখন গান শুনতে বড়ো ইচ্ছে করচে না !

ফুলি। তবে তুমি ফুল নেবে ?

নীরদ। আমাকে ফুল কে দেবে ফুলি ?

ফুলি। কেন, নলিনী ঐখেনে ফুল তুলচে, ঐদিকে ঢের ফুটেচে— ঐখেনে চল না কেন ? (নলিনীর কাছে টানিয়া লইয়া গিয়া) কাকাকে কতকগুলি ফুল দাও না ভাই, উনি ফুল চাচ্চেন !

নলিনী। তুই কি চোকে দেখতে পাস নে ? দেখ্ দেখি গাছের তলায় কি ক'রে দিলি ? অমন সুন্দর বকুলগুলি সব মাড়িয়ে দিয়েচিস ! হ্যাঁ হ্যাঁ, ফুলি, আমরা যে সে দিন সেই ঝোপের মধ্যে পাখির বাসায় সেই পাখির ছানাগুলিকে দেখেছিলুম, আজ তাদের চোক ফুটেচে, তারা কেমন পিট্‌পিট্ ক'রে চাচ্চে ! তাদের মা খাবার আনতে গেছে, এই বেলা আয়, আমরা তাদের একটি একটি ক'রে ঘাসের ধান খাওয়াই গে !

ফুলি। কোথায় সে, কোথায় সে, চল না। (উভয়ের দ্রুত গমন)

নলিনী। (কিছু দূর গিয়া ফুলির প্রতি) ঐ যা, তোর কাকাকে ফুল দিয়ে আসতে ভুলে গেচি ! তুই ছুটে যা, এই ফুল দুটি তাঁকে দিয়ে আয় গে। আমার নাম করিস নে যেন !

ফুলি। (নীরদের কাছে আসিয়া) এই নাও কাকা, ফুল এনেছি।

নীরদ। (চুম্বন করিয়া) আমি ভেবেছিলেম আমাকে কেউ ফুল দেবে না। শেষ কালে তোর কাছ থেকে পেলেম !

নলিনী। (দূর হইতে) ফুলি, তুই আবার গেলি কোথায় ? ঝট ক'রে আয় না, বেলা ব'য়ে যায়।

ফুলি। এই যাই। (ছুটিয়া যাওন)

নীরদ। (স্বগত) এ যেন রূপের ঝড়ের মতো, যেখেন দিয়ে বয়ে যায় সেখেনে তোলপাড় ক'রে দেয়। এতটা আমি ভালোবাসি নে ! আমার প্রাণ শ্রান্ত পাখিটির মতো একটি গাছের ছায়া চায়, প্রচ্ছন্ন সুখের কুলায় চায়। আমি তো এত অধীরতা সইতে পারি নে। একটুখানি বিরাম, একটুখানি শান্তি কোথায় পাব ? (নলিনীর কাছে গিয়া) নলিনী, তুমি আমার একটি কথার উত্তর দেবে না ?

নতশিরা নলিনীর স্তব্ধভাবে আঁচলের ফুল-গণনা

কখন তুমি আমার সঙ্গে একটি কথা কও নি— আজ তোমাকে বেশী কিছু বলতে হবে না, একবার কেবল আমার নামটি ধ'রে ডাক, তোমার মুখে একবার কেবল আমার নামটি শোনবার সাধ হয়েছে। আমার এইটুকু সাধও কি মিটবে না? না হয় একবার বলো যে, না! বলো যে, মিটবে না! বলো যে, তোমাকে আমার ভালো লাগে না, তুমি কেন আমার কাছে কাছে ঘুরে বেড়াও ! আমার এই দুর্বল ক্ষীণ আশাটুকুকে আর কত দিন বাঁচিয়ে রাখব ? তোমার একটি কঠিন কথায় তাকে একেবারে বধ ক'রে ফেল, আমার যা হবার হোক।

(নলিনীর আঁচল শিথিল হইয়া ফুলগুলি সব পড়িয়া গেল ও নলিনী মাটিতে বসিয়া ধীরে ধীরে একে একে কুড়াইতে লাগিল।)

নীরদ। তাও বলবে না ! (নিশ্বাস ফেলিয়া দূরে গমন)

ফুলি। (ছুটিয়া নলিনীর কাছে আসিয়া) দেখ'সে, নেবুগাছে একটা মৌচাক দেখতে পেয়েছি !— ও

কি ভাই, তুমি মুখ ঢেকে অমন ক'রে ব'সে আছ কেন ? ও কি তুমি কাঁদচ কেন ভাই ?

নলিনী। (তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া হাসিয়া উঠিয়া) কই, কাঁদচি কই ?

ফুলি। আমি মনে করেছিলুম, তুমি কাঁদচ!

নবীনের প্রবেশ

নলিনী। ঐ যে নবীন এয়েচে, চল্ ওর কাছে যাই! (কাছে আসিয়া) আজ যে তুমি এত দেরি ক'রে এলে ?

নবীন। (হাসিয়া) একটুখানি তিরস্কার পাবার ইচ্ছা হয়েছিল। আমি দেরি ক'রে এলে তোমারও যে দেরি মনে হয় এটা মাঝে মাঝে শুনতে ভালো লাগে

নলিনী। বটে! তিরস্কারের সুখটা একবার দেখিয়ে দেব। দে তো ফুলি, ওর গায়ে একটা কাঁটা ফুটিয়ে দে তো।

নবীন। ও যন্ত্রণাটা ভাই এক রকম সওয়া আছে। ওতে আর বেশী কি হ'ল? ওটা তো আমার দৈনিক পাওনা! যতগুলি কাঁটা এইখেনে ফুটিয়েছ, সবগুলি যত্ন ক'রে প্রাণের ভিতর বিঁধিয়ে রেখেচি— তার একটিও ওপ্‌ড়ায় নি, আর যায়গা কোথায় ?

নলিনী। ও বড্ড কথা কচ্চে ফুলি— দে তো ওকে সেই গানটা শুনিয়ে।

ফুলির গান

পিলু

ও কেন ভালোবাসা জানাতে আসে
ওলো সজনি!
হাসি খেলি রে মনের সুখে,
ও কেন সাথে ফেরে আঁধারমুখে
দিন রজনী!

নবীন। আমারও ভাই একটা গান আছে, কিন্তু গলা নেই। কি দুঃখ! প্রাণের মধ্যে গান আকুল হয়ে উঠেচে, কেবল গলা নেই ব'লে কেউ একদণ্ড মন দিয়ে শুনবে না! কিন্তু গলাটাই কি সব হ'ল! গানটা কি কিছুই নয় ? গানটা শুনতেই হবে।

কালাংড়া

ভালোবাসিলে যদি সে ভালো না বাসে
কেন সে দেখা দিল!
মধু অধরের মধুর হাসি
প্রাণে কেন বরষিল!
দাঁড়িয়েছিলেম পথের ধারে,
সহসা দেখিলেম তারে—
নয়ন দুটি তুলে কেন
মুখের পানে চেয়ে গেল!

নলিনী। আর ভালো লাগচে না। (স্বগত) মিছিমিছি কথা কাটাকাটি ক'রে আর পারি নে। একটু একলা হ'লে বাঁচি। (ফুলির প্রতি) আয় ফুলি, আমরা একটু বেড়িয়ে আসি গে।

[প্রস্থান

নীরদ। এমন প্রশান্ত নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় অমনতর চপলতা কি কিছুমাত্র শোভা পায়! সন্ধ্যার এমন শান্তিময় স্তব্ধতার সঙ্গে ঐ গান বাজনা হাসি তামাসা কি কিছুমাত্র মিশ খায় ? একটু হৃদয় থাকলে কি এমন সময়ে এমনতর চপলতা প্রকাশ করতে পারত ? আমোদ প্রমোদের কি একটুও বিরাম নেই ?

দিনের আলো যখন নিবে এসেচে, পাখিগুলি তাদের নীড়ে তাদের একমাত্র সঙ্গিনীদের কাছে ফিরে এসেছে, দূরে কুঁড়েঘরগুলিতে সন্ধের প্রদীপ জ্বলেচে— তখন কি ঐ চপলার এক মুহূর্তের তরেও আর একটি হৃদয়ের জন্যে প্রাণ কাঁদে না ? এক মুহূর্তের জন্যও কি ইচ্ছে যায় না— এই কোলাহলশূন্য জগতের মধ্যে আর একটি প্রেমপূর্ণ হৃদয় নিয়ে দুজনে স্তব্ধ হয়ে দুজনের পানে চেয়ে থাকি । গভীর শান্তিপূর্ণ সেই সন্ধ্যা-আকাশে দুটিমাত্র স্তব্ধ হৃদয় স্তব্ধ আনন্দে বিরাজ করি । দুটি সন্ধ্যাতারার মতো আলোয় আলোয় কথা হয় ! হায় এ কি কল্পনা ! এ কি দুরাশা !

নবীনের প্রবেশ

নবীন । এ কি ভাই, তুমি যে একলা এখানে ব'সে আছ ? আমাদের সঙ্গে যে যোগ দাও নি ?

নীরদ । এমন মধুর সন্ধে বেলায় কেমন ক'রে যে তুমি ঐ মূর্তিমতী চপলতার সঙ্গে আমোদ ক'রে বেড়াচ্ছিলে আমি তাই ব'সে ভাবছিলুম । সন্ধের কি একটা পবিত্রতা নেই ? ঐ সময়ে হৃদয়হীন চটুলতা দেখলে কি তার সঙ্গে যোগ দিতে ইচ্ছে করে ?

নবীন। তোমরা কবি মানুষ, তোমাদের কথা আমরা ঠিক বুঝতে পারি নে। আমার তো খুব ভালো লাগছিল। আর তোমাদের কবিত্বের চোখেই বা ভালো লাগবে না কেন তাও আমি ঠিক বুঝতে পারি নে! সরলা বালিকা, মনে কোনো চিন্তা নেই, প্রাণের স্ফূর্তিতে সন্ধ্যার কোলে খেলিয়ে বেড়াচ্চে এই বা দেখতে খারাপ লাগবে কেন?

নীরদ । তা ঠিক বলেচ ! (কিছুক্ষণ ভাবিয়া) কিন্তু যার কোনো চিন্তা নেই, সে মন কি মন ? যে হৃদয় আর কোনো হৃদয়ের জন্যে ভাবে না, আপনাকে নিয়েই আপনি সন্তুষ্ট আছে, তাকে কি স্বার্থপর বলব না !

নবীন । তুমি নিজে স্বার্থপর ব'লেই তাকে স্বার্থপর বলচ ! যে হৃদয় তোমার হৃদয়ের জন্যে ভাবে না তার আনন্দ তার হাসি তোমার ভালো লাগে না, এর চেয়ে স্বার্থপরতা আর কি আছে ! আমি তো, ভাই, সে ধাতের লোক নই । সে আমাকে হৃদয় দিক আর নাই দিক আমার তাতে কি আসে যায় ? আমি তার যতটুকু মধুর তা উপভোগ করব না কেন ? তার মিষ্টি হাসি মিষ্টি কথা পেতে আপত্তি কি আছে !

নীরদ । স্বার্থপরতা ? ঠিক কথাই বটে । এত দিনে আমার মনের ভাব ঠিক বুঝতে পারলুম । ঐ সরলা বালা আমোদ ক'রে বেড়াচ্চে তাতে আমার মনে মনে তিরস্কার করবার কি অধিকার আছে । আমি কোথাকার কে ! আমি অনবরত তাকে অপরাধী করি কেন !

নলিনীর প্রবেশ

নলিনী । আমাকে মার্জনা কর ।

নবীন। (তাড়াতাড়ি) আবার ও সব কথা কেন? বড়ো বড়ো হৃদয়ের কথা ব'লে বালিকার সরল মনকে ভারগ্রস্ত করবার দরকার কি ? (হাসিয়া নলিনীর প্রতি) নলিনী, আজ বিদায় হবার আগে একটি ফুল চাই !

নলিনী । বাগানে তো অনেক ফুল ফুটেচে, যত খুশি তুলে নাও না ?

নবীন । ফুলগুলিকে আগে তোমার হাসি দিয়ে হাসিয়ে দাও, তোমার স্পর্শ দিয়ে বাঁচিয়ে দাও ! ফুলের মধ্যে আগে তোমার রূপের ছায়া পড়ুক, তোমার স্মৃতি জড়িয়ে যাক— তার পরে তাকে ঘরে নিয়ে যাব ।

নলিনী । (হাসিয়া) বড্ড তোমার মুখ ফুটেচে দেখচি ! দিনে দুপুরে কবিতা বলতে আরম্ভ করেচ !

নবীন । আমি কি সাধে বলচি ! তুমি যে জোর ক'রে আমাকে কবিতা বলাচ্চ । তোমার ঐ দৃষ্টির পরেশ-পাথরে আমার ভাবগুলি একেবারে সোনাবাঁধানো হয়ে বেরিয়ে আসচে ।

নলিনী। তুমি ও কি হেঁয়ালি বলচ আমি কিছুই বুঝতে পারচি নে।

নীরদ। আমি তো নবীনের মতো এ রকম ক'রে কথা কইতে পারি নে! আর মিছিমিছি এ রকম উত্তর প্রত্যুত্তর ক'রে যে কি সুখ আমি কিছুই তো বুঝতে পারি নে! কিন্তু আমার সুখ হয় না ব'লে কি আর কারও সুখ হবে না? আমি কি কেবল একলা ব'সে ব'সে পরের সুখ দেখে তাদের তিরস্কার করতে থাকব, এই আমার কাজ হয়েচে? যে যাতে সুখী হয় হোক না, আমার তাতে কি? আমার যদি তাতে সুখ না হয়, আমি অন্যত্র চ'লে যাই।

নবীন। (নলিনীর প্রতি) দেখতে দেখতে তোমার হাসিটি মিলিয়ে এল কেন ভাই? কি যেন একটা কালো জিনিষ প্রাণের ভিতর নুকিয়ে রেখেচ, সেটা হাসি দিয়ে ঢেকে রেখেচ, কিন্তু হাসি যে আর থাকে না! আমি তো বলি প্রকাশ করা ভালো! (কোন উত্তর না পাইয়া) তুমি বিরক্ত হয়েচ! না? মনের ভিতর একজন লোক হঠাৎ উঁকি মারতে এল বড়ো ভালো লাগে না বটে! কিন্তু একটু বিরক্ত হ'লে তোমাকে বড়ো সুন্দর দেখায়! সেই জন্যে তোমাকে মাঝে মাঝে কষ্ট দিতে ইচ্ছে করে!

নলিনী। (হাসিয়া) বটে! তোমার যে বড্ড জাঁক হয়েচে দেখচি! তুমি কি মনে কর তুমিও আমাকে বিরক্ত করতে, কষ্ট দিতে পার! সেও অনেক ভাগ্যের কথা! কিন্তু সে ক্ষমতাটুকুও তোমার নেই

নবীন। (সহাস্যে) আমার ভুল হয়েছিল।

নীরদ। নবীনের সঙ্গেই নলিনীর ঠিক মিলেচে! এ আমার জন্যে হয় নি! আমি এদের কিছুই বুঝতে পারি নে! এদের হাসি এদের কথা আমার প্রাণের সঙ্গে কিছুই মেলে না! তবে কেন আমি এদের মধ্যে একজন বেগানা লোকের মতো ব'সে থাকি! আমি পর, আমার এখেনে কোনো অধিকার নেই! এদের অন্তঃপুরের মধ্যে আমি কেন? আমার এখান থেকে যাওয়াই ভালো! আমি চ'লে গেলে কি এদের একটুও কষ্ট হবে না? একবারও কি মনে করবে না, আহা, সে কোথায় গেল? না— না— আমি গেলে হয়ত এরা আরাম বোধ করবে! এখানে আর থাকব না। আজই বিদেশে যাব! এত দিনের পরে আমি ঠিক বুঝতে পেরেচি যে আমিই স্বার্থপর। কিন্তু আর নয়।

ফুলি। (আসিয়া) (নলিনীর প্রতি) মা তোমাদের ডাকতে পাঠালেন।

নলিনী। তবে যাই।

[প্রস্থান

নবীন। আমিও তবে বিদায় হই।

[প্রস্থান

নীরদ। (ফুলিকে ধরিয়া) আয় ফুলি, একবার আমার কোলে আয়! আমার বুকে আয়!

ফুলি। ও কি কাকা, তোমার চোখে জল কেন?

নীরদ। ও থাক্। জল একটু পড়ুক। (কিছুক্ষণ পরে) অন্ধকার হয়ে এল, এখন তবে বাড়ি যা।

ফুলি। তুমি বাড়ি যাবে না কাকা?

নীরদ। না বাছা!

ফুলি। তুমি তবে কোথায় যাবে?

নীরদ। আমি আর এক জায়গায় চল্লেম। নলিনীর সঙ্গে তুই বাড়ি যা!

[প্রস্থান

নলিনী। (আসিয়া) তোর কাকা তোকে কি বলছিলেন ফুলি?

ফুলি। কিছুই না!

নলিনী। আমার কথা কি কিছু বলছিলেন?

ফুলি। না।

নলিনী। আয় বাড়ি আয়।

ফুলি। কিন্তু কাকা কাঁদছিলেন কেন?

নলিনী। কি, তিনি কাঁদছিলেন ?
ফুলি। হাঁ।
নলিনী। কেন কাঁদছিলেন ফুলি ?
ফুলি। আমি তো জানি নে !
নলিনী। তোকে কিছুই বলেন নি ?
ফুলি। না।
নলিনী। কিছুই বলেন নি ?
ফুলি। না।
নলিনী। তবে সেই গানটা গা !

বেহাগড়া— কাওয়ালি

মনে রয়ে গেল মনের কথা—
শুধু চোখের জল, প্রাণের ব্যথা !
মনে করি দুটি কথা বলে যাই,
কেন মুখের পানে চেয়ে চলে যাই,
সে যদি চাহে মরি যে তাহে—
কেন মুদে আসে আঁখির পাতা !
ম্লান মুখে সখি সে যে চলে যায়,
ও তারে ফিরায়ে ডেকে নিয়ে আয়,
বুঝিল না সে যে কেঁদে গেল—
ধুলায় লুটাইল হৃদয়লতা !

[গাইতে গাইতে প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

গৃহ

নবীন। নীরদ বিদেশে যাবার পর থেকে নলিনীর এ কি হ'ল ? সে উল্লাস নেই, সে হাসি নেই। বাগানে তার আর দেখা পাই নে। দিনরাত ঘরের মধ্যেই একলা ব'সে থাকে। নলিনী নীরদকেই বাস্তবিক ভালোবাসত ! এইটে আর আগে বুঝতে পারি নি ! এমনি অন্ধ হয়েছিলেম। নীরদের সমুখে সে যেন নিজের প্রেমের ভারে নিজে ঢাকা পড়ে যেত ! তাকে ঠিক দেখা যেত না। নীরদের সমুখে সে এমনি অভিভূত হয়ে পড়ত যে আমাদের কাছে পেলে সে যেন আশ্রয় পেত, সে যেন আমাদের পাশে আপনাকে আড়াল ক'রে তাড়াতাড়ি আত্মসংবরণ করতে চেষ্টা করত। নীরদের পূর্ণদৃষ্টির সূর্যালোকে পাছে তার প্রাণের সমস্তটা একেবারে দেখা যায় এই ভয়ে সে নীরদের সমুখে অস্থির হয়ে পড়ত ; কি ভুলই করেছি! যাই, তাকে একবার খুঁজে আসি গে। আজ তার সে করুণ মুখখানি দেখলে বড়ো মায়া করে। তার মুখের সেই সরল হাসিখানি যেন নিরাশ্রয় হয়ে আমার চোখের সমুখে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্চে ! আবার কবে সে হাসবে !

[প্রস্থান

নলিনীর গৃহে প্রবেশ ও জানালার কাছে উপবেশন

নলিনী। (স্বগত) আমাকে একবার ব'লেও গেলেন না ? আমি তাঁর কি করেছিলেম ? আমাকে যদি তিনি ভালোবাসতেন তবে কি একবার ব'লে যেতেন না ?

ফুলির প্রবেশ

ফুলি। বাগানে বেড়াতে যাবে না ?

নলিনী। আজকের থাক ফুলি, আর এক দিন যাব।

ফুলি। তোর কী হয়েচে দিদি, তুই অমন ক'রে থাকিস কেন ?

নলিনী। কিছু হয় নি বোন, আমার এই রকমই স্বভাব।

ফুলি। আগে তো তুই অমন ছিলি নে !

নলিনী। কি জানি আমার কি বদল হয়েছে !

ফুলি। আচ্ছা দিদি, কাকাকে আর দেখতে পাই নে কেন ? কাকা কোথায় চ'লে গেছেন ?

নলিনী। (ফুলিকে কোলে লইয়া, কাঁদিয়া উঠিয়া) তুই বল্ না তিনি কোথায় গেছেন ! যাবার সময় তিনি তো কেবল তোকে তো ব'লে গেছেন ! আমাদের কাউকে কিছু ব'লে যান নি !

ফুলি। (অবাক্ হইয়া) কই, আমাকে তো কিছু বলেন নি !

নলিনী। তোকে তিনি বড়ো ভালোবাসতেন। না ফুলি? আমাদের সকলের চেয়ে তোকে তিনি বেশি ভালোবাসতেন!

ফুলি। তুমি কাঁদচ কেন দিদি ? কাকা হয়ত শীগগির ফিরে আসবেন।

নলিনী। শীগগির কি আসবেন ? তুই কি ক'রে জানলি ?

ফুলি। কেনই বা আসবেন না ?

নলিনী। ফুলি, তুই আমার জন্য এক ছড়া মালা গেঁথে নিয়ে আয়গে ! আমি একটু একলা ব'সে থাকি।

ফুলি। আচ্ছা।

[প্রস্থান

নবীনের প্রবেশ

নবীন। নলিনী, তুমি কি সমস্ত দিন এই রকম জানালার কাছে ব'সে ব'সেই কাটাবে ?

নলিনী। আমার আর কাজ কি আছে ? এইখানটিতে ব'সে থাকতে আমার ভালো লাগে।

নবীন। আগেকাব মতো আজ একবার বাগানে বেড়াই গে চল না।

নলিনী। না, বাগানে আর বেড়াব না !

নবীন। নলিনী, কি করলে তোমার মন ভালো থাকে আমাকে বলো। আমার যথাসাধ্য আমি করব।

নলিনী। এইখেনে আমি একটুখানি একলা ব'সে থাকতে চাই। তা হ'লেই আমি ভালো থাকব।

নবীন। আচ্ছা।

[প্রস্থান

এক প্রতিবেশিনীর প্রবেশ

প্র। তোর কি হ'ল বল্ দেখি বোন্‌ঝি, আর যে বড়ো আমাদের ও দিকে যাস নে।

নলিনী। কি বলব মাসী, শরীরটা বড়ো ভালো নেই।

প্র। আহা, তাই তো লো, তোর মুখখানি বড়ো শুকিয়ে গেছে ! চোখের গোড়ায় কালী পড়ে গেছে ! মুখে হাসিটি নেই ! তা, এমন ক'রে ব'সে আছিস কেন লো ! আমার সঙ্গে আয়, দুজনে একবার পাড়ায় বেড়িয়ে আসি গে।

নলিনী। আজকের থাক্ মাসী !

প্র। কেনে লা ! আমার দিদির বাড়ি নতুন বৌ এসেচে, তাকে একবার দেখবি চ।

নলিনী। আর এক দিন দেখব এখন মাসী, আজকের থাক্। আজ আমি বড়ো ভালো নেই।

প্র। আহা, থাক্ তবে। যে শরীর হয়ে গেছে, বাতাসের ভর সয় কি না সয় ! আজ তবে আসি মা, ঘরকন্নার কাজ পড়ে রয়েচে।

[প্রস্থান

ফুলির প্রবেশ

ফুলি। মা বলেচেন, সারাদিন তুমি ঘরে ব'সে আছ, আজ একটিবার আমাদের বাড়িতে চল।

নলিনী। না বোন, আজকের আমি পারব না!

ফুলি। তবে তুমি বাগানে চল। একলা মালা গাঁথতে আমার ভালো লাগচে না। একবারটি চল না বাগানে!

নলিনী। তোর পায়ে পড়ি ফুলি, আমাকে আর বাগানে যেতে বলিস নে, আমাকে একটু একলা থাকতে দে!

ফুলি। আমাদের সেই মাধবীলতাটি শুকিয়ে এসেচে, তাতে একটু জল দিবি নে?

নলিনী। না।

ফুলি। আমাদের সেই পোষ-মানা পাখির ছানাটি আজকের একটু একটু উড়ে বেড়াচ্চে, তাকে একবার দেখতে ইচ্ছে করচে না?

নলিনী। না ফুলি!

ফুলি। তবে আমি যাই, মালা গাঁথি গে, কিন্তু তোকে মালা দেব না!

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

বিদেশ

নীরদ নীরজা

উদ্যান

নীরদ। (স্বগত) এত দিন এলুম, মনে করেছিলুম একখানা চিঠিও পাওয়া যাবে। "কেমন আছ" একবার জিগেস করতেও কি নেই? স্ত্রীলোকের কঠোর হৃদয় কি ভয়ানক দৃশ্য!

নীরজা। (কাজে আসিয়া) এমন ক'রে চুপ ক'বে আছ কেন নীরদ?

নীরদ। আহা, কি সুধাময় স্বর! কে বলে স্ত্রীলোকের প্রাণ কঠিন? মমতাময়ি, এত সুধা তোমাদের প্রাণে কোথায় থাকে? আমি কি চুপ ক'রে আছি! আর থাকব না। বলো কি করতে হবে। এসো, আমরা দুজনে মিলে গান গাই।

নীরজা। না নীরদ, আমার জন্যে তোমাকে কিছু করতে হবে না। তোমাকে বিমর্ষ দেখলে আমার কষ্ট হয় ব'লে যে তুমি প্রফুল্লতার ভান করবে সে আমার পক্ষে দ্বিগুণ কষ্টকর! একবার তোমার দুঃখে আমাকে দুঃখ করতে দাও, মিছে হাসির চেয়ে সে ভালো।

নীরদ। ঠিক বলেছ নীরজা! দিনরাত্রি কি প্রমোদের চপলতা ভালো লাগে? এমন সময় কি আসে না যখন স্তব্ধ হয়ে ব'সে দুটিতে মিলে সন্ধেবেলায় নিরিবিলি দুজনের দুঃখে দুঃখে কোলাকুলি হয়? দুজনের বিষণ্ণ মুখে দুজনে চেয়ে থাকে? দুজনের চোখের জলের মিলন হয়ে হৃদয়ের পবিত্র গঙ্গা যমুনার সঙ্গম হয়? এই লও নীরজা, আমার এই বিষণ্ণ প্রাণ তোমার হাতে দিলেম, একে তোমার ওই অতি কোমল মমতার মধ্যে ঢেকে রাখ, দাও এর চোখের জল মুছিয়ে দাও। তুমি মমতা ক'রেই ভালো থাক, তুমি স্নেহ দিতেই ভালোবাস— দাও, আরো স্নেহ দাও, আরো মমতা কর। আমি চুপ ক'রে তোমার ঐ মধুর করুণা উপভোগ করি।

নীরজা। আমাকে অমন ক'রে তুমি ব'লো না— তোমার কথা শুনে আমার চোখে আরো জল আসে! আমি তোমার কি করতে পারি? আমি কি করলে তোমার একটুও শান্তি হয়? আমার কাছে অমন ক'রে চেয়ো না! আমার কি আছে, কি দেব, কিছু যেন ভেবে পাই নে।

এইখান থেকেই আমাদের ছাড়াছাড়ি হোক। তুমি এক দিকে যাও, আমি এক দিকে যাই। আমাদের সমুখে সংশয়ের সমুদ্র, কি হ'তে পারে কে জানে! আমরা দুজনে মিলে এই সমুদ্রের উপকূল পর্যন্ত এসেছি, আর এক পা এগিয়ে কাজ নেই। এইখানেই এসো আমরা ফিরে যাই, যে যার দেশে চ'লে যাই। দুদিনের জন্যে দেখা হয়েছে, তোমাকে আমি ভালোবেসেছি— কিন্তু তাই ব'লে এই আঁধার সমুদ্রে আমার ভারে তোমাকে ডোবাই কেন?

নীরদ। এ কি অশুভ কথা নীরজা? এ কি অমঙ্গল! কেঁদ না নীরজা! তোমার এ অশ্রুজল আজকের শোভা পায় না নীরজা!

নীরজা। কে জানে ভাই! আমার মনে আজ কেন এমন আশঙ্কা হচ্ছে? আমার প্রাণের ভিতর থেকে যেন কেঁদে উঠছে! আমাকে মাপ কর। ঈশ্বর জানেন আমি নিজের জন্যে কিছুই ভাবছি নে। আমার মনে হচ্ছে এ বিবাহে তুমি সুখী হ'তে পারবে না।

নীরদ। নীরজা, তবে তুমি আজ আমাকে এই অন্ধকারের মধ্যে পরিত্যাগ করতে চাও? তুমি ছাড়া আর কোথাও আমার আশ্রয় নেই— কেউ আমাকে মমতা করে না, কেউ আমাকে তার হৃদয়ের মধ্যে একটুখানি স্থান দেয় না— কেউ আমার মনের ব্যথা শোনে না, আমার প্রাণের কথা বোঝে না, তুমিও আমাকে ছেড়ে চ'লে যাবে? তা হ'লে আমি কোথায় গিয়ে দাঁড়াব?

নীরজা। না না— আমি কি তোমাকে ছেড়ে যেতে পারি? যা হবার তা হবে, আমি তোমার সাথের সাথী রইলেম— ডুবি তো দুজনে মিলে ডুবব। যদি এমন দিন আসে তুমি আমাকে ভালোবাসতে না পার, তোমার সঙ্গে আমার যদি বিচ্ছেদ হয় তো—

নীরদ। ও কি কথা নীরজা? ও কথা মনেও আনতে নেই! দুঃখ এসে যাদের মিলন ক'রে দেয়, চোখের জলের মুক্ত'র মালা যারা বদল করেছে, তাদের সে মিলন পবিত্র— জন্মে জন্মে তাদের আর বিচ্ছেদ হয় না। হাসি খেলার চপলতার মধ্যে আমাদের মিলন হয় নি, আমাদের ভয় কিসের?

নীরজা। নীরদ, দেখি তোমার হাতখানি, তোমাকে একবার স্পর্শ ক'রে দেখি, ভালো ক'রে ধ'রে রাখি, কেউ যেন ছিঁড়ে না নেয়!

নীরদ। এই নাও আমার হাত। আজ থেকে তবে আর আমরা বিচ্ছিন্ন হব না? আজ থেকে তবে সুদীর্ঘ জীবনের পথে আমরা দুজনে মিলে যাত্রা করলেম?

নীরজা। হাঁ প্রিয়তম!

নীরদ। আজ থেকে তবে তুমি আমার বিষাদের সঙ্গিনী হ'লে, অশ্রুজলের সাথী হ'লে?

নীরজা। হাঁ প্রিয়তম!

নীরদ। আমার বিষাদের গোধূলির মধ্যে তুমি সন্ধের তারাটির মতো ফুটে থাকবে। তোমাকে আমি কখনো হারাব না— চোখে চোখে রেখে দেব!

চতুর্থ দৃশ্য

দেশ

নীরদ নীরজা

নীরদ। এই তো আবার সেই দেশে ফিরে এলুম। মনে করি নি আর কখনো ফিরব। তোমাকে যদি না পেতুম তবে আর দেশে ফিরতুম না।

নীরজা। এমন সুন্দর দেশ আমি কোথাও দেখি নি। এ যেন আমার সব স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। এত পাখি, এত শোভা আর কোথায় আছে।

নীরদ। (স্বগত) এই মমতার কিছু অংশও যদি তার থাকত ! এত কাল যে আমি ছায়ার মতো তার কাছে কাছে ছিলুম, আমাকে ভালো নাই বাসুক, একটুকু মায়াও কি আমার উপর জড়ায় নি, যে একখানি চিঠি লিখে আমাকে জিজ্ঞাসা করে তুমি কেমন আছ ? আজও সে তার বাগানে তেমনি ক'রে হেসে খেলে বেড়াচ্ছে ? আমি চ'লে এসেচি ব'লে তার জগতের একটি তিলও শূন্য হয় নি ? কেনই বা হবে ? নিষ্ঠুর মমতাহীন জড়প্রকৃতির এই রকমই তো নিয়ম! আমি চ'লে এসেচি ব'লে কি তার বাগানে একটি বেল ফুলও কম ফুটবে ? একটি পাখিও কম ক'রে গাবে ? কিন্তু তাই ব'লে কি রমণীর প্রাণও সেই রকম ?

নীরজা। নীরদ, তোমার মনের দুঃখ আমার কাছে প্রকাশ ক'রে কি তোমার একটুও শান্তি হয় না। আমাকে কি তুমি ততটুকুও ভালোবাস না ? তবে আজ কেন তুমি আমাকে কিছু বলছ না ? কেন আপনার দুঃখ নিয়ে আপনি ব'সে আছ ?

নীরদ। নীরজা, তুমি কি মনে করচ, আমি নলিনীকে ভালোবেসে কষ্ট পাচ্ছি ? তা মনেও ক'রো না। তাকে আমি ভালোবাসব কি ক'রে ? তাতে আমাতে যে আকাশ পাতাল প্রভেদ।

নীরজা। কিন্তু, কেনই বা তাকে না ভালোবাসবে ? হয়ত সে ভালোবাসবার যোগ্য।

নীরদ। না নীরজা, আমি তাকে ভালোবাসি নে। আমি তোমাকে বার বার ক'রে বলছি, আমি তাকে ভালোবাসি নে। এক কালে ভালোবাসি ব'লে ভ্রম হয়েছিল। কিন্তু সে ভ্রম একেবারে গিয়েছে। কেনই বা আমি তাকে ভালোবাসব ? সে কি আমাকে মমতা করতে পারে ? সে কি আমার প্রাণের কথা বুঝতে পারে ? তার কি হৃদয় আছে ? সে কেবল হাসতেই জানে, সে কি পরের জন্যে কখনো কেঁদেছে ?

নীরজা। কিন্তু সত্যি কথা বলি নীরদ, তোমরা পুরুষ মানুষেরা আমাদের ঠিক বুঝতে পার না। তুমি হয়ত জান না তার প্রাণের মধ্যে কি আছে ! হয়ত সে তোমাকে ভালোবাসে।

নীরদ। তা হবে ! হয়ত তার প্রাণের কথা আমি ঠিক জানি নে। কিন্তু এ প্রতারণায় তার আবশ্যক কি ছিল ? যখন তার মুখে কেবলমাত্র একটি কথা শোনবার জন্য আমার সমস্ত প্রাণের আশা একেবারে উন্মুখ হয়েছিল, তখন সে কেন মুখ ফিরিয়ে অন্যমনস্কের মতো ফুল কুড়োতে লাগল ? আমার কথার কি একটি উত্তরও সে দিতে পারত না ?

নীরজা। কেমন ক'রে দেবে বলো? ক্ষুদ্র বালিকা সে, সে কি ভাষা জানে যে তার প্রাণের সব কথা বলতে পারে ? সে হয়ত ভাবলে, আমার মনের কথা আমি কিছুই ভালো ক'রে বলতে পারব না, সেই জন্যেই তুমি যদি আমার কথা ঠিক না বুঝতে পার, যদি দৈবাৎ আমার একটি কথাও অবিশ্বাস কর, তা হ'লে সে কি যন্ত্রণা ! কি লজ্জা !

নীরদ। কিন্তু আমি কি তার ভাবেও কিছু বুঝতে পারতুম না !

নীরজা। তোমরা পুরুষরা যখন একবার নিজের হৃদয়ের কথা ভাব, তখন পরের হৃদয়ের দিকে একবার চেয়ে দেখতেও পার না। নিজের সুখ দুঃখের সঙ্গে যতটুকু যোগ সেইটুকুই দেখতে পাও, তার সুখ দুঃখ চোখে পড়েও না। সে যে কি ভাবে কথা কয় না, সে যে কি দুঃখে চ'লে যায়, তা তোমরা দেখ না— তোমরা কেবল ভাব আমার সঙ্গে কথা কইলে না, আমার কাছ থেকে চ'লে গেল।

নীরদ। তা হবে ! আমরা স্বার্থপর, সেই জন্যেই আমরা অন্ধ। কিন্তু ও কথা আর কেন ? ও-সব কথা আমি মন থেকে একেবারে তাড়িয়ে দিয়েছি। আর তো আমি তাকে ভালোবাসি নে; ভালোবাসতে পারিও না ! তবে ও কথা থাক্। আর একটা কথা বলা যাক। দেখ নীরজা, যদিও আমাদের বিবাহের দিন কাছে এসেছে, তবু মনে হচ্ছে যেন এখনো কত দিন বাকি আছে : সময় যেন আর কাটছে না !

নীরজা। (নীরদের হাত ধরিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া) নীরদ, আমার চোখে জল আসছে, কিছু মনে ক'রো না। বিবাহের দিন তো কাছে আসছে, এই সময় একবার মনে ক'রে দেখ আমরা কি করছি— কোথায় যাচ্ছি। দেখো ভাই, আমাদের এ বাসরঘর শ্মশানের উপর গড়া নয়ত! তার চেয়ে এসো,

নীরদ। কিন্তু নীরজা, এদেশে কেবল শোভাই আছে, এদেশে হৃদয় নেই।

নীরজা। তা হতেই পারে না। এত সৌন্দর্যের মধ্যে হৃদয় নেই এ কথা আমার বিশ্বাস হয় না।

নীরদ। সৌন্দর্যকে দেখবামাত্রই লোকে তাকে বিশ্বাস ক'রে ফেলে এই জন্যেই তো পৃথিবীতে এত দুঃখ-যন্ত্রণা! সে কথা যাক— নলিনীদের বাড়িতে আজ বসন্ত-উৎসব— আমাদের নিমন্ত্রণ হয়েছে, একটু শীগ্‌গির শীগ্‌গির যেতে হবে।

নীরজা। আমার একটি কথা রাখবে? আমি বলি ভাই, সেখানে আমাদের না যাওয়াই ভালো।

নীরদ। কেন?

নীরজা। কেন, তা জানি নে, কিন্তু কে জানে, আমার মনে হচ্ছে সেখানে আজ না গেলেই ভালো!

নীরদ। নীরজা, তুমি কি আমার ভালোবাসার প্রতি সন্দেহ কর?

নীরজা। প্রিয়তম, এ প্রশ্ন যদি তোমার মনে এসে থাকে— তবে থাক্— তবে আর আমি অধিক কিছু বলব না— তুমি চল!

নীরদ। আমি তো যাওয়াই ভালো বিবেচনা করি! আজ আমার কি গর্বের দিন! তোমাকে সঙ্গে ক'রে যখন নিয়ে যাব, নলিনী দেখবে আমাকে ভালোবাসবারও একজন লোক আছে।

[উভয়ের প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

নলিনীর উদ্যানে বসন্ত-উৎসব

নীরদ নীরজা

নীরদ। আমরা বড়ো সকাল সকাল এসেছি। এখনো একজনও লোক আসে নি।(স্বগত) সেই তো সব তেমনিই রয়েছে! সেই-সব মনে পড়ছে! এই বকুলের তলায় ফুলগুলির উপর সে খেলা ক'রে বেড়াত! সূর্যের আলো তার সঙ্গে সঙ্গে যেন নৃত্য করত! তার হাসিতে গানেতে, তার সেই সরল প্রাণের আনন্দ-হিল্লোলে গাছের কুঁড়িগুলি যেন ফুটে উঠত। আমি কি ঘোর স্বার্থপর! সে হাসি, সে গান আমার কেন ভালো লাগত না! সেই জীবন্ত সৌন্দর্যরাশি আমি কেন উপভোগ করতে পারতুম না। এক দিন মনে আছে সকাল বেলায় ঐ কামিনী গাছের তলায় দাঁড়িয়ে সুকুমার হাতটি বাড়িয়ে সে অন্যমনস্কে কামিনী ফুল তুলছিল, আমি পিছনে গিয়ে দাঁড়াতেই হঠাৎ চমকে উঠে তার আঁচল থেকে ফুলগুলি প'ড়ে গেল, তার সেই চকিত নেত্র তার সেই লজ্জাবনত মুখখানি আমি যেন চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি! আহা, তাকে আর একবার তেমনি ক'রে দেখতে ইচ্ছে করছে! এই পরিচিত গাছপালাগুলির মধ্যে সূর্যালোকে সে তেমনি ক'রে বেড়াক, আমি এইখানে চুপ ক'রে ব'সে ব'সে তাই দেখি! আমি তাকে আর ভালোবাসি নে বটে, কিন্তু তাই ব'লে তার যতটুকু সুন্দর তা আমার ভালো না লাগবে কেন? আহা, সে পুরনো দিনগুলি কোথায় গেল?

নীরজা। এ বাগানটি কি সুন্দর!

নীরদ। তুমি কেবল এর সৌন্দর্য দেখছ— আমি আরো অনেক দেখতে পাচ্ছি। এই বাগানের প্রত্যেক গাছের ছায়ায় প্রত্যেক লতাকুঞ্জে আমার জীবনের এক একটি দিন, এক একটি মুহূর্ত ব'সে রয়েছে! বাগানের চাব দিকে তারা সব ঘিরে রয়েছে! তারা কি আমাকে দেখে আজ চিনতে পারছে? অপরিচিত লোকের মতো আমাকে তারা কি আজ কৌতূহলদৃষ্টিতে চেয়ে দেখছে! এমন এক কাল গিয়েছে, যখন প্রতিদিন আমি এই বাগানে আসতুম, গাছপালাগুলি প্রতিদিন আমার জন্যে যেন অপেক্ষা ক'রে থাকত, আমি এলে আমাকে যেন এসো এসো ব'লে ডাকত। আজ কি তারা আর আমাকে সে রকম ক'রে ডাকছে? তারা হয়ত বলছে, তুমি কে এখেনে এলে?

ও কি নীরজা, তোমার মুখখানি অমন মলিন হয়ে এল কেন ?

নীরজা। প্রিয়তম, তোমার সেই পুরনো দিনগুলির মধ্যে আমি তো একেবারেই ছিলুম না ! এমন এক দিন ছিল যখন তুমি আমাকে একেবারেই জানতে না, একেবারেই আমি তোমার পর ছিলুম— তখন যদি কেউ গল্পচ্ছলে আমার কথা-তোমার কাছে বলত তুমি হয়ত একটিবার মন দিয়ে শুনতে না, যদি কেউ বলত আমি ম'রে গেছি, তোমার চোখে একটি ফোঁটা জল পড়ত না ! এককালে-যে আমি তোমার কেউই ছিলুম না এ মনে করলে কেমন প্রাণে ব্যথা বাজে ! অনন্তকাল হ'তে আমাদের মিলন হয় নি কেন ?

নীরদ। কেন হয় নি নীরজা ? এই মধুর গাছপালাগুলি তোমার স্মৃতির সঙ্গে কেন জড়িয়ে যায় নি ? আর একজনের কথা কেন মনে পড়ে ? আহা, যদি সেই জীবনের প্রভাতকালে তোমার ঐ প্রশান্ত মুখখানি দেখতে পেতেম ! তোমার এই উদার মমতা, গভীর প্রেম, অতলস্পর্শ হৃদয়—

নীরজা। থাক্ থাক্ ও-সব কথা থাক্— ঐ বুঝি সব গ্রামের লোকেরা আসছে! ঐ শোন বাঁশি বেজে উঠেছে ! তবে বুঝি উৎসব আরম্ভ হ'ল ! এখন আর আমাদের এ মলিন মুখ শোভা পায় না ! এসো আমরাও এ উৎসবে যোগ দিই.।

নীরদ। হাঁ চল। একটা গান গাই।

আমার বড়ো ইচ্ছে এখনি একবার নলিনী এসে তোমাকে দেখে! তোমার সঙ্গে তার কতখানি প্রভেদ ! সে গাছের ফুল, আর তুমি গাছের ছায়া ! সে দু দণ্ডের শোভা, আর তুমি চিরকালের আশ্রয়।

নীরজা। দেখ দেখ, ছায়ার মতো শীর্ণ মলিন ও রমণী কে ?

নীরদ। (চমকিয়া) তাই তো, ও কে ?

দূরে নলিনীর প্রবেশ

নীরদ। এ কি নলিনী, না নলিনীর স্বপ্ন ?

নীরজা। (নলিনীর কাছে গিয়া) তুমি কাদের বাছা গা ? আজ এ উৎসবের দিনে তোমার মুখখানি অমন মলিন কেন ?

নলিনী। আমি নলিনী।

নীরজা। (সচকিতে) তোমার নাম নলিনী ?

নলিনী। হাঁ।

নীরজা। (স্বগত) আহা, এর মুখখানি কী হয়ে গেছে ! নলিনী, আমি তোর মনের দুঃখ বুঝেছি ! তাঁকে একবার এর কাছে ডেকে নিয়ে আসি !

ফুলির প্রবেশ

ফুলি। (দ্রুতবেগে আসিয়া) কাকা, কাকা !

নীরদ। (বুকে টানিয়া লইয়া) মা আমার, বাছা আমার !

ফুলি। এত দিন কোথায় ছিলে কাকা ?

নীরদ। সে কথা আর জিজ্ঞাসা করিস নে ফুলি ! আবার আমি তোদের কাছে এসেছি, আর আমি তোদের ছেড়ে কোথাও যাব না !

ফুলি। কাকা, একবার দিদির কাছে চল !

নীরদ। কেন ফুলি ?

ফুলি। একবার দেখ'সে দিদি কী হয়ে গেছে !

নবীনের প্রবেশ

নবীন। এই যে নীরদ, এসেছ ? আমরা সব স্বার্থপর কি অন্ধ হয়েই ছিলেম নীরদ ! একবার নলিনীর কাছে চল।

নীরদ। কেন নবীন!

নবীন। একবার তার সঙ্গে একটি কথা কও'সে! তোমার একটি কথা শোনবার জন্য সে আজ কত দিন ধ'রে অপেক্ষা ক'রে আছে! কত দিন কত মাস ধ'রে জানলার কাছে ব'সে সে পথের পানে চেয়ে আছে, তোমার দেখা পায় নি! তার সে খেলাধুলা কিছুই নেই, একেবারে ছায়ার মতো হয়ে গেছে! কত দিন পরে আজ আবার সে এই বাগানে এয়েছে, কিন্তু তার সেই হাসিটি কোথায় রেখে এল? এ বাগানের মধ্যে তার অমন করুণ ম্লান মুখ কি চোখে দেখা যায়! এই বাগানেই তোমার সঙ্গে তার প্রথম দেখা হয়েছিল, এই বাগানেই বুঝি শেষ দেখা হবে!

তাড়াতাড়ি নলিনীর কাছে আসিয়া

নীরদ। নলিনী!

নলিনী অতি ধীরে ধীরে মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল

নীরদ। নলিনী!

নলিনী। (ধীরে) কি নীরদ!

নীরদ। (নলিনীর হাত ধরিয়া) আর কিছু দিন আগে কেন আমার সঙ্গে কথা কইলে না নলিনী! আর কিছু দিন আগে কেন ঐ সুধামাখা স্বরে আমার নাম ধ'রে ডাক নি! আজ— আজ এই অসময়ে কেন ডাকলে? নলিনী নলিনী—

নলিনীর মূর্ছিত হইয়া পতন

নীরজা। এ কি হ'ল, এ কি হ'ল!

ফুলি। (তাড়াতাড়ি) দিদি— দিদি!— কাকা, দিদির কি হ'ল?

নীরজা: নলিনীর মাথা কোলে রাখিয়া বাতাসকরণ নলিনীর মূর্ছাভঙ্গ

নীরজা। আমি তোর দিদি হই বোন— আর বেশি দিন তোকে দুঃখ পেতে হবে না, আমি তোদের মিলন করিয়ে দেব।

নলিনী। (নীরজার মুখের দিকে চাহিয়া) তুমি কে গা, তুমি কাঁদছ কেন?

নীরজা। আমি তোর দিদি হই বোন!

ষষ্ঠ দৃশ্য

মুমূর্ষু নীরজা। পার্শ্বে নীরদ

নবীন

নীরজা। একবার নলিনীকে ডেকে দাও। বুঝি সময় চ'লে গেল।

[নবীনের প্রস্থান

আমি চল্লেম ভাই— আমার সঙ্গে কেন তোমার দেখা হ'ল? আমি হতভাগিনী কেন তোমাদের মাঝখানে এলেম? প্রিয়তম, আমি যেন চিরকাল তোমার দুঃখের স্মৃতির মতো জেগে না থাকি! আমাকে ভুলে যেয়ো।

নলিনীকে লইয়া নবীনের প্রবেশ

নলিনী, বোন আমার, তোদের আজ মিলন হোক, আমি দেখে যাই। (পরস্পরের হাতে হাত সমর্পণ) (নলিনীকে চুম্বন করিয়া ঈষৎ হাসিয়া) তবে আমি চল্লেম বোন।

নলিনী। (নীরজাকে আলিঙ্গন করিয়া) দিদি তুই আমার আগে চ'লে গেলি? আমিও আর বেশি দিন থাকব না, আমিও শীগগির তোর কাছে যাচ্ছি।

মায়ার খেলা

প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন

সখীসমিতির মহিলাশিল্পমেলায় অভিনীত হইবার উপলক্ষে এই গ্রন্থ উক্ত সমিতি-কর্তৃক মুদ্রিত হইল। ইহাতে সমস্তই কেবল গান, পাঠোপযোগী কবিতা অতি অল্প।

মাননীয়া শ্রীমতী সরলা রায়ের অনুরোধে এই নাট্য রচিত হয় এবং তাঁহাকেই সাদর উপহার-স্বরূপে সমর্পণ করিলাম।

ইহার আখ্যানভাগ কোনো সমাজবিশেষে দেশবিশেষে বদ্ধ নহে। সংগীতের কল্পরাজ্যে সমাজনিয়মের প্রাচীর তুলিবার আবশ্যক বিবেচনা করি নাই। কেবল বিনীত ভাবে ভরসা করি, এই গ্রন্থে সাধারণ মানব-প্রকৃতিবিরুদ্ধ কিছু নাই।

আমার পূর্বরচিত একটি অকিঞ্চিৎকর গদ্যনাটিকার সহিত এ গ্রন্থের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। পাঠকেরা ইহাকে তাহারই সংশোধন-স্বরূপে গ্রহণ করিলে বাধিত হইব।

এই গ্রন্থের তিনটি গান ইতিপূর্বে আমার অন্য কাব্যে প্রকাশিত হইয়াছে।

পাঠক ও দর্শকদিগকে বুঝিতে হইবে যে, মায়াকুমারীগণ এই কাব্যের অন্যান্য পাত্রগণের দৃষ্টি বা শ্রুতি গোচর নহে।

এই নাট্যকাব্যের সংক্ষিপ্ত আখ্যায়িকা পরপৃষ্ঠায় বিবৃত হইল। নতুবা বিচ্ছিন্ন গানের মধ্য হইতে ইহার আখ্যান সংগ্রহ করা সহসা পাঠকদের পক্ষে দুরূহ বোধ হইতে পারে।

প্রথম দৃশ্য

প্রথম দৃশ্যে মায়াকুমারীগণের আবির্ভাব। মায়াকুমারীগণ কুহকশক্তিপ্রভাবে মানব-হৃদয়ে নানাবিধ মায়া সৃজন করে। হাসি, কান্না, মিলন, বিরহ, বাসনা, লজ্জা, প্রেমের মোহ এ-সমস্ত মায়াকুমারীদের ঘটনা। একদিন নব বসন্তের রাত্রে তাহারা স্থির করিল, প্রমোদপুরের যুবক-যুবতীদের নবীন হৃদয়ে নবীন প্রেম রচনা করিয়া তাহারা মায়ার খেলা খেলিবে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

নবযৌবনবিকাশে গ্রন্থের নায়ক অমর সহসা হৃদয়ের মধ্যে এক অপূর্ব আকাঙ্ক্ষা অনুভব করিতেছে। সে উদাসভাবে জগতে আপন মানসী মূর্তির অনুরূপ প্রতিমা খুঁজিতে বাহির হইতেছে। এ দিকে শান্তা আপন প্রাণমন অমরকেই সমর্পণ করিয়াছে। কিন্তু চিরদিন নিতান্ত নিকটে থাকাতে শান্তার প্রতি অমরের প্রেম জন্মিতে অবসর পায় নাই। অমর শান্তার হৃদয়ের ভাব না বুঝিয়া চলিয়া গেল। মায়াকুমারীগণ পরিহাসচ্ছলে গাহিল—

কাছে আছে দেখিতে না পাও,
কাহার সন্ধানে দূরে যাও।

তৃতীয় দৃশ্য

প্রমদার কুমারীহৃদয়ে প্রেমের উন্মেষ হয় নাই। সে কেবল মনের আনন্দে হাসিয়া খেলিয়া বেড়ায়। সখীরা ভালোবাসার কথা বলিলে সে অবিশ্বাস করিয়া উড়াইয়া দেয়। অশোক ও কুমার তাহার নিকটে আপন প্রেম ব্যক্ত করে, কিন্তু সে তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করে না। মায়াকুমারীগণ হাসিয়া বলিল, তোমার এ গর্ব চিরদিন থাকিবে না।—

প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে
কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে।
গরব সব হায় কখন টুটে যায়,
সলিল বহে যায় নয়নে।

চতুর্থ দৃশ্য

অমর পৃথিবী খুঁজিয়া কাহারও সন্ধান পাইল না। অবশেষে প্রমদার ক্রীড়াকাননে আসিয়া দেখিল, প্রমদার প্রেমলাভে অকৃতার্থ হইয়া অশোক আপন মর্মব্যথা পোষণ করিতেছে। অমর বলিল, যদি ভালোবাসিয়া কেবল কষ্টই সার তবে ভালোবাসিবার প্রয়োজন কী? কেন-যে লোকে সাধ করিয়া ভালোবাসে অমর বুঝিতেই পারিল না। এমন সময়ে সখীদের লইয়া প্রমদা কাননে প্রবেশ করিল। প্রমদাকে দেখিয়া অমরের মনে সহসা এক নূতন আনন্দ নূতন প্রাণের সঞ্চার হইল। প্রমদা দেখিল আর-সকলেই তৃষিত ভ্রমরের ন্যায় তাহার চারি দিকে ফিরিতেছে, কেবল অমর একজন অপরিচিত যুবক দূরে দাঁড়াইয়া আছে। সে আকৃষ্টহৃদয়ে সখীদিগকে বলিল, 'উহাকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়া আয় ও কী চায়!' সখীদের প্রশ্নের উত্তরে অমরের

অনতিস্ফুট হৃদয়ের ভাব স্পষ্ট ব্যক্ত হইল না। সখীরা কিছু বুঝিল না। কেবল মায়াকুমারীগণ বুঝিল এবং গাহিল—

প্রেমপাশে ধরা পড়েছে দুজনে
দেখো-দেখো, সখী, চাহিয়া।
দুটি ফুল খসে ভেসে গেল ওই
প্রণয়ের স্রোত বাহিয়া।

পঞ্চম দৃশ্য

অমরের মনে ক্রমে প্রমদার প্রতি প্রেম প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। প্রমদারও হৃদয়ের ব্যাকুলতা বাড়িয়া উঠিল, বাহিরের চঞ্চলতা দূর হইয়া গেল। সখীরা প্রমদার অবস্থা বুঝিতে পারিল। কিন্তু পূর্বদৃশ্যে অমরের অস্পষ্ট উত্তর এবং ভাবগতিক দেখিয়া অমরের প্রতি সখীদের বিশ্বাস নাই। এবং সখীদের নিকট হইতে সখীর হৃদয় হরণ করিয়া লইতেছে জানিয়া অমরের প্রতি হয়তো অলক্ষ্যে তাহাদের ঈষৎ মৃদু বিদ্বেষের ভাবও জন্মিয়াছে। অমর যখন প্রমদার নিকট আপনার প্রেম ব্যক্ত করিল প্রমদা কিছু বলিতে না বলিতে সখীরা তাড়াতাড়ি আসিয়া অমরকে প্রচুর ভর্ৎসনা করিল। সরলহৃদয় অমর প্রকৃত অবস্থা কিছু না বুঝিয়া হতাশ্বাস হইয়া ফিরিয়া গেল। ব্যাকুলহৃদয় প্রমদা লজ্জায় বাধা দিবার অবসর পাইল না। মায়াকুমারীগণ গাহিল—

নিমেষের তরে শরমে বাধিল,
মরমের কথা হল না।
জনমের তরে তাহারি লাগিয়া
রহিল

ষষ্ঠ দৃশ্য

অমরের অসুখী অশান্ত আশ্রয়হীন হৃদয় সহজেই শান্তার প্রতি ফিরিল। এই দীর্ঘ বিরহে এবং অন্য সকলের প্রেম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অমর শান্তার প্রতি নিজের এবং নিজের প্রতি শান্তার অচ্ছেদ্য গূঢ় বন্ধন অনুভব করিবার অবসর পাইল। শান্তার নিকটে আসিয়া আত্মসমর্পণ করিল। এ দিকে প্রমদার সখীরা দেখিল অমর আর ফিরে না, তাহারা প্রত্যাশা করিয়াছিল বাধা পাইয়া অমরের প্রেমানল দ্বিগুণ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে। তাহাতে নিরাশ হইয়া তাহারা নানা কথার ছলে অমরকে আহ্বান করিতে লাগিল— অমর ফিরিল না ; সখীদের ইঙ্গিত বুঝিতেই পারিল না। ভগ্নহৃদয়া প্রমদা অমরের প্রেমের আশা একেবারেই পরিত্যাগ করিল। মায়াকুমারীগণ গাহিল—

বিদায় করেছ যারে নয়নজলে,
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে।

সপ্তম দৃশ্য

শান্তা ও অমরের মিলনোৎসবে পুরনরনারীগণ কাননে সমাগত হইয়া আনন্দ-গান গাহিতেছে। অমর যখন পুষ্পমালা লইয়া শান্তার গলে আরোপণ করিতে যাইতেছে এমন সময় ম্লান ছায়ার ন্যায় প্রমদা কাননে প্রবেশ করিল। সহসা অনপেক্ষিত ভাবে উৎসবের মধ্যে

বিষাদপ্রতিমা প্রমদার নিতান্ত করুণ দীন ভাব অবলোকন করিয়া নিমেষের মতো আত্মবিস্মৃত অমরের হস্ত হইতে পুষ্পমালা খসিয়া পড়িয়া গেল। উভয়ের এই অবস্থা দেখিয়া শান্তা ও আর-সকলের মনে বিশ্বাস হইল যে, অমর ও প্রমদার হৃদয় গোপনে প্রেমের বন্ধনে বাঁধা আছে। তখন শান্তা ও সখীগণ অমর ও প্রমদার মিলনসংঘটনে প্রবৃত্ত হইল। প্রমদা কহিল, 'আর কেন! এখন বেলা গিয়াছে, খেলা ফুরাইয়াছে, এখন আর আমাকে কেন! এখন এ মালা তোমরা পরো, তোমরা সুখে থাকো।' অমর শান্তার প্রতি লক্ষ করিয়া কহিল, 'আমি মায়ার চক্রে পড়িয়া আপনার সুখ নষ্ট করিয়াছি, এখন আমার এই ভগ্ন সুখ এই ম্লান মালা কাহাকে দিব, কে লইবে?' শান্তা ধীরে ধীরে কহিল, 'আমি লইব। তোমার দুঃখের ভার আমি বহন করিব। তোমার সাধের ভুল, প্রেমের মোহ দূর হইয়া জীবনের সুখ-নিশা অবসান হইয়াছে— এই ভুলভাঙা দিবালোকে তোমার মুখের দিকে চাহিয়া আমার হৃদয়ের গভীর প্রশান্ত সুখের কথা তোমাকে শুনাইব।' অমর ও শান্তার এইরূপে মিলন হইল। প্রমদা শূন্য হৃদয় লইয়া কাঁদিয়া চলিয়া গেল। মায়াকুমারীগণ গাহিল—

এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মিলে না,
শুধু সুখ চলে যায়— এমনি মায়ার ছলনা।

মায়ার খেলা

প্রথম দৃশ্য

কানন

মায়াকুমারীগণ

সকলে। মোরা জলে স্থলে কত ছলে মায়াজাল গাঁথি।
প্রথমা। মোরা স্বপন রচনা করি অলস নয়ন ভরি।
দ্বিতীয়া। গোপনে হৃদয়ে পশি কুহক-আসন পাতি।
তৃতীয়া। মোরা মদির তরঙ্গ তুলি বসন্তসমীরে।
প্রথমা। দুরাশা জাগায় প্রাণে-প্রাণে আধো-তানে ভাঙা গানে
ভ্রমরগুঞ্জরাকুল বকুলের পাঁতি।
সকলে। মোরা মায়াজাল গাঁথি।
দ্বিতীয়া। নরনারী-হিয়া মোরা বাঁধি মায়াপাশে।
তৃতীয়া। কত ভুল করে তারা, কত কাঁদে হাসে।
প্রথমা। মায়া করে ছায়া ফেলি মিলনের মাঝে,
আনি মান-অভিমান।
দ্বিতীয়া। বিরহী স্বপনে পায় মিলনের সাথি।
সকলে। মোরা মায়াজাল গাঁথি।
প্রথমা। চলো সখী, চলো।
কুহক-স্বপন-খেলা খেলাবে চলো।
দ্বিতীয়া ও তৃতীয়া। নবীন হৃদয়ে রচি নব প্রেমছল,
প্রমোদে কাটাব নব বসন্তের রাতি।
সকলে। মোরা মায়াজাল গাঁথি।

দ্বিতীয় দৃশ্য

গৃহ

গমনোন্মুখ অমর। শান্তার প্রবেশ

শান্তা। পথহারা তুমি পথিক যেন গো সুখের কাননে,
ওগো যাও, কোথা যাও!
সুখে ঢল ঢল বিবশ বিভল পাগল নয়নে
তুমি চাও, কারে চাও!
কোথা গেছে তব উদাস হৃদয়,
কোথা পড়ে আছে ধরণী!
মায়ার তরণী বাহিয়া যেন গো
মায়াপুরী-পানে ধাও।
কোন্ মায়াপুরী-পানে ধাও!

অমর। জীবনে আজ কি প্রথম এল বসন্ত!
নবীন বাসনাভরে হৃদয় কেমন করে,
নবীন জীবনে হল জীবন্ত।
সুখভরা এ ধরায় মন বাহিরিতে চায়,
কাহারে বসাতে চায় হৃদয়ে!
তাহারে খুঁজিব দিক্-দিগন্ত।

মায়াকুমারীগণের প্রবেশ

সকলে। কাছে আছে দেখিতে না পাও,
তুমি কাহার সন্ধানে দূরে যাও!

শান্তাব প্রতি

অমর। যেমন দখিনে বায়ু ছুটেছে,
কে জানে কোথায় ফুল ফুটেছে।
তেমনি আমিও, সখী, যাব—
না জানি কোথায় দেখা পাব।
কার সুধাস্বর-মাঝে জগতের গীত বাজে—
প্রভাত জাগিছে কার নয়নে!
কাহার প্রাণের প্রেম অনন্ত!
তাহারে খুঁজিব দিক্-দিগন্ত।

[প্রস্থান

মায়াকুমারীগণ। মনের মতো কারে খুঁজে মর,
সে কি আছে ভুবনে, সে তো রয়েছে মনে।
ওগো, মনের মতো সেই তো হবে,
তুমি শুভক্ষণে যাহার পানে চাও।

নেপথ্যে চাহিয়া

শান্তা। আমার পরান যাহা চায়,
তুমি তাই, তুমি তাই গো!
তোমা ছাড়া আর এ জগতে
মোর কেহ নাই কিছু নাই গো!
তুমি সুখ যদি নাহি পাও
যাও সুখের সন্ধানে যাও
আমি তোমারে পেয়েছি হৃদয়মাঝে,
আর কিছু নাহি চাই গো।
আমি তোমার বিরহে রহিব বিলীন,
তোমাতে করিব বাস,
দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী, দীর্ঘ বরষ মাস।
যদি আর কারে ভালোবাস,
যদি আর ফিরে নাহি আস,
তবে তুমি যাহা চাও, তাই যেন পাও,
আমি যত দুখ পাই গো।

নেপথ্যে চাহিয়া

মায়াকুমারীগণ। কাছে আছে দেখিতে না পাও,
তুমি কাহার সন্ধানে দূরে যাও!
প্রথমা। মনের মতো কারে খুঁজে মর,
দ্বিতীয়া। সে কি আছে ভুবনে, সে যে রয়েছে মনে।
তৃতীয়া। ওগো, মনের মতো সেই তো হবে,
তুমি শুভক্ষণে যাহার পানে চাও।
প্রথমা। তোমার আপনার যে জন, দেখিলে না তারে।
দ্বিতীয়া। তুমি যাবে কার দ্বারে!
তৃতীয়া। যারে চাবে তারে পাবে না,
যে মন তোমার আছে যাবে তাও।

তৃতীয় দৃশ্য

কানন

প্রমদার সখীগণ

প্রথমা। সখী, সে গেল কোথায়,
তারে ডেকে নিয়ে আয়।
সকলে। দাঁড়াব ঘিরে তারে তরুতলায়।
প্রথমা। আজি এ মধুর সাঁঝে কাননে ফুলের মাঝে
হেসে হেসে বেড়াবে সে, দেখিব তায়।

দ্বিতীয়া। আকাশে তারা ফুটেছে, দখিনে বাতাস ছুটেছে,
পাখিটি ঘুমঘোরে গেয়ে উঠেছে।
প্রথমা। আয় লো আনন্দময়ী, মধুর বসন্ত লয়ে—
সকলে। লাবণ্য ফুটাবি লো তরুলতায়!

প্রমদার প্রবেশ

প্রমদা। দে লো, সখী, দে পরাইয়ে গলে
সাধের বকুলফুলহার।
আধফুট' জুঁইগুলি যতনে আনিয়া তুলি
গাঁথি গাঁথি সাজায়ে দে মোরে
কবরী ভরিয়ে ফুলভার।
তুলে দে লো চঞ্চল কুন্তল
কপোলে পড়িছে বারেবার।
প্রথমা। আজি এত শোভা কেন, আনন্দে বিবশা যেন!
দ্বিতীয়া। বিম্বাধরে হাসি নাহি ধরে,
লাবণ্য ঝরিয়া পড়ে ধরাতলে!
প্রথমা। সখী, তোরা দেখে যা, দেখে যা—
তরুণ তনু এত রূপরাশি
বহিতে পারে না বুঝি আর!
তৃতীয়া। সখী, বহে গেল বেলা, শুধু হাসিখেলা,
এ কি আর ভালো লাগে!
আকুল তিয়াষ, প্রেমের পিয়াস
প্রাণে কেন নাহি জাগে!
কবে আর হবে থাকিতে জীবন
আঁখিতে আঁখিতে মদির মিলন,
মধুর হুতাশে মধুর দহন
নিত-নব অনুরাগে!
তরল কোমল নয়নের জল
নয়নে উঠিবে ভাসি,
সে বিষাদনীরে নিবে যাবে ধীরে
প্রখর চপল হাসি।
উদাস নিশ্বাস আকুলি উঠিবে,
আশা-নিরাশায় পরান টুটিবে,
মরমের আলো কপোলে ফুটিবে,
শরম-অরুণ-রাগে।
প্রমদা। ওলো, রেখে দে, সখী, রেখে দে,
মিছে কথা ভালোবাসা।
সুখের বেদনা— সোহাগযাতনা—
বুঝিতে পারি না ভাষা!
ফুলের বাঁধন, সাধের কাঁদন,
পরান সঁপিতে প্রাণের সাধন,

লহো লহো বলে পরে আরাধন—
পরের চরণে আশা !
তিলেক দরশ পরশ লাগিয়া
বরষ বরষ কাতরে জাগিয়া
পরের মুখের হাসির লাগিয়া
অশ্রুসাগরে ভাসা—
জীবনের সুখ খুঁজিবারে গিয়া
জীবনের সুখ নাশা ।

মায়াকুমারীগণ । প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে,
কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে !
গরব সব হায় কখন টুটে যায়,
সলিল বহে যায় নয়নে ।

কুমারের প্রবেশ

প্রমদার প্রতি

কুমার । যেয়ো না, যেয়ো না ফিরে—
দাঁড়াও, বারেক দাঁড়াও হৃদয়-আসনে ।
চঞ্চলসমীরসম ফিরিছ কেন
কুসুমে কুসুমে, কাননে কাননে ।
তোমায় ধরিতে চাহি, ধরিতে পারি নে,
তুমি গঠিত যেন স্বপনে ।
এসো হে, তোমারে বারেক দেখি ভরিয়ে আঁখি,
ধরিয়ে রাখি যতনে ।
প্রাণের মাঝে তোমারে ঢাকিব,
ফুলের পাশে বাঁধিয়ে রাখিব,
তুমি দিবস নিশি রহিবে মিশি
কোমল প্রেমশয়নে ।

প্রমদা । কে ডাকে ! আমি কভু ফিরে নাহি চাই ।
কত ফুল ফুটে উঠে, কত ফুল যায় টুটে,
আমি শুধু বহে চলে যাই ।
পরশ পুলকরস-ভরা রেখে যাই, নাহি দিই ধরা ।
উড়ে আসে ফুলবাস, লতাপাতা ফেলে শ্বাস,
বনে বনে উঠে হা-হুতাশ—
চকিতে শুনিতে শুধু পাই,
চলে যাই ।
আমি কভু ফিরে নাহি চাই ।

অশোকের প্রবেশ

অশোক । এসেছি গো এসেছি, মন দিতে এসেছি
যারে ভালো বেসেছি !
ফুলদলে ঢাকি মন যাব রাখি চরণে—

পাছে কঠিন ধরণী পায়ে বাজে।
রেখো রেখো চরণ হৃদিমাঝে।
নাহয় দলে যাবে, প্রাণ ব্যথা পাবে—
আমি তো ভেসেছি, অকূলে ভেসেছি।

প্রমদা। ওকে বলো সখী, বলো, কেন মিছে করে ছল—
মিছে হাসি কেন সখী, মিছে আঁখিজল!
জানি নে প্রেমের ধারা ভয়ে তাই হই সারা,
কে জানে কোথায় সুধা কোথা হলাহল।

সখীগণ। কাঁদিতে জানে না এরা, কাঁদাইতে জানে কল,
মুখের বচন শুনি মিছে কী হইবে ফল!
প্রেম নিয়ে শুধু খেলা, প্রাণ নিয়ে হেলাফেলা,
ফিরে যাই এই বেলা, চলো সখী, চলো!

[প্রস্থান

মায়াকুমারীগণ। প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে,
কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে।
গরব সব হায় কখন টুটে যায়,
সলিল বহে যায় নয়নে।
এ সুখধরণীতে, কেবলি চাহ নিতে—
জান না হবে দিতে আপনা,
সুখের ছায়া ফেলি কখন যাবে চলি,
বরিবে সাধ করি বেদনা।
কখন বাজে বাঁশি, গরব যায় ভাসি—
পরান পড়ে আসি বাঁধনে।

চতুর্থ দৃশ্য

কানন

অমর কুমার ও অশোক

অমর। মিছে ঘুরি এ জগতে কিসের পাকে,
মনের বাসনা যত মনেই থাকে।
বুঝিয়াছি এ নিখিলে, চাহিলে কিছু না মিলে,
এরা, চাহিলে আপন মন গোপনে রাখে।
এত লোক আছে, কেহ কাছে না ডাকে।

অশোক। তারে দেখাতে পারি নে কেন প্রাণ খুলে গো
কেন বুঝাতে পারি নে হৃদয়বেদনা।
কেমনে সে হেসে চলে যায়,
কোন্ প্রাণে ফিরেও না চায়,
এত সাধ এত প্রেম করে অপমান!

এত ব্যথাভরা ভালোবাসা, কেহ দেখে না—
প্রাণে গোপনে রহিল।
এ প্রেম কুসুম যদি হত,
প্রাণ হতে ছিঁড়ে লইতাম,
তার চরণে করিতাম দান—
বুঝি সে তুলে নিত না,
শুকাত অনাদরে,
তবু তার সংশয় হত অবসান।

কুমার। সখা, আপন মন নিয়ে কাঁদিয়ে মরি
পরের মন নিয়ে কী হবে!
আপন মন যদি বুঝিতে নারি
পরের মন বুঝে কে কবে!

অমর। অবোধ মন লয়ে ফিরি ভবে,
বাসনা কাঁদে প্রাণে হা হা রবে—
এ মন দিতে চাও দিয়ে ফেলো
কেন গো নিতে চাও মন তবে।
স্বপনসম সব জানিয়ো মনে,
তোমার কেহ নাই এ ত্রিভুবনে—
যে জন ফিরিতেছে আপন আশে,
তুমি ফিরিছ কেন তাহার পাশে ?
নয়ন মেলি শুধু দেখে যাও,
হৃদয় দিয়ে শুধু শান্তি পাও!

কুমার। তোমারে মুখ তুলে চাহে না যে,
থাক্ সে আপনার গরবে।

অশোক। আমি, জেনে শুনে বিষ করেছি পান,
প্রাণের আশা ছেড়ে সঁপেছি প্রাণ।
যতই দেখি তারে ততই দহি,
আপন মনোজ্বালা নীরবে সহি—
তবু পারি নে দূরে যেতে, মরিতে আসি,
লই গো বুক পেতে অনলবাণ।
যতই হাসি দিয়ে দহন করে
ততই বাড়ে তৃষা প্রেমের তরে,
প্রেম-অমৃতধারা ততই যাচি
যতই করে প্রাণে অশনি দান!

অমর। ভালোবেসে যদি সুখ নাহি তবে কেন,
তবে কেন মিছে ভালোবাসা।

অশোক। মন দিয়ে মন পেতে চাহি।

অমর ও কুমার। ওগো কেন,
ওগো কেন মিছে এ দুরাশা!

অশোক। হৃদয়ে জ্বালায়ে বাসনার শিখা,

নয়নে সাজায়ে মায়ামরীচিকা,
শুধু ঘুরে মরি মরুভূমে।

অমর ও কুমার। ওগো কেন,
ওগো কেন মিছে এ পিপাসা!

অমর। আপনি যে আছে আপনার কাছে,
নিখিল জগতে কী অভাব আছে!
আছে মন্দ সমীরণ, পুষ্পবিভূষণ,
কোকিলকূজিত কুঞ্জ।

অশোক। বিশ্বচরাচর লুপ্ত হয়ে যায়,
এ কী ঘোর প্রেম অন্ধ রাহুপ্রায়
জীবন যৌবন গ্রাসে!

অমর ও কুমার। তবে কেন,
তবে কেন মিছে এ কুয়াশা!

মায়াকুমারীগণ। দেখো চেয়ে, দেখো ওই কে আসিছে!
চাঁদের আলোতে কার হাসি হাসিছে।
হৃদয়দুয়ার খুলিয়ে দাও, প্রাণের মাঝারে তুলিয়ে লও,
ফুলগন্ধ সাথে তার সুবাস ভাসিছে।

প্রমদা ও সখীগণের প্রবেশ

প্রমদা। সুখে আছি সুখে আছি, সখা, আপন মনে।

প্রমদা ও সখীগণ। কিছু চেয়ো না, দূরে যেয়ো না—
শুধু চেয়ে দেখো, শুধু ঘিরে থাকো কাছাকাছি।

প্রমদা। সখা, নয়নে শুধু জানাবে প্রেম, নীরবে দিবে প্রাণ,
রচিয়া ললিত মধুর বাণী আড়ালে গাবে গান।
গোপনে তুলিয়া কুসুম গাঁথিয়া রেখে যাবে মালাগাছি।

প্রমদা ও সখীগণ। মন চেয়ো না, শুধু চেয়ে থাকো,
শুধু ঘিরে থাকো কাছাকাছি।

প্রমদা। মধুর জীবন, মধুর রজনী, মধুর মলয়বায়।
এই মাধুরী-ধারা বহিছে আপনি, কেহ কিছু নাহি চায়।
আমি আপনার মাঝে আপনি হারা, আপন সৌরভে সারা,
যেন আপনার মন আপনার প্রাণ আপনারে সঁপিয়াছি।

অশোক। ভালোবেসে দুখ সেও সুখ, সুখ নাহি আপনাতে।

প্রমদা ও সখীগণ। না না না, সখা, ভুলি নে ছলনাতে।

কুমার। মন দাও দাও দাও, সখী, দাও পরের হাতে।

প্রমদা ও সখীগণ। না না না, মোরা ভুলি নে ছলনাতে।

অশোক। সুখের শিশির নিমেষে শুকায়, সুখ চেয়ে দুখ ভালো—
আনো, সজল বিমল প্রেম ছলছল নলিননয়ন-পাতে।

প্রমদা ও সখীগণ। না না না, মোরা ভুলি নে ছলনাতে।

কুমার। রবির কিরণে ফুটিয়া নলিনী আপনি টুটিয়া যায়,
সুখ পায় তায় সে।
চিরকলিকাজনম কে করে বহন চিরশিশিরবাতে।

প্রমদা ও সখীগণ। না না না, মোরা ভুলি নে ছলনাতে !
অমর। ওই কে গো হেসে চায়, চায় প্রাণের পানে।
গোপনে হৃদয়তলে কী জানি কিসের ছলে
আলোক হানে।
এ প্রাণ নূতন করে কে যেন দেখালে মোরে,
বাজিল মরমবীণা নূতন তানে।
এ পুলক কোথা ছিল, প্রাণ ভরি বিকশিল,
তৃষা-ভরা তৃষা-হরা এ অমৃত কোথা ছিল !
কোন্ চাঁদ হেসে চাহে, কোন্ পাখি গান গাহে,
কোন্ সমীরণ বহে লতাবিতানে।
প্রমদা। দূরে দাঁড়ায়ে আছে, কেন আসে না কাছে !
ওলো যা তোরা, যা সখী, যা শুধা গে
ওই আকুল অধর আঁখি কী ধন যাচে।
সখীগণ। ছি, ওলো ছি, হল কী, ওলো সখী !
প্রথমা। লাজবাঁধ কে ভাঙিল, এত দিনে শরম টুটিল !
তৃতীয়া। কেমনে যাব, কী শুধাব !
প্রথমা। লাজে মরি, কী মনে করে পাছে।
প্রমদা। যা, তোরা যা সখী, যা শুধা গে
ওই আকুল অধর আঁখি কী ধন যাচে।
মায়াকুমারীগণ। প্রেমপাশে ধরা পড়েছে দুজনে
দেখো দেখো সখী, চাহিয়া—
দুটি ফুল খসে ভেসে গেল ওই,
প্রণয়ের স্রোত বাহিয়া।

অমরের প্রতি

সখীগণ। ওগো, দেখি, আঁখি তুলে চাও—
তোমার চোখে কেন ঘুমঘোর
অমব। আমি কী যেন করেছি পান,
কোন্ মদিরা রস-ভোর।
আমার চোখে তাই ঘুমঘোর।
সখীগণ। ছি ছি ছি !
অমর। সখী, ক্ষতি কী !
এ ভবে কেহ জ্ঞানী অতি, কেহ ভোলামন,
কেহ সচেতন, কেহ অচেতন,
কাহারো নয়নে হাসির কিরণ
কাহারো নয়নে লোর।
আমার চোখে শুধু ঘুমঘোর।
সখীগণ। সখা, কেন গো অচলপ্রায়
হেথা, দাঁড়ায়ে তরুছায়।
অমর। অবশ হৃদয়ভারে, চরণ
চলিতে নাহি চায়,
তাই দাঁড়ায়ে তরুছায়।

সখীগণ। ছি ছি ছি !

অমর। সখী, ক্ষতি কী !
এ ভবে কেহ পড়ে থাকে, কেহ চলে যায়,
কেহ বা আলসে চলিতে না চায়,
কেহ বা আপনি স্বাধীন, কাহারো
চরণে পড়েছে ডোর।
কাহারো নয়নে লেগেছে ঘোর।

সখীগণ। ওকে বোঝা গেল না— চলে আয় চলে আয়।
ও কী কথা যে বলে সখী, কী চোখে যে চায় !
চলে আয়, চলে আয়।
লাজ টুটে শেষে মরি লাজে,
মিছে কাজে,
ধরা দিবে না যে, বলো কে পারে তায়।
আপনি সে জানে তার মন কোথায়।
চলে আয়, চলে আয়।

[প্রস্থান

মায়াকুমারীগণ। প্রেমপাশে ধরা পড়েছে দুজনে
দেখো দেখো, সখী, চাহিয়া।
দুটি ফুল খসে ভেসে গেল ওই
প্রণয়ের স্রোত বাহিয়া।
চাঁদিনী যামিনী, মধু সমীরণ,
আধো ঘুমঘোর, আধো জাগরণ,
চোখোচোখি হতে ঘটালে প্রমাদ
কুহুস্বরে পিক গাহিয়া
দেখো দেখো, সখী, চাহিয়া।

পঞ্চম দৃশ্য

কানন

অমর। দিবসরজনী, আমি যেন কার
আশায় আশায় থাকি।
তাই চমকিত মন, চকিত শ্রবণ,
তৃষিত আকুল আঁখি।
চঞ্চল হয়ে ঘুরিয়ে বেড়াই,
সদা মনে হয় যদি দেখা পাই,
'কে আসিছে' ব'লে চমকিয়ে চাই
কাননে ডাকিলে পাখি।
জাগরণে তারে না দেখিতে পাই,

থাকি স্বপনের আশে—
ঘুমেব আড়ালে যদি ধরা দেয়,
বাঁধিব স্বপনপাশে।
এত ভালোবাসি, এত যারে চাই,
মনে হয় না তো সে যে কাছে নাই—
যেন এ বাসনা ব্যাকুল আবেগে
তাহারে আনিবে ডাকি।

প্রমদা সখীগণ অশোক ও কুমারের প্রবেশ

কুমার। সখী, সাধ করে যাহা দেবে তাই লইব
সখীগণ। আহা মরি মরি সাধের ভিখারি,
তুমি মনে মনে চাহ প্রাণমন।
কুমার। দাও যদি ফুল, শিরে তুলে রাখিব।
সখী। দেয় যদি কাঁটা—
কুমার। তাও সহিব।
সখীগণ। আহা মরি মরি সাধেব ভিখারি,
তুমি মনে মনে চাহ প্রাণমন।
কুমাব। যদি একবার চাও, সখী, মধুর নয়ানে
ওই আঁখি-সুধাপানে
চিবজীবন মাতি রহিব।
সখীগণ। যদি কঠিন কটাক্ষ মিলে—
কুমার। তাও হৃদয়ে বিঁধায়ে চিরজীবন বহিব।
সখীগণ। আহা মরি মরি সাধের ভিখাবি,
তুমি মনে মনে চাহ প্রাণমন।
প্রমদা। আমি হৃদয়েব কথা বলিতে ব্যাকুল,
শুধাইল না কেহ।
সে তো এল না, যারে সঁপিলাম
এই প্রাণ মন দেহ।
সে কি মোব তরে পথ চাহে,
সে কি বিবহগীত গাহে,
যার বাঁশরি-ধ্বনি শুনিয়ে
আমি ত্যজিলাম গেহ।
মাযাকুমারীগণ। নিমেষের তরে শরমে বাধিল,
মরমের কথা হল না।
জনমের তরে তাহারি লাগিয়ে
রহিল মরমবেদনা।

প্রমদাব প্রতি

অশোক। ওগো সখী, দেখি দেখি মন কোথা আছে।

সখীগণ। কত কাতর হৃদয় ঘুরে ঘুরে হেরো কারে যাচে।
অশোক। কী মধু, কী সুধা, কী সৌরভ,
কী রূপ রেখেছ লুকায়ে!
সখীগণ। কোন্ প্রভাতে কোন্ রবির আলোকে
দিবে খুলিয়ে কাহার কাছে।
অশোক। সে যদি না আসে এ জীবনে,
এ কাননে পথ না পায়!
সখীগণ। যারা এসেছে তারা বসন্ত ফুরালে
নিরাশ প্রাণে ফেরে পাছে।
প্রমদা। এ তো খেলা নয়, খেলা নয়—
এ যে হৃদয়দহনজ্বালা সখী!
এ যে প্রাণভরা ব্যাকুলতা,
গোপন মনের ব্যথা,
এ যে কাহার চরণোদ্দেশে জীবন মরণ ঢালা।
কে যেন সতত মোরে
ডাকিয়া আকুল করে—
যাই যাই করে প্রাণ, যেতে পারি নে।
যে কথা বলিতে চাহি
তা বুঝি বলিতে নাহি—
কোথায় নামায়ে রাখি, সখী, এ প্রেমের ডালা!
যতনে গাঁথিয়ে শেষে পরাতে পারি নে মালা।
প্রথমা সখী। সে জন কে, সখী, বোঝা গেছে
আমাদের সখী যারে মনপ্রাণ সঁপেছে।
দ্বিতীয়া ও তৃতীয়া। ও সে কে, কে, কে!
প্রথমা। ওই-যে তরুতলে, বিনোদমালা গলে,
না জানি কোন্ ছলে বসে রয়েছে।
দ্বিতীয়া। সখী, কী হবে—
ও কি কাছে আসিবে কভু, কথা কবে?
তৃতীয়া। ও কি প্রেম জানে, ও কি বাঁধন মানে?
ও কী মায়াগুণে মন লয়েছে!
দ্বিতীয়া। বিভল আঁখি তুলে আঁখি-পানে চায়,
যেন পথ ভুলে এল কোথায় ওগো!
তৃতীয়া। যেন কী গানের স্বরে, শ্রবণ আছে ভরে,
যেন কোন্ চাঁদের আলোয় মগ্ন হয়েছে।
অমর। ওই মধুর মুখ জাগে মনে।
ভুলিব না এ জীবনে
কী স্বপনে কী জাগরণে।
তুমি জান বা না জান,
মনে সদা যেন মধুর বাঁশরি বাজে
হৃদয়ে সদা আছ বলে।

আমি প্রকাশিতে পারি নে,
শুধু চাহি কাতর নয়নে।

সখীগণ। তারে কেমনে ধরিবে, সখী, যদি ধরা দিলে।
প্রথমা। তারে কেমনে কাঁদাবে, যদি আপনি কাঁদিলে।
দ্বিতীয়া। যদি মন পেতে চাও, মন রাখো গোপনে।
তৃতীয়া। কে তারে বাঁধিবে, তুমি আপনায় বাঁধিলে!
সকলে। কাছে আসিলে তো কেহ কাছে রহে না।
কথা কহিলে তো কেহ কথা কহে না।
প্রথমা। হাতে পেলে ভূমিতলে ফেলে চলে যায়।
দ্বিতীয়া। হাসিয়ে ফিরায় মুখ কাঁদিয়ে সাধিলে।

নিকটে আসিয়া প্রমদার প্রতি

অমর। সকল হৃদয় দিয়ে ভালো বেসেছি যারে
সে কি ফিরাতে পারে সখী।
সংসারবাহিরে থাকি
জানি নে কী ঘটে সংসারে।
কে জানে, হেথায় প্রাণপণে প্রাণ যারে চায়
তারে পায় কি না পায় জানি নে।
ভয়ে ভয়ে তাই এসেছি গো, অজানা-হৃদয়-দ্বারে।
তোমার সকলি ভালোবাসি—
ওই রূপরাশি,
ওই খেলা, ওই গান, ওই মধুহাসি।
ওই দিয়ে আছ ছেয়ে জীবন আমারি,
কোথায় তোমার সীমা ভুবনমাঝারে!

সখীগণ। তুমি কে গো, সখীরে কেন জানাও বাসনা!
দ্বিতীয়া। কে জানিতে চায়, তুমি ভালোবাস কি ভালোবাস না!
প্রথমা। হাসে চন্দ্র, হাসে সন্ধ্যা, ফুল্ল কুঞ্জকানন,
হাসে হৃদয়বসন্তে বিকচ যৌবন।
তুমি কেন ফেল শ্বাস, তুমি কেন হাস না!
সকলে। এসেছ কি ভেঙে দিতে খেলা—
সখীতে সখীতে এই হৃদয়ের মেলা?
দ্বিতীয়া। আপন দুঃখ আপন ছায়া লয়ে যাও।
প্রথমা। জীবনের আনন্দপথ ছেড়ে দাঁড়াও।
তৃতীয়া। দূর হতে করো পূজা হৃদয়কমল-আসনা।
অমর। তবে সুখে থাকো, সুখে থাকো— আমি যাই— যাই।
প্রমদা। সখী, ওরে ডাকো, মিছে খেলায় কাজ নাই।
সখীগণ। অধীরা হোয়ো না, সখী,
আশ মেটালে ফেরে না কেহ,
আশ রাখিলে ফেরে।
অমর। ছিলাম একেলা সেই আপন ভুবনে,
এসেছি এ কোথায়!

হেথাকার পথ জানি নে, ফিরে যাই।
যদি সেই বিরামভবন ফিরে পাই।

[প্রস্থান

প্রমদা। সখী, ওরে ডাকো ফিরে।
মিছে খেলা মিছে হেলা কাজ নাই।

সখীগণ। অধীরা হোয়ো না, সখী,
আশ মেটালে ফেরে না কেহ,
আশ রাখিলে ফেরে।

[প্রস্থান

মায়াকুমারীগণ। নিমেষের তরে শরমে বাধিল,
মরমের কথা হল না।
জনমের তরে তাহারি লাগিয়ে
রহিল মরমবেদনা।
চোখে চোখে সদা রাখিবারে সাধ,
পলক পড়িল, ঘটিল বিষাদ—
মেলিতে নয়ন মিলাল স্বপন
এমনি প্রেমের ছলনা।

ষষ্ঠ দৃশ্য

গৃহ

শান্তা। অমরের প্রবেশ

অমর। সেই শান্তিভবন ভুবন কোথা গেল!
সেই রবি শশী তারা, সেই শোকশান্ত সন্ধ্যাসমীরণ,
সেই শোভা, সেই ছায়া, সেই স্বপন!
সেই আপন হৃদয়ে আপন বিরাম কোথা গেল,
গৃহহারা হৃদয় লবে কাহার শরণ!

শান্তার প্রতি

এসেছি ফিরিয়ে, জেনেছি তোমারে
এনেছি হৃদয় তব পায়—
শীতল স্নেহসুধা করো দান,
দাও প্রেম, দাও শান্তি, দাও নূতন জীবন।

মায়াকুমারীগণ। কাছে ছিলে দূরে গেলে, দূর হতে এসো কাছে।
ভুবন ভ্রমিলে তুমি, সে এখনো বসে আছে।
ছিল না প্রেমের আলো, চিনিতে পার নি ভালো,
এখন বিরহানলে প্রেমানল জ্বলিয়াছে।

শান্তা। দেখো, সখা, ভুল করে ভালোবেসো না !
আমি ভালোবাসি ব'লে কাছে এসো না।
তুমি যাহে সুখী হও তাই করো সখা,
আমি সুখী হব বলে যেন হেসো না।
আপন বিরহ লয়ে আছি আমি ভালো,
কী হবে চির আঁধারে নিমেষের আলো !
আশা ছেড়ে ভেসে যাই, যা হবার হবে তাই—
আমার অদৃষ্টস্রোতে তুমি ভেসো না।

অমর। ভুল করেছিনু, ভুল ভেঙেছে।
এবার জেগেছি, জেনেছি—
এবার আর ভুল নয়, ভুল নয়।
ফিরেছি মায়ার পিছে পিছে,
জেনেছি স্বপন সব মিছে,
বিঁধেছে বাসনা-কাঁটা প্রাণে—
এ তো ফুল নয়, ফুল নয় !
পাই যদি ভালোবাসা হেলা করিব না,
খেলা করিব না লয়ে মন।
ওই প্রেমময় প্রাণে লইব আশ্রয় সখী,
অতল সাগর এ সংসার,
এ তো কূল নয়, কূল নয় !

প্রমদার সখীগণের প্রবেশ

দূর হইতে

সখীগণ। অলি বার বার ফিরে যায়,
অলি বার বার ফিরে আসে,
তবে তো ফুল বিকাশে।

প্রথমা। কলি ফুটিতে চাহে— ফোটে না,
মরে লাজে, মরে ত্রাসে।
ভুলি মান অপমান, দাও মন প্রাণ,
নিশি দিন রহো পাশে।

দ্বিতীয়া। ওগো, আশা ছেড়ে তবু আশা রেখে দাও।
হৃদয়রতন-আশে।

সকলে। ফিরে এসো, ফিরে এসো, বন মোদিত ফুলবাসে।
আজি বিরহরজনী ফুল্ল কুসুম শিশিরসলিলে ভাসে।

অমর। ওই কে আমায় ফিরে ডাকে !
ফিরে যে এসেছে তারে কে মনে রাখে !

কুমারীগণ। বিদায় করেছ যারে নয়নজলে
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে গো !
আজি মধু সমীরণে নিশীথে কুসুমবনে
তারে কি পড়েছে মনে বকুলতলে ?
এখন ফিরাবে আর কিসের ছলে গো !

অমর। আমি চলে এনু বলে কার বাজে ব্যথা,
কাহার মনের কথা মনেই থাকে!
আমি শুধু বুঝি, সখী, সরল ভাষা—
সরল হৃদয় আর সরল ভালোবাসা।
তোমাদের কত আছে, কত মন প্রাণ—
আমার হৃদয় নিয়ে ফেলো না বিপাকে।

মায়াকুমারীগণ। সেদিনও তো মধুনিশি প্রাণে গিয়েছিল মিশি,
মুকুলিত দশ দিশি কুসুমদলে।
দুটি সোহাগের বাণী যদি হত কানাকানি
যদি ওই মালাখানি পরাতে গলে!
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে গো!

অমরের প্রতি

শান্তা। না বুঝে কারে তুমি ভাসালে আঁখিজলে!
ওগো, কে আছে চাহিয়া শূন্য পথপানে—
কাহার জীবনে নাহি সুখ, কাহার পরান জ্বলে।
পড় নি কাহার নয়নের ভাষা,
বোঝ নি কাহার মরমের আশা,
দেখ নি ফিরে—
কার ব্যাকুল প্রাণের সাধ এসেছ দ'লে।

অমর। আমি কারেও বুঝি নে, শুধু বুঝেছি তোমারে।
তোমাতে পেয়েছি আলো সংশয়-আঁধারে।
ফিরিয়াছি এ ভুবন, পাই নি তো কারো মন,
গিয়েছি তোমারি শুধু মনের মাঝারে।
এ সংসারে কে ফিরাবে, কে লইবে ডাকি,
আজিও বুঝিতে নারি— ভয়ে ভয়ে থাকি।
কেবল তোমারে জানি, বুঝেছি তোমার বাণী—
তোমাতে পেয়েছি কূল অকূল পাথারে।

[প্রস্থান

সখীগণ। প্রভাত হইল নিশি কানন ঘুরে,
বিরহবিধুর হিয়া মরিল ঝুরে।
ম্লান শশী অস্তে গেল, ম্লান হাসি মিলাইল,
কাঁদিয়া উঠিল প্রাণ কাতর সুরে।

প্রমদার প্রবেশ

প্রমদা। চলো সখী, চলো তবে ঘরেতে ফিরে,
যাক ভেসে ম্লান আঁখি নয়ননীরে।
যাক ফেটে শূন্য প্রাণ, হোক আশা অবসান—
হৃদয় যাহারে ডাকে থাক্ সে দূরে।

[প্রস্থান

মায়াকুমারীগণ। মধুনিশি পূর্ণিমার ফিরে আসে বার বার,
সে জন ফেরে না আর যে গেছে চলে।
ছিল তিথি অনুকূল, শুধু নিমেষের ভুল—
চিরদিন তৃষাকুল পরান জ্বলে।
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে গো।

সপ্তম দৃশ্য

কানন

অমর শান্তা অন্যান্য পুরনারী ও পৌরজন

স্ত্রীগণ। এসো এসো, বসন্ত, ধরাতলে।
আনো কুহুতান, প্রেমগান,
আনো গন্ধমদভরে অলস সমীরণ,
আনো নবযৌবনহিল্লোল, নব প্রাণ,
প্রফুল্ল নবীন বাসনা ধরাতলে।

পুরুষগণ। এসো থরথর-কম্পিত মর্মরমুখরিত
নব-পল্লব-পুলকিত
ফুল-আকুল-মালতী-বল্লি-বিতানে,
সুখছায়ে মধুবায়ে এসো এসো।
এসো অরুণচরণ কমলবরণ তরুণ উষার কোলে
এসো জ্যোৎস্নাবিবশ নিশীথে,
কল-কল্লোল তটিনীতীরে,
সুখসুপ্ত সরসীনীরে এসো এসো।

স্ত্রীগণ। এসো যৌবনকাতর হৃদয়ে,
এসো মিলনসুখালস নয়নে,
এসো মধুর শরমমাঝারে,
দাও বাহুতে বাহু বাঁধি,
নবীন কুসুমপাশে রচি দাও নবীন মিলনবাঁধন।

শান্তার প্রতি

অমর। মধুর বসন্ত এসেছে মধুর মিলন ঘটাতে,
মধুর মলয়সমীরে মধুর মিলন রটাতে।
কুহকলেখনী ছুটায়ে কুসুম তুলিছে ফুটায়ে,
লিখিছে প্রণয়কাহিনী বিবিধ বরনছটাতে।
হেরো পুরানো প্রাচীন ধরণী হয়েছে শ্যামলবরনী,
যেন যৌবনপ্রবাহ ছুটেছে কালের শাসন টুটাতে।
পুরানো বিরহ হানিছে, নবীন মিলন আনিছে—
নবীন বসন্ত আইল নবীন জীবন ফুটাতে।

স্ত্রীগণ। আজি আঁখি জুড়াল হেরিয়ে
মনোমোহন মিলনমাধুরী, যুগল মুরতি।
পুরুষগণ। ফুলগন্ধে আকুল করে, বাজে বাঁশরি উদাস স্বরে,
নিকুঞ্জ প্লাবিত চন্দ্রকরে—
স্ত্রীগণ। তারি মাঝে মনোমোহন মিলনমাধুরী, যুগল মুরতি।
আনো আনো ফুলমালা, দাও দোঁহে বাঁধিয়ে।
পুরুষগণ। হৃদয়ে পশিবে ফুলপাশ, অক্ষয় হবে প্রেমবন্ধন।
স্ত্রীগণ। চিরদিন হেরিব হে
মনোমোহন মিলনমাধুরী, যুগল মুরতি।

প্রমদা ও সখীগণের প্রবেশ

অমর। এ কি স্বপ্ন ! এ কি মায়া !
এ কি প্রমদা ! এ কি প্রমদার ছায়া !

প্রমদার প্রতি

শান্তা। আহা, কে গো তুমি মলিনবয়নে
আধ-নিমীলিত নলিননয়নে
যেন আপনারি হৃদয়শয়নে
আপনি রয়েছ লীন।
পুরুষগণ। তোমা-তরে সবে রয়েছে চাহিয়া,
তোমা লাগি পিক উঠিছে গাহিয়া,
ভিখারি সমীর কানন বাহিয়া
ফিরিতেছে সারা দিন।
অমর। এ কি স্বপ্ন ! এ কি মায়া !
এ কি প্রমদা ! এ কি প্রমদার ছায়া !
শান্তা। যেন শরতের মেঘখানি ভেসে
চাঁদের সভাতে দাঁড়ায়েছে এসে,
এখনি মিলাবে ম্লান হাসি হেসে—
কাঁদিয়া পড়িবে ঝরি !
পুরুষগণ। জাগিছে পূর্ণিমা পূর্ণ নীলাম্বরে,
কাননে চামেলি ফুটে থরে থরে,
হাসিটি কখন ফুটিবে অধরে
রয়েছি তিয়াষ ধরি।
অমর। এ কি স্বপ্ন ! এ কি মায়া !
এ কি প্রমদা ! এ কি প্রমদার ছায়া !
সখীগণ। আহা, আজি এ বসন্তে এত ফুল ফুটে,
এত বাঁশি বাজে, এত পাখি গায়,
সখীর হৃদয় কুসুমকোমল—
কার অনাদরে আজি ঝরে যায় !
কেন কাছে আস, কেন মিছে হাস,
কাছে যে আসিত সে তো আসিতে না চায় !

সুখে আছে যারা সুখে থাক্ তারা,
সুখের বসন্ত সুখে হোক্ সারা,
দুখিনী নারীর নয়নের নীর
সুখী জনে যেন দেখিতে না পায়।
তারা দেখেও দেখে না, তারা বুঝেও বোঝে না,
তারা ফিরেও না চায়।

শান্তা। আমি তো বুঝেছি সব— যে বোঝে না বোঝে—
গোপনে হৃদয় দুটি কে কাহারে খোঁজে।
আপনি বিরহ গড়ি আপনি রয়েছ পড়ি,
বাসনা কাঁদিছে বসি হৃদয়সরোজে।
আমি কেন মাঝে থেকে দুজনারে রাখি ঢেকে,
এমন ভ্রমের তলে কেন থাকি মজে।

প্রমদার প্রতি

অশোক। এতদিন বুঝি নাই, বুঝেছি ধীরে—
ভালো যারে বাস তারে আনিব ফিরে।
হৃদয়ে হৃদয় বাঁধা, দেখিতে না পায় আঁধা—
নয়ন রয়েছে ঢাকা নয়ননীরে।

শান্তা ও স্ত্রীগণ। চাঁদ, হাসো, হাসো—
হারা হৃদয় দুটি ফিরে এসেছে।

পুরুষগণ। কত দুখে কত দূরে আঁধার সাগর ঘুরে
সোনার তরণী দুটি তীরে এসেছে।
মিলন দেখিবে বলে ফিরে বায়ু কুতূহলে,
চারি ধারে ফুলগুলি ঘিরে এসেছে।

সকলে। চাঁদ, হাসো, হাসো—
হারা হৃদয় দুটি ফিরে এসেছে।

প্রমদা। আর কেন, আর কেন
দলিত কুসুমে বহে বসন্তসমীরণ।
ফুরায়ে গিয়াছে বেলা, এখন এ মিছে খেলা—
নিশান্তে মলিন দীপ কেন জ্বলে অকারণ!

সখীগণ। অশ্রু যবে ফুরায়েছে তখন মুছাতে এলে,
অশ্রু-ভরা হাসি-ভরা নবীন নয়ন ফেলে!

প্রমদা। এই লও, এই ধরো, এ মালা তোমরা পরো,
এ খেলা তোমরা খেলো— সুখে থাকো অনুক্ষণ।

অমর। এ ভাঙা সুখের মাঝে নয়নজলে,
এ মলিন মালা কে লইবে।
ম্লান আলো ম্লান আশা হৃদয়তলে,
এ চির বিষাদ কে বহিবে।
সুখনিশি অবসান— গেছে হাসি, গেছে গান,
এখন এ ভাঙা প্রাণ লইয়া গলে
নীরব নিরাশা কে সহিবে!

শান্তা। যদি কেহ নাহি চায় আমি লইব,
তোমার সকল দুখ আমি সহিব,
আমার হৃদয় মন সব দিব বিসর্জন—
তোমার হৃদয়ভার আমি বহিব।
ভুল-ভাঙা দিবালোকে চাহিব তোমার চোখে,
প্রশান্ত সুখের কথা আমি কহিব।

[অমর ও শান্তার প্রস্থান

মায়াকুমারীগণ। দুখের মিলন টুটিবার নয়—
নাহি আর ভয়, নাহি সংশয়।
নয়নসলিলে যে হাসি ফুটে গো
রয় তাহা রয় চিরদিন রয়।

প্রমদা। কেন এলি রে, ভালোবাসিলি, ভালোবাসা পেলি নে!
কেন সংসারেতে উঁকি মেরে চলে গেলি নে!

সখীগণ। সংসার কঠিন বড়ো কারেও সে ডাকে না,
কারেও সে ধরে রাখে না।
যে থাকে সে থাকে আর যে যায় সে যায়,
কারো তরে ফিরেও না চায়।

প্রমদা। হায় হায়, এ সংসারে যদি না পুরিল
আজন্মের প্রাণের বাসনা
চলে যাও ম্লান মুখে, ধীরে ধীরে ফিরে যাও,
থেকে যেতে কেহ বলিবে না।
তোমার ব্যথা তোমার অশ্রু তুমি নিয়ে যাবে,
আর তো কেহ অশ্রু ফেলিবে না।

[প্রস্থান

মায়াকুমারীগণ

সকলে। এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মেলে না,
প্রথমা। শুধু সুখ চলে যায়—
দ্বিতীয়া। এমনি মায়ার ছলনা।
তৃতীয়া। এরা ভুলে যায় কারে ছেড়ে কারে চায়।
সকলে। তাই কেঁদে কাটে নিশি, তাই দহে প্রাণ,
তাই মান অভিমান—
প্রথমা। তাই এত হায়-হায়।
দ্বিতীয়া। প্রেমে সুখ দুখ ভুলে তবে সুখ পায়।
সকলে। সখী, চলো, গেল নিশি, স্বপন ফুরাল,
মিছে আর কেন বল।
প্রথমা। শশী ঘুমের কুহক নিয়ে গেল অস্তাচল।
সকলে। সখী চলো।
প্রথমা। প্রেমের কাহিনী-গান হয়ে গেল অবসান।
দ্বিতীয়া। এখন কেহ হাসে, কেহ বসে ফেলে অশ্রুজল।

রাজা ও রানী

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বড়দাদা মহাশয়ের
শ্রীচরণকমলে
এই গ্রন্থ উৎসৃষ্ট হইল

সূচনা

একদিন বড়ো আকারে দেখা দিল একটি নাটক— রাজা ও রানী। এর নাট্যভূমিতে রয়েছে লিরিকের প্লাবন, তাতে নাটককে করেছে দুর্বল। এ হয়েছে কাব্যের জলাজমি। ঐ লিরিকের টানে এর মধ্যে প্রবেশ করেছে ইলা এবং কুমারের উপসর্গ। সেটা অত্যন্ত শোচনীয়রূপে অসংগত। এই নাটকে যথার্থ নাট্যপরিণতি দেখা দিয়েছে যেখানে বিক্রমের দুর্দান্ত প্রেম প্রতিহত হয়ে পরিণত হয়েছে দুর্দান্ত হিংস্রতায়, আত্মঘাতী প্রেম হয়ে উঠেছে বিশ্বঘাতী।

প্রকৃতির প্রতিশোধের সঙ্গে 'রাজা ও রানী'র এক জায়গায় মিল আছে। অসীমের সন্ধানে সন্ন্যাসী বাস্তব হতে ভ্রষ্ট হয়ে সত্য হতে ভ্রষ্ট হয়েছে, বিক্রম তেমনি প্রেমে বাস্তবের সীমাকে লঙ্ঘন করতে গিয়ে সত্যকে হারিয়েছে। এই তত্ত্বকেই যে সজ্ঞানে লক্ষ্য করে লেখা হয়েছে তা নয়। এর মধ্যে এই কথাটাই প্রকাশ পাবার জন্যে স্বত উদ্যত হয়েছে যে, সংসারের জমি থেকে প্রেমকে উৎপাটিত করে আনলে সে আপনার রস আপনি জোগাতে পারে না, তার মধ্যে বিকৃতি ঘটতে থাকে।--

এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম
প্রেম মেলে না।
শুধু সুখ চলে যায়
এমনি মায়ার ছলনা।

শান্তিনিকেতন
২৮।১।৪০

নাটকের পাত্রগণ

বিক্রমদেব	জালন্ধরের রাজা
দেবদত্ত	রাজার বাল্যসখা ব্রাহ্মণ
ত্রিবেদী	বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ
জয়সেন, যুধাজিৎ	রাজ্যের প্রধান নায়ক
মিহিরগুপ্ত	জয়সেনের অমাত্য
চন্দ্রসেন	কাশ্মীরের রাজা
কুমার	কাশ্মীরের যুবরাজ। চন্দ্রসেনের ভ্রাতুষ্পুত্র
শংকর	কুমারের পুরাতন বৃদ্ধ ভৃত্য
অমরুরাজ	ত্রিচূড়ের রাজা
সুমিত্রা	জালন্ধরের মহিষী। কুমারের ভগিনী
নারায়ণী	দেবদত্তের স্ত্রী
রেবতী	চন্দ্রসেনের মহিষী
ইলা	অমরুর কন্যা। কুমারের সহিত বিবাহপণে বদ্ধ

রাজা ও রানী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

জালন্ধর

প্রাসাদের এক কক্ষ

বিক্রমদেব ও দেবদত্ত

দেবদত্ত। মহারাজ, এ কী উপদ্রব!

বিক্রমদেব। হয়েছে কী!

দেবদত্ত। আমাকে বরিবে নাকি পুরোহিতপদে?
কী দোষ করেছি প্রভো? কবে শুনিয়াছ
ত্রিষ্টুভ্ অনুষ্টুভ্ এই পাপমুখে?
তোমার সংসর্গে পড়ে ভুলে বসে আছি
যত যাগযজ্ঞবিধি। আমি পুরোহিত?
শ্রুতিস্মৃতি ঢালিয়াছি বিস্মৃতির জলে।
এক বই পিতা নয় তাঁরি নাম ভুলি,
দেবতা তেত্রিশ কোটি গড় করি সবে।
স্কন্ধে ঝুলে পড়ে আছে শুধু পৈতেখানা
তেজোহীন ব্রহ্মণ্যের নির্বিষ খোলস।

বিক্রমদেব। তাই তো নির্ভয়ে আমি দিয়েছি তোমারে
পৌরোহিত্যভার। শাস্ত্র নাই, মন্ত্র নাই,
নাই কোনো ব্রহ্মণ্য-বালাই।

দেবদত্ত। তুমি চাও
নখদন্তভাঙা এক পোষা পুরোহিত!

বিক্রমদেব। পুরোহিত, একেকটা ব্রহ্মদৈত্য যেন।
একে তো আহার করে রাজস্কন্ধে চেপে
সুখে বারো মাস, তার পরে দিন রাত
অনুষ্ঠান, উপদ্রব, নিষেধ, বিধান,
অনুযোগ, অনুস্বর-বিসর্গের ঘটা—
দক্ষিণায়-পূর্ণ হস্তে শূন্য আশীর্বাদ।

দেবদত্ত। শাস্ত্রহীন ব্রাহ্মণের প্রয়োজন যদি
আছেন ত্রিবেদী— অতিশয় সাধুলোক,
সর্বদাই রয়েছেন জপমালা হাতে
ক্রিয়াকর্ম নিয়ে; শুধু মন্ত্র-উচ্চারণে
লেশমাত্র নাই তাঁর ক্রিয়াকর্মজ্ঞান।

বিক্রমদেব। অতি ভয়ানক। সখা, শাস্ত্র নাই যার
শাস্ত্রের উপদ্রব তার চতুর্গুণ।
নাই যার বেদবিদ্যা, ব্যাকরণবিধি,
নাই তার বাধাবিঘ্ন— শুধু বুলি ছোটে
পশ্চাতে ফেলিয়া রেখে তদ্ধিতপ্রত্যয়
অমর-পাণিনি। একসঙ্গে নাহি সয়
রাজা আর ব্যাকরণ দোঁহারে পীড়ন।

দেবদত্ত। আমি পুরোহিত! মহারাজ, এ সংবাদে
ঘন আন্দোলিত হবে কেশলেশহীন
যতেক চিক্কণ মাথা; অমঙ্গল স্মরি
রাজ্যের টিকি যত হবে কণ্টকিত।

বিক্রমদেব। কেন অমঙ্গলশঙ্কা?

দেবদত্ত। কর্মকাণ্ডহীন
এ দীন বিপ্রের দোষে কুলদেবতার
রোষহুতাশন—

বিক্রমদেব। রেখে দাও বিভীষিকা।
কুলদেবতার রোষ নতশির পাতি
সহিতে প্রস্তুত আছি; সহে না কেবল
কুলপুরোহিত-আস্ফালন। জান সখা,
দীপ্ত সূর্য সহ্য হয় তপ্ত বালি চেয়ে।
দূর করো মিছে তর্ক যত। এসো, করি
কাব্য-আলোচনা। কাল বলেছিলে তুমি
পুরাতন কবিবাক্য 'নাহিকো বিশ্বাস
রমণীরে'— আর-বার বলো শুনি।

দেবদত্ত। শাস্ত্রং—

বিক্রমদেব। রক্ষা করো— ছেড়ে দাও অনুস্বরগুলো।

দেবদত্ত। অনুস্বর ধনুঃশর নহে, মহারাজ,
কেবল টংকারমাত্র। হে বীরপুরুষ,
ভয় নাই। ভালো, আমি ভাষায় বলিব।—
'যত চিন্তা কর শাস্ত্র চিন্তা আরো বাড়ে,
যত পূজা কর ভূপে ভয় নাহি ছাড়ে।
কোলে থাকিলেও নারী রেখো সাবধানে।
শাস্ত্র, নৃপ, নারী কভু বশ নাহি মানে।'

বিক্রমদেব। বশ নাহি মানে! ধিক্ স্পর্ধা, কবি, তব!
চাহে কে করিতে বশ? বিদ্রোহী সে জন।
বশ করিবার নহে নৃপতি, রমণী।

দেবদত্ত। তা বটে। পুরুষ রবে রমণীর বশে।

বিক্রমদেব। রমণীর হৃদয়ের রহস্য কে জানে?
বিধির বিধান-সম অজ্ঞেয়— তা বলে
অবিশ্বাস জন্মে যদি বিধির বিধানে,

রমণীর প্রেমে— আশ্রয় কোথায় পাবে ?
নদী ধায়, বায়ু বহে কেমনে কে জানে ।
সেই নদী দেশের কল্যাণপ্রবাহিণী,
সেই বায়ু জীবের জীবন ।

দেবদত্ত । বন্যা আনে
সেই নদী, সেই বায়ু ঝঞ্ঝা নিয়ে আসে ।

বিক্রমদেব । প্রাণ দেয়, মৃত্যু দেয়— লই শিরে তুলি ।
তাই বলে কোন্ মূর্খ চাহে তাহাদের
বশ করিবারে ! বদ্ধনদী বদ্ধবায়ু
রোগ-শোক-মৃত্যুর নিদান । হে ব্রাহ্মণ,
নারীর কী জান তুমি ?

দেবদত্ত । কিছু না রাজন্ !
ছিলাম উজ্জ্বল করে পিতৃমাতৃকুল
ভদ্র ব্রাহ্মণের ছেলে । তিন সন্ধ্যা ছিল
আহ্নিক তর্পণ । শেষে তোমারি সংসর্গে
বিসর্জন করিয়াছি সকল দেবতা,
কেবল অনঙ্গদেব রয়েছেন বাকি ।
ভুলেছি মহিম্নস্তব, শিখেছি গাহিতে
নারীর মহিমা । সে বিদ্যাও পুঁথিগত—
তার পরে মাঝে মাঝে চক্ষু রাঙাইলে
সে বিদ্যাও ছুটে যায় স্বপ্নের মতন ।

বিক্রমদেব । না না, ভয় নাই, সখা, মৌন রহিলাম—
তোমার নূতন বিদ্যা বলে যাও তুমি ।

দেবদত্ত । শুন তবে— বলিছেন কবি ভর্তৃহরি—
'নারীর বচনে মধু, হৃদয়েতে হলাহল,
অধরে পিয়ায় সুধা, চিত্তে জ্বালে দাবানল ।'

বিক্রমদেব । সেই পুরাতন কথা !

দেবদত্ত । সত্য পুরাতন ।
কী করিব মহারাজ, যত পুঁথি খুলি
ওই এক কথা । যত প্রাচীন পণ্ডিত
প্রেয়সীরে ঘরে নিয়ে এক দণ্ড কভু
ছিল না সুস্থির । আমি শুধু ভাবি, যার
ঘরের ব্রাহ্মণী ফিরে পরের সন্ধানে
সে কেমনে কাব্য লেখে ছন্দ গেঁথে গেঁথে
পরম নিশ্চিন্ত মনে ?

বিক্রমদেব । মিথ্যা অবিশ্বাস ।
ও কেবল ইচ্ছাকৃত আত্মপ্রবঞ্চনা ।
ক্ষুদ্র হৃদয়ের প্রেম নিতান্ত বিশ্বাসে
হয়ে আসে মৃত জড়বৎ, তাই তারে
জাগায়ে তুলিতে হয় মিথ্যা অবিশ্বাসে ।

হেরো ওই আসিছেন মন্ত্রী, স্তূপাকার
রাজ্যভার স্কন্ধে নিয়ে। পলায়ন করি।

দেবদত্ত। রানীর রাজত্বে তুমি লও গে আশ্রয়।
ধাও অন্তঃপুরে। অসম্পূর্ণ রাজকার্য
দুয়ার-বাহিরে পড়ে থাক্, স্ফীত হোক
যত যায় দিন। তোমার দুয়ার ছাড়ি
ক্রমে উঠিবে সে ঊর্ধ্বদিকে, দেবতার
বিচার-আসন-পানে।

বিক্রমদেব। এ কি উপদেশ?

দেবদত্ত। না রাজন্, প্রলাপবচন। যাও তুমি,
কাল নষ্ট হয়।

[বিক্রমদেবের প্রস্থান

মন্ত্রীর প্রবেশ

মন্ত্রী। ছিলেন না মহারাজ?

দেবদত্ত। করেছেন অন্তর্ধান অন্তঃপুর-পানে।

বসিয়া পড়িয়া

মন্ত্রী। হা বিধাতঃ, এ রাজ্যের কী দশা করিলে!
কোথা রাজা, কোথা দণ্ড, কোথা সিংহাসন!
শ্মশানভূমির মতো বিষণ্ণ বিশাল
রাজ্যের বক্ষের 'পরে সগর্বে দাঁড়ায়ে
বধির পাষাণ রুদ্ধ অন্ধ অন্তঃপুর।
রাজশ্রী দুয়ারে বসি অনাথার বেশে
কাঁদে হাহাকার-রবে।

দেবদত্ত। দেখে হাসি আসে।
রাজা করে পলায়ন, রাজ্য ধায় পিছে—
হল ভালো, মন্ত্রিবর, অহর্নিশি যেন
রাজ্য ও রাজায় মিলে লুকোচুরি খেলা।

মন্ত্রী। এ কি হাসিবার কথা ব্রাহ্মণঠাকুর?

দেবদত্ত। না হাসিয়া করিব কী? অরণ্যে ক্রন্দন
সে তো বালকের কাজ। দিবসরজনী
বিলাপ না হয় সহ্য, তাই মাঝে মাঝে
রোদনের পরিবর্তে শুষ্ক শ্বেত হাসি
জমাট অশ্রুর মতো তুষারকঠিন।
কী ঘটেছে বলো শুনি।

মন্ত্রী। জান তো সকলি।
রানীর কুটুম্ব যত বিদেশী কাশ্মীরী
দেশ জুড়ে বসিয়াছে। রাজার প্রতাপ
ভাগ করে লইয়াছে খণ্ড খণ্ড করি,
বিষ্ণুচক্রে ছিন্ন মৃত সতীদেহ-সম।

বিদেশীর অত্যাচারে জর্জর কাতর
কাঁদে প্রজা। অরাজক রাজসভামাঝে
মিলায় ক্রন্দন। বিদেশী অমাত্য যত
বসে বসে হাসে। শূন্যসিংহাসন-পার্শ্বে
বিদীর্ণহৃদয় মন্ত্রী বসি নতশিরে।

দেবদত্ত। বহে ঝড়, ডোবে তরী, কাঁদে যাত্রী যত,
রিক্তহস্ত কর্ণধার উচ্চে একা বসি
বলে 'কর্ণ কোথা গেল !' মিছে খুঁজে মর,
রমণী নিয়েছে টেনে রাজকর্ণখানা,
বাহিছে প্রেমের তরী লীলাসরোবরে
বসন্তপবনে। রাজ্যের বোঝাই নিয়ে
মন্ত্রীটা মরুক ডুবে অকূল পাথারে।

মন্ত্রী। হেসো না ঠাকুর ! ছি ছি, শোকের সময়ে
হাসি অকল্যাণ।

দেবদত্ত। আমি বলি মন্ত্রিবর,
রাজারে ডিঙায়ে, একেবারে পড়ো গিয়ে
রানীর চরণে।

মন্ত্রী। আমি পারিব না তাহা।
আপন আত্মীয়জনে করিবে বিচার
রমণী, এমন কথা শুনি নাই কভু।

দেবদত্ত। শুধু শাস্ত্র জান মন্ত্রী, চেন না মানুষ।
বরঞ্চ আপন জনে আপনার হাতে
দণ্ড দিতে পারে নারী, পারে না সহিতে
পরের বিচার।

মন্ত্রী। ওই শোনো কোলাহল।

দেবদত্ত। এ কি প্রজার বিদ্রোহ ?

মন্ত্রী। চলো দেখে আসি।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজপথ

লোকারণ্য

কিনু নাপিত। ওরে ভাই, কান্নার দিন নয়। অনেক কেঁদেছি, তাতে কিছু হল কি ?

মনসুখ চাষা। ঠিক বলেছিস রে, সাহসে সব কাজ হয়— ঐ-যে কথায় বলে 'আছে যার বুকের পাটা যমরাজকে সে দেখায় ঝাঁটা।'

কুঞ্জরলাল কামার। ভিক্ষে করে কিছু হবে না, আমরা লুঠ করব।

কিনু নাপিত। ভিক্ষেং নৈম নৈমচং। কী বল খুড়ো, তুমি তো স্মার্ত ব্রাহ্মণের ছেলে, লুঠপাটে দোষ আছে কি ?

নন্দলাল। কিছু না, খিদের কাছে পাপ নেই রে বাবা! জানিস তো অগ্নিকে বলে পাবক, অগ্নিতে সকল পাপ নষ্ট করে। জঠরাগ্নির বাড়া তো আর অগ্নি নেই।

অনেকে। আগুন। তা ঠিক বলেছ। বেঁচে থাকো ঠাকুর! তবে তাই হবে। তা, আমরা আগুনই লাগিয়ে দেব। ওরে, আগুনে পাপ নেই রে। এবার ওঁদের বড়ো বড়ো ভিটেতে ঘুঘু চরাব।

কুঞ্জর। আমার তিনটে সড়কি আছে।

মন্‌সুখ। আমার একগাছা লাঙল আছে, এবার তাজ-পরা মাথাগুলো মাটির ঢেলার মতো চষে ফেলব।

শ্রীহর কলু। আমার একগাছ বড়ো কুড়ুল আছে, কিন্তু পালাবার সময় সেটা বাড়িতে ফেলে এসেছি।

হরিদীন কুমোর। ওরে, তোরা মরতে বসেছিস না কি? বলিস কী রে! আগে রাজাকে জানা, তার পরে যদি না শোনে তখন অন্য পরামর্শ হবে।

কিনু নাপিত। আমিও তো সেই কথা বলি।

কুঞ্জর। আমিও তো তাই ঠাওরাচ্ছি।

শ্রীহর। আমি ববাবর বলে আসছি, ঐ কায়স্থর পো'কে বলতে দাও। আচ্ছা, দাদা, তুমি রাজাকে ভয় করবে না?

মন্নুরাম কায়স্থ। ভয় আমি কাউকে করি নে। তোরা লুঠ করতে যাচ্ছিস, আর আমি দুটো কথা বলতে পারি নে?

মন্‌সুখ। দাঙ্গা করা এক, আর কথা বলা এক। এই তো বরাবর দেখে আসছি— হাত চলে, কিন্তু মুখ চলে না।

কিনু। মুখের কোনো কাজটাই হয় না— অন্নও জোটে না, কথাও ফোটে না।

কুঞ্জর। আচ্ছা, তুমি কী বলবে বলো।

মন্নুরাম। আমি ভয় করে বলব না, আমি প্রথমেই শাস্ত্র বলব।

শ্রীহর। বল কী! তোমার শাস্তর জানা আছে? আমি তো তাই গোড়াগুড়িই বলছিলুম কায়স্থর পো'কে বলতে দাও— ও জানে-শোনে।

মন্নুরাম। আমি প্রথমেই বলব—

অতিদর্পে হতা লঙ্কা, অতিমানে চ কৌরবঃ।
অতিদানে বলির্বদ্ধঃ সর্বমত্যন্তগর্হিতম ॥

হরিদীন। হাঁ, এ শাস্ত্র বটে।

কিনু। (ব্রাহ্মণের প্রতি) কেমন খুড়ো, তুমি তো ব্রাহ্মণের ছেলে, এ শাস্ত্র কি না? তুমি তো এ সমস্তই বোঝ।

নন্দ। হাঁ— তা— ইয়ে— ওর নাম কী— তা বুঝি বৈকি। কিন্তু রাজা যদি না বোঝে, তুমি কী করে বুঝিয়ে দেবে বলো তো শুনি।

মন্নুরাম। অর্থাৎ, বাড়াবাড়িটে কিছু নয়।

জওহর তাঁতি। ঐ অতবড়ো কথাটার এইটুকু মানে হল?

শ্রীহর। তা না হলে আর শাস্তর কিসের?

নন্দ। চাষাভুষোর মুখে যে কথাটা ছোট্ট বড়োলোকের মুখে সেইটেই কত বড়ো শোনায়।

মন্‌সুখ। কিন্তু কথাটা ভালো, 'বাড়াবাড়ি কিছু নয়' শুনে রাজার চোখ ফুটবে।

জওহর। কিন্তু ঐ একটাতে হবে না, আরো শাস্তর চাই।

মন্নুরাম। তা আমার পুঁজি আছে, আমি বলব—

লালনে বহবো দোষাস্তাড়নে বহবো গুণাঃ।
তস্মাৎ মিত্রঞ্চ পুত্রঞ্চ তাড়য়েৎ ন তু লালয়েৎ ॥

তা আমরা কি পুত্র নই? হে মহারাজ, আমাদের তাড়না করবে না— ঐটে ভালো নয়।

হরিদীন। এ ভালো কথা, মস্ত কথা, ঐ-যে কী বললে— ও কথাগুলো শোনাচ্ছে ভালো।

শ্রীহর। কিন্তু কেবল শাস্তর বললে তো চলবে না— আমার ঘানির কথাটা কখন আসবে? অমনি ঐসঙ্গে জুড়ে দিলে হয় না?

নন্দ। বেটা, তুমি ঘানির সঙ্গে শাস্তর জুড়বে? এ কি তোমার গোরু পেয়েছ?

জওহর। কলুর ছেলে, ওর আর কত বুদ্ধি হবে!

কুঞ্জর। দু ঘা না পিঠে পড়লে ওর শিক্ষা হবে না। কিন্তু আমার কথাটা কখন পাড়বে? মনে থাকবে তো! আমার নাম কুঞ্জরলাল। কাঞ্জিলাল নয়— সে আমার ভাইপো, সে বুধকোটে থাকে— সে যখন সবে তিন বছর তখন তাকে—

হরিদীন। সব বুঝলুম, কিন্তু যে-রকম কাল পড়েছে, রাজা যদি শাস্তর না শোনে?

কুঞ্জর। তখন আমরাও শাস্তর ছেড়ে অস্তর ধরব।

কিনু। শাবাশ বলেছ, শাস্তর ছেড়ে অস্তর!

মন্‌সুখ। কে বললে হে? কথাটা কে বললে?

কুঞ্জর। (সগর্বে) আমি বলেছি। আমার নাম কুঞ্জরলাল, কাঞ্জিলাল আমার ভাইপো।

কিনু। তা ঠিক বলেছ ভাই— শাস্তর আর অস্তর— কখনো শাস্তর কখনো অস্তর— আবার কখনো অস্তর কখনো শাস্তর।

জওহর। কিন্তু বড়ো গোলমাল হচ্ছে। কথাটা কী যে স্থির হল বুঝতে পারছি নে। শাস্তর না অস্তর?

শ্রীহর। বেটা তাঁতি কিনা, এইটে আর বুঝতে পারলি নে? তবে এতক্ষণ ধরে কথাটা হল কী? স্থির হল যে শাস্তরের মহিমা বুঝতে ঢের দেরি হয়, কিন্তু অস্তরের মহিমা খুব চট্‌পট্ বোঝা যায়।

অনেকে। (উচ্চস্বরে) তবে শাস্তর চুলোয় যাক— অস্তর ধরো।

দেবদত্তের প্রবেশ

দেবদত্ত। বেশি ব্যস্ত হবার দরকার করে না, চুলোতেই যাবে শিগগির, তার আয়োজন হচ্ছে। বেটা, তোরা কী বলছিলি রে?

শ্রীহর। আমরা ঐ ভদ্রলোকের ছেলেটির কাছে শাস্তর শুনছিলুম ঠাকুর!

দেবদত্ত। এমনি মন দিয়েই শাস্তর শোনে বটে! চীৎকারের চোটে রাজ্যের কানে তালা ধরিয়ে দিলে। যেন ধোবাপাড়ায় আগুন লেগেছে।

কিনু। তোমার কী ঠাকুর! তুমি তো রাজবাড়ির সিধে খেয়ে খেয়ে ফুলছ— আমাদের পেটে নাড়ীগুলো জ্বলে জ্বলে ম'ল— আমরা কি বড়ো সুখে চেঁচাচ্ছি!

মন্‌সুখ। আজকালের দিনে আস্তে বললে শোনে কে? এখন চেঁচিয়ে কথা কইতে হয়।

কুঞ্জর। কান্নাকাটি ঢের হয়েছে, এখন দেখছি অন্য উপায় আছে কি না।

দেবদত্ত। কী বলিস রে! তোদের বড়ো আস্পর্ধা হয়েছে। তবে শুনবি? তবে বলব?—

নসমানসমানসমানসমাগমমাপ সমীক্ষ্য বসন্তনভঃ।
ভ্রমদভ্রমদভ্রমদভ্রমদ ভ্রমরচ্ছলতঃ খলু কামিজনঃ ॥

হরিদীন। ও বাবা, শাপ দিচ্ছে নাকি?

দেবদত্ত। (মন্নুর প্রতি) তুমি তো ভদ্রলোকের ছেলে, তুমি তো শাস্তর বোঝ— কেমন, এ ঠিক কথা কিনা? নস মানস মানস মানসং—

মন্নুরাম। আহা ঠিক! শাস্ত্র যদি চাও তো এই বটে। তা, আমিও তো ঠিক ঐ কথাটাই বোঝাচ্ছিলুম।

দেবদত্ত। (নন্দর প্রতি) নমস্কার! তুমি তো ব্রাহ্মণ দেখছি। কী বল ঠাকুর, পরিণামে এই-সব মূর্খরা 'ভ্রমদভ্রমদভ্রমৎ' হয়ে মরবে না?

নন্দ। বরাবর তাই বলছি, কিন্তু বোঝে কে? ছোটোলোক কিনা।

দেবদত্ত। (মন্‌সুখের প্রতি) তোমাকেই এর মধ্যে বুদ্ধিমানের মতো দেখাচ্ছে, আচ্ছা, তুমিই বলো দেখি, কথাগুলো কি ভালো হচ্ছিল? (কুঞ্জরের প্রতি) আর তোমাকেও তো বেশ ভালোমানুষ দেখছি হে, তোমার নাম কী?

কুঞ্জর। আমার নাম কুঞ্জরলাল— কাঞ্জিলাল আমার ভাইপোর নাম।

দেবদত্ত। ওঃ! তোমারই ভাইপোর নাম কাঞ্জিলাল বটে? তা, আমি রাজার কাছে বিশেষ করে তোমাদের নাম করব।

হরিদীন। আর আমাদের কী হবে?

দেবদত্ত। তা আমি বলতে পারি নে বাপু! এখন তো তোরা কান্না ধরেছিস— এই একটু আগে আর-এক সুর বের করেছিলি। সে কথাগুলো কি রাজা শোনে নি? রাজা সব শুনতে পায়।

অনেকে। দোহাই ঠাকুর, আমরা কিছু বলি নি, ঐ কাঞ্জুলাল না মাঞ্জুলাল অস্তরের কথা পেড়েছিল।

কুঞ্জর। চুপ কর্। আমার নাম খারাপ করিস নে। আমার নাম কুঞ্জরলাল। তা, মিছে কথা বলব না, আমি বলছিলুম, 'যেমন শাস্তর আছে তেমনি অস্তরও আছে, রাজা যদি শাস্তরের দোহাই না মানে তখন অস্তর আছে।' কেমন বলেছি ঠাকুর?

দেবদত্ত। ঠিক বলেছ, তোমার উপযুক্ত কথাই বলেছ। অস্ত্র কী? না, বল। তা তোমাদের বল কী? না, 'দুর্বলস্য বলং রাজা'। কি না, রাজাই দুর্বলের বল। আবার, 'বালানাং রোদনং বলং'। রাজার কাছে তোমরা বালক বৈ নও। অতএব এখানে কান্নাই তোমাদের অস্ত্র। অতএব শাস্তর যদি না খাটে তো তোমাদের অস্ত্র আছে কান্না। বড়ো বুদ্ধিমানের মতো কথা বলেছ। প্রথমে আমাকেই ধাঁধা লেগে গিয়েছিল। তোমার নামটা মনে রাখতে হবে। কী হে, তোমার নাম কী?

কুঞ্জর। আমার নাম কুঞ্জরলাল। কাঞ্জিলাল আমার ভাইপো।

অন্য সকলে। ঠাকুর, আমাদের মাপ করো ঠাকুর, মাপ করো।

দেবদত্ত। আমি মাপ করবার কে? তবে দেখ্, কান্নাকাটি করে দেখ্, রাজা যদি মাপ করে।

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

অন্তঃপুর

প্রমোদকানন

বিক্রমদেব ও সুমিত্রা

বিক্রমদেব। মৌনমুগ্ধ সন্ধ্যা ওই মন্দ মন্দ আসে
কুঞ্জবনমাঝে, প্রিয়তমে, লজ্জানম্র
নববধূসম— সম্মুখে গম্ভীর নিশা
বিস্তার করিয়া অন্তহীন অন্ধকার

এ কনককান্তিটুকু চাহে গ্রাসিবারে ।
তেমনি দাঁড়ায়ে আছি হৃদয় প্রসারি
ওই হাসি, ওই রূপ, ওই তব জ্যোতি
পান করিবারে— দিবালোকতট হতে
এসো, নেমে এসো, কনকচরণ দিয়ে
এ অগাধ হৃদয়ের নিশীথ-সাগরে ।
কোথা ছিলে প্রিয়ে ?

সুমিত্রা । নিতান্ত তোমারি আমি
সদা মনে রেখো এ বিশ্বাস । থাকি যবে
গৃহকাজে, জেনো নাথ, তোমারি সে গৃহ,
তোমারি সে কাজ ।

বিক্রমদেব । থাক্ গৃহ, গৃহকাজ ।
সংসারের কেহ নহ, অন্তরের তুমি ।
অন্তরে তোমার গৃহ, আর গৃহ নাই—
বাহিরে কাঁদুক পড়ে বাহিরের কাজ ।

সুমিত্রা । কেবল অন্তরে তব ? নহে, নাথ, নহে—
রাজন্, তোমারি আমি অন্তরে বাহিরে ।
অন্তরে প্রেয়সী তব, বাহিরে মহিষী ।

বিক্রমদেব । হায়, প্রিয়ে, আজ কেন স্বপ্ন মনে হয
সে সুখের দিন ? সেই প্রথম মিলন—
প্রথম প্রেমের ছটা, দেখিতে দেখিতে
সমস্ত হৃদয়ে দেহে যৌবনবিকাশ,
সেই নিশিসমাগমে দুরুদুরু হিয়া—
নয়নপল্লবে লজ্জা ফুলদলপ্রান্তে
শিশিরবিন্দুর মতো, অধরের হাসি
নিমেষে জাগিযা ওঠে, নিমেষে মিলায়
সন্ধ্যার বাতাস লেগে কাতরকম্পিত
দীপশিখাসম, নয়নে-নয়নে হয়ে
ফিরে আসে আঁখি, বেধে যায় হৃদয়ের
কথা, হাসে চাঁদ কৌতুকে আকাশে, চাহে
নিশীথের তারা লুকায়ে জানালা-পাশে—
সেই নিশি-অবসানে আঁখি ছলছল,
সেই বিরহের ভয়ে বদ্ধ আলিঙ্গন,
তিলেক বিচ্ছেদ লাগি কাতর হৃদয় ।
কোথা ছিল গৃহকাজ ! কোথা ছিল, প্রিয়ে,
সংসারভাবনা ?

সুমিত্রা । তখন ছিলাম শুধু
ছোটো দুটি বালক বালিকা, আজি মোরা
রাজা রানী ।

বিক্রমদেব । রাজা রানী ! কে রাজা ? কে রানী ?

নহি আমি রাজা। শূন্য সিংহাসন কাঁদে।
জীর্ণ রাজকার্যরাশি চূর্ণ হয়ে যায়
তোমার চরণতলে ধূলির মাঝারে।

সুমিত্রা। শুনিয়া লজ্জায় মরি। ছি ছি মহারাজ,
এ কি ভালোবাসা? এ যে মেঘের মতন
রেখেছে আচ্ছন্ন করে মধ্যাহ্ন-আকাশে
উজ্জ্বল প্রতাপ তব। শোনো প্রিয়তম,
আমার সকলি তুমি, তুমি মহারাজা,
তুমি স্বামী— আমি শুধু অনুগত ছায়া,
তার বেশি নই। আমারে দিয়ো না লাজ,
আমাবে বেসো না ভালো রাজশ্রীর চেয়ে।

বিক্রমদেব। চাহ না আমার প্রেম?

সুমিত্রা। কিছু চাই নাথ,
সব নহে। স্থান দিয়ো হৃদয়ের পাশে,
সমস্ত হৃদয় তুমি দিয়ো না আমারে।

বিক্রমদেব। আজো রমণীর মন নারিনু বুঝিতে।

সুমিত্রা। তোমরা পুরুষ, দৃঢ় তরুর মতন
আপনি অটল রবে আপনার 'পরে
স্বতন্ত্র উন্নত, তবে তো আশ্রয় পাব
আমরা লতার মতো তোমাদের শাখে।
তোমবা সকল মন দিয়ে ফেল যদি
কে রহিবে আমাদের ভালোবাসা নিতে,
কে রহিবে বহিবারে সংসারের ভার?
তোমরা রহিবে কিছু স্নেহময়, কিছু
উদাসীন, কিছু মুক্ত, কিছু বা জড়িত—
সহস্র পাখির গৃহ, পান্থের বিশ্রাম,
তপ্ত ধরণীর ছায়া, মেঘের বান্ধব,
ঝটিকার প্রতিদ্বন্দ্বী, লতার আশ্রয়।

বিক্রমদেব। কথা দূর করো প্রিয়ে! হেরো সন্ধ্যাবেলা
মৌনপ্রেমসুখে সুপ্ত বিহঙ্গের নীড়,
নীরব কাকলি। তবে মোরা কেন দোঁহে
কথার উপরে কথা করি বরিষন?
অধর অধরে বসি প্রহরীর মতো
চপল কথার দ্বার রাখুক রুধিয়া।

কঞ্চুকীর প্রবেশ

কঞ্চুকী। এখনি দর্শনপ্রার্থী মন্ত্রীমহাশয়,
গুরুতর রাজকার্য, বিলম্ব সহে না।

বিক্রমদেব। ধিক্ তুমি! ধিক্ মন্ত্রী! ধিক্ রাজকার্য!
রাজ্য রসাতলে যাক মন্ত্রী লয়ে সাথে।

[কঞ্চুকীর প্রস্থান

সুমিত্রা। যাও, নাথ, যাও !

বিক্রমদেব। বার বার এক কথা !
নির্মম ! নিষ্ঠুর ! কাজ, কাজ ! যাও, যাও !
যেতে কি পারি নে আমি ? কে চাহে থাকিতে ?
সবিনয় করপুটে কে মাগে তোমার
সযত্নে ওজন-করা বিন্দু বিন্দু কৃপা ?
এখনি চলিনু।
অয়ি হৃদিলগ্না লতা,
ক্ষম মোরে, ক্ষম অপরাধ। মোছো আঁখি,
ম্লান মুখে হাসি আনো, অথবা ভ্রূকুটি—
দাও শাস্তি, করো তিরস্কার।

সুমিত্রা। মহারাজ,
এখন সময় নয়— আসিয়ো না কাছে,
এই মুছিয়াছি অশ্রু, যাও রাজ-কাজে।

বিক্রমদেব। হায় নারী, কী কঠিন হৃদয় তোমার !
কোনো কাজ নাই প্রিয়ে, মিছে উপদ্রব।
ধান্যপূর্ণ বসুন্ধরা, প্রজা সুখে আছে,
রাজকার্য চলিছে অবাধে— এ কেবল,
সামান্য কী বিঘ্ন নিয়ে তুচ্ছ কথা তুলে
বিজ্ঞ বৃদ্ধ অমাত্যের অতি-সাবধান।

সুমিত্রা। ওই শোনো ক্রন্দনের ধ্বনি— সকাতরে
প্রজার আহ্বান। ওরে বৎস, মাতৃহীন
নোস তোরা কেহ, আমি আছি— আমি আছি—
আমি এ রাজ্যের রানী, জননী তোদের।

[প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

অন্তঃপুরের কক্ষ

সুমিত্রা

সুমিত্রা। এখনো এল না কেন ? কোথায় ব্রাহ্মণ ?
ওই ক্রমে বেড়ে ওঠে ক্রন্দনের ধ্বনি।

দেবদত্তের প্রবেশ

দেবদত্ত। জয় হোক।

সুমিত্রা। ঠাকুর, কিসের কোলাহল ?

দেবদত্ত। শোন কেন মাতঃ ! শুনিলেই কোলাহল।
সুখে থাকো, রুদ্ধ করো কান। অন্তঃপুরে
সেথাও কি পশে কোলাহল ? শান্তি নেই
সেখানেও ? বল তো এখনি সৈন্য লয়ে

তাড়া করে নিয়ে যাই পথ হতে পথে
জীর্ণচীর ক্ষুধিত তৃষিত কোলাহল।

সুমিত্রা। বলো শীঘ্র কী হয়েছে।

দেবদত্ত। কিছু না, কিছু না।
শুধু ক্ষুধা, হীন ক্ষুধা, দরিদ্রের ক্ষুধা।
অভদ্র অসভ্য যত বর্বরের দল
মরিছে চীৎকার করি ক্ষুধার তাড়নে
কর্কশ ভাষায়। রাজকুঞ্জে ভয়ে মৌন
কোকিল পাপিয়া যত।

সুমিত্রা। আহা, কে ক্ষুধিত?

দেবদত্ত। অভাগ্যের দুরদৃষ্ট। দীন প্রজা যত
চিরদিন কেটে গেছে অর্ধাশনে যার
আজও তার অনশন হল না অভ্যাস,
এমনি আশ্চর্য!

সুমিত্রা। হে ঠাকুর, এ কী শুনি!
ধান্যপূর্ণ বসুন্ধরা, তবু প্রজা কাঁদে
অনাহারে?

দেবদত্ত। ধান্য তার বসুন্ধরা যার।
দরিদ্রের নহে বসুন্ধরা। এরা শুধু
যজ্ঞভূমে কুক্কুরের মতো লোলজিহ্বা
এক পাশে পড়ে থাকে, পায় ভাগ্যক্রমে
কভু যষ্টি, উচ্ছিষ্ট কখনো। বেঁচে যায়
দয়া হয় যদি, নহে তো কাঁদিয়া ফেরে
পথপ্রান্তে মরিবার তরে।

সুমিত্রা। কী বলিলে,
রাজা কি নির্দয় তবে? দেশ অরাজক?

দেবদত্ত। অবাজক কে বলিবে? সহস্ররাজক।

সুমিত্রা। রাজকার্যে অমাত্যের দৃষ্টি নাই বুঝি?

দেবদত্ত। দৃষ্টি নাই? সে কী কথা! বিলক্ষণ আছে।
গৃহপতি নিদ্রাগত, তা বলিয়া গৃহে
চোরের কি দৃষ্টি নাই? সে যে শনিদৃষ্টি।
তাদের কী দোষ? এসেছে বিদেশ হতে
রিক্ত হস্তে, সে কি শুধু দীন প্রজাদের
আশীর্বাদ করিবারে দুই হাত তুলে?

সুমিত্রা। বিদেশী! কে তারা? তবে, আমার আত্মীয়?

দেবদত্ত। রানীর আত্মীয় তারা প্রজার মাতুল,
যেমন মাতুল কংস, মামা কালনেমি।

সুমিত্রা। জয়সেন?

দেবদত্ত। ব্যস্ত তিনি প্রজা-সুশাসনে।
প্রবল শাসনে তাঁর সিংহগড় দেশে

যত উপসর্গ ছিল অন্নবস্ত্র আদি
সব গেছে, আছে শুধু অস্থি আর চর্ম।

সুমিত্রা। শিলাদিত্য ?

দেবদত্ত। তাঁর দৃষ্টি বাণিজ্যের প্রতি।
বণিকের ধনভার করিয়া লাঘব
নিজস্কন্ধে করেন বহন।

সুমিত্রা। যুধাজিৎ ?

দেবদত্ত। নিতান্তই ভদ্রলোক, অতি মিষ্টভাষী।
থাকেন বিজয়কোটে, মুখে লেগে আছে
'বাপু বাছা', আড়চক্ষে চাহেন চৌদিকে,
আদরে বুলান হাত ধরণীর পিঠে—
যাহা-কিছু হাতে ঠেকে যত্নে লন তুলি।

সুমিত্রা। এ কী লজ্জা ! এ কী পাপ ! আমার আত্মীয় !
পিতৃকুল-অপযশ ! ছি ছি, এ কলঙ্ক
করিব মোচন। তিলেক বিলম্ব নহে।

[প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

দেবদত্তের গৃহ

নারায়ণী গৃহকার্যে নিযুক্ত

দেবদত্তের প্রবেশ

দেবদত্ত। প্রিয়ে, বলি ঘরে কিছু আছে কি ?

নারায়ণী। তোমার থাকার মধ্যে আছি আমি। তাও না থাকলেই আপদ চোকে।

দেবদত্ত। ও আবার কী কথা !

নারায়ণী। তুমি রাস্তা থেকে কুড়িয়ে কুড়িয়ে যত রাজ্যের ভিক্ষুক জুটিয়ে আন, ঘরে খুদকুঁড়ো আর বাকি রইল না। খেটে খেটে আমার শরীরও আর থাকে না।

দেবদত্ত। আমি সাধে আনি ? হাতে কাজ থাকলে তুমি থাক ভালো, সুতরাং আমিও ভালো থাকি। আর কিছু না হোক, তোমার ঐ মুখখানি বন্ধ থাকে।

নারায়ণী। বটে ? তা আমি এই চুপ করলুম। আমার কথা যে তোমার অসহ্য হয়ে উঠেছে তা কে জানত ! তা, কে বলে আমার কথা শুনতে—

দেবদত্ত। তুমিই বল, আবার কে বলবে ? এক কথা না শুনলে দশ কথা শুনিয়ে দাও।

নারায়ণী। বটে ! আমি দশ কথা শোনাই ? তা, আমি এই চুপ করলুম। আমি একেবারে থামলেই তুমি বাঁচ। এখন কি আর সেদিন আছে— সেদিন গেছে। এখন আবার নতুন মুখের নতুন কথা শুনতে সাধ গিয়েছে— এখন আমার কথা পুরোনো হয়ে গেছে।

দেবদত্ত। বাপ রে ! আবার নতুন মুখের নতুন কথা ! শুনলে আতঙ্ক হয়। তবু পুরোনো কথাগুলো অনেকটা অভ্যেস হয়ে এসেছে।

নারায়ণী। আচ্ছা বেশ। এতই জ্বালাতন হয়ে থাক তো আমি এই চুপ করলুম। আমি আর একটি কথাও কব না। আগে বললেই হত— আমি তো জানতুম না। জানলে কে তোমাকে—

দেবদত্ত। আগে বলি নি ? কত বার বলেছি। কই, কিছু হল না তো।

নারায়ণী। বটে ! তা বেশ, আজ থেকে তবে এই চুপ করলুম। তুমিও সুখে থাকবে, আমিও সুখে থাকব। আমি সাধে বকি ? তোমার রকম দেখে—

দেবদত্ত। এই বুঝি তোমার চুপ করা ?

নারায়ণী। আচ্ছা। [বিমুখ

দেবদত্ত। প্রিয়ে ! প্রেয়সী ! মধুরভাষিণী ! কোকিলগঞ্জিনী !

নারায়ণী। চুপ করো।

দেবদত্ত। রাগ কোরো না প্রিয়ে, কোকিলের মতো রঙ বলছি নে, কোকিলের মতো পঞ্চমস্বর।

নারায়ণী। যাও যাও, বোকো না। কিন্তু তা বলছি, তুমি যদি আরো ভিখিরি জুটিয়ে আন তা হলে হয় তাদের ঝেঁটিয়ে বিদেয় করব, নয় নিজে বনবাসিনী হয়ে বেরিয়ে যাব।

দেবদত্ত। তা হলে আমিও তোমার পিছনে পিছনে যাব, এবং ভিক্ষুকগুলোও যাবে।

নারায়ণী। মিছে না। ঢেঁকির স্বর্গেও সুখ নেই।

[নাবায়ণীর প্রস্থান

ত্রিবেদীর মালা জপিতে জপিতে প্রবেশ

ত্রিবেদী। শিব শিব শিব ! তুমি রাজপুরোহিত হয়েছ ?

দেবদত্ত। তা হয়েছি, কিন্তু রাগ কেন ঠাকুর ? কোনো দোষ ছিল না। মালাও জপি নে, ভগবানের নামও করি নে। রাজার মর্জি।

ত্রিবেদী। পিপীলিকার পক্ষচ্ছেদ হয়েছে। শ্রীহরি !

দেবদত্ত। আমার প্রতি রাগ করে শব্দশাস্ত্রের প্রতি উপদ্রব কেন ? পক্ষচ্ছেদ নয়, পক্ষোদ্ভেদ।

ত্রিবেদী। তা ও একই কথা। ছেদও যা ভেদও তা। কথায় বলে ছেদভেদ। হে ভবকাণ্ডারী ! যা হোক, তোমার যতদূর বার্ধক্য হবার তা হয়েছে।

দেবদত্ত। ব্রাহ্মণী সাক্ষী, এখনো আমার যৌবন পেরোয় নি।

ত্রিবেদী। আমিও তাই বলছি। যৌবনের দর্পেই তোমার এতটা বার্ধক্য হয়েছে। তা তুমি মরবে। হরি হে দীনবন্ধু !

দেবদত্ত। ব্রাহ্মণবাক্য মিথ্যে হবে না— তা আমি মরব। কিন্তু সেজন্যে তোমার বিশেষ আয়োজন করতে হবে না, স্বয়ং যম রয়েছেন। ঠাকুর, তোমার চেয়ে আমার সঙ্গে যে তাঁর বেশি কুটুম্বিতে তা নয়— সকলেরই প্রতি তাঁর সমান নজর।

ত্রিবেদী। তোমার সময় নিতান্ত এগিয়ে এসেছে। দয়াময় হরি !

দেবদত্ত। তা কী করে জানব ? দেখেছি বটে আজকাল মরে ঢের লোক— কেউ-বা গলায় দড়ি দিয়ে মরে, কেউ-বা গলায় কলসি বেঁধে মরে, আবার সর্পাঘাতেও মরে, কিন্তু ব্রহ্মশাপে মরে না। ব্রাহ্মণের লাঠিতে কেউ কেউ মরেছে শুনেছি, কিন্তু ব্রাহ্মণের কথায় কেউ মরে না। অতএব যদি শীঘ্র না মরে উঠতে পারি তো রাগ কোরো না ঠাকুর— সে আমার দোষ নয়, সে কালের দোষ।

ত্রিবেদী। প্রণিপাত ! শিব শিব শিব !

দেবদত্ত। আর-কিছু প্রয়োজন আছে ?

ত্রিবেদী। না। কেবল এই খবরটা দিতে এলুম। দয়াময় ! তা, তোমার চালে যদি দু-একটা বেশি কুমড়ো ফলে থাকে তো দিতে পার— আমার দরকার আছে।

দেবদত্ত। এনে দিচ্ছি।

[প্রস্থান

ষষ্ঠ দৃশ্য

অন্তঃপুর

পুষ্পোদ্যান

বিক্রমদেব ও রাজমাতুল বৃদ্ধ অমাত্য

বিক্রমদেব। শুনো না অলীক কথা, মিথ্যা অভিযোগ—
যুধাজিৎ, জয়সেন, উদয়ভাস্কর,
সুযোগ্য সুজন। একমাত্র অপরাধ
বিদেশী তাহারা। তাই এ রাজ্যের মনে
বিদ্বেষ-অনল উদ্গারিছে কৃষ্ণধূম
নিন্দা রাশি রাশি।

অমাত্য। সহস্র প্রমাণ আছে,
বিচার করিয়া দেখো।

বিক্রমদেব। কী হবে প্রমাণ?
চলিছে বৃহৎ রাজ্য বিশ্বাসের বলে—
যার 'পরে রয়েছে যে ভার, সযতনে
তাই সে পালিছে। প্রতিদিন তাহাদের
বিচার করিতে হবে নিন্দাবাক্য শুনে,
নহে ইহা রাজধর্ম। আর্য, যাও ঘরে,
করিয়ো না বিশ্রামে ব্যাঘাত।

অমাত্য। পাঠায়েছে
মন্ত্রী মোরে ; সানুনয়ে করিছে প্রার্থনা
দর্শন তোমার, গুরু রাজকার্য-তরে।

বিক্রমদেব। চিরকাল আছে রাজ্য, আছে রাজকার্য—
সুমধুর অবসর শুধু মাঝে মাঝে
দেখা দেয়, অতি ভীরু, অতি সুকুমার।
ফুটে ওঠে পুষ্পটির মতো, টুটে যায়
বেলা না ফুরাতে। কে তারে ভাঙিতে চাহে
অকালে চিন্তার ভারে ? বিশ্রামেরে জেনো
কর্তব্য কাজের অঙ্গ।

অমাত্য। যাই মহারাজ।

[প্রস্থান

রানীর আত্মীয় অমাত্যের প্রবেশ

অমাত্য। বিচারের আজ্ঞা হোক।

বিক্রমদেব। কিসের বিচার ?

অমাত্য। শুনি নাকি, মহারাজ, নির্দোষীর নামে
মিথ্যা অভিযোগ—

বিক্রমদেব। সত্য হবে। কিন্তু যতক্ষণ
বিশ্বাস রেখেছি আমি তোমাদের 'পরে

ততক্ষণ থাকো মৌন হয়ে। এ বিশ্বাস
ভাঙিবে যখন, তখন, আপনি আমি
সত্য মিথ্যা করিব বিচার। যাও চলে।

[অমাত্যের প্রস্থান

বিক্রমদেব। হায় কষ্ট মানবজীবন! পদে পদে
নিয়মের বেড়া! আপন রচিত জালে
আপনি জড়িত। অশান্ত আকাঙ্ক্ষা-পাখি
মরিতেছে মাথা খুঁড়ে পঞ্জরপিঞ্জরে!
কেন এ জটিল অধীনতা? কেন এত
আত্মপীড়া? কেন এ কর্তব্যকারাগার?
তুই সুখী অয়ি মাধবিকা, বসন্তের
আনন্দমঞ্জরী! শুধু প্রভাতের আলো,
নিশার শিশির, শুধু গন্ধ, শুধু মধু,
শুধু মধুপের গান, বায়ুর হিল্লোল,
স্নিগ্ধ পল্লবশয়ন, প্রস্ফুট শোভায়
সুনীল আকাশ-পানে নীরবে উত্থান,
তার পরে ধীরে ধীরে শ্যাম দূর্বাদলে
নীরবে পতন। নাই তর্ক, নাই বিধি,
নিদ্রিত নিশায় মর্মে সংশয়দংশন,
নিরাশ্বাস প্রণয়ের নিষ্ফল আবেগ।

সুমিত্রার প্রবেশ

এসেছ পাষাণী! দয়া হয়েছে কি মনে?
হল সারা সংসারের যত কাজ ছিল!
মনে কি পড়িল তবে অধীন এ জনে
সংসারের সব শেষে? জান না কি, প্রিয়ে,
সকল কর্তব্য চেয়ে প্রেম গুরুতর!
প্রেম এই হৃদয়ের স্বাধীন কর্তব্য।

সুমিত্রা। হায়, ধিক্ মোরে। কেমনে বোঝাব, নাথ,
তোমারে যে ছেড়ে যাই সে তোমারি প্রেমে।
মহারাজ, অধীনীর শোনো নিবেদন—
এ রাজ্যের প্রজার জননী আমি। প্রভু,
পারি নে শুনিতে আর কাতর অভাগা
সন্তানের করুণ ক্রন্দন। রক্ষা করো
পীড়িত প্রজারে।

বিক্রমদেব। কী করিতে চাহ রানী?

সুমিত্রা। আমার প্রজারে যারা করিছে পীড়ন
রাজ্য হতে দূর করে দাও তাহাদের।

বিক্রমদেব। কে তাহারা জান?

সুমিত্রা। জানি।

বিক্রমদেব। তোমার আত্মীয়।

সুমিত্রা। নহে মহারাজ ! আমার সন্তান চেয়ে
নহে তারা অধিক আত্মীয়। এ রাজ্যের
অনাথ আতুর যত তাড়িত ক্ষুধিত
তারাই আমার আপনার। সিংহাসন-
রাজচ্ছত্রছায়ে ফিরে যারা গুপ্তভাবে
শিকারসন্ধানে— তারা দস্যু, তারা চোর।

বিক্রমদেব। যুধাজিৎ, শিলাদিত্য, জয়সেন তারা।

সুমিত্রা। এই দণ্ডে তাহাদের দাও দূর করে।

বিক্রমদেব। আরামে রয়েছে তারা, যুদ্ধ ছাড়া কভু
নড়িবে না এক পদ।

সুমিত্রা। তবে যুদ্ধ করো।

বিক্রমদেব। যুদ্ধ করো ! হায় নারী, তুমি কি রমণী !
ভালো, যুদ্ধে যাব আমি। কিন্তু তার আগে
তুমি মানো অধীনতা, তুমি দাও ধরা—
ধর্মাধর্ম, আত্মপর, সংসারের কাজ
সব ছেড়ে হও তুমি আমারি কেবল।
তবেই ফুরাবে কাজ— তৃপ্তমন হয়ে
বাহিরিব বিশ্বরাজ্য জয় করিবারে।
অতৃপ্ত রাখিবে মোরে যতদিন তুমি
তোমার অদৃষ্ট-সম রব তব সাথে।

সুমিত্রা। আজ্ঞা করো মহারাজ, মহিষী হইয়া
আপনি প্রজারে আমি করিব রক্ষণ।

[প্রস্থান

বিক্রমদেব। এমনি করেই মোরে করেছ বিকল।
আছ তুমি আপনার মহত্ত্বশিখরে
বসি একাকিনী ; আমি পাই নে তোমারে।
দিবানিশি চাহি তাই। তুমি যাও কাজে,
আমি ফিরি তোমারে চাহিয়া। হায় হায়,
তোমায় আমায় কভু হবে কি মিলন ?

দেবদত্তের প্রবেশ

দেবদত্ত। জয় হোক মহারানী— কোথা মহারানী,
একা তুমি মহারাজ ?

বিক্রমদেব। তুমি কেন হেথা ?
ব্রাহ্মণের ষড়যন্ত্র অন্তঃপুরমাঝে ?
কে দিয়েছে মহিষীরে রাজ্যের সংবাদ ?

দেবদত্ত। রাজ্যের সংবাদ রাজ্য আপনি দিয়েছে।
উর্ধ্বস্বরে কেঁদে মরে রাজ্য উৎপীড়িত
নিতান্ত প্রাণের দায়ে— সে কি ভাবে কভু
পাছে তব বিশ্রামের হয় কোনো ক্ষতি ?

ভয় নাই, মহারাজ, এসেছি কিঞ্চিৎ
ভিক্ষা মাগিবার তরে রানীমার কাছে।
ব্রাহ্মণী বড়োই রুক্ষ, গৃহে অন্ন নাই,
অথচ ক্ষুধার কিছু নাই অপ্রতুল।

[প্রস্থান

বিক্রমদেব। সুখী হোক, সুখে থাক্ এ রাজ্যের সবে।
কেন দুঃখ, কেন পীড়া, কেন এ ক্রন্দন!
অত্যাচার, উৎপীড়ন, অন্যায় বিচার,
কেন এ-সকল! কেন মানুষের 'পরে
মানুষের এত উপদ্রব! দুর্বলের
ক্ষুদ্র সুখ, ক্ষুদ্র শান্তিটুকু, তার 'পরে
সবলের শ্যেনদৃষ্টি কেন? যাই, দেখি,
যদি কিছু খুঁজে পাই শান্তির উপায়।

সপ্তম দৃশ্য

মন্ত্রগৃহ

বিক্রমদেব ও মন্ত্রী

বিক্রমদেব। এই দণ্ডে রাজ্য হতে দাও দূর করে
যত সব বিদেশী দস্যুরে। সদা দুঃখ,
সদা ভয়, রাজ্য জুড়ে কেবল ক্রন্দন!
আর যেন একদিন না শুনিতে হয়
পীড়িত প্রজার এই নিত্য কোলাহল।

মন্ত্রী। মহারাজ, ধৈর্য চাই। কিছুদিন ধরে
রাজার নিয়ত দৃষ্টি পড়ুক সর্বত্র,
ভয় শোক বিশৃঙ্খলা তবে দূর হবে।
অন্ধকারে বাড়িয়াছে বহুকাল ধরে
অমঙ্গল— এক দিনে কী করিবে তার?

বিক্রমদেব। এক দিনে চাহি তারে সমূলে নাশিতে,
শত বরষের শাল যেমন সবলে
এক দিনে কাঠুরিয়া করে ভূমিসাৎ।

মন্ত্রী। অস্ত্র চাই, লোক চাই—

বিক্রমদেব। সেনাপতি কোথা?

মন্ত্রী। সেনাপতি নিজেই বিদেশী।

বিক্রমদেব। বিড়ম্বনা!
তবে ডেকে নিয়ে এসো দীন প্রজাদের,
খাদ্য দিয়ে তাহাদের বন্ধ করো মুখ,

অর্থ দিয়ে করহ বিদায়। রাজ্য ছেড়ে
যাক চলে, যেথা গিয়ে সুখী হয় তারা।

[প্রস্থান

দেবদত্তের সহিত সুমিত্রার প্রবেশ

সুমিত্রা। আমি এ রাজ্যের রানী— তুমি মন্ত্রী বুঝি ?
মন্ত্রী। প্রণাম জননী ! দাস আমি। কেন মাতঃ,
অন্তঃপুর ছেড়ে আজ মন্ত্রগৃহে কেন ?
সুমিত্রা। প্রজার ক্রন্দন শুনে পারি নে তিষ্ঠিতে
অন্তঃপুরে। এসেছি করিতে প্রতিকার।
মন্ত্রী। কী আদেশ মাতঃ ?
সুমিত্রা। বিদেশী নায়ক
এ রাজ্যে যতেক আছে করহ আহ্বান
মোর নামে ত্বরা করি।
মন্ত্রী। সহসা আহ্বানে
সংশয় জন্মিবে মনে, কেহ আসিবে না।
সুমিত্রা। মানিবে না রানীর আদেশ ?
দেবদত্ত। রাজা রানী
ভুলে গেছে সবে। কদাচিৎ জনশ্রুতি
শোনা যায় !
সুমিত্রা। কালভৈরবের পূজোৎসবে
করো নিমন্ত্রণ। সেদিন বিচার হবে।
গর্বে অন্ধ দণ্ড যদি না করে স্বীকার
সৈন্যবল কাছাকাছি রাখিয়ো প্রস্তুত।

[প্রস্থান

দেবদত্ত। কাহারে পাঠাবে দূত ?
মন্ত্রী। ত্রিবেদী ঠাকুরে।
নির্বোধ সরলমন ধার্মিক ব্রাহ্মণ,
তার 'পরে কারো আর সন্দেহ হবে না।
দেবদত্ত। ত্রিবেদী সরল ? নির্বুদ্ধিই বুদ্ধি তার,
সরলতা বক্রতার নির্ভরের দণ্ড।

অষ্টম দৃশ্য

ত্রিবেদীর কুটির

মন্ত্রী ও ত্রিবেদী

মন্ত্রী। বুঝেছ ঠাকুর, এ কাজ তোমাকে ছাড়া আর কাউকে দেওয়া যায় না।

ত্রিবেদী। তা বুঝেছি। হরি হে ! কিন্তু মন্ত্রী, কাজের সময় আমাকে ডাক, আর পৌরহিত্যের বেলায় দেবদত্তের খোঁজ পড়ে।

মন্ত্রী। তুমি তো জান ঠাকুর, দেবদত্ত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, ওঁকে দিয়ে আর তো কোনো কাজ হয় না। উনি কেবল মন্ত্র পড়তে আর ঘণ্টা নাড়তে পারেন।

ত্রিবেদী। কেন, আমার কি বেদের উপর কম ভক্তি ? আমি বেদ পুজো করি, তাই বেদ পাঠ করবার সুবিধে হয়ে ওঠে না। চন্দনে আর সিঁদুরে আমার বেদের একটা অক্ষরও দেখবার জো নেই। আজই আমি যাব। হে মধুসূদন !

মন্ত্রী। কী বলবে ?

ত্রিবেদী। তা আমি বলব কালভৈরবের পুজো, তাই রাজা তোমাদের নিমন্ত্রণ করেছেন। আমি খুব বড়োরকম ꣲ লংকার দিয়েই বলব। সব কথা এখন মনে আসছে না— পথে যেতে যেতে ভেবে নেব। হরি   তুমিই সত্য।

মন্ত্রী। যাব। আগে একবার দেখা করে যেয়ো ঠাকুর।

[প্রস্থান

ত্রিবেদী। আমি নির্বোধ, আমি শিশু, আমি সরল, আমি তোমাদের কাজ উদ্ধার করবার গোরু ! পিঠে বস্তা, নাকে দড়ি, কিছু বুঝব না, শুধু লেজে মোড়া খেয়ে চলব— আর সন্ধেবেলায় দুটিখানি শুকনো বিচিলি খেতে দেবে ! হরি হে, তোমারি ইচ্ছে। দেখা যাবে কে কতখানি বোঝে। ওরে, এখনো পুজোর সামগ্রী দিলি নে ? বেলা যায় যে। নারায়ণ ! নারায়ণ !

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সিংহগড়

জয়সেনের প্রাসাদ

জয়সেন ত্রিবেদী ও মিহিরগুপ্ত

ত্রিবেদী। তা বাপু, তুমি যদি চক্ষু অমন রক্তবর্ণ কর তা হলে আমার আপ্তবিস্রুতি হবে। ভক্তবৎসল হরি ! দেবদত্ত আর মন্ত্রী আমাকে অনেক করে শিখিয়ে দিয়েছে— কী বলছিলেম ভালো ? আমাদের রাজা কালভৈরবের পুজো -নামক একটা উপলক্ষ করে—

জয়সেন। উপলক্ষ করে ?

ত্রিবেদী। হাঁ, তা নয় উপলক্ষই হল, তাতে দোষ হয়েছে কী ? মধুসূদন ! তা তোমার [illegible] হতে পারে বটে। উপলক্ষ শব্দটা কিঞ্চিৎ কাঠিন্যরসাসক্ত হয়ে পড়েছে— ওর যা যথার্থ অর্থ সেটা নিরাকার করতে অনেকেরই গোল ঠেকে দেখেছি।

জয়সেন। তাই তো ঠাকুর, ওর যথার্থ অর্থটাই ঠাওরাচ্ছি।

ত্রিবেদী। রাম নাম সত্য ! তা নাহয় উপলক্ষ না বলে উপসর্গ বলা গেল। শব্দের অভাব কী বাপু ? শাস্ত্রে বলে শব্দ ব্রহ্ম। অতএব উপলক্ষই বল আর উপসর্গই বল অর্থ সমানই রইল।

জয়সেন। তা বটে। রাজা যে আমাদের আহ্বান করেছেন তার উপলক্ষ এবং উপসর্গ পর্যন্ত বোঝা গেল— কিন্তু তার যথার্থ কারণটা কী খুলে বলো দেখি।

ত্রিবেদী। ঐটে বলতে পারলুম না বাপু— ঐটে আমায় কেউ বুঝিয়ে বলে নি। হরি হে !

জয়সেন। ব্রাহ্মণ, তুমি বড়ো কঠিন স্থানে এসেছ, কথা গোপন কর তো বিপদে পড়বে।

ত্রিবেদী। হে ভগবান ! হ্যাঁ দেখো বাপু, তুমি রাগ কোরো না, তোমার স্বভাবটা নিতান্ত যে মধুমত্ত মধুকরের মতো তা বোধ হচ্ছে না।

জয়সেন। বেশি বোকো না ঠাকুর, যথার্থ কারণ যা জান বলে ফেলো।

ত্রিবেদী। বাসুদেব! সকল জিনিসেরই কি যথার্থ কারণ থাকে? যদি-বা থাকে তো সকল লোকে কি টের পায়? যারা গোপনে পরামর্শ করেছে তারাই জানে। মন্ত্রী জানে, দেবদত্ত জানে। তা বাপু, তুমি অধিক ভেবো না, বোধ করি সেখানে যাবামাত্রই যথার্থ কারণ অবিলম্বে টের পাবে।

জয়সেন। মন্ত্রী তোমাকে আর কিছুই বলে নি?

ত্রিবেদী। নারায়ণ নারায়ণ! তোমার দিব্য, কিছু বলে নি। মন্ত্রী বললে, 'ঠাকুর, যা বললুম তা ছাড়া একটি কথা বোলো না। দেখো, তোমাকে যেন একটুও সন্দেহ না করে।' আমি বললুম, 'হে রাম! সন্দেহ কেন করবে? তবে বলা যায় না। আমি তো সরলচিত্তে বলে যাব, যিনি সন্দগ্ধ হবেন তিনি হবেন!' হরি হে, তুমিই সত্য।

জয়সেন। পুজো উপলক্ষে নিমন্ত্রণ, এ তো সামান্য কথা, এতে সন্দেহ হবার কী কারণ থাকতে পারে?

ত্রিবেদী। তোমরা বড়োলোক, তোমাদের এইরকমই হয়। নইলে 'ধর্মস্য সূক্ষ্মা গতি' বলবে কেন? যদি তোমাদের কেউ এসে বলে, 'আয় তো রে পাষণ্ড, তোর মুণ্ডুটা টান মেরে ছিঁড়ে ফেলি' অমনি তোমাদের উপলব্ধ হয় যে, আর যাই হোক লোকটা প্রবঞ্চনা করছে না, মুণ্ডুটার উপরে বাস্তবিক তার নজর আছে বটে। কিন্তু যদি কেউ বলে 'এসো তো বাপধন, আস্তে আস্তে তোমার পিঠে হাত বুলিয়ে দিই', অমনি তোমাদের সন্দেহ হয়। যেন আস্ত মুণ্ডুটা ধরে টান মারার চেয়ে পিঠে হাত বুলিয়ে দেওয়া শক্ত কাজ! হে ভগবান, যদি রাজা স্পষ্ট করেই বলত— একবার হাতের কাছে এসো তো, তোমাদের এক-একটাকে ধরে রাজ্য থেকে নির্বাসন করে পাঠাই— তা হলে এটা কখনো সন্দেহ করতে না যে, হয়তো-বা রাজকন্যার সঙ্গে পরিণাম-বন্ধন করবার জন্যেই রাজা ডেকে থাকবেন। কিন্তু রাজা বলেছেন নাকি, 'হে বন্ধুসকল, রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধব, অতএব তোমরা পুজো উপলক্ষে এখানে এসে কিঞ্চিৎ ফলাহার করবে'— অমনি তোমাদের সন্দেহ হয়েছে, সে ফলাহারটা কী রকমের না জানি। হে মধুসূদন! তা এমনি হয় বটে। বড়োলোকের সামান্য কথায় সন্দেহ হয়, আবার সামান্য লোকের বড়ো কথায় সন্দেহ হয়।

জয়সেন। ঠাকুর, তুমি অতি সরল প্রকৃতির লোক। আমার যেটুকু-বা সন্দেহ ছিল, তোমার কথায় সমস্ত ভেঙে গেছে।

ত্রিবেদী। তা লেহ্য কথা বলেছ। আমি তোমাদের মতো বুদ্ধিমান নই, সকল কথা তলিয়ে বুঝতে পারি নে; কিন্তু বাবা, সরল— পুরাণ-সংহিতায় যাকে বলে 'অন্যে পরে কা কথা', অর্থাৎ, অন্যের কথা নিয়ে কখনো থাকি নে।

জয়সেন। আর কাকে কাকে তুমি নিমন্ত্রণ করতে বেরিয়েছ?

ত্রিবেদী। তোমাদের পোড়া নাম আমার মনে থাকে না। তোমাদের কাশ্মীরী স্বভাব যেমন তোমাদের নামগুলোও ঠিক তেমনি শ্রুতিপৌরুষ। তা এ রাজ্যে তোমাদের গুষ্টির যেখানে যে আছে সকলকেই ডাক পড়েছে। শূলপাণি! কেউ বাদ যাবে না।

জয়সেন। যাও ঠাকুর, এখন বিশ্রাম করো গে।

ত্রিবেদী। যা হোক, তোমার মন থেকে যে সমস্ত সন্দেহ দূর হয়েছে, মন্ত্রী এ কথা শুনলে ভারি খুশি হবে। মুকুন্দ মুরহর মুরারে!

[প্রস্থান

জয়সেন। মিহিরগুপ্ত, সমস্ত অবস্থা বুঝলে তো? এখন গৌরসেন যুধাজিৎ উদয়ভাস্কর ওদের কাছে শীঘ্র লোক পাঠাও। বলো, অবিলম্বে সকলে একত্র মিলে একটা পরামর্শ করা আবশ্যক।

মিহিরগুপ্ত। যে আজ্ঞা।

দ্বিতীয় দৃশ্য

অন্তঃপুর

বিক্রমদেব ও রানীর আত্মীয় সভাসদ

সভাসদ। ধন্য মহারাজ !
বিক্রমদেব। কেন এত ধন্যবাদ ?
সভাসদ। মহত্ত্বের এই তো লক্ষণ, দৃষ্টি তার
সকলের 'পরে। ক্ষুদ্রপ্রাণ ক্ষুদ্র জনে
পায় না দেখিতে। প্রবাসে পড়িয়া আছে
সেবক যাহারা, জয়সেন, যুধাজিৎ—
মহোৎসবে তাহাদের করেছ স্মরণ।
আনন্দে বিহ্বল তারা। সত্বর আসিছে
দলবল নিয়ে।
বিক্রমদেব। যাও, যাও। তুচ্ছ কথা,
তার লাগি এত যশোগান ! জানিও নে
আহূত হয়েছে কারা পূজার উৎসবে।
সভাসদ। রবির উদয়মাত্রে আলোকিত হয়
চরাচর, নাই চেষ্টা, নাহি পরিশ্রম,
নাহি তাহে ক্ষতিবৃদ্ধি তার। জানেও না
কোথা কোন্ তৃণতলে কোন্ বনফুল
আনন্দে ফুটিছে তার কনককিরণে।
কৃপাবৃষ্টি কর অবহেলে, যে পায় সে
ধন্য হয়।
বিক্রমদেব। থামো থামো, যথেষ্ট হয়েছে।
আমি যত অবহেলে কৃপাবৃষ্টি করি
তার চেয়ে অবহেলে সভাসদ্‌গণ
করে স্তুতিবৃষ্টি। বলা তো হয়েছে শেষ
যত কথা করেছ রচনা ? যাও এবে।

[সভাসদের প্রস্থান

সুমিত্রার প্রবেশ

কোথা যাও, একবার ফিরে চাও রানী
রাজা আমি পৃথিবীর কাছে, তুমি শুধু
জান মোরে দীন ব'লে। ঐশ্বর্য আমার
বাহিরে বিস্তৃত— শুধু তোমার নিকটে
ক্ষুধার্ত কঙ্কালসার কাঙাল বাসনা।
তাই কি ঘৃণার দর্পে চলে যাও দূরে
মহারানী, রাজরাজেশ্বরী !
সুমিত্রা। মহারাজ,
যে প্রেম করিছে ভিক্ষা সমস্ত বসুধা

একা আমি সে প্রেমের যোগ্য নই কভু।
বিক্রমদেব। অপদার্থ আমি! দীন কাপুরুষ আমি!
কর্তব্যবিমুখ আমি, অন্তঃপুরচারী!
কিন্তু মহারানী, সে কি স্বভাব আমার?
আমি ক্ষুদ্র, তুমি মহীয়সী? তুমি উচ্চে,
আমি ধূলিমাঝে? নহে তাহা। জানি আমি
আপন ক্ষমতা। রয়েছে দুর্জয় শক্তি
এ হৃদয়-মাঝে, প্রেমের আকারে তাহা
দিয়েছি তোমারে। বজ্রাগ্নিরে করিয়াছি
বিদ্যুতের মালা, পরায়েছি কণ্ঠে তব।
সুমিত্রা। ঘৃণা করো মহারাজ, ঘৃণা করো মোরে
সেও ভালো— একেবারে ভুলে যাও যদি
সেও সহ্য হয়— ক্ষুদ্র এ নারীর 'পরে
করিয়ো না বিসর্জন সমস্ত পৌরুষ।
বিক্রমদেব। এত প্রেম, হায়, তার এত অনাদর!
চাহ না এ প্রেম? না চাহিয়া দস্যুসম
নিতেছ কাড়িয়া। উপেক্ষার ছুরি দিয়া
কাটিয়া তুলিছ— রক্তসিক্ত তপ্ত প্রেম
মর্ম বিদ্ধ করি। ধূলিতে দিতেছ ফেলি
নির্মম নিষ্ঠুর! পাষাণপ্রতিমা তুমি,
যত বক্ষে চেপে ধরি অনুরাগভরে
তত বাজে বুকে।
সুমিত্রা। চরণে পতিত দাসী,
কী করিতে চাও করো। কেন তিরস্কার?
নাথ, কেন আজি এত কঠিন বচন!
কত অপরাধ তুমি করেছ মার্জনা,
কেন রোষ বিনা অপরাধে!
বিক্রমদেব। প্রিয়তমে,
উঠ উঠ, এসো বুকে— স্নিগ্ধ আলিঙ্গনে
এ দীপ্ত হৃদয়জ্বালা করহ নির্বাণ।
কত সুধা, কত ক্ষমা ওই অশ্রুজলে
অয়ি প্রিয়ে, কত প্রেম, কতই নির্ভর!
কোমল হৃদয়তলে তীক্ষ্ণ কথা বিঁধে
প্রেম-উৎস ছুটে— অর্জুনের শরাঘাতে
মর্মাহত ধরণীর ভোগবতী-সম।
নেপথ্যে। মহারানী!
সুমিত্রা। (অশ্রু মুছিয়া) দেবদত্ত! আর্য, কী সংবাদ?

দেবদত্তের প্রবেশ

দেবদত্ত। রাজ্যের নায়কগণ রাজনিমন্ত্রণ

করিয়াছে অবহেলা, বিদ্রোহের তরে
হয়েছে প্রস্তুত।

সুমিত্রা। শুনিতেছ মহারাজ ?

বিক্রমদেব। দেবদত্ত, অন্তঃপুর নহে মন্ত্রগৃহ।

দেবদত্ত। মহারাজ, মন্ত্রগৃহ অন্তঃপুর নহে,
তাই সেথা নৃপতির পাই নে দর্শন।

সুমিত্রা। স্পর্ধিত কুক্কুর যত বর্ধিত হয়েছে
রাজ্যের উচ্ছিষ্ট অন্নে ! রাজার বিরুদ্ধে
বিদ্রোহ করিতে চাহে ! এ কী অহংকার !
মহারাজ, মন্ত্রণার আছে কি সময় ?
মন্ত্রণার কী আছে বিষয় ! সৈন্য লয়ে
যাও অবিলম্বে, রক্তশোষী কীটদের
দলন করিয়া ফেলো চরণের তলে।

বিক্রমদেব। সেনাপতি শত্রুপক্ষ—

সুমিত্রা। নিজে যাও তুমি।

বিক্রমদেব। আমি কি তোমার উপদ্রব, অভিশাপ,
দুরদৃষ্ট, দুঃস্বপন, করলগ্ন কাঁটা ?
হেথা হতে এক পদ নড়িব না, রানী,
পাঠাইব সন্ধির প্রস্তাব। কে ঘটালে
এই উপদ্রব ! ব্রাহ্মণে নারীতে মিলে
বিবরের সুপ্তসর্প জাগাইয়া তুলি
এ কী খেলা ! আত্মরক্ষা-অসমর্থ যারা
নিশ্চিন্তে ঘটায় তারা পরের বিপদ।

সুমিত্রা। ধিক্ এ অভাগা রাজ্য, হতভাগ্য প্রজা !
ধিক্ আমি, এ রাজ্যের রানী !

[প্রস্থান

বিক্রমদেব। দেবদত্ত,
বন্ধুত্বের এই পুরস্কার ? বৃথা আশা !
রাজার অদৃষ্টে বিধি লেখে নি প্রণয় ;
ছায়াহীন সঙ্গীহীন পর্বতের মতো
একা মহাশূন্যমাঝে দগ্ধ উচ্চ শিরে
প্রেমহীন নীরস মহিমা— ঝঞ্ঝাবায়ু
করে আক্রমণ, বজ্র এসে বিঁধে, সূর্য
রক্তনেত্রে চাহে— ধরণী পড়িয়া থাকে
চরণ ধরিয়া। কিন্তু, ভালোবাসা কোথা !
রাজার হৃদয় সেও হৃদয়ের তরে
কাঁদে। হায় বন্ধু, মানবজীবন লয়ে
রাজত্বের ভান করা শুধু বিড়ম্বনা।
দম্ভ-উচ্চ সিংহাসন চূর্ণ হয়ে গিয়ে
ধরা-সাথে হোক সমতল, একবার

হৃদয়ের কাছাকাছি পাই তোমাদের।
বাল্যসখা, রাজা ব'লে ভুলে যাও মোরে,
একবার ভালো করে করো অনুভব
বান্ধবহৃদয়ব্যথা বান্ধবহৃদয়ে।

দেবদত্ত। সখা, এ হৃদয় মোর জানিয়ো তোমার।
কেবল প্রণয় নয়, অপ্রণয় তব
সেও আমি সব' অকাতরে, রোষানল
লব বক্ষ পাতি— যেমন অগাধ সিন্ধু
আকাশের বজ্র লয় বুকে।

বিক্রমদেব। দেবদত্ত,
সুখনীড়মাঝে কেন হানিছ বিরহ?
সুখস্বর্গমাঝে কেন আনিছ বহিয়া
হাহাধ্বনি?

দেবদত্ত। সখা, আগুন লেগেছে ঘরে,
আমি শুধু এনেছি সংবাদ— সুখনিদ্রা
দিয়েছি ভাঙায়ে।

বিক্রমদেব। এর চেয়ে সুখস্বপ্নে
মৃত্যু ছিল ভালো।

দেবদত্ত। ধিক্ লজ্জা, মহারাজ,
রাজ্যের মৃত্যুর চেয়ে তুচ্ছ স্বপ্নসুখ
বেশি হল?

বিক্রমদেব। যোগাসনে লীন যোগিবর
তার কাছে কোথা আছে বিশ্বের প্রলয়?
স্বপ্ন এ সংসার। অর্ধশত বর্ষপরে
আজিকার সুখদুঃখ কার মনে রবে?
যাও যাও, দেবদত্ত, যেথা ইচ্ছা তব।
আপন সান্ত্বনা আছে আপনার কাছে।
দেখে আসি ঘৃণাভরে কোথা গেল রানী।

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

মন্দির

পুরুষবেশে রানী সুমিত্রা। বাহিরে অনুচর

সুমিত্রা। জগৎ-জননী মাতা, দুর্বলহৃদয়
তনয়ারে করিয়ো মার্জনা। আজ সব
পূজা ব্যর্থ হল— শুধু সে সুন্দর মুখ
পড়ে মনে, সেই প্রেমপূর্ণ চক্ষু দুটি,
সেই শয্যা-'পরে একা সুপ্ত মহারাজ।

হায় মা, নারীর প্রাণ এত কি কঠিন !
দক্ষযজ্ঞে তুই যবে গিয়েছিলি সতী,
প্রতিপদে আপন হৃদয়খানি তোর
আপন চরণ দুটি জড়ায়ে কাতরে
বলে নি কি ফিরে যেতে পতিগৃহ-পানে।
সেই কৈলাসের পথে আর ফিরিল না
ও রাঙা চরণ। মা গো, সে দিনের কথা
দেখ্ মনে করে। জননী, এসেছি আমি
রমণীহৃদয় বলি দিতে, রমণীর
ভালোবাসা ছিন্নশতদলসম দিতে
পদতলে। নারী তুমি, নারীর হৃদয়
জান তুমি, বল দাও জননী আমারে।
থেকে থেকে ওই শুনি রাজগৃহ হতে
'ফিরে এসো, ফিরে এসো রানী'— প্রেমপূর্ণ
পুরাতন সেই কণ্ঠস্বর। খড়্গ নিয়ে
তুমি এসো, দাঁড়াও রুধিয়া পথ, বলো,
'তুমি যাও, রাজধর্ম উঠুক জাগিয়া—
ধন্য হোক রাজা, প্রজা হোক সুখী, রাজ্যে
ফিরে আসুক কল্যাণ— দূর হোক যত
অত্যাচার— ভূপতির যশোরশ্মি হতে
ঘুচে যাক কলঙ্ককালিমা। তুমি নারী
ধরাপ্রান্তে যেথা স্থান পাও, একাকিনী
বসে বসে নিজ দুঃখে মরো বুক ফেটে।'
পিতৃসত্যপালনের তরে রামচন্দ্র
গিয়াছেন বনে, পতিসত্যপালনের
লাগি আমি যাব। যে সত্যে আছেন বাঁধা
মহারাজ রাজ্যলক্ষ্মী-কাছে, কভু তাহা
সামান্য নারীর তরে ব্যর্থ হইবে না।

বাহিরে একজন পুরুষ ও স্ত্রীর প্রবেশ

অনুচর। কে তোরা ? দাঁড়া এইখানে।
পুরুষ। কেন বাবা ? এখেনেও কি স্থান নেই ?
স্ত্রী। মা গো ! এখেনেও সেই সিপাই !

সুমিত্রার বাহিরে আগমন

সুমিত্রা। তোমরা কে গো ?

পুরুষ। মিহিরগুপ্ত আমাদের ছেলেটিকে ধরে রেখে আমাদের তাড়িয়ে দিয়েছে। আমাদের চাল নেই, চুলো নেই, মরবার জায়গাটুকু নেই— তাই আমরা মন্দিরে এসেছি। মার কাছে হত্যা দিয়ে পড়ব, দেখি তিনি আমাদের কী গতি করেন।

স্ত্রী। তা, হাঁ গা, এখেনেও তোমরা সিপাই রেখেছ ? রাজার দরজা বন্ধ, আবার মায়ের দরজাও আগলে দাঁড়িয়েছ ?

সুমিত্রা। না বাছা, এসো তোমরা। এখানে তোমাদের কোনো ভয় নেই। কে তোমাদের উপর দৌরাত্ম্য করেছে?

পুরুষ। এই জয়সেন। আমরা রাজার কাছে দুঃখু জানাতে গিয়েছিলেম, রাজদর্শন পেলেম না। ফিরে এসে দেখি আমাদের ঘরদোর জ্বালিয়ে দিয়েছে, আমাদের ছেলেটিকে বেঁধে রেখেছে।

সুমিত্রা। (স্ত্রীলোকের প্রতি) হাঁ গা, তা তুমি রানীকে গিয়ে জানালে না কেন?

স্ত্রী। ওগো, রানীই তো রাজাকে জাদু করে রেখেছে। আমাদের রাজা ভালো, রাজার দোষ নেই— ঐ বিদেশ থেকে এক রানী এসেছে, সে আপন কুটুম্বুদের রাজ্য জুড়ে বসিয়েছে। প্রজার বুকের রক্ত শুষে খাচ্ছে গো!

পুরুষ। চুপ কর্ মাগী! তুই রানীর কী জানিস? যে কথা জানিস নে তা মুখে আনিস নে।

স্ত্রী। জানি গো জানি। ঐ রানীই তো বসে বসে রাজার কাছে আমাদের নামে যত কথা লাগায়।

সুমিত্রা। ঠিক বলেছ বাছা! ঐ রানী সর্বনাশীই তো যত নষ্টের মূল। তা, সে আর বেশি দিন থাকবে না, তার পাপের ভরা পূর্ণ হয়েছে। এই নাও, আমার সাধ্যমত কিছু দিলাম, সব দুঃখ দূর করতে পারি নে।

পুরুষ। আহা, তুমি কোনো রাজার ছেলে হবে, তোমার জয় হোক।

সুমিত্রা। আর বিলম্ব নয়, এখনি যাব।

[প্রস্থান

ত্রিবেদীর প্রবেশ

ত্রিবেদী। হে হরি, কী দেখলুম! পুরুষমূর্তি ধরে রানী সুমিত্রা ঘোড়ায় চড়ে চলেছেন। মন্দিরে দেবপুজোর ছলে এসে রাজ্য ছেড়ে পালিয়েছেন। আমাকে দেখে বড়ো খুশি। মধুসূদন! ভাবলে ব্রাহ্মণ বড়ো সরল-হৃদয়, মাথার তেলোয় যেমন একগাছি চুল দেখা যায় না, তলায় তেমনি বুদ্ধির লেশমাত্র নেই। একে দিয়ে একটা কাজ করিয়ে নেওয়া যাক। এর মুখ দিয়ে রাজাকে দুটো মিষ্টি কথা পাঠিয়ে দেওয়া যাক।' বাবা, তোমরা বেঁচে থাকো। যখনি তোমাদের কিছু দরকার পড়বে বুড়ো ত্রিবেদীকে ডেকো, আর দান-দক্ষিণের বেলায় দেবদত্ত আছেন। দয়াময়! তা বলব! খুব মিষ্টি মিষ্টি করেই বলব। আমার মুখে মিষ্টি কথা আরো বেশি মিষ্টি হয়ে ওঠে। কমললোচন! রাজা কী খুশিই হবে। কথাগুলো যত বড়ো বড়ো করে বলব রাজার মুখের হাঁ তত বেড়ে যাবে। দেখেছি, আমার মুখে বড়ো কথাগুলো শোনায় ভালো। লোকের বিশেষ আমোদ বোধ হয়। বলে, ব্রাহ্মণ বড়ো সরল। পতিতপাবন! এবারে কতটা আমোদ হবে বলতে পারি নে। কিন্তু শব্দশাস্ত্র একেবারে উলট-পালট করে দেব। আঃ কী দুর্যোগ! আজ সমস্ত দিন দেবপুজো হয় নি, এইবার একটু পুজো-অর্চনায় মন দেওয়া যাক। দীনবন্ধু ভক্তবৎসল!

[প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

প্রাসাদ

বিক্রমদেব মন্ত্রী ও দেবদত্ত

বিক্রমদেব। পলায়ন! রাজ্য ছেড়ে পলায়ন! এ রাজ্যেতে
যত সৈন্য, যত দুর্গ, যত কারাগার,
যত লোহার শৃঙ্খল আছে, সব দিয়ে
পারে না কি বাঁধিয়া রাখিতে দৃঢ়বলে

ক্ষুদ্র এক নারীর হৃদয় ? এই রাজা ?
এই কি মহিমা তার ? বৃহৎ প্রতাপ,
লোকবল অর্থবল নিয়ে পড়ে থাকে
শূন্য স্বর্ণপিঞ্জরের মতো, ক্ষুদ্র পাখি
উড়ে চলে যায় ।

মন্ত্রী । হায় হায়, মহারাজ,
লোকনিন্দা, ভগ্নবাঁধ জলস্রোত-সম,
ছুটে চারি দিক হতে ।

বিক্রমদেব । চুপ করো মন্ত্রী !
লোকনিন্দা, লোকনিন্দা সদা ! নিন্দাভারে
রসনা খসিয়া যাক অলস লোকের ।
দিবা যদি গেল, উঠুক-না চুপি চুপি
ক্ষুদ্র পঙ্ককুণ্ড হতে দুষ্ট বাষ্পরাশি,
অমার আঁধার তাহে বাড়িবে না কিছু ।
লোকনিন্দা !

দেবদত্ত । মন্ত্রী, পরিপূর্ণ সূর্য-পানে
কে পারে তাকাতে ? তাই গ্রহণের বেলা
ছুটে আসে যত মর্তলোক, দীননেত্রে
চেয়ে দেখে দুর্দিনের দিনপতি-পানে,
আপনার কালিমাখা কাচখণ্ড দিয়ে
কালো দেখে গগনের আলো । মহারানী,
মা-জননী, এই ছিল অদৃষ্টে তোমার ?
তব নাম ধুলায় লুটায় ? তব নাম
ফিরে মুখে মুখে ? একি এ দুর্দিন আজি !
তবু তুমি তেজস্বিনী সতী, এরা সব
পথের কাঙাল ।

বিক্রমদেব । ত্রিবেদী কোথায় গেল ?
মন্ত্রী, ডেকে আনো তারে । শোনা হয় নাই
তার সব কথা, ছিনু অন্যমনে ।

মন্ত্রী । যাই
ডেকে আনি তারে ।

[প্রস্থান

বিক্রমদেব । এখনো সময় আছে,
এখনো ফিরাতে পারি পাইলে সন্ধান ।
আবার সন্ধান ? এমনি কি চিরদিন
কাটিবে জীবন ? সে দিবে না ধরা, আমি
ফিরিব পশ্চাতে ? প্রেমের শৃঙ্খল হাতে
রাজ্য রাজধর্ম ফেলে শুধু রমণীর
পলাতক হৃদয়ের সন্ধানে ফিরিব ?
পলাও, পলাও নারী, চির দিনরাত

করো পলায়ন গৃহহীন, প্রেমহীন,
বিশ্রামবিহীন, অনাবৃত পৃথ্বীমাঝে
কেবল পশ্চাতে লয়ে আপনার ছায়া।

ত্রিবেদীর প্রবেশ

চলে যাও, দূর হও, কে ডাকে তোমারে ?
বার বার তার কথা কে চাহে শুনিতে—
প্রগল্‌ভ ব্রাহ্মণ, মূর্খ !

ত্রিবেদী। হে মধুসূদন !

[প্রস্থানোদ্যম

বিক্রমদেব। শোনো, শোনো, দুটো কথা শুধাবার আছে।
চোখে অশ্রু ছিল ?

ত্রিবেদী। চিন্তা নেই বাপু ! অশ্রু
দেখি নাই।

বিক্রমদেব। মিথ্যা করে বলো। অতি ক্ষুদ্র
সকরুণ দুটি মিথ্যে কথা। হে ব্রাহ্মণ,
বৃদ্ধ তুমি ক্ষীণদৃষ্টি কী করে জানিলে
চোখে তার অশ্রু ছিল কি না ? বেশি নয়,
একবিন্দু জল ! নহে তো নয়নপ্রান্তে
ছলছল ভাব, কম্পিত কাতর কণ্ঠে
অশ্রুবদ্ধ বাণী ! তাও নয় ? সত্য বলো,
মিথ্যা বলো। বোলো না, বোলো না, চলে যাও।

ত্রিবেদী। হরি হে, তুমিই সত্য !

[প্রস্থান

বিক্রমদেব। অন্তর্যামী দেব,
তুমি জান জীবনের সব অপরাধ
তারে ভালোবাসা। পুণ্য গেল, স্বর্গ গেল,
রাজ্য যায়, অবশেষে সেও চলে গেল !
তবে দাও, ফিরে দাও ক্ষাত্রধর্ম মোর—
রাজধর্ম ফিরে দাও, পুরুষহৃদয়
মুক্ত করে দাও এই বিশ্বরঙ্গমাঝে।
কোথা কর্মক্ষেত্র ! কোথা জনস্রোত ! কোথা
জীবনমরণ ! কোথা সেই মানবের
অবিশ্রাম সুখদুঃখ-বিপদসম্পদ-
তরঙ্গ উচ্ছ্বাস !

মন্ত্রীর প্রবেশ

মন্ত্রী। মহারাজ, অশ্বারোহী
পাঠায়েছি চারি দিকে রাজ্ঞীর সন্ধানে।

বিক্রমদেব। ফিরাও ফিরাও মন্ত্রী ! স্বপ্ন ছুটে গেছে,
অশ্বারোহী কোথা তারে পাইবে খুঁজিয়া ?

সৈন্যদল করহ প্রস্তুত । যুদ্ধে যাব,
নাশিব বিদ্রোহ ।

মন্ত্রী । যে আদেশ মহারাজ !

[প্রস্থান

বিক্রমদেব । দেবদত্ত, কেন নত মুখ, ম্লান দৃষ্টি ?
ক্ষুদ্র সান্ত্বনার কথা বোলো না ব্রাহ্মণ !
আমারে পশ্চাতে ফেলে চলে গেছে চোব,
আপনারে পেয়েছি কুড়ায়ে । আজি সখা,
আনন্দের দিন । এসো আলিঙ্গনপাশে ।

আলিঙ্গন করিয়া

বন্ধু, বন্ধু, মিথ্যা কথা, মিথ্যা এই ভান ।
থেকে থেকে বজ্রশেল ছুটিছে, বিঁধেছে
মর্মে । এসো, এসো, একবার অশ্রুজল
ফেলি বন্ধুর হৃদয়ে । মেঘ যাক কেটে ।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কাশ্মীর

প্রাসাদসম্মুখে রাজপথ । দ্বারে শংকর

শংকর । এতটুকু ছিল, আমার কোলে খেলা করত । যখন কেবল চারটি দাঁত উঠেছে তখন সে আমাকে 'সংকল দাদা' বলত । এখন বড়ো হয়ে উঠেছে, এখন সংকল দাদার কোলে আর ধরে না, এখন সিংহাসন চাই । স্বর্গীয় মহারাজ মরবার সময় তোদের দুটি ভাইবোনকে আমার কোলে দিয়ে গিয়েছিল । বোনটি তো দুদিন বাদে স্বামীর কোলে গেল । মনে করেছিলুম কুমারসেনকে আমার কোল থেকে একেবারে সিংহাসনে উঠিয়ে দেব । কিন্তু খুড়ো-মহারাজ আর সিংহাসন থেকে নাবেন না । শুভলগ্ন কতবার হল, কিন্তু আজ কাল করে আর সময় হল না । কত ওজর কত আপত্তি ! আরে ভাই, সংকলের কোল এক, আর সিংহাসন এক । বুড়ো হয়ে গেলুম— তোকে কি আর রাজাসনে দেখে যেতে পারব !

দুইজন সৈনিকের প্রবেশ

প্রথম সৈনিক । আমাদের যুবরাজ কবে রাজা হবে রে ভাই ? সেদিন আমি তোদের সকলকে মহুয়া খাওয়াব ।

দ্বিতীয় সৈনিক । আরে, তুই তো মহুয়া খাওয়াবি— আমি জান্ দেব, আমি লড়াই করে করে বেড়াব, আমি পাঁচটা গাঁ লুট করে আনব । আমি আমার মহাজন বেটার মাথা ভেঙে দেব । বলিস তো, আমি খুশি হয়ে যুবরাজের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অমনি মরে পড়ে যাব ।

প্রথম সৈনিক । তা কি আমি পারি নে ? মরবার কথা কী বলিস ? আমার যদি সওয়া-শো বরষ পরমায়ু থাকে আমি যুবরাজের জন্যে রোজ নিয়মিত দু-সন্ধে দুবার করে মরতে পারি । তা ছাড়া উপরি আছে ।

দ্বিতীয় সৈনিক। ওরে, যুবরাজ তো আমাদেরই। স্বর্গীয় মহারাজ তাকে আমাদেরই হাতে দিয়ে গেছেন। আমরা তাকে কাঁধে করে ঢাক বাজিয়ে রাজা করে দেব। তা, কাউকে ভয় করব না—

প্রথম সৈনিক। খুড়ো-মহারাজকে গিয়ে বলব, তুমি নেমে এসো, আমরা রাজপুত্তুরকে সিংহাসনে চড়িয়ে আনন্দ করতে চাই।

দ্বিতীয় সৈনিক। শুনেছিস, পূর্ণিমাতিথিতে যুবরাজের বিয়ে?

প্রথম সৈনিক। সে তো পাঁচ বৎসর ধরে শুনে আসছি।

দ্বিতীয় সৈনিক। এইবার পাঁচ বৎসর পূর্ণ হয়ে গেছে। ত্রিচূড়ের রাজবংশে নিয়ম চলে আসছে যে, পাঁচ বৎসর রাজকন্যার অধীন হয়ে থাকতে হবে। তার পর তার হুকুম হলে বিয়ে হবে।

প্রথম সৈনিক। বাবা, এ আবার কী নিয়ম! আমরা ক্ষত্রিয়, আমাদের চিরকাল চলে আসছে, শ্বশুরের গালে চড় মেরে মেয়েটার ঝুঁটি ধরে টেনে নিয়ে আসি— ঘণ্টা দুয়ের মধ্যে সমস্ত পরিষ্কার হয়ে যায়। তার পরে আবার দশটা বিয়ে করবার ফুরসৎ পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় সৈনিক। যোধমল, সেদিন কী করবি বল্ দেখি।

প্রথম সৈনিক। সেদিন আমিও আর-একটা বিয়ে করে ফেলব।

দ্বিতীয় সৈনিক। শাবাশ বলেছিস রে ভাই!

প্রথম সৈনিক। মহিচাঁদের মেয়ে! খাসা দেখতে ভাই! কী চোখ রে! সেদিন বিতস্তায় জল আনতে যাচ্ছিল, দুটো কথা বলতে গেলুম, কঙ্কণ তুলে মারতে এল। দেখলুম চোখের চেয়ে তার কঙ্কণ ভয়ানক। চট্‌পট্ সরে পড়তে হল।

গান

ওই আঁখি রে!
ফিরে ফিরে চেয়ো না, চেয়ো না, ফিরে যাও
কী আর রেখেছ বাকি রে!
মরমে কেটেছ সিঁধ, নয়নের কেড়েছ নিদ—
কী সুখে পরান আর রাখি রে!

দ্বিতীয় সৈনিক। শাবাশ ভাই!

প্রথম সৈনিক। ঐ দেখ্ শংকরদাদা। যুবরাজ এখানে নেই— তবু বুড়ো সাজ-সজ্জা করে সেই দুয়োরে বসে আছে। পৃথিবী যদি উলট-পালট হয়ে যায় তবু বুড়োর নিয়মের ত্রুটি হবে না।

দ্বিতীয় সৈনিক। আয় ভাই, ওকে যুবরাজের দুটো কথা জিজ্ঞাসা করা যাক।

প্রথম সৈনিক। জিজ্ঞাসা করলে ও কি উত্তর দেবে? ও তেমন বুড়ো নয়। যেন ভরতের রাজত্বে রামচন্দ্রের জুতোজোড়াটার মতো পড়ে আছে, মুখে কথাটি নেই।

দ্বিতীয় সৈনিক। (শংকরের নিকটে গিয়া) হাঁ দাদা, বলো-না দাদা, যুবরাজ রাজা হবে কবে?

শংকর। তোদের সে খবরে কাজ কী?

প্রথম সৈনিক। না না, বলছি, আমাদের যুবরাজের বয়স হয়েছে, এখন খুড়োরাজা নাবছে না কেন?

শংকর। তাতে দোষ হয়েছে কী? হাজার হোক, খুড়ো তো বটে।

দ্বিতীয় সৈনিক। তা তো বটেই। কিন্তু যে দেশের যেমন নিয়ম— আমাদের নিয়ম আছে যে—

শংকর। নিয়ম তোরা মানবি, আমরা মানব, বড়োলোকের আবার নিয়ম কী? সবাই যদি নিয়ম মানবে তবে নিয়ম গড়বে কে!

প্রথম সৈনিক। আচ্ছা, দাদা, তা যেন হল— কিন্তু এই পাঁচ বছর ধরে বিয়ে করা এ কেমন নিয়ম দাদা? আমি তো বলি, বিয়ে করা বাণ খাওয়ার মতো— চট্ করে লাগল তীর, তার পরে ইহজন্মের মতো বিঁধে রইল। আর ভাবনা রইল না। কিন্তু দাদা, পাঁচ বৎসর ধরে এ কী রকম কারখানা!

শংকর। তোদের আশ্চর্য ঠেকবে বলে কি যে দেশের যা নিয়ম তা উলটে যাবে? নিয়ম তো কারো ছাড়বার জো নেই। এ সংসার নিয়মেই চলছে। যা যা, আর বকিস নে, যা! এ-সকল কথা তোদের মুখে ভালো শোনায় না।

প্রথম সৈনিক। তা চললুম। আজকাল আমাদের দাদার মেজাজ ভালো নেই। একেবারে শুকিয়ে যেন খড় খড় করছে।

[সৈনিকদ্বয়ের প্রস্থান

পুরুষবেশী সুমিত্রার প্রবেশ

সুমিত্রা। তুমি কি শংকরদাদা?
শংকর। কে তুমি ডাকিলে
পুরাতন পরিচিত স্নেহভরা সুরে?
কে তুমি পথিক?
সুমিত্রা। এসেছি বিদেশ হতে।
শংকর। এ কি স্বপ্ন দেখি আমি? কী মন্ত্রকুহকে
কুমার আবার এল বালক হইয়া
শংকরের কাছে! যেন সেই সন্ধ্যাবেলা
খেলাশ্রান্ত সুকুমার বাল্যতনুখানি,
চরণকমল ক্লিষ্ট, বিবর্ণ কপোল,
ক্লান্ত শিশু-হিয়া, বৃদ্ধ শংকরের বুকে
বিশ্রাম মাগিছে।
সুমিত্রা। জালন্ধর হতে আমি
এসেছি সংবাদ লয়ে কুমারের কাছে।
শংকর। কুমারের বাল্যকাল এসেছে আপনি
কুমারের কাছে! শৈশবের খেলাধুলা
মনে করে দিতে, ছোটো বোন পাঠায়েছে
তারে! দূত, তুমি এ মূর্তি কোথায় পেলে?
মিছে বকিতেছি কত! ক্ষমা করো মোরে।
বলো বলো কী সংবাদ। রানীদিদি মোর
ভালো আছে, সুখে আছে, পতির সোহাগে
মহিষীগৌরবে? সুখে প্রজাগণ তারে
মা বলিয়া করে আশীর্বাদ? রাজ্যলক্ষ্মী
অন্নপূর্ণা বিতরিছে রাজ্যের কল্যাণ?
ধিক্ মোরে, শ্রান্ত তুমি পথশ্রমে, চলো
গৃহে চলো। বিশ্রামের পরে একে একে
বোলো তুমি সকল সংবাদ। গৃহে চলো!
সুমিত্রা। শংকর, মনে কি আছে এখনো রানীরে?
শংকর। সেই কণ্ঠস্বর! সেই গভীর গম্ভীর
দৃষ্টি স্নেহভারনত। একি মরীচিকা!
এনেছ কি চুরি করে মোর সুমিত্রার
ছায়াখানি? মনে নাই তারে! তুমি বুঝি

তাহারি অতীত স্মৃতি বাহিরিয়া এলে
আমারি হৃদয় হতে আমারে ছলিতে ?
বার্ধক্যের মুখরতা ক্ষমা করো যুবা !
বহুদিন মৌন ছিনু— আজ কত কথা
আসে মুখে, চোখে আসে জল । নাহি জানি
কেন এত স্নেহ আসে মনে, তোমা-'পরে ।
যেন তুমি চিরপরিচিত । যেন তুমি
চিরজীবনের মোর আদরের ধন ।

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

ত্রিচূড়

ক্রীড়াকানন

কুমারসেন ইলা ও সখীগণ

ইলা । যেতে হবে ? কেন যেতে হবে যুবরাজ ?
ইলারে লাগে না ভালো দু দণ্ডের বেশি ?
ছি ছি চঞ্চলহৃদয় !

কুমারসেন । প্রজাগণ সবে—

ইলা । তারা কি আমার চেয়ে হয় ম্রিয়মাণ
তব অদর্শনে ? রাজ্যে তুমি চলে গেলে
মনে হয়, আর আমি নেই । যতক্ষণ
তুমি মোরে মনে কর ততক্ষণ আছি,
একাকিনী কেহ নই আমি । রাজ্যে তব
কত লোক, কত চিন্তা, কত কার্যভার,
কত রাজ-আড়ম্বর ! আর সব আছে,
শুধু সেথা ক্ষুদ্র ইলা নাই ।

কুমারসেন । সব আছে
তবু কিছু নাই, তুমি না থেকেও আছ
প্রাণতমে !

ইলা । মিছে কথা বোলো না কুমার !
তুমি রাজা আপন রাজত্বে— এ অরণ্যে
আমি রানী, তুমি প্রজা মোর । কোথা যাবে ?
যেতে আমি দিব না তোমারে । সখী, তোরা
আয় । এরে বাঁধ্ ফুলপাশে, কর গান,
কেড়ে নে সকলে মিলি রাজ্যের ভাবনা ।

সখীদের গান

যদি আসে তবে কেন যেতে চায় ?
দেখা দিয়ে তবে কেন গো লুকায় ?
চেয়ে থাকে ফুল হৃদয় আকুল, বায়ু বলে এসে 'ভেসে যাই' ।
ধরে রাখো, ধরে রাখো, সুখপাখি ফাঁকি দিয়ে উড়ে যায় ।
পথিকের বেশে সুখনিশি এসে বলে হেসে হেসে 'মিশে যাই'
জেগে থাকো, জেগে থাকো, বরষের সাধ নিমেষে মিলায় ।

কুমারসেন । আমারে কী করেছিস, অয়ি কুহকিনী !
নির্বাপিত আমি । সমস্ত জীবন মন
নয়ন বচন ধাইছে তোমার পানে
কেবল বাসনাময় হয়ে । যেন আমি
আমারে ভাঙিয়ে দিয়ে ব্যাপ্ত হয়ে যাব
তোমার মাঝারে প্রিয়ে ! যেন মিশে রব
সুখস্বপ্ন হয়ে ওই নয়নপল্লবে ।
হাসি হয়ে ভাসিব অধরে । বাহু দুটি
ললিত লাবণ্যসম রহিব বেড়িয়া,
মিলনসুখের মতো কোমল হৃদয়ে
রহিব মিলায়ে ।

ইলা । তার পরে অবশেষে
সহসা টুটিবে স্বপ্নজাল, আপনারে
পড়িবে স্মরণে । গীতহীনা বীণাসম
আমি পড়ে রব ভূমে, তুমি চলে যাবে
গুনগুন্ গাহি অন্যমনে । না না সখা,
স্বপ্ন নয়, মোহ নয়, এ মিলনপাশ
কখন বাঁধিয়া যাবে বাহুতে বাহুতে,
চোখে চোখে, মর্মে মর্মে, জীবনে জীবনে !

কুমারসেন । সে তো আর দেরি নাই— আজি সপ্তমীর
অর্ধচাঁদ ক্রমে ক্রমে পূর্ণশশী হয়ে
দেখিবেক আমাদের পূর্ণ সে মিলন ।
ক্ষীণ বিচ্ছেদের বাধা মাঝখানে রেখে
কম্পিত আগ্রহবেগে মিলনের সুখ—
আজি তার শেষ । দূরে থেকে কাছাকাছি,
কাছে থেকে তবু দূর— আজি তার শেষ ।
সহসা সাক্ষাৎ, সহসা বিস্ময়রাশি,
সহসা মিলন, সহসা বিরহব্যথা—
বনপথ দিয়ে ধীরে ধীরে ফিরে যাওয়া
শূন্য গৃহপানে সুখস্মৃতি সঙ্গে নিয়ে,
প্রতি কথা প্রতি হাসিটুকু শতবার
উলটি পালটি মনে— আজি তার শেষ ।
মৌন লজ্জা প্রতিবার প্রথম মিলনে,

অশ্রুজল প্রতিবার বিদায়ের বেলা—
আজি তার শেষ।

ইলা। আহা, তাই যেন হয়।
সুখের ছায়ার চেয়ে সুখ ভালো, দুঃখ
সেও ভালো। তৃষ্ণা ভালো মরীচিকা চেয়ে।
কখন তোমারে পাব, কখন পাব না,
তাই সদা মনে হয়— কখন হারাব,
একা বসে বসে ভাবি কোথা আছ তুমি,
কী করিছ। কল্পনা কাঁদিয়া ফিরে আসে
অরণ্যের প্রান্ত হতে। বনের বাহিরে
তোমারে জানি নে আর, পাই নে সন্ধান।
সমস্ত ভুবনে তব রহিব সর্বদা—
কিছুই রবে না আর অচেনা, অজানা,
অন্ধকার। ধরা দিতে চাহ না কি নাথ?

কুমারসেন। ধরা তো দিয়েছি আমি আপন ইচ্ছায়,
তবু কেন বন্ধনের পাশ? বলো দেখি
কী তুমি পাও নি, কোথা রয়েছে অভাব।

ইলা। যখন তোমার কাছে সুমিত্রার কথা
শুনি ব'সে, মনে মনে ব্যথা যেন বাজে।
মনে হয় সে যেন আমায় ফাঁকি দিয়ে
চুরি করে রাখিয়াছে শৈশব তোমার
গোপনে আপন-কাছে। কভু মনে হয়,
যদি সে ফিরিয়া আসে, বাল্যসহচরী
ডেকে নিয়ে যায় সেই সুখশৈশবের
খেলাঘরে, সেথা তারি তুমি। সেথা মোর
নাই অধিকার। মাঝে মাঝে সাধ যায়,
তোমার সে সুমিত্রারে দেখি একবার।

কুমারসেন। সে যদি আসিত, আহা, কত সুখ হত!
উৎসবের আনন্দকিরণখানি হয়ে
দীপ্তি পেত পিতৃগৃহে শৈশবভবনে।
অলংকারে সাজাত তোমারে, বাহুপাশে
বাঁধিত সাদরে, চুরি করে হাসিমুখে
দেখিত মিলন। আর কি সে মনে করে
আমাদের? পরগৃহে পর হয়ে আছে।

ইলার গান

এরা পরকে আপন করে, আপনারে পর—
বাহিরে বাঁশির রবে ছেড়ে যায় ঘর।
ভালোবাসে সুখে দুখে,
ব্যথা সহে হাসিমুখে,
মরণেরে করে চির জীবননির্ভর।

কুমারসেন। কেন এ করুণ সুর ? কেন দুঃখগান ?
বিষণ্ণ নয়ন কেন ?

ইলা। এ কি দুঃখগান ?
শোনায় গভীর সুখ দুঃখের মতন
উদার উদাস। সুখদুঃখ ছেড়ে দিয়ে
আত্মবিসর্জন করি রমণীর সুখ।

কুমারসেন। পৃথিবী করিব বশ তোমার এ প্রেমে।
আনন্দে জীবন মোর উঠে উচ্ছ্বসিয়া
বিশ্বমাঝে। শ্রান্তিহীন কর্মসুখতরে
ধায় হিয়া। চিরকীর্তি করিয়া অর্জন
তোমারে করিব তার অধিষ্ঠাত্রী দেবী।
বিরলে বিলাসে ব'সে এ অগাধ প্রেম
পারি নে করিতে ভোগ অলসের মতো।

ইলা। ওই দেখো রাশি রাশি মেঘ উঠে আসে
উপত্যকা হতে, ঘিরিতে পর্বতশৃঙ্গ—
সৃষ্টির বিচিত্র লেখা মুছিয়া ফেলিতে।

কুমারসেন। দক্ষিণে চাহিয়া দেখো— অস্তরবিকরে
সুবর্ণসমুদ্রসম সমতলভূমি
গেছে চলে নিরুদ্দেশ কোন্ বিশ্ব-পানে।
শস্যক্ষেত্র, বনরাজি, নদী, লোকালয়
অস্পষ্ট সকলি— যেন স্বর্ণ চিত্রপটে
শুধু নানা বর্ণসমাবেশ, চিত্ররেখা
এখনো ফোটে নি। যেন আকাঙ্ক্ষা আমারই
শৈল-অন্তরাল ছেড়ে ধরণীর পানে
চলেছে বিস্তৃত হয়ে হৃদয়ে বহিয়া
কল্পনার স্বর্ণলেখা ছায়াস্ফুট ছবি।
আহা, হোথা কত দেশ, নব দৃশ্য কত,
কত নব কীর্তি, কত নব রঙ্গভূমি !

ইলা। অনন্তের মূর্তি ধরে ওই মেঘ আসে
মোদের করিতে গ্রাস। নাথ, কাছে এসো।
আহা, যদি চিরকাল এই মেঘমাঝে
লুপ্ত বিশ্বে থাকিতাম তোমাতে আমাতে,
দুটি পাখি একমাত্র মহামেঘনীড়ে।
পারিতে থাকিতে তুমি ? মেঘ-আবরণ
ভেদ করে কোথা হতে পশিত শ্রবণে
ধরার আহ্বান, তুমি ছুটে চলে যেতে
আমারে ফেলিয়া রেখে প্রলয়ের মাঝে।

পরিচারিকার প্রবেশ

পরিচারিকা। কাশ্মীরে এসেছে দূত জালন্ধর হতে
গোপন সংবাদ লয়ে।

কুমারসেন । তবে যাই, প্রিয়ে,
আবার আসিব ফিরে, পূর্ণিমার রাতে
নিয়ে যাব হৃদয়ের চিরপূর্ণিমারে—
হৃদয়দেবতা আছ, গৃহলক্ষ্মী হবে ।

[প্রস্থান

ইলা । যাও তুমি, আমি একা কেমনে পারিব
তোমারে রাখিতে ধরে ! হায়, কত ক্ষুদ্র,
কত ক্ষুদ্র আমি ! কী বৃহৎ এ সংসার,
কী উদ্দাম তোমার হৃদয় ! কে জানিবে
আমার বিরহ ! কে গনিবে অশ্রু মোর !
কে মানিবে এ নিভৃত বনপ্রান্তভাগে
শূন্যহিয়া বালিকার মর্মকাতরতা !

তৃতীয় দৃশ্য

কাশ্মীর

যুবরাজের প্রাসাদ

কুমারসেন ও ছদ্মবেশী সুমিত্রা

কুমারসেন । কত-যে আগ্রহ মোর কেমনে দেখাব
তোমারে ভগিনী ! আমারে ব্যথিছে যেন
প্রত্যেক নিমেষ পল— যেতে চাই আমি
এখনি লইয়া সৈন্য, দুর্বিনীত সেই
দস্যুদের করিতে দমন, কাশ্মীরের
কলঙ্ক করিতে দূর । কিন্তু পিতৃব্যের
পাই নে আদেশ । ছদ্মবেশ দূর করো
বোন ! চলো মোরা যাই দোঁহে, পড়ি গিয়ে
রাজার চরণে ।

সুমিত্রা । সে কী কথা ভাই ! আমি
এসেছি তোমার কাছে, জানাতে তোমারে
ভগিনীর মনোব্যথা । আমি কি এসেছি
জালন্ধর রাজ্য হতে ভিখারিনী রানী
ভিক্ষা মাগিবার তরে কাশ্মীরের কাছে ?
ছদ্মবেশ দহিছে হৃদয় । আপনার
পিতৃগৃহে আসিলাম এতদিন পরে
আপনারে করিয়া গোপন ! কতবার
বৃদ্ধ শংকরের কাছে কণ্ঠ রুদ্ধ হল
অশ্রুভরে— কতবার মনে করেছিনু
কাঁদিয়া তাহারে বলি, 'শংকর শংকর,

তোদের সুমিত্রা সেই ফিরিয়া এসেছে
দেখিতে তোদের ।' হায়, বৃদ্ধ, কত অশ্রু
ফেলে গিয়েছিনু সেই বিদায়ের দিনে,
মিলনের অশ্রুজল নারিলাম দিতে ।
শুধু আমি নহি আর কন্যা কাশ্মীরের,
আজ আমি জালন্ধর-রানী ।

কুমারসেন । বুঝিয়াছি
বোন ! যাই দেখি, অন্য কী উপায় আছে ।

চতুর্থ দৃশ্য

কাশ্মীর-প্রাসাদ

অন্তঃপুর

রেবতী ও চন্দ্রসেন

রেবতী । যেতে দাও মহারাজ ! কী ভাবিছ বসি ?
ভাবিছ কী লাগি ? যাক যুদ্ধে, তার পরে
দেবতাকৃপায় আর যেন নাহি আসে
ফিরে ।

চন্দ্রসেন । ধীরে রানী, ধীরে ।

রেবতী । ক্ষুধিত মার্জার
বসে ছিলে এতদিন সময় চাহিয়া,
আজ তো সময় এল— তবু আজও কেন
সেই বসে আছ ?

চন্দ্রসেন । কে বসিয়া ছিল, রানী,
কিসের লাগিয়া ?

রেবতী । ছি ছি, আবার ছলনা ?
লুকাবে আমার কাছে ? কোন্ অভিপ্রায়ে
এতদিন কুমারের দাও নি বিবাহ ?
কেন-বা সম্মতি দিলে ত্রিচূড়রাজ্যের
এই অনার্য প্রথায় ? পঞ্চবর্ষ ধরে
কন্যার সাধনা ।

চন্দ্রসেন । ধিক্ ! চুপ করো রানী—
কে বোঝে কাহার অভিপ্রায় ?

রেবতী । তবে, বুঝে
দেখো ভালো করে । যে কাজ করিতে চাও
জেনে শুনে করো । আপনার কাছ হতে
রেখো না গোপন করে উদ্দেশ্য আপন ।
দেবতা তোমার হয়ে অলক্ষ্য সন্ধানে

করিবে না তব লক্ষ্যভেদ। নিজহাতে
উপায় রচনা করো অবসর বুঝে।
বাসনার পাপ সেই হতেছে সঞ্চয়,
তার পরে কেন থাকে অসিদ্ধির ক্লেশ ?
কুমারে পাঠাও যুদ্ধে।

চন্দ্রসেন। বাহিরে রয়েছে
কাশ্মীরের যত উপদ্রব। পররাজ্যে
আপনার বিষদন্ত করিতেছে ক্ষয়।
ফিরায়ে আনিতে চাও তাদের আবার ?

রেবতী। অনেক সময় আছে সে কথা ভাবিতে।
আপাতত পাঠাও কুমারে। প্রজাগণ
ব্যগ্র অতি যৌবরাজ্য-অভিষেক-তরে,
তাদের থামাও কিছুদিন। ইতিমধ্যে
কত কী ঘটিতে পারে, পরে ভেবে দেখো।

কুমারের প্রবেশ

কুমারের প্রতি

রেবতী। যাও যুদ্ধে, পিতৃব্যের হয়েছে আদেশ।
বিলম্ব কোরো না আর, বিবাহ-উৎসব
পরে হবে। দীপ্ত যৌবনের তেজ ক্ষয়
করিয়ো না গৃহে ব'সে আলস্য-উৎসবে।

কুমারসেন। জয় হোক, জয় হোক জননী তোমার !
একি আনন্দসংবাদ ! নিজমুখে তাত,
করহ আদেশ।

চন্দ্রসেন। যাও তবে। দেখো বৎস,
থেকো সাবধানে। দর্পমদে ইচ্ছা ক'রে
বিপদে দিয়ো না ঝাঁপ। আশীর্বাদ করি
ফিরে এসো জয়গর্বে অক্ষত শরীরে
পিতৃসিংহাসন-'পরে।

কুমারসেন। মাগি জননীর
আশীর্বাদ।

রেবতী। কী হইবে মিথ্যা আশীর্বাদে ?
আপনারে রক্ষা করে আপনার বাহু।

পঞ্চম দৃশ্য

ত্রিচূড়

ক্রীড়াকানন

ইলার সখীগণ

প্রথম সখী। আলো কোথায় কোথায় দেবে ভাই?

দ্বিতীয় সখী। আলোর জন্যে ভাবি নে। আলো তো কেবল এক রাত্রি জ্বলবে। কিন্তু বাঁশি এখনো এল না কেন? বাঁশি না বাজলে আমোদ নেই ভাই!

তৃতীয় সখী। বাঁশি কাশ্মীর থেকে আনতে গেছে, এতক্ষণে এল বোধ হয়। কখন বাজবে ভাই?

প্রথম সখী। বাজবে লো বাজবে। তোর অদৃষ্টেও একদিন বাজবে।

তৃতীয় সখী। পোড়াকপাল আর-কি!- আমি সেইজন্যেই ভেবে মরছি।

প্রথম সখীর গান

বাজিবে, সখী, বাঁশি বাজিবে—
হৃদয়রাজ হৃদে রাজিবে।
বচন রাশি রাশি, কোথা যে যাবে ভাসি
অধরে লাজহাসি সাজিবে।
নয়নে আঁখিজল করিবে ছলছল,
সুখবেদনা মনে বাজিবে।
মরমে মুরছিয়া মিলাতে চাবে হিয়া
সেই চরণযুগরাজীবে।

দ্বিতীয় সখী। তোর গান রেখে দে। এক-একবার মন কেমন হু হু করে উঠছে। মনে পড়ছে কেবল একটি রাত আলো হাসি বাঁশি আর গান। তার পরদিন থেকে সমস্ত অন্ধকার।

প্রথম সখী। কাঁদবার সময় ঢের আছে বোন! এ দুটো দিন একটু হেসে আমোদ করে নে। ফুল যদি না শুকোত তা হলে আমি আজ থেকেই মালা গাঁথতে বসতুম।

দ্বিতীয় সখী। আমি বাসরঘর সাজাব।

প্রথম সখী। আমি সখীকে সাজিয়ে দেব।

তৃতীয় সখী। আর আমি কী করব?

প্রথম সখী। ওলো, তুই আপনি সাজিস। দেখিস যদি যুবরাজের মন ভোলাতে পারিস।

তৃতীয় সখী। তুই তো ভাই, চেষ্টা করতে ছাড়িস নি। তা, তুই যখন পারলি নে তখন কি আর আমি পারব? ওলো, আমাদের সখীকে যে একবার দেখেছে তার মন কি আর অমনি পথে-ঘাটে চুরি যায়? ঐ বাঁশি এসেছে। ঐ শোন্ বেজে উঠেছে।

প্রথম সখীর গান

ওই বুঝি বাঁশি বাজে—
বনমাঝে কি মনোমাঝে?
বসন্তবায় বহিছে কোথায়, কোথায় ফুটেছে ফুল!
বলো গো সজনী, এ সুখরজনী কোন্‌খানে উদিয়াছে—

বনমাঝে কি মনোমাঝে ?
যাব কি যাব না মিছে এ ভাবনা, মিছে মরি লোকলাজে।
কে জানে কোথা সে বিরহহুতাশে ফিরে অভিসারসাজে—
বনমাঝে কি মনোমাঝে ?

দ্বিতীয় সখী। ওলো থাম্— ঐ দেখ্ যুবরাজ কুমারসেন এসেছেন।

তৃতীয় সখী। চল্ চল্ ভাই, আমরা একটু আড়ালে দাঁড়াই গে। তোরা পারিস, কিন্তু কে জানে ভাই, যুবরাজের সামনে যেতে আমার কেমন করে।

দ্বিতীয় সখী। কিন্তু কুমার আজ হঠাৎ অসময়ে এলেন কেন ?

প্রথম সখী। ওলো, এর কি আর সময়-অসময় আছে ? রাজার ছেলে বলে কি পঞ্চশর ওকে ছেড়ে কথা কয় ? থাকতে পারবে কেন ?

তৃতীয় সখী। চল্ ভাই, আড়ালে চল্।

[অন্তরালে গমন

কুমারসেন ও ইলার প্রবেশ

ইলা। থাক্ নাথ, আর বেশি বোলো না আমারে।
কাজ আছে, যেতে হবে রাজ্য ছেড়ে, তাই
বিবাহ স্থগিত রবে কিছুকাল, এর
বেশি কী আর শুনিব ?

কুমারসেন। এমনি বিশ্বাস
মোর 'পরে রেখো চিরদিন। মন দিয়ে
মন বোঝা যায়, গভীর বিশ্বাস শুধু
নীরব প্রাণের কথা টেনে নিয়ে আসে।
প্রবাসীরে মনে কোরো এই উপবনে,
এই নির্ঝরিণীতীরে, এই লতাগৃহে,
এই সন্ধ্যালোকে, পশ্চিমগগনপ্রান্তে
ওই সন্ধ্যাতারা-পানে চেয়ে। মনে কোরো,
আমিও প্রদোষে, প্রবাসে তরুর তলে
একেলা বসিয়া ওই তারকার 'পরে
তোমারি আঁখির তারা পেতেছি দেখিতে।
মনে কোরো মিশিতেছে এই নীলাকাশে
পুষ্পের সৌরভ-সম তোমার আমার
প্রেম। এক চন্দ্র উঠিয়াছে উভয়ের
বিরহরজনী-'পরে।

ইলা। জানি, জানি নাথ,
জানি আমি তোমার হৃদয়।

কুমারসেন। যাই তবে,
অয়ি তুমি অন্তরের ধন, জীবনের
মর্মস্বরূপিণী, অয়ি সবার অধিক !

[প্রস্থান

সখীগণের প্রবেশ

দ্বিতীয় সখী। হায় একি শুনি !

তৃতীয় সখী। সখী, কেন যেতে দিলে!
প্রথম সখী। ভালোই করেছ। স্বেচ্ছায় না দিলে ছাড়ি
বাঁধন ছিঁড়িয়া যায় চিরদিন তরে।
হায় সখী, হায়, শেষে নিবাতে হল কি
উৎসবের দীপ?
ইলা। সখী, তোরা চুপ কর্,
টুটিছে হৃদয়। ভেঙে দে ভেঙে দে ওই
দীপমালা। বল্ সখী, কে দিবে নিবায়ে
লজ্জাহীনা পূর্ণিমার আলো? কেন আজ
মনে হয়, আমার এ জীবনের সুখ
আজি দিবসের সাথে ডুবিল পশ্চিমে?
অমনি ইলারে কেন অস্তপথ-পানে
সঙ্গে নাহি নিয়ে গেল ছায়ার মতন?

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

জালন্ধর

রণক্ষেত্র। শিবির

বিক্রমদেব ও সেনাপতি

সেনাপতি। বন্দীকৃত শিলাদিত্য উদয়ভাস্কর,
শুধু যুধাজিৎ পলাতক— সঙ্গে লয়ে
সৈন্যদলবল।
বিক্রমদেব। চলো তবে অবিলম্বে
তাহার পশ্চাতে। উঠাও শিবির তবে।
ভালোবাসি আমি এই ব্যগ্র ঊর্ধ্বশ্বাস
মানবমৃগয়া; গ্রাম হতে গ্রামান্তরে,
বন গিরি নদীতীরে দিবারাত্রি এই
কৌশলে কৌশলে খেলা। বাকি আছে আর
কেবা বিদ্রোহীদলের?
সেনাপতি। শুধু জয়সেন।
কর্তা সে'ই বিদ্রোহের। সৈন্যবল তার
সব চেয়ে বেশি।
বিক্রমদেব। চলো তবে সেনাপতি,
তার কাছে। আমি চাই উদগ্র সংগ্রাম,
বুকে বুকে বাহুতে বাহুতে— অতি তীব্র
প্রেম-আলিঙ্গন-সম। ভালো নাহি লাগে

অস্ত্রে অস্ত্রে মৃদু ঝন্‌ঝনি— ক্ষুদ্র যুদ্ধে
ক্ষুদ্র জয়লাভ !

সেনাপতি। কথা ছিল আসিবে সে
গোপনে সহসা, করিবে পশ্চাৎ হতে
আক্রমণ। বুঝি শেষে জাগিয়াছে মনে
বিপদের ভয়, সন্ধির প্রস্তাব-তরে
হয়েছে উন্মুখ।

বিক্রমদেব। ধিক্‌, ভীরু, কাপুরুষ !
সন্ধি নহে— যুদ্ধ চাই আমি। রক্তে রক্তে
মিলনের স্রোত, অস্ত্রে অস্ত্রে সংগীতের
ধ্বনি। চলো সেনাপতি !

সেনাপতি। যে আদেশ প্রভু !

[প্রস্থান

বিক্রমদেব। একি মুক্তি ! একি পরিত্রাণ ! কী আনন্দ
হৃদয়মাঝারে ! অবলার ক্ষীণ বাহু
কী প্রচণ্ড সুখ হতে রেখেছিল মোরে
বাঁধিয়া বিবরমাঝে ! উদ্দাম হৃদয়
অপ্রশস্ত অন্ধকার গভীরতা খুঁজে
ক্রমাগত যেতেছিল রসাতল-পানে।
মুক্তি, মুক্তি আজি ! শৃঙ্খল বন্দীরে
ছেড়ে আপনি পলায়ে গেছে। এতদিন
এ জগতে কত যুদ্ধ, কত সন্ধি, কত
কীর্তি, কত রঙ্গ— কত কী চলিতেছিল
কর্মের প্রবাহ— আমি ছিনু অন্তঃপুরে
পড়ে, রুদ্ধদল চম্পককোরকমাঝে
সুপ্তকীটসম। কোথা ছিল লোকলাজ,
কোথা ছিল বীরপরাক্রম ! কোথা ছিল
এ বিপুল বিশ্বতটভূমি ! কোথা ছিল
হৃদয়ের তরঙ্গতর্জন ! কে বলিবে
আজি মোরে দীন কাপুরুষ ! কে বলিবে
অন্তঃপুরচারী ! মৃদু গন্ধবহ আজি
জাগিয়া উঠিছে বেগে ঝঞ্ঝাবায়ুরূপে।
এ প্রবল হিংসা ভালো ক্ষুদ্র প্রেম চেয়ে,
প্রলয় তো বিধাতার চরম আনন্দ।
হিংসা এই হৃদয়ের বন্ধনমুক্তির
সুখ। হিংসা জাগরণ। হিংসা স্বাধীনতা।

সেনাপতির প্রবেশ

সেনাপতি। আসিছে বিদ্রোহী সৈন্য।

বিক্রমদেব। চলো, তবে চলো !

চরের প্রবেশ

চর। রাজন্, বিপক্ষদল নিকটে এসেছে।
নাই বাদ্য, নাই জয়ধ্বজা, নাই কোনো
যুদ্ধ-আস্ফালন, মার্জনা-প্রার্থনা-তরে
আসিতেছে যেন।

বিক্রমদেব। থাক্, চাহি না শুনিতে
মার্জনার কথা। আগে আমি আপনারে
করিব মার্জনা, অপযশ রক্তস্রোতে
করিব ক্ষালন। যুদ্ধে চলো সেনাপতি!

দ্বিতীয় চরের প্রবেশ

দ্বিতীয় চর। বিপক্ষশিবির হতে আসিছে শিবিকা
বোধ করি সন্ধিদূত লয়ে।

সেনাপতি। মহারাজ,
তিলেক অপেক্ষা করো— আগে শোনা যাক
কী বলে বিপক্ষদূত—

বিক্রমদেব। যুদ্ধ তার পরে।

সৈনিকের প্রবেশ

সৈনিক। মহারানী এসেছেন বন্দী ক'রে লয়ে
যুধাজিৎ আর জয়সেনে।

বিক্রমদেব। কে এসেছে?

সৈনিক। মহারানী।

বিক্রমদেব। মহারানী! কোন্ মহারানী?

সৈনিক। আমাদের মহারানী।

বিক্রমদেব। বাতুল! উন্মাদ!
যাও সেনাপতি, দেখে এসো কে এসেছে।

[সেনাপতি প্রভৃতির প্রস্থান

মহারানী এসেছেন বন্দী ক'রে লয়ে
যুধাজিৎ-জয়সেনে! এ কি স্বপ্ন নাকি!
এ কি রণক্ষেত্র নয়? এ কি অন্তঃপুর?
এতদিন ছিলাম কি যুদ্ধের স্বপনে
মগ্ন? সহসা জাগিয়া আজ দেখিব কি
সেই ফুলবন, সেই মহারানী, সেই
পুষ্পশয্যা, সেই সুদীর্ঘ অলস দিন,
দীর্ঘনিশি বিজড়িত ঘুমে জাগরণে?
বন্দী? কারে বন্দী? কী শুনিতে কী শুনেছি?
এসেছে কি আমারে করিতে বন্দী? দূত!
সেনাপতি! কে এসেছে? কারে বন্দী লয়ে?

সেনাপতির প্রবেশ

সেনাপতি। মহারানী এসেছেন লয়ে কাশ্মীরের

সৈন্যদল— সোদর কুমারসেন-সাথে।
এনেছেন পথ হতে যুদ্ধে বন্দী করে
পলাতক যুধাজিৎ আর জয়সেনে।
আছেন শিবিরদ্বারে, সাক্ষাতের তরে
অভিলাষী।

বিক্রমদেব। সেনাপতি, পালাও, পালাও।
চলো চলো সৈন্য লয়ে— আর কি কোথাও
নাই শত্রু, আর কেহ নাহি কি বিদ্রোহী ?
সাক্ষাৎ ? কাহার সাথে ? রমণীর সনে
সাক্ষাতের এ নহে সময়।

সেনাপতি। মহারাজ—

বিক্রমদেব। চুপ করো সেনাপতি, শোনো যাহা বলি।
রুদ্ধ করো দ্বার— এ শিবিরে শিবিকার
প্রবেশ নিষেধ।

সেনাপতি। যে আদেশ মহারাজ !

দ্বিতীয় দৃশ্য

দেবদত্তের কুটির

দেবদত্ত ও নারায়ণী

দেবদত্ত। প্রিয়ে, তবে অনুমতি করো— দাস বিদায় হয়।

নারায়ণী। তা যাও-না, আমি তোমাকে বেঁধে রেখেছি না কি ?

দেবদত্ত। ঐ তো, ঐজন্যেই তো কোথাও যাওয়া হয়ে ওঠে না— বিদায় নিয়েও সুখ নেই। যা বলি তা করো। ঐখানটায় আছাড় খেয়ে পড়ো। বলো, হা হতোঽস্মি, হা ভগবতি ভবিতব্যতে ! হা ভগবন্ মকরকেতন !

নারায়ণী। মিছে বোকো না। মাথা খাও, সত্যি করে বলো কোথায় যাবে।

দেবদত্ত। রাজার কাছে।

নারায়ণী। রাজা তো যুদ্ধু করতে গেছে। তুমি যুদ্ধু করবে নাকি ? দ্রোণাচার্য হয়ে উঠেছ ?

দেবদত্ত। তুমি থাকতে আমি যুদ্ধ করব ? যা হোক, এবার যাওয়া যাক।

নারায়ণী। সেই অবধি তো ঐ এক কথাই বলছ। তা যাও-না। কে তোমাকে মাথার দিব্যি দিয়ে ধরে রেখেছে ?

দেবদত্ত। হায় মকরকেতন, এখানে তোমার পুষ্পশরের কর্ম নয়— একেবারে আস্ত'শক্তিশেল না ছাড়লে মর্মে গিয়ে পৌঁছয় না। বলি ও শিখরদশনা, পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী, চোখ দিয়ে জল-টল কিছু বেরোবে কি ? সেগুলো শীঘ্র শীঘ্র সেরে ফেলো— আমি উঠি।

নারায়ণী। পোড়া কপাল ! চোখের জল ফেলব কী দুঃখে ? হাঁ গা, তুমি না গেলে কি রাজার যুদ্ধু চলবে না ? তুমি কি মহাবীর ধূম্রলোচন হয়েছ ?

দেবদত্ত। আমি না গেলে রাজার যুদ্ধ থামবে না। মন্ত্রী বার বার লিখে পাঠাচ্ছে রাজ্য ছারখারে যায়, কিন্তু মহারাজ কিছুতেই যুদ্ধ ছাড়তে চান না। এ দিকে বিদ্রোহ সমস্ত থেমে গেছে।

নারায়ণী। বিদ্রোহই যদি থেমে গেল তো মহারাজ কার সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাবেন?

দেবদত্ত। মহারানীর ভাই কুমারসেনের সঙ্গে।

নারায়ণী। হাঁ গা, সে কী কথা! শ্যালার সঙ্গে যুদ্ধ? বোধ করি রাজায় রাজায় এইরকম করেই ঠাট্টা চলে। আমরা হলে শুধু কান মলে দিতুম। কী বল?

দেবদত্ত। বড়ো ঠাট্টা নয়। মহারানী কুমারসেনের সাহায্যে জয়সেন ও যুধাজিৎকে যুদ্ধে বন্দী করে মহারাজের কাছে নিয়ে আসেন। মহারাজ তাঁকে শিবিরে প্রবেশ করতে দেন নি।

নারায়ণী। হাঁ গা, বল কী! তা, তুমি এতদিন যাও নি কেন! এ খবর শুনেও বসে আছ? যাও, যাও, এখনি যাও। আমাদের রানীর মতো অমন সতীলক্ষ্মীকে অপমান করলে? রাজার শরীরে কলি প্রবেশ করেছে।

দেবদত্ত। বন্দী বিদ্রোহীরা রাজাকে বলেছে— মহারাজ, আমরা তোমারই প্রজা, অপরাধ করে থাকি তুমি শাস্তি দেবে। একজন বিদেশী এসে আমাদের অপমান করবে এতে তোমাকেই অপমান করা হল— যেন তোমার নিজরাজ্য নিজে শাসন করবার ক্ষমতা নেই। একটা সামান্য যুদ্ধ, এর জন্যে অমনি কাশ্মীর থেকে সৈন্য এল, এর চেয়ে উপহাস আর কী হতে পারে! এই শুনে মহারাজ আগুন হয়ে কুমারসেনকে পাঁচটা ভর্ৎসনা করে এক দূত পাঠিয়ে দেন। কুমারসেন উদ্ধত যুবাপুরুষ, সহ্য করতে পারবে কেন? বোধ করি সেও দূতকে দু কথা শুনিয়ে দিয়ে থাকবে।

নারায়ণী। তা, বেশ তো— কুমারসেন তো রাজার পর নয়, আপনার লোক, তা কথা চলছিল, বেশ, তাই চলুক। তুমি কাছে না থাকলে রাজার ঘটে কি দুটো কথাও জোগায় না? কথা বন্ধ করে অস্ত্র চালাবার দরকার কী বাপু! ঐ ওতেই তো হার হল।

দেবদত্ত। আসল কথা, একটা যুদ্ধ করবার ছুতো। রাজা এখন কিছুতেই যুদ্ধ ছাড়তে পারছেন না। নানা ছল অন্বেষণ করছেন। রাজাকে সাহস করে দুটো ভালো কথা বলে এমন বন্ধু কেউ নেই। আমি তো আর থাকতে পারছি নে— আমি চললুম।

নারায়ণী। যেতে ইচ্ছে হয় যাও, আমি কিন্তু একলা তোমার ঘরকন্না করতে পারব না তা আমি বলে রাখলুম। এই রইল, তোমার সমস্ত পড়ে রইল। আমি বিবাগী হয়ে বেরিয়ে যাব।

দেবদত্ত। রোসো, আগে আমি ফিরে আসি, তার পরে যেয়ো। বল তো আমি থেকে যাই।

নারায়ণী। না না, তুমি যাও। আমি কি আর তোমাকে সত্যি থাকতে বলছি? ওগো, তুমি চলে গেলে আমি একেবারে বুক ফেটে মরব না, সেজন্যে ভেবো না। আমার বেশ চলে যাবে।

দেবদত্ত। তা কি আর আমি জানি নে? মলয়সমীরণ তোমার কিছু করতে পারবে না। বিরহ তো সামান্য, বজ্রাঘাতেও তোমার কিছু হয় না!

[প্রস্থানোন্মুখ

নারায়ণী। হে ঠাকুর, রাজাকে সুবুদ্ধি দাও ঠাকুর! শীঘ্র শীঘ্র ফিরিয়ে আনো।

দেবদত্ত। এ ঘর ছেড়ে কখনো কোথাও যাই নি। হে ভগবান, এদের সকলের উপর তোমার দৃষ্টি রেখো।

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

জালন্ধর

কুমারসেনের শিবির

কুমারসেন ও সুমিত্রা

সুমিত্রা। ভাই, রাজারে মার্জনা করো ; করো রোষ
আমার উপরে। আমি মাঝে না থাকিলে
যুদ্ধ করে 'বীর' নাম করিতে উদ্ধার।
যুদ্ধের আহ্বান শুনে অটল রহিলে
তবু তুমি ; জানি না কি অসম্মানশেল
চিরজীবী মৃত্যু-সম মানীর হৃদয়ে ?
আপন ভায়ের হৃদে দুর্ভাগিনী আমি
হানিতে দিলাম হেন অপমানশর
যেন আপনারি হস্তে। মৃত্যু ভালো ছিল,
ভাই, মৃত্যু ভালো ছিল।

কুমারসেন। জানিস তো বোন,
যুদ্ধ বীরধর্ম বটে— ক্ষমা তার চেয়ে
বীরত্ব অধিক। অপমান অবহেলা
কে পারে করিতে মানী ছাড়া ?

সুমিত্রা। ধন্য ভাই,
ধন্য তুমি। সঁপিলাম এ জীবন মোর
তোমার লাগিয়া। তোমার এ স্নেহঋণ
প্রাণ দিয়ে কেমনে করিব পরিশোধ ?
বীর তুমি, মহাপ্রাণ, তুমি নরপতি
এ নরসমাজ-মাঝে—

কুমারসেন। আমি ভাই তোর।
চল্ বোন, আমাদের সেই শৈলগৃহে
তুষারশিখর-ঘেরা শুভ্র সুশীতল
আনন্দকাননে। দুটি নির্ঝরের মতো
একত্রে করেছি খেলা দুই ভাইবোনে—
এখন আর কি ফিরে যেতে পারিবি নে
সেই উচ্চ, সেই শুভ্র শৈশবশিখরে ?

সুমিত্রা। চলো ভাই, চলো। যে ঘরেতে ভাইবোনে
করিতাম খেলা, সেই ঘরে নিয়ে এসো
প্রেয়সী নারীরে— সন্ধ্যাবেলা বসে তারে
তোমার মনের মতো সাজাব যতনে।
শিখাইয়া দিব তারে তুমি ভালোবাস
কোন্ ফুল, কোন্ গান, কোন্ কাব্যরস।

শুনাব বাল্যের কথা ; শৈশবমহত্ত্ব
তব শিশু-হৃদয়ের ।

কুমারসেন । মনে পড়ে মোর,
দোঁহে শিখিতাম বীণা । আমি ধৈর্যহীন
যেতেম পালায়ে । তুই শয্যাপ্রান্তে বসে
কেশবেশ ভুলে গিয়ে সারা সন্ধ্যাবেলা
বাজাতিস, গম্ভীর আনন্দমুখখানি ।
সংগীতেরে করে তুলেছিলি তোর সেই
ছোটো ছোটো অঙ্গুলির বশ ।

সুমিত্রা । মনে আছে,
খেলা হতে ফিরে এসে শোনাতে আমারে
অদ্ভুত কল্পনাকথা— কোথা দেখেছিলে
অজ্ঞাত নদীর ধারে স্বর্ণস্বর্গপুর,
অলৌকিক কল্পকুঞ্জে কোথায় ফলিত
অমৃতমধুর ফল ! ব্যথিত হৃদয়ে
সবিস্ময়ে শুনিতাম, স্বপ্নে দেখিতাম
সেই কিন্নরকানন ।

কুমারসেন । বলিতে বলিতে
নিজের কল্পনা শেষে নিজেরে ছলিত ।
সত্য মিথ্যা হত একাকার মেঘ আর
গিরির মতন ; দেখিতে পেতেম যেন
দূর শৈলপরপারে রহস্যনগরী ।—
শংকর আসিছে ওই ফিরে । শোনা যাক
কী সংবাদ ।

শংকরের প্রবেশ

শংকর । প্রভু তুমি, তুমি মোর রাজা,
ক্ষমা করো বৃদ্ধ এ শংকরে । ক্ষমা করো
রানী, দিদি মোর । মোরে কেন পাঠাইলে
দূত করে রাজার শিবিরে ? আমি বৃদ্ধ.
নহি পটু সাবধান বচনবিন্যাসে,
আমি কি সহিতে পারি তব অপমান ?
শান্তির প্রস্তাব শুনে যখন হাসিল
ক্ষুদ্র জয়সেন, হাসিমুখে ভৃত্য যুধাজিৎ
করিল সুতীব্র উপহাস, সভ্রূভঙ্গে
কহিলা বিক্রমদেব জালন্ধররাজ
তোমারে বালক, ভীরু— মনে হল যেন
চারি দিকে হাসিতেছে সভাসদ যত
পরস্পর মুখ চেয়ে, হাসিতেছে দূরে
দ্বারের প্রহরী— পশ্চাতে আছিল যারা
তাদের নীরব হাসি ভুজঙ্গের মতো

যেন পৃষ্ঠে আসি মোর দংশিতে লাগিল।
তখন ভুলিয়া গেনু শিখেছিনু যত
শান্তিপূর্ণ মৃদুবাক্য। কহিলাম রোষে—
'কলহেরে জান তুমি বীরত্ব বলিয়া,
নারী তুমি, নহ ক্ষত্রবীর। সেই খেদে
মোর রাজা কোষে লয়ে কোষরুদ্ধ অসি
ফিরে যেতেছেন দেশে, জানাইনু সবে।'
শুনিয়া কম্পিততনু জালন্ধরপতি।
প্রস্তুত হতেছে সৈন্য।

সুমিত্রা। ক্ষমা করো ভাই!

শংকর। এই কি উচিত তব, কাশ্মীরতনয়া
তুমি, ভারতে রটায়ে যাবে কাশ্মীরের
অপমানকথা? বীরের স্বধর্ম হতে
বিরত কোরো না তুমি আপন ভ্রাতারে,
রাখো এ মিনতি।

সুমিত্রা। বোলো না, বোলো না আর
শংকর! মার্জনা করো ভাই! পদতলে
পড়িলাম! ওই তব রুদ্ধ কম্পমান
রোষানল নির্বাণ করিতে চাও? আছে
মোর হৃদয়শোণিত। মৌন কেন ভাই?
বাল্যকাল হতে আমি ভালোবাসা তব
পেয়েছি না চেয়ে, আজ আমি ভিক্ষা মাগি
ওই রোষ তব, দাও তাহা।

শংকর। শোনো প্রভু!

কুমারসেন। চুপ করো বৃদ্ধ! যাও তুমি, সৈন্যদের
জানাও আদেশ— এখনি ফিরিতে হবে
কাশ্মীরের পথে।

শংকর। হায় একি অপমান,
পলাতক ভীরু বলে রটিবে অখ্যাতি!

সুমিত্রা। শংকর, বারেক তুই মনে করে দেখ
সেই ছেলেবেলা। দুটি ছোটো ভাইবোনে
কোলে বেঁধে রেখেছিলি এক স্নেহপাশে।
তার চেয়ে বেশি হল খ্যাতি ও অখ্যাতি?
প্রাণের সম্পর্ক এ যে চিরজীবনের—
পিতা-মাতা-বিধাতার-আশীর্বাদে-ঘেরা
পুণ্য স্নেহতীর্থখানি। বাহির হইতে
হিংসানলশিখা আনি এ কল্যাণভূমি,
শংকর, করিতে চাস অঙ্গারমলিন!

শংকর। চল্ দিদি, চল্ ভাই, ফিরে চলে যাই
সেই শান্তিসুধাস্নিগ্ধ বাল্যকাল-মাঝে।

চতুর্থ দৃশ্য

বিক্রমদেবের শিবির

বিক্রমদেব যুধাজিৎ ও জয়সেন

বিক্রমদেব। পলাতক অরাতিরে আক্রমণ করা
নহে ক্ষাত্রধর্ম।

যুধাজিৎ। পলাতক অপরাধী
সহজে নিষ্কৃতি পায় যদি, রাজদণ্ড
ব্যর্থ হয় তবে।

বিক্রমদেব। বালক সে, শাস্তি তার
যথেষ্ট হয়েছে। পলায়ন, অপমান,
আর শাস্তি কিবা?

যুধাজিৎ। গিরিরুদ্ধ কাশ্মীরের
বাহিরে পড়িয়া রবে যত অপমান।
সেথায় সে যুবরাজ, কে জানিবে তার
কলঙ্কের কথা?

জয়সেন। চলো মহারাজ, চলো
সেই কাশ্মীরের মাঝে যাই— সেথা গিয়ে
দোষীরে শাসন করে আসি, সিংহাসনে
দিয়ে আসি কলঙ্কের ছাপ।

বিক্রমদেব। তাই চলো।
বাড়ে চিন্তা যত চিন্তা কর। কার্যস্রোতে
আপনারে ভাসাইয়া দিনু, দেখি কোথা
গিয়ে পড়ি, কোথা পাই কূল।

প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী। মহারাজ,
এসেছে সাক্ষাৎ-তরে ব্রাহ্মণতনয়
দেবদত্ত।

বিক্রমদেব। দেবদত্ত? নিয়ে এসো, নিয়ে
এসো তারে। না না, রোসো, থামো, ভেবে দেখি
কী লাগিয়ে এসেছে ব্রাহ্মণ? জানি তারে
ভালোমতে। এসেছে সে যুদ্ধক্ষেত্র হতে
ফিরাতে আমারে। হায় বিপ্র, তোমরাই
ভাঙিয়াছ বাঁধ, এখন প্রবল স্রোত
শুধু কি শস্যের ক্ষেত্রে জলসেক করে
ফিরে যাবে, তোমাদের আবশ্যক বুঝে
পোষ-মানা প্রাণীর মতন? চূর্ণিবে সে
লোকালয়, উচ্ছন্ন করিবে দেশ গ্রাম।

সকম্পিত পরামর্শ উপদেশ নিয়ে
তোমরা চাহিয়া থাকো— আমি ধেয়ে চলি
কার্যবেগে, অবিশ্রাম গতিসুখে মত্ত
মহানদী যে আনন্দে শিলারোধ ভেঙে
ছুটে চিরদিন। প্রচণ্ড আনন্দ অন্ধ,
মুহূর্ত তাহার পরমায়ু— তারি মধ্যে
উৎপাটিয়া নিয়ে আসে অনন্তের সুখ
মত্ত করীশুণ্ডে ছিন্ন রক্তপদ্মসম।
বিচার বিবেক পরে হবে। চিরকাল
জড় সিংহাসনে পড়ি করিব মন্ত্রণা।—
চাহি না করিতে দেখা ব্রাহ্মণের সনে।

জয়সেন। যে আদেশ।

জনান্তিকে জয়সেনের প্রতি

যুধাজিৎ। ব্রাহ্মণেরে জেনো শত্রু বলে।
বন্দী করে রাখো।

জয়সেন। বিলক্ষণ জানি তারে।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কাশ্মীর। প্রাসাদ

রেবতী ও চন্দ্রসেন

রেবতী। যুদ্ধসজ্জা? কেন যুদ্ধসজ্জা? শত্রু কোথা?
মিত্র আসিতেছে। সমাদরে ডেকে আনো
তারে। করুক সে অধিকার কাশ্মীরের
সিংহাসন। রাজ্যরক্ষা-তরে তুমি এত
ব্যস্ত কেন? এ কি তব আপনার ধন?
আগে তারে নিতে দাও, তার পরে ফিরে
নিয়ো বন্ধুভাবে। তখন এ পররাজ্য
হবে আপনার।

চন্দ্রসেন। চুপ করো, চুপ করো,
বোলো না অমন করে। কর্তব্য আমার
করিব পালন, তার পরে দেখা যাবে
অদৃষ্ট কী করে।

রেবতী। তুমি কী করিতে চাও
আমি জানি তাহা। যুদ্ধের ছলনা করে
পরাজয় মানিবারে চাও। তার পর

চারি দিক রক্ষা করে সুবিধা বুঝিয়া
কৌশলে করিতে চাও উদ্দেশ্যসাধন।

চন্দ্রসেন। ছি ছি রানী, এ-সকল কথা শুনি যবে
তব মুখে, ঘৃণা হয় আপনার 'পরে।
মনে হয় সত্য বুঝি এমনি পাষণ্ড
আমি ; আপনারে ছদ্মবেশী চোর ব'লে
সন্দেহ জনমে।— কর্তব্যের পথ হতে
ফিরায়ো না মোরে।

রেবতী। আমিও পালিব তবে
কর্তব্য আপন। নিশ্বাস করিয়া রোধ
বধিব আপন হস্তে সন্তান আপন।
রাজা যদি না করিবে তারে, কেন তবে
রোপিলে সংসারে পরাধীন ভিক্ষুকের
বংশ। অরণ্যে গমন ভালো, মৃত্যু ভালো,
রিক্তহস্তে পরের সম্পদছায়ে ফেরা—
ধিক্ বিড়ম্বনা। জেনো তুমি, রাজভ্রাতা,
আমার গর্ভের ছেলে সহিবে না কভু
পরের শাসনপাশ, সমস্ত জীবন
পরদত্ত সাজ প'রে রহিবে না বসে
রাজসভাপুত্তলিকা হয়ে। আমি তারে
দিয়েছি জনম, আমি তারে সিংহাসন
দিব— নহে আমি নিজহস্তে মৃত্যু দিব
তারে। নতুবা সে কুমাতা বলিয়া মোরে
দিবে অভিশাপ।

কঞ্চুকীর প্রবেশ

কঞ্চুকী। যুবরাজ এসেছেন
রাজধানীমাঝে। আসিছেন অবিলম্বে
রাজসাক্ষাতের তরে।

[প্রস্থান

রেবতী। অন্তরালে রব
আমি। তুমি তারে বোলো, অস্ত্রশস্ত্র ছাড়ি
জালন্ধর-রাজপদে অপরাধীভাবে
করিতে হইবে তারে আত্মসমর্পণ।

চন্দ্রসেন। যেয়ো না চলিয়া।

রেবতী। পারি নে লুকাতে আমি
হৃদয়ের ভাব। স্নেহের ছলনা করা
অসাধ্য আমার। তার চেয়ে অন্তরালে
গুপ্ত থেকে শুনি বসে তোমাদের কথা।

[প্রস্থান

কুমারসেন ও সুমিত্রার প্রবেশ

কুমারসেন। প্রণাম !
সুমিত্রা। প্রণাম তাত !
চন্দ্রসেন। দীর্ঘজীবী হও।
কুমারসেন। বহুপূর্বে পাঠায়েছি সংবাদ, রাজন্,
শত্রুসৈন্য আসিছে পশ্চাতে, আক্রমণ
করিতে কাশ্মীর। কই, রণসজ্জা কই ?
কোথা সৈন্যবল ?
চন্দ্রসেন। শত্রুপক্ষ কারে বল ?
বিক্রম কি শত্রু হল ? জননী সুমিত্রা,
বিক্রম কি নহে, বৎসে, কাশ্মীর-জামাতা ?
সে যদি আসিল গৃহে এতকাল পরে,
অসি দিয়ে তারে কি করিব সম্ভাষণ ?
সুমিত্রা। হায় তাত, মোরে কিছু কোরো না জিজ্ঞাসা।
আমি দুর্ভাগিনী নারী কেন আসিলাম
অন্তঃপুর ছাড়ি ! কোথা লুকাইয়া ছিল
এত অকল্যাণ ! অবলা নারীর ক্ষীণ
ক্ষুদ্র পদক্ষেপে সহসা উঠিল রুষি
সর্প শতফণা ! মোরে কিছু শুধায়ো না।
বুদ্ধিহীনা আমি।— তুমি সব জান ভাই !
তুমি জ্ঞানী, তুমি বীর, আমি পদপ্রান্তে
মৌন ছায়া। তুমি জান সংসারের গতি,
আমি শুধু তোমারেই জানি।
কুমারসেন। মহারাজ,
আমাদের শত্রু নহে জালন্ধরপতি,
নিতান্তই আপনার জন। কাশ্মীরের
শত্রু তিনি, আসিছেন শত্রুভাব ধরি।
অকাতরে সহিয়াছি নিজ অপমান,
কেমনে উপেক্ষা করি রাজ্যের বিপদ ?
চন্দ্রসেন। সেজন্য ভেবো না বৎস, যথেষ্ট রয়েছে
বল। কাশ্মীরের তরে আশঙ্কা কিছুই
নাই।
কুমারসেন। মোর হাতে দাও সৈন্যভার।
চন্দ্রসেন। দেখা
যাবে পরে। আগে হতে প্রস্তুত হইলে
অকারণে জেগে ওঠে যুদ্ধের কারণ্।
আবশ্যককালে তুমি পাবে সৈন্যভার।

রেবতীর প্রবেশ

রেবতী। কে চাহিছে সৈন্যভার ?
সুমিত্রা ও কুমারসেন। প্রণাম জননী !

রেবতী। যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়ে তুমি এসেছ পলায়ে,
নিতে চাও অবশেষে ঘরে ফিরে এসে
সৈন্যভার ? তুমি রাজপুত্র ? তুমি চাও
কাশ্মীরের সিংহাসন ? ছি ছি লজ্জাহীন !
বনে গিয়ে থাকো লুকাইয়া। সিংহাসনে
বসো যদি, বিশ্বসুদ্ধ সকলে দেখিবে
কনককিরীটচূড়া কলঙ্কে অঙ্কিত।

কুমাবসেন। জননী, কী অপরাধ করেছি চরণে ?
কী কঠিন বচন তোমাব ! ও কি মাতা
স্নেহের ভর্ৎসনা ? বহুদিন হতে তুমি
অপ্রসন্ন অভাগার 'পরে। রোষদীপ্ত
দৃষ্টি তব বিঁধে মোর মর্মস্থলে সদা ;
কাছে গেলে চলে যাও কথা না কহিয়া
অন্য ঘবে ; অকারণে কহ তীব্র বাণী।
বলো মাতা, কী করিলে আমারে তোমাব
আপন সন্তান বলে হইবে বিশ্বাস।

বেবতী। বলি তবে--

চন্দ্রসেন। ছি ছি, চুপ কবো বানী !

কুমারসেন। মাতঃ,
অধিক কহিতে কথা নাহিক সময়।
দ্বাবে এল শত্রুদল আমাবে করিতে
আক্রমণ। তাই আমি সৈন্য ভিক্ষা মাগি।

বেবতী। তোমারে কবিয়া বন্দী অপবাধীভাবে
জালন্ধর-রাজকরে করিব অর্পণ।
মার্জনা কবেন ভালো, নতুবা যেমন
বিধান করেন শাস্তি নিয়ো নতশিরে।

সুমিত্রা। ধিক্ পাপ ! চুপ করো মাতা ! নারী হয়ে
রাজকার্যে দিয়ো না, দিয়ো না হাত। ঘোব
অমঙ্গলপাশে সবারে আনিবে টানি,
আপনি পড়িবে। হেথা হতে চলো ফিরে
দয়ামায়াহীন ওই সদাঘূর্ণমান
কর্মচক্র ছাড়ি। তুমি শুধু ভালোবাসো,
শুধু স্নেহ করো, দয়া করো, সেবা করো—
জননী হইয়া থাকো প্রাসাদ-মাঝারে।
যুদ্ধ দ্বন্দ্ব রাজ্যরক্ষা আমাদেব কার্য
নহে।

কুমারসেন। কাল যায় মহারাজ, কী আদেশ ?

চন্দ্রসেন। বৎস, তুমি অনভিজ্ঞ, মনে কর তাই
শুধু ইচ্ছামাত্রে সব কার্য সিদ্ধ হয়
চক্ষের নিমেষে। রাজকার্য মনে রেখো

সুকঠিন অতি। সহস্রের শুভাশুভ
কেমনে করিব স্থির মুহূর্তের মাঝে ?

কুমারসেন। নির্দয় বিলম্ব তব পিতঃ! বিপদের
মুখে মোরে ফেলি অনায়াসে, স্থিরভাবে
বিচারমন্ত্রণা ? প্রণাম, বিদায় হই।

[সুমিত্রাকে লইয়া প্রস্থান

চন্দ্রসেন। তোমার নিষ্ঠুর বাক্য শুনে দয়া হয়
কুমারের 'পরে— প্রাণে বাজে, ইচ্ছা করে
ডেকে নিয়ে বেঁধে তারে রাখি বক্ষোমাঝে,
স্নেহ দিয়ে দূর করি আঘাতবেদনা।

রেবতী। শিশু তুমি! মনে কর আঘাত না ক'রে
আপনি ভাঙিবে বাধা ? পুরুষের মতো
যদি তুমি কার্যে দিতে হাত, আমি তবে
দয়ামায়া করিতাম ঘরে ব'সে ব'সে
অবসর বুঝে। এখন সময় নাই।

[প্রস্থান

চন্দ্রসেন। অতি-ইচ্ছা চলে অতি-বেগে। দেখিতে না
পায় পথ, আপনারে করে সে নিষ্ফল।
বায়ুবেগে ছুটে গিয়ে মত্ত অশ্ব যথা
চূর্ণ করে ফেলে রথ পাষাণপ্রাচীরে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কাশ্মীর। হাট

লোকসমাগম

প্রথম। কেমন হে খুড়ো, গোলা ভরে ভরে যে গম জমিয়ে রেখেছিলে, আজ বেচবার জন্যে এত তাড়াতাড়ি কেন ?

দ্বিতীয়। না বেচলে কি আর রক্ষে আছে ? এদিকে জালন্ধরের সৈন্য এল ব'লে। সমস্ত লুটে নেবে। আমাদের এই মহাজনদের বড়ো বড়ো গোলা আর মোটা মোটা পেট বেবাক ফাঁসিয়ে দেবে। গম আর রুটি দুইয়েরই জায়গা থাকবে না!

মহাজন। আচ্ছা ভাই, আমোদ করে নে। কিন্তু শিগ্‌গির তোদের ঐ দাঁতের পাটি ঢাকতে হবে। গুঁতো সকলেরই উপর পড়বে।

প্রথম। সেই সুখেই তো হাসছি বাবা! এবারে তোমায় আমায় একসঙ্গে মরব। তুমি রাখতে গম জমিয়ে, আর আমি মরতুম পেটের জ্বালায়। সেইটে হবে না। এবার তোমাকেও জ্বালা ধরবে। সেই শুকনো মুখখানি দেখে যেন মরতে পারি।

দ্বিতীয়। আমাদের ভাবনা কী ভাই ? আমাদের আছে কী ? প্রাণখানা এম্‌নেও বেশিদিন টিকবে না, অম্‌নেও বেশিদিন টিকবে না। এ কটা দিন কষে মজা করে নে রে ভাই!

প্রথম। ও জনার্দন, এতগুলি থলে এনেছ কেন ? কিছু কিনবে নাকি ?

জনার্দন। একেবারে বছরখানেকের মতো গম কিনে রাখব।

দ্বিতীয়। কিনলে যেন, রাখবে কোথায় ?

জনার্দন। আজ রাত্তিরেই মামার বাড়ি পালাচ্ছি।

প্রথম। মামার বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছলে তো ! পথে অনেক মামা বসে আছে, আদর করে ডেকে নেবে।

কোলাহল করিতে করিতে এক দল লোকের প্রবেশ

পঞ্চম। ওরে, কে তোরা লড়াই করতে চাস, আয়।

প্রথম। রাজি আছি। কার সঙ্গে লড়তে হবে বলে দে।

পঞ্চম। খুড়ো-রাজা জালন্ধরের সঙ্গে ষড করে যুবরাজকে ধরিয়ে দিতে চায়।

দ্বিতীয়। বটে ! খুড়ো-রাজার দাড়িতে আমরা মশাল ধরিয়ে দেব।

অনেকে। আমাদের যুবরাজকে আমরা রক্ষা করব।

পঞ্চম। খুড়ো-রাজা গোপনে যুবরাজকে বন্দী করতে চেষ্টা করেছিল, তাই আমরা যুবরাজকে লুকিয়ে রেখেছি।

প্রথম। চল্ ভাই, খুড়ো-রাজাকে গুঁড়ো করে দিয়ে আসি গে।

দ্বিতীয়। চল্ ভাই, তার মুণ্ডুখানা খসিয়ে তাকে মুড়ো করে দিই গে।

পঞ্চম। সে-সব পরে হবে রে। আপাতত লড়তে হবে।

প্রথম। তা লড়ব। এই হাট থেকেই লড়াই শুরু করে দেওয়া যাক-না। প্রথমে ঐ মহাজনদের গমের বস্তাগুলো লুটে নেওয়া যাক। তার পরে ঘি আছে, চামড়া আছে, কাপড় আছে।

ষষ্ঠের প্রবেশ

ষষ্ঠ। শুনেছিস ? যুবরাজ লুকিয়েছেন শুনে জালন্ধরের রাজা রটিয়েছে, যে তার সন্ধান বলে দেবে তাকে পুরস্কার দেবে।

পঞ্চম। তোর এ-সব খবরে কাজ কী ?

দ্বিতীয়। তুই পুরস্কার নিবি নাকি ?

প্রথম। আয়-না ভাই, ওকে সবাই মিলে পুরস্কার দিই। যা হয় একটা কাজ আরম্ভ করে দেওয়া যাক। চুপ করে বসে থাকতে পারি নে।

ষষ্ঠ। আমাকে মারিস নে ভাই, দোহাই বাপ-সকল ! আমি তোদের সাবধান করে দিতে এসেছি।

দ্বিতীয়। বেটা, তুই আপনি সাবধান হ্।

পঞ্চম। এ খবর যদি তুই রটাবি তা হলে তোর জিভ টেনে ছিড়ে ফেলব।

দূরে কোলাহল

অনেকে মিলিয়া। এসেছে— এসেছে !

সকলে। ওরে, এসেছে রে, জালন্ধরের সৈন্য এসে পৌঁচেছে।

প্রথম। তবে আর কী ! এবারে লুঠ করতে চললুম। ঐ জনার্দন থলে ভরে গোরুর পিঠে বোঝাই করছে। এইবেলা চল্। ঐ জনার্দনটাকে বাদ দিয়ে বাকি ক'টা গোরু বোঝাই-সুদ্ধ তাড়া করা যাক।

দ্বিতীয়। তোরা যা ভাই ! আমি তামাশা দেখে আসি। সার বেঁধে খোলা তলোয়ার হাতে যখন সৈন্য আসে আমার দেখতে বড়ো মজা লাগে।

গান

যমের দুয়োর খোলা পেয়ে
ছুটেছে সব ছেলেমেয়ে।
হরিবোল হরিবোল !

রাজ্য জুড়ে মস্ত খেলা
মরণ-বাঁচন অবহেলা—
ও ভাই, সবাই মিলে প্রাণটা দিলে
সুখ আছে কি মরার চেয়ে !
হরিবোল হরিবোল !
বেজেছে ঢোল, বেজেছে ঢাক,
ঘরে ঘরে পড়েছে ডাক,
এখন কাজকর্ম চুলোতে যাক—
কেজো লোক সব আয় রে ধেয়ে ।
হরিবোল হরিবোল !
রাজা প্রজা হবে জড়ো,
থাকবে না আর ছোটো বড়ো,
একই স্রোতের মুখে ভাসবে সুখে
বৈতরণীর নদী বেয়ে ।
হরিবোল হরিবোল !

তৃতীয় দৃশ্য

ত্রিচূড় । প্রাসাদ

অমরুরাজ ও কুমারসেন

অমরুরাজ । পালাও, পালাও । এসো না আমার রাজ্যে ।
আপনি মজিবে তুমি আমারে মজাবে ।
তোমারে আশ্রয় দিয়ে চাহি নে হইতে
অপরাধী জালন্ধর-রাজ কাছে । হেথা
তব নাহি স্থান ।

কুমারসেন । আশ্রয় চাহি নে আমি ।
অনিশ্চিত অদৃষ্টের পারাবার-মাঝে
ভাসাইব জীবনতরণী— তার আগে
ইলারে দেখিয়া যাব একবার শুধু,
এই ভিক্ষা মাগি ।

অমরুরাজ । ইলারে দেখিয়া যাবে ?
কী হইবে দেখে তারে ! কী হইবে দেখা
দিয়ে ! স্বার্থপর ! রয়েছ মৃত্যুর মুখে
অপমান বহি— গৃহহীন, আশাহীন,
কেন আসিয়াছ ইলার হৃদয়মাঝে
জাগাতে প্রেমের স্মৃতি ?

কুমারসেন । কেন আসিয়াছি ?
হায় আর্য, কেমনে তা বুঝাব তোমায় !

অমরুরাজ। বিপদের খরস্রোতে ভেসে চলিয়াছ,
তুমি কেন চাহিছ ধরিতে ক্ষীণপ্রাণ
কুসুমিত তীরলতা ? যাও, ভেসে যাও

কুমারসেন। আমার বিপদ আজ দোঁহার বিপদ,
মোর দুঃখ দুজনের দুখ। প্রেম শুধু
সম্পদের নহে। মহারাজ, একবার
বিদায় লইতে দাও দুদণ্ডের তরে।

অমরুরাজ। চিরকাল-তরে তুমি লয়েছ বিদায়।
আর নহে। যাও চলে। ভুলে যেতে দাও
তারে অবসর। হাসিমুখখানি তার
দিয়ো না আঁধার করি এ জন্মের মতো।

কুমারসেন। ভুলিতে পারিত যদি দিতাম ভুলিতে—
ফিরে এসে দেখা দিব বলে গিয়েছিনু ;
জানি সে রয়েছে বসি আমার লাগিয়া
পথপানে চাহি, আমারে বিশ্বাস করি।
সে সরল সে অগাধ বিশ্বাস তাহার
কেমনে ভাঙিতে দিব !

অমরুরাজ। সে বিশ্বাস ভেঙে
যাক একবার। নতুবা নূতন পথে
জীবন তাহার ফিরাতে সে পারিবে না।
চিরকাল দুঃখতাপ চেয়ে কিছুকাল
এ যন্ত্রণা ভালো।

কুমারসেন। তার সুখদুঃখ তুমি
দিয়েছ আমার হাতে, কিছুতে ফিরায়ে
নিতে পারিবে না আর। তারে তুমি আর
নাহি জান। তারে আর নারিবে বুঝিতে।
তুমি যারে সুখ দুঃখ ব'লে মনে কর
তার সুখ দুঃখ তাহা নহে। একবার
দেখে যাই তারে।

অমরুরাজ। আমি তারে জানায়েছি,
কাশ্মীরে রয়েছ তুমি রাজমর্যাদায়
ক্ষুদ্র বলে আমাদের অবহেলা ক'রে ;
বিদেশে সংগ্রামযাত্রা মিছে ছল শুধু
বিবাহ ভাঙিতে।

কুমারসেন। ধিক্, ধিক্ প্রতারণা !
সরল বালিকা সে কি তোমার দুহিতা ?
এ নিষ্ঠুর মিথ্যা তারে কহিলে যখন
বিধাতা কি ঘুমাইতেছিল ? শিরে তব
বজ্র পড়িল না ভেঙে ? এখনো সে বেঁচে
রয়েছে কি ! যেতে দাও, যেতে দাও মোরে—
দিবে না কি যেতে ? হানো তবে তরবারি—

বোলো তারে মরে গেছি আমি। প্রতারণা
কোরো না তাহারে।

শংকরের প্রবেশ

শংকর। আসিছে সন্ধানে তব
শত্রুচর, পেয়েছি সংবাদ। এইবেলা
চলো যাই।

কুমারসেন। কোথা যাব? কী হবে লুকায়ে?
এ জীবন পারি নে বহিতে।

শংকর। বনপ্রান্তে
তোমার অপেক্ষা করি আছেন সুমিত্রা।

কুমারসেন। চলো, যাই চলো। ইলা, কোথা আছ ইলা!
ফিরে গেনু দুয়ারে আসিয়া। দুর্ভাগ্যের
দিনে জগতের চারি দিকে রুদ্ধ হয়
আনন্দের দ্বার। প্রিয়ে, হতভাগ্য আমি,
তাই ব'লে নহি অবিশ্বাসী।— চলো, যাই।

চতুর্থ দৃশ্য

ত্রিচূড়। অন্তঃপুর

ইলা ও সখীগণ

ইলা। মিছে কথা, মিছে কথা! তোরা চুপ কর্।
আমি তার মন জানি। সখী, ভালো করে
বেঁধে দে কবরী মোর ফুলমালা দিয়ে।
নিয়ে আয় সেই নীলাম্বর। স্বর্ণথালে
আন্ তুলে শুভ্র ফুল্ল মালতীর ফুল।
নির্ঝরিণীতীরে ওই বকুলের তলা
ভালো সে বাসিত; ওইখানে শিলাতলে
পেতে দে আসনখানি। এমনি যতনে
প্রতিদিন করি সাজ, এমনি করিয়া
প্রতিদিন থাকি বসে, কে জানে কখন
সহসা আসিবে ফিরে প্রিয়তম মোর।
এসেছিল আমাদের মিলন দেখিতে
পরে পরে দুটি পূর্ণিমার রাত, অস্ত
গেছে নিরাশ হইয়া। মনে স্থির জানি
এবার পূর্ণিমানিশি হবে না নিষ্ফল।
আসিবে সে দেখা দিতে। না'ই যদি আসে
তোদের কী! আমারে সে ভুলে যায় যদি
আমিই সে বুঝিব অন্তরে। কেনই বা

না ভুলিবে, কী আছে আমার ! ভুলে যদি
সুখী হয় সেই ভালো— ভালোবেসে যদি
সুখী হয় সেও ভালো। তোরা সখী, মিছে
বকিস নে আর। একটুকু চুপ কর।

গান

আমি নিশিদিন তোমায় ভালোবাসি,
তুমি অবসরমত বাসিয়ো।
আমি নিশিদিন হেথায় বসে আছি,
তোমার যখন মনে পড়ে আসিয়ো।
আমি সারা নিশি তোমা লাগিয়া
রব বিরহশয়নে জাগিয়া,
তুমি নিমেষের তরে প্রভাতে
এসে মুখপানে চেয়ে হাসিয়ো।
তুমি চিরদিন মধুপবনে
চির- বিকশিত বনভবনে
যেয়ো মনোমত পথ ধরিয়া,
তুমি নিজ সুখস্রোতে ভাসিয়ো।
যদি তার মাঝে পড়ি আসিয়া
তবে আমিও চলিব ভাসিয়া,
যদি দূরে পড়ি তাহে ক্ষতি কী,
মোর স্মৃতি মন হতে নাশিয়ো।

পঞ্চম দৃশ্য

কাশ্মীর। শিবির

বিক্রমদেব জয়সেন ও যুধাজিৎ

জয়সেন। কোথায় সে পালাবে রাজন্ ! ধরে এনে
দিব তারে রাজপদে। বিবরদুয়ারে
অগ্নি দিলে বাহিরিয়া আসে ভুজঙ্গম
উত্তাপকাতর। সমস্ত কাশ্মীর ঘিরি
লাগাব আগুন— আপনি সে ধরা দিবে।

বিক্রমদেব। এতদূর এনু পিছে পিছে— কত বন,
কত নদী, কত তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ ভাঙি !
আজ সে পালাবে হাত ছেড়ে ? চাহি তারে,
চাহি তারে আমি। সে না হলে সুখ নাই,
নিদ্রা নাই মোর। শীঘ্র না পাইলে তারে
সমস্ত কাশ্মীর আমি খণ্ড দীর্ণ করি
দেখিব কোথা সে আছে।

যুধাজিৎ। ধরিবারে তারে
পুরস্কার করেছি ঘোষণা।
বিক্রমদেব। তারে পেলে
অন্য কার্যে দিতে পারি হাত। রাজ্য মোর
রয়েছে পড়িয়া, শূন্যপ্রায় রাজকোষ,
দুর্ভিক্ষ হয়েছে রাজা অরাজক দেশে—
ফিরিতে পারি নে তবু। একি দৃঢ়পাশে
আমারে করেছে বন্দী শত্রু পলাতক!
সচকিতে সদা মনে হয়, এই এল,
এই এল, ওই দেখা যায়, ওই বুঝি
উড়ে ধুলা, আর দেরি নাই, এইবার
বুঝি পাব তারে— ধাবমান, ঘনশ্বাস,
ত্রস্ত আঁখি মৃগ-সম। শীঘ্র আনো তারে
জীবিত কি মৃত। ছিন্নভিন্ন হয়ে যাক
মায়াপাশ। নতুবা যা-কিছু আছে মোর
সব যাবে অধঃপাতে।

প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী। রাজা চন্দ্রসেন,
মহিষী রেবতী, এসেছেন ভেটিবার
তরে।
বিক্রমদেব। তোমরা সরিয়া যাও।

প্রহরীকে

নিয়ে এসো
তাঁহাদের প্রণাম জানায়ে।

[অন্য সকলের প্রস্থান

কী বিপদ!
আসিছেন শাশুড়ি আমার। কী বলিব
শুধাইলে কুমারের কথা! কী বলিব
মার্জনা চাহেন যদি যুবরাজ-তরে!
সহিতে পারি নে আমি অশ্রু রমণীর।

চন্দ্রসেন ও রেবতীর প্রবেশ

প্রণাম! প্রণাম আর্যা!
চন্দ্রসেন। চিরজীবী হও।
রেবতী। জয়ী হও, পূর্ণ হোক মনস্কাম তব।
চন্দ্রসেন। শুনেছি, তোমার কাছে কুমার হয়েছে
অপরাধী।
বিক্রমদেব। অপমান করেছে আমারে।
চন্দ্রসেন। বিচারে কী শাস্তি তার করেছ বিধান?

বিক্রমদেব। বন্দীভাবে অপমান করিলে স্বীকার,
করিব মার্জনা।

রেবতী। এই শুধু ? আর কিছু
নয় ? অবশেষে মার্জনা করিবে যদি
তবে কেন এত ক্লেশে এত সৈন্য লয়ে
এত দূরে আসা !

বিক্রমদেব। ভর্ৎসনা কোরো না মোরে।
রাজার প্রধান কাজ, আপনার মান
রক্ষা করা। যে মস্তক মুকুট বহিছে
অপমান পারে না বহিতে। মিছে কাজে
আসি নি হেথায়।

চন্দ্রসেন। ক্ষমা তারে করো বৎস,
বালক সে অল্পবুদ্ধি। ইচ্ছা কর যদি
রাজ্য হতে করিয়ো বঞ্চিত— কেড়ে নিয়ো
সিংহাসন-অধিকার। নির্বাসন সেও
ভালো, প্রাণে বধিয়ো না।

বিক্রমদেব। চাহি না বধিতে।

রেবতী। তবে কেন এত অস্ত্র এনেছ বহিয়া ?
এত অসি শর ? নির্দোষী সৈনিকদের
বধ করে যাবে, যথার্থ যে জন দোষী
ক্ষমিবে তাহারে ?

বিক্রমদেব। বুঝিতে পারি নে দেবী,
কী বলিছ তুমি।

চন্দ্রসেন। কিছু নয়, কিছু নয়।
আমি তবে বলি বুঝাইয়া। সৈন্য যবে
মোর কাছে মাগিল কুমার, আমি তারে
কহিলাম, বিক্রম স্নেহের পাত্র মোর—
তার সনে যুদ্ধ নাহি সাজে। সেই ক্ষোভে
ক্রুদ্ধ যুবা প্রজাদের ঘরে ঘরে গিয়া
বিদ্রোহে করিল উত্তেজিত। অসন্তুষ্ট
মহারানী তাই ; রাজবিদ্রোহীর শাস্তি
করিছে প্রার্থনা তোমা-কাছে। গুরুদণ্ড
দিয়ো না তাহারে, সে যে অবোধ বালক।

বিক্রমদেব। আগে তারে বন্দী করে আনি। তার পরে
যথাযোগ্য করিব বিচার।

রেবতী। প্রজাগণ
লুকায়ে রেখেছে তারে। আগুন জ্বালাও
ঘরে ঘরে তাহাদের। শস্যক্ষেত্র করো
ছারখার। ক্ষুধা-রাক্ষসীর হাতে সঁপি
দাও দেশ, তবে তারে করিবে বাহির।

চন্দ্রসেন। চুপ করো, চুপ করো রানী! চলো বৎস,
শিবির ছাড়িয়া চলো কাশ্মীর প্রাসাদে।
বিক্রমদেব। পরে যাব, অগ্রসর হও মহারাজ।

[চন্দ্রসেন ও রেবতীর প্রস্থান

ওরে হিংস্রনারী! ওরে নরকাগ্নিশিখা!
বন্ধুত্ব আমার সনে! এতদিন পরে
আপনার হৃদয়ের প্রতিমূর্তিখানা
দেখিতে পেলেম ওই রমণীব মুখে।
অমনি শাণিত ক্রূর বক্র জ্বালারেখা
আছে কি ললাটে মোর? রুদ্ধ হিংসাভারে
অধরের দুই প্রান্ত পড়েছে কি নুয়ে?
অমনি কি তীক্ষ্ণ মোর উষ্ণ তিক্ত বাণী
খুনীর ছুরির মতো বাঁকা বিষ-মাখা?
নহে নহে, কভু নহে। এ হিংসা আমার
চোর নহে, ক্রূর নহে, নহে ছদ্মবেশী।
প্রচণ্ড প্রেমের মতো প্রবল এ জ্বালা
অভ্রভেদী সর্বগ্রাসী উদ্দাম উন্মাদ
দুর্নিবার! নহি আমি তোদের আত্মীয়।
হে বিক্রম, ক্ষান্ত করো এ সংহার-খেলা।
এ শ্মশাননৃত্য তব থামাও থামাও,
নিবাও এ চিতা। পিশাচ-পিশাচী যত
অতৃপ্ত হৃদয়ে লয়ে দীপ্ত হিংসাতৃষা
ফিরে যাক রুদ্ধ রোষে, লালায়িত লোভে।
একদিন দিব বুঝাইয়া, নহি আমি
তোমাদের কেহ। নিরাশ করিব এই
গুপ্ত লোভ, বক্র রোষ, দীপ্ত হিংসাতৃষা।
দেখিব কেমন ক'রে আপনার বিষে
আপনি জ্বলিয়া মরে নর-বিষধর।
রমণীর হিংস্র মুখ সূচিময় যেন—
কী ভীষণ, কী নিষ্ঠুর, একান্ত কুৎসিত!

চরের প্রবেশ

চর। ত্রিচূড়ের অভিমুখে গেছেন কুমার।
বিক্রমদেব। এ সংবাদ রাখিয়ো গোপনে। একা আমি
যাব সেথা মৃগয়ার ছলে।
চর। যে আদেশ।

ষষ্ঠ দৃশ্য

অরণ্য

শুষ্ক পর্ণশয্যায় কুমারসেন শয়ান। সুমিত্রা আসীন

কুমারসেন। কত রাত্রি ?
সুমিত্রা। রাত্রি আর নাই ভাই ! রাঙা
হয়ে উঠেছে আকাশ ! শুধু বনচ্ছায়া
অন্ধকার রাখিয়াছে বেঁধে।
কুমারসেন। সারা রাত্রি
জেগে বসে আছ, বোন, ঘুম নেই চোখে ?
সুমিত্রা। জাগিয়াছি দুঃস্বপন দেখে। সারা রাত
মনে হয় শুনি যেন পদশব্দ কার
শুষ্ক পল্লবের 'পরে। তরু-অন্তরালে
শুনি যেন কাহাদের চুপিচুপি কথা,
বিজন মন্ত্রণা। শ্রান্ত আঁখি যদি কভু
মুদে আসে, দারুণ দুঃস্বপ্ন দেখে কেঁদে
জেগে উঠি। সুখসুপ্ত মুখখানি তব
দেখে পুন প্রাণ পাই প্রাণে।
কুমারসেন। দুর্ভাবনা
দুঃস্বপ্নজননী। ভেবো না আমার তরে
বোন ! সুখে আছি। মগ্ন হয়ে জীবনের
মাঝখানে, কে জেনেছে জীবনের সুখ ?
মরণের তটপ্রান্তে ব'সে, এ যেন গো
প্রাণপণে জীবনের একান্ত সম্ভোগ।
এ সংসারে যত সুখ, যত শোভা, যত
প্রেম আছে, সকলি প্রগাঢ় হয়ে যেন
আমারে করিছে আলিঙ্গন। জীবনের
প্রতি বিন্দুটিতে যত মিষ্ট আছে, সব
আমি পেতেছি আস্বাদ। ঘন বন,
তুঙ্গ শৃঙ্গ, উদার আকাশ, উচ্ছ্বসিত
নির্ঝরিণী— আশ্চর্য এ শোভা। অযাচিত
ভালোবাসা অরণ্যের পুষ্পবৃষ্টি-সম
অবিশ্রাম হতেছে বর্ষণ। চারি দিকে
ভক্ত প্রজাগণ। তুমি আছ প্রীতিময়ী
শিয়রে বসিয়া। উড়িবার আগে বুঝি
জীবনবিহঙ্গ বিচিত্র-বরন পাখা
করিছে বিস্তার।— ওই শোনো কাঠুরিয়া
গান গায়— শোনা যাবে রাজ্যের সংবাদ।

কাঠুরিয়ার প্রবেশ ও গান

বঁধু, তোমায় করব রাজা তরুতলে।
বনফুলের বিনোদ-মালা দেব গলে।
সিংহাসনে বসাইতে
হৃদয়খানি দেব পেতে—
অভিষেক করব তোমায় আঁখিজলে।

অগ্রসর হইয়া

কুমারসেন। বন্ধু, আজি কী সংবাদ?
কাঠুরিয়া। ভালো নয় প্রভু!
জয়সেন কাল রাত্রে জ্বালায়ে দিয়েছে
নন্দীগ্রাম, আজ আসে পাণ্ডুপুর-পানে।
কুমারসেন। হায়, ভক্ত প্রজা মোর, কেমনে তোদের
রক্ষা করি? ভগবান, নির্দয় কেন গো
নির্দোষ দীনের 'পরে?

সুমিত্রার প্রতি

কাঠুরিয়া। জননী, এনেছি
কাষ্ঠভার, রাখি শ্রীচরণে।
সুমিত্রা। বেঁচে থাকো।

[কাঠুরিয়ার প্রস্থান

মধুজীবীর প্রবেশ

কুমারসেন। কী সংবাদ?
মধুজীবী। সাবধানে থেকো যুবরাজ!
তোমারে যে ধরে দেবে জীবিত কি মৃত
পুরস্কার পাইবে সে, ঘোষণা করেছে
যুধাজিৎ। বিশ্বাস কোরো না কারে প্রভু!
কুমারসেন। বিশ্বাস করিয়া মরা ভালো। অবিশ্বাস
কাহারে করিব? তোরা সব অনুরক্ত
বন্ধু মোর সরলহৃদয়।
মধুজীবী। মা-জননী,
এনেছি সঞ্চয় করে কিছু বনমধু—
দয়া করে করো মা গ্রহণ।
সুমিত্রা। ভগবান
মঙ্গল করুন তোর!

[মধুজীবীর প্রস্থান

শিকারীর প্রবেশ

শিকারী। জয় হোক প্রভু!
ছাগ-শিকারের তরে যেতে হবে দূর
গিরিদেশে, দুর্গম সে পথ। তব পদে

প্রণাম করিয়া যাব । জয়সেন গৃহ
মোর দিয়েছে জ্বালায়ে ।

কুমারসেন । ধিক্ সে পিশাচ !

শিকারী । আমরা শিকারী । যতদিন বন আছে
আমাদের কে পারে করিতে গৃহহীন ?
কিছু খাদ্য এনেছি জননী, দরিদ্রের
তুচ্ছ উপহার । আশীর্বাদ করো যেন
ফিরে এসে আমাদের যুবরাজে দেখি
সিংহাসনে ।

বাহু বাড়াইয়া

কুমারসেন । এসো তুমি, এসো আলিঙ্গনে ।

[শিকারীর প্রস্থান

ওই দেখো পল্লব ভেদিয়া পড়িতেছে
রবিকররেখা । যাই নির্ঝরের ধারে,
স্নানসন্ধ্যা করি সমাপন । শিলাতটে
বসে বসে কতক্ষণ দেখি আপনার
ছায়া, আপনারে ছায়া বলে মনে হয় ।
নদী হয়ে গেছে চলে এই নির্ঝরিণী
ত্রিচূড়-প্রমোদবন দিয়ে । ইচ্ছা করে
ছায়া মোর ভেসে যায় স্রোতে, যেথা সেই
সন্ধ্যাবেলা বসে থাকে তীরতরুতলে
ইলা— তার ম্লান ছায়াখানি সঙ্গে নিয়ে
চিরকাল ভেসে যায় সাগরেব পানে ।
থাক্ থাক্ কল্পনা-স্বপন । চলো বোন,
যাই নিত্য কাজে । ওই শোনো চারি দিকে
অরণ্য উঠেছে জেগে বিহঙ্গের গানে ।

সপ্তম দৃশ্য

ত্রিচূড় । প্রমোদবন

বিক্রমদেব ও অমরুরাজ

অমরুরাজ । তোমারে করিনু সমর্পণ যাহা আছে
মোর । তুমি বীর, তুমি রাজ-অধিরাজ ।
তব যোগ্য কন্যা মোর, তারে লহো তুমি ।
সহকার মাধবিকা-লতার আশ্রয় ।
ক্ষণেক বিলম্ব করো, মহারাজ, তারে
দিই পাঠাইয়া ।

[প্রস্থান

বিক্রমদেব। কী মধুর শান্তি হেথা!
চিরন্তন অরণ্য আবাস, সুখসুপ্ত
ঘনচ্ছায়া, নির্ঝরিণী নিরন্তরধ্বনি।
শান্তি যে শীতল এত, এমন গম্ভীর,
এমন নিস্তব্ধ তবু এমন প্রবল,
উদার সমুদ্রসম, বহুদিন ভুলে
ছিনু যেন। মনে হয়, আমার প্রাণের
অনন্ত অনলদাহ সেও যেন হেথা
হারাইয়া ডুবে যায়, না থাকে নির্দেশ—
এত ছায়া, এত স্থান, এত গভীরতা!
এমনি নিভৃত সুখ ছিল আমাদের—
গেল কার অপরাধে? আমার কি তার?
যারই হোক— এ জনমে আর কি পাব না?
যাও তবে! একেবারে চলে যাও দূরে!
জীবনে থেকো না জেগে অনুতাপরূপে!
দেখা যাক যদি এইখানে— সংসারের
নির্জন নেপথ্যদেশে পাই নব প্রেম,
তেমনি অতলস্পর্শ, তেমনি মধুর।

সখীর সহিত ইলার প্রবেশ

এ কী অপরূপ মূর্তি! চরিতার্থ আমি।
আসন গ্রহণ করো দেবী! কেন মৌন,
নতশির, কেন ম্লানমুখ, দেহলতা
কম্পিত কাতর? কিসের বেদনা তব?

নতজানু

ইলা। শুনিয়াছি মহারাজ-অধিরাজ তুমি
সসাগরা ধরণীর পতি। ভিক্ষা আছে
তোমার চরণে।
বিক্রমদেব। উঠ উঠ হে সুন্দরী!
তব পদস্পর্শযোগ্য নহে এ ধরণী,
তুমি কেন ধুলায় পতিত? চরাচরে
কিবা আছে অদেয় তোমারে?
ইলা। মহারাজ,
পিতা মোরে দিয়াছেন সঁপি তব হাতে;
আপনারে ভিক্ষা চাহি আমি। ফিরাইয়া
দাও মোরে। কত ধন রত্ন রাজ্য দেশ
আছে তব, ফেলে রেখে যাও মোরে এই
ভূমিতলে। তোমার অভাব কিছু নাই।
বিক্রমদেব। আমার অভাব নাই? কেমনে দেখাব
গোপন হৃদয়? কোথা সেথা ধনরত্ন?

কোথা সসাগরা ধরা ? সব শূন্যময় ।
রাজ্যধন না থাকিত যদি, শুধু তুমি
থাকিতে আমার—

উঠিয়া

ইলা । লহো তবে এ জীবন ।
তোমরা যেমন ক'রে বনের হরিণী
নিয়ে যাও, বুকে তার তীক্ষ্ণ তীর বিঁধে,
তেমনি হৃদয় মোর বিদীর্ণ করিয়া
জীবন কাড়িয়া আগে, তার পরে মোরে
নিয়ে যাও ।

বিক্রমদেব । কেন দেবী, মোর 'পরে এত
অবহেলা ? আমি কি নিতান্ত তব যোগ্য
নহি ? এত রাজ্য দেশ করিলাম জয়,
প্রার্থনা করেও আমি পাব না কি তবু
হৃদয় তোমার ?

ইলা । সে কি আর আছে মোর ?
সমস্ত সঁপেছি যারে, বিদায়ের কালে
হৃদয় সে নিয়ে চলে গেছে, বলে গেছে—
ফিরে এসে দেখা দেবে এই উপবনে ।
কতদিন হল ; বনপ্রান্তে দিন আর
কাটে নাকো । পথ চেয়ে সদা পড়ে আছি ;
যদি এসে দেখিতে না পায়, ফিরে যায়,
আর যদি ফিরিয়া না আসে ! মহারাজ,
কোথা নিয়ে যাবে ? রেখে যাও তার তরে
যে আমারে ফেলে রেখে গেছে ।

বিক্রমদেব । না জানি সে
কোন্ ভাগ্যবান ! সাবধান, অতিপ্রেম
সহে না বিধির । শুন তবে মোর কথা ।
এক কালে চরাচর তুচ্ছ করি আমি
শুধু ভালোবাসিতাম ; সে প্রেমের 'পরে
পড়িল বিধির হিংসা, জেগে দেখিলাম
চরাচর পড়ে আছে, প্রেম গেছে ভেঙে ।
বসে আছ যার তরে কী নাম তাহার ?

ইলা । কাশ্মীরের যুবরাজ— কুমার তাহার
নাম ।

বিক্রমদেব । কুমার ?

ইলা । তারে জান তুমি ! কেই বা
না জানে ! সমস্ত কাশ্মীর তারে দিয়েছে
হৃদয় ।

বিক্রমদেব । কুমার ? কাশ্মীরের যুবরাজ ?

ইলা। সেই বটে মহারাজ ! তার নাম সদা
ধ্বনিছে চৌদিকে। তোমারি সে বন্ধু বুঝি !
মহৎ সে, ধরণীর যোগ্য অধিপতি।

বিক্রমদেব। তাহার সৌভাগ্যরবি গেছে অস্তাচলে,
ছাড়ো তার আশা। শিকারের মৃগসম
সে আজ তাড়িত, ভীত, আশ্রয়বিহীন,
গোপন অরণ্যছায়ে রয়েছে লুকায়ে।
কাশ্মীরের দীনতম ভিক্ষাজীবী আজ
সুখী তার চেয়ে।

ইলা। কী বলিলে মহারাজ ?

বিক্রমদেব। তোমরা বসিয়া থাক ধরাপ্রান্তভাগে,
শুধু ভালোবাস। জান না বাহিরে বিশ্বে
গরজে সংসার, কর্মস্রোতে কে কোথায়
ভেসে যায়, ছলছল বিশাল নয়নে
তোমরা চাহিয়া থাক। বৃথা তার আশা।

ইলা। সত্য বলো মহারাজ, ছলনা কোরো না।
জেনো এই অতিক্ষুদ্র রমণীর প্রাণ
শুধু আছে তারি তরে, তারি পথ চেয়ে।
কোন্ গৃহহীন পথে কোন্ বনমাঝে
কোথা ফিরে কুমার আমার ? আমি যাব,
বলে দাও— গৃহ ছেড়ে কখনো যাই নি—
কোথা যেতে হবে ? কোন্ দিকে, কোন্ পথে ?

বিক্রমদেব। বিদ্রোহী সে, রাজসৈন্য ফিরিতেছে সদা
সন্ধানে তাহার।

ইলা। তোমরা কি বন্ধু নহ ?
তোমরা কি কেহ রক্ষা করিবে না তারে ?
রাজপুত্র ফিরিতেছে বনে, তোমরা কি
রাজা হয়ে দেখিবে চাহিয়া ? এতটুকু
দয়া নেই কারো ? প্রিয়তম, প্রিয়তম,
আমি তো জানি নে, নাথ, সংকটে পড়েছ—
আমি হেথা বসে আছি তোমার লাগিয়া।
অনেক বিলম্ব দেখে মাঝে মাঝে মনে
চকিত বিদ্যুৎ-সম বেজেছে সংশয়।—
শুনেছিনু এত লোক ভালোবাসে তারে
কোথা তারা বিপদের দিনে ? তুমি নাকি
পৃথিবীর রাজা ? বিপন্নের কেহ নহ ?
এত সৈন্য, এত যশ, এত বল নিয়ে
দূরে বসে রবে ? তবে পথ বলে দাও।
জীবন সঁপিব একা অবলা রমণী।

বিক্রমদেব। কী প্রবল প্রেম ! ভালোবাসো ভালোবাসো
এমনি সবেগে চিরদিন। যে তোমার

হৃদয়ের রাজা, শুধু তারে ভালোবাসো।
প্রেমস্বর্গচ্যুত আমি, তোমাদের দেখে
ধন্য হই। দেবী, চাহি নে তোমার প্রেম।
শুষ্ক শাখে ঝরে ফুল, অন্য তরু হতে
ফুল ছিঁড়ে নিয়ে তারে কেমনে সাজাব ?
আমারে বিশ্বাস করো— আমি বন্ধু তব।
চলো মোর সাথে, আমি তারে এনে দেব।
সিংহাসনে বসায়ে কুমারে, তার হাতে
সঁপি দিব তোমারে কুমারী।

ইলা। মহারাজ,
প্রাণ দিলে মোরে। যেথা যেতে বল, যাব।

বিক্রমদেব। এসো তবে প্রস্তুত হইয়া। যেতে হবে
কাশ্মীরের রাজধানী-মাঝে।

[ইলা ও সখীর প্রস্থান

যুদ্ধ নাহি
ভালো লাগে। শান্তি আরো অসহ্য দ্বিগুণ।
গৃহহীন পলাতক, তুমি সুখী মোর
চেয়ে। এ সংসারে যেথা যাও, সাথে থাকে
রমণীর অনিমেষ প্রেম, দেবতার
ধ্রুবদৃষ্টি-সম ; পবিত্র কিরণে তারি
দীপ্তি পায় বিপদের মেঘ, স্বর্ণময়
সম্পদের মতো। আমি কোন্ সুখে ফিরি
দেশ-দেশান্তরে, স্কন্ধে বহে জয়ধ্বজা,
অন্তরেতে অভিশপ্ত হিংসাতপ্ত প্রাণ।
কোথা আছে কোন্ স্নিগ্ধ হৃদয়ের মাঝে
প্রস্ফুটিত শুভ্র প্রেম শিশিরশীতল।
ধুয়ে দাও, প্রেমময়ী, পুণ্য অশ্রুজলে
এ মলিন হস্ত মোর রক্তকলুষিত।

প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী। ব্রাহ্মণ এসেছে মহারাজ, তব সাথে
সাক্ষাতের তরে।

বিক্রমদেব। নিয়ে এসো, দেখা যাক।

দেবদত্তের প্রবেশ

দেবদত্ত। রাজার দোহাই, ব্রাহ্মণেরে রক্ষা করো।

বিক্রমদেব। একি ! তুমি কোথা হতে এলে ? অনুকূল
দৈব মোর 'পরে। তুমি বন্ধুরত্ন মোর।

দেবদত্ত। তাই বটে মহারাজ, রত্ন বটে আমি।
অতি যত্নে বন্ধ করে রেখেছিলে তাই।
ভাগ্যবলে পলায়েছি খোলা পেয়ে দ্বার।

আবার দিয়ো না সঁপি প্রহরীর হাতে
রত্নভ্রমে। আমি শুধু বন্ধুরত্ন নহি,
ব্রাহ্মণীর স্বামীরত্ন আমি। সে কি হায়
এতদিন বেঁচে আছে আর ?

বিক্রমদেব। একি কথা !
আমি তো জানি নে কিছু, এতদিন রুদ্ধ
আছ তুমি !

দেবদত্ত। তুমি কী জানিবে মহারাজ ?
তোমার প্রহরী দুটো জানে। কত শাস্ত্র
বলি তাহাদের, কত কাব্যকথা, শুনে
মূর্খ দুটো হাসে। একদিন বর্ষা দেখে
বিরহব্যথায় মেঘদূত কাব্যখানা
শুনালেম দোঁহে ডেকে ; গ্রাম্য মূর্খ দুটো
পড়িল কাতর হয়ে নিদ্রার আবেশে।
তখনি ধিক্কারভরে কারাগার ছাড়ি
আসিনু চলিয়া। বেছে বেছে ভালো লোক
দিয়েছিলে বিরহী এ ব্রাহ্মণের 'পরে !
এত লোক আছে সখা অধীনে তোমার,
শাস্ত্র বোঝে এমন কি ছিল না দুজন ?

বিক্রমদেব। বন্ধুবর, বড়ো কষ্ট দিয়েছে তোমারে।
সমুচিত শাস্তি দিব তারে, যে পাষণ্ড
রেখেছিল রুধিয়া তোমায়। নিশ্চয় সে
ক্রূরমতি জয়সেন।

দেবদত্ত। শাস্তি পরে হবে।
আপাতত যুদ্ধ রেখে অবিলম্বে দেশে
ফিরে চলো। সত্য কথা বলি মহারাজ,
বিরহ সামান্য ব্যথা নয় এবার তা
পেরেছি বুঝিতে। আগে আমি ভাবিতাম
শুধু বড়ো বড়ো লোক বিরহেতে মরে।
এবার দেখেছি, সামান্য এ ব্রাহ্মণের
ছেলে, এরেও ছাড়ে না পঞ্চবাণ ; ছোটো
বড়ো করে না বিচার।

বিক্রমদেব। যম আর প্রেম
উভয়েরই সমদৃষ্টি সর্বভূতে। বন্ধু,
ফিরে চলো দেশে। কেবল যাবার আগে
এক কাজ বাকি আছে। তুমি লহো ভার।
অরণ্যে কুমারসেন আছে লুকাইয়া,
ত্রিচূড়রাজের কাছে সন্ধান পাইবে
সখে, তার কাছে যেতে হবে। বোলো তারে,
আর আমি শত্রু নহি। অস্ত্র ফেলে দিয়ে

বসে আছি প্রেমে বন্দী করিবারে তারে।
আর সখা— আর কেহ যদি থাকে সেথা—
যদি দেখা পাও আর কারো—

দেবদত্ত। জানি, জানি—
তাঁর কথা জাগিতেছে হৃদয়ে সতত।
এতক্ষণ বলি নাই কিছু। মুখে যেন
সরে না বচন। এখন তাঁহার কথা
বচনের অতীত হয়েছে। সাধ্বী তিনি,
তাই এত দুঃখ তাঁর। তাঁরে মনে ক'রে
মনে পড়ে পুণ্যবতী জানকীর কথা।
চলিলাম তবে।

বিক্রমদেব। বসন্ত না আসিতেই
আগে আসে দক্ষিণপবন, তার পরে
পল্লবে কুসুমে বনশ্রী প্রফুল্ল হয়ে
ওঠে। তোমারে হেরিয়া আশা হয় মনে,
আবার আসিবে ফিরে সেই পুরাতন
দিন মোর, নিয়ে তার সব সুখভার।

অষ্টম দৃশ্য

অরণ্য

কুমারের দুইজন অনুচর

প্রথম। হ্যা দেখ্, মাধু, কাল যে স্বপ্নটা দেখলুম তার কোনো মানে ভেবে পাচ্ছি নে। শহরে গিয়ে দৈবিজ্ঞি ঠাকুরের কাছে শুনিয়ে নিয়ে আসতে হবে।

দ্বিতীয়। কী স্বপ্নটা বল্ তো শুনি।

প্রথম। যেন একজন মহাপুরুষ ঐ জল থেকে উঠে আমাকে তিনটে বড়ো বড়ো বেল দিতে এল। আমি দুটো দু হাতে নিলুম, আর-একটা কোথায় নেব ভাবনা পড়ে গেল।

দ্বিতীয়। দূর মূর্খ, তিনটেই চাদরে বেঁধে নিতে হয়।

প্রথম। আরে, জেগে থাকলে তো সকলেরই বুদ্ধি জোগায়— সে সময়ে তুই কোথায় ছিলি ? তার পরে শোন্-না ; সেই বাকি বেলটা মাটিতে পড়েই গড়াতে আরম্ভ করলে, আমি তার পিছন পিছন ছুটলুম। হঠাৎ দেখি যুবরাজ অশথতলায় বসে আহ্নিক করছেন। বেলটা ধপ্ করে তাঁর কোলের উপর গিয়ে লাফিয়ে উঠল। আমার ঘুম ভেঙে গেল।

দ্বিতীয়। এটা আর বুঝতে পারলি নে ? যুবরাজ শিগ্‌গির রাজা হবে।

প্রথম। আমিও তাই ঠাউরেছিলুম। কিন্তু আমি যে দুটো বেল পেলুম, আমার কী হবে ?

দ্বিতীয়। তোর আবার হবে কী ? তোর খেতে বেগুন বেশি করে ফলবে।

প্রথম। না ভাই, আমি ঠাউড়ে রেখেছি আমার দুই পুত্তুর-সন্তান হবে।

দ্বিতীয়। হ্যা দেখ্ ভাই, বললে পিত্তয় যাবি নে, কাল ভারি আশ্চর্য কাণ্ড হয়ে গেছে। ঐ জলের ধারে বসে রামচরণে আমাতে চিঁড়ে ভিজিয়ে খাচ্ছিলুম ; তা আমি কথায় কথায় বললুম, আমাদের

দোবেজী শুনে বলেছে যুবরাজের ফাঁড়া প্রায় কেটে এসেছে। আর দেরি নেই। এবার শিগ্‌গির রাজা হবে। হঠাৎ মাথার উপর কে তিন বার বলে উঠল 'ঠিক ঠিক ঠিক'। উপরে চেয়ে দেখি ডুমুরের ডালে এতবড়ো একটা টিকটিকি !

রামচরণের প্রবেশ

প্রথম। কী খবর রামচরণ ?

রামচরণ। ওরে ভাই, আজ একটা ব্রাহ্মণ এই বনের আশেপাশে যুবরাজের সন্ধান নিয়ে ফিরছিল। আমাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কত কথাই জিজ্ঞেসা করলে। আমি তেমনি বোকা আর-কি ! আমিও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জবাব দিতে লাগলুম। অনেক খোঁজ করে শেষকালে চলে গেল। তাকে আমি চিত্তলের রাস্তা দেখিয়ে দিলুম। ব্রাহ্মণ না হলে তাকে আজ আর আমি আস্ত রাখতুম না।

দ্বিতীয়। কিন্তু তা হলে তো এ বন ছাড়তে হচ্ছে। বেটারা সন্ধান পেয়েছে দেখছি।

প্রথম। এইখানে বসে পড়ো-না ভাই রামচরণ— দুটো গল্প করা যাক।

রামচরণ। যুবরাজের সঙ্গে আমাদের মা-ঠাকরুন এই দিকে আসছেন। চল্ ভাই, তফাতে গিয়ে বসি গে।

[প্রস্থান

কুমারসেন ও সুমিত্রার প্রবেশ

কুমারসেন। শংকর পড়েছে ধরা। রাজ্যের সংবাদ
নিতে গিয়েছিল বৃদ্ধ, গোপনে ধরিয়া
ছদ্মবেশ। শত্রুচর ধরেছে তাহারে।
নিয়ে গেছে জয়সেন-কাছে। শুনিয়াছি
চলিতেছে নিষ্ঠুর পীড়ন তার 'পরে—
তবু সে অটল। একটি কথাও তারা
পারে নাই মুখ হতে করিতে বাহির।

সুমিত্রা। হায় বৃদ্ধ প্রভুবৎসল ! প্রাণাধিক
ভালোবাসো যারে সেই কুমারের কাজে
সঁপি দিলে তোমার কুমারগত প্রাণ।

কুমারসেন। এ সংসারে সব চেয়ে বন্ধু সে আমার,
আজন্মের সখা। আপনার প্রাণ দিয়ে
আড়াল করিয়া, চাহে সে রাখিতে মোরে
নিরাপদে। অতিবৃদ্ধ ক্ষীণ জীর্ণ দেহ,
কেমনে সে সহিছে যন্ত্রণা ! আমি হেথা
সুখে আছি লুকায়ে বসিয়া !

সুমিত্রা। আমি যাই
ভাই ! ভিখারিনীবেশে সিংহাসনতলে
গিয়া শংকরের প্রাণভিক্ষা মেগে আসি।

কুমারসেন। বাহির হইতে তারা আবার তোমারে
দিবে ফিরাইয়া। তোমার পিতার রাজ্য
হবে নতশির। বজ্রসম বাজিবে সে
মর্মে গিয়ে মোর।

চরের প্রবেশ

চর। গত রাত্রে গিধ্‌কূট

জ্বালায়ে দিয়েছে জয়সেন। গৃহহীন
গ্রামবাসীগণ আশ্রয় নিয়েছে গিয়ে
মন্দুর অরণ্য-মাঝে।

[প্রস্থান

কুমারসেন। আর তো সহে না।
ঘৃণা হয় এ জীবন করিতে বহন
সহস্রের জীবন করিয়া ক্ষয়।

সুমিত্রা। চলো
মোরা দুইজনে যাই রাজসভা-মাঝে—
দেখিব কেমনে, কোন্ ছলে, জালন্ধর
স্পর্শ করে কেশ তব।

কুমারসেন। শংকর বলিত,
'প্রাণ যায় সেও ভালো, তবু বন্দীভাবে
কখনো দিয়ো না ধরা।' পিতৃসিংহাসনে
বসি বিদেশের রাজা দণ্ড দিবে মোরে
বিচারের ছল করি, এ কি সহ্য হবে?
অনেক সহেছি বোন, পিতৃপুরুষের
অপমান সহিব কেমনে।

সুমিত্রা। তার চেয়ে
মৃত্যু ভালো।

কুমারসেন। বলো বোন, বলো, 'তার চেয়ে
মৃত্যু ভালো।' এই তো তোমার যোগ্য কথা
তার চেয়ে মৃত্যু ভালো! ভালো করে ভেবে
দেখো— বেঁচে থাকা ভীরুতা কেবল। বলো,
এ কি সত্য নয়? থেকো না নীরব হয়ে,
বিষাদ-আনত নেত্রে চেয়ো না ভূতলে।
মুখ তোলো, স্পষ্ট করে বলো একবার,
ঘৃণিত এ প্রাণ লয়ে লুকায়ে লুকায়ে
নিশিদিন মরে থাকা, এক দণ্ড এ কি
উচিত আমার?

সুমিত্রা। ভাই—

কুমারসেন। আমি রাজপুত্র—
ছারখার হয়ে যায় সোনার কাশ্মীর,
পথে পথে বনে বনে ফিরে গৃহহীন
প্রজা, কেঁদে মরে পতিপুত্রহীনা নারী,
তবু আমি কোনোমতে বাঁচিব গোপনে?

সুমিত্রা। তার চেয়ে মৃত্যু ভালো।

কুমারসেন। বলো, তাই বলো।
ভক্ত যারা অনুরক্ত মোর— প্রতিদিন
সঁপিছে আপন প্রাণ নির্যাতন সহি।

তবু আমি তাহাদের পশ্চাতে লুকায়ে
জীবন করিব ভোগ ! এ কি বেঁচে থাকা !

সুমিত্রা । এর চেয়ে মৃত্যু ভালো ।

কুমারসেন । বাঁচিলাম শুনে ।
কোনোমতে রেখেছিনু তোমারি লাগিয়া
এ হীন জীবন, প্রত্যেক নিশ্বাসে মোর
নির্দোষের প্রাণবায়ু করিয়া শোষণ ।—
আমার চরণ ছুঁয়ে করহ শপথ
যে কথা বলিব তাহা করিবে পালন
যতই কঠিন হোক ।

সুমিত্রা । করিনু শপথ ।

কুমারসেন । এ জীবন দিব বিসর্জন । তার পরে
তুমি মোর ছিন্নমুণ্ড নিয়ে, নিজ হস্তে
জালন্ধর-রাজ-করে দিবে উপহার ।
বলিয়ো তাহারে— 'কাশ্মীরে অতিথি তুমি ;
ব্যাকুল হয়েছ এত যে দ্রব্যের তরে
কাশ্মীরের যুবরাজ দিতেছেন তাহা
আতিথ্যের অর্ঘ্যরূপে তোমারে পাঠায়ে ।'
মৌন কেন বোন ? সঘনে কাঁপিছে কেন
চরণ তোমার ? বোসো এই তরুতলে ।
পারিবে না তুমি ? একান্ত অসাধ্য এ কি ?
তবে কি ভৃত্যের হস্তে পাঠাইতে হবে
তুচ্ছ উপহার-সম এ রাজমস্তক ?
সমস্ত কাশ্মীর তারে ফেলিবে যে রোষে
ছিন্নভিন্ন করি ।

সুমিত্রার মূর্ছা

ছি ছি বোন ! উঠ, উঠ !
পাষাণে হৃদয় বাঁধো । হোয়ো না বিহ্বল ।
দুঃসহ এ কাজ— তাই তো তোমার 'পরে
দিতেছি দুরূহ ভার ! অয়ি প্রাণাধিকে,
মহৎহৃদয় ছাড়া কাহারা সহিবে
জগতের মহাক্লেশ যত ? বলো বোন,
পারিবে করিতে ?

সুমিত্রা । পারিব ।

কুমারসেন । দাঁড়াও তবে ।
ধরো বল, তোলো শির । উঠাও জাগায়ে
সমস্ত হৃদয়-মন । ক্ষুদ্রনারী-সম
আপন বেদনাভারে পোড়ো না ভাঙিয়া ।

সুমিত্রা । অভাগিনী ইলা !

কুমারসেন । তারে কি জানি নে আমি ?

হেন অপমান লয়ে সে কি মোরে কভু
বাঁচিতে বলিত ? সে আমার ধ্রুবতারা
মহৎমৃত্যুর দিকে দেখাইছে পথ।
কাল পূর্ণিমার তিথি মিলনের রাত।
জীবনের গ্লানি হতে মুক্ত ধৌত হয়ে
চিরমিলনের বেশ করিব ধারণ।
চলো বোন, আগে হতে সংবাদ পাঠাই
দূতমুখে রাজসভামাঝে— কাল আমি
যাব ধরা দিতে। তাহা হলে অবিলম্বে
শংকর পাইবে ছাড়া— বান্ধব আমার

নবম দৃশ্য

কাশ্মীর। রাজসভা

বিক্রমদেব ও চন্দ্রসেন

বিক্রমদেব। আর্য, তুমি কেন আজ নীরব এমন ?
মার্জনা তো করেছি কুমারে।

চন্দ্রসেন। তুমি তারে
মার্জনা করেছ। আমি তো এখনো তার
বিচার করি নি। বিদ্রোহী সে মোর কাছে।
এবার তাহার শাস্তি দিব।

বিক্রমদেব। কোন্ শাস্তি
করিয়াছ স্থির ?

চন্দ্রসেন। সিংহাসন হতে তারে
করিব বঞ্চিত।

বিক্রমদেব। অতি অসম্ভব কথা।
সিংহাসন দিব তারে নিজ হস্তে আমি।

চন্দ্রসেন। কাশ্মীরের সিংহাসনে তোমার কী আছে
অধিকার ?

বিক্রমদেব। বিজয়ীর অধিকার।

চন্দ্রসেন। তুমি
হেথা আছ বন্ধুভাবে অতিথির মতো।
কাশ্মীরের সিংহাসন কর নাই জয়।

বিক্রমদেব। বিনা যুদ্ধে করিয়াছে কাশ্মীর আমারে
আত্মসমর্পণ। যুদ্ধ চাও যুদ্ধ করো,
রয়েছি প্রস্তুত। আমার এ সিংহাসন।
যারে ইচ্ছা দিব।

চন্দ্রসেন। তুমি দিবে ! জানি আমি

গর্বিত কুমারসেনে জন্মকাল হতে।
সে কি লবে আপনার পিতৃসিংহাসন
ভিক্ষার স্বরূপে ? প্রেম দাও প্রেম লবে,
হিংসা দাও প্রতিহিংসা লবে, ভিক্ষা দাও
ঘৃণাভরে পদাঘাত করিবে তাহাতে।

বিক্রমদেব। এত গর্ব যদি তার, তবে সে কি কভু
ধরা দিতে মোর কাছে আপনি আসিত ?

চন্দ্রসেন। তাই ভাবিতেছি, মহারাজ, নহে ইহা
কুমারসেনের মতো কাজ। দৃপ্ত যুবা
সিংহ-সম। সে কি আজ স্বেচ্ছায় আসিবে
শৃঙ্খল পরিতে গলে ? জীবনের মায়া
এতই কি বলবান ?

প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী। শিবিকার দ্বার
রুদ্ধ করি প্রাসাদে আসিছে যুবরাজ।

বিক্রমদেব। শিবিকার দ্বার রুদ্ধ ?

চন্দ্রসেন। সে কি আর কভু
দেখাইবে মুখ ? আপনার পিতৃরাজ্যে
আসিছে সে স্বেচ্ছাবন্দী হয়ে ; রাজপথে
লোকারণ্য চারি দিকে, সহস্রের আঁখি
রয়েছে তাকায়ে। কাশ্মীর-ললনা যত
গবাক্ষে দাঁড়ায়ে। উৎসবের পূর্ণচন্দ্র
চেয়ে আছে আকাশের মাঝখান হতে।
সেই চিরপরিচিত গৃহ পথ হাট
সরোবর মন্দির কানন, পরিচিত
প্রত্যেক প্রজার মুখ। কোন্ লাজে আজি
দেখা দিবে সবারে সে ? মহারাজ, শোনো
নিবেদন। গীতবাদ্য বন্ধ করে দাও।
এ উৎসব উপহাস মনে হবে তার।
আজ রাত্রে দীপালোক দেখে ভাবিবে সে,
নিশীথতিমিরে পাছে লজ্জা ঢাকা পড়ে
তাই এত আলো। এ আলোক শুধু বুঝি
অপমানপিশাচের পরিহাস-হাসি।

দেবদত্তের প্রবেশ

দেবদত্ত। জয়োস্তু রাজন্! কুমারের অন্বেষণে
বনে বনে ফিরিয়াছি, পাই নাই দেখা।
আজ শুনিলাম নাকি আসিছেন তিনি
স্বেচ্ছায় নগরে ফিরি। তাই চলে এনু।

বিক্রমদেব। করিব রাজার মতো অভ্যর্থনা তারে।

তুমি হবে পুরোহিত অভিষেক-কালে।
পূর্ণিমানিশীথে আজ কুমারের সনে
ইলার বিবাহ হবে, করেছি তাহার
আয়োজন।

নগরের ব্রাহ্মণগণের প্রবেশ

সকলে। মহারাজ, জয় হোক।

প্রথম। করি
আশীর্বাদ, ধরণীর অধীশ্বর হও।
লক্ষ্মী হোন অচলা তোমা গৃহে সদা।
আজ যে আনন্দ তুমি দিয়েছ সবারে
বলিতে শকতি নাই— লহো মহারাজ,
কৃতজ্ঞ এ কাশ্মীরের কল্যাণ-আশিস্।

রাজার মস্তকে ধান্যদূর্বা দিয়া আশীর্বাদ

বিক্রমদেব। ধন্য আমি কৃতার্থ জীবন।

[ব্রাহ্মণগণের প্রস্থান

যষ্টিহস্তে কষ্টে শংকরের প্রবেশ
চন্দ্রসেনের প্রতি

শংকর। মহারাজ!
এ কি সত্য? যুবরাজ আসিছেন নিজে
শত্রুকরে করিবারে আত্মসমর্পণ?
বলো, এ কি সত্য কথা?

চন্দ্রসেন। সত্য বটে।

শংকর। ধিক্,
সহস্র মিথ্যার চেয়ে এই সত্যে ধিক্!
হায় যুবরাজ, বৃদ্ধ ভৃত্য আমি তব,
সহিলাম এত যে যন্ত্রণা, জীর্ণ অস্থি
চূর্ণ হয়ে গেল, মূকসম রহিলাম
তবু, সে কি এরি তরে? অবশেষে তুমি
আপনি ধরিলে বন্দীবেশ, কাশ্মীরের
রাজপথ দিয়ে চলে এলে নতশিরে
বন্দীশালা-মাঝে? এই কি সে রাজসভা
পিতামহদের? যেথা বসি পিতা তব
উঠিতেন ধরণীর সর্বোচ্চ শিখরে
সে আজ তোমার কাছে ধরার ধুলার
চেয়ে নীচে! তার চেয়ে নিরাশ্রয় পথ
গৃহতুল্য, অরণ্যের ছায়া সমুজ্জ্বল,
কঠিনপর্বতশৃঙ্গ অনুর্বরমরু
রাজার সম্পদে পূর্ণ। চিরভৃত্য তব

আজি দুর্দিনের আগে মরিল না কেন ?

বিক্রমদেব। ভালো হতে মন্দটুকু নিয়ে, বৃদ্ধ, মিছে
এ তব ক্রন্দন।

শংকর। রাজন্, তোমার কাছে
আসি নি কাঁদিতে। স্বর্গীয় রাজেন্দ্রগণ
রয়েছেন জাগি ওই সিংহাসন-কাছে,
আজি তাঁরা ম্লানমুখ, লজ্জানতশির,
তাঁরা বুঝিবেন মোর হৃদয়বেদনা।

বিক্রমদেব। কেন মোরে শত্রু বলে করিতেছ ভ্রম ?
মিত্র আমি আজি।

শংকর। অতিশয় দয়া তব
জালন্ধরপতি! মার্জনা করেছ তুমি!
দণ্ড ভালো মার্জনার চেয়ে।

বিক্রমদেব। এর মতো
হেন ভক্ত বন্ধু হায় কে আমার আছে ?

দেবদত্ত। আছে বন্ধু, আছে মহারাজ।

বাহিরে হুলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি, কোলাহল
শংকরের দুই হস্তে মুখ আচ্ছাদন

প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী। আসিয়াছে
দুয়ারে শিবিকা।

বিক্রমদেব। বাদ্য কোথা, বাজাইতে
বলো। চলো সখা, অগ্রসর হয়ে তারে
অভ্যর্থনা করি।

[বাদ্যোদ্যম

সভামধ্যে শিবিকার প্রবেশ
অগ্রসর হইয়া

বিক্রমদেব। এসো, এসো, বন্ধু এসো।

স্বর্ণথালে ছিন্নমুণ্ড লইয়া সুমিত্রার শিবিকাবাহিরে
আগমন। সহসা সমস্ত বাদ্য নীরব

বিক্রমদেব। সুমিত্রা! সুমিত্রা ?

চন্দ্রসেন। এ কী, জননী সুমিত্রা!

সুমিত্রা। ফিরেছ সন্ধানে যার রাত্রিদিন ধরে
কাননে কান্তারে শৈলে রাজ্য ধর্ম দয়া
রাজলক্ষ্মী সব বিসর্জিয়া, যার লাগি
দিগ্বিদিকে হাহাকার করেছ প্রচার,

মূল্য দিয়ে চেয়েছিলে কিনিবারে যারে,
লহো মহারাজ, ধরণীর রাজবংশে
শ্রেষ্ঠ সেই শির। আতিথ্যের উপহার
আপনি ভেটিলা যুবরাজ। পূর্ণ তব
মনস্কাম। এবে শান্তি হোক, শান্তি হোক
এ জগতে, নিবে যাক নারকাগ্নিরাশি—
সুখী হও তুমি।

ঊর্ধ্বস্বরে

মা গো জগৎজননী,
দয়াময়ী, স্থান দাও কোলে।

[পতন ও মৃত্যু

ছুটিয়া ইলার প্রবেশ

ইলা। এ কী! এ কী!
মহারাজ, কুমার আমার—

[মূর্ছা

অগ্রসর হইয়া

শংকর। প্রভু, স্বামী,
বৎস, প্রাণাধিক, বৃদ্ধের জীবনধন,
এই ভালো, এই ভালো! মুকুট পরেছ
তুমি, এসেছ রাজার মতো আপনার
সিংহাসনে। মৃত্যুর অমর রশ্মিরেখা
উজ্জ্বল করেছে তব ভাল। এতদিন
এ বৃদ্ধেরে রেখেছিল বিধি, আজি তব
এ মহিমা দেখাবার তরে। গেছ তুমি
পুণ্যধামে— ভৃত্য আমি চিরজনমের
আমিও যাইব সাথে।

মাথা হইতে মুকুট ভূমে ফেলিয়া

চন্দ্রসেন। ধিক্ এ মুকুট!
ধিক্ এই সিংহাসন!

[সিংহাসনে পদাঘাত

রেবতীর প্রবেশ

রাক্ষসী, পিশাচী,
দূর হ, দূর হ— আমারে দিস্ নে দেখা
পাপীয়সী!

রেবতী। এ রোষ রবে না চিরদিন।

[প্রস্থান

নতজানু

বিক্রমদেব। দেবী, যোগ্য নহি আমি তোমার প্রেমের,
তাই ব'লে মার্জনাও করিলে না ? রেখে
গেলে চির-অপরাধী করে ? ইহজন্ম
নিত্য অশ্রুজলে লইতাম ভিক্ষা মাগি
ক্ষমা তব ; তাহারও দিলে না অবকাশ ?
দেবতার মতো তুমি নিশ্চল নিষ্ঠুর,
অমোঘ তোমার দণ্ড, কঠিন বিধান !

বিসর্জন

উৎসর্গ

শ্রীমান সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রাণাধিকেষু

তোরি হাতে বাঁধা খাতা, তারি শ-খানেক পাতা
অক্ষরেতে ফেলিয়াছি ঢেকে,
মস্তিষ্ককোটরবাসী চিন্তাকীট রাশি রাশি
পদচিহ্ন গেছে যেন রেখে।
প্রবাসে প্রত্যহ তোরে হৃদয়ে স্মরণ করে
লিখিয়াছি নির্জন প্রভাতে,
মনে করি অবশেষে শেষ হলে ফিরে দেশে
জন্মদিনে দিব তোর হাতে।

বর্ণনাটা করি শোন্— একা আমি, গৃহকোণ,
কাগজ-পত্তর ছড়াছড়ি।
দশ দিকে বইগুলি সঞ্চয় করিছে ধূলি,
আলস্যে যেতেছে গড়াগড়ি।
শয্যাহীন খাটখানা একপাশে দেয় থানা,
প্রকাশিয়া কাঠের পাঁজর।
তারি 'পরে অবিচারে যাহা-তাহা ভারে ভারে
স্তূপাকারে সহে অনাদর।

চেয়ে দেখি জানালায় খালখানা শুষ্কপ্রায়,
মাঝে মাঝে বেধে আছে জল,
এক ধারে রাশ রাশ, অর্ধমগ্ন দীর্ঘ বাঁশ,
তারি 'পরে বালকের দল।
ধরে মাছ, মারে ঢেলা— সারাদিন করে খেলা
ডভচর মানবশাবক।
মেয়েরা মাজিছে গাত্র অথবা কাঁসার পাত্র
সোনার মতন ঝক্ ঝক্।

উত্তরে যেতেছে দেখা পড়েছে পথের রেখা
শুষ্ক সেই জলপথ-মাঝে—
বহু কষ্টে ডাক ছাড়ি চলেছে গোরুর গাড়ি,
ঝিনি ঝিনি ঘণ্টা তারি বাজে।
কেহ দ্রুত কেহ ধীরে কেহ যায় নতশিরে,
কেহ যায় বুক ফুলাইয়া,
কেহ জীর্ণ টাট্টু চড়ি চলিয়াছে তড়বড়ি
দুই ধারে দু-পা দুলাইয়া।

পরপারে গায়ে গায়   অভ্রভেদী মহাকায়
স্তব্ধচ্ছায় বট-অশথেরা,
স্নিগ্ধ বন-অঙ্কে তারি   সুপ্তপ্রায় সারি সারি
কুঁড়েগুলি বেড়া দিয়ে ঘেরা—
বিহঙ্গে মানবে মিলি   আছে হোথা নিরিবিলি,
ঘনশ্যাম পল্লবের ঘর—
সন্ধ্যাবেলা হোথা হতে   ভেসে আসে বায়ুস্রোতে
গ্রামের বিচিত্র গীতস্বর।

পূর্বপ্রান্তে বনশিরে   সূর্যোদয় ধীরে ধীরে,
চারি দিকে পাখির কূজন।
শঙ্খঘণ্টা ক্ষণপরে   দূর মন্দিরের ঘরে
প্রচারিছে শিবের পূজন।
যে প্রত্যূষে মধুমাছি   বাহিরায় মধু যাচি
কুসুমকুঞ্জের দ্বারে দ্বারে
সেই ভোরবেলা আমি   মানসকুহরে নামি
আয়োজন করি লিখিবারে।

লিখিতে লিখিতে মাঝে   পাখি-গান কানে বাজে,
মনে আনে কাল পুরাতন—
ওই গান, ওই ছবি,   তরুশিরে রাঙা রবি
ওরা প্রকৃতির নিত্যধন।
আদিকবি বাল্মীকিরে   এই সমীরণ ধীরে
ভক্তিভরে করেছে বীজন,
ওই মায়াচিত্রবৎ   তরুলতা ছায়াপথ
ছিল তাঁর পুণ্য তপোবন।

রাজধানী কলিকাতা   তুলেছে স্পর্ধিত মাথা,
পুরাতন নাহি ঘেঁষে কাছে।
কাষ্ঠ লোষ্ট্র চারি দিক,   বর্তমান-আধুনিক
আড়ষ্ট হইয়া যেন আছে।
'আজ' 'কাল' দুটি ভাই   মরিতেছে জন্মিয়াই,
কলরব করিতেছে কত।
নিশিদিন ধূলি প'ড়ে   দিতেছে আচ্ছন্ন ক'রে
চিরসত্য আছে যেথা যত।

জীবনের হানাহানি,   প্রাণ নিয়ে টানাটানি,
মত নিয়ে বাক্য-বরিষন,
বিদ্যা নিয়ে রাতারাতি   পুঁথির প্রাচীর গাঁথি
প্রকৃতির গণ্ডি-বিরচন,

কেবলই নূতনে আশ, সৌন্দর্যেতে অবিশ্বাস
উন্মাদনা চাহি দিনরাত—
সে-সকল ভুলে গিয়ে কোণে বসে খাতা নিয়ে
মহানন্দে কাটিছে প্রভাত।

দক্ষিণের বারান্দায় বেড়াই মুগ্ধের প্রায়,
অপরাহ্ণে পড়ে তরুচ্ছায়া—
কল্পনার ধনগুলি হৃদয়দোলায় দুলি
প্রতিক্ষণে লভিতেছে কায়া।
সেবি বাহিরের বায়ু বাড়ে তাহাদের আয়ু,
ভোগ করে চাঁদের অমিয়—
ভেদ করি মোর প্রাণ জীবন করিয়া পান
হইতেছে জীবনের প্রিয়।

এত তারা জেগে আছে নিশিদিন কাছে কাছে,
এত কথা কয় শত স্বরে,
তাহাদের তুলনায় আর-সবে ছায়াপ্রায়
আসে যায় নয়নের 'পরে।
আজ সব হল সারা, বিদায় লয়েছে তারা,
নূতন বেঁধেছে ঘরবাড়ি—
এখন স্বাধীন বলে বাহিরে এসেছে চলে
অন্তরের পিতৃগৃহ ছাড়ি।

তাই এতদিন পরে আজি নিজমূর্তি ধরে
প্রবাসের বিরহবেদনা,
তোদের কাছেতে যেতে তোদিকে নিকটে পেতে
জাগিতেছে একান্ত বাসনা।
সম্মুখে দাঁড়াব যবে 'কী এনেছ' বলি সবে
যদ্যপি শুধাস হাসিমুখ,
খাতাখানি বের করে বলিব 'এ পাতা ভরে
আনিয়াছি প্রবাসের সুখ'!

সেই ছবি মনে আসে— টেবিলের চারি পাশে
গুটিকত চৌকি টেনে আনি,
শুধু জন দুই-তিন, ঊর্ধ্বে জ্বলে কেরোসিন,
কেদারায় বসি ঠাকুরানী।
দক্ষিণের দ্বার দিয়ে বায়ু আসে গান নিয়ে,
কেঁপে কেঁপে উঠে দীপশিখা।
খাতা হাতে সুর ক'রে অবাধে যেতেছি প'ড়ে,
কেহ নাই করিবারে টীকা।

ঘণ্টা বাজে, বাড়ে রাত, ফুরায় ব'য়ের পাত,
বাহিরে নিস্তব্ধ চারি ধার—
তোদের নয়নে জল করে আসে ছলছল্
শুনিয়া কাহিনী করুণার।
তাই দেখে শুতে যাই, আনন্দের শেষ নাই,
কাটে রাত্রি স্বপ্ন-রচনায়—
মনে মনে প্রাণ ভরি অমরতা লাভ করি
নীরব সে সমালোচনায়।

তার পরে দিনকত কেটে যায় এইমত,
তার পরে ছাপাবার পালা।
মুদ্রাযন্ত্র হতে শেষে বাহিরায় ভদ্রবেশে,
তার পরে মহা ঝালাপালা।
রক্তমাংস-গন্ধ পেয়ে ক্রিটিকেরা আসে ধেয়ে,
চারি দিকে করে কাড়াকাড়ি।
কেহ বলে, 'ড্রামাটিক বলা নাহি যায় ঠিক,
লিরিকের বড়ো বাড়াবাড়ি।'

শির নাড়ি কেহ কহে, 'সব-সুদ্ধ মন্দ নহে,
ভালো হ'ত আরো ভালো হলে।'
কেহ বলে, 'আয়ুহীন বাঁচিবে দু-চারি দিন,
চিরদিন রবে না তা ব'লে।'
কেহ বলে, 'এ বহিটা লাগিতে পারিত মিঠা
হ'ত যদি অন্য কোনোরূপ।'
যার মনে যাহা লয় সকলেই কথা কয়,
আমি শুধু বসে আছি চুপ।

ল'য়ে নাম, ল'য়ে জাতি বিদ্বানের মাতামাতি,
ও-সকল আনিস নে কানে।
আইনের লৌহ-ছাঁচে কবিতা কভু না বাঁচে,
প্রাণ শুধু পায় তাহা প্রাণে।
হাসিমুখে স্নেহভরে সঁপিলাম তোর করে,
বুঝিয়া পড়িবি অনুরাগে।
কে বোঝে কে নাই বোঝে ভাবুক তা নাহি খোঁজে,
ভালো যার লাগে তার লাগে।

—রবিকাকা

নাটকের পাত্রগণ

গোবিন্দমাণিক্য	ত্রিপুরার রাজা
নক্ষত্ররায়	গোবিন্দমাণিক্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা
রঘুপতি	রাজপুরোহিত
জয়সিংহ	রঘুপতির পালিত রাজপুত যুবক, রাজমন্দিরের সেবক
চাঁদপাল	দেওয়ান
নয়নরায়	সেনাপতি
ধ্রুব	রাজপালিত বালক
মন্ত্রী	
পৌরগণ	
গুণবতী	মহিষী
অপর্ণা	ভিখারিনী

বিসর্জন

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মন্দির

গুণবতী

গুণবতী। মার কাছে কী করেছি দোষ ! ভিখারি যে
সন্তান বিক্রয় করে উদরের দায়ে,
তারে দাও শিশু— পাপিষ্ঠা যে লোকলাজে
সন্তানেরে বধ করে, তার গর্ভে দাও
পাঠাইয়া অসহায় জীব। আমি হেথা
সোনার পালঙ্কে মহারানী, শত শত
দাস দাসী সৈন্য প্রজা লয়ে বসে আছি
তপ্ত বক্ষে শুধু এক শিশুর পরশ
লালসিয়া, আপনার প্রাণের ভিতরে
আরেকটি প্রাণাধিক প্রাণ করিবারে
অনুভব— এই বক্ষ, এই বাহু দুটি,
এই কোল, এই দৃষ্টি দিয়ে, বিরচিতে
নিবিড় জীবন্ত নীড়, শুধু একটুকু
প্রাণকণিকার তরে। হেরিবে আমারে
একটি নূতন আঁখি প্রথম আলোকে,
ফুটিবে আমারি কোলে কথাহীন মুখে
অকারণ আনন্দের প্রথম হাসিটি !
কুমারজননী মাতঃ, কোন্ পাপে মোরে
করিলি বঞ্চিত মাতৃস্বর্গ হতে ?

রঘুপতির প্রবেশ

প্রভু,
চিরদিন মা'র পূজা করি। জেনে শুনে
কিছু তো করি নি দোষ। পুণ্যের শরীর
মোর স্বামী মহাদেবসম— তবে কোন্
দোষ দেখে আমারে করিল মহামায়া
নিঃসন্তানশ্মশানচারিণী ?

রঘুপতি। মা'র খেলা
কে বুঝিতে পারে বলো ? পাষাণতনয়া
ইচ্ছাময়ী, সুখ দুঃখ তাঁরি ইচ্ছা। ধৈর্য

ধরো। এবার তোমার নামে মা'র পূজা
হবে। প্রসন্ন হইবে শ্যামা।

গুণবতী। এ বৎসর
পূজার বলির পশু আমি নিজে দিব।
করিনু মানত, মা যদি সন্তান দেন
বর্ষে বর্ষে দিব তাঁরে একশো মহিষ,
তিন শত ছাগ।

রঘুপতি। পূজার সময় হল।

[উভয়ের প্রস্থান

গোবিন্দমাণিক্য অপর্ণা ও জয়সিংহের প্রবেশ

জয়সিংহ। কী আদেশ মহারাজ?

গোবিন্দমাণিক্য। ক্ষুদ্র ছাগশিশু
দরিদ্র এ বালিকার স্নেহের পুত্তলি,
তারে নাকি কেড়ে আনিয়াছ মা'র কাছে
বলি দিতে? এ দান কি নেবেন জননী
প্রসন্ন দক্ষিণ হস্তে?

জয়সিংহ। কেমনে জানিব,
মহারাজ, কোথা হতে অনুচরগণ
আনে পশু দেবীর পূজার তরে।— হাঁ গা,
কেন তুমি কাঁদিতেছ? আপনি নিয়েছে
যারে বিশ্বমাতা, তার তরে ক্রন্দন কি
শোভা পায়?

অপর্ণা। কে তোমার বিশ্বমাতা! মোর
শিশু চিনিবে না তারে। মা-হারা শাবক
জানে না সে আপন মায়েরে। আমি যদি
বেলা করে আসি, খায় না সে তৃণদল,
ডেকে ডেকে চায় পথপানে— কোলে করে
নিয়ে তারে, ভিক্ষা-অন্ন কয় জনে ভাগ
করে খাই। আমি তার মাতা।

জয়সিংহ। মহারাজ,
আপনার প্রাণ-অংশ দিয়ে যদি তারে
বাঁচাইতে পারিতাম, দিতাম বাঁচায়ে।
মা তাহারে নিয়েছেন— আমি তারে আর
ফিরাব কেমনে?

অপর্ণা। মা তাহারে নিয়েছেন?
মিছে কথা! রাক্ষসী নিয়েছে তারে!

জয়সিংহ। ছি ছি,
ও কথা এনো না মুখে।

অপর্ণা। মা, তুমি নিয়েছ

কেড়ে দরিদ্রের ধন ! রাজা যদি চুরি
করে, শুনিয়াছি নাকি, আছে জগতের
রাজা— তুমি যদি চুরি করো, কে তোমার
করিবে বিচার ! মহারাজ, বলো তুমি—

গোবিন্দমাণিক্য । বৎসে, আমি বাক্যহীন— এত ব্যথা কেন,
এত রক্ত কেন, কে বলিয়া দিবে মোরে ?

অপর্ণা । এই-যে সোপান বেয়ে রক্তচিহ্ন দেখি
এ কি তারি রক্ত ? ওরে বাছনি আমার !
মরি মরি, মোরে ডেকে কেঁদেছিল কত,
চেয়েছিল চারি দিকে ব্যাকুল নয়নে,
কম্পিত কাতর বক্ষে, মোর প্রাণ কেন
যেথা ছিল সেথা হতে ছুটিয়া এল না !

প্রতিমার প্রতি

জয়সিংহ । আজন্ম পূজিনু তোরে, তবু তোর মায়া
বুঝিতে পারি নে । করুণায় কাঁদে প্রাণ
মানবের, দয়া নাই বিশ্বজননীর !

জয়সিংহের প্রতি

অপর্ণা । তুমি তো নিষ্ঠুর নহ— আঁখি-প্রান্তে তব
অশ্রু ঝরে মোর দুখে । তবে এসো তুমি,
এ মন্দির ছেড়ে এসো । তবে ক্ষম মোরে,
মিথ্যা আমি অপরাধী করেছি তোমায় ।

প্রতিমার প্রতি

জয়সিংহ । তোমার মন্দিরে এ কী নূতন সংগীত
ধ্বনিয়া উঠিল আজি, হে গিরিনন্দিনী,
করুণাকাতর কণ্ঠস্বরে ! ভক্তহৃদি
অপরূপ বেদনায় উঠিল ব্যাকুলি ।—
হে শোভনে, কোথা যাব এ মন্দির ছেড়ে ?
কোথায় আশ্রয় আছে ?

জনান্তিক হইতে

গোবিন্দমাণিক্য । যেথা আছে প্রেম ।

[প্রস্থান

জয়সিংহ । কোথা আছে প্রেম !—
অয়ি ভদ্রে, এসো তুমি
আমার কুটিরে । অতিথিরে দেবীরূপে
আজিকে করিব পূজা করিয়াছি পণ ।

[জয়সিংহ ও অপর্ণার প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজসভা

রাজা রঘুপতি ও নক্ষত্ররায়ের প্রবেশ

সভাসদ্‌গণ উঠিয়া

সকলে। জয় হোক মহারাজ !

রঘুপতি। রাজার ভাণ্ডারে
এসেছি বলির পশু সংগ্রহ করিতে।

গোবিন্দমাণিক্য। মন্দিরেতে জীববলি এ বৎসর হতে
হইল নিষেধ।

নক্ষত্ররায়। বলি নিষেধ !

মন্ত্রী। নিষেধ !

নক্ষত্ররায়। তাই তো ! বলি নিষেধ !

রঘুপতি। এ কি স্বপ্নে শুনি ?

গোবিন্দমাণিক্য। স্বপ্ন নহে প্রভু ! এতদিন স্বপ্নে ছিনু,
আজ জাগরণ। বালিকার মূর্তি ধ'রে
স্বয়ং জননী মোরে বলে গিয়েছেন,
জীবরক্ত সহে না তাঁহার।

রঘুপতি। এতদিন
সহিল কী করে ? সহস্র বৎসর ধ'রে
রক্ত করেছেন পান, আজি এ অরুচি !

গোবিন্দমাণিক্য। করেন নি পান। মুখ ফিরাতেন দেবী
করিতে শোণিতপাত তোমরা যখন।

রঘুপতি। মহারাজ, কী করিছ ভালো করে ভেবে
দেখো। শাস্ত্রবিধি তোমার অধীন নহে।

গোবিন্দমাণিক্য। সকল শাস্ত্রের বড়ো দেবীর আদেশ।

রঘুপতি। একে ভ্রান্তি, তাহে অহংকার ! অজ্ঞ নর,
তুমি শুধু শুনিয়াছ দেবীর আদেশ,
আমি শুনি নাই ?

নক্ষত্ররায়। তাই তো, কী বলো মন্ত্রী—
এ বড়ো আশ্চর্য ! ঠাকুর শোনেন নাই ?

গোবিন্দমাণিক্য। দেবী-আজ্ঞা নিত্যকাল ধ্বনিছে জগতে।
সেই তো বধিরতম যেজন সে বাণী
শুনেও শুনে না।

রঘুপতি। পাষণ্ড, নাস্তিক তুমি !

গোবিন্দমাণিক্য। ঠাকুর, সময় নষ্ট হয়। যাও এবে
মন্দিরের কাজে। প্রচার করিয়া দিয়ো
পথে যেতে যেতে, আমার ত্রিপুররাজ্যে
যে করিবে জীবহত্যা জীবজননীর

পূজাচ্ছলে, তারে দিব নির্বাসনদণ্ড ।

রঘুপতি । এই কি হইল স্থির ?

গোবিন্দমাণিক্য । স্থির এই ।

উঠিয়া

রঘুপতি । তবে

উচ্ছন্ন ! উচ্ছন্ন যাও !

ছুটিয়া আসিয়া

চাঁদপাল । হাঁ হাঁ ! থামো ! থামো !

গোবিন্দমাণিক্য । বোসো চাঁদপাল । ঠাকুর, বলিয়া যাও ।
মনোব্যথা লঘু করে যাও নিজ কাজে ।

রঘুপতি । তুমি কি ভেবেছ মনে ত্রিপুর-ঈশ্বরী
ত্রিপুরার প্রজা ? প্রচারিবে তাঁর 'পরে
তোমার নিয়ম ? হরণ করিবে তাঁর
বলি ? হেন সাধ্য নাই তব । আমি আছি
মায়ের সেবক ।

[প্রস্থান

নয়নরায় । ক্ষমা করো অধীনের
স্পর্ধা মহারাজ । কোন্ অধিকারে, প্রভু,
জননীর বলি—

চাঁদপাল । শান্ত হও সেনাপতি ।

মন্ত্রী । মহারাজ, একেবারে করেছ কি স্থির ?
আজ্ঞা আর ফিরিবে না ?

গোবিন্দমাণিক্য । আর নহে মন্ত্রী,
বিলম্ব উচিত নহে বিনাশ করিতে
পাপ ।

মন্ত্রী । পাপের কি এত পরমায়ু হবে ?
কত শত বর্ষ ধরে যে প্রাচীন প্রথা
দেবতাচরণতলে বৃদ্ধ হয়ে এল,
সে কি পাপ হতে পারে ?

রাজার নিরুত্তরে চিন্তা

নক্ষত্ররায় । তাই তো হে মন্ত্রী,
সে কি পাপ হতে পারে ?

মন্ত্রী । পিতামহগণ
এসেছে পালন করে যত্নে ভক্তিভরে
সনাতন রীতি । তাঁহাদের অপমান
তার অপমানে ।

রাজার চিন্তা

নক্ষত্ররায় । ভেবে দেখো মহারাজ,

যুগে যুগে যে পেয়েছে শতসহস্রের
ভক্তির সম্মতি, তাহারে করিতে নাশ
তোমার কী আছে অধিকার।

সনিশ্বাসে

গোবিন্দমাণিক্য। থাক্ তর্ক!
যাও মন্ত্রী, আদেশ প্রচার করো গিয়ে—
আজ হতে বন্ধ বলিদান।

[প্রস্থান

মন্ত্রী। এ কি হল!
নক্ষত্ররায়। তাই তো হে মন্ত্রী, এ কী হল! শুনেছিনু
মগের মন্দিরে বলি নেই, অবশেষে
মগেতে হিন্দুতে ভেদ রহিল না কিছু।
কী বল হে চাঁদপাল, তুমি কেন চুপ?
চাঁদপাল। ভীরু আমি ক্ষুদ্র প্রাণী, বুদ্ধি কিছু কম,
না বুঝে পালন করি রাজার আদেশ।

তৃতীয় দৃশ্য

মন্দির

জয়সিংহ

জয়সিংহ। মা গো, শুধু তুই আর আমি! এ মন্দিরে
সারাদিন আর কেহ নাই— সারা দীর্ঘ দিন
মাঝে মাঝে কে আমারে ডাকে যেন।
তোর কাছে থেকে তবু একা মনে হয়!

নেপথ্যে গান

আমি একলা চলেছি এ ভবে.
আমায় পথের সন্ধান কে কবে?

জয়সিংহ। মা গো, একি মায়া! দেবতারে প্রাণ দেয়
মানবের প্রাণ! এইমাত্র ছিলে তুমি
নির্বাক নিশ্চল— উঠিলে জীবন্ত হয়ে
সন্তানের কণ্ঠস্বরে সজাগ জননী!

গান গাহিতে গাহিতে অপর্ণার প্রবেশ

আমি একলা চলেছি এ ভবে,
আমায় পথের সন্ধান কে কবে?
ভয় নেই, ভয় নেই, যাও আপন মনেই

যেমন একলা মধুপ ধেয়ে যায়
কেবল ফুলের সৌরভে।

জয়সিংহ। কেবলি একেলা! দক্ষিণ বাতাস যদি
বন্ধ হয়ে যায়, ফুলের সৌরভ যদি
নাহি আসে, দশ দিক জেগে ওঠে যদি
দশটি সন্দেহ-সম, তখন কোথায়
সুখ, কোথা পথ? জান কি একেলা কারে
বলে?

অপর্ণা। জানি। যবে বসে আছি ভরা মনে—
দিতে চাই, নিতে কেহ নাই!

জয়সিংহ। সৃজনের
আগে দেবতা যেমন একা! তাই বটে!
তাই বটে! মনে হয় এ জীবন বড়ো
বেশি আছে— যত বড়ো তত শূন্য, তত
আবশ্যকহীন।

অপর্ণা। জয়সিংহ, তুমি বুঝি
একা! তাই দেখিয়াছি, কাঙাল যে জন
তাহারো কাঙাল তুমি। যে তোমার সব
নিতে পারে, তারে তুমি খুঁজিতেছ যেন।
ভ্রমিতেছ দীনদুঃখী সকলের দ্বারে।
এতদিন ভিক্ষা মেগে ফিরিতেছি— কত
লোক দেখি, কত মুখপানে চাই, লোকে
ভাবে শুধু বুঝি ভিক্ষাতরে— দূর হতে
দেয় তাই মুষ্টিভিক্ষা ক্ষুদ্র দয়াভরে!
এত দয়া পাই নে কোথাও— যাহা পেয়ে
আপনার দৈন্য আর মনে নাহি পড়ে।

জয়সিংহ। যথার্থ যে দাতা, আপনি নামিয়া আসে
দানরূপে দরিদ্রের পানে ভূমিতলে।
যেমন আকাশ হতে বৃষ্টিরূপে মেঘ
নেমে আসে মরুভূমে— দেবী নেমে আসে
মানবী হইয়া, যারে ভালোবাসি তার
মুখে। দরিদ্র ও দাতা, দেবতা মানব
সমান হইয়া যায়।—
ওই আসিছেন
মোর গুরুদেব।

অপর্ণা। আমি তবে সরে যাই
অন্তরালে। ব্রাহ্মণেরে বড়ো ভয় করি।
কী কঠিন তীব্র দৃষ্টি! কঠিন ললাট
পাষাণসোপান যেন দেবীমন্দিরের।

[প্রস্থান

জয়সিংহ। কঠিন ? কঠিন বটে। বিধাতার মতো।
কঠিনতা নিখিলের অটল নির্ভর !

রঘুপতির প্রবেশ

পা ধুইবার জল প্রভৃতি অগ্রসর করিয়া

জয়সিংহ। গুরুদেব !
রঘুপতি। যাও, যাও !
জয়সিংহ। আনিয়াছি জল।
রঘুপতি। থাক্, রেখে দাও জল।
জয়সিংহ। বসন—
রঘুপতি। কে চাহে
বসন ?
জয়সিংহ। অপরাধ করেছি কি ?
রঘুপতি। আবার !
কে নিয়েছে অপরাধ তব ?—
ঘোর কলি
এসেছে ঘনায়ে। বাহুবল রাহুসম
ব্রহ্মতেজে গ্রাসিবারে চায়— সিংহাসন
তোলে শির যজ্ঞবেদী-'পরে। হায় হায়,
কলির দেবতা, তোমরাও চাটুকার
সভাসদ্‌-সম, নতশিরে রাজ-আজ্ঞা
বহিতেছ ? চতুর্ভুজা, চারি হস্ত আছ
জোড় করি ! বৈকুণ্ঠ কি আবার নিয়েছে
কেড়ে দৈত্যগণ ! গিয়েছে দেবতা যত
রসাতলে ! শুধু, দানবে মানবে মিলে
বিশ্বের রাজত্ব দর্পে করিতেছে ভোগ ?
দেবতা না যদি থাকে, ব্রাহ্মণ রয়েছে।
ব্রাহ্মণের রোষযজ্ঞে দগ্ধ সিংহাসন
হবিকাষ্ঠ হবে।

জয়সিংহের নিকট গিয়া সস্নেহে

বৎস, আজ করিয়াছি
রুক্ষ আচরণ তোমা-'পরে, চিত্ত বড়ো
ক্ষুব্ধ মোর।
জয়সিংহ। কী হয়েছে প্রভু !
রঘুপতি। কী হয়েছে
শুধাও অপমানিত ত্রিপুরেশ্বরীরে।
এই মুখে কেমনে বলিব কী হয়েছে !
জয়সিংহ। কে করেছে অপমান ?
রঘুপতি। গোবিন্দমাণিক্য।

জয়সিংহ। গোবিন্দমাণিক্য ! প্রভু, কারে অপমান ?
রঘুপতি। কারে ! তুমি, আমি, সর্বশাস্ত্র, সর্বদেশ,
সর্বকাল, সর্বদেশকাল-অধিষ্ঠাত্রী
মহাকালী, সকলেরে করে অপমান
ক্ষুদ্র সিংহাসনে বসি। মা'র পূজা-বলি
নিষেধিল স্পর্ধাভরে।
জয়সিংহ। গোবিন্দমাণিক্য !
রঘুপতি। হাঁ গো, হাঁ, তোমার রাজা গোবিন্দমাণিক্য !
তোমার সকল-শ্রেষ্ঠ— তোমার প্রাণের
অধীশ্বর ! অকৃতজ্ঞ ! পালন করিনু
এত যত্নে স্নেহে তোরে শিশুকাল হতে,
আমা-চেয়ে প্রিয়তর আজ তোর কাছে
গোবিন্দমাণিক্য !
জয়সিংহ। প্রভু, পিতৃকোলে বসি
আকাশে বাড়ায় হাত ক্ষুদ্র মুগ্ধ শিশু
পূর্ণচন্দ্র-পানে— দেব, তুমি পিতা মোর,
পূর্ণশশী মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য।
কিন্তু একি বকিতেছি ! কী কথা শুনিনু !
মায়ের পূজার বলি নিষেধ করেছে
রাজা ? এ আদেশ কে মানিবে ?
রঘুপতি। না মানিলে
নির্বাসন।
জয়সিংহ। মাতৃপূজাহীন রাজ্য হতে
নির্বাসন দণ্ড নহে। এ প্রাণ থাকিতে
অসম্পূর্ণ নাহি রবে জননীর পূজা।

চতুর্থ দৃশ্য

অন্তঃপুর

গুণবতী ও পরিচারিকা

গুণবতী। কী বলিস ! মন্দিরের দুয়ার হইতে
রানীর পূজার বলি ফিরায়ে দিয়াছে !
এক দেহে কত মুণ্ড আছে তার ! কে সে
দুরদৃষ্ট ?
পরিচারিকা। বলিতে সাহস নাহি মানি—
গুণবতী। বলিতে সাহস নাহি ? এ কথা বলিলি
কী সাহসে ? আমা-চেয়ে কারে তোর ভয় ?
পরিচারিকা। ক্ষমা করো।

গুণবতী। কাল সন্ধেবেলা ছিনু রানী ;
কাল সন্ধেবেলা বন্দীগণ করে গেছে
স্তব, বিপ্রগণ করে গেছে আশীর্বাদ,
ভৃত্যগণ করজোড়ে আজ্ঞা লয়ে গেছে—
একরাত্রে উলটিল সকল নিয়ম !
দেবী পাইল না পূজা, রানীর মহিমা
অবনত ! ত্রিপুরা কি স্বপ্নরাজ্য ছিল !
ত্বরা করে ডেকে আন্ ব্রাহ্মণ-ঠাকুরে।

[পরিচারিকার প্রস্থান

গোবিন্দমাণিক্যের প্রবেশ

গুণবতী। মহারাজ, শুনিতেছ ? মা'র দ্বার হতে
আমার পূজার বলি ফিরায়ে দিয়েছে।
গোবিন্দমাণিক্য। জানি তাহা।
গুণবতী। জান তুমি ? নিষেধ কর নি
তবু ? জ্ঞাতসারে মহিষীর অপমান ?
গোবিন্দমাণিক্য। তারে ক্ষমা করো প্রিয়ে !
গুণবতী। দয়ার শরীর
তব, কিন্তু মহারাজ, এ তো দয়া নয়—
এ শুধু কাপুরুষতা ! দয়ায় দুর্বল
তুমি, নিজ হাতে দণ্ড দিতে নাহি পারো
যদি, আমি দণ্ড দিব। বলো মোরে কে সে
অপরাধী।
গোবিন্দমাণিক্য। দেবী, আমি। অপরাধ আর
কিছু নহে, তোমারে দিয়েছি ব্যথা এই
অপরাধ।
গুণবতী। কী বলিছ মহারাজ !
গোবিন্দমাণিক্য। আজ
হতে, দেবতার নামে জীবরক্তপাত
আমার ত্রিপুররাজ্যে হয়েছে নিষেধ।
গুণবতী। কাহার নিষেধ ?
গোবিন্দমাণিক্য। জননীর।
গুণবতী। কে শুনেছে ?
গোবিন্দমাণিক্য। আমি।
গুণবতী। তুমি ! মহারাজ, শুনে হাসি আসে।
রাজদ্বারে এসেছেন ভুবন-ঈশ্বরী
জানাইতে আবেদন !
গোবিন্দমাণিক্য। হেসো না মহিষী !
জননী আপনি এসে সন্তানের প্রাণে
বেদনা জানায়েছেন, আবেদন নহে।

গুণবতী। কথা রেখে দাও মহারাজ ! মন্দিরের
বাহিরে তোমার রাজ্য। যেথা তব আজ্ঞা
নাহি চলে, সেথা আজ্ঞা নাহি দিয়ো।

গোবিন্দমাণিক্য। মা'র
আজ্ঞা, মোর আজ্ঞা নহে।

গুণবতী। কেমনে জানিলে ?

গোবিন্দমাণিক্য। ক্ষীণ দীপালোকে গৃহকোণে থেকে যায়
অন্ধকার ; সব পারে, আপনার ছায়া
কিছুতে ঘুচাতে নারে দীপ। মানবের
বুদ্ধি দীপসম, যত আলো করে দান
তত রেখে দেয় সংশয়ের ছায়া। স্বর্গ
হতে নামে যবে জ্ঞান, নিমেষে সংশয়
টুটে। আমার হৃদয়ে সংশয় কিছুই
নাই।

গুণবতী। শুনিয়াছি, আপনার পাপপুণ্য
আপনার কাছে। তুমি থাকো আপনার
অসংশয় নিয়ে— আমারে দুয়ার ছাড়ো,
আমার পূজার বলি আমি নিয়ে যাই
আমার মায়ের কাছে।

গোবিন্দমাণিক্য। দেবী, জননীর
আজ্ঞা পারি না লঙ্ঘিতে।

গুণবতী। আমিও পারি না।
মা'র কাছে আছি প্রতিশ্রুত। সেইমত
যথাশাস্ত্র যথাবিধি পূজিব তাঁহারে।
যাও, তুমি যাও !

গোবিন্দমাণিক্য। যে আদেশ মহারানী !

[প্রস্থান

রঘুপতির প্রবেশ

গুণবতী। ঠাকুর, আমার পূজা ফিরায়ে দিয়েছে
মাতৃদ্বার হতে !

রঘুপতি। মহারানী, মা'র পূজা
ফিরে গেছে, নহে সে তোমার। উঞ্ছবৃত্ত
দরিদ্রের ভিক্ষালব্ধ পূজা, রাজেন্দ্রাণী,
তোমার পূজার চেয়ে ন্যূন নহে। কিন্তু,
এই বড়ো সর্বনাশ, মা'র পূজা ফিরে
গেছে। এই বড়ো সর্বনাশ, রাজদর্প
ক্রমে স্ফীত হয়ে, করিতেছে অতিক্রম
পৃথিবীর রাজত্বের সীমা— বসিয়াছে
দেবতার দ্বার রোধ করি, জননীর

ভক্তদের প্রতি দুই আঁখি রাঙাইয়া।

গুণবতী। কী হবে ঠাকুর!

রঘুপতি। জানেন তা মহামায়া।
এই শুধু জানি— যে সিংহাসনের ছায়া
পড়েছে মায়ের দ্বারে, ফুৎকারে ফাটিবে
সেই দম্ভমঞ্চখানি জলবিম্বসম।
যুগে যুগে রাজপিতাপিতামহ মিলে
ঊর্ধ্ব-পানে তুলিয়াছে যে রাজমহিমা
অভ্রভেদী ক'রে, মুহূর্তে হইয়া যাবে
ধূলিসাৎ, বজ্রদীর্ণ, দগ্ধ, ঝঞ্ঝাহত।

গুণবতী। রক্ষা করো, রক্ষা করো প্রভু!

রঘুপতি। হা হা! আমি
রক্ষা করিব তোমারে! যে প্রবল রাজা
স্বর্গে মর্তে প্রচারিছে আপন শাসন
তুমি তাঁরি রানী! দেব-ব্রাহ্মণেরে যিনি—
ধিক্, ধিক্ শতবার! ধিক্ লক্ষবার!
কলির ব্রাহ্মণে ধিক্। ব্রহ্মশাপ কোথা!
ব্যর্থ ব্রহ্মতেজ শুধু বক্ষে আপনার
আহত বৃশ্চিক-সম আপনি দংশিছে!
মিথ্যা ব্রহ্ম-আড়ম্বর!

পৈতা ছিঁড়িতে উদ্যত

গুণবতী। কী কর! কী কর
দেব! রাখো, রাখো, দয়া করো নির্দোষীরে!

রঘুপতি। ফিরায়ে দে ব্রাহ্মণের অধিকার।

গুণবতী। দিব।
যাও প্রভু, পূজা করো মন্দিরেতে গিয়ে,
হবে নাকো পূজার ব্যাঘাত।

রঘুপতি। যে আদেশ
রাজ-অধীশ্বরী! দেবতা কৃতার্থ হল
তোমারি আদেশ-বলে, ফিরে পেল পুন
ব্রাহ্মণ আপন তেজ! ধন্য তোমরাই,
যতদিন নাহি জাগে কল্কি-অবতার।

[প্রস্থান

গোবিন্দমাণিক্যের পুনঃপ্রবেশ

গোবিন্দমাণিক্য। অপ্রসন্ন প্রেয়সীর মুখ, বিশ্বমাঝে
সব আলো সব সুখ লুপ্ত করে রাখে।
উন্মনা-উৎসুক-চিত্তে ফিরে ফিরে আসি।

গুণবতী। যাও, যাও, এসো না এ গৃহে। অভিশাপ
আনিয়ো না হেথা।

গোবিন্দমাণিক্য। প্রিয়তমে, প্রেমে করে
অভিশাপ নাশ, দয়া করে অকল্যাণ
দূর। সতীর হৃদয় হতে প্রেম গেলে
পতিগৃহে লাগে অভিশাপ।— যাই তবে
দেবী!
গুণবতী। যাও! ফিরে আর দেখায়ো না মুখ।
গোবিন্দমাণিক্য। স্মরণ করিবে যবে, আবার আসিব।

[প্রস্থানোন্মুখ

পায়ে পড়িয়া

গুণবতী। ক্ষমা করো, ক্ষমা করো নাথ! এতই কি
হয়েছ নিষ্ঠুর, রমণীর অভিমান
ঠেলে চলে যাবে? জান না কি প্রিয়তম,
ব্যর্থ প্রেম দেখা দেয় রোষের ধরিয়া
ছদ্মবেশ! ভালো, আপনার অভিমানে
আপনি করিনু অপমান। ক্ষমা করো!
গোবিন্দমাণিক্য। প্রিয়তমে, তোমা-'পরে টুটিলে বিশ্বাস
সেই দণ্ডে টুটিত জীবনবন্ধ। জানি
প্রিয়ে, মেঘ ক্ষণিকের, চিরদিবসের
সূর্য।
গুণবতী। মেঘ ক্ষণিকের। এ মেঘ কাটিয়া
যাবে, বিধির উদ্যত বজ্র ফিরে যাবে,
চিরদিবসের সূর্য উঠিবে আবার
চিরদিবসের প্রথা জাগায়ে জগতে,
অভয় পাইবে সর্বলোক— ভুলে যাবে
দু দণ্ডের দুঃস্বপন। সেই আজ্ঞা করো।
ব্রাহ্মণ ফিরিয়া পাক নিজ অধিকার,
দেবী নিজ পূজা, রাজদণ্ড ফিরে যাক
নিজ অপ্রমত্ত মর্ত-অধিকার-মাঝে।
গোবিন্দমাণিক্য। ধর্মহানি ব্রাহ্মণের নহে অধিকার।
অসহায় জীবরক্ত নহে জননীর
পূজা। দেবতার আজ্ঞা পালন করিতে
রাজা বিপ্র সকলেরই আছে অধিকার।
গুণবতী। ভিক্ষা, ভিক্ষা চাই! একান্ত মিনতি করি
চরণে তোমার প্রভু! চিরাগত প্রথা
চিরপ্রবাহিত মুক্ত সমীরণ-সম,
নহে তা রাজার ধন— তাও জোড়করে
সমস্ত প্রজার নামে ভিক্ষা মাগিতেছে
মহিষী তোমার। প্রেমের দোহাই মানো
প্রিয়তম! বিধাতাও করিবেন ক্ষমা
প্রেম-আকর্ষণ-বশে কর্তব্যের ত্রুটি।

গোবিন্দমাণিক্য। এই কি উচিত মহারানী ? নীচ স্বার্থ,
নিষ্ঠুর ক্ষমতাদর্প, অন্ধ অজ্ঞানতা,
চিররক্তপানে স্ফীত হিংস্র বৃদ্ধ প্রথা—
সহস্র শত্রুর সাথে একা যুদ্ধ করি ;
শ্রান্তদেহে আসি গৃহে নারীচিত্ত হতে
অমৃত করিতে পান ; সেথাও কি নাই
দয়াসুধা ! গৃহমাঝে পুণ্যপ্রেম বহে,
তারো সাথে মিশিয়াছে রক্তধারা ! এত
রক্তস্রোত কোন্ দৈত্য দিয়েছে খুলিয়া—
ভক্তিতে প্রেমেতে রক্ত মাখামাখি হয়,
ক্রূর হিংসা দয়াময়ী রমণীর প্রাণে
দিয়ে যায় শোণিতের ছাপ ! এ শোণিতে
তবু করিব না রোধ !

মুখ ঢাকিয়া

গুণবতী। যাও, যাও তুমি !

গোবিন্দমাণিক্য। হায় মহারানী, কর্তব্য কঠিন হয়
তোমরা ফিরালে মুখ।

[প্রস্থান

কাঁদিয়া উঠিয়া

গুণবতী। ওরে অভাগিনী,
এতদিন এ কী ভ্রান্তি পুষেছিলি মনে !
ছিল না সংশয়মাত্র ব্যর্থ হবে আজ
এত অনুরোধ, এত অনুনয়, এত
অভিমান। ধিক্, কী সোহাগে পুত্রহীনা
পতিরে জানায় অভিমান ! ছাই হোক
অভিমান তোর ! ছাই এ কপাল ! ছাই
মহিষীগরব ! আর নহে প্রেমখেলা,
সোহাগক্রন্দন। বুঝিয়াছি আপনার
স্থান— হয় ধূলিতলে নতশির, নয়
উর্ধ্বফণা ভুজঙ্গিনী আপনার তেজে।

পঞ্চম দৃশ্য

মন্দির

একদল লোকের প্রবেশ

নেপাল। কোথায় হে, তোমাদের তিনশো পাঁঠা, একশো-এক মোষ! একটা টিকটিকির ছেঁড়া নেজ্‌টুকু পর্যন্ত দেখবার জো নেই। বাজনাবাদ্যি গেল কোথায়, সব যে হাঁ-হাঁ করছে। খরচপত্র করে পুজো দেখতে এলুম, আচ্ছা শাস্তি হয়েছে!

গণেশ। দেখ্‌, মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে অমন করে বলিস নে। মা পাঁঠা পায় নি; এবার জেগে উঠে তোদের এক-একটাকে ধরে ধরে মুখে পুরবে।

হারু। কেন! গেল বছরে বাছারা সব ছিলে কোথায়? আর, সেই ও বছর, যখন ব্রত সাঙ্গ করে রানীমা পুজো দিয়েছিল, তখন কি তোদের পায়ে কাঁটা ফুটেছিল? তখন একবার দেখে যেতে পারো নি? রক্তে যে গোমতী রাঙা হয়ে গিয়েছিল। আর অলুক্ষুনে বেটারা এসেছিস, অার মায়ের খোরাক পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেল! তোদের এক-একটাকে ধরে মা'র কাছে নিবেদন করে দিলে মনের খেদ মেটে।

কানু। আর ভাই, মিছে রাগ করিস। আমাদের কি আর বলবার মুখ আছে! তা হলে কি আর দাঁড়িয়ে ওর কথা শুনি!

হারু। তা যা বলিস ভাই, অপ্লেতেই আমার রাগ হয় সে কথা সত্যি। সেদিন ও ব্যক্তি শালা পর্যন্ত উঠেছিল, তার বেশি যদি একটা কথা বলত, কিম্বা আমার গায়ে হাত দিত, মাইরি বলছি, তা হলে আমি—

নেপাল। তা, চল্‌-না দেখি, কার হাড়ে কত শক্তি আছে।

হারু। তা, আয়-না। জানিস? এখানকার দফাদার আমার মামাতো ভাই হয়।

নেপাল। তা, নিয়ে আয়, তোর মামাকে সুদ্ধ নিয়ে আয়, তোর দফাদারের দফা নিকেশ করে দিই।

হারু। তোমরা সকলেই শুনলে!

গণেশ ও কানু। আর দূর কর্‌ ভাই, ঘরে চল্‌। আজ আর কিছুতে গা লাগছে না। এখন তোদের তামাশা তুলে রাখ্‌।

হারু। এ কি তামাশা হল! আমার মামাকে নিয়ে তামাশা! আমাদের দফাদারের আপনার বাবাকে নিয়ে—

গণেশ ও কানু। আর রেখে দে! তোর আপনার বাবাকে নিয়ে তুই আপনি মর্‌।

[সকলের প্রস্থান

রঘুপতি নয়নরায় ও জয়সিংহের প্রবেশ

রঘুপতি। মা'র 'পরে ভক্তি নাই তব?

নয়নরায়। হেন কথা
কার সাধ্য বলে! ভক্তবংশে জন্ম মোর।

রঘুপতি। সাধু, সাধু! তবে তুমি মায়ের সেবক,
আমাদেরই লোক।

নয়নরায়। প্রভু, মাতৃভক্ত যাঁরা
আমি তাঁহাদেরই দাস।

রঘুপতি। সাধু! ভক্তি তব
হউক অক্ষয়। ভক্তি তব বাহুমাঝে
করুক সঞ্চার অতি দুর্জয় শকতি।

ভক্তি তব তরবারি করুক শাণিত,
বজ্রসম দিক তাহে তেজ। ভক্তি তব
হৃদয়েতে করুক বসতি, পদমান
সকলের উচ্চে।

নয়নরায়। ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ
ব্যর্থ হইবে না।

রঘুপতি। শুন তবে সেনাপতি,
তোমার সকল বল করো একত্রিত
মা'র কাজে। নাশ করো মাতৃবিদ্রোহীরে।

নয়নরায়। যে আদেশ প্রভু! কে আছে মায়ের শত্রু?

রঘুপতি। গোবিন্দমাণিক্য।

নয়নরায়। আমাদের মহারাজ!

রঘুপতি। লয়ে তব সৈন্যদল, আক্রমণ করো
তারে।

নয়নরায়। ধিক্ পাপ-পরামর্শ! প্রভু, এ কি
পরীক্ষা আমারে?

রঘুপতি। পরীক্ষাই বটে। কার
ভৃত্য তুমি, এবার পরীক্ষা হবে তার।
ছাড়ো চিন্তা, ছাড়ো দ্বিধা, কাল নাহি আর—
ত্রিপুরেশ্বরীর আজ্ঞা হতেছে ধ্বনিত
প্রলয়ের শৃঙ্গ-সম— ছিন্ন হয়ে গেছে
আজি সকল বন্ধন।

নয়নরায়। নাই চিন্তা, নাই
কোনো দ্বিধা। যে পদে রেখেছে দেবী, আমি
তাহে রয়েছি অটল।

রঘুপতি। সাধু!

নয়নরায়। এত আমি
নরাধম জননীর সেবকের মাঝে!
মোর 'পরে হেন আজ্ঞা কেন! আমি হব
বিশ্বাসঘাতক! আপনি দাঁড়ায়ে আছে
বিশ্বমাতা হৃদয়ের বিশ্বাসের 'পরে,
সেই তাঁর অটল আসন— আপনি তা
ভাঙিতে বলিবে দেবী আপনার মুখে?
তাহা হলে আজ যাবে রাজা, কাল দেবী—
মনুষ্যত্ব ভেঙে পড়ে যাবে জীর্ণভিত্তি
অট্টালিকা-সম।

জয়সিংহ। ধন্য, সেনাপতি, ধন্য!

রঘুপতি। ধন্য বটে তুমি। কিন্তু একি ভ্রান্তি তব!
যে রাজা বিশ্বাসঘাতী জননীর কাছে
তার সাথে বিশ্বাসের বন্ধন কোথায়?

নয়নরায়। কী হইবে মিছে তর্কে ? বুদ্ধির বিপাকে
চাহি না পড়িতে। আমি জানি এক পথ
আছে— সেই পথ বিশ্বাসের পথ। সেই
সিধে পথ বেয়ে চিরদিন চলে যাবে
অবোধ অধম ভৃত্য এ নয়নরায়।

[প্রস্থান

জয়সিংহ। চিন্তা কেন দেব ? এমনি বিশ্বাসবলে
মোরাও করিব কাজ। কারে ভয় প্রভু !
সৈন্যবলে কোন্ কাজ ! অস্ত্র কোন্ ছার !
যার 'পরে রয়েছে যে ভার, বল তার
আছে সে কাজের। করিবই মা'র পূজা
যদি সত্য মায়ের সেবক হই মোরা।
চলো প্রভু, বাজাই মায়ের ডঙ্কা, ডেকে
আনি পুরবাসীগণে, মন্দিরের দ্বার
খুলে দিই !— ওরে, আয় তোরা, আয়, আয়,
অভয়ার পূজা হবে— নির্ভয়ে আয় রে
তোরা মায়ের সন্তান ! আয় পুরবাসী !

[জয়সিংহ ও রঘুপতির প্রস্থান

পুরবাসীগণের প্রবেশ

অক্রূর। ওরে, আয় রে আয় !
সকলে। জয় মা !
হারু। আয় রে, মায়ের সামনে বাহু তুলে নৃত্য করি।

গান

উলঙ্গিনী নাচে রণরঙ্গে।
আমরা নৃত্য করি সঙ্গে।
দশ দিক আঁধার ক'রে মাতিল দিক্‌বসনা,
জ্বলে বহ্নিশিখা রাঙা-রসনা,
দেখে মরিবারে ধাইছে পতঙ্গে।
কালো কেশ উড়িল আকাশে,
রবি সোম লুকালো তরাসে।
রাঙা রক্তধারা ঝরে কালো অঙ্গে,
ত্রিভুবন কাঁপে ভুরুভঙ্গে।

সকলে। জয় মা !
গণেশ। আর ভয় নেই।
কানু। ওরে, সেই দক্ষিণদ'র মানুষগুলো এখন গেল কোথায় ?
গণেশ। মায়ের ঐশ্বর্য বেটাদের সইল না। তারা ভেগেছে।
হারু। কেবল মায়ের ঐশ্বর্য নয়, আমি তাদের এমনি শাসিয়ে দিয়েছি, তারা আর এমুখো হবে না। বুঝলে অক্রূরদা, আমার মামাতো ভাই দফাদারের নাম করবা-মাত্র তাদের মুখ চুন হয়ে গেল।

অক্রূর। আমাদের নিতাই সেদিন তাদের খুব কড়া কড়া দুটো কথা শুনিয়ে দিয়েছিল। ঐ যার সেই ছুঁচোপারা মুখ সেই বেটা তেড়ে উত্তর দিতে এসেছিল ; আমাদের নিতাই বললে, 'ওরে, তোরা দক্ষিণদেশে থাকিস, তোরা উত্তরের কী জানিস ? উত্তর দিতে এসেছিস, উত্তরের জানিস কী ?' শুনে আমরা হেসে কে কার গায়ে পড়ি।

গণেশ। ইদিকে ঐ ভালোমানুষটি, কিন্তু নিতাইয়ের সঙ্গে কথায় আঁটবার জো নেই।

হারু। নিতাই আমার পিসে হয়।

কানু। শোনো একবার কথা শোনো। নিতাই আবার তোর পিসে হল কবে ?

হারু। তোমরা আমার সকল কথাই ধরতে আরম্ভ করেছ ! আচ্ছা, পিসে নয় তো পিসে নয়। তাতে তোমার সুখটা কী হল ? আমার হল না বলে কি তোমারই পিসে হল ?

রঘুপতি ও জয়সিংহের প্রবেশ

রঘুপতি। শুনলুম সৈন্য আসছে। জয়সিংহ, অস্ত্র নিয়ে তুমি এইখানে দাঁড়াও। তোরা আয়, তোরা এইখানে দাঁড়া ! মন্দিরের দ্বার আগলাতে হবে। আমি তোদের অস্ত্র এনে দিচ্ছি।

গণেশ। অস্ত্র কেন ঠাকুর ?

রঘুপতি। মায়ের পুজো বন্ধ করবার জন্যে রাজার সৈন্য আসছে।

হারু। সৈন্য আসছে ! প্রভু, তবে আমরা প্রণাম হই।

কানু। আমরা ক'জনা, সৈন্য এলে কী করতে পারব ?

হারু। করতে সবই পারি— কিন্তু সৈন্য এলে এখেনে জায়গা হবে কোথায় ! লড়াই তো পরের কথা, এখানে দাঁড়াব কোন্‌খানে !

অক্রূর। তোর কথা রেখে দে। দেখছিস নে প্রভু রাগে কাঁপছেন ?— তা ঠাকুর, অনুমতি করেন তো আমাদের দলবল সমস্ত ডেকে নিয়ে আসি।

হারু। সেই ভালো। অমনি আমার মামাতো ভাইকে ডেকে আনি। কিন্তু, আর একটুও বিলম্ব করা উচিত নয়।

[সকলের প্রস্থানোদ্যম

সরোষে

রঘুপতি। দাঁড়া তোরা !

করজোড়ে

জয়সিংহ। যেতে দাও প্রভু— প্রাণভয়ে ভীত এরা
বুদ্ধিহীন, আগে হতে রয়েছে মরিয়া।
আমি আছি মায়ের সৈনিক। এক দেহে
সহস্র সৈন্যের বল। অস্ত্র থাক্ পড়ে।
ভীরুদের যেতে দাও।

স্বগত

রঘুপতি। সে কাল গিয়েছে।
অস্ত্র চাই, অস্ত্র চাই— শুধু ভক্তি নয়।

প্রকাশ্যে

জয়সিংহ, তবে বলি আনো, করি পূজা।

বাহিরে বাদ্যোদ্যম

জয়সিংহ। সৈন্য নহে প্রভু, আসিছে রানীর পূজা।

রানীর অনুচর ও পুরবাসীগণের প্রবেশ

সকলে। ওরে ভয় নেই— সৈন্য কোথায় ! মা'র পূজা আসছে।
হারু। আমরা আছি খবর পেয়েছে, সৈন্যেরা শীঘ্র এ দিকে আসছে না।
কানু। ঠাকুর, রানীমা পুজো পাঠিয়েছেন।
রঘুপতি। জয়সিংহ, শীঘ্র পূজার আয়োজন করো।

[জয়সিংহের প্রস্থান

পুরবাসীগণের নৃত্যগীত। গোবিন্দমাণিক্যের প্রবেশ

গোবিন্দমাণিক্য। চলে যাও হেথা হতে— নিয়ে যাও বলি।
রঘুপতি, শোনো নাই আদেশ আমার ?
রঘুপতি। শুনি নাই।
গোবিন্দমাণিক্য। তবে তুমি এ রাজ্যের নহ।
রঘুপতি। নহি আমি। আমি আছি যেথা, সেথা এলে
বাজদণ্ড খসে যায় রাজহস্ত হতে,
মুকুট ধুলায় পড়ে লুটে। কে আছিস,
আন্ মা'র পূজা।

বাদ্যোদ্যম

গোবিন্দমাণিক্য। চুপ কর্ !

অনুচরের প্রতি

কোথা আছে
সেনাপতি, ডেকে আন্ ! হায় রঘুপতি,
অবশেষে সৈন্য দিয়ে ঘিরিতে হইল
ধর্ম ! লজ্জা হয় ডাকিতে সৈনিকদল,
বাহুবল দুর্বলতা করায় স্মরণ।
রঘুপতি। অবিশ্বাসী, সত্যই কি হয়েছে ধারণা
কলিযুগে ব্রহ্মতেজ গেছে— তাই এত
দুঃসাহস ? যায় নাই। যে দীপ্ত অনল
জ্বলিছে অন্তরে, সে তোমার সিংহাসনে
নিশ্চয় লাগিবে ! নতুবা এ মনানলে
ছাই করে পুড়াইব সব শাস্ত্র, সব
ব্রহ্মগর্ব, সমস্ত তেত্রিশ কোটি মিথ্যা।
আজ নহে মহারাজ, রাজ-অধিরাজ,
এই দিন মনে কোরো আর-এক দিন।

নয়নরায় ও চাঁদপালের প্রবেশ

নয়নের প্রতি

গোবিন্দমাণিক্য। সৈন্য লয়ে থাকো হেথা নিষেধ করিতে
জীববলি।

নয়নরায়। ক্ষমা করো অধম কিংকরে।
অক্ষম রাজার ভৃত্য দেবতামন্দিরে।
যতদূর যেতে পারে রাজার প্রতাপ,
মোরা ছায়া সঙ্গে যাই।

চাঁদপাল। থামো সেনাপতি,
দীপশিখা থাকে এক ঠাঁই, দীপালোক
যায় বহুদূরে। রাজ-ইচ্ছা যেথা যাবে
সেথা যাব মোরা।

গোবিন্দমাণিক্য। সেনাপতি, মোর আজ্ঞা
তোমার বিচারাধীন নহে। ধর্মাধর্ম
লাভক্ষতি রহিল আমার, কার্য শুধু
তব হাতে।

নয়নরায়। এ কথা হৃদয় নাহি মানে।
মহারাজ, ভৃত্য বটে, তবুও মানুষ
আমি! আছে বুদ্ধি, আছে ধর্ম, আছে প্রভু,
আছেন দেবতা।

গোবিন্দমাণিক্য। তবে ফেলো অস্ত্র তব।
চাঁদপাল, তুমি হলে সেনাপতি, দুই
পদ রহিল তোমার। সাবধানে সৈন্য
লয়ে মন্দির করিবে রক্ষা।

চাঁদপাল। যে আদেশ
মহারাজ!

গোবিন্দমাণিক্য। নয়ন, তোমার অস্ত্র দাও
চাঁদপালে।

নয়নরায়। চাঁদপালে! কেন মহারাজ!
এ অস্ত্র তোমার পূর্ব রাজপিতামহ
দিয়েছেন আমাদের পিতামহে। ফিরে
নিতে চাও যদি, তুমি লও। স্বর্গে আছ
তোমরা হে পিতৃপিতামহ, সাক্ষী থাকো
এতদিন যে রাজবিশ্বাস পালিয়াছি
বহু যত্নে, সাগ্নিকের পুণ্য অগ্নি-সম,
যার ধন তারি হাতে ফিরে দিনু আজ
কলঙ্কবিহীন।

চাঁদপাল। কথা আছে ভাই!

নয়নরায়। ধিক্!
চুপ করো! মহারাজ, বিদায় হলেম।

[প্রণামপূর্বক প্রস্থান

গোবিন্দমাণিক্য। ক্ষুদ্র স্নেহ নাই রাজকাজে। দেবতার
কার্যভার তুচ্ছ মানবের 'পরে, হায়,
কী কঠিন!

রঘুপতি। এমনি করিয়া ব্রহ্মশাপ
ফলে, বিশ্বাসী হৃদয় ক্রমে দূরে যায়,
ভেঙে যায় দাঁড়াবার স্থান।

জয়সিংহের প্রবেশ

জয়সিংহ। আয়োজন
হয়েছে পূজার। প্রস্তুত রয়েছে বলি।
গোবিন্দমাণিক্য। বলি কার তরে ?
জয়সিংহ। মহারাজ, তুমি হেথা !
তবে শোনো নিবেদন— একান্ত মিনতি
যুগল চরণতলে, প্রভু, ফিরে লও
তব গর্বিত আদেশ। মানব হইয়া
দাঁড়ায়ো না দেবীরে আচ্ছন্ন করি—
রঘুপতি। ধিক্ !
জয়সিংহ, ওঠো ওঠো ! চরণে পতিত
কার কাছে ? আমি যার গুরু, এ সংসারে
এই পদতলে তার একমাত্র স্থান।
মূঢ়, ফিরে দেখ্— গুরুর চরণ ধরে
ক্ষমা ভিক্ষা কর্। রাজার আদেশ নিয়ে
করিব দেবীর পূজা, করালকালিকা,
এত কি হয়েছে তোর অধঃপাত ! থাক্
পূজা, থাক্ বলি— দেখিব রাজার দর্প
কতদিন থাকে। চলে এসো জয়সিংহ !

[রঘুপতি ও জয়সিংহের প্রস্থান

গোবিন্দমাণিক্য। এ সংসারে বিনয় কোথায় ! মহাদেবী,
যারা করে বিচরণ তব পদতলে
তারাও শেখে নি হায় কত ক্ষুদ্র তারা !
হরণ করিয়া লয়ে তোমার মহিমা
আপনার দেহে বহে, এত অহংকার !

[প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মন্দির

রঘুপতি জয়সিংহ ও নক্ষত্ররায়

নক্ষত্ররায়। কী জন্য ডেকেছ গুরুদেব ?
রঘুপতি। কাল রাত্রে
স্বপন দিয়েছে দেবী, তুমি হবে রাজা।
নক্ষত্ররায়। আমি হব রাজা ! হা হা ! বল কী ঠাকুর !
রাজা হব ? এ কথা নূতন শোনা গেল !
রঘুপতি। তুমি রাজা হবে।
নক্ষত্ররায়। বিশ্বাস না হয় মোর।
রঘুপতি। দেবীর স্বপন সত্য। রাজটিকা পাবে
তুমি, নাহিকো সন্দেহ।
নক্ষত্ররায়। নাহিকো সন্দেহ !
কিন্তু, যদি নাই পাই !
রঘুপতি। আমার কথায়
অবিশ্বাস ?
নক্ষত্ররায়। অবিশ্বাস কিছুমাত্র নেই,
কিন্তু দৈবাতের কথা— যদি নাই হয় !
রঘুপতি। অন্যথা হবে না কভু।
নক্ষত্ররায়। অন্যথা হবে না ?
দেখো প্রভু, কথা যেন ঠিক থাকে শেষে।
রাজা হয়ে মন্ত্রীটারে দেব দূর করে,
সর্বদাই দৃষ্টি তার রয়েছে পড়িয়া
আমা-'পরে, যেন সে বাপের পিতামহ।
বড়ো ভয় করি তারে— বুঝেছ ঠাকুর ?
তোমারে করিব মন্ত্রী।
রঘুপতি। মন্ত্রিত্বের পদে
পদাঘাত করি আমি।
নক্ষত্ররায়। আচ্ছা, জয়সিংহ
মন্ত্রী হবে। কিন্তু, হে ঠাকুর, সবই যদি
জানো তুমি, বলো দেখি কবে রাজা হব।
রঘুপতি। রাজরক্ত চান দেবী।
নক্ষত্ররায়। রাজরক্ত চান !
রঘুপতি। রাজরক্ত আগে আনো, পরে রাজা হবে।
নক্ষত্ররায়। পাব কোথা !

রঘুপতি। ঘরে আছে গোবিন্দমাণিক্য।
তাঁরি রক্ত চাই।

নক্ষত্ররায়। তাঁরি রক্ত চাই!

রঘুপতি। স্থির
হয়ে থাকো জয়সিংহ, হোয়ো না চঞ্চল!—
বুঝেছ কি? শোনো তবে— গোপনে তাঁহারে
বধ ক'রে আনিবে সে তপ্ত রাজরক্ত
দেবীর চরণে।—
জয়সিংহ, স্থির যদি
না থাকিতে পারো, চলে যাও অন্য ঠাঁই।—
বুঝেছ নক্ষত্ররায়? দেবীর আদেশ,
রাজরক্ত চাই— শ্রাবণের শেষ রাত্রে।
তোমরা রয়েছ দুই রাজভ্রাতা— জ্যেষ্ঠ
যদি অব্যাহতি পায়, তোমার শোণিত
আছে। তৃষিত হয়েছে যবে মহাকালী,
তখন সময় আর নাই বিচারের।

নক্ষত্ররায়। সর্বনাশ! হে ঠাকুর, কাজ কী রাজত্বে!
রাজরক্ত থাক্ রাজদেহে, আমি যাহা
আছি সেই ভালো।

রঘুপতি। মুক্তি নাই, মুক্তি নাই
কিছুতেই! রাজরক্ত আনিতেই হবে!

নক্ষত্ররায়। বলে দাও, হে ঠাকুর; কী করিতে হবে।

রঘুপতি। প্রস্তুত হইয়া থাকো। যখন যা বলি
অবিলম্বে করিবে সাধন; কার্যসিদ্ধি
যতদিন নাহি হয়, বন্ধ রেখো মুখ।
এখন বিদায় হও।

নক্ষত্ররায়। হে মা কাত্যায়নী!

[প্রস্থান

জয়সিংহ। একি শুনিলাম! দয়াময়ী মাতঃ, একি
কথা! তোর আজ্ঞা! ভাই দিয়ে ভ্রাতৃহত্যা!
বিশ্বের জননী!— গুরুদেব! হেন আজ্ঞা
মাতৃ-আজ্ঞা ব'লে করিলে প্রচার!

রঘুপতি। আর
কী উপায় আছে বলো।

জয়সিংহ। উপায়! কিসের
উপায় প্রভু! হা ধিক্! জননী, তোমার
হস্তে খড়্গ নাই? রোষে তব বজ্রানল
নাহি চণ্ডী? তব ইচ্ছা উপায় খুঁজিছে,
খুঁড়িছে সুরঙ্গপথ চোরের মতন
রসাতলগামী? একি পাপ!

রঘুপতি। পাপপুণ্য
তুমি কিবা জানো!

জয়সিংহ। শিখেছি তোমারি কাছে।

রঘুপতি। তবে এসো বৎস, আর-এক শিক্ষা দিই।
পাপপুণ্য কিছু নাই। কে বা ভ্রাতা, কে বা
আত্মপর! কে বলিল হত্যাকাণ্ড পাপ!
এ জগৎ মহা হত্যাশালা। জানো না কি
প্রত্যেক পলকপাতে লক্ষকোটি প্রাণী
চির আঁখি মুদিতেছে! সে কাহার খেলা?
হত্যায় খচিত এই ধরণীর ধূলি।
প্রতিপদে চরণে দলিত শত কীট—
তাহারা কি জীব নহে? রক্তের অক্ষরে
অবিশ্রাম লিখিতেছে বৃদ্ধ মহাকাল
বিশ্বপত্রে জীবের ক্ষণিক ইতিহাস।
হত্যা অরণ্যের মাঝে, হত্যা লোকালয়ে,
হত্যা বিহঙ্গের নীড়ে, কীটের গহ্বরে,
অগাধ সাগর-জলে নির্মল আকাশে,
হত্যা জীবিকার তরে, হত্যা খেলাচ্ছলে,
হত্যা অকারণে, হত্যা অনিচ্ছার বশে—
চলেছে নিখিল বিশ্ব হত্যার তাড়নে
ঊর্ধ্বশ্বাসে প্রাণপণে, ব্যাঘ্রের আক্রমে
মৃগসম, মুহূর্ত দাঁড়াতে নাহি পারে।
মহাকালী কালস্বরূপিণী, রয়েছেন
দাঁড়াইয়া তৃষাতীক্ষ্ণ লোলজিহ্বা মেলি—
বিশ্বের চৌদিক বেয়ে চির রক্তধারা
ফেটে পড়িতেছে, নিষ্পেষিত দ্রাক্ষা হতে
রসের মতন, অনন্ত খর্পরে তাঁর—

জয়সিংহ। থামো, থামো, থামো!—
মায়াবিনী, পিশাচিনী,
মাতৃহীন এ সংসারে এসেছিস তুই
মা'র ছদ্মবেশ ধরে রক্তপানলোভে?
ক্ষুধিত বিহঙ্গশিশু অরক্ষিত নীড়ে
চেয়ে থাকে মা'র প্রত্যাশায়, কাছে আসে
লুব্ধ কাক, ব্যগ্রকণ্ঠে অন্ধ শাবকেরা
মা মনে করিয়া তারে করে ডাকাডাকি,
হারায় কোমল প্রাণ হিংস্রচঞ্চুঘাতে—
তেমনি কি তোর ব্যবসায়? প্রেম মিথ্যা,
স্নেহ মিথ্যা, দয়া মিথ্যা, মিথ্যা আর-সব,
সত্য শুধু অনাদি অনন্ত হিংসা! তবে
কেন মেঘ হতে ঝরে আশীর্বাদসম

বৃষ্টিধারা দগ্ধ ধরণীর বক্ষ-'পরে—
গ'লে আসে পাষাণ হইতে দয়াময়ী
স্রোতস্বিনী মরুমাঝে— কোটি কণ্টকের
শিরোভাগে, কেন ফুল ওঠে বিকশিয়া ?
ছলনা করেছ মোরে প্রভু ! দেখিতেছ
মাতৃভক্তি রক্তসম হৃদয় টুটিয়া
ফেটে পড়ে কিনা আমারি হৃদয় বলি
দিলে মাতৃপদে । ওই দেখো হাসিতেছে
মা আমার স্নেহপরিহাসবশে । বটে,
তুই রাক্ষসী পাষাণী বটে, মা আমার
রক্ত-পিয়াসিনী ! নিবি মা আমার রক্ত,
ঘুচাবি সন্তানজন্ম এ জন্মের তরে—
দিব ছুরি বুকে ? এই শিরা-ছেঁড়া রক্ত
বড়ো কি লাগিবে ভালো ? ওরে, মা আমার
রাক্ষসী পাষাণী বটে ! ডাকিছ কি মোরে
গুরুদেব ? ছলনা বুঝেছি আমি তব ।
ভক্তহিয়া-বিদারিত এই রক্ত চাও !
দিয়েছিলে এই যে বেদনা, তারি 'পরে
জননীর স্নেহহস্ত পড়িয়াছে । দুঃখ
চেয়ে সুখ শত গুণ । কিন্তু রাজরক্ত !
ছিছি ! ভক্তিপিপাসিতা মাতা, তাঁরে বলো
রক্তপিপাসিনী !

রঘুপতি । বন্ধ হোক বলিদান
তবে !

জয়সিংহ । হোক বন্ধ !— না না, গুরুদেব, তুমি
জানো ভালোমন্দ । সরল ভক্তির বিধি
শাস্ত্রবিধি নহে । আপন আলোকে আঁখি
দেখিতে না পায়, আলোক আকাশ হতে
আসে । প্রভু, ক্ষমা করো, ক্ষমা করো দাসে ।
ক্ষমা করো স্পর্ধা মূঢ়তার । ক্ষমা করো
নিতান্ত বেদনাবশে উদ্‌ভ্রান্ত প্রলাপ ।
বলো প্রভু, সত্যই কি রাজরক্ত চান
মহাদেবী ?

রঘুপতি । হায় বৎস, হায় ! অবশেষে
অবিশ্বাস মোর প্রতি ?

জয়সিংহ । অবিশ্বাস ? কভু
নহে । তোমারে ছাড়িলে, বিশ্বাস আমার
দাঁড়াবে কোথায় ? বাসুকির শিরশ্চ্যুত
বসুধার মতো, শূন্য হতে শূন্যে পাবে
লোপ । রাজরক্ত চায় তবে মহামায়া,

সে রক্ত আনিব আমি। দিব না ঘটিতে
ভ্রাতৃহত্যা।

রঘুপতি। দেবতার আজ্ঞা পাপ নহে।

জয়সিংহ। পুণ্য তবে, আমিই সে করিব অর্জন।

রঘুপতি। সত্য করে বলি, বৎস, তবে। তোরে আমি
ভালোবাসি প্রাণের অধিক— পালিয়াছি
শিশুকাল হতে তোরে, মায়ের অধিক
স্নেহে— তোরে আমি নারিব হারাতে।

জয়সিংহ। মোর
স্নেহে ঘটিতে দিব না পাপ, অভিশাপ
আনিব না এ স্নেহের 'পরে।

রঘুপতি। ভালো ভালো,
সে কথা হইবে পরে— কল্য হবে স্থির।

[উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

মন্দির

অপর্ণা

গান

ওগো পুরবাসী,
আমি দ্বারে দাঁড়ায়ে আছি উপবাসী।

অর্পণা। জয়সিংহ, কোথা জয়সিংহ! কেহ নাই
এ মন্দিরে। তুমি কে দাঁড়ায়ে আছ হোথা
অচল মুরতি— কোনো কথা না বলিয়া
হরিতেছ জগতের সার-ধন যত!
আমরা যাহার লাগি কাতর কাঙাল
ফিরে মরি পথে পথে, সে আপনি এসে
তব পদতলে করে আত্মসমর্পণ!
তাহে তোর কোন্ প্রয়োজন! কেন তারে
কৃপণের ধন-সম রেখে দিস পুঁতে
মন্দিরের তলে— দরিদ্র এ সংসারের
সর্ব ব্যবহার হতে করিয়া গোপন!
জয়সিংহ, এ পাষাণী কোন্ সুখ দেয়,
কোন্ কথা বলে তোমা-কাছে, কোন্ চিন্তা
করে তোমা-তরে— প্রাণের গোপন পাত্রে
কোন্ সান্ত্বনার সুধা চিররাত্রিদিন

রেখে দেয় করিয়া সঞ্চিত !— ওরে চিত্ত
উপবাসী, কার রুদ্ধ দ্বারে আছ বসে ?

গান

ওগো পুরবাসী,
আমি দ্বারে দাঁড়ায়ে আছি উপবাসী।
হেরিতেছি সুখমেলা, ঘরে ঘরে কত খেলা,
শুনিতেছি সারাবেলা সুমধুর বাঁশি।

রঘুপতির প্রবেশ

রঘুপতি। কে রে তুই এ মন্দিরে !
অপর্ণা। আমি ভিখারিনী।
জয়সিংহ কোথা ?
রঘুপতি। দূর হ্ এখান হতে
মায়াবিনী ! জয়সিংহে চাহিস কাড়িতে
দেবীর নিকট হতে, ওরে উপদেবী !
অপর্ণা। আমা হতে দেবীর কী ভয় ? আমি ভয়
করি তারে, পাছে মোর সব করে গ্রাস !

গাহিতে গাহিতে প্রস্থান

চাহি না অনেক ধন, রব না অধিক ক্ষণ,
যেথা হতে আসিয়াছি সেথা যাব ভাসি—
তোমরা আনন্দে রবে নব নব উৎসবে,
কিছু ম্লান নাহি হবে গৃহভরা হাসি।

তৃতীয় দৃশ্য

মন্দির-সম্মুখে পথ

জয়সিংহ

জয়সিংহ। দূর হোক চিন্তাজাল ! দ্বিধা দূর হোক !
চিন্তার নরক চেয়ে কার্য ভালো, যত
ক্রূর, যতই কঠোর হোক। কার্যের তো
শেষ আছে, চিন্তার সীমানা নাই কোথা—
ধরে সে সহস্র মূর্তি পলকে পলকে
বাষ্পের মতন ; চারি দিকে যতই সে
পথ খুঁজে মরে, পথ তত লুপ্ত হয়ে
যায়। এক ভালো অনেকের চেয়ে। তুমি
সত্য, গুরুদেব, তোমারি আদেশ সত্য—
সত্যপথ তোমারি ইঙ্গিতমুখে। হত্যা

পাপ নহে, ভ্রাতৃহত্যা পাপ নহে, নহে
পাপ রাজহত্যা !— সেই সত্য, সেই সত্য !
পাপপুণ্য নাই, সেই সত্য ! থাক্ চিন্তা,
থাক্ আত্মদাহ, থাক্ বিচার বিবেক !—
কোথা যাও ভাই-সব, মেলা আছে বুঝি
নিশিপুরে ? কুকী রমণীর নৃত্য হবে ?
আমিও যেতেছি ।— এ ধরায় কত সুখ
আছে— নিশ্চিন্ত আনন্দসুখে নৃত্য করে
নারীদল, মধুর অঙ্গের রঙ্গভঙ্গ
উচ্ছ্বসিয়া উঠে চারি দিকে, তটপ্লাবী
তরঙ্গিণী-সম । নিশ্চিন্ত আনন্দে সবে
ধায় চারি দিক হতে— উঠে গীতগান,
বহে হাস্যপরিহাস, ধরণীর শোভা
উজ্জ্বল মুরতি ধরে । আমিও চলিনু ।

গান

আমারে কে নিবি ভাই, সঁপিতে চাই আপনারে ।
আমার এই মন গলিয়ে কাজ ভুলিয়ে সঙ্গে তোদের নিয়ে যা রে ।
তোরা কোন্ রূপের হাটে, চলেছিস ভবের বাটে
পিছিয়ে আছি আমি আপন ভারে ।
তোদের ওই হাসিখুশি দিবানিশি দেখে মন কেমন করে ।
আমার এই বাধা টুটে নিয়ে যা লুটেপুটে,
পড়ে থাক্ মনের বোঝা ঘরের দ্বারে ।
যেমন ওই এক নিমেষে বন্যা এসে
ভাসিয়ে নে যায় পারাবারে ।
এত যে আনাগোনা, কে আছে জানাশোনা—
কে আছে নাম ধরে মোর ডাকতে পারে ।
যদি সে বারেক এসে দাঁড়ায় হেসে
চিনতে পারি দেখে তারে ॥

দূরে অপর্ণার প্রবেশ

ওকি ও অপর্ণা, দূরে দাঁড়াইয়া কেন !
শুনিতেছ অবাক হইয়া জয়সিংহ
গান গাহে ? সব মিথ্যা, বৃহৎ বঞ্চনা,
তাই হাসিতেছি— তাই গাহিতেছি গান ।
ওই দেখো পথ দিয়ে তাই চলিতেছে
লোক নির্ভাবনা, তাই ছোটো কথা নিয়ে
এতই কৌতুকহাসি, এত কুতূহল,
তাই এত যত্নভরে সেজেছে যুবতী ।
সত্য যদি হত, তবে হত কি এমন ?

সহজে আনন্দ এত বহিত কি হেথা ?
তাহা হলে বেদনায় বিদীর্ণ ধরায়,
বিশ্বব্যাপী ব্যাকুল ক্রন্দন থেমে গিয়ে
মূক হয়ে রহিত অনন্তকাল ধরি ।
বাঁশি যদি সত্যই কাঁদিত বেদনায়,
ফেটে গিয়ে সংগীত নীরব হত তার !
মিথ্যা বলে তাই এত হাসি— শ্মশানের
কোলে বসে খেলা, বেদনার পাশে শুয়ে
গান, হিংসা-ব্যাঘ্রিনীর খরনখতলে
চলিতেছে প্রতিদিবসের কর্মকাজ !
সত্য হলে এমন কি হত ? হা অপর্ণা,
তুমি আমি কিছু সত্য নই, তাই জেনে
সুখী হও— বিষণ্ণ বিস্ময়ে, মুগ্ধ আঁখি
তুলে কেন রয়েছিস চেয়ে ! আয় সখী,
চিরদিন চলে যাই দুই জনে মিলে
সংসারের 'পর দিয়ে, শূন্য নভস্তলে
দুই লঘু মেঘখণ্ড-সম ।

রঘুপতির প্রবেশ

রঘুপতি । জয়সিংহ !

জয়সিংহ । তোমারে চিনি নে আমি । আমি চলিয়াছি
আমার অদৃষ্টভরে ভেসে নিজ পথে,
পথের সহস্র লোক যেমন চলেছে ।
তুমি কে বলিছ মোরে দাঁড়াইতে ? তুমি
চলে যাও— আমি চলে যাই ।

রঘুপতি । জয়সিংহ !

জয়সিংহ । ওই তো সম্মুখে পথ চলেছে সরল—
চলে যাব ভিক্ষাপাত্র হাতে, সঙ্গে লয়ে
ভিখারিনী সখী মোর । কে বলিল, এই
সংসারের রাজপথ দুরূহ জটিল !
যেমন ক'রেই যাই, দিবা-অবসানে
পঁহুছিব জীবনের অন্তিম পলকে,
আচার বিচার তর্ক বিতর্কের জাল
কোথা মিশে যাবে । ক্ষুদ্র এই পরিশ্রান্ত
নরজন্ম সমর্পিব ধরণীর কোলে—
দু-চারি দিনের এই সমষ্টি আমার,
দু-চারিটা ভুলভ্রান্তি ভয় দুঃখসুখ,
ক্ষীণ হৃদয়ের আশা, দুর্বলতাবশে
ভ্রষ্ট ভগ্ন এ জীবনভার, ফিরে দিয়ে
অনন্তকালের হাতে, গভীর বিশ্রাম ।

এই তো সংসার ! কী কাজ শাস্ত্রের বিধি,
কী কাজ গুরুতে !
প্রভু ! পিতা ! গুরুদেব !
কী বলিতেছিনু ! স্বপ্নে ছিনু এতক্ষণ ।
এই সে মন্দির— ওই সেই মহাবট
দাঁড়ায় রয়েছে, অটল কঠিন দৃঢ়
নিষ্ঠুর সত্যের মতো । কী আদেশ দেব !
ভুলি নাই কী করিতে হবে । এই দেখো—

ছুরি দেখাইয়া

তোমার আদেশ-স্মৃতি অন্তরে বাহিরে
হতেছে শাণিত । আরো কী আদেশ আছে
প্রভু !

রঘুপতি । দূর করে দাও ওই বালিকারে
মন্দির হইতে ।— মায়াবিনী, জানি আমি
তোদের কুহক ।— দূর করে দাও ওরে !

জয়সিংহ । দূর করে দিব ? দরিদ্র আমারি মতো
মন্দির-আশ্রিত, আমারি মতন হায়
সঙ্গীহীন, অকণ্টক পুষ্পের মতন
নির্দোষ নিষ্পাপ শুভ্র সুন্দর সরল
সুকোমল বেদনাকাতর, দূর করে
দিতে হবে ওরে ? তাই দিব গুরুদেব !
চলে যা অপর্ণা ! দয়ামায়া স্নেহপ্রেম
সব মিছে ! মরে যা অপর্ণা ! সংসারের
বাহিরেতে কিছুই না থাকে যদি, আছে
তবু দয়াময় মৃত্যু । চলে যা অপর্ণা !

অপর্ণা । তুমি চলে এসো জয়সিংহ, এ মন্দির
ছেড়ে, দুইজনে চলে যাই ।

জয়সিংহ । দুইজনে
চলে যাই ! এ তো স্বপ্ন নয় । একবার
স্বপ্নে মনে করেছিনু স্বপ্ন এ জগৎ ।
তাই হেসেছিনু সুখে, গান গেয়েছিনু ।
কিন্তু সত্য এ যে । বোলো না সুখের কথা
আর, দেখায়ো না স্বাধীনতা-প্রলোভন—
বন্দী আমি সত্য-কারাগারে ।

রঘুপতি । জয়সিংহ,
কাল নাই মিষ্ট আলাপের । দূর করে
দাও ওই বালিকারে ।

জয়সিংহ । চলে যা অপর্ণা !

অপর্ণা । কেন যাব !

জয়সিংহ । এই নারী-অভিমান তোর ?

অপর্ণা। অভিমান কিছু নাই আর। জয়সিংহ,
তোমার বেদনা, আমার সকল ব্যথা
সব গর্ব চেয়ে বেশি। কিছু মোর নাই
অভিমান।

জয়সিংহ। তবে আমি যাই। মুখ তোর
দেখিব না, যতক্ষণ রহিবি হেথায়।—
চলে যা অপর্ণা!

অপর্ণা। নিষ্ঠুর ব্রাহ্মণ, ধিক্
থাক্ ব্রাহ্মণত্বে তব। আমি ক্ষুদ্র নারী
অভিশাপ দিয়ে গেনু তোরে, এ বন্ধনে
জয়সিংহে পারিবি না বাঁধিয়া রাখিতে।

[প্রস্থান

রঘুপতি। বৎস, তোলো মুখ, কথা কও একবার!
প্রাণপ্রিয় প্রাণাধিক, আমার কি প্রাণে
অগাধ সমুদ্রসম স্নেহ নাই! আরো
চাস? আমি আজন্মের বন্ধু, দু দণ্ডের
মায়াপাশ ছিন্ন হয়ে যায় যদি, তাহে
এত ক্লেশ।

জয়সিংহ। থাক্ প্রভু, বোলো না স্নেহের
কথা আর! কর্তব্য রহিল শুধু মনে।
স্নেহপ্রেম তরুলতাপত্রপুষ্পসম
ধরণীর উপরেতে শুধু, আসে যায়
শুকায় মিলায় নব নব স্বপ্নবৎ।
নিম্নে থাকে শুষ্ক রূঢ় পাষাণের স্তূপ
রাত্রিদিন, অনন্তহৃদয়ভারসম।

[প্রস্থান

রঘুপতি। জয়সিংহ, কিছুতে পাই নে তোর মন,
এত যে সাধনা করি নানা ছলে-বলে।

[প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

মন্দিরপ্রাঙ্গণ

জনতা

গণেশ। এবারে মেলায় তেমন লোক হল না!

অক্রূর। এবারে আর লোক হবে কী করে? এ তো আর হিঁদুর রাজত্ব রইল না। এ যেন নবাবের রাজত্ব হয়ে উঠল। ঠাকরুনের বলিই বন্ধ হয়ে গেল, তো মেলায় লোক আসবে কী!

কানু। ভাই, রাজার তো এ বুদ্ধি ছিল না, বোধ হয় কিসে তাকে পেয়েছে।

অক্রূর। যদি পেয়ে থাকে তো কোন্ মুসলমানের ভূতে পেয়েছে, নইলে বলি উঠিয়ে দেবে কেন ?

গণেশ। কিন্তু যাই বলো, এ রাজ্যের মঙ্গল হবে না।

কানু। পুরুত-ঠাকুর তো স্বয়ং বলে দিয়েছেন, তিন মাসের মধ্যে মড়কে দেশ উচ্ছন্ন যাবে।

হারু। তিন মাস কেন, যেরকম দেখছি তাতে তিন দিনের ভর সইবে না। এই দেখো-না কেন, আমাদের মোধো এই আড়াই বছর ধরে ব্যামোয় ভুগে ভুগে বরাবরই তো বেঁচে এসেছে, ঐ, যেমন বলি বন্ধ হল অমনি মারা গেল।

অক্রূর। না রে, সে তো আজ তিন মাস হল মরেছে।

হারু। নাহয় তিন মাসই হল, কিন্তু এই বছরেই তো মরেছে বটে।

ক্ষান্তমণি। ওগো, তা কেন, আমার ভাসুরপো, সে যে মরবে কে জানত। তিন দিনের জ্বর— ঐ, যেমনি কবিরাজের বড়িটি খাওয়া অমনি চোখ উল্‌টে গেল।

গণেশ। সেদিন মথুরহাটির গঞ্জে আগুন লাগল, একখানি চালা বাকি রইল না!

চিন্তামণি। অত কথায় কাজ কী! দেখো-না কেন, এ বছর ধান যেমন সস্তা হয়েছে এমন আর কোনোবার হয় নি। এ বছর চাষার কপালে কী আছে কে জানে!

হারু। ঐ রে, রাজা আসছে। সকালবেলাতেই আমাদের এমন রাজার মুখ দেখলুম, দিন কেমন যাবে কে জানে। চল্ এখান থেকে সরে পড়ি।

[সকলের প্রস্থান

চাঁদপাল ও গোবিন্দমাণিক্যের প্রবেশ

চাঁদপাল। মহারাজ, সাবধানে থেকো। চারি দিকে
চক্ষুকর্ণ পেতে আছি, রাজ-ইষ্টানিষ্ট
কিছু না এড়ায় মোর কাছে। মহারাজ,
তব প্রাণহত্যা-তরে গুপ্ত আলোচনা
স্বকর্ণে শুনেছি।

গোবিন্দমাণিক্য। প্রাণহত্যা! কে করিবে ?

চাঁদপাল। বলিতে সংকোচ মানি। ভয় হয় পাছে
সত্যকার ছুরি চেয়ে নিষ্ঠুর সংবাদ
অধিক আঘাত করে রাজার হৃদয়ে।

গোবিন্দমাণিক্য। অসংকোচে বলে যাও। রাজার হৃদয়
সতত প্রস্তুত থাকে আঘাত সহিতে।
কে করেছে হেন পরামর্শ ?

চাঁদপাল। যুবরাজ
নক্ষত্ররায়।

গোবিন্দমাণিক্য। নক্ষত্র!

চাঁদপাল। স্বকর্ণে শুনেছি
মহারাজ, রঘুপতি যুবরাজে মিলে
গোপনে মন্দিরে বসে স্থির হয়ে গেছে
সব কথা।

গোবিন্দমাণিক্য। দুই দণ্ডে স্থির হয়ে গেল
আজন্মের বন্ধন টুটিতে! হায় বিধি!

চাঁদপাল। দেবতার কাছে তব রক্ত এনে দেবে—

গোবিন্দমাণিক্য। দেবতার কাছে! তবে আর নক্ষত্রের
নাই দোষ। জানিয়াছি, দেবতার নামে
মনুষ্যত্ব হারায় মানুষ। ভয় নাই,
যাও তুমি কাজে! সাবধানে রব আমি।

[চাঁদপালের প্রস্থান

রক্ত নহে, ফুল আনিয়াছি মহাদেবী!
ভক্তি শুধু— হিংসা নহে, বিভীষিকা নহে।
এ জগতে দুর্বলেরা বড়ো অসহায়
মা জননী, বাহুবল বড়োই নিষ্ঠুর,
স্বার্থ বড়ো ক্রূর, লোভ বড়ো নিদারুণ,
অজ্ঞান একান্ত অন্ধ— গর্ব চলে যায়
অকাতরে ক্ষুদ্রেরে দলিয়া পদতলে।
হেথা স্নেহ-প্রেম অতি ক্ষীণ বৃন্তে থাকে,
পলকে খসিয়া পড়ে স্বার্থের পরশে।
তুমিও, জননী, যদি খড়্গ উঠাইলে,
মেলিলে রসনা, তবে সব অন্ধকার!
ভাই তাই ভাই নহে আর, পতি-প্রতি
সতী বাম, বন্ধু শত্রু, শোণিতে পঙ্কিল
মানবের বাসগৃহ, হিংসা পুণ্য, দয়া
নির্বাসিত। আর নহে, আর নহে, ছাড়ো
ছদ্মবেশ। এখনো কি হয় নি সময়?
এখনো কি রহিবে প্রলয়রূপ তব?
এই-যে উঠিছে খড়্গ চারি দিক হতে
মোর শির লক্ষ্য করি, মাতঃ, একি তোরি
চারি ভুজ হতে? তাই হবে! তবে তাই
হোক। বুঝি মোর রক্তপাতে হিংসানল
নিবে যাবে। ধরণীর সহিবে না এত
হিংসা। রাজহত্যা! ভাই দিয়ে ভ্রাতৃহত্যা!
সমস্ত প্রজার বুকে লাগিবে বেদনা,
সমস্ত ভায়ের প্রাণ উঠিবে কাঁদিয়া।
মোর রক্তে হিংসার ঘুচিবে মাতৃবেশ,
প্রকাশিবে রাক্ষসী-আকার। এই যদি
দয়ার বিধান তোর, তবে তাই হোক!

জয়সিংহের প্রবেশ

জয়সিংহ। বল্ চণ্ডী, সত্যই কি রাজরক্ত চাই?
এই বেলা বল্, বল্ নিজ মুখে, বল্
মানবভাষায়, বল্ শীঘ্র— সত্যই কি
রাজরক্ত চাই?

নেপথ্যে। চাই।

জয়সিংহ। তবে মহারাজ,
নাম লহো ইষ্টদেবতার। কাল তব
নিকটে এসেছে।

গোবিন্দমাণিক্য। কী হয়েছে জয়সিংহ?

জয়সিংহ। শুনিলে না নিজকর্ণে? দেবীরে শুধানু
সত্যই কি রাজরক্ত চাই— দেবী নিজে
কহিলেন 'চাই'।

গোবিন্দমাণিক্য। দেবী নহে জয়সিংহ,
কহিলেন রঘুপতি অন্তরাল হতে,
পরিচিত স্বর।

জয়সিংহ। কহিলেন রঘুপতি?
অন্তরাল হতে?— নহে নহে, আর নহে!
কেবলি সংশয় হতে সংশয়ের মাঝে
নামিতে পারি নে আর! যখনি কূলের
কাছে আসি, কে মোরে ঠেলিয়া দেয় যেন
অতলের মাঝে! সে যে অবিশ্বাস-দৈত্য!
আর নহে। গুরু হোক কিম্বা দেবী হোক,
একই কথা!—

ছুরিকা উন্মোচন। ছুরি ফেলিয়া

ফুল নে মা! নে মা! ফুল নে মা!
পায়ে ধরি, শুধু ফুল নিয়ে হোক তোর
পরিতোষ! আর রক্ত না মা, আর রক্ত
নয়! এও যে রক্তের মতো রাঙা, দুটি
জবাফুল! পৃথিবীর মাতৃবক্ষ ফেটে
উঠিয়াছে ফুটে, সন্তানের রক্তপাতে
ব্যথিত ধরার স্নেহ-বেদনার মতো।
নিতে হবে! এই নিতে হবে! আমি
নাহি ডরি তোর রোষ। রক্ত নাহি দিব!
রাঙা তোর আঁখি! তোল্ তোর খড়্গ! আন্
তোর শ্মশানের দল! আমি নাহি ডরি।

[গোবিন্দমাণিক্যের প্রস্থান

এ কী হল হায়! দেবী, গুরু যাহা ছিল
এক দণ্ডে বিসর্জন দিনু— বিশ্বমাঝে
কিছু রহিল না আর!

রঘুপতির প্রবেশ

রঘুপতি। সকল শুনেছি
আমি। সব পণ্ড হল। কী করিলি ওরে
অকৃতজ্ঞ!

জয়সিংহ। দণ্ড দাও প্রভু !
রঘুপতি। সব ভেঙে
দিলি ! ব্রহ্মশাপ ফিরাইলি অর্ধপথ
হতে ! লঙ্ঘিলি গুরুর বাক্য ! ব্যর্থ করে
দিলি দেবীর আদেশ ! আপন বুদ্ধিরে
করিলি সকল হতে বড়ো ! আজন্মের
স্নেহঋণ শুধিলি এমনি করে !
জয়সিংহ। দণ্ড
দাও পিতা !
রঘুপতি। কোন্ দণ্ড দিব ?
জয়সিংহ। প্রাণদণ্ড।
রঘুপতি। নহে। তার চেয়ে গুরুদণ্ড চাই। স্পর্শ
কর্ দেবীর চরণ।
জয়সিংহ। করিনু পরশ।
রঘুপতি। বল্ তবে, 'আমি এনে দিব রাজরক্ত
শ্রাবণের শেষ রাত্রে দেবীর চরণে।'
জয়সিংহ। আমি এনে দিব রাজরক্ত, শ্রাবণের
শেষ রাত্রে দেবীর চরণে।
রঘুপতি। চলে যাও।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মন্দির

জনতা। রঘুপতি ও জয়সিংহ

রঘুপতি। তোরা এখানে সব কী করতে এলি ?

সকলে। আমরা ঠাকরুন দর্শন করতে এসেছি।

রঘুপতি। বটে ! দর্শন করতে এসেছ ? এখনো তোমাদের চোখ দুটো যে আছে সে কেবল বাপের পুণ্যে। ঠাকরুন কোথায় ! ঠাকরুন এ রাজ্য ছেড়ে চলে গেছেন। তোরা ঠাকরুনকে রাখতে পারলি কই ? তিনি চলে গেছেন।

সকলে। কী সর্বনাশ ! সে কি কথা ঠাকুর ! আমরা কী অপরাধ করেছি ?

নিস্তারিণী। আমার বোনপো'র ব্যামো ছিল বলেই যা আমি ক'দিন পুজো দিতে আসতে পারি নি।

গোবর্ধন। আমার পাঁঠা দুটো ঠাকরুনকেই দেব বলে অনেক দিন থেকে মনে করে রেখেছিলুম, এরই মধ্যে রাজা বলি বন্ধ করে দিলে তো আমি কী করব !

হারু। এই আমাদের গন্ধমাদন যা মানত করেছিল তা মাকে দেয় নি বটে, কিন্তু মাও তো তেমনি তাকে শাস্তি দিয়েছেন। তার পিলে বেড়ে ঢাক হয়ে উঠেছে— আজ ছ'টি মাস বিছানায় প'ড়ে। তা বেশ হয়েছে, আমাদেরই যেন সে মহাজন, তাই বলে কি মাকে ফাঁকি দিতে পারবে !

অক্রূর। চুপ কর্ তোরা। মিছে গোল করিস নে। আচ্ছা ঠাকুর, মা কেন চলে গেলেন, আমাদের কী অপরাধ হয়েছিল ?

রঘুপতি। মার জন্যে এক ফোঁটা রক্ত দিতে পারিস নে, এই তো তোদের ভক্তি !

অনেকে। রাজার আজ্ঞা, তা আমরা কী করব ?

রঘুপতি। রাজা কে ? মার সিংহাসন তবে কি রাজার সিংহাসনের নীচে ? তবে এই মাতৃহীন দেশে তোদের রাজাকে নিয়েই থাক্, দেখি তোদের রাজা কী করে রক্ষা করে।

সকলের সভয়ে গুন্‌গুন্ স্বরে কথা

অক্রূর। চুপ কর্।— সন্তান যদি অপরাধ করে থাকে মা তাকে দণ্ড দিক, কিন্তু একেবারে ছেড়ে চলে যাবে এ কি মা'র মতো কাজ ? বলে দাও কী করলে মা ফিরবে।

রঘুপতি। তোদের রাজা যখন রাজ্য ছেড়ে যাবে, মাও তখন রাজ্যে ফিরে পদার্পণ করবে।

নিস্তব্ধভাবে পরস্পরের মুখাবলোকন

রঘুপতি। তবে তোরা দেখবি ? এইখানে আয়। অনেক দূর থেকে অনেক আশা করে ঠাকরুনকে দেখতে এসেছিস, তবে একবার চেয়ে দেখ্।

মন্দিরের দ্বার-উদ্‌ঘাটন। প্রতিমার পশ্চাদ্ভাগ দৃশ্যমান

সকলে। ও কী ! মার মুখ কোন্ দিকে ?

অক্রূর। ওরে, মা বিমুখ হয়েছেন !

সকলে। ও মা, ফিরে দাঁড়া মা ! ফিরে দাঁড়া মা ! ফিরে দাঁড়া মা ! একবার ফিরে দাঁড়া ! মা কোথায় ! মা কোথায় ! আমরা তোকে ফিরিয়ে আনব মা ! আমরা তোকে ছাড়ব না। চাই নে আমাদের রাজা। যাক রাজা ! মরুক রাজা !

রঘুপতির নিকট আসিয়া

জয়সিংহ। প্রভু, আমি কি একটি কথাও কব না ?

রঘুপতি। না।

জয়সিংহ। সন্দেহের কি কোনো কারণ নেই ?

রঘুপতি। না।

জয়সিংহ। সমস্তই কি বিশ্বাস করব ?

রঘুপতি। হাঁ।

অপর্ণার প্রবেশ

পার্শ্বে আসিয়া

অপর্ণা। জয়সিংহ ! এসো জয়সিংহ, শীঘ্র এসো
এ মন্দির ছেড়ে।

জয়সিংহ। বিদীর্ণ হইল বক্ষ।

[রঘুপতি অপর্ণা ও জয়সিংহের প্রস্থান

রাজার প্রবেশ

প্রজাগণ। রক্ষা করো মহারাজ, আমাদের রক্ষা
করো— মাকে ফিরে দাও !

গোবিন্দমাণিক্য। বৎসগণ, করো

অবধান। সেই মোর প্রাণপণ সাধ
জননীরে ফিরে এনে দেব !

প্রজাগণ। জয় হোক
মহারাজ, জয় হোক তব।

গোবিন্দমাণিক্য। একবার
শুধাই তোদের, তোরা কি মায়ের গর্ভে
নিস নি জনম ? মাতৃগণ, তোমরা তো
অনুভব করিয়াছ কোমল হৃদয়ে
মাতৃস্নেহসুধা— বলো দেখি মা কি নেই ?
মাতৃস্নেহ সব হতে পবিত্র প্রাচীন ;
সৃষ্টির প্রথম দণ্ডে মাতৃস্নেহ শুধু
একেলা জাগিয়া বসে ছিল, নতনেত্রে
তরুণ বিশ্বেরে কোলে লয়ে। আজিও সে
পুরাতন মাতৃস্নেহ রয়েছে বসিয়া
ধৈর্যের প্রতিমা হয়ে। সহিয়াছে কত
উপদ্রব, কত শোক, কত ব্যথা, কত
অনাদর— চোখের সম্মুখে ভায়ে ভায়ে
কত রক্তপাত, কত নিষ্ঠুরতা, কত
অবিশ্বাস— বাক্যহীন বেদনা বহিয়া
তবু সে জননী আছে বসে, দুর্বলের
তরে কোল পাতি, একান্ত যে নিরুপায়
তারি তরে সমস্ত হৃদয় দিয়ে। আজ
কী এমন অপরাধ করিয়াছি মোরা
যার লাগি সে অসীম স্নেহ চলে গেল
চিরমাতৃহীন করে অনাথ সংসার !
বৎসগণ, মাতৃগণ, বলো, খুলে বলো—
কী এমন করিয়াছি অপরাধ ?

কেহ কেহ। মা'র
বলি নিষেধ করেছ ! বন্ধ মা'র পূজা !

গোবিন্দমাণিক্য। নিষেধ করেছি বলি, সেই অভিমানে
বিমুখ হয়েছে মাতা ! আসিছে মড়ক,
উপবাস, অনাবৃষ্টি, অগ্নি, রক্তপাত—
মা তোদের এমনি মা বটে ! দণ্ডে দণ্ডে
ক্ষীণ শিশুটিরে স্তন্য দিয়ে বাঁচাইয়ে
তোলে মাতা, সে কি তার রক্তপানলোভে ?
হেন মাতৃ-অপমান মনে স্থান দিলি
যবে, আজন্মের মাতৃস্নেহস্মৃতিমাঝে
ব্যথা বাজিল না ? মনে পড়িল না মা'র
মুখ ?— 'রক্ত চাই' 'রক্ত চাই' গরজন
করিছে জননী, অবোলা দুর্বল জীব

প্রাণভয়ে কাঁপে থরথর— নৃত্য করে
দয়াহীন নরনারী রক্তমত্ততায়—
এই কি মায়ের পরিবার ? পুত্রগণ,
এই কি মায়ের স্নেহছবি ?

প্রজাগণ। মূর্খ মোরা
বুঝিতে পারি নে।

গোবিন্দমাণিক্য। বুঝিতে পারো না ! শিশু
দু দিনের, কিছু যে বোঝে না আর, সেও
তার জননীরে বোঝে। সেও বোঝে, ভয়
পেলে নির্ভয় মায়ের কাছে ; সেও বোঝে
ক্ষুধা পেলে দুগ্ধ আছে মাতৃস্তনে ; সেও
ব্যথা পেলে কাঁদে মা'র মুখ চেয়ে।— তোরা
এমনি কি ভুলে ভ্রান্ত হলি, মাকে গেলি
ভুলে ? বুঝিতে পারো না মাতা দয়াময়ী !
বুঝিতে পারো না জীবজননীর পূজা
জীবরক্ত দিয়ে নহে, ভালোবাসা দিয়ে !
বুঝিতে পারো না— ভয় যেথা মা সেখানে
নয়, হিংসা যেথা মা সেখানে নাই, রক্ত
যেথা মা'র সেথা অশ্রুজল। ওরে বৎস,
কী করিয়া দেখাব তোদের, কী বেদনা
দেখেছি মায়ের মুখে, কী কাতর দয়া,
কী ভর্ৎসনা অভিমান-ভরা ছলছল
নেত্রে তাঁর। দেখাইতে পাবিতাম যদি,
সেই দণ্ডে চিনিতিস আপনার মাকে।
দয়া এল দীনবেশে মন্দিরের দ্বারে,
অশ্রুজলে মুছে দিতে কলঙ্কের দাগ
মা'র সিংহাসন হতে— সেই অপরাধে
মাতা চলে গেল রোষভরে, এই তোরা
করিলি বিচার ?

অপর্ণার প্রবেশ

প্রজাগণ। আপনি চাহিয়া দেখো,
বিমুখ হয়েছে মাতা সন্তানের 'পরে।

মন্দিরের দ্বারে উঠিয়া

অপর্ণা। বিমুখ হয়েছে মাতা ! আয় তো মা, দেখি,
আয় তো সমুখে একবার !

প্রতিমা ফিরাইয়া

এই দেখো
মুখ ফিরায়েছে মাতা।

সকলে। ফিরেছে জননী!
জয় হোক! জয় হোক! মাতঃ, জয় হোক।

সকলে মিলিয়া গান

থাকতে আর তো পারলি নে মা, পারলি কই?
কোলের সন্তানেরে ছাড়লি কই?
দোষী আছি অনেক দোষে, ছিলি বসে ক্ষণিক রোষে,
মুখ তো ফিরালি শেষে, অভয় চরণ কাড়লি কই?

[সকলের প্রস্থান

জয়সিংহ ও রঘুপতির প্রবেশ

জয়সিংহ। সত্য বলো, প্রভু, তোমারি এ কাজ?
রঘুপতি। সত্য
কেন না বলিব? আমি কি ডরাই সত্য
বলিবারে? আমারি এ কাজ। প্রতিমার
মুখ ফিরায়ে দিয়েছি আমি। কী বলিতে
চাও বলো। হয়েছ গুরুর গুরু তুমি,
কী ভর্ৎসনা করিবে আমারে? দিবে কোন্
উপদেশ?
জয়সিংহ। বলিবার কিছু নাই মোর।
রঘুপতি। কিছু নাই? কোনো প্রশ্ন নাই মোর কাছে?
সন্দেহ জন্মিলে মনে মীমাংসার তরে
চাহিবে না গুরু-উপদেশ? এত দূরে
গেছ? মনে এতই কি ঘটেছে বিচ্ছেদ?
মূঢ়, শোনো। সত্যই তো বিমুখ হয়েছে
দেবী, কিন্তু তাই ব'লে প্রতিমার মুখ
নাহি ফিরে। মন্দিরে যে রক্তপাত করি
দেবী তাহা করে পান, প্রতিমার মুখে
সে রক্ত উঠে না। দেবতার অসন্তোষ
প্রতিমার মুখে প্রকাশ না পায়। কিন্তু
মূর্খদের কেমনে বুঝাব! চোখে চাহে
দেখিবারে, চোখে যাহা দেখিবার নয়।
মিথ্যা দিয়ে সত্যেরে বুঝাতে হয় তাই।
মূর্খ, তোমার আমার হাতে সত্য নাই।
সত্যের প্রতিমা সত্য নহে, কথা সত্য
নহে, লিপি সত্য নহে, মূর্তি সত্য নহে—
চিন্তা সত্য নহে। সত্য কোথা আছে— কেহ
নাহি জানে তারে, কেহ নাহি পায় তারে।
সেই সত্য কোটি মিথ্যারূপে চারি দিকে
ফাটিয়া পড়েছে। সত্য তাই নাম ধরে
মহামায়া, অর্থ তার 'মহামিথ্যা'। সত্য

মহারাজ বসে থাকে রাজ-অন্তঃপুরে—
শত মিথ্যা প্রতিনিধি তার, চতুর্দিকে
মরে খেটে খেটে ।—
শিরে হাত দিয়ে, ব'সে
ব'সে ভাবো— আমার অনেক কাজ আছে !
আবার গিয়েছে ফিরে প্রজাদের মন ।

জয়সিংহ । যে তরঙ্গ তীরে নিয়ে আসে, সেই ফিরে
অকূলের মাঝখানে টেনে নিয়ে যায় ।
সত্য নহে, সত্য নহে, সত্য নহে— সবই
মিথ্যা ! মিথ্যা ! মিথ্যা ! দেবী নাই প্রতিমার
মাঝে, তবে কোথা আছে ? কোথাও সে নাই !
দেবী নাই ! ধন্য ধন্য ধন্য মিথ্যা তুমি !

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রাসাদকক্ষ

গোবিন্দমাণিক্য ও চাঁদপাল

চাঁদপাল । প্রজারা করিছে কুমন্ত্রণা । মোগলের
সেনাপতি চলিয়াছে আসামের দিকে
যুদ্ধ-লাগি, নিকটেই আছে, দুই-চারি
দিবসের পথে— প্রজারা তাহারি কাছে
পাঠাবে প্রস্তাব তোমারে করিতে দূর
সিংহাসন হতে ।

গোবিন্দমাণিক্য । আমারে করিবে দূর ?
মোর 'পরে এত অসন্তোষ ?

চাঁদপাল । মহারাজ,
সেবকের অনুনয় রাখো— পশুরক্ত
এত যদি ভালো লাগে নিষ্ঠুর প্রজার
দাও তাহাদের পশু, রাক্ষসী প্রবৃত্তি
পশুর উপর দিয়া যাক । সর্বদাই
ভয়ে ভয়ে আছি কখন কী হয়ে পড়ে ।

গোবিন্দমাণিক্য । আছে ভয় জানি চাঁদপাল, রাজকার্য
সেও আছে । পাথার ভীষণ, তবু তরী
তীরে নিয়ে যেতে হবে । গেছে কি প্রজার
দূত মোগলের কাছে ?

চাঁদপাল । এতক্ষণে গেছে ।

গোবিন্দমাণিক্য। চাঁদপাল, তুমি তবে যাও এই বেলা,
মোগলের শিবিরের কাছাকাছি থেকো—
যখন যা ঘটে সেথা পাঠায়ো সংবাদ।

চাঁদপাল। মহারাজ, সাবধানে থেকো হেথা প্রভু,
অন্তরে বাহিরে শত্রু।

[প্রস্থান

গুণবতীর প্রবেশ

গোবিন্দমাণিক্য। প্রিয়ে, বড়ো শুষ্ক,
বড়ো শূন্য এ সংসার। অন্তরে বাহিরে
শত্রু। তুমি এসে ক্ষণেক দাঁড়াও হেসে,
ভালোবেসে চাও মুখপানে। প্রেমহীন
অন্ধকার ষড়যন্ত্র বিপদ বিদ্বেষ
সবার উপরে, হোক তব সুধাময়
আবির্ভাব, ঘোর নিশীথের শিরোদেশে
নির্নিমেষ চন্দ্রের মতন। প্রিয়তমে,
নিরুত্তর কেন ? অপরাধ-বিচারের
এই কি সময় ? তৃষার্ত হৃদয় যবে
মুমূর্ষুর মতো চাহে মরুভূমি-মাঝে
সুধাপাত্র হাতে নিয়ে ফিরে চলে যাবে ?

[গুণবতীর প্রস্থান

চলে গেলে ! হায়, দুর্বহজীবন !

নক্ষত্ররায়ের প্রবেশ

স্বগত

নক্ষত্ররায়। যেথা যাই সকলেই বলে, 'রাজা হবে ?'—
'রাজা হবে ?'— এ বড়ো আশ্চর্য কাণ্ড। একা
বসে থাকি, তবু শুনি কে যেন বলিছে—
রাজা হবে ? রাজা হবে ? দুই কানে যেন
বাসা করিয়াছে দুই টিয়ে পাখি, এক
বুলি জানে শুধু— রাজা হবে ? রাজা হবে ?
ভালো বাপু, তাই হব, কিন্তু রাজরক্ত
সে কি তোরা এনে দিবি ?

গোবিন্দমাণিক্য। নক্ষত্র !

নক্ষত্র সচকিত

নক্ষত্র !
আমারে মারিবে তুমি ? বলো, সত্য বলো,
আমারে মারিবে ? এই কথা জাগিতেছে
হৃদয়ে তোমার নিশিদিন ? এই কথা

মনে নিয়ে মোর সাথে হাসিয়া বলেছ
কথা, প্রণাম করেছ পায়ে, আশীর্বাদ
করেছ গ্রহণ, মধ্যাহ্নে আহারকালে
এক অন্ন ভাগ করে করেছ ভোজন
এই কথা নিয়ে ? বুকে ছুরি দেবে ? ওরে
ভাই, এই বুকে টেনে নিয়েছিনু তোরে
এ কঠিন মর্তভূমি প্রথম চরণে
তোর বেজেছিল যবে— এই বুকে টেনে
নিয়েছিনু তোরে, যেদিন জননী, তোর
শিরে শেষ স্নেহহস্ত রেখে, চলে গেল
ধরাধাম শূন্য করি— আজ সেই তুই
সেই বুকে ছুরি দিবি ? এক রক্তধারা
বহিতেছে দোঁহার শরীরে, যেই রক্ত
পিতৃপিতামহ হতে বহিয়া এসেছে
চিরদিন ভাইদের শিরায় শিরায়—
সেই শিরা ছিন্ন করে দিয়ে সেই রক্ত
ফেলিবি ভূতলে ? এই বন্ধ করে দিনু
দ্বার, এই নে আমার তরবারি, মার্‌
অবারিত বক্ষে, পূর্ণ হোক মনস্কাম !

নক্ষত্ররায় । ক্ষমা করো ! ক্ষমা করো ভাই ! ক্ষমা করো !

গোবিন্দমাণিক্য । এসো বৎস, ফিরে এসো ! সেই বক্ষে ফিরে
এসো ! ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছ ? এ সংবাদ
শুনেছি যখন, তখনি করেছি ক্ষমা ।
তোরে ক্ষমা না করিতে অক্ষম যে আমি ।

নক্ষত্ররায় । রঘুপতি দেয় কুমন্ত্রণা । রক্ষ মোরে
তার কাছ হতে ।

গোবিন্দমাণিক্য । কোনো ভয় নেই ভাই !

তৃতীয় দৃশ্য

অন্তঃপুরকক্ষ

গুণবতী

গুণবতী । তবু তো হল না । আশা ছিল মনে মনে
কঠিন হইয়া থাকি কিছুদিন যদি
তাহা হলে আপনি আসিবে ধরা দিতে
প্রেমের তৃষায় । এত অহংকার ছিল
মনে । মুখ ফিরে থাকি, কথা নাহি কই,

অশ্রুও ফেলি নে, শুধু শুষ্ক রোষ, শুধু
অবহেলা— এমন তো কতদিন গেল !
শুনেছি নারীর রোষ পুরুষের কাছে
শুধু শোভা আভাময়, তাপ নাহি তাহে—
হীরকের দীপ্তিসম ! ধিক্ থাক্ শোভা !
এ রোষ বজ্রের মতো হত যদি, তবে
পড়িত প্রাসাদ-'পরে, ভাঙিত রাজার
নিদ্রা, চূর্ণ হত রাজ-অহংকার, পূর্ণ
হত রানীর মহিমা ! আমি রানী, কেন
জন্মাইলে এ মিথ্যা বিশ্বাস ! হৃদয়ের
অধীশ্বরী তব, এই মন্ত্র প্রতিদিন
কেন দিলে কানে ? কেন না জানালে মোরে
আমি ক্রীতদাসী, রাজার কিংকরী শুধু,
রানী নহি— তাহা হলে আজিকে সহসা
এ আঘাত, এ পতন সহিতে হত না !

ধ্রুবের প্রবেশ

কোথা যাস তুই ?

ধ্রুব। আমারে ডেকেছে রাজা।

[প্রস্থান

গুণবতী। রাজার হৃদয়রত্ন এই সে বালক !
ওরে শিশু, চুরি করে নিয়েছিস তুই
আমার সন্তানতরে যে আসন ছিল।
না আসিতে আমার বাছারা, তাহাদের
পিতৃস্নেহ-'পরে তুই বসাইলি ভাগ !
রাজহৃদয়ের সুধাপাত্র হতে, তুই
নিলি প্রথম অঞ্জলি— রাজপুত্র এসে
তোরি কি প্রসাদ পাবে ওরে রাজদ্রোহী !—
মা গো মহামায়া, একি তোর অবিচার !
এত সৃষ্টি, এত খেলা তোর— খেলাচ্ছলে
দে আমারে একটি সন্তান— দে জননী,
শুধু এইটুকু শিশু, কোলটুকু ভ'রে
যায় যাহে। তুই যা বাসিস ভালো, তাই
দিব তোরে।

নক্ষত্ররায়ের প্রবেশ

নক্ষত্র, কোথায় যাও ? ফিরে
যাও কেন ? এত ভয় কারে তব ? আমি
নারী, অস্ত্রহীন, বলহীন, নিরুপায়,
অসহায়— আমি কি ভীষণ এত ?

নক্ষত্ররায়। না, না,
মোরে ডাকিয়ো না।
গুণবতী। কেন, কী হয়েছে ?
নক্ষত্ররায়। আমি
রাজা নাহি হব।
গুণবতী। নাই হলে। তাই বলে
এত আস্ফালন কেন ?
নক্ষত্ররায়। চিরকাল বেঁচে
থাক্ রাজা, আমি যেন যুবরাজ থেকে
মরি।
গুণবতী। তাই মরো। শীঘ্র মরো। পূর্ণ হোক
মনোরথ। আমি কি তোমার পায়ে ধ'রে
রেখেছি বাঁচিয়ে ?
নক্ষত্ররায়। তবে কী বলিবে বলো।
গুণবতী। যে চোর করিছে চুরি তোমারি মুকুট
তাহারে সরায়ে দাও। বুঝেছ কি ?
নক্ষত্ররায়। সব
বুঝিয়াছি, শুধু কে সে চোর বুঝি নাই।
গুণবতী। ওই-যে বালক ধ্রুব। বাড়িছে রাজার
কোলে, দিনে দিনে উঁচু হয়ে উঠিতেছে
মুকুটের পানে।
নক্ষত্ররায়। তাই বটে ? এতক্ষণে
বুঝিলাম সব। মুকুট দেখেছি বটে
ধ্রুবের মাথায়। আমি বলি শুধু খেলা।
গুণবতী। মুকুট লইয়া খেলা ? বড়ো কাল-খেলা—
এই বেলা ভেঙে দাও খেলা— নহে তুমি
সে খেলার হইবে খেলেনা।
নক্ষত্ররায়। তাই বটে !
এ তো ভালো খেলা নয়।
গুণবতী। অর্ধরাত্রে আজি
গোপনে লইয়া তারে দেবীর চরণে
মোর নামে কোরো নিবেদন। তার রক্তে
নিবে যাবে দেবরোষানল, স্থায়ী হবে
সিংহাসন এই রাজবংশে— পিতৃলোক
গাহিবেন কল্যাণ তোমার। বুঝেছ কি ?
নক্ষত্ররায়। বুঝিয়াছি।
গুণবতী। তবে যাও ! যা বলিনু করো।
মনে রেখো, মোর নামে কোরো নিবেদন।
নক্ষত্ররায়। তাই হবে। মুকুট লইয়া খেলা ! এ কী
সর্বনাশ ! দেবীর সন্তোষ, রাজ্যরক্ষা,
পিতৃলোক— বুঝিতে কিছুই বাকি নেই।

চতুর্থ দৃশ্য

মন্দিরসোপান

জয়সিংহ

জয়সিংহ। দেবী আছ, আছ তুমি। দেবী, থাকো তুমি।
এ অসীম রজনীর সর্বপ্রান্তশেষে
যদি থাকো কণামাত্র হয়ে, সেথা হতে
ক্ষীণতম স্বরে সাড়া দাও, বলো মোরে
'বৎস, আছি'— নাই, নাই নাই, দেবী নাই!
নাই? দয়া করে থাকো! অয়ি মায়াময়ী
মিথ্যা, দয়া কর্, দয়া কর্ জয়সিংহে,
সত্য হয়ে ওঠ্। আশৈশব ভক্তি মোর,
আজন্মের প্রেম তোরে প্রাণ দিতে নারে?
এত মিথ্যা তুই?— এ জীবন কারে দিলি
জয়সিংহ! সব ফেলে দিলি সত্যশূন্য,
দয়াশূন্য, মাতৃশূন্য সর্বশূন্য -মাঝে!

অপর্ণার প্রবেশ

অপর্ণা, আবার এসেছিস? তাড়ালেম
মন্দিরবাহিরে, তবু তুই অনুক্ষণ
আশে-পাশে চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়াস
সুখের দুরাশা-সম দরিদ্রের মনে?
সত্য আর মিথ্যায় প্রভেদ শুধু এই!—
মিথ্যারে রাখিয়া দিই মন্দিরের মাঝে
বহুযত্নে, তবুও সে থেকেও থাকে না।
সত্যেরে তাড়ায়ে দিই মন্দিরবাহিরে
অনাদরে, তবুও সে ফিরে ফিরে আসে।
অপর্ণা, যাস নে তুই— তোরে আমি আর
ফিরাব না। আয়, এইখানে বসি দোঁহে।
অনেক হয়েছে রাত। কৃষ্ণপক্ষশশী
উঠিতেছে তরু-অন্তরালে। চরাচর
সুপ্তিমগ্ন, শুধু মোরা দোঁহে নিদ্রাহীন।
অপর্ণা, বিষাদময়ী, তোরেও কি গেছে
ফাঁকি দিয়ে মায়ার দেবতা? দেবতায়
কোন্ আবশ্যক? কেন তারে ডেকে আনি
আমাদের ছোটোখাটো সুখের সংসারে?
তারা কি মোদের ব্যথা বুঝে? পাষাণের
মতো, শুধু চেয়ে থাকে! আপন ভায়েরে
প্রেম হতে বঞ্চিত করিয়া, সেই প্রেম

দিই তারে— সে কি তার কোনো কাজে লাগে ?
এ সুন্দরী সুখময়ী ধরণী হইতে
মুখ ফিরাইয়া, তার দিকে চেয়ে থাকি—
সে কোথায় চায় ? তার কাছে ক্ষুদ্র বটে,
তুচ্ছ বটে, তবু তো আমার মাতৃধরা ,
তার কাছে কীটবৎ, তবু তো আমার
ভাই ; অবহেলে অন্ধরথচক্রতলে
দলিয়া চলিয়া যায়, তবু সে দলিত,
উপেক্ষিত, তারা তো আমার আপনার ।
আয় ভাই, নির্ভয়ে দেবতাহীন হয়ে
আরো কাছাকাছি সবে বেঁধে বেঁধে থাকি ।
রক্ত চাই ? স্বরগের ঐশ্বর্য ত্যজিয়া
এ দরিদ্র ধরাতলে তাই কি এসেছ ?
সেথায় মানব নেই, জীব নেই কেহ,
রক্ত নেই, ব্যথা পাবে হেন কিছু নেই—
তাই স্বর্গে হয়েছে অরুচি ? আসিয়াছ
মৃগয়া করিতে, নির্ভয়বিশ্বাস্সুখে
যেথা বাসা বেঁধে আছে মানবের ক্ষুদ্র
পরিবার ?— অপর্ণা, বালিকা, দেবী নাই !

অপর্ণা । জয়সিংহ, তবে চলে এসো, এ মন্দির
ছেড়ে ।

জয়সিংহ । যাব, যাব, তাই যাব, ছেড়ে চলে
যাব । হায় রে অপর্ণা, তাই যেতে হবে ।
তবু, যে রাজত্বে আজন্ম করেছি বাস
পরিশোধ করে দিয়ে তার রাজকর
তবে যেতে পাব । থাক্ ও-সকল কথা ।
দেখ্ চেয়ে গোমতীর শীর্ণ জলরেখা
জ্যোৎস্নালোকে পুলকিত— কলধ্বনি তার
এক কথা শতবার করিছে প্রকাশ ।
আকাশেতে অর্ধচন্দ্র পাণ্ডুমুখচ্ছবি
শ্রান্তিক্ষীণ— বহু রাত্রিজাগরণে যেন
পড়েছে চাঁদের চোখে আধেক পল্লব
ঘুমভারে । সুন্দর জগৎ ! হা অপর্ণা,
এমন রাত্রির মাঝে দেবী নাই । থাক্
দেবী । অপর্ণা, জানিস কিছু সুখভরা
সুধাভরা কোনো কথা ? শুধু তাই বল্ ।
যা শুনিলে মুহূর্তে অতলে মগ্ন হয়ে
ভুলে যাব জীবনের তাপ, মরণ যে
কত মধুরতাময় আগে হতে পাব
তার স্বাদ । অপর্ণা, এমন কিছু বল্

ওই মধুকণ্ঠে তোর, ওই মধু-আঁখি
রেখে মোর মুখপানে, এই জনহীন
স্তব্ধ রজনীতে, এই বিশ্বজগতের
নিদ্রামাঝে, বল্ রে অপর্ণা, যা শুনিলে
মনে হবে চারি দিকে আর কিছু নাই,
শুধু ভালোবাসা ভাসিতেছে, পূর্ণিমার
সুপ্তরাত্রে রজনীগন্ধার গন্ধসম।

অপর্ণা। হায় জয়সিংহ, বলিতে পারি নে কিছু—
বুঝি মনে আছে কত কথা।

জয়সিংহ। তবে আরো
কাছে আয়, মন হতে মনে যাক কথা—
এ কী করিতেছি আমি! অপর্ণা, অপর্ণা,
চলে যা মন্দির ছেড়ে! গুরুর আদেশ!

অপর্ণা। জয়সিংহ, হোয়ো না নিষ্ঠুর! বার বার
ফিরায়ো না! কী সহেছি অন্তর্যামী জানে!

জয়সিংহ। তবে আমি যাই। এক দণ্ড হেথা নহে।

কিয়দ্দূর গিয়া ফিরিয়া

অপর্ণা, নিষ্ঠুর আমি? এই কি রহিবে
তোর মনে, জয়সিংহ নিষ্ঠুর, কঠিন!
কখনো কি হাসিমুখে কহি নাই কথা?
কখনো কি ডাকি নাই কাছে? কখনো কি
ফেলি নাই অশ্রুজল তোর অশ্রু দেখে?
অপর্ণা, সে-সব কথা পড়িবে না মনে,
শুধু মনে রহিবে জাগিয়া জয়সিংহ
নিষ্ঠুর পাষাণ? যেমন পাষাণ ওই
পাষাণের ছবি, দেবী বলিতাম যারে?—
হায় দেবী, তুই যদি দেবী হইতিস,
তুই যদি বুঝিতিস এই অন্তর্দাহ!

অপর্ণা। বুদ্ধিহীন ব্যথিত এ ক্ষুদ্র নারী-হিয়া,
ক্ষমা করো এরে। এই বেলা চলে এসো,
জয়সিংহ, এসো মোরা এ মন্দির ছেড়ে
যাই।

জয়সিংহ। রক্ষা করো! অপর্ণা, করুণা করো!
দয়া ক'রে, মোরে ফেলে চলে যাও। এক
কাজ বাকি আছে এ জীবনে, সেই হোক
প্রাণেশ্বর— তার স্থান তুমি কাড়িয়ো না।

[দ্রুত প্রস্থান

অপর্ণা। শতবার সহিয়াছি, আজ কেন আর
নাহি সহে! আজ কেন ভেঙে পড়ে প্রাণ!

পঞ্চম দৃশ্য

মন্দির

নক্ষত্ররায় রঘুপতি ও নিদ্রিত ধ্রুব

রঘুপতি। কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছে। জয়সিংহ
এসেছিল মোর কোলে অমনি শৈশবে
পিতৃমাতৃহীন। সেদিন অমনি করে
কেঁদেছিল নূতন দেখিয়া চারি দিক,
হতাশ্বাস শ্রান্ত শোকে অমনি করিয়া
ঘুমায়ে পড়িয়াছিল সন্ধ্যা হয়ে গেলে
ওইখানে দেবীর চরণে! ওরে দেখে
তার সেই শিশুমুখ শিশুর ক্রন্দন
মনে পড়ে।

নক্ষত্ররায়। ঠাকুর, কোরো না দেরি আর—
ভয় হয় কখন সংবাদ পাবে রাজা।

রঘুপতি। সংবাদ কেমন করে পাবে? চারি দিক
নিশীথের নিদ্রা দিয়ে ঘেরা।

নক্ষত্ররায়। একবার
মনে হল যেন দেখিলাম কার ছায়া!

রঘুপতি। আপন ভয়ের।

নক্ষত্ররায়। শুনিলাম যেন কার
ক্রন্দনের স্বর!

রঘুপতি। আপনার হৃদয়ের।
দূর হোক নিরানন্দ। এসো পান করি
কারণসলিল।

মদ্যপান

মনোভাব যতক্ষণ
মনে থাকে, ততক্ষণ দেখায় বৃহৎ—
কার্যকালে ছোটো হয়ে আসে, বহু বাষ্প
গলে গিয়ে একবিন্দু জল। কিছুই না,
শুধু মুহূর্তের কাজ। শুধু শীর্ণশিখা
প্রদীপ নিভাতে যতক্ষণ! ঘুম হতে
চকিতে মিলায়ে যাবে গাঢ়তর ঘুমে
ওই প্রাণরেখাটুকু— শ্রাবণনিশীথে
বিজুলিঝলক-সম, শুধু বজ্র তার
চিরদিন বিঁধে রবে রাজদম্ভ-মাঝে।
এসো এসো যুবরাজ, ম্লান হয়ে কেন
বসে আছ এক পাশে— মুখে কথা নেই,

হাসি নেই, নির্বাপিতপ্রায় ! এসো, পান
করি আনন্দসলিল ।

নক্ষত্ররায় । অনেক বিলম্ব
হয়ে গেছে । আমি বলি, আজ থাক্ । কাল
পূজা হবে ।

রঘুপতি । বিলম্ব হয়েছে বটে । রাত্রি
শেষ হয়ে আসে ।

নক্ষত্ররায় । ওই শোনো পদধ্বনি ।

রঘুপতি । কই ? নাহি শুনি ।

নক্ষত্ররায় । ওই শোনো, ওই দেখো
আলো ।

রঘুপতি । সংবাদ পেয়েছে রাজা ! আর তবে
এক পল দেরি নয় । জয় মহাকালী !

খড়্গ উত্তোলন

গোবিন্দমাণিক্য ও প্রহরীগণের প্রবেশ

রাজার নির্দেশক্রমে প্রহরীর দ্বারা রঘুপতি ও নক্ষত্ররায় ধৃত হইল

গোবিন্দমাণিক্য । নিয়ে যাও কারাগারে, বিচার হইবে ।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বিচারসভা

গোবিন্দমাণিক্য রঘুপতি নক্ষত্ররায়
সভাসদ্‌গণ ও প্রহরীগণ

রঘুপতিকে

গোবিন্দমাণিক্য । আর কিছু বলিবার আছে ?

রঘুপতি । কিছু নাই ।

গোবিন্দমাণিক্য । অপরাধ করিছ স্বীকার ?

রঘুপতি । অপরাধ ?
অপরাধ করিয়াছি বটে । দেবীপূজা
করিতে পারি নি শেষ— মোহে মূঢ় হয়ে
বিলম্ব করেছি অকারণে । তার শাস্তি
দিতেছেন দেবী, তুমি উপলক্ষ শুধু ।

গোবিন্দমাণিক্য । শুন সর্বলোক, আমার নিয়ম এই—
পবিত্র পূজার ছলে দেবতার কাছে

যে মোহান্ধ দিবে জীববলি, কিম্বা তারি
করিবে উদ্যোগ রাজ-আজ্ঞা তুচ্ছ করি,
নির্বাসনদণ্ড তার প্রতি। রঘুপতি,
অষ্ট বর্ষ নির্বাসনে করিবে যাপন ;
তোমারে আসিবে রেখে সৈন্য চারিজন
রাজ্যের বাহিরে।

রঘুপতি। দেবী ছাড়া এ জগতে
এ জানু হয় নি নত আর কারো কাছে।
আমি বিপ্র, তুমি শূদ্র, তবু জোড়করে
নতজানু আজ আমি প্রার্থনা করিব
তোমা-কাছে— দুই দিন দাও অবসর,
শ্রাবণের শেষ দুই দিন। তার পরে
শরতের প্রথম প্রত্যূষে— চলে যাব
তোমার এ অভিশপ্ত দগ্ধ রাজ্য ছেড়ে,
আর ফিরাব না মুখ।

গোবিন্দমাণিক্য। দুই দিন দিনু
অবসর।

রঘুপতি। মহারাজ রাজ-অধিরাজ !
মহিমাসাগর তুমি কৃপা-অবতার !
ধূলির অধম আমি, দীন, অভাজন !

[প্রস্থান

গোবিন্দমাণিক্য। নক্ষত্র, স্বীকার করো অপরাধ তব।

নক্ষত্ররায়। মহারাজ, দোষী আমি। সাহস না হয়
মার্জনা করিতে ভিক্ষা।

পদতলে পতন

গোবিন্দমাণিক্য। বলো তুমি কার
মন্ত্রণায় ভুলে এ কাজে দিয়েছ হাত ?
স্বভাবকোমল তুমি, নিদারুণ বুদ্ধি
এ তোমার নহে।

নক্ষত্ররায়। আর কারে দিব দোষ !
লব না এ পাপমুখে আর কারো নাম।
আমি শুধু একা অপরাধী। আপনার
পাপমন্ত্রণায় আপনি ভুলেছি। শত
দোষ ক্ষমা করিয়াছ নির্বোধ ভ্রাতার,
আরবার ক্ষমা করো !

গোবিন্দমাণিক্য। নক্ষত্র, চরণ
ছেড়ে ওঠো, শোনো কথা। ক্ষমা কি আমার
কাজ ? বিচারক আপন শাসনে বদ্ধ,
বন্দী হতে বেশি বন্দী। এক অপরাধে

দণ্ড পাবে এক জনে, মুক্তি পাবে আর,
এমন ক্ষমতা নাই বিধাতার— আমি
কোথা আছি !

সকলে । ক্ষমা করো, ক্ষমা করো প্রভু !
নক্ষত্র তোমার ভাই ।

গোবিন্দমাণিক্য । স্থির হও সবে ।
ভাই বন্ধু কেহ নাই মোর, এ আসনে
যতক্ষণ আছি । প্রমাণ হইয়া গেছে
অপরাধ । ছাড়ায়ে ত্রিপুররাজ্যসীমা
ব্রহ্মপুত্র নদীতীরে আছে রাজগৃহ
তীর্থস্নানতরে, সেথায় নক্ষত্ররায়
অষ্ট বর্ষ নির্বাসন করিবে যাপন ।

প্রহরীগণ নক্ষত্রকে লইয়া যাইতে উদ্যত । রাজার
সিংহাসন হইতে অবরোহণ

দিয়ে যাও বিদায়ের আলিঙ্গন । ভাই,
এ দণ্ড তোমার শুধু একেলার নহে,
এ দণ্ড আমার । আজ হতে রাজগৃহ
সূচিকণ্টকিত হয়ে বিঁধিবে আমায় ।
রহিল তোমার সাথে আশীর্বাদ মোর ;
যত দিন দূরে র'বি রাখিবেন তোরে
দেবগণ ।

[নক্ষত্রের প্রস্থান

সভাসদ্‌গণের প্রতি

সভাগৃহ ছেড়ে যাও সবে,
ক্ষণেক একেলা রব আমি ।

[সকলের প্রস্থান

দ্রুত নয়নরায়ের প্রবেশ

নয়নরায় । মহারাজ,
সমূহ বিপদ !

গোবিন্দমাণিক্য । রাজা কি মানুষ নহে ?
হায় বিধি, হৃদয় তাহার গড় নি কি
অতি দীনদরিদ্রের সমান করিয়া ?
দুঃখ দিবে সবার মতন, অশ্রুজল
ফেলিবারে অবসর দিবে না কি শুধু ?—
কিসের বিপদ, ব'লে যাও শীঘ্র করি ।

নয়নরায় । মোগলের সৈন্য সাথে আসে চাঁদপাল,
নাশিতে ত্রিপুরা ।

গোবিন্দমাণিক্য । এ নহে নয়নরায়,
তোমার উচিত । শত্রু বটে চাঁদপাল,

তাই বলে তার নামে হেন অপবাদ !

নয়নরায় । অনেক দিয়েছ দণ্ড হীন অধীনেরে,
আজ এই অবিশ্বাস সব চেয়ে বেশি ।
শ্রীচরণচ্যুত হয়ে আছি, তাই বলে
গিয়েছি কি এত অধঃপাতে !

গোবিন্দমাণিক্য । ভালো করে
বলো আরবার, বুঝে দেখি সব ।

নয়নরায় । যোগ
দিয়ে মোগলের সাথে চাহে চাঁদপাল
তোমারে করিতে রাজ্যচ্যুত ।

গোবিন্দমাণিক্য । তুমি কোথা
পেলে এ সংবাদ ?

নয়নরায় । যেদিন আমারে প্রভু
নিরস্ত্র করিলে, অস্ত্রহীন লাজে চলে
গেনু দেশান্তরে ; শুনিলাম আসামের
সাথে মোগলের বাধিছে বিবাদ ; তাই
চলেছিনু সেথাকার রাজসন্নিধানে
মাগিতে সৈনিকপদ । পথে দেখিলাম
আসিছে মোগল সৈন্য ত্রিপুরার পানে,
সঙ্গে চাঁদপাল । সন্ধানে জেনেছি তার
অভিসন্ধি । ছুটিয়া এসেছি রাজপদে ।

গোবিন্দমাণিক্য । সহসা এ কী হল সংসারে হে বিধাতঃ !
শুধু দুই-চারিদিন হল, ধরণীর
কোন্‌খানে ছিদ্রপথ হয়েছে বাহির,
সমুদয় নাগবংশ রসাতল হতে
উঠিতেছে চারি দিকে পৃথিবীর 'পরে—
পদে পদে তুলিতেছে ফণা । এসেছে কি
প্রলয়ের কাল !— এখন সময় নহে
বিস্ময়ের । সেনাপতি, লহো সৈন্যভার ।

দ্বিতীয় দৃশ্য

মন্দিরপ্রাঙ্গণ

জয়সিংহ ও রঘুপতি

রঘুপতি । গেছে গর্ব, গেছে তেজ, গেছে ব্রাহ্মণত্ব ।
ওরে বৎস, আমি তোর গুরু নহি আর !
কাল আমি অসংশয়ে করেছি আদেশ
গুরুর গৌরবে, আজ শুধু সানুনয়ে

ভিক্ষা মাগিবার মোর আছে অধিকার।
অন্তরেতে সে দীপ্তি নিবেছে, যার বলে
তুচ্ছ করিতাম আমি ঐশ্বর্যের জ্যোতি,
রাজার প্রতাপ। নক্ষত্র পড়িলে খসি
তার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর মাটির প্রদীপ।
তাহারে খুঁজিয়া ফিরে পরিহাসভরে
খদ্যোত ধূলির মাঝে, খুঁজিয়া না পায়।
দীপ প্রতিদিন নেভে, প্রতিদিন জ্বলে,
বারেক নিভিলে তারা চির-অন্ধকার!
আমি সেই চিরদীপ্তিহীন; সামান্য এ
পরমায়ু, দেবতার অতি ক্ষুদ্র দান,
ভিক্ষা মেগে লইয়াছি তারি দুটো দিন
রাজদ্বারে নতজানু হয়ে। জয়সিংহ,
সেই দুই দিন যেন ব্যর্থ নাহি হয়।
সেই দুই দিন যেন আপন কলঙ্ক
ঘুচায়ে মরিয়া যায়। কালামুখ তার
রাজরক্তে রাঙা করে তবে যায় যেন।
বৎস, কেন নিরুত্তর? গুরুর আদেশ
নাহি আর; তবু তোরে করেছি পালন
আশৈশব, কিছু নহে তার অনুরোধ?
নহি কি রে আমি তোর পিতার অধিক
পিতৃবিহীনের পিতা বলে? এই দুঃখ,
এত করে স্মরণ করাতে হল! কৃপা-
ভিক্ষা সহ্য হয়, ভালোবাসা ভিক্ষা করে
যে অভাগ্য, ভিক্ষুকের অধম ভিক্ষুক
সে যে। বৎস, তবু নিরুত্তর? জানু তবে
আরবার নত হোক। কোলে এসেছিল
যবে, ছিল এতটুকু, এ জানুর চেয়ে
ছোটো— তার কাছে নত হোক জানু। পুত্র,
ভিক্ষা চাই আমি।

জয়সিংহ। পিতা, এ বিদীর্ণ বুকে
আর হানিয়ো না বজ্র। রাজরক্ত চাহে
দেবী, তাই তারে এনে দিব। যাহা চাহে
সব দিব। সব ঋণ শোধ করে দিয়ে
যাব। তাই হবে। তাই হবে।

[প্রস্থান

রঘুপতি। তবে তাই
হোক। দেবী চাহে, তাই বলে দিস। আমি
কেহ নই। হায় অকৃতজ্ঞ, দেবী তোর
কী করেছে? শিশুকাল হতে দেবী তোরে

প্রতিদিন করেছে পালন ? রোগ হলে
করিয়াছে সেবা ? ক্ষুধায় দিয়েছে অন্ন ?
মিটায়েছে জ্ঞানের পিপাসা ? অবশেষে
এই অকৃতজ্ঞতার ব্যথা নিয়েছে কি
দেবী বুক পেতে ? হায়, কলিকাল ! থাক্ !

তৃতীয় দৃশ্য

প্রাসাদকক্ষ

গোবিন্দমাণিক্য

নয়নরায়ের প্রবেশ

নয়নরায় । বিদ্রোহী সৈনিকদের এনেছি ফিরায়ে,
যুদ্ধসজ্জা হয়েছে প্রস্তুত । আজ্ঞা দাও
মহারাজ, অগ্রসর হই— আশীর্বাদ
করো—

গোবিন্দমাণিক্য । চলো সেনাপতি, নিজে আমি যাব
রণক্ষেত্রে ।

নয়নরায় । যতক্ষণ এ দাসের দেহে
প্রাণ আছে, ততক্ষণ মহারাজ, ক্ষান্ত
থাকো, বিপদের মুখে গিয়ে—

গোবিন্দমাণিক্য । সেনাপতি,
সবার বিপদ-অংশ হতে মোর অংশ
নিতে চাই আমি । মোর রাজ-অংশ, সব
চেয়ে বেশি । এসো সৈন্যগণ, লহো মোরে
তোমাদের মাঝে । তোমাদের নৃপতিরে
দূর সিংহাসনচূড়ে নির্বাসিত করে
সমরগৌরব হতে বঞ্চিত কোরো না ।

চরের প্রবেশ

চর । নির্বাসনপথ হতে লয়েছে কাড়িয়া
কুমার নক্ষত্ররায়ে মোগলের সেনা ;
রাজপদে বরিয়াছে তাঁরে । আসিছেন
সৈন্য লয়ে রাজধানী-পানে ।

গোবিন্দমাণিক্য । চুকে গেল ।
আর ভয় নাই । যুদ্ধ তবে গেল মিটে ।

প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী । বিপক্ষশিবির হতে পত্র আসিয়াছে ।

গোবিন্দমাণিক্য । নক্ষত্রের হস্তলিপি । শান্তির সংবাদ

হবে বুঝি ।— এই কি স্নেহের সম্ভাষণ !
এ তো নহে নক্ষত্রের ভাষা ! চাহে মোর
নির্বাসন, নতুবা ভাসাবে রক্তস্রোতে
সোনার ত্রিপুরা— দগ্ধ করে দিবে দেশ,
বন্দী হবে মোগলের অন্তঃপুরতরে
ত্রিপুররমণী ?— দেখি, দেখি, এই বটে
তারি লিপি । 'মহারাজ নক্ষত্রমাণিক্য !'
মহারাজ ! দেখো সেনাপতি— এই দেখো
রাজদণ্ডে-নির্বাসিত দিয়েছে রাজারে
নির্বাসনদণ্ড । এমনি বিধির খেলা !

নয়নরায় । নির্বাসন ! এ কী স্পর্ধা ! এখনো তো যুদ্ধ
শেষ হয় নাই ।

গোবিন্দমাণিক্য । এ তো নহে মোগলের
দল । ত্রিপুরার রাজপুত্র রাজা হতে
করিয়াছে সাধ, তার তরে যুদ্ধ কেন ?

নয়নরায় । রাজ্যের মঙ্গল—

গোবিন্দমাণিক্য । রাজ্যের মঙ্গল হবে ?
দাঁড়াইয়া মুখোমুখি দুই ভাই হানে
ভ্রাতৃবক্ষ লক্ষ্য করে মৃত্যুমুখী ছুরি,
রাজ্যের মঙ্গল হবে তাহে ? রাজ্যে শুধু
সিংহাসন আছে— গৃহস্থের ঘর নেই,
ভাই নেই, ভ্রাতৃত্ববন্ধন নেই হেথা ?
দেখি দেখি আরবার— এ কি তার লিপি ?
নক্ষত্রের নিজের রচনা নহে । আমি
দস্যু, আমি দেবদ্বেষী, আমি অবিচারী,
এ রাজ্যের অকল্যাণ আমি ! নহে, নহে,
এ তার রচনা নহে ।— রচনা যাহারই
হোক, অক্ষর তো তারি বটে । নিজ হস্তে
লিখেছে তো সেই— যে সর্পেরই বিষ হোক,
নিজের অক্ষরমুখে মাখায়ে দিয়েছে,
হেনেছে আমার বুকে ।— বিধি, এ তোমার
শাস্তি, তার নহে । নির্বাসন ! তাই হোক ।
তার নির্বাসনদণ্ড তার হয়ে আমি
নীরবে বিনম্র শিরে করিব বহন ।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মন্দির। বাহিরে ঝড়

রঘুপতি

পূজোপকরণ লইয়া

রঘুপতি। এতদিনে আজ বুঝি জাগিয়াছ দেবী!
ওই রোষহুহুংকার! অভিশাপ হাঁকি
নগরের 'পর দিয়া ধেয়ে চলিয়াছ
তিমিররূপিণী! ওই বুঝি তোর
প্রলয়সঙ্গিনীগণ দারুণ ক্ষুধায়
প্রাণপণে নাড়া দেয় বিশ্বমহাতরু!
আজ মিটাইব তোর দীর্ঘ উপবাস।
ভক্তেরে সংশয়ে ফেলি এতদিন ছিলি
কোথা দেবী? তোর খড়্গ তুই না তুলিলে
আমরা কি পারি? আজ কী আনন্দ, তোর
চণ্ডীমূর্তি দেখে! সাহসে ভরেছে চিত্ত,
সংশয় গিয়েছে; হতমান নতশির
উঠেছে নূতন তেজে। ওই পদধ্বনি
শুনা যায়, ওই আসে তোর পূজা। জয়
মহাদেবী!

অপর্ণার প্রবেশ

দূর হ, দূর হ মায়াবিনী—
জয়সিংহে চাস তুই? আরে সর্বনাশী!
মহাপাতকিনী!

[অপর্ণার প্রস্থান

এ কী অকাল-ব্যাঘাত!
জয়সিংহ যদি নাই আসে! কভু নহে।
সত্যভঙ্গ কভু নাহি হবে তার।— জয়
মহাকালী, সিদ্ধিদাত্রী, জয় ভয়ংকরী!—
যদি বাধা পায়— যদি ধরা পড়ে শেষে—
যদি প্রাণ যায় তার প্রহরীর হাতে!—
জয় মা অভয়া, জয় ভক্তের সহায়।
জয় মা জাগ্রত দেবী, জয় সর্বজয়া!
ভক্তবৎসলার যেন দুর্নাম না রটে
এ সংসারে, শত্রুপক্ষ নাহি হাসে যেন
নিঃশঙ্ক কৌতুকে। মাতৃ-অহংকার যদি
চূর্ণ হয় সন্তানের, মা বলিয়া তবে

কেহ ডাকিবে না তোরে। ওই পদধ্বনি!
জয়সিংহ বটে! জয় নৃমুণ্ডমালিনী,
পাষণ্ডদলনী মহাশক্তি!

জয়সিংহের দ্রুত প্রবেশ

জয়সিংহ,
রাজরক্ত কই?

জয়সিংহ। আছে আছে! ছাড়ো মোরে।
নিজে আমি করি নিবেদন।— রাজরক্ত
চাই তোর, দয়াময়ী, জগৎপালিনী
মাতা? নহিলে কিছুতে তোর মিটিবে না
তৃষা? আমি রাজপুত, পূর্ব পিতামহ
ছিল রাজা, এখনো রাজত্ব করে মোর
মাতামহবংশ— রাজরক্ত আছে দেহে।
এই রক্ত দিব। এই যেন শেষ রক্ত
হয় মাতা, এই রক্তে শেষ মিটে যেন
অনন্ত পিপাসা তোর, রক্ততৃষাতুরা।

বক্ষে ছুরি-বিদ্ধন

রঘুপতি। জয়সিংহ! জয়সিংহ! নির্দয়! নিষ্ঠুর!
এ কী সর্বনাশ করিলি রে? জয়সিংহ,
অকৃতজ্ঞ, গুরুদ্রোহী, পিতৃমর্মঘাতী,
স্বেচ্ছাচারী! জয়সিংহ, কুলিশকঠিন!
ওরে জয়সিংহ, মোর একমাত্র প্রাণ,
প্রাণাধিক, জীবন-মন্থন-করা ধন!
জয়সিংহ, বৎস মোর, হে গুরুবৎসল!
ফিরে আয়, ফিরে আয়, তোরে ছাড়া আর
কিছু নাহি চাহি! অহংকার অভিমান
দেবতা ব্রাহ্মণ সব যাক! তুই আয়!

অপর্ণার প্রবেশ

অপর্ণা। পাগল করিবে মোরে। জয়সিংহ, কোথা
জয়সিংহ!

রঘুপতি। আয় মা অমৃতময়ী! ডাক্
তোর সুধাকণ্ঠে, ডাক্ ব্যগ্রস্বরে, ডাক্
প্রাণপণে! ডাক্ জয়সিংহে! তুই তারে
নিয়ে যা মা আপনার কাছে, আমি নাহি
চাহি।

অপর্ণার মূর্ছা

প্রতিমার পদতলে মাথা রাখিয়া

ফিরে দে, ফিরে দে, ফিরে দে, ফিরে দে!

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রাসাদ

গোবিন্দমাণিক্য

গোবিন্দমাণিক্য। এখনি আনন্দধ্বনি ! এখনি পরেছে
দীপমালা নির্লজ্জ প্রাসাদ ! উঠিয়াছে
রাজধানী-বহির্দ্বারে বিজয়তোরণ
পুলকিত নগরের আনন্দ-উৎক্ষিপ্ত
দুই বাহু-সম ! এখনো প্রাসাদ হতে
বাহিরে আসি নি— ছাড়ি নাই সিংহাসন।
এতদিন রাজা ছিনু— কারো কি করি নি
উপকার ? কোনো অবিচার করি নাই
দূর ? কোনো অত্যাচার করি নি শাসন ?
ধিক্ ধিক্ নির্বাসিত রাজা ! আপনারে
আপনি বিচার করি আপনার শোকে
আপনি ফেলিস অশ্রু !
মর্তরাজ্য গেল,
আপনার রাজা তবু আমি। মহোৎসব
হোক আজি অন্তরের সিংহাসনতলে।

গুণবতীর প্রবেশ

গুণবতী। প্রিয়তম, প্রাণেশ্বর, আর কেন নাথ ?
এইবার শুনেছ তো দেবীর নিষেধ !
এসো প্রভু, আজ রাত্রে শেষ পূজা করে
রামজানকীর মতো যাই নির্বাসনে ?

গোবিন্দমাণিক্য। অয়ি প্রিয়তমে, আজি শুভদিন মোর।
রাজ্য গেল, তোমারে পেলেম ফিরে। এসো
প্রিয়ে, যাই দোঁহে দেবীর মন্দিরে, শুধু
প্রেম নিয়ে, শুধু পুষ্প নিয়ে, মিলনের
অশ্রু নিয়ে, বিদায়ের বিশুদ্ধ বিষাদ
নিয়ে, আজ রক্ত নয়, হিংসা নয়।

গুণবতী। ভিক্ষা
রাখো নাথ !

গোবিন্দমাণিক্য। বলো দেবী !

গুণবতী। হোয়ো না পাষাণ।
রাজগর্ব ছেড়ে দাও। দেবতার কাছে
পরাভব না মানিতে চাও যদি, তবু
আমার যন্ত্রণা দেখে গলুক হৃদয়।
তুমি তো নিষ্ঠুর কভু ছিলে নাকো প্রভু,
কে তোমারে করিল পাষাণ ! কে তোমারে

আমার সৌভাগ্য হতে লইল কাড়িয়া !
করিল আমারে রাজাহীন রানী !

গোবিন্দমাণিক্য । প্রিয়ে,
আমারে বিশ্বাস করো একবার শুধু,
না বুঝিয়া বোঝো মোর পানে চেয়ে । অশ্রু
দেখে বোঝো, আমারে যে ভালোবাস সেই
ভালোবাসা দিয়ে বোঝো— আর রক্তপাত
নহে । মুখ ফিরায়ো না দেবী, আর মোরে
ছাড়িয়ো না, নিরাশ কোরো না আশা দিয়ে ।
যাবে যদি মার্জনা করিয়া যাও তবে ।

[গুণবতীর প্রস্থান

গেলে চলি ! কী কঠিন নিষ্ঠুর সংসার !—
ওরে কে আছিস ?— কেহ নাই ? চলিলাম ।
বিদায় হে সিংহাসন ! হে পুণ্য প্রাসাদ,
আমার পৈতৃক ক্রোড়, নির্বাসিত পুত্র
তোমারে প্রণাম ক'রে লইল বিদায় ।

তৃতীয় দৃশ্য

অন্তঃপুরকক্ষ

গুণবতী

গুণবতী । বাজা বাদ্য বাজা, আজ রাত্রে পূজা হবে,
আজ মোর প্রতিজ্ঞা পুরিবে । আন্ বলি ।
আন্ জবাফুল । রহিলি দাঁড়ায়ে ? আজ্ঞা
শুনিবি নে ? আমি কেহ নই ? রাজ্য গেছে,
তাই ব'লে এতটুকু রানী বাকি নেই
আদেশ শুনিবে যার কিংকর-কিংকরী ?
এই নে কঙ্কণ, এই নে হীরার কণ্ঠী—
এই নে যতেক আভরণ । ত্বরা ক'রে
কর্ গিয়ে আয়োজন দেবীর পূজার ।
মহামায়া, এ দাসীরে রাখিয়ো চরণে ।

চতুর্থ দৃশ্য

মন্দির

রঘুপতি

রঘুপতি। দেখো, দেখো, কী করে দাঁড়ায়ে আছে, জড়
পাষাণের স্তূপ, মূঢ় নির্বোধের মতো।
মূক, পঙ্গু, অন্ধ ও বধির! তোরি কাছে
সমস্ত ব্যথিত বিশ্ব কাঁদিয়া মরিছে!
পাষাণ-চরণে তোর, মহৎ হৃদয়
আপনারে ভাঙিছে আছাড়ি। হা হা হা হা!
কোন্ দানবের এই ক্রূর পরিহাস
জগতের মাঝখানে রয়েছে বসিয়া।
মা বলিয়া ডাকে যত জীব, হাসে তত
ঘোরতর অট্টহাস্যে নির্দয় বিদ্রূপ।
দে ফিরায়ে জয়সিংহে মোর! দে ফিরায়ে!
দে ফিরায়ে রাক্ষসী পিশাচী।

নাড়া দিয়া

শুনিতে কি
পাস? আছে কর্ণ? জানিস কী করেছিস?
কার রক্ত করেছিস পান? কোন্ পুণ্য
জীবনের? কোন্ স্নেহদয়াপ্রীতি-ভরা
মহাহৃদয়ের?
থাক্ তুই চিরকাল
এইমত— এই মন্দিরের সিংহাসনে,
সরল ভক্তির প্রতি গুপ্ত উপহাস!
দিব তোর পূজা প্রতিদিন, পদতলে
করিব প্রণাম, দয়াময়ী মা বলিয়া
ডাকিব তোমারে। তোর পরিচয় কারো
কাছে নাহি প্রকাশিব, শুধু ফিরায়ে দে
মোর জয়সিংহে! কার কাছে কাঁদিতেছি!
তবে দূর, দূর, দূর, দূর করে দাও
হৃদয়দলনী পাষাণীরে। লঘু হোক
জগতের বক্ষ।

দূরে গোমতীর জলে প্রতিমা-নিক্ষেপ

মশাল লইয়া বাদ্য বাজাইয়া

গুণবতীর প্রবেশ

গুণবতী। জয় জয় মহাদেবী!
দেবী কই?

রঘুপতি। দেবী নাই।

গুণবতী। ফিরাও দেবীরে
গুরুদেব, এনে দাও তাঁরে, রোষশান্তি
করিব তাঁহার। আনিয়াছি মা'র পূজা।
রাজ্য পতি সব ছেড়ে পালিয়াছি শুধু
প্রতিজ্ঞা আমার। দয়া করো, দয়া করে
দেবীরে ফিরায়ে আনো শুধু, আজি এই
এক রাত্রি তরে। কোথা দেবী ?

রঘুপতি। কোথাও সে
নাই। ঊর্ধ্বে নাই, নিম্নে নাই, কোথাও সে
নাই, কোথাও সে ছিল না কখনো।

গুণবতী। প্রভু,
এইখানে ছিল না কি দেবী ?

রঘুপতি। দেবী বল
তারে ! এ সংসারে কোথাও থাকিত দেবী,
তবে সেই পিশাচীরে দেবী বলা কভু
সহ্য কি করিত দেবী ? মহত্ত্ব কি তবে
ফেলিত নিষ্ফল রক্ত হৃদয় বিদারি
মূঢ় পাষাণের পদে ? দেবী বল তারে ?
পুণ্যরক্ত পান ক'রে সে মহারাক্ষসী
ফেটে মরে গেছে।

গুণবতী। গুরুদেব, বধিয়ো না
মোরে। সত্য করে বলো আরবার। দেবী
নাই ?

রঘুপতি। নাই।

গুণবতী। দেবী নাই ?

রঘুপতি। নাই।

গুণবতী। দেবী নাই !
তবে কে রয়েছে ?

রঘুপতি। কেহ নাই। কিছু নাই।

গুণবতী। নিয়ে যা, নিয়ে যা পূজা ! ফিরে যা, ফিরে যা !
বল্ শীঘ্র কোন্ পথে গেছে মহারাজ।

অপর্ণার প্রবেশ

অপর্ণা। পিতা !

রঘুপতি। জননী, জননী, জননী আমার !
পিতা ! এ তো নহে ভর্ৎসনার নাম। পিতা !
মা জননী, এ পুত্রঘাতীরে পিতা ব'লে
যে জন ডাকিত, সেই রেখে গেছে ওই
সুধামাখা নাম তোর কণ্ঠে, এইটুকু
দয়া করে গেছে। আহা, ডাক্ আরবার !

অপর্ণা। পিতা, এসো এ মন্দির ছেড়ে যাই মোরা।

পুষ্প-অর্ঘ্য লইয়া
গোবিন্দমাণিক্যের প্রবেশ

গোবিন্দমাণিক্য। দেবী কই ?
রঘুপতি। দেবী নাই।
গোবিন্দমাণিক্য। একি রক্তধারা !
রঘুপতি। এই শেষ পুণ্যরক্ত এ পাপ-মন্দিরে।
জয়সিংহ নিবায়েছে নিজ রক্ত দিয়ে
হিংসারক্তশিখা।
গোবিন্দমাণিক্য। ধন্য ধন্য জয়সিংহ,
এ পূজার পুষ্পাঞ্জলি সঁপিনু তোমারে।
গুণবতী। মহারাজ !
গোবিন্দমাণিক্য। প্রিয়তমে !
গুণবতী। আজ দেবী নাই—
তুমি মোর একমাত্র রয়েছ দেবতা।

প্রণাম

গোবিন্দমাণিক্য। গেছে পাপ। দেবী আজ এসেছে ফিরিয়া
আমার দেবীর মাঝে।
অপর্ণা। পিতা, চলে এসো !
রঘুপতি। পাষাণ ভাঙিয়া গেল— জননী আমার
এবার দিয়েছে দেখা প্রত্যক্ষ প্রতিমা !
জননী অমৃতময়ী !
অপর্ণা। পিতা, চলে এসো !

চিত্রাঙ্গদা

উৎসর্গ

স্নেহাস্পদ শ্রীমান অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
পরমকল্যাণীয়েষু

বৎস,

তুমি আমাকে তোমার যত্নরচিত চিত্রগুলি উপহার দিয়াছ, আমি তোমাকে আমার কাব্য এবং স্নেহ-আশীর্বাদ দিলাম। ১৫ শ্রাবণ ১২৯৯

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সূচনা

অনেক বছর আগে রেলগাড়িতে যাচ্ছিলুম শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতার দিকে। তখন বোধ করি চৈত্রমাস হবে। রেল লাইনের ধারে ধারে আগাছার জঙ্গল। হলদে বেগনি সাদা রঙের ফুল ফুটেছে অজস্র। দেখতে দেখতে এই ভাবনা এল মনে যে আর কিছুকাল পরেই রৌদ্র হবে প্রখর, ফুলগুলি তার রঙের মরীচিকা নিয়ে যাবে মিলিয়ে— তখন পল্লীপ্রাঙ্গণে আম ধরবে গাছের ডালে ডালে, তরুপ্রকৃতি তার অন্তরের নিগূঢ় রসসঞ্চয়ের স্থায়ী পরিচয় দেবে আপন অপ্রগল্ভ ফলসম্ভারে। সেইসঙ্গে কেন জানি হঠাৎ আমার মনে হল সুন্দরী যুবতী যদি অনুভব করে যে সে তার যৌবনের মায়া দিয়ে প্রেমিকের হৃদয় ভুলিয়েছে তা হলে সে তার সুরূপকেই আপন সৌভাগ্যের মুখ্য অংশে ভাগ বসাবার অভিযোগে সতিন বলে ধিক্কার দিতে পারে। এ যে তার বাইরের জিনিস, এ যেন ঋতুরাজ বসন্তের কাছ থেকে পাওয়া বর, ক্ষণিক মোহ-বিস্তারের দ্বারা জৈব উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্যে যদি তার অন্তরের মধ্যে যথার্থ চারিত্রশক্তি থাকে তবে সেই মোহমুক্ত শক্তির দানই তার প্রেমিকের পক্ষে মহৎ লাভ, যুগল জীবনের জয়যাত্রার সহায়। সেই দানেই আত্মার স্থায়ী পরিচয়, এর পরিণামে ক্লান্তি নেই, অবসাদ নেই, অভ্যাসের ধূলিপ্রলেপে উজ্জ্বলতার মালিন্য নেই। এই চারিত্রশক্তি জীবনের ধ্রুব সম্বল, নির্মম প্রকৃতির আশু প্রয়োজনের প্রতি তার নির্ভর নয়। অর্থাৎ এর মূল্য মানবিক, এ নয় প্রাকৃতিক।

এই ভাবটাকে নাট্য-আকারে প্রকাশ-ইচ্ছা তখনই মনে এল, সেইসঙ্গেই মনে পড়ল মহাভারতের চিত্রাঙ্গদার কাহিনী। এই কাহিনীটি কিছু রূপান্তর নিয়ে অনেক দিন আমার মনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল। অবশেষে লেখবার আনন্দিত অবকাশ পাওয়া গেল উড়িষ্যায় পাণ্ডুয়া বলে একটি নিভৃত পল্লীতে গিয়ে।

বৈশাখ ১৩৪৭ — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চিত্রাঙ্গদা

১

অনঙ্গ-আশ্রম

চিত্রাঙ্গদা মদন ও বসন্ত

চিত্রাঙ্গদা। তুমি পঞ্চশর ?

মদন। আমি সেই মনসিজ,
টেনে আনি নিখিলের নরনারী-হিয়া
বেদনাবন্ধনে।

চিত্রাঙ্গদা। কী বেদনা কী বন্ধন
জানে তাহা দাসী। প্রণমি তোমার পদে।
প্রভু, তুমি কোন্ দেব ?

বসন্ত। আমি ঋতুরাজ।
জরা মৃত্যু দৈত্য নিমেষে নিমেষে
বাহির করিতে চাহে বিশ্বের কঙ্কাল ;
আমি পিছে পিছে ফিরে পদে পদে তারে
করি আক্রমণ ; রাত্রিদিন সে সংগ্রাম।
আমি অখিলের সেই অনন্ত যৌবন।

চিত্রাঙ্গদা। প্রণাম তোমারে ভগবন্। চরিতার্থ
দাসী দেব-দরশনে।

মদন। কল্যাণী, কী লাগি
এ কঠোর ব্রত তব ? তপস্যার তাপে
করিছ মলিন খিন্ন যৌবনকুসুম—
অনঙ্গ-পূজার নহে এমন বিধান।
কে তুমি, কী চাও ভদ্রে।

চিত্রাঙ্গদা। দয়া কর যদি,
শোনো মোর ইতিহাস। জানাব প্রার্থনা
তার পরে।

মদন। শুনিবারে রহিনু উৎসুক।

চিত্রাঙ্গদা। আমি চিত্রাঙ্গদা মণিপুররাজকন্যা।
মোর পিতৃবংশে কভু পুত্রী জন্মিবে না—
দিয়াছিলা হেন বর দেব উমাপতি
তপে তুষ্ট হয়ে। আমি সেই মহাবর
ব্যর্থ করিয়াছি। অমোঘ দেবতাবাক্য
মাতৃগর্ভে পশি দুর্বল প্রারম্ভ মোর

পারিল না পুরুষ করিতে শৈব তেজে,
এমনি কঠিন নারী আমি।

মদন। শুনিয়াছি
বটে। তাই তব পিতা পুত্রের সমান
পালিয়াছে তোমা। শিখায়েছে ধনুর্বিদ্যা
রাজদণ্ডনীতি।

চিত্রাঙ্গদা। তাই পুরুষের বেশে
নিত্য করি রাজকাজ যুবরাজরূপে,
ফিরি স্বেচ্ছামতে ; নাহি জানি লজ্জা ভয়,
অন্তঃপুরবাস ; নাহি জানি হাবভাব,
বিলাসচাতুরী ; শিখিয়াছি ধনুর্বিদ্যা,
শুধু শিখি নাই, দেব, তব পুষ্পধনু
কেমনে বাঁকাতে হয় নয়নের কোণে।

বসন্ত। সুনয়নে, সে বিদ্যা শিখে না কোনো নারী ;
নয়ন আপনি করে আপনার কাজ,
বুকে যার বাজে সেই বোঝে।

চিত্রাঙ্গদা। এক দিন
গিয়েছিনু মৃগ-অন্বেষণে একাকিনী
ঘন বনে, পূর্ণা-নদীতীরে। তরুমূলে
বাঁধি অশ্ব, দুর্গম কুটিল বনপথে
পশিলাম মৃগপদচিহ্ন অনুসরি।
ঝিল্লিমন্দ্রমুখরিত নিত্য-অন্ধকার
লতাগুল্মে গহন গম্ভীর মহারণ্যে
কিছু দূর অগ্রসরি দেখিনু সহসা,
রুধিয়া সংকীর্ণ পথ রয়েছে শয়ান
ভূমিতলে চীরধারী মলিন পুরুষ।
উঠিতে কহিনু তারে অবজ্ঞার স্বরে
সরে যেতে— নড়িল না, চাহিল না ফিরে।
উদ্ধত অধীর রোষে ধনু-অগ্রভাগে
করিনু তাড়না— সরল সুদীর্ঘ দেহ
মুহূর্তেই তীরবেগে উঠিল দাঁড়ায়ে
সম্মুখে আমার— ভস্মসুপ্ত অগ্নি যথা
ঘৃতাহুতি পেয়ে, শিখারূপে উঠে ঊর্ধ্বে
চক্ষের নিমেষে। শুধু ক্ষণেকের তরে
চাহিলা আমার মুখপানে— রোষদৃষ্টি
মিলাল পলকে ; নাচিল অধরপ্রান্তে
স্নিগ্ধ গুপ্ত কৌতুকের মৃদুহাস্যরেখা
বুঝি সে বালক-মূর্তি হেরিয়া আমার।
শিখে পুরুষের বিদ্যা, প'রে পুরুষের
বেশ, পুরুষের সাথে থেকে, এতদিন
ভুলে ছিনু যাহা, সেই মুখ চেয়ে, সেই

আপনাতে-আপনি-অটল মূর্তি হেরি',
সেই মুহূর্তেই জানিলাম মনে, নারী
আমি। সেই মুহূর্তেই প্রথম দেখিনু
সম্মুখে পুরুষ মোর।

মদন। সে শিক্ষা আমারি
সুলক্ষণে। আমিই চেতন করে দিই
একদিন জীবনের শুভ পুণ্যক্ষণে
নারীরে হইতে নারী, পুরুষে পুরুষ।
কী ঘটিল পরে?

চিত্রাঙ্গদা। সভয়বিস্ময়কণ্ঠে
শুধানু, "কে তুমি?" শুনিনু উত্তর, "আমি
পার্থ, কুরুবংশধর।"
রহিনু দাঁড়ায়ে
চিত্রপ্রায়, ভুলে গেনু প্রণাম করিতে।
এই পার্থ! আজন্মের বিস্ময় আমার!
শুনেছিনু বটে, সত্যপালনের তরে
দ্বাদশ বৎসর বনে বনে ব্রহ্মচর্য
পালিছে অর্জুন। এই সেই পার্থবীর!
বাল্যদুরাশায় কত দিন করিয়াছি
মনে, পার্থকীর্তি করিব নিষ্প্রভ আমি
নিজ ভুজবলে; সাধিব অব্যর্থ লক্ষ্য;
পুরুষের ছদ্মবেশে মাগিব সংগ্রাম
তাঁর সাথে, বীরত্বের দিব পরিচয়।
হা রে মুগ্ধে, কোথায় চলিয়া গেল সেই
স্পর্ধা তোর! যে ভূমিতে আছেন দাঁড়ায়ে
সে ভূমির তৃণদল হইতাম যদি,
শৌর্যবীর্য যাহা কিছু ধুলায় মিলায়ে
লভিতাম দুর্লভ মরণ, সেই তাঁর
চরণের তলে।
কী ভাবিতেছিনু মনে
নাই। দেখিনু চাহিয়া ধীরে চলি গেলা
বীর, বন-অন্তরালে। উঠিনু চমকি;
সেইক্ষণে জন্মিল চেতনা; আপনারে
দিলাম ধিক্কার শতবার। ছি ছি মূঢ়ে,
না করিলি সম্ভাষণ, না শুধালি কথা,
না চাহিলি ক্ষমাভিক্ষা, বর্বরের মতো
রহিলি দাঁড়ায়ে— হেলা করি চলি গেলা
বীর। বাঁচিতাম, সে মুহূর্তে মরিতাম
যদি।
পরদিন প্রাতে দূরে ফেলে দিনু
পুরুষের বেশ। পরিলাম রক্তাম্বর,

কঙ্কণ কিঙ্কিণী কাঞ্চি। অনভ্যস্ত সাজ
লজ্জায় জড়ায়ে অঙ্গ রহিল একান্ত
সসংকোচে।
গোপনে গেলাম সেই বনে
অরণ্যের শিবালয়ে দেখিলাম তাঁরে—

মদন। বলে যাও বালা। মোর কাছে করিয়ো না
কোনো লাজ। আমি মনসিজ ; মানসের
সকল রহস্য জানি।

চিত্রাঙ্গদা। মনে নাই ভালো
তার পরে কী কহিনু আমি, কী উত্তর
শুনিলাম। আর শুধায়ো না ভগবন্।
মাথায় পড়িল ভেঙে লজ্জা বজ্ররূপে,
তবু মোরে পারিল না শতধা করিতে—
নারী হয়ে এমনি পুরুষপ্রাণ মোর।
নাহি জানি কেমনে এলেম ঘরে ফিরে
দুঃস্বপ্নবিহ্বলসম। শেষ কথা তাঁর
কর্ণে মোর বাজিতে লাগিল তপ্ত শূল—
"ব্রহ্মচারিব্রতধারী আমি। পতিযোগ্য
নহি বরাঙ্গনে।"
পুরুষের ব্রহ্মচর্য!
ধিক্ মোরে, তাও আমি নারিনু টলাতে।
তুমি জান, মীনকেতু, কত ঋষি মুনি
করিয়াছে বিসর্জন নারীপদতলে
চিরার্জিত তপস্যার ফল। ক্ষত্রিয়ের
ব্রহ্মচর্য! গৃহে গিয়ে ভাঙিয়ে ফেলিনু
ধনুঃশর যাহা কিছু ছিল ; কিণাঙ্কিত
এ কঠিন বাহু— ছিল যা গর্বের ধন
এত কাল মোর— লাঞ্ছনা করিনু তারে
নিষ্ফল আক্রোশভরে। এতদিন পরে
বুঝিলাম, নারী হয়ে পুরুষের মন
না যদি জিনিতে পারি বৃথা বিদ্যা যত।
অবলার কোমলমৃণালবাহুদুটি
এ বাহুর চেয়ে ধরে শতগুণ বল।
ধন্য সেই মুগ্ধ মূর্খ ক্ষীণতনুলতা
পরাবলম্বিতা লজ্জাভয়ে-লীনাঙ্গিনী
সামান্য ললনা, যার ত্রস্ত নেত্রপাতে
মানে পরাভব বীর্যবল, তপস্যার
তেজ।
হে অনঙ্গদেব, সব দম্ভ মোর
এক দণ্ডে লয়েছ ছিনিয়া— সব বিদ্যা
সব বল করেছ তোমার পদানত।
এখন তোমার বিদ্যা শিখাও আমায়,

দাও মোরে অবলার বল, নিরস্ত্রের
অস্ত্র যত।

মদন। আমি হব সহায় তোমার।
অয়ি শুভে , বিশ্বজয়ী অর্জুনে জিনিয়া
বন্দী করি আনি দিব সম্মুখে তোমার।
রাজ্ঞী হয়ে দিয়ো তারে দণ্ড পুরস্কার
যথা-ইচ্ছা। বিদ্রোহীরে করিয়ো শাসন।

চিত্রাঙ্গদা। সময় থাকিত যদি, একাকিনী আমি
তিলে তিলে হৃদয় তাঁহার করিতাম
অধিকার, নাহি চাহিতাম দেবতার
সহায়তা। সঙ্গীরূপে থাকিতাম সাথে,
রণক্ষেত্রে হতেম সারথি, মৃগয়াতে
রহিতাম অনুচর, শিবিরের দ্বারে
জাগিতাম রাত্রির প্রহরী, ভক্তরূপে
পূজিতাম, ভৃত্যরূপে করিতাম সেবা,
ক্ষত্রিয়ের মহাব্রত আর্ত-পরিত্রাণে
সখারূপে হইতাম সহায় তাঁহার।
একদিন কৌতূহলে দেখিতেন চাহি,
ভাবিতেন মনে মনে, "এ কোন্ বালক,
পূর্বজনমের চিরদাস, এ জনমে
সঙ্গ লইয়াছে মোর সুকৃতির মতো।"
ক্রমে খুলিতাম তাঁর হৃদয়ের দ্বার,
চিরস্থান লভিতাম সেথা। জানি আমি
এ প্রেম আমার শুধু ক্রন্দনের নহে;
যে নারী নির্বাক্ ধৈর্যে চিরমর্মব্যথা
নিশীথনয়নজলে করয়ে পালন,
দিবালোকে ঢেকে রাখে ম্লান হাসিতলে,
আজন্মবিধবা, আমি সে রমণী নহি;
আমার কামনা কভু হবে না নিষ্ফল।
নিজেরে বারেক যদি প্রকাশিতে পারি,
নিশ্চয় সে দিবে ধরা। হায় হতবিধি,
সেদিন কী দেখেছিল! শরমে কুণ্ঠিত
শঙ্কিত কম্পিত নারী, বিবশ বিহ্বল
প্রলাপবাদিনী। কিন্তু আমি যথার্থ কি
তাই? যেমন সহস্র নারী পথে গৃহে,
চারি দিকে, শুধু ক্রন্দনের অধিকারী,
তার চেয়ে বেশি নই আমি? কিন্তু হায়,
আপনার পরিচয় দেওয়া, বহু ধৈর্যে
বহু দিনে ঘটে, চিরজীবনের কাজ,
জন্মজন্মান্তের ব্রত। তাই আসিয়াছি
দ্বারে তোমাদের, করেছি কঠোর তপ।

হে ভুবনজয়ী দেব, হে মহাসুন্দর
ঋতুরাজ, শুধু এক দিবসের তরে
ঘুচাইয়া দাও— জন্মদাতা বিধাতার
বিনাদোষে অভিশাপ, নারীর কুরূপ।
করো মোরে অপূর্ব সুন্দরী। দাও মোরে
সেই একদিন— তার পরে চিরদিন
রহিল আমার হাতে।— যখন প্রথম
দেখিলাম তারে, যেন মুহূর্তের মাঝে
অনন্ত বসন্ত ঋতু পশিল হৃদয়ে।
বড়ো ইচ্ছা হয়েছিল সে যৌবনোচ্ছ্বাসে
সমস্ত শরীর যদি দেখিতে দেখিতে
অপূর্বপুলকভরে উঠে প্রস্ফুটিয়া
লক্ষ্মীর চরণশায়ী পদ্মের মতন।
হে বসন্ত, হে বসন্তসখে, সে বাসনা
পুরাও আমার শুধু দিনেকের তরে।

মদন। তথাস্তু।

বসন্ত। তথাস্তু। শুধু একদিন নহে,
বসন্তের পুষ্পশোভা এক বর্ষ ধরি
ঘেরিয়া তোমার তনু রহিবে বিকশি।

২

মণিপুর। অরণ্যে শিবালয়

অর্জুন

অর্জুন। কাহারে হেরিনু? সে কি সত্য, কিম্বা মায়া
নিবিড় নির্জন বনে নির্মল সরসী—
এমনি নিভৃত নিরালয়, মনে হয়,
নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে সেথা বনলক্ষ্মীগণ
স্নান করে যায়, গভীর পূর্ণিমারাত্রে
সেই সুপ্ত সরসীর স্নিগ্ধ শষ্পতটে
শয়ন করেন সুখে নিঃশঙ্ক বিশ্রামে
স্খলিত-অঞ্চলে।
সেথা তরু-অন্তরালে
অপরাহ্ণবেলাশেষে, ভাবিতেছিলাম
আশৈশবজীবনের কথা; সংসারের
মূঢ় খেলা দুঃখসুখ উলটি পালটি;
জীবনের অসন্তোষ, অসম্পূর্ণ আশা,
অনন্ত দারিদ্র্য এই মর্ত মানবের।
হেনকালে ঘনতরু-অন্ধকার হতে
ধীরে ধীরে বাহিরিয়া, কে আসি দাঁড়াল
সরোবর-সোপানের শ্বেত শিলাপটে।

কী অপূর্ব রূপ। কোমল চরণতলে
ধরাতল কেমনে নিশ্চল হয়ে ছিল?
উষার কনক মেঘ, দেখিতে দেখিতে
যেমন মিলায়ে যায়, পূর্ব পর্বতের
শুভ্র শিরে অকলঙ্ক নগ্ন শোভাখানি
করি বিকশিত, তেমনি বসন তার
মিলাতে চাহিতেছিল অঙ্গের লাবণ্যে
সুখাবেশে। নামি ধীরে সরোবরতীরে
কৌতূহলে দেখিল সে নিজ মুখচ্ছায়া;
উঠিল চমকি। ক্ষণপরে মৃদু হাসি
হেলাইয়া বাম বাহুখানি, হেলাভরে
এলাইয়া দিলা কেশপাশ; মুক্ত কেশ
পড়িল বিহ্বল হয়ে চরণের কাছে।
অঞ্চল খসায়ে দিয়ে হেরিল আপন
অনিন্দিত বাহুখানি— পরশের রসে
কোমল কাতর, প্রেমের করুণামাখা।
নিরখিলা নত করি শির, পরিস্ফুট
দেহতটে যৌবনের উন্মুখ বিকাশ।
দেখিলা চাহিয়া নব গৌরতনুতলে
আরক্তিম আলজ্জ আভাস; সরোবরে
পা-দুখানি ডুবাইয়া দেখিলা আপন
চরণের আভা। বিস্ময়ের নাই সীমা।
সেই যেন প্রথম দেখিল আপনারে।
শ্বেত শতদল যেন কোরকবয়স
যাপিল নয়ন মুদি— যেদিন প্রভাতে
প্রথম লভিল পূর্ণ শোভা, সেইদিন
হেলাইয়া গ্রীবা, নীল সরোবরজলে
প্রথম হেরিল আপনারে, সারাদিন
রহিল চাহিয়া সবিস্ময়ে। ক্ষণপরে,
কী জানি কী দুখে, হাসি মিলাইল মুখে,
ম্লান হল দুটি আঁখি; বাঁধিয়া তুলিল
কেশপাশ; অঞ্চলে ঢাকিল দেহখানি;
নিশ্বাস ফেলিয়া, ধীরে ধীরে চলে গেল;
সোনার সায়াহ্ন যথা ম্লান মুখ করি
আঁধার রজনীপানে ধায় মৃদুপদে।

ভাবিলাম মনে, ধরণী খুলিয়া দিল
ঐশ্বর্য আপন। কামনার সম্পূর্ণতা
চমকিয়া মিলাইয়া গেল। ভাবিলাম
কত যুদ্ধ, কত হিংসা, কত আড়ম্বর,
পুরুষের পৌরুষগৌরব, বীরত্বের

নিত্য কীর্তিতৃষা, শান্ত হয়ে লুটাইয়া
পড়ে ভূমে, ওই পূর্ণ সৌন্দর্যের কাছে ;
পশুরাজ সিংহ যথা সিংহবাহিনীর
ভুবনবাঞ্ছিত অরুণচরণতলে।
আর এক বার যদি— কে দুয়ার ঠেলে।

দ্বার খুলিয়া

এ কী ! সেই মূর্তি ! শান্ত হও হে হৃদয় !
কোনো ভয় নাই মোরে বরাননে ! আমি
ক্ষত্রকুলজাত ; ভয়ভীত দুর্বলের
ভয়হারী।

চিত্রাঙ্গদা। আর্য, তুমি অতিথি আমার।
এ মন্দির আমার আশ্রম। নাহি জানি
কেমনে করিব অভ্যর্থনা, কী সৎকারে
তোমারে তুষিব আমি।

অর্জুন। অতিথি-সৎকার
তব দরশনে, হে সুন্দরী ! শিষ্টবাক্য
সমূহ সৌভাগ্য মোর। যদি নাহি লহ
অপরাধ, প্রশ্ন এক শুধাইতে চাহি,
চিত্ত মোর কুতূহলী।

চিত্রাঙ্গদা। শুধাও নির্ভয়ে।

অর্জুন। শুচিস্মিতে, কোন্ সুকঠোর ব্রত লাগি
জনহীন দেবালয়ে হেন রূপরাশি
হেলায় দিতেছ বিসর্জন, হতভাগ্য
মর্তজনে করিয়া বঞ্চিত।

চিত্রাঙ্গদা। গুপ্ত এক
কামনা-সাধনা-তরে একমনে করি
শিবপূজা।

অর্জুন। হায়, কারে করিছে কামনা
জগতের কামনার ধন। সুদর্শনে,
উদয়শিখর হতে অস্তাচলভূমি
ভ্রমণ করেছি আমি ; সপ্তদ্বীপমাঝে
যেখানে যা-কিছু আছে দুর্লভ সুন্দর,
অচিন্ত্য মহান্, সকলি দেখেছি চোখে ;
কী চাও, কাহারে চাও, যদি বল মোরে
মোর কাছে পাইবে বারতা।

চিত্রাঙ্গদা। ত্রিভুবনে
পরিচিত তিনি, আমি যারে চাহি।

অর্জুন। হেন
নর কে আছে ধরায়। কার যশোরাশি
অমরকাঙ্ক্ষিত তব মনোরাজ্যমাঝে
করিয়াছে অধিকার দুর্লভ আসন।

কহো নাম তার, শুনিয়া কৃতার্থ হই।

চিত্রাঙ্গদা। জন্ম তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতিকুলে,
সর্বশ্রেষ্ঠ বীর।

অর্জুন। মিথ্যা খ্যাতি বেড়ে ওঠে
মুখে মুখে কথায় কথায় ; ক্ষণস্থায়ী
বাষ্প যথা উষারে ছলনা ক'রে ঢাকে
যতক্ষণ সূর্য নাহি ওঠে। হে সরলে,
মিথ্যারে কোরো না উপাসনা, এ দুর্লভ
সৌন্দর্যসম্পদে। কহো শুনি সর্বশ্রেষ্ঠ
কোন্ বীর, ধরণীর সর্বশ্রেষ্ঠ কুলে।

চিত্রাঙ্গদা। পরকীর্তি-অসহিষ্ণু কে তুমি সন্ন্যাসী!
কে না জানে কুরুবংশ এ ভুবনমাঝে
রাজবংশচূড়া।

অর্জুন। কুরুবংশ!

চিত্রাঙ্গদা। সেই বংশে
কে আছে অক্ষয়যশ বীরেন্দ্রকেশরী—
নাম শুনিয়াছ?

অর্জুন। বলো, শুনি তব মুখে।

চিত্রাঙ্গদা। অর্জুন, গাণ্ডীবধনু, ভুবনবিজয়ী।
সমস্ত জগৎ হতে সে অক্ষয় নাম,
করিয়া লুণ্ঠন, লুকায়ে রেখেছি যত্নে
কুমারীহৃদয় পূর্ণ করি।— ব্রহ্মচারী,
কেন এ অধৈর্য তব?
তবে মিথ্যা এ কি?
মিথ্যা সে অর্জুন নাম? কহো এই বেলা—
মিথ্যা যদি হয় তবে হৃদয় ভাঙিয়া
ছেড়ে দিই তারে, বেড়াক সে উড়ে উড়ে
শূন্যে শূন্যে মুখে মুখে— তার স্থান নহে
নারীর অন্তরাসনে।

অর্জুন। অয়ি বরাঙ্গনে,
সে অর্জুন, সে পাণ্ডব, সে গাণ্ডীবধনু,
চরণে শরণাগত সেই ভাগ্যবান।
নাম তার, খ্যাতি তার, শৌর্যবীর্য তার,
মিথ্যা হোক, সত্য হোক, যে দুর্লভ লোকে
করেছ তাহারে স্থানদান, সেথা হতে
আর তারে কোরো না বিচ্যুত, ক্ষীণপুণ্য
হৃতস্বর্গ হতভাগ্যসম।

চিত্রাঙ্গদা। তুমি পার্থ?

অর্জুন। আমি পার্থ, দেবী, তোমার হৃদয়দ্বারে
প্রেমার্ত অতিথি।

চিত্রাঙ্গদা। শুনেছিনু ব্রহ্মচর্য

পালিছে অর্জুন দ্বাদশবরষব্যাপী।
সেই বীর কামিনীরে করিছে কামনা
ব্রত ভঙ্গ করি! হে সন্ন্যাসী, তুমি পার্থ।

অর্জুন। তুমি ভাঙিয়াছ ব্রত মোর। চন্দ্র উঠি
যেমন নিমেষে ভেঙে দেয় নিশীথের
যোগনিদ্রা-অন্ধকার।

চিত্রাঙ্গদা। ধিক্, পার্থ, ধিক্!
কে আমি, কী আছে মোর, কী দেখেছ তুমি,
কী জান আমারে। কার লাগি আপনারে
হতেছ বিস্মৃত। মুহূর্তেকে সত্যভঙ্গ
করি অর্জুনেরে করিতেছ অনর্জুন
কার তরে? মোর তরে নহে। এই দুটি
নীলোৎপল নয়নের তরে; এই দুটি
নবনীনিন্দিত বাহুপাশে সব্যসাচী
অর্জুন দিয়াছে আসি ধরা, দুই হস্তে
ছিন্ন করি সত্যেব বন্ধন। কোথা গেল
প্রেমের মর্যাদা? কোথায় রহিল পড়ে
নারীর সম্মান? হায়, আমারে করিল
অতিক্রম আমার এ তুচ্ছ দেহখানা,
মৃত্যুহীন অন্তরের এই ছদ্মবেশ
ক্ষণস্থায়ী। এতক্ষণে পারিনু জানিতে
মিথ্যা খ্যাতি, বীরত্ব তোমার।

অর্জুন। খ্যাতি মিথ্যা,
বীর্য মিথ্যা, আজ বুঝিয়াছি। আজ মোরে
সপ্তলোক স্বপ্ন মনে হয়। শুধু একা
পূর্ণ তুমি, সর্ব তুমি, বিশ্বের ঐশ্বর্য
তুমি— এক নারী সকল দৈন্যের তুমি
মহা অবসান, সকল কর্মের তুমি
বিশ্রামরূপিণী। কেন জানি অকস্মাৎ
তোমারে হেরিয়া, বুঝিতে পেরেছি আমি
কী আনন্দকিরণেতে প্রথম প্রত্যুষে
অন্ধকার মহার্ণবে সৃষ্টিশতদল
দিগ্বিদিকে উঠেছিল উন্মেষিত হয়ে
এক মুহূর্তের মাঝে। আর সকলেরে
পলে পলে তিলে তিলে তবে জানা যায়
বহু দিনে; তোমাপানে যেমনি চেয়েছি
অমনি সমস্ত তব পেয়েছি দেখিতে,
তবু পাই নাই শেষ। কৈলাসশিখরে
একদা মৃগয়াশ্রান্ত, তৃষিত, তাপিত,
গিয়েছিনু দ্বিপ্রহরে কুসুমবিচিত্র
মানসের তীরে। যেমনি দেখিনু চেয়ে

সেই সুরসরসীর সলিলের পানে,
অমনি পড়িল চোখে অনন্ত-অতল।
স্বচ্ছ জল, যত নিম্নে চাই। মধ্যাহ্নের
রবিরশ্মিরেখাগুলি স্বর্ণনলিনীর
সুবর্ণমৃণাল-সাথে মিশি নেমে গেছে
অগাধ অসীমে, কাঁপিতেছে আঁকি বাঁকি
জলের হিল্লোলে, লক্ষকোটি অগ্নিময়ী
নাগিনীর মতো। মনে হল ভগবান
সূর্যদেব সহস্র অঙ্গুলি নির্দেশিয়া
দিলেন দেখায়ে, জন্মশ্রান্ত কর্মক্লান্ত
মর্তজনে, কোথা আছে সুন্দর মরণ
অনন্ত শীতল। সেই স্বচ্ছ অতলতা
দেখেছি তোমার মাঝে। চারি দিক হতে
দেবের অঙ্গুলি যেন দেখায়ে দিতেছে
মোরে, ওই তব অলোক-আলোক-মাঝে
কীর্তিক্লিষ্ট জীবনের পূর্ণ নির্বাপণ।

চিত্রাঙ্গদা। আমি নহি, আমি নহি, হায় পার্থ, হায়,
কোন্ দেবের ছলনা! যাও যাও ফিরে
যাও, ফিরে যাও বীর। মিথ্যারে কোরো না
উপাসনা। শৌর্য বীর্য মহত্ত্ব তোমার
দিয়ো না মিথ্যার পদে। যাও, ফিরে যাও।

৩

তরুতলে চিত্রাঙ্গদা

চিত্রাঙ্গদা। হায়, হায়, সে কি ফিরাইতে পারি! সেই
থরথর ব্যাকুলতা বীরহৃদয়ের
তৃষার্ত কম্পিত এক স্ফুলিঙ্গনিশ্বাসী
হোমাগ্নিশিখার মতো; সেই নয়নের
দৃষ্টি যেন অন্তরের বাহু হয়ে কেড়ে
নিতে আসিছে আমায়; উত্তপ্ত হৃদয়
ছুটিয়া আসিতে চাহে সর্বাঙ্গ টুটিয়া,
তাহার ক্রন্দনধ্বনি প্রতি অঙ্গে যেন
যায় শুনা। এ তৃষ্ণা কি ফিরাইতে পারি?

বসন্ত ও মদনের প্রবেশ

হে অনঙ্গদেব, এ কী রূপহুতাশনে
ঘিরেছ আমারে, দগ্ধ হই, দগ্ধ করে
মারি।

মদন। বলো, তন্বী, কালিকার বিবরণ।

মুক্ত পুষ্পশর মোর কোথা কী সাধিল
কাজ শুনিতে বাসনা।

চিত্রাঙ্গদা। কাল সন্ধ্যাবেলা
সরসীর তৃণপুঞ্জ তীরে পেতেছিনু
পুষ্পশয্যা, বসন্তের ঝরা ফুল দিয়ে।
শ্রান্ত কলেবরে শুয়েছিনু আনমনে,
রাখিয়া অলস শির বামবাহু-'পরে
ভাবিতেছিলাম গতদিবসের কথা।
শুনেছিনু যেই স্তুতি অর্জুনের মুখে
আনিতেছিলাম তাহা মনে ; দিবসের
সঞ্চিত অমৃত হতে বিন্দু বিন্দু লয়ে
করিতেছিলাম পান ; ভুলিতেছিলাম
পূর্ব ইতিহাস, গতজন্মকথাসম।
যেন আমি রাজকন্যা নহি ; যেন মোর
নাই পূর্বপর ; যেন আমি ধরাতলে
একদিনে উঠেছি ফুটিয়া, অরণ্যের
পিতৃমাতৃহীন ফুল ; শুধু এক বেলা
পরমায়ু, তারি মাঝে শুনে নিতে হবে
ভ্রমরগুঞ্জনগীতি, বনবনান্তের
আনন্দমর্মর ; পরে নীলাম্বর হতে
ধীরে নামাইয়া আঁখি, নুয়াইয়া গ্রীবা,
টুটিয়া লুটিয়া যাব বায়ুস্পর্শভরে
ক্রন্দনবিহীন, মাঝখানে ফুরাইবে
কুসুমকাহিনীখানি আদিঅন্তহারা।

বসন্ত। একটি প্রভাতে ফুটে অনন্ত জীবন,
হে সুন্দরী।

মদন। সংগীতে যেমন, ক্ষণিকের
তানে, গুঞ্জরি, কাঁদিয়া ওঠে অন্তহীন
কথা। তার পরে বলো।

চিত্রাঙ্গদা। ভাবিতে ভাবিতে
সর্বাঙ্গে হানিতেছিল ঘুমের হিল্লোল
দক্ষিণের বায়ু। সপ্তপর্ণশাখা হতে
ফুল্ল মালতীর লতা আলস্য-আবেশে
মোর গৌরতনু-'পরে পাঠাইতেছিল
নিঃশব্দ চুম্বন ; ফুলগুলি কেহ চুলে,
কেহ পদতলে, কেহ স্তনতটমূলে
বিছাইল আপনার মরণশয়ন।

অচেতনে গেল কত ক্ষণ। হেনকালে
ঘুমঘোরে কখন করিনু অনুভব
যেন কার মুগ্ধ নয়নের দৃষ্টিপাত

দশ অঙ্গুলির মতো পরশ করিছে
রভসলালসে মোর নিদ্রালস তনু।
চমকি উঠিনু জাগি।
দেখিনু, সন্ন্যাসী
পদপ্রান্তে নির্নিমেষ দাঁড়ায়ে রয়েছে
স্থিরপ্রতিমূর্তিসম। পূর্বাচল হতে
ধীরে ধীরে সরে এসে পশ্চিমে হেলিয়া
দ্বাদশীর শশী, সমস্ত হিমাংশুরাশি
দিয়াছে ঢালিয়া, স্খলিতবসন মোর
অম্লাননূতন শুভ্র সৌন্দর্যের 'পরে।
পুষ্পগন্ধে পূর্ণ তরুতল ; ঝিল্লিরবে
তন্দ্রামগ্ন নিশীথিনী ; স্বচ্ছ সরোবরে
অকম্পিত চন্দ্রকরচ্ছায়া ; সুপ্ত বায়ু ;
শিরে লয়ে জ্যোৎস্নালোকে মসৃণ চিক্কণ
রাশি রাশি অন্ধকার পল্লবের ভার
স্তম্ভিত অটবী। সেইমতো চিত্রার্পিত
দাঁড়াইয়া, দীর্ঘকায় বনস্পতিসম,
দণ্ডধারী ব্রহ্মচারী ছায়াসহচর।

প্রথম সে নিদ্রাভঙ্গে চারি দিক চেয়ে
মনে হল, কবে কোন্ বিস্মৃত প্রদোষে
জীবন ত্যজিয়া, স্বপ্নজন্ম লভিয়াছি
কোন্ এক অপরূপ মোহনিদ্রালোকে,
জনশূন্য ম্লানজ্যোৎস্না বৈতরণীতীরে।

দাঁড়ানু উঠিয়া। মিথ্যা শরম সংকোচ
খসিয়া পড়িল শ্লথ বসনের মতো
পদতলে। শুনিলাম, "প্রিয়ে, প্রিয়তমে!"
গম্ভীর আহ্বানে, মোর এক দেহমাঝে
জন্ম জন্ম শতজন্ম উঠিল জাগিয়া।
কহিলাম, "লহো লহো, যাহা কিছু আছে
সব লহো জীবনবল্লভ !" দুই বাহু
দিলাম বাড়ায়ে।— চন্দ্র অস্ত গেল বনে,
অন্ধকারে ঝাঁপিল মেদিনী। স্বর্গমর্ত
দেশকাল দুঃখসুখ জীবনমরণ
অচেতন হয়ে গেল অসহ্য পুলকে।

প্রভাতের প্রথম কিরণে, বিহঙ্গের
প্রথম সংগীতে, বাম করে দিয়া ভর
ধীরে ধীরে শয্যাতলে উঠিয়া বসিনু।
দেখিনু চাহিয়া, সুখসুপ্ত বীরবর ;

শ্রান্ত হাস্য লেগে আছে ওষ্ঠপ্রান্তে তাঁর
প্রভাতের চন্দ্রকলাসম, রজনীর
আনন্দের শীর্ণ অবশেষ। নিপতিত
উন্নত ললাটপটে অরুণের আভা;
মর্তলোকে যেন নব উদয়পর্বতে
নবকীর্তি-সূর্যোদয় পাইবে প্রকাশ।

উঠিনু শয়ন ছাড়ি নিশ্বাস ফেলিয়া;
মালতীর লতাজাল দিলাম নামায়ে
সাবধানে, রবিকর করি অন্তরাল
সুপ্তমুখ হতে। দেখিলাম চতুর্দিকে
সেই পূর্বপরিচিত প্রাচীন পৃথিবী।
আপনারে আরবার মনে পড়ে গেল,
ছুটিয়া পলায়ে এনু, নবপ্রভাতের
শেফালিবিকীর্ণতৃণ বনস্থলী দিয়ে,
আপনার ছায়াত্রস্তা হরিণীর মতো।
বিজনবিতানতলে বসি, করপুটে
মুখ আবরিয়া, কাঁদিবারে চাহিলাম,
এল না ক্রন্দন।

মদন। হায়, মানবনন্দিনী,
স্বর্গের সুখের দিন স্বহস্তে ভাঙিয়া
ধরণীর এক রাত্রি পূর্ণ করি তাহে
যত্নে ধরিলাম তব অধরসম্মুখে—
শচীর প্রসাদসুধা, রতির চুম্বিত,
নন্দনবনের গন্ধে মোদিত-মধুর—
তোমারে করানু পান, তবু এ ক্রন্দন!

চিত্রাঙ্গদা। কারে, দেব, করাইলে পান! কার তৃষা
মিটাইলে! সে চুম্বন, সে প্রেমসংগম
এখনো উঠিছে কাঁপি যে-অঙ্গ ব্যাপিয়া
বীণার ঝংকার-সম, সে তো মোর নহে!
বহুকাল সাধনায় এক দণ্ড শুধু
পাওয়া যায় প্রথম মিলন, সে মিলন
কে লইল লুটি, আমারে বঞ্চিত করি।
সে চিরদুর্লভ মিলনের সুখস্মৃতি
সঙ্গে করে ঝরে পড়ে যাবে অতিস্ফুট
পুষ্পদলসম, এ মায়ালাবণ্য মোর;
অন্তরের দরিদ্র রমণী, রিক্তদেহে
বসে রবে চিরদিনরাত। মীনকেতু,
কোন্ মহারাক্ষসীরে দিয়াছ বাঁধিয়া
অঙ্গসহচরী করি ছায়ার মতন—
কী অভিসম্পাত! চিরন্তন তৃষ্ণাতুর

লোলুপ ওষ্ঠের কাছে আসিল চুম্বন,
সে করিল পান। সেই প্রেমদৃষ্টিপাত—
এমনি আগ্রহপূর্ণ, যে-অঙ্গেতে পড়ে
সেথা যেন অঙ্কিত করিয়া রেখে যায়
বাসনার রাঙা চিহ্নরেখা— সেই দৃষ্টি
রবিরশ্মিসম, চিররাত্রিতাপসিনী-
কুমারী-হৃদয়পদ্মপানে ছুটে এল,
সে তাহারে লইল ভুলায়ে।

মদন। কল্য নিশি
ব্যর্থ গেছে তবে! শুধু, কূলের সম্মুখে
এসে আশার তরণী, গেছে ফিরে ফিরে
তরঙ্গ-আঘাতে?

চিত্রাঙ্গদা। কাল রাত্রে কিছু নাহি
মনে ছিল দেব। সুখস্বর্গ এত কাছে
দিয়েছিল ধরা, পেয়েছি কি না পেয়েছি
করি নি গণনা আত্মবিস্মরণসুখে।
আজ প্রাতে উঠে, নৈরাশ্যধিক্কারবেগে
অন্তরে অন্তরে টুটিছে হৃদয়। মনে
পড়িতেছে একে একে রজনীর কথা।
বিদ্যুৎবেদনাসহ হতেছে চেতনা
অন্তরে বাহিরে মোর হয়েছে সতিন,
আর তাহা নারিব ভুলিতে। সপত্নীরে
স্বহস্তে সাজায়ে সযতনে, প্রতিদিন
পাঠাইতে হবে, আমার আকাঙ্ক্ষা-তীর্থ
বাসরশয্যায়; অবিশ্রাম সঙ্গে রহি
প্রতিক্ষণ দেখিতে হইবে চক্ষু মেলি
তাহার আদর। ওগো, দেহের সোহাগে
অন্তর জ্বলিবে হিংসানলে, হেন শাপ
নরলোকে কে পেয়েছে আর। হে অতনু,
বর তব ফিরে লও।

মদন। যদি ফিরে লই,
ছলনার আবরণ খুলে ফেলে দিয়ে
কাল প্রাতে কোন্ লাজে দাঁড়াইবে আসি
পার্থের সম্মুখে, কুসুমপল্লবহীন
হেমন্তের হিমশীর্ণ লতা? প্রমোদের
প্রথম আস্বাদটুকু দিয়ে, মুখ হতে
সুধাপাত্র কেড়ে নিয়ে চূর্ণ কর যদি
ভূমিতলে, অকস্মাৎ সে আঘাতভরে
চমকিয়া, কী আক্রোশে হেরিবে তোমায়!

চিত্রাঙ্গদা। সেও ভালো। এই ছদ্মরূপিণীর চেয়ে
শ্রেষ্ঠ আমি শতগুণে। সেই আপনারে

করিব প্রকাশ ; ভালো যদি নাই লাগে,
ঘৃণাভরে চলে যান যদি, বুক ফেটে
মরি যদি আমি, তবু আমি— আমি রব।
সেও ভালো, ইন্দ্রসখা।

বসন্ত। শোনো মোর কথা।
ফুলের ফুরায় যবে ফুটিবার কাজ
তখন প্রকাশ পায় ফল। যথাকালে
আপনি ঝরিয়া প'ড়ে যাবে, তাপক্লিষ্ট
লঘু লাবণ্যের দল ; আপন গৌরবে
তখন বাহির হবে ; হেরিয়া তোমারে
নূতন সৌভাগ্য বলি মানিবে ফাল্গুনী।
যাও ফিরে যাও, বৎসে, যৌবন-উৎসবে।

৪

অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদা

চিত্রাঙ্গদা। কী দেখিছ বীর।

অর্জুন। দেখিতেছি পুষ্পবৃন্ত
ধরি, কোমল অঙ্গুলিগুলি রচিতেছে
মালা ; নিপুণতা চারুতায় দুই বোনে
মিলি, খেলা করিতেছে যেন সারাবেলা
চঞ্চল উল্লাসে, অঙ্গুলির আগে আগে।
দেখিতেছি আর ভাবিতেছি।

চিত্রাঙ্গদা। কী ভাবিছ।

অর্জুন। ভাবিতেছি অমনি সুন্দর ক'রে ধ'রে,
সরসিয়া ওই রাঙা পরশের রসে,
প্রবাস দিবসগুলি গেঁথে গেঁথে প্রিয়ে
অমনি রচিবে মালা ; মাথায় পরিয়া
অক্ষয় আনন্দ-হার গৃহে ফিরে যাব।

চিত্রাঙ্গদা। এ প্রেমের গৃহ আছে ?

অর্জুন। গৃহ নাই ?

চিত্রাঙ্গদা। নাই।
গৃহে নিয়ে যাবে ! বোলো না গৃহের কথা।
গৃহ চির বরষের ; নিত্য যাহা তাই
গৃহে নিয়ে যেয়ো। অরণ্যের ফুল যবে
শুকাইবে, গৃহে কোথা ফেলে দিবে তারে,
অনাদরে পাষাণের মাঝে ? তার চেয়ে
অরণ্যের অন্তঃপুরে নিত্য নিত্য যেথা
মরিছে অঙ্কুর, পড়িছে পল্লবরাশি,
ঝরিছে কেশর, খসিছে কুসুমদল,

ক্ষণিক জীবনগুলি ফুটিছে টুটিছে
প্রতি পলে পলে, দিনান্তে আমার খেলা
সাঙ্গ হলে ঝরিব সেথায়, কাননের
শত শত সমাপ্ত সুখের সাথে। কোনো
খেদ রহিবে না কারো মনে।

অর্জুন। এই শুধু ?

চিত্রাঙ্গদা। শুধু এই। বীরবর, তাহে দুঃখ কেন।
আলস্যের দিনে যাহা ভালো লেগেছিল,
আলস্যের দিনে তাহা ফেলো শেষ করে।
সুখেরে তাহার বেশি একদণ্ডকাল
বাঁধিয়া রাখিলে, সুখ দুঃখ হয়ে ওঠে।
যাহা আছে তাই লও, যতক্ষণ আছে
ততক্ষণ রাখো। কামনার প্রাতঃকালে
যতটুকু চেয়েছিলে, তৃপ্তির সন্ধ্যায়
তার বেশি আশা করিয়ো না।
দিন গেল।
এই মালা পরো গলে। শ্রান্ত মোর তনু
ওই তব বাহু-'পরে টেনে লও বীর।
সন্ধি হোক অধরের সুখসম্মিলনে
ক্ষান্ত করি মিথ্যা অসন্তোষ। বাহুবন্ধে
এসো বন্দী করি দোঁহে দোঁহা, প্রণয়ের
সুধাময় চিরপরাজয়ে।

অর্জুন। ওই শোনো
প্রিয়তমে, বনান্তের দূর লোকালয়ে
আরতির শান্তিশঙ্খ উঠিল বাজিয়া।

৫

মদন ও বসন্ত

মদন। আমি পঞ্চশর, সখা ; এক শরে হাসি,
অশ্রু এক শরে ; এক শরে আশা, অন্য
শরে ভয়, এক শরে বিরহ-মিলন-
আশা-ভয়-দুঃখ-সুখ এক নিমেষেই।

বসন্ত। শ্রান্ত আমি, ক্ষান্ত দাও সখা। হে অনঙ্গ,
সাঙ্গ করো রণরঙ্গ তব ; রাত্রিদিন
সচেতন থেকে, তব হুতাশনে আর
কতকাল করিব ব্যজন। মাঝে মাঝে
নিদ্রা আসে চোখে, নত হয়ে পড়ে পাখা,
ভস্মে ম্লান হয়ে আসে তপ্তদীপ্তিরাশি।
চমকিয়া জেগে, আবার নূতন শ্বাসে
জাগাইয়া তুলি তার নব-উজ্জ্বলতা।
এবার বিদায় দাও সখা।

মদন। জানি তুমি
অনন্ত অস্থির, চিরশিশু। চিরদিন
বন্ধনবিহীন হয়ে দ্যুলোকে ভূলোকে
করিতেছ খেলা। একান্ত যতনে যারে
তুলিছ সুন্দর করি বহুকাল ধরে
নিমেষে যেতেছ তারে ফেলি ধূলিতলে
পিছে না ফিরিয়া। আর বেশি দিন নাই;
আনন্দচঞ্চল দিনগুলি, লঘুবেগে,
তব পক্ষ-সমীরণে হুহু করি কোথা
যেতেছে উড়িয়া চ্যুত পল্লবের মতো।
হর্ষ-অচেতন বর্ষ শেষ হয়ে এল।

৬

অরণ্যে অর্জুন

অর্জুন। আমি যেন পাইয়াছি, প্রভাতে জাগিয়া
ঘুম হতে, স্বপ্নলব্ধ অমূল্য রতন।
রাখিবার স্থান তার নাহি এ ধরায়;
ধরে রাখে এমন কিরীট নাই কোথা,
গেঁথে রাখে হেন সূত্র নাই, ফেলে যাই
হেন নরাধম নহি; তারে লয়ে তাই
চিররাত্রি চিরদিন ক্ষত্রিয়ের বাহু
বদ্ধ হয়ে পড়ে আছে কর্তব্যবিহীন।

চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ

চিত্রাঙ্গদা। কী ভাবিছ।
অর্জুন। ভাবিতেছি মৃগয়ার কথা।
ওই দেখো বৃষ্টিধারা আসিয়াছে নেমে
পর্বতের 'পরে; অরণ্যেতে ঘনঘোর
ছায়া; নির্ঝরিণী উঠেছে দুরন্ত হয়ে,
কলগর্ব-উপহাসে তটের তর্জন
করিতেছে অবহেলা; মনে পড়িতেছে
এমনি বর্ষার দিনে পঞ্চ ভ্রাতা মিলে
চিত্রক-অরণ্যতলে যেতেম শিকারে।
সারাদিন রৌদ্রহীন স্নিগ্ধ অন্ধকারে
কাটিত উৎসাহে; গুরুগুরু মেঘমন্দ্রে
নৃত্য করি উঠিত হৃদয়; ঝরঝর
বৃষ্টিজলে, মুখর নির্ঝরকলোল্লাসে
সাবধান পদশব্দ শুনিতে পেত না
মৃগ; চিত্রব্যাঘ্র পঞ্চনখচিহ্নরেখা

রেখে যেত পথপঙ্ক পরে, দিয়ে যেত
আপনার গৃহের সন্ধান। কেকারবে
অরণ্য ধ্বনিত। শিকার সমাধা হলে
পঞ্চ সঙ্গী পণ করি মোরা সন্তরণে
হইতাম পার বর্ষার সৌভাগ্যগর্বে
স্ফীত তরঙ্গিণী। সেইমতো বাহিরিব
মৃগয়ায়, করিয়াছি মনে।

চিত্রাঙ্গদা। হে শিকারী,
যে-মৃগয়া আরম্ভ করেছ, আগে তাই
হোক শেষ। তবে কি জেনেছ স্থির
এই স্বর্ণ মায়ামৃগ তোমারে দিয়েছে
ধরা ? নহে, তাহা নহে। এ বন্য হরিণী
আপনি রাখিতে নারে আপনারে ধরি।
চকিতে ছুটিয়া যায় কে জানে কখন
স্বপনের মতো। ক্ষণিকের খেলা সহে,
চিরদিবসের পাশ বহিতে পারে না।
ওই চেয়ে দেখো, যেমন করিছে খেলা
বায়ুতে বৃষ্টিতে— শ্যাম বর্ষা হানিতেছে
নিমেষে সহস্র শর বায়ুপৃষ্ঠ-'পরে,
তবু সে দুরন্ত মৃগ মাতিয়া বেড়ায়
অক্ষত অজেয়— তোমাতে আমাতে, নাথ,
সেইমতো খেলা, আজি বরষার দিনে ;
চঞ্চলারে করিবে শিকার, প্রাণপণ
করি ; যত শর, যত অস্ত্র আছে তূণে
একাগ্র আগ্রহভরে করিবে বর্ষণ।
কভু অন্ধকার, কভু বা চকিত আলো
চমকিয়া হাসিয়া মিলায়, কভু স্নিগ্ধ
বৃষ্টিবরিষন, কভু দীপ্ত বজ্রজ্বালা।
মায়ামৃগী ছুটিয়া বেড়ায়, মেঘাচ্ছন্ন
জগতের মাঝে, বাধাহীন চিরদিন।

৭

মদন ও চিত্রাঙ্গদা

চিত্রাঙ্গদা। হে মন্মথ, কী জানি কী দিয়েছ মাখায়ে
সর্বদেহে মোর। তীব্র মদিরার মতো
রক্তসাথে মিশে, উন্মাদ করেছে মোরে।
আপনার গতিগর্বে মত্ত মৃগী আমি
ধাইতেছি মুক্তকেশে, উচ্ছ্বসিত বেশে
পৃথিবী লঙ্ঘিয়া। ধনুর্ধর ঘনশ্যাম
ব্যাধেরে আমার করিয়াছি পরিশ্রান্ত

আশাহতপ্রায়, ফিরাতেছি পথে পথে
বনে বনে তারে। নির্দয় বিজয়সুখে
হাসিতেছি কৌতুকের হাসি। এ খেলায়
ভঙ্গ দিতে হইতেছে ভয়— এক দণ্ড
স্থির হ'লে পাছে ক্রন্দনে হৃদয় ভ'রে
ফেটে পড়ে যায়।

মদন। থাক্। ভাঙিয়ো না খেলা।
এ খেলা আমার। ছুটুক ফুটুক বাণ,
টুটুক হৃদয়। আমার মৃগয়া আজি
অরণ্যের মাঝখানে নবীন বর্ষায়।
দাও দাও শ্রান্ত করে দাও, করো তারে
পদানত, বাঁধো তারে দৃঢ় পাশে ; দয়া
করিয়ো না, হাসিতে জর্জর করে দাও,
অমৃতে-বিষেতে-মাখা খর বাক্যবাণ
হানো বুকে। শিকারে দয়ার বিধি নাই।

৮

অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদা

অর্জুন। কোনো গৃহ নাই তব, প্রিয়ে, যে ভবনে
কাঁদিছে বিরহে তব প্রিয়পরিজন?
নিত্য স্নেহসেবা দিয়ে যে আনন্দপুরী
রেখেছিলে সুধামগ্ন করে, যেথাকার
প্রদীপ নিবায়ে দিয়ে এসেছ চলিয়া
অরণ্যের মাঝে? আপন শৈশবস্মৃতি
যেথায় কাঁদিতে যায় হেন স্থান নাই?

চিত্রাঙ্গদা। প্রশ্ন কেন। তবে কি আনন্দ মিটে গেছে।
যা দেখিছ তাই আমি, আর কিছু নাই
পরিচয়। প্রভাতে এই-যে দুলিতেছে
কিংশুকের একটি পল্লবপ্রান্তভাগে
একটি শিশির, এর কোনো নামধাম
আছে? এর কি শুধায় কেহ পরিচয়।
তুমি যারে ভালোবাসিয়াছ, সে এমনি
শিশিরের কণা, নামধামহীন।

অর্জুন। কিছু
তার নাই কি বন্ধন পৃথিবীতে। এক
বিন্দু স্বর্গ শুধু ভূমিতলে ভুলে পড়ে
গেছে?

চিত্রাঙ্গদা। তাই বটে। শুধু নিমেষের তরে
দিয়েছে আপন উজ্জ্বলতা অরণ্যের
কুসুমেরে।

অর্জুন। তাই সদা হারাই-হারাই
করে প্রাণ ; তৃপ্তি নাহি পাই, শান্তি নাহি
মানি। সুদুর্লভে, আরো কাছাকাছি এসো।
নামধামগোত্রগৃহ-বাক্যদেহমনে
সহস্র বন্ধনপাশে ধরা দাও প্রিয়ে।
চারি পার্শ্ব হতে ঘেরি পরশি তোমায়,
নির্ভয় নির্ভরে করি বাস। নাম নাই ?
তবে কোন্ প্রেমমন্ত্রে জপিব তোমারে
হৃদয়মন্দিরমাঝে ? গোত্র নাই ? তবে
কী মৃণালে এ কমল ধরিয়া রাখিব ?

চিত্রাঙ্গদা। নাই, নাই, নাই। যারে বাঁধিবারে চাও
কখনো সে বন্ধন জানে নি। সে কেবল
মেঘের সুবর্ণছটা, গন্ধ কুসুমের,
তরঙ্গের গতি।

অর্জুন। তাহারে যে ভালোবাসে
অভাগা সে। প্রিয়ে, দিয়ো না প্রেমের হাতে
আকাশকুসুম। বুকে রাখিবার ধন
দাও তারে, সুখে দুঃখে সুদিনে দুর্দিনে।

চিত্রাঙ্গদা। এখনো যে বর্ষ যায় নাই, শ্রান্তি এরি
মাঝে ? হায় হায়, এখন বুঝিনু পুষ্প
স্বল্পপরমায়ু দেবতার আশীর্বাদে।
গত বসন্তের যত মৃতপুষ্পসাথে
ঝরিয়া পড়িত যদি এ মোহন তনু
আদরে মরিত তবে। বেশি দিন নহে,
পার্থ। যে কদিন আছে, আশা মিটাইয়া
কুতূহলে, আনন্দের মধুটুকু তার
নিঃশেষ করিয়া করো পান। এর পরে
বার বার আসিয়ো না স্মৃতির কুহকে
ফিরে ফিরে, গত সায়াহ্নের চ্যুতবৃন্ত
মাধবীর আশে তৃষিত ভৃঙ্গের মতো।

৯

বনচরগণ ও অর্জুন

বনচর। হায় হায়, কে রক্ষা করিবে।

অর্জুন। কী হয়েছে।

বনচর। উত্তর-পর্বত হতে আসিছে ছুটিয়া
দস্যুদল, বরষার পার্বত্য বন্যার
মতো বেগে, বিনাশ করিতে লোকালয়।

অর্জুন। এ রাজ্যে রক্ষক কেহ নাই ?

বনচর। রাজকন্যা

চিত্রাঙ্গদা আছিলেন দুষ্টের দমন ;
তাঁর ভয়ে রাজ্যে নাহি ছিল কোনো ভয়,
যমভয় ছাড়া। শুনেছি গেছেন তিনি
তীর্থপর্যটনে, অজ্ঞাত ভ্রমণব্রত।

অর্জুন। এ রাজ্যের রক্ষক রমণী ?

বনচর। এক দেহে
তিনি পিতামাতা অনুরক্ত প্রজাদের।
স্নেহে তিনি রাজমাতা, বীর্যে যুবরাজ।

[প্রস্থান

চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ

চিত্রাঙ্গদা। কী ভাবিছ নাথ।

অর্জুন। রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা
কেমন না জানি তাই ভাবিতেছি মনে।
প্রতিদিন শুনিতেছি শত মুখ হতে
তারি কথা, নব নব অপূর্ব কাহিনী।

চিত্রাঙ্গদা। কুৎসিত, কুরূপ। এমন বঙ্কিম ভুরু
নাই তার— এমন নিবিড় কৃষ্ণতারা।
কঠিন সবল বাহু বিঁধিতে শিখেছে
লক্ষ্য, বাঁধিতে পারে না বীরতনু হেন
সুকোমল নাগপাশে।

অর্জুন। কিন্তু শুনিয়াছি,
স্নেহে নারী, বীর্যে সে পুরুষ।

চিত্রাঙ্গদা। ছি ছি, সেই
তার মন্দভাগ্য। নারী যদি নারী হয়
শুধু, শুধু ধরণীর শোভা, শুধু আলো,
শুধু ভালোবাসা— শুধু সুমধুর ছলে
শতরূপ ভঙ্গিমায় পলকে পলকে
লুটায়ে জড়ায়ে, বেঁকে বেঁধে, হেসে কেঁদে,
সেবায় সোহাগে ছেয়ে চেয়ে থাকে সদা—
তবে তার সার্থক জনম। কী হইবে
কর্মকীর্তি, বীর্যবল, শিক্ষাদীক্ষা তার।
হে পৌরব, কাল যদি দেখিতে তাহারে
এই বনপথপার্শ্বে, এই পূর্ণাতীরে,
ওই দেবালয়মাঝে— হেসে চলে যেতে।
হায় হায়, আজ এত হয়েছে অরুচি
নারীর সৌন্দর্যে, নারীতে খুঁজিতে চাও
পৌরুষের স্বাদ !
এসো নাথ, ওই দেখো
গাঢ়চ্ছায়া শৈলগুহামুখে বিছাইয়া
রাখিয়াছি আমাদের মধ্যাহ্নশয়ন

কচি কচি পীতশ্যাম কিশলয় তুলি
আর্দ্র করি ঝরনার শীকরনিকরে।
গভীর পল্লবছায়ে বসি ক্লান্তকণ্ঠে
কাঁদিছে কপোত, "বেলা যায়" "বেলা যায়"
বলি। কুলু কুলু বহিয়া চলেছে নদী
ছায়াতল দিয়া। শিলাখণ্ডে স্তরে স্তরে
সরস সুস্নিগ্ধ সিক্ত শ্যামল শৈবাল
নয়ন চুম্বন করে কোমল অধরে।
এসো, নাথ, বিরল বিরামে।

অর্জুন। আজ নহে
প্রিয়ে।

চিত্রাঙ্গদা। কেন নাথ।

অর্জুন। শুনিয়াছি দস্যুদল
আসিছে নাশিতে জনপদ। ভীত জনে
কবিব রক্ষণ।

চিত্রাঙ্গদা। কোনো ভয় নাই প্রভু।
তীর্থযাত্রাকালে, রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা
স্থাপন করিয়া গেছে সতর্ক প্রহরী
দিকে দিকে; বিপদের যত পথ ছিল
বন্ধ করে দিয়ে গেছে বহু তর্ক করি।

অর্জুন। তবু আজ্ঞা করো প্রিয়ে, স্বল্পকালতরে
করে আসি কর্তব্যসন্ধান। বহুদিন
রয়েছে অলস হয়ে ক্ষত্রিয়ের বাহু।
সুমধ্যমে, ক্ষীণকীর্তি এই ভুজদ্বয়
পুনর্বার নবীন গৌরবে ভরি আনি
তোমার মস্তকতলে যতনে রাখিব,
হবে তব যোগ্য উপাধান।

চিত্রাঙ্গদা। যদি আমি
নাই যেতে দিই? যদি বেঁধে রাখি? ছিন্ন
করে যাবে? তাই যাও। কিন্তু মনে রেখো
ছিন্ন লতা জোড়া নাহি লাগে। যদি তৃপ্তি
হয়ে থাকে, তবে যাও, করিব না মানা;
যদি তৃপ্তি নাহি হয়ে থাকে, তবে মনে
রেখো, চঞ্চলা সুখের লক্ষ্মী কারো তরে
বসে নাহি থাকে; সে কাহারো সেবাদাসী
নহে; তার সেবা করে নরনারী, অতি
ভয়ে ভয়ে, নিশিদিন রাখে চোখে চোখে
যত দিন প্রসন্ন সে থাকে। রেখে যাবে
যারে সুখের কলিকা, কর্মক্ষেত্র হতে
ফিরে এসে সন্ধ্যাকালে দেখিবে তাহার
দলগুলি ফুটে ঝরে পড়ে গেছে ভূমে;

সব কর্ম ব্যর্থ মনে হবে। চিরদিন
রহিবে জীবনমাঝে জীবন্ত অতৃপ্তি
ক্ষুধাতুরা। এসো নাথ, বসো। কেন আজি
এত অন্যমন। কার কথা ভাবিতেছ।
চিত্রাঙ্গদা ? আজ তার এত ভাগ্য কেন।

অর্জুন। ভ'বিতেছি বীরাঙ্গনা কিসের লাগিয়া
ধরেছে দুষ্কর ব্রত। কী অভাব তার।

চিত্রাঙ্গদা। কী অভাব তার ? কী ছিল সে অভাগীর ?
বীর্য তার অভ্রভেদী দুর্গ সুদুর্গম
রেখেছিল চতুর্দিকে অবরুদ্ধ করি
রুদ্যমান রমণীহৃদয়। রমণী তো
সহজেই অন্তরবাসিনী ; সংগোপনে
থাকে আপনাতে ; কে তারে দেখিতে পায়,
হৃদয়ের প্রতিবিম্ব দেহের শোভায়
প্রকাশ না পায় যদি। কী অভাব তার !
অরুণলাবণ্যলেখাচিরনির্বাপিত
উষার মতন, যে-রমণী আপনার
শতস্তর তিমিরের তলে বসে থাকে
বীর্যশৈলশৃঙ্গ-'পরে নিত্য-একাকিনী,
কী অভাব তার ! থাক্, থাক্ তার কথা ;
পুরুষের শ্রুতিসুমধুর নহে তার
ইতিহাস।

অর্জুন। বলো বলো। শ্রবণলালসা
ক্রমশ বাড়িছে মোর। হৃদয় তাহার
করিতেছি অনুভব হৃদয়ের মাঝে।
যেন পান্থ আমি, প্রবেশ করেছি গিয়া
কোন্ অপরূপ দেশে অর্ধরজনীতে।
নদীগিরিবনভূমি সুপ্তিনিমগন,
শুভ্রসৌধকিরীটিনী উদার নগরী
ছায়াসম অর্ধস্ফুট দেখা যায়, শুনা
যায় সাগরগর্জন ; প্রভাতপ্রকাশে
বিচিত্র বিস্ময়ে যেন ফুটিবে চৌদিক ;
প্রতীক্ষা করিয়া আছি উৎসুক হৃদয়ে
তারি তরে। বলো বলো, শুনি তার কথা।

চিত্রাঙ্গদা। কী আর শুনিবে।

অর্জুন। দেখিতে পেতেছি তারে—
বাম করে অশ্বরশ্মি ধরি অবহেলে,
দক্ষিণেতে ধনুঃশর, হৃষ্ট নগরের
বিজয়লক্ষ্মীর মতো আর্ত প্রজাগণে
করিছেন বরাভয় দান। দরিদ্রের
সংকীর্ণ দুয়ারে, রাজার মহিমা যেথা

নত হয় প্রবেশ করিতে, মাতৃরূপ
ধরি সেথা করিছেন দয়া বিতরণ।
সিংহিনীর মতো চারি দিকে আপনার
বৎসগণে রয়েছেন আগলিয়া, শত্রু
কেহ কাছে নাহি আসে ডরে। ফিরিছেন
মুক্তলজ্জা ভয়হীনা প্রসন্নহাসিনী,
বীর্যসিংহ-'পরে চড়ি জগদ্ধাত্রী দয়া।
রমণীর কমনীয় দুই বাহু-'পরে
স্বাধীন সে অসংকোচ বল, ধিক থাক্
তার কাছে রুনুঝুনু কঙ্কণকিঙ্কিণী।
অয়ি বরারোহে, বহুদিন কর্মহীন
এ পরান মোর, উঠিছে অশান্ত হয়ে
দীর্ঘশীতসুপ্তোত্থিত ভুজঙ্গের মতো।
এসো এসো, দোঁহে দুই মত্ত অশ্ব লয়ে
পাশাপাশি ছুটে চলে যাই, মহাবেগে
দুই দীপ্ত জ্যোতিষ্কের মতো। বাহিরিয়া
যাই, এই রুদ্ধ সমীরণ, এই তিক্ত
পুষ্পগন্ধমদিরায় নিদ্রাঘনঘোর
অরণ্যের অন্ধগর্ভ হতে।

চিত্রাঙ্গদা। হে কৌন্তেয়,
যদি এ লালিত্য, এই কোমল ভীরুতা,
স্পর্শক্লেশসকাতর শিরীষপেলব
এই রূপ, ছিন্ন করে ঘৃণাভরে ফেলি
পদতলে, পরের বসনখণ্ডসম—
সে ক্ষতি কি সহিতে পারিবে। কামিনীর
ছলাকলা মায়ামন্ত্র দূর করে দিয়ে
উঠিয়া দাঁড়াই যদি সরল উন্নত
বীর্যমন্ত অন্তরের বলে, পর্বতের
তেজস্বী তরুণ তরুসম, বায়ুভরে
আনম্র সুন্দর, কিন্তু লতিকার মতো
নহে নিত্য কুণ্ঠিত লুণ্ঠিত— সে কি ভালো
লাগিবে পুরুষ-চোখে। থাক্ থাক্, তার
চেয়ে এই ভালো। আপন যৌবনখানি
দুদিনের বহুমূল্য ধন, সাজাইয়া
সযতনে, পথ চেয়ে বসিয়া রহিব ;
অবসরে আসিবে যখন, আপনার
সুধাটুকু দেহপাত্রে আকর্ণ পুরিয়া
করাইব পান ; সুখস্বাদে শ্রান্তি হলে
চলে যাবে কর্মের সন্ধানে ; পুরাতন
হলে, যেথা স্থান দিবে, সেথায় রহিব
পার্শ্বে পড়ি। যামিনীর নর্মসহচরী

যদি হয় দিবসের কর্মসহচরী,
সতত প্রস্তুত থাকে বামহস্তসম
দক্ষিণহস্তের অনুচর, সে কি ভালো
লাগিবে বীরের প্রাণে।

অর্জুন। বুঝিতে পারি নে
আমি রহস্য তোমার। এতদিন আছি,
তবু যেন পাই নি সন্ধান। তুমি যেন
বঞ্চিত করিছ মোরে গুপ্ত থেকে সদা;
তুমি যেন দেবীর মতন, প্রতিমার
অন্তরালে থেকে আমারে করিছ দান
অমূল্য চুম্বনরত্ন, আলিঙ্গনসুধা;
নিজে কিছু চাহ না, লহ না। অঙ্গহীন
ছন্দোহীন প্রেম, প্রতিক্ষণে পরিতাপ
জাগায় অন্তরে। তেজস্বিনী, পরিচয়
পাই তব মাঝে মাঝে কথায় কথায়।
তার কাছে এ সৌন্দর্যরাশি মনে হয়
মৃত্তিকার মূর্তি শুধু, নিপুণচিত্রিত
শিল্পযবনিকা। মাঝে মাঝে মনে হয়
তোমারে তোমার রূপ ধারণ করিতে
পারিছে না আর, কাঁপিতেছে টলমল
করি। নিত্যদীপ্ত হাসির অন্তরে
ভরা অশ্রু করিতেছে বাস, মাঝে মাঝে
ছলছল করে ওঠে, মুহূর্তের মাঝে
ফাটিয়া পড়িবে যেন আবরণ টুটি।
সাধকের কাছে, প্রথমেতে ভ্রান্তি আসে
মনোহর মায়াকায়া ধরি; তার পরে
সত্য দেখা দেয়, ভূষণবিহীন রূপে
আলো করি অন্তর বাহির। সেই সত্য
কোথা আছে তোমার মাঝারে, দাও তারে।
আমার যে সত্য তাই লও। শ্রান্তিহীন
সে মিলন চিরদিবসের।— অশ্রু কেন
প্রিয়ে! বাহুতে লুকায়ে মুখ কেন এই
ব্যাকুলতা! বেদনা দিয়েছি প্রিয়তমে?
তবে থাক্, তবে থাক্। ওই মনোহর
রূপ পুণ্যফল মোর। এই-যে সংগীত
শোনা যায় মাঝে মাঝে বসন্তসমীরে
এ যৌবনযমুনার পরপার হতে,
এই মোর বহুভাগ্য। এ বেদনা মোর
সুখের অধিক সুখ, আশার অধিক
আশা, হৃদয়ের চেয়ে বড়ো, তাই তারে
হৃদয়ের ব্যথা বলে মনে হয় প্রিয়ে।

১০

মদন, বসন্ত ও চিত্রাঙ্গদা

মদন। শেষ রাত্রি আজি।

বসন্ত। আজ রাত্রি-অবসানে
তব অঙ্গশোভা ফিরে যাবে বসন্তের
অক্ষয় ভাণ্ডারে। পার্থের চুম্বনস্মৃতি
ভুলে গিয়ে তব ওষ্ঠরাগ, দুটি নব
কিশলয়ে মঞ্জরি উঠিবে লতিকায়।
অঙ্গের বরন তব, শত শ্বেত ফুলে
ধরিয়া নূতন তনু, গতজন্মকথা
ত্যজিবে স্বপ্নের মতো নব জাগরণে।

চিত্রাঙ্গদা। হে অনঙ্গ, হে বসন্ত, আজ রাত্রে তবে
এ মুমূর্ষু রূপ মোর, শেষ রজনীতে,
অন্তিম শিখার মতো শ্রান্ত প্রদীপের,
আচম্বিতে উঠুক উজ্জ্বলতম হয়ে।

মদন। তবে তাই হোক। সখা, দক্ষিণ পবন
দাও তবে নিশ্বসিয়া প্রাণপূর্ণ বেগে।
অঙ্গে অঙ্গে উঠুক উচ্ছ্বসি পুনর্বার
নবোল্লাসে যৌবনের ক্লান্ত মন্দ স্রোত।
আমি মোর পঞ্চ পুষ্পশরে, নিশীথের
নিদ্রাভেদ করি, ভোগবতী তটিনীর
তরঙ্গ-উচ্ছ্বাসে প্লাবিত করিয়া দিব
বাহুপাশে বদ্ধ দুটি প্রেমিকের তনু।

১১

শেষ রাত্রি

অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদা

চিত্রাঙ্গদা। প্রভু, মিটিয়াছে সাধ? এই সুললিত
সুগঠিত নবনীকোমল সৌন্দর্যের
যত গন্ধ যত মধু ছিল সকলি কি
করিয়াছ পান। আর-কিছু বাকি আছে?
আর-কিছু চাও? আমার যা-কিছু ছিল
সব হয়ে গেছে শেষ? হয় নাই প্রভু!
ভালো হোক, মন্দ হোক, আরো কিছু বাকি
আছে, সে আজিকে দিব।

প্রিয়তম ভালো
লেগেছিল ব'লে করেছিনু নিবেদন

এ সৌন্দর্যপুষ্পরাশি চরণকমলে—
নন্দনকানন হতে তুলে নিয়ে এসে
বহু সাধনায়। যদি সাঙ্গ হল পূজা
তবে আজ্ঞা করো প্রভু, নির্মাল্যের ডালি
ফেলে দিই মন্দিরবাহিরে। এইবার
প্রসন্ন নয়নে চাও সেবিকার পানে।
যে ফুলে করেছি পূজা, নহি আমি কভু
সে ফুলের মতো, প্রভু, এত সুমধুর,
এত সুকোমল, এত সম্পূর্ণ সুন্দর।
দোষ আছে, গুণ আছে, পাপ আছে, পুণ্য
আছে; কত দৈন্য আছে; আছে আজন্মের
কত অতৃপ্ত তিয়াষা। সংসারপথের
পান্থ, ধূলিলিপ্তবাস বিক্ষতচরণ;
কোথা পাব কুসুমলাবণ্য, দু দণ্ডের
জীবনের অকলঙ্ক শোভা। কিন্তু আছে
অক্ষয় অমর এক রমণী-হৃদয়।
দুঃখ সুখ আশা ভয় লজ্জা দুর্বলতা—
ধূলিময়ী ধরণীর কোলের সন্তান,
তার কত ভ্রান্তি, তার কত ব্যথা, তার
কত ভালোবাসা, মিশ্রিত জড়িত হয়ে
আছে একসাথে। আছে এক সীমাহীন
অপূর্ণতা, অনন্ত মহৎ। কুসুমের
সৌরভ মিলায়ে থাকে যদি, এইবার
সেই জন্মজন্মান্তের সেবিকার পানে
চাও।

সূর্যোদয়

অবগুণ্ঠন খুলিয়া

আমি চিত্রাঙ্গদা। রাজেন্দ্রনন্দিনী।
হয়তো পড়িবে মনে, সেই একদিন
সেই সরোবরতীরে শিবালয়ে দেখা
দিয়েছিল এক নারী, বহু আভরণে
ভারাক্রান্ত করি তার রূপহীন তনু।
কী জানি কী বলেছিল নির্লজ্জ মুখরা,
পুরুষেরে করেছিল পুরুষ-প্রথায়
আরাধনা, প্রত্যাখ্যান করেছিলে তারে।
ভালোই করেছ। সামান্য সে নারীরূপে
গ্রহণ করিতে যদি তারে, অনুতাপ
বিঁধিত তাহার বুকে আমরণ কাল।
প্রভু, আমি সেই নারী। তবু আমি সেই
নারী নহি; সে আমার হীন ছদ্মবেশ।

তার পরে পেয়েছিনু বসন্তের বরে
বর্ষকাল অপরূপ রূপ। দিয়েছিনু
শ্রান্ত করি বীরের হৃদয়, ছলনার
ভারে। সেও আমি নহি।
আমি চিত্রাঙ্গদা।
দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী।
পূজা করি রাখিবে মাথায়, সেও আমি
নই; অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে
পিছে, সেও আমি নহি। যদি পার্শ্বে রাখ
মোরে সংকটের পথে, দুরূহ চিন্তার
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর
কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে,
যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী,
আমার পাইবে তবে পরিচয়। গর্ভে
আমি ধরেছি যে সন্তান তোমার, যদি
পুত্র হয়, আশৈশব বীরশিক্ষা দিয়ে
দ্বিতীয় অর্জুন করি তারে একদিন
পাঠাইয়া দিব যবে পিতার চরণে—
তখন জানিবে মোরে, প্রিয়তম।
আজ
শুধু নিবেদি চরণে, আমি চিত্রাঙ্গদা,
রাজেন্দ্রনন্দিনী।

অর্জুন। প্রিয়ে আজ ধন্য আমি।

কটক
২৮ ভাদ্র ১২৯৮

গোড়ায় গলদ

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন
প্রিয়বন্ধুবরেষু

নাটকের পাত্রগণ

বিনোদবিহারী	
চন্দ্রকান্ত	
নলিনাক্ষ	
নিমাই	
শ্রীপতি	
ভূপতি	
নিবারণ	চন্দ্রকান্তের প্রতিবেশী
শিবচরণ	নিমাইয়ের পিতা
কমলমুখী	নিবারণের পালিতা কন্যা
ইন্দুমতী	নিবারণের কন্যা
ক্ষান্তমণি	চন্দ্রকান্তের স্ত্রী

গোড়ায় গলদ

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

চন্দ্রকান্তের বাসা

বিনোদবিহারী, নলিনাক্ষ ও চন্দ্রকান্ত

চন্দ্রকান্ত। আচ্ছা, বিনদা, সত্যি বলো-না ভাই, জগৎটা কি বেবাক শূন্য মনে হয়।

নলিনাক্ষ। তুমি একেবারে আকাশ থেকে পড়লে যে! তোমার হয় না নাকি! আমাদের তো হয়।

চন্দ্রকান্ত। তবু কী রকমটা হয় শুনিই-না।

নলিনাক্ষ। বুঝতে পারছ না? সমস্ত কেমন যেন শূন্য— যেন ফাঁকা— যেন মরুভূমি—

চন্দ্রকান্ত। যেন নেড়া মাথার মতো। আমারও বোধ করি ঐরকমই মনে হয় কিন্তু ঠিক বুঝতে পারি নে— আচ্ছা, বিনদা, জগৎটা যদি মরুভূমিই হল—

বিনোদবিহারী। বড্ড বেজার করলে যে হে! কে বলছে মরুভূমি! তা হলে পৃথিবীসুদ্ধ এতগুলো গোরু চরে বেড়াচ্ছে কোন্‌খানে। জগতে গোরুর খাবার ঘাসও যথেষ্ট আছে এবং ঘাস খাবার গোরুরও অভাব নেই।

চন্দ্রকান্ত। দিব্যি গুছিয়ে বলেছ বিনু। ঐ যা বললে ভাই। সবাই কেবল চিবোচ্ছে আর জাওর কাটছে আর ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে— কিছু একটা হচ্ছে না—

বিনোদবিহারী। কিছু না, কিছু না। দেখো-না, দুটি ব্রাহ্মণ এবং একটি কায়স্থ-কুলতিলক বসে বসে খোপের মধ্যে দুপুরবেলাকার পায়রার মতো সমস্তক্ষণ কেবল বক্‌বক্‌ করছি, তার না আছে অর্থ, না আছে তাৎপর্য।

নলিনাক্ষ। ঠিক। না আছে অর্থ, না আছে কিছু।

চন্দ্রকান্ত। কিন্তু সত্যি কথা বলছি, ভাই নলিন, রাগ করিস নে, এ-সব কথা বিনদার মুখে যেমন মানায় তোর মুখে তেমন মানায় না। তুই কেমন ঠিক সুরটি লাগাতে পারিস নে। বিনু যখন বলে জগৎটা শূন্য— তখন দেখতে দেখতে চোখের সামনে সমস্ত পৃথিবীটা যেন একটা ঘষা পয়সার মতো চেহারা বের করে।

বিনোদবিহারী। চন্দ্র, তোমার কাছে কথা কয়ে সুখ আছে, তার মধ্যে দুটো নতুন সুর লাগাতে পার। নইলে নিজের প্রতিধ্বনি শুনে শুনে নিজের উপর বিরক্ত ধরে গেল।

নলিনাক্ষ। ঠিক বলেছ। বিরক্ত ধরে গেছে। প্রাণের কথা কেউ বুঝতে পারে না—

বিনোদবিহারী। নলিন, সকালবেলাটায় আর তোমার প্রাণের কথা তুলো না— একটু চুপ করো তো দাদা। আজ রবিবারটা আছে, আজ একটা-কিছু করা যাক, যাতে মনটা বেশ তাজা হয়ে ধড়ফড়িয়ে ওঠে।

চন্দ্রকান্ত। ঠিক বলেছ। ওষুধের শিশির মতো নিদেন হপ্তার মধ্যে একটা দিন নিজেকে খানিকটা ঝাঁকানি দিয়ে নেওয়া আবশ্যক— নইলে শরীরে যা-কিছু পদার্থ ছিল সমস্তই তলায় থিতিয়ে গেল। কী করা যায় বলো দেখি। চলো, গড়ের মাঠে বেড়িয়ে আসা যাক।

বিনোদবিহারী। হাঃ— গড়ের মাঠে কে যায়। তুমিও যেমন।

চন্দ্রকান্ত। তবে ক্লাবে চলো।

বিনোদবিহারী। রাম! কেবল কতকগুলো মনুষ্যমূর্তি দেখে আসা, তাও আবার প্রায়ই চেনা লোক।

চন্দ্রকান্ত। তবে এক কাজ করা যাক। চলো আমরা বোষ্টম ভিক্ষুক সেজে বেরিয়ে পড়ি— দেখি তিনটে প্রাণী সমস্ত দিন শহরে কত ভিক্ষে কুড়োতে পারি।

বিনোদবিহারী। কথাটা মন্দ নয়, কিন্তু বড়ো ল্যাঠা।

চন্দ্রকান্ত। তা হলে আর-একটা প্ল্যান মাথায় এসেছে—

বিনোদবিহারী। কী বলো দেখি।

চন্দ্রকান্ত। যেমন আছি এমনিই বসে থাকি।

বিনোদবিহারী। ঠিক বলেছ। সেটা এতক্ষণ আমার মাথায় আসে নি। আজ তবে এমনি বসে থাকাই যাক। দেখো দেখি চন্দর, একে কি বেঁচে থাকা বলে। সোমবার থেকে শনিবার পর্যন্ত কেবল কালেজ যাচ্ছি, আইন পড়ছি, আর সেই পটলডাঙার বাসার মধ্যে পড়ে পড়ে ট্রামের ঘড়ঘড় শুনছি। হপ্তার মধ্যে একটার বেশি রবিবার আসে না, তাও কিসে খরচ করব ভেবে পাওয়া যায় না।

চন্দ্রকান্ত। আচ্ছা বর্ষার দিনে যেমন চালকড়াইভাজা তেমনি রবিবার দিনে কী হলে ঠিক হত বলো দেখি বিনদা।

বিনোদবিহারী। তবে সত্যি কথা বলব। অ্যাঁ! একটি রাঙা পাড়, একটু মিষ্টি হাসি, দুটো নরম কথা— তার থেকে ক্রমে দীর্ঘনিশ্বাস, ক্রমে অশ্রুজল, ক্রমে ছটফটানি—

চন্দ্রকান্ত। এমন-কি, আত্মহত্যা পর্যন্ত—

বিনোদবিহারী। হাঁ— এই হলে জীবনটার একটুখানি স্বাদ পাওয়া যায়। ভাই, ঐ কালো চোখ, টুকটুকে ঠোঁট, মিষ্টিমুখের সঙ্গে মাঝে মাঝে মিশল না হলে এই রোজ রোজ নিরিমিষ দিনগুলো আর তো মুখে রোচে না। কেবল এই শুকনো বইয়ের বোঝা টেনে এই পঁচিশটা বৎসর কী করে কাটল বলো দেখি।

চন্দ্রকান্ত। এর চেয়ে সাধের মানবজন্ম একেবারেই ঘুচিয়ে দিয়ে যদি কোনো গতিকে একটা ইংরেজ নভেলিস্টের মাথার মধ্যে সেঁধোতে পারা যেত, বেশ দিব্যি সোনার জলে বাঁধানো একখানি তকতকে বইয়ের মধ্যে ছাপা হয়ে বেরোতুম— কখনো ঈডিথ, কখনো এলেন, কখনো লিওনোরার সঙ্গে বেশ ভালো ইংরিজিতে প্রেমালাপ করছি— মেয়ের বাপ বিয়ে দিতে চাচ্ছে না, মেয়ে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে মরতে চাচ্ছে, শেষকালে নভেলের শেষ পাতায় বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দে দুটিতে মিলে ঘরকরনা করছি— হুহু করে এডিশনের পর এডিশন উঠে যাচ্ছে আর পাঁচ-পাঁচ শিলিঙে বিক্রি হচ্ছি।

বিনোদবিহারী। চমৎকার! কত মেরি-ফ্যানি-ল্যুসির হাতে হাতে কোলে কোলে দিনপাত করা যাচ্ছে। যে-সব নীল চোখ কোনো জন্মে আমাদের প্রতি কটাক্ষপাতও করত না তারা হুহু শব্দে আমাদের জন্য অশ্রুবর্ষণ করছে। তা না হয়ে জন্মালুম বাঙালির ঘরে— কেবল একুইটি আর এভিডেন্স অ্যাক্ট মুখস্থ করে করেই দুর্লভ জীবনটা কাটালুম।

নলিনাক্ষ। চললুম ভাই বিনোদ। আমি থাকলে তোমার ভালো লাগে না, তোমাদের গল্প জমে না— চন্দর ছাড়া আর কারও সঙ্গে তোমার প্রাণের কথা হয় না।— "ভালোবাসা ভুলে যাব, মনেরে বুঝাইব, পৃথিবীতে আর যেন কেউ কারেও ভালোবাসে না।"

[দ্রুত প্রস্থান

বিনোদবিহারী। এই দেখো রোম্যান্সের কথা হচ্ছিল, এই এক রোম্যান্স! পোড়া অদৃষ্ট এমনি, ভালোবাসা বল যা বল সবই জুটল, কেবল বিধির বিপাকে একটু ব্যাকরণের ভুল হয়েই সব মাটি করে দিয়েছে।

চন্দ্রকান্ত। কেবল একটা দীর্ঘ ঈ'র জন্যে। নলিনাক্ষ না হয়ে যদি নলিনাক্ষী হত। হায় হায়! কিন্তু তা হলে এই মিনসে চন্দ্রবিন্দুটাকে লোপ করে দেবার জায়গা পেতে না।

নিমাইয়ের প্রবেশ

নিমাই। কী হচ্ছে।

বিনোদবিহারী। যা রোজ হয় তাই হচ্ছে।

নিমাই। সেন্টিমেন্টাল আলোচনা! তোমাদের আচ্ছা এক কাজ হয়েছে যা হোক। ওটা একটা শারীরিক ব্যামো তা জান? বেশ ভালো করে আহারটি করলে এবং সেটি হজম করতে পারলে কবিত্বরোগ কাছে ঘেঁষতে পারে না। আর আধপেটা করে খাও, আর অম্বলের ব্যামোটি বাধাও, আর অমনি কোথায় আকাশের চাঁদ, কোথায় দক্ষিণের বাতাস, কোথায় কোকিল পক্ষীর ডাক, এই নিয়ে ভারি মাথাব্যথা পড়ে যায়— জানালার কাছে বসে বসে মনে হয় কী যেন চাই— যা চাও সেটি যে হচ্ছে বাইকার্বোনেট অফ সোডা তা কিছুতেই বুঝতে পার না।

বিনোদবিহারী। তা যদি বল তা হলে জীবনটাই তো একটা প্রধান রোগ, এবং সকল রোগের গোড়া। জড়পদার্থ কেমন সুস্থ আছে— মাঝের থেকে হঠাৎ প্রাণ নামক একটা ব্যাধি জুটে প্রাণীগুলোকে খেপিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। বাতাসে একটা ঢেউ উঠল অমনি কানের মধ্যে ভোঁ করে উঠল, ঈথর একটু নড়ে উঠল অমনি চোখের মধ্যে চিকমিক করতে লাগল, সকালবেলায় উঠেই পেটের মধ্যে চোঁ চোঁ করতে আরম্ভ করেছে— এ কি কখনো স্বাভাবিক অবস্থা হতে পারে। স্বাভাবিক যদি বলতে চাও সে কেবল কাঠ পাথর মাটি—

নিমাই। আরে, অতটা দূর গেলে তো কথাই নেই। কিন্তু তোমরা ঐ যে যাকে ভালোবাসা বল সেটা যে শুদ্ধ একটা স্নায়ুর ব্যামো তার আর সন্দেহ নেই। আমার বিশ্বাস অন্যান্য ব্যামোর মতো তারও একটা ওষুধ বের হবে। বালকবালিকাদের যেমন হাম হয়, যুবকযুবতীদের তেমনি ঐ একটা স্নায়ুর উৎপাত ঘটে, কারও বা খুব উৎকট, কারও বা একটু মৃদু রকমের। যখন ও রোগটা চিকিৎসাশাস্ত্রের অধীনে আসবে তখন লক্ষণ মিলিয়ে ওষুধ ঠিক করতে হবে— ডাক্তার রোগীকে জিজ্ঞাসা করবে, "আচ্ছা, তাকে কি তোমার সর্বদাই মনে পড়ে। তার কাছে থাকলে বেশি ভালোবাসা বোধ হয়, না দূরে গেলে? তাকে দেখতে আস না দেখা দিতে আস?" এই-সমস্ত নির্ণয় করে তবে ওষুধ আনতে হবে।

চন্দ্রকান্ত। কাগজে বিজ্ঞাপন বেরোবে— "হৃদয়বেদনার জন্য অতি উত্তম মালিশ, উত্তম মালিশ, উত্তম মালিশ। বিরহ-নিবারণী বটিকা। রাত্রে একটি, সকালে একটি সেবন করিলে সমস্ত বিরহ দূর হইয়া অন্তঃকরণ পরিষ্কার হইয়া যাইবে।"

বিনোদবিহারী। আবার প্রশংসাপত্র বেরোবে— কেউ লিখবে— "আমি একাদিক্রমে আড়াইমাস কাল আমার প্রতিবেশিনীর প্রেমে ভুগিতেছিলাম— নানারূপ চিকিৎসায় কোনো আরাম না পাইয়া অবশেষে আপনার জগদ্‌বিখ্যাত প্রেমাঙ্কুশ রস সেবন করিয়া প্রায় সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছি— এক্ষণে উক্ত প্রতিবেশিনীর জন্য ভ্যালুপেয়েব্লে বড়ো এক শিশি পাঠাইয়া বাধিত করিবেন, তাঁহার ব্যাধিটা আমার অপেক্ষাও অনেক প্রবল জানিবেন। ইতি—"

নিমাই। ওহে চন্দর, তামাক ডাকো। তোমরা ধোঁয়ার মধ্যে বাস কর, তোমাদের আর তামাকের দরকার হয় না, আমরা পৃথিবীতে থাকি, আমাদের তামাকটা পানটা, এমন-কি, সামান্য ভাতটা ডালটারও আবশ্যক ঠেকে।

চন্দ্রকান্ত। বটে বটে, ভুল হয়ে গেছে, মাপ করো নিমাই। ওরে ভুতো— আবাগের বেটা ভূত— তামাক দিয়ে যা— আচ্ছা ভাই বিনু, মেয়েমানুষের কথা যে বলছিলে কী রকম মেয়েমানুষ তোমার পছন্দসই। তোমার আইডিয়ালটি কী আমাকে বলো দেখি।

বিনোদবিহারী। আমি কী রকম চাই জান? যাকে কিছু বোঝবার জো নেই। যাকে ধরতে গেলে পালিয়ে যায়— পালাতে গেলে ধরে টেনে নিয়ে আসে। যে শরতের আকাশের মতো এ দিকে বেশ নির্মল কিন্তু কখন রোদ উঠবে, কখন মেঘ করবে, কখন বৃষ্টি হবে, কখন বিদ্যুৎ দেখা দেবে, তা স্বয়ং বিজ্ঞানশাস্ত্রের পিতৃপিতামহও ঠিক করে বলতে পারে না।

চন্দ্রকান্ত। বুঝেছি— যে কোনোকালেই পুরোনো হবে না। মনের কথা টেনে বলেছ ভাই। কিন্তু পাওয়া শক্ত। আমরা ভুক্তভোগী, জানি কিনা, বিয়ে করলেই মেয়েগুলো দুদিনেই বহুকেলে পড়া-পুঁথির মতো হয়ে আসে; মলাটটা আধখানা ছিঁড়ে ঢলঢল করছে, পাতাগুলো দাগি হয়ে খুলে খুলে আসছে— কোথায় সে আঁটসাঁট বাঁধুনি, কোথায় সে সোনার জলের ছাপ— তা ছাড়া যেখানে খুলে দেখ সেই এক কথা— "কমলিনী অতি সুবোধ মেয়ে, সে ঘরকন্নায় কদাচ আলস্য করে না; সে প্রত্যূষে উঠিয়াই গৃহমার্জন এবং গোময়লেপন করে; যথাসময়ে স্বামীর অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া রাখে, যাহাতে তাঁহার আপিসে যাইতে বিলম্ব না হয়; আপিস হইতে ফিরিয়া আসিলে তাঁহার গাড়ু-গামছা ঠিক করিয়া রাখে এবং রাত্রিকালে তাঁহার মশারি ঝাড়িয়া দেয়!" আগাগোড়া একটা নীতি-উপদেশের মতো। স্ত্রী হবে কেমন— রোজ এক-এক পাতা ওলটাবে আর এক-একটা নতুন চ্যাপ্টার বেরোবে।

নিমাই। অর্থাৎ কোনোদিন বা গৃহমার্জন করবে, কোনোদিন বা স্বামীর পৃষ্ঠমার্জন করবে! একদিন বা মেঝেতে গোময় লেপন করলে, একদিন বা স্বামীর পবিত্র মাথার উপর ঘোল সেচন করলে— পূর্বাহ্ণে কিছুই ঠিক করবার জো নেই।

চন্দ্রকান্ত। সে যেন হল— আর চেহারাটা কী রকম হবে।

বিনোদবিহারী। চেহারাটি বেশ ছিপছিপে, মাটির সঙ্গে অতি অল্পই সম্পর্ক, যেন 'সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব'। অর্থাৎ যাকে দেখে মনে হবে অতি ক্ষীণবল— অস্তিত্বটুকু কেবল নামমাত্র— অথচ ঐটুকুর মধ্যে যে এত লীলা, এত বল, এত কৌতুক তাই দেখে পলকে পলকে আশ্চর্য বোধ হবে। যেন বিদ্যুতের মতো, একটিমাত্র আলোর রেখা— কিন্তু তার ভিতরে কত চাঞ্চল্য, কত হাসি, কত বজ্রতেজ!

চন্দ্রকান্ত। আর বেশি বলতে হবে না— আমি বুঝে নিয়েছি। তুমি চাও পদ্যর মতো চোদ্দটি অক্ষরে বাঁধাসাঁধা, ছিপছিপে; অমনি, চলতে ফিরতে ছন্দটি রেখে চলে, কিন্তু এ দিকে মল্লিনাথ, ভরত শিরোমণি, জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি বড়ো বড়ো পণ্ডিত তাঁর টিকে ভাষ্য করে থই পায় না। বুঝেছ বিনদা, আমিও তাই চাই, কিন্তু চাইলেই তো পাওয়া যায় না—

বিনোদবিহারী। কেন, তোমার কপালে তো মন্দ জোটে নি।

চন্দ্রকান্ত। মন্দ বলতে সাহস করি নে— কিন্তু ভাই, পদ্য নয় সে গদ্য— বিধাতা অক্ষর মিলিয়ে তাকে তৈরি করেন নি, কলমে যা এসেছে তাই বসিয়ে গেছেন— এই প্রতিদিন যে-ভাষায় কথাবার্তা চলে তাই আর-কি। ওর মধ্যে বেশ একটি ছাঁদ পাওয়া যাচ্ছে না।

নিমাই। আর ছাঁদে কাজ নেই ভাই। আবার তোমার কী রকম ছাঁদ সেটাও তো দেখতে হবে। বিনোদ লেখক-মানুষ, ওর মুখে সকলরকম খ্যাপামিই শোভা পায়, ও যদি হঠাৎ মাঝের থেকে বিদ্যুৎ কিংবা অনুষ্টুভ ছন্দকে বিয়ে করে বসে ও তাদের সামলাতে পারে, বরঞ্চ ওকে নিয়েই তারা কিছু ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু চন্দরদা, তোমার সঙ্গে একটি আস্ত পদ্য জুড়ে দিলে কি আর রক্ষে ছিল; এক লাইন পদ্য আর এক লাইন গদ্যে কখনো মিল হয়?

চন্দ্রকান্ত। সে কথা অস্বীকার করবার জো নেই। কিন্তু আমাকে বাইরে থেকে যা দেখিস নিমাই, ভিতরে যে কিছু পদ্য নেই তা বলতে পারি নে। আমি, যাকে বলে, চম্পূকাব্য! গঙ্গাজল ছুঁয়ে বললেও কেউ বিশ্বাস করে না, কিন্তু মাইরি বলছি আমারও মন এক-একদিন উড়ু-উড়ু করে— এমন-কি, চাঁদের আলোয় শুয়ে পড়ে পড়ে এমনও ভেবেছি— আহা, এই সময় প্রেয়সী যদি চুলটি বেঁধে, গাটি ধুয়ে, একখানি বাসন্তী রঙের কাপড় প'রে, একগাছি বেলফুলের মালা হাতে করে নিয়ে এসে গলায় পরিয়ে দেয় আর মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে বলতে থাকে—

জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়ে জুড়ন না গেল।

প্রেয়সীও আসে, দু-চার কথা বলেও থাকে, কিন্তু আমার ঐ বর্ণনার সঙ্গে ঠিকটি মেলে না।

বাজনা নেই, আলো নেই, উলু নেই, শাঁখ নেই, তার পরে যদি আবার অন্তিমকালের বোলচাল দিতে আরম্ভ কর তা হলে তো আর বাঁচি নে!

ভূপতি। মিছে না! চন্দরদার ও-সমস্ত মুখের আস্ফালন বেশ জানি— এ দিকে রাত্তির দশটার পর যদি আর এক মিনিট ধরে রাখা যায়, তা হলে ব্রাহ্মণ বিরহের জ্বালায় একেবারে অস্থির হয়ে পড়ে—

চন্দ্রকান্ত। ভূপতির আর কোনো গুণ না থাক্ ও মানুষ চেনে তা স্বীকার করতে হয়। ঘড়িতে ঐ-যে ছুঁচোলো মিনিটের কাঁটা দেখছ উনি যে কেবল কানের কাছে টিক টিক করে সময় নির্দেশ করেন তা নয় অনেক সময় প্যাঁট প্যাঁট করে বেঁধেন— মন-মাতঙ্গকে অঙ্কুশের মতো গৃহাভিমুখে তাড়না করেন। রাত্তির দশটার পর আমি যদি বাইরে থাকি তা হলে প্রতি মিনিট আমাকে একটি করে খোঁচা মেরে মনে করিয়ে দেন ঘরে আমার অন্ন ঠাণ্ডা এবং গৃহিণী গরম হচ্ছেন।— বিনুদার ঘড়ির সঙ্গে আজকাল কোনো সম্পর্কই নেই— এবার থেকে ঘড়ির ঐ চন্দ্রবদনে নানারকম ভাব দেখতে পাবেন— কখনো প্রসন্ন কখনো ভীষণ। (নিমাইয়ের প্রতি) আচ্ছা ভাই বৈজ্ঞানিক, তুমি আজ অমন চুপচাপ কেন। এমন করলে তো চলবে না।

শ্রীপতি। সত্যি, বিনু যে বিয়ে করতে যাচ্ছে তা মনে হচ্ছে না। আমরা কতকগুলো পুরুষমানুষে জটলা করেছি— কী করতে হবে কেউ কিছু জানি নে— মহা মুশকিল! চন্দরদা, তুমি তো বিয়ে করেছ, বলো-না কী করতে হবে— হাঁ করে সবাই মিলে বসে থাকলে কি বিয়ে-বিয়ে মনে হয়।

চন্দ্রকান্ত। আমার বিয়ে— সে যে পুরাতত্ত্বের কথা হল— আমার স্মরণশক্তি ততদূর পৌঁছয় না। কেবল বিবাহের যেটি সর্বপ্রধান আয়োজন, যেটিকে কিছুতে ভোলবার জো নেই, সেইটিই অন্তরে বাহিরে জেগে আছে, মন্তর-তন্তর পুরুত-ভাট সে সমস্ত ভুলে গেছি।

ভূপতি। বাসরঘরে শ্যালীর কানমলা?

চন্দ্রকান্ত। হায় পোড়াকপাল! শ্যালীই নেই তো শ্যালীর কানমলা— মাথা নেই তার মাথাব্যথা! শ্যালী থাকলে তবু তো বিবাহের সংকীর্ণতা অনেকটা দূর হয়ে যায়— ওরই মধ্যে একটুখানি নিশ্বেস ফেলবার, পাশ ফেরবার জায়গা পাওয়া যায়— শ্বশুরমশায় একেবারে কড়ায়-গণ্ডায় ওজন করে দিয়েছেন, সিকিপয়সার ফাউ দেন নি।

বিনোদবিহারী। বাস্তবিক— বর মনোনীত করবার সময় যেমন জিজ্ঞাসা করে, কটি পাস আছে, 'কনে বাছবার সময় তেমনি খোঁজ নেওয়া উচিত কটি ভগ্নী আছে।

চন্দ্রকান্ত। চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে— ঠিক বিয়ের দিনটিতে বুঝি তোমার চৈতন্য হল? তা তোমারও একটি আছে শুনেছি তার নামটি হচ্ছে ইন্দুমতী— স্বভাবের পরিচয় ক্রমে পাবে।

নিমাই। (স্বগত) যাঁকে আমার স্কন্ধের উপরে উদ্যত করা হয়েছে— সর্বনাশ আর কী!

শ্রীপতি। এ দিকে যে বেরোবার সময় হয়ে এল তা দেখছ? এতক্ষণ কী যে হল তার ঠিক নেই! নিদেন ইংরেজ ছোঁড়াগুলোর মতো খুব খানিকটা হো হো করতে পারলেও আসর গরম হয়ে উঠত। খানিকটা চেঁচিয়ে বেসুরো গান গাইলেও একটু জমাট হত— (উচ্চৈঃস্বরে) "আজ তোমায় ধরব চাঁদ আঁচল পেতে।"

চন্দ্রকান্ত। আরে থাম্ থাম্— তোর পায়ে পড়ি ভাই, থাম্; দেখ্ আর্য ঋষিগণ যে রাগরাগিণীর সৃষ্টি করেছিলেন সে কেবল লোকের মনোরঞ্জনের জন্যে— কোনোরকম নিষ্ঠুর অভিপ্রায় তাঁদের ছিল না।

ভূপতি। এসো তবে বরকনের উদ্দেশে থ্রী চিয়ার্স দিয়ে বেরিয়ে পড়া যাক— হিপ্ হিপ্ হুরে—

চন্দ্রকান্ত। দেখো, আমার প্রিয় বন্ধুর বিয়েতে আমি কখনোই এরকম অনাচার হতে দেব না; শুভকর্মে অমন বিদেশী শেয়াল-ডাক ডেকে বেরোলে নিশ্চয় অযাত্রা হবে। তার চেয়ে সবাই মিলে উলু দেবার চেষ্টা করো-না! ঘরে একটিমাত্র স্ত্রীলোক আছেন তিনি শাঁখ বাজাবেন এখন। আহা, এই সময়ে থাকত তাঁর গুটি দুই-তিন সহোদরা তা হলে কোকিলকণ্ঠের উলু শুনে আজ কান জুড়িয়ে যেত।

বিনোদবিহারী। তা হলে তোমার দুটি কান সামলাতেই দিন বয়ে যেত।

ভূপতি। বিনোদ, তবে ওঠো, সময় হল।

নলিনাক্ষ। এই তবে আমাদের অবিবাহিত বন্ধুত্বের শেষ মিলন! জীবনস্রোতে তুমি এক দিকে যাবে আমি এক দিকে যাব। প্রার্থনা করি, তুমি সুখে থাকো। কিন্তু মুহূর্তের জন্যে ভেবে দেখো বিনু, এই মরুময় জগতে তুমি কোথায় যাচ্ছ—

চন্দ্রকান্ত। বিনু, তুই বল্, মা, আমি তোমার জন্যে দাসী আনতে যাচ্ছি। তা হলে কনকাঞ্জলিটা হয়ে যায়।

শ্রীপতি। এইবার তবে উলু আরম্ভ হোক।

সকলে উলুর চেষ্টা। নেপথ্যে উলু ও শঙ্খ -ধ্বনি

নিমাই। ঐ-যে উলুর জোগাড় করে রেখেছ, এতক্ষণে একটুখানি বিয়ের সুর লাগল। নইলে কতকগুলো মিন্‌সেয় মিলে যেরকম বেসুরো লাগিয়েছিলে, বরযাত্রা কি গঙ্গাযাত্রা কিছু বোঝবার জো ছিল না।

[সকলের প্রস্থান

ইন্দুমতী ও ক্ষান্তমণির প্রবেশ

ক্ষান্তমণি। শুনলি তো ভাই, আমার কর্তাটির মধুর কথাগুলি?

ইন্দুমতী। কেন ভাই, আমার তো মন্দ লাগে নি।

ক্ষান্তমণি। তোর মন্দ লাগবে কেন। তোর তো আর বাজে নি। যার বেজেছে সেই জানে।

ইন্দুমতী। তুমি যে আবার একেবারে ঠাট্টা সইতে পার না। তোমার স্বামী কিন্তু ভাই, তোমাকে সত্যি ভালোবাসে। দিনকতক বাপের বাড়ি গিয়ে বরং পরীক্ষা করে দেখো-না—

ক্ষান্তমণি। তাই একবার ইচ্ছা করে, কিন্তু জানি থাকতে পারব না। তা যা হোক, এখন তোদের ওখানে যাই। ওরা তো বউবাজারের রাস্তা ঘুরে যাবে, সে এখনো ঢের দেরি আছে।

ইন্দুমতী। তুমি এগোও ভাই, আমি তোমার স্বামীর এই বইগুলি গুছিয়ে দিয়ে যাই। (ক্ষান্তমণির প্রস্থান) আজ ললিতবাবু এমন চুপচাপ গম্ভীর হয়ে বসেছিলেন। কী কথা ভাবছিলেন কে জানে। সত্যি আমার জানতে ইচ্ছে করে। থেকে থেকে একটা খাতা খুলে দেখছিলেন। সেই খাতাটা ঐ ভুলে ফেলে গেছেন। ওটা আমাকে দেখতে হচ্ছে। (খাতা খুলিয়া) ও মা! এ যে কবিতা! কাদম্বিনীর প্রতি! আ-মরণ! সে পোড়ারমুখী আবার কে।

জল দিবে অথবা বজ্র, ওগো কাদম্বিনী,
হতভাগ্য চাতক তাই ভাবিছে দিনরজনী!

ইস! ভারি যে অবস্থা খারাপ দেখছি! এত বেশি ভাবনায় কাজ কী! আমি যদি পোড়াকপালী কাদম্বিনী হতুম তা হলে জলও দিতুম না বজ্রও দিতুম না, হতভাগ্য চাতকের মাথায় খানিকটা কবিরাজের তেল ঢেলে দিতুম। খেয়ে দেয়ে তো কাজ নেই— কোথাকার কাদম্বিনীর নামে কবিতা, তাও আবার দুটো লাইন ছন্দ মেলে নি। এর চেয়ে আমি ভালো লিখতে পারি।

আর কিছু দাও বা না দাও, অয়ি অবলে সরলে,
বাঁচি সেই হাসিভরা মুখ আর একবার দেখিলে।

আহা-হা-হা-হা! অবলে সরলে! কোন্ এক বেহায়া মেয়ে ওঁকে হাসিভরা কালামুখ দেখিয়ে দিয়েছিল, এক তিল লজ্জাও করে নি। বাস্তবিক, পুরুষগুলো ভারি বোকা। মনে করলে ওঁর প্রতি ভারি অনুগ্রহ করে সে হেসে গেল— হাসতে নাকি সিকি পয়সার খরচ হয়। দাঁতগুলো বোধ হয় একটু ভালো দেখতে ছিল তাই একটা ছুতো করে দেখিয়ে দিয়ে গেল। কই আমাদের কাছে তো কোনো কাদম্বিনী সাত পুরুষে এমন করে হাসতে আসে না। অবলে সরলে! সত্যি বাপু, মেয়ে জাতটাই ভালো নয়।

এত ছলও জানে! ছি ছি! এ কবিতাও তেমনি হয়েছে। আমি যদি কাদম্বিনী হতুম তো এমন পুরুষের মুখ দেখতুম না। যে লোক চোদ্দটা অক্ষর সামলে চলতে পারে না, তার সঙ্গে আবার প্রণয়! এ খাতা আমি ছিঁড়ে ফেলব— পৃথিবীর একটা উপকার করব— কাদম্বিনীর দেমাক বাড়তে দেব না।

পুরুষের বেশে হরিলে পুরুষের মন,
(এবার) নারীবেশে কেড়ে নিয়ে যাও জীবন মরণ।

এর মানে কী!

কদম্ব যেমনি আমা প্রথম দেখিলে,
কেমন করে ভৃত্য বলে তখনি চিনিলে!

ও মা! ও মা! ও মা! এ যে আমারই কথা! এইবার বুঝেছি পোড়ারমুখী কাদম্বিনী কে! (হাস্য) তাই বলি, এমন করে কাকে লিখলেন! ও মা, কত কথাই বলেছেন! আর-একবার ভালো করে সমস্তটা পড়ি! কিন্তু কী চমৎকার হাতের অক্ষর! একেবারে যেন মুক্তো বসিয়ে গেছে।

[নীরবে পাঠ

পশ্চাৎ হইতে খাতা অন্বেষণে নিমাইয়ের প্রবেশ

কিন্তু ছন্দ থাক্ না-থাক্ পড়তে তো কিছুই খারাপ হয় নি। সত্যি, ছন্দ নেই বলে আরো মনের সরল ভাবটা ঠিক যেন প্রকাশ হয়েছে। আমার তো বেশ লাগছে। আমার বোধ হয় ছেলেদের প্রথম ভাঙা কথা যেমন মিষ্টি লাগে, কবিদের প্রথম ভাঙা ছন্দ তেমনি মিষ্টি লাগে; পড়তে গেলে বুকের ভিতরটা কী একরকম করে ওঠে— বড়ো বড়ো কবিতা পড়ে এমন হয় না। মেঘনাদবধ, বৃত্রসংহার, পলাশির যুদ্ধ, সে-সব যেন ইস্কুলের বই— এমন সত্যিকার না। (খাতা বুকে চাপিয়া) এ খাতা আমি নিয়ে যাব— এ তো আমাকেই লিখেছেন। আমার এমনি আনন্দ হচ্ছে! ইচ্ছে করছে এখনি দিদিকে গিয়ে জড়িয়ে ধরি গে! আহা, দিদি যাকে বিয়ে করছে তাকে নিয়ে যেন খুব খুব খুব সুখে থাকে— যেন চিরজীবন আদরে সোহাগে কাটাতে পারে। (প্রস্থানোদ্যম। পশ্চাতে ফিরিয়া নিমাইকে দেখিয়া) ও মা!

[মুখ আচ্ছাদন

নিমাই। ঠাকরুন, আমি একখানা খাতা খুঁজতে এসেছিলুম— (ইন্দুমতীর দ্রুত পলায়ন) জন্ম জন্ম সহস্র বার আমার সহস্র খাতা হারাক— কবিতার বদলে যা পেয়েছি কালিদাস তাঁর কুমারসম্ভব শকুন্তলা বাঁধা রেখে এমন জিনিস পায় না।

[মহা উল্লাসে প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

বিবাহসভা

লোকারণ্য। শঙ্খ হুলুধ্বনি। সানাই

নিবারণ। কানাই! ও কানাই! কী করি বলো দেখি। কানাই গেল কোথায়।

শিবচরণ। তুমি ব্যস্ত হোয়ো না ভাই। এ ব্যস্ত হবার কাজ নয়। আমি সমস্ত ঠিক করে দিচ্ছি। তুমি পাত পাড়া হল কিনা দেখে এসো দেখি।

ভৃত্য। বাবু, আসন এসে পৌঁচেছে সেগুলো রাখি কোথায়।

নিবারণ। এসেছে! বাঁচা গেছে। তা সেগুলো ছাতে—

শিবচরণ। ব্যস্ত হচ্ছ কেন দাদা। কী হয়েছে বলো দেখি। কী রে বেটা, তুই হাঁ করে দাঁড়িয়ে রয়েছিস কেন। কাজকর্ম কিছু হাতে নেই না কি।

ভৃত্য। আসন এসেছে সেগুলো রাখি কোথায় তাই জিজ্ঞাসা করছি।

শিবচরণ। আমার মাথায়! একটু গুছিয়ে-গাছিয়ে নিজের বুদ্ধিতে কাজ করা, তা তোদের দ্বারা হবে না! চল্‌ আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। ওরে বাতিগুলো যে এখনো জ্বালালে না! এখানে কোনো কাজেরই একটা বিধিব্যবস্থা নেই— সমস্ত বেবন্দোবস্ত! নিবারণ, তুমি ভাই একটু ঠাণ্ডা হয়ে বসো দেখি— ব্যস্ত হয়ে বেড়ালে কোনো কাজই হয় না। আঃ, বেটাদের কেবল ফাঁকি। বেহারা বেটারা সবাই পালিয়েছে দেখছি— আচ্ছা করে তাদের কানমলা না দিলে—

নিবারণ। পালিয়েছে নাকি! কী করা যায়!

শিবচরণ। ব্যস্ত হোয়ো না ভাই— সব ঠিক হয়ে যাবে। বড়ো বড়ো ক্রিয়াকর্মের সময় মাথা ঠাণ্ডা রাখা ভারি দরকার। কিন্তু এই রেধো বেটার সঙ্গে তো আর পারি নে! আমি তাকে পই পই করে বললুম, তুমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে লুচিগুলো ভাজিয়ো, কিন্তু কাল থেকে হতভাগা বেটার চুলের টিকি দেখবার জো নেই। লুচি যেন কিছু কম পড়েছে বোধ হচ্ছে।

নিবারণ। বল কী শিবু! তা হলে তো সর্বনাশ!

শিবচরণ। ভয় কী দাদা! তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, সে আমি করে নিচ্ছি। একবার রাধুর দেখা পেলে হয়, তাকে আচ্ছা করে শুনিয়ে দিতে হবে।

চন্দ্রকান্ত নিমাই প্রভৃতির প্রবেশ

নিবারণ। আহার প্রস্তুত, চন্দ্রবাবু, কিছু খাবেন চলুন।

চন্দ্রকান্ত। আমাদের পরে হবে, আগে সকলের হোক।

শিবচরণ। না না, একে একে সব হয়ে যাক। চলো চন্দর, তোমাদের খাইয়ে আনি। নিবারণ, তুমি কিছু ব্যস্ত হোয়ো না, আমি সব ঠিক করে নিচ্ছি। কিন্তু লুচিটা কিছু কম পড়বে বোধ হচ্ছে।

নিবারণ। তা হলে কী হবে শিবু!

শিবচরণ। ঐ দেখো! মিছিমিছি ভাব কেন! সে-সব ঠিক হয়ে যাবে। এখন কেবল সন্দেশগুলো এসে পৌঁছলে বাঁচি। আমার তো বোধ হচ্ছে ময়রা বেটা বায়না নিয়ে ফাঁকি দিলে।

নিবারণ। বল কী ভাই!

শিবচরণ। ব্যস্ত হোয়ো না, আমি সব দেখে শুনে নিচ্ছি।

[সকলকে ডাকিয়া লইয়া প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

বাসর ঘর

বিনোদবিহারী। কমলমুখী ও অন্য স্ত্রীগণ

সম্মুখবর্তী পথ দিয়া আহারার্থী বরযাত্রগণ যাতায়াত করিতেছে

ইন্দুমতী। এতক্ষণে বুঝি তোমার মুখ ফুটল!

বিনোদবিহারী। আপনার ও-হাতের স্পর্শে বোবার মুখ খুলে যায়, আমি তো কেবল বর।

ক্ষান্তমণি। দেখেছিস ভাই, আমরা এতক্ষণ এত চেষ্টা করে একটা কথাও কওয়াতে পারলুম না আর ইন্দুর হাতের কানমলা খেয়ে তবে ওর কথা বেরোল।

প্রথমা। ও ইন্দু, তোর কাছে ওর কথার চাবি ছিল না কি! তুই কী কল ঘুরিয়ে দিলি লো!

দ্বিতীয়া। তা দে ভাই, তবে আর-এক পাক দে। ওর পেটে যত কথা আছে বেরিয়ে যাক

(মৃদুস্বরে) জিগ্‌গেস কর্‌-না, আমাদের নাতনিকে লাগছে কেমন—

ইন্দুমতী। কী বল ঠাকুরজামাই, তবে আর-এক বার দম দিয়ে নিই।

কমলমুখী। (মৃদুস্বরে) ইন্দু, তুই আর জ্বালাস নে ভাই— একটু থাম্‌।

ইন্দুমতী। দিদি, ওর কানে একটু মোচড় দিলেই অমনি তোমার প্রাণে দ্বিগুণ বেজে উঠছে কেন। তুমি কি ওর তানপুরোর তার!

প্রথমা। ওলো ও কমল, তোর রকম দেখে তো আর বাঁচি নে। হ্যাঁ লো, এরই মধ্যে ওর কানের 'পরে তোর এত দরদ হয়েছে! তা ভাবিস নে ভাবিস নে— আমরা ওর দুটো কান কেটে নিচ্ছি নে, নিদেন একটা তোর জন্যে রেখে দেব।

চন্দ্রকান্ত। (জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া) দরদ হবে না কেন। আজ থেকে উনি আমাদের বিনুদার কর্ণধার হলেন— সে কর্ণ উনি যদি না সামলাবেন তো কে সামলাবে।

দ্বিতীয়া। ও মিন্‌সে আবার কে ভাই!

ক্ষান্তমণি। (তাড়াতাড়ি) ও বরের ভাই হয়।— ওগো, মশায়, তোমার বিনুদার হয়ে জবাব দিতে হবে না। উনি বেশ সেয়ানা হয়েছেন— এখন দিব্যি কথা ফুটেছে। তুমি এখন নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে যাও।

চন্দ্রকান্ত। যে আজ্ঞে, আদেশ পেলেই নির্ভয়ে যেতে পারি। এখন বোধ করি কিছুক্ষণ ঘরে টিকতে পারব।

[প্রস্থান

ইন্দুমতী। না ভাই, এখানে বড্ড আনাগোনার রাস্তা— বাইরে ঐ দরজাটা দিয়ে আসি।

[উঠিয়া দ্বারের নিকট আগমন

নিমাই। একবার উঁকি মেরে বিনুদার অবস্থাটা দেখে যেতে হচ্ছে।

[ইন্দুমতীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত

ইন্দুমতী। আপনারা বেশি ব্যস্ত হবেন না, আপনাদের প্রাণের বন্ধুটি জলে পড়েন নি।

নিমাই। সেজন্যে আমি কিছু ব্যস্ত হই নি। আমার নিজের একটা জিনিস হারিয়েছে আমি তারই খোঁজ করে বেড়াচ্ছি।

ইন্দুমতী। হারাবার মতো জিনিস যেখানে-সেখানে ফেলে রাখেন কেন।

নিমাই। সে আমাদের জাতের স্বধর্ম— আমরা সাবধান হতে শিখি নি। সে খাতাটা যদি আপনার হাতে পড়ে থাকে—

ইন্দুমতী। খাতা? হিসেবের খাতা?

নিমাই। তাতে কেবল খরচের হিসেবটাই ছিল, জমার হিসেবটা যদি বসিয়ে দেন তো আপনার কাছেই থাক্‌।

ইন্দুমতী। ছি ছি, আজ আমি কী যে বকাবকি করছি তার ঠিক নেই। আজ আমার কী হয়েছে।

[দ্রুত দ্বার রোধ

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বাগবাজারের রাস্তা

নিমাই

নিমাই। আহা, এই বাড়িটা আমার শরীর থেকে আমার মনটুকুকে যেন শুষে নিচ্ছে— ব্লটিং যেমন কাগজ থেকে কালি শুষে নেয়। কিন্তু কোন্ দিকে সে থাকে এ পর্যন্ত কিছুই সন্ধান করতে পারলুম না। ঐ যে পশ্চিমের জানলার ভিতর দিয়ে একটা সাদা কাপড়ের মতো যেন দেখা গেল— না না, ও তো নয়, ও তো একজন দাসী দেখছি— ও কী করছে। একটা ভিজে শাড়ি শুকোতে দিচ্ছে। বোধ হয় তাঁরই শাড়ি। আহা, নাগাল পেলে একবার স্পর্শ করে নিতুম। তা হলে এতক্ষণে তাঁর স্নান হল। পিঠের উপরে ভিজে চুল ফেলে সাফ কাপড়টি পরে এখন কী করছেন। একবার কিছুতেই কি দেখা হতে পারে না। আমরা কি বনের জন্তু। আমাদের কেন এত ভয়। এত করে এতগুলো দেয়াল গেঁথে এতগুলো দরজা-জানলা বন্ধ করে মানুষের কাছ থেকে মানুষ লুকিয়ে থাকে কেন।

পালকিতে শিবচরণের প্রবেশ

শিবচরণ। (বেহারার প্রতি) আরে রাখ্ রাখ্। (পালকি হইতে অবতরণ) বেটার তবু হুঁশ নেই! দেখো-না, হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে দেখো-না! যেন খিদে পেয়েছে, এই বাড়ির ইঁটকাঠগুলো গিলে খাবে! ছোঁড়ার হল কী। খাঁচার পাখির দিকে বেড়াল যেমন তাকিয়ে থাকে তেমনি করে উপরের দিকে তাকিয়ে আছে। রোসো, এবারে ওকে জব্দ করছি— বাবাজি হাতে হাতে ধরা পড়েছেন। হতভাগা কালেজে যাবার নাম করে রোজ বাগবাজারে এসে ঘুর-ঘুর করে। (নিকটে আসিয়া) বাপু, মেডিকেল কালেজটা কোন্ দিকে একবার দেখিয়ে দাও দেখি।

নিমাই। কী সর্বনাশ! এ-যে বাবা!

শিবচরণ। শুনছ? কালেজ কোন্ দিকে! তোমার অ্যানাটমির নোট কি ঐ দেয়ালের গায়ে লেখা আছে। তোমার সমস্ত ডাক্তারি শাস্ত্র কি ঐ জানলায় গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে। (নিমাই নিরুত্তর) মুখে কথা নেই যে! লক্ষ্মীছাড়া, এই তোর একজামিন! এইখানে তোর মেডিকেল কালেজ!

নিমাই। খেয়েই কালেজে গেলে আমার অসুখ করে, তাই একটুখানি বেড়িয়ে নিয়ে—

শিবচরণ। বাগবাজারে তুমি হাওয়া খেতে এস? শহরের আর-কোথাও বিশুদ্ধ বায়ু নেই! এ তোমার দার্জিলিং সিমলে পাহাড়! বাগবাজারের হাওয়া খেয়ে খেয়ে আজকাল যে চেহারা বেরিয়েছে একবার আয়নাতে দেখা হয় কি। আমি বলি ছোঁড়াটা একজামিনের তাড়াতেই শুকিয়ে যাচ্ছে— তোমাকে যে ভূতে তাড়া করে বাগবাজারে ঘোরাচ্ছে তা তো জানতুম না!

নিমাই। আজকাল বেশি পড়তে হয় বলে রোজ খানিকটা করে একসেসাইজ করে নিই—

শিবচরণ। রাস্তার ধারে কাঠের পুতুলের মতো হাঁ করে দাঁড়িয়ে থেকে তোমার একসেসাইজ হয়, বাড়িতে তোমার দাঁড়াবার জায়গা নেই!

নিমাই। অনেকটা চলে এসে শ্রান্ত হয়েছিলুম তাই একটু বিশ্রাম করা যাচ্ছিল।

শিবচরণ। শ্রান্ত হয়েছিস, তবে ওঠ্ আমার পালকিতে। যা এখনি কালেজ যা। গেরস্তর বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে শ্রান্তি দূর করতে হবে না।

নিমাই। সে কী কথা! আপনি কী করে যাবেন।

শিবচরণ। আমি যেমন করে হোক যাব, তুই এখন পালকিতে ওঠ্। ওঠ্ বলছি।

নিমাই। অনেকটা জিরিয়ে নিয়েছি— এখন আমি অনায়াসে হেঁটে যেতে পারব।

শিবচরণ। না, সে হবে না— তুই ওঠ্‌ আমি দেখে যাই—

নিমাই। আপনার যে ভারি কষ্ট হবে।

শিবচরণ। সেজন্যে তোকে কিছু ভাবতে হবে না— তুই ওঠ্‌ পালকিতে।

নিমাই। কী করি— পালকিতে ওঠা যাক, আজ সকালবেলাটা মাটি হল।

[পালকি-আরোহণ

শিবচরণ। (বেহারার প্রতি) দেখ্‌, একেবারে সেই পটলডাঙার কালেজে নিয়ে যাবি, কোথাও থামাবি নে।

[পালকি লইয়া বেহারাগণ প্রস্থানোন্মুখ

নিমাই। (জনান্তিকে বেহারাদের প্রতি) মির্জাপুর চন্দ্রবাবুর বাসায় চল্‌, তোদের এক টাকা বকশিশ দেব, ছুটে চল্‌।

[প্রস্থান

শিবচরণ। আজ আর রুগি দেখা হল না। আমার সকালবেলাটা মাটি করে দিলে।

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

চন্দ্রকান্তের বাসা

চন্দ্রকান্ত

চন্দ্রকান্ত। নাঃ! এ আগাগোড়া কেবল ছেলেমানুষি করা হয়েছে। আমার এমন অনুতাপ হচ্ছে! মনে হচ্ছে, যেন আমিই এ-সমস্ত কাণ্ডটি ঘটিয়েছি। ইদিকে এত কল্পনা, এত কবিত্ব, এত মাতামাতি, আর বিয়ের দুদিন না যেতে যেতেই কিছু আর মনে ধরছে না। ওঁদের জন্যে একটি আলাদা জগৎ ফরমাশ দিতে হবে। একটি শান্তিপুরে ফিনফিনে জগৎ— কেবল চাঁদের আলো, ঘুমের ঘোর আর পাগলের পাগলামি দিয়ে তৈরি!

নিমাইয়ের প্রবেশ

নিমাই। কী হচ্ছে চন্দরদা।

চন্দ্রকান্ত। না, নিমাই, তোরা আর বিয়ে-থাওয়া করিস নে।

নিমাই। কেন বলো দেখি— তোমার ঘাড়ে ম্যাল্‌থসের ভূত চাপল নাকি।

চন্দ্রকান্ত। এখনকার ছেলেরা তোরা মেয়েমানুষকে বিয়ে করবার যোগ্য ন'স। তোরা কেবল লম্বাচওড়া কথা ক'বি আর কবিতা লিখবি, তাতে যে পৃথিবীর কী উপকার হবে ভগবান জানেন।

নিমাই। কবিতা লিখে পৃথিবীর কী উপকার হয় বলা শক্ত, কিন্তু এক-এক সময়ে নিজের কাজে লেগে যায় সন্দেহ নেই। যা হোক এত রাগ কেন।

চন্দ্রকান্ত। শুনেছ তো সমস্তই। আমাদের বিনুর তাঁর স্ত্রীকে পছন্দ হচ্ছে না।

নিমাই। বাস্তবিক, এরকম গুরুতর ব্যাপার নিয়ে খেলা করাটা ভালো হয় নি।

চন্দ্রকান্ত। বিনুটা যে এত অপদার্থ তা কি জানতুম। একটা স্ত্রীলোককে ভালোবাসবার ক্ষমতাটুকুও নেই? একবার ভেবে দেখ্‌ দেখি ভাই— একটি বালিকা হঠাৎ একদিন রাত্রে তার আশৈশব আত্মীয়স্বজনের বন্ধন বিচ্ছিন্ন করে সমস্ত ইহকাল পরকাল তোমার বাম হস্তে তুলে দিলে আর তার পরদিন সকালবেলা উঠে কিনা তাকে তোমার পছন্দ হল না! এ কি পছন্দর কথা!

নিমাই। সেইজন্য তো ভাই, গোড়ায় একবার দেখে শুনে নেওয়া উচিত ছিল। তা এখন কী করবে বলো দেখি।

চন্দ্রকান্ত। আমি তো আর তার মুখদর্শন করছি নে। এই নিয়ে তার সঙ্গে আমার ভারি ঝগড়া হয়ে গেছে।

নিমাই। তুমি তাকে ছাড়লে সে যে নেহাত অধঃপাতে যাবে।

চন্দ্রকান্ত। না, তার সঙ্গে আমি কিছুতেই মিশছি নে, সে যদি আমার পায়ে ধরে এসে পড়ে তবু না! তুমি ঠিক বলেছিলে নিমাই, আজকাল সবাই যাকে ভালোবাসা বলে সেটা একটা স্নায়ুর ব্যামো— হঠাৎ কাঁপুনি দিয়ে ধরে, আবার হঠাৎ ঘাম দিয়ে ছেড়ে যায়।

নিমাই। সে-সব বিজ্ঞানশাস্ত্রের কথা পরে হবে, আপাতত আমার একটা কাজ করে দিতে হচ্ছে।

চন্দ্রকান্ত। যে কাজ বল তাতেই রাজি আছি কিন্তু ঘটকালি আর করছি নে।

নিমাই। ঐ ঘটকালিই করতে হবে।

চন্দ্রকান্ত। (ব্যগ্রভাবে) কী রকম শুনি।

নিমাই। বাগবাজারের চৌধুরীদের বাড়ির কাদম্বিনী, তার সঙ্গে আমার—

চন্দ্রকান্ত। (উচ্চস্বরে) নিমাই, তোমারও কবিত্ব! তবে তোমারও স্নায়ু বলে একটা বালাই আছে!

নিমাই। তা আছে ভাই। বোধ হয় একটু বেশি পরিমাণেই আছে। অবস্থা এমনি হয়েছে কিছুতেই একজামিনের পড়ায় মন দিতে পারি নে— শিগ্‌গির আমার একটি সদ্গতি না করলে—

চন্দ্রকান্ত। বুঝেছি। কিন্তু নিমাই, আমার ঘাড়ে পাপের বোঝা আর চাপাস নে। ভেবে দেখ্, পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে দুটি অবলার সর্বনাশ করেছি— একটিকে স্বহস্তে নিয়েছি, আর-একটিকে প্রিয় বন্ধুর হাতে সমর্পণ করেছি— আর স্ত্রীহত্যার পাতকে আমাকে লিপ্ত করিস নে।

নিমাই। কিচ্ছু ভেব না ভাই। এবার যা করবে তাতে তোমার পূর্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে।

চন্দ্রকান্ত। ভ্যালা মোর দাদা! এ বেশ কথা বলেছিস ভাই। সকাল থেকে মরে ছিলুম। এখন একটু প্রাণ পাওয়া গেল। আমি এক্‌খনি যাচ্ছি। চাদরখানা নিয়ে আসি। অমনি বড়োবউয়ের পরামর্শটাও জানা ভালো।

[প্রস্থান

(অনতিবিলম্বে ছুটিয়া আসিয়া) বড়োবউ রাগ করে বাপের বাড়ি চলে গেছে। এ-সমস্তই কেবল তোদের জন্যে। না, আমি আর তোদের কারও সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখছি নে। তোরা পাঁচজনে এসে জুটিস, আমিও ছেলেমানুষদের সঙ্গে মিশে যা মুখে আসে তাই বকি, আর এই-সমস্ত অনর্থ বাধে। আমার চিরকালের ঘরের স্ত্রীটিকেই যদি ঘরে না রাখতে পারব তো তোদের স্ত্রী জুটিয়ে দিয়ে আমার কী এমন পরমার্থ লাভ হবে বল্ দেখি। না, তোদের কারও সঙ্গে আমি আর বাক্যালাপ করছি নে।

বিনোদবিহারী ও নলিনাক্ষের প্রবেশ

বিনোদবিহারী। চন্দরদা, তুমি আমার উপর রাগ করে চলে এলে ভাই, আমি আর থাকতে পারলুম না।

চন্দ্রকান্ত। না ভাই, তোদের উপর কি আমি রাগ করতে পারি। তবে মনে একটু দুঃখ হয়েছিল তা স্বীকার করি।

বিনোদবিহারী। কী করব চন্দরদা। আমি এত চেষ্টা করছি কিছুতেই পেরে উঠছি নে—

চন্দ্রকান্ত। কেন বল্ দেখি। ওর মধ্যে শক্তটা কী। মেয়েমানুষকে ভালোবাসতে পারিস নে? তুই কি কাঠের পুতুল।

নলিনাক্ষ। চন্দ্রবাবুর সঙ্গে কিন্তু আমার মতের একটুও মিল হচ্ছে না। ভালোবাসা কখনো জোর করে হয় না। একটা গান আছে—

ভালোবাসিবে বলে ভালোবাসি নে।
আমার স্বভাব এই তোমা বৈ আর জানি নে।

আমি কিন্তু বিনু, সম্পূর্ণ তোমার দিকে।

বিনোদবিহারী। নলিন, একটু থাম্ তুই— এই বড়ো দুঃখের সময় আর হাসাস নে। চন্দরদা, কী জানি ভাই, একাদিক্রমে পঁচিশ বৎসরকাল বিয়ে না করে বিয়ে না করাটাই যেন একেবারে মুখস্থ হয়ে গেছে। এখন হঠাৎ এই বিয়েটা কিছুতেই মনের মধ্যে গ্রহণ করতে পারছি নে।

চন্দ্রকান্ত। তোর পায়ে পড়ি বিনু, তুই আমার গা ছুঁয়ে বল্, নিদেন আমার খাতিরে তোর স্ত্রীকে ভালোবাসবি। মনে কর্, তুই আমার বোনকে বিয়ে করেছিস।

নলিনাক্ষ। চন্দ্রবাবুর এ নিতান্ত অন্যায় কথা! বিনুর প্রতি উনি—

বিনোদবিহারী। তুই আর জ্বালাস নে নলিন। বুঝেছ চন্দরদা, যা কিছু মনে করবার তা করেছি— তাকে আমি চোখ বুজে পরী অপ্সরী রম্ভা তিলোত্তমা বলে কল্পনা করি কিন্তু তাতে ফল পাই নে। তবে সত্যি কথা বলি চন্দর, আসলে হয়েছে কী, আজকাল টাকার বড়ো টানাটানি— বই থেকে কিছু পাই নে, দেশে যা বিষয় আছে মামাতো ভাইরা লুঠ করে খেলে— নিজে পাড়াগাঁয়ে পড়ে থেকে বিষয় দেখা, সে মরে গেলেও পারব না— ওকালতি ব্যাবসা সবে ধরেছি, ঘর থেকে কেবল গাড়ি-ভাড়াই দিচ্ছি। একলা যখন থাকতুম, আমার কোণের ঘরের ভাঙা চৌকিটিতে এসে বসতুম, আপনাকে রাজা মনে হত। এখন নড়তে-চড়তে কেবল মনে হয় আমার এই ভাঙা ঘর ছেঁড়া বিছানাটুকুও বেদখল হয়ে গেছে— আমাকে আর-কোথাও ভালো করে ধরে না। নিমাই, তুমি শুনে রাগ করছ, কিন্তু একটু বুঝে দেখো, একটা জুতোর মধ্যে দুটো পা ঢোকে না, তা দুই পায়ে যতই প্রণয় থাক্।

নলিনাক্ষ। বিনু যা বলছে ওর সমস্ত কথাই আমি মানি।

নিমাই। তা হলে তোমার ভালোবাসার অভাব নেই, কেবল টাকার অভাব।

বিনোদবিহারী। কথাটা যে প্রায় একই দাঁড়ায়—

নিমাই। কী বল! কথাটা একই! ভালোবাসাকে তুমি একেবারে উড়িয়ে দিতে চাও—

বিনোদবিহারী। না ভাই, আমি ভালোবাসাটাকে স্নায়ুর ব্যামো কিংবা মিথ্যে বলছি নে; আমি বলছি ও জিনিসটা কিছু শৌখিন জাতের। ওর বিস্তর আসবাবের দরকার। টানাটানির বাজারে ওকে নিয়ে বড়ো বিব্রত হয়ে পড়তে হয়। আমি বেশ বুঝতে পারি, চতুর্দিকটি বেশ মনের মতো হত, ট্রামের ঘড়ঘড় না থাকত, দাসীমাগী ঝগড়া না করত, গয়লা ঠিক নিয়মিত দুধ জোগাত এবং দাম না চাইত, মাসান্তে বাড়িওয়ালা একবার করে অপমান করে না যেত, জজসাহেব বিচারাসনে বসে আমার ইংরিজি ভুল সংশোধন করে না দিত, তা হলে আমিও ক্রমে ক্রমে ভালোবাসতে পারতুম— কিন্তু এখন সংগীত, চাঁদের আলো, প্রেমালাপ, এ কিছুই রুচছে না— আমার পটলডাঙার সেই বাসার মধ্যে এ-সমস্ত শৌখিন জিনিস পুষতে পারছি নে।

চন্দ্রকান্ত। ভালোবাসা যে এতবড়ো ফুলবাবু তা জানতুম না— কী করেই বা জানব, ওঁর সঙ্গে আমার কখনোই পরিচয় নেই।

নিমাই। ছি ছি বিনোদ, তোমার এতদিনকার কবিত্ব শেষকালে পয়সার থলির মধ্যে গুঁজলে হে!

বিনোদবিহারী। নিমাই, তুমি এমন কথাটা বললে! আমি দুর্গন্ধ পয়সার কাঙাল! ছোঃ! অভাবকে কি আমি অভাব বলে ডরাই— তা নয়, কিন্তু তার চেহারাটা অতি বিশ্রী, জীর্ণশীর্ণ, মলিন, কুৎসিত, কদাকার, হাড়-বের-করা; নিতান্ত গায়ের কাছে তাকে সর্বদা সহ্য হয় না। তার ময়লা হাতে সে পৃথিবীর যা-কিছু ছোঁয় তাই দাগি হয়ে যায়, তা চাঁদের আলোই বল, আর প্রেয়সীর হাসিই বল। এতদিন আমার টাকা ছিল না, অভাবও ছিল না— বিয়ের পর থেকে দারিদ্র্য বলে একটা কদর্য মড়াখেকো শ্মশানের কুকুর জিব বের করে সর্বদা আমার চোখের সামনে হাঁ্যাহাঁ্যা করে

বেড়াচ্ছে— তাকে আমি দু-চক্ষে দেখতে পারি নে। আসল কথা, আমার চারি দিকে আমি একটি সৌন্দর্যের সামঞ্জস্য দেখতে চাই— জীবনটি বেশ একটি অখণ্ড রাগিণীর মতো হবে, তবে আমার মধ্যে যা-কিছু পদার্থ আছে তা ভালো করে প্রকাশ পাবে। কিন্তু আমার এই নতুন স্ত্রীর সঙ্গে আমার পুরোনো অবস্থার ঠিক সুর মেলাতে পারছি নে, আমার কোনো জিনিস তাঁকে কেমন খাপ খাচ্ছে না, আর তাই ক্রমাগত আমাকে ছুঁচের মতো বিঁধছে। থাকত যদি আরব্য-উপন্যাসের একটি পোষা দৈত্য, স্ত্রী ঘরে পদার্পণ করলেন অমনি একটি কিংকরী সোনার থালে হ্যামিল্টনের দোকানের সমস্ত ভালো ভালো গয়না এনে তাঁর পায়ের কাছে রেখে গেল, দু-জন দাসী বসবার ঘরে মছলন্দ বিছিয়ে চামর হাতে করে দুই দিকে দাঁড়াল, চারি দিক থেকে সংগীত উঠছে, বাগান থেকে ফুলের গন্ধ আসছে— যেদিকে চোখ পড়ছে তক তক ঝক ঝক করছে— সে হলে একরকম হত— আর এই এক জীর্ণ ঘরে ছেঁড়া মাদুরে উঠতে-বসতে লজ্জিত হয়ে আছি। যা বলিস ভাই, স্ত্রীর কাছে মান রাখতে সকলেরই সাধ যায়, এমন-কি, সেইজন্যে মনু বলে গেছেন স্ত্রীর কাছে মিথ্যা বলতে পাপ নেই। তা ভাই, মিথ্যা কথা দিয়ে যদি আমার পটলডাঙার বাসাটা ঢেকে ফেলতে পারতুম, আমার বর্তমান অবস্থা আগাগোড়া গিলটি করে দিতে পারতুম, তা হলে মিথ্যে আমার মুখে বাধত না— কিন্তু এতখানি ছেঁড়া বেরিয়ে পড়ছে যে কেবল কথা দিয়ে আর রিফু চলে না। এখন এ অবস্থায় সে কি আমাকে মনে মনে শ্রদ্ধা করতে পারে। আমার মধ্যে যেটুকু পদার্থ আছে সে কি আমি তার কাছে প্রকাশ করতে পেরেছি। আমার সঙ্গে প্রথম পরিচয়েই সে আমাকে কী হীনতার মধ্যে দেখছে বলো দেখি। তুমি কি বল এ অবস্থায় মানুষের বসে বসে প্রেমালাপ করতে শখ যায়। এই তো ভাই, আমার যেরকম স্বভাব তা খুলে বললুম, খুব যে উঁচুদরের বীরত্বময় মহত্ত্বপূর্ণ তা নয়— কিন্তু উঁচু নিচু মাঝারি এই তিন রকমেরই মানুষ আছে, ওর মধ্যে আমাকে যে দলেই ফেল আমার আপত্তি নেই— কিন্তু ভুল বুঝো না।

চন্দ্রকান্ত। তোমার সঙ্গে বক্তৃতায় কে পারবে বলো। যা হোক, এখন কর্তব্য কী বলো দেখি।

বিনোদবিহারী। আমি তাঁকে তাঁর বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি।

চন্দ্রকান্ত। তুমি নিজে চেষ্টা করে? না তিনি রাগ করে গেছেন?

বিনোদবিহারী। না, আমি তাঁকে একরকম বুঝিয়ে দিলুম—

চন্দ্রকান্ত। যে, এখানে তিনি টিকতে পারবেন না! তুমি সব পার। যদি বন্ধুত্ব রাখতে চাও তো ও-আলোচনায় আর কাজ নেই, তোমার যা কর্তব্য বোধ হয় তুমি কোরো। নিমাই ভাই, তোমার সে কথাটা মনে রইল— আগে একবার নিজের শ্বশুরবাড়িটা ঘুরে আসি, তার পরে বেশ উৎসাহের সঙ্গে কাজটায় লাগতে পারব। বিনু, আজ আমার মনটা কিছু অস্থির আছে, আজ আর থাকতে পারছি নে— কাল তোমার বাসায় একবার যাওয়া যাবে। [প্রস্থান

নলিনাক্ষ। চলো ভাই বিনু, আমরা দুজনে মিলে গোলদিঘির ধারে বেড়াতে যাই গে।

বিনোদবিহারী। আমার এখন গোলদিঘি বেড়াবার শখ নেই নলিন। সেখানে যখন যাব একেবারে দড়ি-কলসি হাতে করে নিয়ে যাব।

নলিনাক্ষ। কেন ভাই, অনর্থক তুমি ওরকম মন খারাপ করে রয়েছ? একে তো এই পোড়া সংসারে যথেষ্ট অসুখ আছে তার পরে আবার—

বিনোদবিহারী। বন্ধু লাগলে আরো অসহ্য হয়ে ওঠে।

নলিনাক্ষ। কী করলে তোমার দগ্ধ হৃদয়ে আমি একটুখানি সান্ত্বনা দিতে পারি ভাই।

বিনোদবিহারী। নলিন, তোর দুটি পায়ে পড়ি আমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে এত অবিশ্রাম চেষ্টা করিস নে, মাঝে মাঝে একটু একটু হাঁপ ছাড়তে দিস।

নলিনাক্ষ। তুমি এখন কোথায় যাচ্ছ।

বিনোদবিহারী। বাড়ি যাচ্ছি।

নলিনাক্ষ। তবে আমিও তোমার সঙ্গে যাই। এখন তুমি সেখানে একলা, মনে করছি কিছুদিন তোমার সঙ্গে একত্র থেকে—

বিনোদবিহারী। না না, আমি শীঘ্রই আমার স্ত্রীকে ঘরে আনছি— নলিন, আজ ভাই তুমি চন্দরকে নিয়ে গোলদিঘিতে বেড়াতে যাও— আমাকে একটু ছুটি দিতেই হচ্ছে।

নলিনাক্ষ। (সনিশ্বাসে) তবে বিদায় ভাই! কিন্তু এই শেষ কথা বলে যাচ্ছি, যাঁদের তুমি তোমার প্রাণের বন্ধু বলে জান, তাঁরা তোমাকে হয়তো এক কথায় ত্যাগ করতে পারেন কিন্তু নলিনাক্ষ তোমাকে কখনোই ছাড়বে না।

বিনোদবিহারী। সে আমি খুবই জানি নলিন।

নলিনাক্ষ। আর এটা নিশ্চয় মনে রেখো, তুমি যা কর আমি তোমার পক্ষে আছি।

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

নিবারণের অন্তঃপুর

ইন্দুমতী ও কমলমুখী

কমলমুখী। না ভাই ইন্দু, ওরকম করে তুই বলিস নে। তুই যতটা বাড়িয়ে দেখছিস আসলে ততটা কিছু নয়—

ইন্দুমতী। না, তা কিছু নয়! তিনি অতি উত্তম কাজ করেছেন— বাঙালির ঘরে এতবড়ো মহাপুরুষ আর জন্মগ্রহণ করেন নি— ওঁর মহত্ত্বের কথা সোনার জলে ছাপিয়ে কপালে মেরে ওঁকে একবার ঘরে ঘরে দেখিয়ে আনলে হয়! দিদি, এই কদিনে তোর বুদ্ধি খারাপ হয়ে গেছে। তুই কি বলতে চাস আমাদের বিনোদবাবু ভারি উদার স্বভাবের পরিচয় দিয়েছেন।

কমলমুখী। তুই ভাই, সব কথা বড়ো বেশি বাড়িয়ে বলিস, ওটা তোর একটা দোষ ইন্দু। একবার ভালো করে ভেবে দেখ্ দেখি, হঠাৎ একজন লোককে বলা গেল আজ থেকে তুমি অমুক লোকটাকে ভালোবাসবে, সে যদি অমনি তক্‌খনি ঘোড়ায় চড়ে আদেশ পালন করতে না পারে তা হলে তাকে কি দোষ দেওয়া যায়। বিয়ের মন্তর সত্যি যদি ভালোবাসার মন্তর হত তা হলে খেমাপিসির এমন দুর্দশা কেন, তা হলে বিরাজদিদি এতকাল কেঁদে মরছেন কেন।

ইন্দুমতী। ভাই, তোকে দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে গেছি। বিয়ের মন্তর যে ভালোবাসার মন্তর নয় তা কে বলবে। আচ্ছা দিদি, এক রাত্তিরে তোর এত ভালোবাসা জন্মাল কোথা থেকে— বিয়ে হলে কী রকম মনে হয় আমাকে সত্যি করে বল্ দেখি।

কমলমুখী। কী জানি, বিয়ের পরেই মনে হয়, বিধাতা সমস্ত জগৎ থেকে একটি মানুষকে স্বতন্ত্র করে নিয়ে তার সমস্ত সুখদুঃখের ভার আমার উপর দিলেন— আমি তাকে দেখব, সেবা করব, যত্ন করব, তার সংসারের ভার লাঘব করব, আর-সকলের কাছ থেকে তার সমস্ত দোষ দুর্বলতা আবরণ করে রেখে দেব। এইমাত্র যে তাকে বিয়ে করলুম তা মনে হয় না; মনে হয় আজন্মকাল এবং জন্মাবার পূর্বে থেকে এই একমাত্র মানুষের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ হয়েছিল—

ইন্দুমতী। তোর যদি এতটা হল, তো বিনোদবাবুর হয় না কেন।

কমলমুখী। তুই বুঝিস নে ইন্দু, ওরা যে পুরুষমানুষ। আমাদের এক ভাব ওদের আর-এক ভাব। জানিস নে, মার কোলে ছেলেটি হবামাত্রই সে কালোই হোক আর সুন্দরই হোক তাকে সেই মুহূর্ত থেকে ভালোবাসতে না পারলে এ সংসার চলে না— তেমনি স্ত্রীর অদৃষ্টে যে-স্বামীই জোটে তক্‌খনি যদি সে তাকে ভালোবাসতে না পারে তা হলে সে স্ত্রীরই বা কী দশা হয় আর এই পৃথিবীই বা টেকে

কী করে। মেয়েমানুষের ভালোবাসা সবুর করতে পারে না, বিধাতা তার হাতে সে অবসর দেন নি। পুরুষমানুষ রয়ে বসে অনেক ঠেকে অনেক ঘা খেয়ে তার পরে ভালোবাসতে শেখে, ততদিন পৃথিবী সবুর করে থাকে, কাজের ব্যাঘাত হয় না।

ইন্দুমতী। ইস! কী সব নবাব! আচ্ছা দিদি, তুই কি বলিস নিমে গয়লার সঙ্গে আজই যদি আমার বিয়ে হয় অমনি কাল ভোর থেকেই তাড়াতাড়ি তার চরণদুটো ধরে সেবা করতে বসে যাব— মনে করব, ইনি আমার চিরকালের গয়লা, আমার পূর্বজন্মের গয়লা, বিধাতা এঁকে এবং এঁর অন্য গোরুগুলিকে গোয়ালসুদ্ধ আমারই হাতে সমর্পণ করে দিয়েছেন!

কমলমুখী। ইন্দু, তুই কী যে বকিস আমি তোর সঙ্গে পেরে উঠি নে। নিমে গয়লাকে তুই বিয়ে করতে যাবি কেন— সে একে গয়লা তাতে আবার তার দুই বিয়ে।

ইন্দুমতী। আচ্ছা, নাহয় নিমে গয়লা নাই হল— পৃথিবীতে নিমাইচন্দ্রের তো অভাব নেই।

কমলমুখী। তা, তোর অদৃষ্টে যদি কোনো নিমাই থাকে তা হলে অবশ্যি তাকে ভালোবাসবি।—

ইন্দুমতী। কক্‌খনো বাসব না। আচ্ছা, তুমি দেখো। বিয়ে করেছি বলেই যে অমনি তার পরদিন থেকে নিমাই-নিমাই করে খেপে বেড়াব আমাকে তেমন মেয়ে পাও নি। আমি দিদি, তোর মতন না ভাই! তোরা ঐ রকম করিস বলেই তো পুরুষগুলোর দেমাক বেড়ে যায়। নইলে তাদের আছে কী? যেমন মূর্তি তেমনি স্বভাব! সাধে তাদের পায়া ভারী হয়— তোদের যে সেই পায়ে তেল দিতে একদণ্ড তর সয় না। তুই হাসছিস দিদি, কিন্তু আমি সত্যি বলছি, ঐ দাড়িমুখগুলো না হলে কি আর আমাদের একেবারে চলে না। কেন ভাই, তোতে আমাতে তো বেশ ছিলুম। আমাদের কিসের অভাব ছিল। মাঝখানে একজন অপরিচিত পুরুষ এসে আমাদের অপমান করে যায় কেন। যেন আমরা ওঁদের বাড়ির বাগানের বেগুন, ইচ্ছে করলেই তুলে নিতে পারেন, ইচ্ছে করলেই ফেলে দিতে পারেন। আচ্ছা, মনে কর্‌-না, আমিই তোর স্বামী। আমি তোকে যত যত্ন করব, যত ভালোবাসব, তোর সাতগণ্ডা গোঁফদাড়ি তেমন পারবে না।

কমলমুখী। আসলে জানিস ইন্দু, ওদের না হলে আমাদের চলতে পারে কিন্তু আমাদের না হলে পুরুষমানুষের চলে না, সেইজন্যে ওদের আমরা ভালোবাসি। ওরা নিজের যত্ন নিজে করতে জানে না— ওদের সর্বদা সামলে রাখবার এবং দেখবার লোক একজন চাই। মনে হয়, যেন আমাদের চেয়ে ওদের ঢের বেশি জিনিসের দরকার, ওদের মস্ত শরীর, মস্ত খিদে, মস্ত আবদার। আমাদের সব তাতেই চলে যায়, ওদের একটু-কিছু হলেই একেবারে অস্থির হয়ে পড়ে। আমাদের মতো ওদের এমন মনের জোর নেই— ওরা এত সহ্য করতে পারে না। সেইজন্যেই তো ওদের এতটা বেশি ভালোবাসতে হয়, নইলে ওদের কী দশা হত।

নিবারণের প্রবেশ

নিবারণ। মা, তোমাকে দেখলে আমি চোখের জল রাখতে পারি নে। আমার মার কাছে আমি অপরাধী— তোমার কাছে আমার দাঁড়ানো উচিত হয় না।

কমলমুখী। কাকা, আপনি অমন করে বলবেন না; আমার অদৃষ্টে যা ছিল তাই হয়েছে—

ইন্দুমতী। বাবা, আসলে যার অপরাধ তাকে কিছু না বলে তার অপরাধ তোমরা পাঁচজনে কেন ভাগ করে নিচ্ছ আমি তো বুঝতে পারি নে।

নিবারণ। থাক্‌ মা, সে-সব আলোচনা থাক্‌— এখন একটা কাজের কথা বলি, কমল, মন দিয়ে শোনো। তোমাকে এতদিন গরিবের মেয়ে বলে পরিচয় দিয়ে এসেছি, সে-কথাটা ঠিক নয়। তোমার বাপের বিষয়সম্পত্তি নিতান্ত সামান্য ছিল না— আমারই হাতে সে-সমস্ত আছে— ইতিমধ্যে অনেক টাকা জমেছে এবং সুদেও বেড়েছে। তোমার বাপ বলে গিয়েছিলেন তোমার কুড়ি বৎসর বয়স হলে তবে এই-সমস্ত বিষয়সম্পত্তি তোমার হাতে দেওয়া হয়। তাঁর আশঙ্কা ছিল পাছে তোমার বিষয়ের লোভে কেউ তোমাকে বিবাহ করে, তার পরে মদ খেয়ে অসৎ ব্যয় করে উড়িয়ে দেয়। তোমার বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে বিষয় পেলে তুমি তার ইচ্ছামত ব্যবহার করতে পারবে। যদিও তোমার সে বয়স হয়

নি, কিন্তু সুবুদ্ধিতে তোমার সমান আর কে আছে মা! অতএব তোমার সমস্ত বিষয় তুমি এখনই নাও। খুব সম্ভব তা হলে তোমার স্বামীও তোমার কাছে আপনি এসে ধরা দেবে।

ইন্দুমতী। (কানে কানে) বেশ হয়েছে ভাই, এইবার তুই খুব জব্দ করে নিস।

কমলমুখী। কাকা, তাঁকে আপনি এ সংবাদ দেবেন না। আর, এ কথাটা যাতে কেউ টের না পায় আপনাকে তাই করতে হবে।

নিবারণ। কেন বলো দেখি মা।

কমলমুখী। একটু কারণ আছে। সমস্তটা ভেবে আপনাকে পরে বলব।

নিবারণ। আচ্ছা।

[প্রস্থান

ইন্দুমতী। তোর মতলবটা কী আমাকে বল্ তো।

কমলমুখী। আমি আর-একটা বাড়ি নিয়ে ছদ্মবেশে ওঁর কাছে অন্য স্ত্রীলোক বলে পরিচয় দেব।

ইন্দুমতী। সে তো বেশ হবে ভাই। তা হলে আবার তোর সঙ্গে তার ভাব হবে। ওরা ঠিক নিজের স্ত্রীকে ভালোবেসে সুখ পায় না। কিন্তু বরাবর রাখতে পারবি তো?

কমলমুখী। বরাবর রাখবার ইচ্ছে তো আমার নেই বোন—

ইন্দুমতী। ফের আবার এক দিন স্বামী-স্ত্রী সাজতে হবে নাকি।

কমলমুখী। হাঁ ভাই, যতদিন যবনিকাপতন না হয়।

চতুর্থ দৃশ্য

নিমাইয়ের ঘর

নিমাই ও শিবচরণ

শিবচরণ। এই বুড়োবয়েসে তুই যে একটা সামান্য বিষয়ে আমাকে এত দুঃখ দিবি তা কে জানত।

নিমাই। বাবা, এটা কি সামান্য বিষয় হল।

শিবচরণ। আরে বাপু, সামান্য না তো কী। বিয়ে করা বৈ তো নয়। রাস্তার মুটেমজুরগুলোও যে বিয়ে করছে। ওতে তো খুব বেশি বুদ্ধি খরচ করতে হয় না, বরঞ্চ কিছু টাকা খরচ আছে, তা সেও বাপমায়ে জোগায়। তুই এমন বুদ্ধিমান ছেলে, এতগুলো পাস করে শেষকালে এইখানে এসে ঠেকল?

নিমাই। আপনি তো সব শুনেছেন— আমি তো বিয়ে করতে অসম্মত নই—

শিবচরণ। আরে, তাতেই তো আমার বুঝতে আরো গোল বেধেছে। যদি বিয়ে করতেই আপত্তি না থাকে তবে নাহয় একটাকে না করে আর-একটাকেই করলি। নিবারণকে কথা দিয়েছি— আমি তার কাছে মুখ দেখাই কী করে।

নিমাই। নিবারণবাবুকে ভালো করে বুঝিয়ে বললেই সব—

শিবচরণ। আরে, আমি নিজে বুঝতে পারি নে, নিবারণকে বোঝাব কী। আমি যদি তোর মাকে বিয়ে না করে তোর মাসিকে বিয়ে করবার প্রস্তাব মুখে আনতুম, তা হলে তোর ঠাকুরদাদা কি আমার দুখানা হাড় একত্র রাখত। পড়েছিস ভালোমানুষের হাতে—

নিমাই। শুনেছি আমার ঠাকুরদামশায়ের মেজাজ ভালো ছিল না—

শিবচরণ। কী বলিস বেটা। মেজাজ ভালো ছিল না! তোর বাবার চেয়ে তিনশো গুণে ভালো ছিল। কিছু বলি নে বলে বটে!— সে যা হোক, এখন যা হয় একটা কথা ঠিক করেই বল্।

নিমাই। আমি তো বরাবর এক কথাই বলে আসছি।

শিবচরণ। (সরোষে) তুই তো বলছিস এক কথা। আমিই কি এক কথার বেশি বলছি। মাঝের থেকে কথা যে আপনিই দুটো হয়ে যাচ্ছে। আমি এখন নিবারণকে বলি কী। তা সে যা হোক, তুই তা হলে নিবারণের মেয়ে ইন্দুমতীকে কিছুতেই বিয়ে করবি নে? যা বলবি এক কথা বল্।

নিমাই। কিছুতেই না বাবা।

শিবচরণ। একমাত্র বাগবাজারের কাদম্বিনীকেই বিয়ে করবি? ঠিক করে বলিস।

নিমাই। সেই রকমই স্থির করেছি—

শিবচরণ। বড়ো উত্তম কাজ করেছ— এখন আমি নিবারণকে কী বলব।

নিমাই। বলবেন, আপনার অবাধ্য ছেলে তাঁর কন্যা ইন্দুমতীর যোগ্য নয়।

শিবচরণ। কোথাকার নির্লজ্জ! আমাকে আর তোর শেখাতে হবে না। কী বলতে হবে তা আমি বিলক্ষণ জানি। তবে ওর আর কিছুতেই নড়চড় হবে না?

নিমাই। না বাবা, সেজন্যে আপনি ভাববেন না।

শিবচরণ। আরে ম'ল! আমি সেইজন্যেই ভেবে মরছি আর-কি! আমি ভাবছি, নিবারণকে বলি কী।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সুসজ্জিত গৃহ

বিনোদবিহারী

বিনোদবিহারী। এরা বেছে বেছে এত দেশ থাকতে আমাকে উকিল পাকড়ালে কী করে আমি তাই ভাবছি। আমার অদৃষ্ট ভালো বলতে হবে। এখন টিকতে পারলে হয়। যখন মেয়ে প্রভু তখন একটু একটু আশা হয়— একবার কোনো সুযোগে মনটি জোগাড় করতে পারলে স্থায়িত্ব সম্বন্ধে আর কোনো ভাবনা নেই। তা বলি, স্ত্রীলোকের থাকবার স্থান এই বটে। ওরা যে রানীর জাত, দারিদ্র্য ওদের আদবে শোভা পায় না। পুরুষমানুষ জন্মগরিব— সাজসজ্জা ঐশ্বর্য অলংকার আমাদের তেমন মানায় না। সেইজন্যেই তো লক্ষ্মী যেমন সৌন্দর্যের দেবতা তেমনি ধনের দেবতা! শিবটা হল ভিক্ষুক আর দুর্গা হলেন অন্নপূর্ণা। মেয়েমানুষ একেবারে ভরা ভাণ্ডারের মাঝখানে এসে দাঁড়াবে, চারি দিক ঝলসে দেবে— কোথাও যে কিছু অভাব আছে তা কারও চোখে পড়বে না, মনে থাকবে না। আর আমরা গোলাম ওঁদের জন্যে দিনরাত্রি মজুরি করে মরব। বাস্তবিক, ভেবে দেখতে গেলে পুরুষরা যে এত বেশি খেটে মরে সে কেবল মেয়েরা খাটবার জন্যে হয় নি বলে— পাছে ওঁদেরও খাটতে হয়, সেইজন্যে পুরুষকে পুরুষ আর মেয়ে দুয়ের জন্যেই একলা খেটে দিতে হয়— এইজন্যেই পুরুষের চেহারা এবং ভাবখানা এমন চোয়াড়ের মতো কেবল খেটে খাবার উপযুক্ত— খাটুনির মতো এমন আর-কিছু তাকে শোভা পায় না। রানী বসন্তকুমারীকে বোধ করি এই অতুল ঐশ্বর্যেরই উপযুক্ত দেখতে হবে। আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি তাঁর এমন একটি মহিমা আছে যে, তাঁর পায়ের নীচে পৃথিবী নিজের ধুলোমাটির জন্যে ভারি অপ্রতিভ হয়ে পড়ে আছে। কী করবে, বেচারার নড়ে বসবার জায়গা নেই।

ঘোমটা পরিয়া কমলমুখীর প্রবেশ

' যা মনে করেছিলুম তাই বটে। আহা, মুখটি দেখতে পেলে বেশ হত।— আপনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন?

কমলমুখী। হাঁ। আপনি বোধ হয় আমার অবস্থা সবই জানেন।

বিনোদবিহারী। কিছু কিছু শুনেছি।— গলাটা যে তারই মতন শোনাচ্ছে। সব মেয়েরই গলা প্রায় একরকম দেখছি। কিন্তু তার চেয়ে কত মিষ্টি!

কমলমুখী। আমার পুরুষ অভিভাবক কেউ নেই— বিবাহ করি নি পাছে স্বামী আমার চেয়ে আমার বিষয়সম্পত্তির বেশি আদর করেন— পাছে শাঁসটুকু নিয়ে আমাকে খোলার মতো ফেলে দেন।

বিনোদবিহারী। আপনি আমাকে বৈষয়িক পরামর্শের জন্যে ডেকেছেন, অন্য কোনো বিষয়ে কথা বলা আমার উচিত হয় না; কিন্তু মানুষের মানসিক বিষয়েও আমার কিছু অভিজ্ঞতা আছে। আপনি বোধ হয় শুনে থাকবেন আমি অবসরমত কিঞ্চিৎ সাহিত্যচর্চাও করে থাকি। আমাকে ক্ষমা করবেন, কিন্তু বিবাহ সম্বন্ধে আপনি যেরকম ভাবছেন ওটা আপনার ভুল। যেমন বোঁটার সঙ্গে ফুল তেমনি ধনের সঙ্গে স্ত্রী। অর্থাৎ ধন থাকলে স্ত্রীকে গ্রহণ করবার সুবিধা হয়— নইলে তাকে বেশ সুচারুরূপে ধরে রাখবার সুযোগ হয় না। অনেক সময় বোঁটা নেই বলে ফুল হাত থেকে পড়ে যায়, কিন্তু এতবড়ো অরসিক মূর্খ কে আছে যে ফুল ফেলে দিয়ে বোঁটাটি রেখে দেয়!

কমলমুখী। আমি পুরুষজাতকে ভালো চিনি নে, কাজেই সাহস পাই নে। যাই হোক, সংসারকার্যে পুরুষেরা যতই অনাবশ্যক হোক বিষয়কর্ম তাদের না হলে চলে না। তাই আমি আমার সমস্ত বিষয়সম্পত্তির অধ্যক্ষতার ভার আপনার উপর দিতে ইচ্ছে করি—

বিনোদবিহারী। আমার প্রাণপণ সাধ্যে আমি আপনার কাজ করে দেব। সে যে কেবল বেতনের প্রত্যাশায়, অনুগ্রহ করে তা মনে করবেন না। আমাকে কেবলমাত্র আপনার ভৃত্য বলে জানবেন না, আমি—

কমলমুখী। না না, আপনি ভৃত্যের ভাবে থাকবেন কেন— আপনাকে আমার বন্ধুস্বরূপ জ্ঞান করব— আপনি মনে করবেন যেন আপনারই কাজ আপনি করছেন—

বিনোদবিহারী। তার চেয়ে ঢের বেশি মনে করব— কারণ, এ পর্যন্ত কখনো আপনার কাজে আপনি যথেষ্ট মন দিই নি। নিজের স্বার্থরক্ষার চেয়ে উচ্চতর মহত্তর কর্তব্য যেমনভাবে সম্পন্ন করতে হয় আমি তেমনি ভাবে কাজ করব— দেবতার কাজ যেমন প্রাণপণে—

কমলমুখী। না না, আপনি অতটা বেশি কিছু ভাববেন না। আমার সম্পত্তি আপনি দেবোত্তর সম্পত্তি মনে করবেন না। কেবল এইটুকু মনে করলেই যথেষ্ট হবে যে, একজন অনাথা অবলা একান্ত বিশ্বাসপূর্বক আপনার হাতে তার যথাসর্বস্ব সমর্পণ করছে—

বিনোদবিহারী। আপনি আমার উপর এই বিশ্বাস স্থাপন করে আমাকে যে কতখানি অনুগ্রহ করলেন তা আমি বলতে পারি নে। আপনাকে তবে সত্যি কথা বলি, আমি নিতান্ত একটা লক্ষ্মীছাড়া অকর্মণ্য লোক, বোধ হয় শূন্য অহংকারে ফুলে উঠে স্রোতের ফেনার মতো মৃত্যুকাল পর্যন্ত কেবল ভেসে ভেসে বেড়াতুম। আপনার এই বিশ্বাসে আমাকে মানুষ করে তুলবে, আমার জীবনের একটা উদ্দেশ্য হবে— আমি—

কমলমুখী। আপনি এত কথা কেন বলছেন আমি বুঝতে পারছি নে— আমার এ অতি সামান্য কাজ— এর সঙ্গে আপনার জীবনের উদ্দেশ্যের যোগ কী।

বিনোদবিহারী। কাজ যেমনই হোক-না, আপনাদের বিশ্বাস আমাদের যে কত বল দেয় তা আপনারা জানেন না। এই একজন অজ্ঞাত অপরিচিত পুরুষের প্রতি আপনি যে এমন অসন্দিগ্ধভাবে নির্ভর স্থাপন করলেন এজন্যে আপনাকে কখনোই এক মুহূর্তের জন্যও একতিল অনুতাপ করতে হবে না।

কমলমুখী। আপনার কথায় আমি বড়ো নিশ্চিন্ত হলুম। আমার একটা মস্ত ভার দূর হল। আপনাকে আর বেশিক্ষণ আবদ্ধ করে রাখতে চাই নে, আপনার বোধ করি অনেক কাজ আছে—

বিনোদবিহারী। না না, সেজন্যে আপনি ভাববেন না। আমার সহস্র কাজ থাকলেও সমস্ত পরিত্যাগ করে আমি—

কমলমুখী। তা হলে আমার কর্মচারীদের কাছ থেকে আপনি সমস্ত বুঝে পড়ে নিন। নিবারণবাবু এখনই আসবেন, তিনি এলে তাঁর কাছ থেকেও অনেকটা জেনেশুনে নিতে পারবেন।

বিনোদবিহারী। নিবারণবাবু?

কমলমুখী। আপনি তাঁকে চেনেন বোধ হয়, কারণ তিনিই প্রথমে আপনার জন্যে আমার কাছে অনুরোধ করে দিয়েছেন।

বিনোদবিহারী। (স্বগত) ছি ছি ছি, বড়ো লজ্জা বোধ হচ্ছে। আমি কালই আমার স্ত্রীকে ঘরে নিয়ে আসব। এখন তো আমার কোনো অভাব নেই।

কমলমুখী। তবে আমি আসি।

[প্রস্থান

বিনোদবিহারী। না, এরকম স্ত্রীলোক আমি কখনো দেখি নি। কেমন বুদ্ধি, কেমন বেশ আপনাকে আপনি যেন ধারণ করে রেখেছেন। জড়োসড়ো নির্বোধ কাঁচুমাচু ভাব কিচ্ছু নেই অথচ কেমন সলজ্জ সসম্ভ্রম ব্যবহার। আমার মতো একজন অপরিচিত পুরুষের প্রতি এতটা পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভরের কথা বললেন অথচ সেটা কেমন স্বাভাবিক সরল শুনতে হল— কিছুমাত্র বাড়াবাড়ি মনে হল না। এই রকম স্ত্রীলোক দেখলে পুরুষগুলোকে নিতান্ত আনাড়ি জড়ভরত মনে হয়। এই দুটি-চারটি কথা কয়েই মনে হচ্ছে যেন ওঁর সঙ্গে আমার চিরকালের জানাশোনা আছে— যেন ওঁর কাজ করা, ওঁর সেবা করা আমার একটা পরম কর্তব্য। কিন্তু নিবারণবাবুর সঙ্গে রানীর আলাপ আছে শুনে আমার ভয় হচ্ছে পাছে আমার স্ত্রীর কথা সমস্ত শুনতে পান। ছি ছি, সে বড়ো লজ্জার বিষয় হবে। উনি হয়তো ঠিক আমার মনের ভাবটা বুঝতে পারবেন না, আমাকে কী মনে করবেন কে জানে। আমি আজই নিবারণবাবুর বাড়ি গিয়ে আমার স্ত্রীকে নিয়ে আসব।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কমলমুখীর গৃহ

নিবারণ ও কমলমুখী

কমলমুখী। আমার জন্যে আপনি আর কিছু ভাববেন না— এখন ইন্দুর এই গোলটা চুকে গেলেই বাঁচা যায়।

নিবারণ। তাই তো মা, আমাকে ভারি ভাবনা ধরিয়ে দিয়েছে। আমি এ দিকে শিবু ডাক্তারের সঙ্গে কথাবার্তা একরকম স্থির করে বসে আছি, এখন তাকেই বা কী বলি, ললিত চাটুজ্জেকেই বা কোথায় পাওয়া যায়, আর সে বিয়ে করতে রাজি হয় কি না তাই বা কে জানে।

কমলমুখী। সেজন্যে ভাববেন না কাকা। আমাদের ইন্দুকে চোখে দেখলে বিয়ে করতে নারাজ হবে এমন ছেলে কেউ জন্মায় নি।

নিবারণ। ওদের দেখাশুনা হয় কী করে।

কমলমুখী। সে আমি সব ঠিক করেছি।

নিবারণ। তুমি কী করে ঠিক করলে মা।

কমলমুখী। আমি ওঁকে বলে দিয়েছি ওঁর সমস্ত বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতে। তা হলে সেইসঙ্গে ললিতবাবুও আসবেন, তার পর একটা-কোনো উপায় বের করা যাবে।

নিবারণ। তা সব যেন হল, আমি ভাবছি শিবুকে কী বলব।

কমলমুখী। ঐ উনি আসছেন। আমি তবে যাই।

[প্রস্থান

বিনোদবিহারীর প্রবেশ

বিনোদবিহারী। এই যে, আমি এখনই আপনার ওখানেই যাচ্ছিলুম।

নিবারণ। কেন বাপু, আমার ওখানে তো তোমার কোনো মক্কেল নেই।

বিনোদবিহারী। আজ্ঞে, আমাকে আর লজ্জা দেবেন না— আপনি বুঝতেই পারছেন—

নিবারণ। না বাপু, আমি এখনকার কিছুই বুঝতে পারি নে— একটু পরিষ্কার করে খুলে না বললে তোমাদের কথাবার্তা রকমসকম আমার ভালোরূপ ধারণা হয় না।

বিনোদবিহারী। আমার স্ত্রী আপনার ওখানে আছেন—

নিবারণ। তা অবশ্য— তাঁকে তো আমরা ত্যাগ করতে পারি নে—

বিনোদবিহারী। আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে তাঁকে যদি আমার ওখানে পাঠিয়ে দেন—

নিবারণ। বাপু, আবার কেন পালকিভাড়াটা লাগাবে।

বিনোদবিহারী। আপনারা আমাকে কিছু ভুল বুঝছেন। আমার অবস্থা খারাপ ছিল বলেই আমার স্ত্রীকে আপনার ওখানে পাঠিয়েছিলুম, নইলে তাঁকে ত্যাগ করবার অভিপ্রায় ছিল না। এখন আপনারই অনুগ্রহে আমার অবস্থা অনেকটা ভালো হয়েছে— এখন অনায়াসে—

নিবারণ। বাপু, এ তো তোমার পোষা পাখি নয়। সে যে সহজে তোমার ওখানে যেতে রাজি হবে এমন আমার বোধ হয় না।

বিনোদবিহারী। আপনি অনুমতি দিলে আমি নিজে গিয়ে তাঁকে অনুনয় বিনয় করে নিয়ে আসতে পারি।

নিবারণ। আচ্ছা, সে বিষয়ে বিবেচনা করে পরে বলব।

[প্রস্থান

বিনোদবিহারী। বুড়োও তো কম একগুঁয়ে নয় দেখছি। যা হোক, এ পর্যন্ত রানীকে কিছু বলে নি বোধ হয়।

চন্দ্রকান্তের প্রবেশ

বিনোদবিহারী। কী হে চন্দর!

চন্দ্রকান্ত। আর ভাই, মহা বিপদে পড়েছি।

বিনোদবিহারী। কেন, কী হয়েছে।

চন্দ্রকান্ত। কী জানি ভাই, কখন তোদের সাক্ষাতে কথায়-কথায় কী কতকগুলো মিছে কথা বলেছিলুম, তাই শুনে ব্রাহ্মণী বাপের বাড়ি এমনি গা-ঢাকা হয়েছেন যে কিছুতেই তাঁর আর নাগাল পাচ্ছি নে।

বিনোদবিহারী। বল কী দাদা। তোমার বাড়িতে তো এ দণ্ডবিধি পূর্বে প্রচলিত ছিল না।

চন্দ্রকান্ত। না ভাই, কালক্রমে কতই যে হচ্ছে কিছু বুঝতে পারছি নে। ইদিকে আবার দাসী পাঠিয়ে দু বেলা খোঁজ নেওয়া আছে, তা আমি জানতে পাই। আবার শাশুড়ি-ঠাকরুনের নাম করে যথাসময়ে অন্নব্যঞ্জনও আসে। মনে করি রাগ করে খাব না; কিন্তু ভাই, খিদের সময়ে আমি না খেয়ে থাকতে পারি নে তা যতই রাগ হোক।

বিনোদবিহারী। তবে তোমার ভাবনা কী। যদি শ্বশুরবাড়ি থেকে আর-সমস্তই পাচ্ছ, নাহয় একটি বাকি রইল।

চন্দ্রকান্ত। না বিনু, তোরা ঠিক বুঝতে পারবি নে। তুই সেদিন বলছিলি বিয়ে না-করাটাই তোর মুখস্থ হয়ে গেছে। আমার ঠিক তার উলটো। প্রায় সমস্ত জীবন ধরে ঐ স্ত্রীটিকে এমনি বিশ্রী অভ্যেস করে ফেলেছি যে, হঠাৎ বুকের হাড় কখানা খসে গেলে যেমন একদম খালি-খালি ঠেকে, ঐ স্ত্রীটি আড়াল হলেও তেমনি নেহাত ফাঁকা বোধ হয়। মাইরি, সন্ধের পর আমার সে ঘরে আর ঢুকতে ইচ্ছে করে না।

বিনোদবিহারী। এখন উপায় কী।

চন্দ্রকান্ত। মনে করছি আমি উলটে রাগ করব। আমিও ঘর ছেড়ে চলে আসব, তোর এখানেই থাকব। আমার বন্ধুদের মধ্যে তোকেই সে সব চেয়ে বেশি ভয় করে। তার বিশ্বাস, তুই আমার মাথাটি খেয়েছিস ; আমি তাকে বলি, আমার এ ঝুনো মাথায় বিনুর দন্তস্ফুট করবার জো নেই, কিন্তু সে বোঝে না। সে যদি খবর পায় আমি চব্বিশ ঘন্টা তোর সংসর্গে কাটিয়েছি, তা হলে পতিত-উদ্ধারের জন্যে পতিতপাবনী অমনি তৎক্ষণাৎ ছুটে চলে আসবে!

বিনোদবিহারী। তা বেশ কথা। তুমি এখানেই থাকো, যতক্ষণ তোমার সঙ্গ পাওয়া যায় ততক্ষণই লাভ। কিন্তু আমাকে যে আবার শ্বশুরবাড়ি যেতে হচ্ছে।

চন্দ্রকান্ত। কার শ্বশুরবাড়ি।

বিনোদবিহারী। আমার নিজের, আবার কার।

চন্দ্রকান্ত। (সানন্দে বিনোদের পৃষ্ঠে চপেটাঘাত করিয়া) সত্যি বলছিস বিনু?

বিনোদবিহারী। হাঁ ভাই, নিতান্ত লক্ষ্মীছাড়ার মতো থাকতে আর ইচ্ছে করছে না। স্ত্রীকে ঘরে এনে একটু ভদ্রলোকের মতো হতে হচ্ছে। বিবাহ করে আইবুড়ো থাকলে লোকে বলবে কী।

চন্দ্রকান্ত। সে আর আমাকে বোঝাতে হবে না— কিন্তু এতদিন তোর এ আক্কেল ছিল কোথায়। যতকাল আমার সংসর্গে ছিলি এমন-সব সদালাপ সৎপ্রসঙ্গ তো শুনতে পাই নি, দু-দিন আমার দেখা পাস নি আর তোর বুদ্ধি এতদূর পরিষ্কার হয়ে এল ? যা হোক তা হলে আর বিলম্বে কাজ নেই— এখনি চল্— শুভবুদ্ধি মানুষের মাথায় দৈবাৎ উদয় হয় তখন তাকে অবহেলা করা কিছু নয়।

তৃতীয় দৃশ্য

কমলমুখীর গৃহ

ইন্দুমতী ও কমলমুখী

কমলমুখী। তোর জ্বালায় তো আর বাঁচি নে ইন্দু। তুই আবার এ কী জট পাকিয়ে বসে আছিস। ললিতবাবুর কাছে তোকে কাদম্বিনী বলে উল্লেখ করতে হবে না কি।

ইন্দুমতী। তা কী করব দিদি। কাদম্বিনী না বললে যদি সে না চিনতে পারে তা হলে ইন্দু বলে পরিচয় দিয়ে লাভটা কী।

কমলমুখী। ইতিমধ্যে তুই এত কাণ্ড কখন করে তুললি তা তো জানি নে। একটা যে আস্ত নাটক বানিয়ে বসেছিস!

ইন্দুমতী। তোমার বিনোদবাবুকে বোলো, তিনি লিখে ফেলবেন এখন, তার পর মেট্রপলিটান থিয়েটারে অভিনয় দেখতে যাব।

কমলমুখী। তোমার ললিতবাবু সাজতে পারে এমন ছোকরা কি তারা কোথাও খুঁজে পাবে। তুই হয়তো মাঝখান থেকে "ও হয় নি, ও হয় নি" বলে চেঁচিয়ে উঠবি।

ইন্দুমতী। ঐ ভাই, তোমার বিনোদবাবু আসছেন, আমি পালাই।

[প্রস্থান

বিনোদবিহারীর প্রবেশ

বিনোদবিহারী। মহারানী, আমার বন্ধুরা এলে কোথায় তাঁদের বসাব।

কমলমুখী। এই ঘরেই বসাবেন।

বিনোদবিহারী। ললিতের সঙ্গে আপনার যে বন্ধুর বিবাহ স্থির করতে হবে তাঁর নামটি কী।

কমলমুখী। কাদম্বিনী। বাগবাজারের চৌধুরীদের মেয়ে।

বিনোদবিহারী। আপনি যখন আদেশ করছেন আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব। কিন্তু ললিতের কথা

আমি কিছুই বলতে পারি নে। সে যে এ-সব প্রস্তাবে আমাদের কারও কথায় কর্ণপাত করবে এমন বোধ হয় না—

কমলমুখী। আপনাকে সেজন্যে বোধ হয় বেশি চেষ্টা করতেও হবে না—কাদম্বিনীর নাম শুনলেই তিনি আর বড়ো আপত্তি করবেন না।

বিনোদবিহারী। তা হলে তো আর কথাই নেই।

কমলমুখী। মাপ করেন যদি আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই।

বিনোদবিহারী। এখনই। (স্বগত) স্ত্রীর কথা না তুললে বাঁচি।

কমলমুখী। আপনার স্ত্রী নেই কি।

বিনোদবিহারী। কেন বলুন দেখি। স্ত্রীর কথা কেন জিজ্ঞাসা করছেন।

কমলমুখী। আপনি তো অনুগ্রহ করে এই বাড়িতেই বাস করছেন, তা হলে আপনার স্ত্রীকে আমি আমার সঙ্গিনীর মতো করে রাখতে চাই। অবিশ্যি যদি আপনার কোনো আপত্তি না থাকে।

বিনোদবিহারী। আপত্তি। কোনো আপত্তিই থাকতে পারে না। এ তো আমার সৌভাগ্যের কথা।

কমলমুখী। আজ সন্ধের সময় তাঁকে আনতে পারেন না?

বিনোদবিহারী। আমি বিশেষ চেষ্টা করব।

[কমলের প্রস্থান

কিন্তু কী বিপদেই পড়েছি। এ দিকে আবার আমার স্ত্রী কিছুতেই আমার বাড়ি আসতে চায় না— আমার সঙ্গে দেখা করতেই চায় না। কী যে করি ভেবে পাই নে। অনুনয় করে একখানা চিঠি লিখতে হচ্ছে।

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। একটি সাহেব-বাবু এসেছেন।

বিনোদবিহারী। এইখানেই ডেকে নিয়ে আয়।

সাহেবি বেশে ললিতের প্রবেশ

ললিত। (শেকহ্যান্ড করিয়া) Well! How goes the world? ভালো তো?

বিনোদবিহারী। একরকম ভালোয় মন্দয়। তোমার কীরকম চলছে।

ললিত। Pretty well! জান, I am going in for studentship next year!

বিনোদবিহারী। ওহে, আর কত দিন একজামিন দিয়ে মরবে? বিয়েথাওয়া করতে হবে না নাকি। এ দিকে যৌবনটা যে ভাঁটিয়ে গেল।

ললিত। Hallo! You seem to have queer ideas on the subject! কেবল যৌবনটুকু নিয়ে one can't marry! I suppose first of all you must get a girl whom you—

বিনোদবিহারী। আহা, তা তো বটেই। আমি কি বলছি তুমি তোমার নিজের হাতপাগুলোকে বিয়ে করবে? অবিশ্যি মেয়ে একটি আছে।

ললিত। I know that! একটি কেন। মেয়ে there is enough and to spare! কিন্তু তা নিয়ে তো কথা হচ্ছে না।

বিনোদবিহারী। আহা, তোমাকে নিয়ে তো ভালো বিপদে পড়া গেল। পৃথিবীর সমস্ত কন্যাদায় তোমাকে হরণ করতে হবে না। কিন্তু যদি একটি বেশ সুন্দরী সুশিক্ষিত বয়ঃপ্রাপ্ত মেয়ে তোমাকে দেওয়া যায় তা হলে কী বল?

ললিত। I admire your cheek বিনু। তুমি wife select করবে আর আমি marry করব! I don't see any rhyme or reason in such co-operation। পোলিটিক্যাল ইকনমিতে division of labour আছে কিন্তু there is no such thing in marriage।

বিনোদবিহারী। তা বেশ তো, তুমি দেখো, তার পরে তোমার পছন্দ না হয় বিয়ে কোরো না—

ললিত। My dear fellow, you are very kind! কিন্তু আমি বলি কি, you need not bother yourself about my happiness! আমার বিশ্বাস আমি যদি কখনো কোনো girlকে love করি I will love her without your help এবং তার পরে যখন বিয়ে করব You'll get your invitation in due form!

বিনোদবিহারী। আচ্ছা ললিত, যদি সে মেয়েটির নাম শুনলেই তোমার পছন্দ হয়?

ললিত। The idea! নাম শুনে পছন্দ! যদি মেয়েটিকে বাদ দিয়ে simply নামটিকে বিয়ে করতে বল, that's a safe proposition!

বিনোদবিহারী। আগে শোনো, তার পর যা বলতে হয় বোলো— মেয়েটির নাম— কাদম্বিনী।

ললিত। কাদম্বিনী! She may be all that is nice and good কিন্তু I must confess, তার নাম নিয়ে তাকে congratulate করা যায় না। যদি তার নামটাই তার best qualification হয় তা হলে I should try my luck in some other quarter!

বিনোদবিহারী। (স্বগত) এর মানে কী। তবে যে রানী বললেন কাদম্বিনীর নাম শুনলেই লাফিয়ে উঠবে। দূর হোক গে। একে খাওয়ানোটাই বাজে খরচ হল— আবার এই ম্লেচ্ছটার সঙ্গে আরো আমাকে নিদেন দু ঘণ্টা কাল কাটাতে হবে দেখছি।

ললিত। I say, it's infernally hot here— চলো-না বারান্দায় গিয়ে বসা যাক।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কমলমুখীর অন্তঃপুর

কমলমুখী ও ইন্দুমতী

ইন্দুমতী। দিদি, আর বলিস নে দিদি, আর বলিস নে। পুরুষমানুষকে আমি চিনেছি। তুই বাবাকে বলিস আমি আর কাউকে বিয়ে করব না।

কমলমুখী। তুই ললিতবাবু থেকে সব পুরুষ চিনলি কী করে ইন্দু।

ইন্দুমতী। আমি জানি, ওরা কেবল কবিতায় ভালোবাসে, তা ছন্দ মিলুক আর না মিলুক। তার পরে যখন সুখদুঃখ সমেত ভালোবাসার সমস্ত কর্তব্যভার মাথায় করবার সময় আসে তখন ওদের আর সাড়া পাওয়া যায় না। ছি ছি, ছি ছি, দিদি, আমার এমনি লজ্জা করছে! ইচ্ছে করছে মাটির সঙ্গে মাটি হয়ে মিশে যাই। বাবাকে আমার এ মুখ দেখাব কী করে। কাদম্বিনীকে সে চেনে না? মিথ্যেবাদী! কাদম্বিনীর নামে কবিতা লিখেছে সে-খাতা এখনো আমার কাছে আছে।

কমলমুখী। যা হয়ে গেছে তা নিয়ে ভেবে আর করবি কী। এখন কাকা যাকে বলছেন তাকে বিয়ে কর্। তুই কি সেই মিথ্যেবাদী অবিশ্বাসীর জন্যে চিরজীবন কুমারী হয়ে থাকবি। একে বেশি বয়স পর্যন্ত মেয়ে রাখায় জন্যে কাকাকে প্রায় একঘরে করেছে।

ইন্দুমতী। তা, দিদি, কলাগাছ তো আছে। সে তো কোনো উৎপাত করে না। ঐ বাবা আসছেন, আমি যাই ভাই।

[প্রস্থান

নিবারণের প্রবেশ

নিবারণ। কী করি বল্ তো মা। ললিত চাটুজ্জে যা বলেছে সে তো সব শুনেছিস। সে বিনোদকে কেবল মারতে বাকি রেখেছে, অপমান যা হবার তা হয়েছে।

কমলমুখী। না কাকা, তার কাছে ইন্দুর নাম করা হয় নি, আপনার মেয়ের কথা হচ্ছে তাও সে জানে না।

নিবারণ। ইদিকে আবার শিবুকে কথা দিয়েছি তাকেই বা কী বলি— আবার মেয়ের পছন্দ না হলে জোর করে বিয়ে দেওয়া সে আমি পারব না— একটি যা হয়ে গেছে তারই অনুতাপ রাখবার জায়গা পাচ্ছি নে। তুমি মা, ইন্দুকে বলে কয়ে ওদের দুজনের দেখা করিয়ে দিতে পার তো বড়ো ভালো হয়। আমি নিশ্চয় জানি ওরা পরস্পরকে একবার দেখলে পছন্দ না করে থাকতে পারবে না। নিমাই ছেলেটিকে বড়ো ভালো দেখতে— তাকে দর্শন মাত্রেই স্নেহ জন্মায়।

কমলমুখী। নিমাইয়ের মনের ইচ্ছে কী সেটাও তো জানতে হবে কাকা। আবার কি এইরকম একটি কাণ্ড বাধানো ভালো।

নিবারণ। সে আমি তার বাপের কাছে শুনেছি। সে বলে আমি উপার্জন না করে বিয়ে করব না। সে তো আমার মেয়েকে কখনো চক্ষে দেখে নি। একবার দেখলে ও-সব কথা ছেড়ে দেবে। বিশেষ, তার বাপ তাকে খুব পীড়াপীড়ি করছে। আমি চন্দ্রবাবুকে বলে তাকে একবার ইন্দুর সঙ্গে দেখা করতে রাজি করব। চন্দ্রবাবুর কথা সে খুব মানে।

কমলমুখী। তা, ইন্দুকে আমি সম্মত করাতে পারব।

[নিবারণের প্রস্থান

ইন্দুমতীর প্রবেশ

কমলমুখী। লক্ষ্মী দিদি আমার, আমার একটি অনুরোধ তোকে রাখতে হবে।

ইন্দুমতী। কী বল্-না ভাই।

কমলমুখী। একবার নিমাইবাবুর সঙ্গে তুই দেখা কর্।

ইন্দুমতী। কেন দিদি, তাতে আমার কী প্রায়শ্চিত্তটা হবে।

কমলমুখী। দেখ্ ইন্দু, এ তো ভাই ইংরেজের ঘর নয়, তোকে তো বিয়ে করতেই হবে। মনটাকে অমন করে বন্ধ করে রাখিস নে— তুই যা মনে করিস ভাই, পুরুষমানুষ নিতান্তই বাঘভাল্লুকের জাত নয়— বাইরে থেকে খুব ভয়ংকর দেখায়, কিন্তু ওদের বশ করা খুব সহজ। একবার পোষ মানলে ঐ মস্ত প্রাণীগুলো এমনি গরিব গোবেচারা হয়ে থাকে যে দেখে হাসি পায়। পুরুষমানুষের মধ্যে তুই কি ভদ্রলোক দেখিস নি। কেন ভাই, কাকার কথা একবার ভেবে দেখ্-না।

ইন্দুমতী। তুই আমাকে এত কথা বলছিস কেন দিদি। আমি কি পুরুষমানুষের দুয়োরে আগুন দিতে যাচ্ছি। তারা খুব ভালো লোক, আমি তাদের কোনো অনিষ্ট করতে চাই নে।

কমলমুখী। তোর যখন যা ইচ্ছে তাই করেছিস ইন্দু, কাকা তাতে কোনো বাধা দেন নি। আজ কাকার একটি অনুরোধ রাখবি নে?

ইন্দুমতী। রাখব ভাই— তিনি যা বলবেন তাই শুনব।

কমলমুখী। তবে চল্, তোর চুলটা একটু ভালো করে দিই। নিজের উপরে এতটা অযত্ন করিস নে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কমলমুখীর গৃহ

নিমাই

নিমাই। চন্দর যখন পীড়াপীড়ি করছে তা নাহয় একবার ইন্দুমতীর সঙ্গে দেখা করাই যাক। শুনেছি তিনি বেশ বুদ্ধিমতী সুশিক্ষিতা মেয়ে— তাঁকে আমার অবস্থা বুঝিয়ে বললে তিনি নিজেই আমাকে বিয়ে করতে অসম্মত হবেন। তা হলে আমার ঘাড় থেকে দায়টা যাবে— বাবাও আর পীড়াপীড়ি করবেন না।

ঘোমটা পরিয়া ইন্দুমতীর প্রবেশ

ইন্দুমতী। বাবা যখন বলছেন তখন দেখা করতেই হবে; কিন্তু কারও অনুরোধে তো আর পছন্দ হয় না। বাবা কখনোই আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিয়ে দেবেন না।

নিমাই। (নতশিরে ইন্দুর প্রতি) আমাদের মা-বাপ আমাদের পরস্পরের বিবাহের জন্য পীড়াপীড়ি করছেন, কিন্তু আপনি যদি ক্ষমা করেন তো আপনাকে একটি কথা বলি—

ইন্দুমতী। এ কী! এ যে ললিতবাবু! (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) ললিতবাবু, আপনাকে বিবাহের জন্য যাঁরা পীড়াপীড়ি করছেন তাঁদের আপনি জানাবেন বিবাহ একপক্ষের সম্মতিতে হয় না। আমাকে আপনার বিবাহের কথা বলে কেন অপমান করছেন।

নিমাই। এ কী! এ যে কাদম্বিনী! (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) আপনি এখানে আমি তা জানতুম না। আমি মনে করেছিলুম নিবারণবাবুর কন্যা ইন্দুমতীর সঙ্গে আমি কথা কচ্ছি— কিন্তু আমার যে এমন সৌভাগ্য হবে—

ইন্দুমতী। ললিতবাবু, আপনার সৌভাগ্য আপনি মনে মনে রেখে দেবেন, সে কথা আমার কাছে প্রচার করবার দরকার দেখি নে।

নিমাই। আপনি কাকে ললিতবাবু বলছেন? ললিতবাবু বারান্দায় বিনোদের সঙ্গে গল্প করছেন— যদি আবশ্যক থাকে তাঁকে ডেকে নিয়ে আসি।

ইন্দুমতী। না না, তাঁকে ডাকতে হবে না। আপনি তা হলে কে।

নিমাই। এর মধ্যেই ভুলে গেলেন? চন্দ্রবাবুর বাসায় আপনি নিজে আমাকে চাকরি দিয়েছেন, আমি তৎক্ষণাৎ তা মাথায় করে নিয়েছি— ইতিমধ্যে বরখাস্ত হবার মতো কোনো অপরাধ করি নি তো।

ইন্দুমতী। আপনার নাম কি ললিতবাবু নয়।

নিমাই। যদি পছন্দ করেন তো ঐ নামই শিরোধার্য করে নিতে পারি কিন্তু বাপ-মায়ে আমার নাম রেখেছিলেন নিমাই।

ইন্দুমতী। নিমাই!— ছি ছি, এ কথা আমি আগে জানতে পারলুম না কেন।

নিমাই। তা হলে কি চাকরি দিতেন না? তবে তো না জেনে ভালোই হয়েছে। এখন কী আদেশ করেন।

ইন্দুমতী। আমি আদেশ করছি ভবিষ্যতে যখন আপনি কবিতা লিখবেন তখন কাদম্বিনীর পরিবর্তে ইন্দুমতী নামটি ব্যবহার করবেন এবং ছন্দ মিলিয়ে লিখবেন।

নিমাই। যে দুটো আদেশ করলেন ও দুটোই যে আমার পক্ষে সমান অসাধ্য।

ইন্দুমতী। আচ্ছা ছন্দ মেলাবার ভার আমি নেব এখন, নামটা আপনি বদলে নেবেন—

নিমাই। এমন নিষ্ঠুর আদেশ কেন করছেন। চোদ্দটা অক্ষরের জায়গায় সতেরোটা বসানো কি এমনি গুরুতর অপরাধ যে সেজন্যে ভৃত্যকে একেবারে—

ইন্দুমতী। না, সে অপরাধ আমি সহস্র বার মার্জনা করতে পারি কিন্তু ইন্দুমতীকে কাদম্বিনী বলে

ভুল করলে আমার সহ্য হবে না—

নিমাই। আপনার নাম তবে—

ইন্দুমতী। ইন্দুমতী। তার প্রধান কারণ আপনার বাপ-মা যেমন আপনার নাম রেখেছেন নিমাই, তেমনি আমার বাপ-মা আমার নাম রেখেছেন ইন্দুমতী।

নিমাই। হায় হায়, আমি এতদিন কী ভুলটাই করেছি। বাগবাজারের রাস্তায় রাস্তায় বৃথা ঘুরে বেড়িয়েছি, বাবা আমাকে উঠতে বসতে দু বেলা বাপান্ত করেছেন, কাদম্বিনী নামটা ছন্দের ভিতর পুরতে মাথা ভাঙাভাঙি করেছি—

(মৃদুস্বরে) যেমনি আমায় ইন্দু প্রথম দেখিলে
কেমন করে চকোর বলে তখনি চিনিলে—

কিংবা

কেমন করে চাকর বলে তখনি চিনিলে

আহা সে কেমন হত!

ইন্দুমতী। তবে, এখন ভ্রম সংশোধন করুন— এই নিন আপনার খাতা। আমি চললুম।

[প্রস্থানোদ্যম

নিমাই। আপনারও বোধ হচ্ছে যেন একটা ভ্রম হয়েছিল— সেটাও অনুগ্রহ করে সংশোধন করে নেবেন—— আপনার একটা সুবিধে আছে, আপনাকে আর সেইসঙ্গে ছন্দ বদলাতে হবে না।

[ইন্দুমতীর প্রস্থান

নিবারণের প্রবেশ

নিবারণ। দেখো বাপু, শিবু আমার বাল্যকালের বন্ধু— আমার বড়ো ইচ্ছে তাঁর সঙ্গে আমার একটা পারিবারিক বন্ধন হয়। এখন তোমাদের ইচ্ছের উপরেই সমস্ত নির্ভর করছে।

নিমাই। আমার ইচ্ছের জন্যে আপনি কিছু ভাববেন না, আপনার আদেশ পেলেই আমি কৃতার্থ হই।

নিবারণ। (স্বগত) যা মনে করেছিলুম তাই। বুড়ো বাপ মাথা খোঁড়াখুঁড়ি করে যা করতে না পারলে, একবার ইন্দুকে দেখবামাত্র সমস্ত ঠিক হয়ে গেল। বুড়োরাই শাস্তর মেনে চলে— যুবোদের শাস্ত্রই এক আলাদা— তা বাপু, তোমার কথা শুনে বড়ো আনন্দ হল। তা হলে একবার আমার মেয়েকে তার মতটা জিজ্ঞাসা করে আসি। তোমরা শিক্ষিত লোক, বুঝতেই পার, বয়ঃপ্রাপ্ত মেয়ে, তার সম্মতি না নিয়ে তাকে বিবাহ দেওয়া যায় না।

নিমাই। তা অবশ্য।

নিবারণ। তা হলে আমি একবার আসি। চন্দ্রবাবুদের এই ঘরে ডেকে দিয়ে যাই।

[প্রস্থান

শিবচরণের প্রবেশ

শিবচরণ। তুই এখানে বসে রয়েছিস, আমি তোকে পৃথিবীসুদ্ধ খুঁজে বেড়াচ্ছি।

নিমাই। কেন বাবা।

শিবচরণ। তোকে যে আজ তারা দেখতে আসবে।

নিমাই। কারা।

শিবচরণ। বাগবাজারের চৌধুরীরা।

নিমাই। কেন।

শিবচরণ। কেন! না-দেখে না-শুনে অমনি ফস করে বিয়ে হয়ে যাবে? তোর বুঝি আর সবুর সইছে না?

নিমাই। বিয়ে কার সঙ্গে হবে।

শিবচরণ। ভয় নেই রে বাপু, তুই যাকে চাস তারই সঙ্গে হবে। আমার ছেলে হয়ে তুই যে এত টাকা চিনেছিস তা তো জানতুম না; তা সেই বাগবাজারের ট্যাকশালের সঙ্গেই তোর বিয়ে স্থির করে এসেছি।

নিমাই। সে কী বাবা। আপনার মতের বিরুদ্ধে আমি বিয়ে করতে চাই নে— বিশেষ, আপনি নিবারণবাবুকে কথা দিয়েছেন—

শিবচরণ। (অনেকক্ষণ হাঁ করিয়া নিমাইয়ের মুখের দিকে নিরীক্ষণ) তুই খেপেছিস না আমি খেপেছি আমাকে কে বুঝিয়ে দেবে! কথাটা একটু পরিষ্কার করে বল্, আমি ভালো করে বুঝি।

নিমাই। আমি সে চৌধুরীদের মেয়ে বিয়ে করব না।

শিবচরণ। চৌধুরীদের মেয়ে বিয়ে করবি নে! তবে কাকে করবি!

নিমাই। নিবারণবাবুর মেয়ে ইন্দুমতীকে।

শিবচরণ। (উচ্চৈঃস্বরে) কী! হতভাগা পাজি লক্ষ্মীছাড়া বেটা! যখন ইন্দুমতীর সঙ্গে তোর সম্বন্ধ করি তখন বলিস কাদম্বিনীকে বিয়ে করবি, আবার যখন কাদম্বিনীর সঙ্গে সম্বন্ধ করি তখন বলিস ইন্দুমতীকে বিয়ে করবি— তুই তোর বুড়ো বাপকে একবার বাগবাজার একবার মির্জাপুর খেপিয়ে নিয়ে নাচিয়ে নিয়ে বেড়াতে চাস!

নিমাই। আমাকে মাপ করুন বাবা, আমার একটা মস্ত ভুল হয়ে গিয়েছিল—

শিবচরণ। ভুল কী রে বেটা! তোকে সেই বাগবাজারে বিয়ে করতেই হবে। তাদের কোনো পুরুষে চিনি নে, আমি নিজে গিয়ে তাদের স্তুতিমিনতি করে এলুম, যেন আমারই কন্যেদায় হয়েছে— তার পরে যখন সমস্ত ঠিকঠাক হয়ে গেল, আজ তারা আশীর্বাদ করতে আসবে, তখন বলে কিনা আমি বিয়ে করব না। আমি এখন চৌধুরীদের বলি কী।

চন্দ্রকান্তের প্রবেশ

চন্দ্রকান্ত। (নিমাইয়ের প্রতি) সমস্ত শুনলুম। ভালো একটি গোল বাধিয়েছ যা হোক।— এই যে ডাক্তারবাবু, ভালো আছেন তো?

শিবচরণ। ভালো আর থাকতে দিলে কই। এই দেখো-না চন্দর, ওঁর নিজেরই কথামত একটি পাত্রী স্থির করলুম— যখন সমস্ত স্থির হয়ে গেল তখন বলে কিনা, তাকে বিয়ে করব না। আমি এখন চৌধুরীদের বলি কী।

নিমাই। বাবা, আপনি তাদের একটু বুঝিয়ে বললেই—

শিবচরণ। তোমার মাথা! তাদের বোঝাতে হবে আমার ভীমরতি ধরেছে আর আমার ছেলেটি একটি আস্ত খ্যাপা— তা তাদের বুঝতে বিলম্ব হবে না।

চন্দ্রকান্ত। আপনি কিছু ভাববেন না। সে মেয়েটির আর-একটি পাত্র জুটিয়ে দিলেই হবে।

শিবচরণ। সে তেমন মেয়েই নয়। তার টাকা আছে ঢের, কিন্তু চেহারা দেখে পাত্র এগোয় না। আমার বংশের এই অকালকুষ্মাণ্ডের মতো হঠাৎ এতবড়ো তুমি দ্বিতীয় আর কোথায় পাবে যে তাকে বিয়ে করতে রাজি হবে।

চন্দ্রকান্ত। সে আমার উপর ভার রইল। আমি সমস্ত ঠিকঠাক করে দেব। এখন নিশ্চিন্ত মনে নিবারণবাবুর মেয়ের সঙ্গে বিবাহ স্থির করুন।

শিবচরণ। যদি পার চন্দর তো বড়ো উপকার হয়। এই বাগবাজারের হাত থেকে মানে মানে নিস্তার পেলে বাঁচি। এ দিকে আমি নিবারণের কাছে মুখ দেখাতে পারছি নে, পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি।

চন্দ্রকান্ত। সেজন্যে কোনো ভাবনা নেই। আমি প্রায় অর্ধেক কাজ গুছিয়ে এসে তবে আপনাকে বলছি। এখন বাকিটুকু সেরে আসি।

[প্রস্থান

নিবারণের প্রবেশ

শিবচরণ। আরে এসো ভাই, এসো।

নিবারণ। ভালো আছ ভাই? যা হোক শিবু, কথা তো স্থির?

শিবচরণ। সে তো বরাবরই স্থির আছে, এখন তোমার মর্জি হলেই হয়।

নিবারণ। আমারও তো সমস্ত ঠিক হয়ে আছে, এখন হয়ে গেলেই চুকে যায়।

শিবচরণ। তবে আর কী, দিনক্ষণ দেখে—

নিবারণ। সে-সব কথা পরে হবে— এখন কিছু মিষ্টিমুখ করবে চলো।

শিবচরণ। না ভাই, এখন আমার খাওয়াটা অভ্যাস নেই, এখন থাক্— অসময়ে খেয়েছি কি, আর আমার মাথা ধরেছে—

নিবারণ। না না, সে হবে না, কিছু খেতে হচ্ছে। বাপু, তুমিও এসো।

তৃতীয় দৃশ্য

কমলমুখীর অন্তঃপুর

কমলমুখী ও ইন্দুমতী

কমলমুখী। ছি ছি, ইন্দু, তুই কী কাণ্ডটাই করলি বল্ দেখি।

ইন্দুমতী। তা বেশ করেছি। ভাই, পরে গোল বাধার চেয়ে আগে গোল চুকে যাওয়া ভালো।

কমলমুখী। এখন পুরুষজাতটাকে কী রকম লাগছে।

ইন্দুমতী। মন্দ না ভাই, একরকম চলনসই।

কমলমুখী। তুই যে বলেছিলি ইন্দু, নিমাই গয়লাকে তুই কক্খনো বিয়ে করবি নে।

ইন্দুমতী। না ভাই, নিমাই নামটি খারাপ নয়, তা তোমরা যাই বল। তোমার নলিনীকান্ত, ললনামোহন, রমণীরঞ্জনের চেয়ে সহস্র গুণে ভালো। নিমাই নামটি খুব আদরের নাম, অথচ পুরুষমানুষকে বেশ মানায়। রাগ করিস নে দিদি, তোর বিনোদের চেয়ে ঢের ভালো—

কমলমুখী। কী হিসেবে ভালো শুনি।

ইন্দুমতী। বিনোদবিহারী নামটা যেন টাটকা নভেল-নাটক থেকে পেড়ে এনেছে— বড্ডো বেশি গায়ে-পড়া কবিত্ব। মানুষের চেয়ে নামটা জাঁকালো। আর, নিমাই নামটি কেমন বেশ সাদাসিধে, কোনো দেমাক নেই, ভঙ্গিমে নেই— বেশ নিতান্ত আপনার লোকটির মতো।

কমলমুখী। কিন্তু যখন বই ছাপাবে, বইয়ে ও-নাম তো মানাবে না।

ইন্দুমতী। আমি তো ওঁকে ছাপতে দেব না, খাতাখানি আগে আটক করে রাখব। আমার ততটুকু বুদ্ধি আছে দিদি—

কমলমুখী। তা, যে নমুনা দেখিয়েছিলি।— তোর সেটুকু বুদ্ধি আছে জানি, কিন্তু শুনেছি বিয়ে করলে আবার স্বামীর লেখা সম্বন্ধে মত বদলাতে হয়।

ইন্দুমতী। আমার তো তার দরকার হবে না। সে লেখা তোদের ভালো লাগে না— আমার ভালো লেগেছে। সে আরো ভালো— আমার কবি কেবল আমারই কবি থাকবে, পৃথিবীতে তাঁর কেবল একটিমাত্র পাঠক থাকবে—

কমলমুখী। ছাপবার খরচ বেঁচে যাবে—

ইন্দুমতী। সবাই তাঁর কবিত্বের প্রশংসা করলে আমার প্রশংসার মূল্য থাকবে না।

কমলমুখী। সে ভয় তোকে করতে হবে না। যা হোক, তোর গয়লাটিকে তোর পছন্দ হয়েছে তা নিয়ে তোর সঙ্গে ঝগড়া করতে চাই নে। তাকে নিয়ে তুই চিরকাল সুখে থাক্ বোন। তোর গোয়াল দিনে দিনে পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক।

ইন্দুমতী। ঐ বিনোদবাবু আসছেন। মুখটা ভারি বিমর্ষ দেখছি।

[প্রস্থান

বিনোদবিহারীর প্রবেশ

কমলমুখী। তাঁকে এনেছেন?

বিনোদবিহারী। তিনি তাঁর বাপের বাড়ি গেছেন, তাঁকে আনবার তেমন সুবিধে হচ্ছে না।

কমলমুখী। আমার বোধ হচ্ছে তিনি যে আমার সঙ্গিনীভাবে এখানে থাকেন সেটা আপনার আন্তরিক ইচ্ছে নয়।

বিনোদবিহারী। আপনাকে আমি বলতে পারি নে, তিনি এখানে আপনার কাছে থাকলে আমি কত সুখী হই। আপনার দৃষ্টান্তে তাঁর কত শিক্ষা হয়। যথার্থ ভদ্র স্ত্রীলোকের কী রকম আচারব্যবহার কথাবার্তা হওয়া উচিত তা আপনার কাছে থাকলে তিনি বুঝতে পারবেন। বেশ সম্ভ্রম রক্ষা করে চলা অথচ নিতান্ত জড়োসড়ো হয়ে না থাকা, বেশ শোভন লজ্জাটুকু রাখা অথচ সহজভাবে চলাফেরা, এক দিকে উদার সহৃদয়তা আর-এক দিকে উজ্জ্বল বুদ্ধি, এমন দৃষ্টান্ত তিনি আর কোথায় পাবেন।

কমলমুখী। আমার দৃষ্টান্ত হয়তো তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। শুনেছি আপনি তাঁকে অল্পদিন হল বিবাহ করেছেন, হয়তো তাঁকে ভালো করে জানেন না—

বিনোদবিহারী। তা বটে। কিন্তু যদিও তিনি আমার স্ত্রী তবু এ কথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে আপনার সঙ্গে তাঁর তুলনা হতে পারে না।

কমলমুখী। ও কথা বলবেন না। আপনি হয়তো জানেন না আমি তাঁকে বাল্যকাল হতে চিনি। তাঁর চেয়ে আমি যে কোনো অংশে শ্রেষ্ঠ এমন আমার বোধ হয় না।

বিনোদবিহারী। আপনি তাঁকে চেনেন?

কমলমুখী। খুব ভালোরকম চিনি।

বিনোদবিহারী। আমার সম্বন্ধে তিনি আপনার কাছে কোনো কথা বলেছেন?

কমলমুখী। কিছু না। কেবল বলেছেন, তিনি আপনার ভালোবাসার যোগ্য নন। আপনাকে সুখী করতে না পেরে এবং আপনার ভালোবাসা না পেয়ে, তাঁর সমস্ত জীবনটা ব্যর্থ হয়ে আছে।

বিনোদবিহারী। এ তাঁর ভারি ভ্রম। তবে আপনার কাছে স্পষ্ট স্বীকার করি আমিই তাঁর ভালোবাসার যোগ্য নই। আমি তাঁর প্রতি বড়ো অন্যায় করেছি, কিন্তু সে তাঁকে ভালোবাসি নে বলে নয়। আমি দরিদ্র, বিবাহের পূর্বে সে কথা ভালো বুঝতে পারতুম না— কিন্তু লক্ষ্মীকে ঘরে এনেই যেন অলক্ষ্মীকে দ্বিগুণ স্পষ্ট দেখতে পেলুম; মনটা প্রতিমুহূর্তে অসুখী হতে লাগল। সেইজন্যেই আমি তাঁকে বাপের বাড়ি পাঠিয়েছিলুম। তার পরে আপনার অনুগ্রহে আমার অবস্থা সচ্ছল হয়ে অবধি তাঁর অভাব আমি সর্বদাই অনুভব করি—তাঁকে আনবার অনেক চেষ্টা করছি, কিন্তু কিছুতেই তিনি আসছেন না। অবশ্য, তিনি রাগ করতে পারেন, কিন্তু আমি কী এত বেশি অপরাধ করেছি!

কমলমুখী। তবে আর একটি সংবাদ আপনাকে দিই। আপনার স্ত্রীকে আমি এখানে আনিয়ে রেখেছি।

বিনোদবিহারী। (আগ্রহে) কোথায় আছেন তিনি, আমার সঙ্গে একবার দেখা করিয়ে দিন।

কমলমুখী। তিনি ভয় করছেন পাছে আপনি তাঁকে ক্ষমা না করেন— যদি অভয় দেন—

বিনোদবিহারী। বলেন কী, আমি তাঁকে ক্ষমা করব! তিনি যদি আমাকে ক্ষমা করতে পারেন—

কমলমুখী। তিনি কোনোকালেই আপনাকে অপরাধী করেন নি, সেজন্যে আপনি ভাববেন না—

বিনোদবিহারী। তবে এত মিনতি করছি তিনি আমাকে দেখা দিচ্ছেন না কেন।

কমলমুখী। আপনি সত্যই যে তাঁর দেখা চান এ জানতে পারলে তিনি এক মুহূর্ত গোপন থাকতেন না। তবে নিতান্ত যদি সেই পোড়ারমুখ দেখতে চান তো দেখুন।

[মুখ উদ্‌ঘাটন

বিনোদবিহারী। আপনি! তুমি! কমল! আমাকে মাপ করলে!

ইন্দুমতীর প্রবেশ

ইন্দুমতী। মাপ করিস নে দিদি। আগে উপযুক্ত শাস্তি হোক, তার পরে মাপ।

বিনোদবিহারী। তা হলে অপরাধীকে আর-একবার বাসরঘরে আপনার হাতে সমর্পণ করতে হয়।

ইন্দুমতী। দেখেছিস ভাই, কতবড়ো নির্লজ্জ। এরই মধ্যে মুখে কথা ফুটেছে। ওদের একটু আদর দিয়েছিস কি আর ওদের সামলে রাখবার জো নেই। মেয়েমানুষের হাতে পড়েই ওদের উপযুক্তমত শাসন হয় না। যদি ওদের নিজের জাতের সঙ্গে ঘরকন্না করতে হত তা হলে দেখতুম ওদের এত আদর থাকত কোথায়।

বিনোদবিহারী। তা হলে ভূভারহরণের জন্য মাঝে মাঝে অবতারের আবশ্যক হত না; পরস্পরকে কেটেকুটে সংসারটা অনেকটা সংক্ষেপ করে আনতে পারতুম।

কমলমুখী। ঐ ক্ষান্তদিদি আসছেন। (বিনোদের প্রতি) তোমার সাক্ষাতে উনি বেরোবেন না।

[বিনোদবিহারীর প্রস্থান

ক্ষান্তমণির প্রবেশ

ক্ষান্তমণি। তা বেশ হয়েছে ভাই, বেশ হয়েছে। এই বুঝি তোর নতুন বাড়ি! এ যে রাজার ঐশ্বর্য! তা বেশ হয়েছে। এখন তোর স্বামী ধরা দিলেই আর কোনো খেদ থাকে না।

ইন্দুমতী। সে বুঝি আর বাকি আছে! স্বামিরত্নটিকে ভাঁড়ারে পুরেছেন।

ক্ষান্তমণি। আহা, তা বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে। কমলের মতো এমন লক্ষ্মী মেয়ে কি কখনো অসুখী হতে পারে।

ইন্দুমতী। ক্ষান্তদিদি, তুমি যে এই ভরসন্ধের সময় ঘরকন্না ফেলে এখানে ছুটে এসেছ!

ক্ষান্তমণি। আর ভাই, ঘরকন্না! আমি দুদিন বাপের বাড়ি গিয়েছিলুম, এই ওঁর আর সহ্য হল না। রাগ করে ঘর ছেড়ে শুনলুম তোদের এই বাড়িতে এসে রয়েছেন। তা ভাই, বিয়ে করেছি বলেই কি বাপ-মা একেবারে পর হয়ে গেছে। দুদিন সেখানে থাকতে পাব না! যা হোক, খবরটা পেয়ে চলে আসতে হল।

ইন্দুমতী। আবার তাকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে বুঝি!

ক্ষান্তমণি। তা ভাই, একলা তো আর ঘরকন্না হয় না। ওদের যে চাই, ওদের যে নইলে নয়। নইলে আমার কি সাধ ওদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখি।

ইন্দুমতী। তোমার কর্তাটিকে দেখবে তো এসো, ঐ ঘর থেকে দেখা যাবে।

চতুর্থ দৃশ্য

ঘর

শিবচরণ নিমাই নিবারণ ও চন্দ্রকান্ত

চন্দ্রকান্ত। সমস্ত ঠিক হয়ে গেছে।

শিবচরণ। কী হল বল দেখি।

চন্দ্রকান্ত। ললিতের সঙ্গে কাদম্বিনীর বিবাহ স্থির হয়ে গেল।

নিবারণ। সে কী! সে যে বিবাহ করবে না শুনলুম?

চন্দ্রকান্ত। সে তো স্ত্রীকে বিবাহ করছে না। তার টাকা বিয়ে করে টাকাটি সঙ্গে নিয়ে বিলেত যাবে। যা হোক, এখন আর-একবার আমাদের নিমাইবাবুর মত নেওয়া উচিত— ইতিমধ্যে যদি আবার বদল হয়ে থাকে।

শিবচরণ। (ব্যস্তভাবে) না না, আর মত বদলাতে সময় দেওয়া হবে না। তার পূর্বেই আমরা পাঁচজনে পড়ে কোনো গতিকে ওর বিয়েটা দিয়ে দিতে হচ্ছে। চলো নিমাই, অনেক আয়োজন করবার আছে। (নিবারণের প্রতি) তবে চললেম ভাই।

নিবারণ। এসো। [নিমাই ও শিবচরণের প্রস্থান

চন্দরবাবু, আপনার তো খাওয়া হল না, কেবল ঘুরে ঘুরেই অস্থির হলেন— একটু বসুন, আপনার জন্যে জলখাবারের আয়োজন করে আসি গে। [প্রস্থান

ক্ষান্তমণির প্রবেশ

ক্ষান্তমণি। এখন বাড়ি যেতে হবে? না কী।

চন্দ্রকান্ত। (দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়া) নাঃ, আমি এখানে বেশ আছি।

ক্ষান্তমণি। তা তো দেখতে পাচ্ছি। তা, চিরকাল এইখানেই কাটাবে না কি।

চন্দ্রকান্ত। বিনুর সঙ্গে আমার তো সেইরকমই কথা হয়েছে।

ক্ষান্তমণি। বিনু তোমার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী কিনা, বিনুর সঙ্গে কথা হয়েছে! এখন ঢের হয়েছে, চলো।

চন্দ্রকান্ত। (জিব কাটিয়া মাথা নাড়িয়া) সে কি হয়! বন্ধুমানুষকে কথা দিয়েছি এখন কি সে ভাঙতে পারি।

ক্ষান্তমণি। আমার ঘাট হয়েছে, আমাকে মাপ করো তুমি। আমি আর কখনো বাপের বাড়ি গিয়ে থাকব না। তা, তোমার তো অযত্ন হয় নি— আমি তো সেখান থেকে সমস্ত রেঁধে তোমাকে পাঠিয়ে দিয়েছি।

চন্দ্রকান্ত। বড়োবউ, আমি কি তোমার রান্নার জন্যে তোমাকে বিয়ে করেছিলুম। যে বৎসর তোমার সঙ্গে অভাগার শুভবিবাহ হয় সে বৎসর কলকাতা শহরে কি রাঁধুনি বামুনের মড়ক হয়েছিল।

ক্ষান্তমণি। আমি বলছি, আমার একশো বার ঘাট হয়েছে, আমাকে মাপ করো— আমি আর কখনো এমন কাজ করব না। এখন তুমি ঘরে চলো।

চন্দ্রকান্ত। তবে একটু রোসো। নিবারণবাবু আমার জলখাবারের ব্যবস্থা করতে গেছেন— উপস্থিত ত্যাগ করে যাওয়াটা শাস্ত্রবিরুদ্ধ।

ক্ষান্তমণি। আমি সেখানে সব ঠিক করে রেখেছি, তুমি এখনি চলো।

চন্দ্রকান্ত। বল কী, নিবারণবাবু—

ক্ষান্তমণি। সে আমি নিবারণবাবুকে বলে পাঠাব এখন, তুমি চলো।

চন্দ্রকান্ত। তবে চলো। সকল গোরুগুলিই তো একে একে গোষ্ঠে গেল। আমিও যাই।

বন্ধুগণ। (নেপথ্য হইতে) চন্দরদা!

ক্ষান্তমণি। ঐ রে, আবার ওরা আসছে! ওদের হাতে পড়লে আর তোমার রক্ষে নেই।

চন্দ্রকান্ত। ওদের হাতে তুমি আমি দুজনেই পড়ার চেয়ে একজন পড়া ভালো। শাস্ত্রে লিখছে 'সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ', অতএব এ স্থলে আমার অর্ধাঙ্গের সরাই ভালো।

ক্ষান্তমণি। তোমার ঐ বন্ধুগুলোর জ্বালায় আমি কি মাথামোড় খুঁড়ে মরব।

[প্রস্থান

বিনোদবিহারী নিমাই ও নলিনাক্ষের প্রবেশ

চন্দ্রকান্ত। কেমন মনে হচ্ছে বিনু।

বিনোদবিহারী। সে আর কী বলব দাদা।

চন্দ্রকান্ত। নিমাই, তোর স্নায়ুরোগের বর্তমান লক্ষণটা কী বল্ দেখি।

নিমাই। অত্যন্ত সাংঘাতিক। ইচ্ছে করছে দিগ্‌বিদিকে নেচে বেড়াই।

চন্দ্রকান্ত। ভাই, নাচতে হয় তো দিকে নেচো, আবার বিদিকে নেচো না। পূর্বে তোমার যেরকম দিগ্‌ভ্রম হয়েছিল— কোথায় মির্জাপুর আর কোথায় বাগবাজার!

নিমাই। এখন তোমার খবরটা কী চন্দরদা!

চন্দ্রকান্ত। আমি কিছু দ্বিধায় পড়ে গেছি। এখানেও আহার তৈরি হচ্ছে ঘরেও আহার প্রস্তুত— কিন্তু ঘরের দিকে ডবল টান পড়েছে।

নলিনাক্ষ। বিনু, এই মরুজগৎ তোমার কাছে তো আবার নন্দনকানন হয়ে উঠল— তুমি তো ভাই সুখী হলে—

চন্দ্রকান্ত। সেজন্যে ওকে আর লজ্জা দিস নে নলিন, সে ওর দোষ নয়। সুখী না হবার জন্যে ও যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল, এমন-কি, প্রায় সম্পূর্ণ কৃতকার্য হয়েছিল; এমন সময় বিধাতা ওর সঙ্গে লাগলেন— নিতান্ত ওকে কানে ধরে সুখী করে দিলেন। সেজন্যে ওকে মাপ করতে হবে।

বিনোদবিহারী। দেখ্ নলিন, তুই আমাকে ত্যাগ কর্। দুধের সাধ আর ঘোলে মেটাস নে। তুইও একটা বিয়ে করে ফেল্— আর এই জগৎটাকে শখের মরুভূমি করে রাখিস নে।

চন্দ্রকান্ত। একদিন প্রতিজ্ঞা করেছিলুম, নলিন, জীবনে আর কখনো ঘটকালি করব না— আজ তোর খাতিরে সে প্রতিজ্ঞা আমি এখনই ভঙ্গ করতে প্রস্তুত আছি।

নিমাই। এখনই ?

চন্দ্রকান্ত। হাঁ এখনই। একবার কেবল বাড়ি থেকে চাদরটা বদলে আসতে হবে।

নিমাই। সেই কথাটা খুলে বলো। আর এ পর্যন্ত তোমার প্রতিজ্ঞা যে কী রকম রক্ষা করে এসেছ সে আর প্রকাশ করে কাজ নেই।

বিনোদবিহারী। নলিন, আমার গা ছুঁয়ে বল্ দেখি তুই বিয়ে করবি।

নলিনাক্ষ। তুমি যদি বল বিনু, তা হলে আমি নিশ্চয় করব। এ পর্যন্ত আমি তোমার কোন অনুরোধটা রাখি নি বলো।

বিনোদবিহারী। চন্দরদা, তবে আর কী! একটা খোঁজ করো। একটি সৎকায়স্থের মেয়ে। ওঁদের আবার একটু সুবিধে আছে— খাদ্যের সঙ্গে হজমিগুলিটুকু পান, রাজকন্যার সঙ্গে অর্ধেক রাজত্বের জোগাড় হয়।

চন্দ্রকান্ত। তা বেশ কথা। আমি এই সংসারসমুদ্রে দিব্যি একটি খেয়া জমিয়েছি— একে একে তোদের দুটিকে আইবুড়ো-কূল থেকে বিবাহ-কূলে পার করে দিয়েছি— মিস্টার চাটুজ্জেকেও একহাঁটু কাদার মধ্যে নাবিয়ে দিয়ে এসেছি, এখন আর কে কে যাত্রী আছে ডাক দাও—

বিনোদবিহারী। এখন এই অনাথ যুবকটিকে পার করে দাও।

নলিনাক্ষ। বিনু ভাই, আর কেউ নয়, কেবল তুমি যাকে পছন্দ করে দেবে, আমি তাকেই নেব। দেখেছি তোমার সঙ্গে আমার রুচির মিল হয়।

বিনোদবিহারী। তাই সই। তবে আমি সন্ধানে বেরোব। চন্দরদার আবার চাদর বদলাতে বড়ো বিলম্ব হয় দেখেছি। ততক্ষণ আমিই খেয়া দেব।

নিমাই। আজ তবে সভাভঙ্গ হোক। ও দিকে যতই রাত বয়ে যাচ্ছে আমাদের চন্দ্র ততই ম্লান হয়ে আসছেন।

চন্দ্রকান্ত। উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু আগে আমাদের ভাগ্যলক্ষ্মীদের একটি বন্দনা গেয়ে তার পরে বেরোনো যাবে। এটি বিরহকালে আমার নিজের রচনা— বিরহ না হলে গান বাঁধবার অবসর পাওয়া যায় না। মিলনের সময় মিলনটা নিয়েই কিছু ব্যতিব্যস্ত হয়ে থাকতে হয়।

গান। প্রথমে চন্দ্র পরে সকলে মিলিয়া

বাউলের সুর

যার অদৃষ্টে যেমনি জুটুক তোমরা সবাই ভালো!
আমাদের এই আঁধার ঘরে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালো।
কেউ বা অতি জ্বলজ্বল, কেউ বা ম্লান ছলছল,
কেউ বা কিছু দহন করে, কেউ বা স্নিগ্ধ আলো।
নূতন প্রেমে নূতন বধূ আগাগোড়া কেবল মধু,
পুরাতনে অম্লমধুর একটুকু ঝাঁঝালো।
বাক্য যখন বিদায় করে চক্ষু এসে পায়ে ধরে,
রাগের সঙ্গে অনুরাগে সমান ভাগে ঢালো।
আমরা তৃষ্ণা তোমরা সুধা, তোমরা তৃপ্তি আমরা ক্ষুধা,
তোমার কথা বলতে কবির কথা ফুরালো।
যে মূর্তি নয়নে জাগে সবই আমার ভালো লাগে—
কেউ বা দিব্যি গৌরবরন, কেউ বা দিব্যি কালো।

বিদায়-অভিশাপ

বিদায়-অভিশাপ

দেবগণকর্তৃক আদিষ্ট হইয়া বৃহস্পতিপুত্র কচ দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের নিকট হইতে সঞ্জীবনী বিদ্যা শিখিবার নিমিত্ত তৎসমীপে গমন করেন। সেখানে সহস্র বৎসর অতিবাহন করিয়া এবং নৃত্যগীতবাদ্যদ্বারা শুক্রদুহিতা দেবযানীর মনোরঞ্জনপূর্বক সিদ্ধকাম হইয়া, কচ দেবলোকে প্রত্যাগমন করেন। দেবযানীর নিকট হইতে বিদায়কালীন ব্যাপার পরে বিবৃত হইল।

কচ ও দেবযানী

কচ। দেহ আজ্ঞা, দেবযানী, দেবলোকে দাস
করিবে প্রয়াণ। আজি গুরুগৃহবাস
সমাপ্ত আমার। আশীর্বাদ করো মোরে
যে বিদ্যা শিখিনু তাহা চিরদিন ধরে
অন্তরে জাজ্বল্য থাকে উজ্জ্বল রতন,
সুমেরুশিখরশিরে সূর্যের মতন,
অক্ষয়কিরণ।

দেবযানী। মনোরথ পুরিয়াছে,
পেয়েছ দুর্লভবিদ্যা আচার্যের কাছে,
সহস্রবর্ষের তব দুঃসাধ্যসাধনা
সিদ্ধ আজি ; আর কিছু নাহি কি কামনা
ভেবে দেখো মনে মনে।

কচ। আর কিছু নাহি।

দেবযানী। কিছু নাই ? তবু আরবার দেখো চাহি
অবগাহি হৃদয়ের সীমান্ত অবধি
করহ সন্ধান— অন্তরের প্রান্তে যদি
কোনো বাঞ্ছা থাকে, কুশের অঙ্কুর-সম
ক্ষুদ্র দৃষ্টি-অগোচর, তবু তীক্ষ্ণতম।

কচ। আজি পূর্ণ কৃতার্থ জীবন। কোনো ঠাঁই
মোর মাঝে কোনো দৈন্য কোনো শূন্য নাই
সুলক্ষণে।

দেবযানী। তুমি সুখী ত্রিজগৎ-মাঝে।
যাও তবে ইন্দ্রলোকে আপনার কাজে
উচ্চশিরে গৌরব বহিয়া। স্বর্গপুরে
উঠিবে আনন্দধ্বনি, মনোহর সুরে
বাজিবে মঙ্গলশঙ্খ, সুরাঙ্গনাগণ
করিবে তোমার শিরে পুষ্প বরিষন
সদ্যছিন্ন নন্দনের মন্দারমঞ্জরী।
স্বর্গপথে কলকণ্ঠে অপ্সরী কিন্নরী

দিবে হুলুধ্বনি। আহা, বিপ্র, বহুক্লেশে
কেটেছে তোমার দিন বিজনে বিদেশে
সুকঠোর অধ্যয়নে। নাহি ছিল কেহ
স্মরণ করায়ে দিতে সুখময় গেহ,
নিবারিতে প্রবাসবেদনা। অতিথিরে
যথাসাধ্য পূজিয়াছি দরিদ্রকুটিরে
যাহা ছিল দিয়ে। তাই ব'লে স্বর্গসুখ
কোথা পাব, কোথা হেথা অনিন্দিত মুখ
সুরললনার। বড়ো আশা করি মনে
আতিথ্যের অপরাধ রবে না স্মরণে
ফিরে গিয়ে সুখলোকে।

কচ। সুকল্যাণ হাসে
প্রসন্ন বিদায় আজি দিতে হবে দাসে।

দেবযানী। হাসি ? হায় সখা, এ তো স্বর্গপুরী নয়।
পুষ্পে কীটসম হেথা তৃষ্ণা জেগে রয়
মর্মমাঝে, বাঞ্ছা ঘুরে বাঞ্ছিতেরে ঘিরে,
লাঞ্ছিত ভ্রমর যথা বারম্বার ফিরে
মুদ্রিত পদ্মের কাছে। হেথা সুখ গেলে
স্মৃতি একাকিনী বসি দীর্ঘশ্বাস ফেলে
শূন্যগৃহে— হেথায় সুলভ নহে হাসি।
যাও বন্ধু, কী হইবে মিথ্যা কাল নাশি—
উৎকণ্ঠিত দেবগণ।
যেতেছ চলিয়া ?
সকলি সমাপ্ত হল দু কথা বলিয়া ?
দশশত বর্ষ পরে এই কি বিদায় !

কচ। দেবযানী, কী আমার অপরাধ !

দেবযানী। হায়,
সুন্দরী অরণ্যভূমি সহস্র বৎসর
দিয়েছে বল্লভছায়া পল্লবমর্মর,
শুনায়েছে বিহঙ্গকূজন— তারে আজি
এতই সহজে ছেড়ে যাবে ? তরুরাজি
ম্লান হয়ে আছে যেন, হেরো আজিকার
বনচ্ছায়া গাঢ়তর শোকে অন্ধকার,
কেঁদে ওঠে বায়ু, শুষ্ক পত্র ঝ'রে পড়ে,
তুমি শুধু চলে যাবে সহাস্য অধরে
নিশান্তের সুখস্বপ্নসম ?

কচ। দেবযানী,
এ বনভূমিরে আমি মাতৃভূমি মানি,
হেথা মোর নবজন্মলাভ। এর 'পরে
নাহি মোর অনাদর, চিরপ্রীতিভরে
চিরদিন করিব স্মরণ।

দেবযানী। এই সেই
বটতল, যেথা তুমি প্রতি দিবসেই
গোধন চরাতে এসে পড়িতে ঘুমায়ে
মধ্যাহ্নের খরতাপে ; ক্লান্ত তব কায়ে
অতিথিবৎসল তরু দীর্ঘ ছায়াখানি
দিত বিছাইয়া, সুখসুপ্তি দিত আনি
ঝর্ঝরপল্লবদলে করিয়া বীজন
মৃদুস্বরে। যেয়ো সখা, তবু কিছুক্ষণ
পরিচিত তরুতলে বোসো শেষবার,
নিয়ে যাও সম্ভাষণ এ স্নেহছায়ার,
দুই দণ্ড থেকে যাও— সে বিলম্বে তব
স্বর্গের হবে না কোনো ক্ষতি।

কচ। অভিনব
বলে যেন মনে হয় বিদায়ের ক্ষণে
এই-সব চিরপরিচিত বন্ধুগণে—
পলাতক প্রিয়জনে বাঁধিবার তরে
করিছে বিস্তার সবে ব্যগ্র স্নেহভরে
নূতন বন্ধনজাল, অন্তিম মিনতি,
অপূর্ব সৌন্দর্যরাশি। ওগো বনস্পতি,
আশ্রিতজনের বন্ধু, করি নমস্কার।
কত পান্থ বসিবেক ছায়ায় তোমার,
কত ছাত্র কত দিন আমার মতন
প্রচ্ছন্ন প্রচ্ছায়তলে নীরব নির্জন
তৃণাসনে, পতঙ্গের মৃদুগুঞ্জস্বরে,
করিবেক অধ্যয়ন— প্রাতঃস্নান-পরে
ঋষিবালকেরা আসি সজল বল্কল
শুকাবে তোমার শাখে— রাখালের দল
মধ্যাহ্নে করিবে খেলা— ওগো, তারি মাঝে
এ পুরানো বন্ধু যেন স্মরণে বিরাজে।

দেবযানী। মনে রেখো আমাদের হোমধেনুটিরে ;
স্বর্গসুধা পান করে সে পুণ্যগাভীরে
ভুলো না গরবে।

কচ। সুধা হতে সুধাময়
দুগ্ধ তার— দেখে তারে পাপক্ষয় হয়,
মাতৃরূপা, শান্তিস্বরূপিণী, শুভ্রকান্তি,
পয়স্বিনী। না মানিয়া ক্ষুধাতৃষ্ণাশ্রান্তি
তারে করিয়াছি সেবা ; গহন কাননে
শ্যামশষ্প স্রোতস্বিনীতীরে তারি সনে
ফিরিয়াছি দীর্ঘ দিন ; পরিতৃপ্তিভরে
স্বেচ্ছামতে ভোগ করি নিম্নতট-'পরে
অপর্যাপ্ত তৃণরাশি সুস্নিগ্ধ কোমল—

আলস্যমন্থরতনু লভি তরুতল
রোমন্থ করেছে ধীরে শুয়ে তৃণাসনে
সারাবেলা ; মাঝে মাঝে বিশাল নয়নে
সকৃতজ্ঞ শান্ত দৃষ্টি মেলি, গাঢ়স্নেহ
চক্ষু দিয়া লেহন করেছে মোর দেহ।
মনে রবে সেই দৃষ্টি স্নিগ্ধ অচঞ্চল,
পরিপুষ্ট শুভ্র তনু চিক্কণ পিচ্ছল।

দেবযানী। আর মনে রেখো আমাদের কলস্বনা
স্রোতস্বিনী বেণুমতী।

কচ। তারে ভুলিব না।
বেণুমতী, কত কুসুমিত কুঞ্জ দিয়ে
মধুকণ্ঠে আনন্দিত কলগান নিয়ে
আসিছে শুশ্রূষা বহি গ্রাম্যবধূসম
সদা ক্ষিপ্রগতি, প্রবাসসঙ্গিনী মম
নিত্যশুভব্রতা।

দেবযানী। হায় বন্ধু, এ প্রবাসে
আরো কোনো সহচরী ছিল তব পাশে,
পরগৃহবাসদুঃখ ভুলাবার তরে
যত্ন তার ছিল মনে রাত্রিদিন ধরে—
হায় রে দুরাশা!

কচ। চিরজীবনের সনে
তাঁর নাম গাঁথা হয়ে গেছে।

দেবযানী। আছে মনে
যেদিন প্রথম তুমি আসিলে হেথায়
কিশোর ব্রাহ্মণ, তরুণ অরুণপ্রায়
গৌরবর্ণ তনুখানি স্নিগ্ধ দীপ্তিঢালা,
চন্দনে চর্চিত ভাল, কণ্ঠে পুষ্পমালা,
পরিহিত পট্টবাস, অধরে নয়নে
প্রসন্ন সরল হাসি, হোথা পুষ্পবনে
দাঁড়ালে আসিয়া—

কচ। তুমি সদ্য স্নান করি
দীর্ঘ আর্দ্র কেশজালে, নবশুক্লাম্বরী
জ্যোতিস্নাত মূর্তিমতী উষা, হাতে সাজি
একাকী তুলিতেছিলে নব পুষ্পরাজি
পূজার লাগিয়া। কহিনু করি বিনতি,
‘তোমারে সাজে না শ্রম, দেহো অনুমতি,
ফুল তুলে দিব দেবী।’

দেবযানী। আমি সবিস্ময়
সেই ক্ষণে শুধানু তোমার পরিচয়।
বিনয়ে কহিলে, ‘আসিয়াছি তব দ্বারে
তোমার পিতার কাছে শিষ্য হইবারে

আমি বৃহস্পতিসুত।'

কচ। শঙ্কা ছিল মনে,
পাছে দানবের গুরু স্বর্গের ব্রাহ্মণে
দেন ফিরাইয়া।

দেবযানী। আমি গেনু তাঁর কাছে।
হাসিয়া কহিনু, 'পিতা, ভিক্ষা এক আছে
চরণে তোমার।' স্নেহে বসাইয়া পাশে
শিরে মোর দিয়ে হাত শান্ত মৃদু ভাষে
কহিলেন, 'কিছু নাহি অদেয় তোমারে।'
কহিলাম, 'বৃহস্পতিপুত্র তব দ্বারে
এসেছেন, শিষ্য করি লহো তুমি তাঁরে
এ মিনতি।' সে আজিকে হল কত কাল;
তবু মনে হয় যেন সেদিন সকাল।

কচ। ঈর্ষাভরে তিনবার দৈত্যগণ মোরে
করিয়াছে বধ, তুমি দেবী দয়া করে
ফিরায়ে দিয়েছ মোর প্রাণ, সেই কথা
হৃদয়ে জাগায়ে রবে চিরকৃতজ্ঞতা।

দেবযানী। কৃতজ্ঞতা! ভুলে যেয়ো, কোনো দুঃখ নাই।
উপকার যা করেছি হয়ে যাক ছাই—
নাহি চাই দান-প্রতিদান। সুখস্মৃতি
নাহি কিছু মনে? যদি আনন্দের গীতি
কোনোদিন বেজে থাকে অন্তরে বাহিরে,
যদি কোনো সন্ধ্যাবেলা বেণুমতীতীরে
অধ্যয়ন-অবসরে বসি পুষ্পবনে
অপূর্ব পুলকরাশি জেগে থাকে মনে;
ফুলের সৌরভসম হৃদয়-উচ্ছ্বাস
ব্যাপ্ত করে দিয়ে থাকে সায়াহ্ন-আকাশ,
ফুটন্ত নিকুঞ্জতল, সেই সুখকথা
মনে রেখো— দূর হয়ে যাক কৃতজ্ঞতা।
যদি, সখা, হেথা কেহ গেয়ে থাকে গান
চিত্তে যাহা দিয়েছিল সুখ; পরিধান
করে থাকে কোনোদিন হেন বস্ত্রখানি
যাহা দেখে মনে তব প্রশংসার বাণী
জেগেছিল, ভেবেছিলে প্রসন্ন-অন্তর
তৃপ্ত চোখে, আজি এরে দেখায় সুন্দর,
সেই কথা মনে কোরো অবসরক্ষণে
সুখস্বর্গধামে। কতদিন এই বনে
দিগ্‌দিগন্তরে, আষাঢ়ের নীল জটা,
শ্যামস্নিগ্ধ বরষায় নবঘনঘটা
নেবেছিল, অবিরল বৃষ্টিজলধারে
কর্মহীন দিনে সঘনকল্পনাভারে

পীড়িত হৃদয়— এসেছিল কতদিন
অকস্মাৎ বসন্তের বাধাবন্ধহীন
উল্লাসহিল্লোলাকুল যৌবন-উৎসাহ,
সংগীতমুখর সেই আবেগপ্রবাহ
লতায় পাতায় পুষ্পে বনে বনান্তরে
ব্যাপ্ত করি দিয়াছিল লহরে লহরে
আনন্দপ্লাবন— ভেবে দেখো একবার
কত উষা, কত জ্যোৎস্না, কত অন্ধকার
পুষ্পগন্ধঘন অমানিশা, এই বনে
গেছে মিশে সুখে দুঃখে তোমার জীবনে—
তারি মাঝে হেন প্রাতঃ, হেন সন্ধ্যাবেলা,
হেন মুগ্ধরাত্রি, হেন হৃদয়ের খেলা,
হেন সুখ, হেন মুখ দেয় নাই দেখা
যাহা মনে আঁকা রবে চিরচিত্ররেখা
চিররাত্রি চিরদিন ? শুধু উপকার !
শোভা নহে, প্রীতি নহে, কিছু নহে আর ?

কচ। আর যাহা আছে তাহা প্রকাশের নয়
সখী। বহে যাহা মর্মমাঝে রক্তময়
বাহিরে তা কেমনে দেখাব।

দেবযানী। জানি সখে,
তোমার হৃদয় মোর হৃদয়-আলোকে
চকিতে দেখেছি কতবার, শুধু যেন
চক্ষের পলকপাতে ; তাই আজি হেন
স্পর্ধা রমণীর। থাকো তবে, থাকো তবে,
যেয়ো নাকো। সুখ নাই যশের গৌরবে।
হেথা বেণুমতীতীরে মোরা দুই জন
অভিনব স্বর্গলোক করিব সৃজন
এ নির্জন বনচ্ছায়াসাথে মিশাইয়া
নিভৃত বিশ্রব্ধ মুগ্ধ দুইখানি হিয়া
নিখিলবিস্মৃত। ওগো বন্ধু, আমি জানি
রহস্য তোমার।

কচ। নহে, নহে দেবযানী।

দেবযানী। নহে ? মিথ্যা প্রবঞ্চনা ! দেখি নাই আমি
মন তব ? জান না কি প্রেম অন্তর্যামী ?
বিকশিত পুষ্প থাকে পল্লবে বিলীন—
গন্ধ তার লুকাবে কোথায় ? কতদিন
যেমনি তুলেছ মুখ, চেয়েছ যেমনি,
যেমনি শুনেছ তুমি মোর কণ্ঠধ্বনি,
অমনি সর্বাঙ্গে তব কম্পিয়াছে হিয়া—
নড়িলে হীরক যথা পড়ে ঠিকরিয়া
আলোক তাহার। সে কি আমি দেখি নাই ?

ধরা পড়িয়াছ বন্ধু, বন্দী তুমি তাই
মোর কাছে। এ বন্ধন নারিবে কাটিতে।
ইন্দ্র আর তব ইন্দ্র নহে।

কচ। শুচিস্মিতে,
সহস্র বৎসর ধরি এ দৈত্যপুরীতে
এরি লাগি করেছি সাধনা ?

দেবযানী। কেন নহে ?
বিদ্যারই লাগিয়া শুধু লোকে দুঃখ সহে
এ জগতে ? করে নি কি রমণীর লাগি
কোনো নর মহাতপ ? পত্নীবর মাগি
করেন নি সম্বরণ তপতীর আশে
প্রখর সূর্যের পানে তাকায়ে আকাশে
অনাহারে কঠোর সাধনা কত ? হায়,
বিদ্যাই দুর্লভ শুধু, প্রেম কি হেথায়
এতই সুলভ ? সহস্র বৎসর ধরে
সাধনা করেছ তুমি কী ধনের তরে
আপনি জান না তাহা। বিদ্যা এক ধারে,
আমি এক ধারে— কভু মোরে কভু তারে
চেয়েছ সোৎসুকে ; তব অনিশ্চিত মন
দোঁহারেই করিয়াছে যত্নে আরাধন
সংগোপনে। আজ মোরা দোঁহে এক দিনে
আসিয়াছি ধরা দিতে। লহো, সখা, চিনে
যারে চাও। বল যদি সরল সাহসে
'বিদ্যায় নাহিকো সুখ, নাহি সুখ যশে—
দেবযানী, তুমি শুধু সিদ্ধি মূর্তিমতী,
তোমারেই করিনু বরণ', নাহি ক্ষতি,
নাহি কোনো লজ্জা তাহে। রমণীর মন
সহস্রবর্ষেরই, সখা, সাধনার ধন।

কচ। দেবসন্নিধানে শুভে করেছিনু পণ
মহাসঞ্জীবনী বিদ্যা করি উপার্জন
দেবলোকে ফিরে যাব। এসেছিনু তাই ;
সেই পণ মনে মোর জেগেছে সদাই ;
পূর্ণ সেই প্রতিজ্ঞা আমার, চরিতার্থ
এতকাল পরে এ জীবন— কোনো স্বার্থ
করি না কামনা আজি।

দেবযানী। ধিক্ মিথ্যাভাষী !
শুধু বিদ্যা চেয়েছিলে ? গুরুগৃহে আসি
শুধু ছাত্ররূপে তুমি আছিলে নির্জনে
শাস্ত্রগ্রন্থে রাখি আঁখি রত অধ্যয়নে
অহরহ ? উদাসীন আর সবা-'পরে ?
ছাড়ি অধ্যয়নশালা বনে বনান্তরে

ফিরিতে পুষ্পের তরে, গাঁথি মাল্যখানি
সহাস্য প্রফুল্লমুখে কেন দিতে আনি
এ বিদ্যাহীনারে ? এই কি কঠোর ব্রত ?
এই তব ব্যবহার বিদ্যার্থীর মতো ?
প্রভাতে রহিতে অধ্যয়নে, আমি আসি
শূন্য সাজি হাতে লয়ে দাঁড়াতেম হাসি,
তুমি কেন গ্রন্থ রাখি উঠিয়া আসিতে,
প্রফুল্ল শিশিরসিক্ত কুসুমরাশিতে
করিতে আমার পূজা ? অপরাহ্ণকালে
জলসেক করিতাম তরু-আলবালে,
আমারে হেরিয়া শ্রান্ত কেন দয়া করি
দিতে জল তুলে ? কেন পাঠ পরিহরি
পালন করিতে মোর মৃগশিশুটিকে ?
স্বর্গ হতে যে সংগীত এসেছিলে শিখে
কেন তাহা শুনাইতে, সন্ধ্যাবেলা যবে
নদীতীরে অন্ধকার নামিত নীরবে
প্রেমনত নয়নের স্নিগ্ধচ্ছায়াময়
দীর্ঘ পল্লবের মতো। আমার হৃদয়
বিদ্যা নিতে এসে কেন করিলে হরণ
স্বর্গের চাতুরীজালে ? বুঝেছি এখন,
আমারে করিয়া বশ পিতার হৃদয়ে
চেয়েছিলে পশিবারে— কৃতকার্য হয়ে
আজ যাবে মোরে কিছু দিয়ে কৃতজ্ঞতা,
লব্ধমনোরথ অর্থী রাজদ্বারে যথা
দ্বারীহস্তে দিয়ে যায় মুদ্রা দুই-চারি
মনের সন্তোষে।

কচ। হা অভিমানিনী নারী,
সত্য শুনে কী হইবে সুখ। ধর্ম জানে,
প্রতারণা করি নাই ; অকপট-প্রাণে
আনন্দ-অন্তরে তব সাধিয়া সন্তোষ,
সেবিয়া তোমারে যদি করে থাকি দোষ,
তার শাস্তি দিতেছেন বিধি। ছিল মনে
কব না সে কথা। বলো, কী হইবে জেনে
ত্রিভুবনে কারো যাহে নাই উপকার,
একমাত্র শুধু যাহা নিতান্ত আমার
আপনার কথা। ভালোবাসি কি না আজ
সে তর্কে কী ফল ? আমার যা আছে কাজ
সে আমি সাধিব। স্বর্গ আর স্বর্গ বলে
যদি মনে নাহি লাগে, দূর বনতলে
যদি ঘুরে মরে চিত্ত বিদ্ধ মৃগসম,
চিরতৃষ্ণা লেগে থাকে দগ্ধ প্রাণে মম

সর্বকার্য-মাঝে— তবু চলে যেতে হবে
সুখশূন্য সেই স্বর্গধামে। দেব-সবে
এই সঞ্জীবনী বিদ্যা করিয়া প্রদান
নূতন দেবত্ব দিয়া তবে মোর প্রাণ
সার্থক হইবে ; তার পূর্বে নাহি মানি
আপনার সুখ। ক্ষমো মোরে, দেবযানী,
ক্ষমো অপরাধ।

দেবযানী। ক্ষমা কোথা মনে মোর।
করেছ এ নারীচিত্ত কুলিশকঠোর
হে ব্রাহ্মণ। তুমি চলে যাবে স্বর্গলোকে
সগৌরবে, আপনার কর্তব্যপুলকে
সর্ব দুঃখশোক করি দূরপরাহত ;
আমার কী আছে কাজ, কী আমার ব্রত।
আমার এ প্রতিহত নিষ্ফল জীবনে
কী রহিল, কিসের গৌরব ? এই বনে
বসে রব নতশিরে নিঃসঙ্গ একাকী
লক্ষ্যহীনা। যে দিকেই ফিরাইব আঁখি
সহস্র স্মৃতির কাঁটা বিঁধিবে নিষ্ঠুর ;
লুকায়ে বক্ষের তলে লজ্জা অতি ক্রূর
বারম্বার করিবে দংশন। ধিক্ ধিক্ ,
কোথা হতে এলে তুমি, নির্মম পথিক,
বসি মোর জীবনের বনচ্ছায়াতলে
দণ্ড দুই অবসর কাটাবার ছলে
জীবনের সুখগুলি ফুলের মতন
ছিন্ন করে নিয়ে, মালা করেছ গ্রন্থন
একখানি সূত্র দিয়ে। যাবার বেলায়
সে মালা নিলে না গলে, পরম হেলায়
সেই সূক্ষ্ম সূত্রখানি দুই ভাগ করে
ছিঁড়ে দিয়ে গেলে। লুটাইল ধূলি-'পরে
এ প্রাণের সমস্ত মহিমা। তোমা-'পরে
এই মোর অভিশাপ— যে বিদ্যার তরে
মোরে কর অবহেলা, সে বিদ্যা তোমার
সম্পূর্ণ হবে না বশ— তুমি শুধু তার
ভারবাহী হয়ে রবে, করিবে না ভোগ ;
শিখাইবে, পারিবে না করিতে প্রয়োগ।

কচ। আমি বর দিনু, দেবী, তুমি সুখী হবে।
ভুলে যাবে সর্বগ্লানি বিপুল গৌরবে।

কালীগ্রাম
২৬ শ্রাবণ [১৩০০]

মালিনী

সূচনা

মালিনী নাটিকার উৎপত্তির একটা বিশেষ ইতিহাস আছে, সে স্বপ্নঘটিত। কবিকঙ্কণকে দেবী স্বপ্নে আদেশ করেছিলেন তাঁর গুণকীর্তন করতে। আমার স্বপ্নে দেবীর আবির্ভাব ছিল না, ছিল হঠাৎ মনের একটা গভীর আত্মপ্রকাশ ঘুমন্ত বুদ্ধির সুযোগ নিয়ে।

তখন ছিলুম লণ্ডনে। নিমন্ত্রণ ছিল প্রিমরোজ হিলে তারক পালিতের বাসায়। প্রবাসী বাঙালিদের প্রায়ই সেখানে হত জটলা, আর তার সঙ্গে চলত ভোজ। গোলেমালে রাত হয়ে গেল। যাঁদের বাড়িতে ছিলুম, অত রাত্রে দরজার ঘণ্টা বাজিয়ে দিয়ে হঠাৎ চমক লাগিয়ে দিলে গৃহস্থ সেটাকে দুঃসহ বলেই গণ্য করতেন ; তাই পালিত সাহেবের অনুরোধে তাঁর ওখানেই রাত্রিযাপন স্বীকার করে নিলুম। বিছানায় যখন শুলুম তখনো চলছে কলরবের অন্তিম পর্ব, আমার ঘুম ছিল আবিল হয়ে।

এমন সময় স্বপ্ন দেখলুম, যেন আমার সামনে একটা নাটকের অভিনয় হচ্ছে। বিষয়টা একটা বিদ্রোহের চক্রান্ত। দুই বন্ধুর মধ্যে এক বন্ধু কর্তব্যবোধে সেটা ফাঁস করে দিয়েছেন রাজার কাছে। বিদ্রোহী বন্দী হয়ে এলেন রাজার সামনে। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্যে তাঁর বন্ধুকে যেই তাঁর কাছে এনে দেওয়া হল দুই হাতের শিকল তাঁর মাথায় মেরে বন্ধুকে দিলেন ভূমিসাৎ করে।

জেগে উঠে যেটা আমাকে আশ্চর্য ঠেকল সেটা হচ্ছে এই যে, আমার মনের একভাগ নিশ্চেষ্ট শ্রোতামাত্র, অন্যভাগ বুনে চলেছে একখানা নাটক। স্পষ্ট হোক অস্পষ্ট হোক একটা কথাবার্তার ধারা গল্পকে বহন করে চলেছিল। জেগে উঠে সে আমি মনে আনতে পারলুম না। পালিত সাহেবকে মনের ক্রিয়ার এই বিস্ময়করতা জানিয়েছিলুম। তিনি এটাতে বিশেষ কোনো ঔৎসুক্য বোধ করলেন না।

কিন্তু অনেক কাল এই স্বপ্ন আমার জাগ্রত মনের মধ্যে সঞ্চরণ করেছে। অবশেষে অনেক দিন পরে এই স্বপ্নের স্মৃতি নাটিকার আকার নিয়ে শান্ত হল।

বোধ করি এই নাটিকায় আমার রচনার একটা কিছু বিশেষত্ব ছিল, সেটা অনুভব করেছিলুম যখন দ্বিতীয় বার ইংলণ্ডে বাসকালে এর ইংরেজি অনুবাদ কোনো ইংরেজ বন্ধুর চোখে পড়ল। প্রথম দেখা গেল এটা আর্টিস্ট রোটেনস্টাইনের মনকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছে। কখনো কখনো এটাকে তাঁর ঘরে অভিনয় করবার ইচ্ছেও তাঁর হয়েছিল। আমার মনে হল, এই নাটকের প্রধান চরিত্রগুলি তাঁর শিল্পী-মনে মূর্তিরূপে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তার পরে একদিন ট্রেভেলিয়ানের মুখে এর সম্বন্ধে মন্তব্য শুনলুম। তিনি কবি এবং গ্রীক সাহিত্যের রসজ্ঞ। তিনি আমাকে বললেন, এই নাটকে তিনি গ্রীক নাট্যকলার প্রতিরূপ দেখেছেন। তার অর্থ কী তা আমি সম্পূর্ণ বুঝতে পারি নি, কারণ যদিও কিছু কিছু তর্জমা পড়েছি, তবু গ্রীক নাট্য আমার অভিজ্ঞতার বাইরে। শেক্‌সপীয়রের নাটক আমাদের কাছে বরাবর নাটকের আদর্শ। তার বহুশাখায়িত বৈচিত্র্য, ব্যাপ্তি ও ঘাতপ্রতিঘাত প্রথম থেকেই আমাদের মনকে অধিকার করেছে। মালিনীর নাট্যরূপ সংযত সংহত এবং দেশকালের ধারায় অবিচ্ছিন্ন। এর বাহিরের রূপায়ণ সম্বন্ধে যে মত শুনেছিলুম এ হচ্ছে তাই। কবিতার মর্মকথাটি প্রথম থেকেই যদি রচনার মধ্যে জেনেশুনে বপন করা না হয়ে থাকে তবে কবির কাছেও সেটা প্রত্যক্ষ হয়ে উঠতে দেরি লাগে, আজ আমি জানি মালিনীর মধ্যে কী কথাটি লিখতে লিখতে উদ্ভাবিত হয়ে ছিল গৌণরূপে ঈষৎগোচর। আসল কথা, মনের একটা সত্যকার বিস্ময়ের আলোড়ন ওর মধ্যে দেখা দিয়েছে।

আমার মনের মধ্যে ধর্মের প্রেরণা তখন গৌরীশংকরের উত্তুঙ্গ শিখরে শুভ্র নির্মল তুষারপুঞ্জের মতো নির্মল নির্বিকল্প হয়ে স্তব্ধ ছিল না, সে বিগলিত হয়ে মানবলোকে বিচিত্র

মঙ্গলরূপে মৈত্রীরূপে আপনাকে প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছে। নির্বিকার তত্ত্ব নয় সে, মূর্তিশালার মাটিতে পাথরে নানা অদ্ভুত আকার নিয়ে মানুষকে সে হতবুদ্ধি করতে আসে নি। কোনো দৈববাণীকে সে আশ্রয় করে নি। সত্য যার স্বভাবে, যে মানুষের অন্তরে অপরিমেয় করুণা, তার অন্তঃকরণ থেকে এই পরিপূর্ণ মানবদেবতার আবির্ভাব অন্য মানুষের চিত্তে প্রতিফলিত হতে থাকে। সকল আনুষ্ঠানিক সকল পৌরাণিক ধর্মজটিলতা ভেদ করে তবেই এর যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ হতে পারে।

আমার এ মতের সত্যাসত্য আলোচ্য নয়। বক্তব্য এই যে, এই ভাবের উপরে মালিনী স্বতই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে ; এরই যা দুঃখ, এরই যা মহিমা, সেইটেতেই এর কাব্যরস। এই ভাবের অঙ্কুর আপনা-আপনি দেখা দিয়েছিল 'প্রকৃতির প্রতিশোধে', সে-কথা ভেবে দেখবার যোগ্য। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে হয়তো তারও আগে এর আভাস পাওয়া যায়।

শ্রাবণ ১৩৪৭

মালিনী

প্রথম দৃশ্য

রাজান্তঃপুর

মালিনী ও কাশ্যপ

কাশ্যপ। ত্যাগ করো, বৎসে, ত্যাগ করো সুখ-আশা
দুঃখভয় ; দূর করো বিষয়পিপাসা ;
ছিন্ন করো সংসারবন্ধন ; পরিহরো
প্রমোদপ্রলাপ চঞ্চলতা ; চিত্তে ধরো
ধ্রুবশান্ত সুনির্মল প্রজ্ঞার আলোক
রাত্রিদিন— মোহশোক পরাভূত হোক।

মালিনী। ভগবন্, রুদ্ধ আমি, নাহি হেরি চোখে ;
সন্ধ্যায় মুদ্রিতদল পদ্মের কোরকে
আবদ্ধ ভ্রমরী— স্বর্ণরেণুরাশিমাঝে
মৃত জড়প্রায়। তবু কানে এসে বাজে
মুক্তির সংগীত, তুমি কৃপা কর যবে।

কাশ্যপ। আশীর্বাদ করিলাম, অবসান হবে
বিভাবরী, জ্ঞানসূর্য-উদয়-উৎসবে
জাগ্রত এ জগতের জয়জয়রবে
শুভলগ্নে সুপ্রভাতে হবে উদ্‌ঘাটন
পুষ্পকারাগার তব। সেই মহাক্ষণ
এসেছে নিকটে। আমি তবে চলিলাম
তীর্থপর্যটনে।

মালিনী। লহো দাসীর প্রণাম।

[কাশ্যপের প্রস্থান

মহাক্ষণ আসিয়াছে। অন্তর চঞ্চল
যেন বারিবিন্দুসম করে টলমল
পদ্মদলে। নেত্র মুদি শুনিতেছি কানে
আকাশের কোলাহল ; কাহারা কে জানে
কী করিছে আয়োজন আমারে ঘিরিয়া,
আসিতেছে যাইতেছে ফিরিয়া ফিরিয়া
অদৃশ্যমুরতি। কভু বিদ্যুতের মতো
চমকিছে আলো ; বায়ুর তরঙ্গ যত
শব্দ করি করিছে আঘাত। ব্যথাসম
কী যেন বাজিছে আজি অন্তরেতে মম

বারম্বার— কিছু আমি নারি বুঝিবারে
জগতে কাহারা আজি ডাকিছে আমারে।

রাজমহিষীর প্রবেশ

মহিষী। মা গো মা, কী করি তোরে লয়ে। ওরে বাছা,
এ-সব কি সাজে তোরে কভু, এই কাঁচা
নবীন বয়সে? কোথা গেল বেশভূষা
কোথা আভরণ? আমার সোনার উষা
স্বর্ণপ্রভাহীনা, এও কি চোখের 'পরে
সহ্য হয় মার?

মালিনী। কখনো রাজার ঘরে
জন্মে না কি ভিখারিনী? দরিদ্রের কূলে
তুই যে, মা জন্মেছিস সে কি গেলি ভুলে
রাজেশ্বরী? তোর সে বাপের দরিদ্রতা
জগৎবিখ্যাত, বল্ মা, সে যাবে কোথা?
তাই আমি ধরিয়াছি অলংকারসম
তোমার বাপের দৈন্য সর্ব অঙ্গে মম,
মা আমার।

মহিষী। ওগো, আপন বাপের গর্বে
আমার বাপেরে দাও খোঁটা? তাই গর্ভে
ধরেছিনু তোরে, ওরে অহংকারী মেয়ে?
জানিস, আমার পিতা তোর পিতা চেয়ে
শতগুণে ধনী, তাই, ধনরত্নমানে
এত তাঁর হেলা।

মালিনী। সে তো সকলেই জানে।
যেদিন পিতৃব্য তব, পিতৃধনলোভে
বঞ্চিলেন পিতারে তোমার, মনঃক্ষোভে
ছাড়িলেন গৃহ তিনি। সর্ব ধনজন
সম্পদ সহায় করিলেন বিসর্জন
অকাতর মনে; শুধু সযত্নে আনিলা
পৈতৃক দেবতামূর্তি শালগ্রামশিলা
দরিদ্রকুটিরে। সেই তাঁর ধর্মখানি
মোর জন্মকালে মোরে দিয়েছ, মা, আনি—
আর কিছু নহে। থাক্-না মা, সর্বক্ষণ
তব পিতৃভবনের দরিদ্রের ধন
তোমারি কন্যার হৃদে। আমার পিতার
যা-কিছু ঐশ্বর্য আছে ধনরত্নভার
থাক্ রাজপুত্রতরে।

মহিষী। কে তোমারে বোঝে
মা আমার! কথা শুনে জানি না কেন যে
চক্ষে আসে জল। যেদিন আসিলি কোলে

মায়েরে ব্যাকুল করি, কে জানিত তবে
বাক্যহীন মূঢ় শিশু, ক্রন্দনকল্লোলে
সেই ক্ষুদ্র মুগ্ধ মুখ এত কথা কবে
দুই দিন পরে। থাকি তোর মুখ চেয়ে,
ভয়ে কাঁপে বুক। ও মোর সোনার মেয়ে,
এ ধর্ম কোথায় পেলি, কী শাস্ত্রবচন ?
আমার পিতার ধর্ম সে তো পুরাতন
অনাদি কালের। কিন্তু মা গো, এ যে তব
সৃষ্টিছাড়া বেদছাড়া ধর্ম অভিনব
আজিকার-গড়া। কোথা হতে ঘরে আসে
বিধর্মী সন্ন্যাসী ? দেখে আমি মরি ত্রাসে।
কী মন্ত্র শিখায় তারা, সরল হৃদয়
জড়ায় মিথ্যার জালে ? লোকে না কি কয়
বৌদ্ধেরা পিশাচপন্থী, জাদুবিদ্যা জানে,
প্রেতসিদ্ধ তারা। মোর কথা লহো কানে,
বাছা রে আমার ! ধর্ম কি খুঁজিতে হয় ?
সূর্যের মতন ধর্ম চিরজ্যোতির্ময়
চিরকাল আছে। ধরো তুমি সেই ধর্ম,
সরল সে পথ। লহো ব্রতক্রিয়াকর্ম
ভক্তিভরে। শিবপূজা করো দিনযামী,
বর মাগি লহো, বাছা, তাঁরি মতো স্বামী।
সেই পতি হবে তোর সমস্ত দেবতা,
শাস্ত্র হবে তাঁরি বাক্য, সরল এ কথা।
শাস্ত্রজ্ঞানী পণ্ডিতেরা মরুক ভাবিয়া
সত্যাসত্য ধর্মাধর্ম কর্তাকর্মক্রিয়া
অনুস্বার-চন্দ্রবিন্দু লয়ে। পুরুষের
দেশভেদে কালভেদে প্রতিদিবসের
স্বতন্ত্র নূতন ধর্ম ; সদা হাহা ক'রে
ফিরে তারা শান্তি লাগি সন্দেহসাগরে,
শাস্ত্র লয়ে করে কাটাকাটি। রমণীর
ধর্ম থাকে বক্ষে কোলে চিরদিন স্থির
পতিপুত্ররূপে।

রাজার প্রবেশ

রাজা। কন্যা, ক্ষান্ত হও এবে
কিছুদিন-তরে। উপরে আসিছে নেবে
ঝটিকার মেঘ।

মহিষী। কোথা হতে মিথ্যা ভয়
আনিয়াছ মহারাজ ?

রাজা। বড়ো মিথ্যা নয়।

হায় রে অবোধ মেয়ে, নব ধর্ম যদি
ঘরেতে আনিতে চাস, সে কি বর্ষানদী
একেবারে তট ভেঙে হইবে প্রকাশ
দেশবিদেশের দৃষ্টিপথে ? লজ্জাত্রাস
নাহি তার ? আপনার ধর্ম আপনারি,
থাকে যেন সংগোপনে, সর্বনরনারী
দেখে যেন নাহি করে দ্বেষ, পরিহাস
না করে কঠোর। ধর্মেরে রাখিতে চাস
রাখ্ মনে মনে।

মহিষী। ভর্ৎসনা করিছ কেন
বাছারে আমার মহারাজ ? কত যেন
অপরাধী। কী শিক্ষা শিখাতে এলে আজ,
পাপ রাষ্ট্রনীতি ? লুকায়ে করিবে কাজ,
ধর্ম দিবে চাপা ! সে মেয়ে আমার নয়।
সাধুসন্ন্যাসীর কাছে উপদেশ লয়,
শুনে পুণ্যকথা, করে সজ্জনের সেবা—
আমি তো বুঝি না তাহে দোষ দিবে কেবা,
ভয় বা কাহারে।

রাজা। মহারানী, প্রজাগণ
ক্ষুব্ধ অতিশয়। চাহে তারা নির্বাসন
মালিনীর।

মহিষী। কী বলিলে ! নির্বাসন কারে !
মালিনীরে ? মহারাজ, তোমার কন্যারে ?

রাজা। ধর্মনাশ-আশঙ্কায় ব্রাহ্মণের দল
এক হয়ে—

মহিষী। ধর্ম জানে ব্রাহ্মণে কেবল ?
আর ধর্ম নাই ? তাদেরি পুঁথিতে লেখা
সর্বসত্য, অন্য কোথা নাহি তার রেখা
এ বিশ্বসংসারে ? ব্রাহ্মণেরা কোথা আছে
ডেকে নিয়ে এসো। আমার মেয়ের কাছে
শিখে নিক ধর্ম কারে বলে। ফেলে দিক
কীটে-কাটা ধর্ম তার, ধিক্ ধিক্ ধিক্।—
ওরে বাছা, আমি লব নবমন্ত্র তোর,
আমি ছিন্ন করে দেব জীর্ণ শাস্ত্রডোর
ব্রাহ্মণের। তোমারে পাঠাবে নির্বাসনে ?—
নিশ্চিন্ত রয়েছ মহারাজ ? ভাব মনে
এ কন্যা তোমার কন্যা, সামান্য বালিকা !
ওগো, তাহা নহে। এ যে দীপ্ত অগ্নিশিখা।
আমি কহিলাম আজি শুনি লহো কথা—
এ কন্যা মানবী নহে, এ কোন্ দেবতা,
এসেছে তোমার ঘরে। করিয়ো না হেলা,

কোন্ দিন অকস্মাৎ ভেঙে দিয়ে খেলা
চলে যাবে— তখন করিবে হাহাকার,
রাজ্যধন সব দিয়ে পাইবে না আর।

মালিনী। প্রজাদের পুর'ও প্রার্থনা। মহাক্ষণ
এসেছে নিকটে। দাও মোরে নির্বাসন
পিতা।

রাজা। কেন বৎসে, পিতার ভবনে তোর
কী অভাব ? বাহিরের সংসার কঠোর
দয়াহীন, সে কি বাছা পিতৃমাতৃক্রোড় ?

মালিনী। শোনো পিতা— যারা চাহে নির্বাসন মোর
তারা চাহে মোরে। ওগো মা, শোন্ মা কথা—
বোঝাতে পারি নে মোর চিত্তব্যাকুলতা।
আমারে ছাড়িয়া দে মা, বিনা দুঃখশোকে,
শাখা হতে চ্যুত পত্রসম। সর্বলোকে
যাব আমি— রাজদ্বারে মোরে যাচিয়াছে
বাহির-সংসার। জানি না কী কাজ আছে,
আসিয়াছে মহাক্ষণ।

রাজা। ওরে শিশুমতি,
কী কথা বলিস।

মালিনী। পিতা, তুমি নরপতি,
রাজার কর্তব্য করো। জননী আমার,
আছে তোর পুত্রকন্যা এ ঘরসংসার,
আমারে ছাড়িয়া দে মা। বাঁধিস নে আর
স্নেহপাশে।

মহিষী। শোনো কথা শোনো একবার।
বাক্য নাহি সরে মুখে, চেয়ে তোর পানে
রয়েছি বিস্মিত। হাঁ গো, জন্মিলি যেখানে
সেখানে কি স্থান নাই তোর ? মা আমার,
তুই কি জগৎলক্ষ্মী, জগতের ভার
পড়েছে কি তোরি 'পরে ? নিখিলসংসার
তুই বিনা মাতৃহীনা, যাবি তারি কাছে
নূতন আদরে— আমাদের মা কে আছে
তুই চলে গেলে ?

মালিনী। আমি স্বপ্ন দেখি জেগে,
শুনি নিদ্রাঘোরে, যেন বায়ু বহে বেগে,
নদীতে উঠিছে ঢেউ, রাত্রি অন্ধকার,
নৌকাখানি তীরে বাঁধা— কে করিবে পার,
কর্ণধার নাই— গৃহহীন যাত্রী সবে
বসে আছে নিরাশ্বাস— মনে হয় তবে
আমি যেন যেতে পারি, আমি যেন জানি
তীরের সন্ধান— মোর স্পর্শে নৌকাখানি

পাবে যেন প্রাণ, যাবে যেন আপনার
পূর্ণ বলে— কোথা হতে বিশ্বাস আমার
এল মনে? রাজকন্যা আমি, দেখি নাই
বাহির-সংসার— বসে আছি এক ঠাঁই
জন্মাবধি, চতুর্দিকে সুখের প্রাচীর,
আমারে কে করে দেয় ঘরের বাহির
কে জানে গো। বন্ধ কেটে দাও মহারাজ,
ওগো, ছেড়ে দে মা, কন্যা আমি নহি আজ,
নহি রাজসুতা— যে মোর অন্তরযামী
অগ্নিময়ী মহাবাণী, সেই শুধু আমি।

মহিষী। শুনিলে তো মহারাজ? এ কথা কাহার?
শুনিয়া বুঝিতে নারি। এ কি বালিকার?
এই কি তোমার কন্যা? আমি কি আপনি
ইহারে ধরেছি গর্ভে?

রাজা। যেমন রজনী
উষারে জনম দেয়। কন্যা জ্যোতির্ময়ী
রজনীর কেহ নহে, সে যে বিশ্বজয়ী
বিশ্বে দেয় প্রাণ।

মহিষী। মহারাজ, তাই বলি,
খুঁজে দেখো কোথা আছে মায়ার শিকলি
যাহে বাঁধা পড়ে যায় আলোকপ্রতিমা।

কন্যার প্রতি

মুখে খুলে পড়ে কেশ, এ কী বেশ! ছি মা!
আপনারে এত অনাদর! আয় দেখি,
ভালো করে বেঁধে দিই। লোকে বলিবে কী
দেখে তোরে? নির্বাসন! এই যদি হয়
ধর্ম ব্রাহ্মণের, তবে হোক, মা, উদয়
নবধর্ম— শিখে নিক তোরি কাছ হতে
বিপ্রগণ। দেখি মুখ, আয় মা, আলোতে।

[মহিষী ও মালিনীর প্রস্থান

সেনাপতির প্রবেশ

সেনাপতি। মহারাজ, বিদ্রোহী হয়েছে প্রজাগণ
ব্রাহ্মণবচনে। তারা চায় নির্বাসন
রাজকুমারীর।

রাজা। যাও তবে সেনাপতি,
সামন্তনৃপতি সবে আনো দ্রুতগতি।

[রাজা ও সেনাপতির প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

মন্দিরপ্রাঙ্গণে ব্রাহ্মণগণ

ব্রাহ্মণগণ। নির্বাসন, নির্বাসন, রাজদুহিতার
নির্বাসন!

ক্ষেমংকর। বিপ্রগণ, এই কথা সার।
এ সংকল্প দৃঢ় রেখো মনে। জেনো ভাই,
অন্য অরি নাহি ডরি, নারীরে ডরাই।
তার কাছে অস্ত্র যায় টুটে, পরাহত
তর্কযুক্তি, বাহুবল করে শির নত—
নিরাপদে হৃদয়ের মাঝে করে বাস
রাক্ষীসম মনোহর মহাসর্বনাশ।

চারুদত্ত। চলো সবে রাজদ্বারে, বলো, 'রক্ষ রক্ষ
মহারাজ, আর্যধর্মে করিতেছে লক্ষ্য
তব নীড় হতে সর্প।'

সুপ্রিয়। ধর্ম? মহাশয়,
মূঢ়ে উপদেশ দেহো ধর্ম কারে কয়।
ধর্ম নির্দোষীর নির্বাসন?

চারুদত্ত। তুমি দেখি
কুলশত্রু বিভীষণ। সকল কাজে কি
বাধা দিতে আছে?

সোমাচার্য। মোরা ব্রাহ্মণসমাজে
একত্রে মিলেছি সবে ধর্মরক্ষাকাজে,
তুমি কোথা হতে এসে মাঝে দিলে দেখা
অতিশয় সুনিপুণ বিচ্ছেদের রেখা—
সূক্ষ্ম সর্বনাশ।

সুপ্রিয়। ধর্মাধর্ম সত্যাসত্য
কে করে বিচার? আপন বিশ্বাসে মত্ত
করিয়াছ স্থির, শুধু দল বেঁধে সবে
সত্যের মীমাংসা হবে, শুধু উচ্চরবে?
যুক্তি কিছু নহে?

চারুদত্ত। দম্ভ তব অতিশয়
হে সুপ্রিয়।

সুপ্রিয়। প্রিয়ম্বদ, মোর দম্ভ নয়,
আমি অজ্ঞ অতি— দম্ভ তারি যে আজিকে
শতার্থক শাস্ত্র হতে দুটো কথা শিখে
নিষ্পাপ নিরপরাধ রাজকুমারীরে
টানিয়া আনিতে চাহে ঘরের বাহিরে
ভিক্ষুকের পথে— তাঁর শাস্ত্রে মোর শাস্ত্রে
দু-অক্ষর প্রভেদ বলিয়া।

ক্ষেমংকর। বচনাস্ত্রে
কে পারে তোমারে বন্ধুবর।
সোমাচার্য। দূর করে
দাও সুপ্রিয়েরে। বিপ্রগণ, কবো ওরে
সভার বাহির।
চারুদত্ত। মোরা নির্বাসন চাহি
রাজকুমারীর। যার অভিমত নাহি
যাক সে বাহিরে।
ক্ষেমংকর। ক্ষান্ত হও বন্ধুগণ।
সুপ্রিয়। ভ্রমক্রমে আমারে করেছ নির্বাচন
ব্রাহ্মণমণ্ডলী। আমি নহি একজন
তোমাদের ছায়া। প্রতিধ্বনি নহি আমি
শাস্ত্রবচনের। যে শাস্ত্রের অনুগামী
এ ব্রাহ্মণ, সে শাস্ত্রে কোথাও লেখে নাই
শক্তি যার ধর্ম তার।

ক্ষেমংকরের প্রতি

চলিলাম ভাই,
আমারে বিদায় দাও।
ক্ষেমংকর। দিব না বিদায়।
তর্কে শুধু দ্বিধা তব, কাজের বেলায়
দৃঢ় তুমি পর্বতের মতো। বন্ধু মোর,
জান না কি আসিয়াছে দুঃসময় ঘোর—
আজ মৌন থাকো।
সুপ্রিয়। বন্ধু, জন্মেছে ধিক্‌কার
মূঢ়তার দুর্বিনয় নাহি সহে আর।
যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকর্ম ব্রত-উপবাস
এই শুধু ধর্ম বলে করিবে বিশ্বাস
নিঃসংশয়ে? বালিকারে দিয়া নির্বাসনে
সেই ধর্ম রক্ষা হবে? ভেবে দেখো মনে
মিথ্যারে সে সত্য বলি করে নি প্রচার;
সেও বলে সত্য ধর্ম, দয়া ধর্ম তার,
সর্বজীবে প্রেম— সর্বধর্মে সেই সার,
তার বেশি যাহা আছে, প্রমাণ কী তার?
ক্ষেমংকর। স্থির হও ভাই। মূল ধর্ম এক বটে,
বিভিন্ন আধার। জল এক, ভিন্ন তটে
ভিন্ন জলাশয়। আমরা যে সরোবরে
মিটাই পিপাসা পিতৃপিতামহ ধ'রে
সেথা যদি অকস্মাৎ নবজলোচ্ছ্বাস
বন্যার মতন আসে, ভেঙে করে নাশ
তটভূমি তার, সে উচ্ছ্বাস হলে গত
বাঁধ-ভাঙা সরোবরে জলরাশি যত

বাহির হইয়া যাবে। তোমার অন্তরে
উৎস আছে, প্রয়োজন নাহি সরোবরে—
তাই বলে ভাগ্যহীন সর্বজনতরে
সাধারণ জলাশয় রাখিবে না তুমি—
পৈতৃক কালের বাঁধা দৃঢ় তটভূমি,
বহুদিবসের প্রেমে সতত লালিত
সৌন্দর্যের শ্যামলতা, সযত্নপালিত
পুরাতন ছায়াতরুগুলি, পিতৃধর্ম,
প্রাণপ্রিয় প্রথা, চির-আচরিত কর্ম,
চিরপরিচিত নীতি ? হারায়ে চেতন
সত্যজননীর কোলে নিদ্রায় মগন
কত মূঢ় শিশু, নাহি জানে জননীরে—
তাদের চেতনা দিতে মাতার শরীরে
কোরো না আঘাত। ধৈর্য সদা রাখো সখে,
ক্ষমা করো ক্ষমাযোগ্য জনে, জ্ঞানালোকে
আপন কর্তব্য করো।

সুপ্রিয়। তব পথগামী
চিরদিন এ অধীন। রেখে দিব আমি
তব বাক্য শিরে করি। যুক্তিসূচি-'পরে
সংসার-কর্তব্যভার কভু নাহি ধরে।

উগ্রসেনের প্রবেশ

উগ্রসেন। কার্য সিদ্ধ, ক্ষেমংকর ! হয়েছে চঞ্চল
ব্রাহ্মণের বাক্য শুনে রাজসৈন্যদল,
আজি বাঁধ ভাঙে-ভাঙে।

সোমাচার্য। সৈন্যদল !

চারুদত্ত। সে কী !
এ কী কাণ্ড, ক্রমে এ যে বিপরীত দেখি
বিদ্রোহের মতো।

সোমাচার্য। এতদূর ভালো নয়,
ক্ষেমংকর।

চারুদত্ত। ধর্মবলে ব্রাহ্মণের জয়,
বাহুবলে নহে। যজ্ঞযাগে সিদ্ধি হবে ;
দ্বিগুণ উৎসাহভরে এসো, বন্ধু, সবে
করি মন্ত্রপাঠ। শুদ্ধাচারে যোগাসনে
ব্রহ্মতেজ করি উপার্জন। একমনে
পূজি ইষ্টদেবে।

সোমাচার্য। তুমি কোথা আছ দেবী,
সিদ্ধিদাত্রী জগদ্ধাত্রী। তব পদ সেবি
ব্যর্থকাম কভু নাহি হবে ভক্তজন।
তুমি কর নাস্তিকের দর্পসংহরণ

সশরীরে— প্রত্যক্ষ দেখায়ে দাও আজি
বিশ্বাসের বল। সংহারের বেশে সাজি
এখনি দাঁড়াও সর্বসম্মুখেতে আসি
মুক্তকেশে খড়্গহস্তে, অট্টহাস হাসি
পাষণ্ডদলনী। এসো সবে একপ্রাণ
ভক্তিভরে সমস্বরে করহ আহ্বান
প্রলয়শক্তিরে।

সমস্বরে

ব্রাহ্মণগণ। সবে করজোড়ে যাচি—
আয় মা প্রলয়ংকরী।

মালিনীর প্রবেশ

মালিনী। আমি আসিয়াছি।

ক্ষেমংকর ও সুপ্রিয় ব্যতীত
সমস্ত ব্রাহ্মণের ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম

সোমাচার্য। এ কী দেবী, এ কী বেশ! দয়াময়ী এ যে
এসেছেন ম্লানবস্ত্রে নরকন্যা সেজে।
এ কী অপরূপ রূপ! এ কী স্নেহজ্যোতি
নেত্রযুগে! এ তো নহে সংহারমুরতি।
কোথা হতে এলে মাতঃ? কী ভাবিয়া মনে,
কী করিতে কাজ?

মালিনী। আসিয়াছি নির্বাসনে,
তোমরা ডেকেছ বলে ওগো বিপ্রগণ।

সোমাচার্য। নির্বাসন। স্বর্গ হতে দেবনির্বাসন
ভক্তের আহ্বানে!

চারুদত্ত। হায়, কী করিব মাতঃ,
তোমার সহায় বিনা আর রহে না তো
এ ভ্রষ্ট সংসার।

মালিনী। আমি ফিরিব না আর।
জানিতাম, জানিতাম তোমাদের দ্বার
মুক্ত আছে মোর তরে। আমারি লাগিয়া
আছ বসে। তাই আমি উঠেছি জাগিয়া
সুখসম্পদের মাঝে, তোমরা যখন
সবে মিলি যাচিলে আমার নির্বাসন
রাজদ্বারে।

ক্ষেমংকর। রাজকন্যা?

সকলে। রাজার দুহিতা!

সুপ্রিয়। ধন্য ধন্য!

মালিনী। আমারে করেছ নির্বাসিতা?
তাই আজি মোর গৃহ তোমাদের ঘরে।
তবু একবার মোরে বলো সত্য করে
সত্যই কি আছে কোনো প্রয়োজন মোরে,

চাহ কি আমায়। সত্যই কি নাম ধরে
বাহির-সংসার হতে ডেকেছিলে সবে
আপন নির্জন ঘরে বসে ছিনু যবে
সমস্ত জগৎ হতে অতিশয় দূরে
শতভিত্তি-অন্তরালে রাজ-অন্তঃপুরে
একাকী বালিকা। তবে সে তো স্বপ্ন নয়!
তাই তো কাঁদিয়াছিল আমার হৃদয়
না বুঝিয়া কিছু!

চারুদত্ত। এসো, এসো মা জননী,
শতচিত্তশতদলে দাঁড়াও অমনি
করুণামাখানো মুখে।

মালিনী। আসিয়াছি আজ—
প্রথমে শিখাও মোরে কী করিব কাজ
তোমাদের। জন্ম লভিয়াছি রাজকুলে,
রাজকন্যা আমি— কখনো গবাক্ষ খুলে
চাহি নি বাহিরে, দেখি নাই এ সংসার
বৃহৎ বিপুল— কোথায় কী ব্যথা তার
জানি না তো কিছু। শুনিয়াছি দুঃখময়
বসুন্ধরা, সে দুঃখের লব পরিচয়
তোমাদের সাথে।

দেবদত্ত। ভাসি নয়নের জলে,
মা, তোমার কথা শুনে।

সকলে। আমরা সকলে
পাষণ্ড পামর।

মালিনী। আজি মোর মনে হয়
অমৃতের পাত্র যেন আমার হৃদয়—
যেন সে মিটাতে পারে এ বিশ্বের ক্ষুধা,
যেন সে ঢালিতে পারে সান্ত্বনার সুধা
যত দুঃখ যেথা আছে সকলের 'পরে
অনন্ত প্রবাহে। দেখো দেখো নীলাম্বরে
মেঘ কেটে গিয়ে চাঁদ পেয়েছে প্রকাশ।
কী বৃহৎ লোকালয়, কী শান্ত আকাশ—
এক জ্যোৎস্না বিস্তারিয়া সমস্ত জগৎ
কে নিল কুড়ায়ে বক্ষে—। ওই রাজপথ,
ওই গৃহশ্রেণী, ওই উদার মন্দির—
স্তব্ধচ্ছায়া তরুরাজি— দূরে নদীতীর,
বাজিছে পূজার ঘণ্টা— আশ্চর্য পুলকে
পূরিছে আমার অঙ্গ, জল আসে চোখে।
কোথা হতে এনু আমি আজি জ্যোৎস্নালোকে
তোমাদের এ বিস্তীর্ণ সর্বজনলোকে।

চারুদত্ত। তুমি বিশ্বদেবী।

সোমাচার্য। ধিক্ পাপ-রসনায়!
শত ভাগে ফাটিয়া গেল না বেদনায়—
চাহিল তোমার নির্বাসন!

দেবদত্ত। চলো সবে
বিপ্রগণ, জননীরে জয়জয়রবে
রেখে আসি রাজগৃহে।

সমবেত কণ্ঠে। জয় জননীর!
জয় মা লক্ষ্মীর! জয় করুণাময়ীর!

[মালিনীকে ঘিরিয়া লইয়া সুপ্রিয় ও ক্ষেমংকর
ব্যতীত সকলের প্রস্থান

ক্ষেমংকর। দূর হোক, মোহ দূর হোক! কোথা যাও
হে সুপ্রিয়?

সুপ্রিয়। ছেড়ে দাও, মোরে ছেড়ে দাও।

ক্ষেমংকর। স্থির হও। তুমিও কি, বন্ধু, অন্ধভাবে
জনস্রোতে সর্বসাথে ভেসে চলে যাবে?

সুপ্রিয়। এ কি স্বপ্ন, ক্ষেমংকর?

ক্ষেমংকর। স্বপ্নে মগ্ন ছিলে
এতক্ষণ— এখন সবলে চক্ষু মেলে
জেগে চেয়ে দেখো।

সুপ্রিয়। মিথ্যা তব স্বর্গধাম,
মিথ্যা দেবদেবী, ক্ষেমংকর— ভ্রমিলাম
বৃথা এ সংসারে এতকাল। পাই নাই
কোনো তৃপ্তি কোনো শাস্ত্রে, অন্তর সদাই
কেঁদেছে সংশয়ে। আজ আমি লভিয়াছি
ধর্ম মোর, হৃদয়ের বড়ো কাছাকাছি।
সবার দেবতা তব, শাস্ত্রের দেবতা—
আমার দেবতা নহে। প্রাণ তার কোথা,
আমার অন্তরমাঝে কই কহে কথা,
কী প্রশ্নের দেয় সে উত্তর— কী ব্যথার
দেয় সে সান্ত্বনা! আজি তুমি কে আমার
জীবনতরণী-'পরে রাখিলে চরণ—
সমস্ত জড়তা তার করিয়া হরণ
একি গতি দিলে তারে! এতদিন পরে
এ মর্তধরণীমাঝে মানবের ঘরে
পেয়েছি দেবতা মোর।

ক্ষেমংকর। হায় হায় সখে,
আপন হৃদয় যবে ভুলায় কুহকে
আপনারে, বড়ো ভয়ংকর সে সময়—
শাস্ত্র হয় ইচ্ছা আপনার, ধর্ম হয়
আপন কল্পনা। এই জ্যোৎস্নাময়ী নিশি
যে সৌন্দর্যে দিকে দিকে রহিয়াছে মিশি

ইহাই কি চিরস্থায়ী ? কাল প্রাতঃকালে
শতলক্ষ ক্ষুধাগুলা শতকর্মজালে
ঘিরিবে না ভবসিন্ধু— মহাকোলাহলে
হবে না কঠিন রণ বিশ্বরণস্থলে ?
তখন এ জ্যোৎস্নাসুপ্তি স্বপ্নমায়া বলে
মনে হবে, অতি ক্ষীণ, অতি ছায়াময়।
যে সৌন্দর্যমোহ তব ঘিরেছে হৃদয়
সেও সেই জ্যোৎস্নাসম— ধর্ম বল তারে ?
একবার চক্ষু মেলি চাও চারি ধারে—
কত দুঃখ, কত দৈন্য, বিকট নিরাশা !
ওই ধর্মে মিটাইবে মধ্যাহ্নপিপাসা
তৃষ্ণাতুর জগতের ? সংসারের মাঝে
ওই তব ক্ষীণ মোহ লাগিবে কী কাজে ?
খররৌদ্রে দাঁড়াইয়া রণরঙ্গভূমে
তখনো কি মগ্ন হয়ে রবে এই ঘুমে,
ভুলে রবে স্বপ্নধর্মে— আর কিছু নাহি ?
নহে সখে !

সুপ্রিয়। নহে নহে।

ক্ষেমংকর। তবে দেখো চাহি
সম্মুখে তোমার। বন্ধু, আর রক্ষা নাই।
এবার লাগিল অগ্নি। পুড়ে হবে ছাই
পুরাতন অট্টালিকা, উন্নত উদার,
সমস্ত ভারতখণ্ড কক্ষে কক্ষে যার
হয়েছে মানুষ।— এখনো যে দু-নয়নে
স্বপ্ন লেগে আছে তব !
খাণ্ডবদহনে
সমস্ত বিহঙ্গকুল গগনে গগনে
উড়িয়া ফিরিয়াছিল করুণ ক্রন্দনে
স্বর্গ সমাচ্ছন্ন করি, বক্ষে রক্ষণীয়
অক্ষম শাবকগণে স্মরি। হে সুপ্রিয়,
সেইমত উদ্‌বেগ-অধীর পিতৃকুল
নানা স্বর্গ হতে আসি আশঙ্কাব্যাকুল
ফিরিছেন শূন্যে শূন্যে আর্ত কলস্বরে
আসন্নসংকটাতুর ভারতের 'পরে।—
তবু স্বপ্নে মগ্ন সখে !
দেখো মনে স্মরি,
আর্যধর্মমহাদুর্গ এ তীর্থনগরী
পুণ্য কাশী। দ্বারে হেথা কে আছে প্রহরী ?
সে কি আজ স্বপ্নে রবে কর্তব্য পাসরি।
শত্রু যবে সমাগত, রাত্রি অন্ধকার,
মিত্র যবে গৃহদ্রোহী, পৌর পরিবার

নিশ্চেতন। হে সুপ্রিয়, তুলে চাও আঁখি।
কথা কও। বলো তুমি, আমারে একাকী
ফেলিয়া কি চলে যাবে মায়ার পশ্চাতে
বিশ্বব্যাপী এ দুর্যোগে, প্রলয়ের রাতে?

সুপ্রিয়। কভু নহে, কভু নহে। নিদ্রাহীন চোখে
দাঁড়াইব পার্শ্বে তব।

ক্ষেমংকর। শুন তবে, সখে,
আমি চলিলাম।

সুপ্রিয়। কোথা যাবে?

ক্ষেমংকর। দেশান্তরে।
হেথা কোনো আশা নাই আর। ঘরে পরে
ব্যাপ্ত হয়ে গেছে বহ্নি। বাহির হইতে
রক্তস্রোত মুক্ত করি হবে নিবাইতে।
যাই, সৈন্য আনি।

সুপ্রিয়। হেথাকার সৈন্যগণ
রয়েছে প্রস্তুত।

ক্ষেমংকর। মিথ্যা আশা। এতক্ষণ
মুগ্ধ পঙ্গপালসম তারাও সকলে
দগ্ধপক্ষ পড়িয়াছে সর্ব দলেবলে
হুতাশনে। জয়ধ্বনি ওই শুনা যায়।
উন্মত্তা নগরী আজি ধর্মের চিতায়
জ্বালায় উৎসবদীপ।

সুপ্রিয়। যদি যাবে ভাই,
প্রবাসে কঠিন পণে, আমি সঙ্গে যাই।

ক্ষেমংকর। তুমি কোথা যাবে বন্ধু? তুমি হেথা থেকো
সদা সাবধানে; সকল সংবাদ রেখো
রাজভবনের। লিখো পত্র। দেখো সখে,
তুমিও ভুলো না শেষে নূতন কুহকে,
ছেড়ো না আমায়। মনে রেখো সর্বক্ষণ
প্রবাসী বন্ধুরে।

সুপ্রিয়। সখে, কুহক নূতন,
আমি তো নূতন নহি। তুমি পুরাতন
আর আমি পুরাতন।

ক্ষেমংকর। দাও আলিঙ্গন।

সুপ্রিয়। প্রথম বিচ্ছেদ আজি। ছিনু চিরদিন
এক সাথে। বক্ষে বক্ষে বিরহবিহীন
চলেছিনু দোঁহে— আজ তুমি কোথা যাবে,
আমি কোথা রব।

ক্ষেমংকর। আবার ফিরিয়া পাবে
বন্ধুরে তোমার। শুধু মনে ভয় হয়
আজি বিপ্লবের দিন বড়ো দুঃসময়—

ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় ধ্রুব বন্ধচয়,
ভ্রাতারে আঘাত করে ভ্রাতা, বন্ধু হয়
বন্ধুর বিরোধী। বাহিরিনু অন্ধকারে,
অন্ধকারে ফিরিয়া আসিব গৃহদ্বারে—
দেখিব কি দীপ জ্বালি বসি আছ ঘরে
বন্ধু মোর? সেই আশা রহিল অন্তরে।

তৃতীয় দৃশ্য

অন্তঃপুরে মহিষী

মহিষী। এখানেও নাই! মা গো, কী হবে আমার।
কেবলি এমন করে কতদিন আর
চোখে চোখে রাখি তারে, ভয়ে ভয়ে থাকি,
রজনীতে ঘুম ভেঙে নাম ধ'রে ডাকি,
জেগে জেগে উঠি। চোখের আড়াল হলে
মনে শঙ্কা হয়, কোথা গেল বুঝি চলে
আমার সে স্বপ্নস্বরূপিণী। যাই, খুঁজি,
কোথা সে লুকায়ে আছে।

[প্রস্থান

যুবরাজের সহিত রাজার প্রবেশ

রাজা। অবশেষে বুঝি
দিতে হল নির্বাসন।

যুবরাজ। না দেখি উপায়।
ত্বরা যদি নাহি কর রাজ্য তবে যায়
মহারাজ। সৈন্যগণ নগরপ্রহরী
হয়েছে বিদ্রোহী। স্নেহমোহ পরিহরি
কর্তব্য সাধন করো— দাও মালিনীরে
অবিলম্বে নির্বাসন।

রাজা। ধীরে, বৎস, ধীরে।
দিব তারে নির্বাসন, পুরাব প্রার্থনা,
সাধিব কর্তব্য মোর। মনে করিয়ো না
বৃদ্ধ আমি মোহমুগ্ধ, অন্তর দুর্বল,
রাজধর্ম তুচ্ছ করি ফেলি অশ্রুজল।

মহিষীর পুনঃপ্রবেশ

মহিষী। মহারাজ, মহারাজ, বলো সত্য করে
কোথা লুকায়েছ তারে কাঁদাইতে মোরে?
কোথায় সে?

রাজা। কে মহিষী ?

মহিষী। মালিনী আমার।

রাজা। কোথায় সে ? চলে গেছে ? নাই ঘরে তার ?

মহিষী। ওগো, নাই। যাও তুমি সৈন্যদল ল'য়ে
খোঁজো তারে পথে পথে আলয়ে আলয়ে,
করো ত্বরা। ওগো, তারে করিয়াছে চুরি
তোমার প্রজারা মিলে। নিষ্ঠুর চাতুরী
তাহাদের। দূর করে দাও সর্বজনে।
শূন্য করে দাও এ নগরী, যতক্ষণে
ফিরে নাহি দেয় মালিনীরে।

রাজা। গেছে চলে ?
প্রতিজ্ঞা করিনু আমি ফিরাইব কোলে
কোলের কন্যারে মোর। রাজ্যে ধিক্ থাক্।
ধিক্ ধর্মহীন রাজনীতি। ডাক্, ডাক্
সৈন্যদলে।

[যুবরাজের প্রস্থান

মালিনীকে লইয়া সৈন্যগণ ও প্রজাগণের মশাল ও
সমারোহ সহকারে প্রবেশ

ব্রাহ্মণগণ। জয় জয় শুভ্র পুণ্যরাশি,
বিগ্রহিণী দয়া।

ছুটিয়া গিয়া

মহিষী। ওমা, ওমা, সর্বনাশী,
ও রাক্ষসী মেয়ে, আমার হৃদয়বাসী
নির্দয় পাষাণী, এক পল করি না গো
বুকের বাহির— তবু ফাঁকি দিয়ে, মা গো,
কোথা গিয়েছিলি ?

প্রজাগণ। কোরো না গো তিরস্কার
মহারানী! আমাদের ঘরে একবার
গিয়েছিল আমাদের মাতা।

চারুদত্ত। কেহ নই
আমরা কি ওগো রানী ? দেবী দয়াময়ী
শুধু তোমাদেরি ?

দেবদত্ত। ফিরে তো এনেছি পুন
পুণ্যবতী প্রাসাদলক্ষ্মীরে।

সোমাচার্য। মা গো, শুন,
আমাদের ভুলিয়ো না আর। মাঝে মাঝে
শুনি যেন শ্রীমুখের বাণী, শুভকাজে
পাই আশীর্বাদ, তা হলে পরান-তরী
পথ পাবে পারাবারে— ধ্রুবতারা ধরি
যাবে মুক্তিপারে।

মালিনী। তোমরা যেয়ো না দূরে
এসেছ যাহারা। প্রতিদিন রাজপুরে
দেখা দিয়ে যেয়ো। সকলেরে এনো ডাকি,
সবারে দেখিতে চাহি আমি। হেথা থাকি
রব আমি তোমাদেরি ঘরে পুরবাসী।

সকলে। মোরা আজি ধন্য সবে, ধন্য আজি কাশী।

[প্রস্থান

মালিনী। ওগো পিতা, আজ আমি হয়েছি সবার।
কী আনন্দ উচ্ছ্বসিল, জয়জয়কার
উঠিল ধ্বনিয়া যবে সহস্র হৃদয়
মুহূর্তে বিদীর্ণ করি।

রাজা। কী সৌন্দর্যময়
আজিকার ছবি। সমুদ্রমন্থনে যবে
লক্ষ্মী উঠিলেন, তাঁরে ঘেরি কলরবে
মাতিল উন্মাদনৃত্যে ঊর্মিগুলি সবে,
সেইমত উচ্ছ্বসিত জনপারাবার,
মাঝে তুমি লোকলক্ষ্মী মাতা।

মালিনী। মা আমার,
এ প্রাচীরে মোরে আর নারিবে লুকাতে।
তব অন্তঃপুরে আমি আনিয়াছি সাথে
সর্বলোক— দেহ নাই মোর, বাধা নাই,
আমি যেন এ বিশ্বের প্রাণ!

মহিষী। থাক্ তাই,
বিশ্বপ্রাণ হয়ে আপন করিয়া সবে
থাক্ মার কাছে। বাহিরে যেতে না হবে,
হেথা নিয়ে আয় তোর বৃহৎ সংসার—
মাতা কন্যা দোঁহে মিলি সেবা করি তার।
অনেক হয়েছে রাত, বোস্ মা এখানে,
শান্ত করো আপনারে— জ্বলিছে নয়ানে
উদ্দীপ্ত প্রাণের জ্যোতি নিদ্রার আরাম
দগ্ধ করি। একটুকু করো, মা, বিশ্রাম।

মাতাকে আলিঙ্গন করিয়া

মালিনী। মা গো, শ্রান্ত এবে আমি। কাঁপিতেছে দেহ।
কোথা গিয়েছিনু চলে ছাড়ি মার স্নেহ
প্রকাণ্ড পৃথিবী-মাঝে। মা গো, নিদ্রা আন্
চক্ষে মোর। ধীরে ধীরে কর্ তুই গান
শিশুকালে শুনিতাম যাহা। আজি মোর
চক্ষে আসিতেছে জল, বিষাদের ঘোর
ঘনাইছে প্রাণে।

মহিষী। বসুগণ, রুদ্রগণ,
বিশ্বদেবগণ, সবে করহ রক্ষণ

কন্যারে আমার। মর্তলোক, স্বর্গলোক
হও অনুকূল— শুভ হোক, শুভ হোক
কন্যার আমার। হে আদিত্য, হে পবন,
করি প্রণিপাত, সর্ব দিক্‌পালগণ
করো দূর মালিনীর সর্ব অকল্যাণ।—
দেখিতে দেখিতে আহা শ্রান্ত দু-নয়ান
মুদিয়া এসেছে ঘুমে। আহা, মরে যাই।
দূর হোক, দূর হোক সকল বালাই।—
ভয়ে অঙ্গ কাঁপে মোর। কন্যার তোমার
এ কী খেলা মহারাজ? সমস্ত সংসার
খেলার সামগ্রী তার— তারে রেখে দিবে
আপনার গৃহকোণে, ঘুম পাড়াইবে
পদ্মহস্ত পরশিয়া ললাটে তাহার!
অবাক হয়েছি দেখে কাণ্ড বালিকার।
যেমন খেলেনাখানি, তেমনি এ খেলা।
মহারাজ, সাবধান হও এই বেলা।
নবধর্ম, নবধর্ম কারে বল তুমি!
কে আনিল নবধর্ম, কোথা তার ভূমি
আকাশকুসুম? কোন্ মত্ততার স্রোতে
ভেসে এল— কন্যারে মায়ের কোল হতে
টানিয়া লইয়া যায়— ধর্ম বলে তায়?
তুমিও দিয়ো না যোগ কন্যার খেলায়
মহারাজ। বলে দাও, গ্রহবিপ্রগণ
করুক সকলে মিলে শান্তিস্বস্ত্যয়ন
দেবার্চনা। স্বয়ম্বরসভা আনো ডেকে
মালিনীর তরে। মনোমত বর দেখে
খেলা ভেঙে যোগ্য কণ্ঠে দিক বরমালা—
দূর হবে নবধর্ম, জুড়াইবে জ্বালা।

চতুর্থ দৃশ্য

রাজ-উপবন

মালিনী পরিচারিকাবর্গ ও সুপ্রিয়

মালিনী। হায়, কী বলিব! তুমিও কি মোর দ্বারে
আসিয়াছ দ্বিজোত্তম? কী দিব তোমারে?
কী তর্ক করিব? কী শাস্ত্র দেখাব আনি?
তুমি যাহা নাহি জান আমি কি তা জানি?

সুপ্রিয়। শাস্ত্রসাথে তর্ক করি, নহে তোমা-সনে।
সভায় পণ্ডিত আমি, তোমার চরণে
বালকের মতো। দেবী, লহো মোর ভার।
যে পথে লইয়া যাবে জীবন আমার
সাথে যাবে, সর্ব তর্ক করি পরিহার,
নীরব ছায়ার মতো দীপবর্তিকার।

মালিনী। হে ব্রাহ্মণ, চলে যায় সকল ক্ষমতা
তুমি যবে প্রশ্ন কর, নাহি পাই কথা।
বড়োই বিস্ময় লাগে মনে। হে সুপ্রিয়,
মোর কাছে কী জানিতে এসেছ তুমিও?

সুপ্রিয়। জানিবার কিছু নাই, নাহি চাহি জ্ঞান।
সব শাস্ত্র পড়িয়াছি, করিয়াছি ধ্যান
শত তর্ক শত মত। ভুলাও, ভুলাও,
যত জানি সব জানা দূর করে দাও।
পথ আছে শতলক্ষ, শুধু আলো নাই
ওগো দেবী জ্যোতির্ময়ী— তাই আমি চাই
একটি আলোর রেখা উজ্জ্বল সুন্দর
তোমার অন্তর হতে।

মালিনী। হায় বিপ্রবর,
যত তুমি চাহিতেছ আমি যেন তত
আপনারে হেরিতেছি দরিদ্রের মতো।
যে দেবতা মর্মে মোর বজ্রালোক হানি
বলেছিল একদিন বিদ্যুন্ময়ী বাণী
সে আজি কোথায় গেল। সেদিন, ব্রাহ্মণ,
কেন তুমি আসিলে না? কেন এতক্ষণ
সন্দেহে রহিলে দূরে? বিশ্বে বাহিরিয়া
আজি মোর জাগে ভয়, কেঁপে ওঠে হিয়া,
কী করিব কী বলিব বুঝিতে না পারি—
মহাধর্মতরণীর বালিকাকাণ্ডারী
নাহি জানি কোথা যেতে হবে। মনে হয়
বড়ো একাকিনী আমি— সহস্র সংশয়,
বৃহৎ সংসার, অসংখ্য জটিল পথ,
নানা প্রাণী— দিব্যজ্ঞান ক্ষণপ্রভাবৎ
ক্ষণিকের তরে আসে। তুমি মহাজ্ঞানী
হবে কি সহায় মোর?

সুপ্রিয়। বহু ভাগ্য মানি
যদি চাহ মোরে।

মালিনী। মাঝে মাঝে নিরুৎসাহ
রুদ্ধ করে দেয় যেন প্রাণের প্রবাহ—
পীড়ন করিতে থাকে নিরুদ্ধনিশ্বাসে,
থেকে থেকে অকারণ অশ্রুজলে ভাসে

দু-নয়ন কোন্ বেদনায়। অকস্মাৎ
আপনার 'পরে যেন পড়ে দৃষ্টিপাত
সহস্র লোকের মাঝে, সেই দুঃসময়ে
তুমি মোর বন্ধু হবে? মন্ত্রগুরু হয়ে
দিবে নবপ্রাণ?

সুপ্রিয়। প্রস্তুত রাখিব নিত্য
এ ক্ষুদ্র জীবন। আমার সকল চিত্ত
সবল নির্মল করি, বুদ্ধি করি শান্ত,
সমর্পণ করি দিব নিয়ত একান্ত
তব কাজে।

প্রতিহারীর প্রবেশ

প্রতিহারী। প্রজাগণ দরশন যাচে।

মালিনী। আজ নহে, আজ নহে। সকলের কাছে
মিনতি আমার; আজি মোর কিছু নাহি।
রিক্ত চিত্ত মাঝে মাঝে ভরিবারে চাহি—
বিশ্রাম প্রার্থনা করি ঘুচাতে জড়তা।

[প্রতিহারীর প্রস্থান

সুপ্রিয়ের প্রতি

যে কথা শুনাতেছিলে কহো সেই কথা,
আপন কাহিনী। শুনিয়া বিস্ময় লাগে,
নূতন বারতা পাই, নবদৃশ্য জাগে
চক্ষে মোর। তোমাদের সুখদুঃখ যত,
গৃহের বারতা সব, আত্মীয়ের মতো
সকলি প্রত্যক্ষ যেন জানিবারে পাই।
ক্ষেমংকর বান্ধব তোমার?

সুপ্রিয়। বন্ধু, ভাই,
প্রভু। সূর্য সে আমার, আমি তার রাহু,
আমি তার মহামোহ। বলিষ্ঠ সে বাহু,
আমি তাহে লৌহপাশ। বাল্যকাল হতে
দৃঢ় সে অটলচিত্ত, সংশয়ের স্রোতে
আমি ভাসমান। তবু সে নিয়ত মোরে
বন্ধুমোহে বক্ষোমাঝে রাখিয়াছে ধরে
প্রবল অটল প্রেমপাশে, নিঃসন্দেহে
বিনা পরিতাপে, চন্দ্রমা যেমন স্নেহে
সহাস্যে বহন করে কলঙ্ক অক্ষয়
অনন্ত ভ্রমণপথে। ব্যর্থ নাহি হয়
বিধির নিয়ম কভু— লৌহময় তরী
হোক-না যতই দৃঢ়, যদি রাখে ধরি
বক্ষতলে ক্ষুদ্র ছিদ্রটিরে, একদিন
সংকটসমুদ্রমাঝে উপায়বিহীন

ডুবিতে হইবে তারে। বন্ধু চিরন্তন,
তোমারে ডুবাব আমি, ছিল এ লিখন।

মালিনী। ডুবায়েছ তারে?

সুপ্রিয়। দেবী, ডুবায়েছি তারে।
জীবনের সব কথা বলেছি তোমারে,
শুধু, সেই কথা আছে বাকি।
যেই দিন
বিদ্বেষ উঠিল গর্জি দয়াধর্মহীন
তোমারে ঘেরিয়া চারি দিকে, একাকিনী
দাঁড়াইয়া পূর্ণ মহিমায়, কী রাগিণী
বাজাইলে! বংশীরবে যেন মন্ত্রাহত
বিদ্রোহ করিল আসি ফণা অবনত
তব পদতলে। শুধু বিপ্র ক্ষেমংকর
রহিল পাষাণচিত্ত, অটল-অন্তর।
একদা ধরিয়া কর কহিল সে মোরে—
'বন্ধু, আমি চলিলাম দূর দেশান্তরে।
আনিয়া বিদেশী সৈন্য বরুণার কূলে
নবধর্ম উৎপাটন করিব সমূলে
পুণ্য কাশী হতে।' চলি গেল রিক্ত হাতে
অজ্ঞাত ভুবনে। শুধু লয়ে গেল সাথে
আমার হৃদয়, আর, প্রতিজ্ঞা কঠোর।
তার পরে জান তুমি কী ঘটিল মোর।
লভিলাম যেন আমি নবজন্মভূমি
যেদিন এ শুষ্ক চিত্তে বরষিলে তুমি
সুধাবৃষ্টি। 'সর্ব জীবে দয়া' জানে সবে—
অতি পুরাতন কথা— তবু এই ভবে
এই কথা বসি আছে লক্ষবর্ষ ধরি
সংসারের পরতীরে। তারে পার করি
তুমি আজি আনিয়াছ সোনার তরীতে
সবার ঘরের দ্বারে। হৃদয়-অমৃতে
স্তন্যদান করিয়াছ সে দেবশিশুরে,
লয়েছে সে নবজন্ম মানবের পুরে
তোমারে মা ব'লে। স্বর্গ আছে কোন্ দূরে,
কোথায় দেবতা— কে বা সে সংবাদ জানে
শুধু জানি বলি দিয়া আত্ম-অভিমানে
বাসিতে হইবে ভালো, বিশ্বের বেদনা
আপন করিতে হবে— যে-কিছু বাসনা
শুধু আপনার তরে তাই দুঃখময়।
যজ্ঞে যাগে তপস্যায় কভু মুক্তি নয়,
মুক্তি শুধু বিশ্বকাজে। ফিরে গিয়ে ঘরে
সে নিশীথে কাঁদিয়া কহিনু উচ্চস্বরে,

'বন্ধু, বন্ধু, কোথা গেছ বহু বহু দূরে—
অসীম ধরণীতলে মরিতেছ ঘুরে।'
ছিনু তার পত্র-আশে— পত্র নাহি পাই,
না জানি সংবাদ। আমি শুধু আসি যাই
রাজগৃহমাঝে, চারি দিকে দৃষ্টি রাখি,
শুধাই বিদেশীজনে, ভয়ে ভয়ে থাকি—
নাবিক যেমন দেখে চকিত নয়নে
সমুদ্রের মাঝে, গগনের কোন্ কোণে
ঘনাইছে ঝড়। এল ঝড় অবশেষে
একখানি ছোটো পত্ররূপে। লিখেছে সে—
রত্নবতী নগরীর রাজগৃহ হতে
সৈন্য লয়ে আসিছে সে শোণিতের স্রোতে
ভাসাইতে নবধর্ম, ভিড়াইতে তীরে
পিতৃধর্ম মগ্নপ্রায়, রাজকুমারীরে
প্রাণদণ্ড দিতে। প্রচণ্ড আঘাতে সেই
ছিঁড়িল প্রাচীন পাশ এক নিমেষেই।
রাজারে দেখানু পত্র। মৃগয়ার ছলে
গোপনে গেছেন রাজা সৈন্যদলবলে
আক্রমিতে তারে। আমি হেথা লুটাতেছি
পৃথ্বীতলে— আপনার মর্মে ফুটাতেছি
দন্ত আপনার।

মালিনী। হায়, কেন তুমি তারে
আসিতে দিলে না হেথা মোর গৃহদ্বারে
সৈন্যসাথে? এ ঘরে সে প্রবেশিত আসি
পূজ্য অতিথির মতো, সুচিরপ্রবাসী
ফিরিত স্বদেশে তার।

রাজার প্রবেশ

রাজা। এসো আলিঙ্গনে
হে সুপ্রিয়! গিয়েছিনু অনুকূল ক্ষণে
বার্তা পেয়ে। বন্দী করিয়াছি ক্ষেমংকরে
বিনাক্লেশে। তিলেক বিলম্ব হলে পরে
সুপ্তরাজগৃহশিরে বজ্র ভয়ংকর
পড়িত ঝঞ্ঝনি, জাগিবার অবসর
পেতেম না কভু। এসো আলিঙ্গনে মম
বান্ধব, আত্মীয় তুমি।

সুপ্রিয়। ক্ষমো মোরে ক্ষমো
মহারাজ!

রাজা। শুধু নহে শূন্য আত্মীয়তা
প্রিয়বন্ধু! মনে আনিয়ো না হেন কথা
শুধু রাজ-আলিঙ্গনে পুরস্কার তব।

কী ঐশ্বর্য চাহ? কী সম্মান অভিনব
করিব সৃজন তোমা-তরে? কহো মোরে!

সুপ্রিয়। কিছু নহে, কিছু নহে, খাব ভিক্ষা করে
দ্বারে দ্বারে।

রাজা। সত্য কহো, রাজ্যখণ্ড লবে?

সুপ্রিয়। রাজ্যে ধিক্ থাক্।

রাজা। অহো, বুঝিলাম তবে
কোন্ পণ চাহ জিনিবারে, কোন্ চাঁদ
পেতে চাও হাতে। ভালো, পুরাইব সাধ,
দিলাম অভয়। কোন্ অসম্ভব আশা
আছে মনে, খুলে বলো। কোথা গেল ভাষা!
বেশি দিন নহে, বিপ্র, সে কি মনে পড়ে
এই কন্যা মালিনীর নির্বাসনতরে
অগ্রবর্তী ছিলে তুমি। আজি আরবার
করিবে কি সে প্রার্থনা? রাজদুহিতার
নির্বাসন পিতৃগৃহ হতে? সাধনার
অসাধ্য কিছুই নাই— বাঞ্ছা সিদ্ধ হবে,
ভরসা বাঁধহ বক্ষোমাঝে। শুন তবে—
জীবনপ্রতিমে, বৎসে, যে তোমার প্রাণ
রক্ষা করিয়াছে, সেই বিপ্র গুণবান্
সুপ্রিয় সবার প্রিয়, প্রিয়দরশন,
তারে—

সুপ্রিয়। ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও হে রাজন্!
অয়ি দেবী, আজন্মের ভক্তি-উপহারে
পেয়েছে আপন ঘরে ইষ্টদেবতারে
কত অকিঞ্চন— তেমনি পেতেম যদি
আমার দেবীরে, রহিতাম নিরবধি
ধন্য হয়ে। রাজহস্ত হতে পুরস্কার!
কী করেছি? আশৈশব বন্ধুত্ব আমার
করেছি বিক্রয়, আজি তারি বিনিময়ে
লয়ে যাব শিরে করি আপন আলয়ে
পরিপূর্ণ সার্থকতা? তপস্যা করিয়া
মাগিব পরমসিদ্ধি জন্মান্ত ধরিয়া—
জন্মান্তরে পাই যদি তবে তাই হোক—
বন্ধুর বিশ্বাস ভাঙি সপ্ত স্বর্গলোক
চাহি না লভিতে। পূর্ণকাম তুমি দেবী,
আপনার অন্তরের মহত্ত্বেরে সেবি
পেয়েছ অনন্ত শান্তি— আমি দীনহীন
পথে পথে ফিরে মরি অদৃষ্ট-অধীন
শ্রান্ত নিজভারে। আর কিছু চাহিব না—
দিতেছ নিখিলময় যে শুভকামনা

মনে করে অভাগারে তারি এক কণা
দিয়ো মনে মনে।

মালিনী। ওরে রমণীর মন,
কোথা বক্ষোমাঝে বসে করিস ক্রন্দন
মধ্যাহ্নে নির্জন নীড়ে প্রিয়বিরহিতা
কপোতীর প্রায় ?— কী করেছ বলো পিতা
বন্দীর বিচার ?

রাজা। প্রাণদণ্ড হবে তার।

মালিনী। ক্ষমা করো— একান্ত এ প্রার্থনা আমার
তব পদে।

রাজা। রাজদ্রোহী, ক্ষমিব তাহারে
বৎসে ?

সুপ্রিয়। কে কার বিচার করে এ সংসারে !
সে কি চেয়েছিল তব সসাগরা মহী
মহারাজ ? সে জানিত তুমি ধর্মদ্রোহী,
তাই সে আসিতেছিল তোমার বিচার
করিতে আপন বলে। বেশি বল যার
সেই বিচারক। সে যদি জিনিত আজি
দৈবক্রমে, সে বসিত বিচারক সাজি,
তুমি হতে অপরাধী।

মালিনী। রাখো প্রাণ তার
মহারাজ ! তার পরে স্মরি উপকার
হিতৈষী বন্ধুরে তব যাহা ইচ্ছা দিয়ো,
লবে সে আদর করি।

রাজা। কী বল সুপ্রিয় ?
বন্ধুরে করিব বন্ধুদান ?

সুপ্রিয়। চিরদিন
স্মরণে রহিবে তব অনুগ্রহ-ঋণ
নরপতি।

রাজা। কিন্তু তার পূর্বে একবার
দেখিব পরীক্ষা করি বীরত্ব তাহার।
দেখিব মরণভয়ে টলে কি না টলে
কর্তব্যের বল। মহত্ত্বের শিখা জ্বলে
নক্ষত্রের মতো— দীপ নিবে যায় ঝড়ে,
তারা নাহি নিবে। সে কথা হইবে পরে।
তোমার বন্ধুরে তুমি পাবে, মাঝখানে
উপলক্ষ আমি। সে দানে তৃপ্তি না মানে
মন। আরো দিব। পুরস্কার বলে নয়—
রাজার হৃদয় তুমি করিয়াছ জয়;
সেথা হতে লহ তুলি রত্ন সর্বোত্তম
হৃদয়ের।— কন্যা, কোথা ছিল এ শরম

এতদিন ! বালিকার লজ্জাভয়শোক
দূর করি দীপ্তি পেত অম্লান আলোক
দুঃসহ উজ্জ্বল। কোথা হতে এল আজ
অশ্রুবাষ্পে ছলছল কম্পমান লাজ—
যেন দীপ্ত হোমহুতাশনশিখা ছাড়ি
সদ্য বাহিরিয়া এল স্নিগ্ধসুকুমারী
দ্রুপদদুহিতা।

সুপ্রিয়ের প্রতি

উঠ, ছাড়ো পদতল।
বৎস, বক্ষে এসো। সুখ করিছে বিহ্বল
দুর্ভর দুঃখেরই মতো। দাও অবসর,
হেরি প্রাণপ্রতিমার মুখশশধর
বিরলে আনন্দভরে শুধু ক্ষণকাল। [সুপ্রিয়ের প্রতি

স্বগত

বহুদিন পরে মোর মালিনীর ভাল
লজ্জার আভায় রাঙা। কপোল উষার
যখনি রাঙিয়া উঠে, বুঝা যায়, তার
তপন উদয় হতে দেরি নাই আর।
এ রাঙা আভাস দেখে আনন্দে আমার
হৃদয় উঠিছে ভরি ; বুঝিলাম মনে
আমাদের কন্যাটুকু বুঝি এতক্ষণে
বিকশি উঠিল— দেবী না রে, দয়া না রে,
ঘরের সে মেয়ে।

প্রতিহারীর প্রবেশ

প্রতিহারী। জয় মহারাজ, দ্বারে
উপনীত বন্দী ক্ষেমংকর।

রাজা। আনো তারে।

শৃঙ্খলবদ্ধ ক্ষেমংকরের প্রবেশ

নেত্র স্থির, উর্ধ্বশির, ভ্রূকুটির 'পরে
ঘনায়ে রয়েছে ঝড়, হিমাদ্রিশিখরে
স্তম্ভিত শ্রাবণসম।

মালিনী। লোহার শৃঙ্খল
ধিক্কার মানিছে যেন লজ্জায় বিকল
ওই অঙ্গ-'পরে। মহত্বের অপমান
মরে অপমানে। ধন্য মানি এ পরান
ইন্দ্রতুল্য হেন মূর্তি হেরি।

বন্দীর প্রতি

রাজা। কী বিধান
হয়েছে শুনেছ?

ক্ষেমংকর। মৃত্যুদণ্ড।

রাজা। যদি প্রাণ
ফিরে দিই, যদি ক্ষমা করি!

ক্ষেমংকর। পুনর্বার
তুলিয়া লইতে হবে কর্তব্যের ভার—
যে পথে চলিতেছিনু আবার সে পথে
যেতে হবে।

রাজা। বাঁচিতে চাহ না কোনোমতে:
ব্রাহ্মণ, প্রস্তুত হও মমতা তেয়াগি
জীবনের। এই বেলা লহো তবে মাগি
প্রার্থনা যা-কিছু থাকে।

ক্ষেমংকর। আর কিছু নাহি,
বন্ধু সুপ্রিয়েরে শুধু দেখিবারে চাহি।

প্রতিহারীর প্রতি

রাজা। ডেকে আনো তারে।

মালিনী। হৃদয় কাঁপিছে বুকে.
কী যেন পরমা শক্তি আছে ওই মুখে
বজ্রসম ভয়ংকর। রক্ষা করো পিতঃ,
আনিয়ো না সুপ্রিয়েরে।

রাজা। কেন, মা, শঙ্কিত
অকারণে? কোনো ভয় নাই।

ক্ষেমংকরের নিকট সুপ্রিয়ের আগমন

আলিঙ্গন প্রত্যাখ্যান করিয়া

ক্ষেমংকর। থাক্ থাক্,
যাহা বলিবার আছে আগে হয়ে যাক—
পরে হবে প্রণয়সম্মান। এসো হেথা।
জান সখে, বাক্যদীন আমি— বেশি কথা
জোগায় না মুখে। সময় অধিক নাই,
আমার বিচার হল শেষ— আমি চাই
তোমার বিচার এবে। বলো মোর কাছে
এ কাজ করেছ কেন?

সুপ্রিয়। বন্ধু এক আছে
শ্রেষ্ঠতম, সে আমার আত্মার নিশ্বাস,
সব ছেড়ে রাখিয়াছি তাহারি বিশ্বাস
প্রাণসখে— ধর্ম সে আমার।

ক্ষেমংকর। জানি জানি
ধর্ম কে তোমার। ওই স্তব্ধ মুখখানি
অন্তর্জ্যোতির্ময়, মূর্তিমতী দৈববাণী
রাজকন্যারূপে— চতুর্বেদ হতে, সখে,
কেড়ে লয়ে পিতৃধর্ম ওই নেত্রালোকে
দিয়েছ আহুতি তুমি। ধর্ম ওই তব।
ওই প্রিয়মুখে তুমি রচিয়াছ নব
ধর্মশাস্ত্র আজি।

সুপ্রিয়। সত্য বুঝিয়াছ সখে।
মোর ধর্ম অবতীর্ণ দীন মর্তলোকে
ওই নারীমূর্তি ধরি। শাস্ত্র এতদিন
মোর কাছে ছিল অন্ধ জীবনবিহীন ;
ওই দুটি নেত্রে জ্বলে যে উজ্জ্বল শিখা
সে আলোকে পড়িয়াছি বিশ্বশাস্ত্রে লিখা—
যেথা দয়া সেথা ধর্ম, যেথা প্রেমস্নেহ,
যেথায় মানব, যেথা মানবের গেহ।
বুঝিলাম, ধর্ম দেয় স্নেহ মাতারূপে,
পুত্ররূপে স্নেহ লয় পুন ; দাতারূপে
করে দান, দীনরূপে করে তা গ্রহণ ;
শিষ্যরূপে করে ভক্তি, গুরুরূপে করে
আশীর্বাদ ; প্রিয়া হয়ে পাষাণ-অন্তরে
প্রেম-উৎস লয় টানি, অনুরক্ত হয়ে
করে সর্বত্যাগ। ধর্ম বিশ্বলোকালয়ে
ফেলিয়াছে চিত্তজাল, নিখিল ভুবন
টানিতেছে প্রেমক্রোড়ে— সে মহাবন্ধন
ভরেছে অন্তর মোর আনন্দবেদনে
চাহি ওই উষারুণ করুণ বদনে।
ওই ধর্ম মোর।

ক্ষেমংকর। আমি কি দেখি নি ওরে ?
আমিও কি ভাবি নাই মুহূর্তের ঘোরে
এসেছে অনাদি ধর্ম নারীমূর্তি ধরে
কঠিন পুরুষমন কেড়ে নিয়ে যেতে
স্বর্গপানে ? ক্ষণতরে মুগ্ধ হৃদয়েতে
জন্মে নি কি স্বপ্নাবেশ ? অপূর্ব সংগীতে
বক্ষের পঞ্জর মোর লাগিল কাঁদিতে
সহস্র বংশীর মতো— সর্ব সফলতা
জীবনের যৌবনের আশাকল্পলতা
জড়ায়ে জড়ায়ে মোর অন্তরে অন্তরে
মঞ্জরি উঠিল যেন পত্রপুষ্পভরে
এক নিমেষের মাঝে। তবু কি সবলে
ছিঁড়ি নি মায়ার বন্ধ, যাই নি কি চলে

দেশে দেশে দ্বারে দ্বারে, ভিক্ষুকের মতো
লই নি কি শিরে ধরি অপমান শত
হীন হস্ত হতে— সহি নি কি অহরহ
আজন্মের বন্ধু তুমি তোমার বিরহ?
সিদ্ধি যবে লব্ধপ্রায়, তুমি হেথা বসে
কী করেছ— রাজগৃহমাঝে সুখালসে
কী ধর্ম মনের মতো করেছ সৃজন
দীর্ঘ অবসরে!

সুপ্রিয়। ওগো বন্ধু, এ ভুবন
নহে কি বৃহৎ? নাই কি অসংখ্য জন,
বিচিত্র স্বভাব? কাহার কী প্রয়োজন
তুমি কি তা জান? গগনে অগণ্য তারা
নিশিনিশি বিবাদ কি করিছে তাহারা
ক্ষেমংকর? তেমনি জ্বালায়ে নিজ জ্যোতি
কত ধর্ম জাগিতেছে তাহে কোন্ ক্ষতি!

ক্ষেমংকর। মিছে আর কেন বন্ধু। ফুরালো সময়,
বাক্য লয়ে মিথ্যা খেলা, তর্ক আর নয়।
সত্যমিথ্যা পাশাপাশি নির্বিরোধে রবে
এত স্থান নাহি নাহি অনন্ত এ ভবে।
অন্নরূপে ধান্য যেথা উঠে চিরদিন
রোপিবে তাহারি মাঝে কণ্টক নবীন,
হে সুপ্রিয়, প্রেম এত সর্বপ্রেমী নয়।
ছিল চিরদিবসের বিশ্রব্ধ প্রণয়,
আনিবে বিশ্বাসঘাত বক্ষোমাঝে তার,
বন্ধু মোর, উদারতা এত কি উদার!
কেহ বা ধর্মের লাগি সহি নির্যাতন
অকালে অস্থানে মরে চোরের মতন,
কেহ বা ধর্মের ব্রত করিয়া নিষ্ফল
বাঁচিবে সম্মানে সুখে, এ ধরণীতল
হেন বিপরীত ধর্ম এক বক্ষে বহে—
এতো বড়ো এত দৃঢ় কভু নহে নহে।

মালিনীর প্রতি ফিরিয়া

সুপ্রিয়। হে দেবী, তোমারি জয়! নিজ পদ্মকরে
যে পবিত্র শিখা তুমি আমার অন্তরে
জ্বালায়েছ, আজি হল পরীক্ষা তাহার—
তুমি হলে জয়ী। সর্ব অপমানভার
সকল নিষ্ঠুরঘাত করিনু গ্রহণ।
রক্ত উচ্ছ্বসিয়া উঠে উৎসের মতন
বিদীর্ণ হৃদয় হতে— তবু সমুজ্জ্বল
তব শান্তি, তব প্রীতি, তব সুমঙ্গল
অম্লান-অচল-দীপ্তি করিছে বিরাজ

সর্বোপরি। ভক্তের পরীক্ষা হল আজ,
জয় দেবী। ক্ষেমংকর, তুমি দিবে প্রাণ—
আমার ধর্মের লাগি করিয়াছি দান
প্রাণের অধিক প্রিয় তোমার প্রণয়,
তোমার বিশ্বাস। তার কাছে প্রাণভয়
তুচ্ছ শতবার।

ক্ষেমংকর। ছাড়ো এ প্রলাপবাণী।
মৃত্যু যিনি তাঁহারেই ধর্মরাজ জানি—
ধর্মের পরীক্ষা তাঁরি কাছে। বন্ধুবর,
এসো তবে কাছে এসো, ধরো মোর কর,
চলো মোরা যাই সেথা দোঁহে এক সনে,
যেমন সে বাল্যকালে— সে কি পড়ে মনে,
কতদিন সারারাত্রি তর্ক করি, শেষে
প্রভাতে যেতেম দোঁহে গুরুর উদ্দেশে
কে সত্য কে মিথ্যা তাহা করিতে নির্ণয়।
তেমনি প্রভাত হোক। সকল সংশয়
আজিকে লইয়া চলি অসংশয় ধামে,
দাঁড়াই মৃত্যুর পাশে দক্ষিণে ও বামে
দুই সখা, লয়ে দু জনের প্রশ্ন যত।
সেথায় প্রত্যক্ষ সত্য উজ্জ্বল উন্নত—
মুহূর্তে পর্বতপ্রায় বিচার-বিরোধ
বাষ্পসম কোথা যাবে! দুইটি অবোধ
আনন্দে হাসিব চাহি দোঁহে দোঁহাকারে।
সব চেয়ে বড়ো আজি মনে কর যারে
তাহারে রাখিয়া দেখো মৃত্যুর সম্মুখে।

সুপ্রিয়। বন্ধু, তাই হোক।

ক্ষেমংকর। এসো তবে, এসো বুকে।
বহুদূরে গিয়েছিলে এসো কাছে তবে
যেথায় অনন্তকাল বিচ্ছেদ না হবে।
লহো তবে বন্ধুহস্তে করুণ বিচার—
এই লহো।

শৃঙ্খল দ্বারা সুপ্রিয়ের মস্তকে আঘাত ও তাহার পতন

সুপ্রিয়। দেবী, তব জয়। [মৃত্যু

মৃতদেহের উপর পড়িয়া

ক্ষেমংকর। এইবার
ডাকো, ডাকো ঘাতকেরে।

সিংহাসন ছাড়িয়া

রাজা। কে আছিস ওরে।
আন্ খড়্গ।

মালিনী। মহারাজ, ক্ষমো ক্ষেমংকরে। [মূর্ছিত

বৈকুণ্ঠের খাতা

নাটকের পাত্রগণ

বৈকুণ্ঠ	
অবিনাশ	বৈকুণ্ঠের কনিষ্ঠ ভ্রাতা
ঈশান	বৈকুণ্ঠের ভৃত্য
কেদার	অবিনাশের সহপাঠী
তিনকড়ি	কেদারের সহচর
বিপিন	

বৈকুণ্ঠের খাতা

প্রথম দৃশ্য

কেদার ও তিনকড়ি

কেদার। দেখ্‌ তিনকড়ে— অবিনাশ তো আমার গন্ধ পেলেই তেড়ে আসে—

তিনকড়ি। মানুষ চেনে দেখছি, আমার মতো অবোধ নয়।

কেদার। কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, আমার শ্যালীর সঙ্গে তার বিবাহ দিয়ে এই জায়গাটাতেই বসবাস করব, আর ঘুড়ে বেড়াতে পারি নে—

তিনকড়ি। টিকতে পারবে না দাদা। তোমার মধ্যে একটা ঘূর্ণি আছেন, তিনিই বরাবর ঘুরিয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত ঘোরাবেন।

কেদার। এখন অবিনাশের দাদা বৈকুণ্ঠকে বশ করতে এসে আমার কী দুর্গতি হয়েছে দেখ্‌। কে জানত বুড়ো বই লেখে। এত বড়ো একখানা খাতা আমাকে পড়তে দিয়ে চলে গেছে—

তিনকড়ি। ওরে বাবা! ইঁদুরের মতো চুরি করে খেতে এসে খাতার জাঁতাকলের মধ্যে পড়ে গেছ দেখছি।

কেদার। কিন্তু তিনকড়ে, তুইই আমার সব প্ল্যান মাটি করবি।

তিনকড়ি। কিছু দরকার হবে না দাদা, তুমি একলাই মাটি করতে পারবে।

কেদার। দেখ্‌ তিনু, এ-সব ব্যস্ত হবার কাজ নয়। গণেশকে সিদ্ধিদাতা বলে কেন— তিনি মোটা লোকটি, খুব চেপে বসে থাকতে জানেন, দেখে মনে হয় না যে তাঁর কিছুতে কোনো গরজ আছে—

তিনকড়ি। কিন্তু তাঁর ইঁদুরটি—

কেদার। ফের বকছিস? লক্ষ্মীছাড়া, তুই একটু আড়ালে যা।

তিনকড়ি। চললুম দাদা। কিন্তু ফাঁকি দিয়ো না। সময়কালে অভাগা তিনকড়েকে মনে রেখো!

[প্রস্থান

বৈকুণ্ঠের প্রবেশ

বৈকুণ্ঠ। দেখছেন কেদারবাবু?

কেদার। আজ্ঞে হাঁ, দেখছি বৈকি! কিন্তু আমার মতে, ওর নাম কী, বইয়ের নামটা যেন কিছু বড়ো হয়ে পড়েছে।

বৈকুণ্ঠ। বড়ো হোক, কিন্তু বিষয়টা বেশ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রাচীন ও প্রচলিত সংগীতশাস্ত্রের আদিম উৎপত্তি ও ইতিহাস এবং নূতন সার্বভৌমিক স্বরলিপির সংক্ষিপ্ত ও সরল আদর্শ প্রকরণ'। এতে আর কোনো কথাটি বাদ গেল না।

কেদার। তা বাদ যায় নি। কিন্তু ওর নাম কী, মাপ করবেন বৈকুণ্ঠবাবু— কিছু বাদসাদ দিয়েই নাম রাখতে হয়। কিন্তু লেখা যা হয়েছে সে পড়তে পড়তে, ওর নাম কী, শরীর রোমাঞ্চ হয়ে ওঠে!

বৈকুণ্ঠ। হা হা হা হা! রোমাঞ্চ! আপনি ঠাট্টা করছেন।

কেদার। সে কী কথা!

বৈকুণ্ঠ। ঠাট্টার বিষয় বটে। ও আমার একটা পাগলামি। হা হা হা হা! সংগীতের উৎপত্তি ও ইতিহাস, মাথা আর মুণ্ডু। দিন খাতাটা। বুড়ো মানুষকে পরিহাস করবেন না কেদারবাবু।

কেদার। পরিহাস! ওর নাম কী, পরিহাস কি মশায় দু ঘণ্টা ধরে কেউ করে। ভেবে দেখুন দেখি, কখন থেকে আপনার খাতা নিয়ে পড়ছি। তা হলে তো রামের বনবাসকেও, ওর নাম কী, কৈকেয়ীর পরিহাস বলতে পারেন।

বৈকুণ্ঠ। হা হা হা হা! আপনি বেশ কথাগুলি বলেন।

কেদার। কিন্তু হাসির কথা নয় বৈকুণ্ঠবাবু, ওর নাম কী, আপনার লেখার স্থানে স্থানে যথার্থই রোমাঞ্চ হয়— তা, কী বলে, আপনার মুখের সামনেই বললুম।

বৈকুণ্ঠ। বুঝেছি আপনি কোন্ জায়গার কথা বলছেন, সেখানটা লেখার সময় আমারই চোখে জল এসেছিল। যদি আপনার বিরক্তি বোধ না হয় তো সেই জায়গাটা একবার পড়ে শোনাই।

কেদার। বিরক্তি! বিলক্ষণ! ওর নাম কী, আমি আপনাকে ঐ জায়গাটা পড়বার জন্যে অনুরোধ করতে যাচ্ছিলুম। (স্বগত) শ্যালীটিকে পার করা পর্যন্ত হে ভগবান, আমাকে ধৈর্য দাও— তার পরে আমারও একদিন আসবে!

বৈকুণ্ঠ। কী বলছেন কেদারবাবু?

কেদার। বলছিলুম যে, ওর নাম কী, সাহিত্যের কামড় কচ্ছপের কামড়— যাকে একবার ধরে, ওর নাম কী, তাকে সহজে ছাড়তে চায় না। আহা, অমন জিনিস কি আর আছে?

বৈকুণ্ঠ। হা হা হা হা! কচ্ছপের কামড়! আপনার কথাগুলি বড়ো চমৎকার।— এই যে সেই জায়গাটা। তবে শুনুন।— হে ভারতভূমি, এক সময়ে তুমি প্রবীণ বীর্যবান পুরুষদিগের তপোভূমি ছিলে; তখন রাজার রাজত্বও তপস্যা ছিল, কবির কবিত্বও তপস্যারই নামান্তর ছিল। তখন তাপস জনক রাজ্যশাসন করিতেন, তখন তাপস বাল্মীকি রামায়ণগানে তপঃপ্রভাব উৎসারিত করিয়া দিতেন; তখন সকল জ্ঞান, সকল বিদ্যা, সংসারের সকল কর্তব্য, জীবনের সকল আনন্দ সাধনার সামগ্রী ছিল। তখন গৃহাশ্রমও আশ্রম ছিল, অরণ্যাশ্রমও আশ্রম ছিল। আজ যে কুলত্যাগিনী সংগীতবিদ্যা নাট্যশালায় বিদেশী বংশীর কাংস্যকণ্ঠে আর্তনাদ করিতেছে, প্রমোদালয়ে সুরাসরোবরে স্খলিতচরণে আত্মহত্যা করিয়া মরিতেছে, সেই সংগীত একদিন ভরতমুনির তপোবলে মূর্তিমান হইয়া স্বর্গকে স্বর্গীয় করিয়া তুলিয়াছিল; সেই সংগীত সাধকশ্রেষ্ঠ নারদের বীণাতন্ত্রী হইতে শুভ্ররশ্মিরাশির ন্যায় বিচ্ছুরিত হইয়া বৈকুণ্ঠাধিপতির বিগলিত পাদপদ্মনিস্যন্দিত পুণ্য নির্ঝরিণীকে ম্লান মর্তলোকে প্রবাহিত করিয়াছিল। হে দুর্ভাগিনী ভারতভূমি, আজ তুমি কৃশকায় দীনপ্রাণ রোগজীর্ণ শিশুদিগের ক্রীড়াভূমি; আজ তোমার যজ্ঞবেদীর পুণ্য মৃত্তিকা লইয়া অবোধগণ পুত্তলিকা নির্মাণ করিতেছে; আজ সাধনাও নাই, সিদ্ধিও নাই; আজ বিদ্যার স্থলে বাচালতা, বীর্যের স্থলে অহংকার এবং তপস্যার স্থলে চাতুরী বিরাজ করিতেছে। যে বজ্রবক্ষ বিপুল তরণী একদিন উত্তাল তরঙ্গ ভেদ করিয়া মহাসমুদ্র পার হইত, আজ সে তরণীর কর্ণধার নাই; আমরা কয়েকজন বালকে তাহারই কয়েক খণ্ড জীর্ণ কাষ্ঠ লইয়া ভেলা বাঁধিয়া আমাদের পল্লীপ্রান্তের পঙ্কপল্বলে ক্রীড়া করিতেছি এবং শিশুসুলভ মোহে অজ্ঞানসুলভ অহংকার কল্পনা করিতেছি, এই ভগ্ন ভেলাই সেই অর্ণবতরী, আমরাই সেই আর্য, এবং আমাদের গ্রামের এই জীর্ণপত্রকলুষিত জলকুণ্ডই সেই অতলস্পর্শ সাধনসমুদ্র।

ঈশানের প্রবেশ

ঈশান। বাবু, খাবার এসেছে।

বৈকুণ্ঠ। তাঁকে একটু বসতে বলো।

ঈশান। বসতে বলব কাকে? খাবার এসেছে।

কেদার। তা হলে আমি উঠি। ওর নাম কী, স্বার্থপর হয়ে আপনাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি—

বৈকুণ্ঠ। কেন, আপনি উঠছেন কেন?

ঈশান। নাঃ, ওঁর আর উঠে কাজ নেই! তামাম রাত ধরে তোমার ঐ লেখা শুনুন! (কেদারের প্রতি) যাও বাবু, তুমি ঘরে যাও। আমাদের বাবুকে আর খেপিয়ে তুলো না। [প্রস্থান

কেদার। ইনি আপনার কে হন?

বৈকুণ্ঠ। ঈশেন, আমার চাকর।

কেদার। ওঃ, ওর নাম কী, এঁর কথাগুলি বেশ পষ্ট পষ্ট।

বৈকুণ্ঠ। হা হা হা হা! ঠিক বলেছেন। তা, কিছু মনে করবেন না— অনেক দিন থেকে আছে— আমাকে মানে-টানে না।

কেদার। ওর নাম কী, অল্পক্ষণের আলাপ যদিচ, তবু আমাকেও বড়ো মানে না দেখলুম। কিন্তু ওর কথাটা আপনি কানে তোলেন নি— খাবার এসেছে।

বৈকুণ্ঠ। তা হোক, রাত হয় নি— এই অধ্যায়টা শেষ করে ফেলি।

কেদার। বৈকুণ্ঠবাবু, খাবার আপনার ঘরে আসে এবং এসে বসেও থাকে— ওর নাম কী, আমাদের ঘরে তাঁর ব্যবহার অন্য রকমের। দেখুন, যখন ছেলেবেলায় কালেজে পড়তুম তখন, ওর নাম কী, খুব উচ্চ মাচার উপরেই আশালতা চড়িয়েছিলুম; তাতে বড়ো বড়ো লাউয়ের মতো দেড়-হাত দু-হাত ফলও ঝুলে পড়েছিল, কিন্তু কী বলে, গোড়ায় জল পেলে না, ভিতরে রস প্রবেশ করলে না, ওর নাম কী, সব ফাঁপা হয়ে রইল। এখন কোথায় পয়সা, কোথায় অন্ন, এই করেই মরছি। ভিতরে সার যা ছিল সব চুপসে, ওর নাম কী, শুকিয়ে গেল।

বৈকুণ্ঠ। আহা হা হা! এতবড়ো দুঃখের বিষয় আর কিছু হতে পারে না। অথচ সর্বদাই প্রফুল্ল আছেন— আপনি মহানুভব ব্যক্তি! (কেদারের হাত চাপিয়া ধরিয়া) দেখুন, আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে যদি আপনার কোনো সাহায্য করতে পারি খুলে বলবেন— কিছুমাত্র সংকোচ—

কেদার। মাপ করবেন বৈকুণ্ঠবাবু, ওর নাম কী, আমাকে টাকার প্রত্যাশী মনে করবেন না— আজ যে আনন্দ দিয়েছেন এর তুলনায়, ওর নাম কী, টাকার তোড়া—

তিনকড়ির প্রবেশ

তিনকড়ি। (জনান্তিকে) খুশি হয়ে দিতে চাচ্ছে, নে না—

কেদার। সব মাটি করলে লক্ষ্মীছাড়া বাঁদর কোথাকার—

বৈকুণ্ঠ। এ ছেলেটি কে?

কেদার। দেনার সঙ্গে যেমন সুদ, ওর নাম কী, উনি আমার তেমনি। নিজের দায়ই সামলাতে পারি নে, তার উপর আবার ভগবান, কী বলে, ঢাকের উপর ঢেঁকি চড়িয়েছেন।

তিনকড়ি। উনি যদি হন গোরু আমি হই ওঁর লেজ। যখন চরে খান আমি পিঠের মাছি তাড়াই, আবার যখন চাষার হাতে লাঞ্ছনা খেতে হয় তখন মলাটা আমার উপর দিয়েই যায়।

বৈকুণ্ঠ। হা হা হা হাঃ! এ ছোকরাটি বেড়ে পেয়েছেন। এর যে খুব চোখেমুখে কথা। দেখুন, বিলম্ব হয়ে গেছে, আজ আমার এইখানেই আহারাদি হোক-না।

কেদার। না না, সে আপনার অসুবিধা করে কাজ নেই।

তিনকড়ি। বিলক্ষণ! শুভকার্যে বাধা দিতে নেই। খাওয়াতে ওঁর সামান্য অসুবিধে, না খেতে পেলে আমাদের অসুবিধে ঢের বেশি। খিদে পেয়েছে মশায়।

বৈকুণ্ঠ। বেশ বাবা, তুমি পেট ভরে খেয়ে যাও। তৃপ্তির সঙ্গে খেতে দেখলে আমার বড়ো আনন্দ হয়।

কেদার। এই ছোঁড়াটাকে ভগবান, ওর নাম কী, অন্তরিন্দ্রিয়ের মধ্যে কেবল একটি জঠর দিয়েছেন মাত্র। আপনার এই আশ্রমটিতে এলে পেট বলে যে একটা গভীর গহ্বর আছে, কী বলে, সে কথা একেবারে ভুলে যেতে হয়। মনে হয় যেন কেবল একজোড়া হৃৎপিণ্ডের উপরে, ওর নাম কী, একখানি মুণ্ডু নিয়ে বসে আছি।

বৈকুণ্ঠ। হা হা হা হাঃ! আপনি বড়ো সুন্দর রস দিয়ে কথা বলতে পারেন— বা বা, আপনার চমৎকার ক্ষমতা!

তিনকড়ি। কথায় মত্ত হয়ে প্রতিজ্ঞে ভুলবেন না বৈকুণ্ঠবাবু। খিদে ক্রমেই বাড়ছে।

বৈকুণ্ঠ। বটে বটে! ঈশেন! ঈশেন! একবার এই দিকে শুনে যাও তো ঈশেন!

ঈশানের প্রবেশ

ঈশান। একটি ছিল, দুটি জুটেছে!

তিনকড়ি। রেগো না দাদা, তোমাকেও ভাগ দেব।

ঈশান। এখনো লেখা শোনানো চলছে বুঝি!

বৈকুণ্ঠ। (লজ্জিতভাবে খাতা আড়াল করিয়া) না না, লেখা, কোথায়? দেখো ঈশেন, ইয়ে হয়েছে— এই দুটি বাবু, বুঝেছ, এঁদের জন্যে কিছু খাবার এনে দিতে হচ্ছে।

ঈশান। খাবার এখন কোথায় জোগাড় করব।

তিনকড়ি। ও বাবা!

বৈকুণ্ঠ। ঈশেন, বুঝেছ, তুমি একবার বাড়ির মধ্যে গিয়ে আমার মাকে বলে এসো গে যে—

ঈশান। সে হবে না বাবু, দিদিঠাকরুনকে আমি আবার এই দিবসান্তে বেড়ি ধরাতে পারব না— তিনি তোমার ভাত কোলে নিয়ে সেই অবধি বসে আছেন—

বৈকুণ্ঠ। তা, এঁদের না খাইয়ে তো আমি খেতে পারব না, তুমি একবার মাকে বললেই—

ঈশান। তা জানি, তাঁকে বললেই তিনি ছুটে যাবেন, কিন্তু আজ সমস্ত দিন একাদশী করে আছেন। বাবু, আজকের মতো তোমরা ঘরে গিয়ে খাও গে।

তিনকড়ি। দাদা, পরামর্শ দেওয়া সহজ, কিন্তু খাবার না থাকলে কী করে খাওয়া যায় সে সমিস্যে তো কেউ মেটাতে পারলে না।

কেদার। তিনকড়ে, থাম্। বৈকুণ্ঠবাবু, ব্যস্ত হবেন না, ওর নাম কী, আজ থাক্-না—

বৈকুণ্ঠ। দেখ্ ঈশেন, তোর জ্বালায় কি আমি বাড়িঘরদোর ছেড়ে বনে গিয়ে পালাব! বাড়িতে দু জন ভদ্রলোক এলে তাদের দু-মুঠো খেতে দিবি নে! হারামজাদা লক্ষ্মীছাড়া বেটা! বেরো তুই আমার ঘর থেকে—

[ঈশানের প্রস্থান

তিনকড়ি। আহা, রাগ করবেন না। আমি ঠাউরেছিলুম খাওয়াতে আপনার কোনো অসুবিধে নেই, ঠিক বুঝতে পারি নি, একটু অসুবিধে আছে বৈকি! এ লোকটিকে ইতিপূর্বে দেখি নি— তা ছাড়া আপনার বুড়ো মা—

বৈকুণ্ঠ। না না; সেটি আমার একমাত্র বিধবা মেয়ে, আমার নীরু, আমার মা নেই।

তিনকড়ি। মা নেই! ঠিক আমারই মতো।

কেদার। বৈকুণ্ঠবাবু, ওর নাম কী, আজ তবে উঠি— ঈশানকোণে ঝড়ের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

তিনকড়ি। দাঁড়াও না, যাবে কোথায়? দেখুন বৈকুণ্ঠবাবু, লজ্জা পাবেন না— এই তিনকড়ের পোড়াকপালের আঁচ পেলে অন্নপূর্ণার হাঁড়ির তলা দু-ফাঁক হয়ে যায়। যা হোক, আমার উপর সম্পূর্ণ ভার দিন, আমি বড়োবাজার থেকে আহারের জোগাড় করে আনছি। আপনাকে আর কিছু দেখতে হবে না।

কেদার। (কৃত্রিম রোষে) দেখ্ তিনকড়ি! এতদিন, ওর নাম কী, আমার সহবাসে এবং দৃষ্টান্তে তোর এই, কী বলে, হেয় জঘন্য লুব্ধ প্রবৃত্তি ঘুচল না! আজ থেকে, ওর নাম কী, তোর মুখদর্শন করব না।

[প্রস্থান

বৈকুণ্ঠ। আহা, আহা, রাগ করে যাবেন না কেদারবাবু— কেদারবাবু, শুনে যান।

তিনকড়ি। কিছু ভাববেন না। কেদারদাকে আমি বেশ জানি। ওকে আমি আধ ঘণ্টার মধ্যে

জুড়িয়ে ঠাণ্ডা করে আপনার এখানে হাজির করে দেব। বুঝছেন না, পেটে আগুন জ্বললেই বাক্যিগুলো কিছু গরম গরম আকারে মুখ থেকে বেরোতে থাকে।

বৈকুণ্ঠ। হা হা হা হাঃ! বাবা, তোমার কথাগুলি বেশ। তা দেখো, এই তোমাকে কিঞ্চিৎ জলপানি দিচ্ছি। (নোট দিয়া) কিছু মনে কোরো না।

তিনকড়ি। কিচ্ছু না, কিচ্ছু না। এর চেয়ে বেশি দিলেও কিছু মনে করতুম না— আমার সেরকম স্বভাবই নয়।

[প্রস্থান

ঈশানের প্রবেশ

ঈশান। বাবু! (বৈকুণ্ঠ নিরুত্তর)— বাবু! (নিরুত্তর)— বাবু, খাবার এসেছে। (নিরুত্তর)— খাবার ঠাণ্ডা হয়ে গেল যে।

বৈকুণ্ঠ। (রাগিয়া) যা— আমি খাব না।

ঈশান। আমায় মাপ করো— খাবার জুড়িয়ে গেল।

বৈকুণ্ঠ। না, আমি খাব না।

ঈশান। পায়ে ধরি বাবু— খেতে চলো— রাগ কোরো না।

বৈকুণ্ঠ। যাঃ— বেরো তুই— বিরক্ত করিস নে।

ঈশান। দাও আমার কান মলে দাও— বাবু—

অবিনাশের প্রবেশ

অবিনাশ। কী দাদা। এখনো বসে বসে লিখছ বুঝি?

বৈকুণ্ঠ। না না, কিচ্ছু না— এখন লিখতে যাব কেন? ঈশানের সঙ্গে বসে বসে গল্প করছি।— ঈশেন, তুই যা, আমি যাচ্ছি।

[ঈশানের প্রস্থান

অবিনাশ। দাদা, মাইনের টাকাগুলো এনেছি— এই কুড়ি টাকার পাঁচ কেতা নোট আর পাঁচশো টাকার একখানা।

বৈকুণ্ঠ। ঐ পাঁচশো টাকার খানা তুমিই রাখো-না অবু।

অবিনাশ। কেন দাদা।

বৈকুণ্ঠ। যদি কোনো আবশ্যক হয়— খরচপত্র—

অবিনাশ। আবশ্যক হলে চেয়ে নেব—

বৈকুণ্ঠ। তবে এইখানে রাখো। তোমার হাতে টাকা দিলেও তো থাকে না। যে আসে তাকেই বিশ্বাস করে বস। টাকা রাখতে হলে লোক চিনতে হয় ভাই।

অবিনাশ। (হাসিয়া) সেইজন্যেই তো তোমার হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হই দাদা।

বৈকুণ্ঠ। অবি, হাসছিস যে! কেন, আমাকে কেউ ঠকিয়েছে বলতে পারিস? সেদিন সেই স্বরসূত্রসার বই কিনলেম, তোরা নিশ্চয় মনে করেছিস ঠকেছি— কিন্তু সংগীত সম্বন্ধে অমন প্রাচীন বই আর আছে? হীরে দিয়ে ওজন করলেও ওর দাম হয় না। তিনশো টাকায় তো অমনি পেয়েছি।

অবিনাশ। ও বই সম্বন্ধে আমি কি কিছু বলেছি?

বৈকুণ্ঠ। তাতেই তো বুঝতে পারলুম তোরা মনে করছিস বুড়ো ঠকেছে। নইলে একবার জিজ্ঞাসা করতে হয়, একবার নেড়েচেড়ে দেখতে হয়—

অবিনাশ। ওর আর আছে কী দাদা। নাড়তে চাড়তে গেলে যে গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে যাবে।

বৈকুণ্ঠ। সেই তো ওর দাম। ও ধুলো কি আজকের ধুলো। ও ধুলো লাখ টাকা দিয়ে মাথায় রাখতে হয়।

অবিনাশ। দাদা, এ মাসে আমাকে পঁচাত্তর টাকা দিতে হবে।

বৈকুণ্ঠ। কেন, কী করবি? (অবিনাশ নিরুত্তর)— নিলেম থেকে বিলিতি গাছ কিনবি বুঝি? ঐ

তোর এক গাছ-পোঁতা বাতিক হয়েছে। দিনরাত যত রাজ্যের উড়েমালী নিয়ে কারবার! কত মিথ্যে গাছের নাম করে কত লোক যে তোমাকে ঠকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তার আর সংখ্যে করা যায় না। অবু, তুই বিয়েথাওয়া করবি নে?

অবিনাশ। তার চেয়ে অন্য বাতিকগুলো যে ভালো। বয়স প্রায় চল্লিশ হল, আর কেন?

বৈকুণ্ঠ। সে কী, এরই মধ্যে চল্লিশ?

অবিনাশ। এরই মধ্যে আর কই? ঠিক পুরো সময়ই লেগেছে— যেমন অন্য লোকের হয়ে থাকে।

বৈকুণ্ঠ। আমারই অন্যায় হয়েছে! ছি ছি, লোকে স্বার্থপর বলবে। আর দেরি করা নয়।

অবিনাশ। একটি লোক বসে আছে, আমি তবে চললুম। [প্রস্থান

বৈকুণ্ঠ। নিশ্চয় সেই মানিকতলার মালী। একেই বলে বাতিক।

কেদারের প্রবেশ

বৈকুণ্ঠ। এই যে কেদারবাবু ফিরে এসেছেন— বড়ো খুশি হলুম— তা হলে—

কেদার। দেখুন, ওর নাম কী, আপনার লাইব্রেরিতে সকল রকম সংগীতের বই আছে, কিন্তু, কী বলে, চীনেদের সংগীতপুস্তক বোধ করি নেই।

বৈকুণ্ঠ। (ব্যস্ত হইয়া) আজ্ঞে না। আপনি কোথাও সন্ধান পেয়েছেন?

কেদার। একখানি জোগাড় করে এনেছি, আপনাকে উপহার দিতে চাই। বইখানি, ওর নাম কী, বহুমূল্য। এই দেখুন। (স্বগত) বেটা চীনেম্যানের কাছ থেকে তার পুরানো জুতোর হিসাব চেয়ে এনেছি।

বৈকুণ্ঠ। তাই তো। এ যে আদত চীনে ভাষা দেখছি। কিচ্ছু বোঝবার জো নেই। আশ্চর্য! একেবারে সোজা অক্ষর! বা, বা, চমৎকার! তা এর দাম—

কেদার। মাপ করবেন, ওর নাম কী—

বৈকুণ্ঠ। না, সে হবে না! আপনি যে কষ্ট করে বইখানি খুঁজে এনেছেন এতেই আমি আপনার কেনা হয়ে রইলুম, আমার ঋণ আর বাড়াবেন না!

কেদার। (নিশ্বাস ফেলিয়া) কিন্তু কী বলব, দামটা— বোধ হয় ঠকেছি।

বৈকুণ্ঠ। আজ্ঞে না, তা কখনো হতেই পারে না। আমি জানি কিনা, এ-সব জিনিসের দাম বেশি।

কেদার। আজ্ঞে, বেটা—পঁয়ত্রিশ টাকা চেয়ে বসেছে, বোধ করি, ওর নাম কী, ত্রিশেই রফা হবে।

বৈকুণ্ঠ। পঁয়ত্রিশ! এ তো জলের দর! টাকাটা এখনই দিয়ে দিন— আবার যদি মত বদলায়। চীনেম্যান বোধ হয় নিতান্ত দায়ে পড়েছে।

কেদার। দায় বলে দায়! শুনলুম দেশে তার তিন শ্যালী আছে, তিনটিকেই এক কুলীন চীনেম্যানের সঙ্গে বিয়ে দিতে হবে। কন্যাদায় দায়, কিন্তু, কী বলে ভালো, শ্যালীদায়ের সঙ্গে তার তুলনাই হয় না।

বৈকুণ্ঠ। (হাসিয়া) বল কী কেদারবাবু!

কেদার। সাধে বলি! ভুক্তভোগীর কথা। ওর নাম কী, শ্বশুরবাড়িতে শ্যালী অতি উত্তম জিনিস— অমন জিনিস আর হয় না— কিন্তু সেখান থেকে চ্যুত হয়ে হঠাৎ স্কন্ধের উপর এসে পড়লে, ওর নাম কী, সকলে সামলাতে পারে না।

বৈকুণ্ঠ। সামলাতে পারে না! হা হা, হা হা!

কেদার। আজ্ঞে, আমি তো পারছি নে! একে শ্যালী তাতে নিখুঁত সুন্দরী, তাতে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছেন, ওর নাম কী, ঘরে তো আর টেকা যায় না! চোখ মেলে চাইলে স্ত্রী ভাবে শ্যালীকে খুঁজছি, ওর নাম কী, চোখ বুজে থাকলে স্ত্রী ভাবে আমি শ্যালীর ধ্যান করছি। কাশলে মনে করে কাশির মধ্যে একটি অর্থ আছে, আবার কী বলে ভালো, প্রাণপণে কাশি চেপে থাকলে মনে করে তার অর্থ আরো সন্দেহজনক।

অবিনাশের প্রবেশ

অবিনাশ। কী দাদা, খাবার ঠাণ্ডা হয়ে এল, এখনো লেখা নিয়ে বসে আছ!

বৈকুণ্ঠ। না, না, লেখাটেখা কিছু নয়, কেদারবাবুর সঙ্গে গল্প করছি।

অবিনাশ। তাই তো, কেদার দেখছি! কী সর্বনাশ! তুমি কোথা থেকে হে। দাদাকে পেয়ে বসেছ বুঝি।

কেদার। হা হা হা হাঃ! অবিনাশ, চিরকালই তুমি ছেলেমানুষ রয়ে গেলে হে।

অবিনাশ। দাদা, তোমার লেখা শোনাবার আর লোক পেলে না? শেষকালে কেদারকে ধরেছ? ও যে তোমাকে ধরলে আর ছাড়বে না।

বৈকুণ্ঠ। আঃ অবিনাশ, ছিঃ, কী বকছ?

কেদার। বৈকুণ্ঠবাবু, আপনি ব্যস্ত হবেন না, ওর নাম কী, অবিনাশের সঙ্গে এক ক্লাসে পড়েছি, আমার সঙ্গে দেখা হলেই ওর আর ঠাট্টা ছাড়া কথা নেই।

অবিনাশ। তোমার ঠাট্টা যে আমার ঠাট্টার চেয়ে গুরুতর। এই সেদিন আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে গেলে, আবার বুঝি দরকার পড়েছে তাই দাদার বই শুনতে এসেছ?

কেদার। ভাই অবিনাশ, ওর নাম কী, এক-একসময় তোমার কথা শুনে হঠাৎ ভ্রম হয় যে, যা বলছ বুঝি বা সত্যই বলছ! কী জানি, বৈকুণ্ঠবাবু মনে ভাবতেও পারেন যে, কী বলে ভালো—

বৈকুণ্ঠ। (ব্যস্ত হইয়া) না না কেদারবাবু! আমি কিছু মনে ভাবছি নে। কিন্তু অবিনাশ, সত্যি কথা বলতে কি, তোমার ঠাট্টাগুলো কিছু রূঢ় হয়ে পড়ছে। বন্ধুকেও—

অবিনাশ। আমি তো ঠাট্টা করছি নে—

বৈকুণ্ঠ। অ্যাঁ! ঠাট্টা নয়! অভদ্র কোথাকার! কেদারবাবু আমার ঘরে আসেন সে আমার সৌভাগ্য। তুই আমার সামনে তাঁকে অপমান করিস!

কেদার। আহা, রাগ করবেন না বৈকুণ্ঠবাবু—

অবিনাশ। দাদা, মিথ্যা রাগ করছ কেন? কেদারের আবার অপমান কিসের?

বৈকুণ্ঠ। আবার! তোর সঙ্গে আর আমি কথা কব না।

অবিনাশ। মাপ করো দাদা! (বৈকুণ্ঠ নিরুত্তর)— মাপ করো, আমার অপরাধ হয়েছে! (নিরুত্তর)— দাদা, রাগ করে থেকো না—

বৈকুণ্ঠ। তবে শোন্। কেদারবাবুর একটি বিবাহযোগ্যা পরমা সুন্দরী বয়ঃপ্রাপ্ত শ্যালী আছে, তোরও তো বিবাহযোগ্য বয়স হয়েছে— এখন—

কেদার। যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ।

বৈকুণ্ঠ। ঠিক বলেছেন, আমার মনের কথাটি বলেছেন।

কেদার। আমারও ঠিক ঐ মনের কথা।

অবিনাশ। কিন্তু দাদা, আমার মনের কথা একটু স্বতন্ত্র। আমার বিবাহ করবার ইচ্ছে নেই।

কেদার। অবিনাশ, তুমি হাসালে। বিবাহ করবার পূর্বেই অনিচ্ছে! ওর নাম কী, করবার পরে যদি হত তো মানে পাওয়া যেত।

বৈকুণ্ঠ। মেয়েটি তো সুন্দরী—

অবিনাশ। তাকে দেখেছ নাকি?

বৈকুণ্ঠ। দেখতে হবে কেন? কেদারবাবু যে বলছেন।

[অবিনাশ নিরুত্তর

কেদার। বিশ্বাস হল না? কী বলে, আমার আকৃতি দেখেই ভয় পেলে— কিন্তু ওর নাম কী, সে যে আমার শ্যালী, আমার স্ত্রীর সহোদরা, আমার বংশের কেউ নয়। একবার স্বচক্ষে দেখে এলে হয় না?

বৈকুণ্ঠ। সে তো বেশ কথা, দেখে এসো-না অবিনাশ।

অবিনাশ। দেখে আর করব কী! ঘরের মধ্যে বাইরের লোক আনতে চাই নে—

কেদার। তা এনো না। কিন্তু ওর নাম কী, বাইরের লোকের পানে একবার তাকাতে দোষ কী— কী বলে, একবার দেখে এলে ঘরেরও ক্ষতি নেই, ওর নাম কী, বাইরেরও বিশেষ ক্ষয় হবে না।

অবিনাশ। আচ্ছা, তাই হবে। এখন খেতে যাও দাদা, নীরু আমাকে পাঠিয়ে দিল।

বৈকুণ্ঠ। এই যে কেদারবাবু এখনো— আগে ওঁর—

কেদার। বিলক্ষণ!

অবিনাশ। তা, খাবার না বলে দিলে খাবার আসবে কোথা থেকে! ঈশেনকে একবার ডাকা যাক।

কেদার। ঈশেনকে ডেকো না ভাই, ওর নাম কী, তার সঙ্গে পূর্বেই দুটো-একটা কথাবার্তা হয়ে গেছে।

খাবারের চাঙারি হস্তে তিনকড়ির প্রবেশ

তিনকড়ি। এই নাও— বসে যাও— আমি পরিবেশন করছি।

বৈকুণ্ঠ। তুমিও বোসো-না বাপু, পরিবেশনের ব্যবস্থা আমি করছি।

তিনকড়ি। ব্যস্ত হবেন না মশায়, নিজে আগে খেয়ে নিয়েছি।

কেদার। দূর লক্ষ্মীছাড়া পেটুক!

তিনকড়ি। ভাই, তিনকড়ের ভাগ্যে বিঘ্নি ঢের আছে বরাবর দেখে আসছি। জন্মাবামাত্র দুধ খাবার জন্যে কান্না ধরলুম, তার ঠিক পূর্বেই মা গেল মরে। ভাই, সবুর করতে আর সাহস হয় না।

অবিনাশ। এ ছোকরাটিকে কোথায় জোগাড় করলে কেদার?

কেদার। ওর নাম কী, দেশদেশান্তর খুঁজতে হয় নি, আপনি জুটেছে। এখন এঁকে থোব কোথায়, কী বলে ভালো, তাই খুঁজছি।

অবিনাশ। দাদা, তা হলে তুমি এখন খেতে যাও।

বৈকুণ্ঠ। বিলক্ষণ! আগে এঁদের হোক।

কেদার। সে কী কথা বৈকুণ্ঠবাবু—

বৈকুণ্ঠ। কেদারবাবু, আপনি কিছু সংকোচ করবেন না, খেতে দেখতে আমার বড়ো আনন্দ।

তিনকড়ি। বেশ তো, আবার কাল দেখবেন। আমরা তো পালাচ্ছি নে। কিছুতেই না।

কেদার। তিনকড়ে, বরঞ্চ তুই ঐ চাঙারিটা বাড়ি নিয়ে চল্‌। কী বলে, এঁদের আর কেন মিছে বিরক্ত করা।

তিনকড়ি। আজ তো আর দরকার দেখি নে। আবার কাল আছে।

[অবিনাশের হাস্য

বৈকুণ্ঠ। এ ছোকরাটি বেশ কথা কয়। একে আমার বড়ো ভালো লাগছে। কিন্তু আহারটা এইখানেই করতে হচ্ছে, সে আমি কিছুতেই ছাড়ছি নে—

ঈশানের প্রবেশ

ঈশান। বাবু!

বৈকুণ্ঠ। আরে, শুনেছি, এই যে যাচ্ছি। আপনারা তা হলে যাবেন দেখছি। তবে আর ধরে রাখব না।

তিনকড়ি। আজ্ঞে না, তা হলে বিপদে পড়বেন।

[বৈকুণ্ঠ অবিনাশ ও ঈশানের প্রস্থান

(কেদারের প্রতি) এই নে ভাই, টাকা-কটা বেঁচেছে— এ জিনিস আমার হাতে টেঁকে না।

কেদার। তোর বাবা তোর নাম দিয়েছে তিনকড়ি, আমি তোকে ডাকব মানিক। লাখো টাকা তোর দাম।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কেদার ও অবিনাশ

কেদার। ওর নাম কী, আজ তবে উঠি, অনেক বিরক্ত করা গেছে—

অবিনাশ। বিলক্ষণ! বিরক্ত আবার কিসের! একটু বসে যাও-না! শোনো-না— আমি চলে আসার পর সেদিন মনোরমা আমার কথা কিছু বললে?

কেদার। সে আবার কিছু বলবে! তোমার নাম করবামাত্র তার গাল, ওর নাম কী, বিলিতি বেগুনের মতো টকটক করে ওঠে!

অবিনাশ। (হাসিতে হাসিতে) বল কী কেদার, এত লজ্জা!

কেদার। কী বলে, ঐটেই তো হল খারাপ লক্ষণ!

অবিনাশ। (ধাক্কা দিয়া) দূর! কী বলিস তার ঠিক নেই! খারাপ লক্ষণটা কী হল শুনি!

কেদার। ওর নাম কী, ওটা স্বভাবের নিয়ম। যেমন তীর ছোঁড়া— গোড়ায় পিছনের দিকে প্রাণপণে পড়ে টান, তার পরে, ওর নাম কী, ছাড়া পাবামাত্রই সামনের দিকে একেবারে বোঁ করে দেয় ছুট! গোড়ায় যেখানে বেশি লজ্জা দেখা যাচ্ছে, ওর নাম কী, ভালোবাসার দৌড়টাও সেখানে বড্ড বেশি হবে।

অবিনাশ। বল কী কেদার! তা, কিরকম লজ্জাটা তার দেখলে; শুনিই-না! তোমরা বুঝি আমার নাম করে তাকে ঠাট্টা করেছিলে?

কেদার। ভাই, সে অনেক কথা। আজ একটু কাজ আছে, আজ তবে—

অবিনাশ। আঃ, বোসো-না কেদার! শোনো-না, একটা কথা আছে। বুঝেছ কেদার, একটা আংটি কেনা গেছে। বুঝেছ?

কেদার। খুব সহজ কথা, ওর নাম কী, বুঝেছি।

অবিনাশ। সহজ? আচ্ছা, কী বুঝেছ বলো দেখি।

কেদার। টাকা থাকলে আংটি কেনা সহজ, ওর নাম কী, এই বুঝেছি।

অবিনাশ। কিছু বোঝ নি। এই আংটিটি আমি তোমার হাত দিয়ে মনোরমাকে উপহার পাঠাতে চাই। তাতে কিছু দোষ আছে?

কেদার। আমি তো কিছু দেখি নে। যদি বা থাকে তো দোষটুকু বাদ দিয়ে, ওর নাম কী, আংটিটুকু নিলেই হবে।

অবিনাশ। আঃ, তোমার ঠাট্টা রাখো। শোনো-না কেদার, ঐসঙ্গে একটা চিঠিও দিই-না?

কেদার। সে আর বেশি কথা কী।

অবিনাশ। তবে চট করে লিখে দিই।

[লিখিতে প্রবৃত্ত

কেদার। আংটিটা তো লাভ করা গেল। কিন্তু দুই ভাইয়ের মাঝখানে পড়ে মেহন্নতটাও বড্ড বেশি হচ্ছে। এখন, বিবাহটা শীঘ্র চুকে গেলে একটু জিরোবার সময় পাওয়া যায়।

বৈকুণ্ঠের প্রবেশ

বৈকুণ্ঠ। (উকি মারিয়া স্বগত) এই যে, ভায়া আমার কেদারবাবুকে নিয়ে পড়েছে! কনে দেখে ইস্তক ওঁকে আর এক মুহূর্ত ছাড়ে না। বাতিকগ্রস্ত মানুষ কিনা, সকল বিষয়েই বাড়াবাড়ি! কেদারবাবু বোধ হয় একেবারে অস্থির হয়ে উঠেছেন! বেচারাকে আমি উদ্ধার না করলে উপায় নেই। (ঘরে ঢুকিয়া) এই যে কেদারবাবু, আমার সেই নতুন পরিচ্ছেদটি শোনাবার জন্যে আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

কেদার। (স্বগত) আর তো বাঁচি নে।

অবিনাশ। (চিঠি ঢাকিয়া) দাদা, কেদারবাবুর সঙ্গে একটা কাজের কথা ছিল।

বৈকুণ্ঠ। কাজের তো সীমা নেই! ছোঁড়াটার মাথা একেবারে ঘুরে গেছে।— কিন্তু কেদারবাবুকে না পেলে তো আমার চলছে না।

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। বাবু, মানিকতলা থেকে মালী এসেছে।

অবিনাশ। এখন যেতে বলে দে! [ভৃত্যের প্রস্থান

বৈকুণ্ঠ। যাও-না, একবার শুনেই এসো-না! ততক্ষণ আমি কেদারবাবুর কাছে আছি—

কেদার। আমার জন্যে ব্যস্ত হবেন না, ওর নাম কী, আমি আজ তবে—

অবিনাশ। না কেদার, একটু বোসো।

বৈকুণ্ঠ। না, না, আপনি বসুন। দেখো অবিনাশ, গাছপালা সম্বন্ধে তোমার যে আলোচনাটা ছিল সেটা অবহেলা কোরো না। সেটা বড়ো স্বাস্থ্যকর, বড়োই আনন্দজনক।

অবিনাশ। কিছু অবহেলা করব না দাদা, কিন্তু এখন একটা বড়ো দরকারি কাজ আছে।

বৈকুণ্ঠ। আচ্ছা, তা হলে তোমরা একটু বোসো।— ভালোমানুষ পেয়ে বেচারা কেদারবাবুকে ভারি মুশকিলে ফেলেছে— একটু বিবেচনা নেই— বয়সের ধর্ম!

তিনকড়ির প্রবেশ

কেদার। আবার এখানে কী করতে এলি?

তিনকড়ি। ভয় কী দাদা, দু জন আছে— একটিকে তুমি নাও, একটি আমাকে দাও।

বৈকুণ্ঠ। বেশ কথা বাবা, এসো, আমার ঘরে এসো।

কেদার। তিনকড়ে, তুই আমাকে মাটি করলি!

তিনকড়ি। সব্বাই বলে তুমিই আমাকে মাটি করেছ। (কাছে গিয়া) রাগ কর কেন দাদা, যে অবধি তোমাকে দেখেছি সেই অবধি আপন বাপ দাদা খুড়ো কাউকে দু চক্ষে দেখতে পারি নে। এত ভালোবাসা।

কেদার। বাজে বকিস কেন, তোর আবার বাপ দাদা কোথা!

তিনকড়ি। বললে বিশ্বাস করবি নে, কিন্তু আছে ভাই। ওতে তো খরচও নেই, মাহাত্মিও নেই— তিনকড়েরও বাপ দাদা থাকে, যদি আমার নিজে করে নিতে হত তবে কি আর থাকত? কক্‌খনো না!

বৈকুণ্ঠ। হা হা হা হাঃ! ছেলেটি বেশ কথা কয়। চলো বাবা, আমার ঘরে চলো। [উভয়ের প্রস্থান

অবিনাশ। খুব সংক্ষেপে লিখলুম, বুঝেছ কেদার— কেবল একটি লাইন— 'দেবীপদতলে বিমুগ্ধ ভক্তের পূজোপহার'।

কেদার। তা, কোনো কথাটিই বাদ দেওয়া হয় নি— দিব্যি হয়েছে— তবে আজ উঠি।

অবিনাশ। কিন্তু 'পদতলে' কথাটা কি ঠিক খাটল— ওটা কিনা আংটি—

কেদার। কী বলে ভালো, তা 'করতলেই' লিখে দাও-না!

অবিনাশ। কিন্তু করতলে পূজোপহারটা কেমন শোনাচ্ছে!

কেদার। তা, নাহয় পূজোপহার নাই হল, ওর নাম কী—

অবিনাশ। শুধু 'উপহার' লিখলে বড়ো ফাঁকা শোনায়, 'পূজোপহারই' থাক্—

কেদার। তা থাক্-না—

অবিনাশ। কিন্তু তা হলে 'করতলে'টা কী করা যায়—

কেদার। ওটা পদতলেই করে দাও-না— ওর নাম কী, তাতে ক্ষতি কী। আমি তা হলে উঠি।

অবিনাশ। একটু রোসো-না। আংটি সম্বন্ধে পদতলে কথাটা খাপছাড়া শোনাচ্ছে।

কেদার। খাপছাড়া কেন হবে! তুমি তো পদতলে দিয়ে খালাস, তার পরে ওর নাম কী, তিনি

করতলে তুলে নেবেন, কী বলে, যদি স্বয়ং না নেন তো অন্য লোক আছে।

অবিনাশ। আচ্ছা, পুজোপহার না লিখে যদি প্রণয়োপহার লেখা যায়।

কেদার। সেটা যদি খুব চট করে লেখা যায় তো সেইটেই ভালো।

অবিনাশ। কিন্তু রোসো, একটু ভেবে দেখি।

ঈশানের প্রবেশ

ঈশান। খাবার ঠাণ্ডা হয়ে এল যে।

অবিনাশ। আচ্ছা, সে হবে এখন, তুই যা।

ঈশান। দিদিঠাকরুন বসে আছে—

অবিনাশ। আচ্ছা আচ্ছা, তুই এখন পালা—

ঈশান। (কেদারের প্রতি) বড়োবাবুর তো আহারনিদ্রা বন্ধ, আবার ছোটোবাবুকেও খেপিয়ে তুলেছ?

কেদার। ভাই ঈশেন, যদিচ আমার নিমক খাও না, তবু, ওর নাম কী, আমার কথাটাও একবার ভেবে দেখো। তোমার বড়োবাবু খুব বিস্তারিত করে লিখে থাকেন আর তোমার ছোটোবাবু, কী বলে, অত্যন্ত সংক্ষেপেই লেখেন, কিন্তু আমার কপালক্রমে দুইই সমান হয়ে ওঠে।— অবিনাশ, তোমার খাবার এসেছে, ওর নাম কী, আমি উঠি।

অবিনাশ। বিলক্ষণ! তুমিও খেয়ে যাও-না। ঈশেন, বাবুর জন্যে খাবার ঠিক কর্।

ঈশান। সময়মত বল না, এখন আমি খাবার ঠিক করি কোত্থেকে?

অবিনাশ। তোর মাথা থেকে! বেটা ভূত!

ঈশান। এও যে ঠিক বড়োবাবুর মতো হয়ে এল, আমাকে আর টিকতে দিলে না।

[প্রস্থান

অবিনাশ। এখানে 'প্রণয়োপহার' লিখলে 'দেবী' কথাটা বদলাতে হয়। দেবীর সঙ্গে প্রণয় হবে কী করে।

কেদার। কেন হবে না! তা হলে দেবতাগুলো, ওর নাম কী, বাঁচে কী করে? ভাই অবিনাশ, স্ত্রীজাতি স্বর্গে মর্তে পাতালে যেখানেই থাকুক, ওর নাম কী, তাদের সঙ্গে প্রণয় হতে পারে, কী বলে ভালো, হয়েও থাকে। তুমি অত ভেবো না! (স্বগত) এখন ছাড়লে বাঁচি।

তিনকড়ির প্রবেশ

তিনকড়ি। ও দাদা! তোমার বদল ভেঙে নাও! তুমি সেখানে যাও, আমি বরঞ্চ এখানে একবার চেষ্টা দেখি।

কেদার। কেন রে, কী হয়েছে?

তিনকড়ি। ওরে বাস রে! সে কী খাতা! আমি তার মধ্যে সেঁধোলে আমাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না! সেইটে পড়তে দিয়ে বুড়ো কোথায় উঠে গেল, আমি তো এক দৌড়ে পালিয়ে এসেছি।

বৈকুণ্ঠের প্রবেশ

বৈকুণ্ঠ। কী তিনকড়ি, পালিয়ে এলে যে!

তিনকড়ি। আপনি অতবড়ো একখানা বই লিখলেন আর এইটুকু বুঝলেন না!

বৈকুণ্ঠ। কেদারবাবু, আপনি যদি একবার আসেন তা হলে—

কেদার। চলুন। (স্বগত) রামে মারলেও মরব রাবণে মারলেও মরব, কিন্তু অবিনাশের ঐ একটি লাইন নিয়ে তো আর পারি নে!

অবিনাশ। কেদার, তুমি যাও কোথায়! দাদা, আমার সেই কাজটা—

বৈকুণ্ঠ। (রাগিয়া উঠিয়া) দিনরাত্তির তোমার কাজ! কেদারবাবু ভদ্রলোক, ওঁকে একটু বিশ্রাম

দেবে না! তোমাদের একটু বিবেচনা নেই! আসুন কেদারবাবু।

কেদার। ওর নাম কী, চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান

অবিনাশ। মনোরমা তোমার কে হন তিনকড়ি?

তিনকড়ি। তিনি আমার দূরসম্পর্কে বোন হন, কিন্তু সে পরিচয় প্রকাশ হলে তিনি ভারি লজ্জা পাবেন।

অবিনাশ। তাঁর খুব লজ্জা, না তিনকড়ি?

তিনকড়ি। আমার সম্বন্ধে ভারি লজ্জা। কাউকে মুখ দেখাবার জো নেই।

অবিনাশ। না, তোমার সম্বন্ধে বলছি নে, আমার সম্বন্ধে। জান তো তিনকড়ি, আমার সঙ্গে তাঁর একটা সম্বন্ধ—

তিনকড়ি। ওঃ, বুঝেছি। তা তো হতেই পারে। আমার সঙ্গেও একটি কন্যের সম্বন্ধ হয়েছিল— বিবাহের পূর্বে সে তো লজ্জায় মরেই গেল।

অবিনাশ। আঃ, কী বল তিনকড়ি!

তিনকড়ি। শুধু লজ্জা নয়, শুনলুম তার যকৃৎও ছিল।

অবিনাশ। মনোরমার—

তিনকড়ি। যকৃতের দোষ নেই।

অবিনাশ। আঃ, সে কথা আমি জিজ্ঞাসা করছি নে, আমি হৃদয়ের কথা বলছি—

তিনকড়ি। মশায়, ও-সব বড়ো শক্ত শক্ত কথা, আমি বুঝি নে। মেয়েমানুষের হৃদয় তিনকড়ি কখনো পায় নি, কখনো প্রত্যাশাও করে নি। দিব্যি আছি।

অবিনাশ। আচ্ছা, সে থাক্— কিন্তু, দেখো তিনকড়ি, মনোরমাকে আমি একটি আংটি উপহার দেব। বুঝলে? সেইসঙ্গে এক লাইন চিঠি দিতে চাই—

তিনকড়ি। ক্ষতি কী! একটা লাইন বৈ তো নয়, চট করে হয়ে যাবে।

অবিনাশ। এই দেখো-না, আমি লিখেছিলুম— 'দেবীপদতলে বিমুগ্ধ ভক্তের পূজোপহার'। তুমি কী বল?

তিনকড়ি। তোমার কথা তুমি বলবে, ওর মধ্যে আমার কিছু বলা ভালো হয় না, সে হল আমার ভগ্নী—

অবিনাশ। না না, তা বলছি নে। আংটি কি ঠিক পদতলে দেওয়া যায়! করতলে লিখলে—

তিনকড়ি। তা, ওটা লেখা বৈ তো না— পদতলে লিখে করতলে দিলেই হবে, সেজন্যে তো কেউ আদালতে নালিশ করবে না।

অবিনাশ। না হে না, লেখার তো একটা মানে থাকা চাই—

তিনকড়ি। আংটি থাকলে আর মানে থাকার দরকার কী? ওতেই তো বোঝা গেল।

অবিনাশ। আংটির চেয়ে কথার দাম বেশি, তা জান?

তিনকড়ি। তা হলে আজ আর তিনকড়েকে হাহাকার করে বেড়াতে হত না।

অবিনাশ। আঃ, কী বকছ তুমি তার ঠিক নেই। একটু মন দিয়ে শোনো দেখি। ও লাইনটা যদি এইরকম লেখা যায় তো কেমন হয়— 'প্রেয়সীর করপদ্মে অনুরক্ত সেবকের প্রণয়োপহার'।

তিনকড়ি। বেশ হয়।

অবিনাশ। বেশ হয়! একটা কথা বলে দিলেই হল— 'বেশ হয়'! একটু ভেবেচিন্তে বলো-না!

তিনকড়ি। ও বাবা! এ যে আবার রাগ করে! বুড়োর শরীরে কিন্তু রাগ নেই। (প্রকাশ্যে) তা, ভেবেচিন্তে দেখলে বোধ হয় গোড়ারটাই ছিল ভালো।

অবিনাশ। কেন বলো দেখি। এটাতে কী দোষ হয়েছে।

তিনকড়ি। ও বাবা! এটাতে যদি দোষই না থাকবে তো খামকা আমাকে ভাবতে বললে কেন?

এ তো বড়ো মুশকিলেই পড়া গেল দেখছি।— দোষ কী জানেন অবিনাশবাবু, ও ভাবতে গেলেই দোষ, না ভাবলে কিছুতেই দোষ নেই, আমি তো এই বুঝি।

অবিনাশ। ওঃ, বুঝেছি— তুমি বলছ, আগে থাকতে ঐ প্রেয়সী সম্বোধনটায় লোকে কিছু মনে ভাবতে পারে—

তিনকড়ি। বাঁচা গেল!— হাঁ, তাই বটে। কিন্তু কী জানেন, আপনা-আপনির মধ্যে নাহয় তাকে প্রেয়সীই বললেন! তা কি আর অন্য কেউ বলে না! ঐটেই লিখে ফেলুন।

অবিনাশ। কাজ নেই, গোড়ায় যেটা ছিল সেইটেই—

তিনকড়ি। সেইটেই তো আমার পছন্দ—

অবিনাশ। কিন্তু একটু ভেবে দেখো-না, ওটা যেন—

তিনকড়ি। ও বাবা! আবার ভাবতে বলে!— দেখো অবিনাশবাবু, শিশুকাল থেকে আমিও কারও জন্যে ভাবি নি, আমার জন্যেও কেউ ভাবে নি, ওটা আমার আর অভ্যাস হলই না। এরকম আরো আমার অনেকগুলি শিক্ষার দোষ আছে—

অবিনাশ। আঃ, তিনকড়ি, তুমি একটু থামলে বাঁচি। নিজের কথা নিয়েই কেবল বকবক করে মরছ, আমাকে একটু ভাবতে দাও দেখি।

তিনকড়ি। আপনি ভাবুন-না। আমাকে ভাবতে বলেন কেন? একটু বসুন অবিনাশবাবু, আমি কেদারদাকে ডেকে আনি। সে আমার চেয়ে ভাবতেও জানে, ভেবে কিনারা করতেও পারে।— আমার পক্ষে বুড়োই ভালো।

[প্রস্থান

কেদার বৈকুণ্ঠ ও তিনকড়ির প্রবেশ

বৈকুণ্ঠ। অবিনাশ, কেদারবাবুকে আবার তোমার কী দরকার হল। আমি ওঁকে আমার নূতন পরিচ্ছেদটা শোনাচ্ছিলুম— তিনকড়ি কিছুতেই ছাড়লে না, শেষকালে হাতে পায়ে ধরতে লাগল।

অবিনাশ। আমার সেই কাজটা শেষ হয় নি, তাই।

বৈকুণ্ঠ। (রাগিয়া) তোমার তো কাজ শেষ হয় নি, আমারই সে পরিচ্ছেদটা শেষ হয়েছিল না কি?

অবিনাশ। তা, দাদা, ওঁকে নিয়ে যাও-না—

কেদার। (ব্যস্ত হইয়া) ওর নাম কী, অবিনাশ, তোমারও সে কাজটা তো জরুরি, কী বলে, আর তো দেরি করা চলে না।

বৈকুণ্ঠ। বিলক্ষণ! আপনি সেজন্যে ভাববেন না।— নিজের কাজ নিয়ে কেদারবাবুকে এরকম কষ্ট দেওয়া উচিত হয় না অবিনাশ। অমন করলে উনি আর এখানে আসবেন না।

তিনকড়ি। সে ভয় করবেন না বৈকুণ্ঠবাবু— আমাদের দুটিকে না চাইলেও পাওয়া যায়, তাড়ালেও ফিরে পাবেন— ম'লেও ফিরে আসব এমনি সকলে সন্দেহ করে।

কেদার। তিনকড়ে! ফের!

তিনকড়ি। ভাই, আগে থাকতে বলে রাখাই ভালো— শেষকালে ওঁয়ারা কী মনে করবেন।

ঈশানের প্রবেশ

ঈশান। (অবিনাশ ও কেদারের প্রতি) বাবু, তোমাদের দু-জনেরই খাবার জায়গা হয়েছে।

তিনকড়ি। আর আমাকে বুঝি ফাঁকি!— জন্মাবামাত্র যার নিজের মা ফাঁকি দিয়ে ম'ল, বন্ধুরা তার আর কী করবে!— কিন্তু দাদা, তিনকড়ে তোমাকে ভাগ না দিয়ে খায় না।

কেদার। তিনকড়ে! ফের!

তিনকড়ি। তা, যা ভাই, চট করে খেয়ে আয় গে। দেরি করলে বড্ড লোভ হবে। মনে হবে ছত্রিশ ব্যঞ্জন লুঠছিস।

বৈকুণ্ঠ। সে কী কথা তিনকড়ি! তুমি না খেয়ে যাবে! সে কি হয়। ঈশেন!

ঈশান। আমি জানি নে। আমি চললুম।

[প্রস্থান

অবিনাশ। চলো-না তিনকড়ি। একরকম করে হয়ে যাবে।

তিনকড়ি। টানাটানি করে দরকার কী। আপনারা এগোন। খাওয়াবার রাস্তা বৈকুণ্ঠবাবু জানেন— সেদিন টের পেয়েছি।

[তিনকড়ি ও বৈকুণ্ঠের প্রস্থান

অবিনাশ। তা হলে ও লাইনটা—

কেদার। ওর নাম কী, খেয়ে এসে হবে।

তৃতীয় দৃশ্য

কেদার

কেদার। শ্যালীর বিবাহ তো নির্বিঘ্নে হয়ে গেছে। কিন্তু বৈকুণ্ঠ থাকতে এখানে বাস করে সুখ হচ্ছে না। উপদ্রব তো করা যাচ্ছে, কিন্তু বুড়ো নড়ে না।

বৈকুণ্ঠের প্রবেশ

বৈকুণ্ঠ। এই-যে কেদারবাবু, আপনাকে শুকনো দেখাচ্ছে যে। অসুখ করে নি তো?

কেদার। ওর নাম কী, ডাক্তারে সকল রকম মানসিক পরিশ্রম নিষেধ করেছে—

বৈকুণ্ঠ। আহা, কী দুঃখের বিষয়! আপনি এখানেই কিছুদিন বিশ্রাম করুন।

কেদার। সেইরকমই তো স্থির করেছি।

বৈকুণ্ঠ। তা দেখুন, বেণীবাবুকে—

কেদার। বেণীবাবু নয়, বিপিনবাবুর কথা বলছেন বোধ হয়—

বৈকুণ্ঠ। হাঁ হাঁ, বিপিনবাবুই বটে, ঐ-যে তিনি ছোটোবউমার কে হন—

কেদার। খুড়ো হন—

বৈকুণ্ঠ। খুড়োই হবেন। তা, তাঁকে আমার এই ঘরে থাকতে দিয়েছেন, সে কি তাঁর—

কেদার। না, ওর নাম কী, তাঁর কোনো অসুবিধে হয় নি, তিনি বেশ আছেন—

বৈকুণ্ঠ। জানেন তো কেদারবাবু, আমি এই ঘরেই লিখে থাকি—

কেদার। তা বেশ তো, আপনি লিখবেন, ওর নাম কী, আপনি লিখবেন— তাতে বিপিনবাবুর কোনো আপত্তি নেই।

বৈকুণ্ঠ। না, আপত্তি কেন করবেন, লোকটি বেশ— কিন্তু তাঁর একটি অভ্যাস আছে, তিনি বিছানায় শুয়ে শুয়ে প্রায় সর্বদাই গুন গুন করে গান করেন, তাতে লেখবার সময়—

কেদার। কী বলে, সেজন্যে ভাবনা কী। আপনি তাঁকে ডেকেই বলুন-না—

বৈকুণ্ঠ। না না না না। সে থাক্। তিনি ভদ্রলোক—

কেদার। ওর নাম কী, আমিই তাঁকে ডেকে খুব ভর্ৎসনা করে দিচ্ছি—

বৈকুণ্ঠ। না না কেদারবাবু, সে করবেন না— লেখার সময় গান তো আমার ভালোই লাগে। কিন্তু আমি ভাবছিলুম, হয়তো আর-কোনো ঘরে বেণীবাবু একলা থাকলে বেশ মন খুলে গাইতে পারেন।

কেদার। ওর নাম কী, ঠিক উলটো। বিপিনবাবুর একটি লোক সর্বদাই চাই—

বৈকুণ্ঠ। তা দেখেছি— বড়ো মিশুক— হয় গান নয় গল্প করছেনই— তা আমি তাঁর কথা মন দিয়ে শুনে থাকি।— কিন্তু দেখো কেদারবাবু, কিছু মনে কোরো না ভাই— একটা বড়ো গুরুতর বেদনা পেয়েছি, সে কথা তোমাকে না বলে থাকতে পারছি নে। ভাই, আমার সেই স্বরসূত্রসার পুঁথিখানি কে নিয়েছে।

কেদার। কোথায় ছিল বলুন দেখি।

বৈকুণ্ঠ। সে তো আপনি জানেন। এই ঘরে ঐ শেলফের উপর ছিল। আজকাল এ ঘরে সর্বদা লোক আনাগোনা করছেন, আমি কাউকে কিছুই বলতে পারছি নে— কিন্তু শেলফের ঐ জায়গাটা শূন্য দেখছি আর মনে হচ্ছে আমার বুকের কখানা পাঁজর খালি হয়ে গেছে।

কেদার। তবে আপনাকে, ওর নাম কী, খুলে বলি, অবিনাশ আপনার লাইব্রেরি থেকে বই নিয়ে যায়।

বৈকুণ্ঠ। অবু! সে তো এ-সব বই পড়ে না।

কেদার। পড়ে না, ওর নাম কী, বিক্রি করে।

বৈকুণ্ঠ। বিক্রি করে!

কেদার। নতুন প্রণয়— নতুন শখ— ওর নাম কী, খরচ বেশি। আমি তাকে বলি অবু, কী বলে ভালো, মাইনের টাকা থেকে কিছু কিছু কেটে নিয়ে দাদাকে দিলেই হয়। অবু বলে, লজ্জা করে।

বৈকুণ্ঠ। ছেলেমানুষ! প্রণয়ের খাতিরও এড়াতে পারে না, আবার দাদার সম্মানটিও রাখতে হবে।

কেদার। ওর নাম কী, আমি আপনার বইখানি উদ্ধার করে আনব—

বৈকুণ্ঠ। তা, যত টাকা লাগে— আপনার কাছে আমি চিরঋণী হয়ে থাকব।

কেদার। (স্বগত) বাজারে তো তার চার পয়সা দামও হল না, এ আরো হল ভালো— ধর্মও রইল কিছু পাওয়াও গেল।

[প্রস্থান

অবিনাশের প্রবেশ

অবিনাশ। দাদা!

বৈকুণ্ঠ। কী ভাই অবু!

অবিনাশ। আমার কিছু টাকার দরকার হয়েছে—

বৈকুণ্ঠ। তাতে লজ্জা কী অবু! আমি বলছি কী, এখন থেকে তোমার টাকা তুমিই রাখো-না ভাই— আমি বুড়ো হয়ে গেলুম, হারিয়েই ফেলি কি ভুলেই যাই, আমার কি মনের ঠিক আছে।

অবিনাশ। এ আবার কী নতুন কথা হল দাদা!

বৈকুণ্ঠ। নতুন কথা নয় ভাই। তুমি বিয়েথাওয়া করে সংসারী হয়েছ, আমি তো সন্ন্যাসী মানুষ—

অবিনাশ। তুমিই তো, দাদা, আমার বিয়ে দিয়ে দিলে— তাতেই যদি পর হয়ে থাকি, তবে থাক্, টাকাকড়ির কথা আর আমি বলব না।

[প্রস্থান

বৈকুণ্ঠ। আহা, অবু, রাগ কোরো না। শোনো আমার কথাটা, আহা শুনে যাও—

'ভাবতে পারি নে পরের ভাবনা' গাহিতে গাহিতে
বিপিনের প্রবেশ

বৈকুণ্ঠ। এই-যে বেণীবাবু—

বিপিন। আমার নাম বিপিনবিহারী।

বৈকুণ্ঠ। হাঁ হাঁ, বিপিনবাবু। আপনার বিছানায় ঐ-যে বইগুলি রেখেছেন ওগুলি পড়ছেন বুঝি?

বিপিন। নাঃ, পড়ি নে, বাজাই।

বৈকুণ্ঠ। বাজান? তা আপনাকে যদি বাঁয়া তবলা কি মৃদঙ্গ—

বিপিন। সে তো আমার আসে না, আমি বই বাজাই। দেখুন বৈকুণ্ঠবাবু, আপনাকে রোজ বলব

মনে করি, ভুলে যাই— আপনার এই ডেক্‌সো আর ঐ গোটাকতক শেল্‌ফ এখান থেকে সরাতে হচ্ছে, আমার বন্ধুরা সর্বদাই আসছে, তাদের বসাবার জায়গা পাচ্ছি নে—

বৈকুণ্ঠ। আর তো ঘর দেখি নে— দক্ষিণের ঘরে কেদারবাবু আছেন, ডাক্তার তাঁকে বিশ্রাম করতে বলেছে— পুবের ঘরটায় কে কে আছেন আমি ঠিক চিনি নে— তা বেণীবাবু—

বিপিন। বিপিনবাবু—

বৈকুণ্ঠ। হাঁ হাঁ, বিপিনবাবু— তা, যদি ওগুলো এক পাশে সরিয়ে রাখি তা হলে কি কিছু অসুবিধে হয়?

বিপিন। অসুবিধা আর কী, থাকবার কষ্ট হয়। আমি আবার বেশ একটু ফাঁকা না হলে থাকতে পারি নে। 'ভাবতে পারি নে পরের ভাবনা লো সই!'

ঈশানের প্রবেশ

বৈকুণ্ঠ। ঈশেন, এ ঘরে বেণীবাবুর—

বিপিন। বিপিনবাবুর—

বৈকুণ্ঠ। হাঁ, বিপিনবাবুর থাকার কিছু কষ্ট হচ্ছে।

ঈশান। কষ্ট হয়ে থাকে তো আর আবশ্যক কী, ওঁর বাপের ঘরদুয়োর কিছু নেই নাকি!

বৈকুণ্ঠ। ঈশেন, চুপ কর্।

বিপিন। কী রাস্কেল, তুই এতবড়ো কথা বলিস!

ঈশান। দেখো, গালমন্দ দিয়ো না বলছি—

বৈকুণ্ঠ। আঃ ঈশেন, থাম্—

বিপিন। আমি তোদের এ ঘরে পায়ের ধুলো মুছতে চাই নে, আমি এখনই চললুম।

বৈকুণ্ঠ। যাবেন না বেণীবাবু, আমি গলবস্ত্র হয়ে বলছি মাপ করবেন— (বৈকুণ্ঠকে ঠেলিয়া বিপিনের প্রস্থান) ঈশেন, তুই কী করলি বল্ দেখি— তুই আর আমাকে বাড়িতে টিকতে দিলি নে দেখছি।

ঈশান। আমিই দিলুম না বটে!

বৈকুণ্ঠ। দেখ্ ঈশেন, অনেক কাল থেকে আছিস, তোর কথাবার্তাগুলো আমাদের অভ্যাস হয়ে এসেছে, এরা নতুন মানুষ— এরা সইতে পারবে কেন? তুই একটু ঠাণ্ডা হয়ে কথা কইতে পারিস নে?

ঈশান। আমি ঠাণ্ডা থাকি কী করে! এদের রকম দেখে আমার সর্বশরীর জ্বলতে থাকে।

বৈকুণ্ঠ। ঈশেন, ওরা আমাদের নতুন কুটুম্ব, ওরা কিছুতে ক্ষুণ্ণ হলে অবিনাশের গায়ে লাগবে, সে আমাকেও কিছু বলতে পারবে না, অথচ তার হল—

ঈশান। সে তো সব বুঝেছি। সেইজন্যেই তো ছোটো বয়সে ছোটোবাবুকে বিয়ে দেবার জন্যে কতবার বলেছি। সময়কালে বিয়ে হলে এতটা বাড়াবাড়ি হয় না।

বৈকুণ্ঠ। যা, আর বকিস নে ঈশেন, এখন যা, আমি সকল কথা একবার ভেবে দেখি।

ঈশান। ভেবে দেখো! এখন যে কথাটা বলতে এসেছিলুম বলে নিই। আমাদের ছোটোমার খুড়ি না পিসি না কে এক বুড়ি এসে দিদিঠাকরুনকে যে দুঃখ দিচ্ছে সে তো আমার আর সহ্য হয় না।

বৈকুণ্ঠ। আমার নীরুমাকে! সে তো কারও কিছুতে থাকে না।

ঈশান। তাঁকে তো দিনরাত্তির দাসীর মতো খাটিয়ে মারছে। তার পরে আবার মাগী তোমার নামে খোঁটা দিয়ে তাঁকে বলে কিনা যে, তুমি তোমার ছোটোভাইয়ের টাকায় গায়ে ফুঁ দিয়ে বড়োমানুষি করে বেড়াচ্ছ! মাগীর যদি দাঁত থাকত তো নোড়া দিয়ে ভেঙে দিতুম না!

বৈকুণ্ঠ। তা, নীরু কী বলে?

ঈশান। তিনি তো তাঁর বাপেরই মেয়ে, মুখখানি যেন ফুলের মতো শুকিয়ে যায়, একটি কথা বলে না—

বৈকুণ্ঠ। (কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া) একটা কথা আছে, 'যে সয় তারই জয়'—

ঈশান। সে কথা আমি ভালো বুঝি নে। আমি একবার ছোটোবাবুকে—

বৈকুণ্ঠ। খবরদার ঈশেন, আমার মাথার দিব্যি দিয়ে বলছি, অবিনাশকে কোনো কথা বলতে পারবি নে।

ঈশান। তবে চুপ করে বসে থাকব?

বৈকুণ্ঠ। না, আমি একটা উপায় ঠাউরেছি। এখানে জায়গাতেও আর কুলোচ্ছে না, এঁদের সকলেরই অসুবিধে হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি, তা ছাড়া অবিনাশের এখন ঘর-সংসার হল, তার টাকাকড়ির দরকার, তার উপরে ভার চাপাতে আমার আর ইচ্ছে নেই— আমি এখান থেকে যেতে চাই—

ঈশান। সে তো মন্দ কথা নয়, কিন্তু—

বৈকুণ্ঠ। ওর আর কিন্তুটিন্তু নেই ঈশেন। সময় উপস্থিত হলেই প্রস্তুত হতে হয়।

ঈশান। তোমার লেখাপড়ার কী হবে?

বৈকুণ্ঠ। (হাসিয়া) আমার লেখা! সে আবার একটা জিনিস! সবাই হাসে, আমি কি তা জানি নে ঈশেন? ও-সব রইল পড়ে। সংসারে লেখায় কারও কোনো দরকার নেই।

ঈশান। ছোটোবাবুকে তো বলে কয়ে যেতে হবে?

বৈকুণ্ঠ। তা হলে সে কিছুতেই যেতে দেবে না। সে তো আর আমাকে 'যাও' বলতে পারবে না ঈশেন। গোপনেই যেতে হবে, তার পর তাকে লিখে জানাব। যাই, আমার নীরুকে একবার দেখে আসি গে।

[উভয়ের প্রস্থান

তিনকড়ি ও কেদারের প্রবেশ

তিনকড়ি। দাদা, তুই তো আমাকে ফাঁকি দিয়ে হাঁসপাতালে পাঠালি, সেখান থেকেও আমি ফাঁকি দিয়ে ফিরেছি। কিছুতেই মলেম না।

কেদার। তাই তো রে, দিব্যি টিকে আছিস যে।

তিনকড়ি। ভাগ্যে, দাদা, একদিনও দেখতে যাও নি—

কেদার। কেন রে!

তিনকড়ি। যম বেটা ঠাউরালে এ ছোঁড়ার দুনিয়ায় কেউই নেই, নেহাত তাচ্ছিল্য করে নিলে না। ভাই, তোকে বলব কী, এই তিনকড়ের ভিতরে কতটা পদার্থ আছে সেইটে দেখবার জন্যে মেডিকাল কালেজের ছোকরাগুলো সব ছুরি উঁচিয়ে বসে ছিল— দেখে আমার অহংকার হত। যাই হোক দাদা, তুমি তো এখানে দিব্যি জমিয়ে বসেছ।

কেদার। যা, যা, মেলা বকিস নে। এখন এ আমার আত্মীয়বাড়ি তা জানিস?

তিনকড়ি। সমস্তই জানি, আমার অগোচর কিছুই নেই। কিন্তু বুড়ো বৈকুণ্ঠকে দেখছি নে যে। তাকে বুঝি ঠেলে দিয়েছিস? ঐটে তোর দোষ। কাজ ফুরোলেই—

কেদার। তিনকড়ে! ফের! কানমলা খাবি।

তিনকড়ি। তা, দে মলে। কিন্তু সত্যি কথা বলতে হয়, বৈকুণ্ঠকে যদি তুই ফাঁকি দিস তা হলে অধর্ম হবে, আমার সঙ্গে যা করিস সে আলাদা—

কেদার। ইস, এত ধর্ম শিখে এলি কোথা।

তিনকড়ি। তা, যা বলিস ভাই, যদিচ তুমি-আমি এতদিন টিকে আছি তবু ধর্ম বলে একটা কিছু আছে। দেখো কেদারদা, আমি যখন হাঁসপাতালে পড়ে ছিলুম, বুড়োর কথা আমার সর্বদা মনে হত। পড়ে পড়ে ভাবতুম, তিনকড়ি নেই, এখন কেদারদার হাত থেকে বুড়োকে কে ঠেকাবে। বড়ো দুঃখ হত।

কেদার। দেখ্ তিনকড়ে, তুই যদি এখানে আমাকে জ্বালাতে আসিস তা হলে—

তিনকড়ি। মিথ্যে ভয় করছ দাদা। আমাকে আর হাঁসপাতালে পাঠাতে হবে না। এখানে তুমি

একলাই রাজত্ব করবে। আমি দুদিনের বেশি কোথাও টিকতে পারি নে, এ জায়গাও আমার সহ্য হবে না।

কেদার। তা হলে আর আমাকে দগ্ধাস কেন, নাহয় দুটো দিন আগেই গেলি।

তিনকড়ি। বৈকুণ্ঠের খাতাখানা না চুকিয়ে যেতে পারছি নে, তুমি তাকে ফাঁকি দেবে জানি। অদৃষ্টে যা থাকে ওটা এই অভাগাকেই শুনতে হবে।

কেদার। এ ছোঁড়াটাকে মেরে ধরে, গাল দিয়ে, কিছুতেই তাড়াবার জো নেই। তিনকড়ে, তোর খিদে পেয়েছে?

তিনকড়ি। কেন আর মনে করিয়ে দাও ভাই?

কেদার। চল্, তোকে কিছু পয়সা দিই গে, বাজার থেকে জলখাবার কিনে এনে খাবি।

তিনকড়ি। এ কী হল! তোমারও ধর্মজ্ঞান! হঠাৎ ভালোমন্দ একটা কিছু হবে না তো।

[উভয়ের প্রস্থান

ঈশান ও বৈকুণ্ঠের প্রবেশ

বৈকুণ্ঠ। ভেবেছিলুম, খাতাপত্রগুলো আর সঙ্গে নেব না— শুনে নীরুমা কাঁদতে লাগল, ভাবলে বুড়ো বয়সের খেলাগুলো বাবা কোথায় ফেলে যাচ্ছে। এগুলো নে ঈশেন।— ঈশেন!

ঈশান। কী বাবু!

বৈকুণ্ঠ। ছোটোর উপর বড়োর যেরকম স্নেহ, বড়োর উপর ছোটোর সেরকম হয় না— না ঈশেন?

ঈশান। তাই তো দেখতে পাই।

বৈকুণ্ঠ। আমি চলে গেলে অবু বোধ হয় বিশেষ কষ্ট পাবে না।

ঈশান। না পাবারই সম্ভব। বিশেষ—

বৈকুণ্ঠ। হাঁ, বিশেষ তার নতুন সংসার হয়েছে, আর তো আত্মীয়স্বজনের অভাব নেই, কী বলিস ঈশেন—

ঈশান। আমিও তাই বলছিলুম।

বৈকুণ্ঠ। বোধ হয় নীরুমার জন্যে তার মনটা, নীরুকে অবু বড়ো ভালোবাসে— না ঈশেন?

ঈশান। আগে তো তাই বোধ হত, কিন্তু—

বৈকুণ্ঠ। অবিনাশ কি এ-সব জানে?

ঈশান। তা কি আর জানেন না? তিনি যদি এর মধ্যে না থাকতেন, তা হলে কি আর বুড়িটা সাহস করত—

বৈকুণ্ঠ। দেখ্ ঈশেন, তোর কথাগুলো বড়ো অসহ্য। তুই একটা মিষ্টিকথা বানিয়েও বলতে পারিস নে? এতটুকু বেলা থেকে আমি তাকে মানুষ করলুম— একদিনের জন্যেও চোখের আড়াল করি নি— আমি চলে গেলে তার কষ্ট হবে না এমন কথা তুই মুখে আনিস হারামজাদা বেটা! সে জেনে শুনে আমার নীরুকে কষ্ট দিয়েছে! লক্ষ্মীছাড়া পাজি, তোর কথা শুনলে বুক ফেটে যায়!

'ভাবতে পারি নে পরের ভাবনা' গাহিতে গাহিতে

বিপিনের প্রবেশ

বিপিন। ভেবেছিলুম ফিরে ডাকবে। ডাকে না যে। এই-যে, বুড়ো এইখেনেই আছে।— বৈকুণ্ঠবাবু, আমার জিনিসপত্র নিতে এলুম। আমার ঐ হুঁকোটা আর ঐ ক্যাম্বিসের ব্যাগটা। ঈশেন, শিগগির মুটে ডাকো।

বৈকুণ্ঠ। সে কী কথা! আপনি এখানেই থাকুন। আমি করজোড় করে বলছি, আমাকে মাপ করুন বেণীবাবু।

বিপিন। বিপিনবাবু—

বৈকুণ্ঠ। হাঁ হাঁ, বিপিনবাবু। আপনি থাকুন, আমরা এখনই ঘর খালি করে দিচ্ছি।

বিপিন। এই বইগুলো কী হবে?

বৈকুণ্ঠ। সমস্তই সরাচ্ছি। [শেল্‌ফ হইতে বই ভূমিতে নাবাইতে প্রবৃত্ত

ঈশান। এ বইগুলিকে বাবু যেন বিধবার পুত্রসন্তানের মতো দেখত, ধুলো নিজের হাতে ঝাড়ত, আজ ধুলোয় ফেলে দিচ্ছে! [চক্ষু-মোছন

বিপিন। কেদারের ঘরে আফিমের কৌটা ফেলে এসেছি— নিয়ে আসি গে। 'ভাবতে পারি নে পরের ভাবনা লো সই।' [প্রস্থান

তিনকড়ির প্রবেশ

তিনকড়ি। এই-যে পেয়েছি! বৈকুণ্ঠবাবু, ভালো তো?

বৈকুণ্ঠ। কী বাবা, তুমি ভালো আছ? অনেক দিন দেখি নি।

তিনকড়ি। ভয় কী বৈকুণ্ঠবাবু, আবার অনেক দিন দেখতে পাবেন। ধরা দিয়েছি, এখন আপনার খাতাপত্র বের করুন।

বৈকুণ্ঠ। সে-সব আর নেই তিনকড়ি, তুমি এখন নিশ্চিন্ত মনে এখানে থাকতে পারবে।

তিনকড়ি। তা হলে আর লিখবেন না?

বৈকুণ্ঠ। না, সে-সব খেয়াল ছেড়ে দিয়েছি।

তিনকড়ি। ছেড়ে দিয়েছেন, সত্যি বলছেন?

বৈকুণ্ঠ। হাঁ, ছেড়ে দিয়েছি।

তিনকড়ি। আঃ, বাঁচলেম। তা হলে ছুটি— আমি যেতে পারি?

বৈকুণ্ঠ। কোথায় যাবে বাপু?

তিনকড়ি। অলক্ষ্মী যেখানে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ান। ভেবেছিলুম মেয়াদ ফুরোয় নি, খাতা এখনো অনেকখানি বাকি আছে, শুনে যেতে হবে। তা হলে প্রণাম হই।

বৈকুণ্ঠ। এসো বাবা, ঈশ্বর তোমার ভালো করুন।

তিনকড়ি। উঁহু! একটা কী গোল হয়েছে! ঠিক বুঝতে পারছি নে। ভাই ঈশেন, এতদিন পরে দেখা, তুমিও তো আমাকে মার্ মার্ শব্দে খেদিয়ে এলে না— তোমার জন্যে ভাবনা হচ্ছে।

অবিনাশের প্রবেশ

অবিনাশ। দাদা, কোথা থেকে তুমি যত-সব লোক জুটিয়েছ— বাড়ির মধ্যে, বাইরে, কোথাও তো আর টিকতে দিলে না।

বৈকুণ্ঠ। তারা কি আমার লোক অবু! তোমারই তো সব—

অবিনাশ। আমার কে! আমি তাদের চিনি নে! কেদারের সব আত্মীয়, তুমিই তো তাদের স্থান দিয়েছ। সেইজন্যেই তো আমি তাদের কিছু বলতে পারি নে। তা, তুমি যদি পার তো তাদের সামলাও দাদা, আমি বাড়ি ছেড়ে চললুম।

বৈকুণ্ঠ। আমিই তো যাব মনে করছিলুম—

তিনকড়ি। তার চেয়ে তাঁরা গেলেই তো ভালো হয়। আপনারা দু-জনেই গেলে তাঁদের আদর-অভ্যর্থনা করবে কে?

অবিনাশ। বাড়ির মধ্যে একটা কে বুড়ি এসেছে, সে তো ঝগড়া করে একটাও দাসী টিকতে দিলে না— তাও সয়েছিলুম— কিন্তু আজ আমি স্বচক্ষে দেখলুম, সে নীরুর গায়ে হাত তুললে! আর সহ্য হল না, তাকে এইমাত্র গঙ্গাপার করে দিয়ে আসছি।

ঈশান। বেঁচে থাকো ছোটোবাবু, বেঁচে থাকো।

বৈকুণ্ঠ। অবিনাশ, তিনি ছোটোবউমার আত্মীয়া হন, তাঁকে—

তিনকড়ি। কেউ না, কেউ না, ও বুড়ি কেদারদার পিসি। ওকে বিবাহ করে কেদারের পিসে আর

বাঁচতে পারলে না, বিধবা হয়ে ভাইয়ের বাড়ি আসতে ভাইও মরে বাঁচল, এখন কেদারদা নিজের প্রাণ রক্ষে করতে ওকে তোমাদের এখানে চালান করেছে।

অবিনাশ। দাদা, তোমার এই বইগুলো মাটিতে নাবাচ্ছ কেন? তোমার ডেক্‌সো গেল কোথায়?

ঈশান। এ ঘরে যে বাবুটি থাকেন বই থাকলে তাঁর থাকবার অসুবিধে হয়, বড়োবাবুকে তিনি লুটিস দিয়েছেন।

অবিনাশ। কী! দাদাকে ঘর ছেড়ে যেতে হবে!

বিপিনের প্রবেশ

বিপিন। 'ভাবতে পারি নে পরের ভাবনা'—

অবিনাশ। (তাড়া করিয়া গিয়া) বেরোও, বেরোও, বেরোও বলছি, বেরোও এখান থেকে— বেরোও এখনই—

বৈকুণ্ঠ। আহা, থামো অবু, থামো থামো, কী কর— বেণীবাবুকে

বিপিন। বিপিনবাবুকে—

বৈকুণ্ঠ। হাঁ, বিপিনবাবুকে অপমান কোরো না—

তিনকড়ি। কেদারদাকে ডেকে আনতে হচ্ছে। এ তামাশা দেখা উচিত।

[প্রস্থান

ঈশান বিপিনকে বলপূর্বক বাহির করিল

বিপিন। ঈশেন, একটা মুটে ডাকো, আমার হুঁকো আর ক্যাম্বিসের ব্যাগটা—

[প্রস্থান

বৈকুণ্ঠ। ঈশেন, হারামজাদা কোথাকার, ভদ্রলোককে তুই, তোকে আর—

ঈশান। আজ আমাকে গাল দাও, ধরে মারো, আমি কিছু বলব না— প্রাণ বড়ো খুশি হয়েছে।

কেদারকে লইয়া তিনকড়ির প্রবেশ

কেদার। ওর নাম কী, অবিনাশ ডাকছ?

অবিনাশ। হাঁ— তোমার চুলো প্রস্তুত হয়েছে, এখন ঘর থেকে নাবতে হবে।

কেদার। তোমার ঠাট্টাটা অবিনাশ অন্য লোকের ঠাটার চেয়ে, ওর নাম কী, কিছু কড়া হয়।

বৈকুণ্ঠ। আহা, অবিনাশ, তুমি থামো! কেদারবাবু, অবিনাশের উদ্ধত বয়েস, আপনার আত্মীয়দের সঙ্গে ওঁর ঠিক—

অবিনাশ। বনছিল না। তাই তিনি তাঁদের হাত ধরে সদর দরজার বার করে দিয়ে এসেছেন—

তিনকড়ি। এতক্ষণে আবার তাঁরা খিড়কির দরজা দিয়ে ঢুকেছেন, সাবধান থাকবেন—

অবিনাশ। এখন তোমাকেও তাঁদের পথে—

তিনকড়ি। ওঁকে দোসরা পথ দেখাবেন, সব কটিকে একত্রে মিলতে দেবেন না—

কেদার। অবু, ওর নাম কী, তা হলে আমার সম্বন্ধে করতলের পরিবর্তে পদতলেই স্থির হল—

অবিনাশ। হাঁ, যার যেখানে স্থান—

কেদার। ঈশেন, তা হলে একটা ভালো দেখে সেকেন্ড ক্লাস গাড়ি ডেকে দাও তো।

তিনকড়ি। ভেবেছিলুম এবার বুঝি একলা বেরোতে হবে— শেষ, দাদাও জুটল। বরাবর দেখে আসছি কেদারদা, শেষকালটা তুমি ধরা পড়ই, আমি সর্বাগ্রেই সেটা সেরে রাখি, আমার আর ভাবনা থাকে না।

কেদার। তিনকড়ে! ফের!

বৈকুণ্ঠ। কেদারবাবু, এখনই যাচ্ছেন কেন? আসুন, কিঞ্চিৎ জলযোগ করে নিন—

তিনকড়ি। তা বেশ তো, আমাদের তাড়া নেই।

বৈকুণ্ঠ। ঈশেন!

কাহিনী

সাদর উৎসর্গ

শ্রীলশ্রীযুক্ত রাধাকিশোর দেবমাণিক্য

মহারাজ ত্রিপুরেশ্বর

করকমলে

২০শে ফাল্গুন
১৩০৬

কাহিনী

গান্ধারীর আবেদন

দুর্যোধন। প্রণমি চরণে তাত !
ধৃতরাষ্ট্র। ওরে দুরাশয়,
অভীষ্ট হয়েছে সিদ্ধ ?
দুর্যোধন। লভিয়াছি জয়।
ধৃতরাষ্ট্র। এখন হয়েছ সুখী ?
দুর্যোধন। হয়েছি বিজয়ী।
ধৃতরাষ্ট্র। অখণ্ড রাজত্ব জিনি সুখ তোর কই
রে দুর্মতি ?
দুর্যোধন। সুখ চাহি নাই মহারাজ !
জয়, জয় চেয়েছিনু, জয়ী আমি আজ।
ক্ষুদ্র সুখে ভরে নাকো ক্ষত্রিয়ের ক্ষুধা
কুরুপতি— দীপ্তজ্বালা অগ্নিঢালা সুধা
জয়রস, ঈর্ষাসিন্ধুমন্থনসঞ্জাত,
সদ্য করিয়াছি পান ; সুখী নহি, তাত,
অদ্য আমি জয়ী। পিতঃ, সুখে ছিনু, যবে
একত্রে আছিনু বদ্ধ পাণ্ডবে কৌরবে,
কলঙ্ক যেমন থাকে শশাঙ্কের বুকে
কর্মহীন গর্বহীন দীপ্তিহীন সুখে।
সুখে ছিনু, পাণ্ডবের গাণ্ডীবটঙ্কারে
শঙ্কাকুল শত্রুদল আসিত না দ্বারে।
সুখে ছিনু, পাণ্ডবেরা জয়দৃপ্ত করে
ধরিত্রী দোহন করি' ভ্রাতৃপ্রীতিভরে
দিত অংশ তার— নিত্য নব ভোগসুখে
আছিনু নিশ্চিন্তচিত্তে অনন্ত কৌতুকে।
সুখে ছিনু, পাণ্ডবের জয়ধ্বনি যবে
হানিত কৌরবকর্ণ প্রতিধ্বনিরবে।
পাণ্ডবের যশোবিম্ব-প্রতিবিম্ব আসি
উজ্জ্বল অঙ্গুলি দিয়া দিত পরকাশি
মলিন কৌরবকক্ষ। সুখে ছিনু, পিতঃ,
আপনার সর্বতেজ করি নির্বাপিত
পাণ্ডবগৌরবতলে স্নিগ্ধশান্তরূপে,
হেমন্তের ভেক যথা জড়ত্বের কূপে।

আজি পাণ্ডুপুত্রগণে পরাভব বহি
বনে যায় চলি— আজ আমি সুখী নহি,
আজ আমি জয়ী।

ধৃতরাষ্ট্র। ধিক্ তোর ভ্রাতৃদ্রোহ।
পাণ্ডবের কৌরবের এক পিতামহ
সে কি ভুলে গেলি ?

দুর্যোধন। ভুলিতে পারি নে সে যে—
এক পিতামহ, তবু ধনে মানে তেজে
এক নহি। যদি হত দূরবর্তী পর
নাহি ছিল ক্ষোভ ; শর্বরীর শশধর
মধ্যাহ্নের তপনেরে দ্বেষ নাহি করে,
কিন্তু প্রাতে এক পূর্ব-উদয়শিখরে
দুই ভ্রাতৃসূর্যলোক কিছুতে না ধরে।
আজ দ্বন্দ্ব ঘুচিয়াছে, আজি আমি জয়ী,
আজি আমি একা।

ধৃতরাষ্ট্র। ক্ষুদ্র ঈর্ষা ! বিষময়ী
ভুজঙ্গিনী !

দুর্যোধন। ক্ষুদ্র নহে, ঈর্ষা সুমহতী।
ঈর্ষা বৃহতের ধর্ম। দুই বনস্পতি
মধ্যে রাখে ব্যবধান ; লক্ষ লক্ষ তৃণ
একত্রে মিলিয়া থাকে বক্ষে বক্ষে লীন ;
নক্ষত্র অসংখ্য থাকে সৌভ্রাত্রবন্ধনে—
এক সূর্য, এক শশী। মলিন কিরণে
দূর বন-অন্তরালে পাণ্ডুচন্দ্রলেখা
আজি অস্ত গেল, আজি কুরুসূর্য একা—
আজি আমি জয়ী !

ধৃতরাষ্ট্র। আজি ধর্ম পরাজিত।

দুর্যোধন। লোকধর্ম রাজধর্ম এক নহে পিতঃ !
লোকসমাজের মাঝে সমকক্ষ জন
সহায় সুহৃদ্‌-রূপে নির্ভর বন্ধন।
কিন্তু রাজা একেশ্বর ; সমকক্ষ তার
মহাশত্রু, চিরবিঘ্ন, স্থান দুশ্চিন্তার,
সম্মুখের অন্তরাল, পশ্চাতের ভয়,
অহর্নিশি যশঃশক্তিগৌরবের ক্ষয়,
ঐশ্বর্যের অংশ-অপহারী। ক্ষুদ্র জনে
বলভাগ ক'রে লয়ে বান্ধবের সনে
রহে বলী ; রাজদণ্ড যত খণ্ড হয়
তত তার দুর্বলতা, তত তার ক্ষয়।
একা সকলের ঊর্ধ্বে মস্তক আপন
যদি না রাখিবে রাজা, যদি বহুজন
বহুদূর হতে তাঁর সমুদ্ধত শির

নিত্য না দেখিতে পায় অব্যাহত স্থির,
তবে বহুজন-'পরে বহুদূরে তাঁর
কেমনে শাসনদৃষ্টি রহিবে প্রচার ?
রাজধর্মে ভ্রাতৃধর্ম বন্ধুধর্ম নাই,
শুধু জয়ধর্ম আছে, মহারাজ, তাই
আজি আমি চরিতার্থ— আজি জয়ী আমি—
সম্মুখের ব্যবধান গেছে আজি নামি
পাণ্ডবগৌরবগিরি পঞ্চচূড়াময় ।

ধৃতরাষ্ট্র । জিনিয়া কপটদ্যূতে তারে কোস জয়,
লজ্জাহীন অহংকারী !

দুর্যোধন । যার যাহা বল
তাই তার অস্ত্র, পিতঃ, যুদ্ধের সম্বল ।
ব্যাঘ্রসনে নখে দন্তে নহিক সমান,
তাই বলে ধনুঃশরে বধি তার প্রাণ
কোন্ নর লজ্জা পায় ? মূঢ়ের মতন
ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যুমাঝে আত্মসমর্পণ
যুদ্ধ নহে, জয়লাভ এক লক্ষ্য তার—
আজি আমি জয়ী পিতঃ, তাই অহংকার ।

ধৃতরাষ্ট্র । আজি তুমি জয়ী, তাই তব নিন্দাধ্বনি
পরিপূর্ণ করিয়াছে অম্বর অবনী
সমুচ্চ ধিক্কারে ।

দুর্যোধন । নিন্দা ! আর নাহি ডরি,
নিন্দারে করিব ধ্বংস কণ্ঠরুদ্ধ করি ।
নিস্তব্ধ করিয়া দিব মুখরা নগরী
স্পর্ধিত রসনা তার দৃঢ়বলে চাপি
মোর পাদপীঠতলে । "দুর্যোধন পাপী"
"দুর্যোধন ক্রূরমনা" "দুর্যোধন হীন"
নিরুত্তরে শুনিয়া এসেছি এতদিন,
রাজদণ্ড স্পর্শ করি কহি মহারাজ,
আপামর জনে আমি কহাইব আজ—
"দুর্যোধন রাজা, দুর্যোধন নাহি সহে
রাজনিন্দা-আলোচনা, দুর্যোধন বহে
নিজ হস্তে নিজ নাম ।"

ধৃতরাষ্ট্র । ওরে বৎস, শোন্,
নিন্দারে রসনা হতে দিলে নির্বাসন
নিম্নমুখে অন্তরের গূঢ় অন্ধকারে
গভীর জটিল মূল সুদূরে প্রসারে,
নিত্য বিষতিক্ত করি রাখে চিত্ততল ।
রসনায় নৃত্য করি চপল চঞ্চল
নিন্দা শ্রান্ত হয়ে পড়ে ; দিয়ো না তাহারে
নিঃশব্দে আপন শক্তি বৃদ্ধি করিবারে

গোপন হৃদয়দুর্গে। প্রীতিমন্ত্রবলে
শান্ত করো, বন্দী করো নিন্দাসর্পদলে
বংশীরবে হাস্যমুখে।

দুর্যোধন। অব্যক্ত নিন্দায়
কোনো ক্ষতি নাহি করে রাজমর্যাদায়;
ভ্রূক্ষেপ না করি তাহে। প্রীতি নাহি পাই
তাহে খেদ নাহি, কিন্তু স্পর্ধা নাহি চাই
মহারাজ! প্রীতিদান স্বেচ্ছার অধীন,
প্রীতিভিক্ষা দিয়ে থাকে দীনতম দীন—
সে প্রীতি বিলাক তারা পালিত মার্জারে,
দ্বারের কুক্কুরে, আর পাণ্ডবভ্রাতারে—
তাহে মোর নাহি কাজ। আমি চাহি ভয়,
সেই মোর রাজপ্রাপ্য— আমি চাহি জয়
দর্পিতের দর্প নাশি। শুন নিবেদন
পিতৃদেব— এতকাল তব সিংহাসন
আমার নিন্দুকদল নিত্য ছিল ঘিরে,
কণ্টকতরুর মতো নিষ্ঠুর প্রাচীরে
তোমার আমার মধ্যে রচি ব্যবধান—
শুনায়েছে পাণ্ডবের নিত্যগুণগান,
আমাদের নিত্য নিন্দা— এইমতে, পিতঃ,
পিতৃস্নেহ হতে মোরা চিরনির্বাসিত।
এইমতে, পিতঃ, মোরা শিশুকাল হতে
হীনবল— উৎসমুখে পিতৃস্নেহস্রোতে
পাষাণের বাধা পড়ি মোরা পরিক্ষীণ
শীর্ণ নদ, নষ্টপ্রাণ, গতিশক্তিহীন,
পদে পদে প্রতিহত; পাণ্ডবেরা স্ফীত,
অখণ্ড, অবাধগতি। অদ্য হতে, পিতঃ,
যদি সে নিন্দুকদলে নাহি কর দূর
সিংহাসনপার্শ্ব হতে, সঞ্জয় বিদুর
ভীষ্মপিতামহে, যদি তারা বিজ্ঞবেশে
হিতকথা ধর্মকথা সাধু-উপদেশে
নিন্দায় ধিক্কারে তর্কে নিমেষে নিমেষে
ছিন্ন ছিন্ন করি দেয় রাজকর্মডোর,
ভারাক্রান্ত করি রাখে রাজদণ্ড মোর,
পদে পদে দ্বিধা আনে রাজশক্তি-মাঝে,
মুকুট মলিন করে অপমানে লাজে,
তবে ক্ষমা দাও পিতৃদেব— নাহি কাজ
সিংহাসনকণ্টকশয়নে— মহারাজ,
বিনিময় করে লই পাণ্ডবের সনে
রাজ্য দিয়ে বনবাস, যাই নির্বাসনে।

ধৃতরাষ্ট্র। হায় বৎস অভিমানী! পিতৃস্নেহ মোর

কিছু যদি হ্রাস হত শুনি সুকঠোর
সুহৃদের নিন্দাবাক্য, হইত কল্যাণ।
অধর্মে দিয়েছি যোগ, হারায়েছি জ্ঞান,
এত স্নেহ। করিতেছি সর্বনাশ তোর,
এত স্নেহ। জ্বালাতেছি কালানল ঘোর
পুরাতন কুরুবংশ-মহারণ্যতলে—
তবু পুত্র, দোষ দিস স্নেহ নাই ব'লে ?
মণিলোভে কালসর্প করিলি কামনা,
দিনু তোরে নিজহস্তে ধরি তার ফণা
অন্ধ আমি।— অন্ধ আমি অন্তরে বাহিরে
চিরদিন-- তোরে লয়ে প্রলয়তিমিরে
চলিয়াছি— বন্ধুগণ হাহাকার-রবে
করিছে নিষেধ, নিশাচর গৃধ্র-সবে
করিতেছে অশুভ চীৎকার, পদে পদে
সংকীর্ণ হতেছে পথ, আসন্ন বিপদে
কণ্টকিত কলেবর, তবু দৃঢ়করে
ভয়ংকর স্নেহে বক্ষে বাঁধি লয়ে তোরে
বায়ুবলে অন্ধবেগে বিনাশের গ্রাসে
ছুটিয়া চলেছি মূঢ় মত্ত অট্টহাসে
উল্কার আলোকে— শুধু তুমি আর আমি,
আর সঙ্গী বজ্রহস্ত দীপ্ত অন্তর্যামী—
নাই সম্মুখের দৃষ্টি, নাই নিবারণ
পশ্চাতের, শুধু নিম্নে ঘোর আকর্ষণ
নিদারুণ নিপাতের। সহসা একদা
চকিতে চেতনা হবে, বিধাতার গদা
মুহূর্তে পড়িবে শিরে, আসিবে সময়—
ততক্ষণ পিতৃস্নেহে কোরো না সংশয়,
আলিঙ্গন কোরো না শিথিল, ততক্ষণ
দ্রুত হস্তে লুটি লও সর্ব স্বার্থধন—
হও জয়ী, হও সুখী, হও তুমি রাজা
একেশ্বর।— ওরে, তোরা জয়বাদ্য বাজা।
জয়ধ্বজা তোল্ শূন্যে। আজি জয়োৎসবে
ন্যায় ধর্ম বন্ধু ভ্রাতা কেহ নাহি রবে—
না রবে বিদুর ভীষ্ম, না রবে সঞ্জয়,
নাহি রবে লোকনিন্দা লোকলজ্জা -ভয়,
কুরুবংশরাজলক্ষ্মী নাহি রবে আর—
শুধু রবে অন্ধ পিতা, অন্ধ পুত্র তার,
আর কালান্তক যম— শুধু পিতৃস্নেহ
আর বিধাতার শাপ, আর নহে কেহ।

চরের প্রবেশ

চর। মহারাজ, অগ্নিহোত্র দেব-উপাসনা
ত্যাগ করি বিপ্রগণ, ছাড়ি সন্ধ্যার্চনা,
দাঁড়ায়েছে চতুষ্পথে পাণ্ডবের তরে
প্রতীক্ষিয়া ; পৌরগণ কেহ নাহি ঘরে,
পণ্যশালা রুদ্ধ সব ; সন্ধ্যা হল, তবু
ভৈরবমন্দির-মাঝে নাহি বাজে, প্রভু,
শঙ্খঘণ্টা সন্ধ্যাভেরী, দীপ নাহি জ্বলে ;
শোকাতুর নরনারী সবে দলে দলে
চলিযাছে নগরের সিংহদ্বার-পানে
দীনবেশে সজলনয়নে।

দুর্যোধন। নাহি জানে
জাগিয়াছে দুর্যোধন। মূঢ় ভাগ্যহীন !
ঘনায়ে এসেছে আজি তোদের দুর্দিন।
রাজায় প্রজায় আজি হবে পরিচয়
ঘনিষ্ঠ কঠিন। দেখি কতদিন বয়
প্রজার পরম স্পর্ধা— নির্বিষ সর্পের
ব্যর্থ ফণা-আস্ফালন, নিরস্ত্র দর্পের
হুহুংকার।

প্রতিহারীর প্রবেশ

প্রতিহারী। মহারাজ, মহিষী গান্ধারী
দর্শনপ্রার্থিনী পদে।

ধৃতরাষ্ট্র। রহিনু তাঁহারি
প্রতীক্ষায়।

দুর্যোধন। পিতঃ, আমি চলিলাম তবে।

ধৃতরাষ্ট্র। করো পলায়ন। হায়, কেমনে বা সবে
সাধ্বী জননীর দৃষ্টি সমুদ্যত বাজ
ওরে পুণ্যভীত ! মোরে তোর নাহি লাজ।

গান্ধারীর প্রবেশ

গান্ধারী। নিবেদন আছে শ্রীচরণে। অনুনয়
রক্ষা করো নাথ !

ধৃতরাষ্ট্র। কভু কি অপূর্ণ রয়
প্রিয়ার প্রার্থনা ?

গান্ধারী। ত্যাগ করো এইবার—

ধৃতরাষ্ট্র। কারে হে মহিষী ?

গান্ধারী। পাপের সংঘর্ষে যার
পড়িছে ভীষণ শাণ ধর্মের কৃপাণে,
সেই মূঢ়ে।

ধৃতরাষ্ট্র। কে সে জন ? আছে কোন্‌খানে ?
শুধু কহো নাম তার।
গান্ধারী। পুত্র দুর্যোধন।
ধৃতরাষ্ট্র। তাহারে করিব ত্যাগ!
গান্ধারী। এই নিবেদন
তব পদে।
ধৃতরাষ্ট্র। দারুণ প্রার্থনা, হে গান্ধারী
রাজমাতা!
গান্ধারী। এ প্রার্থনা শুধু কি আমারি
হে কৌরব ? কুরুকুলপিতৃপিতামহ
স্বর্গ হতে এ প্রার্থনা করে অহরহ
নরনাথ! ত্যাগ করো, ত্যাগ করো তারে—
কৌরবকল্যাণলক্ষ্মী যার অত্যাচারে
অশ্রুমুখী প্রতীক্ষিছে বিদায়ের ক্ষণ
রাত্রিদিন।
ধৃতরাষ্ট্র। ধর্ম তারে করিবে শাসন
ধর্মেরে যে লঙ্ঘন করেছে— আমি পিতা—
গান্ধারী। মাতা আমি নহি ? গর্ভভারজর্জরিতা
জাগ্রত হৃৎপিণ্ডতলে বহি নাই তারে ?
স্নেহবিগলিত চিত্ত শুভ্র দুগ্ধধারে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে নাই দুই স্তন বাহি
তার সেই অকলঙ্ক শিশুমুখ চাহি ?
শাখাবন্ধে ফল যথা সেইমত করি
বহু বর্ষ ছিল না সে আমারে আঁকড়ি
দুই ক্ষুদ্র বাহুবৃন্ত দিয়ে— লয়ে টানি
মোর হাসি হতে হাসি, বাণী হতে বাণী,
প্রাণ হতে প্রাণ ? তবু কহি, মহারাজ,
সেই পুত্র দুর্যোধনে ত্যাগ করো আজ।
ধৃতরাষ্ট্র। কী রাখিব তারে ত্যাগ করি ?
গান্ধারী। ধর্ম তব।
ধৃতরাষ্ট্র। কী দিবে তোমারে ধর্ম ?
গান্ধারী। দুঃখ নব নব।
পুত্রসুখ রাজ্যসুখ অধর্মের পণে
জিনি লয়ে চিরদিন বহিব কেমনে
দুই কাঁটা বক্ষে আলিঙ্গিয়া ?
ধৃতরাষ্ট্র। হায় প্রিয়ে,
ধর্মবশে একবার দিনু ফিরাইয়ে
দ্যূতবদ্ধ পাণ্ডবের হৃত রাজ্যধন।
পরক্ষণে পিতৃস্নেহ করিল গুঞ্জন
শত বার কর্ণে মোর, "কী করিলি ওরে!
এক কালে ধর্মাধর্ম দুই তরী-'পরে

পা দিয়ে বাঁচে না কেহ। বারেক যখন
নেমেছে পাপের স্রোতে কুরুপুত্রগণ
তখন ধর্মের সাথে সন্ধি করা মিছে ;
পাপের দুয়ারে পাপ সহায় মাগিছে।
কী করিলি হতভাগ্য, বৃদ্ধ বুদ্ধিহত,
দুর্বল দ্বিধায় পড়ি ? অপমানক্ষত
রাজ্য ফিরে দিলে তবু মিলাবে না আর
পাণ্ডবের মনে— শুধু নব কাষ্ঠভার
হুতাশনে দান। অপমানিতের করে
ক্ষমতার অস্ত্র দেওয়া মরিবার তরে।
সক্ষমে দিয়ো না ছাড়ি দিয়ে স্বল্প পীড়া—
করহ দলন। কোরো না বিফল ক্রীড়া
পাপের সহিত ; যদি ডেকে আন তারে,
বরণ করিয়া তবে লহো একেবারে।"
এইমত পাপবুদ্ধি পিতৃস্নেহরূপে
বিঁধিতে লাগিল মোর কর্ণে চুপে চুপে
কত কথা তীক্ষ্ণ সূচিসম। পুনরায়
ফিরানু পাণ্ডবগণে ; দ্যূতছলনায়
বিসর্জিনু দীর্ঘ বনবাসে। হায় ধর্ম,
হায় রে প্রবৃত্তিবেগ ! কে বুঝিবে মর্ম
সংসারের !

গান্ধারী। ধর্ম নহে সম্পদের হেতু,
মহারাজ, নহে সে সুখের ক্ষুদ্র সেতু—
ধর্মেই ধর্মের শেষ। মূঢ় নারী আমি,
ধর্মকথা তোমারে কী বুঝাইব স্বামী,
জান তো সকলই। পাণ্ডবেরা যাবে বনে,
ফিরাইলে ফিরিবে না, বদ্ধ তারা পণে।
এখন এ মহারাজ্য একাকী তোমার
মহীপতি— পুত্রে তব ত্যজ এইবার ;
নিষ্পাপেরে দুঃখ দিয়ে নিজে পূর্ণ সুখ
লইয়ো না, ন্যায়ধর্মে কোরো না বিমুখ
পৌরবপ্রাসাদ হতে— দুঃখ সুদুঃসহ
আজ হতে, ধর্মরাজ, লহো তুলি লহো,
দেহো তুলি মোর শিরে।

ধৃতরাষ্ট্র। হায় মহারানী,
সত্য তব উপদেশ, তীব্র তব বাণী।

গান্ধারী। অধর্মের মধুমাখা বিষফল তুলি
আনন্দে নাচিছে পুত্র ; স্নেহমোহে ভুলি
সে ফল দিয়ো না তারে ভোগ করিবারে ;
কেড়ে লও, ফেলে দাও, কাঁদাও তাহারে।
ছললব্ধ পাপস্ফীত রাজ্যধনজনে

ফেলে রাখি সেও চলে যাক নির্বাসনে,
বঞ্চিত পাণ্ডবদের সমদুঃখভার
করুক বহন।

ধৃতরাষ্ট্র। ধর্মবিধি বিধাতার—
জাগ্রত আছেন তিনি, ধর্মদণ্ড তাঁর
রয়েছে উদ্যত নিত্য ; অয়ি মনস্বিনী,
তাঁর রাজ্যে তাঁর কার্য করিবেন তিনি।
আমি পিতা—

গান্ধারী। তুমি রাজা, রাজ-অধিরাজ,
বিধাতার বাম হস্ত ; ধর্মরক্ষা-কাজ
তোমা-'পরে সমর্পিত। শুধাই তোমারে,
যদি কোনো প্রজা তব সতী অবলারে
পরগৃহ হতে টানি করে অপমান
বিনা দোষে— কী তাহার করিবে বিধান ?

ধৃতরাষ্ট্র। নির্বাসন।

গান্ধারী। তবে আজ রাজপদতলে
সমস্ত নারীর হয়ে নয়নের জলে
বিচার প্রার্থনা করি। পুত্র দুর্যোধন
অপরাধী প্রভু ! তুমি আছ, হে রাজন,
প্রমাণ আপনি। পুরুষে পুরুষে দ্বন্দ্ব
স্বার্থ লয়ে বাধে অহরহ— ভালোমন্দ
নাহি বুঝি তার ; দণ্ডনীতি, ভেদনীতি,
কূটনীতি কত শত, পুরুষের রীতি
পুরুষেই জানে। বলের বিরোধে বল,
ছলের বিরোধে কত জেগে উঠে ছল,
কৌশলে কৌশল হানে ; মোরা থাকি দূরে
আপনার গৃহকর্মে শান্ত অন্তঃপুরে।
যে সেথা টানিয়া আনে বিদ্বেষ-অনল,
যে সেথা সঞ্চার করে ঈর্ষার গরল
বাহিরের দ্বন্দ্ব হতে, পুরুষেরে ছাড়ি
অন্তঃপুরে প্রবেশিয়া নিরুপায় নারী
গৃহধর্মচারিণীর পুণ্যদেহ-'পরে
কলুষপরুষ স্পর্শে অসম্মানে করে
হস্তক্ষেপ— পতি-সাথে বাধায়ে বিরোধ
যে নর পত্নীরে হানি লয় তার শোধ,
সে শুধু পাষণ্ড নহে, সে যে কাপুরুষ।
মহারাজ, কী তার বিধান ? অকলুষ
পুরুবংশে পাপ যদি জন্মলাভ করে
সেও সহে ; কিন্তু, প্রভু, মাতৃগর্বভরে
ভেবেছিনু গর্ভে মোর বীরপুত্রগণ
জন্মিয়াছে— হায় নাথ, সেদিন যখন

অনাথিনী পাঞ্চালীর আর্তকণ্ঠরব
প্রাসাদপাষাণভিত্তি করি দিল দ্রব
লজ্জা-ঘৃণা-করুণার তাপে, ছুটি গিয়া
হেরিনু গবাক্ষে, তার বস্ত্র আকর্ষিয়া
খল খল হাসিতেছে সভা-মাঝখানে
গান্ধারীর পুত্র পিশাচেরা— ধর্ম জানে
সেদিন চূর্ণিয়া গেল জন্মের মতন
জননীর শেষ গর্ব। কুরুরাজগণ,
পৌরুষ কোথায় গেছে ছাড়িয়া ভারত!
তোমরা, হে মহারথী, জড়মূর্তিবৎ
বসিয়া রহিলে সেথা চাহি মুখে মুখে,
কেহ বা হাসিলে, কেহ করিলে কৌতুকে
কানাকানি— কোষমাঝে নিশ্চল কৃপাণ
বজ্রনিঃশেষিত সুপ্তবিদ্যুৎ-সমান
নিদ্রাগত— মহারাজ, শুন মহারাজ,
এ মিনতি। দূর করো জননীর লাজ,
বীরধর্ম করহ উদ্ধার, পদাহত
সতীত্বের ঘুচাও ক্রন্দন; অবনত
ন্যায়ধর্মে করহ সম্মান— ত্যাগ করো
দুর্যোধনে।

ধৃতরাষ্ট্র। পরিতাপদহনে জর্জর
হৃদয়ে করিছ শুধু নিষ্ফল আঘাত
হে মহিষী!

গান্ধারী। শতগুণ বেদনা কি, নাথ,
লাগিছে না মোরে? প্রভু, দণ্ডিতের সাথে
দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে
সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার। যার তরে প্রাণ
কোনো ব্যথা নাহি পায় তারে দণ্ডদান
প্রবলের অত্যাচার। যে দণ্ডবেদনা
পুত্রেরে পার না দিতে সে কারে দিয়ো না,
যে তোমার পুত্র নহে তারো পিতা আছে,
মহা-অপরাধী হবে তুমি তার কাছে
বিচারক। শুনিয়াছি বিশ্ববিধাতার
সবাই সন্তান মোরা— পুত্রের বিচার
নিয়ত করেন তিনি আপনার হাতে
নারায়ণ; ব্যথা দেন, ব্যথা পান সাথে;
নতুবা বিচারে তাঁর নাই অধিকার,
মূঢ় নারী লভিয়াছি অন্তরে আমার
এই শাস্ত্র। পাপী পুত্রে ক্ষমা কর যদি
নির্বিচারে, মহারাজ, তবে নিরবধি
যত দণ্ড দিলে তুমি যত দোষীজনে,

ধর্মাধিপ নামে, কর্তব্যের প্রবর্তনে,
ফিরিয়া লাগিবে আসি দণ্ডদাতা ভূপে—
ন্যায়ের বিচার তব নির্মমতারূপে
পাপ হয়ে তোমারে দাগিবে। ত্যাগ করো
পাপী দুর্যোধনে।

ধৃতরাষ্ট্র। প্রিয়ে, সংহর, সংহর
তব বাণী। ছিঁড়িতে পারি নে মোহডোর,
ধর্মকথা শুধু আসি হানে সুকঠোর
ব্যর্থ ব্যথা। পাপী পুত্র ত্যাজ্য বিধাতার,
তাই তারে ত্যজিতে না পারি— আমি তার
একমাত্র। উন্মত্ত-তরঙ্গ-মাঝখানে
যে পুত্র সঁপেছে অঙ্গ তারে কোন্ প্রাণে
ছাড়ি যাব? উদ্ধারের আশা ত্যাগ করি
তবু তারে প্রাণপণে বক্ষে চাপি ধরি,
তারি সাথে এক পাপে ঝাঁপ দিয়া পড়ি,
এক বিনাশের তলে তলাইয়া মরি
অকাতরে— অংশ লই তার দুর্গতির,
অর্ধ ফল ভোগ করি তার দুর্মতির,
সেই তো সান্ত্বনা মোর— এখন তো আর
বিচারের কাল নাই, নাই প্রতিকার,
নাই পথ— ঘটেছে যা ছিল ঘটিবার,
ফলিবে যা ফলিবার আছে।

[প্রস্থান

গান্ধারী। হে আমার
অশান্ত হৃদয়, স্থির হও। নতশিরে
প্রতীক্ষা করিয়া থাকো বিধির বিধিরে
ধৈর্য ধরি। যেদিন সুদীর্ঘ রাত্রি-'পরে
সদ্য জেগে উঠে কাল সংশোধন করে
আপনারে, সেদিন দারুণ দুঃখদিন।
দুঃসহ উত্তাপে যথা স্থির গতিহীন
ঘুমাইয়া পড়ে বায়ু— জাগে ঝঞ্ঝাঝড়ে
অকস্মাৎ, আপনার জড়ত্বের 'পরে
করে আক্রমণ, অন্ধ বৃশ্চিকের মতো
ভীমপুচ্ছে আত্মশিরে হানে অবিরত
দীপ্ত বজ্রশূল, সেইমত কাল যবে
জাগে, তারে সভয়ে অকাল কহে সবে।
লুটাও লুটাও শির— প্রণম, রমণী,
সেই মহাকালে; তার রথচক্রধ্বনি
দূর রুদ্রলোক হতে বজ্রঘর্ঘরিত
ওই শুনা যায়। তোর আর্ত জর্জরিত
হৃদয় পাতিয়া রাখ্ তার পথতলে।

ছিন্ন সিক্ত হৃৎপিণ্ডের রক্তশতদলে
অঞ্জলি রচিয়া থাক্ জাগিয়া নীরবে
চাহিয়া নিমেষহীন। তার পরে যবে
গগনে উড়িবে ধূলি, কাঁপিবে ধরণী,
সহসা উঠিবে শূন্যে ক্রন্দনের ধ্বনি—
হায় হায় হা রমণী, হায় রে অনাথা,
হায় হায় বীরবধূ ; হায় বীরমাতা,
হায় হায় হাহাকার— তখন সুধীরে
ধুলায় পড়িস লুটি অবনতশিরে
মুদিয়া নয়ন। তার পরে নমো নম
সুনিশ্চিত পরিণাম, নির্বাক্ নির্মম
দারুণ করুণ শান্তি ! নমো নমো নম
কল্যাণ কঠোর কান্ত, ক্ষমা স্নিগ্ধতম !
নমো নমো বিদ্বেষের ভীষণা নির্বৃতি !
শ্মশানের ভস্মমাখা পরমা নিষ্কৃতি !

দুর্যোধন-মহিষী ভানুমতীর প্রবেশ
(দাসীগণের প্রতি)

ভানুমতী। ইন্দুমুখী, পরভৃতে, লহো তুলি শিরে
মাল্যবস্ত্র অলংকার।

গান্ধারী। বৎসে, ধীরে, ধীরে।
পৌরবভবনে কোন্ মহোৎসব আজি ?
কোথা যাও নব বস্ত্র-অলংকারে সাজি
বধূ মোর ?

ভানুমতী। শত্রুপরাভব-শুভক্ষণ
সমাগত।

গান্ধারী। শত্রু যার আত্মীয়স্বজন
আত্মা তার নিত্য শত্রু, ধর্ম শত্রু তার,
অজেয় তাহার শত্রু। নব অলংকার
কোথা হতে হে কল্যাণী ?

ভানুমতী। জিনি বসুমতী
ভুজবলে, পাঞ্চালীরে তার পঞ্চপতি
দিয়েছিল যত রত্ন মণি অলংকার,
যজ্ঞদিনে যাহা পরি ভাগ্য-অহংকার
ঠিকরিত মাণিক্যের শত সূচীমুখে
দ্রৌপদীর অঙ্গ হতে, বিদ্ধ হত বুকে
কুরুকুলকামিনীর, সে রত্নভূষণে
আমারে সাজায়ে তারে যেতে হল বনে।

গান্ধারী। হা রে মূঢ়ে, শিক্ষা তবু হল না তোমার—
সেই রত্ন নিয়ে তবু এত অহংকার !
একি ভয়ংকরী কান্তি, প্রলয়ের সাজ।

যুগান্তের উল্কাসম দহিছে না আজ
এ মণিমঞ্জীর তোরে ? রত্নললাটিকা
এ যে তোর সৌভাগ্যের বজ্রানলশিখা ।
তোরে হেরি অঙ্গে মোর ত্রাসের স্পন্দন
সঞ্চারিছে, চিত্তে মোর উঠিছে ক্রন্দন—
আনিছে শঙ্কিত কর্ণে তোর অলংকার
উন্মাদিনী শংকরীর তাণ্ডবঝংকার ।

ভানুমতী । মাতঃ, মোরা ক্ষত্রনারী, দুর্ভাগ্যের ভয়
নাহি করি । কভু জয়, কভু পরাজয়—
মধ্যাহ্নগগনে কভু, কভু অস্তধামে,
ক্ষত্রিয়মহিমা-সূর্য উঠে আর নামে ।
ক্ষত্রবীরাঙ্গনা, মাতঃ, সেই কথা স্মরি
শঙ্কার বক্ষেতে থাকি সংকটে না ডরি
ক্ষণকাল । দুর্দিন দুর্যোগ যদি আসে,
বিমুখ ভাগ্যেরে তবে হানি উপহাসে
কেমনে মরিতে হয় জানি তাহা দেবী—
কেমনে বাঁচিতে হয় শ্রীচরণ সেবি
সে শিক্ষাও লভিয়াছি ।

গান্ধারী । বৎসে, অমঙ্গল
একেলা তোমার নহে । লয়ে দলবল
সে যবে মিটায় ক্ষুধা, উঠে হাহাকার,
কত বীররক্তস্রোতে কত বিধবার
অশ্রুধারা পড়ে আসি— রত্ন-অলংকার
বধূহস্ত হতে খসি পড়ে শত শত
চূতলতাকুঞ্জবনে মঞ্জরীর মতো
ঝঞ্ঝাবাতে । বৎসে, ভাঙিয়ো না বদ্ধ সেতু,
ক্রীড়াচ্ছলে তুলিয়ো না বিপ্লবের কেতু
গৃহমাঝে— আনন্দের দিন নহে আজি ।
স্বজনদুর্ভাগ্য লয়ে সর্ব অঙ্গে সাজি
গর্ব করিয়ো না মাতঃ ! হয়ে সুসংযত
আজ হতে শুদ্ধচিত্তে উপবাসব্রত
করো আচরণ— বেণী করি উন্মোচন
শান্ত মনে করো, বৎসে, দেবতা-অর্চন ।
এ পাপসৌভাগ্যদিনে গর্ব-অহংকারে
প্রতিক্ষণে লজ্জা দিয়ো নাকো বিধাতারে ।
খুলে ফেলো অলংকার, নব রক্তাম্বর ;
থামাও উৎসববাদ্য, রাজ-আড়ম্বর ;
অগ্নিগৃহে যাও, পুত্রী, ডাকো পুরোহিতে—
কালের প্রতীক্ষা করো শুদ্ধসত্ত্ব চিতে ।

[ভানুমতীর প্রস্থান

দ্রৌপদীসহ পঞ্চপাণ্ডবের প্রবেশ

যুধিষ্ঠির। আশীর্বাদ মাগিবারে এসেছি, জননী,
বিদায়ের কালে।

গান্ধারী। সৌভাগ্যের দিনমণি
দুঃখরাত্রি-অবসানে দ্বিগুণ উজ্জ্বল
উদিবে হে বৎসগণ! বায়ু হতে বল,
সূর্য হতে তেজ, পৃথ্বী হতে ধৈর্যক্ষমা
করো লাভ দুঃখব্রত পুত্র মোর! রমা
দৈন্য-মাঝে গুপ্ত থাকি দীন-ছদ্ম-রূপে
ফিরুন পশ্চাতে তব সদা চুপে চুপে,
দুঃখ হতে তোমা-তরে করুন সঞ্চয়
অক্ষয় সম্পদ। নিত্য হউক নির্ভয়
নির্বাসনবাস। বিনা পাপে দুঃখভোগ
অন্তরে জ্বলন্ত তেজ করুক সংযোগ
বহ্নিশিখাদগ্ধদীপ্ত সুবর্ণের প্রায়।
সেই মহাদুঃখ হবে মহৎ সহায়
তোমাদের। সেই দুঃখে রহিবেন ঋণী
ধর্মরাজ বিধি, যবে শুধিবেন তিনি
নিজহস্তে আত্মঋণ তখন জগতে
দেব নর কে দাঁড়াবে তোমাদের পথে!
মোর পুত্র করিয়াছে যত অপরাধ
খণ্ডন করুক সব মোর আশীর্বাদ
পুত্রাধিক পুত্রগণ! অন্যায় পীড়ন
গভীর কল্যাণসিন্ধু করুক মন্থন।

(দ্রৌপদীকে আলিঙ্গনপূর্বক)

ভূলুণ্ঠিতা স্বর্ণলতা, হে বৎসে আমার,
হে আমার রাহুগ্রস্ত শশী, একবার
তোলো শির, বাক্য মোর করো অবধান।
যে তোমারে অবমানে তারি অপমান
জগতে রহিবে নিত্য, কলঙ্ক অক্ষয়।
তব অপমানরাশি বিশ্বজগন্ময়
ভাগ করে লইয়াছে সর্ব কুলাঙ্গনা—
কাপুরুষতার হস্তে সতীর লাঞ্ছনা।
যাও বৎসে, পতি-সাথে অমলিনমুখ
অরণ্যেরে করো স্বর্গ, দুঃখে করো সুখ।
বধূ মোর, সুদুঃসহ পতিদুঃখব্যথা
বক্ষে ধরি সতীত্বের লভো সার্থকতা।
রাজগৃহে আয়োজন দিবসযামিনী
সহস্র সুখের— বনে তুমি একাকিনী
সর্বসুখ, সর্বসঙ্গ, সর্বৈশ্বর্যময়,

সকল সান্ত্বনা একা, সকল আশ্রয়,
ক্লান্তির আরাম, শান্তি, ব্যাধির শুশ্রূষা,
দুর্দিনের শুভলক্ষ্মী, তামসীর ভূষা
উষা মূর্তিমতী। তুমি হবে একাকিনী
সর্বপ্রীতি, সর্বসেবা, জননী, গেহিনী—
সতীত্বের শ্বেতপদ্ম সম্পূর্ণ সৌরভে
শতদলে প্রস্ফুটিয়া জাগিবে গৌরবে।

[? মাঘ ১৩০৪]

সতী

মিস্ ম্যানিং-সম্পাদিত ন্যাশনাল ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের পত্রিকায় মারাঠি গাথা সম্বন্ধে অ্যাক্‌ওঅর্থ সাহেব -রচিত প্রবন্ধবিশেষ হইতে বর্ণিত ঘটনা সংগৃহীত।

রণক্ষেত্র

অমাবাই ও বিনায়ক রাও

অমাবাই। পিতা!

বিনায়ক রাও। পিতা! আমি তোর পিতা! পাপীয়সী
স্বাতন্ত্র্যচারিণী! যবনের গৃহে পশি
ম্লেচ্ছগলে দিলি মালা কুলকলঙ্কিনী!
আমি তোর পিতা!

অমাবাই। অন্যায় সমরে জিনি
স্বহস্তে বধিলে তুমি পতিরে আমার,
হায় পিতা, তবু তুমি পিতা! বিধবার
অশ্রুপাতে পাছে লাগে মহা অভিশাপ
তব শিরে, তাই আমি দুঃসহ সন্তাপ
রুদ্ধ করি রাখিয়াছি এ বক্ষপঞ্জরে।
তুমি পিতা, আমি কন্যা, বহুদিন পরে
হয়েছে সাক্ষাৎ দোঁহে সমর-অঙ্গনে
দারুণ নিশীথে। পিতঃ, প্রণমি চরণে
পদধূলি তুলি শিরে লইব বিদায়।
আজ যদি নাহি পারো ক্ষমিতে কন্যায়
আমি তবে ভিক্ষা মাগি বিধাতার ক্ষমা
তোমা লাগি পিতৃদেব!

বিনায়ক রাও। কোথা যাবি অমা?
ধিক্ অশ্রুজল। ওরে দুর্ভাগিনী নারী,
যে বৃক্ষে বাঁধিলি নীড় ধর্ম না বিচারি
সে তো বজ্রাহত, দগ্ধ, যাবি কার কাছে
ইহকাল-পরকাল-হারা?

অমাবাই। পুত্র আছে—

বিনায়ক রাও। থাক্ পুত্র। ফিরে আর চাস নে পশ্চাতে
পাতকের ভগ্নশেষ-পানে। আজ রাতে
শোণিততর্পণে তোর প্রায়শ্চিত্ত শেষ—
যবনের গৃহে তোর নাহিকো প্রবেশ
আর কভু। বল্ তবে কোথা যাবি আজ?

অমাবাই। হে নির্দয়, আছে মৃত্যু, আছে যমরাজ,
পিতা হতে স্নেহময়, মুক্ত দ্বারে যাঁর
আশ্রয় মাগিয়া কেহ ফিরে নাই আর।

বিনায়ক রাও। মৃত্যু ? বৎসে ! হা দুর্বৃত্তে ! পরম পাবক
নির্মল উদার মৃত্যু— সকল পাতক
করে গ্রাস— সিন্ধু যথা সকল নদীর
সব পঙ্করাশি। সেই মৃত্যু সুগভীর
তোর মুক্তি গতি। কিন্তু, মৃত্যু আজ না সে,
নহে হেথা। চল্ তবে দূর তীর্থবাসে
সলজ্জস্বজন আর সক্রোধসমাজ
পরিহরি, বিসর্জি কলঙ্ক ভয় লাজ
জন্মভূমি-ধূলিতলে। সেথা গঙ্গাতীরে
নবীন নির্মল বায়ু ; স্বচ্ছ পুণ্যনীরে
তিন সন্ধ্যা স্নান করি, নির্জন কুটিরে
শিব শিব শিব নাম জপি শান্ত মনে,
সুদূর মন্দির হতে সায়াহ্নপবনে
শুনিয়া আরতিধ্বনি, একদিন কবে
আয়ুঃশেষে মৃত্যু তোরে লইবে নীরবে—
পতিত কুসুমে লয়ে পঙ্ক ধুয়ে তার
গঙ্গা যথা দেয় তারে পূজা-উপহার
সাগরের পদে।

অমাবাই। পুত্র মোর !

বিনায়ক রাও। তার কথা
দূর কর্। অতীতনির্মুক্ত পবিত্রতা
ধৌত করে দিক তোরে। সদ্যশিশুসম
আর বার আয় বৎসে, পিতৃকোলে মম
বিস্মৃতিমাতার গর্ভ হতে। নব দেশে,
নব তরঙ্গিণীতীরে, শুভ্র হাসি হেসে
নবীন কুটিরে মোর জ্বালাবি আলোক
কন্যাব কল্যাণ করে।

অমাবাই। জ্বলে পতিশোক,
বিশ্ব হেরি ছায়াসম ; তোমাদের কথা
দূর হতে আনে কানে ক্ষীণ অস্ফুটতা,
পশে না হৃদয়মাঝে। ছেড়ে দাও মোরে,
ছেড়ে দাও। পতিরক্তসিক্ত স্নেহডোরে
বেঁধো না আমায়।

বিনায়ক রাও। কন্যা নহেকো পিতার।
শাখাচ্যুত পুষ্প শাখে ফিরে নাকো আর।
কিন্তু রে শুধাই তোরে কারে কোস পতি
লজ্জাহীনা ! কাড়ি নিল যে ম্লেচ্ছ দুর্মতি
জীবাজির প্রসারিত বরহস্ত হতে
বিবাহের রাত্রে তোরে— বঞ্চিয়া কপোতে
শ্যেন যথা লয়ে যায় কপোতবধূরে
আপনার ম্লেচ্ছ নীড়ে— সে দুষ্ট দস্যুরে

পতি কোস তুই ! সে রাত্রি কি মনে পড়ে ?
বিবাহসভায় সবে উৎসুক-অন্তরে
বসে আছি, শুভলগ্ন হল গতপ্রায়—
জীবাজি আসে না কেন সবাই শুধায়,
চায় পথপানে । দেখা দিল হেনকালে
মশালের রক্তরশ্মি নিশীথের ভালে,
শোনা গেল বাদ্যরব হর্ষে উচ্ছ্বসিল
অন্তঃপুরে উলুধ্বনি । দুয়ারে পশিল
শতেক শিবিকা ; কোথা জীবাজি কোথায়
শুধাতে না শুধাতেই ঝটিকার প্রায়
অকস্মাৎ কোলাহলে হতবুদ্ধি করি
মুহূর্তের মাঝে তোরে বলে অপহরি
কে কোথা মিলালো । ক্ষণপরে নতশিরে
জীবাজি বন্ধনমুক্ত এল ধীরে ধীরে—
শুনিনু কেমনে তারে বন্দী করি পথে
লয়ে তার দীপমালা, চড়ি তার রথে,
কাড়ি লয়ে পরি তার বরপরিচ্ছদ
বিজাপুর-যবনের রাজসভাসদ
দস্যুবৃত্তি করি গেল । সে দারুণ রাতে
হোমাগ্নি করিয়া স্পর্শ জীবাজির সাথে
প্রতিজ্ঞা করিনু আমি— দস্যুরক্তপাতে
লব এর প্রতিশোধ । বহুদিন পরে
হয়েছি সে পণমুক্ত । নিশীথসমরে
জীবাজি ত্যজিয়া প্রাণ বীরের সদ্‌গতি
লভিয়াছে । রে বিধবা, সেই তোর পতি—
দস্যু সে তো ধর্মনাশী ।

অমাবাই । ধিক্ পিতা, ধিক্ !
বধেছ পতিরে মোর— আরো মর্মান্তিক
এই মিথ্যা বাক্যশেল । তব ধর্ম-কাছে
পতিত হয়েছি, তবু মম ধর্ম আছে
সমুজ্জ্বল । পত্নী আমি, নহি সেবাদাসী ।
বরমাল্যে বরেছিনু তাঁরে ভালোবাসি
শ্রদ্ধাভরে ; ধরেছিনু পতির সন্তান
গর্ভে মোর, বলে করি নাই আত্মদান ।
মনে আছে দুই পত্র একদিন রাতে
পেয়েছিনু অন্তঃপুরে গুপ্তদূতী-হাতে—
তুমি লিখেছিলে শুধু, "হানো, তারে ছুরি ।"
মাতা লিখেছিল, "পত্রে বিষ দিনু পুরি,
করো তাহা পান ।" যদি বলে পরাজিত
অসহায় সতীধর্ম কেহ কেড়ে নিত
তা হলে কি এতদিন হত না পালন

তোমাদের সে আদেশ ? হৃদয় অর্পণ
করেছিনু বীরপদে । যবন ব্রাহ্মণ
সে ভেদ কাহার ভেদ ? ধর্মের সে নয় ।
অন্তরে অন্তর্যামী যেথা জেগে রয়
সেথায় সমান দোঁহে । মাঝে মাঝে তবু
সংস্কার উঠিত জাগি ; কোনোদিন কভু
নিগূঢ় ঘৃণার বেগ শিরায় অধীর
হানিত বিদ্যুৎকম্প, অবাধ্য শরীর
সংকোচে কুঞ্চিত হত— কিন্তু তারো পরে
সতীত্ব হয়েছে জয়ী । পূর্ণ ভক্তিভরে
করেছি পতির পূজা ; হয়েছি যবনী
পবিত্র অন্তরে : নহি পতিতা রমণী—
পরিতাপে অপমানে অবনতশিরে
মোর পতিধর্ম হতে নাহি যাব ফিরে
ধর্মান্তরে অপরাধীসম ।— একি ! একি !
নিশীথের উল্কাসম এ কাহারে দেখি
ছুটে আসে মুক্তকেশে !

রমাবাইয়ের প্রবেশ

জননী আমার !
কখনো যে দেখা হবে এ জনমে আর
হেন ভাবি নাই মনে । মা গো, মা জননী,
দেহ তব পদধূলি ।

রমাবাই । ছুঁস নে যবনী
পাতকিনী !

অমাবাই । কোনো পাপ নাই মোর দেহে—
নির্মল তোমারি মতো ।

রমাবাই । যবনের গেহে
কার কাছে সমর্পিলি ধর্ম আপনার ?

অমাবাই । পতি-কাছে ।

রমাবাই । পতি ! ম্লেচ্ছ, পতি সে তোমার !
জানিস কাহারে বলে পতি ! নষ্টমতি,
ভ্রষ্টাচার ! রমণীর সে যে এক গতি,
একমাত্র ইষ্টদেব । ম্লেচ্ছ মুসলমান
ব্রাহ্মণকন্যার পতি ! দেবতা-সমান !

অমাবাই । উচ্চ বিপ্রকুলে জন্মি তবুও যবনে
ঘৃণা করি নাই আমি, কায়বাক্যে মনে
পূজিয়াছি পতি বলি ; মোরে করে ঘৃণা
এমন কে সতী আছে ? নহি আমি হীনা
জননী তোমার চেয়ে— হবে মোর গতি
সতীস্বর্গলোকে ।

রমাবাই । সতী তুমি !
অমাবাই । আমি সতী ।
রমাবাই । জানিস মরিতে অসংকোচে ?
অমাবাই । জানি আমি ।
রমাবাই । তবে জ্বাল্ চিতানল । ওই তোর স্বামী
পড়িয়া সমরভূমে ।
অমাবাই । জীবাজি ?
রমাবাই । জীবাজি
বাগ্‌দত্ত পতি তোর । তারি ভস্মে আজি
ভস্ম মিলাইতে হবে । বিবাহরাত্রির
বিফল হোমাগ্নিশিখা শ্মশানভূমির
ক্ষুধিত চিতাগ্নিরূপে উঠেছে জাগিয়া ;
আজি রাত্রে সে রাত্রির অসমাপ্ত ক্রিয়া
হবে সমাপন ।
বিনায়ক রাও । যাও বৎসে, যাও ফিরে
তব পুত্র-কাছে, তব শোকতপ্ত নীড়ে ।
দারুণ কর্তব্য মোর নিঃশেষ করিয়া
করেছি পালন— যাও তুমি । অয়ি প্রিয়া,
বৃথা করিতেছ ক্ষোভ । যে নব শাখারে
আমাদের বৃক্ষ হতে কঠিন কুঠারে
ছিন্ন করি নিয়ে গেল বনান্তরছায়ে,
সেথা যদি বিশীর্ণা সে মরিত শুকায়ে
অগ্নিতে দিতাম তারে ; সে যে ফলে ফুলে
নব প্রাণে বিকশিত, নব নব মূলে
নূতন মৃত্তিকা ছেয়ে । সেথা তার প্রীতি,
সেথাকার ধর্ম তার, সেথাকার রীতি ।
অন্তরের যোগসূত্র ছিঁড়েছে যখন
তোমার নিয়মপাশ নির্জীব বন্ধন—
ধর্মে বাঁধিছে না তারে, বাঁধিতেছে বলে ।
ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও । যাও, বৎসে, চলে
যাও তব গৃহকর্মে ফিরে— যাও তব
স্নেহপ্রীতিজড়িত সংসারে, অভিনব
ধর্মক্ষেত্রমাঝে । এসো প্রিয়ে, মোরা দোঁহে
চলে যাই তীর্থধামে কাটি মায়ামোহে,
সংসারের দুঃখ-সুখ-চক্র-আবর্তন
ত্যাগ করি—
রমাবাই । তার আগে করিব ছেদন
আমার সংসার হতে পাপের অঙ্কুর
যতগুলি জন্মিয়াছে । করি যাব দূর
আমার গর্ভের লজ্জা । কন্যার কুযশে
মাতার সতীত্বে যেন কলঙ্ক পরশে ।

অনলে অঙ্গারসম সে কলঙ্ককালি
তুলিব উজ্জ্বল করি চিতানল জ্বালি।
সতীখ্যাতি রটাইব দুহিতার নামে,
সতীমঠ উঠাইব এ শ্মশানধামে
কন্যার ভস্মের 'পরে।

অমাবাই। ছাড়ো লোকলাজ
লোকখ্যাতি— হে জননী, এ নহে সমাজ,
এ মহাশ্মশানভূমি। হেথা পুণ্যপাপ
লোকের মুখের বাক্যে করিয়ো না মাপ,
সত্যেরে প্রত্যক্ষ করো মৃত্যুর আলোকে।
সতী আমি। ঘৃণা যদি করে মোরে লোকে
তবু সতী আমি। পরপুরুষের সনে
মাতা হয়ে বাঁধ যদি মৃত্যুর মিলনে
নির্দোষ কন্যারে, লোকে তোরে ধন্য কবে,
কিন্তু, মাতঃ, নিত্যকাল অপরাধী রবে
শ্মশানের অধীশ্বর-পদে।

রমাবাই। জ্বালো চিতা,
সৈন্যগণ! ঘেরো আসি বন্দিনীরে।

অমাবাই। পিতা!

বিনায়ক রাও। ভয় নাই, ভয় নাই। হায় বৎসে, হায়!
মাতৃহস্ত হতে আজি রক্ষিতে তোমায়
পিতারে ডাকিতে হল। যেই হস্তে তোরে
বক্ষে বেঁধে রেখেছিনু, কে জানিত ওরে
ধর্মেরে করিতে রক্ষা, দোষীরে দণ্ডিতে
সেই হস্তে একদিন হইবে খণ্ডিতে
তোমারি সৌভাগ্যসূত্র হে বৎসে আমার।

অমাবাই। পিতা!

বিনায়ক রাও। আয় বৎসে! বৃথা আচার বিচার।
পুত্রে লয়ে মোর সাথে আয় মোর মেয়ে
আমার আপন ধন। সমাজের চেয়ে
হৃদয়ের নিত্যধর্ম সত্য চিরদিন।
পিতৃস্নেহ নির্বিচার বিকারবিহীন
দেবতার বৃষ্টিসম, আমার কন্যারে
সেই শুভ স্নেহ হতে কে বঞ্চিতে পারে—
কোন্ শাস্ত্র, কোন্ লোক, কোন্ সমাজের
মিথ্যা বিধি, তুচ্ছ ভয়?

রমাবাই। কোথা যাস্। ফের্।
রে পাপিষ্ঠে, ওই দেখ্ তোর লাগি প্রাণ
যে দিয়েছে রণভূমে তার প্রাণদান
নিষ্ফল হবে না, তোরে লইবে সে সাথে
বরবেশে ধরি তোর মৃত্যুপূত হাতে

শূরস্বর্গমাঝে। শুন, যত আছ বীর,
তোমরা সকলে ভক্ত ভৃত্য জীবাজির—
এই তাঁর বাগ্‌দত্তা বধূ, চিতানলে
মিলন ঘটায়ে দাও, মিলিয়া সকলে
প্রভুকৃত্য শেষ করো।

সৈন্যগণ। ধন্য পুণ্যবতী।

অমাবাই। পিতা!

বিনায়ক রাও। ছাড়্ তোরা।

সৈন্যগণ। যিনি এ নারীর পতি
তাঁর অভিলাষ মোরা করিব পূরণ।

বিনায়ক রাও। পতি এঁর স্বধর্মী যবন।

সেনাপতি। সৈন্যগণ,
বাঁধো বৃদ্ধ বিনায়কে।

অমাবাই। মাতঃ, পাপীয়সী,
পিশাচিনী!

রমাবাই। মূঢ়, তোরা কী করিস বসি।
বাজা বাদ্য, কর্ জয়ধ্বনি।

সৈন্যগণ। জয় জয়!

অমাবাই। নারকিনী!

সৈন্যগণ। জয় জয়!

রমাবাই। রটা বিশ্বময়
সতী অমা।

অমাবাই। জাগো, জাগো, জাগো ধর্মরাজ!
শ্মশানের অধীশ্বর, জাগো তুমি আজ।
হেরো তব মহারাজ্যে করিছে উৎপাত
ক্ষুদ্র শত্রু— জাগো, তারে করো বজ্রাঘাত
দেবদেব! তব নিত্যধর্মে করো জয়ী
ক্ষুদ্র ধর্ম হতে।

রমাবাই। বল্ জয় পুণ্যময়ী,
বল্ জয় সতী!

সৈন্যগণ। জয় জয় পুণ্যবতী।

অমাবাই। পিতা, পিতা, পিতা মোর!

সৈন্যগণ। ধন্য ধন্য সতী।

২০ কার্তিক ১৩০৪

নরকবাস

নেপথ্যে। কোথা যাও মহারাজ!

সোমক। কে ডাকে আমারে
দেবদূত? মেঘলোকে ঘন অন্ধকারে

দেখিতে না পাই কিছু— হেথা ক্ষণকাল
রাখো তব স্বর্গরথ ।

নেপথ্যে । ওগো নরপাল,
নেমে এসো । নেমে এসো হে স্বর্গপথিক !

সোমক । কে তুমি, কোথায় আছ ?

নেপথ্যে । আমি সে ঋত্বিক্,
মর্তে তব ছিনু পুরোহিত ।

সোমক । ভগবন্,
নিখিলের অশ্রু যেন করেছে সৃজন
বাষ্প হয়ে এই মহা অন্ধকারলোক,
সূর্যচন্দ্রতারাহীন ঘনীভূত শোক
নিঃশব্দে রয়েছে চাপি দুঃস্বপ্ন-মতন
নভস্তল— হেথা কেন তব আগমন ?

প্রেতগণ । স্বর্গের পথের পার্শ্বে এ বিষাদলোক,
এ নরকপুরী । নিত্য নন্দন-আলোক
দূর হতে দেখা যায়— স্বর্গযাত্রিগণে
অহোরাত্রি চলিয়াছে, রথচক্রস্বনে
নিদ্রাতন্দ্রা দূর করি ঈর্ষাজর্জরিত
আমাদের নেত্র হতে । নিম্নে মর্মরিত
ধরণীর বনভূমি, সপ্ত পারাবার
চিরদিন করে গান— কলধ্বনি তার
হেথা হতে শুনা যায় ।

ঋত্বিক্ । মহারাজ, নামো
তব দেবরথ হতে ।

প্রেতগণ । ক্ষণকাল থামো
আমাদের মাঝখানে । ক্ষুদ্র এ প্রার্থনা
হতভাগ্যদের । পৃথিবীর অশ্রুকণা
এখনো জড়ায়ে আছে তোমার শরীর,
সদ্যছিন্ন পুষ্পে যথা বনের শিশির ।
মাটির, তৃণের গন্ধ— ফুলের, পাতার,
শিশুর, নারীর হায়, বন্ধুর, ভ্রাতার
বহিয়া এনেছ তুমি । ছয়টি ঋতুর
বহুদিনরজনীর বিচিত্র মধুর
সুখের সৌরভরাশি ।

সোমক । গুরুদেব, প্রভো,
এ নরকে কেন তব বাস ?

ঋত্বিক্ । পুত্রে তব
যজ্ঞে দিয়েছিনু বলি— সে পাপে এ গতি
মহারাজ !

প্রেতগণ । কহো সে কাহিনী, নরপতি,
পৃথিবীর কথা । পাতকের ইতিহাস

এখনো হৃদয়ে হানে কৌতুক-উল্লাস।
রয়েছে তোমার কণ্ঠে মর্তরাগিণীর
সকল মূর্ছনা, সুখদুঃখকাহিনীর
করুণ কম্পন। কহ তব বিবরণ
মানবভাষায়।

সোমক। হে ছায়াশরীরীগণ,
সোমক আমার নাম, বিদেহভূপতি।
বহু বর্ষ আরাধিয়া দেবদ্বিজযতি,
বহু যাগযজ্ঞ করি, প্রাচীন বয়সে
এক পুত্র লভেছিনু— তারি স্নেহবশে
রাত্রিদিন আছিলাম আপনা-বিস্মৃত।
সমস্ত-সংসারসিন্ধু-মথিত অমৃত
ছিল সে আমার শিশু। মোর বৃন্ত ভরি
একটি সে শ্বেতপদ্ম, সম্পূর্ণ আবরি
ছিল সে জীবন মোর। আমার হৃদয়
ছিল তারি মুখ-'পরে সূর্য যথা রয়
ধরণীর পানে চেয়ে। হিমবিন্দুটিরে
পদ্মপত্র যত ভয়ে ধরে রাখে শিরে
সেইমত রেখেছিনু তারে। সুকঠোর
ক্ষাত্রধর্ম রাজধর্ম স্নেহপানে মোর
চাহিত সরোষ চক্ষে ; দেবী বসুন্ধরা
অবহেলা-অবমানে হইত কাতরা,
রাজলক্ষ্মী হত লজ্জামুখী।
সভামাঝে
একদা অমাত্য-সাথে ছিনু রাজকাজে,
হেনকালে অন্তঃপুরে শিশুর ক্রন্দন
পশিল আমার কর্ণে। ত্যজি সিংহাসন
দ্রুত ছুটে চলে গেনু ফেলি সর্বকাজ।

ঋত্বিক্। সে মুহূর্তে প্রবেশিনু রাজসভামাঝ
আশিস করিতে নৃপে ধান্যদূর্বাকরে
আমি রাজপুরোহিত। ব্যগ্রতার ভরে
আমারে ঠেলিয়া রাজা গেলেন চলিয়া,
অর্ঘ্য পড়ি গেল ভূমে। উঠিল জ্বলিয়া
ব্রাহ্মণের অভিমান। ক্ষণকাল-পরে
ফিরিয়া আসিলা রাজা লজ্জিত-অন্তরে।
আমি শুধালেম তাঁরে, 'কহো হে রাজন্,
কী মহা অনর্থপাত দুর্দৈবঘটন
ঘটেছিল, যার লাগি ব্রাহ্মণেরে ঠেলি
অন্ধ অবজ্ঞার বশে, রাজকর্ম ফেলি,
না শুনি বিচারপ্রার্থী প্রজাদের যত
আবেদন, পররাষ্ট্র হতে সমাগত

রাজদূতগণে নাহি করি সম্ভাষণ,
সামন্ত রাজন্যগণে না দিয়া আসন,
প্রধান অমাত্য-সবে রাজ্যের বারতা
না করি জিজ্ঞাসাবাদ, না করি শিষ্টতা
অতিথি-সজ্জন-গুণীজনে— অসময়ে
ছুটি গেলা অন্তঃপুরে মত্তপ্রায় হয়ে
শিশুর ক্রন্দন শুনি ? ধিক্ মহারাজ,
লজ্জায় আনতশির ক্ষত্রিয়সমাজ
তব মুগ্ধ ব্যবহারে ; শিশুভুজপাশে
বন্দী হয়ে আছ পড়ি দেখে সবে হাসে
শত্রুদল দেশে দেশে, নীরব সংকোচে
বন্ধুগণ সংগোপনে অশ্রুজল মোছে ।'

সোমক । ব্রাহ্মণের সেই তীব্র তিরস্কার শুনি
অবাক হইল সভা । পাত্রমিত্র গুণী
রাজগণ প্রজাগণ রাজদূত সবে
আমার মুখের পানে চাহিল নীরবে
ভীত কৌতূহলে । রোষাবেশ ক্ষণতরে
উত্তপ্ত করিল রক্ত ; মুহূর্তেক-পরে
লজ্জা আসি করি দিল দ্রুত পদাঘাত
দৃপ্ত রোষসর্পশিরে । করি প্রণিপাত
গুরুপদে, কহিলাম বিনম্র বিনয়ে,
'ভগবন্, শান্তি নাই এক পুত্র লয়ে,
ভয়ে ভয়ে কাটে কাল । মোহবশে তাই
অপরাধী হইয়াছি— ক্ষমা ভিক্ষা চাই ।
সাক্ষী থাকো মন্ত্রী-সবে, হে রাজন্যগণ,
রাজার কর্তব্য কভু করিয়া লঙ্ঘন
খর্ব করিব না আর ক্ষত্রিয়গৌরব ।'

ঋত্বিক্ । কুণ্ঠিত আনন্দে সভা রহিল নীরব ।
আমি শুধু কহিলাম বিদ্বেষের তাপ
অন্তরে পোষণ করি, 'এক-পুত্র-শাপ
দূর করিবারে চাও— পন্থা আছে তারো,
কিন্তু সে কঠিন কাজ, পারো কি না পারো
ভয় করি ।' শুনিয়া সগর্বে মহারাজ
কহিলেন, 'নাহি হেন সুকঠিন কাজ
পারি না করিতে যাহা ক্ষত্রিয়তনয়
কহিলাম স্পর্শি তব পাদপদ্মদ্বয় ।'
শুনিয়া কহিনু মৃদু হাসি, 'হে রাজন্,
শুন তবে । আমি করি যজ্ঞ-আয়োজন,
তুমি হোম করো দিয়ে আপন সন্তান ।
তারি মেদগন্ধধূম করিয়া আঘ্রাণ
মহিষীরা হইবেন শতপুত্রবতী,

কহিনু নিশ্চয় ।' শুনি নীরব নৃপতি
রহিলেন নতশিরে । সভাস্থ সকলে
উঠিল ধিক্কার দিয়া উচ্চ কোলাহলে ।
কর্ণে হস্ত রুধি কহে যত বিপ্রগণ,
'ধিক্ পাপ এ প্রস্তাব !' নৃপতি তখন
কহিলেন ধীরস্বরে, 'তাই হবে প্রভু,
ক্ষত্রিয়ের পণ মিথ্যা হইবে না কভু ।'
তখন নারীর আর্ত বিলাপে চৌদিক
কাঁদি উঠে, প্রজাগণ করে 'ধিক্ ধিক্',
বিদ্রোহ জাগাতে চায় যত সৈন্যদল
ঘৃণাভরে । নৃপ শুধু রহিলা অটল ।
জ্বলিল যজ্ঞের বহ্নি । যজনসময়ে
কেহ নাই, কে আনিবে রাজার তনয়ে
অন্তঃপুর হতে বহি । রাজভৃত্য সবে
আজ্ঞা মানিল না কেহ । রহিল নীরবে
মন্ত্রিগণ । দ্বাররক্ষী মুছে চক্ষুজল,
অস্ত্র ফেলি চলি গেল যত সৈন্যদল ।
আমি ছিন্নমোহপাশ, সর্বশাস্ত্রজ্ঞানী,
হৃদয়বন্ধন সব মিথ্যা ব'লে মানি—
প্রবেশিনু অন্তঃপুরমাঝে ! মাতৃগণ
শত-শাখা-অন্তরালে ফুলের মতন
রেখেছেন অতিযত্নে বালকেরে ঘেরি
কাতর-উৎকণ্ঠা-ভরে । শিশু মোরে হেরি
হাসিতে লাগিল উচ্চে দুই বাহু তুলি ।
জানাইল অর্ধস্ফুট কাকলি আকুলি—
মাতৃব্যূহ ভেদ করে নিয়ে যাও মোরে ।
বহুক্ষণ বন্দী থাকি খেলাবার তরে
ব্যগ্র তার শিশু-হিয়া । কহিলাম হাসি—
'মুক্তি দিব এ নিবিড় স্নেহবন্ধ নাশি,
আয় মোর সাথে ।' এত বলি বল করি
মাতৃগণ-অঙ্ক হতে লইলাম হরি
সহাস্য শিশুরে । পায়ে পড়ি দেবীগণ
পথ রুধি আর্তকণ্ঠে করিল ক্রন্দন—
আমি চলে এনু বেগে । বহ্নি উঠে জ্বলি—
দাঁড়ায়ে রয়েছে রাজা পাষাণপুত্তলি ।
কম্পিত প্রদীপ্ত শিখা হেরি হর্ষভরে
কলহাস্যে নৃত্য করি প্রসারিত করে
ঝাঁপাইতে চাহে শিশু । অন্তঃপুর হতে
শতকণ্ঠে উঠে আর্তস্বর । রাজপথে
অভিশাপ উচ্চারিয়া যায় বিপ্রগণ
নগর ছাড়িয়া । কহিলাম, 'হে রাজন্,

আমি করি মন্ত্রপাঠ, তুমি এরে লও,
দাও অগ্নিদেবে।'

সোমক। ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও,
কহিয়ো না আর।

প্রেতগণ। থামো থামো! ধিক্ ধিক্!
পূর্ণ মোরা বহু পাপে, কিন্তু রে ঋত্বিক্,
শুধু একা তোর তরে একটি নরক
কেন সৃজে নাই বিধি! খুঁজে যমলোক
তব সহবাসযোগ্য নাহি মিলে পাপী।

দেবদূত। মহারাজ, এ নরকে ক্ষণকাল যাপি
নিষ্পাপে সহিছ কেন পাপীর যন্ত্রণা?
উঠ স্বর্গরথে— থাক্ বৃথা আলোচনা
নিদারুণ ঘটনার।

সোমক। রথ যাও লয়ে
দেবদূত! নাহি যাব বৈকুণ্ঠ-আলয়ে।
তব সাথে মোর গতি নরকমাঝারে
হে ব্রাহ্মণ! মত্ত হয়ে ক্ষাত্র-অহংকারে
নিজ কর্তব্যের ত্রুটি করিতে ক্ষালন
নিষ্পাপ শিশুরে মোর করেছি অর্পণ
হুতাশনে, পিতা হয়ে। বীর্য আপনার
নিন্দুকসমাজমাঝে করিতে প্রচার
নরধর্ম রাজধর্ম পিতৃধর্ম হায়
অনলে করেছি ভস্ম। সে পাপজ্বালায়
জ্বলিয়াছি আমরণ, এখনো সে তাপ
অন্তরে দিতেছে দাগি নিত্য অভিশাপ।
হায় পুত্র, হায় বৎস নবনীনির্মল,
করুণকোমলকান্ত, হা মাতৃবৎসল,
একান্ত নির্ভরপর পরম দুর্বল
সরল চঞ্চল শিশু পিতৃ-অভিমানী,
অগ্নিরে খেলনাসম পিতৃদান জানি
ধরিলি দু হাত মেলি বিশ্বাসে নির্ভয়ে।
তার পরে কী ভর্ৎসনা ব্যথিত বিস্ময়ে
ফুটিল কাতর চক্ষে বহ্নিশিখাতলে
অকস্মাৎ! হে নরক, তোমার অনলে
হেন দাহ কোথা আছে যে জিনিতে পারে
এ সন্তাপ! আমিও কি যাব স্বর্গদ্বারে!
দেবতা ভুলিতে পারে এ পাপ আমার
আমি কি ভুলিতে পারি সে দৃষ্টি তাহার,
সে অন্তিম অভিমান? দগ্ধ হব আমি
নরক-অনল-মাঝে নিত্য দিনযামী,
তবু বৎস, তোর সেই নিমেষের ব্যথা,

আচম্বিতে বহ্নিদাহে ভীত কাতরতা
পিতৃমুখপানে চেয়ে, পরম বিশ্বাস
চকিতে হইয়া ভঙ্গ মহা নিরাশ্বাস,
তার নাহি হবে পরিশোধ।

ধর্মের প্রবেশ

ধর্ম। মহারাজ,
স্বর্গ অপেক্ষিয়া আছে তোমা-তরে আজ,
চলো ত্বরা করি।

সোমক। সেথা মোর নাহি স্থান
ধর্মরাজ! বধিয়াছি আপন সন্তান
বিনা পাপে।

ধর্ম। করিয়াছ প্রায়শ্চিত্ত তার
অন্তর-নরকানলে। সে পাপের ভার
ভস্ম হয়ে ক্ষয় হয়ে গেছে। যে ব্রাহ্মণ
বিনা চিত্তপরিতাপে পরপুত্রধন
স্নেহবন্ধ হতে ছিঁড়ি করেছে বিনাশ
শাস্ত্রজ্ঞান-অভিমানে, তারি হেথা বাস
সমুচিত।

ঋত্বিক্। যেয়ো না যেয়ো না তুমি চলে
মহারাজ! সর্পশীর্ষ তীব্র ঈর্ষানলে
আমারে ফেলিয়া রাখি যেয়ো না, যেয়ো না
একাকী অমরলোকে। নূতন বেদনা
বাড়ায়ো না বেদনায় তীব্র দুর্বিষহ,
সৃজিয়ো না দ্বিতীয় নরক। রহো রহো
মহারাজ, রহো হেথা।

সোমক। রব তব সহ
হে দুর্ভাগা! তুমি আমি মিলি অহরহ
করিব দারুণ হোম, সুদীর্ঘ যজন
বিরাট নরকহুতাশনে। ভগবন্,
যতকাল ঋত্বিকের আছে পাপভোগ
ততকাল তার সাথে করো মোরে যোগ—
নরকের সহবাসে দাও অনুমতি।

ধর্ম। মহান্ গৌরবে হেথা রহো মহীপতি!
ভালের তিলক হোক দুঃসহ দহন,
নরকাগ্নি হোক তব স্বর্ণ সিংহাসন।

প্রেতগণ। জয় জয়, মহারাজ, পুণ্যফলত্যাগী।
নিষ্পাপ নরকবাসী, হে মহাবৈরাগী,
পাপীর অন্তরে করো গৌরবসঞ্চার
তব সহবাসে। করো নরক উদ্ধার।

বোসো আসি দীর্ঘ যুগ মহাশক্রসনে
প্রিয়তম মিত্র-সম এক দুঃখাসনে।
অতি উচ্চ বেদনার আগ্নেয় চূড়ায়
জ্বলন্ত মেঘের সাথে দীপ্ত সূর্যপ্রায়
দেখা যাবে তোমাদের যুগল মুরতি—
নিত্যকাল-উদ্ভাসিত অনির্বাণ জ্যোতি।

৭ অগ্রহায়ণ ১৩০৪

লক্ষ্মীর পরীক্ষা

প্রথম দৃশ্য

ক্ষীরো। ধনী সুখে করে ধর্মকর্ম,
গরিবের পড়ে মাথার ঘর্ম।
তুমি রানী, আছে টাকা শত শত,
খেলাছলে করো দান ধ্যান ব্রত—
তোমার তো শুধু হুকুম মাত্র,
খাটুনি আমারি দিবসরাত্র।
তবুও তোমারি সুযশ, পুণ্য—
আমার কপালে সকলি শূন্য।

নেপথ্যে। ক্ষীরি, ক্ষীরি, ক্ষীরো!

ক্ষীরো। কেন ডাকাডাকি-
নাওয়া-খাওয়া সব ছেড়ে দেব নাকি?

রানী কল্যাণীর প্রবেশ

কল্যাণী। হল কী! তুই যে আছিস রেগেই।

ক্ষীরো। কাজ যে পিছনে রয়েছে লেগেই।
কতই বা সয় রক্তমাংসে,
কত কাজ করে একটা মান্‌ষে!
দিনে দিনে হল শরীর নষ্ট।

কল্যাণী। কেন, এত তোর কিসের কষ্ট?

ক্ষীরো। যেথা যত আছে রামী ও বামী
সকলেরি যেন গোলাম আমি।
হোক ব্রাহ্মণ, হোক শুদ্দুর,
সেবা করে মরি পাড়াসুদ্ধুর।
ঘরেতে কারো তো চড়ে না অন্ন,
তোমারি ভাঁড়ারে নিমন্তন্ন।
হাড় বের হল বাসন মেজে,
সৃষ্টির পান-তামাক সেজে।
একা একা এত খেটে যে মরি,
মায়া দয়া নেই?

কল্যাণী। সে দোষ তোরি।
চাকর দাসী কি টিকিতে পারে
তোমার প্রখর মুখের ধারে ?
লোক এলে তুই তাড়াবি তাদের,
লোক গেলে শেষে আর্তনাদের
ধুম পড়ে যাবে— এর কি পথ্যি
আছে কোনোরূপ !

ক্ষীরো। সে কথা সত্যি।
সয় না আমার— তাড়াই সাধে ?
অন্যায় দেখে পরান কাঁদে।
কোথা থেকে যত ডাকাত জোটে,
টাকাকড়ি সব দু হাতে লোটে।
আমি না তাদের তাড়াই যদি
তোমারে তাড়াত আমারে বধি।

কল্যাণী। ডাকাত মাধবী, ডাকাত মাধু,
সবাই ডাকাত, তুমিই সাধু !

ক্ষীরো। আমি সাধু ! মা গো, এমন মিথ্যে
মুখেও আনি নে, ভাবি নে চিত্তে।
নিই-থুই খাই দু হাত ভরি,
দু বেলা তোমায় আশিস করি—
কিন্তু তবু সে দু হাত -'পরে
দু-মুঠোর বেশি কতই ধরে।
ঘরে যত আনো মানুষ-জনকে
তত বেড়ে যায় হাতের সংখ্যে।
হাত যে সৃজন করেছে বিধি
নেবার জন্যে, জান তো দিদি !
পাড়াপড়শির দৃষ্টি থেকে
কিছু আপনার রাখো তো ঢেকে,
তার পরে বেশি রহিলে বাকি
চাকর-বাকর আনিয়ো ডাকি।

কল্যাণী। একা বটে তুমি ! তোমার সাথি
ভাইপো ভাইঝি নাতনী নাতি—
হাট বসে গেছে সোনার চাঁদের,
দুটো করে হাত নেই কি তাঁদের ?
তোর কথা শুনে কথা না সরে,
হাসি পায় ফের রাগও ধরে।

ক্ষীরো। বেশি রেগে যদি কম হাসি পেত
স্বভাব আমার শুধরিয়ে যেত।

কল্যাণী। ম'লেও যাবে না স্বভাবখানি
নিশ্চয় জেনো।

ক্ষীরো। সে কথা মানি।

তাই তো ভরসা মরণ মোরে
নেবে না সহসা সাহস করে।
ওই-যে তোমার দরজা জুড়ে
বসে গেছে যত দেশের কুঁড়ে—
কারো বা স্বামীর জোটে না খাদ্য,
কারো বা বেটার মামীর শ্রাদ্ধ।
মিছে কথা ঝুড়ি ভরিয়া আনে,
নিয়ে যায় ঝুড়ি ভরিয়া দানে।
নিতে চায় নিক, কত যে নিচ্ছে—
চোখে ধুলো দেবে সেটা কি ইচ্ছে ?

কল্যাণী। কেন তুই মিছে মরিস বকে ?
ধুলো দেয়, ধুলো লাগে না চোখে।
বুঝি আমি সব— এটাও জানি
তারা যে গরিব, আমি যে রানী।
ফাঁকি দিয়ে তারা ঘোচায় অভাব,
আমি দিই— সেটা আমার স্বভাব।
তাদের সুখ সে তারাই জানে,
আমার সুখ সে আমার প্রাণে।

ক্ষীরো। নুন খেয়ে গুণ গাহিত কভু,
দিয়ে-থুয়ে সুখ হইত তবু।
সামনে প্রণাম পদারবিন্দে,
আড়ালে তোমার করে যে নিন্দে !

কল্যাণী। সামনে যা পাই তাই যথেষ্ট,
আড়ালে কী ঘটে জানেন কেষ্ট।
সে যাই হোক গে, শুধাই তোরে
কাল বৈকালে বল্ তো মোরে,
অতিথিসেবায় অনেকগুলি
কম পড়েছিল চন্দ্রপুলি—
কেন বা ছিল না রসকরা ?

ক্ষীরো। কেন করো মিছে মসকরা
দিদিঠাকরুন। আপন হাতে
গুনে দিয়েছিনু সবার পাতে
দুটো দুটো ক'রে।

কল্যাণী। আপন চোখে
দেখেছি পায় নি সকল লোকে,
খালি পাত—

ক্ষীরো। ওমা, তাই তো বলি,
কোথায় তলিয়ে যায় যে চলি
যত সামিগ্রি দিই আনিয়ে।
ভোলা ময়রার শয়তানি এ।

কল্যাণী। এক বাটি করে দুধ বরাদ্দ,

আধ বাটি তাও পাওয়া অসাধ্য।
ক্ষীরো। গয়লা তো নন যুধিষ্ঠির।
যত বিষ তব কুদৃষ্টির
পড়েছে আমারই পোড়া অদৃষ্টে,
যত ঝাঁটা সব আমারি পৃষ্ঠে,
হায় হায়—
কল্যাণী। ঢের হয়েছে, আর না,
রেখে দাও তব মিথ্যে কান্না।
ক্ষীরো। সত্যি কান্না কাঁদেন যাঁরা
ওই আসছেন ঝেঁটিয়ে পাড়া।

প্রতিবেশিনীগণের প্রবেশ

প্রতিবেশিনীগণ। জয় জয় রানী, হও চিরজয়ী।
কল্যাণী তুমি কল্যাণময়ী।
ক্ষীরো। ওগো রানীদিদি, শোন্ ওই শোন্,
পাতে যদি কিছু হত অকুলোন
এত গলা ছেড়ে এত খুলে প্রাণ
উঠিত কি তবে জয় জয় তান?
যদি দু-চারটে চন্দ্রপুলি
দৈবগতিকে দিতে না ভুলি।
তা হলে কি আর রক্ষে থাকত,
হজম করতে বাপকে ডাকত।
কল্যাণী। আজ তো খাবার হয় নি কষ্ট?
প্রথমা। কত পাতে পড়ে হয়েছে নষ্ট—
লক্ষ্মীর ঘরে খাবার ত্রুটি?
কল্যাণী। হাঁ গো, কে তোমার সঙ্গে উটি?
আগে তো দেখি নি।
দ্বিতীয়া। আমার মধু,
তারি উটি হয় নতুন বধূ—
এনেছি দেখাতে তোমার চরণে
মা জননী।
ক্ষীরো। সেটা বুঝেছি ধরনে।

বধূর প্রতি

দ্বিতীয়া। প্রণাম করিবে এসো ই দিকে
এই যে তোমার রানীদিদিকে।
কল্যাণী। এসো কাছে এসো, লজ্জা কাদের?

আংটি পরাইয়া

আহা, মুখখানি দিব্যি ছাঁদের—
চেয়ে দেখ্ ক্ষীরি।

ক্ষীরো। মুখটি তো বেশ,
তা চেয়ে তোমার আংটি সরেশ।
দ্বিতীয়া। শুধু রূপ নিয়ে কী হবে অঙ্গে,
সোনাদানা কিছু আনে নি সঙ্গে।
ক্ষীরো। যাহা এনেছিল সবি সিন্দুকে
রেখেছ যতনে, বলে নিন্দুকে।
কল্যাণী। এসো ঘরে এসো।
ক্ষীরো। যাও গো ঘরে,
সোনা পাবে শুধু বাণীর দরে।

[কল্যাণী ও বধূসহ দ্বিতীয়ার প্রস্থান

প্রথমা। দেখলি মাগীর কাণ্ড একি!
ক্ষীরো। কারে বাদ দিয়ে কারে বা দেখি।
তৃতীয়া। তা বলে এতটা সহ্য হয় না।
ক্ষীরো। অন্যের বউ পরলে গয়না
অন্যের তাতে জ্বলে যে অঙ্গ।
তৃতীয়া। মাসি, জান তুমি কতই রঙ্গ।
এত ঠাট্টাও আছে তোর পেটে,
হাসতে হাসতে নাড়ী যায় ফেটে।
প্রথমা। কিন্তু যা বলো, আমাদের মাতা
নাই তাঁর মতো এত বড়ো দাতা।
ক্ষীরো। অর্থাৎ কিনা এত বড়ো হাবা
জন্ম দেয় নি আর কারো বাবা।
তৃতীয়া। সে কথা মিথ্যে নয় নিতান্ত।
দেখ্‌-না সেদিন কৃশী ও ক্ষান্ত
কী ঠকান্‌টাই ঠকালে মা গো!
আহা মাসি, তুমি সাধে কি রাগো!
আমাদেরই গায়ে হয় অসহ্য।
চতুর্থী। বুড়ো মহারাজা যে ঐশ্বর্য
রেখে গেছে সে কি এমনি ভাবে
পাঁচ ভূতে শুধু ঠকিয়ে খাবে।
প্রথমা। দেখলি তো ভাই, কানা আন্দি
কত টাকা পেলে।
তৃতীয়া। বুড়ি ঠানদি
জুড়ে দিলে তার কান্না অস্ত্র,
নিয়ে গেল কত শীতের বস্ত্র।
চতুর্থী। বুড়ি মাগী তার শীত কি এতই?
কাঁথা হলে চলে, নিয়ে গেল লুই।
আছে সেটা শেষে চোরের ভাগ্যে—
এ যে বাড়াবাড়ি।
প্রথমা। সে কথা যাগ্‌ গে।

চতুর্থী। না না, তাই বলি হও-নাকো দাতা—
তা বলে খাবে কি বুদ্ধির মাথা ?
যত রাজ্যের দুঃখী কাঙাল
যত উড়ে মেড়ো খোট্টা বাঙাল
কানা খোঁড়া নুলো যে আসে মরতে
বাচ-বিচার কি হবে না করতে ?

তৃতীয়া। দেখ্-না ভাই, সে গোপালের মাকে
দু টাকা দিলেই খেয়ে প'রে থাকে,
পাঁচ টাকা তার মাসে বরাদ্দ—
এ যে মিছিমিছি টাকার শ্রাদ্ধ।

চতুর্থী। আসল কথা কি, ভালো নয় থাকা
মেয়েমানুষের এতগুলো টাকা।

তৃতীয়া। কত লোকে কত করে যে রটনা—

প্রথমা। সেগুলো তো সব মিথ্যে ঘটনা।

চতুর্থী। সত্যি মিথ্যে দেব্‌তা জানে—
রটেছে তো কথা পাঁচের কানে,
সেটা যে ভালো না।

প্রথমা। যা বলিস ভাই,
এমন মানুষ ভূভারতে নাই।
ছোটো-বড়ো-বোধ নাইকো মনে,
মিষ্টি কথাটি সবার সনে।

ক্ষীরো। টাকা যদি পাই বাক্‌স ভরে
আমার গলাও গলাবে তোরে।
'বাপু' বললেই মিলবে স্বর্গ,
'বাছা' বললেই বলবি 'ধর্ গো'।
মনে ঠিক জেনো আসল মিষ্টি—
কথার সঙ্গে রুপোর বৃষ্টি।

চতুর্থী। তাও বলি, বাপু, এটা কিছু বেশি—
সবার সঙ্গে এত মেশামেশি।
বড়োলোক তুমি ভাগ্যিমন্ত,
সেইমত চাই চাল-চলন তো ?

তৃতীয়া। দেখলি সেদিন শশীর বাঁ গালে
আপনার হাতে ওষুধ লাগালে।

চতুর্থী। বিধু খোঁড়া সেটা নেহাত বাঁদর,
তারে কেন এত যত্ন আদর ?

তৃতীয়া। এত লোক আছে কেদারের মাকে
কেন বলো দেখি দিনরাত ডাকে।
গয়লাপাড়ার কেষ্টদাসী
তারি সাথে কত গল্প হাসি,
যেন সে কতই বন্ধু পুরোনো।

চতুর্থী। ওগুলো লোকের আদর কুড়োনো।

ক্ষীরো। এ সংসারের ওই তো প্রথা,
দেওয়া নেওয়া ছাড়া নেইকো কথা।
ভাত তুলে দেন মোদের মুখে,
নাম তুলে নেন পরম সুখে।
ভাত মুখে দিলে তখনি ফুরোয়,
নাম চিরদিন কর্ণ জুড়োয়।
চতুর্থী। ওই বউ নিয়ে ফিরে এল নেকী।

বধূসহ দ্বিতীয়ার প্রবেশ

প্রথমা। কী পেলি লো বিধু, দেখি দেখি দেখি।
দ্বিতীয়া। শুধু একজোড়া রতনচক্র।
তৃতীয়া। বিধি আজ তোরে বড়োই বক্র।
এত ঘটা করে নিয়ে গেল ডেকে,
ভেবেছিনু দেবে গয়না গা ঢেকে।
চতুর্থী। মেয়ের বিয়েতে পেয়ারী বুড়ি
পেয়েছিল হার, তা ছাড়া চুড়ি।
দ্বিতীয়া। আমি যে গরিব নই যথেষ্ট,
গরিবিয়ানায় সে মাগী শ্রেষ্ঠ।
অদৃষ্টে যার নেইকো গয়না
গরিব হয়ে সে গরিব হয় না।
চতুর্থী। বড়োমানুষের বিচার তো নেই।
কারেও বা তাঁর ধরে না মনেই,
কেউ বা তাঁহার মাথার ঠাকুর।
প্রথমা। টাকাটা সিকেটা কুমড়ো কাঁকুড়
যা পাই সে ভালো, কে দেয় তাই বা?
দ্বিতীয়া। অবিচারে দান দিলেন নাই বা।
মাথা বাঁধা রেখে পায়ের নীচে
ভরি-কত সোনা পেলেম মিছে।
ক্ষীরো। মা লক্ষ্মী যদি হতেন সদয়
দেখিয়ে দিতেম দান কারে কয়।
দ্বিতীয়া। আহা তাই হোক, লক্ষ্মীর বরে
তোর ঘরে যেন টাকা নাহি ধরে।
প্রথমা। ওলো থাম্ তোরা, রাখ্ বকুনি—
রানীর পায়ের শব্দ শুনি।

উচ্চৈঃস্বরে

চতুর্থী। আহা, জননীর অসীম দয়া,
ভগবতী যেন কমলালয়া।
দ্বিতীয়া। হেন নারী আর হয় নি সৃষ্টি,
সবা-'পরে তাঁর সমান দৃষ্টি।
তৃতীয়া। আহা মরি, তাঁরি হস্তে আসি
সার্থক হল অর্থরাশি।

কল্যাণীর প্রবেশ

কল্যাণী। রাত হল তবু কিসের কমিটি ?
ক্ষীরো। সবাই তোমার যশের জমিটি
নিড়োতেছিলেন, চষতেছিলেন,
মই দিয়ে কষে ঘষতেছিলেন,
আমি মাঝে মাঝে বীজ ছিটিয়ে
বুনেছি ফসল আশ মিটিয়ে।
কল্যাণী। রাত হল, আজ যাও সবে ঘরে।
এই ক'টি কথা রেখো মনে করে—
আশার অন্ত নাইকো বটে,
আর সকলেরই অন্ত ঘটে।
সবার মনের মতন ভিক্ষে
দিতে যদি হত, কল্পবৃক্ষে
ঘুণ ধরে যেত, আমি তো তুচ্ছ।
নিন্দে করলে যাব না মুচ্ছো,
তবু এ কথাটা ভেবে দেখো দিখি—
ভালো কথা বলা শক্ত বেশি কি ?

[প্রস্থান

চতুর্থী। কী বলছিলেম ছিল সেই খোঁজে।
ক্ষীরো। না গো না, তা নয়, এটুকু সে বোঝে—
সামনে তোমরা যেটুকু বাড়ালে
সেটুকু কমিয়ে আনবে আড়ালে।
উপকার যেন মধুর পাত্র
হজম করতে জ্বলে যে গাত্র,
তাই সাথে চাই ঝালের চাটনি
নিন্দে বান্দা কান্না কাটনি।
যার খেয়ে মশা ওঠেন ফুলে
জ্বালান তারেই গোপন হুলে।
দেবতারে নিয়ে বানাবে দত্যি
কলিকাল তবে হবে তো সত্যি।
চতুর্থী। মিথ্যে না ভাই। সামলে চলিস।
যাই মুখে আসে তাই যে বলিস।
পালন যে করে সে হল মা বাপ,
তাহারই নিন্দে সে যে মহাপাপ।
এমন লক্ষ্মী এমন সতী
কোথা আছে হেন পুণ্যবতী।
যেমন ধনের কপাল মস্ত
তেমনি দানের দরাজ হস্ত,
যেমন রূপসী তেমনি সাধ্বী,
খুঁত ধরে তাঁর কাহার সাধ্যি।

দিস নেকো দোষ তাঁহার নামে।
তৃতীয়া। তুমি থামলে যে অনেক থামে।
দ্বিতীয়া। আহা, কোথা হতে এলেন গুরু।
হিতকথা আর কোরো না শুরু।
হঠাৎ ধর্মকথার পাঠটা
তোমার মুখে যে শোনায় ঠাট্টা।
ক্ষীরো। ধর্মও রাখো, ঝগড়াও থাক্,
গলা ছেড়ে আর বাজিয়ো না ঢাক।
পেট ভরে খেলে, করলে নিন্দে,
বাড়ি ফিরে গিয়ে ভজো গোবিন্দে।

[প্রতিবেশিনীগণের প্রস্থান

ওরে বিনি, ওরে কিনি, ওরে কাশী!

বিনি কিনি কাশীর প্রবেশ

কাশী। কেন দিদি।
কিনি। কেন খুড়ি।
বিনি। কেন মাসি।
ক্ষীরো। ওরে, খাবি আয়।
বিনি। কিছু নেই খিধে।
ক্ষীরো। খেয়ে নিতে হয় পেলেই সুবিধে।
কিনি। রসকরা খেয়ে পেট বড়ো ভার।
ক্ষীরো। বেশি কিছু নয়, শুধু গোটা চার
ভোলা ময়রার চন্দ্রপুলি
দেখ্ দেখি ওই ঢাকনা খুলি—
তাই মুখে দিয়ে, দু-বাটিখানিক
দুধ খেয়ে শোও লক্ষ্মী মানিক।
কাশী। কত খাব, দিদি, সমস্ত দিন।
ক্ষীরো। খাবার তো নয় খিদের অধীন।
পেটের জ্বালায় কত লোকে ছোটে,
খাবার কি তার মুখে এসে জোটে?
দুঃখী গরিব কাঙাল ফতুর
চাষাভুষো মুটে অনাথ অতুর
কারো তো খিদের অভাব হয় না,
চন্দ্রপুলিটা সবার রয় না।
মনে রেখে দিস যেটার যা দর—
খাবার চাইতে খিদের আদর!
হাঁ রে বিনি, তোর চিরুনি রুপোর
দেখছি নে কেন খোঁপার উপর?
বিনি। সেটা ও পাড়ার খেতুর মেয়ে
কেঁদেকেটে কাল নিয়েছে চেয়ে।

ক্ষীরো। ওই রে, হয়েছে মাথাটি খাওয়া।
তোমারও লেগেছে দাতার হাওয়া।
বিনি। আহা, কিছু তার নেই যে মাসি।
ক্ষীরো। তোমারই কি এত টাকার রাশি।
গরিব লোকের দয়ামায়া রোগ
সেটা যে একটা ভারি দুর্যোগ।
না না, যাও তুমি মায়ের বাড়িতে—
হেথাকার হাওয়া সবে না নাড়ীতে।
রানী যত দেয় ফুরোয় না, তাই
দান করে তার কোনো ক্ষতি নাই!
তুই যেটা দিলি রইল না তোর,
এতেও মনটা হয় না কাতর?
ওরে বোকা মেয়ে, আমি আরো তোরে
আনিয়ে নিলেম এই মনে ক'রে
কী করে কুড়োতে হইবে ভিক্ষে
মোর কাছে তাই করবি শিক্ষে।
কে জানত তুই পেট না ভরতে
উল্‌টো বিদ্যে শিখবি মরতে?—
দুধ যে রইল বাটির তলায়
ওইটুকু বুঝি গলে না গলায়?
আমি মরে গেলে যত মনে আশ
কোরো দান ধ্যান আর উপবাস।
যতদিন আমি রয়েছি বর্তে
দেব না করতে আত্মহত্যে।—
খাওয়া দাওয়া হল, এখন তবে
রাত হল ঢের শোও গে সবে।

[কিনি বিনি ক্ষীরীর প্রস্থান

কল্যাণীর প্রবেশ

ওগো দিদি, আমি বাঁচি নে তো আর।
কল্যাণী। সেটা বিশ্বাস হয় না আমার।
তবু, কী হয়েছে শুনি ব্যাপারটা।
ক্ষীরো। মাইরি দিদি, এ নয়কো ঠাট্টা।
দেশ থেকে চিঠি পেয়েছি মামার
বাঁচে কি না-বাঁচে খুড়িটি আমার—
শক্ত অসুখ হয়েছে এবার,
টাকাকড়ি নেই ওষুধ দেবার।
কল্যাণী। এখনো বছর হয় নি গত,
খুড়ির শ্রাদ্ধে নিলি যে কত।
ক্ষীরো। হাঁ হাঁ, বটে বটে, মরেছে বেটী,
খুড়ি গেছে তবু আছে তো জেঠি।

আহা রানীদিদি, ধন্য তোরে,
এত রেখেছিস স্মরণ করে ।
এমন বুদ্ধি আর কি আছে,
এড়ায় না কিছু তোমার কাছে ।
ফাঁকি দিয়ে খুড়ি বাঁচবে আবার
সাধ্য কি আছে সে তার বাবার ?
কিন্তু কখনো আমার সে জেঠি
মরে নি পূর্বে মনে রেখো সেটি ।

কল্যাণী । মরেও নি বটে, জন্মে নি কভু ।

ক্ষীরো । এমন বুদ্ধি দিদি তোর, তবু
সে বুদ্ধিখানি কেবলই খেলায়
অনুগত এই আমারই বেলায় ?

কল্যাণী । চেয়ে নিতে তোর মুখে ফোটে কাঁটা !
না বললে নয় মিথ্যে কথাটা ?
ধরা পড় তবু হও না জব্দ ?

ক্ষীরো । 'দাও দাও' ও তো একটা শব্দ,
ওটা কি নিত্যি শোনায় মিষ্টি ?
মাঝে মাঝে তাই নতুন সৃষ্টি
করতেই হয় খুড়ি-জেঠিমার ।
জান তো সকলি তবে কেন আর
লজ্জা দেওয়া ?

কল্যাণী । অমনি চেয়ে কি
পাস নি কখনো তাই বল্ দেখি ?

ক্ষীরো । মরা পাখিরেও শিকার ক'রে
তবে তো বিড়াল মুখেতে পোরে ।
সহজেই পাই, তবু দিয়ে ফাঁকি
স্বভাবটাকে যে শান দিয়ে রাখি ।
বিনা প্রয়োজনে খাটাও যাকে
প্রয়োজনকালে ঠিক সে থাকে ।
সত্যি বলছি মিথ্যে কথায়
তোমারও কাছেতে ফল পাওয়া যায় ।

কল্যাণী । এবার পাবে না ।

ক্ষীরো । আচ্ছা, বেশ তো,
সেজন্যে আমি নইকো ব্যস্ত ।
আজ না হয় তো কাল তো হবে,
ততখন মোর সবুর সবে ।
গা ছুঁয়ে কিন্তু বলছি তোমার
খুড়িটার কথা তুলব না আর ।

[কল্যাণীর হাসিয়া প্রস্থান

হরি বলো মন ! পরের কাছে
আদায় করার সুখও আছে,

দুঃখও ঢের। হে মা লক্ষ্মীটি,
তোমার বাহন পেঁচা পক্ষীটি
এত ভালোবাসে এ বাড়ির হাওয়া,
এত কাছাকাছি করে আসা-যাওয়া,
ভুলে কোনোদিন আমার পানে
তোমারে যদি সে বহিয়া আনে
মাথায় তাহার পরাই সিঁদুর,
জলপান দিই আশিটা ইঁদুর,
খেয়ে দেয়ে শেষে পেটের ভারে
পড়ে থাকে বেটা আমারই দ্বারে—
সোনা দিয়ে ডানা বাঁধাই, তবে
ওড়বার পথ বন্ধ হবে।

লক্ষ্মীর আবির্ভাব

কে আবার রাতে এসেছ জ্বালাতে,
দেশ ছেড়ে শেষে হবে কি পালাতে ?
আর তো পারি নে।

লক্ষ্মী। পালাব তবে কি ?
যেতে হবে দূরে।

ক্ষীরো। রোসো রোসো দেখি।
কী পরেছ ওটা মাথার ওপর,
দেখাচ্ছে যেন হীরের টোপর।
হাতে কী রয়েছে সোনার বাক্সে
দেখতে পারি কি ? আচ্ছা, থাক্ সে।
এত হীরে সোনা কারো তো হয় না—
ওগুলো তো নয় গিল্‌টি গয়না ?
এগুলি তো সব সাঁচ্চা পাথর ?
গায়ে কী মেখেছ, কিসের আতর ?
ভুর্ ভুর্ করে পদ্মগন্ধ—
মনে কত কথা হতেছে সন্ধ।
বোসো বাছা, কেন এলে এত রাতে ?
আমারে তো কেউ আস নি ঠকাতে ?
যদি এসে থাকো ক্ষীরিকে তা হলে
চিনতে পার নি সেটা রাখি ব'লে।
নাম কী তোমার বলো দেখি খাঁটি।
মাথা খাও, বোলো সত্য কথাটি।

লক্ষ্মী। একটা তো নয়, অনেক যে নাম।

ক্ষীরো। হাঁ হাঁ, থাকে বটে স্বনাম বেনাম
ব্যাবসা যাদের ছলনা করা।
কখনো কোথাও পড় নি ধরা ?

লক্ষ্মী। ধরা পড়ি বটে দুই দশ দিন,
বাঁধন কাটিয়ে আবার স্বাধীন।
ক্ষীরো। হেঁয়ালিটা ছেড়ে কথা কও সিধে—
অমন করলে হবে না সুবিধে।
নামটি তোমার বলো অকপটে।
লক্ষ্মী। লক্ষ্মী।
ক্ষীরো। তেমনি চেহারাও বটে।
লক্ষ্মী তো আছে অনেকগুলি,
তুমি কোথাকার বলো তো খুলি।
লক্ষ্মী। সত্যি লক্ষ্মী একের অধিক
নাই ত্রিভুবনে।
ক্ষীরো। ঠিক ঠিক ঠিক।
তাই বলো মা গো, তুমিই কি তিনি ?
আলাপ তো নেই, চিনতে পারি নি।
চিনতেম যদি চরণ-জোড়া
কপাল হত কি এমন পোড়া ?
এসো, বোসো, ঘর করো'সে আলো।
পেঁচা দাদা মোর আছে তো ভালো ?
এসেছ যখন, তখন মাতঃ,
তাড়াতাড়ি যেতে পারবে না তো।
জোগাড় করছি চরণ-সেবার ;
সহজ হস্তে পড় নি এবার।
সেয়ানা লোকেরে কর না মায়া
কেন যে জানি তা বিষ্ণুজায়া।
না খেয়ে মরে না বুদ্ধি থাকলে,
বোকারই বিপদ তুমি না রাখলে।
লক্ষ্মী। প্রতারণা ক'রে পেটটি ভরাও,
ধর্মেরে তুমি কিছু না ডরাও ?
ক্ষীরো। বুদ্ধি দেখলে এগোও না গো,
তোর দয়া নেই কাজেই মা গো।
বুদ্ধিমানেরা পেটের দায়
লক্ষ্মীমানেরে ঠকিয়ে খায়।
লক্ষ্মী। সরল বুদ্ধি আমার প্রিয়,
বাঁকা বুদ্ধিরে ধিক্ জানিয়ো।
ক্ষীরো। ভালো তলোয়ার যেমন বাঁকা
তেমনি বক্র বুদ্ধি পাকা।
ও জিনিস বেশি সরল হলে
নির্বুদ্ধি তো তারেই বলে।
ভালো মা গো, তুমি দয়া করো যদি
বোকা হয়ে আমি রব নিরবধি।
লক্ষ্মী। কল্যাণী তোর অমন প্রভু

তারেও, দস্যু, ঠকাও তবু।
ক্ষীরো। অদৃষ্টে শেষে এই ছিল মোর—
যার লাগি চুরি সেই বলে চোর।
ঠকাতে হয় যে কপাল-দোষে
তোরে ভালোবাসি বলেই তো সে।
আর ঠকাব না, আরামে ঘুমিয়ো—
আমারে ঠকিয়ে যেয়ো না তুমিও।
লক্ষ্মী। স্বভাব তোমার বড়োই রুক্ষ্ম।
ক্ষীরো। তাহার কারণ আমি যে দুঃখী।
তুমি যদি কর রসের বৃষ্টি
স্বভাবটা হবে আপনি মিষ্টি।
লক্ষ্মী। তোরে যদি আমি করি আশ্রয়
যশ পাব কি না সন্দেহ হয়।
ক্ষীরো। যশ না পাও তো কিসের কড়ি?
তবে তো আমার গলায় দড়ি।
দশের মুখেতে দিলেই অন্ন
দশ মুখে উঠে ধন্য ধন্য।
লক্ষ্মী। প্রাণ ধরে দিতে পারবি ভিক্ষে?
ক্ষীরো। একবার তুমি করো পরীক্ষে।
পেট ভ'রে গেলে যা থাকে বাকি
সেটা দিয়ে দিতে শক্তটা কী।
দানের গরবে যিনি গরবিনী
তিনি হোন আমি, আমি হই তিনি,
দেখবে তখন তাঁহার চালটা—
আমারই বা কত উল্‌টো-পাল্‌টা।
দাসী আছি, জানি দাসীর যা রীতি—
রানী করো, পাব রানীর প্রকৃতি।
তাঁরও যদি হয় মোর অবস্থা
সুযশ হবে না এমন সস্তা।
তাঁর দয়াটুকু পাবে না অন্যে,
ব্যয় হবে সেটা নিজেরই জন্যে।
কথার মধ্যে মিষ্টি অংশ
অনেকখানিই হবেক ধ্বংস।
দিতে গেলে কড়ি কভু না সরবে—
হাতের তেলোয় কামড়ে ধরবে।
ভিক্ষে করতে, ধরতে দু পায়
নিত্যি নতুন উঠবে উপায়।
লক্ষ্মী। তথাস্তু, রানী করে দিনু তোকে—
দাসী ছিলি তুই ভুলে যাবে লোকে।
কিন্তু সদাই থেকো সাবধান,
আমার যেন না হয় অপমান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রানীবেশে ক্ষীরো
ও তাহার পারিষদবর্গ

ক্ষীরো। বিনি!
বিনি। কেন মাসি।
ক্ষীরো। মাসি কী রে মেয়ে!
দেখি নি তো আমি বোকা তোর চেয়ে।
কাঙাল ভিখিরি কলু মালী চাষি
তারাই মাসিরে বলে শুধু মাসি।
রানীর বোনঝি হয়েছ ভাগ্যে,
জান না আদব! মালতী!
মালতী। আজ্ঞে।
ক্ষীরো। রানীর বোনঝি রানীরে কী ডাকে
শিখিয়ে দে ওই বোকা মেয়েটাকে।
মালতী। ছি ছি, শুধু মাসি বলে কি রানীকে?
রানীমাসি বলে রেখে দিয়ো শিখে।
ক্ষীরো। মনে থাকবে তো? কোথা গেল কাশী।
কাশী। কেন রানীদিদি।
ক্ষীরো। চার-চার দাসী
নেই যে সঙ্গে?
কাশী। এত লোক মিছে
কেন দিনরাত লেগে থাকে পিছে?
ক্ষীরো। মালতী!
মালতী। আজ্ঞে।
ক্ষীরো। এই মেয়েটাকে
শিখিয়ে দে কেন এত দাসী থাকে।
মালতী। তোমরা তো নও জেলেনী তাঁতিনী,
তোমরা হও যে রানীর নাত্নী।
যে নবাববাড়ি এনু আমি ত্যেজি
সেথা বেগমের ছিল পোষা বেজি,
তাহারি একটা ছোটো বাচ্ছার
পিছনেতে ছিল দাসী চার-চার,
তা ছাড়া সেপাই।
ক্ষীরো। শুনলি তো কাশী?
কাশী। শুনেছি।
ক্ষীরো। তা হলে ডাক্ তোর দাসী।
কিনি পোড়ামুখী!
কিনি। কেন রানীখুড়ি?

ক্ষীরো। হাই তুললেম, দিলি নে যে তুড়ি!
মালতী!
মালতী। আজ্ঞে।
ক্ষীরো। শেখাও কায়দা।
মালতী। এত বলি তবু হয় না ফায়দা।
বেগমসাহেব যখন হাঁচেন
তুড়ি ভুল হলে কেহ না বাঁচেন।
তখনি শূলেতে চড়িয়ে তারে
নাকে কাঠি দিয়ে হাঁচিয়ে মারে।
ক্ষীরো। সোনার বাটায় পান দে তারিণী।
কোথা গেল মোর চামরধারিণী?
তারিণী। চলে গেছে ছুঁড়ি, সে বলে মাইনে
চেয়ে চেয়ে তবু কিছুতে পাই নে।
ক্ষীরো। ছোটোলোক বেটী হারামজাদী
রানীর ঘরে সে হয়েছে বাঁদি,
তবু মনে তার নেই সন্তোষ—
মাইনে পায় না ব'লে দেয় দোষ!
পিঁপড়ের পাখা কেবল মরতে।
মালতী!
মালতী। আজ্ঞে।
ক্ষীরো। মাগীরে ধরতে
পাঠাও আমার ছ-ছয় পেয়াদা,
না না, যাবে আরো দুজন জেয়াদা।
কী বল মালতী।
মালতী। দস্তুর তাই।
ক্ষীরো। হাতকড়ি দিয়ে বেঁধে আনা চাই।
তারিণী। ও পাড়ার মতি রানীমাতাজির
চরণ দেখতে হয়েছে হাজির।
ক্ষীরো। মালতী!
মালতী। আজ্ঞে।
ক্ষীরো। নবাবের ঘরে
কোন্ কায়দায় লোকে দেখা করে?
মালতী। কুর্নিশ করে ঢোকে মাথা নুয়ে,
পিছু হটে যায় মাটি ছুঁয়ে ছুঁয়ে।
ক্ষীরো। নিয়ে এসো সাথে, যাও তো মালতী,
কুর্নিশ করে আসে যেন মতি।

মতিকে লইয়া মালতীর পুনঃপ্রবেশ

মালতী। মাথা নিচু করো। মাটি ছোঁও হাতে,
লাগাও হাতটা নাকের ডগাতে।
তিন পা এগোও, নিচু করো মাথা।

মতি। আর তো পারি নে, ঘাড়ে হল ব্যথা।
মালতী। তিন বার নাকে লাগাও হাতটা।
মতি। টন্ টন্ করে পিঠের বাতটা।
মালতী। তিন পা এগোও, তিন বার ফের্
ধুলো তুলে নেও ডগায় নাকের।
মতি। ঘাট হয়েছিল এসেছি এ পথ,
এর চেয়ে সিধে নাকে দেওয়া খত।
জয় রানীমার, একাদশী আজি।
ক্ষীরো। রানীর জ্যোতিষী শুনিয়েছে পাঁজি।
কবে একাদশী, কবে কোন্ বার
লোক আছে মোর তিথি গোনবার।
মতি। টাকাটা সিকেটা যদি কিছু পাই
জয় জয় বলে বাড়ি চলে যাই।
ক্ষীরো। যদি না'ই পাও তবু যেতে হবে—
কুর্নিশ করে চলে যাও তবে।
মতি। ঘড়া ঘড়া টাকা ঘরে গড়াগড়ি,
তবু কড়াকড় দিতে কড়াকড়ি!
ক্ষীরো। ঘরের জিনিস ঘরেরই ঘড়ায়
চিরদিন যেন ঘরেই গড়ায়।
মালতী!
মালতী। আজ্ঞে।
ক্ষীরো। এবার মাগীরে
কুর্নিশ করে নিয়ে যাও ফিরে।
মতি। চললেম তবে।
মালতী। রোসো, ফিরো নাকো,
তিন বার মাটি তুলে নাকে মাখো।
তিন পা কেবল হটে যাও পিছু,
পোড়ো না উল্‌টে, মাথা করো নিচু।
মতি। হায়, কোথা এনু, ভরল না পেট—
বারে বারে শুধু মাথা হল হেঁট।
আহা, কল্যাণী রানীর ঘরে
কর্ণ জুড়োয় মধুর স্বরে—
কড়ি যদি দেন অমূল্য তাই—
হেথা হীরে মোতি সেও অতি ছাই।
ক্ষীরো। সে ছাই পাবার ভরসা কোরো না।
মালতী। সাবধানে হঠো, উল্‌টে পোড়ো না।

[মতির প্রস্থান

ক্ষীরো। বিনি!
বিনি। রানীমাসি!
ক্ষীরো। একগাছি চুড়ি
হাত থেকে তোর গেছে নাকি চুরি।

বিনি। চুরি তো যায় নি।
ক্ষীরো। গিয়েছে হারিয়ে ?
বিনি। হারায় নি।
ক্ষীরো। কেউ নিয়েছে ভাঁড়িয়ে ?
বিনি। না গো রানীমাসি !
ক্ষীরো। এটা তো মানিস
পাখা নেই তার। একটা জিনিস
হয় চুরি যায়, নয় তো হারায়,
নয় মারা যায় ঠগের দ্বারায়,
তা না হলে থাকে— এ ছাড়া তাহার
কী যে হতে পারে জানি নে তো আর
বিনি। দান করেছি সে !
ক্ষীরো। দিয়েছিস দানে ?
ঠকিয়েছে কেউ, তারই হল মানে।
কে নিয়েছে বল্।
বিনি। মল্লিকা দাসী।
এমন গরিব নেই রানীমাসি !
ঘরে আছে তার সাত ছেলে মেয়ে,
মাস পাঁচ-ছয় মাইনে না পেয়ে
খরচপত্র পাঠাতে পারে না—
দিনে দিনে তার বেড়ে যায় দেনা,
কেঁদে কেঁদে মরে— তাই চুড়িগাছি
নুকিয়ে তাহারে দান করিয়াছি।
অনেক তো চুড়ি আছে মোর হাতে,
একখানা গেলে কী হবে তাহাতে।
ক্ষীরো। বোকা মেয়েটার শোনো ব্যাখ্যানা।
একখানা গেলে গেল একখানা,
সে যে একেবারে ভারি নিশ্চয়।
কে না জানে যেটা রাখ সেটা রয়,
যেটা দিয়ে ফেল সেটা তো রয় না—
এর চেয়ে কথা সহজ হয় না।
অল্পস্বল্প যাদের আছে
দানে যশ পায় লোকের কাছে—
ধনীর দানেতে ফল নাহি ফলে,
যত দেও তত পেট বেড়ে চলে—
কিছুতে ভরে না লোকের স্বার্থ,
ভাবে 'আরো ঢের দিতে যে পারত'।
অতএব বাছা, হবি সাবধান,
বেশি আছে বলে করিস নে দান।
মালতী !
মালতী। আজ্ঞে।

ক্ষীরো। বোকা মেয়েটি এ,
এরে দুটো কথা দাও সমঝিয়ে।
মালতী। রানীর বোনঝি রানীর অংশ,
তফাতে থাকবে উচ্চ বংশ ;
দান করা-টরা যত হয় বেশি
গরিবের সাথে তত ঘেঁষাঘেঁষি।
পুরোনো শাস্ত্রে লিখেছে শোলোক,
গরিবের মতো নেই ছোটোলোক।
ক্ষীরো। মালতী !
মালতী। আজ্ঞে।
ক্ষীরো। মল্লিকাটারে
আর তো রাখা না।
মালতী। তাড়াব তাহারে।
ছেলেমেয়েদের দয়ার চর্চা
বেড়ে গেলে সাথে বাড়বে খরচা।
ক্ষীরো। তাড়াবার বেলা হয়ে আনমনা
বালাটা-সুদ্ধ যেন তাড়িয়ো না।—
বাহিরের পথে কে বাজায় বাঁশি
দেখে আয় মোর ছয়-ছয় দাসী।

তারিণীর প্রস্থান ও পুনঃপ্রবেশ

তারিণী। মধুদত্তর পৌত্রের বিয়ে,
ধুম করে তাই চলে পথ দিয়ে।
ক্ষীরো। রানীর বাড়ির সামনের পথে
বাজিয়ে যাচ্ছে কী নিয়ম-মতে।
বাঁশির বাজনা রানী কি সইবে !
মাথা ধ'রে যদি থাকত দৈবে ?
যদি ঘুমোতেন, কাঁচা ঘুমে জেগে
অসুখ করত যদি রেগেমেগে ?
মালতী !
মালতী। আজ্ঞে।
ক্ষীরো। নবাবের ঘরে
এমন কাণ্ড ঘটলে কী করে।
মালতী। যার বিয়ে যায় তারে ধরে আনে,
দুই বাঁশিওয়ালা তার দুই কানে
কেবলই বাজায় দুটো-দুটো বাঁশি ;
তিন দিন পরে দেয় তারে ফাঁসি।
ক্ষীরো। ডেকে দাও কোথা আছে সর্দার,
নিয়ে যাক দশ জুতোবর্দার—
ফি লোকের পিঠে দশ ঘা চাবুক
সপাসপ বেগে সজোরে নাবুক।

মালতী । তবু যদি কারো চেতনা না হয়,
বন্দুক দিলে হবে নিশ্চয় ।
প্রথমা । ফাঁসি হল মাপ, বড়ো গেল বেঁচে,
জয় জয় ব'লে বাড়ি যাবে নেচে ।
দ্বিতীয়া । প্রসন্ন ছিল তাদের গ্রহ,
চাবুক ক' ঘা তো অনুগ্রহ ।
তৃতীয়া । বলিস কী ভাই, ফাঁড়া গেল কেটে—
আহা, এত দয়া রানীমার পেটে ।
ক্ষীরো । থাম তোরা, শুনে নিজ গুণগান
লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে কান ।
বিনি !
বিনি । রানীমাসি !
ক্ষীরো । স্থির হয়ে রবি,
ছট্‌ফট্‌ করা বড়ো বে-আদবি ।
মালতী !
মালতী । আজ্ঞে ।
ক্ষীরো । মেয়েরা এখনো
শেখে নি আমিরি দস্তুর কোনো ।
বিনির প্রতি
মালতী । রানীর ঘরের ছেলেমেয়েদের
ছট্‌ফট্‌ করা ভারি নিন্দের ।
ইতর লোকেরই ছেলেমেয়েগুলো
হেসেখুশে ছুটে করে খেলাধুলো ।
রাজারানীদের পুত্রকন্যে
অধীর হয় না কিছুরই জন্যে !
হাত-পা সামলে খাড়া হয়ে থাকো,
রানীর সামনে নোড়ো-চোড়ো নাকো ।
ক্ষীরো । ফের গোলমাল করছে কাহারা ?
দরজায় মোর নাই কি পাহারা ?
তারিণী । প্রজারা এসেছে নালিশ করতে ।
ক্ষীরো । আর কি জায়গা ছিল না মরতে !
মালতী । প্রজার নালিশ শুনবে রাজ্ঞী
ছোটোলোকদের এত কি ভাগ্যি !
প্রথমা । তাই যদি হবে তবে অগণ্য
নোকর চাকর কিসের জন্য ।
দ্বিতীয়া । নিজের রাজ্যে রাখতে দৃষ্টি
রাজারানীদের হয় নি সৃষ্টি ।
তারিণী । প্রজারা বলছে, কর্মচারী
পীড়ন তাদের করছে ভারি ।
নাই দয়া মায়া, নাইকো ধর্ম,
বেচে নিতে চায় গায়ের চর্ম ।

বলে তারা, 'হায়, কী করেছি পাপ,
এত ছোটো মোরা, এত বড়ো চাপ !'

ক্ষীরো। সর্ষেও ছোটো তবু সে ভোগায়,
চাপ না পেলে কি তৈল জোগায়।
টাকা জিনিসটা নয় পাকা ফল,
টুপ করে খ'সে ভরে না আঁচল,
ছিঁড়ে নাড়া দিয়ে ঠেঙার বাড়িতে
তবে ও জিনিস হয় যে পাড়িতে।

তারিণী। সেজন্যে না মা— তোমার খাজনা
বঞ্চনা করা তাদের কাজ না।
তারা বলে, যত আমলা তোমার
মাইনে না পেয়ে হয়েছে গোঁয়ার।
লুটপাট করে মারছে প্রজা,
মাইনে পেলেই থাকবে সোজা।

ক্ষীরো। রানী বটি, তবু নইকো বোকা,
পারবে না দিতে মিথ্যে ধোঁকা।
করবেই তারা দস্যুবৃত্তি,
মাইনেটা দেওয়া মিথ্যেমিথ্যি।
প্রজাদের ঘরে ডাকাতি করে,
তা বলে করবে রানীরও ঘরে ?

তারিণী। তারা বলে রানী কল্যাণী যে
নিজের রাজ্য দেখেন নিজে।
নালিশ শোনেন নিজের কানেই,
প্রজাদের 'পরে জুলুমটা নেই।

ক্ষীরো। ছোটোমুখে বলে বড়ো কথাগুলা,
আমার সঙ্গে অন্যের তুলা ?
মালতী !

মালতী। আজ্ঞে।

ক্ষীরো। কী কর্তব্য।

মালতী। জরিমানা দিক যত অসভ্য
এক-শো এক-শো।

ক্ষীরো। গরিব ওরা যে,
তাই একেবারে এক-শো'র মাঝে
নব্বই টাকা করে দিনু মাপ।

প্রথমা। আহা, গরিবের তুমিই মা বাপ।

দ্বিতীয়া। কার মুখ দেখে উঠেছিল প্রাতে,
নব্বই টাকা পেল হাতে হাতে।

তৃতীয়া। নব্বই কেন, যদি ভেবে দেখে—
আরো ঢের টাকা নিয়ে গেল ট্যাকে।
হাজার টাকার ন-শো নব্বই
চোখের পলকে পেল সর্বই।

চতুর্থী। এক দমে ভাই এত দিয়ে ফেলা
অন্যে কে পারে, এ তো নয় খেলা।
ক্ষীরো। বলিস নে আর মুখের আগে,
নিজগুণ শুনে শরম লাগে।
বিনি!
বিনি। রানীমাসী!
ক্ষীরো। হঠাৎ কী হল।
ফোঁস ফোঁস করে কাঁদিস কেন লো।
দিনরাত আমি বকে বকে খুন,
শিখলি নে কিছু কায়দা-কানুন?
মালতী!
মালতী। আজ্ঞে।
ক্ষীরো। ঐই মেয়েটাকে
শিক্ষা না দিলে মান নাহি থাকে।
মালতী। রানীর বোনঝি জগতে মান্য,
বোঝ না এ কথা অতি সামান্য।
সাধারণ যত ইতর লোকেই
সুখে হাসে, কাঁদে দুঃখশোকেই।
তোমাদেরও যদি তেমনি হবে,
বড়োলোক হয়ে হল কী তবে।

একজন দাসীর প্রবেশ

দাসী। মাইনে না পেলে মিথ্যে চাকরি।
বাঁধা দিয়ে এনু কানের মাকড়ি—
ধার করে খেয়ে পরের গোলামি
এমন কখনো শুনি নি তো আমি।
মাইনে চুকিয়ে দাও, তা না হলে
ছুটি দাও, আমি ঘরে যাই চলে।
ক্ষীরো। মাইনে চুকোনো নয়কো মন্দ,
তবু ছুটিটাই মোর পছন্দ।
বড়ো ঝঞ্ঝাট মাইনে বাঁটতে,
হিসেব-কিতেব হয় যে ঘাঁটতে।
ছুটি দেওয়া যায় অতি সত্বর,
খুলতে হয় না খাতাপত্তর—
ছ-ছয় পেয়াদা ধরে আসি কেশ,
নিমেষ ফেলতে কর্ম নিকেশ।
মালতী!
মালতী। আজ্ঞে।
ক্ষীরো। সাথে যাও ওর,
ঝেড়ে ঝুড়ে নিয়ো কাপড়চোপড়—

ছুটি দেয় যেন দরোয়ান যত
হিন্দুস্থানি দস্তুরমত।

মালতী। বুঝেছি রানীজি!

ক্ষীরো। আচ্ছা, তা হলে
কুর্নিশ করে যাক বেটী চলে।

[কুর্নিশ করাইয়া দাসীকে বিদায়

দাসী। দুয়ারে রানীমা দাঁড়িয়ে আছে কে,
বড়োলোকের ঝি মনে হয় দেখে।

ক্ষীরো। এসেছে কি হাতি কিম্বা রথে?

দাসী। মনে হল যেন হেঁটে এল পথে।

ক্ষীরো। কোথা তবে তার বড়োলোকত্ব?

দাসী। রানীর মতন মুখটি সত্য।

ক্ষীরো। মুখে বড়োলোক লেখা নাহি থাকে,
গাড়িঘোড়া দেখে চেনা যায় তাকে।

মালতীর প্রবেশ

মালতী। রানী কল্যাণী এসেছেন দ্বারে
রানীজির সাথে দেখা করিবারে।

ক্ষীরো। হেঁটে এসেছেন?

মালতী। শুনছি তাই তো।

ক্ষীরো। তা হলে হেথায় উপায় নাই তো।
সমান আসন কে তাহারে দেয়।
নিচু আসনটা, সে'ও অন্যায়।
এ এক বিষম হল সমিস্যে,
মীমাংসা এর কে করে বিশ্বে?

প্রথমা। মাঝখানে রেখে রানীজির গদি
তাহার আসন দূরে রাখি যদি?

দ্বিতীয়া। ঘুরায়ে যদি এ আসনখানি
পিছন ফিরিয়া বসেন রানী?

তৃতীয়া। যদি বলা যায় 'ফিরে যাও আজ—
ভালো নেই আজ রানীর মেজাজ'?

ক্ষীরো। মালতী!

মালতী। আজ্ঞে।

ক্ষীরো। কী করি উপায়।

মালতী। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যদি সারা যায়
দেখাশোনা, তবে সব গোল মেটে।

ক্ষীরো। এত বুদ্ধিও আছে তোর পেটে।
সেই ভালো। আগে দাঁড়া সার বাঁধি
আমার এক-শো পঁচিশটে বাঁদি।
ও হল না ঠিক— পাঁচ-পাঁচ করে
দাঁড়া ভাগে ভাগে— তোরা আয় সরে—

না না, এই দিকে— না না, কাজ নেই,
সারি সারি তোরা দাঁড়া সামনেই—
না না, তা হলে যে মুখ যাবে ঢেকে।
কোনাকুনি তোরা দাঁড়া দেখি বেঁকে।
আচ্ছা, তা হলে ধরে হাতে হাতে
খাড়া থাক্ তোরা একটু তফাতে।
শশী, তুই সাজ্ ছত্রধারিণী,
চামরটা নিয়ে দোলাও তারিণী।
মালতী!

মালতী। আজ্ঞে।

ক্ষীরো। এইবার তারে
ডেকে নিয়ে আয় মোর দরবারে।

[মালতীর প্রস্থান

কিনি বিনি কাশী স্থির হয়ে থাকো—
খবর্দার, কেউ নোড়ো-চোড়ো নাকো।
মোর দুই পাশে দাঁড়াও সকলে
দুই ভাগ করি।

কল্যাণী ও মালতীর প্রবেশ

কল্যাণী। আছ তো কুশলে?

ক্ষীরো। আমার চেষ্টা কুশলেই থাকি,
পরের চেষ্টা দেবে মোরে ফাঁকি,
এই ভাবে চলে জগৎ-সুদ্ধ
নিজের সঙ্গে পরের যুদ্ধ।

কল্যাণী। ভালো আছ বিনি?

বিনি। ভালোই আছি মা,
ম্লান কেন দেখি সোনার প্রতিমা!

ক্ষীরো। বিনি, করিস নে মিছে গোলযোগ,
ঘুচল না তোর কথা-কওয়া রোগ?

কল্যাণী। রানী, যদি কিছু না কর মনে,
কথা আছে কিছু— কব গোপনে।

ক্ষীরো। আর কোথা যাব, গোপন এই তো—
তুমি আমি ছাড়া কেহই নেই তো।
এরা সব দাসী, কাজ নেই কিছু—
রানীর সঙ্গে ফেরে পিছু-পিছু।
হেথা হতে যদি করে দিই দূর
হবে না তো সেটা ঠিক দস্তুর;
কী বল মালতী!

মালতী। আজ্ঞে, তাই তো,
দস্তুরমত চলাই চাই তো।

ক্ষীরো। সোনার বাটাটা কোথায় কে জানে।
খুঁজে দেখ্ দেখি।

দাসী। এই-যে এখানে।

ক্ষীরো। ওটা নয়, সেই মুক্তো-বসানো
আরেকটা আছে, সেইটেই আনো।

অন্য বাটা আনয়ন

খয়েরের দাগ লেগেছে ডালায়,
বাঁচি নে তো আর তোদের জ্বালায়।
তবে নিয়ে আয় চুনীর সে বাটা—
না না, নিয়ে আয় পান্না-দেওয়াটা।

কল্যাণী। কথাটা আমার নিই তবে বলে।
পাঠান বাদশা অন্যায় ছলে
রাজ্য আমার নিয়েছেন কেড়ে—

ক্ষীরো। বল কী! তা হলে গেছে ফুলবেড়ে,
গিরিধরপুর, গোপালনগর,
কানাইগঞ্জ—

কল্যাণী। সব গেছে মোর।

ক্ষীরো। হাতে আছে কিছু নগদ টাকা কি।

কল্যাণী। সব নিয়ে গেছে, কিছু নেই বাকি।

ক্ষীরো। অদৃষ্টে ছিল এত দুখ তোর!
গয়না যা ছিল হীরে-মুক্তোর,
সেই বড়ো বড়ো নীলার কণ্ঠি,
কানবালা-জোড়া বেড়ে গড়নটি,
সেই-যে চুনীর পাঁচনলি হার,
হীরে-দেওয়া সিঁথি লক্ষ টাকার—
সেগুলো নিয়েছে বুঝি লুটেপুটে?

কল্যাণী। সব নিয়ে গেছে সৈন্যেরা জুটে।

ক্ষীরো। আহা, তাই বলে, ধনজনমান
পদ্মপত্রে জলের সমান।
দামী তৈজস ছিল যা পুরোনো
চিহ্নও তার নেই বুঝি কোনো?
সেকালের সব জিনিসপত্র
আসাসোটাগুলো চামরছত্র
চাঁদোয়া কানাত গেছে বুঝি সব?
শাস্ত্রে যে বলে ধনবৈভব
তড়িৎ-সমান, মিথ্যে সে নয়।
এখন তা হলে কোথা থাকা হয়।
বাড়িটা তো আছে?

কল্যাণী। ফৌজের দল
প্রাসাদ আমার করেছে দখল।

ক্ষীরো। ওমা, ঠিক এ যে শোনায় কাহিনী—
কাল ছিল রানী, আজ ভিখারিনি।
শাস্ত্রে তাই তো বলে সব মায়া,
ধনজন তালবৃক্ষের ছায়া।
কী বল মালতী!

মালতী। তাই তো বটেই,
বেশি বাড় হলে পতন ঘটেই।

কল্যাণী। কিছুদিন যদি হেথায় তোমার
আশ্রয় পাই, করি উদ্ধার
আবার আমার রাজ্যখানি—
অন্য উপায় নাহিকো জানি।

ক্ষীরো। আহা, তুমি রবে আমার হেথায়
এ তো বেশ কথা, সুখেরই কথা এ।

প্রথমা। আহা, কত দয়া!

দ্বিতীয়া। মায়ার শরীর!

তৃতীয়া। আহা, দেবী তুমি, নও পৃথিবীর।

চতুর্থী। হেথা ফেরে নাকো অধম পতিত,
আশ্রয় পায় অনাথ অতিথ।

ক্ষীরো। কিন্তু একটা কথা আছে বোন!
বড়ো বটে মোর প্রাসাদভবন,
তেমনি যে ঢের লোকজন বেশি—
কোনোমতে তারা আছে ঠেসাঠেসি।
এখানে তোমার জায়গা হবে না
সে একটা মহা রয়েছে ভাবনা।
তবে কিছুদিন যদি ঘর ছেড়ে
বাইরে কোথাও থাকি তাঁবু গেড়ে—

প্রথমা। ওমা, সে কী কথা!

দ্বিতীয়া। তা হলে রানীমা,
রবে না তোমার কষ্টের সীমা।

তৃতীয়া। যে-সে তাঁবু নয়, তবু সে তাঁবুই,
ঘর থাকতে কি ভিজবে বাবুই!

পঞ্চমী। দয়া করে কত নাববে নাবোতে,
রানী হয়ে কি না থাকবে তাঁবুতে!

ষষ্ঠী। তোমার সে দশা দেখলে চক্ষে
অধীনগণের বাজবে বক্ষে।

কল্যাণী। কাজ নেই রানী, সে অসুবিধায়—
আজকের তরে লইনু বিদায়।

ক্ষীরো। যাবে নিতান্ত? কী করব ভাই!
ছুঁচ ফেলবার জায়গাটি নাই।
জিনিসপত্র লোক-লশকরে
ঠাসা আছে ঘর— কারে ফস করে

বসতে বলি যে তার জোটি নেই।
ভালো কথা, শোনো, বলি গোপনেই,
গয়নাপত্র কৌশলে রাতে
দু-দশটা যাহা পেরেছ সরাতে
মোর কাছে দিলে রবে যতনেই।

কল্যাণী। কিছুই আনি নি, শুধু হেরো এই
হাতে দুটি চুড়ি, পায়েতে নূপুর।

ক্ষীরো। আজ এসো তবে, বেজেছে দুপুর—
শরীর ভালো না, তাইতে সকালে
মাথা ধরে যায় অধিক বকালে।
মালতী!

মালতী। আজ্ঞে।

ক্ষীরো। জানে না কানাই
স্নানের সময় বাজবে সানাই?

মালতী। বেটারে উচিত করব শাসন।

[কল্যাণীর প্রস্থান

ক্ষীরো। তুলে রাখো মোর রত্ন-আসন—
আজকের মতো হল দরবার।
মালতী!

মালতী। আজ্ঞে।

ক্ষীরো। নাম করবার
সুখ তো দেখলি?

মালতী। হেসে নাহি বাঁচি—
ব্যাঙ থেকে কেঁচে হলেন ব্যাঙাচি।

ক্ষীরো। আমি দেখো, বাছা, নাম-করাকরি,
যেখানে সেখানে টাকা-ছড়াছড়ি,
জড়ো করে দল ইতর লোকের
জাঁক-জমকের লোক-চমকের
যত রকমের ভণ্ডামি আছে
ঘেঁষি নে কখনো ভুলে তার কাছে।

প্রথমা। রানীর বুদ্ধি যেমন সারালো,
তেমনি ক্ষুরের মতন ধারালো।

দ্বিতীয়া। অনেক মূর্খে করে দান ধ্যান,
কার আছে হেন কাণ্ডজ্ঞান।

তৃতীয়া। রানীর চক্ষে ধুলো দিয়ে যাবে
হেন লোক হেন ধুলো কোথা পাবে!

ক্ষীরো। থাম্ থাম্ তোরা, রেখে দে বকুনি,
লজ্জা করে যে নিজগুণ শুনি।
মালতী!

মালতী। আজ্ঞে।

ক্ষীরো। ওদের গয়না
ছিল যা এমন কাহারো হয় না।
দুখানি চুড়িতে ঠেকেছে শেষে,
দেখে আমি আর বাঁচি নে হেসে।
তবু মাথা যেন নুইতে চায় না,
ভিখ নেবে তবু কতই বায়না।
পথে বের হল পথের ভিখিরি,
ভুলতে পারে না তবু রানীগিরি।
নত হয় লোক বিপদে ঠেকলে,
পিত্তি জ্বলে যে দেমাক দেখলে।
আবার কিসের শুনি কোলাহল।

মালতী। দুয়ারে এসেছে ভিক্ষুকদল—
আকাল পড়েছে, চালের বস্তা
মনের মতন হয় নি সস্তা,
তাইতে চেঁচিয়ে খাচ্ছে কানটা।
বেতটি পড়লে হবেন ঠাণ্ডা।

ক্ষীরো। রানী কল্যাণী আছেন দাতা,
মোর দ্বারে কেন হস্ত পাতা।
বলে দে আমার পাঁড়েজি বেটাকে
ধরে নিয়ে যাক সকল-ক'টাকে,
দাতা কল্যাণী রানীর ঘরে
সেথায় আসুক ভিক্ষে করে।
সেখানে যা পাবে এখানে তাহার
আরো পাঁচ গুণ মিলবে আহার।

প্রথমা। হা হা হা, কী মজা হবেই না জানি।

দ্বিতীয়া। হাসিয়ে হাসিয়ে মারলেন রানী।

তৃতীয়া। আমাদের রানী এতও হাসান!

চতুর্থী। দু-চোখ চক্ষু-জলেতে ভাসান।

দাসীর প্রবেশ

দাসী। ঠাকরুন এক এসেছেন দ্বারে,
হুকুম পেলেই তাড়াই তাঁহারে।

ক্ষীরো। না না, ডেকে দে-না। আজ কিজন্য
মন আছে মোর বড়ো প্রসন্ন।

ঠাকুরানীর প্রবেশ

ঠাকুরানী। বিপদে পড়েছি, তাই এনু চলে।

ক্ষীরো। সে তো জানা কথা। বিপদে না প'(
শুধু যে আমার চাঁদমুখখানি
দেখতে আস নি সেটা বেশ জানি।

ঠাকুরানী। চুরি হয়ে গেছে ঘরেতে আমার—

ক্ষীরো। মোর ঘরে বুঝি শোধ নেবে তার ?
ঠাকুরানী। দয়া করে যদি কিছু করো দান
এ যাত্রা তবে বেঁচে যায় প্রাণ।
ক্ষীরো। তোমার যা-কিছু নিয়েছে অন্যে
দয়া চাও তুমি তাহার জন্যে !
আমার যা তুমি নিয়ে যাবে ঘরে
তার তরে দয়া আমায় কে করে।
ঠাকুরানী। ধনসুখ আছে যার ভাণ্ডারে
দানসুখে তার সুখ আরো বাড়ে।
গ্রহণ যে করে তারি হেঁট মুখ,
দুঃখের পরে ভিক্ষার দুখ।
তুমি সক্ষম, আমি নিরুপায়,
অনায়াসে পারো ঠেলিবারে পায়।
ইচ্ছা না হয় না'ই কোরো দান,
অপমানিতেরে কেন অপমান !
চলিলাম তবে, বলো দয়া ক'রে
বাসনা পুরিবে গেলে কার ঘরে।
ক্ষীরো। রানী কল্যাণী নাম শোন নাই ?
দাতা ব'লে তাঁর বড়ো যে বড়াই।
এইবার তুমি যাও তাঁরি ঘরে
ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে এসো ভরে,
পথ না জান তো মোর লোকজন
পৌঁছিয়ে দেবে রানীর ভবন।
ঠাকুরানী। তবে তথাস্তু। যাই তাঁরি কাছে।
তাঁর ঘর মোর খুব জানা আছে।
আমি সে লক্ষ্মী, তোর ঘরে এসে
অপমান পেয়ে ফিরিলাম শেষে।
এই কথা ক'টি করিয়ো স্মরণ—
ধনে মানুষের বাড়ে নাকো মন।
আছে বহু ধনী, আছে বহু মানী—
সবাই হয় না রানী কল্যাণী।
ক্ষীরো। যাবে যদি তবে ছেড়ে যাও মোরে
দস্তুরমত কুর্নিশ করে।
মালতী ! মালতী ! কোথায় তারিণী !
কোথা গেল মোর চামরধারিণী !
আমার এক-শো পঁচিশটে দাসী ?
তোরা কোথা গেলি বিনি কিনি কাশী !

কল্যাণীর প্রবেশ

কল্যাণী। পাগল হলি কি। হয়েছে কী তোর
এখনো যে রাত হয় নিকো ভোর—

বল্ দেখি কী যে কাণ্ড কল্লি।
ডাকাডাকি করে জাগালি পল্লী!

ক্ষীরো। ওমা, তাই তো গা! কী জানি কেমন
সারা রাত ধরে দেখেছি স্বপন।
বড়ো কুস্বপ্ন দিয়েছিল বিধি,
স্বপনটা ভেঙে বাঁচলেম দিদি!
একটু দাঁড়াও, পদধূলি লব—
তুমি রানী, আমি চিরদাসী তব।

২৯ অগ্রহায়ণ ১৩০৪

কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ

কর্ণ। পুণ্য জাহ্নবীর তীরে সন্ধ্যাসবিতার
বন্দনায় আছি রত। কর্ণ নাম যার
অধিরথসূতপুত্র, রাধাগর্ভজাত
সেই আমি— কহো মোরে তুমি কে গো মাতঃ!

কুন্তী। বৎস, তোর জীবনের প্রথম প্রভাতে
পরিচয় করায়েছি তোরে বিশ্ব-সাথে
সেই আমি, আসিয়াছি ছাড়ি সর্ব লাজ
তোরে দিতে আপনার পরিচয় আজ।

কর্ণ। দেবী, তব নতনেত্রকিরণসম্পাতে
চিত্ত বিগলিত মোর, সূর্যকরঘাতে
শৈলতুষারের মতো। তব কণ্ঠস্বর
যেন পূর্বজন্ম হতে পশি কর্ণ-'পর
জাগাইছে অপূর্ব বেদনা। কহো মোরে
জন্ম মোর বাঁধা আছে কী রহস্য-ডোরে
তোমা সাথে হে অপরিচিতা!

কুন্তী। ধৈর্য ধর্,
ওরে বৎস, ক্ষণকাল। দেব দিবাকর
আগে যাক অস্তাচলে। সন্ধ্যার তিমির
আসুক নিবিড় হয়ে।— কহি তোরে বীর,
কুন্তী আমি।

কর্ণ। তুমি কুন্তী! অর্জুনজননী!

কুন্তী। অর্জুনজননী বটে! তাই মনে গনি
দ্বেষ করিয়ো না বৎস। আজো মনে পড়ে
অস্ত্রপরীক্ষার দিন হস্তিনানগরে
তুমি ধীরে প্রবেশিলে তরুণ কুমার
রঙ্গস্থলে, নক্ষত্রখচিত পূর্বাশার
প্রান্তদেশে নবোদিত অরুণের মতো।
যবনিকা-অন্তরালে নারী ছিল যত

তার মধ্যে বাক্যহীনা কে সে অভাগিনী
অতৃপ্ত স্নেহক্ষুধার সহস্র নাগিনী
জাগায়ে জর্জর বক্ষে— কাহার নয়ন
তোমার সর্বাঙ্গে দিল আশিস্‌-চুম্বন।
অর্জুনজননী সে যে। যবে কৃপ আসি
তোমারে পিতার নাম শুধালেন হাসি,
কহিলেন 'রাজকুলে জন্ম নহে যার
অর্জুনের সাথে যুদ্ধে নাহি অধিকার'—
আরক্ত আনত মুখে না রহিল বাণী,
দাঁড়ায়ে রহিলে, সেই লজ্জা-আভাখানি
দহিল যাহার বক্ষ অগ্নিসম তেজে
কে সে অভাগিনী। অর্জুনজননী সে যে।
পুত্র দুর্যোধন ধন্য, তখনি তোমারে
অঙ্গরাজ্যে কৈল অভিষেক। ধন্য তারে।
মোর দুই নেত্র হতে অশ্রুবারিরাশি
উদ্দেশে তোমারি শিরে উচ্ছ্বসিল আসি
অভিষেক-সাথে। হেনকালে করি পথ
রঙ্গমাঝে পশিলেন সূত অধিরথ
আনন্দবিহ্বল। তখনি সে রাজসাজে
চারি দিকে কুতূহলী জনতার মাঝে
অভিষেকসিক্ত শির লুটায়ে চরণে
সূতবৃদ্ধে প্রণমিলে পিতৃসম্ভাষণে।
ক্রূর হাস্যে পাণ্ডবের বন্ধুগণ সবে
ধিক্কারিল ; সেইক্ষণে পরম গরবে
বীর বলি যে তোমারে ওগো বীরমণি,
আশিসিল, আমি সেই অর্জুনজননী।

কর্ণ। প্রণমি তোমারে আর্যে। রাজমাতা তুমি,
কেন হেথা একাকিনী। এ যে রণভূমি,
আমি কুরুসেনাপতি।

কুন্তী। পুত্র, ভিক্ষা আছে—
বিফল না ফিরি যেন।

কর্ণ। ভিক্ষা, মোর কাছে!
আপন পৌরুষ ছাড়া, ধর্ম ছাড়া আর
যাহা আজ্ঞা কর দিব চরণে তোমার।

কুন্তী। এসেছি তোমারে নিতে।

কর্ণ। কোথা লবে মোরে!

কুন্তী। তৃষিত বক্ষের মাঝে— লব মাতৃক্রোড়ে।

কর্ণ। পঞ্চপুত্রে ধন্য তুমি, তুমি ভাগ্যবতী,
আমি কুলশীলহীন ক্ষুদ্র নরপতি—
মোরে কোথা দিবে স্থান।

কুন্তী। সর্ব-উচ্চভাগে

তোমারে বসাব মোর সর্বপুত্র-আগে,
জ্যেষ্ঠ পুত্র তুমি।

কর্ণ। কোন্ অধিকার-মদে
প্রবেশ করিব সেথা। সাম্রাজ্যসম্পদে
বঞ্চিত হয়েছে যারা মাতৃস্নেহধনে
তাহাদের পূর্ণ অংশ খণ্ডিব কেমনে
কহো মোরে। দ্যূতপণে না হয় বিক্রয়,
বাহুবলে নাহি হারে মাতার হৃদয়—
সে যে বিধাতার দান।

কুন্তী। পুত্র মোর, ওরে,
বিধাতার অধিকার লয়ে এই ক্রোড়ে
এসেছিলি একদিন— সেই অধিকারে
আয় ফিরে সগৌরবে, আয় নির্বিচারে—
সকল ভ্রাতার মাঝে মাতৃ-অঙ্কে মম
লহো আপনার স্থান।

কর্ণ। শুনি স্বপ্নসম,
হে দেবী, তোমার বাণী। হেরো, অন্ধকার
ব্যাপিয়াছে দিগ্‌বিদিকে, লুপ্ত চারি ধার—
শব্দহীনা ভাগীরথী। গেছ মোরে লয়ে
কোন্ মায়াচ্ছন্ন লোকে, বিস্মৃত আলয়ে,
চেতনাপ্রত্যুষে। পুরাতন সত্যসম
তব বাণী স্পর্শিতেছে মুগ্ধচিত্ত মম।
অস্ফুট শৈশবকাল যেন রে আমার,
যেন মোর জননীর গর্ভের আঁধার
আমারে ঘেরিছে আজি। রাজমাতঃ অয়ি,
সত্য হোক, স্বপ্ন হোক, এসো স্নেহময়ী
তোমার দক্ষিণ হস্ত ললাটে চিবুকে
রাখো ক্ষণকাল। শুনিয়াছি লোকমুখে
জননীর পরিত্যক্ত আমি। কতবার
হেরেছি নিশীথস্বপ্নে জননী আমার
এসেছেন ধীরে ধীরে দেখিতে আমায়,
কাঁদিয়া কহেছি তাঁরে কাতর ব্যথায়
'জননী, গুণ্ঠন খোলো, দেখি তব মুখ'—
অমনি মিলায় মূর্তি তৃষার্ত উৎসুক
স্বপনেরে ছিন্ন করি। সেই স্বপ্ন আজি
এসেছে কি পাণ্ডবজননীরূপে সাজি
সন্ধ্যাকালে, রণক্ষেত্রে, ভাগীরথীতীরে!
হেরো দেবী, পরপারে পাণ্ডবশিবিরে
জ্বলিয়াছে দীপালোক, এ পারে অদূরে
কৌরবের মন্দুরায় লক্ষ অশ্বখুরে
খর শব্দ উঠিছে বাজিয়া। কালি প্রাতে

আরম্ভ হইবে মহারণ। আজ রাতে
অর্জুনজননীকণ্ঠে কেন শুনিলাম
আমার মাতার স্নেহস্বর। মোর নাম
তাঁর মুখে কেন হেন মধুর সংগীতে
উঠিল বাজিয়া— চিত্ত মোর আচম্বিতে
পঞ্চপাণ্ডবের পানে 'ভাই' ব'লে ধায়।

কুন্তী। তবে চলে আয় বৎস, তবে চলে আয়।

কর্ণ। যাব মাতঃ, চলে যাব, কিছু শুধাব না—
না করি সংশয় কিছু, না করি ভাবনা।
দেবী, তুমি মোর মাতা! তোমার আহ্বানে
অন্তরাত্মা জাগিয়াছে— নাহি বাজে কানে
যুদ্ধভেরী, জয়শঙ্খ— মিথ্যা মনে হয়
রণহিংসা, বীরখ্যাতি, জয়পরাজয়।
কোথা যাব, লয়ে চলো।

কুন্তী। ওই পরপারে
যেথা জ্বলিতেছে দীপ স্তব্ধ স্কন্ধাবারে
পাণ্ডুর বালুকাতটে।

কর্ণ। হোথা মাতৃহারা
মা পাইবে চিরদিন! হোথা ধ্রুবতারা
চিররাত্রি রবে জাগি সুন্দর উদার
তোমার নয়নে! দেবী, কহো আরবার
আমি পুত্র তব।

কুন্তী। পুত্র মোর!

কর্ণ। কেন তবে
আমারে ফেলিয়া দিলে দূরে অগৌরবে
কুলশীলমানহীন মাতৃনেত্রহীন
অন্ধ এ অজ্ঞাত বিশ্বে। কেন চিরদিন
ভাসাইয়া দিলে মোরে অবজ্ঞার স্রোতে—
কেন দিলে নির্বাসন ভ্রাতৃকুল হতে।
রাখিলে বিচ্ছিন্ন করি অর্জুনে আমারে—
তাই শিশুকাল হতে টানিছে দোঁহারে
নিগূঢ় অদৃশ্য পাশ হিংসার আকারে
দুর্নিবার আকর্ষণে। মাতঃ, নিরুত্তর?
লজ্জা তব ভেদ করি অন্ধকার স্তর
পরশ করিছে মোরে সর্বাঙ্গে নীরবে—
মুদিয়া দিতেছে চক্ষু। থাক্, থাক্ তবে—
কহিয়ো না কেন তুমি ত্যজিলে আমারে।
বিধির প্রথম দান এ বিশ্বসংসারে
মাতৃস্নেহ, কেন সেই দেবতার ধন
আপন সন্তান হতে করিলে হরণ
সে কথার দিয়ো না উত্তর। কহো মোরে

আজি কেন ফিরাইতে আসিয়াছ ক্রোড়ে।

কুন্তী। হে বৎস, ভর্ৎসনা তোর শতবজ্রসম
বিদীর্ণ করিয়া দিক এ হৃদয় মম
শত খণ্ড করি। ত্যাগ করেছিনু তোরে
সেই অভিশাপে পঞ্চপুত্র বক্ষে ক'রে
তবু মোর চিত্ত পুত্রহীন— তবু হায়,
তোরি লাগি বিশ্বমাঝে বাহু মোর ধায়,
খুঁজিয়া বেড়ায় তোরে। বঞ্চিত যে ছেলে
তারি তরে চিত্ত মোর দীপ্ত দীপ জ্বেলে
আপনারে দগ্ধ করি করিছে আরতি
বিশ্বদেবতার। আমি আজি ভাগ্যবতী,
পেয়েছি তোমার দেখা। যবে মুখে তোর
একটি ফুটে নি বাণী তখন কঠোর
অপরাধ করিয়াছি— বৎস, সেই মুখে
ক্ষমা কর্ কুমাতায়। সেই ক্ষমা বুকে
ভর্ৎসনার চেয়ে তেজে জ্বালুক অনল,
পাপ দগ্ধ ক'রে মোরে করুক নির্মল।

কর্ণ। মাতঃ, দেহো পদধূলি, দেহো পদধূলি—
লহো অশ্রু মোর।

কুন্তী। তোরে লব বক্ষে তুলি
সে সুখ-আশায় পুত্র আসি নাই দ্বারে।
ফিরাতে এসেছি তোরে নিজ অধিকারে।
সূতপুত্র নহ তুমি, রাজার সন্তান—
দূর করি দিয়া বৎস, সর্ব অপমান
এসো চলি যেথা আছে তব পঞ্চ ভ্রাতা।

কর্ণ। মাতঃ, সূতপুত্র আমি, রাধা মোর মাতা,
তার চেয়ে নাহি মোর অধিক গৌরব।
পাণ্ডব পাণ্ডব থাক্, কৌরব কৌরব—
ঈর্ষা নাহি করি কারে।

কুন্তী। রাজ্য আপনার
বাহুবলে করি লহো, হে বৎস, উদ্ধার।
দুলাবেন ধবল ব্যজন যুধিষ্ঠির,
ভীম ধরিবেন ছত্র, ধনঞ্জয় বীর
সারথি হবেন রথে, ধৌম্য পুরোহিত
গাহিবেন বেদমন্ত্র— তুমি শত্রুজিৎ
অখণ্ড প্রতাপে রবে বান্ধবের সনে
নিঃসপত্ন রাজ্যমাঝে রত্নসিংহাসনে।

কর্ণ। সিংহাসন! যে ফিরালো মাতৃস্নেহপাশ—
তাহারে দিতেছ, মাতঃ, রাজ্যের আশ্বাস।
একদিন যে সম্পদে করেছ বঞ্চিত
সে আর ফিরায়ে দেওয়া তব সাধ্যাতীত।

মাতা মোর, ভ্রাতা মোর, মোর রাজকুল
এক মুহূর্তেই, মাতঃ, করেছ নির্মূল
মোর জন্মক্ষণে। সূতজননীরে ছলি
আজ যদি রাজজননীরে মাতা বলি,
কুরুপতি-কাছে বদ্ধ আছি যে বন্ধনে
ছিন্ন ক'রে ধাই যদি রাজসিংহাসনে,
তবে ধিক্ মোরে।

কুন্তী। বীর তুমি, পুত্র মোর,
ধন্য তুমি। হায় ধর্ম, এ কী সুকঠোর
দণ্ড তব। সেইদিন কে জানিত, হায়,
ত্যজিলাম যে শিশুরে ক্ষুদ্র অসহায়
সে কখন বলবীর্য লভি কোথা হতে
ফিরে আসে একদিন অন্ধকার পথে,
আপনার জননীর কোলের সন্তানে
আপন নির্মম হস্তে অস্ত্র আসি হানে।
এ কী অভিশাপ!

কর্ণ। মাতঃ, করিয়ো না ভয়।
কহিলাম, পাণ্ডবের হইবে বিজয়।
আজি এই রজনীর তিমিরফলকে
প্রত্যক্ষ করিনু পাঠ নক্ষত্র-আলোকে
ঘোর যুদ্ধ-ফল। এই শান্ত স্তব্ধ ক্ষণে
অনন্ত আকাশ হতে পশিতেছে মনে
জয়হীন চেষ্টার সংগীত, আশাহীন
কর্মের উদ্যম— হেরিতেছি শান্তিময়
শূন্য পরিণাম। যে পক্ষের পরাজয়
সে পক্ষ ত্যজিতে মোরে কোরো না আহ্বান।
জয়ী হোক, রাজা হোক পাণ্ডবসন্তান—
আমি রব নিষ্ফলের, হতাশের দলে।
জন্মরাত্রে ফেলে গেছ মোরে ধরাতলে
নামহীন, গৃহহীন— আজিও তেমনি
আমারে নির্মমচিত্তে তেয়াগো জননী
দীপ্তিহীন কীর্তিহীন পরাভব- 'পরে।
শুধু এই আশীর্বাদ দিয়ে যাও মোরে
জয়লোভে যশোলোভে রাজ্যলোভে, অয়ি,
বীরের সদ্‌গতি হতে ভ্রষ্ট নাহি হই।

১৫ ফাল্গুন ১৩০৬

হাস্যকৌতুক

এই ক্ষুদ্র কৌতুকনাট্যগুলি হেঁয়ালিনাট্য নাম ধরিয়া 'বালক' ও 'ভারতী'তে বাহির হইয়াছিল। য়ুরোপে শারাড্ (charade) -নামক একপ্রকার নাট্য-খেলা প্রচলিত আছে, কতকটা তাহারই অনুকরণে এগুলি লেখা হয়। ইহার মধ্যে হেঁয়ালি রক্ষা করিতে গিয়া লেখা সংকুচিত করিতে হইয়াছিল— আশা করি সেই হেঁয়ালির সন্ধান করিতে বর্তমান পাঠকগণ অনাবশ্যক কষ্ট স্বীকার করিবেন না। এই হেঁয়ালিনাট্যের কয়েকটি বিশেষভাবে বালকদিগকেই আমোদ দিবার জন্য লিখিত হইয়াছিল।

হাস্যকৌতুক

ছাত্রের পরীক্ষা

ছাত্র শ্রীমধুসূদন। শ্রীযুক্ত কালাচাঁদ মাস্টার পড়াইতেছেন

অভিভাবকের প্রবেশ

অভিভাবক। মধুসূদন পড়াশুনো কেমন করছে কালাচাঁদবাবু ?

কালাচাঁদ। আজ্ঞে, মধুসূদন অত্যন্ত দুষ্ট বটে, কিন্তু পড়াশুনোয় খুব মজবুত। কখনো একবার বৈ দুবার বলে দিতে হয় না। যেটি আমি একবার পড়িয়ে দিয়েছি সেটি কখনো ভোলে না।

অভিভাবক। বটে ! তা, আমি আজ একবার পরীক্ষা করে দেখব।

কালাচাঁদ। তা, দেখুন-না।

মধুসূদন। (স্বগত) কাল মাস্টারমশায় এমন মার মেরেছেন যে আজও পিঠ চচ্চড় করছে। আজ এর শোধ তুলব। ওঁকে আমি তাড়াব।

অভিভাবক। কেমন রে মোধো, পুরোনো পড়া সব মনে আছে তো ?

মধুসূদন। মাস্টারমশায় যা বলে দিয়েছেন তা সব মনে আছে।

অভিভাবক। আচ্ছা, উদ্ভিদ্ কাকে বলে বল্ দেখি।

মধুসূদন। যা মাটি ফুঁড়ে ওঠে।

অভিভাবক। একটা উদাহরণ দে।

মধুসূদন। কেঁচো !

কালাচাঁদ। (চোখ রাঙাইয়া) অ্যাঁ ! কী বললি !

অভিভাবক। রসুন মশায়, এখন কিছু বলবেন না।

মধুসূদনের প্রতি

তুমি তো পদ্যপাঠ পড়েছ ; আচ্ছা, কাননে কী ফোটে বলো দেখি ?

মধুসূদন। কাঁটা।

কালাচাঁদের বেত্র-আস্ফালন

কী মশায়, মারেন কেন ? আমি কি মিথ্যে কথা বলছি ?

অভিভাবক। আচ্ছা, সিরাজউদ্দৌলাকে কে কেটেছে ? ইতিহাসে কী বলে ?

মধুসূদন। পোকায়।

বেত্রাঘাত

আজ্ঞে, মিছিমিছি মার খেয়ে মরছি— শুধু সিরাজউদ্দৌলা কেন, সমস্ত ইতিহাসখানাই পোকায় কেটেছে ! এই দেখুন।

প্রদর্শন। কালাচাঁদ মাস্টারের মাথা-চুলকায়ন

অভিভাবক। ব্যাকরণ মনে আছে ?

মধুসূদন। আছে।

অভিভাবক। 'কর্তা' কী, তার একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও দেখি।

মধুসূদন। আজ্ঞে, কর্তা ও পাড়ার জয়মুন্‌শি।

অভিভাবক। কেন বলো দেখি।

মধুসূদন। তিনি ক্রিয়া-কর্ম নিয়ে থাকেন।

কালাচাঁদ। (সরোষে) তোমার মাথা !

পৃষ্ঠে বেত্র

মধুসূদন। (চমকিয়া) আজ্ঞে, মাথা নয়, ওটা পিঠ।

অভিভাবক। ষষ্ঠী-তৎপুরুষ কাকে বলে ?

মধুসূদন। জানি নে।

কালাচাঁদবাবুর বেত্র-দর্শায়ন

মধুসূদন। ওটা বিলক্ষণ জানি— ওটা যষ্টি-তৎপুরুষ।

অভিভাবকের হাস্য এবং কালাচাঁদবাবুর তদ্‌বিপরীত ভাব

অভিভাবক। অঙ্কশিক্ষা হয়েছে ?

মধুসূদন। হয়েছে।

অভিভাবক। আচ্ছা, তোমাকে সাড়ে ছ'টা সন্দেশ দিয়ে বলে দেওয়া হয়েছে যে, পাঁচ মিনিট সন্দেশ খেয়ে যতটা সন্দেশ বাকি থাকবে তোমার ছোটো ভাইকে দিতে হবে। একটা সন্দেশ খেতে তোমার দু মিনিট লাগে, কটা সন্দেশ তুমি তোমার ভাইকে দেবে ?

মধুসূদন। একটাও নয়।

কালাচাঁদ। কেমন করে !

মধুসূদন। সবগুলো খেয়ে ফেলব। দিতে পারব না।

অভিভাবক। আচ্ছা, একটা বটগাছ যদি প্রত্যহ সিকি ইঞ্চি করে উঁচু হয় তবে যে বট এ বৈশাখ মাসের পয়লা দশ ইঞ্চি ছিল ফিরে বৈশাখ মাসের পয়লা সে কতটা উঁচু হবে ?

মধুসূদন। যদি সে গাছ বেঁকে যায় তা হলে ঠিক বলতে পারি নে, যদি বরাবর সিধে ওঠে তা হলে মেপে দেখলেই ঠাহর হবে, আর যদি ইতিমধ্যে শুকিয়ে যায় তা হলে তো কথাই নেই।

কালাচাঁদ। মার না খেলে তোমার বুদ্ধি খোলে না ! লক্ষ্মীছাড়া, মেরে তোমার পিঠ লাল করব, তবে তুমি সিধে হবে।

মধুসূদন। আজ্ঞে, মারের চোটে খুব সিধে জিনিসও বেঁকে যায়।

অভিভাবক। কালাচাঁদবাবু, ওটা আপনার ভ্রম। মারপিট করে খুব অল্প কাজই হয়। কথা আছে গাধাকে পিটোলে ঘোড়া হয় না, কিন্তু অনেক সময়ে ঘোড়াকে পিটোলে গাধা হয়ে যায়। অধিকাংশ ছেলে শিখতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ মাস্টার শেখাতে পারে না। কিন্তু মার খেয়ে মরে ছেলেটাই। আপনি আপনার বেত নিয়ে প্রস্থান করুন, দিনকতক মধুসূদনের পিঠ জুড়োক, তার পরে আমিই ওকে পড়াব।

মধুসূদন। (স্বগত) আঃ, বাঁচা গেল।

কালাচাঁদ। বাঁচা গেল মশায় ! এ ছেলেকে পড়ানো মজুরের কর্ম, কেবলমাত্র ম্যানুয়েল লেবার। ত্রিশ দিন একটা ছেলেকে কুপিয়ে আমি পাঁচটি মাত্র টাকা পাই, সেই মেহনতে মাটি কোপাতে পারলে নিদেন দশটা টাকাও হয়।

শ্রাবণ ১২৯২

পেটে ও পিঠে

প্রথম দৃশ্য

বাড়ির সম্মুখে পথে বসিয়া পা ছড়াইয়া বনমালী পরমানন্দে সন্দেশ আহার করিতেছেন। বয়স সাত। তিনকড়ির প্রবেশ। বয়স পনেরো

সন্দেশের প্রতি সলোভ দৃষ্টিপাত করিয়া

তিনকড়ি। কী হে বটকৃষ্ণবাবু, কী করছ?

বনমালীর নিরুত্তরে অবাক হইয়া থাকন

তিনকড়ি। উত্তর দিচ্ছ না যে? তোমার নাম বটকৃষ্ণ নয়?
বনমালী। (সংক্ষেপে) না।
তিনকড়ি। অবিশ্যি বটকৃষ্ণ। যদি হয়? আচ্ছা, তোমার নাম কী বলো।
বনমালী। আমার নাম বনমালী।
তিনকড়ি। (হাসিয়া উঠিয়া) ছেলেমানুষ, কিচ্ছু জান না। বনমালীও যা বটকৃষ্ণও তাই, একই। বনমালীর মানে জান?
বনমালী। না।
তিনকড়ি। বনমালীর মানে বটকৃষ্ণ। বটকৃষ্ণের মানে জান?
বনমালী। না।
তিনকড়ি। বটকৃষ্ণের মানে বনমালী।— আচ্ছা, বাবা তোমাকে কখনো আদর করেও ডাকে না বটকৃষ্ণ?
বনমালী। না।
তিনকড়ি। ছি ছি! আমার বাবা আমাকে বলে বটকৃষ্ণ, মোধোর বাবা মোধোকে বলে বটকৃষ্ণ— তোমার বাবা তোমাকে কিচ্ছু বলে না! ছি ছি!

পার্শ্বে উপবেশন

বনমালী। (সগর্বে) বাবা আমাকে বলে ভুতু।
তিনকড়ি। আচ্ছা ভুতুবাবু, তোমার ডান হাত কোন্‌টা বলো দেখি।
বনমালী। (ডান হাত তুলিয়া) এইটে ডান হাত।
তিনকড়ি। আচ্ছা, তোমার বাঁ হাত কোন্‌টা বলো দেখি।
বনমালী। (বাম হাত তুলিয়া) এইটে।
তিনকড়ি। (খপ্‌ করিয়া পাত হইতে একটা সন্দেশ তুলিয়া নিজের মুখের কাছে ধরিয়া) আচ্ছা ভুতুবাবু, এইটে কী বলো দেখি।

বনমালীর শশব্যস্ত হইয়া কাড়িয়া লইবার চেষ্টা

তিনকড়ি। (সরোষে পৃষ্ঠে চপেটাঘাত করিয়া) এতবড়ো ধেড়ে ছেলে হলি, এইটে কী জানিস নে! এটা সন্দেশ। এটা খেতে হয়।

তিনকড়ির মুখের মধ্যে সন্দেশের দ্রুত অন্তর্ধান

বনমালী। (পৃষ্ঠে হাত দিয়া) ভ্যাঁ—

তিনকড়ি। ছি ছি ভুতুবাবু, তোমার জ্ঞান কবে হবে বলো দেখি। এইটে জান না যে, পেটে খেলে পিঠে সয় ?

আর-একটা সন্দেশ মুখের ভিতর পূরণ

বনমালী। (দ্বিগুণ বেগে) ভ্যাঁ—

তিনকড়ি। তবে, তুমি কি বল পেটে খেলে পিঠে সয় না ? এই দেখো-না কেন, পেটে খেলে (আর-একটা সন্দেশ খাইয়া) পিঠে সয়—

বনমালীর পৃষ্ঠে চপেটাঘাত

সয় না ?

বনমালী। (সরোদনে চীৎকারপূর্বক) না ম্না ম্না।

তিনকড়ি। (শেষ সন্দেশটি নিঃশেষ করিয়া) তা হবে। তোমার তা হলে সয় না দেখছি। যার যেমন ধাত। তবে থাক্, তবে আর কাজ নেই। তবে এই স্থির হল কারও বা পেটে সমস্তই সয়, কারও বা পিঠে কিছুই সয় না। যেমন আমি আর তুমি।

সহসা বনমালীর পিতার প্রবেশ

পিতা। কী রে ভুতু, কাঁদছিস কেন ?

পিতাকে দেখিয়া বনমালীর দ্বিগুণ ক্রন্দন

তিনকড়ি। (বনমালীর পৃষ্ঠে হাত বুলাইয়া অতি কোমল স্বরে) বাবা জিগ্‌গেস করছেন, কথার উত্তর দাও।

বনমালী। (সরোদনে) আমাকে মেরেছে।

তিনকড়ি। আজ্ঞে, পাড়ার একটা ডানপিটে ছেলে খামকা মেরে গেল, বেচারার কোনো দোষ নেই— সন্দেশগুলি খেয়ে ভুতুবাবু ঠোঙাটি নিয়ে খেলা করছিল—

পিতা। (সরোষে) ভুতু, কে মেরেছে রে ?

বনমালী। (তিনকড়িকে দেখাইয়া) ও মেরেছে।

তিনকড়ি। আজ্ঞে হাঁ, আমি তাকে খুব মেরেছি বটে। কার না রাগ হয় বলুন দেখি। ছেলেমানুষ খেলা করছে— খামকা ওকে মেরে ওর ঠোঙাটা কেড়ে নেও কেন বাপু ? আপনি থাকলে আপনিও তাকে মারতেন।

পিতা। আমি থাকলে তার দুখানা হাড় একত্তর রাখতেম না। যত-সব ডানপিটে ছেলে এ পাড়ায় জুটেছে।

বনমালী। বাবা, ও আমার সন্দেশ—

তিনকড়ি। (নিবৃত্ত করিয়া) আরে, আরে, ও কথা আর বলতে হবে না।

পিতা। কী কথা ?

তিনকড়ি। আজ্ঞে, কিছুই নয়। আমি ভুতুবাবুকে আনা-দুয়েকের সন্দেশ কিনে খাইয়েছি। সামান্য কথা। সে কি আর বলবার বিষয় ?

পিতা। (পরম সন্তোষে) তোমার নাম কী বাপু ?

তিনকড়ি। (সবিনয়ে) আজ্ঞে, আমার নাম তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়।

পিতা। ঠাকুরের নাম ?

তিনকড়ি। খুদিরাম মুখোপাধ্যায়।

পিতা। তুমি আমার পরমাত্মীয়। খুদিরাম যে আমার পিসতুতো ভাই হয়।

তিনকড়ির ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম

পিতা। চলো বাবা, বাড়ির ভিতর চলো। জলখাবার খাবে। আজ পৌষপার্বণ, পিঠে না খাইয়ে ছাড়ব না।

তিনকড়ি। যে আজ্ঞে।

পিতা। আজ রাত্রে এখানে থাকবে। কাল মধ্যাহ্নভোজন করে বাড়ি যেয়ো।

তিনকড়ি। যে আজ্ঞে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

অন্তঃপুরে তিনকড়ি পিষ্টক-আহারে প্রবৃত্ত

তিনকড়ি। (স্বগত) ডান হাতের ব্যাপারটা আজ বেশ চলছে ভালো।

ভুতুর মা। (পাতে চারটে পিঠে দিয়া) বাবা, চুপ করে বসে থাকলে হবে না, এ চারখানাও খেতে হবে।

তিনকড়ি। যে আজ্ঞে। (আহার)

ভুতুর বাপের প্রবেশ

পিতা। ওকি ও! পাত খালি যে! ওরে, খান-আষ্টেক পিঠে দিয়ে যা।

পিঠে-দেওন

বাবা, খেতে হবে। এরই মধ্যে হাত গুটোলে চলবে না।

তিনকড়ি। যে আজ্ঞে। (আহার)

পিসিমার প্রবেশ

পিসিমা। (ভুতুর মা'র প্রতি) ও বউ, তিনকড়ির পাত খালি যে! হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছ কী? ওকে খান-দশেক পিঠে দাও। লজ্জা কোরো না বাবা, ভালো করে খাও।

তিনকড়ি। যে আজ্ঞে।

পিসেমহাশয়ের প্রবেশ

পিসেমহাশয়। বাপু, তোমার খাওয়া হল না দেখছি। দিয়ে যা, দিয়ে যা, এ দিকে দিয়ে যা। পাতে খান-পনেরো পিঠে দে। তোমাদের বয়েসে আমরা খেতুম হাঁসের মতো। সবগুলি খেতে হবে তা বলছি।

তিনকড়ি। যে আজ্ঞে।

দিদিমার প্রবেশ

দিদিমা। (ভুতুর মা'র প্রতি অন্তরালে) ও বউ, পিঠে তো সব ফুরিয়ে গেছে, আর একখানাও বাকি নেই।

ভুতুর মা। কী হবে!

দিদিমা। কী আর হবে?

তিনকড়ির পাশে গিয়া পরিহাস করিয়া পিঠে এক কিল মারিয়া

পিঠে আর খাবে।

তিনকড়ি। আজ্ঞে না।

দিদিমা। সে কী কথা! আর দুটো খাও।

আরো দুটো কিল

তিনকড়ি। (গাত্রোত্থান করিয়া) আজ্ঞে না। আর আবশ্যক নেই।

তৃতীয় দৃশ্য

পরদিন তিনকড়ি শয্যাগত। পাশে বনমালী

তিনকড়ি। (ক্ষীণকণ্ঠে) ভুতুবাবু, তোমার বাবা কোথায় হে?
বনমালী। বদ্যি ডাকতে গেছে।
তিনকড়ি। (কাতর স্বরে) আর বদ্যি ডেকে কী হবে! ওষুধ খাব যে তার জায়গা কোথায়?
বনমালী। তোমার পেটে কী হয়েছে তিনকড়িদা?
তিনকড়ি। যাই হোক গে, কাল তোমাকে যা শিখিয়েছিলুম মনে আছে কি?
বনমালী। আছে।
তিনকড়ি। কী বলো দেখি।
বনমালী। পেটে খেলে পিঠে সয়।
তিনকড়ি। আজ আর-একটা শেখাব। কথাটা মনে রেখো— 'পিঠে খেলে পেটে সয় না'।

আষাঢ় ১২৯২

অভ্যর্থনা

প্রথম দৃশ্য

গ্রামের পথ

চতুর্ভুজবাবু এম.এ.পাস করিয়া গ্রামে আসিয়াছেন; মনে করিয়াছেন
গ্রামে হুলস্থূল পড়িবে। সঙ্গে একটা মোটাসোটা কাবুলি বিড়াল আছে

নীলরতনের প্রবেশ

নীলরতন। এই যে চতুবাবু, কবে আসা হল?
চতুর্ভুজ। কালেজে এম. এ. একজামিন দিয়েই—
নীলরতন। বা বা, এ বেড়ালটি তো বড়ো সরেস।
চতুর্ভুজ। এবারকার একজামিনেশন ভারি—
নীলরতন। মশায়, বেড়ালটি কোথায় পেলেন?
চতুর্ভুজ। কিনেছি। এবারে যে সবজেক্ট নিয়েছিলুম—
নীলরতন। কত দাম লেগেছে মশায়?
চতুর্ভুজ। মনে নেই। নীলরতনবাবু, আমাদের গ্রামের থেকে কেউ কি পাস হয়েছে?
নীলরতন। বিস্তর। কিন্তু এমন বেড়াল এ মুল্লুকে নেই।
চতুর্ভুজ। (স্বগত) আ মোলো, এ যে কেবল বেড়ালের কথাই বলে— আমি যে পাস করে এলুম সে কথা যে আর তোলে না।

জমিদারবাবুর প্রবেশ

জমিদার। এই-যে চতুর্ভুজ, এতকাল কলকাতায় বসে কী করলে বাপু?

চতুর্ভুজ। আজ্ঞে এম. এ. দিয়ে আসছি।

জমিদার। কী বললে? মেয়ে দিয়ে এসেছ? কাকে দিয়ে এসেছ?

চতুর্ভুজ। তা নয়— বি. এ. দিয়ে—

জমিদার। মেয়ের বিয়ে দিয়েছ? তা, আমরা কিছুই জানতে পারলেম না?

চতুর্ভুজ। বিয়ে নয়— বি. এ.—

জমিদার। তবেই হল। তোমরা শহরে বল বি. এ., আমরা পাড়াগাঁয়ে বলি বিয়ে। সে কথা যাক, এ বেড়ালটি তোফা দেখতে।

চতুর্ভুজ। আপনার ভ্রম হয়েছে; আমার—

জমিদার। ভ্রম কিসের— এমন বেড়াল তুমি এ জেলার মধ্যে খুঁজে বের করো দেখি!

চতুর্ভুজ। আজ্ঞে না, বেড়ালের কথা হচ্ছে না—

জমিদার। বেড়ালের কথাই তো হচ্ছে— আমি বলছি এমন বেড়াল মেলে না।

চতুর্ভুজ। (স্বগত) আ খেলে যা!

জমিদার। বিকেলের দিকে বেড়ালটি সঙ্গে করে আমাদের ও দিকে একবার যেয়ো। ছেলেরা দেখে ভারি খুশি হবে।

চতুর্ভুজ। তা হবে বৈকি। ছেলেরা অনেক দিন আমাকে দেখে নি।

জমিদার। হাঁ— তা তো বটেই— কিন্তু আমি বলছি, তুমি যদি যেতে না পার তো বেড়ালটি বেণীর হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিয়ো— ছেলেদের দেখাব।

[প্রস্থান

সাতুখুড়োর প্রবেশ

সাতুখুড়ো। এই-যে, অনেক দিনের পর দেখা।

চতুর্ভুজ। তা আর হবে না! কতগুলো একজামিন—

সাতুখুড়ো। এই বেড়ালটি—

চতুর্ভুজ। (সরোষে) আমি বাড়ি চললেম।

[প্রস্থানোদ্যম

সাতুখুড়ো। আরে, শুনে যাও-না— এ বেড়ালটি—

চতুর্ভুজ। না মশায়, বাড়িতে কাজ আছে।

সাতুখুড়ো। আরে, একটা কথার উত্তরই দাও-না— এ বেড়ালটি—

[কোনো উত্তর না দিয়া হন্‌হন্‌ বেগে চতুর্ভুজের প্রস্থান

সাতুখুড়ো। আ মোলো! ছেলেপুলেগুলো লেখাপড়া শিখে ধনুর্ধর হয়ে ওঠেন। গুণ তো যথেষ্ট— অহংকার চার পোয়া!

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

চতুর্ভুজের বাটীর অন্তঃপুর

দাসী। মাঠাকরুন, দাদাবাবু একেবারে আগুন হয়ে এসেছেন।

মা। কেন রে?

দাসী। কী জানি বাপু!

চতুর্ভুজের প্রবেশ

ছোটো ছেলে। দাদাবাবু, এ বেড়ালটি আমাকে—

চতুর্ভুজ। (তাহাকে এক চপেটাঘাত) দিন রাত্রি কেবল বেড়াল বেড়াল বেড়াল!

মা। বাছা সাধে রাগ করে! এত দিন পরে বাড়ি এল, ছেলেগুলি বিরক্ত করে খেলে। যা, তোরা সব যা! (চতুর্ভুজের প্রতি) আমাকে দাও বাছা— দুধভাত রেখে দিয়েছি, আমি তোমার বেড়ালকে খাইয়ে আনছি।

চতুর্ভুজ। (সরোষে) এই নাও মা, তোমরা বেড়ালকেই খাওয়াও আমি খাব না, আমি চললেম।

মা। (সকাতরে) ও কী কথা! তোমার খাবার তো তৈরি আছে বাপ, এখন নেয়ে এলেই হয়।

চতুর্ভুজ। আমি চললেম— তোমাদের দেশে বেড়ালেরই আদর, এখানে গুণবানের আদর নেই।

বিড়ালের প্রতি লাথি-বর্ষণ

মাসিমা। আহা, ওকে মেরো না— ও তো কোনো দোষ করে নি।

চতুর্ভুজ। বেড়ালের প্রতিই যত তোমাদের মায়ামমতা— আর মানুষের প্রতি একটু দয়া নেই।

ছোটো মেয়ে। (নেপথ্যের দিকে নির্দেশ করিয়া) হরিখুড়ো দেখে যাও, ওর লেজ কত মোটা।

হরি। কার?

মেয়ে। ঐ-যে ওর!

হরি। চতুর্ভুজের?

মেয়ে। না, ঐ বেড়ালের।

তৃতীয় দৃশ্য

পথ। ব্যাগ হস্তে চতুর্ভুজ। সঙ্গে বিড়াল নাই

সাধুচরণ। মশায়, আপনার সে বেড়ালটি গেল কোথায়?

চতুর্ভুজ। সে মরেছে!

সাধুচরণ। আহা, কেমন করে মোলো?

চতুর্ভুজ। (বিরক্ত হইয়া) জানি নে মশায়!

পরানবাবুর প্রবেশ

পরান। মশায়, আপনার বেড়াল কী হল?

চতুর্ভুজ। সে মরেছে।

পরান। বটে! মোলো কী করে?

চতুর্ভুজ। এই তোমরা যেমন করে মরবে। গলায় দড়ি দিয়ে।

পরান। ও বাবা, এ যে একেবারে আগুন।

চতুর্ভুজের পশ্চাতে ছেলের পাল লাগিল
হাততালি দিয়া 'কাবুলি বিড়াল' 'কাবুলি বিড়াল' বলিয়া খেপাইতে লাগিল

ভাদ্র ১২৯২

রোগের চিকিৎসা

প্রথম দৃশ্য

হাঁপাইতে হাঁপাইতে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে হারাধনের প্রবেশ

হারাধন। বাবা! ডাক্তার-সাহেবের আস্তাবল থেকে হাঁসের ডিম চুরি করতে গিয়ে আজ আচ্ছা নাকাল হয়েছি! সাহেব যেরকম তাড়া করে এসেছিল, মরেছিলেম আর-কি! ভয়ে পালাতে গিয়ে খানার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেম। পা ভেঙে গেছে— তাতে দুঃখ নেই, প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছি এই ঢের। রোগীগুলোকে হাতে পেলে ডাক্তার-সাহেব পট্‌ পট্‌ করে মেরে ফেলে; আমার কোনো ব্যামোস্যামো নেই, আমাকেই তো সেরে ফেলবার জো করেছিল। এবারে রোজ রোজ আর হাঁসের ডিম চুরি করব না; একেবারে আস্ত হাঁস চুরি করব, আমাদের বাড়িতে ডিম পাড়বে।

নেপথ্য হইতে। হারু!

হারাধন। (সভয়ে) ঐ রে, বাবা এসেছে। আমার একটা পা খোঁড়া দেখলে মারের চোটে বাবা আর-একটা পা খোঁড়া করে দেবে।

নেপথ্যে পুনশ্চ। হারু! (নিরুত্তর) হারা! (নিরুত্তর) হেরো!

পিতার প্রবেশ

হারাধন। (অগ্রসর হইয়া) আজ্ঞে!

পিতা। তুই খোঁড়াচ্ছিস যে!

হারাধনের মাথা-চুলকন

পিতা। (সরোষে) পা ভাঙলি কী করে!

হারাধন। (সভয়ে) আজ্ঞে, আমি ইচ্ছে করে ভাঙি নি।

পিতা। তা তো জানি, কী করে ভাঙল সেইটে বল্‌-না।

হারাধন। জানি নে বাবা!

পিতা। তোর পা ভাঙল তুই জানিস নে তো কি ও পাড়ার গোবরা তেলি জানে?

হারাধন। কখন ভাঙল টের পাই নি বাবা!

পিতা। বটে! এই লাঠির বাড়ি তোর মাথাটা ভাঙলে তবে টের পাবি বুঝি!

হারাধন। (তাড়াতাড়ি হাত দিয়া মাথা আড়াল করিয়া) না বাবা! ঐ মাথাটা বাঁচাতে গিয়েই পা'টা ভেঙেছি।

পিতা। বুঝেছি। তবে বুঝি সেদিনকার মতো ডাক্তার-সাহেবের বাড়িতে হাঁসের ডিম চুরি করতে গিয়েছিলি, তাই তারা মেরে তোর পা ভেঙে দিয়েছে!

হারাধন। (চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে) হাঁ বাবা! আমার কোনো দোষ নেই। পা আমি নিজে ভাঙি নি, পা তারাই ভেঙে দিয়েছে।

পিতা। লক্ষ্মীছাড়া, তোর কি কিছুতেই চৈতন্য হবে না?

হারাধন। চৈতন্য কাকে বলে বাবা?

পিতা। চৈতন্য কাকে বলে দেখবি? (পিঠে কিল মারিয়া) চৈতন্য একে বলে।

হারাধন। এ তো আমার রোজই হয়।

পিতা। আমি দেখছি তুমি জেলে গিয়েই মরবে!

হারাধন। না বাবা, রোজ চৈতন্য পেলে ঘরে মরব।

পিতা। নাঃ, তোকে আর পেরে উঠলেম না।

হারাধন। (চুপড়ির দিকে চাহিয়া) বাবা, তাল এনেছ কার জন্যে ? আমি খাব।
পিতা। (পৃষ্ঠে কিল মারিয়া) এই খাও!
হারাধন। (পিঠে হাত বুলাইয়া) এ তো ভালো লাগল না!
নেপথ্যে। হারু!
হারাধন। কী মা!
নেপথ্যে। তোর জন্যে তালের বড়া করে রেখেছি— খাবি আয়।

[খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে হারাধনের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

ডাক্তার-সাহেবের আস্তাবলে হারাধন হাঁস-চুরি-করণে প্রবৃত্ত

পিতা। (দূর হইতে) হারু!
হারাধন। ঐ রে, বাবা আসছে! কী করি ?

হারাধনের গলা হইতে পেট পর্যন্ত থলি ঝুলিতেছিল, তাড়াতাড়ি থলির মধ্যে হাঁস পুরিয়া ফেলিল

পিতা। হারু! (নিরুত্তর) হারা! (নিরুত্তর) হেরো!
হারাধন। আজ্ঞে!
পিতা। তোর পেট হঠাৎ অমন ফুলে উঠল কী করে ?
হারাধন। বাবা, কাল সেই তালের বড়া খেয়ে।
পিতা। অমন ক্যাঁক্ ক্যাঁক্ শব্দ হচ্ছে কেন ?
হারাধন। পেটের ভিতর নাড়িগুলো ডাকছে।
পিতা। দেখি, পেটে হাত দিয়ে দেখি।
হারাধন। (শশব্যস্তে) ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না, বড্ড ব্যথা হয়েছে।

পেটের মধ্যে ক্যাঁক্ ক্যাঁক্

পিতা। (স্বগত) সব বোঝা গেছে। হতভাগাকে জব্দ করতে হবে। (প্রকাশ্যে) তোমার রোগ সহজ নয়; এসো বাপু, তোমাকে হাঁসপাতালে নিয়ে যাই।
হারাধন। না বাবা, এমন আমার মাঝে মাঝে হয়, আপনি সেরে যায়।

ক্যাঁক্ ক্যাঁক্ ক্যাঁক্

পিতা। কই রে, এ তো ক্রমেই বাড়ছে। চল্, আর দেরি নয়।

[টানিয়া লইয়া প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

হারাধন। পিতা ও মাতা

মা। (কাঁদিতে কাঁদিতে) বাছার আমার কী হল গা!
পিতা। হাঁগো, তুমি বেশি গোল কোরো না। হাঁসাপাতালে নিয়ে গেলেই এ ব্যামো সেরে যাবে।
মা। আমি বেশি গোল করছি, না তোমার ছেলের পেট বেশি গোল করছে! (সভয়ে) এ যে হাঁসের মতো ক্যাঁক্ ক্যাঁক্ করে। বাবা হারু, তোকে আর আমি হাঁসের ডিম খেতে দেব না— তোর পেটের মধ্যে হাঁস ডাকছে— কী হবে!

[ক্রন্দন

হারাধন। (তাড়াতাড়ি) না মা, ও হাঁস নয়, ও তালের বড়া। হাঁস তোমাকে কে বললে ? কক্খনো হাঁস নয়। হাঁস হতেই পারে না। আচ্ছা, বাজি রাখো, যদি তালের বড়া হয়!

মা। তালের বড়া কি অমন করে ডাকে বাছা!

হারাধন। তুমি একটু চুপ করো মা! তোমাদের গোলমাল শুনে পেটের ভিতর আরো বেশি করে ডাকছে।

পিতা। বোসেদের বাড়ি আমার একটু কাজ আছে, আমি কাজ সেরেই হারুকে নিয়ে হাঁসপাতালে যাচ্ছি।

[প্রস্থান

ক্যাঁক্ ক্যাক্ ক্যাঁক্ ক্যাক্

মা। ওগো, এ যে ক্রমেই বাড়তে চলল! ওগো মুখুজ্যেমশাই!

মুখুজ্যেমশায়ের প্রবেশ

মুখুজ্যে। কী গো বাছা ?

মা। বাছার আমার ক্রমেই বাড়তে লাগল। একে শিগ্‌গির— ঐ-যে কী বলে ঐ— তোমাদের হাঁচপাতালে নিয়ে চলো।

মুখুজ্যে। আমি তো তাই প্রথম থেকেই বলছি, হারুর বাবাই তো এতক্ষণ দেরি করিয়ে রাখলে। (হারার প্রতি) তবে চল্, ওঠ্।

হারাধন। না দাদামশায়, আমি হাঁসপাতালে যাব না, আমার কিছু হয় নি।

মুখুজ্যে। কিছু হয় নি বটে! তোর পেটের ডাকের চোটে পাড়াসুদ্ধ অস্থির হয়ে উঠল। পেটের মধ্যে বাত শ্লেষ্মা পিত্ত তিনটিতে মিলে যেন দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধিয়ে দিয়েছে।

[বলপূর্বক লইয়া যাওন

চতুর্থ দৃশ্য

হাঁসপাতালে ডাক্তার-সাহেব ও হারাধন

ডাক্তার। টোমার পেটে কী হইয়াছে ?

হারাধন। কিছু হয় নি সাহেব। এবার আমাকে মাপ করো সাহেব, আমার কিছু হয় নি।

ডাক্তার। কিছু হয় নি টো এ কী ?

পেটে খোঁচা দেওন ও দ্বিগুণ ক্যাঁক্ ক্যাঁক্ শব্দ

(হাসিয়া) টোমার ব্যামো আমি সমস্ট বুঝিয়াছি।

হারাধন। তোমার গা ছুঁয়ে বলছি সাহেব, আমার কোনো ব্যামো হয় নি। এমন কাজ আর কখনো করব না।

ডাক্তার। টোমার ভয়ানক ব্যামো হইয়াছে।

হারাধন। সাহেব, আমার ব্যামো আমি জানি নে, তুমি জান!

ক্যাঁক্ ক্যাঁক্

(সরোষে থলিতে চাপড় মারিয়া) আ মোলো যা, এর যে ডাক কিছুতেই থামে না।

ডাক্তার। (বৃহৎ ছুরি লইয়া) টোমার চুরি ব্যামো হইয়াছে, ছুরি না ডিলে সারিবে না।

পেট চিরিতে উদ্যত

হারাধন। (কাঁদিয়া হাঁস বাহির করিয়া) সাহেব, এই নাও তোমার হাঁস। তোমার এ হাঁস কোনোমতেই আমার পেটে সইল না। এর চেয়ে ডিমগুলো ছিল ভালো।

হারাধনকে ধরিয়া সাহেবের প্রহার

সাহেব, আর আবশ্যক নেই, আমার ব্যামো একেবারেই সেরে গেছে।

জ্যৈষ্ঠ ১২৯২

চিন্তাশীল

প্রথম দৃশ্য

চিন্তাশীল নরহরি চিন্তায় নিমগ্ন। ভাত শুকাইতেছে। মা মাছি তাড়াইতেছেন

মা। অত ভেবো না, মাথার ব্যামো হবে বাছা!

নরহরি। আচ্ছা মা, 'বাছা' শব্দের ধাতু কী বলো দেখি।

মা। কী জানি বাপু!

নরহরি। 'বৎস'। আজ তুমি বলছ 'বাছা'— দু-হাজার বৎসর আগে বলত 'বৎস'— এই কথাটা একবার ভালো করে ভেবে দেখো দেখি মা! কথাটা বড়ো সামান্য নয়। এ কথা যতই ভাববে ততই ভাবনার শেষ হবে না।

পুনরায় চিন্তায় মগ্ন

মা। যে ভাবনা শেষ হয় না এমন ভাবনার দরকার কী বাপ! ভাবনা তো তোর চিরকাল থাকবে, ভাত যে শুকোয়। লক্ষ্মী আমার, একবার ওঠ্।

নরহরি। (চমকিয়া) কী বললে মা? লক্ষ্মী? কী আশ্চর্য! এক কালে লক্ষ্মী বলতে দেবী-বিশেষকে বোঝাত। পরে লক্ষ্মীর গুণ অনুসারে সুশীলা স্ত্রীলোককে লক্ষ্মী বলত, কালক্রমে দেখো পুরুষের প্রতিও লক্ষ্মী শব্দের প্রয়োগ হচ্ছে! একবার ভেবে দেখো মা, আস্তে আস্তে ভাষার কেমন পরিবর্তন হয়! ভাবলে আশ্চর্য হতে হবে।

ভাবনায় দ্বিতীয় ডুব

মা। আমার আর কি কোনো ভাবনা নেই নরু? আচ্ছা, তুই তো এত ভাবিস, তুইই বল্ দেখি উপস্থিত কাজ উপস্থিত ভাবনা ছেড়ে কি এই-সব বাজে ভাবনা নিয়ে থাকা ভালো? সকল ভাবনারই তো সময় আছে।

নরহরি। এ কথাটা বড়ো গুরুতর মা! আমি হঠাৎ এর উত্তর দিতে পারব না। এটা কিছুদিন ভাবতে হবে, ভেবে পরে বলব।

মা। আমি যে কথাই বলি তোর ভাবনা তাতে কেবল বেড়েই ওঠে, কিছুতেই আর কমে না। কাজ নেই বাপু, আমি আর-কাউকে পাঠিয়ে দিই।

[প্রস্থান

মাসিমা

মাসিমা। ছি নরু, তুই কি পাগল হলি? ছেঁড়া চাদর, একমুখ দাড়ি— সমুখে ভাত নিয়ে ভাবনা! সুবলের মা তোকে দেখে হেসেই কুরুক্ষেত্র!

নরহরি। কুরুক্ষেত্র! আমাদের আর্যগৌরবের শ্মশানক্ষেত্র! মনে পড়লে কি শরীর লোমাঞ্চিত হয়

না ! অন্তঃকরণ অধীর হয়ে ওঠে না ! আহা, কত কথা মনে পড়ে ! কত ভাবনাই জেগে ওঠে ! বলো কী মাসি ! হেসেই কুরুক্ষেত্র ! তার চেয়ে বলো-না কেন কেঁদেই কুরুক্ষেত্র !

অশ্রুনিপাত

মাসিমা। ওমা, এ যে কাঁদতে বসল ! আমাদের কথা শুনলেই এর শোক উপস্থিত হয়। কাজ নেই বাপু !

[প্রস্থান

দিদিমা

দিদিমা। ও নরু, সূর্য যে অস্ত যায় !

নরহরি। ছি দিদিমা, সূর্য তো অস্ত যায় না। পৃথিবীই উলটে যায়। রোসো, আমি তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। (চারি দিকে চাহিয়া) একটা গোল জিনিস কোথাও নেই ?

দিদিমা। এই তোমার মাথা আছে— মুণ্ডু আছে।

নরহরি। কিন্তু মাথা যে বদ্ধ, মাথা যে ঘোরে না।

দিদিমা। তোমারই ঘোরে না, তোমার রকম দেখে পাড়াসুদ্ধ লোকের মাথা ঘুরছে ! নাও, আর তোমায় বোঝাতে হবে না, এ দিকে ভাত জুড়িয়ে গেল, মাছি ভন্ ভন্ করছে।

নরহরি। ছি দিদিমা, এটা যে তুমি উলটো কথা বললে ! মাছি তো ভন্ ভন্ করে না। মাছির ডানা থেকেই এইরকম শব্দ হয়। রোসো, আমি তোমাকে প্রমাণ করে দিচ্ছি—

দিদিমা। কাজ নেই তোমার প্রমাণ করে।

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

নরহরি চিন্তামগ্ন। ভাবনা ভাঙাইবার উদ্দেশে নরহরির
শিশু ভাগিনেয়কে কোলে করিয়া মাতার প্রবেশ

মা। (শিশুর প্রতি) জাদু, তোমার মামাকে দণ্ডবৎ করো।

নরহরি। ছি-মা, ওকে ভুল শিখিয়ো না। একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে, ব্যাকরণ-অনুসারে দণ্ডবৎ করা হতেই পারে না— দণ্ডবৎ হওয়া বলে। কেন বুঝতে পেরেছ মা ? কেননা দণ্ডবৎ মানে—

মা। না বাবা, আমাকে পরে বুঝিয়ে দিলেই হবে। তোমার ভাগ্‌নেকে এখন একটু আদর করো।

নরহরি। আদর করব ? আচ্ছা, এসো আদর করি। (শিশুকে কোলে লইয়া) কী করে আদর আরম্ভ করি ? রোসো, একটু ভাবি।

চিন্তামগ্ন

মা। আদর করবি, তাতেও ভাবতে হবে নরু ?

নরহরি। ভাবতে হবে না মা ? বল কী ! ছেলেবেলাকার আদরের উপরে ছেলের সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করে তা কি জান ? ছেলেবেলাকার এক-একটা সামান্য ঘটনার ছায়া বৃহৎ আকার ধরে আমাদের সমস্ত যৌবনকালকে, আমাদের সমস্ত জীবনকে আচ্ছন্ন করে রাখে এটা যখন ভেবে দেখা যায়— তখন কি ছেলেকে আদর করা একটা সামান্য কাজ বলে মনে করা যায় ? এইটে একবার ভেবে দেখো দেখি মা !

মা। থাক্ বাবা, সে কথা আর-একটু পরে ভাবব, এখন তোমার ভাগ্‌নেটির সঙ্গে দুটো কথা কও দেখি।

নরহরি। ওদের সঙ্গে এমন কথা কওয়া উচিত যাতে ওদের আমোদ এবং শিক্ষা দুই হয়। আচ্ছা, হরিদাস, তোমার নামের সমাস কী বলো দেখি।

হরিদাস। আমি চমা কাব।

মা। দেখো দেখি বাছা, ওকে এ-সব কথা জিগেস কর কেন? ও কী জানে!

নরহরি। না, ওকে এই বেলা থেকে এইরকম করে অল্পে অল্পে মুখস্থ করিয়ে দেব।

মা। (ছেলে তুলিয়া লইয়া) না বাবা, কাজ নেই তোমার আদর করে।

নরহরি মাথায় হাত দিয়া পুনশ্চ চিন্তায় মগ্ন

(কাতর হইয়া) বাবা, আমায় কাশী পাঠিয়ে দে, আমি কাশীবাসী হব।

নরহরি। তা যাও-না মা! তোমার ইচ্ছে হয়েছে, আমি বাধা দেব না।

মা। (স্বগত) নরু আমার সকল কথাতেই ভেবে অস্থির হয়ে পড়ে, এটাতে বড়ো বেশি ভাবতে হল না। (প্রকাশ্যে) তা হলে তো আমাকে মাসে মাসে কিছু টাকার বন্দোবস্ত করে দিতে হবে।

নরহরি। সত্যি নাকি? তা হলে আমাকে আর কিছুদিন ধরে ভাবতে হবে। এ কথা নিতান্ত সহজ নয়। আমি এক হপ্তা ভেবে পরে বলব।

মা। (ব্যস্ত হইয়া) না বাবা, তোমার আর ভাবতে হবে না— আমার কাশী গিয়ে কাজ নেই।

আশ্বিন-কার্তিক ১২৯২

ভাব ও অভাব

কবিবর কুঞ্জবিহারীবাবু ও বশম্বদবাবু

কুঞ্জবিহারী। কী অভিপ্রায়ে আগমন?

বশম্বদ। আজ্ঞে, আর তো অন্ন জোটে না; মশায় সেই-যে কাজের—

কুঞ্জবিহারী। (ব্যস্তসমস্ত হইয়া) কাজ? কাজ আবার কিসের? আজ এই সুমধুর শরৎকালে কাজের কথা কে বলে?

বশম্বদ। আজ্ঞে, ইচ্ছে করে কেউ বলে না, পেটের জ্বালায়—

কুঞ্জবিহারী। পেটের জ্বালা? ছিছি, ওটা অতি হীন কথা— ও কথা আর বলবেন না।

বশম্বদ। যে আজ্ঞে, আর বলব না। কিন্তু ওটা সর্বদাই মনে পড়ে।

কুঞ্জবিহারী। বলেন কী বশম্বদবাবু, সর্বদাই মনে পড়ে? এমন প্রশান্ত নিস্তব্ধ সুন্দর সন্ধ্যাবেলাতেও মনে পড়ছে?

বশম্বদ। আজ্ঞে, পড়ছে বৈকি। এখন আরো বেশি মনে পড়ছে। সেই সাড়ে-দশটা বেলায় দুটি ভাত মুখে গুঁজে উমেদারি করতে বের হয়েছিলুম, তার পরে তো আর খাওয়া হয় নি।

কুঞ্জবিহারী। তা না'ই হল। খাওয়া না'ই হল।

বশম্বদবাবুর নীরবে মাথা-চুলকন

এই শরতের জ্যোৎস্নায় কি মনে হয় না যে, মানুষ যেন পশুর মতো কতকগুলো আহার না করেও বেঁচে থাকে! যেন কেবল এই চাঁদের আলো, ফুলের মধু, বসন্তের বাতাস খেয়েই জীবন বেশ চলে যায়!

বশম্বদ। (সভয়ে মৃদুস্বরে) আজ্ঞে, জীবন বেশ চলে যায় সত্যি, কিন্তু জীবন রক্ষে হয় না— আরো কিছু খাবার আবশ্যক করে।

কুঞ্জবিহারী। (উষ্ণভাবে) তবে তাই খাও গে যাও। কেবল মুঠো মুঠো কতকগুলো ভাত ডাল আর চচ্চড়ি গেলো গে যাও। এখানে তোমাদের অনধিকার প্রবেশ।

বশম্বদ। সেগুলো কোথায় পাওয়া যাবে মশায়! আমি এখনই যাচ্ছি। (কুঞ্জবাবুকে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইতে দেখিয়া) কুঞ্জবাবু আপনি ঠিক বলেছেন, আপনার এই বাগানের হাওয়া খেলেই পেট ভরে যায়। আর কিছু খেতে ইচ্ছে করে না।

কুঞ্জবিহারী। এ কথা আপনার মুখে শুনে খুশি হলুম, এই হচ্ছে যথার্থ মানুষের মতো কথা। চলুন, বাইরে চলুন; এমন বাগান থাকতে ঘরে কেন?

বশম্বদ। চলুন। (আপন মনে মৃদুস্বরে) হিমের সময়টা— গায়েও একখানা কাপড় নেই—

কুঞ্জবিহারী। বা— শরৎকালের কী মাধুরী!

বশম্বদ। তা ঠিক কথা। কিন্তু কিছু ঠাণ্ডা।

কুঞ্জবিহারী। (গায়ে শাল টানিয়া) কিছুমাত্র ঠাণ্ডা নয়।

বশম্বদ। না, ঠাণ্ডা নয়। (হিহিহি কম্পন)

কুঞ্জবিহারী। (আকাশে চাহিয়া) বা বা বা— দেখে চক্ষু জুড়োয়। খণ্ড খণ্ড সাদা মেঘগুলি নীল আকাশ-সরোবরে রাজহংসের মতো ভেসে বেড়াচ্ছে, আর মাঝখানে চাঁদ যেন—

বশম্বদ। (গুরুতর কাশি) খক্ খক্ খক্ খক্!

কুঞ্জবিহারী। মাঝখানে চাঁদ যেন—

বশম্বদ। খন্ খন্ খক্ খক্!

কুঞ্জবিহারী। (ঠেলা দিয়া) শুনছেন বশম্বদবাবু— মাঝখানে চাঁদ যেন—

বশম্বদ। রসুন একটু— খক্ খক্ খন্ খন্ ঘড়্ ঘড়্!

কুঞ্জবিহারী। (চটিয়া উঠিয়া) আপনি অত্যন্ত বদলোক। এরকম করে যদি কাশতে হয় তো আপনি ঘরের কোণে গিয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকুন। এমন বাগান—

বশম্বদ। (সভয়ে প্রাণপণে কাশি চাপিয়া) আজ্ঞে, আমার আর কিছু নেই। (স্বগত) অর্থাৎ কম্বলও নেই, কাঁথাও নেই।

কুঞ্জবিহারী। এই শোভা দেখে আমার একটি গান মনে পড়ছে। আমি গাই—

সু-উ-উন্দর উপবন বিকশিত তরু-উগণ মনোহর বকু—

বশম্বদ। (উৎকট হাঁচি) হ্যাঁচ্ছোঃ!

কুঞ্জবিহারী। মনোহর বকু—

বশম্বদ। হ্যাঁচ্ছোঃ— হ্যাঁচ্ছোঃ—

কুঞ্জবিহারী। শুনছেন? মনোহর বকু—

বশম্বদ। হ্যাঁচ্ছোঃ হ্যাঁচ্ছোঃ!

কুঞ্জবিহারী। বেরোও আমার বাগান থেকে—

বশম্বদ। রসুন— হ্যাঁচ্ছোঃ!

কুঞ্জবিহারী। বেরোও এখেন থেকে—

বশম্বদ। এখনি বেরোচ্ছি— আমার আর এক দণ্ডও এ বাগানে থাকবার ইচ্ছে নেই— আমি না বেরোলে আমার মহাপ্রাণী বেরোবেন। হ্যাঁচ্ছোঃ! শরৎকালের মাধুরী আমার নাক-চোখ দিয়ে বেরোচ্ছে। প্রাণটা সুদ্ধ হেঁচে ফেলবার উপক্রম। হ্যাঁচ্ছোঃ হ্যাঁচ্ছোঃ! খক্ খক্! কিন্তু কুঞ্জবাবু, সেই কাজটা যদি— হ্যাঁচ্ছোঃ!

কুঞ্জবাবু শাল মুড়ি দিয়া নীরবে আকাশের চাঁদের দিকে চাহিয়া থাকন

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। খাবার এসেছে।

কুঞ্জবিহারী। দেরি করলি কেন? খাবার আনতে দু-ঘণ্টা লাগে বুঝি?

[দ্রুত প্রস্থান

অগ্রহায়ণ ১২৯২

রোগীর বন্ধু

রেলগাড়িতে দুঃখীরাম ও বৈদ্যনাথবাবু

বৈদ্যনাথ। (মাথায় হাত দিয়া) উ—উ—উঃ!

দুঃখীরাম। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) হা—হাঃ!

কাতরভাবে বৈদ্যনাথের প্রতি নিরীক্ষণ

বৈদ্যনাথ। (দুঃখীরামের মনোযোগ দেখিয়া) দেখছেন তো মশায়, ব্যামোর কষ্টটা তো দেখছেন!

দুঃখীরাম। না, আমি তা দেখছি নে। আপনাকে দেখে আমার পুনর্বার ভ্রাতৃশোক উপস্থিত হচ্ছে। হা হাঃ!

নিশ্বাস

বৈদ্যনাথ। সে কী কথা!

দুঃখীরাম। হাঁ মশায়! মরবার সময় তার ঠিক আপনার মতো চেহারা হয়ে এসেছিল—

বৈদ্যনাথ। (শশব্যস্ত হইয়া) বলেন কী!

দুঃখীরাম। যথার্থ কথা। ঐরকম তার চোখ বসে গিয়েছিল, গালের মাংস ঝুলে পড়েছিল, হাত-পা সরু হয়ে গিয়েছিল, ঠোঁট সাদা, মুখের চামড়া হলদে—

বৈদ্যনাথ। (আকুলভাবে) বলেন কী মশায়! আমার কি তবে এমন দশা হয়েছে? এ কথা আমাকে তো কেউ বলে নি—

দুঃখীরাম। কেনই বা বলবে? এ সংসারে প্রকৃত বন্ধু কেই বা আছে?

দীর্ঘনিশ্বাস

বৈদ্যনাথ। ডাক্তার তো আমাকে বার বার বলেছে আমার কোনো ভাবনার কারণ নেই।

দুঃখীরাম। ডাক্তার? ডাক্তারের কথা আপনি এক তিল বিশ্বাস করেন? ডাক্তারকে বিশ্বাস করেই কি আমরা অকূল পাথারে পড়ি নি? যখন আসন্ন বিপদ সেই সময়েই তারা বেশি করে আশ্বাস দেয়, অবশেষে যখন রোগীর হাতে-পায়ে খিল ধরে আসে, তার চোখ উলটে যায়, তার গা-হাত-পা হিম হয়ে আসে, তার—

বৈদ্যনাথ। (দুঃখীরামের হাত ধরিয়া) ক্ষমা করুন মশায়, আর বলবেন না মশায়! আমার গা-হাত-পা হিম হয়েই এসেছে। আপনার বর্ণনা সদ্যসদ্যই খেটে যাবে।

(বুকে হাত দিয়া) উ উ উঃ!

দুঃখীরাম। দেখেছেন মশায়? আমি তো বলেইছি— ডাক্তারের আশ্বাসবাক্যে কিছুমাত্র বিশ্বাস করবেন না। আচ্ছা, একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি— আপনি কি রাত্রে চিত হয়ে শোন?

বৈদ্যনাথ। হাঁ, চিত হয়ে না শুলে আমার ঘুম হয় না।

দুঃখীরাম। (নিশ্বাস ফেলিয়া) আমার ভায়েরও ঠিক ঐ দশা হয়েছিল। সে একেবারেই পাশ ফিরতে পারত না।

বৈদ্যনাথ। আমি তো ইচ্ছা করলেই পাশ ফিরতে পারি।

দুঃখীরাম। এখন পারছেন। কিন্তু ক্রমে আর পারবেন না।

বৈদ্যনাথ। সত্যি নাকি!

দুঃখীরাম। ক্রমে আপনার বাঁ-দিকের পাঁজরায় একরকম বেদনা ধরবে, ক্রমে পায়ের আঙুলগুলো একেবারে আড়ষ্ট হয়ে যাবে, গাঁঠ ফুলে উঠবে, ক্রমে—

বৈদ্যনাথ। (গলদ্‌ঘর্ম হইয়া) দোহাই আপনার, আর বলবেন না। আমার বুক ধড়াস্‌ ধড়াস্‌ করছে!

দুঃখীরাম। আপনার এইবেলা সাবধান হওয়া উচিত।

বৈদ্যনাথ। উচিত তা যেন বুঝলুম, কিন্তু কী করব বলুন।

দুঃখীরাম। আপনি কি অ্যালোপ্যাথি-মতে চিকিৎসা করাচ্ছেন?

বৈদ্যনাথ। হাঁ।

দুঃখীরাম। কী সর্বনাশ! অ্যালোপ্যাথরা তো বিষ খাওয়ায়, ব্যামোর চেয়ে ওষুধ ভয়ানক। যমের চেয়ে ডাক্তারকে ডরাই।

বৈদ্যনাথ। (শঙ্কিত হইয়া) বটে! তা, কী করব? হোমিওপ্যাথি দেখব?

দুঃখীরাম। হোমিওপ্যাথি তো শুধু জলের ব্যবস্থা।

বৈদ্যনাথ। তবে কি বদ্যি দেখাব?

দুঃখীরাম। তার চেয়ে খানিকটা আফিং তুঁতের জলে গুলে হরতেল মিশিয়ে খান-না কেন?

বৈদ্যনাথ। রাম রাম! তবে কী করা যায় মশায়!

দুঃখীরাম। কিছু করবার নেই, কোনো উপায় নেই এ আপনাকে নিশ্চিত বলছি।

বৈদ্যনাথ। মশায়, আমি রোগা মানুষ, আমাকে এরকম ভয় দেখানো উচিত হয় না।

দুঃখীরাম। ভয় কিসের মশায়? এ সংসারে তো কেবলই দুঃখ কষ্ট বিপদ। চতুর্দিক অন্ধকার। বিষাদের মেঘে আচ্ছন্ন। হা-হুতাশ ছাড়া আর কিছু শোনা যায় না। এখানে আমরা বিষধর সর্পের গর্তে বাস করছি। এখেন থেকে বিদায় হওয়াই ভালো।

নিশ্বাস

বৈদ্যনাথ। দেখুন, ডাক্তার আমাকে সর্বদা আমোদ-আহ্লাদ নিয়ে প্রফুল্ল থাকতে বলেছে। আপনার ঐ মুখ দেখেই আমার ব্যামো যেন হুহু করে বেড়ে উঠছে। আমাকে দেখে আপনার ভ্রাতৃশোক জন্মেছিল, কিন্তু আপনার ঐ অন্ধকার দাড়ি ঝাড়া দিলেই দেড় ডজন পুত্রশোক ঝরে পড়ে। আপনি একটা ভালো কথা তুলুন।

এটা কোন্‌ স্টেশন মশায়?

দুঃখীরাম। এটা মধুপুর। এখেনে এ বৎসর যেরকম ওলাউঠো হয়েছে সে আর বলবার নয়।

বৈদ্যনাথ। (ব্যস্ত হইয়া) ওলাউঠো! বলেন কী! এখেনে গাড়ি কতক্ষণ থাকে?

দুঃখীরাম। আধ ঘণ্টা। এখেনে পাঁচ মিনিট থাকাও উচিত না।

বৈদ্যনাথ। (শুইয়া পড়িয়া) কী সর্বনাশ!

দুঃখীরাম। ভয় করা বড়ো খারাপ। ভয় ধরলে তাকে ওলাউঠো আগে ধরে। লরি-সাহেবের বইয়ে লেখা আছে—

বৈদ্যনাথ। আপনি আমাকে ছাড়লে আমার ভয়ও ছাড়ে। আপনি আমার হাড়ে হাড়ে কাঁপুনি ধরিয়েছেন। আপনি ডাক্তার ডাকুন— আমার কেমন করছে।

দুঃখীরাম। ডাক্তার কোথায়?

বৈদ্যনাথ। তবে স্টেশনমাস্টারকে ডাকুন।

দুঃখীরাম। গাড়ি যে ছাড়ে-ছাড়ে।

বৈদ্যনাথ। তবে গার্ডকে ডাকুন।

দুঃখীরাম। গার্ড আপনার কী করতে পারবে?

দীর্ঘনিশ্বাস

বৈদ্যনাথ। তবে হরিকে ডাকুন। আমার হয়ে এল।

মূর্ছা

দুঃখীরামের উপর্যুপরি সুদীর্ঘ নিশ্বাসপতন ও গান—
'মনে করো শেষের সে দিন ভয়ংকর'

পৌষ ১২৯২

খ্যাতির বিড়ম্বনা

প্রথম দৃশ্য

উকিল দুকড়ি দত্ত চেয়ারে আসীন

ভয়ে ভয়ে খাতা-হস্তে কাঙালিচরণের প্রবেশ

দুকড়ি। কী চাই?

কাঙালি। আজ্ঞে, মশায় হচ্ছেন দেশহিতৈষী—

দুকড়ি। তা তো সকলেই জানে, কিন্তু আসল ব্যাপারটা কী?

কাঙালি। আপনি সাধারণের হিতের জন্য প্রাণপণ—

দুকড়ি। ক'রে ওকালতি ব্যাবসা চালাচ্ছি তাও কারও অবিদিত নেই— কিন্তু তোমার বক্তব্যটা কী?

কাঙালি। আজ্ঞে, বক্তব্য বেশি নেই।

দুকড়ি। তবে শীঘ্র শীঘ্র সেরে ফেলো-না।

কাঙালি। একটু বিবেচনা করে দেখলে আপনাকে স্বীকার করতেই হবে যে 'গানাৎ পরতরং নহি'—

দুকড়ি। বাপু, বিবেচনা এবং স্বীকার করবার পূর্বে যে কথাটা বললে তার অর্থ জানা বিশেষ আবশ্যক। ওটা বাংলা করে বলো।

কাঙালি। আজ্ঞে বাংলাটা ঠিক জানি নে। তবে মর্ম হচ্ছে এই, গান জিনিসটা শুনতে বড়ো ভালো লাগে।

দুকড়ি। সকলের ভালো লাগে না।

কাঙালি। গান যার ভালো না লাগে সে হচ্ছে—

দুকড়ি। উকিল শ্রীযুক্ত দুকড়ি দত্ত।

কাঙালি। আজ্ঞে, অমন কথা বলবেন না।

দুকড়ি। তবে কি মিথ্যে কথা বলব?

কাঙালি। আর্যাবর্তে ভরত মুনি হচ্ছেন গানের প্রথম—

দুকড়ি। ভরত মুনির নামে যদি কোনো মকদ্দমা থাকে তো বলো, নইলে বক্তৃতা বন্ধ করো।

কাঙালি। অনেক কথা বলবার ছিল—

দুকড়ি। কিন্তু অনেক কথা শোনবার সময় নেই।

কাঙালি। তবে সংক্ষেপে বলি। এই মহানগরীতে গানোন্নতিবিধায়িনী-নাম্নী এক সভা স্থাপন করা গেছে, তাতে মহাশয়কে—

দুকড়ি। বক্তৃতা দিতে হবে?

কাঙালি। আজ্ঞে না।

দুকড়ি। সভাপতি হতে হবে?

কাঙালি। আজ্ঞে না।

দুকড়ি। তবে কী করতে হবে বলো। গান গাওয়া এবং গান শোনা, এ দুটোর কোনোটা আমার দ্বারা কখনো হয় নি এবং হবেও না— তা আমি আগে থাকতে বলে রাখছি।

কাঙালি। মশায়কে ও-দুটোর কোনোটাই করতে হবে না। (খাতা অগ্রসর করিয়া) কেবল কিঞ্চিৎ চাঁদা—

দুকড়ি। (ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া) চাঁদা! আ সর্বনাশ! তুমি তো সহজ লোক নও হে! ভালোমানুষটির মতো মুখ কাঁচুমাচু করে এসেছ— আমি বলি, বুঝি কী মকদ্দমার ফেসাদে পড়েছ! তোমার চাঁদার খাতা নিয়ে বেরোও এখনি, নইলে ট্রেস্‌পাসের দাবি দিয়ে পুলিস-কেস আনব।

কাঙালি। চাইলুম চাঁদা, পেলুম অর্ধচন্দ্র! (স্বগত) কিন্তু তোমাকে জব্দ করব।

দ্বিতীয় দৃশ্য

দুকড়িবাবু কতকগুলি সংবাদপত্র-হস্তে

দুকড়ি। এ তো বড়ো মজাই হল! কাঙালিচরণ বলে কে একজন লোক ইংরেজি বাংলা সমস্ত খবরের কাগজে লিখে পাঠিয়েছে যে আমি তাদের 'গানোন্নতিবিধায়িনী' সভায় পাঁচ হাজার টাকা দান করেছি। দান চুলোয় যাক, গলাধাক্কা দিতে বাকি রেখেছি। মাঝের থেকে আমার খুব নাম রটে গেল— এতে আমার ব্যাবসার পক্ষে ভারি সুবিধে। তাদেরও সুবিধে; লোকে মনে করবে, যখন পাঁচ হাজার টাকা দান পেয়েছে তখন অবিশ্যি মস্ত সভা। পাঁচ জায়গা থেকে ভারী ভারী চাঁদা আদায় হবে। যা হোক, আমার অদৃষ্ট ভালো।

কেরানিবাবুর প্রবেশ

কেরানি। মশায় তবে গানোন্নতিসভায় পাঁচ হাজার টাকা দান করেছেন?

দুকড়ি। (মাথা চুলকাইয়া হাসিয়া) আ— ও একটা কথার কথা। শোন কেন! কে বললে দিয়েছি? মনে করো যদি দিয়েই থাকি, তা হয়েছে কী? এত গোলের আবশ্যক কী?

কেরানি। আহা, কী বিনয়! পাঁচ হাজার টাকা নগদ দিয়ে গোপন করবার চেষ্টা, সাধারণ লোকের কাজ নয়।

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। নীচের ঘরে বিস্তর লোক জমা হয়েছে।

দুকড়ি। (স্বগত) দেখেছ! একদিনেই আমার পসার বেড়ে গেছে। (সানন্দে) একে একে তাদের উপরে নিয়ে আয়— আর পান-তামাক দিয়ে যা।

প্রথম ব্যক্তির প্রবেশ

দুকড়ি। (চৌকি সরাইয়া) আসুন— বসুন। মশায়, তামাক ইচ্ছে করুন। ওরে— পান দিয়ে যা।

প্রথম। (স্বগত) আহা, কী অমায়িক প্রকৃতি! এঁর কাছে কামনাসিদ্ধি হবে না তো কার কাছে হবে!

দুকড়ি। মশায়ের কী অভিপ্রায়ে আগমন?

প্রথম। আপনার বদান্যতা দেশবিখ্যাত।

দুকড়ি। ও-সব গুজবের কথা শোনেন কেন ?

প্রথম। কী বিনয় ! কেবল মশায়ের নামই শ্রুত ছিলুম, আজ চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন হল।

দুকড়ি। (স্বগত) এখন আসল কথাটা যে পাড়লে হয়। বিস্তর লোক বসে আছে। (প্রকাশ্যে) তা, মশায়ের কী আবশ্যক ?

প্রথম। দেশের উন্নতি-উদ্দেশে হৃদয়ের—

দুকড়ি। আজ্ঞে, সে-সব কথা বলাই বাহুল্য—

প্রথম। তা ঠিক। মশায়ের মতো মহানুভব ব্যক্তি যাঁরা ভারতভূমির—

দুকড়ি। সমস্ত মানছি মশায়, অতএব ও অংশটুকুও ছেড়ে দিন। তার পরে—

প্রথম। বিনয়ী লোকের স্বভাবই এই যে, নিজের গুণানুবাদ—

দুকড়ি। রক্ষে করুন মশায়, আসল কথাটা বলুন।

প্রথম। আসল কথা কী জানেন— দিনে দিনে আমাদের দেশ অধোগতি প্রাপ্ত হচ্ছে—

দুকড়ি। সে কেবলমাত্র কথা সংক্ষেপ করতে না জানার দরুন।

প্রথম। আমাদের স্বর্ণশস্যশালিনী পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ দারিদ্র্যের অন্ধকূপে—

দুকড়ি। (সকাতরে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া) বলে যান।

প্রথম। দারিদ্র্যের অন্ধকূপে দিনে দিনে নিমজ্জমানা—

দুকড়ি। (কাতর স্বরে) মশায়, বুঝতে পারছি নে।

প্রথম। তবে আপনাকে প্রকৃত ব্যাপারটা বলি—

দুকড়ি। (সানন্দে সাগ্রহে) সেই ভালো।

প্রথম। ইংরেজেরা লুঠ করছে।

দুকড়ি। এ তো বেশ কথা। প্রমাণ সংগ্রহ করুন, ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে নালিশ রুজু করি।

প্রথম। ম্যাজিস্ট্রেটও লুঠছে।

দুকড়ি। তবে ডিস্ট্রিক্ট জজের আদালত—

প্রথম। ডিস্ট্রিক্ট জজ তো ডাকাত।

দুকড়ি। (অবাকভাবে) আপনার কথা আমি কিছু বুঝতে পারছি নে।

প্রথম। আমি বলছি, দেশের টাকা বিদেশে চালান যাচ্ছে।

দুকড়ি। দুঃখের বিষয়।

প্রথম। তাই একটা সভা—

দুকড়ি। (সচকিত) সভা !

প্রথম। এই দেখুন-না খাতা।

দুকড়ি। (বিস্ফারিতনেত্রে) খাতা !

প্রথম। কিঞ্চিৎ চাঁদা—

দুকড়ি। (চৌকি হইতে লাফাইয়া উঠিয়া) চাঁদা ! বেরোও— বেরোও— বেরোও—

তাড়াতাড়ি চৌকি-উল্টায়ন, কালি-ফেলন, প্রথম ব্যক্তির
বেগে প্রস্থানোদ্যম, পতন, উত্থান, গোলমাল

দ্বিতীয় ব্যক্তির প্রবেশ

দুকড়ি। কী চাই ?

দ্বিতীয়। মহাশয়ের দেশবিখ্যাত বদান্যতা—

দুকড়ি। ও-সব হয়ে গেছে— হয়ে গেছে— নতুন কিছু থাকে তো বলুন।

দ্বিতীয়। আপনার দেশহিতৈষিতা—

দুকড়ি। আ মোলো— এও যে সেই কথাটাই বলে!
দ্বিতীয়। স্বদেশের সদনুষ্ঠানে আপনার সদনুরাগ—
দুকড়ি। এ তো বিষম দায় দেখি। আসল কথাটা খুলে বলুন।
দ্বিতীয়। একটা সভা—
দুকড়ি। আবার সভা!
দ্বিতীয়। এই দেখুন-না খাতা।
দুকড়ি। খাতা! কিসের খাতা!
দ্বিতীয়। চাঁদা আদায়—
দুকড়ি। চাঁদা! (হাত ধরিয়া টানিয়া) ওঠো, ওঠো, বেরোও, বেরোও— প্রাণের মায়া থাকে তো—

[দ্বিরুক্তি না করিয়া চাঁদাওয়ালার প্রস্থান

তৃতীয় ব্যক্তির প্রবেশ

দুকড়ি। দেখো বাপু, আমার দেশহিতৈষিতা বদান্যতা বিনয় এ-সমস্ত শেষ হয়ে গেছে— তার পর থেকে আরম্ভ করো।
তৃতীয়। আপনার সার্বভৌমিকতা— সার্বজনীনতা— উদারতা—
দুকড়ি। তবু ভালো। এ কিছু নতুন ঠেকছে বটে। কিন্তু মশায়, ওগুলোও থাক্— ভাষায় কথা আরম্ভ করুন।
তৃতীয়। আমাদের একটা লাইব্রেরি—
দুকড়ি। লাইব্রেরি? সভা নয় তো?
তৃতীয়। আজ্ঞে, সভা নয়।
দুকড়ি। আ, বাঁচা গেল। লাইব্রেরি। অতি উত্তম। তার পরে বলে যান।
তৃতীয়। এই দেখুন-না প্রস্পেক্টস—
দুকড়ি। খাতা নেই তো?
তৃতীয়। আজ্ঞে না— খাতা নয়, ছাপানো কাগজ।
দুকড়ি। আ!— তার পরে।
তৃতীয়। কিঞ্চিৎ চাঁদা।
দুকড়ি। (লাফাইয়া) চাঁদা! ওরে, আমার বাড়ি আজ ডাকাত পড়েছে রে! পুলিসম্যান! পুলিসম্যান!

[তৃতীয় ব্যক্তির ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন

হরশংকরবাবুর প্রবেশ

দুকড়ি। আরে, এসো এসো, হরশংকর এসো। সেই কালেজে একসঙ্গে পড়া— তার পরে তো আর দেখা হয় নি— তোমাকে দেখে কী যে আনন্দ হল সে আর কী বলব।
হরশংকর। তোমার সঙ্গে সুখদুঃখের অনেক কথা আছে ভাই— সে-সব কথা পরে হবে, আগে একটা কাজের কথা বলে নিই।
দুকড়ি। (পুলকিত হইয়া) কাজের কথা অনেকক্ষণ শুনি নি ভাই— বলো, শুনে কান জুড়োক।

শালের মধ্য হইতে হরশংকরের খাতা বাহির-করণ

ও কী ও, খাতা বেরোয় যে!
হরশংকর। আমাদের পাড়ার ছেলেরা মিলে একটা সভা—

দুকড়ি। (চমকিত হইয়া) সভা!

হরশংকর। সভাই বটে। তা কিছু চাঁদার জন্যে—

দুকড়ি। চাঁদা! দেখো, তোমার সঙ্গে আমার বহুকালের প্রণয়, কিন্তু ঐ কথাটা যদি আমার সামনে উচ্চারণ কর তা হলে চিরকালের মতো চটাচটি হবে তা বলে রাখছি।

হরশংকর। বটে! তুমি কোথাকার খরগেছের 'গানোন্নতি' সভায় পাঁচ হাজার টাকা দান করতে পার, আর বন্ধুর অনুরোধে পাঁচ টাকা সই করতে পার না! কোন্ পাষণ্ড নরাধম এখেনে আর পদার্পণ করে।

[সবেগে প্রস্থান

খাতা-হস্তে এক ব্যক্তির প্রবেশ

দুকড়ি। খাতা? আবার খাতা? পালাও পালাও!

খাতাবাহক। (ভীত হইয়া) আমি নন্দলালবাবুর—

দুকড়ি। নন্দলাল ফন্দলাল বুঝি নে, পালাও এখনই।

খাতাবাহক। আজ্ঞে, সেই টাকাটা।

দুকড়ি। আমি টাকা দিতে পারব না। বেরোও বেরোও।

[খাতাবাহকের পলায়ন

কেরানি। মশায়, করলেন কী? নন্দলালবাবুর কাছ থেকে আপনার পাওনার টাকাটা নিয়ে এসেছে। ও টাকাটা আদায় না হলে আজ যে চলবে না।

দুকড়ি। কী সর্বনাশ! ওকে ডাকো ডাকো।

কেরানির প্রস্থান ও কিয়ৎক্ষণ পরে প্রবেশ

কেরানি। সে চলে গেছে, তাকে পাওয়া গেল না।

দুকড়ি। বিষম দায় দেখছি।

তম্বুরা-হস্তে এক ব্যক্তির প্রবেশ

দুকড়ি। কী চাও?

তম্বুরা। আপনার মতো এমন রসজ্ঞ কে আছে। গানের উন্নতির জন্য আপনি কী না করছেন। আপনাকে গান শোনাব।

তৎক্ষণাৎ তম্বুরা ছাড়িয়া গান

ইমনকল্যাণ

জয় জয় দুকড়ি দত্ত,
ভুবনে অনুপম মহত্ত্ব— ইত্যাদি—

দুকড়ি। আরে, কী সর্বনাশ! থাম্ থাম্!

তম্বুরা-হস্তে দ্বিতীয় ব্যক্তির প্রবেশ

দ্বিতীয়। ও গানের কী জানে মশায়? আমার গান শুনুন—

দুকড়ি দত্ত তুমি ধন্য,
তব মহিমা কে জানিবে অন্য—

প্রথম। জয়-অ-জ-অ-অ-য়-অ-অ—

দ্বিতীয়। দু-উ-উ-উ-উ-উ কড়ি-ই-ই—
প্রথম। দুক-অ-অ-অ—
দুকড়ি। (কানে আঙুল দিয়া) আরে গেলুম, আরে গেলুম!

বাঁয়া-তবলা লইয়া বাদকের প্রবেশ

বাদক। মশায়, সংগত নেই গান! সে কি হয়!

বাদ্য আরম্ভ

দ্বিতীয় বাদকের প্রবেশ

দ্বিতীয় বাদক।। ও বেটা সংগতের কী জানে! ও তো বাঁয়া ধরতেই জানে না।
প্রথম গায়ক। তুই বেটা থাম্।
দ্বিতীয়। তুই থাম্-না।
প্রথম। তুই গানের কী জানিস!
দ্বিতীয়। তুই কী জানিস?

উভয়ে মিলিয়া ওড়ব খাড়ব প্রণব নাদ উদারা তারা লইয়া তর্ক। অবশেষে তম্বুরায় তম্বুরায় লড়াই
দুই বাদকে মুখে মুখে বোল-কাটাকাটি 'ধেকেটে দেধে ঘেনে গেধে ঘেনে'। অবশেষে তবলায় তবলায় যুদ্ধ

দলে দলে গায়ক বাদক ও খাতা-হস্তে চাঁদাওয়ালার প্রবেশ

প্রথম। মশায়, গান—
দ্বিতীয়। মশায়, চাঁদা—
তৃতীয়। মশায়, সভা—
চতুর্থ। আপনার বদান্যতা—
পঞ্চম। ইমনকল্যাণের খেয়াল—
ষষ্ঠ। দেশের মঙ্গল—
সপ্তম। সরি মিঞার টপ্পা—
অষ্টম। আরে, তুই থাম্-না বাপু—
নবম। আমার কথাটা বলে নিই, একটু থাম্-না ভাই।

সকলে মিলিয়া দুকড়ির চাদর ধরিয়া টানাটানি, 'শুনুন মশাই, আমার কথা শুনুন মশাই' ইত্যাদি

দুকড়ি। (সকাতরে কেরানির প্রতি) আমি মামার বাড়ি চললুম। কিছুকাল সেখানে গিয়ে থাকব। কাউকে আমার ঠিকানা বোলো না।

[প্রস্থান

গৃহমধ্যে সমস্ত দিন গায়ক-বাদকের কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ
বিবাদ মিটাইতে গিয়া সন্ধ্যাকালে আহত হইয়া কেরানির পতন

মাঘ ১২৯২

আর্য ও অনার্য

অদ্বৈতচরণ চট্টোপাধ্যায় ও চিন্তামণি কুণ্ডু

অদ্বৈত। তুমি কে?
চিন্তামণি। আমি আর্য, আমি হিন্দু।
অদ্বৈত। নাম কী?
চিন্তামণি। শ্রীচিন্তামণি কুণ্ডু।
অদ্বৈত। কী অভিপ্রায়?
চিন্তামণি। মহাশয়ের কাগজে আমি লিখব।
অদ্বৈত। কী লিখবেন?
চিন্তামণি। আমি আর্য— আর্যধর্ম সম্বন্ধে লিখব।
অদ্বৈত। আর্য জিনিসটা কী মশায়?
চিন্তামণি। (বিস্মিত হইয়া) আজ্ঞে, আর্য কাকে বলে জানেন না? আমি আর্য, আমার বাবা শ্রীনকুড় কুণ্ডু আর্য, তাঁর বাবা ৺নফর কুণ্ডু আর্য, তাঁর বাবা—
অদ্বৈত। বুঝেছি! আপনাদের ধর্মটা কী?
চিন্তামণি। বলা ভারি শক্ত। সংক্ষেপে এই পর্যন্ত বলা যায় যে, যা অনার্যদের ধর্ম তা আর্যদের ধর্ম নয়।
অদ্বৈত। অনার্য আবার কারা?
চিন্তামণি। যারা আর্য নয় তারাই অনার্য। আমি অনার্য নই, আমার বাবা শ্রীনকুড় কুণ্ডু অনার্য নয়, তাঁর বাবা ৺নফর কুণ্ডু অনার্য নয়, তাঁর বাবা—
অদ্বৈত। আর বলতে হবে না। অতএব যে-হেতুক শ্রীনকুড় কুণ্ডু আমার বাবা নন এবং ৺নফর কুণ্ডুর সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই, আমিই হচ্ছি অনার্য।
চিন্তামণি। তা স্থির বলতে পারি নে।
অদ্বৈত। (ক্রুদ্ধ হইয়া) এ তোমার কিরকম কথা! স্থির বলতে পারি নে কী! নকুড় আমার বাবা নয় তুমি স্থির বলতে পার না? তুমি কোথাকার কী জাত, তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কিসের!
চিন্তামণি। জাতের কথা হচ্ছে না, বংশের কথা হচ্ছে। আপনিও তো ভুবনবিদিত আর্যবংশে জন্মগ্রহণ—
অদ্বৈত। তোমার বাবা নকুড় কুণ্ডু যে বংশে জন্মেছে আমিও সেই বংশে জন্মেছি! চাষার ঘরে জন্মে তোমার এতবড়ো আস্পর্ধা!
চিন্তামণি। যে আজ্ঞে, আপনি নাহয় আর্য না হলেন, আমি এবং আমার শ্রীবাবা আর্য! হায়! কোথায় আমাদের সেই পূর্বপুরুষগণ, কোথায় কশ্যপ ভরদ্বাজ ভৃগু—
অদ্বৈত। এ ব্যক্তি বলে কী! কশ্যপ তো আমাদের পূর্বপুরুষ, আমাদের কাশ্যপ গোত্রে জন্ম— তোমার পূর্বপুরুষ কশ্যপ ভরদ্বাজ ভৃগু এ কিরকম কথা!
চিন্তামণি। আপনি এ-সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, আপনার সঙ্গে এ সম্বন্ধে কোনো আলোচনা হতেই পারে না। হায়! এ-সকল ইংরাজি শিক্ষার শোচনীয় ফল।
অদ্বৈত। ইংরিজি শিক্ষা আপনাতে কি ফলে নি?
চিন্তামণি। আজ্ঞে, সে দোষ আমাকে দিতে পারবেন না, স্বাভাবিক আর্যরক্তের তেজে আমি অতি বাল্যকালেই ইস্কুল পালিয়েছিলুম।

হরিহরবাবু এবং অন্যান্য অনেকানেক লেখকের প্রবেশ

অদ্বৈত। আসতে আজ্ঞে হোক। লেখা সমস্ত প্রস্তুত ?

হরিহর। এই দেখুন-না।

চিন্তামণি। কী বিষয়ে লিখেছেন মশায় ?

হরিহর। নানা বিষয়ে।

চিন্তামণি। আর্যদের সম্বন্ধে কিছু লিখেছেন ?

হরিহর। না।

চিন্তামণি। আর্যদের বিজ্ঞান সম্বন্ধে—

হরিহর। য়ুরোপীয়েরা আর্যজাতি এবং তাঁদের বিজ্ঞান—

চিন্তামণি। য়ুরোপীয়েরা অতি নিকৃষ্ট জাতি এবং বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের পূর্বপুরুষ আর্যদের তুলনায় তারা নিতান্ত মূর্খ— আমি প্রমাণ করে দেব। এখনো আর্যবংশীয়েরা তেল মাখার পূর্বে অশ্বত্থামাকে স্মরণ করে ভূমিতে তিন বার তৈল নিক্ষেপ করেন। কেন করেন আপনি জানেন ?

হরিহর। না।

চিন্তামণি। আপনি ?

অদ্বৈত। না।

চিন্তামণি। আপনি জানেন ?

প্রথম লেখক। না।

চিন্তামণি। না যদি জানেন তবে আপনারা বিজ্ঞান সম্বন্ধে কথা কইতে যান কেন ? হাই তোলবার সময় আর্যরা তুড়ি দেন কেন আপনারা কেউ জানেন ?

সকলে। (সমস্বরে) আজ্ঞে, আমরা কেউ জানি নে।

চিন্তামণি। তবে ? এই-যে আমাদের আর্য মেয়েরা বাতাস করতে করতে পাখা গায়ে লাগলে ভূমিতে একবার ঠেকায়, তার কারণ আপনারা কিছু জানেন ?

সকলে। কিছু না !

চিন্তামণি। এই দেখুন দেখি ! এই-সকল বিষয় কিছুমাত্র আলোচনা না করেই, অনুসন্ধান না করেই, আপনারা বলেন য়ুরোপীয় বিজ্ঞান শ্রেষ্ঠ ! অথচ আর্যরা হাঁচে কেন, হাই তোলে কেন, তেল মাখে কেন, এ আপনারা কিছু জানেন না !

হরিহর। আচ্ছা মশায়, আপনিই বলুন। তেল মাখবার পূর্বে ভূমিতে তৈল নিক্ষেপ করবার কারণ কী ?

চিন্তামণি। ম্যাগ্‌নেটিজ্‌ম্ ! আর কিছু নয়। ইংরাজিতে যাকে বলে ম্যাগ্‌নেটিজ্‌ম্।

হরিহর। (সবিস্ময়ে) আপনি ম্যাগ্‌নেটিজ্‌ম্ সম্বন্ধে ইংরাজি বিজ্ঞানশাস্ত্র কিছু পড়েছেন ?

চিন্তামণি। কিছু না। দরকার নেই। বিজ্ঞান শিক্ষা কিংবা কোনো শিক্ষার জন্য ইংরিজি পড়বার কিছু প্রয়োজন নেই। আমাদের আর্যেরা কী বলেন ? প্রাণশক্তি কারণশক্তি এবং ধারণশক্তি এই তিন শক্তি আছে, তার উপরে তৈলের সারণশক্তি যোগ হয়ে ঠিক স্নানের অব্যবহিত পূর্বেই আমাদের শরীরের মধ্যে ভৌতিক বারণশক্তির উত্তেজনা হয়— এই তো ম্যাগ্‌নেটিজ্‌ম্। উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজেরা স্নানের পরে যে গায়ে তোয়ালে ঘষে, তার কত হাজার বৎসর আগে আমাদের আর্যদের মধ্যে গামছা দিয়ে গাত্রমার্জন প্রথা প্রচলিত ছিল ভেবে দেখুন দেখি।

লেখকগণ। (সবিস্ময়ে) আশ্চর্য ! ধন্য ! আর্যদের কী বিজ্ঞানপারদর্শিতা ! আর্য কুণ্ডুমশায়ের কী গবেষণা !

হরিহর। ভালো মূর্খের হাতেই আজ পড়া গিয়েছে। কিন্তু একে চটিয়ে কাজ নেই। নানা কাগজে লিখে থাকে। শুনেছি নাকি এই আর্য কুণ্ডু ভদ্রলোকদের বড্ড গাল দিতে পারে। সেইজন্যেই বিখ্যাত।

চিন্তামণি। ঐ দেখুন— ঐ আর্য ব্রাহ্মণ প্রাতঃকালে যে ফুল তুলছে, কেন তুলছে বলুন দেখি।

অদ্বৈত। পূজার সময় দেবতাকে দেবে বলে।

চিন্তামণি। ছি ছি, আপনারা কিছুই গভীর তলিয়ে দেখেন না। সকালে ফুল তুলতে যখন ঋষিরা অনুমতি করেছেন তখন স্পষ্টই প্রমাণ হচ্ছে যে, বাতাসে অক্সিজেন বাষ্প যে আছে এ তাঁরা জানতেন। তা যখন জানা ছিল, তখন অবশ্য অন্যান্য বাষ্পের কথাও তাঁরা জানতেন সন্দেহ নেই। এইরকম একে একে অতি স্পষ্ট করে প্রমাণ করে দেওয়া যায় যে, আধুনিক য়ুরোপীয় রসায়নশাস্ত্রের কিছুই তাঁদের অগোচর ছিল না। হাই তোলবার সময় তুড়ি দেওয়া কেন ? সেও ম্যাগ্নেটিজ্ম্। উত্তানবায়ুর সঙ্গে আধানশক্তির যোগ হয়ে যখন ভৌতিক বলে পরিচালিত নিধানশক্তি স্বশক্তির প্রভাবে প্রাণ কারণ এবং ধারণ এই তিনটেকে অতিক্রম করতে থাকে তখন সত্ত্ব রজ এবং তম এই তিনেরই ব্যতিক্রমদশা ঘটে। এমন সময়ে মধ্যমা এবং বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ঘর্ষণজনিত বায়ব তাপের কারণভূত স্নায়ব তাপ সৌর তাপের সঙ্গে মিলিত হয়ে জীবদেহের ভৌতিক তাপের আত্যন্তিক প্রলয়দশা ঘটতে দেয় না। একে বিজ্ঞান বলে না তো কাকে বিজ্ঞান বলে ? অথচ আমাদের আর্য ঋষিগণ ডারুয়িনের কোনো গ্রন্থই পড়েন নি !

লেখকগণ। আশ্চর্য ! ধন্য ! ধন্য আর্যমহিমা ! আমরা এতদিন এ-সকল কথার কিছুই বুঝতুম না !

হরিহর। (স্বগত) এবং আজও কিছু বুঝতে পারছি নে !

চিন্তামণি। মাটিতে পাখা ঠোকার বিষয়ে যদি জিজ্ঞাসা করেন তো সেও ম্যাগ্নেটিজ্ম্ ! সম্প্রসারণ এবং নিঃসারণ, বিপ্রকর্ষণ এবং নিকর্ষণ এই ক'টা ভৌতিক ক্রিয়ার যোগে—

অদ্বৈত। রক্ষা করুন মশায়, আমার মাথা ঘুরছে। পাখা ঠোকার বিষয়ে আপনি আমার কাগজে লিখবেন এখন ! আপনি অনেক বকেছেন, আপনাকে একটা পান আনিয়ে দিই।

চিন্তামণি। আজ্ঞে না, আপনার এখেনে আমি পান খেতে পারি নে। আপনি আর্যক্রিয়াকলাপ অনুসরণ করেন না— যে আধ্যাত্মিক শক্তি আমাদের আর্যনাড়ীতে কুলক্রমাগত প্রবাহিত হয়ে আসছে, সেই শক্তি—

অদ্বৈত। মশায়, থাক্ মশায়, আপনাকে পান দেব না, আপনি পান নেই খেলেন। অনুমতি করেন তো বরঞ্চ তামাক আনিয়ে দিচ্ছি।

চিন্তামণি। তামাক ! কী সর্বনাশ ! সে আরো খারাপ ! উৎকৃষ্ট জাতি নিকৃষ্ট জাতির হুঁকোয় তামাক খায় না কেন ? এক জাতি আর-এক জাতির স্পৃষ্ট অন্ন খায় না কেন ? আগে আর্য অনার্যের ছায়া মাড়াতেন না কেন ? তার মধ্যে কি বিজ্ঞান নেই ? অবশ্য আছে। আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। সেও ম্যাগ্নেটিজ্ম্। উত্তম মধ্যম এবং অধম এই তিনপ্রকার দেহজ বিকিরণশক্তি—

অদ্বৈত। থামুন থামুন— তামাক দেব না মশায়, কাজ নেই আপনার তামাক খেয়ে। পানও থাক্, তামাকও থাক্— যাতে আপনার সুবিধে হয়, যাতে আপনার দেহজ বিকিরণশক্তি রক্ষা হয়, তাই করুন।

লেখকগণ। ধিক্ অদ্বৈতবাবু, আপনি আর্যশ্রেষ্ঠ কুশুমশায়ের জ্ঞানগর্ভ কথা শুনতে দিলেন না !

প্রথম লেখক। (দ্বিতীয়ের প্রতি) কুশুমশায়ের কী অসাধারণ যুক্তিশক্তি ও জ্ঞান। কিন্তু কিছু কি বুঝতে পারলে ভাই ?

দ্বিতীয় লেখক। না ভাই, বোঝা গেল না। ভালো করে জিজ্ঞাসা করা যাক-না। আচ্ছা মশায়, আপনি ধারণ কারণ প্রভৃতি যে-সকল শক্তির উল্লেখ করলেন, সেগুলো কী ?

চিন্তামণি। সেগুলো আর কিছু নয়— ইংরেজিতে যাকে বলে ফোর্স্, যাকে বলে ম্যাগ্নেটিজ্ম্।

লেখকগণ। (সমস্বরে) ওঃ, বুঝেছি।

হরিহর। আজ্ঞে, আমি এখনো কিছু বুঝতে পারছি নে।

লেখকগণ। (বিরক্ত হইয়া) বুঝতে পারছেন না ! ম্যাগ্নেটিজ্ম্— ফোর্স্— সোজা কথা। ম্যাগ্নেটিজ্ম্ তো জানেন ? ফোর্স্ তো জানেন ? এও তাই আর-কি। আর্যদের অসাধারণ বিজ্ঞানচর্চা।

প্রথম লেখক। এ-সকল স্পষ্ট বুঝতে গেলে নানা শাস্ত্র জানা আবশ্যক। মশায়ের বোধ করি নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করা হয়েছে?

চিন্তামণি। না, শাস্ত্রটা এখনো পড়া হয় নি। আমি, আমার বাবা এবং নফর কুণ্ডু আর্য— এইজন্য শাস্ত্র অধ্যয়ন আমি বাহুল্য বিবেচনা করেছি।

দ্বিতীয় লেখক। তা বটে, কিন্তু বিজ্ঞানটা আপনি অবিশ্যি ভালো করেই পড়েছেন।

চিন্তামণি। আজ্ঞে না, আমি চিন্তাশক্তির প্রভাবে আমাদের আর্যজাতির হাঁচি কাশি তুড়ি আঙুল-মটকানো প্রভৃতি আচার-ব্যবহারের নানাবিধ সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসকল আয়ত্ত করেছি। আমার বিজ্ঞান পড়া আবশ্যক হয় নি। আপনারা শুনে হয়তো বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু আর্যশাস্ত্রের দিব্যি নিয়ে আমি শপথ করতে পারি, আমি আর্যশাস্ত্র কিংবা বিজ্ঞান কিছুই পড়ি নি। আমার সমস্ত বিদ্যা স্বাধীনচিন্তাপ্রসূত।

হরিহর। আজ্ঞে, শপথ করবার আবশ্যক নেই— পড়াশুনো আছে, এরূপ অপবাদ আপনাকে কেউ দেবে না।

চৈত্র ১২৯২

একান্নবর্তী

দৌলতচন্দ্র ও কানাই

দৌলত। হৃদয় যখন ভাবে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে তখন কোম্পানির দমকল এলেও থামাতে পারে না। একান্নবর্তী পরিবার -প্রথা সম্বন্ধে সভায় দাঁড়িয়ে অনর্গল বলতে লাগলুম, সভাপতি ঘুমিয়ে পড়াতে নিষেধ করবার কেউ রইল না। শেষকালে দুজন ছোকরা এসে দুই হাত ধরে আমাকে টেনে বসিয়ে দিলে। সেদিন এত উৎসাহ হয়েছিল!

কানাই। বটে, তা হবার কথাই তো। তা, আপনি কী বলেছিলেন?

দৌলত। আমি বলেছিলেম, স্বার্থত্যাগের একমাত্র উপায় একান্নবর্তী পরিবার। যেখানে পরের অর্থেই জীবননির্বাহ হয় সেখানে স্বার্থের কোনো প্রয়োজনই হয় না। খবরের কাগজে আমার বক্তৃতা খুব রটে গেছে— তারা সকলেই বলছে দুঃখের বিষয় দৌলতবাবুর পরিবার কেউ নেই, তিনি একলা।

দীর্ঘনিশ্বাস

জয়নারায়ণের প্রবেশ

জয়নারায়ণ। জয় হোক বাবা! আমি তোমার পিসে।

দৌলত। সে কী মশায়, আমার তো পিসি নেই।

জয়নারায়ণ। না, তাঁর কাল হয়েছে বটে।

দৌলত। পিসি কোনোকালেই যে ছিলেন না।

জয়নারায়ণ। (ঈষৎ হাসিয়া) সে কী করে হয় বাবা! আমি তা হলে তোমার পিসে হলুম কী করে! (কানাইয়ের প্রতি) কী বলেন মশায়!

কানাই। তা তো বটেই।

দৌলত। যে আজ্ঞে, তা আপনার কী অভিপ্রায়ে আগমন?

জয়নারায়ণ। অভিপ্রায় তেমন বিশেষ কিছু নয়। শুনলুম আমরা পৃথক হয়ে আছি ব'লে খবরের কাগজে নিন্দে করছে, তাই একত্র বাস করতে এসেছি।

দৌলত। আপনার সম্পত্তি কিছু আছে?

জয়নারায়ণ। কিছু নেই, কোনো বালাই নেই, কোনো উৎপাত নেই। কেবল এক খুড়তুতো ভাই আছে— তা, সেও এল ব'লে।

দৌলত। তা বটে। তাঁর কিছু আছে ?

জয়। কিছু না, কোনো ঝঞ্ঝাট না। কেবল দুই স্ত্রী ও চারটি শিশুসন্তান ; তারাও এল ব'লে। এতক্ষণ এসে পড়ত ; যাত্রা করবার বেলা দুই স্ত্রীতে চুলোচুলি বেধে গেছে, তাই যা দেরি।

দৌলত। কানাই, কী করা যায় !

জয়নারায়ণ। তোমাকে কিছুই করতে হবে না— তারা আপনারাই আসবে, ভাবনা কী দৌলত ! এত অল্পে কাতর হোয়ো না। তারা আজ সন্ধ্যার মধ্যেই এসে পৌঁছবে।

রামচরণের প্রবেশ ও ভূমিষ্ঠ হইয়া দৌলতকে প্রণাম

রামচরণ। মামা, তোমার বক্তৃতায় বড়ো লজ্জা দিয়েছ।

দৌলত। কে হে বাপু, কে তুমি ?

রামচরণ। আজ্ঞে, আপনারই ভাগ্নে রামচরণ। ইস্টিশনে লোক পাঠিয়ে দিন— সেখেনে একটি পুঁটুলি আর বুড়ি মাকে রেখে এসেছি।

দৌলত। এখানে কী করতে আসা ?

রামচরণ। বাস করতে।

দৌলত। আর কোথাও বাসস্থান নেই ?

রামচরণ। অমনি একরকম আছে বটে, কিন্তু সেখানে স্বার্থত্যাগ শিক্ষা হয় না।

দৌলত। (ভীতভাবে) কানাই !

কানাই। আপনার উপদেশ উনি যেরকম দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করেছেন ওঁকে বোধ হয় নড়ানো শক্ত হবে।

নিতাইয়ের প্রবেশ

নিতাই। দাদা, চাকরি ছেড়ে এলুম, নইলে তোমার যে নিন্দে হয়। কে আছিস রে ! ঝট্ করে দুটো ডাব পেড়ে নিয়ে আয় তো। বড়ো পিপাসা লেগেছে।

নদেরচাঁদের প্রবেশ

নদেরচাঁদ। এই লও খুড়ো, আমার সমস্ত স্বার্থ বিসর্জন দিতে এসেছি। এই আমার ভাঙা বোক্‌নো, থেলো হুঁকো আর এই বেড়ালছানাটি। এর মধ্যে ও-দুটো পৈতৃক সম্পত্তি, বেড়ালছানা আমার স্বোপার্জিত। আর আমায় দোষ দিতে পারবে না, তোমার এখানেই আমি লেগে রইলুম।

দর্জির প্রবেশ

দৌলত। তুমি আমার কে হও বাপু ?

দর্জি। আজ্ঞে আমি দর্জি, আপনার গায়ের মাপ নিতে এসেছি।

দৌলত। এখন যাও, টানাটানির সময়। এখন আমি কাপড় করাতে পারব না।

নদেরচাঁদ। খলিফাজি, যাও কোথায়। আমার গায়ের মাপটা নেও। খুড়োর গায়ে যেরকম ফুলকাটা ছিটের জামা দেখছি অমনি ছ-জোড়া হলেই আমার চলে যাবে। যদি বেশ ভালো রকম করে তৈরি করে দিতে পার তো খুড়ো তোমাকে খুশি করে দেবেন, বুঝেছ খলিফাজি ?

দর্জি। যে আজ্ঞে।

গায়ের মাপ-লওন

বালক-সমেত পরেশনাথের প্রবেশ

পরেশ। (দৌলতকে প্রণাম করিয়া বালকের প্রতি) তোর জ্যাঠামশায়কে প্রণাম কর্। দাদা, এই লও তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র।

দৌলত। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র!

পরেশ। যাকে চলিত বাংলায় বলে ভাইপো। দাদা যে একেবারে অবাক। ভ্রাতৃ শব্দের ষষ্ঠীতে হয় ভ্রাতুঃ, তার উপরে পুত্র শব্দ যোগ করলেই হল ভ্রাতুষ্পুত্র। স্বয়ং পাণিনি বোপদেব রয়েছেন, অন্য প্রমাণের প্রয়োজন কী? অতএব ইনি হলেন ভাইপো।

কানাই। আপনার ছেলেটি কী করেন?

পরেশ। ওকে নিজেই পড়াচ্ছিলুম। হ্রস্ব ই পর্যন্ত সেরে দীর্ঘ ঈতে এমনি আটকা পড়ল যে ভাবলুম, দৌলদ্দা যখন আছেন তখন ছেলের লেখাপড়ার দরকার কী? যে বেটার হ্রস্ব-দীর্ঘ জ্ঞান নেই তার পক্ষে বাবা-জ্যাঠা দুই সমান। কেমন কিনা?

কানাই। সমান বৈকি।

পরেশ। দাদা বলেছেন, নিজের ক্ষুধা হেয় জ্ঞান করে পরের ক্ষুধানিবৃত্তির সুখ একমাত্র একান্নবর্তী পরিবারেই সম্ভব। শুনেই ঠাওরালুম, এ সুখ দাদা নিশ্চয়ই অনেক দিন পান নি। যদি বা পেয়ে থাকেন বিস্মৃত হয়েছেন। তাই নিতান্ত মমতাপরবশ হয়ে ছেলেটিকে এখানে নিয়ে এলুম। রাবণের চুলো যদি কোথাও জ্বলে সে এর পেটের মধ্যে।

নটবরের প্রবেশ

নটবর। (দৌলতের কান মলিয়া) কী রে শালা! শুনলুম নাকি শালার শোকে সভায় দাঁড়িয়ে কেঁদে ভাসিয়ে দিয়েছিস?

দৌলত। কে হে তুমি বেল্লিক! ভদ্রলোকের কানে হাত দাও!

নটবর। ভগ্নীপতির কান মলব না তো কি কান ভাড়া করে এনে মলব! কী বলেন মশায়?

কানাই। কথাটা তো ঠিক বটে।

দৌলত। কী বল হে কানাই! আমার স্ত্রীই নেই, তো আবার শালা কিসের?

নটবর। তোমারই যেন স্ত্রী নেই, তাই বলে আর কারও স্ত্রী নেই? একটু ভেবে দেখো-না।

দৌলত। স্ত্রী তো অনেকেরই আছে, তা আর ভাবতে হবে কী!

নটবর। (হাসিয়া) তবে?

দৌলত। (সরোষে) তবে কী! তুমি আমার শালা কোন্ সম্পর্কে?

নটবর। কেন, দাদার সম্পর্কে। দাদা আছেন তো! শালাই যেন ভাঁড়ালে, কিন্তু দাদা বেকবুল গেলে তো চলবে না!

দৌলত। আমি তো জানতেম নেই, কিন্তু আজ যেরকম দেখছি তাতে—

নটবর। থাক্, তা হলেই তো চুকে গেল। বেশি বকাবকিতে কাজ কী? ভদ্রলোক বসে আছেন, এঁর সামনে কে শালা আর কে শালা নয় তা নিয়ে তক্‌রার করা ভালো দেখায় না। (দৌলতের পশ্চাৎ হইতে তাকিয়া টানিয়া লইয়া) একটু জিরোনো যাক, এক ছিলিম তামাক ডাকো।

ফলমূলমিষ্টান্ন লইয়া ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। (দৌলতকে) আপনার জলখাবার।

দৌলত। (সরোষে) বেটা, তোকে এখানে কে খাবার আনতে বলেছে? বাড়ি-ভিতর নিয়ে যা!

পরেশ। বিলক্ষণ, তাতে দোষ হয়েছে কী! (ভৃত্যের প্রতি) ওরে তুই দিয়ে যা, এ দিকে দিয়ে যা।

থালা লইয়া আহার-আরম্ভ

চুলের মুঠি ধরিয়া বিধুভূষণকে লইয়া দুই স্ত্রীলোকের প্রবেশ

প্রথমা। পোড়ারমুখো তোমার মরণ হয় না!

দৌলত। (শশব্যস্তে) এঁরা কে?

জয়নারায়ণ। বাবা, ব্যস্ত হোয়ো না, আমার সেই খুড়তুত ভাই এসে পৌচেছেন।

প্রথমা। ও আবাগের বেটা ভূত!

দ্বিতীয়া। মার্ ঝাঁটা, মার্ ঝাঁটা!

দৌলত। ভাই কানাই!

কানাই। সহিষ্ণুতা শিক্ষার এমন উপায় আর কী আছে!

প্রথমা। মিন্‌সে, তুমি বুড়োবয়সে আক্কেল খুইয়ে বসেছ!

দ্বিতীয়া। ওগো, এত লোকের এত সোয়ামি মরছে, যমরাজ কি তোমাকেই ভুলেছে!

দৌলত। বাছারা একটু ঠাণ্ডা হও।

উভয়ে। ঠাণ্ডা হব কিরে মিন্‌সে। তুই ঠাণ্ডা হ, তোর সাত পুরুষ ঠাণ্ডা হয়ে মরুক।

দৌলত। কানাই!

কানাই। গৃহ পূর্ণ হয়েছে—

দৌলত। গ্রহ পূর্ণ হয়েছে বলো—

কানাই। যাই হোক, আজ আর আমাকে প্রয়োজন নেই। আমি এই বেলা সরি।

[প্রস্থান

দৌলত। (উচ্চস্বরে) কানাই, আমাকে একলা রেখে পালাও কোথায়!

সকলে মিলিয়া। (দৌলতকে চাপিয়া ধরিয়া) একলা কিসের! আমরা সবাই আছি, আমরা কেউ নড়ব না।

দৌলত। বল কী!

সকলে। হাঁ, তোমার গা ছুঁয়ে বলছি।

বৈশাখ ১২৯৪

সূক্ষ্ম বিচার

চণ্ডীচরণ ও কেবলরাম

কেবলরাম। মশায়, ভালো আছেন?

চণ্ডীচরণ। 'ভালো আছেন' মানে কী?

কেবলরাম। অর্থাৎ সুস্থ আছেন।

চণ্ডীচরণ। স্বাস্থ্য কাকে বলে?

কেবলরাম। আমি জিজ্ঞাসা করছিলেম, মশায়ের শরীর-গতিক—

চণ্ডীচরণ। তবে তাই বলো। আমার শরীর কেমন আছে জানতে চাও। তবে কেন জিজ্ঞাসা করছিলে আমি কেমন আছি? আমি কেমন আছি আর আমার শরীর কেমন আছে কি একই হল? আমি কে, আগে সেইই বলো।

কেবলরাম। আজ্ঞে, আপনি তো চণ্ডীচরণবাবু।

চণ্ডীচরণ। সে বিষয়ে গুরুতর তর্ক উঠতে পারে।

কেবলরাম। তর্ক কেন উঠবে! আপনি বরঞ্চ আপনার পিতাঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করবেন।

চণ্ডীচরণ। নাম জিনিসটা কী? নাম কাকে বলে?

কেবলরাম। (বহু চিন্তার পর) নাম হচ্ছে মানুষের পরিচয়ের—

চণ্ডীচরণ। নাম কি কেবল মানুষেরই আছে, অন্য প্রাণীর নেই?

কেবলরাম। ঠিক কথা। মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর—

চণ্ডীচরণ। কেবল মানুষ ও প্রাণী ছাড়া আর কিছুর নাম নেই? তবে বস্তু চেনার কী উপায়?

কেবলরাম। ঠিক বটে। মানুষ, প্রাণী এবং বস্তু—

চণ্ডীচরণ। শব্দ স্বাদ বর্ণ প্রভৃতি অবস্তুর কি নাম নেই?

কেবলরাম। তাও বটে। মানুষ, প্রাণী, বস্তু এবং শব্দ, স্বাদ, বর্ণ প্রভৃতি অবস্তু—

চণ্ডীচরণ। এবং—

কেবলরাম। আবার এবং!

চণ্ডীচরণ। এবং আমাদের মনোবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তির—

কেবলরাম। এবং আমাদের মনোবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তির—

চণ্ডীচরণ। এবং অন্তর ও বাহিরের যাবতীয় পরিবর্তনের ও ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার—

কেবলরাম। যাবতীয় পরিবর্তনের এবং ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার—

চণ্ডীচরণ। এবং—

কেবলরাম। (কাতরভাবে) এবং না ব'লে এইখানে একটা ইত্যাদি লাগানো যাক-না।

চণ্ডীচরণ। আচ্ছা বেশ। এখন সমস্তটা কী হল বলো তো। কথাটা পরিষ্কার হয়ে যাক।

কেবলরাম। (মাথা চুলকাইয়া) পরিষ্কার হবে কি না বলতে পারি নে, চেষ্টা করি। নাম হচ্ছে মানুষের এবং অবস্তুর, না না— বস্তু এবং অবস্তুর, এবং বাহিরের ও অন্তরের যাবতীয় হৃদয়বৃত্তির, না মনোবৃত্তির, না না— যাবতীয় ভিন্ন ভিন্ন কিংবা পরিবর্তন ও অবস্থার ভিন্ন ভিন্ন যাবতীয়— এ তো মুশকিল হল! কিছুতেই গুছিয়ে উঠতে পারছি নে। এক কথায় নাম হচ্ছে মানুষের এবং প্রাণীর এবং— দূর হোক গে, মানুষের, প্রাণীর এবং ইত্যাদির পরিচয়ের উপায়।

চণ্ডীচরণ। এ সম্বন্ধে তর্ক আছে। পরিচয় কাকে বলে!

কেবলরাম। (জোড়হস্তে) আমি কাউকেই বলি নে। মশায়ই বলুন।

চণ্ডীচরণ। ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের প্রভেদ অবগত হয়ে তাদের স্বতন্ত্র করে জানা। এই ঠিক তো!

কেবলরাম। এ ছাড়া আর তো কিছু হতেই পারে না।

চণ্ডীচরণ। তা হলে তুমি অস্বীকার করছ না?

কেবলরাম। আজ্ঞে না।

চণ্ডীচরণ। যদিই অস্বীকার কর তা হলে এ সম্বন্ধে গুটিকতক তর্ক আছে।

কেবলরাম। না না, আমি কিছুমাত্র অস্বীকার করছি নে।

চণ্ডীচরণ। মনে কর, যদিই কর।

কেবলরাম। (ভীতভাবে) আজ্ঞে না, মনেও করতে পারি নে।

চণ্ডীচরণ। তুমি না কর, যদি আর কেউ করে।

কেবলরাম। কারও সাধ্য নেই যে করে। এত বড়ো দুঃসাহসিক কে আছে!

চণ্ডীচরণ। আচ্ছা বেশ, এটা যেন স্বীকারই করলে, তার পরে— নামই যদি পরিচয়ের একমাত্র উপায় হবে তবে কি আমার চেহারা পরিচয়ের উপায় নয়? আর আমার অন্যান্য লক্ষণগুলো—

কেবলরাম। আজ সম্পূর্ণ বুঝেছি নাম কাকে বলে তার নামগন্ধও জানি নে, আপনিই বলে দিন।

চণ্ডীচরণ। ভাষার দ্বারা স্বতন্ত্র পদার্থের স্বাতন্ত্র্য নির্দিষ্ট করবার একটি কৃত্রিম উপায়কে বলে নামকরণ— যদি অস্বীকার কর—

কেবলরাম। না, আমি অস্বীকার করি নে—

চণ্ডীচরণ। কেবল তর্কের অনুরোধেও যদি অস্বীকার কর—

কেবলরাম। তর্কের অনুরোধে কেন, বাবার অনুরোধেও অস্বীকার করতে পারি নে।

চণ্ডীচরণ। এর কোনো একটা অংশও যদি অস্বীকার কর।

কেবলরাম। একটি অক্ষরও অস্বীকার করতে পারি নে।

চণ্ডীচরণ। এই মনে করো, 'কৃত্রিম' কথাটা সম্বন্ধে নানা তর্ক উঠতে পারে।

কেবলরাম। ঠিক তার উলটো, ঐ কথাতেই সকল তর্ক দূর হয়ে যায়।

চণ্ডীচরণ। আচ্ছা, তাই যদি হল, মীমাংসা করা যাক আমার নাম কী।

কেবলরাম। (হতাশভাবে) মীমাংসা আপনিই করুন, আমার খিদে পেয়েছে।

চণ্ডীচরণ। নাম আমার সহস্র আছে, কোন্‌টা তুমি শুনতে চাও ?

কেবলরাম। যেটা আপনি সব চেয়ে পছন্দ করেন।

চণ্ডীচরণ। প্রথমে বিচার করতে হবে কিসের সঙ্গে আমার প্রভেদ জানতে চাও— যদি পশুর সঙ্গে আমার প্রভেদ নির্দেশ করতে চাও—

কেবলরাম। আজ্ঞে, তা চাই নে—

চণ্ডীচরণ। তা হলে আমার নাম মানুষ। যদি শ্বেত পীত পদার্থের সঙ্গে আমার প্রভেদ জানতে চাও তবে আমার নাম—

কেবলরাম। কালো।

চণ্ডীচরণ। শামলা। যদি ছেলের সঙ্গে প্রভেদ জানতে চাও তবে আমার নাম—

কেবলরাম। বুড়ো।

চণ্ডীচরণ। মধ্যবয়সী।

কেবলরাম। তবে চণ্ডীচরণ কার নাম মশায় ?

চণ্ডীচরণ। একটি মনুষ্যের মধ্যে, একটি উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ মনুষ্য-বিশেষের মধ্যে, একটি পূর্ণপরিণত মনুষ্যের মধ্যে তার জন্মকাল হতে আজ পর্যন্ত যে-সকল পরিবর্তন অহরহ সংঘটিত হচ্ছে এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত হবার সম্ভাবনা আছে, সেই পরিবর্তন ও পরিবর্তনসম্ভাবনার কেন্দ্রস্থলে যে-একটি সজ্ঞান ঐক্য বিরাজ করছে, তাকেই একদল লোক অর্থাৎ সেই লোকদের সজ্ঞান ঐক্য চণ্ডীচরণ নামে নির্দেশ করে।

কেবলরাম। সর্বনাশ ! মশায় বেলা হল। অত্যন্ত ক্ষুধানুভব হয়েছে, আহারও প্রস্তুত, এবার তবে—

চণ্ডীচরণ। (হাত চাপিয়া ধরিয়া) রোসো— আসল কথাটার কিছুই মীমাংসা হয় নি। সবে আমরা তার ভূমিকা করেছি মাত্র। তুমি জিজ্ঞাসা করছিলে আমি ভালো আছি কি না ; এখন প্রশ্ন এই, তুমি কী জানতে চাও, আমার অন্তর্গত প্রাণী কেমন আছে জানতে চাও, না মনুষ্য কেমন আছে জানতে চাও—

কেবলরাম। গোড়ায় কী জানতে চেয়েছিলুম তা বলা ভারি শক্ত। কিন্তু আপনার সঙ্গে এতক্ষণ কথা কয়ে এখন অনুমান হচ্ছে আপনার সজ্ঞান ঐক্য কেমন আছেন এইটে জানাই অজ্ঞান আমার অভিপ্রায় ছিল।

চণ্ডীচরণ। অত্যন্ত কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলে।

কেবলরাম। তা হলে মাপ করবেন— অপরাধ করেছি, এখন অনুতাপে এবং পেটের জ্বালায় দগ্ধ হচ্ছি। আহারের পূর্বে এরকম প্রশ্ন আমি আর কখনো আপনাকে জিজ্ঞাসা করব না।

চণ্ডীচরণ। (কর্ণপাত না করিয়া) আমি ভালো আছি কি না জিজ্ঞাসা করলে প্রথম দেখা আবশ্যক ভালোমন্দ কাকে বলে। তার পরে স্থির করতে হবে আমার সম্বন্ধে ভালোই বা কী আর মন্দই বা কী। তার পরে দেখতে হবে বর্তমানে যা ভালো তা—

কেবলরাম। মশায়, আপনার পায়ে ধরছি এখনকার মতো ছুটি দিন। বরং 'আপনি কেমন আছেন'

এই অত্যন্ত কঠিন প্রশ্নের উত্তর আপনি কবে দিতে পারবেন একটা দিন স্থির করে দিন— আমি যে নিতান্ত ব্যস্ত হয়েছি তা নয়— নাহয় উত্তর পেতে কিছুদিন দেরিই হবে, নাহয় উত্তর নেই পাওয়া গেল। কিন্তু আজ আমার অপরাধ ক্ষমা করুন, ভবিষ্যতে আমি সতর্ক হব।

বৈশাখ ১২৯৩

আশ্রমপীড়া

প্রথম দৃশ্য

নবকান্ত

নবকান্ত। ওঃ! প্রেমের রহস্য কে ভেদ করতে পারে! না জানি সে কিসের বন্ধন যাতে এক হৃদয়ের সঙ্গে আর-এক হৃদয় বাঁধা পড়ে! কী জ্যোৎস্নাপাশ, কী পুষ্পসৌরভের ডোর, কী মুকুলিত মধুমাসের মধুর মলয়ানিলের বন্ধন!

নরোত্তমের প্রবেশ

নরোত্তম। কী সর্বনাশ! নবকান্তের হাতে পড়লে তো রক্ষা নেই! ধরলে বুঝি!

নবকান্ত। (নরোত্তমকে ধরিয়া) ভাই, প্রেমের কী মহান শক্তি!

নরোত্তম। খিদের শক্তি তার চেয়ে বেশি। আমি খেতে যাই, আমাকে ছাড়ো—

নবকান্ত। হৃদয়ের ক্ষুধা—

নরোত্তম। হৃদয়ের নয়, উদরের। আমি খেয়ে আসি—

নবকান্ত। খাওয়ার কথা বলছি নে।

নরোত্তম। তুমি কেন বলবে, আমি বলছি। একটু রোসো, আমি— ঐ যে আদ্যানাথবাবু আসছেন। ওঁকে ধরো, প্রেমের শক্তি বোঝবার লোক এমন আর পাবে না।

[প্রস্থান

আদ্যানাথের প্রবেশ

নবকান্ত। (আদ্যানাথকে ধরিয়া) মশায়, প্রেমের কী মহান শক্তি!

আদ্যানাথ। মহান শক্তি কী বাপু! মহতী শক্তি। কারণ, শক্তি শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ, তৎপূর্বে—

নবকান্ত। ভেবে দেখুন, প্রেমের সৈন্য নেই, সামন্ত নেই, অথচ প্রেম বিশ্ববিজয়ী। সে আপন জীবন্ত—

আদ্যানাথ। জীবন্ত হতেই পারে না।

নবকান্ত। আজ্ঞে হাঁ, সে আপনার জীবন্ত প্রভাবেই—

আদ্যানাথ। জীবিত বলো-না কেন, তা হলে ব্যাকরণ—

নবকান্ত। জীবন্ত প্রভাবে সর্বত্র আপনার পথ সৃজন—

আদ্যানাথ। সৃজন নয়। সর্জন।

নবকান্ত। পথ সৃজন করে নেয়। এই-যে সূর্যতারাখচিত—

আদ্যানাথ। সর্জন, কেননা সৃজ্ ধা—

নবকান্ত। নীলাকাশ, এই-যে বিচিত্রপুষ্পশোভিত—

আদ্যানাথ। সৃজ্ ধাতুর উত্তর—

নবকান্ত। পুষ্পকানন—

[কথোপকথন করিতে করিতে প্রস্থান

গণেশের প্রবেশ

গণেশ। লেখাটা তো শেষ করেছি, এখন শোনাই কাকে? খাতা হাতে যেখানেই যাই কাউকে দেখতে পাই নে। আজ কাউকে শোনাতেই হবে— সন্ধান দেখি গে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

হরিচরণ নবীনমাধব নরোত্তম

হরিচরণ। ওহে, এতদিন ছিলেম ভালো, কোনো আপদ ছিল না। এখন কী করা যায়!

নবীন। তাই তো, কী করা যায়!

নরোত্তম। তাই তো হে, উপায় কী!

হরিচরণ। এতদিন আমাদের বাসায় আপদের মধ্যে নবকান্ত ছিল, তাকে সয়ে গিয়েছিল, এখন কোথা থেকে একটা লেখক এসেছে।

নরোত্তম। বাসায় লেখক থাকা কাজের কথা নয়।

নবীন। কাল জাতিভেদের উপর এক কবিতা লিখে শোনাতে এসেছিল।

হরিচরণ। কাল রাত্রি সাড়ে-দশটা, সবে আমার একটু তন্দ্রা এসেছে, এমন সময় লেখক এসে উপস্থিত। তন্দ্রা তো ছুটলই, আমিও তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটলুম।

নরোত্তম। আরে ভাই, আমাকেও— ঐ আসছে!

হরিচবণ। ঐ এল রে!

নবীন। ঐ খাতা!

হরিচরণ। পালাই!

[প্রস্থান

নবীন। আমিও পালাই!

[প্রস্থান

নরোত্তম। আমি মোটা মানুষ ছুটতে পারব না, করি কী!

গণেশের প্রবেশ

গণেশ। তিনটে প্রবন্ধ—

নরোত্তম। কটা বাজল কে জানে!

গণেশ। একটা হচ্ছে আধুনিক স্ত্রীজাতির—

নরোত্তম। মশায়, ঘড়ি আছে? দেখুন তো সময়—

গণেশ। আজ্ঞে, ঘড়ি নেই। আমার প্রবন্ধের একটা হচ্ছে—

নরোত্তম। (উচ্চস্বরে) ওরে মোধো, আপিসের চাপকানটা কোথায় রাখলি?

গণেশ। বুঝেছেন নরোত্তমবাবু, একটা প্রবন্ধ হিন্দুধর্মের—

নরোত্তম। (নেপথ্যে চাহিয়া) ঐ ঐ, ঐ সর্বনাশ হল! ছেলেটা প'ল বুঝি!

[প্রস্থান

গণেশ। কাল থেকে চেষ্টা করছি, কাউকে পাচ্ছি নে। কে যেন কাকের বাসায় ঢিল ছুঁড়েছে— বাসাসুদ্ধ প্রাণী চঞ্চল হয়ে বেড়াচ্ছে। পূর্বে যে বাসায় ছিলুম সেখানে একটি লোকও বাকি রইল না, কাজেই ছেড়ে আসতে হল। এখানেই বা এরা দু দণ্ড স্থির হয়ে বসতে পারে না কেন! যাই, নরোত্তমবাবুকে ধরি গে। লোকটি বেশ মোটাসোটা ভালোমানুষ।

তৃতীয় দৃশ্য

নরোত্তম ও নবকান্ত

নবকান্ত। দেখো নরোত্তম, হৃদয়ের রহস্য—

নরোত্তম। এখন নয় ভাই, আপিস আছে।

নবকান্ত। (সনিশ্বাসে) আহা, তোমার তো আপিস আছে, আমার কী আছে বলো তো। আমার যে occupation gone! Othello's occupation gone! শেক্‌স্‌পিয়র যে লিখেছে— কোথায় যাও— আঃ, শোনো-না—

নরোত্তম। না ভাই, আমাকে মাপ করো— সাহেব রাগ করবে, আমারও occupation যাবার জো হবে।

নবকান্ত। আমি বলছিলুম উভয় পক্ষের যদি— আহা শোনো-না— উভয় পক্ষের—

নরোত্তম। ও-সব কথা আমার জানা নেই, উভয় পক্ষের কথা শুনলে আমার ভারি গোল বেধে যায়, মাথা ঘুরতে থাকে।

নবকান্ত। তুমি আমার কথা না শুনেই যে ভয় পাচ্ছ, আমি যা বলছি তা তর্কের কথা নয়— হৃদয়ের কথা, সহজ কথা।

নরোত্তম। কিন্তু ঐ সহজ কথাতেই সাড়ে-চারটে বেজে যাবে— আমায় ছাড়ো।

নবকান্ত। আচ্ছা দেখো, দশ মিনিটের বেশি লাগবে না— ঘড়ি ধরে থাকো, আমি বলে যাই।

নরোত্তম। (সকাতরে) নবকান্ত, কেন তোমরা সকলে আমাকে নিয়েই পড়েছ? ও ঘরে হরি আছে, নবীন আছে, তাদের কাছে তো ঘেঁষ না। সেদিন ঠিক এমনি সময়ে হৃদয়ের রহস্যের কথা পাড়লে, সাড়ে-দুপুর বেজে গেল— সাহেবের কাছে জরিমানা দিতে হল। আবার আজও সেই হৃদয়ের রহস্য! গরিবের চাকরিটি গেলে হৃদয়ের রহস্য আমার কোন্ কাজে লাগবে! [প্রস্থানোদ্যম

নবকান্ত। (ধরিয়া) রাগ করলে ভাই!

নরোত্তম। না, রাগের কথা হচ্ছে না। আপিসের বেলা হল, তাই তাড়াতাড়ি করছি।

[প্রস্থানোদ্যম

নবকান্ত। (ধরিয়া) না ভাই, তুমি রাগ করছ।

নরোত্তম। এও তো বিষম মুশকিলে ফেললে! কিন্তু শীতকালের দিনে কথায় কথায় বেলা হয়ে যায়।

[প্রস্থানোদ্যম

নবকান্ত। (ধরিয়া) না ভাই, তুমি রাগ করে চলে যাচ্ছ, আমার সমস্ত দিন মন খারাপ থাকবে।

নরোত্তম। আচ্ছা ভাই, আপিস থেকে ফিরে এসে কথা হবে।

[প্রস্থানোদ্যম

নবকান্ত। না, তুমি বলো আমাকে মাপ করলে।

নরোত্তম। মাপ করলুম।

[প্রস্থানোদ্যম

নবকান্ত। (ধরিয়া) না ভাই, তোমার মুখ যে প্রসন্ন দেখছি নে।

নরোত্তম। প্রসন্ন হবে কী করে! বেলা যে বিস্তর হল।

নবকান্ত। (আটক করিয়া) প্রসন্ন মুখে মাপ করে যাও, তবে ছাড়ব।

নরোত্তম। তোমাকে মাপ করব কী, তুমি আমাকে মাপ করো— আমি পায়ে ধরছি, নাকে খত দিচ্ছি, আর যা বল তাই করছি— কিন্তু এই অবেলায় হৃদয়ের রহস্য শুনতে পারব না।

[প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

নরোত্তমের পশ্চাতে গণেশ

গণেশ। অত হাঁপাচ্ছেন কেন? একটু স্থির হোন-না। আমার প্রবন্ধে—
নরোত্তম। কী ভয়ানক! মশায়ের খাওয়া হয়েছে?
গণেশ। আজ্ঞে, না। কিন্তু আমার লেখায়—
নরোত্তম। মাছি পড়েছে।
গণেশ। আজ্ঞে, মাছি পড়বে কেন?
নরোত্তম। আপনার লেখায় নয়— আমার দুধে মাছি পড়েছে।

[প্রস্থানোদ্যম

নবকান্তের প্রবেশ

নবকান্ত। তুমি ভাই রাগ করে এলে— আমার মন স্থির হচ্ছে না।
নরোত্তম। আমারও মন অত্যন্ত অস্থির।

[তাড়াতাড়ি প্রস্থান

নবকান্ত। যাই, নরোত্তমের মুখ প্রফুল্ল না দেখে তাকে তো কিছুতেই ছাড়তে পারি নে।

[প্রস্থান

গণেশ। নরোত্তমবাবু গেলেন কোথায় দেখে আসি।

[প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

নরোত্তম আহারে প্রবৃত্ত। গণেশের প্রবেশ

গণেশ। এত সকাল-সকাল আহারে বসেছেন যে!
নরোত্তম। সকাল আর কই? আপিসে বেরোতে হবে যে।
গণেশ। এখনি যেতে হবে! তবে যতক্ষণ খাচ্ছেন ততক্ষণ যদি আমার—
নরোত্তম। মশায়, আমার খাওয়া হয়েছে, আমি উঠলুম।
গণেশ। কিছুই যে খেলেন না, সবই যে পড়ে রইল। পান-তামাক তো খাবেন, ততক্ষণ যদি—
নরোত্তম। (নেপথ্যে চাহিয়া) ঐ রে, নবকান্ত মুখ বিমর্ষ করে আসছে। আজ্ঞে না, পান-তামাকে প্রয়োজন নেই, আমি চললুম।

[প্রস্থান

নবকান্তের প্রবেশ

নবকান্ত। নরোত্তম কোথায় মশায়?
গণেশ। (খাতা বাহির করিয়া) তিনি চলে গেছেন। তা হোক-না, আপনি বসুন-না।
নবকান্ত। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) হায়, আমার কী অবস্থা হল!
গণেশ। কিছুই হয় নি, আপনি ভাববেন না, বেশ আছেন। হিন্দুপ্রকাশে আমার লেখা—
নবকান্ত। কিছুই নয়! বলেন কী! হৃদয়ের—
গণেশ। হৃদয়ের কথা তো হচ্ছিল না। আর্যমনীষিগণের—
নবকান্ত। আর্যমনীষী আবার কোত্থেকে এল! হৃদয়ের কথাই তো হচ্ছিল। আমি বলছিলুম, হৃদয় যখন—

গণেশ। আমি যা লিখেছি তার বিষয়টা হচ্ছে আর্যমনীষিগণ যে-সকল বিধান করে গেছেন আমাদের বর্তমান অবস্থায় তার কী করা উচিত।

নবকান্ত। শ্রাদ্ধ করা উচিত। সে যাক গে— যার হৃদয়ে তুষানল ধিকি ধিকি জ্বলছে—

গণেশ। যে যেন ভদ্রলোকের ঘরের চালের উপর গিয়ে না বসে, তা হলেই লঙ্কাকাণ্ড বাধবে। আমার প্রশ্ন এই, শাস্ত্রের মূলে কী আছে—

নবকান্ত। কচু।

গণেশ। এবং তার থেকে কী ফলছে?

নবকান্ত। কলা।

গণেশ। এবং সে মূল উদ্ধার কে করবে?

নবকান্ত। বরাহ অবতার।

গণেশ। সে ফল ভোগ করবে কে?

নবকান্ত। হনুমান অবতার। এখন আমার প্রশ্ন এই, জগতে সকলের চেয়ে গভীর রহস্য কী?

গণেশ। আর্যশাস্ত্র।

নবকান্ত। প্রেম।

গণেশ। মনু এবং—

নবকান্ত। অভিমানের অশ্রুজল—

গণেশ। এবং গৃহ্যসূত্র—

নবকান্ত। এবং চোখে চোখে চাহনি—

গণেশ। দায়ভাগ—

নবকান্ত। এবং প্রাণে প্রাণে মিলন।

ষষ্ঠ দৃশ্য

গণেশ লিখিতে প্রবৃত্ত

গণেশ। বিষয়টা গুরুতর, 'নারদের ঢেঁকি এবং আধুনিক বেলুন'— আরম্ভটা দিব্যি হয়েছে, শেষটা মেলাতে পারছি নে। তা শেষটা না হলেও চলবে। কিন্তু শোনাই কাকে? নরোত্তমবাবু বাসা ছেড়ে গেছেন। হরিহরবাবুর কাছে ঘেঁষতে ভয় হয়।

নবকান্তের প্রবেশ

নবকান্ত। হায় হায়, নরোত্তম বাসা ছেড়েছে, এখন যাই কার কাছে?

গণেশ। এই-যে নবকান্তবাবু, নারদের ঢেঁকি—

নবকান্ত। নিথর জ্যোৎস্নাজালে নধর নবীন—

আদ্যানাথের প্রবেশ

গণেশ। বাঁচা গেল! আদ্যানাথবাবু, আমার নারদের ঢেঁকি—

নবকান্ত। নয়ননলিনীদল নিদ্রায় নিলীন—

গণেশ। সনাতনশাস্ত্র মন্থন করে নারদের ঢেঁকি—

আদ্যানাথ। ঢেঁকি শব্দটা কি গ্রাম্যতাদোষদুষ্ট নয়? সাহিত্যদর্পণে—

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। বাবুরা পালাও গো, আগুন লেগেছেন।

আদ্যানাথ। বেটার ব্যাকরণজ্ঞান দেখো।

নবকান্ত। (সনিশ্বাসে) আগুন! হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে—

গণেশ। নল যে বিনা-আয়োজনে আগুন জ্বালাতেন সে অক্সিজেন-হাইড্রোজেন-যোগে।

আদ্যানাথ। ওটা যাবনিক প্রয়োগ হল। ও স্থলে—

ঘরে অগ্নির আবির্ভাব

কার্তিক ১২৯৩

অন্ত্যেষ্টি-সৎকার

প্রথম দৃশ্য

রায় কৃষ্ণকিশোর বাহাদুর মৃত্যুশয্যায় শয়ান

চন্দ্রকিশোর নন্দকিশোর ও ইন্দ্রকিশোর পুত্রত্রয় পরামর্শে রত

ডাক্তার উপস্থিত। মহিলাগণ ক্রন্দনোন্মুখী

চন্দ্র। কাকে কাকে লিখি?

ইন্দ্র। রেনল্‌ড্‌স্‌-সায়েবকে লেখো।

কৃষ্ণ। (অতিকষ্টে) কী লিখবে বাবা!

নন্দ। তোমার মৃত্যুসংবাদ।

কৃষ্ণ। এখনো তো মরি নি বাবা!

ইন্দ্র। এখনি নেই বা মলে, কিন্তু একটা সময় স্থির করে লিখতে হবে তো।

চন্দ্র। যত শীঘ্র পারি সাহেবদের কন্‌ডোলেন্‌স্‌ লেটারগুলো আদায় করে কাগজে ছাপিয়ে ফেলা দরকার, এর পরে জুড়িয়ে গেলে ছাপিয়ে তেমন ফল হবে না।

কৃষ্ণ। রোসো বাবা, আগে আমি জুড়িয়ে যাই।

নন্দ। সবুর করলে চলবে না বাবা! সিমলে দার্জিলিঙে যাদের যাদের চিঠি পাঠাতে হবে তাদের একটা ফর্দ করা যাক। ব'লে যাও।

চন্দ্র। লাট-সায়েব, ইলবর্ট্‌-সায়েব, উইলসন্‌-সায়েব, বেরেস্‌ফোর্ড, মেকলে, পিকক—

কৃষ্ণ। বাবা, কানের কাছে ও কী নামগুলো করছ, তার চেয়ে ভগবানের নাম করো। অন্তিমে তিনিই সহায়। হরি হে—

ইন্দ্র। ভালো মনে করিয়ে দিয়েছ, হ্যারিসন-সায়েবকে ধরা হয় নি।

কৃষ্ণ। বাবা, বলো রাম রাম—

নন্দ। তাই তো, রামজে-সায়েবকে তো ভুলেছিলুম।

কৃষ্ণ। নারায়ণ নারায়ণ!

চন্দ্র। নন্দ, লেখো তো, নোরান-সায়েবের নামটা লেখো তো।

স্কন্দকিশোরের প্রবেশ

স্কন্দ। বা, তোমরা বেশ তো! আসল কাজটাই তো বাকি।

চন্দ্র। কী বলো তো।

স্কন্দ। ঘাটে যাবার প্রোসেশ্যনে যারা যোগ দেবে তাদের তো আগে থাকতে খবর দেওয়া চাই।

কৃষ্ণ। বাবা, কোন্‌টা আসল হল। আগে তো মরতে হবে, তার পরে—
চন্দ্র। সেজন্য ভাবনা নেই। ডাক্তার!
ডাক্তার। আজ্ঞে!
চন্দ্র। বাবার আর কত বাকি? সাধারণকে কখন আসতে বলব?
ডাক্তার। বোধ হয়—

রমণীদের রোদন

স্কন্দ। (বিরক্ত হইয়া) মা, তুমি তো ভারি উৎপাত আরম্ভ করলে! আগে কথাটা জিজ্ঞাসা করে নিই। কখন ডাক্তার?
ডাক্তার। বোধ হয় রাত্রি—

রমণীদের পুনশ্চ ক্রন্দন

নন্দ। এ তো মুশকিল হল। কাজের সময় এমন করলে তো চলে না। তোমাদের কান্নায় ফল কী? আমরা বড়ো বড়ো সায়েবদের কাঁদুনি চিঠি কাগজে ছাপিয়ে দেব।

রমণীগণকে বহিষ্করণ

স্কন্দ। ডাক্তার, কী বোধ হচ্ছে?
ডাক্তার। যেরকম দেখছি আজ রাত্রি চারটের সময়েই বা হয়ে যায়।
চন্দ্র। তবে তো আর সময়— নন্দ, যাও ছুটে যাও, স্লিপগুলো দাঁড়িয়ে থেকে ছাপিয়ে আনো।
ডাক্তার। কিন্তু ওষুধটা আগে—
স্কন্দ। আরে, তোমার ডাক্তারখানা তো পালিয়ে যাচ্ছে না। প্রেস বন্ধ হলে যে মুশকিলে পড়তে হবে।
ডাক্তার। আজ্ঞে, রুগি যে ততক্ষণে—
চন্দ্র। সেইজন্যই তো তাড়াতাড়ি— পাছে স্লিপ ছাপার আগেই রুগি--
নন্দ। এই আমি চললুম।
স্কন্দ। লিখে দিয়ো, কাল আটটার সময় প্রোসেশ্যন আরম্ভ হবে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্কন্দ। কই ডাক্তার, চারটে ছেড়ে সাতটা বাজল যে!
ডাক্তার। (অপ্রতিভ ভাবে) তাই তো, নাড়ী এখনো বেশ সবল আছে।
চন্দ্র। বা, তুমি তো বেশ ডাক্তার! আচ্ছা বিপদে ফেলেছ!
নন্দ। ওষুধটা আনতে দেরি করেই বিপদ ঘটল। ডাক্তারের ওষুধ বন্ধ হয়েই বাবা বল পেয়েছেন।
কৃষ্ণ। এতক্ষণ তোমরা প্রফুল্ল ছিলে, হঠাৎ বিমর্ষ হলে কেন? আমি তা ভালোই বোধ করছি।
স্কন্দ। আমরা যে ভালো বোধ করছি নে। ঘাটে যাবার এন্‌গেজমেন্ট যে করে বসেছি।
কৃষ্ণ। তাই তো! আমার মরা উচিত ছিল।
ডাক্তার। (অসহ্য হইয়া) এক কাজ কর তো সব গোল চুকে যায়।
ইন্দ্র। কী?
স্কন্দ। কী?
চন্দ্র। কী?
নন্দ। কী?
ডাক্তার। ওঁর বদলে তোমরা যদি কেউ সময়মত মর।

তৃতীয় দৃশ্য

বহির্বাটিতে লোকসমাগম

কানাই। ওহে, সাড়ে-আটটা বাজল। দেরি কিসের ?

চন্দ্র। বসুন, একটু তামাক খান।

কানাই। তামাক তো সকাল থেকেই খাচ্ছি।

বলাই। কই হে, তোমাদের জোগাড় তো কিছুই দেখি নে।

চন্দ্র। জোগাড় সমস্তই আছে— আমাদের কোনো ত্রুটি নেই— এখন কেবল—

রামতারণ। কী হে চন্দ্র, আর দেরি করা তো ভালো হয় না।

চন্দ্র। সে কি আমি বুঝি নে— কিন্তু—

হরিহর। দেরি কিসের জন্যে হচ্ছে ? আপিসের বেলা হয় যে, কাণ্ডখানা কী !

ইন্দ্রকিশোরের প্রবেশ

ইন্দ্র। ব্যস্ত হবেন না, হল বলে। ততক্ষণ কন্‌ডোলেন্‌স্‌ লেটারগুলো পড়ুন।

হাতে হাতে বিলি

এটা ল্যাম্‌বার্টের, এটা হ্যারিসনের, এটা সার জেম্‌স্‌—

স্কন্দকিশোরের প্রবেশ

স্কন্দ। এই নিন, ততক্ষণ কাগজে বাবার মৃত্যুর বিবরণ পড়ুন। এই স্টেট্‌স্‌ম্যান, এই ইংলিশম্যান।

মধুসূদন। (যাদবের প্রতি) দেখছ ভাই, বাঙালি পাংচুয়ালিটি কাকে বলে জানে না।

ইন্দ্র। ঠিক বলেছেন। মরবে তবু পাংচুয়াল হবে না।

খবরের কাগজ ও কন্‌ডোলেন্‌স্‌ পত্র পড়িতে পড়িতে অভ্যাগতগণের অশ্রুপাত

রাধামোহন। (সজল নেত্রে) হরি হে দীনবন্ধু !

নয়ানচাঁদ। হায় হায়, এমন লোকেরও এমন বিপদ ঘটে !

নবদ্বীপচন্দ্র। (সনিশ্বাসে) প্রভু, তোমারই ইচ্ছা !

রসিক। 'হৃদয়বৃন্তে ফুটে যে কমল'— তার পরে কী ভুলে যাচ্ছি—

'হৃদয়বৃন্তে ফুটে যে কমল
তাহারে কাল অকালে ছিঁড়িলে হৃদয়-
মৃণাল ডুবে শোকসাগরের জলে।'

এও ঠিক তাই। হৃদয়মৃণাল শোকসাগরের জলে ! আহা !

আড্ডি এস্কোয়ার। O tempora ! O mores !

তর্কবাগীশ। চলচ্চিত্তং চলদ্‌বিত্তং চলজ্জীবন— হায় হায় হায় !

ন্যায়বাগীশ। যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরাপুরী, রঘুপতেঃ

[কণ্ঠরোধ

দুঃখীরাম। হায় কৃষ্ণকিশোর বাহাদুর, তুমি কোথায় গেলে !

নেপথ্য হইতে ক্ষীণকণ্ঠ। আমি এইখানেই আছি বাবা ! দোহাই, তোরা অত চেঁচাস নে।

ভাদ্র ১২৯৩

রসিক

তিনকড়ি নেপাল ভোলা এবং নীলমণি হাসিয়া কুটিকুটি

ধীরাজের প্রবেশ

ধীরাজ। এত হাসছ কেন। খেপলে নাকি।

তিনকড়ি। (দূরে নির্দেশ করিয়া) দেখছেন না রসিকরাজবাবু আসছেন?

ধীরাজ। তা তো দেখছি, কিন্তু হাস্যকর কিছু তো দেখা যাচ্ছে না।

নেপাল। উনি ভারি মজার লোক।

ভোলা। ভা-আ-রি মজার লোক।

নীলমণি। ব-ড্ড মজার লোক।

তিনকড়ি। ওঁর একটা গল্প বলি শুনুন। সেদিন আমরা ঐ কজনে মিলে হাসতে হাসতে রসিকবাবুর সঙ্গে আসছি— চোরবাগানের মোড়ের কাছে— হা হা হা!

নীলমণি। হো হো হো!

ভোলা। হী হী হী!

তিনকড়ি। বুঝেছেন, চোরবাগানের— হা হা!

নেপাল। রোসো ভাই, কাপড় সামলে নিই। হাসতে হাসতে বিলকুল আলগা হয়ে এসেছে।

তিনকড়ি। বুঝেছেন ধীরাজবাবু, আমাদের এই মোড়টার কাছে, সে কী আর বলব! ভারি মজা!

ধীরাজ। আচ্ছা, পরে বোলো— আমি তবে চললুম।

ভোলা। না না, শুনে যান। সে ভারি মজা। বলো-না ভাই, গল্পটা শেষ করো-না।

তিনকড়ি। বুঝেছেন ধীরাজবাবু, মোড়ের কাছে এক বেটা গোরুর গাড়ির গাড়োয়ান— হা হা হা— (ভোলার প্রতি) কী নিয়ে যাচ্ছিল হে?

ভোলা। পাথুরে কয়লা।

তিনকড়ি। হাঁ, পাথুরে কয়লাই বটে। রসিকবাবু তাকে দেখে— হা হা হা হা! (সকলের হাস্য) রসিকবাবু তাকে দেখে— (নেপালের প্রতি) কী হে কী বললেন?

নেপাল। হা হা হা! সে ভারি মজার কথা। (ভোলার প্রতি) কিন্তু কথাটা কী বলো তো হে!

ভোলা। মনে পড়ছে না, কিন্তু সে ভারি মজা। বুঝেছেন ধীরাজবাবু, সে ভারি মজা।

নীলমণি। একটু একটু মনে পড়ছে, এই পাথুরে কয়লা নিয়ে কী যেন একটা—

নেপাল। আহা, বল কী হে! পাথুরে কয়লা নিয়ে আবার কী বলবেন? নিশ্চয় দেশের ভগ্নীদের লক্ষ্য করে কিছু বলেছিলেন, তা ছাড়া তিনি আর তো কিছু বলেন না।

ভোলা। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, গোরুর লেজ মলা নিয়ে যেন কী একটা বলেছিলেন।

তিনকড়ি। তা হতে পারে। কিন্তু ভারি মজা।

সকলে মিলিয়া হাস্য

রসিকরাজের প্রবেশ

রসিক। কী হে, এখানে যে এত হস্ ধাতুর আমদানি?

নীলমণি। হস্ ধাতুই বটে। হা হা হা!

তিনকড়ি। (ধীরাজের প্রতি) একবার কথাটা শুনুন। হস্ ধাতু— হা হা হা!

ভোলা। ধীরাজবাবু শুনছেন। কী চমৎকার! হস্ ধাতু— আবার আমদানি।

নীলমণি। ধীরাজবাবু—

ধীরাজ। আমি বুঝেছি।
নেপাল। ধীরাজবাবু—
ধীরাজ। আর কষ্ট পেতে হবে না, একরকম বুঝেছি।
রসিক। ভেগ্নীদের কোনো নূতন খবর পেয়েছ।
নীলমণি প্রভৃতি। হী হী হো হো হা হা!
ধীরাজ। ভেগ্নী কী।
তিনকড়ি। আর সকলে ভগ্নী বলে, রসিকবাবু বলেন ভেগ্নী! হা হা হা!
ধীরাজ। কেন, উনি কি বাংলা জানেন না?
তিনকড়ি। মজাটা বুঝছেন না? ভগ্নী তো সবাই বলে, কিন্তু ভেগ্নী!
রসিক। বুঝেছ ভোলা, আজ এক কাণ্ডই হয়ে গেছে। ভেগ্নীসভার সভ্যি আর সভাপেত্নী—
তিনকড়ি প্রভৃতি। হো হো হী হী হা হা!

দামোদর ও চিন্তামণির প্রবেশ

উভয়ে। কী হে, কী হে, কী হল? কী কথাটা হল?
তিনকড়ি। রসিকবাবু বলছিলেন 'ভেগ্নীসভার সভ্যি ও সভাপেত্নী'— হা হা হো হো!
দামোদর। এ ভারি মজা। এটা আপনাকে লিখতে হচ্ছে। আমাদের কাগজে লিখুন।
চিন্তামণি। রসিকবাবু, এটা লিখে ফেলুন।
তিনকড়ি। ধীরাজবাবু, বুঝেছেন?
ভোলা। পেত্নী কেন বললেন বুঝেছেন? যেমন ভেগ্নী তেমনি পেত্নী। হা হা হা!
নেপাল। ওর মজাটা বোঝেন নি ধীরাজবাবু? আসল কথাটা পত্নী। কিন্তু রসিকবাবু—
ধীরাজ। দোহাই, আমাকে আর বেশি বুঝিয়ো না।
ভোলা। কোন্ ভদ্রলোকের ঘর লক্ষ্য করে বলা হয়েছে বোঝেন নি বলে ধীরাজবাবু হাসছেন না।
ধীরাজ। বুঝতে পেরেছি ব'লেই হাসছি নে। আমিও যে ভদ্রলোক, আমারও স্ত্রী কন্যা ভগ্নী আছে।
রসিক। তোমরা যখন বলছ তখন অবশ্যই লিখব। কিন্তু এ-সব চণ্ডমুণ্ডবধের পালা, একেবারে সারেগামাপাধানি, তেরেকেটে মেরেকেটে ছাড়া কথা নেই। ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া আর-কি। বুঝেছ?
সকলে। বুঝেছি বৈকি। হা হা হো হো!
তিনকড়ি। বুঝেছেন ধীরাজবাবু?
ধীরাজ। কিচ্ছু বুঝি নি।
নেপাল। ধীরাজবাবু, বুঝেছেন তো?
ধীরাজ। না বাপু, কথাগুলো কী বলে গেলেন বুঝলুম না।
তিনকড়ি। কথা নেই বুঝলেন, ওর মজাটা তো বুঝেছেন? কথা তো আমরাও বুঝি নি।
দামোদর। রসিকবাবু, ঐ কথাগুলোও লিখতে হবে।
রসিক। (ধীরাজের প্রতি) আপনার মুখে হাসি নেই যে? হাসলে কোনো লোকসান আছে?
ধীরাজ। রাগ করবেন না মশায়, হাসবার চেষ্টা করছি।
চিন্তামণি। আপনি বুঝি ভ্রাতাদের কেউ হবেন?
রসিক। ভ্রাতাও হতে পারেন, ভর্তাও হতে পারেন।
দামোদর প্রভৃতি। (হাততালি দিয়া) বাহবা, বাহবা, কী মজা! হো হো হা হা!
দামোদর। এটাও লিখবেন। ভারি মজা হবে।
নীলমণি। (ধীরাজকে ধরিয়া) মশায়, যান কোথায়?

ধীরাজ। বুকে টার্পিন মালিশ করতে যাচ্ছি, রসিকবাবু বড্ড বলেছেন।

[প্রস্থান

চিন্তামণি। লোকটা জব্দ হয়ে গেছে। পাঁচ কথা যা শোনালেন ওর বাপের বয়সে—

রসিক। পাঁচ কথা আর হতে দিলে কই ? আড়াইখানার বেশি কথাই কই নি।

রসিককে ঘিরিয়া সকলের অবিশ্রাম হাস্য

দামোদর। দুখানা নয়, দশখানা নয়, আড়াইখানা— কী চমৎকার, ও কথাটাও লিখতে হবে। টুকে রাখুন, বুঝেছেন রসিকবাবু !

ফাল্গুন ১২৯৩

গুরুবাক্য

অচ্যুত অপূর্ব উমেশ কার্তিক ও খগেন্দ্র

অচ্যুত। গুরুদেব এখনো এলেন না, উপায় কী !

কার্তিক। আমি তো বিষম মুশকিলে পড়েছি। আমার নাম কার্তিক, আমার ছোটো শালার নাম কীর্তি। আমার স্ত্রী তার ভাইকে কীর্তি বলে ডাকতে পারে কি না এটা স্থির করে না দিলে স্ত্রীর সঙ্গে একত্র বাস করাই দায় হয়েছে। তার উপর আবার গয়লা বেটার নাম কীর্তিবাস ! এখন গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করতে হবে, আমার স্ত্রী যদি কীর্তিবাস গোয়ালাকে বাসুদেব বলে ডাকে তা হলে বৈধ হয় কি না। বাড়িতে কার্তিকপূজার সময় স্ত্রী কার্তিককে নাত্তিক বলে ; নাম খারাপ করার দরুন ঠাকুরের কিংবা তাঁর মা'র কোনো অসন্তোষ ঘটে কি না এও জিজ্ঞাস্য।

অপূর্ব। আমারও একটা ভাবনা পড়েছে। সেবার শ্রীক্ষেত্রে গিয়ে জগন্নাথকে কুল দিয়ে এসেছিলুম, এখন, এই গরমির দিনে কুলটুকু বাদ দিয়ে যদি তার ঝোলটুকু খাই তাতে অপরাধ হয় কি না।

অচ্যুত। আমি সেদিন গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করেছিলেম যে, শাস্ত্রমতে ভোক্তা শ্রেষ্ঠ না ভোজ্য শ্রেষ্ঠ, অন্ন শ্রেষ্ঠ না অন্নপায়ী শ্রেষ্ঠ ? তিনি এমনি এক গভীর উত্তর দিলেন যে, তখন যদিচ আমরা সকলেই জলের মতো বুঝে গেলুম কিন্তু এখন আমাদের কারও একটি কথাও মনে পড়ছে না।

উমেশ। আমার যতদূর মনে হচ্ছে, বোধ হয় তিনি বলেছিলেন অন্নও শ্রেষ্ঠ নয়, অন্নপায়ীও শ্রেষ্ঠ নয়, কিন্তু আর-একটা কী শ্রেষ্ঠ, সেইটে যে কী মনে পড়ছে না।

অপূর্ব। না না, তিনি বলেছিলেন অন্নও শ্রেষ্ঠ, অন্নপায়ীও শ্রেষ্ঠ। কিন্তু অন্নই বা কেন শ্রেষ্ঠ আর অন্নপায়ীই বা কেন শ্রেষ্ঠ তখন বুঝেছিলুম, এখন কোনোমতেই ভেবে পাচ্ছি নে।

খগেন্দ্র। অন্ন এবং অন্নপায়ীর মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, সহজবুদ্ধিতে পূর্বে সেটা একরকম ঠাউরেছিলুম, কিন্তু গুরুদেবের কথা শুনে বুঝলুম যে, পূর্বে কিছুই বুঝি নি এবং তিনি যা বললেন তাও কিছুই বুঝলুম না।

অচ্যুত। যা হোক, সেও একটা লাভ।

বদনচন্দ্রের ছুটিয়া প্রবেশ

বদন। (হাঁপাতে হাঁপাতে) গুরু কোথায় ? আমাদের শিরোমণিমশায় কোথায় ? বলো-না হে কোথায় গেলেন তিনি !

অচ্যুত প্রভৃতি। কেন কেন ?

বদন। হঠাৎ কাল রাত্রে আমার মনে একটা প্রশ্ন উদয় হল, সে অবধি আহার নিদ্রা প্রায় ছেড়েছি।

কার্তিক। তাই তো ! বিষয়টা কী বলো তো।

বদন। কী জান ? কাল মশারি ঝাড়তে ঝাড়তে হঠাৎ মনে একটা তর্ক এল যে, এত দেশ থাকতে জটায়ু কেন রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে মারা পড়ল ? জটায়ু যে রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে ম'ল তার অর্থ কী, তার কারণ কী, এবং তার তাৎপর্যই বা কী ? এর মধ্যে যদি কোনো রূপক থাকে তবে তাই বা কী ? যদি কোনো অর্থ না থাকে তাই বা কেন ?

কার্তিক। বিষয়টা শক্ত বটে। শিরোমণিমশায় আসুন।

খগেন্দ্র। (ভয়ে ভয়ে) ঠিক বলতে পারি নে, কিন্তু আমার বোধ হয় জটায়ুর মৃত্যুর একমাত্র কারণ, যুদ্ধের সময় রাবণ তাকে এমন অস্ত্র মেরেছিলেন যে সেটা সাংঘাতিক হয়ে উঠল।

বদন। আরে রাম, ও কি একটা উত্তর হল ! ও তো সকলেই জানে।

কার্তিক। ও তো আমিও বলতে পারতুম।

অপূর্ব। ও রকম উত্তরে কি মন সন্তুষ্ট হয় ?

বদন চিন্তান্বিত। খগেন্দ্র অপ্রতিভ

অচ্যুত। (শশব্যস্ত) ঐ-যে গুরু আসছেন।

উমেশ। ঐ-যে শিরোমণিমশায়।

বদন। (সহসা চিন্তাভঙ্গে চকিত হইয়া) অ্যাঁ, গুরুদেব আসছেন ! বাঁচলুম, আমার অর্ধেক সংশয় এখনি দূর হয়ে গেল।

শিরোমণি মহাশয়ের প্রবেশ

সকলের ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম

শিরোমণি। স্বস্তি স্বস্তি !

বদন। গুরুদেব, কাল মশারি ঝাড়তে ঝাড়তে মনে একটা প্রশ্ন উদয় হয়েছে।

শিরোমণি। প্রকাশ করে বলো।

বদন। বিহগরাজ জটায়ু রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে কেন নিহত হলেন ? (অঙ্গুলিনির্দেশপূর্বক) আমাদের খগেন্দ্রবাবু (খগেন্দ্র অত্যন্ত লজ্জিত ও কুণ্ঠিত) বলছিলেন অস্ত্রাঘাতই তার কারণ।

শিরোমণি। বটে ! হাঃ হাঃ হাঃ, আধুনিক নব্যতন্ত্র কালেজের ছেলের মতোই উত্তর হয়েছে। শাস্ত্রচর্চা ছেড়ে বিজ্ঞান পড়ার ফলই এই। প্রশ্ন হল, জটায়ুর মৃত্যু হল কেন, উত্তর হল অস্ত্রাঘাতে। এ কেমন হল জান ? কাশীধামে বৃষ্টি হল আর খড়দহে পঙ্গপালে ধান খেলে। হা হা হাঃ।

অপূর্ব। ঠিক তাই বটে। আজকাল এইরকমই হয়েছে, বুঝেছেন শিরোমণিমশায় ?

শিরোমণি। আচ্ছা বাপু খগেন্দ্র, তুমি তো অনেকগুলো পাস দিয়েছ, তুমিই বলো তো, অস্ত্রাঘাতেই বা জটায়ুর মৃত্যু হল কেন, রক্তপিত্ত রোগেই বা না মরে কেন ? রাবণের সঙ্গেই বা যুদ্ধ হয় কেন, ভস্মলোচনের সঙ্গেই বা না হল কেন ? অত কথায় কাজ কী, জটায়ুই বা মরে কেন, রাবণ ম'লেই বা ক্ষতি কী ছিল ?

বদন পূর্বাপেক্ষা চিন্তান্বিত

অচ্যুত ও অপূর্ব। (গভীর চিন্তার সহিত) তাই তো, এত দেশ থাকতে জটায়ুই বা মরে কেন !

উমেশ। কী হে খগেন্দ্র, একটা জবাব দাও-না। তোমাদের রস্কো-সাহেব কী লেখেন ?

কার্তিক। তোমাদের টিণ্ডালই বা কী বলেন— রাবণের সঙ্গেই বা যুদ্ধ হয় কেন ?

অচ্যুত। রক্তপিত্তে না ম'রে অস্ত্রাঘাতে মরবার জন্যেই বা তার এত মাথাব্যথা কেন ? হক্সলি-সাহেব কী মীমাংসা করেন শুনি।

খগেন্দ্র। (আধমরা হইয়া) গুরুদেব, আমি মূঢ়মতি, না বুঝে একটা কথা বলে ফেলেছি। মাপ করুন। শ্রীমুখের উত্তরের জন্যে উৎসুক হয়ে আছি।

শিরোমণি। তোমরা বলছ রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে জটায়ু ম'ল কেন— এক কথায় এর উত্তর দিই কী করে!

সকলে। তা তো বটেই। তা তো বটেই।

শিরোমণি। প্রথমে দেখতে হবে 'রাবণের'ই সঙ্গে যুদ্ধ হয় কেন, তার পরে দেখতে হবে রাবণের সঙ্গে 'যুদ্ধ'ই বা হয় কেন, তার পরে দেখতে হবে রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে 'জটায়ু'ই বা মরে কেন, সব শেষে দেখতে হবে রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে জটায়ু 'মরে'ই বা কেন?

বদন হাল ছাড়িয়া দিয়া চিন্তাসাগরে নিমজ্জমান

অচ্যুত। (খগেন্দ্রকে *ঠেলিয়া*) শুনছ খগেনবাবু?

অপূর্ব। কী খগেনবাবু, মুখে যে কথাটি নেই?

কার্তিক। খগেন্দ্র-সাহেব, তোমার কেমিস্ট্রি গেল কোথায় হে?

খগেন্দ্র রক্তমুখচ্ছবি

শিরোমণি। তবে একে একে উত্তর দিই। প্রথম প্রশ্নের উত্তর, নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে।

বদন। (দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া) আঃ, বাঁচলুম। এ ছাড়া আর কোনো উত্তর হতেই পারে না।

শিরোমণি। যদি বল 'নিয়তিকে কে বাধা দিতে পারে' এ কথার অর্থ কী, তবে সরল করে বুঝিয়ে দিই। নিয়তত্বই হচ্ছে নিয়তির গুণ এবং নিয়তের গুণই হচ্ছে নিয়তি। তা যদি হয় তবে নিয়তকালবর্তী যে নিয়তি তাকে পুনশ্চ নিয়ত নিয়ন্ত্রিত করতে পারে এমন দ্বিতীয় নিয়তির সম্ভাবনা কুতঃ? কারণ কিনা, নিত্য যাহা তাহাই নিয়ত এবং তাহাই নিয়ন্তা, অতএব রাবণের সঙ্গেই যে জটায়ুর যুদ্ধ হবে এ আর বিচিত্র কী!

সকলে। এ আর বিচিত্র কী!

বদন। অহো, এ আর বিচিত্র কী!

শিরোমণি। এক্ষণে দ্বিতীয় প্রশ্ন—

বদন। কিন্তু আর নয়, প্রথমটা আগে ভালো করে জীর্ণ করি।

অচ্যুত। কিন্তু কী চমৎকার উত্তর!

অপূর্ব। কী সরল মীমাংসা!

কার্তিক। কী পরিষ্কার ভাব!

উমেশ। কী গভীর শাস্ত্রজ্ঞান!

বদন। (শিরোমণির মুখের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া) গুরুদেব, আপনার অবর্তমানে আমাদের কী দশা হবে!

সকলের বাষ্পবিসর্জন

চৈত্র ১২৯৩

ব্যঙ্গকৌতুক

ব্যঙ্গকৌতুক

বিনি পয়সার ভোজ

আপিসের বেশে অক্ষয়বাবু

(হাসিতে হাসিতে) আজ আচ্ছা জব্দ করেছি। বাবু রোজ আমাদের স্কন্ধে বিনামূল্যে বিনামাশুলে ইয়ার্কি দিয়ে বেড়ান, আর লম্বাচওড়া কথা কন। মশায়, আজ বছর-খানেক ধরে রোজ বলে 'আজ খাওয়াব' 'কাল খাওয়াব', খাওয়াবার নাম নেই। যতখানি আশা দিয়েছে তার সিকি পরিমাণ যদি আহার দিত তা হলে এতদিনে তিনটে রাজসূয় যজ্ঞ হতে পারত। যা হোক, আজ তো বহু কষ্টে একটা নিমন্ত্রণ আদায় করা গেছে। কিন্তু, দুটি ঘণ্টা বসে আছি এখনো তার দেখা নেই। ফাঁকি দিলে না তো?

(নেপথ্যে চাহিয়া) ওরে, কী তোর নাম, ভূতো না মোধো, না হরে?

চন্দ্রকান্ত? আচ্ছা, বাপু, তাই সই। তা, ভালো চন্দ্রকান্ত, তোমার বাবু কখন আসবে বলো দেখি।

কি বললি? বাবু হোটেল থেকে খাবার কিনে আনতে গেছেন? বলিস কী রে! আজ তবে তো রীতিমত খানা! খিদেটিও দিব্যি জমে এসেছে। মটন-চপের হাড়গুলি একেবারে পালিশ করে হাতির দাঁতের চুষিকাঠির মতো চক্‌চকে করে রেখে দেব। একটা মুর্গির কারি অবিশ্যি থাকবে— কিন্তু, কতক্ষণই বা থাকবে! আর দু-রকমের দুটো পুডিং যদি দেয় তা হলে চেঁচেপুঁচে চীনের বাসনগুলোকে একেবারে কাঁচের আয়না বানিয়ে দেব। যদি মনে ক'রে ডজন-দুত্তিন অয়স্টার প্যাটি আনে তা হলে ভোজনটি বেশ পরিপাটি রকমের হয়। আজ সকাল থেকে ডান চোখ নাচছে, বোধ হয় অয়স্টার প্যাটি আসবে।

ওহে ও চন্দ্রকান্ত, তোমার বাবু কখন গেছেন বলো দেখি।

অনেকক্ষণ গেছেন? তবে আর বিস্তর বিলম্ব নেই। ততক্ষণ এক ছিলিম তামাক দাও-না। অনেকক্ষণ ধরে বলছি, কিন্তু তোমার কোনো গা দেখছি নে।

তামাক বাইরে নেই? বাবু বন্ধ করে রেখে গেছেন? এমন তো কখনো শুনি নি। এ তো কোম্পানির কাগজ নয়। কী করা যায়! আমি একটু-আধটু আফিম খাই, তামাক না হলে আর তো বাঁচি নে। ওহে মোধো, না, না, চন্দ্রকান্ত, কোনোমতে মালীদের কাছ থেকে হোক, যেখান থেকে হোক, এক ছিলিম জোগাড় করে দিতে পার-না?

বাজার থেকে কিনে আনতে হবে? পয়সা চাই? আচ্ছা বাপু, তাই সই। এই নাও, এক পয়সার তামাক চট করে কিনে নিয়ে এসো।

এক পয়সার তামাক হবে না? কেন হবে না! বাপু, আমাকে কি মুচিখোলার নবাব বলে হঠাৎ তোমার ভ্রম হয়েছে? ষোলো টাকা ভরি অম্বুরি তামাক না হলেও আমার কষ্টেসৃষ্টে চলে যায়— এক পয়সাতেই ঢের হবে।

হুঁকো-কলকেও কিনে আনতে হবে? সেও তোমার বাবু লোহার সিন্দুকে পুরে রেখে গেছেন নাকি? বাঙাল ব্যাঙ্কে সেফ ডিপজিট করে আসেন নি কেন! ওরে বাস রে! এ তো ভালো জায়গায় এসে পড়া গেছে দেখছি। তা নাও, এই ছটি পয়সা ট্রামের জন্যে রেখেছিলুম। উদয় ফিরে এলে তার কাছ থেকে সুদ-সুদ্ধ আদায় করে নিতে হবে।— এই বুঝি বাবুর বাগানবাড়ি, তা হলে এঁর

ভদ্রাসন-বাড়ি কিরকম হবে না জানি ! কড়িগুলো মাথায় ভেঙে না পড়লে বাঁচি। এই তো একখানি ভাঙা চৌকি আসবাবের মধ্যে। এ আমার ভর সইবে না। সেই অবধি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুরে ঘুরে পা ব্যথা হয়ে গেল— আর তো পারি নে— এই মাটিতেই বসা যাক।

কোঁচা দিয়া ধুলা ঝাড়িয়া একটা খবরের কাগজ মাটিতে পাতিয়া
উপবেশন ও গুন্‌গুন্ স্বরে গান

যদি জোটে রোজ
এমনি বিনি পয়সায় ভোজ !
ডিশের পরে ডিশ
শুধু মটন কারি ফিশ,
সঙ্গে তারি হুইস্কি সোডা দু-চার রয়াল ডোজ !
পরের তহবিল
চোকায় উইল্‌সনের বিল—
থাকি মনের সুখে হাস্যমুখে কে কার রাখে খোঁজ !

কই রে ? তামাক এল ? ও কী রে ? শুধু কলকে ? হুঁকো কই ? এখানে ছ পয়সায় হুঁকো পাওয়া যায় না ? কলকেটার দাম দু আনা ? হ্যা দেখো বাপু চন্দ্রকান্ত, বাইরে থেকে আমাকে দেখে যতটা বোকা মনে হয় আমি ততটা নই। শরীরটা যত মোটা, বুদ্ধিটা তার চেয়ে কিঞ্চিৎ সূক্ষ্ম। তোমার বাবু যে হুঁকোটা কলকেটা তামাকটা পর্যন্ত আয়রনচেস্টে তুলে রেখে দেন, এতক্ষণে তার কারণ বোঝা গেল। কেবল তোমার মতো রত্নটিকে বাইরে রাখাই তাঁর ভুল হয়েছে। বোধ হয় বেশি দিন বাইরে থাকতেও হবে না। কোম্পানি-বাহাদুর একবার খবরটি পেলেই পাহারা বসিয়ে খুব হেপাজতের সঙ্গেই তোমাকে রাখবেন। যা হোক, তামাক না খেয়ে তো আর বাঁচি নে। (কলিকায় মুখ দিয়া তামাক টানিয়া কাশিতে কাশিতে) ওরে বাবা, এ কোথাকার তামাক ! এ যে উইল করে টানতে হয়। এর দু টান টানলে স্বয়ং বাবা ভোলানাথের মাথার চাঁদি ফট্ করে ফেটে যায়, নন্দীভৃঙ্গীর ভিরমি লাগে। কাজ নেই বাপু, থাক্। বাবু আগে আসুন। কিন্তু, বাবুর আসবার জন্যে তো কোনোরকম তাড়া দেখছি নে। সে বোধ হয় প্যাটিগুলো একটি একটি করে শেষ করছে। এ দিকে আমার পেট এমনই জ্বলে উঠেছে যে, মনে হচ্ছে যেন এখনই কোঁচায় আগুন ধরে যাবে। তৃষ্ণাও পেয়েছে। কিন্তু, জল চাইলেই আমাদের চন্দ্রকান্ত বলে বসবেন গেলাস কিনে আনতে হবে, বাবু বন্ধ করে রেখে গেছেন। কাজ নেই, বাগানের ডাব খাওয়া যাক।

ওহে বাপু চন্দ্র, একটি কাজ করতে পার ? বাগান থেকে চট করে একটি ডাব পেড়ে আনতে পার ? বড়ো তেষ্টা পেয়েছে।

কেন ? ডাব পাওয়া যাবে না কেন ? বাগানে তো ডাব বিস্তর দেখে এলুম।

সব গাছ জমা দেওয়া হয়েছে ? তা, হোক-না বাপু, একটি ডাবও মিলবে না ?

পয়সা চাই ? পয়সা তো আর নেই। তবে থাক্, বাবু আসুন, তার পরে দেখা যাবে।— সঙ্গে মাইনের টাকা আছে, কিন্তু ওকে ভাঙাতে দিতে সাহস হয় না। এখনো কোম্পানির মুল্লুকে যে এতবড়ো একটি ডাকাত বাইরে ছাড়া আছে তা আমি জানতুম না— যাই হোক, এখন উদয় এলে যে বাঁচি।

ঐ বুঝি আসছে। পায়ের শব্দ শুনছি। আঃ, বাঁচা গেল। ওহে উদয়, ওহে উদয় ! কই, না তো। তুমি কে হে ?

বাবু তোমাকে পাঠিয়ে দিলেন ? তার চেয়ে নিজে এলেই তো ভালো করতেন। খিদেয় যে মারা গেলুম।

হোটেলের বাবু ? কেরানিবাবু ? কই, তাঁর সঙ্গে আমার তো কোনো আত্মীয়তা নেই। কিছু খাবার পাঠিয়েছেন বলতে পার ? অয়স্টার প্যাটি ?

পাঠান নি ? বিল পাঠিয়েছেন ? কৃতার্থ করেছেন আর-কি। যে বাবুটির নামে বিল তিনি এখানে উপস্থিত নেই।

আরে, না রে না। আমি না। এও তো ভালো বিপদে পড়লুম।— আরে, মাইরি না। কী গেরো ! তোমাকে ঠকিয়ে আমার লাভ কী বাপু ? আমি নিমন্ত্রণ খেতে এসে তিন ঘণ্টা এখানে বসে আছি— তুমি হোটেল থেকে আসছ, তবু তোমাকে দেখেও অনেকটা তৃপ্তি হচ্ছে। বোধ হয় তোমার ঐ চাদরখানা সিদ্ধ করলে ওর থেকে নিদেন— ভয় নেই, আমি তোমার চাদর নেব না, কিন্তু বিলটিও চাই নে।

এ তো ভালো মুশকিল দেখছি। ওগো, না গো না। আমি উদয়বাবু নই, আমি অক্ষয়বাবু। কী গেরো ! আমার নাম আমি জানি নে, তুমি জান ! অত গোলে কাজ কী বাপু, তুমি নীচে গিয়ে একটু বোসো, উদয়বাবু এখনই আসবেন।

বিধাতা সকালবেলায় এইজন্যেই কি ডান চোখ নাচিয়েছিলে ? হোটেল থেকে ডিনার না এসে বিল এসে উপস্থিত !—

সখি, কী মোর করম ভেল !
পিয়াসা লাগিয়া জলদ সেবিনু, বজর পড়িয়া গেল।

হে বিধি, তোমারই বিচারে সমুদ্রমন্থনে একজন পেলে সুধা, আর-একজন পেলে বিষ। হোটেল-মন্থনেও কি একজন পাবে মজা, আর-একজন পাবে তার বিল ! বিলটাও তো কম দিনের নয় দেখছি।

তুমি আবার কে হে ? বাবু পাঠিয়ে দিলে ? বাবুর যথেষ্ট অনুগ্রহ। কিন্তু, তিনি কি মনে করেছেন তোমার মুখখানি দেখেই আমার ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর হবে ? তোমার বাবু তো বড়ো ভদ্রলোক দেখছি হে।

কী বললে ? কাপড়ের দাম ? কার কাপড়ের দাম ?

উদয়বাবু কাপড় কিনবেন আর অক্ষয়বাবু তার দাম দেবে ? তোমার তো বিবেচনাশক্তি বেশ দেখছি।

সত্যি নাকি ? কিসে ঠাওরালে আমারই নাম উদয়বাবু ? কপালে কি সাইনবোর্ড টাঙিয়ে রেখেছি ? আমার অক্ষয়বাবু নামটা কি তোমার পছন্দ হল না ?

নাম বদলেছি ? আচ্ছা বাপু, শরীরটি তো বদলানো সহজ ব্যাপার নয়। উদয়বাবুর সঙ্গে কোনখানটা মেলে, বলো দেখি।

উদয়বাবুকে কখনো চাক্ষুষ দেখ নি ? আচ্ছা, একটু সবুর করো, তোমার মনের আক্ষেপ মিটিয়ে দেব। বিস্তর দেরি হবে না, তিনি এলেন ব'লে।

আরে ম'ল ! আবার কে আসে ? মশায়ের কোত্থেকে আসা হল ? মশায়েরও এখানে নিমন্ত্রণ আছে বুঝি ?

বাড়িভাড়া ? কোন বাড়ির ভাড়া মশায় ? এই বাড়ির ? ভাড়াটা কত হিসাবে ?

মাসে সতেরো টাকা ? তা হলে হিসেব করুন দেখি সাড়ে তিন ঘণ্টায় কত ভাড়া হয়। ঠাট্টা করছি নে মশায়, মনের সেরকম প্রফুল্ল অবস্থা নয়। এ বাড়িতে নিমন্ত্রিত হয়ে আমি সাড়ে তিন ঘণ্টা কাল আছি। সেজন্যেও যদি ভাড়া দিতে হয় তো ন্যায্য হিসেব করে নিন। তামাকটা পর্যন্ত পয়সা দিয়ে খেয়েছি।

আজ্ঞে না, আপনি ঠিকটি অনুমান করতে পারেন নি— আপনার ঈষৎ ভুল হয়েছে— আমার নাম উদয় নয়, অক্ষয়। এরকম সামান্য ভুলে অন্য সময় বড়ো একটা কিছু আসে যায় না, কিন্তু বাড়িভাড়া-আদায়ের সময় বাপ-মায়ে যার যে নাম দিয়েছেন সেইটে বাঁচিয়ে কাজ করলেই সুবিধে হয়।

আমাকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলছেন ? মাপ করবেন, ঐটি পারব না। সাড়ে তিন ঘণ্টা ধরে পেটের জ্বালায় মরছি, ঠিক যেই খাবারটি আসবার সময় হল অমনি আপনি গাল দিচ্ছেন বলেই যে বাড়ি ছেলে চলে যাব আমাকে তেমন গর্দভ ঠাওরাবেন না। আপনি ঐখানেই বসুন, যা যা বলবার অভিপ্রায় আছে বলে যান, আমি আহারান্তে বাড়ি ছেড়ে যাব।

বকে বকে আমার গলা শুকিয়ে এল, আর তো বাঁচি নে। খিদেয় নাড়িগুলো বেবাক হজম হয়ে গেল। ঐ-যে পায়ের শব্দ ! ওহে উদয়, আমার অন্ধের নড়ি, আমার সাগর-সেঁচা সাত রাজার ধন মানিক, একবার উদয় হও হে ! আর তো প্রাণ বাঁচে না।

তুমি আবার কে হে ? যদি গালমন্দ দেবার থাকে তো ঐখানে বসে আরম্ভ করে দাও। দোহার্কি করবার অনেকগুলি লোক উপস্থিত আছেন।

হরিবাবু আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন ? শুনে বড়ো সন্তোষ লাভ করলুম। তিনি আমাকে খুব ভালোবাসেন সন্দেহ নেই, কিন্তু আমার পরম বন্ধু যাঁরা আমাকে নিমন্ত্রণ করে পাঠিয়েছেন তাঁদের কোনো দেখাসাক্ষাৎ নেই আর যাঁদের সঙ্গে আমার কোনো কালে কোনো পরিচয় নেই তাঁরা যে আজ প্রাতঃকাল থেকে আমাকে এত ঘন ঘন খাতির করছেন এর কারণ কি ? আচ্ছা মশায়, হরিবাবু-নামক কোনো একটি ভদ্রলোক আমাকে কেন এমন অসময়ে স্মরণ করলেন এবং হঠাৎ এতই অধৈর্য হয়ে উঠলেন বলতে পারেন কি ?

কী ! আমি আমার স্ত্রীর বালা গড়াবার জন্যে তাঁর কাছ থেকে নমুনাস্বরূপ গহনা এনে ফিরিয়ে দিচ্ছি নে ? দেখো, এ সম্বন্ধে আমার অনেকগুলি কথা বলবার ছিল, কিন্তু আপাতত একটি বললেই যথেষ্ট হবে— আমি কারও কাছ থেকে কোনো গহনা আনি নি এবং আমার স্ত্রীই নেই। প্রধান প্রধান কথা আর যা বলবার ছিল সে আজকের মতো মাপ করবেন— গলা শুকিয়ে তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে মরছি। আপনি আর আধ ঘণ্টা কাল অপেক্ষা করুন, সমস্ত সমাচার অবগত হবেন। (উচ্চৈঃস্বরে) ওরে উদয়, ওরে উদো, ওরে লক্ষ্মীছাড়া হতভাগা পাজি ছুঁচো ড্যাম শুয়ার ইস্টুপিড— ওরে পেট যে জ্বলে গেল, গলা যে শুকিয়ে যায়, মাথা যে ফেটে যাচ্ছে— ওরে নরাধম, কুলাঙ্গার !

আরে না মশায় ! আপনাদের সম্ভাষণ করছি নে। আপনারা হঠাৎ চঞ্চল হবেন না। আমি পেটের জ্বালায়, মনের খেদে, আমার প্রাণের বন্ধুকে ডাকছি। আপনারা বসুন।

আর বসতে পারছেন না ? অনেক দেরি হয়ে গেছে ? সে কথা আর আমাকে বলতে হবে না। দেরি হয়েছে সন্দেহ নেই। তা হলে আপনাদের আর পীড়াপীড়ি করে ধরে রাখতে চাই নে। তবে আজকের মতো আপনারা আসুন। আপনাদের সঙ্গে মিষ্টালাপে এতক্ষণ সময়টা বেশ সুখে কেটেছিল।

কিন্তু, এখন যে-কথাগুলো বলছেন ওগুলো কিছু অধিক পরিমাণেই বলছেন। খুব পরম বন্ধুকেও মানুষ ভালোবেসে শ্যালক সম্ভাষণ করতে হঠাৎ কুণ্ঠিত হয়, কিন্তু আপনাদের সঙ্গে অতি অল্পক্ষণের আলাপেই যে আপনারা এতটা বেশি ঘনিষ্ঠতা আত্মীয়তা করছেন সেজন্যে আমি মনে মনে কিছু লজ্জাবোধ করছি। জানবেন আপনাদের প্রতি আমার আন্তরিক কোনোরকম অসদ্ভাব নেই, কিন্তু আপনারা আমার কাছে যতটা প্রত্যাশা করছেন আমি ততটা দিতে একেবারে অক্ষম।

মশায়রা আর বাড়াবাড়ি করবেন না। আপনারা বোধ হয় দু বেলা নিয়মিত আহার করে থাকেন, খিদে পেলে মানুষের মেজাজটা কিরকম হয় ঠিক জানেন না, তাই আমাকে এমন অবস্থায় ঘাঁটাতে সাহস করছেন।

আবার ! ফের ! দেখো বাপু, আমার সঙ্গে পারবে না। শরীরটা দেখেই বুঝতে পারছ না ! বহু কষ্টে রাগ চেপে আছি, পাছে একটা খুনোখুনি কাণ্ড করে বসি। আচ্ছা, আমাকে রাগাও দেখি। দেখি তোমাদের কত ক্ষমতা। কিছুতেই রাগাতে পারবে না। এই দেখো আমি খুব গম্ভীর হয়ে ঠাণ্ডা হয়ে বসলুম।

ও বাবা ! এরা যে সবাই মিলে মারধোর করবার জোগাড় করে ! খালি পেটে, খিদের উপর, মারটা সয় না দেখছি। আচ্ছা বাপু, তোমরা সবাই বোসো। তোমাদের কার কত পাওনা আছে বলো।—

ভাগ্যি মাইনের টাকাটা পকেটে ছিল, নইলে আজ নিতান্তই ধনঞ্জয়কে স্মরণ করে এক-পেট খিদেসুদ্ধ দৌড় মারতে হত। আপাতত প্রাণটা বাঁচাই, তার পর টাকাটা উদয়ের কাছ থেকে আদায় করে নিলেই হবে।

তোমার পাঁচ টাকা বৈ পাওয়া নয়, কিন্তু তুমি পঞ্চান্ন টাকার গাল পেড়ে নিয়েছ বাপু— এই নাও তোমার টাকা।

ওহে বাপু, তোমার হোটেলের বিল এই শুধে দিচ্ছি, যদি কখনো অসময়ে তোমাদের শরণাগত হতে হয় তা হলে স্মরণ রেখো।

তোমার তিন মাসের বাড়িভাড়া পাওনা? এক মাসের টাকাটা আজ দিচ্ছি, বাকি পরে নিয়ো। তুমি তো ভাই, তোমার গালমন্দ আমাকে ষোলো-আনাই চুকিয়ে দিয়েছ, তাতে বোধ করি তোমার মনটা কতকটা খোলসা হয়েছে, এখন আশীর্বাদ করে বাড়ি চলে যাও।

ওহে বাপু, তোমার গহনা ফিরিয়ে দেওয়া সহজ নয়! যদি আমার স্ত্রী থাকতেন আর তোমার গহনা তাঁকে দিতুম তা হলেও ফিরিয়ে আনা শক্ত হত; আর যখন তিনি বর্তমান নেই এবং তোমার গহনা তাঁকে দিই নি, তখন ফিরিয়ে আনা আরো কত কঠিন তা একটুখানি ভেবে দেখলে তুমিও হয়তো বুঝতে পারবে। তবু যদি পীড়াপীড়ি কর তা হলে কাজেই তোমার হরিবাবুর ওখানে আমাকে যেতে হবে, কিন্তু খাবারটা আসে কি না আর-একটু না দেখে যেতে পারছি নে।— উঃ! আর তো পারি নে। চন্দ্র, ওহে চন্দ্র! এখানে উদয়ের তো কোনো সম্পর্ক নেই, এখন তুমি সুদ্ধ অস্ত গেলে আমি যে অন্ধকার দেখি। চন্দ্র! ওহে চন্দ্রকান্ত! এই-যে এসেছ। চন্দ্র, তুমি তো তোমার বাবুকে চেন, সত্য করে বলো দেখি আজ কাল এবং পরশুর মধ্যে তিনি কি হোটেল থেকে ফিরবেন।

বোধ হয় ফিরবেন না? এতক্ষণ পরে তোমার এই কথাটি আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হচ্ছে। যা হোক, বড্ড খিদে পেয়েছে, এখন আর গাল দেবার সময় নেই, এই আধুলিটি নিয়ে যদি চট করে কিছু খাবার কিনে আন তা হলে প্রাণ রক্ষে হয়।

লোকটা নবাবি করে বেড়ায় অথচ কাজকর্ম কিছু নেই, আমরা ভাবতুম চালায় কী করে! এখন ব্যাপারটা বুঝতে পারছি। কিন্তু, প্রত্যহ এতগুলি গাল হজম ক'রে, এতগুলি বিল ঠেকিয়ে, এতগুলো লোক খেদিয়ে রাখা তো কম কাণ্ড নয়। এতে মজুরি পোষায় না, এর চেয়ে ঘানি ঠেলেও সুখ আছে।

কী হে! শুধু মুড়ি নিয়ে এলে? আর কিছু পাওয়া গেল না? পয়সা কিছু ফিরেছে? না? আচ্ছা, তবে দাও মুড়িই দাও।

আহার

ওহে চন্দ্র, কী বলব, ক্ষুধার চোটে এই বাসি মুড়ি যেন সুধা ব'লে বোধ হচ্ছে। অনেক নিমন্ত্রণ খেয়েছি, কিন্তু এমন সুখ পাই নি। চন্দ্র, তুমিই সুধাকর বটে, কিন্তু আজকে কলঙ্কের ভাগটাই কিছু বেশি দেখা গেল। ডাবও একটা এনেছ দেখছি, এর জন্যেও স্বতন্ত্র কিছু দিতে হবে নাকি? হবে না? শরীরে দয়ামায়া কিছু আছে বোধ হচ্ছে, এখন যদি একটি গাড়ি ডেকে দাও তো আস্তে আস্তে বিদায় হই।

গাড়ি এখানে পাওয়া যায় না? তবে তো বড়ো বিপদে ফেললে। আমি এখন না খেয়ে কাহিল শরীরে দেড় ক্রোশ রাস্তা হাঁটতে পারব না; যখন সম্মুখে আহারের আশা ছিল তখন পেরেছিলুম।— কী করব! বেরিয়ে পড়া যাক।

কী সর্বনাশ! এই সময়ে আবার হরিবাবুর ওখানে যেতে হবে? চন্দ্র, তুমি আজ আমার বিস্তর উপকার করেছ, এখন আর কিছু করতে হবে না, এই ভদ্রলোকের ছেলেটিকে বুঝিয়ে দাও আমি উদয়বাবু নই, আমি আহিরীটোলার অক্ষয়বাবু।

ও তোমার কথা বিশ্বাস করবে না? সেজন্যে ওকে আমি বেশি দোষ দিতে পারি নে, বোধ হয় তোমাকে ও অনেক দিন থেকে চেনে। যা হোক, আর ঝগড়া করবার সামর্থ্য নেই, আস্তে আস্তে হরিবাবুর ওখানেই যাওয়া যাক। বাপু, যেরকম অবস্থা দেখছ পথে যদি একটা কিছু ঘটে দাহ করবার

ব্যয়টা তোমার স্কন্ধে পড়বে— আগে থাকতে বলে রাখলুম।

চন্দ্র, তুমি আবার হাত বাড়াও কেন হে! তোমাদের কল্যাণে যেরকম সস্তায় আজ নেমন্তন্ন খেয়ে গেলুম বহুকাল আমার আর খিদে থাকবে না। আরো কী চাও?

ও! বকশিশ! সেটা চুকিয়ে দেওয়াই ভালো। যখন এতই করলেম তখন সর্বশেষে ঐ খুঁতটুকু আর রাখব না। কিন্তু আমার কাছে আর একটিমাত্র টাকা বাকি আছে। তার মধ্যে বারো-আনা আমি গাড়িভাড়ার জন্যে রেখে দিতে চাই। তোমার কাছে খুচরো, যদি কিছু থাকে তা হলে ভাঙিয়ে—

খুচরো নেই? (পকেট উলটাইয়া শেষ টাকাটি দিয়া) তবে এই নাও বাপু। তোমাদের বাড়ি থেকে বেরোলুম একেবারে গজভুক্তকপিত্থবৎ।

কিন্তু এই-যে টাকাগুলি দিলুম, উদয়ের কাছ থেকে ফিরে আদায় করবার কী উপায় করা যায়! একটা দামি জিনিস যদি কিছু পাওয়া যায় তো আটক করে রাখি। দামি জিনিসের মধ্যে তো দেখছি ঐ চন্দ্রকান্ত; কিন্তু যেরকম দেখলুম ওঁকে সংগ্রহ করা আমার কর্ম নয়, আমাকে উনি ট্যাঁকে গুঁজে নিতে পারেন।

(কোণে একটা দেরাজ সবলে খুলিয়া) বাঃ, এই তো ঠিক হয়েছে। চেনটিও দিব্যি। তা হলে ঘড়িসুদ্ধ এইটি দখল করা যাক।

কী হে চন্দ্র, এত ব্যস্ত কেন?

পুলিস! পুলিস আসছে?

আমাকে পালাতে হবে? কেন, কী দুষ্কর্ম করেছি! কেবল এক ভদ্রলোকের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসেছি, তার যা শাস্তি যথেষ্ট হয়েছে।

তাই তো সত্যিই দেখছি! চন্দ্র কোথায় গেল! হরিবাবুর সেই লোকটিকেও যে দেখছি নে! সবাই পালিয়েছে!

দেখো বাপু, গায়ে হাত দিয়ো না। ভালো হবে না। আমি ভদ্রলোক। চোর নই, জালিয়াত নই।

উঃ, কর কী! লাগে যে! বাবা, আজ সমস্ত দিন কেবল মুড়ি খেয়ে পথ চেয়ে আছি, আজ তোমাদের এ-সব ঠাট্টা আমার ভালো লাগছে না।

পেয়াদা-বাবা, বরঞ্চ কিছু জলপানি নাও। (পকেটে হাত দিয়া) হায় হায়, একটি পয়সা নেই। দারোগা-সাহেব, যদি চোর ধরতে চাও, চলো আমি তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি। জেল সৃষ্টি হয়ে পর্যন্ত এতবড়ো চোর পৃথিবীতে দেখা দেয় নি।

কী করেছি বলো দেখি। জীবনবাবুর নাম সই করে হ্যামিলটনের দোকান থেকে ঘড়ি এনেছি? পেয়াদা-সাহেব, ভদ্রলোক হয়ে ভদ্রলোকের নামে ফস করে এতবড়ো অপবাদটা দিলে?

ও কী ও! ওটা ধরে টেনো না। ও আমার ঘড়ি নয়। শেষকালে যদি চেন-মেন ছিঁড়ে যায় তা হলে আবার মুশকিলে পড়তে হবে।

কী? এই সেই হ্যামিল্‌টনের ঘড়ি? ও বাবা, সত্যি নাকি! তা, নিয়ে যাও, নিয়ে যাও, এখনই নিয়ে যাও। কিন্তু, ঘড়ির সঙ্গে আমাকে সুদ্ধ টান কেন? আমি তো সোনার চেন নই। আমি সোনার অক্ষয় বটে, কিন্তু সেও কেবল বাপ-মায়ের কাছে।

তা, নিতান্তই যদি না ছাড়তে পার তো চলো। বাবা, আমাকে সবাই ভালোবাসে, আজ তার বিস্তর পরিচয় পেয়েছি, এখন তোমার ম্যাজিস্ট্রেটের ভালোবাসা কোনোমতে এড়াতে পারলে এ যাত্রা রক্ষে পাই।—

যদি জোটে রোজ
এমনি বিনি পয়সায় ভোজ।

পৌষ ১৩০০

নূতন অবতার

প্রথম অঙ্ক

নন্দকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

(স্বগত) তুমি রুদ্‌দুর বক্‌শি ব্রাহ্মণের ব্রহ্মোত্তর পুষ্করিণীটি কেড়ে নিয়ে খিড়কির পুকুর করেছ। আচ্ছা, দেখা যাবে তুমি ভোগ কর কেমন করে। ঐ পুকুরে দু বেলা ছত্রিশ জাতকে স্নান করাব তবে আমি ব্রাহ্মণের ছেলে। (সমাগত প্রতিবেশীবর্গের প্রতি) তা, তোমরা তো সব শুনেছ দেখছি। সে স্বপ্নের কথা মনে হলে এখনো গা শিউরে ওঠে। ভাই, উপরি-উপরি তিন রাত্তির স্বপ্ন দেখলুম— মা গঙ্গা মকরের উপর চড়ে আমার শিয়রের কাছে এসে বললেন, 'ওরে বেটা নন্দ, তোর কুবুদ্ধি ধরেছিল, তাই তুই রুদ্‌দুর বক্‌শির সঙ্গে পুষ্করিণী নিয়ে মামলা করতে গিয়েছিলি। রুদ্‌দুর বক্‌শি কে তা জানিস ? সত্যযুগে যে ছিল ভগীরথ সে-ই আজ বক্‌শির ঘরে আবির্ভাব করেছে। হুগলি পুলের উপর দিয়ে যেদিন থেকে গাড়ি চলেছে সেই দিন থেকে আমিও তোদের ঐ পুষ্করিণীতে এসে অধিষ্ঠান করেছি।' তখন আমার মনে হল, ওরে বাপ রে ! কী কাণ্ডই করেছি ! যিনি স্বয়ং কলিযুগের ভগীরথ তাঁরই সঙ্গে কিনা গঙ্গার দখল নিয়ে আদালতে মকদ্দমা ! এমন পাপও করে ! এখন বুঝতে পারছি মকদ্দমায় কেন হার হল এবং তোমরা পাড়ার সকলেই-বা আদালতে হলফ নিয়ে কেন পরিষ্কার মিথ্যে সাক্ষি দিয়ে এলে। এ-সমস্তই দেবতার কাণ্ড। তোমাদের মুখ দিয়ে অনর্গল মিথ্যে কথা একেবারে যেন গোমুখী থেকে গঙ্গাস্রোতের মতো বেরোতে লাগল ; আমি নিতান্ত মূঢ়মতি পাপিষ্ঠ বলে প্রকৃত তত্ত্ব তখনো বুঝতে পারলুম না— মায়াতে অন্ধ হয়ে রইলুম এবং টাকাগুলো কেবল উকিলে লুটে খেলে !

অশ্রুবিসর্জন। এবং ভক্তিবিহ্বল নরনারীগণের হরিধ্বনি-
সহকারে কলিযুগের ভগীরথ-দর্শনে গমন

দ্বিতীয় অঙ্ক

রুদ্রনারায়ণ বক্‌শি

(স্বগত) তাই বটে !— ছেলেবেলা থেকে বরাবর অকারণে কেমন আমার একটা ধারণা ছিল যে, আমি বড়ো কম লোক নই। এত দিনে তার কারণটা বোঝা যাচ্ছে। আর এও দেখেছি, ব্রাহ্মণের ঐ পুষ্করিণীটির প্রতি আমার অনেক দিন থেকে লোভ পড়েছিল ; থেকে থেকে আমার কেবলই মনে হত, ও পুকুরটা কোনোমতে ঘিরে না নিতে পারলে মেয়েছেলেদের ভারি অসুবিধে হচ্ছে। একেবারে সাফ মনেই ছিল না যে, আমি ভগীরথ, আর মা গঙ্গা এখনো আমাকে ভুলতে পারেন নি। উঃ, সে জন্মে যে তপিস্যেটা করেছিলুম এ জন্মেকার মিথ্যে মকদ্দমাগুলো তার কাছে লাগে কোথায় !

(ভক্তমণ্ডলীর প্রতি ঈষৎ সহাস্যে) তা কি আর আমি জানতেম না ! কিন্তু তোমাদের কাছে কিছু ফাঁস করি নি, কী জানি পাছে বিশ্বাস না কর। কলিকালে দেবতা-ব্রাহ্মণের প্রতি তো কারও ভক্তি নেই। তা ভয় নেই, আমি তোমাদের সব অপরাধ মাপ করলুম।— কে গো তুমি ? পায়ের ধুলো ? তা, এই নাও (পদপ্রসারণ)। তুমি কী চাও গা ? পাদোদক ? এসো, এসো। নিয়ে এসো তোমার বাটি— এই নাও— খেয়ে ফেলো। ভোরবেলা থেকে পাদোদক দিতে দিতে আমার সর্দি হয়ে মাথা ভার হয়ে এল।— বাছা, তোমরা সব এসো, কিছু ভয় নেই। এতদিন আমাকে চিনতে পার নি সে তো আর তোমাদের দোষ নয়। আমি মনে করেছিলুম কথাটা তোমাদের কাছে প্রকাশ করব না, যেমন চলছে এমনিই চলবে— তোমরা আমাকে তোমাদের মাধব বক্‌শির ছেলে রুদ্‌দুর বক্‌শি বলেই জানবে। (ঈষৎ হাস্য) কিন্তু মা গঙ্গা যখন স্বয়ং ফাঁস করে দিলেন তখন আর লুকোতে পারলুম না।

কথাটা সর্বত্রই রাষ্ট্র হয়ে গেছে। ও আর কিছুতে ঢাকা রইল না। এই দেখো-না হিন্দুপ্রকাশে কী লিখেছে। ওরে তিনকড়ে, চট করে সেই কাগজখানা নিয়ে আয় তো। এই দেখো— 'কলিযুগের ভগীরথ এবং ফজুগঞ্জের ভাগীরথী'— লোকটার রচনাশক্তি দিব্য আছে। আর সেই পরশুদিনকার বঙ্গতোষিণীখানা আন্ দেখি, তাতেও বড়ো বড়ো দুখানা চিঠি বেরিয়েছে। কী ? খুঁজে পাচ্ছিস নে ? হারিয়েছিস বুঝি ? হারায় যদি তো তোর দুখানা হাড় আস্ত রাখব না, তা জানিস ! সেদিন যে তোর হাতে দিয়ে বলে দিলুম আলমারির ভিতর তুলে রেখে দিস ! পাজি বেটা ! নচ্ছার বেটা ! হারামজাদা বেটা ! কোথায় আমার কাগজ হারালি বের করে দে ! দে বের করে ! যেখান থেকে পাস নিয়ে আয়, নইলে তোকে পুঁতে ফেলব বেটা !— ওঃ, তাই বটে, আমার ক্যাশবাক্সের ভিতরে তুলে রেখেছিলুম। ওহে হরিভূষণ, পড়ে শুনিয়ে দাও তো, আমার আবার বাংলা পড়াটা ভালো অভ্যেস নেই।— কে গা ? মতি গয়লানী বুঝি ? তা, এসো এসো, আমি পায়ের ধুলো দিচ্ছি— দুধের দাম নিতে এসেছ ? এখনো শোন নি বুঝি ? নন্দ মুকুজ্জেকে মা গঙ্গা কী স্বপন দিয়েছেন সে-সব খবর রাখ না ? বেটি, তুই আমার পুকুরের জল দুধের সঙ্গে মিশিয়ে আমাকে বিক্রি করেছিস, সে জলের মাহাত্ম্য জানিস ? কেমন, সবার কাছে কথাটা শুনলি তো ? এখন হিসেবটা রেখে পায়ের ধুলো নিয়ে আমার খিড়কির ঘাটে চট করে একটা ডুব দিয়ে আয় গে যা।

এই এখনই যাচ্ছি। বেলা হয়েছে সে কি আর জানি নে ? ভাত ঠাণ্ডা হয়ে গেল ? তা, কী করব বলো। লোকজন সব অনেক দূর থেকে একটু পায়ের ধুলোর প্রত্যাশায় এসেছে, এরা কি সব নিরাশ হয়ে যাবে ! আচ্ছা, উঠি। ওরে তিনকড়ে, তুই এখানে হাজির থাকিস— যারা আমাকে দেখতে আসবে সব বসিয়ে রাখিস, আমি এলুম ব'লে। খবরদার ! দেখিস যেন কেউ দর্শন না পেয়ে ফিরে না যায়। বলিস ভগীরথ-ঠাকুরের ভোগ হচ্ছে। বুঝলি ? আমি দুটো ভাত মুখে দিয়েই এলুম ব'লে।

রেখো, তুই যে একেবারে সিধে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে রইলি ! তোর কি মাথা নোয় না নাকি ? তোর তো ভারি অহংকার দেখছি। বেটা, তোর ভক্তির লেশমাত্র নেই। পাজি বেটা, তোকে জুতো মেরে বিদায় করে দেব তা জানিস ? সবাই আমাকে ভক্তি করছে, আর তুই বেটা এতবড়ো খ্রীস্টান হয়েছিস যে, আমাকে দেখে প্রণাম করিস নে ! তোর পরকালের ভয় নেই ? বেরো আমার বাড়ি থেকে।

ছি বাবা উমেশ, তোমার এত বয়স হল, তবু কার সঙ্গে কিরকম ব্যবহার করতে হয় শিখলে না ? যে ভগীরথ মর্তে গঙ্গা এনেছিলেন তাঁর গল্প মহাভারতে পড়েছ তো ? ভুল করছ— ঐরাবত নয়, সে ভগীরথ। আমাকে সেই ভগীরথ বলে জেনো। বুঝেছ ? মনে থাকবে তো ? ভগীরথ, ঐরাবত নয়। সেই জায়গাটা মাস্টারের কাছে পড়ে নিয়ো। এসো বাবা, তোমার মাথায় পায়ের ধুলো দিয়ে দিই।

কই ? ভাত কই ? আমি আর সবুর করতে পারছি নে— দেশ-দেশান্তর থেকে সব লোক আসছে। কী গো গিন্নি, এত রাগ কিসের ? হয়েছে কী ? খিড়কির পুকুরে লোকজনের ভিড় হয়েছে ? নাওয়া, কাপড় কাচা, বাসন মাজা, জল তোলা, সমস্ত বন্ধ হয়েছে ? কী করব বলো। আমি স্বয়ং ভগীরথ হয়ে গঙ্গা থেকে তো কাউকে বঞ্চিত করতে পারি নে। তা হলে আমি এত তপিস্যে করে এত কষ্ট করে গঙ্গা আনলুম কেন ? তোমাদের ময়লা কাপড় কাচবার জন্যে— বটে ! যখন ব্রাহ্মণের সঙ্গে মকদ্দমা করছিলুম তখন তোমরা সেই আশায় বসেছিলে, আসল কথাটা কেবল আমি জানতুম আর মা গঙ্গাই জানতেন।— কী ! এতবড়ো আস্পর্ধা— তুই বিশ্বাস করিস নে ! জানিস, তোকে বিয়ে করে তোর চোদ্দপুরুষকে উদ্ধার করেছি। বাপের বাড়ি যাবে ? যাও-না ! মরবার সময় আমার এই গঙ্গায় আসতে দেব না। সেটা মনে রেখো। ভাত আর আছে তো ? নেই ? আমি যে তোমাকে বেশি করে রাঁধতে বলে দিয়েছিলুম। আমার প্রসাদ নিয়ে যাবে বলে যে দেশ-বিদেশ থেকে লোক এসেছে। যা রেঁধেছ, এর একটা একটা ভাত খুঁটে দিলেও যে কুলোবে না। রান্নাঘরে যত ভাত আছে সব নিয়ে এসো— তোমরা সব চিঁড়ে আনতে দাও, পুকুর থেকে গঙ্গাজল এনে ভিজিয়ে খেয়ো। কী করব বলো। দূর থেকে নাম শুনে প্রসাদ নিতে এসেছে, তাদের ফেরাতে পারব না। কী বললে ? আমার হাতে পড়ে তোমার হাড় জ্বালাতন হয়ে গেল ? কী বলব, তুমি মুর্খু মেয়েমানুষ, ঐ কথাটা একবার দেশের ভালো

ভালো পণ্ডিতদের কাছে বলো দেখি। তারা তখনই মুখের উপর শুনিয়ে দেবে, ষাট হাজার সগরসন্তান জ্ব'লে ভস্ম হয়ে গিয়েছিল, সেই ভস্মে যিনি প্রাণ দিয়েছেন, তিনি যে তোমার হাড় জ্বালাবেন এ কথা কোনো শাস্ত্রের সঙ্গেই মিলছে না। তুমি গাল দাও, আমি আমার ভক্তদের কাছে চললুম।

(বাহিরে আসিয়া) দেরি হয়ে গেল। বাড়ির মধ্যে এঁয়ারা সব আবার কিছুতেই ছাড়েন না, পায়ের ধুলো নিয়ে পুজো করে বেলা করে দিলেন। আমি বলি, থাক্ থাক্, আর কাজ নেই— তারা কি ছাড়ে! এসো, তোমরা একে একে এসো, যার যার ধুলো নেবার আছে নিয়ে বাড়ি যাও— কী হে বিপিন? আজ মকদ্দমার দিন? তা তো যেতে পারছি নে। দর্শন করতে সব লোকজন আসছে। এক-তরফা ডিক্রি হবে? কী করব বলো। আমি উপস্থিত না থাকলে এখানেও যে এক-তরফা হয়। বিপ্‌নে, তুই যাবার সময় প্রণাম করে গেলি নে? এমনি করেই অধঃপাতে যাবে। আয়, এইখানে গড় কর, এই নে, ধুলো নে। যা।

তৃতীয় অঙ্ক

ওহে মুখুজ্জে, মা গঙ্গা ঠিক আমার এই খিড়কির কাছটায় না এসে আর রশি দুয়েক তফাতে এলেই ভালো করতেন। তুমি তো দাদা, স্বপ্ন দেখেই সারলে, আমাকে যে দিনরাত্তির অসহ্য ভোগ ভুগতে হচ্ছে। এক তো, পুকুরের জল দুধে বাতাসায় ডাবে আর পদ্মের পাতায় পচে দুর্গন্ধ হয়ে উঠেছে, মাছগুলো মরে মরে ভেসে উঠছে, যেদিন দক্ষিণের বাতাস দেয় সেদিন মনে হয় যেন নরককুণ্ডুর দক্ষিণের জানলা-দরজাগুলো সব কে খুলে দিয়েছে— সাত জন্মের পেটের ভাত উঠে আসবার জো হয়। ছেলেগুলো যে ক'টা দিন ছিল কেবল ব্যামোয় ভুগেছে। কলিযুগের ভগীরথ হয়ে ডাক্তারের ফি দিতে দিতেই সর্বস্বান্ত হতে হল; তারা সব যমদূত, ভক্তির ধার ধারে না, স্বয়ং মা গঙ্গাকে দেখতে এলে পুরো ভিজিট আদায় করে ছাড়ে। সেও সহ্য হয়, কিন্তু খিড়কির ধারে ঐ-যে দেশ-বিদেশের মড়া পুড়তে আরম্ভ হয়েছে ঐটেতে আমাকে কিছু কাবু করেছে। অহর্নিশি চিতা জ্বলছে। কাছাকাছি যে-সমস্ত বসতি ছিল সে-সমস্তই উঠে গেছে; রাত্তিরে যখন হরিবোল হরিবোল শব্দ ওঠে এবং শেয়ালগুলো ডাকতে থাকে তখন রক্ত শুকিয়ে যায়। স্ত্রী তো বাপের বাড়ি চলে গেছেন। বাড়িতে চাকর-দাসী টিকতে পারে না। ভূতের ভয়ে দিনে-দুপুরে দাঁতকপাটি খেয়ে খেয়ে পড়ে। চারটি রেঁধে দেয় এমন লোক পাই নে। রাত্তিরে নিজের পায়ের শব্দ শুনলে বুকের মধ্যে দুড় দুড় করতে থাকে; বাড়িতে জনমানব নেই; গঙ্গাযাত্রীর ঘর থেকে কেবল থেকে থেকে তারক-ব্রহ্ম নাম শুনি, আর গা ছম্‌ছম্ করতে থাকে। আবার হয়েছে কী; ছেড়েও যেতে পারি নে। আমার ভগীরথ নাম চতুর্দিকেই রাষ্ট্র হয়ে গেছে; সকলেরই দর্শন করতে ইচ্ছা হয়— সেদিন পশ্চিম থেকে দুজন এসেছিল, তাদের কথাই বুঝতে পারি নে। বেটারা ভক্তি করলে বটে, কিন্তু আমার থালাবাটিগুলো চুরিও করে গেছে। এখান থেকে উঠে গেলে হয়তো ঠিকানা না পেয়ে অনেকে ফিরে যেতে পারে। এ দিকে আবার বিষয়কর্ম দেখতে সময় পাচ্ছি নে; আমার পত্তনি তালুকটার খাজনা বাকি পড়েছে, শুনেছি জমিদার অষ্টম করবে। শরীর ভয়ে অনিয়মে এবং ব্যামোয় রোজ শুকিয়ে যাচ্ছে। ডাক্তারে ভয় দেখাচ্ছে এ জায়গা না ছাড়লে আমি আর বেশিদিন বাঁচব না। কী করি বলো তো দাদা? রুদ্দুর বক্‌শি ছিলুম, সুখে ছিলুম, কোনো ল্যাঠাই ছিল না; ভগীরথ হয়ে কোনো দিক সামলে উঠতে পারছি নে, আমার সোনার পুরী একেবারে শ্মশান হয়ে গেছে! আবার কাগজগুলো আজকাল আমার সঙ্গে লেগেছে; তারা বলে সব মিথ্যে। তাদের নামে লাইবেল আনবার জন্যে উকিলের পরামর্শ নিতে গিয়েছিলুম; উকিল বললেন, তুমিই যে ভগীরথ সেটা প্রমাণ করতে গেলে সত্যযুগ থেকে সাক্ষী তলব করতে হয়, স্বয়ং ব্যাসদেবের নামে সমন জারি করতে হয়। শুনে আমার ভরসা হল না। এখানকার লোকের মনেও ক্রমে সন্দেহ জন্মে গেছে। মতি গয়লানীর সঙ্গে একরকম ঠিক হয়েছিল আমি পাদোদক দেব আর সে দুধ দেবে, আজ দু দিন থেকে সে মাগী আবার তার হিসেব নিয়ে এসে উপস্থিত হয়েছে;

ভাবে গতিকে স্পষ্ট বুঝতে পারছি টাকার বদলে আমি তাকে পায়ের ধুলো দিতে গেলে সেও আমার উপরে পায়ের ধুলো ঝেড়ে যাবে। ভয়ে কিছু বলতে পারছি নে। পুকুরটা তো গেছেই, আমার স্ত্রী-পুত্র-কন্যারাও ছেড়ে গেছে, চাকর-দাসীও পালিয়েছে, প্রতিবেশীরাও গ্রাম ছেড়ে নতুন বসতি করেছে, আমার ভগীরথ নামটাও টেঁকে কি না সন্দেহ, কেবল কি একা মা গঙ্গা আমাকে কিছুতেই ছাড়বেন না? মা গঙ্গাকে নিয়ে কি আমার সংসার চলবে? রাস্তায় বেরোলে আজকাল ছেলেগুলো ঠাট্টা করতে আরম্ভ করেছে যে, রুদ্দুর বক্‌শির গঙ্গাপ্রাপ্তি হয়েছে!— এই তো বিপদে পড়া গেছে। দাদা, আবার একবার তোমাকে স্বপন দেখতে হচ্ছে। দোহাই তোমার, দোহাই মা গঙ্গার, হুগলির পুলের নীচে যদি তাঁর বাসের অসুবিধে হয়, দেশে বড়ো বড়ো ঝিল খাল দিঘি রয়েছে, স্বচ্ছন্দে থাকতে পারবেন। আমার ঐ পুকুরের জল যেরকম হয়ে এসেছে আর দু দিন বাদে তাঁর মকরটা তার শুঁড়সুদ্ধ মরে ভেসে উঠবে; আমার মতো ভগীরথ ঢের মিলবে, কিন্তু ব্রাহ্মণ-কায়স্থের ঘরে অমন বাহন আর পাবেন না। এই নতুন গঙ্গার ধারে তাঁর স্নেহের ভগীরথও যে বেশিদিন টিকবে কোনো ডাক্তারেই এমন আশা দেয় না। সত্যযুগের নামটার জন্যে মায়া হয় বটে, কিন্তু আমি বেশ করে ভেবে দেখেছি, দাদা, এই কলিযুগের প্রাণটার মায়াও ছাড়তে পারি নে। তাই স্থির করেছি পুষ্করিণীটি তোমাকেই ফিরিয়ে দেব, কিন্তু গঙ্গা-মাতাকে এখান থেকে একটু দূরে বসত করতে হবে।

পৌষ ১৩০১

অরসিকের স্বর্গপ্রাপ্তি

গোকুলনাথ দত্ত। ইন্দ্রলোক

গোকুলনাথ। (স্বগত) আমি দেখছি স্বর্গটি স্বাস্থ্যের পক্ষে দিব্য জায়গা হয়েছে। এ সম্বন্ধে প্রশংসা না করে থাকা যায় না। অনেক উঁচে থাকার দরুন অক্সিজেন বাষ্পটি বেশ বিশুদ্ধ পাওয়া যায়, এবং রাত্রিকাল না থাকাতে নন্দনবনের তরুলতাগুলি কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাস পরিত্যাগ করবার সময় পায় না, হাওয়াটি বেশ পরিষ্কার। এ দিকে ধুলো নেই, তাতে করে একেবারে রোগের বীজই নষ্ট হয়েছে। কিন্তু এখানে বিদ্যাচর্চার যেরকম অবহেলা দেখছি তাতে আমি সন্দেহ করি ধুলোয় রোগের বীজ উড়ে বেড়ায় এ সংবাদ এখনো এঁদের কানে এসে পৌঁচেছে কি না। এঁরা সেই-যে এক সামবেদের গাথা নিয়ে পড়েছেন, এর বেশি আর ইন্টেলেক্‌চুয়াল মুভ্‌মেণ্ট অগ্রসর হল না। পৃথিবী দ্রুতবেগে চলছে, কিন্তু স্বর্গ যেমন ছিল তেমনিই রয়েছে, কনসার্ভেটিভ যত দূর হতে হয়।

(বৃহস্পতির প্রতি) আচ্ছা পণ্ডিতমশায়, ঐ-যে সামবেদের গান হচ্ছে, আপনারা তো বসে বসে মুগ্ধ হয়ে শুনছেন, কিন্তু কোন্ সময়ে ওর প্রথম রচনা হয় তার কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ সংগ্রহ করতে পেরেছেন কি? কী বললেন? স্বর্গে আপনাদের ইতিহাস নেই? আপনাদের সমস্তই নিত্য? সুখের বিষয়। সুরবালকদের তারিখ মুখস্থ করতে হয় না! কিন্তু, বিদ্যাচর্চা ওতে করে কি অনেকটা অসম্পূর্ণ থাকে না? ইতিহাসশিক্ষার উপযোগিতা চার প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে।— প্রথম, ক—

মনোযোগ দিচ্ছেন কি?— (স্বগত) গান শুনতেই মত্ত, তার আর মন দেবে কী করে? পৃথিবী ছেড়ে অবধি এঁদের কাউকে যদি একটা কথা শোনাতে পেরে থাকি! শুনছে কি না শুনছে মুখ দেখে কিছু বোঝবার জো নেই: একটা কথা বললে কেউ তার প্রতিবাদও করে না, এবং কারও কথার কোনো প্রতিবাদ করলে তার একটা জবাব পাওয়াই যায় না। শুনেছি এইখানেই আমাকে সাড়ে পাঁচ কোটি সাড়ে পনেরো লক্ষ বৎসর কাটাতে হবে। তা হলেই তো গেছি। আত্মহত্যা করে যে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে সে সুবিধাও নেই। এখানকার সাপ্তাহিক মৃত্যুতালিকা অন্বেষণ করতে গিয়ে শুনলুম,

এখানে মৃত্যু নেই। অশ্বিনীকুমার-নামক দুই বৈদ্য যে পদটি পেয়েছেন ওঁদের যদি বাঁধা খোরাক বরাদ্দ না থাকত তা হলে সমস্ত স্বর্গ ঝেঁটিয়ে এক পয়সা ভিজিট জুটত না। তবে কী করতে যে ওঁরা এখানে আছেন তা আমাদের মানুষের বুদ্ধিতে বুঝতে পারি নে। কাউকে তো খরচের হিসাব দিতে হয় না, যার যা খুশি তাই হচ্ছে। থাকত একটা ম্যুনিসিপ্যালিটি, এবং নিয়মমত কাজ হত, তা হলে আমি তো সর্বাগ্রে ঐ দুটি হেল্‌থ-অফিসারের পদ উঠিয়ে দেবার জন্যে লড়তুম। এই-যে রোজ সভার মধ্যে অমৃত ছড়াছড়ি যাচ্ছে, তার একটা হিসেব কোথাও আছে ? সেদিন তো শচীঠাকরুনকে স্পষ্টই মুখের উপর জিজ্ঞাসা করলুম; স্বর্গের সমস্ত ভাঁড়ার তো আপনার জিম্মায় আছে ; পাকা খাতায় হোক, খসড়ায় হোক, তার কোনো-একটা হিসেব রাখেন কি— হাতচিঠা কি রসিদ, কি কোনো রকমের একটা নিদর্শন রাখা হয় ? শচীঠাকরুন বোধ করি মনে মনে রাগ করলেন ; স্বর্গ সৃষ্টি হয়ে অবধি এরকম প্রশ্ন তাঁকে কেউ জিজ্ঞাসা করে নি। যা পাব্লিকের জিনিস তার একটা রীতিমত জবাবদিহি থাকা চাই, সে বোধটা এঁদের কারও দেখতে পাই নে। অজস্র আছে বলেই কি অজস্র খরচ করতে হবে ! যদি আমাকে বেশিদিন এখানে থাকতেই হয় তা হলে স্বর্গের সমস্ত বন্দোবস্ত আগাগোড়া রিফর্ম্‌ না করে আমি নড়ছি নে। আমি দেখছি, গোড়ায় দরকার অ্যাজিটেশন— ঐ জিনিসটা স্বর্গে একেবারেই নেই ; সব দেবতাই বেশ সন্তুষ্ট হয়ে বসে আছেন। এঁদের এই তেত্রিশ কোটিকে একবার রীতিমত বিচলিত করে তুলতে পারলে কিছু কাজ হয়। এখানকার লোকসংখ্যা দেখেই আমার মনে হয়েছিল এখানে একটি বড়ো রকমের দৈনিক কিংবা সাপ্তাহিক খবরের কাগজ বেশ চালানো যেতে পারে। আমি যদি সম্পাদক হই, তা হলে আর দুটি উপযুক্ত সাব-এডিটর পেলেই কাজ আরম্ভ করে দিতে পারি। প্রথমত নারদকে দিয়ে খুব এক চোট বিজ্ঞাপন বিলি করতে হয়। তার পরে বিষ্ণুলোক ব্রহ্মলোক চন্দ্রলোক সূর্যলোকে গুটিকতক নিয়মিত সংবাদদাতা নিযুক্ত করতে হয়। আহা, এই কাজটি যদি আমি করে যেতে পারি তা হলে স্বর্গের এ চেহারা আর থাকে না। যাঁরা-সব দেবতাদের ঘুষ দিয়ে দিয়ে স্বর্গে আসেন, প্রতি সংখ্যায় তাঁদের যদি একটি করে সংক্ষেপ-মর্তজীবনী বের করতে পারি তা হলে আমাদের স্বর্গীয় মহাত্মাদের মধ্যে একটা সেন্‌সেশন পড়ে যায়। একবার ইন্দ্রের কাছে আমার প্রস্তাবগুলো পেড়ে দেখতে হবে।

(ইন্দ্রের নিকট গিয়া) দেখুন মহেন্দ্র, আপনার সঙ্গে আমার গোপনে কিছু (অপ্সরাগণকে দেখিয়া) ও ! আমি জানতুম না এঁরা সব এখানে আছেন— মাপ করবেন— আমি যাচ্ছি। এ কী, শচীঠাকরুনও যে বসে আছেন ! আর, ঐ বুড়ো বুড়ো রাজর্ষি-দেবর্ষিগুলোই বা এখানে বসে কী দেখছে ! দেখুন মহেন্দ্র, স্বর্গে স্বায়ত্তশাসন-প্রথা প্রচলিত করেন নি বলে এখানকার কাজকর্ম তেমন ভালো রকম করে চলছে না। আপনি যদি কিছুকাল এই-সমস্ত নাচ-বাজনা বন্ধ করে দিয়ে আমার সঙ্গে আসেন তা হলে আমি আপনাকে হাতে হাতে দেখিয়ে দিতে পারি এখানকার কোনো কাজেরই বিলিব্যবস্থা নেই। কার ইচ্ছায় কী করে যে কী হচ্ছে কিছুই দন্তস্ফুট করবার জো নেই। কাজ এমনতরো পরিষ্কার ভাবে হওয়া উচিত যে, যন্ত্রের মতো চলবে এবং চোখ বুলিয়ে দেখবামাত্রই বোঝা যাবে। আমি সমস্ত নিয়ম নম্বরওয়ারি করে লিখে নিয়ে এসেছি ; আপনার সহস্র চক্ষুর মধ্যে একজোড়া চোখও যদি এ দিকে ফেরান তা হলে— আচ্ছা, তবে এখন থাক্‌, আপনাদের গান-বাজনাগুলো নাহয় হয়ে যাক, তার পরে দেখা যাবে।

(ভরত ঋষির প্রতি) আচ্ছা, অধিকারীমশায়, শুনেছি গান-বাজনায় আপনি ওস্তাদ, একটি প্রশ্ন আপনার কাছে আছে। গানের সম্বন্ধে যে ক'টি প্রধান অঙ্গ আছে, অর্থাৎ সপ্ত সুর, তিন গ্রাম, একুশ মূর্ছনা— কী বললেন ? আপনারা এ-সমস্ত মানেন না ? আপনারা কেবল আনন্দটুকু জানেন ! তাই তো দেখছি— এবং যত দেখছি তত অবাক হয়ে যাচ্ছি। (কিয়ৎক্ষণ শুনিয়া) ভরতঠাকুর, ঐ-যে ভদ্রমহিলাটি— কী ওঁর নাম— রম্ভা ? উপাধি কী বলুন। উপাধি বুঝছেন না ? এই যেমন রম্ভা চাটুজ্জে কি রম্ভা ভট্টাচার্য, কিংবা ক্ষত্রিয় যদি হন তো রম্ভা সিংহ— এখানে আপনাদের ও-সব কিছু নেই বুঝি ? আচ্ছা, বেশ কথা, তা, শ্রীমতী রম্ভা যে গানটি গাইলেন আপনারা তো তার যথেষ্ট প্রশংসা

করলেন ; কিন্তু ওর রাগিণীটি আমাকে অনুগ্রহ করে বলে দেবেন ? একবার তো দেখছি ধৈবত লাগছে, আবার দেখি কোমল ধৈবতও লাগে, আবার গোড়ার দিকে— ওঃ, বুঝেছি, আপনাদের কেবল ভালোই লাগে, কিন্তু ভালো লাগবার কোনো নিয়ম নেই। আমাদের ঠিক তার উলটো, ভালো না লাগতে পারে, কিন্তু নিয়মটা থাকবেই। আপনাদের স্বর্গে যেটি আবশ্যক সেটি নেই, যেটা না হলে চলে তার অনেক বাহুল্য। সমস্ত সপ্তস্বর্গ খুঁজে কায়ক্লেশে যদি আধখানা নিয়ম পাওয়া যায় তো তখনি তার হাজারখানা ব্যতিক্রম বেরিয়ে পড়ে। সকল বিষয়েই তাই দেখছি। ঐ দেখুন-না ষড়ানন বসে আছেন, ওঁর ছটার মধ্যে পাঁচটা মুণ্ডুর কোনোই অর্থ পাবার জো নেই। শরীরতত্ত্বের ক-খণ্ড যে জানে সেও বলে দিতে পারে একটা স্কন্ধের উপরে ছটা মুণ্ড নিতান্তই বাহুল্য। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ ! ওঁর ছয় মাতার স্তন পান করতে ওঁকে ছটা মুণ্ড ধারণ করতে হয়েছিল ? ওটা হল মাইথলজি, আমি ফিজিয়লজির কথা বলছিলুম। ছটা যেন মুণ্ডই ধারণ করলেন, পাকযন্ত্র তো একটার বেশি ছিল না। এই দেখুন-না, আপনাদের স্বর্গের বন্দোবস্তটা— আপনারা শরীর থেকে ছায়াটাকে বাদ দিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু সেটা আপনাদের কী অপরাধ করেছিল ? আপনারা স্বর্গের লোক, বললে হয়তো বিশ্বাস করেন না, আমি জন্মকাল থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত ঐ ছায়াটাকে কখনো পশ্চাতে, কখনো সম্মুখে, কখনো দক্ষিণে, কখনো বামে সঙ্গে করে নিয়ে কাটিয়েছি, ওটাকে পুষতে একদিনের জন্যে সিকিপয়সা খরচ করতে হয় নি এবং অত্যন্ত শ্রান্তির সময়ও বহন করতে এক তিল ভার বোধ করি নি— ওটাকে আপনারা ছেঁটে দিলেন, কিন্তু ছটা মুণ্ড, চারটে হাত, হাজারটা চোখ, এতে খরচও আছে, ভারও আছে, অথচ সেটা সম্বন্ধে একটু ইকনমি করবার দিকে নজর নেই ! ছায়ার বেলাই টানাটানি, কিন্তু কায়ার বেলা মুক্তহস্ত ! সাধুবাদ দিচ্ছেন ? দেবতাদের মধ্যে আপনিই তা হলে আমার কথাটা বুঝেছেন ! সাধুবাদ আমাকে দিচ্ছেন না ? শ্রীমতী রম্ভাকে দিচ্ছেন ? ওঃ ! তা হলে আপনি বসুন, আমি কার্তিকের সঙ্গে আলাপ করে আসি।

(কার্তিকের পার্শ্বে বসিয়া) গুহ, আপনি ভালো আছেন তো ? আপনাদের এখানকার মিলিটারি ডিপার্ট্‌মেন্ট সম্বন্ধে আমার দুটো-একটা খবর নেবার আছে। আপনারা কিরকম নিয়মে— আচ্ছা, তা হলে এখন থাক্‌। আগে আপনাদের অভিনয়টা হয়ে যাক। কেবল একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, এই-যে নাটকটি অভিনয় হচ্ছে এর নাম তো শুনছি 'চিত্রলেখার বিরহ' ; এর উদ্দেশ্যটা কী আমাকে বুঝিয়ে দিতে হবে। উদ্দেশ্য দু রকমের হতে পারে, এক জ্ঞানশিক্ষা, আর-এক নীতিশিক্ষা। কবি, হয় এই গ্রন্থের মধ্যে কোনো-একটা জাগতিক নিয়ম আমাদের সহজে বুঝিয়ে দিয়েছেন, নয় স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, ভালো করলে ভালো হয়, মন্দ করলে মন্দই হয়ে থাকে। ভেবে দেখুন বিবর্তনবাদের নিয়ম-অনুসারে পরমাণুপুঞ্জ কিরকম করে ক্রমে ক্রমে বিচিত্র জগতে পরিণত হল, কিংবা আমাদের ইচ্ছাশক্তি যে অংশে পূর্ববর্তী কর্মের ফল সেই অংশে বদ্ধ এবং যে অংশে পরবর্তী কর্মকে জন্ম দেয় সেই অংশে মুক্ত এই চিরস্থায়ী বিরোধের সামঞ্জস্য কোন্‌খানে— কাব্যে যখন সেই তত্ত্ব পরিস্ফুট হয় তখন কাব্যের উদ্দেশ্যটি হাতে হাতে পাওয়া যায়। চিত্রলেখার বিরহের মধ্যে এর কোন্‌টি আছে ? আপনি তো বিগলিতপ্রায় হয়ে এসেছেন ; যেরকম দেখছি দেবলোকে যদি ফিজিয়লজির নিয়ম বলে একটা কিছু থাকত তা হলে এখনই আপনার দ্বাদশ চক্ষু থেকে অশ্রুধারা প্রবাহিত হত। যাই হোক কার্তিক, এ বড়ো দুঃখের বিষয়, স্বর্গে আপনাদের রাশি রাশি কাব্য-নাটকের ছড়াছড়ি যাচ্ছে, কিন্তু যাতে গবেষণা কিংবা চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায় স্বর্গীয় গ্রন্থকারদের হাত থেকে এমন একটা কিছুই বেরোচ্ছে না। (ঈষৎ হাস্যসহকারে) দেখছি 'চিত্রলেখার বিরহ' নাটকখানা আপনার বড়োই ভালো লেগে গেছে, তা হলে অন্য প্রসঙ্গ থাক্‌, আপনি ঐটেই দেখুন।

(ইন্দ্রের নিকট গিয়া) দেখুন দেবরাজ, স্বর্গে পরস্পরের মতামত আলোচনার একটা স্থান না থাকাতে বড়োই অভাব বোধ করা যায়। আমার ইচ্ছা নন্দনকাননের পারিজাতকুঞ্জের মধ্যে যেখানে আপনাদের নৃত্যশালা আছে, সেইখানে একটা সভা স্থাপন করি, তার নাম দিই 'শতক্রতু ডিবেটিং ক্লাব'। তাতে আপনারও একটা নাম থাক্‌বে আর স্বর্গেরও অনেক উপকার হবে। না, থাক্‌, মাপ করবেন— আমার অভ্যাস নেই— আমি অমৃত খাই নে— রাগ যদি না করেন তো বলি, ও অভ্যাসটা

আপনাদের ত্যাগ করা উচিত। আমি দেখেছি, দেবতাদের মধ্যে পানদোষটা কিছু প্রবল হয়েছে : অবশ্য, ওটাকে আপনারা সুরা বলেন না, কিন্তু বললে কিছু অত্যুক্তি হয় না। পৃথিবীতেও দেখতুম অনেকে মদকে ওআইন বলে কিছু সন্তোষলাভ করতেন। সুরেন্দ্র, আপনি শ্রীমতী মেনকাকে এইমাত্র যে সম্বোধনটা করলেন ওটা কি ভালো শুনতে হল ? সংস্কৃত কাব্যে নাটকে দেখেছি বটে ঐ-সকল সম্বোধন প্রচলিত ছিল, কিন্তু আপনি যদি বিশ্বস্তসূত্রে খবর নেন তো জানতে পারবেন, ওগুলো এখন নিন্দনীয় বলে গণ্য হয়েছে। আমরা কিরকম সম্বোধন করি জানতে চাচ্ছেন ? আমরা কখনো মাতৃসম্বোধনও করে থাকি, কখনো-বা বাছাও বলি, আবার সময়বিশেষে ভালোমানুষের মেয়ে বলেও সম্ভাষণ করা যেতে পারে। এর মধ্যে কোনোটিই আপনি এই-সকল মহিলাদের প্রতি প্রয়োগ করতে ইচ্ছা করেন না ? তা না করুন, এটা স্বীকার করতেই হবে আপনারা ওঁদের সম্বন্ধে যে বিশেষণগুলি উচ্চারণ করে থাকেন, তাতে রুচির পরিচয় পাওয়া যায় না। কী বললেন ? স্বর্গে সুরুচিও নেই, কুরুচিও নেই ? প্রথমটি যে নেই সে বিষয়ে সন্দেহ করি নে ; দ্বিতীয়টি যে আছে তা এখনই প্রমাণ করে দিতে পারি, কিন্তু আপনারা তো আমার কোনো আলোচনাতেই কর্ণপাত করেন না।

(শচীর নিকট গিয়া) দেখুন শচী, আপনার কি মনে হয় না, স্বর্গসমাজের ভিতরে যে-সমস্ত দোষ প্রবেশ করেছে সেগুলো দূর করবার জন্যে আমাদের বদ্ধপরিকর হওয়া উচিত ? আপনারা স্বর্গাঙ্গনারাও যদি এ-সকল বিষয়ে শৈথিল্য প্রকাশ করতে থাকেন তা হলে আপনাদের স্বামীদের চরিত্রের অবস্থা ক্রমশই শোচনীয় হতে থাকবে। ওঁদের সম্বন্ধে যে-সকল অপযশের কথা প্রচলিত আছে সে আপনাদের অবিদিত নেই ; মধ্যে মধ্যে যদি সভা আহ্বান করে এ-সকল বিষয়ে আলোচনা হয়, আপনারা যদি সাহায্য করেন, তা হলে— কোথায় যান ? গৃহকর্ম আছে বুঝি ? (শচীকে উঠিতে দেখিয়া সকল দেবতার উত্থান এবং অকালে সভাভঙ্গ)। মহা মুশকিলে পড়া গেল ! কাউকে একটা কথা বললে কেউ শোনেও না, বুঝতেও পারে না। (ইন্দ্রের নিকট গিয়া কাতর স্বরে) ভগবন্ সহস্রলোচন শতক্রতো, আমার সাড়ে পাঁচ কোটি সাড়ে পনেরো লক্ষ বৎসরের মধ্যে আর কত দিন বাকি আছে ?

ইন্দ্র। (কাতর স্বরে) সাড়ে পাঁচ কোটি পনেরো লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার নয় শো নিরেনব্বই বৎসর।

গোকুলনাথ এবং তেত্রিশ কোটি দেবতার একসঙ্গে সুগভীর দীর্ঘনিশ্বাস-পতন।

ভাদ্র ১৩০১

স্বর্গীয় প্রহসন

ইন্দ্রসভা

বৃহস্পতি। হে সৌম্য, তেত্রিশ কোটি দেবতাতেও কি ইন্দ্রলোক পূর্ণ হয় নাই ? আরো কি নূতন দেবতা আমন্ত্রণের আবশ্যক আছে ? হে প্রিয়দর্শন, স্মরণ রাখিয়ো, জন্মমৃত্যুর দ্বারা মর্তলোকে লোকসংখ্যা নিয়মশাসনে থাকে, কিন্তু স্বর্গলোকে মৃত্যুর অভাবে দেবসংখ্যা হ্রাস করিবার কোনো উপায় নাই ; অতএব সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার পূর্বে সবিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখা কর্তব্য।

ইন্দ্র। হে সুরগুরো, স্বর্গের পথ দুর্গম করিবার জন্য স্বর্গাধিপতির চেষ্টার ত্রুটি নাই এ কথা সর্বজনবিদিত।

বৃহস্পতি। পাকশাসন নাকপতে, তবে কেন অধুনা দেবলোকে মনসা শীতলা ঘেঁটু -নামধারী অজ্ঞাতকুলশীল নব নব দেবতার অভিষেক হইতেছে ?

ইন্দ্র। দ্বিজোত্তম, আমরা দেবতাগণ ত্রিভুবনের কর্তৃত্বভার প্রাপ্ত হইয়াছি বটে, কিন্তু সে কেবল

ত্রিভুবনের সম্মতিক্রমে। এ কথা গুরুদেবের অগোচর নাই যে, মর্তলোকেই দেবতাদের নির্বাচন হইয়া থাকে। এক কালে আর্যাবর্তের সমস্ত ব্রাহ্মণ হোতাগণ আমাকেই স্বর্গের প্রধানপদ দিয়াছিলেন এবং তৎকালে সরস্বতী-দৃশদ্বতীতীরের প্রত্যেক যজ্ঞহুতাশনে আমার উদ্দেশে অহরহ যে হবি সমর্পিত হইত তাহার হোমধূমে আমার সহস্রলোচন হইতে নিরন্তর অশ্রু প্রবাহিত হইত। অদ্য নরলোকে হবিঘৃত কেবলমাত্র জঠরযজ্ঞে ক্ষুধাসুরের উদ্দেশেই উপহৃত হইয়া থাকে এবং শুনিতে পাই সে ঘৃতও বিশুদ্ধ নহে।

বৃহস্পতি। বৃত্রনিসূদন, সেই অপবিত্র বিমিশ্র ঘৃত-পানে, শুনিতে পাই, ক্ষুধাসুর মৃতপ্রায় হইয়া আসিয়াছে। হে শক্র, দেবতাদের প্রতি দেবদেবের বিশেষ কৃপা আছে, সেইজন্যই নরলোকে হোমাগ্নি নির্বাপিত হইয়াছে, নতুবা নব্য গব্য পরিপাক করিতে হইলে, ভো পাকশাসন, দেবজঠরের সমস্ত অমৃতরস সুতীব্র অম্লরসে পরিণত হইত, অগ্নিদেবের মন্দাগ্নি এবং বায়ুদেবের বায়ুপরিবর্তন আবশ্যক হইত, এবং সমস্ত দেবতার অমরবক্ষে অসহ্য শূলবেদনা অমর হইয়া বাস করিত।

ইন্দ্র। হে জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ, উক্ত ঘৃতের গুণাগুণ আমার অবিদিত নাই, যেহেতু যমরাজের নিকট সর্বদাই তাহার বিবরণ শুনিতে পাই। অতএব হব্যপদার্থে আমার কিছুমাত্র লোভ নাই, এবং হোমাগ্নির তিরোধান সম্বন্ধেও আমি আক্ষেপ করিতেছি না। আমার বক্তব্য এই যে, যেমন পুষ্প হইতে সৌরভ উত্থিত হয় তেমনি মর্তের ভক্তি হইতেই স্বর্গ ঊর্ধ্বলোকে উদ্‌বাহিত হইতে থাকে, সেই ভক্তিপুষ্প যদি শুষ্ক হইয়া যায় তবে, হে দ্বিজসত্তম, তেত্রিশ কোটি দেবতাও আমার এই পারিজাতমোদিত নন্দনবনবেষ্টিত স্বর্গলোক রক্ষা করিতে পারিবে না। সেই কারণে, মর্তের সহিত যোগপ্রবাহ রক্ষা করিবার জন্য মাঝে মাঝে নরলোকের নবনির্বাচিত দেবতাগুলিকে সাদরে স্বর্গে আবাহন করিয়া আনিতে হয়। হে ত্রিকালজ্ঞ, স্বর্গের ইতিহাসে এমন ঘটনা ইতিপূর্বেও ঘটিয়াছে।

বৃহস্পতি। মেঘবাহন, সে-সমস্ত ইতিহাস আমার অগোচর নাই। কিন্তু ইতিপূর্বে যে-সকল নূতন দেবতা মর্ত হইতে স্বর্গলোকে উন্নীত হইয়াছিলেন তাঁহারা অভিজাত দেবগণের সহিত একাসনে বসিবার উপযুক্ত। সম্প্রতি ঘেঁটুপ্রমুখ যে-সমস্ত দেবতাগণ তোমার নিমন্ত্রণে স্বর্গে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছেন তাঁহারা সুরসভার দিব্যজ্যোতি ম্লান করিয়া দিয়াছেন। অদিতিনন্দন, আমার প্রস্তাব এই যে, তাঁহাদের জন্য একটি উপদেবলোক সৃজন করিবার জন্য বিশ্বকর্মার প্রতি বিশেষ ভারার্পণ করা হয়।

ইন্দ্র। বুধপ্রবর, তাহা হইলে সেই উপস্বর্গই স্বর্গ হইয়া দাঁড়াইবে এবং স্বর্গ উপসর্গ হইবে মাত্র। একমাত্র বেদমন্ত্রের উপর আমাদের স্বর্গ প্রতিষ্ঠিত। জর্মনদেশীয় পণ্ডিতগণের বহুল চেষ্টা সত্ত্বেও সে মন্ত্র এবং তাহার অর্থ সকলে বিস্মৃত হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু আমাদের নূতন আমন্ত্রিত দেবদেবীগণ, সায়নাচার্যের ভাষ্য, পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদের পুরাতত্ত্ব অথবা তাঁহাদের প্রাচ্যশিষ্যবর্গের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করিতেছেন না, তাঁহারা প্রতিদিনের সদ্য-আহরিত পূজা প্রাপ্ত হইয়া উপবাসী পুরাতন দেবতাদের অপেক্ষা অনেকগুণে প্রবল হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহাদিগকে স্বপক্ষে পাইলে আমরা নূতন বল লাভ করিতে পারিব। অতএব, গুরুদেব, প্রসন্নচিত্তে তাঁহাদের কণ্ঠে দেবমাল্য অর্পণ করিয়া তাঁহাদিগকে স্বর্গলোকে বরণ করিয়া লউন।

বৃহস্পতি। অহো দুর্বৃত্তা নিয়তি! মর্তলোকের প্রসাদলাভলালসায় কত পুরাতন দেবকুলপ্রদীপ ক্রমশ আপন দেবমর্যাদা বিসর্জন দিয়াছেন। দেবসেনাপতি কার্তিকেয় বীরবেশ পরিত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মবসন লম্বকচ্ছে কামিনীমনোমোহন নির্লজ্জ নাগরমূর্তি ধারণ করিয়াছেন! গম্ভীরপ্রকৃতি গণপতি কদলীতরুর সহিত গোপন-পরিণয়পাশে বদ্ধ হইয়াছেন এবং মহাযোগী মহেশ্বর গঞ্জিকা-ধুস্তুর-সিদ্ধি-পানে উন্মত্ত হইয়া মহাদেবীর সহিত অশ্রাব্য ভাষায় কলহ করিয়া নীচজাতীয় স্ত্রীপল্লীর মধ্যে আপন বিহারক্ষেত্র বিস্তার করিয়াছেন। সে-সমস্তই যখন একে একে সহ্য করিতে পারিয়াছি তখন বোধ করি দেবাসনে উপদবেতাগণের অধিরোহণদৃশ্যও এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ধৈর্যকঠিন বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিতে পারিবে না।

চন্দ্রের প্রবেশ

ইন্দ্র। ভগবন্ উডুপতে, স্বর্গলোকে তো কৃষ্ণপক্ষের প্রভাব নাই, তবে অদ্য কেন তোমার সৌম্যসুন্দর প্রফুল্ল মুখচ্ছবি অন্ধকার দেখিতেছি ?

চন্দ্র। দেব সহস্রলোচন, স্বর্গে কৃষ্ণপক্ষ থাকিলে অমাবস্যার ছায়ায় আমি আনন্দে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিতাম। দেবরাজ, দেবী শীতলার প্রসন্ন দৃষ্টি হইতে আমাকে নিষ্কৃতি দান করো। তিনি স্বর্গে পদার্পণ করিয়া অবধি আমার প্রতি যে বিশেষ পক্ষপাত প্রকাশ করিতেছেন, আমি একাকী তাহার যোগ্য নহি। তাঁহার সেই প্রচুর অনুগ্রহ দেবসাধারণের মধ্যে সমভাগে বিভক্ত হইলে কাহারও প্রতি অন্যায় হয় না।

ইন্দ্র। সুধাংশুমালিন্, সুহৃদ্গণের সহিত ভাগ করিয়া ভোগ করিলে অধিকাংশ আনন্দই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে সন্দেহ নাই, কিন্তু রমণীর অনুগ্রহ সে জাতীয় নহে।

চন্দ্র। ভগবন্, তবে সে আনন্দ তুমিই সম্পূর্ণ গ্রহণ করো। তুমি সুরশ্রেষ্ঠ, এ সুখাবেগ তুমি ব্যতীত আর-কেহ একাকী সংবরণ করিতে পারিবে না।

ইন্দ্র। প্রিয়সখে। অন্যের নিকট যাহা পাওয়া যায় তাহা বন্ধুকে দান করা কঠিন নহে, কিন্তু প্রেম সেরূপ সামগ্রী নহে। তুমি যাহা পাইয়াছ তাহা তুমি অনাদরে ফেলিয়া দিতে পার, কিন্তু প্রিয়তম বন্ধুর অত্যাবশ্যক পূরণ করিবার জন্যও তাহা দান করিতে পার না।

চন্দ্র। যদি ফেলিয়া দিতে পারিতাম, তবে বিপন্নভাবে তোমার দ্বারস্থ হইতাম না। সুরপতে, অনেক সৌভাগ্য আছে যাহা দূরে নিক্ষেপ করিলেও নিকটে সংলগ্ন হইয়া থাকে।

ইন্দ্র। শশলাঞ্ছন, তুমি কি অপযশের ভয় করিতেছ ?

চন্দ্র। সখে, সত্য বলিতেছি, কলঙ্কের ভয় আমার নাই।

ইন্দ্র। কলানাথ, তবে কি তুমি তোমার অন্তঃপুরলক্ষ্মী প্রিয়তমার অসূয়া আশঙ্কা করিতেছ ?

চন্দ্র। বন্ধো, তোমার অবিদিত নাই, সপ্তবিংশতি নক্ষত্রনারী লইয়া আমার অন্তঃপুর। তাহারা প্রত্যেকেই সমস্ত রাত্রি অনিমেষ নেত্রে জাগ্রত থাকিয়া আমার গতিবিধি নিরীক্ষণ করিয়া থাকে, তথাপি এ পর্যন্ত নক্ষত্রলোকে কোনোরূপ অশান্তির কারণ ঘটে নাই। সপ্তবিংশতির উপর আর-একটি যোগ করিতে আমি ভীত নহি।

ইন্দ্র। সখে, ধন্য তোমার সাহস! তবে তোমার ভয় কিসের ?

শশব্যস্ত হইয়া দেবদূতের প্রবেশ

দূত। জয়োস্তু! দেবরাজ, বাণী বীণাপাণি স্বর্গপরিত্যাগের কল্পনা করিতেছেন।

ইন্দ্র। (সসম্ভ্রমে) কেন ? দেবগণ তাঁহার নিকট কী কারণে অপরাধী হইয়াছে ?

দূত। মনসা শীতলা মঙ্গলচণ্ডী -নাম্নী দেবীগণ সরস্বতীর কমলবনে চিঙ্গটি-নামক কর্দমচর ক্ষুদ্র মৎস্যের সন্ধানে গিয়াছিলেন। কৃতকার্য না হইয়া কমলকলিকায় অঞ্চল পূর্ণ করিয়া তিন্তিড়িসংযোগে কটুতৈলে অন্নব্যঞ্জন-রন্ধন-পূর্বক তীরে বসিয়া প্রচুর পরিমাণে আহার করিয়াছেন, এবং পিত্তলস্থালী সরোবরের জলে মার্জনপূর্বক স্ব স্ব স্থানে ফিরিয়া আসিয়াছেন। এ পর্যন্ত মানসসরোবরের পদ্মকলিকা দেব দানব কেহই ভক্ষ্যরূপে ব্যবহার করে নাই।

দেবগণের পরস্পর মুখাবলোকন

ঘেঁটু মনসা প্রভৃতি দেবদেবীগণের প্রবেশ

ইন্দ্র। (আসন ছাড়িয়া উঠিয়া) দেবগণ, দেবীগণ, স্বাগত! আপনাদের কুশল ? স্বর্গলোকে আপনাদের কোনোরূপ অভাব নাই ? অনুচরগণ সমাহিত হইয়া সর্বদা আপনাদের আদেশ-পালনের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকে ? সিদ্ধগন্ধর্বগণ নৃত্যশালায় নৃত্যগীতাদির দ্বারা আপনাদের মনোরঞ্জন

করে ? কামধেনুর দুগ্ধ এবং অমৃতরস যথাকালে আপনাদের সম্মুখে আহরিত হইয়া থাকে ? নন্দনবনের সুগন্ধ সমীরণ আপনাদের ইচ্ছানুগামী হইয়া বাতায়নপথে প্রবাহিত হইতে থাকে ? আপনাদের লতানিকুঞ্জে পারিজাত সর্বদাই প্রস্ফুটিত থাকিয়া শোভাদান করে ?

দেবীগণের উচ্চহাস্য

মনসা। (ঘেঁটুর প্রতি) মিন্‌সে কী বকছে ভাই ?

ঘেঁটু। পুরুতঠাকুরের মতো মন্তর পড়ে যাচ্ছে। (ইন্দ্রের প্রতি) ওহে, তুমি বুঝি কর্তা ? তোমার মন্তর পড়া হয়ে থাকে তো গোটাকতক কথা বলি।

ইন্দ্র। হে ঘেঁটো ! আপনকার—

ঘেঁটু। ঘেঁটো কী ! আমি কি তোমার বাগানের মালী ? বাপের জন্মে এমন অভদ্দর মানুষ তো দেখি নি গা ! ঘেঁটো ! আমি যদি তোমাকে ইন্দির না বলে ইন্দিরে বলি ?

মনসা। তা হলেই চিত্তিরে হয় !

দেবীগণের উচ্চহাস্য

ইন্দ্র। (হাস্যে যোগদান করিবার চেষ্টা করিয়া) কুন্দাভদন্তি, বহু তপস্যা-দ্বারা স্বর্গলোক লাভ করিয়াছিলাম, কিন্তু কোন্ সুকৃতিফলে আপনার সকলের স্মিতদশনময়ূখে স্বর্গলোক অকস্মাৎ অতিমাত্র আলোকিত হইয়া উঠিল এখনো তাহা ধারণা করিতে পারিলাম না।

ঘেঁটু। আরে, রাখো, ও-সব বাজে কথা রাখো। তোমার পেয়াদাগুলো আমাকে সোনার ভাঁড়ে করে কী-সব এনে দেয় সে আমি ছুঁতে পারি নে। তোমার শচীগিন্নিকে বলে দিয়ো আমার জন্যে রোজ এক-থাল গোবরের লাড়ু তৈরি করে পাঠিয়ে দেন।

ইন্দ্র। তথাস্তু। স্বর্গে আমাদের কল্পধেনু আছেন। তিনি সকলের সকল কামনাই পূরণ করিয়া থাকেন। বোধ করি, আপনার প্রার্থনা পূর্ণ করা তাঁহার পক্ষে দুঃসাধ্য না হইতে পারে।

শীতলা। (চন্দ্রকে এক কোণে গুপ্তপ্রায় দেখিয়া নিকটে গিয়া) মাইরি ! তুমি এত ছলও জান ভাই। আমাকে আচ্ছা ভোগ ভুগিয়েছ যা হোক। আমি বলি, তুমি বুঝি অন্দরমহলে আছ। ঢুকে দেখি, অশ্লেষা আর মঘা নবাবপুত্রীর মতো বসে আছেন, আমাকে দেখে অবাক হয়ে রইলেন। আমার সহ্য হল না। আমি বললুম, বলি ও বড়োমানুষের ঝি, তোমাদের গতর খাটিয়ে খেতে হয় না বলে বুঝি দেমাকে মাটিতে পা পড়ে না ! যা বলতে হয় তা বলেছি। ধুন্ধুমার বাধিয়ে দিয়ে এসেছি।

চন্দ্র। (জনান্তিকে ইন্দ্রের প্রতি) সপ্তবিংশতির উপর অষ্টবিংশতিতম যোগ হইলে কিরূপ দুর্যোগ উপস্থিত হইতে পারে তাহা, হে শচীপতে, সহজেই অনুভব করিতে পারিবেন। (শীতলার প্রতি) অয়ি অনবদ্যে—

শীতলা। (হাসিয়া অস্থির হইয়া) মা গো মা, তুমি এত হাসাতেও পার ! আদর করে বেশ নামটি দিয়েছ যা হোক। আনো বদ্যি ! কিন্তু বদ্যিতে করবে কী ভাই ! কত বদ্যির সাত পুরুষকে আমি সাত ঘাটের জল খাইয়ে এসেছি— আমি কি তেমনি মেয়ে !

ঘেঁটু। (ইন্দ্রের গায়ের কাছে গিয়া তাঁহার পৃষ্ঠে হাত দিয়া) কী গো, ইন্দিরদা ? মুখে যে রা'টি নেই ! রেতের বেলা গিন্নির সঙ্গে বকাবকি চুলোচুলি হয়ে গেছে নাকি ?

ইন্দ্র। (সসংকোচে সরিয়া গিয়া দূরস্থ আসন-নির্দেশ-পূর্বক) দেব, আসন গ্রহণে অনুমতি হউক।

ঘেঁটু। এই-যে, এখানে ঢের জায়গা আছে। (ইন্দ্রের সহিত একাসনে উপবেশন) দাদা, আমার সঙ্গে তুমি নৌকোতা কোরো না। আজ থেকে তুমি আমার দাদা, আমি তোমার ছোটো ভাই ঘেঁটু।

বাহুদ্বারা ইন্দ্রের গলবেষ্টন এবং ইন্দ্রকর্তৃক অব্যক্ত কাতরধ্বনি উচ্চারণ

শীতলা। (চন্দ্রের প্রতি) তুমি যাও কোথায় ?

চন্দ্র। মনোজ্ঞে, অদ্য অন্তঃপুরে দেবীগণ ভর্তৃপ্রসাদনব্রতে তাঁহাদের এই সেবকাধমকে স্মরণ করিয়াছেন, অতএব যদি অনুমতি হয় তবে, হে হরিণশালীননয়নে—

শীতলা। কী বললে? শালী? তা ভাই, তাই সই। তোমার চাঁদমুখে সবই মিষ্টি লাগে। তা, শালী যদি বললে তবে কানমলাটিও খাও।

চন্দ্রের পার্শ্বে একাসনে বসিয়া চন্দ্রের কর্ণপীড়ন

ইন্দ্র। (চন্দ্রের প্রতি) ভগবন্ সিতকিরণমালিন্, তুমিই ধন্য। করুণস্পর্শে তরুণীকরকিসলয়ের অরুণরাগ এখনো তোমার কর্ণমূলে সংলগ্ন হইয়া আছে।

শীতলা। (মনসার প্রতি লক্ষ করিয়া স্বগত) মোলো মোলো! আমাদের মন্‌সে হিংসেয় ফেটে মোলো। আমি চাঁদের পাশে বসেছি, এ আর ওঁর গায়ে সইল না। ঘুর ঘুর করে বেড়াচ্ছে দেখো-না। এতগুলো পুরুষমানুষের সামনে লজ্জাও নেই! মাগী এবার পাড়ায় গিয়ে কত কানাঘুষোই করবে! উনিও বড়ো কসুর করেন নি। কার্তিক-ঠাকুরটিকে নিয়ে যেরকম নিলজ্জপনা করেছে আমি দেখে লজ্জায় মরে যাই আর-কি। কার্তিক কোথায় নুকোবে ভেবে পায় না। ঐ তো চেহারা, ঐ নিয়ে এত ভঙ্গিও করে! মাগো, মাগো, মাগো! (প্রকাশ্যে) আ মর্ মাগী! চাঁদের সামনে দিয়ে অমন বেহায়ার মতো আনাগোনা করছিস কেন? যেন সাপ খেলিয়ে বেড়াচ্ছে! কার্তিকের ওখানে ঠাঁই হল না নাকি?

সুরসভার মধ্যে মনসার ও শীতলার গ্রাম্য ভাষায় তুমুল কলহ

ইন্দ্র। (শশব্যস্ত হইয়া একবার মনসা ও একবার শীতলার প্রতি) ক্রোধ সংবরণ করো! ক্রোধ সংবরণ করো! অয়ি অসূয়াতাম্রলোচনে, অয়ি গলদ্‌বেণীবন্ধে, অয়ি বিগলিতদুকূলবসনে, অয়ি কোকিলজিতকূজিতে, তারতর সপ্তম স্বরকে পঞ্চম স্বরে নম্র করিয়া আনো। অয়ি কোপনে—

ঘেঁটু। (উত্তরীয় ধরিয়া ইন্দ্রকে আসনে বসাইয়া) তুমি এত ব্যস্ত হও কেন দাদা? ওদের এমন রোজ হয়ে থাকে। থাকত ওলাবিবি, তা হলে আরো জমত। তার কি খাবার গোল হয়েছে তাই সে শচীর সঙ্গে ঝগড়া করতে গেছে।

ইন্দ্র। (ব্যাকুলভাবে) হা সুরেন্দ্রবক্ষোবিহারিণী দেবী পৌলমী!

মনসার দ্রুতবেগে সভাত্যাগ এবং শীতলার পুনশ্চ চন্দ্রের পার্শ্বে উপবেশন

বীণাপাণির প্রবেশ

বীণাপাণি। দেবরাজ, কর্কশ কোলাহলে আমার দেববীণার স্বরস্খলন হইতেছে, আমার কমলবন শূন্যপ্রায়, আমি দেবলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম। [প্রস্থান

বৃহস্পতি। আমিও জননী বাণীর অনুগমন করি। [প্রস্থান

অশ্লেষা ও মঘার সভাপ্রবেশ

অশ্লেষা ও মঘা। (চন্দ্রের একাসনে শীতলাকে দেখিয়া) আজ অপরূপ অভিনব সপ্তদশ কলায় দেব শশধরকে সমধিকতর শোভমান দেখিতেছি!

চন্দ্র। দেবীগণ, এই হতভাগ্যকে অকরুণ পরিহাসে বিড়ম্বিত করিবেন না। পুরুষ রাহু আমাকে কেবল ক্ষণমাত্রকাল পরাভব করিতে পারে সেই আক্রোশে ঈর্ষান্বিত ভগবান একটি স্ত্রী রাহু সৃজন করিয়াছেন, ইহার পূর্ণগ্রাস হইতে আমি বহু চেষ্টায় আপনাকে মুক্ত করিতে পারিতেছি না।

অশ্লেষা। আর্যপুত্র, এই ভদ্রললনা অনতিপূর্বে তোমার অন্তঃপুরে প্রবেশপূর্বক তোমার শ্বশুরকুলকে ঊর্ধ্বতন চতুর্দশ পুরুষ পর্যন্ত অশ্রুতপূর্ব কুৎসা-দ্বারা লাঞ্ছিত করিয়া আসিয়াছেন। দেবীর সেই আশ্চর্য ব্যবহারকে আমরা অধিকারবহির্ভূত উপদ্রব জ্ঞান করিয়া বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিলাম। এক্ষণে স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি সৌভাগ্যবতী তোমারই হস্তে সেই অবমাননের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। এখন, আর্যপুত্রকে তাঁহার নবতর শ্বশুরকুলে বরণ করিয়া আমরা নক্ষত্রলোক হইতে বিচ্যুতিলাভের জন্য চলিলাম। (শীতলার প্রতি) ভদ্রে, কল্যাণী, তোমার সৌভাগ্য অক্ষয় হউক। [প্রস্থান

শচীর প্রবেশ

ইন্দ্র। (সসম্ভ্রমে আসন ত্যাগ করিয়া) আর্যে, শুভ আগমন হউক।

ঘেঁটু। (উত্তরীয় ধরিয়া ইন্দ্রকে সবলে আসনে উপবেশন করাইয়া) ইস্! ভারি খাতির যে! মাইরি দাদা, ঢের ঢের পুরুষমানুষ দেখেছি, কিন্তু তোর মতো এমন স্ত্রৈণ আমি দেখি নি।

ঘেঁটুকে ইন্দ্রের বামপার্শ্বে শচীর নির্দিষ্ট স্থানে বসিতে দেখিয়া দূরে এক কোণে শচীদেবী-কর্তৃক সামান্য এক আসন গ্রহণ

ঘেঁটু। (শচীর অনতিদূরে গমন করিয়া সহাস্যে) বউঠাকরুন, আমার দাদাকে কী মন্তর পড়ে দিয়েছ বলো দেখি! একেবারে শ্রীচরণের গোলাম করে রেখেছ! তুমি উঠলে ওঠে, তুমি বসলে বসে। বলি, একটা কথাই কও। (গান) 'কথা কইতে দোষ কি আছে বিধুমুখী!'

ইন্দ্র। দেব ঘেঁটো, কিঞ্চিৎ অবসর দিতে অনুমতি হউক। দেবীর নিকট কিছু নিবেদন আছে।

ঘেঁটু। ইস্! দেখো! দেখো! একটু কাছে এসে বসেছি, তোমার যে আর গায়ে সইল না! এতটা বাড়াবাড়ি কিছু নয়! কথায় বলে অতিভক্তি চোরের লক্ষণ।— কাজ নেই ভাই, আবার শাপ দেবে! তোমরা দুজনে বোসো, আমি যাই।

বলপূর্বক ইন্দ্রকে শচীর আসনে বসাইবার চেষ্টা

ইন্দ্র। (ঘেঁটুকে দূরে অপসারণ করিয়া) দেব, তুমি আত্মবিস্মৃত হইতেছ।

ওলাবিবির প্রবেশ

ওলাবিবি। (শচীর প্রতি) তাই বলি যায় কোথায়! অমনি বুঝি সোয়ামির কাছে নাগাতে এসেছ? তা, নাগাও-না। তোমার সোয়ামিকে আমি ডরাই নে।

শচী। (আসন হইতে উঠিয়া ইন্দ্রের প্রতি) দেবরাজ, আমি জয়ন্তকে সঙ্গে লইয়া বিষ্ণুলোকে কিছুকাল লক্ষ্মীদেবীর আলয়ে বাস করিবার সংকল্প করিয়াছি। বহুকাল দেবীদর্শন ঘটে নাই।

ইন্দ্র। আর্যে, আমিও দেবীর অনুসরণ করিতেছি। বহুকাল পূজার অনবসরক্রমে চক্রপাণির নিকটে অপরাধী হইয়া আছি।

[উভয়ের প্রস্থান

চন্দ্র। দেব সহস্রলোচন, বিষ্ণুলোকে আমারও বিশেষ আবশ্যক আছে— লক্ষ্মীদেবী— হায়, বিপৎকালে বান্ধবেরাও ত্যাগ করিয়া যায়।

শীতলা। অমন হাঁড়িপানা মুখ করে আছ কেন? অমন করে থাক তো ফের কানমলা খাবে।

চন্দ্র। স্ফুরৎকনকপ্রভে, বিষ্ণুলোকে আমার বিস্তর বিলম্ব হইবে না, যদি অনুমতি কর তো দাস—

শীতলা। ফের কানমলা খাবে।

কান মলিতে উদ্যত

মনসার পুনঃপ্রবেশ

শীতলার সহিত পুনরায় কলহারম্ভ। ঘেঁটু ওলা মঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতি সকলের তাহাতে যোগদান

চন্দ্র। আপনারা তবে ততক্ষণ মিষ্টালাপ করুন, দাস বিষ্ণুলোক-অভিমুখে প্রয়াণ করিতে ইচ্ছা করে।

[দ্রুতপদে প্রস্থান

আশ্বিন-কার্তিক ১৩০১

বশীকরণ

প্রথম অঙ্ক

আশু ও অন্নদা

আশু। আচ্ছা অন্নদা, তুমি যেন ব্রাহ্মই হয়েছিলে, কিন্তু তাই বলে স্ত্রী-পরিত্যাগ করতে গেলে কেন ? স্ত্রী তো তেত্রিশ কোটির মধ্যে একটিও নয়। ঐটুকু পৌত্তলিকতা, রাখলেও ক্ষতি ছিল না।

অন্নদা। সে তো ঠিক কথা। স্ত্রী-পরিত্যাগ করা যায়, কিন্তু স্ত্রীজাতি তো বিদায় হন না— স্ত্রীকে ছাড়লে স্ত্রীজাতি বিশ্বব্যাপী হয়ে দেখা দেন, স্ত্রীপূজার মাত্রা মনে মনে বেড়ে ওঠে।

আশু। তবে ?

অন্নদা। তবে শোনো। আমার শাশুড়ি ছিলেন না, শ্বশুর ভয়ংকর হিন্দু ছিলেন। যখন শুনলেন আমি ব্রাহ্ম হয়েছি, আমার স্ত্রীকে বিধবার বেশ পরিয়ে ব্রহ্মচারিণী করে কাশীতে গিয়ে বাস করলেন। তার পরে শুনছি হিন্দুশাস্ত্রের সমস্ত দেবতাতেও তৃপ্তি হয় নি, তার উপরে অল্‌কট্‌, ব্লাভাট্‌স্কি, অ্যানি বেসান্ট, সূক্ষ্মশরীর, মহাত্মা, প্লান্‌চেট, ভূতপ্রেত কিছুই বাদ যায় নি—

আশু। কেবল তুমি ছাড়া।

অন্নদা। আমাকে ব্রহ্মদৈত্য বলে বাদ দিলে।

আশু। তুমি তার আশা একেবারে ছেড়ে দিয়েছ ?

অন্নদা। আশার অপরাধ নেই— তার পশ্চাতে এত বড়ো রেজিমেন্ট লেগেছে, সে আর টিকল না। শুনেছি আমার শ্বশুর মারা গেছেন, এবং আমার স্ত্রী এখন পতিত-উদ্ধার করে বেড়াচ্ছেন।

আশু। তুমি একবার চরণে পতিত হওগে-না, যদি উদ্ধার করেন।

অন্নদা। ঠিকানাও জানি নে, প্রবৃত্তিও নেই।

আশু। তুমি কি এইরকম উড়ে উড়ে বেড়াবে ?

অন্নদা। না হে, সোনার খাঁচার সন্ধানে আছি।

আশু। খাঁচাওয়ালার অভাব নেই, তবে সোনা জিনিসটা দুর্লভ বটে।

অন্নদা। আচ্ছা, আমার আলোচনা পরে হবে, কিন্তু তোমার কী বলো দেখি। তোমার তো আইবড়োলোক-প্রাপ্তির বিধান কোনো শাস্ত্রেই লেখে না। তার বেলা চুপ। থিওসফিতে তোমাকে খেলে। মন্ত্রতন্ত্র প্রাণায়াম হঠযোগ সুষুম্না-ইড়া-পিঙ্গলা এ-সমস্তই তোমাকে ছাড়ে, যদি বিবাহ কর।

আশু। তুমি মনে কর, আমি সবই অন্ধভাবে বিশ্বাস করি— তা নয়। এ-সমস্ত বিশ্বাসের যোগ্য কি না তাই আমি পরীক্ষা করে দেখতে চাই। অবিশ্বাসকেও তো প্রমাণের উপর স্থাপন করতে হবে।

অন্নদা। বসে বসে তাই করো। মরীচিকা-স্থাপনের জন্য পাথরের ভিত্তি গাঁথো। আমি এখন চললেম।

আশু। কোথায় যাচ্ছ ?

অন্নদা। শবসাধনায় নয়।

আশু। তা তো জানি।

অন্নদা। একটি সজীবের সন্ধান পেয়েছি।

আশু। তবে যাও, শুভকার্যে বাধা দেব না।

দ্বিতীয় অঙ্ক

বাড়িওয়ালা ও তাহার স্ত্রী

স্ত্রী। মাতাজি যদি হবে, তবে অমন চেহারা কেন?

বাড়িওয়ালা। দেখতে শুনতে তাড়কা-রাক্ষসীর মতো না হলেই বুঝি আর মাতাজি হয় না।

স্ত্রী। হবে না কেন? কিন্তু তা হলে কি এই সমর্থবয়সে স্বামীর ঘরে না থেকে তোমার মতো বোকা ভোলাবার জন্যে মাতাজি-গিরি করতে বেরোত? তা হলে কি পিতাজি তোমার মাতাজিকে ছাড়ত? আর এত টাকাই বা পেলে কোথায়?

বাড়িওয়ালা। ওগো, যারা যোগবিদ্যা জানে তাদের যদি টাকা না হবে, চেহারা না হবে, তবে কি তোমার হবে? রোসো-না, ওঁর কাছে মন্তর-টন্তরগুলো শিখে নেওয়া যাক-না।

স্ত্রী। বুড়োবয়সে মন্তর শিখে হবে কী শুনি? কাকে বশ করবে?

বাড়িওয়ালা। যাঁকে কিছুতেই বশ মানাতে পারলেম না।

স্ত্রী। তিনি কে?

বাড়িওয়ালা। আগে বশ মানাই, তার পরে সাহস করে নাম বলব।

মাতাজির প্রবেশ

মাতাজি। এ বাড়িতে আমার থাকার সুবিধা হচ্ছে না। এর চেয়ে বড়ো বাড়ি আমাকে দিতে হবে।

বাড়িওয়ালা। এ বাড়ি ছাড়া আমার আর একটিমাত্র বড়ো বাড়ি আছে। সেটা বড়ো বটে, কিন্তু—

মাতাজি। তা, ভাড়া বেশি দেব, কিন্তু সেই বাড়িতেই আমি কাল যেতে চাই।

বাড়িওয়ালা। সবে পরশু দিন সেখানে একটি ভাড়াটে এসেছে। একটি কোন্ সদরআলার বিধবা স্ত্রী— পশ্চিম থেকে মেয়ের জন্যে পাত্র খুঁজতে এসে আমার সেই উনপঞ্চাশ নম্বরের বাড়িতে উঠেছে।

মাতাজি। উনপঞ্চাশ নম্বর! ঠিক আমি যা চাই। তোমার এ বাড়ির নম্বর ভালো নয়।

বাড়িওয়ালা। বাইশ নম্বর ভালো নয় মাতাজি? কারণটা কী বুঝিয়ে বলুন।

মাতাজি। বুঝতে পারছ না— দুয়ের পিঠে দুই—

বাড়িওয়ালা। ঠিক বলেছেন মাতাজি, দুয়ের পিঠে দুইই তো বটে। এতদিন ওটা ভাবি নি।

মাতাজি। দুইয়েতে কিছু শেষ হয় না, তিন চাই। দেখো-না আমরা কথায় বলি, দু-তিন জন—

বাড়িওয়ালা। ঠিক ঠিক, তা তো বলেই থাকি।

মাতাজি। যদি দুই বললেই চুকে যেত, তা হলে তার সঙ্গে আবার তিন বলব কেন? বুঝে দেখো।

বাড়িওয়ালা। আমাদের কী বা বুদ্ধি, তাই বুঝব। সবই জানতুম, তবু তো বুঝি নি।

মাতাজি। তাই, ঐ দুইয়ের পিঠে দুই বলেই আমার মন্ত্র কিছুই সফল হচ্ছে না।

স্ত্রী। (আত্মগত) বেঁচে থাক্ আমার দুয়ের পিঠে দুই। মন্ত্র সফল হয়ে কাজ নেই।

মাতাজি। উনপঞ্চাশের মতো এমন সংখ্যা আর হয় না।

বাড়িওয়ালা। (জনান্তিকে) শুনলে তো গিন্নি?

স্ত্রী। (জনান্তিকে) শুনে হবে কী? তোমার উনপঞ্চাশ যে অনেক কাল হল পেরিয়েছে।

বাড়িওয়ালা। কিন্তু মাতাজিকে কি কালই সে বাড়িতে যেতে হবে?

মাতাজি। কাল উনত্রিশ তারিখে মঙ্গলবার পড়েছে। এমন দিন আর পাওয়া যাবে না।

বাড়িওয়ালা। ঠিক কথা। কাল উনত্রিশেও বটে, আবার মঙ্গলবারও বটে। কী আশ্চর্য! তা হলে তো কালই যেতে হচ্ছে বটে। তা-ই ঠিক করে দেব। (মাতাজির প্রস্থান) এখন আমার এই নতুন ভাড়াটেদের ওঠাই কী বলে? বিদেশ থেকে এসেছে, হঠাৎ তারা এখন বাড়িই বা পায় কোথায়?

স্ত্রী। তাদের আপাতত এই বাড়িতে এনেই রাখো-না। আমরা নাহয় কিছুদিন ঝামাপুকুরে

জামাইবাড়ি গিয়েই থাকব। তোমার ঐ মন্তর-জানা মেয়েমানুষকে এখানে রেখে কাজ নেই। বিদেয় করে দাও। ছেলেপিলের ঘর, কার কখন অপরাধ হয়, বলা যায় কি ?

বাড়িওয়ালা। সেই ভালো। তাদের কোনোরকম করে ভুলিয়ে-ভালিয়ে আজকের মধ্যেই উনপঞ্চাশ নম্বর থেকে বাইশ নম্বরে এনে ফেলা যাক। বলি গে, পাড়ায় প্লেগ দেখা দিয়েছে, উনপঞ্চাশ নম্বরে প্লেগ হাঁসপাতাল বসবে।

তৃতীয় অঙ্ক

আশু ও অন্নদা

অন্নদা। তোমার ঐ টাটকা লঙ্কার ধোঁয়ায় নাকের জলে চোখের জলে করলে যে হে ! তোমার ঘরে আসা ছাড়তে হল।

আশু। টাটকা লঙ্কার ধোঁয়া তুমি কোথায় পেলে ?

অন্নদা। ঐ-যে তোমার তর্কালংকারের বকুনি। লোকটা তো বিস্তর টিকি নাড়লে, মাথামুণ্ডু কিছু পেলে কি ?

আশু। মাথামুণ্ডু নইলে শুধু টিকি নড়বে কোথায় ? কথাগুলো যদি শ্রদ্ধা করে শুনতে, তবে বুঝতে।

অন্নদা। যদি বুঝতেম, তবে শ্রদ্ধা করতেম। তুমি আশু, ফিজিকাল সায়ান্সে এম· এ· দিয়ে এলে— তুমি যে এত ঘন ঘন টিকি-নাড়া বরদাস্ত করছ এ যদি দেখতে পায় তবে প্রেসিডেন্সি কলেজের চুনকাম-করা দেওয়ালগুলো বিনি-খরচে লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে। আজ কথাটা কী হল বুঝিয়ে বলো দেখি।

আশু। পণ্ডিতমশায় পরিণয়তত্ত্ব ব্যাখ্যা করছিলেন।

অন্নদা। তত্ত্বটা আমার জানা খুব দরকার হয়ে পড়েছে। তর্কালংকারমশায় বলছিলেন, বিবাহের পূর্বে কন্যার সঙ্গে জানাশুনার চেষ্টা না করাই কর্তব্য। যুক্তিটা কী দিচ্ছিলেন, ভালো বোঝা গেল না।

আশু। তিনি বলছিলেন, সকল জিনিসের আরম্ভের মধ্যে একটা গোপনতা আছে। বীজ মাটির নীচে অন্ধকারের মধ্যে থাকে, তার পরে অঙ্কুরিত হলে তখন সূর্য-চন্দ্র-জল-বাতাসের সঙ্গে মুখোমুখি লড়াই করবার সময় আসে। বিবাহের পূর্বে কন্যার হৃদয়কে বিলাতি অনুকরণে বাইরে টানাটানি না করে তাকে আচ্ছন্ন আবৃত রাখাই কর্তব্য। তখন তার উপরে তাড়াতাড়ি দৃষ্টিক্ষেপ করতে যেয়ো না। সে যখন স্বভাবতই নিজে অঙ্কুরিত হয়ে তার অর্ধমুকুলিত সলজ্জ দৃষ্টিটুকু গোপনে তোমার দিকে অগ্রসর করতে থাকবে, তখনই তোমার অবসর।

অন্নদা। আমার অদৃষ্টে সে পরীক্ষা তো হয়ে গেছে। বিলাতি প্রথা-মতে বিবাহের পূর্বে কন্যার হৃদয় নিয়ে টানা-হেঁচড়া করি নি ; হৃদয়টা এত অন্ধকারের মধ্যে ছিল যে আমি তার কোনো খোঁজ পাই নি, তার পরে অঙ্কুরিত হল কি না হল তারও তো কোনো ঠিকানা পেলেম না। এবারে উলটোরকম পরীক্ষা করতে চলেছি, এবার আগে হৃদয়, তার পরে অন্য কথা।

আশু। পরীক্ষার দিন কবে ?

অন্নদা। কাল।

আশু। স্থান ?

অন্নদা। উনপঞ্চাশ নম্বর রাম বৈরাগীর গলি।

আশু। নম্বরটা তো ভালো শোনাচ্ছে না।

অন্নদা। কেন ? উনপঞ্চাশ বায়ুর কথা ভাবছ ? সে আমাকে টলাতে পারবে না— তুমি হলে বিপদ ঘটত।

আশু। পাত্র ?

অন্নদা। কন্যার বিধবা মা তাকে পশ্চিম থেকে সঙ্গে করে এনেছে। আমি ঘটককে বলে রেখেছি যে ভালো করে মেয়েটির সঙ্গে পরিচয় করে নিয়ে তবে বিবাহের কথা হবে।

আশু। কিন্তু অন্নদা, শেষকালে বহুবিবাহে প্রবৃত্ত হলে ?

অন্নদা। তোমাদের মতো আমি নাম দেখে ভড়কাই নে। যে বহুবিবাহের মধ্যে আর সমস্ত আছে, কেবল বহুটুকুই নেই, তাকে দেখে চমকাও কেন ভাই ?

আশু। তবু একটা প্রিন্সিপ্‌ল্‌ আছে তো ? বহুবিবাহকে বহুবিবাহ বলতেই হবে।

অন্নদা। আমার নামমাত্র স্ত্রী যেখানে আছে প্রিন্সিপ্‌ল্‌ও সেইখানে আছে। সে স্ত্রীও আসছে না, প্রিন্সিপ্‌ল্‌ও রইল ; অতএব এখন আমি ডঙ্কা মেরে বহুবিবাহ করব, প্রিন্সিপ্‌ল্‌জুজুকে ডরাব না।

রাধাচরণের প্রবেশ

রাধাচরণ। আশুবাবু !

আশু। কী হে রাধে ?

রাধাচরণ। সেদিন আপনি আমার সঙ্গে মন্ত্র নিয়ে তর্ক করলেন— এক-একটা শব্দের যে এক-এক প্রকার বিশেষ ক্ষমতা আছে, আমার বোধ হল আপনি যেন তা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন না।

অন্নদা। বল কী রাধে ? তা হলে আশুর অবিশ্বাস করবার ক্ষমতা এখনো সম্পূর্ণ লোপ হয় নি ! এখনো দুটো-একটা জায়গায় ঠেকছে !— শব্দের মধ্যে শক্তি আছে, এ কথা বাঙালির ছেলে বিশ্বাস কর না !

রাধাচরণ। বলুন তো অন্নদাবাবু ! তা হলে মারণ, উচাটন, বশীকরণ— এগুলো কি বেবাক গাঁজাখুরি !

অন্নদা। তাও কি কখনো হয় ? সংসারে কি এত গাঁজার চাষ হতে পারে ?

রাধাচরণ। পশ্চিম থেকে একজন যোগসিদ্ধ মাতাজি এসেছেন। শুনেছি তিনি মন্ত্রের বল একেবারে প্রত্যক্ষ দেখিয়ে দিতে পারেন। দেখতে গিয়েছিলেম, কিন্তু সকলকে তিনি দেখা দেন না ; বলেছেন, যোগ্য লোক পেলে তাকে তিনি তাঁর সমস্ত বিদ্যে দেখিয়ে দেবেন। আশুবাবু, আপনি চেষ্টা করলে নিশ্চয় বিফল হবেন না।

আশু। তিনি থাকেন কোথায় ?

রাধাচরণ। বাইশ নম্বর ভেড়াতলায়।

অন্নদা। বাইশ নম্বরটা উনপঞ্চাশের চেয়ে ভালো হতে পারে, কিন্তু জায়গাটা ভালো ঠেকছে না। একে বশীকরণ-বিদ্যে, তার উপরে ভেড়াতলা। মাতাজির কাছে মুণ্ডুজিটি খুইয়ে এসো না।

আশু। আরে ছি ! কী বক তার ঠিক নেই। তাঁরা হলেন সাধু স্ত্রীলোক, সেখানে মুণ্ডুর ভাবনা ভাবতে হয় না। তুমি বুঝেসুঝে উনপঞ্চাশে পা বাড়িয়ো।

অন্নদা। তুমি ভাবছ বাইশ একেবারেই নির্বিষ। তা নয় হে। বিশের উপরের দুই মাত্রা চড়িয়ে তবে বাইশ। আপাদমস্তক জর্জর হয়ে ফিরবে।

চতুর্থ অঙ্ক

বাইশ নম্বরে কন্যার বিধবা মাতা শ্যামাসুন্দরী

শ্যামা। পেলেগ শুনে ভয়ে বাঁচি নে। তাড়াতাড়ি করে পালিয়ে তো এলুম। কিন্তু অন্নদা বলে ছেলেটির আজ যে সেই উনপঞ্চাশ নম্বরে আসবার কথা আছে, সে কি সেখান থেকে চিনে ঠিক এখানে আসতে পারবে ! এত ক'রে খাওয়াদাওয়ার জোগাড় করলেম, সব মাটি হবে না তো ! যে তাড়াটা লাগালে, একবার খবর দেবার সময় দিলে না। ঘটক বলেছে, ছেলেটি আমার নিরুপমাকে

ভালো করে দেখে-শুনে নিতে চায়, ওর পড়াশুনো গান-বাজনা সব পরীক্ষা করবে— তা করুক। কর্তা তো নিরুপমাকে সেইরকম করেই শিখিয়েছেন। বরাবর পশ্চিমে ছিলেন, আমাদের কখনো তো বন্ধ করে রাখেন নি। তবু কলকাতার ছেলে কী রকম জানি নে। ভয় হয়, আমাদের ধরন-ধারণ দেখে হয়তো অভদ্র মনে করবে। তারা মেয়ের সঙ্গে শেক্‌হ্যান্ড করে না কি, কে জানে! হয়তো ইংরেজিতে গুডমর্নিং বলে! শুনেছি তাদের নিজেব হাতে চুরুট জ্বালিয়ে দিতে হয়— এ-সব তো পারব না। ঘটক বললে, ছেলেটি হ্যাট-কোট পরে। আমার মেয়ে আবার ফিরিঙ্গির সাজ দু চক্ষে দেখতে পারে না। কী রকম যে হবে, বুঝতে পারছি নে। মন্ত্র পড়ে বিয়ে করতে রাজি হবে তো?

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। মাঠাকরুন, একটি বাবু এসেছেন। আমি তাঁকে বললেম বাড়িতে পুরুষমানুষ কেউ নেই। তিনি বললেন, তিনি মার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছেন।

শ্যামা। তবে ঠিক হয়েছে। সেই ছেলেটি এসেছে। ডেকে নিয়ে আয়। (ভৃত্যের প্রস্থান) ভয় হচ্ছে— কলকাতার ছেলে, তার সঙ্গে কিরকম করে চলতে হবে! কী জানোয়ারই মনে করবে!

আশুর প্রবেশ

শ্যামাসুন্দরীর পায়ের কাছে একটি গিনি রাখিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম

শ্যামা। (স্বগত) এ যে প্রণামী দিয়ে প্রণাম করলে গো! এ তো শেক্‌হ্যান্ড করে না। বাঁচালে! লক্ষ্মী ছেলে! কেমন ধুতিচাদর পরে এসেছে!

আশু। মাতাজি, আমাকে যে আপনি দর্শন দেবেন, এ আমি আশা করি নি। বড়ো অনুগ্রহ করেছেন।

শ্যামা। (সস্নেহে সপুলকে) কেন বাবা, তুমি আমার ছেলের মতো, তোমাকে দেখা দিতে দোষ কী!

আশু। স্নেহ রাখবেন। আশীর্বাদ করবেন, এই অনুগ্রহ থেকে কখনো বঞ্চিত না হই।

শ্যামা। বাবা, তোমার কথা শুনে আমার কান জুড়োল, আমি নিশ্চয়ই অনেক তপস্যা করেছিলেম, তাই—

আশু। মাতাজি, আপনি তপস্যার দ্বারা যে নিরুপমা-সম্পদ লাভ করেছেন, আমাকে তার—

শ্যামা। তোমাকে দেবার জন্যেই তো প্রস্তুত হয়ে এসেছি। অনেক সন্ধান করে যোগ্যপাত্র পেয়েছি, এখন দিতে পারলেই তো নিশ্চিন্ত হই।

আশু। (শ্যামার পদধূলি লইয়া) মাতাজি, আমাকে কৃতার্থ করলেন; এত সহজেই যে ফললাভ করব, এ আমি স্বপ্নেও জানতুম না।

শ্যামা। বল কী বাবা, তোমার আগ্রহ যত আমার আগ্রহ তার চেয়ে বেশি।

আশু। তা হলে যে কামনা করে এসেছিলেম, আজ কি তার কিছু পরিচয়—

শ্যামা। পরিচয় হবে বৈকি বাবা, আমার তাতে কোনো আপত্তি নেই।

আশু। আপত্তি নেই মাতাজি? শুনে বড়ো আরাম পেলেম—

শ্যামা। দেখাশুনা সমস্তই হবে বাবা, আগে কিছু খেয়ে নাও।

আশু। আবার খাওয়া! আপনি আমাকে যথার্থ জননীর মতোই স্নেহ দেখালেন।

শ্যামা। তুমিও আমাকে মার মতোই দেখবে, এই আমার প্রাণের ইচ্ছা। আমার তো ছেলে নেই, তুমিই আমার ছেলের মতো থাকবে।

আহার্য লইয়া ভৃত্যের প্রবেশ

আশু। করেছেন কী! এত আয়োজন!

শ্যামা। আয়োজন আর কি করলেম? আজই ঠিক আসতে পারবে কি না মনে একটু সন্দেহ ছিল— তাই—

আশু। সন্দেহ ছিল ? আপনি কি জানতেন আমি আসব ?

শ্যামা। তা জানতেম বৈকি।

আশু। (আত্মগত) কী আশ্চর্য ! আমাকে না জেনেই আমার জন্যে পূর্ব হতেই অপেক্ষা করছিলেন ? তবু অন্নদা যোগবলে বিশ্বাস করে না ! তাকে বললে বোধ হয় ঠাট্টা করেই উড়িয়ে দেবে।

আহারে প্রবৃত্ত

শ্যামা। (আত্মগত) ছেলেটি সোনার টুকরো। যেমন কার্তিকের মতো দেখতে তেমনি মধু-ঢালা কথা। আমাকে প্রথম থেকেই মাতাজি বলে ডাকছে। পশ্চিম থেকে এসেছি কিনা, তাই বোধ হয় মা না বলে মাতাজি বলছে। (প্রকাশ্যে) কিছুই খেলে না যে বাবা !

আশু। আমার যা সাধ্য, তার চেয়ে বরঞ্চ বেশিই খেয়েছি মাতাজি।

শ্যামা। তা হলে একটু বোসো আমি ডেকে নিয়ে আসি। [প্রস্থান

আশু। রাধে বলেছিল বটে, মাতাজি কুমারী কন্যার দ্বারা মন্ত্রের ফল দেখিয়ে থাকেন। বশীকরণ-বিদ্যায় আমার একটু বিশ্বাস জন্মাচ্ছে। এরই মধ্যে মাতাজির মাতৃস্নেহে আমার চিত্ত কেমন যেন আর্দ্র হয়ে এসেছে। আমার মা নেই, মনে হচ্ছে যেন মাকে পেলেম। এ কোন্ মন্ত্রবলে কে জানে ! মাতাজি স্নিগ্ধ দৃষ্টি-দ্বারা আমার সমস্ত শরীর যেন অভিষিক্ত করে দিয়েছেন। প্রথম দেখাতেই উনি যে আমাকে তাঁর পুত্রস্থানীয় করে নিয়েছেন, এ যেন পূর্বজন্মের একটা সংবন্ধের স্মৃতি।

নিরুপমাকে লইয়া শ্যামার প্রবেশ

আশু। (স্বগত) আহা, কী সুন্দর ! মাতাজির বশীকরণ-বিদ্যা যেন মূর্তিমতী ! এঁর মুখে কোনো মন্ত্রই বিফল হতে পারে না।

শ্যামা। যাও, লজ্জা কোরো না মা ! উনি যা জিজ্ঞাসা করেন উত্তর দিয়ো।

আশু। লজ্জা করবেন না। মাতাজি আমার প্রতি যেরকম অনুগ্রহ প্রকাশ করেছেন, আপনিও আমাকে আপনার লোকের মতোই দেখবেন। (আত্মগত) মেয়েটি কী লাজুক ! আমার কথা শুনে আরো যেন লাল হয়ে উঠল।

শ্যামা। বাবা, তোমার ইচ্ছামত ওকে জিজ্ঞাসাপত্র করো।

আশু। আপনার কোন্ কোন্ বিদ্যায় অধিকার আছে, জানতে উৎসুক হয়ে আছি।

শ্যামা। বয়স অল্প, বিদ্যা কতই বা বেশি হবে— তবে—

আশু। যত অল্পই হোক মাতাজি, আমাদের মতো লোকের পক্ষে যথেষ্ট হবে।

শ্যামা। (আত্মগত) বিদ্যার কোনো পরিচয় না পেয়েই যখন এত সন্তুষ্ট তখন মেয়েকে পছন্দ করেছে বলেই বোধ হচ্ছে। বাঁচা গেল, আমার বড়ো ভাবনা ছিল। (প্রকাশ্যে) নিরু, একটি গান শুনিয়ে দাও তো মা !

আশু। গান ! এ আমার আশার অতীত। আপনি বোধ হয় পূর্বে থেকেই জানেন, গানের চেয়ে আমি কিছুই ভালোবাসি নে। (স্বগত) অন্নদার মতো এতবড়ো সন্দেহী, সে থাকলে আজ যোগের বল প্রত্যক্ষ করতে পারত। (প্রকাশ্যে নিরুপমার প্রতি) আপনারা আমাকে এক দিনেই চিরঋণী করেছেন, যদি গান করেন তবে বিক্রীত হয়ে থাকব।

নিরুপমার গান

আমি কী বলে করিব নিবেদন
আমার হৃদয় প্রাণ মন !
চিত্তে এসে দয়া করি নিজে লহো অপহরি,
করো তারে আপনার ধন—
আমার হৃদয় প্রাণ মন।

শুধু ধূলি, শুধু ছাই, মূল্য যার কিছু নাই
মূল্য তারে করো সমর্পণ
তব স্পর্শে পরশরতন !
তোমার গৌরবে যবে আমার গৌরব হবে
একেবারে দিব বিসর্জন
চরণে হৃদয় প্রাণ মন ।

আশু । (স্বগত) আর মন্ত্রের দরকার নেই । বশীকরণের আর কী বাকি রইল ! কন্যাটি দেবকন্যা । (প্রকাশ্যে) মাতাজি !

শ্যামা । কী বাবা ?

আশু । আমাকে আপনার পুত্র করেই রাখবেন, এমন সুধাসংগীত শোনবার অধিকার থেকে বঞ্চিত করবেন না । যা পাওয়া গেল এই আমি পরম লাভ মনে করছি । মন্ত্রতন্ত্রের কথা ভুলেই গেছি । এখন বুঝতে পারছি, মন্ত্রের কোনো দরকার নেই ।

শ্যামা । অমন কথা বোলো না বাবা ! মন্ত্রের দরকার আছে বৈকি । নইলে শাস্ত্রে—

আশু । সে তো ঠিক কথা । মন্ত্র আমি অগ্রাহ্য করি নে । আমি বলছিলেম মন্ত্র পড়লেই যে মন বশ হয় তা নয়, গানের মোহিনী শক্তির কাছে কিছুই লাগে না । (স্বগত) মেয়েটি আবার লজ্জায় লাল হয়ে উঠল । ভারি লাজুক !

শ্যামা । (আত্মগত) ছেলেটি খুব ভালো । কিন্তু একটু যেন লজ্জা কম বলে বোধ হয় । মন বশ করার কথাগুলো শাশুড়ির সামনে না বললেই ভালো হত ।

আশু । কিন্তু আপনি বিরক্ত হবেন না, আমার যা মনে উদয় হচ্ছে আমি বলি, তার পরে—

শ্যামা । তা বাবা, সে-সব কথা এখন থাক্ । আগে—

আশু । আমি বলছিলেম, গানে যে মন বশ হয় সেও তো শব্দমাত্র ; মনের সঙ্গে তার যদি যোগ থাকে তা হলে মন্ত্রের শব্দশক্তিকেই বা না মানি কী বলে ?

শ্যামা । ঠিক কথা । মন্ত্রটা মানাই ভালো ।

আশু । (সোৎসাহে) আপনার কাছে এ-সব কথা বলা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা, কিন্তু শাব্দী শক্তির সঙ্গে আত্মার যে একটি নিগূঢ় যোগ আছে তার স্বরূপ নিরূপণ করা কঠিন, তর্কালংকারমশায় বলেন সে অনির্বচনীয় । শাস্ত্রে যে বলে শব্দ ব্রহ্ম, তার কারণ কী ? ব্রহ্মই যে শব্দ বা শব্দই যে ব্রহ্ম তা নয় ; কিন্তু ব্রহ্মের ব্যবহারিক সত্তার মধ্যে শব্দস্বরূপেই ব্রহ্মের প্রকাশ যেন নিকটতম । (নিরুপমার প্রতি) আপনি তো এ-সকল বিষয়ে অনেক আলোচনা করেছেন, আপনার কি মনে হয় না রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শের চেয়ে শব্দই যেন আমাদের আত্মার অব্যবহিত প্রত্যক্ষের বিষয় ? সেইজন্যই এক আত্মার সঙ্গে আর-এক আত্মার মিলনসাধনের প্রধান উপায় শব্দ । আপনি কী বলেন ? (স্বগত) মেয়েটি ভারি লাজুক !

শ্যামা । বলো-না মা, যা জিজ্ঞাসা করছেন বলো । এত বিদ্যে শিখলে, এই কথাটার উত্তর দিতে পারছ না ?— বাবা, প্রথম দিন কিনা, তাই লজ্জা করছে । ও যে কিছু শেখে নি তা মনে কোরো না ।

আশু । ওঁর বিদ্যার উজ্জ্বলতা মুখশ্রীতেই প্রকাশ পাচ্ছে । আমি কিছুমাত্র সন্দেহ করছি নে ।

শ্যামা । নিরু, মা, একবার ও ঘরে যাও তো । [নিরুপমার প্রস্থান

দেখো বাবা, মেয়েটির বাপ নেই, সকল কথা আমাকেই কইতে হচ্ছে, তুমি কিছু মনে কোরো না ।

আশু । মনে করব ! বলেন কী ! আপনার কথা শুনতেই তো এসেছিলেম— বাচালের মতো কেবল নিজেই কতকগুলো বকে গেলেম । আমাকে মাপ করবেন ।

শ্যামা । তোমার যদি মত থাকে তা হলে একটা দিনস্থির করতে হচ্ছে তো ?

আশু । (স্বগত) আমি ভেবেছিলেম, আজই সমস্ত হয়ে যাবে । কিন্তু আজ বৃহস্পতিবার, তাই বোধ হয় হল না । (প্রকাশ্যে) তা, আসছে রবিবারেই যদি স্থির করেন ?

শ্যামা । বল কী বাবা ? আজ বৃহস্পতিবার, মাঝে তো কেবল দুটো দিন আছে ।

আশু। এর জন্যে কি অনেক আয়োজনের দরকার হবে ?

শ্যামা। তা হবে বৈকি বাবা ; যথাসাধ্য করতে হবে। তা ছাড়া, পাঁজি দেখে একটা শুভদিন স্থির করতে হবে তো।

আশু। তা বটে, শুভদিন দেখতে হবে বৈকি। আসল কথা, যত শীঘ্র হয়। আমার যেরকম আগ্রহ, ইচ্ছে হচ্ছে, এই মুহূর্তেই—

শ্যামা। তা, আমি অনর্থক দেরি করব না বাবা ! আসছে অঘ্রান মাসেই হয়ে যাবে। মেয়েটিরও বিবাহযোগ্য বয়স হয়ে এসেছে, ওকেও তো আর রাখা যাবে না।

আশু। ওঁর বিবাহ হয়ে গেলেই বুঝি—

শ্যামা। তা হলে আবার আমি কাশীতে ফিরে যেতে পারি।

আশু। তা হলে তার আগেই আমাদের—

শ্যামা। সব ঠিক করে নিতে হবে।

আশু। তবে দিনক্ষণ দেখুন।

শ্যামা। তুমি তো রাজি আছ বাবা ?

আশু। বিলক্ষণ ! রাজি যদি না থাকব তো এখানে এলেম কেন ! আপনাকে নিয়ে কি আমি পরিহাস করছি ! আমার সেরকম স্বভাব নয়। আমি এখনকার ছেলেদের মতো এ-সকল বিষয় নিয়ে তামাশা করি নে।

শ্যামা। তোমার আর মত বদলাবে না ?

আশু। কিছুতেই না। আপনার পদস্পর্শ করে আমি বলছি, আপনার কাছ থেকে যা সংগ্রহ করতে এসেছি তা আমি গ্রহণ করে তবে নিরস্ত হব।

শ্যামা। দেওয়া-থোওয়ার কথা কিছু হল না যে।

আশু। আপনি কী চান বলুন।

শ্যামা। আমি কী চাইব বাবা ? তুমি কী চাও, সেইটে বলো।

আশু। আমি কেবল বিদ্যে চাই, আর কিছু চাই নে।

শ্যামা। (স্বগত) ছেলেটি কিন্তু বেহায়া, তা বলতেই হবে ! ছি ছি ছি, বিদ্যেসুন্দরের কথা আমার কাছে পাড়লে কী করে ? আমার নিরুকে বলে কিনা বিদ্যে ! (প্রকাশ্যে) তা হলে পানপাত্রটার কথা কী বল বাবা ?

আশু। (স্বগত) পানপাত্র ! এঁর দেখছি সমস্তই শাক্তমতে। এ দিকে কুমারী কন্যা, তার পরে আবার পানপাত্র ! এইটে আমার ভালো ঠেকছে না। (প্রকাশ্যে) তা, মাতাজি, আপনি কিছু মনে করবেন না— অবশ্য যে কাজের যা অঙ্গ তা করতেই হয়— কিন্তু ঐ-যে পানপাত্রের কথা বললেন, ওটা তো আমার দ্বারা হবে না।

শ্যামা। বাবা, তোমরা একালের ছেলে, তোমরা ওটাকে অসভ্যতা মনে কর, কিন্তু আমি তো ওতে কোনো দোষ দেখি নে—

আশু। আপনি ওতে কোনো দোষই দেখেন না ! বলেন কী মাতাজি !

শ্যামা। তা, নাহয় পানপাত্র রইল, ওর জন্যে কিছু আটকাবে না, এখন বিবাহের কথা তো পাকা ?

আশু। কার বিবাহের কথা ?

শ্যামা। তুমি আমাকে অবাক করলে বাপু ! এতক্ষণ কথাবার্তার পর জিজ্ঞাসা করছ কার বিবাহের কথা ! তোমারই তো বিবাহের কথা হচ্ছিল ; কেবল পানপাত্রের কথা শুনেই তুমি চমকে উঠলে। তা, পানপাত্র নাহয় নাই হল।

আশু। (হতবুদ্ধিভাবে) ও, হাঁ, তা বুঝেছি, তাই হচ্ছিল বটে ! (স্বগত) মস্ত একটা কী ভুল হয়ে গেছে। না বুঝে একেবারে জড়িয়ে পড়েছি। কী করা যায় ! (প্রকাশ্যে) কিন্তু, এত তাড়াতাড়ি কিসের, আর-এক দিন এ-সব কথা খোলসা করে আলোচনা করা যাবে। কী বলেন ?

শ্যামা। খোলসার আর কী বাকি রেখেছ বাবা! আর-এক দিন এর চেয়ে আর কত খোলসা হবে! তাড়াতাড়ি তো তুমিই করছিলে। আসছে রবিবারেই তুমি দিন স্থির করতে চেয়েছিলে।

আশু। তা চেয়েছিলেম বটে।

শ্যামা। তুমি দেখাশুনা করতে চাইলে বলেই আমি মেয়েকে তোমার সাক্ষাতে বের করলুম, তার গানও শুনলে, এখন পানপাত্রের কথা শুনেই যদি বেঁকে দাঁড়াও তা হলে তো আমার আর মুখ দেখাবার জো থাকবে না। তোমাকেই বা লোকে কী বলবে বাবা! ভদ্রলোকের মেয়ের সঙ্গে এমন ব্যবহার কি ভালো! আমার নিরু তোমার কাছে কী দোষ করেছিল যে—

ক্রন্দন

নিরুপমার দ্রুত প্রবেশ

নিরুপমা। মা, কী হয়েছে মা, অমন করে কাঁদছ কেন!

আশু। (স্বগত) কী সর্বনাশ! আমাকে এঁরা সবাই কী মনে করবেন না-জানি! (প্রকাশ্যে) কিছুই হয় নি, আমি সমস্তই ঠিক করে দিচ্ছি। আপনারা কান্নাকাটি করবেন না। শুভকর্মে ওতে অমঙ্গল হয়। (শ্যামার প্রতি) তা, আপনি একটা দিন স্থির করে দিন, আমার তাতে কোনো আপত্তি নেই।

শ্যামা। তা বাবা, যদি ভালো দিন হয়, তা হলে তুমি যা বলেছিলে আসছে রবিবারেই হয়ে যাক। আমার আয়োজনে কাজ নেই। এই কটা দিন তোমার মত স্থির থাকলে বাঁচি।

আশু। অমন কথা বলবেন না, আমার মতের কখনো নড়চড় হয় না।

শ্যামা। আমার পা ছুঁয়ে তো তাই বলেওছিলে, কিন্তু দশ মিনিট না যেতেই এক পানপাত্রের কথা শুনেই তোমার মত বদলে গেল।

আশু। তা বটে। পানপাত্রটা আমি আদবে পছন্দ কবি না—

শ্যামা। কেন বলো তো বাবা?

আশু। তা ঠিক বলতে পারছি নে— ঐ আমার কেমন— বোধ হয়, ওটা— কী জানেন, পানপাত্রটা যেন— কে জানে ও কথাটাই কেমন— হঠাৎ শুনলে কী যেন— তা, এই বাড়িটার নম্বর কী বলুন দেখি।

শ্যামা। ওঃ, তাই বুঝি ভাবছ? আমরা তোমাকে ভাঁড়াচ্ছি নে বাবা। আমরাই উনপঞ্চাশ নম্বরে ছিলুম, কাল এই বাইশ নম্বরে উঠে এসেছি। যদি মনে কোনো সন্দেহ থাকে, উনপঞ্চাশ নম্বরে বরঞ্চ একবার খোঁজ করে আসতে পারো।

আশু। (স্বগত) উঃ, কী ভুলই করেছি! যা হোক, এখন একটা পরিত্রাণের রাস্তা পাওয়া গেছে। অন্নদাকে এনে দিলেই সমস্ত গোল মিটে যাবে। যা হোক, অন্নদার অদৃষ্ট ভালো। এক-একবার মনে হচ্ছে, ভুলটা শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেলে মন্দ হয় না।

শ্যামা। কী বাবা? এত ভাবছ কেন? আমরা ভদ্রঘরের মেয়ে, তোমাকে ঠকাবার জন্যে পশ্চিম থেকে এখেনে আসি নি।

আশু। ও কথা বলবেন না, আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই। এখন আমি যাচ্ছি, এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসব, আজকের দিনের মধ্যেই একটা সন্তোষজনক বন্দোবস্ত করবই— এ আমি আপনার পা ছুঁয়ে শপথ করে যাচ্ছি।

শ্যামা। বাবা, ও শপথে কাজ নেই— পা ছুঁয়ে আরো একবার শপথ করেছিলে—

আশু। আচ্ছা, আমি আমার ইষ্টদেবতার শপথ করে যাচ্ছি, আজকের মধ্যেই সমস্ত পাকা করে তবে অন্য কথা।

শ্যামা। (স্বগত) ছেলেটি কথাবার্তায় বেশ, কিন্তু ওকে কিছুই বুঝবার জো নেই। কখনো-বা তাড়া দেয়, কখনো-বা ঢিল দেয়, অথচ মুখ দেখে ওর প্রতি অবিশ্বাসও হয় না।

আশু। তবে অনুমতি করেন তো এখন আসি।

শ্যামা। তা, এসো বাবা। [প্রণাম করিয়া আশুর প্রস্থান

পঞ্চম অঙ্ক

অন্নদা

অন্নদা। ব্যাপারখানা তো কিছুই বুঝতে পারলেম না। ঘটকের কথা শুনে এলেম কন্যা দেখতে। যিনি দেখা দিলেন, তাঁকে তো বয়স দেখে কোনোমতেই কন্যার মা বলে মনে হয় না, চেহারা দেখে বোধ হল অপ্সরী— যদিচ অপ্সরীর চেহারা কিরকম পূর্বে কখনো দেখি নি। শেক্‌হ্যান্ড করতে যেমনি হাত বাড়িয়ে দিয়েছি অমনি ফস্‌ করে আমার হাতে কড়ি-বাঁধা একগাছি লাল সুতো বেঁধে দিলে। আর-কেউ হলে গোল্‌মাল করতেম ; কিন্তু যে সুন্দর চেহারা, গোলমাল করবার জো কী! কিন্তু, এ-সমস্ত কোন্‌দেশী দস্তুর তা তো বুঝতে পারছি নে।

মাতাজির প্রবেশ

মাতাজি। (স্বগত) অনেক সন্ধান করে তবে পেয়েছি। আগে আমার গুরুদত্ত বশীকরণ-মন্ত্রটা খাটাই, তার পরে পরিচয় দেব। (অন্নদার কপালে নরকপাল ঠেকাইয়া) বলো, হুর্‌লিং।

অন্নদা। হুর্‌লিং।

মাতাজি। (অন্নদার গলায় জবার মালা পরাইয়া) বলো, কুড়বং কড়বং ক্‌ড়াং।

অন্নদা। (স্বগত) ছি ছি! ভারি হাস্যকর হয়ে উঠছে। একে আমার কোটের উপর জবার মালা, তার উপরে আবার এই অদ্ভুত শব্দগুলো উচ্চারণ!

মাতাজি। চুপ করে রইলে যে?

অন্নদা। বলছি। কী বলছিলেন বলুন।

মাতাজি। কুড়বং কড়বং ক্‌ড়াং।

অন্নদা। কুড়বং কড়বং ক্‌ড়াং। (স্বগত) রিডিক্লাস!

মাতাজি। মাথাটা নিচু করো। কপালে সিঁদুর দিতে হবে।

অন্নদা। সিঁদুর! সিঁদুর কি এই বেশে আমাকে ঠিক মানাবে?

মাতাজি। তা জানি নে, কিন্তু ওটা দিতে হবে।

অন্নদার কপালে সিঁদুর-লেপন

অন্নদা। ইস! সমস্ত কপালে যে একেবারে লেপে দিলেন!

মাতাজি। বলো, বজ্রযোগিন্যৈ নমঃ। (অন্নদার অনুরূপ আবৃত্তি) প্রণাম করো। (অন্নদাকর্তৃক তথাকৃত) বলো কুড়বে কড়বে নমঃ। প্রণাম করো। বলো হুর্‌লিঙে ঘুর্‌লিঙে নমঃ। প্রণাম করো।

অন্নদা। (স্বগত) প্রহসনটা ক্রমেই জমে উঠছে।

মাতাজি। এইবার মাতা বজ্রযোগিনীর এই প্রসাদী বস্ত্রখণ্ড মাথায় বাঁধো।

অন্নদা। (স্বগত) এই শালুর টুকরোটা মাথায় বাঁধতে হবে! ক্রমেই যে বাড়াবাড়ি হতে চলল। (প্রকাশ্যে) দেখুন, এর চেয়ে বরঞ্চ আমি পাগড়ি পরতেও রাজি আছি, এমন-কি, বাঙালিবাবুরা যে টুপি পরে তাও পরতে পারি—

মাতাজি। সে-সমস্ত পরে হবে, আপাতত এইটে জড়িয়ে দিই।

অন্নদা। দিন।

মাতাজি। এইবারে এই পিঁড়িটাতে বসুন।

অন্নদা। (স্বগত) মুশকিলে ফেললে। আমি আবার ট্রাউজার পরে এসেছি! যাই হোক, কোনোমতে বসতেই হবে।

উপবেশন

মাতাজি। চোখ বোজো। বলো, খটকারিনী হঠবারিণী ঘটসারিণী নটতারিণী ক্রং। প্রণাম করো। (অন্নদার তথাকরণ) কিছু দেখতে পাচ্ছ?

অন্নদা। কিচ্ছু না।

মাতাজি। আচ্ছা, তা হলে পুবমুখো হয়ে বোসো, ডান কানে হাত দাও। বলো, খটকারিণী হঠবারিণী ঘটসারিণী নটতারিণী ক্রং। প্রণাম করো। এবার কিছু দেখতে পাচ্ছ?

অন্নদা। কিছুই না।

মাতাজি। আচ্ছা, তা হলে পিছন ফিরে বোসো। দুই কানে দুই হাত দাও। বলো, খটকারিণী হঠবারিণী ঘটসারিণী নটতারিণী ক্রং। কিছু দেখতে পাচ্ছ?

অন্নদা। কী দেখতে পাওয়া উচিত, আগে আমাকে বলুন।

মাতাজি। একটা গর্দভ দেখতে পাচ্ছ তো?

অন্নদা। পাচ্ছি বৈকি! অত্যন্ত নিকটেই দেখতে পাচ্ছি।

মাতাজি। তবে মন্ত্র ফলেছে। তার পিঠের উপরে—

অন্নদা। হাঁ হাঁ, তার পিঠের উপরে একজনকে দেখতে পাচ্ছি বৈকি।

মাতাজি। গর্দভের দুই কান হাতে চেপে ধরে—

অন্নদা। ঠিক বলেছেন, কষে চেপে ধরেছে—

মাতাজি। একটি সুন্দরী কন্যা—

অন্নদা। পরমা সুন্দরী—

মাতাজি। ঈশানকোণের দিকে চলেছেন—

অন্নদা। দিক্‌ভ্রম হয়ে গেছে, কোন্ কোণে যাচ্ছেন তা ঠিক বলতে পারছি নে। কিন্তু ছুটিয়ে চলেছেন বটে! গাধাটার হাঁফ ধরে গেল।

মাতাজি। ছুটিয়ে যাচ্ছেন না কি? তবে তো আর-একবার—

অন্নদা। না না, ছুটিয়ে যাবেন কেন— কিরকম যাওয়াটা আপনি স্থির করছেন বলুন দেখি।

মাতাজি। একবার এগিয়ে যাচ্ছেন, আবার পিছু হটে পিছিয়ে আসছেন।

অন্নদা। ঠিক তাই। এগোচ্ছেন আর পিছোচ্ছেন। গাধাটার জিভ বেরিয়ে পড়েছে।

মাতাজি। তা হলে ঠিক হয়েছে। এবার সময় হল। ওলো মাতঙ্গিনী, তোরা সবাই আয়।

হুলুধ্বনি-শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে স্ত্রীদলের প্রবেশ

অন্নদার বামে মাতাজির উপবেশন ও তাহার হস্তে হস্তস্থাপন

অন্নদা। এটা বেশ লাগছে, কিন্তু ব্যাপারটা কী ঠিক বুঝতে পারছি নে।

রমণীগণের গান

এবার সখী, সোনার মৃগ
দেয় বুঝি দেয় ধরা।
আয় গো তোরা পুরাঙ্গনা,
আয় সবে আয় ত্বরা।
ছুটেছিল পিয়াস-ভরে
মরীচিকা-বারির তরে,
ধ'রে তারে কোমল করে
কঠিন ফাঁসি পরা।
দয়ামায়া করিস নে গো,
ওদের নয় সে ধারা।
দয়ার দোহাই মানবে না গো
একটু পেলেই ছাড়া।

বাঁধন-কাটা বন্যটাকে
মায়ার ফাঁদে ফেলাও পাকে,
ভুলাও তাকে বাঁশির ডাকে
বুদ্ধি-বিচার-হরা ॥

অন্নদা। বুদ্ধি-বিচার একেবারেই যায় নি। অতি সামান্যই বাকি আছে। তার থেকে মনে হচ্ছে, ঐ যে যাকে জন্তু-জানোয়ার বলা হল সে সৌভাগ্যশালী আমি ছাড়া, উপস্থিত ক্ষেত্রে, আর কেউ হতেই পারে না। গানটি ভালো, সুরটিও বেশ, কণ্ঠস্বরেরও নিন্দা করা যায় না, কিন্তু রূপক ভেঙে সাদা ভাষায় একটু স্পষ্ট করে সবটা খুলে বলুন দেখি— আমার সম্বন্ধে আপনারা কী করতে চান ? পালাব এমন আশঙ্কা করবেন না, আপনারা তাড়া দিলেও নয়। কিন্তু কোথায় এলুম, কেন এলুম, কোথায় যাব, এ-সকল গুরুতর প্রশ্ন মানবমনে স্বভাবতই উদয় হয়ে থাকে।

মাতাজি। তোমার স্ত্রীকে কি মাঝে মাঝে স্মরণ কর ?

অন্নদা। করে লাভ কী, কেবল সময় নষ্ট। তাঁকে স্মরণ করে যেটুকু সুখ, আপনাদের দর্শন করে তার চেয়ে ঢের বেশি আনন্দ।

মাতাজি। তোমার স্ত্রী যদি তোমাকে স্মরণ করে সময় নষ্ট করেন ?

অন্নদা। তা হলে তাঁর প্রতি আমার উপদেশ এই যে, আর অধিক নষ্ট করা উচিত হয় না ; হয় বিস্মরণ করতে আরম্ভ করুন নয় দর্শন দিন— সময়টা মূল্যবান জিনিস।

মাতাজি। সেই উপদেশই শিরোধার্য। আমিই তোমার সেবিকা শ্রীমতী মহীমোহিনী দেবী।

অন্নদা। বাঁচালে ! মনে যেরকম ভাবোদ্রেক করেছিলে, নিজের স্ত্রী না হলে গলায় দড়ি দিতে হত। কিন্তু নিজের স্বামীর জন্যে এ-সমস্ত ব্যাপার কেন ?

মাতাজি। গুরুর কাছে যে বশীকরণ-মন্ত্র শিখেছিলেম আগে সেইটে প্রয়োগ করে তবে আত্মপরিচয় দিলেম, এখন আব তোমার নিষ্কৃতি নেই।

অন্নদা। আর-কারও উপর এ মন্ত্রেব পরীক্ষা করা হয়েছে ?

মাতাজি। না, তোমার জন্যেই এতদিন এ মন্ত্র ধারণ করে রেখেছিলেম। আজ এর আশ্চর্য প্রত্যক্ষ ফল পেয়ে গুরুর চরণে মনে মনে শতবার প্রণাম করছি। অব্যর্থ মন্ত্র। মন্ত্রে তোমার কি বিশ্বাস হল না ?

অন্নদা। বশীকরণের কথা অস্বীকার করতে পারি নে। এখন তোমাকে একবার এই মন্ত্রগুলো পড়িয়ে নিতে পারলে আমি নিশ্চিন্ত হই।

দাসী-কর্তৃক সম্মুখে আহার্য-স্থাপন

এও বশীকরণের অঙ্গ। বন্যমৃগই হোক আর শহুরে গাধাই হোক পোষ মানাবার পক্ষে এটা খুব দরকারি।

আহারে প্রবৃত্ত

আশুর দ্রুত প্রবেশ

[মাতাজি প্রভৃতির প্রস্থান

আশু। ওহে অন্নদা, ভারি গোলমাল বেধে গেছে। বাঃ, তুমি যে দিব্যি আহার করতে বসেছ ! তোমার এ কী রকমের সাজ ! (উচ্চহাস্য) ব্যাপারখানা কী ? নরমুণ্ড, খাঁড়া, বাতি, জবার মালা ! তোমার বলিদান হবে নাকি ?

অন্নদা। হয়ে গেছে।

আশু। হয়ে গেছে কী রকম ?

অন্নদা। সে-সকল ব্যাখ্যা পরে করব। তোমার খবরটা আগে বলো।

আশু। তুমি বিবাহের জন্য যে কন্যাটিকে দেখবে বলে স্থির করেছিলে, তাঁরা হঠাৎ উনপঞ্চাশ নম্বর থেকে বাইশ নম্বরে উঠে গেছেন। আমি কন্যার বিধবা মাকে মাতাজি মনে করে বার বার এমন নির্বোধের মতো কথাবার্তা কয়ে গেছি যে, তাঁরা ঠিক করে নিয়েছেন, আমি মেয়েটিকে বিবাহ করতে সম্মত হয়েছি। এখন তুমি না গেলে তো আর উদ্ধার নেই।

অন্নদা। মেয়েটি দেখতে কেমন ?

আশু। দেবকন্যার মতো।

অন্নদা। তা হোক, বহুবিবাহ আমার মতবিরুদ্ধ।

আশু। বল কী ! সেদিন এত তর্ক করলে—

অন্নদা। সেদিনকার চেয়ে ঢের ভালো যুক্তি আজ পাওয়া গেছে—

আশু। একেবারে অখণ্ডনীয় ?

অন্নদা। অখণ্ডনীয়।

আশু। যুক্তিটা কিরকম দেখা যাক।

অন্নদা। তবে একটু বোসো। (প্রস্থান ও মাতাজিকে লইয়া প্রবেশ) ইনি আমার স্ত্রী শ্রীমতী মহীমোহিনী দেবী।

আশু। অ্যাঁ ! ইনি তোমার— আপনি আমাদের অন্নদার— কী আশ্চর্য ! তা হলে তো হতে পারে না।

অন্নদা। হতে পারে না কী বলছ ? হয়েছে, আবার হতে পারে না কী ? একবার হয়েছে, এই আবার দুবার হল, তুমি বলছ হতে পারে না !

আশু। না, আমি তা বলছি নে। আমি বলছি, সেই বাইশ নম্বরের কী করা যায় !

অন্নদা। সে আর শক্ত কী ! সহজ উপায় আছে।

আশু। কী বলো দেখি।

অন্নদা। বিয়ে করে ফেলো।

আশু। সমস্ত বিসর্জন দেব— আমার হঠযোগ, প্রাণায়াম, মন্ত্রসাধন—

অন্নদা। ভয় কী, তুমি যেগুলো ছাড়বে আমি সেগুলো গ্রহণ করব। সে যাই হোক, তোমার বশীকরণটা কিরকম হল ?

আশু। তা, নিতান্ত কম হয় নি। তোমার এই একটা ঠাট্টা করবার বিষয় হল।

অন্নদা। আর ঠাট্টা চলবে না।

আশু। কেন বলো দেখি।

অন্নদা। আমারও বশীকরণ হয়ে গেছে।

আশু। চললেম। এক ঘণ্টার মধ্যেই যাবার কথা আছে। কথাটা পাকা করে আসি গে।

অগ্রহায়ণ ১৩০৮

শারদোৎসব

পাত্রগণ

সন্ন্যাসী
ঠাকুরদাদা
লক্ষেশ্বর
উপনন্দ
রাজা
রাজদূত
অমাত্য
বালকগণ

রাগিণী ভৈরবী। তাল তেওরা

আজ বুকের বসন ছিঁড়ে ফেলে
দাঁড়িয়েছে এই প্রভাতখানি,
আকাশেতে সোনার আলোয়
ছড়িয়ে গেল তাহার বাণী।

ওরে মন, খুলে দে মন,
যা আছে তোর খুলে দে।
অন্তরে যা ডুবে আছে
আলোক-পানে তুলে দে।

আনন্দে সব বাধা টুটে
সবার সাথে ওঠ্ রে ফুটে,
চোখের 'পরে আলস-ভরে
রাখিস নে আর আঁচল টানি।

শারদোৎসব

প্রথম দৃশ্য

পথে বালকগণ

গান

বিভাস। একতালা

মেঘের কোলে রোদ হেসেছে,
বাদল গেছে টুটি—
আজ আমাদের ছুটি ও ভাই,
আজ আমাদের ছুটি।
কী করি আজ ভেবে না পাই,
পথ হারিয়ে কোন্ বনে যাই,
কোন্ মাঠে যে ছুটে বেড়াই
সকল ছেলে জুটি!
কেয়া-পাতার নৌকো গড়ে
সাজিয়ে দেব ফুলে,
তালদিঘিতে ভাসিয়ে দেব—
চলবে দুলে দুলে।
রাখাল-ছেলের সঙ্গে ধেনু
চরাব আজ বাজিয়ে বেণু,
মাখব গায়ে ফুলের রেণু
চাঁপার বনে লুটি।
আজ আমাদের ছুটি ও ভাই,
আজ আমাদের ছুটি।

লক্ষেশ্বর। (ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া) ছেলেগুলো তো জ্বালালে! ওরে চোবে! ওরে গিরিধারীলাল! ধর্ তো ছোঁড়াগুলোকে ধর্ তো।

ছেলেরা। (দূরে ছুটিয়া গিয়া হাততালি দিয়া) ওরে লক্ষ্মীপেঁচা বেরিয়েছে রে, লক্ষ্মীপেঁচা বেরিয়েছে।

লক্ষেশ্বর। হনুমন্ত সিং, ওদের কান পাকড়ে আন্ তো; একটাকেও ছাড়িস নে।

একজন বালক। (চুপি চুপি পশ্চাৎ হইতে আসিয়া কান হইতে কলম টানিয়া লইয়া)—

কাক লেগেছে লক্ষ্মীপেঁচা
লেজে ঠোকর খেয়ে চেঁচা।

লক্ষেশ্বর। হতভাগা, লক্ষ্মীছাড়া সব, আজ একটাকেও আস্ত রাখব না!

ঠাকুরদাদার প্রবেশ

ঠাকুরদাদা। কী হয়েছে লখাদাদা ? মারমূর্তি কেন ?

লক্ষেশ্বর। আরে, দেখো-না ! সকালবেলা কানের কাছে চেঁচাতে আরম্ভ করেছে।

ঠাকুরদাদা। আজ যে শরতে ওদের ছুটি, একটু আমোদ করবে না ? গান গাইলেও তোমার কানে খোঁচা মারে ! হায় রে হায়, ভগবান তোমাকে এত শাস্তিও দিচ্ছেন !

লক্ষেশ্বর। গান গাবার বুঝি আর সময় নেই ! আমার হিসাব লিখতে ভুল হয়ে যায় যে। আজ আমার সমস্ত দিনটাই মাটি করলে।

ঠাকুরদাদা। তা ঠিক। হিসেব ভুলিয়ে দেবার ওস্তাদ ওরা। ওদের সাড়া পেলে আমার বয়সের হিসাবে প্রায় পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছরের গরমিল হয়ে যায়।— ওরে বাঁদরগুলো, আয় তো রে ! চল্ তোদের পঞ্চাননতলার মাঠটা ঘুরিয়ে আনি।— যাও দাদা, তোমার দপ্তর নিয়ে বোসো গে। আর হিসেবে ভুল হবে না।

ঠাকুরদাদাকে ঘিরিয়া ছেলেদের নৃত্য

প্রথম। হাঁ ঠাকুরদাদা, চলো।

দ্বিতীয়। আমাদের আজ গল্প বলতে হবে।

তৃতীয়। না, গল্প না, বটতলায় ব'সে আজ ঠাকুর্দার পাঁচালি হবে।

চতুর্থ। বটতলায় না, ঠাকুর্দা, আজ পারুলডাঙায় চলো।

ঠাকুরদাদা। চুপ, চুপ, চুপ ! অমন গোলমাল লাগাস যদি তো লখাদাদা আবার ছুটে আসবে।

লক্ষেশ্বরের পুনঃপ্রবেশ

লক্ষেশ্বর। কোন্ পোড়ারমুখো আমার কলম নিয়েছে রে !

[কলম ফেলিয়া দিয়া সকলের প্রস্থান

উপনন্দের প্রবেশ

লক্ষেশ্বর। কী রে, তোর প্রভু কিছু টাকা পাঠিয়ে দিলে ? অনেক পাওনা বাকি।

উপনন্দ। কাল রাত্রে আমার প্রভুর মৃত্যু হয়েছে।

লক্ষেশ্বর। মৃত্যু ! মৃত্যু হলে চলবে কেন ? আমার টাকাগুলোর কী হবে ?

উপনন্দ। তাঁর তো কিছুই নেই। যে বীণা বাজিয়ে উপার্জন ক'রে তোমার ঋণ শোধ করতেন সেই বীণাটি আছে মাত্র।

লক্ষেশ্বর। বীণাটি আছে মাত্র ! কী শুভসংবাদটাই দিলে !

উপনন্দ। আমি শুভসংবাদ দিতে আসি নি। আমি একদিন পথের ভিক্ষুক ছিলেম, তিনিই আমাকে আশ্রয় দিয়ে তাঁর বহু দুঃখের অন্নের ভাগে আমাকে মানুষ করেছেন। তোমার কাছে দাসত্ব করে আমি সেই মহাত্মার ঋণ শোধ করব।

লক্ষেশ্বর। বটে ! তাই বুঝি তাঁর অভাবে আমার বহু দুঃখের অন্নে ভাগ বসাবার মতলব করেছ। আমি তত বড়ো গর্দভ নই।— আচ্ছা, তুই কী করতে পারিস বল দেখি।

উপনন্দ। আমি চিত্রবিচিত্র করে পুঁথি নকল করতে পারি। তোমার অন্ন আমি চাই নে। আমি নিজে উপার্জন করে যা পারি খাব— তোমার ঋণও শোধ করব।

লক্ষেশ্বর। আমাদের বীনকারটিও যেমন নির্বোধ ছিল ছেলেটাকেও দেখছি ঠিক তেমনি করেই বানিয়ে গেছে। হতভাগা ছোঁড়াটা পরের দায় ঘাড়ে নিয়েই মরবে। এক-এক জনের ঐরকম মরাই স্বভাব !— আচ্ছা বেশ, মাসের ঠিক তিন তারিখের মধ্যেই নিয়মমত টাকা দিতে হবে। নইলে—

উপনন্দ। নইলে আবার কী ! আমাকে ভয় দেখাচ্ছ মিছে। আমার কী আছে যে তুমি আমার কিছু

করবে ? আমি আমার প্রভুকে স্মরণ করে ইচ্ছা করেই তোমার কাছে বন্ধন স্বীকার করেছি। আমাকে ভয় দেখিয়ো না বলছি।

লক্ষেশ্বর। না না, ভয় দেখাব না। তুমি লক্ষ্মীছেলে, সোনার চাঁদ ছেলে! টাকাটা ঠিকমত দিয়ো বাবা! নইলে আমার ঘরে দেবতা আছে, তার ভোগ কমিয়ে দিতে হবে— সেটাতে তোমারই পাপ হবে।

[উপনন্দের প্রস্থান

ঐ যে! আমার ছেলেটা এইখানে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি কোন্‌খানে টাকা পুঁতে র‍্যাখি ও নিশ্চয়ই সেই খোঁজে ফেরে। ওদেরই ভয়েই তো আমাকে এক সুরঙ্গ হতে আর-এক সুরঙ্গে টাকা বদল করে বেড়াতে হয়।— ধনপতি, এখানে কেন রে? তোর মতলবটা কী বল্ দেখি!

ধনপতি। ছেলেরা আজ সকলেই বেতসিনীর ধারে আমোদ করতে গেছে— আমাকে ছুটি দিলে আমিও যাই।

লক্ষেশ্বর। বেতসিনীর ধারে! ঐ রে, খবর পেয়েছে বুঝি! বেতসিনীর ধারেই তো আমি সেই গজমোতির কৌটো পুঁতে রেখেছি। (ধনপতির প্রতি) না, না, খবরদার বলছি, সে-সব না। চল্, শীঘ্র চল্, নামতা মুখস্থ করতে হবে।

ধনপতি। (নিশ্বাস ফেলিয়া) আজ এমন সুন্দর দিনটা!

লক্ষেশ্বর। দিন আবার সুন্দর কী রে! এইরকম বুদ্ধি মাথায় ঢুকলেই ছোঁড়াটা মরবে আর-কি! যা বলছি ঘরে যা।

[ধনপতির প্রস্থান

ভারি বিশ্রী দিন! আশ্বিনের এই রোদ্‌দুর দেখলে আমার সুদ্ধ মাথা খারাপ করে দেয়, কিছুতে কাজে মন দিতে পারি নে। মনে করছি মলয়দ্বীপে গিয়ে কিছু চন্দন জোগাড় করবার জন্যে বেরিয়ে পড়লে হয়। যাই হোক, সে পরে হবে, আপাতত বেতসিনীর ধারটায় একবার ঘুরে আসতে হচ্ছে। ছোঁড়াগুলো খবর পায় নি তো! ওদের যে ইঁদুরের স্বভাব! সব জিনিস খুঁড়ে বের করে ফেলে— কোনো জিনিসের মূল্য বোঝে না, কেবল কেটেকুটে ছারখার করতেই ভালোবাসে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বেতসিনীর তীর। বন

ঠাকুরদাদা ও বালকগণ

গান

বাউলের সুর

আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায়
লুকোচুরি খেলা।
নীল আকাশে কে ভাসালে
সাদা মেঘের ভেলা!

একজন বালক। ঠাকুর্দা, তুমি আমাদের দলে।

দ্বিতীয় বালক। না ঠাকুর্দা, সে হবে না, তুমি আমাদের দলে।

ঠাকুরদাদা। না ভাই, আমি ভাগাভাগির খেলায় নেই; সে-সব হয়ে-বয়ে গেছে। আমি সকল দলের মাঝখানে থাকব, কাউকে বাদ দিতে পারব না। এবার গানটা ধর্।—

আজ ভ্রমর ভোলে মধু খেতে
উড়ে বেড়ায় আলোয় মেতে,
আজ কিসের তরে নদীর চরে
চখাচখীর মেলা !

অন্য দল আসিয়া। ঠাকুর্দা, এই বুঝি ! আমাদের তুমি ডেকে আনলে না কেন ? তোমার সঙ্গে আড়ি ! জন্মের মতো আড়ি !

ঠাকুরদাদা। এতবড়ো দণ্ড ! নিজেরা দোষ করে আমাকে শাস্তি ! আমি তোদের ডেকে বের করব, না তোরা আমাকে ডেকে বাইরে টেনে আনবি ! না ভাই, আজ ঝগড়া না, গান ধর্।—

ওরে যাব না আজ ঘরে রে ভাই,
যাব না আজ ঘরে।
ওরে আকাশ ভেঙে বাহিরকে আজ
নেব রে লুঠ করে।
যেন জোয়ার-জলে ফেনার রাশি
বাতাসে আজ ছুটছে হাসি,
আজ বিনা কাজে বাজিয়ে বাঁশি
কাটবে সকল বেলা।

প্রথম বালক। ঠাকুর্দা, ঐ দেখো, ঐ দেখো, সন্ন্যাসী আসছে।

দ্বিতীয় বালক। বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে, আমরা সন্ন্যাসীকে নিয়ে খেলব। আমরা সব চেলা সাজব।

তৃতীয় বালক। আমরা ওঁর সঙ্গে বেরিয়ে যাব, কোন্ দেশে চলে যাব কেউ খুঁজেও পাবে না।

ঠাকুরদাদা। আরে চুপ, চুপ !

সকলে। সন্ন্যাসীঠাকুর ! সন্ন্যাসীঠাকুর !

ঠাকুরদাদা। আরে থাম্ থাম্। ঠাকুর রাগ করবে।

সন্ন্যাসীর প্রবেশ

বালকগণ। সন্ন্যাসীঠাকুর, তুমি কি আমাদের উপর রাগ করবে ? আজ আমরা সব তোমার চেলা হব।

সন্ন্যাসী। হা হা হা হা ! এ তো খুব ভালো কথা। তার পরে আবার তোমরা সব শিশু-সন্ন্যাসী সেজো, আমি তোমাদের বুড়ো চেলা সাজব। এ বেশ খেলা, এ চমৎকার খেলা।

ঠাকুরদাদা। প্রণাম হই, আপনি কে ?

সন্ন্যাসী। আমি ছাত্র।

ঠাকুরদাদা। আপনি ছাত্র ?

সন্ন্যাসী। হ্যাঁ, পুঁথিপত্র সব পোড়াবার জন্যে বের হয়েছি।

ঠাকুরদাদা। ও ঠাকুর, বুঝেছি। বিদ্যের বোঝা সমস্ত ঝেড়ে ফেলে দিব্যি একেবারে হালকা হয়ে সমুদ্রে পাড়ি দেবেন !

সন্ন্যাসী। চোখের পাতার উপরে পুঁথির পাতাগুলো আড়াল করে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেইগুলো খসিয়ে ফেলতে চাই।

ঠাকুরদাদা। বেশ বেশ ! আমাকেও একটু পায়ের ধুলো দেবেন। প্রভু, আপনার নাম বোধ করি শুনেছি— আপনি তো স্বামী অপূর্বানন্দ !

ছেলেরা। সন্ন্যাসীঠাকুর, ঠাকুরদাদা কী মিথ্যে বকছেন ! এমনি করে আমাদের ছুটি বয়ে যাবে।

সন্ন্যাসী। ঠিক বলেছ, বৎস, আমারও ছুটি ফুরিয়ে আসছে।

ছেলেরা। তোমার কত দিনের ছুটি?

সন্ন্যাসী। খুব অল্প দিনের। আমার গুরুমশায় তাড়া করে বেরিয়েছেন, তিনি বেশি দূরে নেই— এলেন বলে।

ছেলেরা। ও বাবা, তোমারও গুরুমশায়!

প্রথম বালক। সন্ন্যাসীঠাকুর, চলো আমাদের যেখানে হয় নিয়ে চলো। তোমার যেখানে খুশি।

ঠাকুরদাদা। আমিও পিছনে আছি ঠাকুর, আমাকেও ভুলো না।

সন্ন্যাসী। আহা, ও ছেলেটি কে? গাছের তলায় এমন দিনে পুঁথির মধ্যে ডুবে রয়েছে!

বালকগণ। উপনন্দ।

প্রথম বালক। ভাই উপনন্দ, এসো ভাই! আমরা আজ সন্ন্যাসীঠাকুরের চেলা সেজেছি, তুমিও চলো আমাদের সঙ্গে। তুমি হবে সর্দার চেলা।

উপনন্দ। না ভাই, আমার কাজ আছে।

ছেলেরা। কিচ্ছু কাজ নেই, তুমি এসো।

উপনন্দ। আমার পুঁথি নকল করতে অনেকখানি বাকি আছে।

ছেলেরা। সে বুঝি কাজ! ভারি তো কাজ!— ঠাকুর, তুমি ওকে বলো-না। ও আমাদের কথা শুনবে না। কিন্তু উপনন্দকে না হলে মজা হবে না।

সন্ন্যাসী। (পাশে বসিয়া) বাছা, তুমি কী কাজ করছ? আজ তো কাজের দিন না।

উপনন্দ। (সন্ন্যাসীর মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া, পায়ের ধুলা লইয়া) আজ ছুটির দিন। কিন্তু আমাব ঋণ আছে, শোধ করতে হবে, তাই আজ কাজ করছি।

ঠাকুরদাদা। উপনন্দ, জগতে তোমার আবার ঋণ কিসের ভাই?

উপনন্দ। ঠাকুরদাদা, আমার প্রভু মারা গিয়েছেন, তিনি লক্ষেশ্বরের কাছে ঋণী— সেই ঋণ আমি পুঁথি লিখে শোধ দেব।

ঠাকুরদাদা। হায় হায়, তোমার মতো কাঁচা বয়সের ছেলেকেও ঋণ শোধ করতে হয়! আর, এমন দিনেও ঋণশোধ!— ঠাকুর, আজ নতুন উত্তরে হাওয়ায় ও পারে কাশের বনে ঢেউ দিয়েছে, এ পারে ধানের খেতের সবুজে চোখ একেবারে ডুবিয়ে দিলে, শিউলিবন থেকে আকাশে আজ পুজোর গন্ধ ভরে উঠেছে, এরই মাঝখানে ঐ ছেলেটি আজ ঋণশোধের আয়োজনে বসে গেছে— এও কি চক্ষে দেখা যায়?

সন্ন্যাসী। বল কী, এর চেয়ে সুন্দর কি আর কিছু আছে! ঐ ছেলেটিই তো আজ সারদার বরপুত্র হয়ে তাঁর কোল উজ্জ্বল করে বসেছে। তিনি তাঁর আকাশের সমস্ত সোনার আলো দিয়ে ওকে বুকে চেপে ধরেছেন। আহা, আজ এই বালকের ঋণশোধের মতো এমন শুভ্র ফুলটি কি কোথাও ফুটেছে— চেয়ে দেখো তো! লেখো, লেখো বাবা, তুমি লেখো, আমি দেখি। তুমি পঙ্‌ক্তির পর পঙ্‌ক্তি লিখছ, আর ছুটির পর ছুটি পাচ্ছ। তোমার এত ছুটির আয়োজন আমরা তো পণ্ড করতে পারব না। দাও বাবা, একটা পুঁথি আমাকে দাও, আমিও লিখি। এমন দিনটা সার্থক হোক।

ঠাকুরদাদা। আছে আছে, চশমাটি ট্যাঁকে আছে, আমিও বসে যাই-না।

প্রথম বালক। ঠাকুর, আমরাও লিখব। সে বেশ মজা হবে।

দ্বিতীয় বালক। হাঁ হাঁ, সে বেশ মজা হবে।

উপনন্দ। বল কী ঠাকুর, তোমাদের যে ভারি কষ্ট হবে।

সন্ন্যাসী। সেইজন্যেই বসে গেছি। আজ আমরা সব মজা করে কষ্ট করব। কী বল বাবা-সকল? আজ একটা-কিছু কষ্ট না করলে আনন্দ হচ্ছে না।

সকলে। (হাততালি দিয়া) হাঁ হাঁ, নইলে মজা কিসের!

প্রথম বালক। দাও দাও, আমাকে একটা পুঁথি দাও।

দ্বিতীয় বালক। আমাকেও একটা দাও-না।

উপনন্দ। তোমরা পারবে তো ভাই?
প্রথম বালক। খুব পারব। কেন পারব না?
উপনন্দ। শ্রান্ত হবে না তো?
দ্বিতীয় বালক। কক্‌খনো না।
উপনন্দ। খুব ধরে ধরে লিখতে হবে কিন্তু।
প্রথম বালক। তা বুঝি পারি নে! আচ্ছা, তুমি দেখো।
উপনন্দ। ভুল থাকলে চলবে না।
দ্বিতীয় বালক। কিচ্ছু ভুল থাকবে না।
প্রথম বালক। এ বেশ মজা হচ্ছে। পুঁথি শেষ করব তবে ছাড়ব।
দ্বিতীয় বালক। নইলে ওঠা হবে না।
তৃতীয় বালক। কী বল ঠাকুর্দা, আজ লেখা শেষ করে দিয়ে তবে উপনন্দকে নিয়ে নৌকো-বাচ করতে যাব। বেশ মজা!

ঠাকুরদাদা।

গান

সিন্ধু ভৈরবী। তেওরা

আনন্দেরই সাগর থেকে এসেছে আজ বান
দাঁড় ধ'রে আজ বোস রে সবাই, টান্ রে সবাই টান্।
বোঝা যত বোঝাই করি
করব রে পার দুখের তরী,
ঢেউয়ের 'পরে ধরব পাড়ি—
যায় যদি যাক প্রাণ।
কে ডাকে রে পিছন হতে, কে করে রে মানা?
ভয়ের কথা কে বলে আজ, ভয় আছে সব জানা।
কোন্ শাপে কোন্ গ্রহের দোষে
সুখের ডাঙায় থাকব বসে?—
পালের রশি ধরব কষি,
চলব গেয়ে গান।

সন্ন্যাসী। ঠাকুর্দা!
ঠাকুরদাদা। (জিভ কাটিয়া) প্রভু, তুমিও আমাকে পরিহাস করবে?
সন্ন্যাসী। তুমি যে জগতে ঠাকুর্দা হয়েই জন্মগ্রহণ করেছ, ঈশ্বর সকলের সঙ্গেই তোমার হাসির সম্বন্ধ পাতিয়ে দিয়ে বসেছেন, সে তো তুমি লুকিয়ে রাখতে পারবে না! ছোটো ছোটো ছেলেগুলির কাছেও ধরা পড়েছ, আর আমাকেই ফাঁকি দেবে?
ঠাকুরদাদা। ছেলে-ভোলানোই যে আমার কাজ— তা ঠাকুর, তুমিও যদি ছেলের দলেই ভিড়ে যাও তা হলে কথা নেই। তা, কী আজ্ঞা কর!
সন্ন্যাসী। আমি বলছিলেম ঐ-যে গানটা গাইলে, ওটা আজ ঠিক হল না। দুঃখ নিয়ে ঐ অত্যন্ত টানাটানির কথাটা, ওটা আমার কানে ঠিক লাগছে না। দুঃখ তো জগৎ ছেয়েই আছে, কিন্তু চার দিকে চেয়ে দেখো-না— টানাটানির তো কোনো চেহারা দেখা যায় না। তাই এই শরৎ-প্রভাতের মান রাখবার জন্যে আমাকে আর-একটা গান গাইতে হল।
ঠাকুরদাদা। তোমাদের সঙ্গ এইজন্যই এত দামি; ভুল করলেও ভুলকে সার্থক করে তোল।

সন্ন্যাসী। গান

ললিত। আড়াঠেকা

তোমার সোনার থালায় সাজাব আজ
দুখের অশ্রুধার।
জননী গো, গাঁথব তোমার
গলার মুক্তাহার।
চন্দ্র সূর্য পায়ের কাছে
মালা হয়ে জড়িয়ে আছে,
তোমার বুকে শোভা পাবে আমার
দুখের অলংকার।
ধন ধান্য তোমারি ধন,
কী করবে তা কও।
দিতে চাও তো দিয়ো আমায়,
নিতে চাও তো লও।
দুঃখ আমার ঘরের জিনিস,
খাঁটি রতন তুই তো চিনিস—
তোর প্রসাদ দিয়ে তারে কিনিস
এ মোর অহংকার।

বাবা উপনন্দ, তোমার প্রভুর কী নাম ছিল?

উপনন্দ। সুরসেন।

সন্ন্যাসী। সুরসেন! বীণাচার্য?

উপনন্দ। হাঁ ঠাকুর, তুমি তাঁকে জানতে?

সন্ন্যাসী। আমি তাঁর বীণা শুনব আশা করেই এখানে এসেছিলেম।

উপনন্দ। তাঁর কি এত খ্যাতি ছিল?

ঠাকুরদাদা। তিনি কি এতবড়ো গুণী? তুমি তাঁর বাজনা শোনবার জন্যেই এ দেশে এসেছ? তবে তো আমরা তাঁকে চিনি নি!

সন্ন্যাসী। এখানকার রাজা?

ঠাকুরদাদা। এখানকার রাজা তো কোনোদিন তাঁকে ডাকেন নি, চক্ষেও দেখেন নি। তুমি তাঁর বীণা কোথায় শুনলে?

সন্ন্যাসী। তোমরা হয়তো জান না, বিজয়াদিত্য বলে একজন রাজা—

ঠাকুরদাদা। বল কী ঠাকুর! আমরা অত্যন্ত মূর্খ, গ্রাম্য, তাই বলে বিজয়াদিত্যের নাম জানব না এও কি হয়? তিনি যে আমাদের চক্রবর্তী সম্রাট।

সন্ন্যাসী। তা হবে। তা, সেই লোকটির সভায় একদিন সুরসেন বীণা বাজিয়েছিলেন, তখন শুনেছিলেম। রাজা তাঁকে রাজধানীতে রাখবার জন্যে অনেক চেষ্টা করেও কিছুতেই পারেন নি।

ঠাকুরদাদা। হায় হায়, এতবড়ো লোকের আমরা কোনো আদর করতে পারি নি!

সন্ন্যাসী। আদর কর নি তাতে তাঁকে কমাতে পার নি, আরো তাঁকে বড়ো করেছ। ভগবান তাঁকে নিজের সভায় ডেকে নিয়েছেন।— বাবা উপনন্দ, তোমার সঙ্গে তাঁর কী রকমে সম্বন্ধ হল?

উপনন্দ। ছোটো বয়সে আমার বাপ মারা গেলে আমি অন্য দেশ থেকে এই নগরে আশ্রয়ের জন্যে এসেছিলেম। সেদিন শ্রাবণমাসের সকালবেলায় আকাশ ভেঙে বৃষ্টি পড়ছিল, আমি লোকনাথের মন্দিরের এক কোণে দাঁড়াব বলে প্রবেশ করছিলেম। পুরোহিত আমাকে বোধ হয় নীচ জাত মনে

করে তাড়িয়ে দিলেন। সেদিন সকালে সেইখানে বসে আমার প্রভু বীণা বাজাচ্ছিলেন। তিনি তখনই মন্দির ছেড়ে এসে আমার গলা জড়িয়ে ধরলেন ; বললেন, এসো বাবা, আমার ঘরে এসো। সেই দিন থেকে ছেলের মতো তিনি আমাকে কাছে রেখে মানুষ করেছেন ; লোকে তাঁকে কত কথা বলেছে, তিনি কান দেন নি। আমি তাঁকে বলেছিলেম, প্রভু, আমাকে বীণা বাজাতে শেখান, আমি তা হলে কিছু কিছু উপার্জন করে আপনার হাতে দিতে পারব। তিনি বললেন, বাবা, এ বিদ্যা পেট ভরাবার নয় ; আমার আর-এক বিদ্যা জানা আছে, তাই তোমাকে শিখিয়ে দিচ্ছি। এই বলে আমাকে রঙ দিয়ে চিত্র করে পুঁথি লিখতে শিখিয়েছেন। যখন অত্যন্ত অচল হয়ে উঠত তখন তিনি মাঝে মাঝে বিদেশে গিয়ে বীণা বাজিয়ে টাকা নিয়ে আসতেন। এখানে তাঁকে সকলে পাগল বলেই জানত।

সন্ন্যাসী। সুরসেনের বীণা শুনতে পেলেম না, কিন্তু বাবা উপনন্দ, তোমার কল্যাণে তাঁর আর-এক বীণা শুনে নিলুম, এর সুর কোনোদিন ভুলব না।— বাবা, লেখো, লেখো।

ছেলেরা। ঐ রে, ঐ আসছে! ঐ রে লখা, ঐ রে লক্ষ্মীপেঁচা!

দৌড়

লক্ষেশ্বর। আ সর্বনাশ! যেখানটিতে আমি কৌটো পুঁতে রেখেছিলুম ঠিক সেই জায়গাটিতেই যে উপনন্দ বসে গেছে? আমি ভেবেছিলেম ছোঁড়াটা বোকা বুঝি, তাই পরের ঋণ শুধতে এসেছে! তা তো নয় দেখছি। পরের ঘাড় ভাঙাই ওর ব্যাবসা। আমার গজমোতির খবর পেয়েছে। একটা সন্ন্যাসীকেও কোথা থেকে জুটিয়ে এনেছে দেখছি। সন্ন্যাসী হাত চেলে জায়গাটা বের করে দেবে।— উপনন্দ!

উপনন্দ। কী?

লক্ষেশ্বর। ওঠ্, ওঠ্ ঐ জায়গা থেকে! এখানে কী করতে এসেছিস?

উপনন্দ। অমন করে চোখ রাঙাও কেন? এ কি তোমার জায়গা নাকি?

লক্ষেশ্বর। এটা আমার জায়গা কি না সে খোঁজে তোমার দরকার কী হে বাপু? ভারি সেয়ানা দেখছি! তুমি বড়ো ভালোমানুষটি সেজে আমার কাছে এসেছিলে! আমি বলি সত্যিই বুঝি প্রভুর ঋণ শোধ করবার জন্যেই ছোঁড়াটা আমার কাছে এসেছে— কেননা, সেটা রাজার আইনেও আছে—

উপনন্দ। আমি তো সেইজন্যেই এখানে পুঁথি লিখতে এসেছি।

লক্ষেশ্বর। সেইজন্যেই এসেছ বটে! আমার বয়স কত আন্দাজ করছ বাপু! আমি কি শিশু!

সন্ন্যাসী। কেন বাবা, তুমি কী সন্দেহ করছ?

লক্ষেশ্বর। কী সন্দেহ করছি! তুমি তা কিছু জান না! বড়ো সাধু! ভণ্ড সন্ন্যাসী কোথাকার!

ঠাকুরদাদা। আরে, কী বলিস লখা, আমার ঠাকুরকে অপমান!

উপনন্দ। এই রঙবাটা নোড়া দিয়ে তোমার মুখ গুঁড়িয়ে দেব-না! টাকা হয়েছে বলে অহংকার! কাকে কী বলতে হয় জান না!

সন্ন্যাসীর পশ্চাতে লক্ষেশ্বরের লুক্কায়ন

সন্ন্যাসী। আরে, কর কী ঠাকুরদাদা! কর কী বাবা! লক্ষেশ্বর তোমাদের চেয়ে ঢের বেশি মানুষ চেনে। যেমনি দেখেছে অমনি ধরা পড়ে গেছে! ভণ্ড সন্ন্যাসী যাকে বলে! বাবা লক্ষেশ্বর, এত দেশের এত মানুষ ভুলিয়ে এলেম, তোমাকে ভোলাতে পারলেম না।

লক্ষেশ্বর। না, ঠিক ঠাওরাতে পারছি নে। হয়তো ভালো করি নি। আবার শাপ দেবে কি কী করবে! তিনখানা জাহাজ এখনো সমুদ্রে আছে। (পায়ের ধুলা লইয়া) প্রণাম হই ঠাকুর! হঠাৎ চিনতে পারি নি। বিরূপাক্ষের মন্দিরে আমাদের ঐ বিকটানন্দ বলে একটা সন্ন্যাসী আছে, আমি বলি সেই ভণ্ডটাই বুঝি— ঠাকুর্দা, তুমি এক কাজ করো। সন্ন্যাসীঠাকুরকে আমার ঘরে নিয়ে যাও ; আমি ওঁকে কিছু ভিক্ষে দিয়ে দেব। আমি চললেম বলে। তোমরা এগোও।

ঠাকুরদাদা। তোমার বড়ো দয়া! তোমার ঘরের এক মুঠো চাল নেবার জন্যে ঠাকুর সাত সিন্ধু পেরিয়ে এসেছেন!

সন্ন্যাসী। বল কী ঠাকুর্দা! এক মুঠো চাল যেখানে দুর্লভ সেখান থেকে সেটি নিতে হবে বৈকি! বাবা লক্ষেশ্বর, চলো তোমার ঘরে।

লক্ষেশ্বর। আমি পরে যাচ্ছি, তোমরা এগোও। উপনন্দ, তুমি আগে ওঠো। ওঠো, শীঘ্র ওঠো বলছি, তোলো তোমার পুঁথিপত্র।

উপনন্দ। আচ্ছা, তবে উঠলেম, কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার কোনো সম্বন্ধ রইল না।

লক্ষেশ্বর। না থাকলেই যে বাঁচি বাবা! আমার সম্বন্ধে কাজ কী! এতদিন তো আমার বেশ চলে যাচ্ছিল।

উপনন্দ। আমি যে ঋণ স্বীকার করেছিলেম তোমার কাছে এই অপমান সহ্য করেই তার থেকে মুক্তি গ্রহণ করলেম। বাস্, চুকে গেল। [প্রস্থান

লক্ষেশ্বর। ওরে! সব ঘোড়সওয়ার আসে কোথা থেকে! রাজা আমার গজমোতির খবর পেলে নাকি! এর চেয়ে উপনন্দ যে ছিল ভালো! এখন কী করি! (সন্ন্যাসীকে ধরিয়া) ঠাকুর, তোমার পায়ে ধরি, তুমি ঠিক এইখানটিতে বোসো— এই-যে এইখানে— আর-একটু বাঁ দিকে সরে এসো— এই হয়েছে! খুব চেপে বোসো। রাজাই আসুক আর সম্রাটই আসুক তুমি কোনোমতেই এখান থেকে উঠো না। তা হলে আমি তোমাকে খুশি করে দেব।

ঠাকুরদাদা। আরে, লখা করে কী! হঠাৎ খেপে গেল নাকি!

লক্ষেশ্বর। ঠাকুর, আমি তবে একটু আড়ালে যাই। আমাকে দেখলেই রাজার টাকার কথা মনে পড়ে যায়। শত্রুরা লাগিয়েছে আমি সব টাকা পুঁতে রেখেছি—শুনে অবধি রাজা যে কত জায়গায় কূপ খুঁড়তে আরম্ভ করেছেন তার ঠিকানা নেই। জিজ্ঞাসা করলে বলেন, প্রজাদের জলদান করছেন। কোন্ দিন আমার ভিটেবাড়ির ভিত কেটে জলদানের হুকুম হবে, সেই ভয়ে রাত্রে ঘুমুতে পারি নে। [প্রস্থান

রাজদূতের প্রবেশ

রাজদূত। সন্ন্যাসীঠাকুর, প্রণাম হই। আপনিই তো অপূর্বানন্দ?

সন্ন্যাসী। কেউ কেউ আমাকে তাই বলেই তো জানে।

রাজদূত। আপনার অসামান্য ক্ষমতার কথা চার দিকে রাষ্ট্র হয়ে গেছে। আমাদের মহারাজ সোমপাল আপনার সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছা করেন।

সন্ন্যাসী। যখনই আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন তখনই আমাকে দেখতে পাবেন।

রাজদূত। আপনি তা হলে যদি একবার—

সন্ন্যাসী। আমি একজনের কাছে প্রতিশ্রুত আছি এইখানেই আমি অচল হয়ে বসে থাকব। অতএব আমার মতো অকিঞ্চন অকর্মণ্যকেও তোমার রাজার যদি বিশেষ প্রয়োজন থাকে তা হলে তাঁকে এইখানেই আসতে হবে।

রাজদূত। রাজোদ্যান অতি নিকটেই, ঐখানেই তিনি অপেক্ষা করছেন—

সন্ন্যাসী। যদি নিকটেই হয় তবে তো তাঁর আসতে কোনো কষ্ট হবে না।

রাজদূত। যে আজ্ঞা, তবে ঠাকুরের ইচ্ছা তাঁকে জানাই গে।

[প্রস্থান

ঠাকুরদাদা। প্রভু, এখানে রাজসমাগমের সম্ভাবনা হয়ে এল— আমি তবে বিদায় হই।

সন্ন্যাসী। ঠাকুর্দা, তুমি আমার শিশু-বন্ধুগুলিকে নিয়ে ততক্ষণ আসর জমিয়ে রাখো, আমি বেশি বিলম্ব করব না।

ঠাকুরদাদা। রাজার উৎপাতই ঘটুক আর অরাজকতাই হোক, আমি প্রভুর চরণ ছাড়ছি নে।

[প্রস্থান

লক্ষেশ্বরের প্রবেশ

লক্ষেশ্বর। ঠাকুর, তুমিই অপূর্বানন্দ ! তবে তো বড়ো অপরাধ হয়ে গেছে। আমাকে মাপ করতে হবে।

সন্ন্যাসী। তুমি আমাকে ভণ্ড তপস্বী বলেছ এই যদি তোমার অপরাধ হয় আমি তোমাকে মাপ করলেম।

লক্ষেশ্বর। বাবাঠাকুর, শুধু মাপ করতে তো সকলেই পারে, সে ফাঁকিতে আমার কী হবে ! আমাকে একটা-কিছু ভালোরকম বর দিতে হচ্ছে। যখন দেখা পেয়েছি তখন শুধু-হাতে ফিরছি নে।

সন্ন্যাসী। কী বর চাই ?

লক্ষেশ্বর। লোকে যতটা মনে করে ততটা নয়, তবে কিনা আমার অল্পস্বল্প কিছু জমেছে— সে অতি যৎসামান্য— তাতে আমার মনের আকাঙ্ক্ষা তো মিটছে না। শরৎকাল এসেছে, আর ঘরে বসে থাকতে পারছি নে ; এখন বাণিজ্যে বেরোতে হবে। কোথায় গেলে সুবিধা হতে পারে আমাকে সেই সন্ধানটি বলে দিতে হবে ; আমাকে আর যেন ঘুরে বেড়াতে না হয়।

সন্ন্যাসী। আমিও তো সেই সন্ধানেই আছি।

লক্ষেশ্বর। বল কী ঠাকুর !

সন্ন্যাসী। আমি সত্যই বলছি।

লক্ষেশ্বর। ওঃ, তবে সেই কথাটাই বলো। বাবা, তোমরা আমাদের চেয়েও সেয়ানা।

সন্ন্যাসী। তার সন্দেহ আছে !

লক্ষেশ্বর। (কাছে ঘেঁষিয়া বসিয়া মৃদুস্বরে) সন্ধান কিছু পেয়েছ ?

সন্ন্যাসী। কিছু পেয়েছি বৈকি। নইলে এমন করে ঘুরে বেড়াব কেন ?

লক্ষেশ্বর। (সন্ন্যাসীর পা চাপিয়া ধরিয়া) বাবাঠাকুর, আর-একটু খোলসা করে বলো। তোমার পা ছুঁয়ে বলছি আমিও তোমাকে একেবারে ফাঁকি দেব না। কী খুঁজব বলো তো, আমি কাউকে বলব না।

সন্ন্যাসী। তবে শোনো। লক্ষ্মী যে সোনার পদ্মটির উপরে পা দুখানি রাখেন আমি সেই পদ্মটিব খোঁজে আছি।

লক্ষেশ্বর। ও বাবা, সে তো কম কথা নয় ! তা হলে যে একেবারে সকল ল্যাঠাই চোকে। ঠাকুর, ভেবে ভেবে এ তো তুমি আচ্ছা বুদ্ধি ঠাওরেছ ! কোনো গতিকে পদ্মটি যদি জোগাড় করে আন তা হলে লক্ষ্মীকে আর তোমার খুঁজতে হবে না, লক্ষ্মীই তোমাকে খুঁজে বেড়াবেন ! এ নইলে আমাদের চঞ্চলা ঠাকরুনটিকে তো জব্দ করবার জো নেই। তোমার কাছে তাঁর পা দুখানিই বাঁধা থাকবে। তা, তুমি সন্ন্যাসীমানুষ, একলা পেরে উঠবে ? এতে তো খরচপত্র আছে। এক কাজ করো-না বাবা, আমরা ভাগে ব্যাবসা করি।

সন্ন্যাসী। তা হলে তোমাকে যে সন্ন্যাসী হতে হবে। বহুকাল সোনা ছুঁতেই পাবে না।

লক্ষেশ্বর। সে যে শক্ত কথা।

সন্ন্যাসী। সব ব্যাবসা যদি ছাড়তে পার তবেই এ ব্যাবসা চলবে।

লক্ষেশ্বর। শেষকালে দু কূল যাবে না তো ? যদি একেবারে ফাঁকিতে না পড়ি তা হলে তোমার তলপি বয়ে তোমার পিছন পিছন চলতে রাজি আছি। সত্যি বলছি ঠাকুর, কারো কথায় বড়ো সহজে বিশ্বাস করি নে ; কিন্তু তোমার কথাটা কেমন মনে লাগছে। আচ্ছা ! আচ্ছা রাজি ! তোমার চেলাই হব !— ঐ রে, রাজা আসছে ! আমি তবে একটু আড়ালে দাঁড়াই গে।

বন্দীগণের গান

মিশ্র কানাড়া। ঝাঁপতাল

রাজরাজেন্দ্র জয় জয়তু জয় হে !
ব্যাপ্ত পরতাপ তব বিশ্বময় হে !

দুষ্টদলদলন তব দণ্ড ভয়কারী,
শত্রুজনদর্পহর দীপ্ত তরবারি,
সংকটশরণ্য তুমি দৈন্যদুখহারী—
মুক্ত-অবরোধ তব অভ্যুদয় হে !

রাজার প্রবেশ

রাজা। প্রণাম হই ঠাকুর।

সন্ন্যাসী। জয় হোক ! কী বাসনা তোমার ?

রাজা। সে কথা নিশ্চয় তোমার অগোচর নেই। আমি অখণ্ড রাজ্যের অধীশ্বর হতে চাই প্রভু !

সন্ন্যাসী। তা হলে গোড়া থেকে শুরু করো। তোমার খণ্ডরাজ্যটি ছেড়ে দাও।

রাজা। পরিহাস নয় ঠাকুর ! বিজয়াদিত্যের প্রতাপ আমার অসহ্য বোধ হয়, আমি তার সামন্ত হয়ে থাকতে পারব না।

সন্ন্যাসী। রাজন্, তবে সত্য কথা বলি, আমার পক্ষেও সে ব্যক্তি অসহ্য হয়ে উঠেছে।

রাজা। বল কী ঠাকুর ?

সন্ন্যাসী। এক বর্ণও মিথ্যা বলছি নে। তাকে বশ করবার জন্যেই আমি মন্ত্রসাধনা করছি।

রাজা। তাই তুমি সন্ন্যাসী হয়েছ ?

সন্ন্যাসী। তাই বটে।

রাজা। মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ হবে ?

সন্ন্যাসী। অসম্ভব নয়।

রাজা। তা হলে ঠাকুর, আমার কথা মনে রেখো। তুমি যা চাও আমি তোমাকে দেব। যদি সে বশ মানে তা হলে আমার কাছে যদি—

সন্ন্যাসী। তা বেশ, সেই চক্রবর্তী-সম্রাটকে আমি তোমার সভায় ধরে আনব।

রাজা। কিন্তু, বিলম্ব করতে ইচ্ছা করছে না। শরৎকাল এসেছে— সকালবেলা উঠে বেতসিনীর জলের উপর যখন আশ্বিনের রৌদ্র পড়ে তখন আমার সৈন্যসামন্ত নিয়ে দিগ্‌বিজয়ে বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। যদি আশীর্বাদ কর তা হলে—

সন্ন্যাসী। কোনো প্রয়োজন নেই ; শরৎকালেই আমি তাকে তোমার কাছে সমর্পণ করব, এই তো উপযুক্ত কাল। তুমি তাকে নিয়ে কী করবে ?

রাজা। আমার একটা কোনো কাজে লাগিয়ে দেব— তার অহংকার দূর করতে হবে।

সন্ন্যাসী। এ তো খুব ভালো কথা। যদি তার অহংকার চূর্ণ করতে পার তা হলে ভারি খুশি হব।

রাজা। ঠাকুর, চলো আমার রাজভবনে।

সন্ন্যাসী। সেটি পারছি নে। আমার দলের লোকদের অপেক্ষায় আছি। তুমি যাও বাবা ! আমার জন্যে কিচ্ছু ভেবো না। তোমার মনের বাসনা যে আমাকে ব্যক্ত করে বলেছ এতে আমার ভারি আনন্দ হচ্ছে। বিজয়াদিত্যের যে এত শত্রু জমে উঠেছে তা তো আমি জানতেম না।

রাজা। তবে বিদায় হই। প্রণাম !

[প্রস্থান

(পুনশ্চ ফিরিয়া আসিয়া) আচ্ছা ঠাকুর, তুমি তো বিজয়াদিত্যকে জান, সত্য করে বলো দেখি, লোকে তার সম্বন্ধে যতটা রটনা করে ততটা কি সত্য ?

সন্ন্যাসী। কিছুমাত্র না। লোকে তাকে একটা মস্ত রাজা বলে মনে করে— কিন্তু সে নিতান্তই সাধারণ মানুষের মতো। তার সাজসজ্জা দেখেই লোকে ভুলে গেছে।

রাজা। বল কী ঠাকুর, হা হা হা হা ! আমিও তাই ঠাউরেছিলেম। অ্যাঁ ! নিতান্তই সাধারণ মানুষ !

সন্ন্যাসী। আমার ইচ্ছে আছে আমি তাকে সেইটে আচ্ছা করে বুঝিয়ে দেব। সে যে রাজার

পোশাক প'রে ফাঁকি দিয়ে অন্য পাঁচ জনের চেয়ে নিজেকে মস্ত একটা-কিছু বলে মনে করে আমি তার সেই ভুলটা একেবারে ঘুচিয়ে দেব।

রাজা। তাই দিয়ো ঠাকুর, তাই দিয়ো।

সন্ন্যাসী। তার ভণ্ডামি আমার কাছে তো কিছু ঢাকা নেই। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রথম বৃষ্টি হলে পর বীজ বোনবার আগে তার রাজ্যে একটা মহোৎসব হয়। সেদিন সব চাষি গৃহস্থেরা বনে গিয়ে সীতার পূজা ক'রে সকলে মিলে বনভোজন করে। সেই চাষাদের সঙ্গে একসঙ্গে পাত পেড়ে খাবার জন্যে বিজয়াদিত্যের প্রাণটা কাঁদে। রাজাই হোক আর যাই হোক, ভিতরে যে'চাষাটা আছে সেটা যাবে কোথায়? সেবারে তো সে রাজবেশ ছেড়ে ওদের সঙ্গে বসে খাবার জন্যে খেপে উঠেছিল। কিন্তু ওর মন্ত্রী আর চাকর-বাকরদের মনে রাজাগিরির উচ্চ ভাব ওর চেয়ে অনেক বেশি আছে। তারা হাতে পায়ে ধরে বললে, এ কখনোই হতে পারে না। অর্থাৎ, তাদের এই ভয়টা আছে যে, ঐ ছদ্মবেশটা খুলে ফেললেই আসল মানুটা ধরা পড়ে যাবে। এইজন্যে বিজয়াদিত্যকে নিয়ে তারা বড়ো ভয়ে ভয়েই থাকে— কোন্‌দিন তার সমস্ত ফাঁস হয়ে যায় এই এক বিষম ভাবনা।

রাজা। ঠাকুর, তুমি সব ফাঁস করে দাও। ও যে মিথ্যে রাজা, ভুয়ো রাজা, সে যেন আর ছাপা না থাকে। ওর বড়ো অহংকার হয়েছে।

সন্ন্যাসী। আমি তো সেই চেষ্টাতেই আছি। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, যতক্ষণ না আমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় আমি সহজে ছাড়ব না।

রাজা। প্রণাম।

[প্রস্থান

উপনন্দের প্রবেশ

উপনন্দ। ঠাকুর, আমার মনের ভার তো গেল না।

সন্ন্যাসী। কী হল বাবা?

উপনন্দ। মনে করেছিলেম, লক্ষেশ্বর যখন আমাকে অপমান করেছে তখন ওর কাছে আমি আর ঋণ স্বীকার করব না। তাই পুঁথিপত্র নিয়ে ঘরে ফিরে গিয়েছিলেম। সেখানে আমার প্রভুর বীণাটি নিয়ে তার ধুলো ঝাড়তে গিয়ে তারগুলি বেজে উঠল— অমনি আমার মনটার ভিতর যে কেমন হল সে আমি বলতে পারি নে। সেই বীণার কাছে লুটিয়ে পড়ে বুক ফেটে আমার চোখের জল পড়তে লাগল। মনে হল আমার প্রভুর কাছে আমি অপরাধ করেছি। লক্ষেশ্বরের কাছে আমার প্রভু ঋণী হয়ে রইলেন, আর আমি নিশ্চিন্ত হয়ে আছি! ঠাকুর, এ তো আমার কোনোমতেই সহ্য হচ্ছে না। ইচ্ছা করছে, আমার প্রভুর জন্যে আজ আমি অসাধ্য কিছু-একটা করি। আমি তোমাকে মিথ্যা বলছি নে, তাঁর ঋণ শোধ করতে যদি আজ প্রাণ দিতে পারি তা হলে আমার খুব আনন্দ হবে— মনে হবে, আজকের এই সুন্দর শরতের দিন আমার পক্ষে সার্থক হল।

সন্ন্যাসী। বাবা, তুমি যা বলছ সত্যই বলছ।

উপনন্দ। ঠাকুর, তুমি তো অনেক দেশ ঘুরেছ, আমার মতো অকর্মণ্যকেও হাজার কার্ষাপণ দিয়ে কিনতে পারেন এমন মহাত্মা কেউ আছেন? তা হলেই ঋণটা শোধ হয়ে যায়। এ নগরে যদি চেষ্টা করি তা হলে বালক বলে, ছোটো জাত বলে, সকলে আমাকে খুব কম দাম দেবে।

সন্ন্যাসী। না বাবা, তোমার মূল্য এখানে কেউ বুঝবে না। আমি ভাবছি কী, যিনি তোমার প্রভুকে অত্যন্ত আদর করতেন সেই বিজয়াদিত্য বলে রাজাটার কাছে গেলে কেমন হয়।

উপনন্দ। বিজয়াদিত্য? তিনি যে আমাদের সম্রাট!

সন্ন্যাসী। তাই নাকি?

উপনন্দ। তুমি জান না বুঝি?

সন্ন্যাসী। তা, হবে। নাহয় তাই হল।

উপনন্দ। আমার মতো ছেলেকে তিনি কি দাম দিয়ে কিনবেন?

সন্ন্যাসী। বাবা, বিনামূল্যে কেনবার মতো ক্ষমতা তাঁর যদি থাকে তা হলে বিনা মূল্যেই কিনবেন। কিন্তু তোমার ঋণটুকু শোধ করে না দিতে পারলে তাঁর এত ঋণ জমবে যে তাঁর রাজভাণ্ডার লজ্জিত হবে, এ আমি তোমাকে সত্যই বলছি।

উপনন্দ। ঠাকুর, এও কি সম্ভব?

সন্ন্যাসী। বাবা, জগতে কেবল কি এক লক্ষেশ্বরই সম্ভব? তার চেয়ে বড়ো সম্ভাবনা কি আর-কিছুই নেই?

উপনন্দ। আচ্ছা, যদি সে সম্ভব হয় তো হবে, কিন্তু আমি ততদিন পুঁথিগুলি নকল করে কিছু কিছু শোধ করতে থাকি; নইলে আমার মনে বড়ো গ্লানি হচ্ছে।

সন্ন্যাসী। ঠিক কথা বলেছ বাবা। বোঝা মাথায় তুলে নাও, কারও প্রত্যাশায় ফেলে রেখে সময় বইয়ে দিয়ো না।

উপনন্দ। তা হলে চললেম ঠাকুর। তোমার কথা শুনে আমি মনে কত যে বল পেয়েছি সে আমি বলে উঠতে পারি নে।

সন্ন্যাসী। তোমাকে দেখে আমিও যে কত বললাভ করেছি সে কথা কেমন করে বুঝবে? এক কাজ করো বাবা, আমার খেলার দলটি ভেঙে গিয়েছে, আবার তাদের সকলকে ডেকে নিয়ে এসো গে।

উপনন্দ। তা আনছি। কিন্তু ঠাকুর, তোমার দলটিকে আমার পুঁথি নকল করার কাজে লাগালে চলবে না। তারা আমার সব নষ্ট করে দেয়; এত খুশি হয়ে করে যে বারণ করতেও পারি নে।

[প্রস্থান

লক্ষেশ্বরের প্রবেশ

লক্ষেশ্বর। ঠাকুর, অনেক ভেবে দেখলেম— পারব না। তোমার চেলা হওয়া আমার কর্ম নয়। যা পেয়েছি তা অনেক দুঃখে পেয়েছি, তোমার এক কথায় সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে শেষকালে হায় হায় করে মরব! আমার বেশি আশায় কাজ নেই।

সন্ন্যাসী। সে কথাটা বুঝলেই হল।

লক্ষেশ্বর। ঠাকুর, এবার একটুখানি উঠতে হচ্ছে।

সন্ন্যাসী। (উঠিয়া) তা হলে তোমার কাছ থেকে ছুটি পাওয়া গেল!

লক্ষেশ্বর। (মাটি ও শুষ্কপত্র সরাইয়া কৌটা বাহির করিয়া) ঠাকুর, এইটুকুর জন্যে আজ সকাল থেকে সমস্ত হিসাব-কিতাব ফেলে রেখে এই জায়গাটার চার দিকে ভূতের মতো ঘুরে বেড়িয়েছি। এই যে গজমোতি, এ আমি তোমাকেই আজ প্রথম দেখালেম; আজ পর্যন্ত কেবলই এটাকে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়িয়েছি; তোমাকে দেখাতে পেরে মনটা তবু একটু হালকা হল। (সন্ন্যাসীর হাতের কাছে অগ্রসর করিয়াই, তাড়াতাড়ি ফিরাইয়া লইয়া)— না, হল না! তোমাকে যে এত বিশ্বাস করলেম, তবু এ জিনিস একটিবার তোমার হাতে তুলে দিই এমন শক্তি আমার নেই। এই যে আলোতে এটাকে তুলে ধরেছি, আমার বুকের ভিতর যেন গুর্‌গুর্ করছে। আচ্ছা ঠাকুর, বিজয়াদিত্য কেমন লোক বলো তো। তাকে বিক্রি করতে গেলে সে তো দাম না দিয়ে এটা আমার কাছ থেকে জোর করে কেড়ে নেবে না? আমার ঐ এক মুশকিল হয়েছে। আমি এটা বেচতেও পারছি নে, রাখতেও পারছি নে, এর জন্যে আমার রাত্রে ঘুম হয় না। বিজয়াদিত্যকে তুমি বিশ্বাস কর?

সন্ন্যাসী। সব সময়েই কি তাকে বিশ্বাস করা যায়?

লক্ষেশ্বর। সেই তো মুশকিলের কথা। আমি দেখছি এটা মাটিতেই পোঁতা থাকবে। হঠাৎ কোন্‌দিন মরে যাব, কেউ সন্ধানও পাবে না।

সন্ন্যাসী। রাজাও না, সম্রাটও না, ঐ মাটিই সব ফাঁকি দিয়ে নেবে। তোমাকেও নেবে, আমাকেও নেবে।

লক্ষেশ্বর। তা নিক গে! কিন্তু, আমার কেবলই ভাবনা হয়, আমি মরে গেলে পর কোথা থেকে কে এসে হঠাৎ হয়তো খুঁড়তে খুঁড়তে ওটা পেয়ে যাবে। যাই হোক ঠাকুর, কিন্তু তোমার মুখে ঐ সোনার পদ্মর কথাটা আমার কাছে বড়ো ভালো লাগল। আমার কেমন মনে হচ্ছে, ওটা তুমি হয়তো খুঁজে বের করতে পারবে। কিন্তু তা হোক গে, আমি তোমার চেলা হতে পারব না। প্রণাম।
[প্রস্থান

ঠাকুরদাদার প্রবেশ

সন্ন্যাসী। ঠাকুর্দা, আজ অনেক দিন পরে একটি কথা খুব স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি— সেটি তোমাকে খুলে না বলে থাকতে পারছি নে।

ঠাকুরদাদা। আমার প্রতি ঠাকুরের বড়ো দয়া।

সন্ন্যাসী। আমি অনেক দিন ভেবেছি জগৎ এমন আশ্চর্য সুন্দর কেন। কিছুই ভেবে পাই নি। আজ স্পষ্ট প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি— জগৎ আনন্দের ঋণ শোধ করছে। বড়ো সহজে করছে না, নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে সমস্ত ত্যাগ করে করছে। সেইজন্যেই ধানের খেত এমন সবুজ ঐশ্বর্যে ভরে উঠেছে, বেতসিনীর নির্মল জল এমন কানায় কানায় পরিপূর্ণ! কোথাও সাধনার এতটুকু বিশ্রাম নেই, সেইজন্যেই এত সৌন্দর্য!

ঠাকুরদাদা। এক দিকে অনন্ত ভাণ্ডার থেকে তিনি কেবলই ঢেলে দিচ্ছেন, আর-এক দিকে কঠিন দুঃখে তারই শোধ চলছে। সেই দুঃখের আনন্দ এবং সৌন্দর্য যে কী সে কথা তোমার কাছে পূর্বেই শুনেছি। প্রভু, কেবল এই দুঃখের জোরেই পাওয়ার সঙ্গে দেওয়ার ওজন বেশ সমান থেকে যাচ্ছে, মিলনটি এমন সুন্দর হয়ে উঠেছে।

সন্ন্যাসী। ঠাকুর্দা, যেখানে আলস্য, যেখানে কৃপণতা, যেখানেই ঋণশোধে ঢিল পড়ে যাচ্ছে, সেইখানেই সমস্ত কুশ্রী, সমস্তই অব্যবস্থা।

ঠাকুরদাদা। সেইখানেই যে এক পক্ষে কম পড়ে যায়, অন্য পক্ষের সঙ্গে মিলন পুরো হতে পায় না।

সন্ন্যাসী। লক্ষ্মী যখন মানবের মর্তলোকে আসেন তখন দুঃখিনী হয়েই আসেন ; তাঁর সেই সাধনার তপস্বিনীবেশেই ভগবান মুগ্ধ হয়ে আছেন ; শত দুঃখেরই দলে তাঁর সোনার পদ্ম সংসারে ফুটে উঠেছে, সে খবরটি আজ ঐ উপনন্দের কাছ থেকে পেয়েছি।

লক্ষেশ্বরের প্রবেশ

লক্ষেশ্বর। তোমরা চুপি চুপি দুটিতে কী পরামর্শ করছ?

সন্ন্যাসী। আমাদের সেই সোনার পদ্মের পরামর্শ।

লক্ষেশ্বর। অ্যাঁ! এরই মধ্যে ঠাকুর্দার কাছে সমস্ত ফাঁস করে বসে আছ? বাবা, তুমি এই ব্যাবসাবুদ্ধি নিয়ে সোনার পদ্মর আমদানি করবে? তবেই হয়েছে! তুমি যেই মনে করলে আমি রাজি হলেম না অমনি তাড়াতাড়ি অন্য অংশীদার খুঁজতে লেগে গেছ! কিন্তু, এ-সব কি ঠাকুর্দার কর্ম? ওঁর পুঁজিই বা কী?

সন্ন্যাসী। তুমি খবর পাও নি। কিন্তু, একেবারে পুঁজি নেই তা নয়। ভিতরে ভিতরে জমিয়েছে।

লক্ষেশ্বর। (ঠাকুরদাদার পিঠ চাপড়াইয়া) সত্যি নাকি ঠাকুর্দা? বড়ো তো ফাঁকি দিয়ে আসছ। তোমাকে তো চিনতেম না। লোকে আমাকেই সন্দেহ করে, তোমাকে তো স্বয়ং রাজাও সন্দেহ করে না— তা হলে এত দিনে খানাতল্লাশি পড়ে যেত। আমি তো, দাদা, গুপ্তচরের ভয়ে ঘরে চাকর-বাকর রাখি নে।

ঠাকুরদাদা। তবে যে আজ সকালে ছেলে তাড়াবার বেলায় ঊর্ধ্বস্বরে চোবে-তেওয়ারি-গিরধারিলালকে হাঁক পাড়ছিলে?

লক্ষেশ্বর। যখন নিশ্চয় জানি হাঁক পাড়লেও কেউ আসবে না, তখন উর্ধ্বস্বরের জোরেই আসর গরম করে তুলতে হয়। কিন্তু, বলে তো ভালো করলেম না। মানুষের সঙ্গে কথা কবার তো বিপদই ঐ। সেইজন্যেই কারও কাছে ঘেঁষি নে। দেখো দাদা, ফাঁস করে দিয়ো না।

ঠাকুরদাদা। ভয় নেই তোমার।

লক্ষেশ্বর। ভয় না থাকলেও তবু ভয় ঘোচে কই ? যা হোক ঠাকুর, একা ঠাকুর্দাকে নিয়ে অতবড়ো কাজটা চলবে না। আমরা নাহয় তিন জনেই অংশীদার হব। ঠাকুর্দা আমাকে ফাঁকি দিয়ে জিতে নেবে সেটি হচ্ছে না। আচ্ছা ঠাকুর, তবে আমিও তোমার চেলা হতে রাজি হলেম।— ঐ-যে ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ আসছে। ঐ দেখছ না দূরে ? আকাশে যে ধুলো উড়িয়ে দিয়েছে ! সবাই খবর পেয়েছে স্বামী অপূর্বানন্দ এসেছেন। এবার পায়ের ধুলো নিয়ে তোমার পায়ের তেলো হাঁটু পর্যন্ত খইয়ে দেবে। যাই হোক, তুমি যেরকম আলগা মানুষ দেখছি, সেই কথাটা আর কারও কাছে ফাঁস কোরো না— অংশীদার আর বাড়িয়ো না। কিন্তু ঠাকুর্দা, লাভ-লোকসানের ঝুঁকি তোমাকেও নিতে হবে ; অংশীদার হলেই হয় না ; সব কথা ভেবে দেখো।

[প্রস্থান

সন্ন্যাসী। ঠাকুর্দা, আর তো দেরি করলে চলবে না। লোকজন জুটতে আরম্ভ করেছে, 'পুত্র দাও' 'ধন দাও' করে আমাকে একেবারে মাটি করে দেবে। ছেলেগুলিকে এইবেলা ডাকো। তারা ধন চায় না, পুত্র চায় না, তাদের সঙ্গে খেলা জুড়ে দিলেই পুত্রধনের কাঙালরা আমাকে ত্যাগ করবে।

ঠাকুরদাদা। ছেলেদের আর ডাকতে হবে না। ঐ-যে আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। এল বলে।

লক্ষেশ্বরের পুনঃপ্রবেশ

লক্ষেশ্বর। না বাবা, আমি পারব না। ভালো বুঝতে পারছি নে। ও-সব আমার কাজ নেই— আমার যা আছে সেই ভালো। কিন্তু, তুমি আমাকে কী যেন মন্ত্র করেছ ! তোমার কাছ থেকে না পালালে আমার তো রক্ষে নেই। তুমি ঠাকুর্দাকে নিয়েই কারবার করো, আমি চললেম।

[দ্রুত প্রস্থান

ছেলেদের প্রবেশ

ছেলেরা। সন্ন্যাসীঠাকুর ! সন্ন্যাসীঠাকুর !

সন্ন্যাসী। কী বাবা !

ছেলেরা। তুমি আমাদের নিয়ে খেলো।

সন্ন্যাসী। সে কি হয় বাবা ? আমার কি সে ক্ষমতা আছে ? তোমরা আমাকে নিয়ে খেলাও।

ছেলেরা। কী খেলা খেলবে ?

সন্ন্যাসী। আমরা আজ শারদোৎসব খেলব।

প্রথম বালক। সে বেশ হবে।

দ্বিতীয় বালক। সে বেশ মজা হবে।

তৃতীয় বালক। সে কী খেলা ঠাকুর ?

চতুর্থ বালক। সে কেমন করে খেলতে হয় ?

সন্ন্যাসী। তবে এক কাজ করো। ঐ কাশবন থেকে কাশ তুলে নিয়ে এসো। আঁচল ভরে ধানের মঞ্জরী আনতে হবে। আর তোমরা আজ শিউলিফুলের মালা গেঁথে ঐখানে ফেলে রেখে গেছ, সেগুলো নিয়ে এসো।

প্রথম বালক। কী করতে হবে ঠাকুর ?

সন্ন্যাসী। আমাকে তোমরা সাজিয়ে দেবে— আমি হব শারদোৎসবের পুরোহিত।

সকলে। (হাততালি দিয়া) হাঁ, হাঁ, হাঁ! সে বড়ো মজাই হবে।

কাশগুচ্ছ প্রভৃতি আনিয়া ছেলেরা সকলে মিলিয়া
সন্ন্যাসীকে সাজাইতে প্রবৃত্ত হইল

একদল লোকের প্রবেশ

প্রথম ব্যক্তি। ওরে ছোঁড়াগুলো, সন্ন্যাসী কোথায় গেল রে?

দ্বিতীয় ব্যক্তি। কই বাবা, সন্ন্যাসী কই?

বালকগণ। এই-যে আমাদের সন্ন্যাসী।

প্রথম ব্যক্তি। ও তো তোদের খেলার সন্ন্যাসী! সত্যিকার সন্ন্যাসী কোথায় গেলেন?

সন্ন্যাসী। সত্যিকার সন্ন্যাসী কি সহজে মেলে? আমি এই ছেলেদের সঙ্গে মিলে সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসী খেলছি।

প্রথম ব্যক্তি। ও তোমার কী রকম খেলা গা!

দ্বিতীয় ব্যক্তি। ওতে যে অপরাধ হবে।

তৃতীয় ব্যক্তি। ফেলো ফেলো, তোমার জটা ফেলো।

চতুর্থ ব্যক্তি। দেখো-না, আবার গেরুয়া পরেছে!

সন্ন্যাসী। জটাও ফেলব, গেরুয়াও ছাড়ব, সবই হবে, খেলাটা সম্পূর্ণ হয়ে যাক।

প্রথম ব্যক্তি। তবে যে আমাদের কে একজন বললে কোথাকার কোন্ একজন স্বামী এসেছে!

সন্ন্যাসী। যদি বা এসে থাকে তাকে দিয়ে তোমাদের কোনো কাজ হবে না।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। কেন? সে ভণ্ড নাকি?

সন্ন্যাসী। তা নয় তো কী?

তৃতীয় ব্যক্তি। বাবা, তোমার চেহারাটি কিন্তু ভালো। তুমি মন্ত্রতন্ত্র কিছু শিখেছ?

সন্ন্যাসী। শেখবার ইচ্ছা তো আছে, কিন্তু শেখায় কে?

তৃতীয় ব্যক্তি। একটি লোক আছে বাবা— সে থাকে ভৈরবপুরে, লোকটা বেতালসিদ্ধ। একটি লোকের ছেলে মারা যাচ্ছিল, তার বাপ এসে ধরে পড়তেই লোকটা করলে কী, সেই ছেলেটার প্রাণপুরুষকে একটা নেকড়ে বাঘের মধ্যে চালান করে দিলে। বললে বিশ্বাস করবে না— ছেলেটা মোল বটে, কিন্তু নেকড়েটা আজও দিব্যি বেঁচে আছে। না, হাসছ কী? আমার সম্বন্ধী স্বচক্ষে দেখে এসেছে। সেই নেকড়েটাকে মারতে গেলে বাপ লাঠি হাতে ছুটে আসে। তাকে দু বেলা ছাগল খাইয়ে লোকটা ফতুর হয়ে গেল। বিদ্যে যদি শিখতে চাও তো সেই সন্ন্যাসীর কাছে যাও।

প্রথম ব্যক্তি। ওরে চল্ রে, বেলা হয়ে গেল। সন্ন্যাসী-ফন্ন্যাসী সব মিথ্যে। সে কথা আমি তো তখনই বলেছিলেম। আজকালকার দিনে কি আর সেরকম যোগবল আছে!

দ্বিতীয় ব্যক্তি। সে তো সত্যি। কিন্তু আমাকে যে কালুর মা বললে, তার ভাগনে নিজের চক্ষে দেখে এসেছে, সন্ন্যাসী এক টান গাঁজা টেনে কলকেটা যেমনি উপুড় করলে অমনি তার মধ্যে থেকে এক ভাঁড় মদ আর একটা আস্ত মড়ার মাথার খুলি বেরিয়ে পড়ল!

তৃতীয় ব্যক্তি। বল কী, নিজের চক্ষে দেখেছে?

দ্বিতীয় ব্যক্তি। হাঁ রে, নিজের চক্ষে বৈকি।

তৃতীয় ব্যক্তি। আছে রে আছে, সিদ্ধপুরুষ আছে। ভাগ্যে যদি থাকে, তবে তো দর্শন পাব। তা, চল্-না ভাই, কোন্ দিকে গেল একবার দেখে আসি গে।

[প্রস্থান

সন্ন্যাসী। (বালকদের প্রতি) বাবা, আজ যে তোমাদের সব সোনার রঙের কাপড় পরতে হবে।

ছেলেরা। সোনার রঙের কাপড় কেন ঠাকুর?

সন্ন্যাসী। বাইরে যে আজ সোনা ঢেলে দিয়েছে। তারই সঙ্গে আমাদেরও আজ অন্তরে বাইরে

মিলে যেতে হবে তো, নইলে এই শরতের উৎসবে আমরা যোগ দিতে পারব কী করে ? আজ এই আলোর সঙ্গে আকাশের সঙ্গে মিলব বলেই তো উৎসব।

ছেলেরা। সোনার রঙের কাপড় কোথায় পাব ঠাকুর ?

সন্ন্যাসী। ঐ বেতসিনীর ধার দিয়ে যাও। যেখানে বটতলায় পোড়ো মন্দিরটা আছে সেই মন্দিরটায় সমস্ত সাজানো আছে। ঠাকুর্দা, তুমি এদের সাজিয়ে আনো গে।

ঠাকুরদাদা। তবে চলো সবাই। [প্রস্থান

সন্ন্যাসী। গান

রামকেলি। কাওয়ালি

নবকুন্দধবলদল-সুশীতলা
অতিসুনির্মলা সুখসমুজ্জ্বলা
শুভ-সুবর্ণ-আসনে-অচঞ্চলা!
স্মিত-উদয়ারুণ-কিরণ-বিলাসিনী
পূর্ণসিতাংশু-বিভাস-বিকাশিনী
নন্দনলক্ষ্মী সুমঙ্গলা!

লক্ষেশ্বরের প্রবেশ

লক্ষেশ্বর। দেখো ঠাকুর, তোমার মন্তর যদি ফিরিয়ে না নাও তো ভালো হবে না বলছি! কী মুশকিলেই ফেলেছ! আমার হিসেবের খাতা মাটি হয়ে গেল! একবার মনটা বলে যাই সোনার পদ্মর খোঁজে, আবার বলি থাক্ গে ও-সব বাজে কথা! একবার মনে ভাবি এবার বুঝি তবে ঠাকুর্দাই জিতলে-বা, আবার ভাবি মরুক গে ঠাকুর্দা! কিন্তু, এ তো ভালো কথা নয়! চেলা-ধরা ব্যাবসা দেখছি তোমার। কিন্তু, সে হবে না, কোনোমতেই হবে না! চুপ করে হাসছ কী ? আমি বলছি আমাকে পারবে না— আমার শক্ত হাড়! লক্ষেশ্বর কোনোদিন তোমার চেলাগিরিতে ভিড়বে না। [প্রস্থান

ফুল লইয়া ছেলেদের প্রবেশ

সন্ন্যাসী। এবার অর্ঘ্য সাজানো যাক। এ যে টগর, এই বুঝি মালতী, শেফালিকাও অনেক এনেছ দেখছি! সমস্তই শুভ্র, শুভ্র, শুভ্র! বাবা, এইবার সব দাঁড়াও। একবার পূর্ব আকাশে দাঁড়িয়ে বেদমন্ত্র পড়ে নিই।

বেদমন্ত্র

অক্ষি দুঃখোত্থিতস্যৈব সুপ্রসন্নে কনীনিকে।
আংক্তে চাদ্গণং নাস্তি ঋভূনাং তন্নিবোধত।
কনকাভানি বাসাংসি অহতানি নিবোধত।
অন্নমশ্নীত মৃজ্মীত অহং বো জীবনপ্রদঃ।
এতা বাচঃ প্রযুজ্যন্তে শরদ্যত্রোপদৃশ্যতে।

এবারে সকলে মিলে তোমাদের শারদোৎসবের আবাহন-গানটি গাইতে গাইতে বনপথ প্রদক্ষিণ করে এসো। ঠাকুর্দা, তুমি গানটি ধরিয়ে দাও। তোমাদের উৎসবের গানে বনলক্ষ্মীদের জাগিয়ে দিতে হবে।

গান

মিশ্র রামকেলি । একতালা

আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ, আমরা
গেঁথেছি শেফালিমালা ।
নবীন ধানের মঞ্জরী দিয়ে
সাজিয়ে এনেছি ডালা ।
এসো গো শারদলক্ষ্মী, তোমার
শুভ্র মেঘের রথে,
এসো নির্মল নীল পথে,
এসো ধৌত শ্যামল আলো-ঝলমল
বনগিরিপর্বতে ।
এসো মুকুটে পরিয়া শ্বেত শতদল
শীতল-শিশির-ঢালা ।
ঝরা মালতীর ফুলে
আসন বিছানো নিভৃত কুঞ্জে
ভরা গঙ্গার কূলে,
ফিরিছে মরাল ডানা পাতিবারে
তোমার চরণমূলে ।
গুঞ্জরতান তুলিয়ো তোমার
সোনার বীণার তারে
মৃদু মধু ঝংকারে,
হাসিঢালা সুর গলিয়া পড়িবে
ক্ষণিক অশ্রুধারে ।
রহিয়া রহিয়া যে পরশমণি
ঝলকে অলককোণে ।
পলকের তরে সকরুণ করে
বুলায়ো বুলায়ো মনে—
সোনা হয়ে যাবে সকল ভাবনা,
আঁধার হইবে আলা ।

সন্ন্যাসী । পৌচেছে, তোমাদের গান আজ একেবারে আকাশের পারে গিয়ে পৌচেছে ! দ্বার খুলেছে তাঁর ! দেখতে পাচ্ছ কি শারদা বেরিয়েছেন ? দেখতে পাচ্ছ না ? দূরে, দূরে, সে অনেক দূরে, বহু বহু দূরে ! সেখানে চোখ যে যায় না ! সেই জগতের সকল আরম্ভের প্রান্তে, সেই উদয়াচলে প্রথমতম শিখরটির কাছে ! যেখানে প্রতিদিন উষার প্রথম পদক্ষেপটি পড়লেও তবু তাঁর আলো চোখে এসে পৌছয় না, অথচ ভোরের অন্ধকারের সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে ওঠে— সেই অনেক অনেক দূরে ! সেইখানে হৃদয়টি মেলে দিয়ে স্তব্ধ হয়ে থাকো, ধীরে ধীরে একটু একটু করে দেখতে পাবে । আমি ততক্ষণ আগমনীর গানটি গাইতে থাকি ।

গান

ভৈরবী । একতালা

লেগেছে অমল ধবল পালে
মন্দ মধুর হাওয়া ।

দেখি নাই কভু দেখি নাই
এমন তরণী বাওয়া।
কোন্ সাগরের পার হতে আনে
কোন্ সুদূরের ধন!
ভেসে যেতে চায় মন,
ফেলে যেতে চায় এই কিনারায়
সব চাওয়া সব পাওয়া!
পিছনে ঝরিছে ঝরো ঝরো জল,
গুরু গুরু দেয়া ডাকে—
মুখে এসে পড়ে অরুণকিরণ
ছিন্ন মেঘের ফাঁকে।
ওগো কাণ্ডারী, কে গো তুমি, কার
হাসিকান্নার ধন—
ভেবে মরে মোর মন
কোন্ সুরে আজ বাঁধিবে যন্ত্র,
কী মন্ত্র হবে গাওয়া!

এবারে আর দেখতে পাই নি বলবার জো নেই।

প্রথম বালক। কই ঠাকুর, দেখিয়ে দাও-না।

সন্ন্যাসী। ঐ-যে সাদা মেঘ ভেসে আসছে।

দ্বিতীয় বালক। হাঁ হাঁ, ভেসে আসছে।

তৃতীয় বালক। হাঁ, আমিও দেখেছি।

সন্ন্যাসী। ঐ-যে আকাশ ভরে গেল!

প্রথম বালক। কিসে?

সন্ন্যাসী। কিসে! এই তো স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে আলোতে, আনন্দে! বাতাসে শিশিরের পরশ পাচ্ছ না?

দ্বিতীয় বালক। হাঁ, পাচ্ছি।

সন্ন্যাসী। তবে আর-কি! চক্ষু সার্থক হয়েছে, শরীর পবিত্র হয়েছে, মন প্রশান্ত হয়েছে! এসেছেন, এসেছেন, আমাদের মাঝখানেই এসেছেন! দেখছ না বেতসিনী নদীর ভাবটা! আর, ধানের খেত কী রকম চঞ্চল হয়ে উঠেছে! গাও গাও, ঠাকুর্দা, বরণের গানটা গাও!

ঠাকুরদাদা। গান

আলেয়া। একতালা

আমার নয়ন-ভুলানো এলে!
আমি কী হেরিলাম হৃদয় মেলে!

সন্ন্যাসী। যাও বাবা, তোমরা সমস্ত বনে বনে নদীর ধারে ধারে গেয়ে এসো গে।

[ছেলেদের গাহিতে গাহিতে প্রস্থান

ঠাকুরদাদা। প্রভু, আমি যে একেবারে ডুবে গিয়েছি। ডুবে গিয়ে তোমার এই পায়ের তলাটিতে এসে ঠেকেছি। এখান থেকে আর নড়তে পারব না।

লক্ষেশ্বরের প্রবেশ

ঠাকুরদাদা। এ কী হল! লখা গেরুয়া ধরেছে যে!

লক্ষেশ্বর। সন্ন্যাসীঠাকুর, এবার আর কথা নেই। আমি তোমারই চেলা। এই নাও আমার

গজমোতির কৌটো ; এই আমার মণিমাণিক্যের পেটিকা তোমারই কাছে রইল। দেখো ঠাকুর, সাবধানে রেখো।

সন্ন্যাসী। তোমার এমন মতি কেন হল লক্ষেশ্বর ?

লক্ষেশ্বর। সহজে হয় নি প্রভু ! সম্রাট বিজয়াদিত্যের সৈন্য আসছে। এবার আমার ঘরে কি আর কিছু থাকবে ? তোমার গায়ে তো কেউ হাত দিতে পারবে না, এ-সমস্ত তোমার কাছেই রাখলেম। তোমার চেলাকে তুমি রক্ষা কোরো বাবা, আমি তোমার শরণাগত।

রাজার প্রবেশ

রাজা। সন্ন্যাসীঠাকুর !

সন্ন্যাসী। বোসো বোসো, তুমি যে হাঁপিয়ে পড়েছ ! একটু বিশ্রাম করো।

রাজা। বিশ্রাম করবার সময় নেই। ঠাকুর, চরের মুখে সংবাদ পাওয়া গেল যে, বিজয়াদিত্যের পতাকা দেখা দিয়েছে— তাঁর সৈন্যদল আসছে।

সন্ন্যাসী। বল কী ! বোধ হয় শরৎকালের আনন্দে তাঁকে আর ঘরে টিকতে দেয় নি, তিনি রাজ্যবিস্তার করতে বেরিয়েছেন।

রাজা। কী সর্বনাশ ! রাজ্যবিস্তার করতে বেরিয়েছেন !

সন্ন্যাসী। বাবা, এতে দুঃখিত হলে চলবে কেন ? তুমিও তো রাজ্যবিস্তার করবার জন্যে বেরোবার উদ্‌যোগে ছিলে।

রাজা। না, সে হল স্বতন্ত্র কথা। তাই বলে আমার এই রাজ্যটুকুতে— তা, সে যাই হোক, আমি তোমার শরণাগত ! এই বিপদ হতে আমাকে বাঁচাতেই হবে, বোধ হয় কোনো দুষ্টলোক তাঁর কাছে লাগিয়েছে যে আমি তাঁকে লঙ্ঘন করতে ইচ্ছা করেছি ! তুমি তাঁকে বোলো সে কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা, সর্বৈব মিথ্যা ! আমি কি এমনি উন্মত্ত ! আমার রাজচক্রবর্তী হবার দরকার কী ! আমার শক্তিই বা এমন কী আছে !

সন্ন্যাসী। ঠাকুর্দা !

ঠাকুরদাদা। কী প্রভু ?

সন্ন্যাসী। দেখো, আমি কৌপীন প'রে এবং গুটিকতক ছেলেকে মাত্র নিয়ে শারদোৎসব কেমন জমিয়ে তুলেছিলেম, আর ঐ চক্রবর্তী-সম্রাটটা তার সমস্ত সৈন্যসামন্ত নিয়ে এমন দুর্লভ উৎসব কেবল নষ্টই করতে পারে ! লোকটা কিরকম দুর্ভাগা দেখেছ !

রাজা। চুপ করো, চুপ করো ঠাকুর ! কে আবার কোন্ দিক থেকে শুনতে পাবে !

সন্ন্যাসী। ঐ বিজয়াদিত্যের 'পরে আমার—

রাজা। আরে চুপ, চুপ ! তুমি সর্বনাশ করবে দেখছি ! তাঁর প্রতি তোমার মনের ভাব যাই থাক্ সে তুমি মনেই রেখে দাও।

সন্ন্যাসী। তোমার সঙ্গে পূর্বেও তো সে বিষয়ে কিছু আলোচনা হয়ে গেছে।

রাজা। কী মুশকিলেই পড়লেম ! সে-সব কথা কেন ঠাকুর ! সে এখন থাক্-না— ওহে লক্ষেশ্বর, তুমি এখানে বসে বসে কী শুনছ ! এখান থেকে যাও-না।

লক্ষেশ্বর। মহারাজ, যাই এমন আমার সাধ্য কী আছে ? একেবারে পাথর দিয়ে চেপে রেখেছে। যমে না নড়ালে আমার আর নড়চড় নেই। নইলে মহারাজের সামনে আমি যে ইচ্ছাসুখে বসে থাকি এমন আমার স্বভাবই নয়।

বিজয়াদিত্যের অমাত্যগণের প্রবেশ

মন্ত্রী। জয় হোক মহারাজাধিরাজচক্রবর্তী বিজয়াদিত্য !

ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম

রাজা। আরে করেন কী ! করেন কী ! আমাকে পরিহাস করছেন নাকি ? আমি বিজয়াদিত্য নই। আমি তাঁর চরণাশ্রিত সামন্ত সোমপাল।

মন্ত্রী। মহারাজ, সময় তো অতীত হয়েছে, এক্ষণে রাজধানীতে ফিরে চলুন।

সন্ন্যাসী। ঠাকুর্দা, পূর্বেই তো বলেছিলেম পাঠশালা ছেড়ে পালিয়েছি, কিন্তু গুরুমশায় পিছন পিছন তাড়া করেছেন।

ঠাকুরদাদা। প্রভু, এ কী কাণ্ড! আমি তো স্বপ্ন দেখছি নে।

সন্ন্যাসী। স্বপ্ন তুমিই দেখছ কী এঁরাই দেখছেন তা নিশ্চয় করে কে বলবে?

ঠাকুরদাদা। তবে কি—

সন্ন্যাসী। হাঁ, এঁরা কয়জনে আমাকে বিজয়াদিত্য বলেই তো জানেন।

ঠাকুরদাদা। প্রভু, আমিই তো তবে জিতেছি। এই কয় দণ্ডে আমি তোমার যে পরিচয়টি পেয়েছি তা এঁরা পর্যন্ত পান নি। কিন্তু বড়ো সংকটে ফেললে তো ঠাকুর!

লক্ষেশ্বর। আমিও বড়ো সংকটে পড়েছি মহারাজ! আমি সম্রাটের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে সন্ন্যাসীর হাতে ধরা দিয়েছি, এখন আমি যে কার হাতে আছি সেটা ভেবেই পাচ্ছি নে।

রাজা। মহারাজ, দাসকে কি পরীক্ষা করতে বেরিয়েছিলেন?

সন্ন্যাসী। না সোমপাল, আমি নিজের পরীক্ষাতেই বেরিয়েছিলেম।

রাজা। (জোড়হস্তে) এই অপরাধীর প্রতি মহারাজের কী বিধান?

সন্ন্যাসী। বিশেষ কিছুই না। তোমার কাছে যে কয়টা বিষয়ে প্রতিশ্রুত আছি সে আমি সেরে দিয়ে যাব।

রাজা। আমার কাছে আবার প্রতিশ্রুত!

সন্ন্যাসী। তার মধ্যে একটা তো উদ্ধার করেছি। বিজয়াদিত্য যে তোমাদের সকলের সমান, সে যে নিতান্ত সাধারণ মানুষ, সেটা তো ফাঁস হয়েই গেছে। নিজের এই পরিচয়টুকু পাবার জন্যেই রাজতক্ত ছেড়ে সন্ন্যাসী সেজে সকল লোকের মাঝখানে নেবে এসেছিলেম। এখন তোমার একটা-কিছু কাজ করে দিয়ে যাব এই প্রতিশ্রুতিটি রক্ষা করতে হবে। বিজয়াদিত্যকে তোমার সভায় আজই হাজির করে দেব— তাকে দিয়ে তোমার কোন্ কাজ করাতে চাও বলো।

রাজা। (নতশিরে) তাঁকে দিয়ে আমার অপরাধ মার্জনা করাতে চাই।

সন্ন্যাসী। তা, বেশ কথা। আমাকে যদি সম্রাট বলে মান তবে আমার সম্বন্ধে তোমার যা-কিছু অপরাধ সে রাজকার্যের ত্রুটি। সে-রকম যদি কিছু ঘটে থাকে তবে আমি কয়েকদিন তোমার রাজ্যে থেকে সে-সমস্তই স্বহস্তে মার্জনা করে দিয়ে যাব।

রাজা। মহারাজ, আপনি যে শরতের বিজয়যাত্রায় বেরিয়েছেন আজ তার পরিচয় পাওয়া গেল। আজ এমন হার আনন্দে হেরেছি, কোনো যুদ্ধে এমনটি ঘটতে পারত না। আমি যে আপনার অধীন এই গৌরবই আমার সকল যুদ্ধজয়ের চেয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে। কী করলে আমি রাজত্ব করবার উপযুক্ত হব সেই উপদেশটি চাই।

সন্ন্যাসী। উপদেশটি কথায় ছোটো, কাজে অত্যন্ত বড়ো। রাজা হতে গেলে সন্ন্যাসী হওয়া চাই।

রাজা। উপদেশটি মনে রাখব, পেরে উঠব বলে ভরসা হয় না।

লক্ষেশ্বর। আমাকেও ঠাকুর— না না, মহারাজ, ঐ-রকম একটা কী উপদেশ দিয়েছিলেন, সে আমি পেরে উঠলেম না, বোধ করি মনে রাখতেও পারব না।

সন্ন্যাসী। উপদেশে বোধ করি তোমার বিশেষ প্রয়োজন নেই।

লক্ষেশ্বর। আজ্ঞা না।

উপনন্দের প্রবেশ

উপনন্দ। ঠাকুর! একি, রাজা যে! এরা সব কারা!

পলায়নোদ্যম

সন্ন্যাসী। এসো, এসো বাবা, এসো, কী বলছিলে বলো। (উপনন্দ নিরুত্তর) এঁদের সামনে বলতে লজ্জা করছ? আচ্ছা, তবে সোমপাল, একটু অবসর নাও। তোমরাও—

উপনন্দ। সে কী কথা! ইনি যে আমাদের রাজা, এঁর কাছে আমাকে অপরাধী কোরো না। আমি তোমাকে বলতে এসেছিলেম, এই কদিন পুঁথি লিখে আজ তার পারিশ্রমিক তিন কাহন পেয়েছি। এই দেখো।

সন্ন্যাসী। আমার হাতে দাও বাবা! তুমি ভাবছ এই তোমার বহুমূল্য তিন কার্ষাপণ আমি লক্ষেশ্বরের হাতে ঋণশোধের জন্য দেব? এ আমি নিজে নিলেম। আমি এখানে শারদার উৎসব করেছি, এ আমার তারই দক্ষিণা। কী বল বাবা?

উপনন্দ। ঠাকুর, তুমি নেবে!

সন্ন্যাসী। নেব বৈকি। তুমি ভাবছ সন্ন্যাসী হয়েছি বলেই আমার কিছুতে লোভ নেই? এ-সব জিনিসে আমার ভারি লোভ।

লক্ষেশ্বর। সর্বনাশ! তবেই হয়েছে! ডাইনের হাতে পুত্র সমর্পণ করে বসে আছি দেখছি!

সন্ন্যাসী। ওগো শ্রেষ্ঠী!

শ্রেষ্ঠী। আদেশ করুন।

সন্ন্যাসী। এই লোকটিকে হাজার কার্ষাপণ গুণে দাও।

শ্রেষ্ঠী। যে আদেশ।

উপনন্দ। তবে ইনিই কি আমাকে কিনে নিলেন?

সন্ন্যাসী। উনি তোমাকে কিনে নেন ওঁর এমন সাধ্য কী! তুমি আমার।

উপনন্দ। (পা জড়াইয়া ধরিয়া) আমি কোন্ পুণ্য করেছিলেম যে আমার এমন ভাগ্য হল!

সন্ন্যাসী। ওগো সুভূতি!

মন্ত্রী। আজ্ঞা!

সন্ন্যাসী। আমার পুত্র নেই বলে তোমরা সর্বদা আক্ষেপ করতে। এবারে সন্ন্যাসধর্মের জোরে এই পুত্রটি লাভ করেছি।

লক্ষেশ্বর। হায় হায়, আমার বয়স বেশি হয়ে গেছে বলে কী সুযোগটাই পেরিয়ে গেল!

মন্ত্রী। বড়ো আনন্দ! তা, ইনি কোন্ রাজগৃহে—

সন্ন্যাসী। ইনি যে গৃহে জন্মেছেন সে গৃহে জগতের অনেক বড়ো বড়ো বীর জন্মগ্রহণ করেছেন— পুরাণ-ইতিহাস খুঁজে সে আমি তোমাকে পরে দেখিয়ে দেব। লক্ষেশ্বর!

লক্ষেশ্বর। কী আদেশ?

সন্ন্যাসী। বিজয়াদিত্যের হাত থেকে তোমার মণিমাণিক্য আমি রক্ষা করেছি; এই তোমাকে ফিরে দিলেম।

লক্ষেশ্বর। মহারাজ, যদি গোপনে ফিরিয়ে দিতেন তা হলেই যথার্থ রক্ষা করতেন, এখন রক্ষা করে কে!

সন্ন্যাসী। এখন বিজয়াদিত্য স্বয়ং রক্ষা করবেন, তোমার ভয় নেই। কিন্তু, তোমার কাছে আমার কিছু প্রাপ্য আছে।

লক্ষেশ্বর। সর্বনাশ করলে!

সন্ন্যাসী। ঠাকুর্দা সাক্ষী আছেন।

লক্ষেশ্বর। এখন সকলেই মিথ্যে সাক্ষ্য দেবে।

সন্ন্যাসী। আমাকে ভিক্ষা দিতে চেয়েছিলে। তোমার কাছে এক মুঠো চাল পাওনা আছে। রাজার মুষ্টি কি ভরাতে পারবে?

লক্ষেশ্বর। মহারাজ, আমি সন্ন্যাসীর মুষ্টি দেখেই কথাটা পেড়েছিলেম।

সন্ন্যাসী। তবে তোমার ভয় নেই, যাও।

লক্ষেশ্বর। মহারাজ, ইচ্ছে করেন যদি তবে এইবার কিছু উপদেশ দিতে পারেন।

সন্ন্যাসী। এখনো দেরি আছে।

লক্ষেশ্বর। তবে প্রণাম হই। চার দিকে সকলেই কৌটোটার দিকে বড্ড তাকাচ্ছে।

[প্রস্থান

সন্ন্যাসী। রাজা সোমপাল, তোমার কাছে আমার একটি প্রার্থনা আছে।

রাজা। সে কী কথা! সমস্তই মহারাজের, যে আদেশ করবেন—

সন্ন্যাসী। তোমার রাজ্য থেকে আমি একটি বন্দী নিয়ে যেতে চাই।

রাজা। যাকে ইচ্ছা নাম করুন, সৈন্য পাঠিয়ে দিচ্ছি। নাহয় আমি নিজেই যাব।

সন্ন্যাসী। বেশি দূরে পাঠাতে হবে না। (ঠাকুরদাদাকে দেখাইয়া) তোমার এই প্রজাটিকে চাই।

রাজা। কেবলমাত্র এঁকে! মহারাজ যদি ইচ্ছা করেন তবে আমার রাজ্যে যে শ্রুতিধর স্মৃতিভূষণ আছেন তাঁকে আপনার সভায় নিয়ে যেতে পারেন।

সন্ন্যাসী। না, অত বড়ো লোককে নিয়ে আমার সুবিধা হবে না, আমি এঁকেই চাই। আমার প্রাসাদে অনেক জিনিস আছে, কেবল বয়স্য নেই।

ঠাকুরদাদা। বয়সে মিলবে না প্রভু, গুণেও না। তবে কিনা, ভক্তি দিয়ে সমস্ত অমিল ভরিয়ে তুলতে পারব এই ভরসা আছে।

সন্ন্যাসী। ঠাকুর্দা, সময় খারাপ হলে বন্ধুরা পালায়, তাই তো দেখছি! আমার উৎসবের বন্ধুরা এখন সব কোথায়? রাজদ্বারের গন্ধ পেয়েই দৌড় দিয়েছে নাকি?

ঠাকুরদাদা। কারও পালাবার পথ কি রেখেছ? আটঘাট ঘিরে ফেলেছ যে! ঐ আসছে।

বালকগণের প্রবেশ

সকলে। সন্ন্যাসীঠাকুর! সন্ন্যাসীঠাকুর!

সন্ন্যাসী। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) এসো বাবা, সব এসো।

সকলে। এ কী! এ যে রাজা! আরে, পালা, পালা!

পলায়নোদ্যম

ঠাকুরদাদা। আরে, পালাস নে, পালাস নে।

সন্ন্যাসী। তোমরা পালাবে কী, উনিই পালাচ্ছেন। যাও সোমপাল, সভা প্রস্তুত করো গে, আমি যাচ্ছি।

রাজা। যে আদেশ।

[প্রস্থান

বালকেরা। আমরা বনে পথে সব জায়গায় গেয়ে গেয়ে এসেছি, এইবার এখানে গান শেষ করি।

ঠাকুরদাদা। হাঁ ভাই, তোরা ঠাকুরকে প্রদক্ষিণ করে করে গান গা।

সকলের গান

আলেয়া। একতালা

আমার নয়ন-ভুলানো এলে!
আমি কী হেরিলাম হৃদয় মেলে!
শিউলিতলার পাশে পাশে
ঝরা ফুলের রাশে রাশে
শিশির-ভেজা ঘাসে ঘাসে
অরুণ-রাঙা চরণ ফেলে
নয়ন-ভুলানো এলে!
আলোছায়ার আঁচলখানি
লুটিয়ে পড়ে বনে বনে,

ফুলগুলি ওই মুখে চেয়ে
কী কথা কয় মনে মনে !
তোমায় মোরা করব বরণ,
মুখের ঢাকা করো হরণ—
ওইটুকু ওই মেঘাবরণ
দু হাত দিয়ে ফেলো ঠেলে !
নয়ন-ভুলানো এলে !
বনদেবীর দ্বারে দ্বারে
শুনি গভীর শঙ্খধ্বনি
আকাশবীণার তারে তারে
জাগে তোমার আগমনী !
কোথায় সোনার নূপুর বাজে—
বুঝি আমার হিয়ার মাঝে
সকল ভাবে সকল কাজে
পাষাণ-গালা সুধা ঢেলে !
নয়ন-ভুলানো এলে !

৭ ভাদ্র ১৩১৫

মুকুট

বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের বালকদের দ্বারা
অভিনীত হইবার উদ্দেশে 'বালক'
পত্রে প্রকাশিত 'মুকুট'-নামক
ক্ষুদ্র উপন্যাস হইতে
নাট্যীকৃত

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

অমরমাণিক্য	মহারাজ
চন্দ্রমাণিক্য	যুবরাজ
ইন্দ্রকুমার	মধ্যম রাজকুমার
রাজধর	কনিষ্ঠ রাজকুমার
ধুরন্ধর	ঐ মামাতো ভাই
ইশা খাঁ	সেনাপতি
আরাকান-রাজ	
প্রতাপ	
নিশানধারী	
ভাট	
দূত	
সৈনিক প্রভৃতি	

মুকুট

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ত্রিপুরার সেনাপতি ইশা খাঁর কক্ষ

ত্রিপুরার কনিষ্ঠ রাজকুমার রাজধর ও ইশা খাঁ

ইশা খাঁ অস্ত্র পরিষ্কার করিতে নিযুক্ত

রাজধর। দেখো সেনাপতি, আমি বার বার বলছি তুমি আমার নাম ধরে ডেকো না।

ইশা খাঁ। তবে কী ধরে ডাকব ? চুল ধরে না কান ধরে ?

রাজধর। আমি বলে রাখছি, আমার সম্মান যদি তুমি না রাখ তোমার সম্মানও আমি রাখব না।

ইশা খাঁ। আমার সম্মান যদি তোমার হাতে থাকবার ভার থাকত তবে কানা কড়ার দরে তাকে হাটে বিকিয়ে আসতুম। নিজের সম্মান আমি নিজেই রাখতে পারব।

রাজধর। তাই যদি রাখতে চাও তা হলে ভবিষ্যতে আমার নাম ধরে ডেকো না।

ইশা খাঁ। বটে !

রাজধর। হাঁ।

ইশা খাঁ। হা হা হা হা ! মহারাজাধিরাজকে কী বলে ডাকতে হবে ? হুজুর, জনাব, জাঁহাপনা !

রাজধর। আমি তোমার ছাত্র বটে, কিন্তু আমি রাজকুমার সে কথা তুমি ভুলে যাও।

ইশা খাঁ। সহজে ভুলি নি, তুমি যে রাজকুমার সে কথা মনে রাখা শক্ত করে তুলেছ।

রাজধর। তুমি যে আমার ওস্তাদ, সে কথাও মনে রাখতে দিলে না দেখছি।

ইশা খাঁ। বস্‌। চুপ।

দ্বিতীয় রাজকুমার ইন্দ্রকুমারের প্রবেশ

ইন্দ্রকুমার। খাঁ সাহেব, ব্যাপারখানা কী ?

ইশা খাঁ। শোনো তো বাবা। বড়ো তামাশার কথা। তোমাদের মধ্যে এই যে ব্যক্তিটি সকলের কনিষ্ঠ এঁকে জাঁহাপনা শাহেন্‌শা বলে না ডাকলে ওঁর আর সম্মান থাকে না— ওঁর সম্মানের এত টানাটানি !

ইন্দ্রকুমার। বল কী ! সত্যি নাকি ! হা হা হা হা !

রাজধর। চুপ করো দাদা।

ইন্দ্রকুমার। তোমাকে কী বলে ডাকতে হবে ? জাঁহাপনা ! হা হা হা হা ! শাহেন্‌শা !

রাজধর। দাদা, চুপ করো বলছি।

ইন্দ্রকুমার। জনাব, চুপ করে থাকা বড়ো শক্ত, হাসিতে যে পেট ফেটে যায় হুজুর !

রাজধর। তুমি অত্যন্ত নির্বোধ।

ইন্দ্রকুমার। ঠাণ্ডা হও ভাই, ঠাণ্ডা হও। তোমার বুদ্ধি তোমারই থাক্, তার প্রতি আমার কোনো লোভ নেই।

ইশা খাঁ। ওর বুদ্ধিটা সম্প্রতি বড়োই বেড়ে উঠেছে।

ইন্দ্রকুমার। নাগাল পাওয়া যাচ্ছে না, মই লাগাতে হবে।

অনুচরসহ যুবরাজ চন্দ্রমাণিক্য ও মহারাজ অমরমাণিক্যের প্রবেশ

রাজধর। মহারাজের কাছে আমার নালিশ আছে।

মহারাজ। কী হয়েছে?

রাজধর। ইশা খাঁ পুনঃপুনঃ নিষেধসত্ত্বে আমার অসম্মান করেন। এর বিচার করতে হবে।

ইশা খাঁ। অসম্মান কেউ করে না, অসম্মান তুমি করাও। আরো তো রাজকুমার আছেন। তাঁরাও মনে রাখেন আমি তাঁদের গুরু, আমিও মনে রাখি তাঁরা আমার ছাত্র— সম্মান-অসম্মানের কোনো কথাই ওঠে না।

মহারাজ। সেনাপতি সাহেব, কুমারদের এখন বয়স হয়েছে, এখন ওঁদের মান রক্ষা করে চলতে হবে বৈকি।

ইশা খাঁ। মহারাজ যখন আমার কাছে যুদ্ধ শিক্ষা করেছেন তখন মহারাজকে যেরকম সম্মান করেছি রাজকুমারদের তা অপেক্ষা কম করি নে।

রাজধর। অন্য কুমারদের কথা বলতে চাই নে, কিন্তু—

ইশা খাঁ। চুপ করো বৎস। আমি তোমার পিতার সঙ্গে কথা কচ্ছি। মহারাজ, মাপ করবেন, রাজবংশের এই কনিষ্ঠ পুত্রটি বড়ো হলে মুন্‌শির মতো কলম চালাতে পারবে, কিন্তু তলোয়ার এর হাতে শোভা পাবে না। (যুবরাজ এবং ইন্দ্রকুমারকে দেখাইয়া) চেয়ে দেখুন মহারাজ, এঁরাই তো রাজপুত্র, রাজগৃহ আলো করে আছেন।

মহারাজ। রাজধর, খাঁ সাহেব কী বলছেন! তুমি অস্ত্রশিক্ষায় ওঁকে সন্তুষ্ট করতে পার নি?

রাজধর। সে আমার ভাগ্যের দোষ, অস্ত্রশিক্ষার দোষ নয়। মহারাজ নিজে আমাদের ধনুর্বিদ্যার পরীক্ষা গ্রহণ করুন, এই আমার প্রার্থনা।

মহারাজ। আচ্ছা, উত্তম। কাল আমাদের অবসর আছে, কালই পরীক্ষা হবে। তোমাদের মধ্যে যে জিতবে তাকে আমার এই হীরে-বাঁধানো তলোয়ার পুরস্কার দেব।

[প্রস্থান

ইশা খাঁ। শাবাশ রাজধর, শাবাশ! আজ তুমি ক্ষত্রিয়সন্তানের মতো কথা বলেছ। অস্ত্রপরীক্ষায় যদি তুমি হার তাতেও তোমার গৌরব নষ্ট হবে না। হার-জিত তো আল্লার ইচ্ছা, কিন্তু ক্ষত্রিয়ের মনে স্পর্ধা থাকা চাই।

রাজধর। থাক্ সেনাপতি, তোমার বাহবা অন্য রাজকুমারদের জন্য জমা থাক্; এত দিন তা না পেয়েও যদি চলে গিয়ে থাকে তবে আজও আমার কাজ নেই।

যুবরাজ। রাগ কোরো না ভাই রাজধর। সেনাপতি সাহেবের সরল ভর্ৎসনা ওঁর সাদা দাড়ির মতো সমস্তই কেবল ওঁর মুখে। কোনো একটি গুণ দেখলেই তৎক্ষণাৎ উনি সব ভুলে যান। অস্ত্রপরীক্ষায় যদি তোমার জিত হয় তা হলে দেখবে, খাঁ সাহেব তোমাকে যেমন মনের সঙ্গে পুরস্কৃত করবেন এমন আর কেউ নয়।

রাজধর। দাদা, আজ পূর্ণিমা আছে, আজ রাত্রে যখন গোমতী নদীতে বাঘে জল খেতে আসবে তখন শিকার করতে গেলে হয় না?

যুবরাজ। বেশ কথা। তোমার যদি ইচ্ছে হয়ে থাকে তো যাওয়া যাবে।

ইন্দ্রকুমার। কী আশ্চর্য! রাজধরের যে শিকারে প্রবৃত্তি হল! এমন তো কখনো দেখা যায় নি।

ইশা খাঁ। ওঁর আবার শিকারে প্রবৃত্তি নেই! উনি সকলের চেয়ে বড়ো জীব শিকার করে বেড়ান। রাজসভায় দুই পা-ওয়ালা এমন একটি জীব নেই যিনি ওঁর কোনো-না-কোনো ফাঁদে আটকা না পড়েছেন।

যুবরাজ। সেনাপতি সাহেব, তোমার তলোয়ারও যেমন তোমার জিহ্বাও তেমনি, দুইই খরধার— যার উপর গিয়ে পড়ে তার একেবারে মর্মচ্ছেদ না করে ফেরে না।

রাজধর। দাদা, তুমি আমার জন্যে ভেবো না। খাঁ সাহেব জিহ্বায় যতই শান দিন-না কেন আমার মর্মে আঁচড় কাটতে পারবেন না।

ইশা খাঁ। তোমার মর্ম পায় কে বাবা! বড়ো শক্ত।

ইন্দ্রকুমার। যেমন, হঠাৎ আজ রাত্রে তোমার শিকারে যাবার শখ হল, এর মর্ম ভালো বোঝা যাচ্ছে না।

যুবরাজ। আহা, ইন্দ্রকুমার! প্রত্যেক কথাতেই রাজধরকে আঘাত করাটা তোমার অভ্যাস হয়ে যাচ্ছে।

রাজধর। সে আঘাতে বেদনা না পাওয়াও আমার অভ্যাস হয়ে গেছে।

ইন্দ্রকুমার। দাদা, আজ রাত্রে শিকারে যাওয়াই তোমার মত নাকি?

যুবরাজ। তোমার সঙ্গে, ভাই, শিকার করতে যাওয়াই বিড়ম্বনা। নিতান্ত নিরামিষ শিকার করতে হয়। তুমি বনে গিয়ে বড়ো বড়ো জন্তু মেরে আন, আর আমরা কেবল লাউ কুমড়ো কচু কাঁঠাল শিকার করেই মরি।

ইশা খাঁ। (ইন্দ্রকুমারের পিঠ চাপড়াইয়া) যুবরাজ ঠিক বলেছেন পুত্র। তোমার তীর সকলের আগে ছোটে এবং নির্ঘাত গিয়ে লাগে— তোমার সঙ্গে পেরে উঠবে কে!

ইন্দ্রকুমার। না দাদা, ঠাট্টা নয়। তুমি না গেলে কে শিকার করতে যাবে!

যুবরাজ। আচ্ছা, চলো। আজ রাজধরের ইচ্ছে হয়েছে, ওঁকে নিরাশ করব না।

ইন্দ্রকুমার। কেন দাদা, আমার ইচ্ছে হয়েছে বলে কি যেতে নেই?

যুবরাজ। সে কী কথা ভাই, তোমার সঙ্গে তো রোজই যাচ্ছি!

ইন্দ্রকুমার। তাই বুঝি পুরনো হয়ে গেছে?

যুবরাজ। আমার কথা অমন উলটো বুঝলে বড়ো ব্যথা লাগে।

ইন্দ্রকুমার। না দাদা, ঠাট্টা করছিলুম— চলো প্রস্তুত হই গে।

ইশা খাঁ। ইন্দ্রকুমার বুকে দশটা বাণ সইতে পারে, কিন্তু দাদার সামান্য অনাদরটুকু সইতে পারে না।

[অনুচরগণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান

অনুচরগণ

প্রথম। কথাটা তো ভালো ঠেকছে না হে। আমাদের ছোটো কুমারের ধনুর্বিদ্যার দৌড় তো সকলেরই জানা আছে, উনি মধ্যম কুমারের সঙ্গে অস্ত্রপরীক্ষায় এগোতে চান এর মানে কী?

দ্বিতীয়। কেউ বা তীর দিয়ে লক্ষ্য ভেদ করে, কেউ বা বুদ্ধি দিয়ে।

প্রথম। সেই তো ভয়ের কথা। অস্ত্রপরীক্ষায় অস্ত্র না চালিয়ে যদি বুদ্ধি চালাও সেটা যে দুষ্টবুদ্ধি।

তৃতীয়। দেখো বংশী, অস্ত্রই চলুক আর বুদ্ধিই চলুক মাঝের থেকে তোমার ঐ জিভটিকে চালিয়ো না, আমার এই পরামর্শ। যদি টিকে থাকতে চাও তো চুপ করে থাকো।

দ্বিতীয়। বনমালী ঠিক কথাই বলেছে। ঐ ছোটো কুমারের কথা উঠলেই তুমি যা মুখে আসে তাই বলে ফেল। রাজার ছেলে— কে ভালো কে মন্দ সে বিচারের ভার আমাদের উপর নেই। তবে কিনা, আমাদের যুবরাজ বেঁচে থাকুন আর আমাদের মধ্যম কুমার ভাই লক্ষ্মণের মতো সর্বদা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থেকে তাঁকে রক্ষে করুন, ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করো। ছোটো কুমারের কথা মুখে না আনাই ভালো।

প্রথম। ইচ্ছে ক'রে তো আনি নে। আমাদের মধ্যম কুমার সরল মানুষ, মনে তাঁর ভয়-ডরও নেই, পাক-চক্রও নেই— সর্বদাই ভয় হয় ঐ যাঁর নামটা করছি নে তিনি কখন তাঁকে কী ফেসাদে ফেলেন।

দ্বিতীয়। চল্‌ চল্‌, ঐ আসছেন।

প্রথম। ঐ-যে সঙ্গে ওঁর মামাতো ভাই ধুরন্ধরটিও আছেন— শনির সঙ্গে মঙ্গল এসে জুটেছেন।

[প্রস্থান

রাজধর ও ধুরন্ধর

রাজধর। অসহ্য হয়েছে।

ধুরন্ধর। কিন্তু সহ্য করতেও তো কসুর নেই। ইন্দ্রকুমারের সঙ্গে তো প্রায় জন্মাবধিই এইরকম চলছে, কিন্তু অসহ্য হয়েছে এমন তো লক্ষণ দেখি নে।

রাজধর। লক্ষণ দেখিয়ে লাভ হবে কী! যখন দেখাব একেবারে কাজে দেখাব। একটা সুযোগ এসেছে। এইবার অস্ত্রপরীক্ষায় আমি লক্ষ্যভেদ করব।

ধুরন্ধর। ইন্দ্রকুমারের বক্ষে নাকি?

রাজধর। বক্ষে নয়, তার হৃদয়ে। এবারকার পরীক্ষায় আমি জিতব, ওঁর অহংকারটাকে বিঁধে এফোঁড় ওফোঁড় করব।

ধুরন্ধর। অস্ত্রপরীক্ষায় ইন্দ্রকুমারকে জিতবে এইটেকেই সুযোগ বলছ?

রাজধর। সুযোগ কি তীরের মুখে থাকে? সুযোগ বুদ্ধির ডগায়। তোমাকে কিন্তু একটি কাজ করতে হবে।

ধুরন্ধর। কাজ তো তোমার বরাবরই করে আসছি, ফল তো কিছু পাই নে।

রাজধর। ফল সবুরে পাওয়া যায়। কোনোরকম ফন্দিতে ইন্দ্রকুমার-দাদার অস্ত্রশালায় ঢুকে তাঁর তূণের প্রথম খোপটি থেকে তাঁর নাম-লেখা তীরটি তুলে নিয়ে আমার নাম-লেখা তীর বসিয়ে আসতে হবে। তার সঙ্গে আমার তীর বদল করতে হবে, ভাগ্যও বদল হবে।

ধুরন্ধর। সবই যেন বুঝলুম কিন্তু আমার প্রাণটি? সেটি গেলে তো কারও সঙ্গে বদল চলবে না।

রাজধর। তোমার কোনো ভয় নেই, আমি আছি।

ধুরন্ধর। তুমি তো বরাবরই আছ, কিন্তু ভয়ও আছে। সেই যখন ইন্দ্রকুমারের রুপোর-পাত-দেওয়া ধনুকটার উপরে তুমি লোভ করলে আমিই তো সেটি সংগ্রহ করে তোমার ঘরে এনে লুকিয়ে রেখেছিলুম। শেষকালে যখন ধরা পড়লে ইন্দ্রকুমার ঘৃণা করে সে ধনুকটা তোমাকে দান করলেন, কিন্তু আমার যে অপমানটা করলেন সে আমার জীবন গেলেও যাবে না। তখন তো ভাই, তুমি ছিলে, রক্ষা যত করেছিলে সে আমার মনে আছে।

রাজধর। এবার তোমার সময় এসেছে, সেই অপমানের শোধ দেবার জোগাড় করো।

ধুরন্ধর। সময় কখন কার আসে সেটা যে পরিষ্কার বোঝা যায় না। দুর্বল লোকের পক্ষে অপমান পরিপাক করবার শক্তিটাই ভালো; শোধ তোলবার শখটা তার পক্ষে নিরাপদ নয়। ঐ-যে ওঁরা সব আসছেন। আমি পালাই। তোমার সঙ্গে আমাকে একত্রে দেখলেই ইন্দ্রকুমার যে কথাগুলি বলবেন তাতে মধুবর্ষণ করবে না, আর ইশা খাঁও যে তোমার চেয়ে আমার প্রতি বেশি ভালোবাসা প্রকাশ করবেন এমন ভরসা আমার নেই।

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

ইন্দ্রকুমারের অস্ত্রশালার দ্বারে

ইন্দ্রকুমার। কী হে প্রতাপ, ব্যাপারখানা কী? আমাকে হঠাৎ অস্ত্রশালার দ্বারে যে ডাক পড়ল?

প্রতাপ। মধ্যম বউরানীমা আপনাকে খবর দিতে বললেন যে, আপনার অস্ত্রশালার মধ্যে একটি জ্যান্ত অস্ত্র ঢুকেছেন, তিনি বায়ু-অস্ত্র না নাগপাশ না কী সেটা সন্ধান নেওয়া উচিত।

ইন্দ্রকুমার। বল কী প্রতাপ, কলিযুগেও এমন ব্যাপার ঘটে নাকি ?

প্রতাপ। আজ্ঞে, কুমার, কলিযুগেই ঘটে, সত্যযুগে নয়। দরজাটা খুললেই সমস্ত বুঝতে পারবেন।

ইন্দ্রকুমার। তাই তো বটে, পায়ের শব্দ শুনি যে ! (দ্বার খুলিতেই রাজধরের নিষ্ক্রমণ) একি ! রাজধর যে ! হা হা হা হা, তোমাকে অস্ত্র বলে কেউ ভুল করেছিল নাকি ! হা হা হা হা !

রাজধর। মেজবউরানী তামাশা করে আমাকে এখানে বন্ধ করে রেখেছিলেন।

ইন্দ্রকুমার। এ ঘরটা তো সহজ তামাশার ঘর না, এখানকার তামাশা যে ভয়ংকর ধারালো তামাশা— এখানে তোমার আগমন হল যে !

রাজধর। আজ রাত্রে শিকারে যাব বলে অস্ত্র খুঁজতে গিয়ে দেখলুম আমার অস্ত্রগুলোতে সব মর্চে পড়ে রয়েছে। কালকের অস্ত্রপরীক্ষার জন্যে সেগুলোকে সমস্ত সাফ করতে দিয়ে এসেছি। তাই বউরানীর কাছে এসেছিলুম তোমার কিছু অস্ত্র ধার নেবার জন্যে।

ইন্দ্রকুমার। তাই তিনি বুঝি সমস্ত অস্ত্রশালাসুদ্ধই তোমাকে ধার দিয়ে বসে আছেন ! হা হা হা হা ! তা বেরিয়ে এলে কেন ? যাও, ঢুকে পড়ো। ধারের মেয়াদ ফুরিয়েছে নাকি ? হা হা হা হা !

রাজধর। হাসো, হাসো। এ তামাশায় আমিও হাসব। কিন্তু এখন নয়। চললুম দাদা, আজ আর শিকারে যাচ্ছি নে।

[প্রস্থান

প্রতাপ। ছোটোকুমারকে নিয়ে আপনাদের এ-সমস্ত ঠাট্টা আমার ভালো বোধ হয় না।

ইন্দ্রকুমার। ঠাট্টা নিয়ে ভয় কিসের ? উনিও ঠাট্টা করুন-না।

প্রতাপ। ওঁর ঠাট্টা বড়ো সহজ হবে না।

তৃতীয় দৃশ্য

পরীক্ষাভূমি

রাজা, রাজকুমারগণ, ইশা খাঁ, নিশানধারী ও ভাট

ইন্দ্রকুমার। দাদা, আজ তোমাকে জিততেই হবে, নইলে চলবে না।

যুবরাজ। চলবে না তো কী ! আমার তীরটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেও জগৎসংসার যেমন চলছিল ঠিক তেমনিই চলবে। আর, যদি বা নাই চলত তবু আমার জেতবার কোনো সম্ভাবনা দেখছি নে।

ইন্দ্রকুমার। দাদা, তুমি যদি হারো তবে আমি ইচ্ছাপূর্বক লক্ষ্যভ্রষ্ট হব।

যুবরাজ। না ভাই, ছেলেমানুষি কোরো না। ওস্তাদের নাম রাখতে হবে।

ইশা খাঁ। যুবরাজ, সময় হয়েছে, ধনুক গ্রহণ করো। মনোযোগ কোরো। দেখো, হাত ঠিক থাকে যেন।

যুবরাজের তীর-নিক্ষেপ

ইশা খাঁ। যাঃ ! ফসকে গেল।

যুবরাজ। মনোযোগ করেছিলুম খাঁ সাহেব, তীরযোগ করতেই পারলুম না।

ইন্দ্রকুমার। কখনো না। মন দিলে তুমি নিশ্চয়ই পারতে। দাদা, তুমি কেবল উদাসীন হয়ে সব জিনিস ঠেলে ফেলে দাও, এতে আমার ভারি কষ্ট হয়।

ইশা খাঁ। তোমার দাদার বুদ্ধি তীরের মুখে কেন খেলে না, তা জান ! বুদ্ধিটা তেমন সূক্ষ্ম নয়।

ইন্দ্রকুমার। সেনাপতি সাহেব, তুমি অন্যায় বলছ।

ইশা খাঁ। (রাজধরের প্রতি) কুমার, এবার তুমি লক্ষ্য ভেদ করো, মহারাজ দেখুন।

রাজধর। আগে দাদার হোক।

ইশা খাঁ। এখন উত্তর করবার সময় নয়, আমার আদেশ পালন করো।

রাজধরের তীর-নিক্ষেপ

ইশা খাঁ। যাক, তোমার তীরও তোমার দাদার তীরেরই অনুসরণ করেছে— লক্ষ্যের দিকে লক্ষও করে নি।

যুবরাজ। ভাই, তোমার বাণ অনেকটা নিকট দিয়েই গেছে, আর-একটু হলেই লক্ষ্য বিদ্ধ করতে পারত।

রাজধব। লক্ষ্য বিদ্ধ তো হয়েছে! দূর থেকে তোমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছ না। ঐ-যে বিদ্ধ হয়েছে।

যুবরাজ। না, রাজধর, তোমার দৃষ্টির ভ্রম হয়েছে— লক্ষ্য বিদ্ধ হয় নি।

রাজধর। আমার ধনুর্বিদ্যার প্রতি তোমাদের বিশ্বাস নেই বলেই তোমরা দেখেও দেখতে পাচ্ছ না। আচ্ছা, কাছে গেলেই প্রমাণ হবে।

ইন্দ্রকুমারের ধনুক-গ্রহণ

যুবরাজ। (ইন্দ্রকুমারের প্রতি) ভাই আমি অক্ষম, সেজন্যে আমার উপর তোমার রাগ করা উচিত না। তুমি যদি লক্ষ্যভ্রষ্ট হও তা হলে তোমার ভ্রষ্টলক্ষ্য তীর আমার হৃদয় বিদীর্ণ করবে এ তুমি নিশ্চয় জেনো।

ইন্দ্রকুমারের তীর-নিক্ষেপ

নেপথ্যে জনতা। জয়, কুমার ইন্দ্রকুমারের জয়!

বাদ্য বাজিয়া উঠিল। যুবরাজ ইন্দ্রকুমারকে আলিঙ্গন করিলেন

ইশা খাঁ। পুত্র, আল্লার কৃপায় তুমি দীর্ঘজীবী হয়ে থাকো। মহারাজ, মধ্যমকুমার পুরস্কারের পাত্র। যেরূপ প্রতিশ্রুত আছেন তা পালন করুন।

রাজধর। না মহারাজ, পুরস্কার আমারই প্রাপ্য। আমারই তীর লক্ষ্যভেদ করেছে।

মহারাজ। কখনোই না।

রাজধর। সেনাপতি সাহেব পরীক্ষা করে আসুন কার তীর লক্ষ্যে বিঁধে আছে।

ইশা খাঁ। আচ্ছা, আমি দেখে আসি।

[প্রস্থান

তীর হাতে লইয়া ইশা খাঁর পুনঃপ্রবেশ

ইশা খাঁ। (ইন্দ্রকুমারের প্রতি) বাবা, আমি বুড়োমানুষ, চোখে তো ভুল দেখছি নে? এই তীরের ফলায় যেন রাজধরের নাম দেখা যাচ্ছে।

ইন্দ্রকুমার। হাঁ, রাজধরেরই নাম।

মহারাজ। দেখি। তাই তো! একসঙ্গে আমাদের সকলেরই ভুল হল!

রাজধর। আজ নয় মহারাজ, আমার প্রতি বরাবরই ভুল হয়ে আসছে!

ইশা খাঁ। কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

ইন্দ্রকুমার। আমি বুঝেছি।

রাজধর। মহারাজ, আজ বিচার করুন।

ইন্দ্রকুমার। (জনান্তিকে) বিচার! তুমি বিচার চাও! তা হলে যে মুখে চুনকালি পড়বে! বংশের লজ্জা প্রকাশ করব না, অন্তর্যামী তোমার বিচার করবেন।

ইশা খাঁ। কী হয়েছে বাবা? এর মধ্যে একটা রহস্য আছে। শিলা কখনো জলে ভাসে না, বানরে কখনো সংগীত গায় না। বাবা ইন্দ্রকুমার, ঠিক কথা বলো তো কী হয়েছে। তূণ বদল হয় নি তো?

রাজধর। কখনোই না। পরীক্ষা করে দেখো।

ইশা খাঁ। তাই তো দেখছি— তূণ তো ঠিকই আছে। আচ্ছা, বাবা ইন্দ্রকুমার, সত্য করে বলো, এর

মধ্যে তোমার অস্ত্রশালায় কেউ কি প্রবেশ করেছিল ?

ইন্দ্রকুমার। সে কথায় প্রয়োজন নেই খাঁ সাহেব।

ইশা খাঁ। ঠিক করে বলো বাবা, তুমি নিশ্চয় জান কেউ তোমার অস্ত্রশালায় গিয়ে তোমার সঙ্গে তীর বদল করেছে।

ইন্দ্রকুমার। চুপ করো খাঁ সাহেব। ও কথা থাক্।

ইশা খাঁ। তা হলে তুমি হার মানছ ?

ইন্দ্রকুমার। হাঁ, আমি হার মানছি।

ইশা খাঁ। শাবাস বাবা, শাবাশ ! তুমি রাজার ছেলে বটে। মহারাজ, কোথাও একটা-কিছু অন্যায় হয়ে গেছে, সে কথাটা প্রকাশ হচ্ছে না। আর-এক বার পরীক্ষা না হলে ঠিকমত মীমাংসা হতে পারবে না।

রাজধর। খাঁ সাহেব, অন্যায় আর কিছু নয়, আমার জেতাই অন্যায় হয়েছে। কিন্তু তাই বলে আবার পরীক্ষার অপমান আমি স্বীকার করতে পারব না। আমার জিত হওয়া যদি অন্যায় হয়ে থাকে সে অন্যায়ের সহজ প্রতিকার আছে। আমি পুরস্কার চাই নে, মধ্যম কুমারকেই পুরস্কার দেওয়া হোক।

মহারাজ। সে কথা আমি বলতে পারি নে— তীরে যখন তোমার নাম লেখা আছে তখন তোমাকে পুরস্কার দিতেই আমি বাধ্য। এই তুমি নাও।

তলোযার প্রদান

রাজধর। পুরস্কার আমি শিরোধার্য করে নিচ্ছি, কিন্তু আমার এই সৌভাগ্যে কারও মন যখন প্রসন্ন হচ্ছে না তখন এই তলোয়ার আমি দাদা ইন্দ্রকুমারকেই দিলুম।

ইন্দ্রকুমারের দিকে তলোযার অগ্রসর-করণ

ইন্দ্রকুমার। (তলোয়ার মাটিতে নিক্ষেপ করিয়া) ধিক্ ! তোমার হাত থেকে এ পুরস্কারের অপমান গ্রহণ করবে কে ?

ইশা খাঁ। (ইন্দ্রকুমারের হাত ধরিয়া) কী ? ইন্দ্রকুমার, মহারাজের দত্ত তলোয়ার তুমি মাটিতে ফেলে দিতে সাহস কর ! তোমার এই অপরাধের সমুচিত শাস্তি হওয়া চাই।

ইন্দ্রকুমার। (হাত ছাড়াইয়া লইয়া) বৃদ্ধ, আমাকে স্পর্শ কোরো না।

ইশা খাঁ। পুত্র, একি পুত্র ! তুমি আজ আত্মবিস্মৃত হয়েছ।

ইন্দ্রকুমার। সেনাপতি সাহেব, আমাকে ক্ষমা করো। আমি যথার্থই আত্মবিস্মৃত হয়েছি। আমাকে শাস্তি দাও।

যুবরাজ। ক্ষান্ত হও ভাই, ঘরে ফিরে চলো।

ইন্দ্রকুমার। (মহারাজের পদধূলি লইয়া) পিতা, অপরাধ মার্জনা করুন। আজ সকল রকমেই আমার হার হয়েছে।

ইশা খাঁ। মহারাজ, আমার একটি নিবেদন আছে। খেলার পরীক্ষা তো চুকেছে, এবার কাজের পরীক্ষা হোক। দেখা যাবে তাতে আপনার কোন্ পুত্র পুরস্কার আনতে পারে।

মহারাজ। কোন্ কাজের কথা বলছ সেনাপতি।

ইশা খাঁ। আরাকান-রাজের সঙ্গে মহারাজের যুদ্ধের মতলব আছে। সৈন্যও তো প্রস্তুত হয়েছে। এইবার কুমারদের সেই যুদ্ধে পাঠানো হোক।

মহারাজ। ভালো কথাই বলেছ সেনাপতি। খবর পেয়েছি আরাকানের রাজা চট্টগ্রামের সীমানার কাছে এসেছেন। বার বার শিক্ষা দিয়েছি, কিন্তু মূর্খের শিক্ষার শেষ তো কিছুতেই হয় না, যমরাজের পাঠশালায় না পাঠালে গতি নেই। কী বল বৎসগণ ! আমাদের সেই চিরশত্রুর সঙ্গে লড়াইয়ে যাত্রা করে ক্ষাত্রচর্যে দীক্ষা গ্রহণ করতে রাজি আছ কি ?

ইন্দ্রকুমার। রাজি। দাদাও যাবেন।

রাজধর। আমিও যাব না মনে করছ নাকি ?

মহারাজ। তবে ইশা খাঁ, তুমি সৈন্যাধ্যক্ষ হয়ে এঁদের সকলকে শত্রুবিজয়ে নিয়ে যাও। ত্রিপুরেশ্বরী তোমাদের সহায় হোন।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রাজধরের শিবির

রাজধর ও ধুরন্ধর

ধুরন্ধর। তুমি পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে তফাতে থাকবে না কি ?

রাজধর। হাঁ— ইশা খাঁর কাছে আমি এই প্রস্তাব পাঠিয়েছিলুম।

ধুরন্ধর। সে তো আমি জানি ; আমি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলুম। তাই নিয়ে অনেক কথাবার্তা হয়ে গেল।

রাজধর। কিরকম ?

ধুরন্ধর। প্রথমেই তো ইন্দ্রকুমার অট্টহাস্য করে উঠলেন। তিনি বললেন, রাজধরের যুদ্ধপ্রণালীটাই ঐরকম, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বহু দূরে থেকেই তিনি যুদ্ধ করতে ভালোবাসেন।

রাজধর। সে কথা ঠিক। ক্ষেত্র হতে যুদ্ধ করে মজুররা, দূরে থেকে যে যুদ্ধ করতে পারে সেই যোদ্ধা। ইশা খাঁ কী বললেন ?

ধুরন্ধর। তোমার উপর তাঁর বিশ্বাস কিরকম সে তো তুমি জানই। তুমি যদি পায়ে ধরতে যাও তা হলেও তিনি সন্দেহ করেন নিশ্চয় জুতোজোড়াটা তোমার সরাবার মতলব আছে। তাই, ইশা খাঁ বললেন, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে রাজধর তফাতে থাকতে চান সেটা তাঁর পক্ষে আশ্চর্য নয়, কিন্তু পাঁচ হাজার সৈন্য সঙ্গে রাখতে চান সেইটে আমার ভালো ঠেকছে না।

রাজধর। যুবরাজ কিছু বললেন না ?

ধুরন্ধর। যুবরাজ কাউকে যে সন্দেহ করবেন সে পরিমাণ বুদ্ধি ভগবান তাঁকে দেন নি— এমন-কি, তুমি যে তুমি, তোমার উপরেও তাঁর সন্দেহ হয় না।

রাজধর। দেখো ধুরন্ধর, দাদার কথা তুমি অমন করে বোলো না।

ধুরন্ধর। ওঃ, ঐ জায়গাটা তোমার একটু নরম আছে সেটা মাঝে মাঝে ভুলে যাই। যা হোক, তিনি বললেন, না, না, রাজধরের প্রতি তোমরা অন্যায় অবিচার করছ। তাঁর প্রস্তাবটা তো আমার ভালোই ঠেকছে। যুদ্ধে যদি সংকট উপস্থিত হয় তা হলে তিনি তাঁর সৈন্য নিয়ে আমাদের সাহায্য করতে পারবেন। যুবরাজের অনুরোধেই তো ইশা খাঁ তোমার প্রস্তাবে রাজি হলেন, নইলে তাঁর বড়ো ইচ্ছে ছিল না। যাই হোক, কিন্তু আমি তোমার আলাদা থাকবার মতলব ভালো বুঝতে পারছি নে।

রাজধর। ওঁদের সঙ্গে একত্রে মিলে যুদ্ধ করে আমার লাভ কী ? জিত হলে সে জিতকে কেউ আমার জিত বলবে না তো।

ধুরন্ধর। তবু ভুলেও কেউ তোমার নাম করতে পারে, কিন্তু তফাতে বসে থাকলে যুদ্ধে জয় হলেও তোমার অপযশ, হারলে তো কথাই নেই।

রাজধর। আমার এই পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়েই আমি যুদ্ধে জিতব এবং আমি একলাই জিতব।

দূতের প্রবেশ

রাজধর। কী রে, যুদ্ধের খবর কী ?

দূত। আজ্ঞে, লড়াই তো সমস্ত দিন ধরেই চলেছে, কিন্তু এ পর্যন্ত এঁরা শত্রুদের ব্যূহ ভেদ করতে

পারেন নি। সূর্য অস্ত যাবার আর তো বেশি দেরি নেই, অন্ধকার হয়ে এলে বোধ হয় যুদ্ধ আজকের মতো বন্ধ রাখতে হবে।

দ্বিতীয় দূতের প্রবেশ

রাজধর। কে তুমি ?

দ্বিতীয় দূত। আজ্ঞে আমি ব্যোমকেশ, যুবরাজ আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন— সেও প্রায় দুই প্রহর হয়ে গেল— আপনার যেখানে সৈন্য নিয়ে থাকবার কথা ছিল সেখানে আপনার কোনো চিহ্ন না পেয়ে বহু সন্ধানে এখানে এসেছি।

রাজধর। যুবরাজের আদেশ কী ?

দূত। শত্রুসৈন্যের সংখ্যা আমরা যেরকম অনুমান করেছিলুম তার চেয়ে অনেক বেশি দেখা যাচ্ছে, যুদ্ধ খুব কঠিন হয়ে এসেছে। কুমার ইন্দ্রকুমার তাঁর অশ্বারোহী-দল নিয়ে শত্রুসৈন্যের উত্তর দিক আক্রমণ করেছিলেন, আর কিছুক্ষণ সময় পেলেই তিনি সে দিক থেকে শত্রুসৈন্যকে একেবারে নদীর কিনারা পর্যন্ত হঠিয়ে আনতে পারতেন।

রাজধর। সত্যি নাকি ! সময় পেলে কী করতে পারতেন সে কথা কল্পনা করে বিশেষ লাভ দেখি নে, কিন্তু সময় পান নি বলেই বোধ হচ্ছে।

দূত। শত্রুসৈন্যকে যখন প্রায় টলিয়ে এনেছেন এমন সময় খবর পেলেন যে যুবরাজ সংকটে পড়েছেন, শত্রু তাঁকে ঘিরে ফেলেছে। ইশা খাঁ তখন অন্য দিকে যুদ্ধে নিযুক্ত ছিলেন, তিনি খবর পেয়ে বললেন, যুবরাজকে উদ্ধার করবার জন্যে আমি এখানে আসি নি, আমাকে যুদ্ধে জিততে হবে ; আমি এখান থেকে নড়তে গেলেই শত্রুরা সুবিধা পাবে।

রাজধর। দাদা কি তবে—

দূত। না, তাঁর কোনো বিপদ এখনো ঘটে নি। ইন্দ্রকুমার সৈন্য নিয়ে তাঁকে উদ্ধার করেছেন। কিন্তু এই গোলেমালে যুদ্ধে আমাদের অসুবিধা ঘটল। আপনাকে সন্ধান করবার জন্যে নানা দিকে দূত গিয়েছে। আপনার সাহায্য না হলে বিপদ ঘটতেও পারে, অতএব আপনি আর কিছুমাত্র বিলম্ব করবেন না।

রাজধর। না, কিছুমাত্র বিলম্ব করব না। যাও, বিশ্রাম করো গে যাও— আমি প্রস্তুত হচ্ছি।

[দূতের প্রস্থান

ধুরন্ধর। তুমি যাচ্ছ নাকি ?

রাজধর। যাচ্ছি বটে, কিন্তু ও দিকে নয়, অন্য দিকে।

ধুরন্ধর। বাড়ির দিকে ?

রাজধর। তুমিও কি ইশা খাঁর কাছ থেকে বিদ্রূপ অভ্যেস করেছ ! বীরত্ব যাঁর খুশি তিনি দেখান, কিন্তু যুদ্ধে জয় করে যদি কেউ বাড়ি ফেরে তো সে রাজধর। ধুরন্ধর, যাও তুমি— দেখো গে আমার শিবিরে কোথাও যেন কেউ আগুন না জ্বালে, একটি প্রদীপও যেন না জ্বলতে পায়।

ধুরন্ধর। আচ্ছা আমি সকলকে সতর্ক করে দিচ্ছি, কিন্তু কী তোমার অভিপ্রায় খুলেই বলো-না— তুমি যদি আমাকে আর আমি যদি তোমাকে সন্দেহ করি তা হলে পৃথিবীতে আমাদের দুটির তো কোথাও ভর দেবার জায়গা থাকবে না।

রাজধর। আজ রাত্রের অন্ধকারে আমি সৈন্য নিয়ে গোপনে নদী পার হয়ে যাব। হঠাৎ আরাকান-রাজের শিবিরে উপস্থিত হয়ে তাকে বন্দী করতে হবে।

ধুরন্ধর। এখানে কোথায় পার হবে ? ঘাট তো নেই।

রাজধর। পথঘাট আমি সমস্তই সন্ধান করে ঠিক করে রেখেছি। সূর্য তো অস্ত গেল। আজ আড়াই প্রহর রাত্রে চাঁদ উঠবে, তার পূর্বেই আমাদের কাজ শেষ করতে হবে। অতএব আর বড়ো বেশি দেরি নেই— তুমি যাও, প্রস্তুত হও গে। আর-একটি কাজ করো— যুবরাজের দূত যেন ফিরে যেতে না পারে, তাকে বন্দী করে রাখো।

দ্বিতীয় দৃশ্য

ইশা খাঁর শিবির

ইন্দ্রকুমার ও ইশা খাঁ

ইন্দ্রকুমার। সেনাপতি সাহেব, আপনি দাদার উপর রাগ করবেন না। আজ রাত্রে সৈন্যেরা বিশ্রাম করুক, কাল আমরা যুদ্ধে জয়লাভ করব।

ইশা খাঁ। দেখো ইন্দ্রকুমার, আগুন যত শীঘ্র নেবানো যায় ততই মঙ্গল ; তাকে সময় দিলে কিসের থেকে কী ঘটে কিছুই বলা যায় না। আজই আমরা জিতে আসতুম, কেবল তোমার দাদা নিতান্ত নির্বোধের মতো শত্রুদের মাঝখানে নিজেকে খামকা জড়িয়ে বসলেন ; আমাদের সমস্ত পণ্ড হয়ে গেল।

ইন্দ্রকুমার। নির্বোধের মতো কেন বলছ খাঁ সাহেব, বলো বীরের মতো— তিনি সামান্য কয়জন সৈন্য নিয়ে—

ইশা খাঁ। যেখানে গিয়ে পড়েছিলেন সেখানে কেবল নির্বোধই যেতে পারে—

ইন্দ্রকুমার। (উত্তেজিত স্বরে) না, সেখানে বীর না হলে কেউ প্রবেশ করতে সাহস করতে পারে না।

ইশা খাঁ। আচ্ছা বাবা, তোমার কথা মানছি। কিন্তু শুধু বীর নয়, নির্বোধ বীর না হলে সে দিকে কেউ যেত না।

ইন্দ্রকুমার। কিন্তু তাতে তোমার লড়াইয়ের তো কোনো ব্যাঘাত হয় নি।

ইশা খাঁ। খুব ব্যাঘাত হয়েছিল। আমার সৈন্যেরা খবর পেয়ে সকলেই চঞ্চল হয়ে উঠল, তাদের কি আর লড়াইয়ে মন ছিল ? আমাদের সৈন্যের মধ্যে একজনও নেই যুবরাজের বিপদের খবর শুনে যে স্থির থাকতে পারে।

ইন্দ্রকুমার। কিন্তু সেনাপতি সাহেব, আমাদের রাজধরের খবর কী ?

ইশা খাঁ। আমি চার দিকেই দূত পাঠিয়েছিলুম ; একজন ছাড়া সব দূতই ফিরে এসেছে, কোথাও তার কোনো সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না।

ইন্দ্রকুমার। হা হা হা হা, সে নিশ্চয় পালিয়েছে।

ইশা খাঁ। হাসির কথা নয় বাবা।

ইন্দ্রকুমার। তা কী করব সেনাপতি সাহেব, আমি খুশি হয়েছি। আমরা যুদ্ধ করে মরতুম, আর ও যে আমাদের খ্যাতিতে ভাগ বসাত সে আমার কিছুতে সহ্য হত না ; তার চেয়ে ও ভেগে গেছে সে ভালোই হয়েছে। এবারকার অস্ত্রপরীক্ষায় তো ফাঁকি চলবে না।

ইশা খাঁ। কিন্তু সেবার কী হয়েছিল তুমি আমার কাছে বল নি।

ইন্দ্রকুমার। সে বলবার কথা না খাঁ সাহেব ; সে আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা কোরো না, সেবার আমি হেরেছিলুম।

ইশা খাঁ। তীর ছুঁড়ে হারো নি বাবা, রাগ করে হেরেছিলে।

তৃতীয় দৃশ্য

আরাকান-রাজের শিবির

আরাকান-রাজ ও রাজধর

আরাকান। দেখুন রাজকুমার, আমাকে বন্দী করে আপনাদের কোনো লাভ নেই।

রাজধর। কেন লাভ নেই রাজন ? এই যুদ্ধের মধ্যে আপনাকে লাভ করাই তো সব চেয়ে বড়ো লাভ।

আরাকান। তাতে যুদ্ধের অবসান হবে না। আমার ভাই হাম্চু রয়েছে, সৈন্যেরা তাকেই রাজা করবে, যুদ্ধ যেমন চলছিল তেমনি চলবে।

রাজধর। আপনাকে মুক্তিই দেব, কিন্তু সেটা তো একেবারে বিনা মূল্যে দেওয়া চলবে না।

আরাকান। সে আমি জানি, মূল্য দিতে হবে। আমি আপনার কাছে পরাজয় স্বীকার করে সন্ধিপত্র লিখে দিতে রাজি আছি।

রাজধর। শুধু সন্ধিপত্র দিলে তো হবে না মহারাজ। আপনি যে পরাজয় স্বীকার করলেন তার কিছু নিদর্শন তো দেশে নিয়ে যেতে হবে :

আরাকান। আপনাকে পাঁচ শত ব্রহ্মদেশের ঘোড়া ও তিনটি হাতি উপহার দেব।

রাজধর। সে উপহারে আমার প্রয়োজন নেই ; মহারাজের মাথার মুকুট আমাকে দিতে হবে।

আরাকান। তার চেয়ে প্রাণ দেওয়া সহজ ছিল।

রাজধর। প্রাণ দিলেও মুকুটটি তো বাঁচাতে পারবেন না, মাঝের থেকে প্রাণটাই বৃথা যাবে।

আরাকান। তবে মুকুট নিন, কিন্তু এই মুকুটের সহিত আরাকানের চিরস্থায়ী শত্রুতা আপনি ঘরে নিয়ে যাচ্ছেন। এই মুকুট যতদিন না আবার ফিরে পাব ততদিন আমার রাজবংশে শান্তি থাকবে না।

রাজধর। এই তো রাজার মতো কথা। আমরাও তো শান্তি চাই নে মহারাজ, আমরা ক্ষত্রিয়। আর-একটি কর্তব্য বাকি আছে। শীঘ্র যুদ্ধ নিবারণ করে এক আদেশপত্র আপনার সেনাপতির নিকট পাঠিয়ে দিন, ও পারে এতক্ষণ যুদ্ধের উদ্যোগ হচ্ছে।

আরাকান। এখনই আমার আদেশ নিয়ে দূত যাবে।

রাজধর। তবে চলুন, সন্ধিপত্র লেখার ব্যবস্থা করা যাক।

চতুর্থ দৃশ্য

রণক্ষেত্র

যুবরাজ ও ইন্দ্রকুমার

যুবরাজ। আজকের যুদ্ধে গতিকটা ভালো বোঝা যাচ্ছে না। আমার মনে হচ্ছে আমাদের সৈন্যেরা কালকের ব্যাপারে আজও নিরুৎসাহ হয়ে রয়েছে, ওরা যেন ভালো করে লড়ছে না। ইশা খাঁ কোন্ দিকে ?

ইন্দ্রকুমার। ঐ-যে পূর্বকোণে তাঁর নিশান দেখা যাচ্ছে।

যুবরাজ। ভাই, তুমি কেন আজ আমার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছ ? তোমার বোধ হয় ঐ উত্তরের দিকে যাওয়াই কর্তব্য।

ইন্দ্রকুমার। না, আমার এই জায়গাই ভালো।

যুবরাজ। ইন্দ্রকুমার, তুমি তোমার দাদাকে আজ নির্বুদ্ধিতা থেকে বাঁচাবার জন্যে সতর্ক হয়ে কাছে কাছে ফিরছ। খাঁ সাহেব যে আবার কোনো সুযোগে আমার বুদ্ধির দোষ ধরবেন এটা তোমার ভালো লাগছে না। কিন্তু ভাই, আমারও নির্বুদ্ধিতার সীমা আছে, আমি আজ বোধ হয় সাবধানে কাজ করতে পারব। ঐ দেখো, চেয়ে দেখো, আমার কিন্তু ভালো বোধ হচ্ছে না। ঐ দেখো, ঐ পাশে আমাদের সৈন্যেরা যেন টলছে, এখনই পালাতে আরম্ভ করবে ; তুমি না হলে কেউ ওদের ঠেকাতে পারবে না। ইন্দ্রকুমার, দেরি কোরো না, আমার জন্যে তোমার কোনো ভয় নেই। একি ! একি ! একি !

ইন্দ্রকুমার। তাই তো, একি ! শত্রুসৈন্যরা হঠাৎ যুদ্ধ বন্ধ করলে যেন !

যুবরাজ। ঐ-যে সন্ধির নিশান উড়িয়েছে ! ওদের তো পরাজয়ের কোনো লক্ষণ ছিল না, তবে কেন এমন ঘটল ? আমার তো মনে হচ্ছিল আজকের যুদ্ধে আমাদের সৈন্যেরাই টল্‌মল্ করছে।

দূতের প্রবেশ

দূত। যুবরাজ, শত্রুপক্ষ যুদ্ধে ক্ষান্ত হয়েছে।

যুবরাজ। সে তো দেখতে পাচ্ছি। এর কারণ কী ?

দূত। কারণ এখনো জানতে পারি নি, কিন্তু শুনতে পেয়েছি আরাকান-রাজ আর আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন না বলে সংবাদ পাঠিয়েছেন।

যুবরাজ। সুসংবাদ। আমার কেবল মনে একটি বেদনা বাজছে।

ইন্দ্রকুমার। কিসের বেদনা দাদা ?

যুবরাজ। রাজধর কেন সৈন্য নিয়ে চলে গেল ! সে যদি থাকত তা হলে কী আনন্দের সঙ্গে আমরা তিন ভাই জয়োৎসব করতে পারতুম। আজকের আমাদের জয়গৌরবের মধ্যে এই একটি মস্ত অভাব রয়ে গেল— রাজধর যুদ্ধে যোগ না দিয়ে আমাকে বড়ো দুঃখ দিয়েছে।

ইন্দ্রকুমার। জয়ের ভাগ না নিয়েই সে যদি পালিয়ে থাকে তাতে এমনি কী ক্ষতি হয়েছে দাদা !

যুবরাজ। না ভাই, আমরা তিন ভাই একত্রে বেরিয়েছি, বিজয়লক্ষ্মীর প্রসাদ আমরা ভাগ করে ভোগ না করতে পারলে আমার তো মনে দুঃখ থেকে যাবে। রাজধর যদি মাথা হেঁট করে বাড়ি ফেরে, আমাদের সৌভাগ্যে যদি তার মুখ বিমর্ষ হয়, তা হলে এই কীর্তি আমাকে কিছুমাত্র সুখ দেবে না।— ঐ-যে ঘোড়া ছুটিয়ে সেনাপতি সাহেব আসছেন।

ইশা খাঁর প্রবেশ

ইন্দ্রকুমার। খাঁ সাহেব, শত্রুসৈন্য হঠাৎ যুদ্ধ থামিয়ে দিলে কেন তার কোনো খবর পেয়েছ ?

ইশা খাঁ। পেয়েছি বৈকি। রাজধর আরাকান-রাজকে বন্দী করেছে।

ইন্দ্রকুমার। রাজধর ! মিথ্যা কথা !

ইশা খাঁ। যা মিথ্যা হওয়া উচিত ছিল এক-এক সময় তাও সত্য হয়ে ওঠে। আমি দেখতে পাচ্ছি আল্লার দূতেরা এক-এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে, শয়তান তখন সমস্ত হিসাব উলটা করে দিয়ে যায়।

ইন্দ্রকুমার। শয়তানও কি রাজধরকে জিতিয়ে দিতে পারে !

ইশা খাঁ। একবার তো জিতিয়েছিল সেই অস্ত্রপরীক্ষার সময়— এবারও সেই শয়তান জিতিয়েছে।

যুবরাজ। সেনাপতি সাহেব, তুমি রাজধরের উপর রাগ কোরো না। সে যদি জিতে থাকে তাতে তো আমাদেরই জিত। কখন সে যুদ্ধ করলে, কখন বা বন্দী করলে, আমরা তো জানতে পারি নি।

ইশা খাঁ। কাল সন্ধ্যার পরে আমরা যখন যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়ে শিবিরে ফিরে এলেম তখন সে অন্ধকারে গোপনে নদী পার হয়ে হঠাৎ আরাকান-রাজের শিবির আক্রমণ করে তাঁকে বন্দী করেছে। আমাদের সাহায্য করবার জন্যে আমি তাকে যেখানে প্রস্তুত থাকতে বলেছিলুম সেখানে সে ছিলই না। আমি সেনাপতি, আমার আদেশ সে মান্যই করে নি।

ইন্দ্রকুমার। অসহ্য ! এজন্যে তার শাস্তি পাওয়া উচিত।

ইশা খাঁ। শুধু তাই ! যুবরাজ উপস্থিত থাকতে সে কিনা নিজের ইচ্ছামত সন্ধিপত্র রচনা করেছে !

ইন্দ্রকুমার। এর শাস্তি না দিলে অন্যায় হবে।

ইশা খাঁ। তোমার দাদাকে এই সহজ কথাটি বুঝিয়ে দাও দেখি।

রাজধরের প্রবেশ

ইন্দ্রকুমার। রাজধর ! তুমি কাপুরুষতা প্রকাশ করেছ।

রাজধর। তোমার মতো যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়ে পুরুষকার প্রকাশ করতে আমি এত দূরে আসি নি— আমি যুদ্ধ জয় করতে এসেছিলুম।

ইন্দ্রকুমার। তুমি যুদ্ধ করেছ ? এবং জয় করেছ ! জয়লক্ষ্মীর মুখ যে লজ্জায় লাল করে তুলেছ !

রাজধর। তা হতে পারে, সেটা প্রণয়ের লজ্জা। কিন্তু তিনি যে আমাকে বরণ করেছেন তার সাক্ষী এই।

ইন্দ্রকুমার। এ মুকুট কার?

রাজধর। এ মুকুট আমার। এ আমার জয়ের পুরস্কার।

ইন্দ্রকুমার। যুদ্ধ থেকে পালিয়েছ তুমি, তুমি পুরস্কার পাবে কিসের! এ মুকুট যুবরাজ পরবেন।

রাজধর। আমি জিতে এনেছি, আমিই পরব।

যুবরাজ। রাজধর ঠিক কথাই বলছেন। ওঁর জয়ের ধন তো উনিই পরবেন।

ইশা খাঁ। সেনাপতির আদেশ লঙ্ঘন করে উনি অন্ধকারে শৃগালবৃত্তি অবলম্বন করলেন— আর, উনি পরবেন মুকুট! ভাঙা হাঁড়ির কানা পরে যদি দেশে যান তবেই ওঁকে সাজবে।

রাজধর। আমি যদি না থাকতুম ভাঙা হাঁড়ির কানা তোমাদের পরতে হত। এতক্ষণ থাকতে কোথায়?

ইন্দ্রকুমার। যেখানেই থাকি তোমার মতো পালিয়ে থাকতুম না।

যুবরাজ। ইন্দ্রকুমার, তুমি অন্যায় বলছ ভাই। সত্য বলতে কি, রাজধর না থাকলে আজ আমাদের বিপদ হত।

ইন্দ্রকুমার। কিচ্ছু বিপদ হত না। রাজধর সৈন্য লুকিয়ে রেখেই আমাদের বিপদে ফেলবার চেষ্টা করেছিল। রাজধর না থাকলে এ মুকুট আমি যুদ্ধ করে আনতুম। রাজধর চুরি করে এনেছে। দাদা, এ মুকুট এনে আমি তোমাকেই পরাতুম, নিজে পরতুম না।

যুবরাজ। (রাজধরের প্রতি) ভাই, তুমিই আজ জিতেছ। তুমি না থাকলে অল্প সৈন্য নিয়ে আমাদের কী বিপদ হত বলা যায় না। এ মুকুট আমি তোমাকেই পরিয়ে দিচ্ছি।

ইন্দ্রকুমার। (রুদ্ধকণ্ঠে) রাজধর ক্ষাত্রধর্ম লঙ্ঘন করেছে বলে তোমার কাছ থেকে আজ পুরস্কার পেলে, আর আমি-যে প্রাণকে তুচ্ছ করে বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করলুম তোমার মুখ থেকে একটা প্রশংসার কথাও শুনতে পেলুম না! এমন কথা তোমার মুখ থেকে আজ শুনতে হল যে, রাজধর না থাকলে কেউ তোমাকে বিপদ হতে উদ্ধার করতে পারত না! কেন দাদা, আমি কি প্রত্যুষ থেকে আর সন্ধ্যা পর্যন্ত তোমার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে লড়াই করি নি! আমি কি রণক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়েছিলুম! আমি কি শত্রুসৈন্যের বেষ্টন ছিন্ন করে তোমার সাহায্যের জন্যে আসি নি! কী দেখে তুমি বললে তোমার স্নেহের রাজধর ছাড়া কেউ তোমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারত না!

যুবরাজ। ভাই, আমি নিজের বিপদের কথা বলছি নে।

ইন্দ্রকুমার। থাক্ দাদা, থাক্। আর কিছুই বলতে হবে না। রাজধরের মতো এমন অসাধারণ বীরকে যখন তুমি সহায় পেয়েছ তখন আমার আর প্রয়োজন নেই— আমি চললেম।

যুবরাজ। ভাই, আবার! আবার তুমি আত্মবিস্মৃত হচ্ছ!

ইন্দ্রকুমার। যেখানে আমার প্রয়োজন নেই সেখানে আমার পক্ষে থাকাই অপমান!

[প্রস্থান

ইশা খাঁ। যুবরাজ, এ মুকুট তোমার কাউকে দেবার অধিকার নেই। আমি সেনাপতি, আমি যাকে দেব এ তারই হবে।

রাজধরের মাথা হইতে মুকুট লইয়া যুবরাজকে পরাইয়া দিতে উদ্যত হইলেন

যুবরাজ। (সরিয়া গিয়া) না, এ মুকুট আমি নিতে পারি নে।

ইশা খাঁ। তবে থাক্। এ মুকুট কেউ পাবে না। এ কর্ণফুলির জলে যাক। (মুকুট নিক্ষেপ) রাজধর যুদ্ধের নিয়ম লঙ্ঘন করেছেন, উনি শাস্তির যোগ্য।

রাজধর। দাদা, তুমি সাক্ষী রইলে। এ আমি ভুলব না।

যুবরাজ। এইটেই কি সকলের চেয়ে মনে রাখবার কথা! মুকুটটাও যদি জলে গিয়ে থাকে তবে ওর সমস্ত লাঞ্ছনাও যাক। তোমারও যা ভোলবার ভোলো, আমাদেরও যা ভোলবার ভুলে যাই।— দেখি, ইন্দ্রকুমার সত্যিই রাগ করে আমাদের ছেড়ে চলে গেল কি না।

পঞ্চম দৃশ্য

শিবির

রাজধর ও ধুরন্ধর

রাজধর। ধুরন্ধর, আমার মুকুট যেখানে গিয়েছে আমাদের যুদ্ধজয়কেও সেই কর্ণফুলির জলে জলাঞ্জলি দেব।

ধুরন্ধর। আবার হারবে নাকি?

রাজধর। হাঁ, এবার হেরে জিতব। ইন্দ্রকুমারের অহংকারকে ধুলোয় না লুটিয়ে দিয়ে আমি ফিরব না। আমার হাতের জিতকে তিনি গ্রহণ করবেন না! দেখি, এবার নিজে তিনি কেমন জিততে পারেন।

ধুরন্ধর। অত বেশি নিশ্চিন্ত হোয়ো না, দৈবাৎ জিতে যেতেও পারে। সত্যি কথায় রাগ করলে চলবে না, যুদ্ধবিদ্যাটা ইন্দ্রকুমার একটু শিখেছে।

রাজধর। আচ্ছা, সে-সব তর্ক পরে হবে। এখন তোমাকে একটি কাজ করতে হবে। আরাকান-রাজ সৈন্য নিয়ে কাল প্রাতেই যাত্রা করবেন। কথা আছে যতদিন না তিনি চট্টগ্রামের সীমানা পেরিয়ে যাবেন ততদিন তাঁর সেনাপতিরা আমার শিবিরে বন্দী থাকবেন। তিনি শিবির তোলবার পূর্বেই আজ রাত্রে গোপনে তাঁর কাছে তুমি আমার এই চিঠিখানি নিয়ে যাবে।

ধুরন্ধর। চিঠিতে কী আছে সেটা তো আমার জানা ভালো। কেননা, যদি দুটো-একটা কথা বলবার দরকার হয় তা হলে ব'লে কাজটা চুকিয়ে আসতে পারব।

রাজধর। আমি লিখেছি আমি অপমানিত হয়েছি, এইজন্য আমার ভাইদের কাছ থেকে আমি অবসর নিলুম। আমার পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে আমি গৃহে ফেরবার ছলে দূরে চলে যাব, ইন্দ্রকুমারও দাদার উপর অভিমান করে চলে গেছে, সৈন্যেরাও যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে জেনে ফেরবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে— এই অবকাশে যদি আরাকান-রাজ সহসা আক্রমণ করেন তা হলে ত্রিপুরার সৈন্যদের নিশ্চয় হার হবে।

ধুরন্ধর। হার তো হবে। তার পরে? তুমি-সুদ্ধ শেষে হায় হায় করে মরবে না তো! আগুন যদি লাগাতে হয় তো নিজের ঘরের চালটা সামলে লাগাতে হবে।

রাজধর। আমাকে সাবধান করে দেবার জন্যে আর-কারও বুদ্ধির প্রয়োজন হবে না। তুমি প্রস্তুত হও গে— দেখো, কেউ যেন জানতে না পারে। আমার সৈন্যেরা যদি কোনোমতে সন্দেহ করে তা হলে সমস্তই পণ্ড হবে।

ধুরন্ধর। দেখো রাজধর, আমাকে সাবধান করে দেবার জন্যেও আর-কারও বুদ্ধির প্রয়োজন হবে না— তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।

ষষ্ঠ দৃশ্য

রণক্ষেত্র

ইশা খাঁ ও যুবরাজ

ইশা খাঁ। যুবরাজ, আল্লাকে স্মরণ করো। আজ বড়ো শক্ত সময় এসেছে।

যুবরাজ। শক্তটা কিসের খাঁ সাহেব! ভগবানের যখন ইচ্ছা হয় তখন মরাও শক্ত নয়, বাঁচাও শক্ত নয়— সবই সহজ।

ইশা খাঁ। মহারাজ আমার হাতে তোমাদের দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন, সেইজন্যেই মনে আক্ষেপ হচ্ছে। নইলে যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যু তো বিবাহশয্যায় নিদ্রা। যুবরাজ, তুমি পালাবার চেষ্টা করো— যুদ্ধের ভার আমার উপর রইল।

যুবরাজ। তুমি আমাদের অস্ত্রগুরু, তোমার মুখে এ উপদেশ সাজে না। তা ছাড়া পথই বা কোথায়? আজ মরবার যেমন চমৎকার সুযোগ হয়েছে পালাবার তেমন নয়।

ইশা খাঁ। কিন্তু বাবা, মনের মধ্যে একটা আগুন জ্বলছে। ইন্দ্রকুমার যে অভিমান করে দূরে চলে গেল, তার এই অপরাধের শাস্তি দেবার জন্যে আমি হয়তো বেঁচে থাকব না।

যুবরাজ। যদি বেঁচে না থাক সেনাপতি, তা হলে তার শাস্তি আরো ঢের বেশি হবে। সে-যে তোমাকে পিতার মতো জানে।

ইশা খাঁ। আল্লা! সে কথা সত্য। বাবা, আজ বুঝছি আমার সময় হবে না। কিন্তু যদি তোমার সুযোগ হয় তবে তাকে বোলো, যদি ইশা খাঁ বেঁচে থাকত তবে তাকে শাস্তি দিত, কিন্তু মরবার আগে তাকে ক্ষমা করে মরেছে। বাস, আর সময় নেই— চললুম বাবা। এসো, একবার আলিঙ্গন করে যাই। আল্লার হাতে দিয়ে গেলুম, তিনি তোমাকে রক্ষা করবেন।

যুবরাজ। খাঁ সাহেব, কতদিন কত অপরাধ করেছি, আজ সমস্ত মার্জনা করে যাও।

ইশা খাঁ। বাবা, জন্মকাল থেকে তোমাকে দেখছি, কোনোদিন কোনো অপরাধ তুমি জমতে দাও নি, হাতে হাতে সমস্তই নিকাশ করে দিয়েছ— আজ মার্জনা করব এমন তো কিছুই রাখ নি। তোমার নির্মল প্রাণ আজ আল্লা যদি নেন তবে তাঁর স্বর্গোদ্যানের কোনো ফুলের কাছেই সে ম্লান হবে না।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রণক্ষেত্র

সৈন্যদল

প্রথম সৈনিক। এ কি সত্যি?

দ্বিতীয় সৈনিক। কী জানি, ভাই, শুনছি তো!

প্রথম। তবে তো সর্বনাশ হবে।

[দ্রুত প্রস্থান

দ্বিতীয় দলের প্রবেশ

প্রথম। কে বললে রে, কে বললে?

দ্বিতীয়। আমাদের উমেশ বললে।

প্রথম। কী জানি ভাই, শুনে যেন মাথায় বজ্রাঘাত হল, ভালো করে সব কথা জিজ্ঞাসা করতে পারলুম না।

দ্বিতীয়। চল্, ভালো করে খোঁজ করে আসি গে।

[প্রস্থান

তৃতীয় দলের প্রবেশ

প্রথম। আমরা তাঁর হাতিকে দেখেছি— হাওদা খালি, মাহুত নেই। প্রভুকে হারিয়ে সে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

দ্বিতীয়। আমাদেরও যে সেই দশা হয়েছে।

তৃতীয়। কোন্ দিকে পড়েছেন কেউ দেখে নি ?

প্রথম। তা তো কেউ বলতে পারে না।

দ্বিতীয়। আমাদের শিবু বলছিল, যুবরাজকে যখন বাণ এসে লাগল তখন মাহুত তাঁর হাতি নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাচ্ছিল, পালাবার সময় মাহুত মারা যায়— তার পরে যুবরাজ যে সেই হাতির উপর থেকে কোন্‌খানে পড়ে গিয়েছেন তা তো কেউ বলতে পারে না।

আর-এক দলের প্রবেশ

চতুর্থ। ওরে, সর্বনাশ হয়ে গেল যে রে ! কুমার ইন্দ্রকুমারকে কি কেউ খবর দিতে ছোটে নি ?

তৃতীয়। অনেকক্ষণ গিয়েছে, আরাকানের ফৌজ আমাদের ফাঁকি দিয়ে আক্রমণ করতেই তখনই লোক গেছে— তাঁকে খুঁজে পেলে তো হয়।

দ্বিতীয়। কুমার রাজধর কি এখনো খবর পান নি ?

চতুর্থ। তিনি কোথায় আছেন খবরই পাওয়া গেল না, বোধ করি ত্রিপুরার দিকে চলে গেছেন। যুবরাজের সংবাদ জানতে পেলে এতক্ষণে তিনিও দৌড়ে ছুটে আসতেন।

প্রথম। আমরা কোন্ মুখে দেশে ফিরব !

তৃতীয়। ফিরব কেন, মরা যাক।

চতুর্থ। যুদ্ধই ফুরিয়ে গেল তো মরব কী করে !

অপর ব্যক্তির প্রবেশ

অপর। ওরে, করছিস কী ! সর্বনাশ হল যে— একবার খোঁজ করবি চল্।

চতুর্থ। হাঁ রে, চল্— আমরা ভাগ করে ভিন্ন ভিন্ন দিকে যাই।

তৃতীয়। আমাদের ভাগ্যে তিনি কি বেঁচে আছেন !

দ্বিতীয়। আমি ভাবছি, ইন্দ্রকুমার যখন এ খবর শুনবেন তখন তিনি কি প্রাণ রাখতে পারবেন !

দ্বিতীয় দৃশ্য

রণক্ষেত্র

ইন্দ্রকুমার ও সৈনিক

ইন্দ্রকুমার। কোথায়— কোথায়— কোথায় ? ওরে, দাদা কোথায় ?

সৈনিক। তাঁকেই তো খুঁজছি প্রভু।

ইন্দ্রকুমার। আর, ইশা খাঁ ?

সৈনিক। আজ বেলা চার প্রহরের সময় যুবরাজ স্বহস্তে ইশা খাঁর কবরে মাটি দিয়েছেন, সেই মাটিতে তাঁর নিজেরও রক্ত তখন মিশছিল।

ইন্দ্রকুমার। ধিক্ ধিক্ ধিক্ ইন্দ্রকুমার ! ধিক্ তোকে ! ধিক্ তোর চণ্ডাল রাগকে ! দাদা ! দাদা ! এই নরাধমকে একবার মাপ চাইতেও সময় দেবে না ? (উচ্চৈঃস্বরে) দাদা ! সাড়া দাও। কেবল এক মুহূর্তের জন্যেও সাড়া দাও। ওরে, আর কেউ নেই নাকি ? যে যেখানে আছিস সকলে মিলে তাঁকে খোঁজ— আজ আমার দাদাকে চাইই যে।

দ্বিতীয় সৈনিকের প্রবেশ

দ্বিতীয়। এই দিকে চলুন কুমার। তাঁর দেখা পেয়েছি।

ইন্দ্রকুমার। কোথায় ? কোথায় ?

দ্বিতীয়। কর্ণফুলির তীরে সেই অর্জুন গাছের তলায়।

ইন্দ্রকুমার। সত্য করে বল্, তিনি কি—

দ্বিতীয়। তিনি বেঁচে আছেন, তোমার জন্যেই অপেক্ষা করে রয়েছেন।

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

কর্ণফুলির তীর। তরুতলে জ্যোৎস্নার ক্ষীণালোকে

যুবরাজ। ওরে, সরিয়ে দে রে, একটু সরিয়ে দে। গাছের ডালগুলো একটু সরিয়ে দে, আজ আকাশের চাঁদকে একটু দেখে নিই। কেউ নেই ! এ কি গাছেরই ছায়া ! না আমার চোখের উপরে ছায়া পড়ে আসছে ! এখনো কর্ণফুলির স্রোতের শব্দ তো শুনতে পাচ্ছি ! এই শব্দটিতেই কি পৃথিবীর শেষ বিদায়সম্ভাষণ শুনব ! ইন্দ্রকুমার ! ভাই ইন্দ্রকুমার ! এখনো তোমার রাগ গেল না !

ইন্দ্রকুমারের প্রবেশ

ইন্দ্রকুমার। দাদা ! দাদা !

যুবরাজ। আঃ, বাঁচলুম ভাই ! তুমি আসবে জেনেই এত দেরি করেই বেঁচে ছিলুম। তুমি অভিমান করে গিয়েছিলে বলেই আমি যেতে পাচ্ছিলুম না। কিন্তু, অনেক রাত হয়ে গেছে ভাই, এবার তবে ঘুমোই, মা কোল পেতেছেন।

ইন্দ্রকুমার। দাদা ! মার্জনা করলে কি ?

যুবরাজ। সমস্তই, সমস্তই ! এখানকার যা-কিছু ছিল এই রক্ত দিয়ে মার্জনা করে গেলুম। কিছুই বাকি রাখি নি। কেবল একটি দুঃখ রইল, মহারাজের কাছে খবর পাঠাতে হবে আমার পরাজয় হয়েছে।

ইন্দ্রকুমার। পরাজয় তোমার হয় নি দাদা, আমারই পরাজয় হয়েছে।

সৈনিকের প্রবেশ

সৈনিক। কুমার রাজধর যুবরাজের পদধূলি নেবার জন্যে প্রার্থনা জানিয়ে পাঠিয়েছেন।

ইন্দ্রকুমার। কখনো না ! কিছুতেই না !

যুবরাজ। ডাকো, ডাকো তাকে, ডাকো !

ইন্দ্রকুমার। (রাগিয়া) দাদা— রাজধরকে—

যুবরাজ। আবার ভাই ! আবার !

ইন্দ্রকুমার। না, না, না, আর নয়। আমার আর রাগ নেই।

রাজধরের প্রবেশ ও প্রণাম

রাজধর। আমি নরাধম। এ মুকুট তোমার পায়ে রাখলুম। এ তোমারই।
যুবরাজ। আমার সময় নেই। ইন্দ্রকুমারকে দাও ভাই।
রাজধর। দাদার আদেশ মাথায় করলেম। এ মুকুট তুমি নাও।
ইন্দ্রকুমার। আমি পরাজিত, এ মুকুট আমার নয়। এ আমি তোমাকেই পরিয়ে দিলুম।— দাদা

প্রায়শ্চিত্ত

বিজ্ঞাপন

বউঠাকুরানীর হাট নামক উপন্যাস হইতে এই প্রায়শ্চিত্ত গ্রন্থখানি নাট্যীকৃত হইল। মূল উপন্যাসখানির অনেক পরিবর্তন হওয়াতে এই নাটকটি প্রায় নূতন গ্রন্থের মতোই হইয়াছে।

৩১শে বৈশাখ
সন ১৩১৬ সাল

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নাটকের পাত্রগণ

প্রতাপাদিত্য	যশোহরের রাজা
উদয়াদিত্য	যশোহরের যুবরাজ
বসন্ত রায়	প্রতাপাদিত্যের খুড়া, রায়গড়ের রাজা
রামচন্দ্র রায়	প্রতাপাদিত্যের জামাতা, চন্দ্রদ্বীপের রাজা
রমাই	রামচন্দ্রের ভাঁড়
রামমোহন	রামচন্দ্র রায়ের মল্ল
ফর্নান্ডিজ	রামচন্দ্র রায়ের পোর্টুগীজ সেনাপতি
ধনঞ্জয়	একজন বৈরাগী
সীতারাম	প্রতাপাদিত্যের গৃহরক্ষক
পীতাম্বর	প্রতাপাদিত্যের অনুচর
প্রতাপাদিত্যের মন্ত্রী	
প্রতাপাদিত্যের মহিষী	
সুরমা	উদয়াদিত্যের স্ত্রী
বিভা	প্রতাপাদিত্যের কন্যা, রামচন্দ্র রায়ের মহিষী
বামী	প্রতাপাদিত্যের মহিষীর পরিচারিকা

প্রায়শ্চিত্ত

প্রথম অঙ্ক

১

উদয়াদিত্যের শয়নকক্ষ

উদয়াদিত্য ও সুরমা

উদয়াদিত্য। যাক চুকল!

সুরমা। কী চুকল?

উদয়াদিত্য। আমার উপর মাধবপুর পরগনা শাসনের ভার মহারাজ রেখেছিলেন। জান তো, দু বৎসর থেকে সেখানে কিরকম অজন্মা হয়েছে— আমি তাই খাজনা আদায় বন্ধ করেছিলুম। মহারাজ আমাকে বলেছিলেন, যেমন করে হোক টাকা চাই।

সুরমা। আমি তো তোমাকে আমার গহনাগুলো দিতে চেয়েছিলুম।

উদয়াদিত্য। তোমার গহনা টাকা দিয়ে কেনে এত বড়ো বুকের পাটা এ রাজ্যে আছে কার? মহারাজার কানে গেলে কি রক্ষা আছে? আমি মহারাজকে বললুম, মাধবপুর থেকে টাকা আমি কোনোমতেই আদায় করতে পারব না। শুনে তিনি মাধবপুর আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছেন। তিনি এখন সৈন্য বাড়াচ্ছেন, টাকা তাঁর চাই।

সুরমা। পরগনা তো কেড়ে নিলেন, কিন্তু তুমি চলে এলে প্রজারা যে মরবে।

উদয়াদিত্য। আমি ঠিক করেছি, যে করে হোক তাদের পেটের ভাতটা জোগাব। শুনতে পেলে মহারাজ খুশি হবেন না— দয়া জিনিসটাকে তিনি মেয়েমানুষের লক্ষণ বলেই জানেন। কিন্তু তোমার ঘরে আজ এত ফুলের মালার ঘটা কেন?

সুরমা। রাজপুত্রকে রাজসভায় যখন চিনল না, তখন যে তাকে চিনেছে সে তাকে মালা দিয়ে বরণ করবে।

উদয়াদিত্য। সত্যি নাকি! তোমার ঘরে রাজপুত্র আসা-যাওয়া করেন? তিনি কে শুনি? এ খবরটা তো জানতুম না।

সুরমা। রামচন্দ্র যেমন ভুলেছিলেন তিনি অবতার, তোমারও সেই দশা হয়েছে। কিন্তু ভক্তকে ভোলাতে পারবে না।

উদয়াদিত্য। রাজপুত্র! রাজার ঘরে কোনো জন্মে পুত্র জন্মাবে না, বিধাতার এই অভিশাপ।

সুরমা। সে কী কথা?

উদয়াদিত্য। হাঁ, রাজার ঘরে উত্তরাধিকারীই জন্মায়, পুত্র জন্মায় না।

সুরমা। এ তুমি মনের ক্ষোভে বলছ।

উদয়াদিত্য। কথাটা কি আমার কাছে নূতন যে ক্ষোভ হবে? যখন এতটুকু ছিলুম তখন থেকে মহারাজ এইটেই দেখেছেন যে, আমি তাঁর রাজ্যভার বইবার যোগ্য কি না। কেবলই পরীক্ষা, স্নেহ নেই!

সুরমা। প্রিয়তম, দরকার কী স্নেহের! খুব কঠোর পরীক্ষাতেও তোমার জিত হবে। তোমার মতো রাজার ছেলে কোন্ রাজা পেয়েছে?

উদয়াদিত্য। বল কী? পরীক্ষক তোমার পরামর্শ নিয়ে বিচার করবেন না, সেটা বেশ বুঝতে পারছি।

সুরমা। কারও পরামর্শ নিয়ে বিচার করতে হবে না— আগুনের পরীক্ষাতেও সীতার চুল পোড়ে নি। তুমি রাজ্যভার বহনের উপযুক্ত নও, এ কথা কি বললেই হল? এতবড়ো অবিচার কি জগতে কখনো টিকতে পারে?

উদয়াদিত্য। রাজ্যভারটা নাই-বা ঘাড়ের উপর পড়ল, তাতেই বা দুঃখ কিসের?

সুরমা। না না, ও কথা তোমার মুখে আমার সহ্য হয় না। ভগবান তোমাকে রাজার ছেলে করে পাঠিয়েছেন, সে কথা বুঝি অমন করে উড়িয়ে দিতে আছে? না-হয় দুঃখই পেতে হবে— তা বলে—

উদয়াদিত্য। আমি দুঃখের পরোয়া রাখি নে। তুমি আমার ঘরে এসেছ, তোমাকে সুখী করতে পারি নে, আমার পৌরুষে সেই ধিক্কার বাজে।

সুরমা। যে সুখ দিয়েছ তাই যেন জন্ম-জন্মান্তর পাই।

উদয়াদিত্য। সুখ যদি পেয়ে থাক তো সে নিজের গুণে, আমার শক্তিতে নয়। এ ঘরে আমার আদর নেই বলে তোমারও যে অপমান ঘটে। এমন-কি, মাও যে তোমাকে অবজ্ঞা করেন!

সুরমা। আমার সব সম্মান যে তোমার প্রেমে, সে তো কেউ কাড়তে পারে নি।

উদয়াদিত্য। তোমার পিতা শ্রীপুররাজ কিনা যশোরের অধীনতা স্বীকার করেন না, সেই হয়েছে তোমার অপরাধ— মহারাজ তোমার উপরে রাগ দেখিয়ে তার শোধ তুলতে চান।

নেপথ্যে। দাদা, দাদা!

উদয়াদিত্য। ও কে ও! বিভা বুঝি! (দ্বার খুলিয়া) কী বিভা! কী হয়েছে? এত রাত্রে কেন?

বিভা। (চুপিচুপি কিছু বলিয়া সরোদনে) দাদা, কী হবে?

উদয়াদিত্য। ভয় নেই, আমি যাচ্ছি।

বিভা। না না, তুমি যেয়ো না।

উদয়াদিত্য। কেন বিভা?

বিভা। বাবা যদি জানতে পারেন?

উদয়াদিত্য। জানতে পারবেন না তো কী? তাই বলে বসে থাকব?

বিভা। যদি রাগ করেন?

সুরমা। ছি বিভা, এখন সে কথা কি ভাববার সময়?

বিভা। (উদয়াদিত্যের হাত ধরিয়া) দাদা, তুমি যেয়ো না, তুমি লোক পাঠিয়ে দাও। আমার ভয় করছে।

উদয়াদিত্য। ভয় করবার সময় নেই বিভা!

[প্রস্থান

বিভা। কী হবে ভাই? বাবা জানতে পারলে জানি নে কী কাণ্ড করবেন।

সুরমা। যাই করুন-না বিভা, নারায়ণ আছেন।

২

মন্ত্রগৃহে প্রতাপাদিত্য ও মন্ত্রী

মন্ত্রী। মহারাজ, কাজটা কি ভালো হবে?

প্রতাপাদিত্য। কোন্ কাজটা?

মন্ত্রী। আজ্ঞে, কাল যেটা আদেশ করেছিলেন।

প্রতাপাদিত্য। কাল কী আদেশ করেছিলুম?

মন্ত্রী। আপনার পিতৃব্য সম্বন্ধে—

প্রতাপাদিত্য। আমার পিতৃব্য সম্বন্ধে কী ?

মন্ত্রী। মহারাজ আদেশ করেছিলেন, যখন রাজা বসন্ত রায় যশোরে আসবার পথে শিমুলতলির চটিতে আশ্রয় নেবেন, তখন—

প্রতাপাদিত্য। তখন কী ? কথাটা শেষ করেই ফেলো।

মন্ত্রী। তখন দুজন পাঠান গিয়ে—

প্রতাপাদিত্য। হাঁ—

মন্ত্রী। তাঁকে নিহত করবে।

প্রতাপাদিত্য। নিহত করবে ! অমরকোষ খুঁজে বুঝি আর কোনো কথা খুঁজে পেলে না ? নিহত করবে ! মেরে ফেলবে কথাটা মুখে আনতে বুঝি বাধছে ?

মন্ত্রী। মহারাজ আমার ভাবটি ভালো বুঝতে পারেন নি।

প্রতাপাদিত্য। বিলক্ষণ বুঝতে পেরেছি।

মন্ত্রী। আজ্ঞে মহারাজ, আমি—

প্রতাপাদিত্য। তুমি শিশু ! খুন করাকে তুমি জুজু বলে জান। তোমার বুড়ি দিদিমার কাছে শিখেছ খুন করাটা পাপ। খুন করাটা যেখানে ধর্ম সেখানে না করাটাই পাপ, এটা এখনো তোমার শিখতে বাকি আছে। যে মুসলমান আমাদের ধর্ম নষ্ট করেছে, তাদের যারা মিত্র তাদের বিনাশ না করাই অধর্ম। পিতৃব্য বসন্ত রায় নিজেকে ম্লেচ্ছের দাস বলে স্বীকার করেছেন। ক্ষত হলে নিজের বাহুকে কেটে ফেলা যায়, সে কথা মনে রেখো মন্ত্রী।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞে।

প্রতাপাদিত্য। অমন তাড়াতাড়ি 'যে আজ্ঞে' বললে চলবে না। তুমি মনে করছ নিজের পিতৃব্যকে বধ করা সকল অবস্থাতেই পাপ। 'না' বোলো না, ঠিক এই কথাটাই তোমার মনে জাগছে। কিন্তু মনে কোরো না এর উত্তর নেই। পিতার অনুরোধে ভৃগু তাঁর মাকে বধ করেছিলেন, আর ধর্মের অনুরোধে আমি আমার পিতৃব্যকে কেন বধ করব না ?

মন্ত্রী। কিন্তু দিল্লীশ্বর যদি শোনেন তবে—

প্রতাপাদিত্য। আর যাই কর, দিল্লীশ্বরের ভয় আমাকে দেখিয়ো না।

মন্ত্রী। প্রজারা জানতে পারলে কী বলবে ?

প্রতাপাদিত্য। জানতে পারলে তো।

মন্ত্রী। এ কথা কখনোই চাপা থাকবে না।

প্রতাপাদিত্য। দেখো মন্ত্রী, কেবল ভয় দেখিয়ে আমাকে দুর্বল করে তোলবার জন্যেই কি তোমাকে রেখেছি ?

মন্ত্রী। মহারাজ, যুবরাজ উদয়াদিত্য—

প্রতাপাদিত্য। দিল্লীশ্বর গেল, প্রজারা গেল, শেষকালে উদয়াদিত্য ! সেই স্ত্রৈণ বালকটার কথা আমার কাছে তুলো না।

মন্ত্রী। তাঁর সম্বন্ধে একটি সংবাদ আছে। কাল তিনি রাত্রে ঘোড়ায় চড়ে একলা বেরিয়েছেন, এখনো ফেরেন নি।

প্রতাপাদিত্য। কোন্ দিকে গেছে ?

মন্ত্রী। পুবের দিকে।

প্রতাপাদিত্য। কখন গেছে ?

মন্ত্রী। তখন রাত দেড় প্রহর হবে।

প্রতাপাদিত্য। নাঃ, আর চলল না। ঈশ্বর করুন আমার কনিষ্ঠ পুত্রটি যেন উপযুক্ত হয়। এখনো ফেরে নি !

মন্ত্রী। আজ্ঞে না।

প্রতাপাদিত্য। একজন প্রহরী তার সঙ্গে যায় নি কেন?

মন্ত্রী। যেতে চেয়েছিল, তিনি নিষেধ করেছিলেন।

প্রতাপাদিত্য। তাকে না জানিয়ে, তার পিছনে পিছনে যাওয়া উচিত ছিল।

মন্ত্রী। তারা তো কোনো সন্দেহ করে নি।

প্রতাপাদিত্য। বড়ো ভালো কাজই করেছিল! মন্ত্রী, তুমি কি বোঝাতে চাও এজন্যে কেউ দায়ী নয়? তা হলে এ দায় তোমার।

৩

পথপার্শ্বে গাছতলায় বাহকহীন পালকিতে বসন্ত রায় আসীন
পাশে একজন পাঠান দণ্ডায়মান

পাঠান। নাঃ, এ বুড়োকে মারার চেয়ে বাঁচিয়ে রেখে লাভ আছে। মারলে যশোরের রাজা কেবল একবার বকশিশ দেবে, কিন্তু একে বাঁচিয়ে রাখলে এর কাছে অনেক বকশিশ পাব।

বসন্ত রায়। খাঁসাহেব, তুমিও যে ওদের সঙ্গে গেলে না?

পাঠান। হুজুর, যাই কী করে? আপনি তো ডাকাতের হাত থেকে আমাদের ধনপ্রাণ রক্ষার জন্যে আপনার সব লোকজনদেরই পাঠিয়ে দিলেন— আপনাকে মাঠের মধ্যে একলা ফেলে যাব এমন অকৃতজ্ঞ আমাকে ঠাওরাবেন না। দেখুন, আমাদের কবি বলেন, যে আমার অপকার করে সে আমার কাছে ঋণী, পরকালে সে ঋণ তাকে শোধ করতেই হবে, যে আমার উপকার করে আমি তার কাছে ঋণী, কোনো কালেই সে ঋণ শোধ করতে পারব না।

বসন্ত রায়। বা বা বা! লোকটা তো বেশ! খাঁসাহেব, তোমাকে বড়ো ঘরের লোক বলে মনে হচ্ছে।

পাঠান। (সেলাম করিয়া) ক্যা তাজ্জব! মহারাজ ঠিক ঠাউরেছেন।

বসন্ত রায়। এখন তোমার কী করা হয়?

পাঠান। (সনিশ্বাসে) হুজুর, গরিব হয়ে পড়েছি, চাষবাস করেই দিন চলে। কবি বলেন, হে অদৃষ্ট, তৃণকে তৃণ করে গড়েছ সেজন্যে তোমাকে দোষ দিই নে। কিন্তু বটগাছকে বটগাছ করেও তাকে ঝড়ের ঘায়ে তৃণের সঙ্গে এক মাটিতে শোয়াও, এতেই বুঝেছি তোমার হৃদয়টা পাষাণ!

বসন্ত রায়। বাহবা, বাহবা! কবি কী কথাই বলেছেন! সাহেব, যে দুটো বয়েত আজ বললে ও তো আমাকে লিখে দিতে হবে। আচ্ছা খাঁসাহেব, তোমার তো বেশ মজবুত শরীর, তুমি তো ফৌজের সিপাহি হতে পার।

পাঠান। হুজুরের মেহেরবানি হলেই পারি। আমার বাপ-পিতামহ সকলেই তলোয়ার হাতে মরেছেন। কবি বলেন—

বসন্ত রায়। (হাসিয়া) কবি যাই বলুন, আমার কাজ যদি নাও তবে তলোয়ার হাতে নিয়ে মরার শখ মিটতে পারে, কিন্তু সে তলোয়ার খাপ থেকে খোলবার সুযোগ হবে না। প্রজারা শান্তিতে আছে— ভগবান করুন আর লড়াইয়ের দরকার না হয়। বুড়ো হয়েছি, তলোয়ার ছেড়েছি, এখন তার বদলে আর-একজন আমার পাণিগ্রহণ করেছে। (সেতারে ঝংকার)

পাঠান। (ঘাড় নাড়িয়া) হায় হায়, এমন অস্ত্র কি আছে! একটি বয়েত আছে — তলোয়ারে শত্রুকে জয় করা যায় কিন্তু সংগীতে শত্রুকে মিত্র করা যায়।

বসন্ত রায়। (উৎসাহে উঠিয়া দাঁড়াইয়া) কী বললে, খাঁসাহেব! সংগীতে শত্রুকে মিত্র করা যায়! কী চমৎকার! তলোয়ার যে এমন ভয়ানক জিনিস, তাতেও শত্রুর শত্রুত্ব নাশ করা যায় না। কেমন করে বলব নাশ করা যায়? রোগীকে বধ করে রোগ আরোগ্য করা সে কেমনতরো আরোগ্য? কিন্তু

সংগীত যে এমন মৃদু জিনিস, তাতে শত্রু নাশ না করেও শত্রুত্ব নাশ করা যায়। এ কি সাধারণ কবিত্বের কথা! বাঃ, কী তারিফ! খাঁসাহেব, তোমাকে একবার রায়গড়ে যেতে হচ্ছে। আমি যশোর থেকে ফিরে গিয়েই আমার সাধ্যমত তোমার কিছু—

পাঠান। আপনার পক্ষে যা 'কিছু' আমার পক্ষে তাই ঢের। হুজুর, আপনার সেতার বাজানো আসে?

বসন্ত রায়। বাজানো আসে কেমন করে বলি? তবে বাজাই বটে।

সেতার-বাদন

পাঠান। বাহবা! খাসী!

উদয়াদিত্যের প্রবেশ

উদয়াদিত্য। আঃ, বাঁচলুম! দাদামশায়, পথের ধারে এত রাত্রে কাকে বাজনা শোনাচ্ছ?

বসন্ত রায়। খবর কী দাদা? সব ভালো তো? দিদি ভালো আছে?

উদয়াদিত্য। সমস্তই মঙ্গল।

বসন্ত রায়। সেতার লইয়া গান

ভূপালী। যৎ

বঁধুয়া, অসময়ে কেন হে প্রকাশ?
সকলি যে স্বপ্ন বলে হতেছে বিশ্বাস।
তুমি গগনেরই তারা
মর্তে এলে পথহারা,
এলে ভুলে অশ্রুজলে আনন্দেরই হাস।

উদয়াদিত্য। দাদামশায়, এ লোকটি কোথা থেকে জুটল?

বসন্ত রায়। খাঁসাহেব বড়ো ভালো লোক। সমজদার ব্যক্তি। আজ রাত্রে এঁকে নিয়ে বড়ো আনন্দেই কাটানো গেছে।

উদয়াদিত্য। তোমার সঙ্গের লোকজন কোথায়? চটিতে না গিয়ে এই পথের ধারে রাত কাটাচ্ছ যে?

বসন্ত রায়। ভালো কথা মনে করিয়ে দিলে! খাঁসাহেব, তোমাদের জন্যে আমার ভাবনা হচ্ছে। এখনো তো কেউ ফিরল না। সেই ডাকাতের দল কি তবে—

পাঠান। হুজুর, অভয় দেন তো সত্য কথা বলি। আমরা রাজা প্রতাপাদিত্যের প্রজা, যুবরাজ বাহাদুর আমাদের বেশ চেনেন। মহারাজ আমাকে আর আমার ভাই রহিমকে আদেশ করেন যে, আপনি যখন নিমন্ত্রণ রাখতে যশোরের দিকে আসবেন তখন পথে আপনাকে খুন করা হয়।

বসন্ত রায়। রাম, রাম!

উদয়াদিত্য। বলে যাও।

পাঠান। আমার ভাই গ্রামে ডাকাত পড়েছে বলে কেঁদেকেটে আপনার অনুচরদের নিয়ে গেলেন। আমার উপরেই এই কাজের ভার ছিল। কিন্তু মহারাজ, যদিও রাজার আদেশ, তবু এমন কাজে আমার প্রবৃত্তি হল না। কারণ আমাদের কবি বলেন, রাজা তো পৃথিবীরই রাজা, তাঁর আদেশে পৃথিবী নষ্ট করতে পার, কিন্তু সাবধান, স্বর্গের এক কোণও নষ্ট কোরো না। গরিব এখন মহারাজের শরণাগত। দেশে ফিরে গেলে আমার সর্বনাশ হবে।

বসন্ত রায়। তোমাকে পত্র দিচ্ছি, তুমি এখান থেকে রায়গড়ে চলে যাও।

উদয়াদিত্য। দাদামশায়, তুমি এখান থেকে যশোরে যাবে নাকি?

বসন্ত রায়। হাঁ ভাই।

উদয়াদিত্য। সে কী কথা!

বসন্ত রায়। আমি তো ভাই ভবসমুদ্রের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছি— একটা ঢেউ লাগলেই বাস্। আমার ভয় কাকে? কিন্তু আমি যদি না যাই তবে প্রতাপের সঙ্গে ইহজন্মে আমার আর দেখা হওয়া শক্ত হবে। এই-যে ব্যাপারটা ঘটল এর সমস্ত কালি মুছে ফেলতে হবে যে— এইখেন থেকেই যদি রায়গড়ে ফিরে যাই তা হলে সমস্তই জমে থাকবে। চল্ দাদা চল্। রাত শেষ হয়ে এল।

৪

মন্ত্রসভায় প্রতাপাদিত্য ও মন্ত্রী

প্রতাপাদিত্য। দেখো দেখি মন্ত্রী, সে পাঠান দুটো এখনো এল না।

মন্ত্রী। সেটা তো আমার দোষ নয় মহারাজ!

প্রতাপাদিত্য। দোষের কথা হচ্ছে না। দেরি কেন হচ্ছে তুমি কী অনুমান কর তাই জিজ্ঞাসা করছি।

মন্ত্রী। শিমুলতলি তো কাছে নয়। কাজ সেরে আসতে দেরি তো হবেই।

প্রতাপাদিত্য। উদয় কাল রাত্রেই বেরিয়ে গেছে?

মন্ত্রী। আজ্ঞে হাঁ, সে তো পূর্বেই জানিয়েছি।

প্রতাপাদিত্য। কী উপযুক্ত সময়েই জানিয়েছ। আমি তোমাকে নিশ্চয় বলছি মন্ত্রী, এ সমস্তই সে তার স্ত্রীর পরামর্শ নিয়ে করেছে। কী বোধ হয়?

মন্ত্রী। কেমন করে বলব মহারাজ?

প্রতাপাদিত্য। আমি কি তোমার কাছে বেদবাক্য শুনতে চাচ্ছি? তুমি কি আন্দাজ কর তাই জিজ্ঞাসা করছি।

একজন পাঠানের প্রবেশ

প্রতাপাদিত্য। কী হল?

পাঠান। মহারাজ, এতক্ষণে কাজ নিকেশ হয়ে গেছে।

প্রতাপাদিত্য। সে কী রকম কথা? তবে তুমি জান না?

পাঠান। জানি বৈকি। কাজ শেষ হয়ে গেছে ভুল নেই, তবে আমি সে সময়ে উপস্থিত ছিলুম না। আমার ভাই হোসেন খাঁর উপর ভার আছে, সে খুব হুঁশিয়ার। মহারাজের পরামর্শমতে আমি খুড়ারাজা-সাহেবের লোকজনদের তফাত করেই চলে আসছি।

প্রতাপাদিত্য। হোসেন যদি ফাঁকি দেয়?

পাঠান। তোবা! সে তেমন বেইমান নয়। মহারাজ, আমি আমার শির জামিন রাখলুম।

প্রতাপাদিত্য। আচ্ছা, এইখানে হাজির থাকো, তোমার ভাই ফিরে এলে বকশিশ মিলবে। (পাঠানের বাহিরে গমন) এটা যাতে প্রজারা টের না পায় সে চেষ্টা করতে হবে।

মন্ত্রী। মহারাজ, এ কথা গোপন থাকবে না।

প্রতাপাদিত্য। কিসে তুমি জানলে?

মন্ত্রী। আপনার পিতৃব্যের প্রতি বিদ্বেষ আপনি তো কোনোদিন লুকোতে পারেন নি। এমন-কি, আপনার কন্যার বিবাহেও আপনি তাঁকে নিমন্ত্রণ করেন নি— তিনি বিনা নিমন্ত্রণেই এসেছিলেন। আর আজ আপনি অকারণে তাঁকে নিমন্ত্রণ করলেন, আর পথে এই কাণ্ডটি ঘটল, এমন অবস্থায় প্রজারা আপনাকেই এর মূল বলে জানবে।

প্রতাপাদিত্য। তা হলেই তুমি খুব খুশি হও, না?

মন্ত্রী। মহারাজ, এমন কথা কেন বলছেন? আপনার ধর্ম-অধর্ম পাপপুণ্যের বিচার আমি করি নে, কিন্তু রাজ্যের ভালোমন্দর কথাও যদি আমাকে ভাবতে না দেবেন তবে আমি আছি কী করতে? কেবল প্রতিবাদ করে মহারাজের জেদ বাড়িয়ে তোলবার জন্যে?

প্রতাপাদিত্য। আচ্ছা, ভালোমন্দর কথাটা কী ঠাওরালে শুনি।

মন্ত্রী। আমি এই কথা বলছি, পদে পদে প্রজাদের মনে অসন্তোষ বাড়িয়ে তুলবেন না। দেখুন, মাধবপুরের প্রজারা খুব প্রবল এবং আপনার বিশেষ বাধ্য নয়। তারা রাজ্যের সীমানার কাছে থাকে, পাছে আপনার প্রতিবেশী শত্রুপক্ষের সঙ্গে যোগ দেয় এই ভয়ে তাদের গায়ে হাত তোলা যায় না। সেইজন্য মাধবপুর-শাসনের ভার যুবরাজের উপর দেবার কথা আমিই মহারাজকে বলেছিলেম।

প্রতাপাদিত্য। সে তো বলেছিলে। তার ফল কী হল দেখো-না। আজ দু বৎসরের খাজনা বাকি। সকল মহল থেকে টাকা এল, আর ওখান থেকে কী আদায় হল?

মন্ত্রী। আজ্ঞে আশীর্বাদ। তেমন সব বজ্জাত প্রজাও যুবরাজের পায়ের গোলাম হয়ে গেছে। টাকার চেয়ে কি তার কম দাম? সেই যুবরাজের কাছ থেকে আপনি মাধবপুরের ভার কেড়ে নিলেন। সমস্তই উলটে গেল। এর চেয়ে তাঁকে না পাঠানোই ভালো ছিল। সেখানকার প্রজারা তো হন্যে কুকুরের মতো খেপে রয়েছে— তার পরে আবার যদি এই কথাটা প্রকাশ হয় তা হলে কী হয় বলা যায় না। রাজকার্যে ছোটোদেরও অবজ্ঞা করতে নেই মহারাজ! অসহ্য হলেই ছোটোরা জোট বাঁধে, জোট বাঁধলেই ছোটোরা বড়ো হয়ে ওঠে।

প্রতাপাদিত্য। সেই ধনঞ্জয় বৈরাগী তো মাধবপুরে থাকে?

মন্ত্রী। আজ্ঞে হাঁ।

প্রতাপাদিত্য। সেই বেটাই যত নষ্টের গোড়া। ধর্মের ভেক ধরে সেই তো যত প্রজাকে নাচিয়ে তোলে। সেই তো প্রজাদের পরামর্শ দিয়ে খাজনা বন্ধ করিয়েছে। উদয়কে বলেছিলুম যেমন করে হোক তাকে আচ্ছা করে শাসন করে দিতে। কিন্তু উদয়কে জান তো? এ দিকে তার না আছে তেজ, না আছে পৌরুষ, কিন্তু একগুঁয়েমির অন্ত নেই। ধনঞ্জয়কে শাসন দূরে থাক্, তাকে আস্পর্ধা দিয়ে বাড়িয়ে তুলেছে। এবারে তার কণ্ঠীসুদ্ধ কণ্ঠ চেপে ধরতে হচ্ছে, তার পরে দেখা যাবে তোমার মাধবপুরের প্রজাদের কতবড়ো বুকের পাটা! আর দেখো, লোকজন আজই সব ঠিক করে রাখো— খবরটা পাবামাত্রই রায়গড়ে গিয়ে বসতে হবে। সেইখানেই শ্রাদ্ধশান্তি করব— আমি ছাড়া উত্তরাধিকারী আর তো কাউকে দেখি নে।

বসন্ত রায়ের প্রবেশ। প্রতাপাদিত্য চমকিয়া উঠিয়া দণ্ডায়মান

বসন্ত রায়। আমাকে কিসের ভয় প্রতাপ? আমি তোমার পিতৃব্য; তাতেও যদি বিশ্বাস না হয়, আমি বৃদ্ধ, তোমার কোনো অনিষ্ট করি এমন শক্তিই নেই। (প্রতাপ নীরব) প্রতাপ, একবার রায়গড়ে চলো— ছেলেবেলা কতদিন সেখানে কাটিয়েছ— তার পরে বহুকাল সেখানে যাও নি।

প্রতাপাদিত্য। (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া সগর্জনে) খবরদার! ঐ পাঠানকে ছাড়িস নে!

[দ্রুত প্রস্থান

বসন্ত রায়ের প্রস্থান। প্রতাপ ও মন্ত্রীর পুনঃপ্রবেশ

প্রতাপাদিত্য। দেখো মন্ত্রী, রাজকার্যে তোমার অত্যন্ত অমনোযোগ দেখা যাচ্ছে।

মন্ত্রী। মহারাজ, এ বিষয়ে আমার কোনো অপরাধ নেই।

প্রতাপাদিত্য। এ বিষয়ের কথা তোমাকে কে বলছে? আমি বলছি রাজকার্যে তোমার অত্যন্ত অমনোযোগ দেখছি। সেদিন তোমাকে চিঠি রাখতে দিলেম, হারিয়ে ফেললে! আর একদিন মনে আছে উমেশ রায়ের কাছে তোমাকে যেতে বলেছিলুম, তুমি লোক দিয়ে কাজ সেরেছিলে।

মন্ত্রী। আজ্ঞে মহারাজ—

প্রতাপাদিত্য। চুপ করো। দোষ কাটাবার জন্যে মিথ্যে চেষ্টা কোরো না। যা হোক, তোমাকে জানিয়ে রাখছি, রাজকার্যে তুমি কিছুমাত্র মনোযোগ দিচ্ছ না। যাও, কাল রাত্রে যারা পাহারায় ছিল তাদের কয়েদ করো গে।

৫

রাজান্তঃপুর

সুরমা ও বিভা

সুরমা। (বিভার গলা ধরিয়া) তুই অমন চুপ করে থাকিস কেন ভাই? যা মনে আছে বলিস নে কেন?

বিভা। আমার আর কী বলবার আছে?

সুরমা। অনেকদিন তাঁকে দেখিস নি। তা তুইই না-হয় তাঁকে একখানা চিঠি লেখ্ না। আমি তোর দাদাকে দিয়ে পাঠাবার সুবিধা করে দেব।

বিভা। যেখানে তাঁর আদর নেই সেখানে আসবার জন্যে আমি কেন তাঁকে লিখব? তিনি আমাদের চেয়ে কিসে ছোটো?

সুরমা। আচ্ছা গো আচ্ছা, না-হয় তিনি খুব মানী, তাই বলে মানটাই কি সংসারে সকলের চেয়ে বড়ো হল? সেটা কি বিসর্জন করবার কোনো জায়গা নেই।

গান

ওর মানের এ বাঁধ টুটবে না কি টুটবে না?
ওর মনের বেদন থাকবে মনে
প্রাণের কথা ফুটবে না?
কঠিন পাষাণ বুকে লয়ে
নাই রহিল অটল হয়ে।
প্রেমেতে ওই পাথর ক্ষ'য়ে
চোখের জল কি ছুটবে না?

আচ্ছা বিভা, তুই যদি পুরুষ হতিস তো কী করতিস? নিমন্ত্রণ-চিঠি না পেলে এক পা নড়তিস নে নাকি?

বিভা। আমার কথা ছেড়ে দাও— কিন্তু তাই বলে—

সুরমা। বিভা, শুনেছিস দাদামশায় এসে পৌঁচেছেন।

বিভা। এখানে এলেন কেন ভাই? আবার তো কিছু বিপদ ঘটবে না।

সুরমা। বিপদের মুখের উপর তেড়ে এলে বিপদ ছুটে পালায়।

বিভা। না ভাই, আমার বুকের ভিতর এখনো কেঁপে উঠছে। আমার এমন একটা ভয় ধরে গেছে, কিছুতে ছাড়ছে না; আমার মনে হচ্ছে কী যেন একটা হবে। মনে হচ্ছে যেন কাকে সাবধান করে দেবার আছে। আমার কিছুই ভালো লাগছে না। আচ্ছা, তিনি আমাদের দেখতে এখনো এলেন না কেন?

বসন্ত রায়ের প্রবেশ ও গান

আজ তোমারে দেখতে এলেম
অনেক দিনের পরে।
ভয় কোরো না, সুখে থাকো,
বেশিক্ষণ থাকব নাকো,
এসেছি দণ্ড দুয়ের তরে।
দেখব শুধু মুখখানি,
শোনাও যদি শুনব বাণী,
না-হয় যাব আড়াল থেকে
হাসি দেখে দেশান্তরে।

সুরমা। (বিভার চিবুক ধরিয়া) দাদামশায়, বিভার হাসি দেখবার জন্যে তো আড়ালে যেতে হল না। এবার তবে দেশান্তরের উদ্‌যোগ করো।

বসন্ত রায়। না না, অত সহজে না। অমনি যে ফাঁকি দিয়ে হেসে তাড়াবে আমি তেমন পাত্র না। কেঁদে না তাড়ালে বুড়ো বিদায় হবে না। গোটা পনেরো নতুন গান আর একমাথা পুরোনো পাকাচুল এনেছি, সমস্ত নিকেশ না করে নড়ছি নে।

বিভা। মিছে বড়াই কর কেন? আধমাথা বৈ চুলই নেই!

বসন্ত রায়। (মাথায় হাত বুলাইয়া) ওরে, সে একদিন গেছে রে ভাই। বললে বিশ্বাস করবি নে, বসন্ত রায়েরও মাথায় একেবারে মাথাভরা চুল ছিল। সেদিন কি আর এত রাস্তা পেরিয়ে তোদের খোশামোদ করতে আসতুম। সেদিন একটা চুল পেকেছে কি, অমনি পাঁচটা রূপসী তোলবার জন্যে উমেদার হত। মনের আগ্রহে কাঁচাচুল সুদ্ধ উজাড় করে দেবার জো করত।

সুরমা। দাদামশায়, টাকের আলোচনা পরে হবে, এখন বিভার একটা যা হয় উপায় করে দাও।

বসন্ত রায়। সেও কি আমাকে আবার বলতে হবে না কি? এতক্ষণ কী করছিলুম? এই যে বুড়োটা রয়েছে, এ কি কোনো কাজেই লাগে না মনে করছ?

গান

মলিন মুখে ফুটুক হাসি, জুড়াক দু-নয়ন।
মলিন বসন ছাড়ো সখী, পরো আভরণ।
  অশ্রুধোওয়া কাজলরেখা
  আবার চোখে দিক-না দেখা,
শিথিল বেণী তুলুক বেঁধে কুসুমবন্ধন।

বিভা। দাদামশায়, সত্যি তুমি বাবার কাছে কিছু বলেছ?

বসন্ত রায়। একটা কিছু যে বলেছি তার সাক্ষী আমি থাকতে থাকতেই হাজির হবে।

বিভা। কেন এমন কাজ করতে গেলে?

বসন্ত রায়। খুব করেছি, বেশ করেছি।

বিভা। না দাদামশায়, আমি ভারি রাগ করেছি।

বসন্ত রায়। এই বুঝি বকশিশ! যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর!

বিভা। না, সত্যি বলছি, কেন তুমি বাবাকে অনুরোধ করতে গেলে?

বসন্ত রায়। দিদি, রাজার ঘরে যখন জন্মেছিস তখন অভিমান করে ফল নেই— এরা সব পাথর।

বিভা। আমার নিজের জন্যে অভিমান করি বুঝি! তিনি যে মানী, তাঁর অপমান কেন হবে?

বসন্ত রায়। আচ্ছা বেশ, সে আমার সঙ্গে তার বোঝাপড়া হবে। ওরে, তুই এখন—

গান

পিলু বারোয়াঁ

মান অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে
  এগিয়ে নিয়ে আয়—
তারে এগিয়ে নিয়ে আয়।
চোখের জলে মিশিয়ে হাসি
  ঢেলে দে তার পায়—
ওরে ঢেলে দে তার পায়।
আসছে পথে ছায়া 'পড়ে,

আকাশ এল আঁধার করে,
শুষ্ক কুসুম পড়ছে ঝরে
সময় বহে যায়—
ওরে সময় বহে যায়।

৬

মাধবপুরের পথ

ধনঞ্জয় ও প্রজাদল

ধনঞ্জয়। একেবারে সব মুখ চুন করে আছিস কেন ? মেরেছে বেশ করেছে। এতদিন আমার কাছে আছিস, বেটারা এখনো ভালো করে মার খেতে শিখলি নে ? হাড়গোড় সব ভেঙে গেছে নাকি রে ?

১। রাজার কাছারিতে ধরে মারলে সে বড়ো অপমান !

ধনঞ্জয়। আমার চেলা হয়েও তোদের মানসম্ভ্রম আছে ? এখনো সবাই তোদের গায়ে ধুলো দেয় না রে ? তবে এখনো তোরা ধরা পড়িস নি। তবে এখনো আরো অনেক বাকি আছে।

২। বাকি আর রইল কী ঠাকুর ! এ দিকে পেটের জ্বালায় মরছি, ও দিকে পিঠের জ্বালাও ধরিয়ে দিলে।

ধনঞ্জয়। বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে— একবার খুব করে নেচে নে !

গান

আরো আরো প্রভু, আরো আরো !
এমনি করে আমায় মারো।
লুকিয়ে থাকি আমি পালিয়ে বেড়াই,
ধরা পড়ে গেছি আর কি এড়াই ?
যা কিছু আছে সব কাড়ো কাড়ো।
এবার যা করবার তা সারো সারো।
আমি হারি কিম্বা তুমিই হারো !
হাটে ঘাটে বাটে করি মেলা,
কেবল হেসে খেলে গেছে বেলা,
দেখি কেমনে কাঁদাতে পারো !

২। আচ্ছা ঠাকুর, তুমি কোথায় চলেছ বলো দেখি।

ধনঞ্জয়। যশোর যাচ্ছি রে।

৩। কী সর্বনাশ ! সেখানে কী করতে যাচ্ছ ?

ধনঞ্জয়। একবার রাজাকে দেখে আসি। চিরকাল কি তোদের সঙ্গেই কাটাব ? এবার রাজদরবারে নাম রেখে আসব।

৪। তোমার উপরে রাজার যে ভারি রাগ ! তার কাছে গেলে কি তোমার রক্ষা আছে ?

৫। জান তো যুবরাজ তোমাকে শাসন করতে চায় নি বলে তাকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল।

ধনঞ্জয়। তোরা যে মার সইতে পারিস নে। সেইজন্যে তোদের মারগুলো সব নিজের পিঠে নেবার জন্যে স্বয়ং রাজার কাছে চলেছি। পেয়াদা নয় রে, পেয়াদা নয়— যেখানে স্বয়ং মারের বাবা বসে আছে সেইখানে ছুটেছি।

১। না, না, সে হবে না ঠাকুর, সে হবে না।

ধনঞ্জয়। খুব হবে— পেট ভরে হবে, আনন্দে হবে।

১। তবে আমরাও তোমার সঙ্গে যাব।

ধনঞ্জয়। পেয়াদার হাতে আশ মেটে নি বুঝি?

২। না ঠাকুর, সেখানে একলা যেতে পারছ না, আমরাও সঙ্গে যাব।

ধনঞ্জয়। আচ্ছা, যেতে চাস তো চল্। একবার শহরটা দেখে আসবি।

৩। কিছু হাতিয়ার সঙ্গে নিতে হবে।

ধনঞ্জয়। কেন রে? হাতিয়ার নিয়ে কী করবি?

৩। যদি তোমার গায়ে হাত দেয় তা হলে—

ধনঞ্জয়। তা হলে তোরা দেখিয়ে দিবি হাত দিয়ে না মেরে কী করে হাতিয়ার দিয়ে মারতে হয়। কী আমার উপকারটা করতেই যাচ্ছ! তোদের যদি এইরকম বুদ্ধি হয় তবে এইখানেই থাক্।

৪। না, না, তুমি যা বলবে তাই করব, কিন্তু আমরা তোমার সঙ্গে থাকব।

৩। আমরাও রাজার কাছে দরবার করব।

ধনঞ্জয়। কী চাইবি রে?

৩। আমরা যুবরাজকে চাইব।

ধনঞ্জয়। বেশ, বেশ, অর্ধেক রাজত্ব চাইবি নে?

৩। ঠাট্টা করছ ঠাকুর!

ধনঞ্জয়। ঠাট্টা কেন করব? সব রাজত্বটাই কি রাজার? অর্ধেক রাজত্ব প্রজার নয় তো কী? চাইতে দোষ নেই রে। চেয়ে দেখিস।

৪। যখন তাড়া দেবে?

ধনঞ্জয়। তখন আবার চাইব। তুই কি ভাবিস রাজা একলা শোনে? আরো একজন শোনবার লোক রাজদরবারে বসে থাকেন— শুনতে শুনতে তিনি একদিন মঞ্জুর করেন, তখন রাজার তাড়াতে কিছুই ক্ষতি হয় না।

গান

আমরা বসব তোমার সনে।
তোমার শরিক হব রাজার রাজা,
  তোমার আধেক সিংহাসনে।
তোমার দ্বারী মোদের করেছে শির নত,
তারা জানে না যে মোদের গরব কত,
তাই বাহির হতে তোমায় ডাকি,
  তুমি ডেকে লও গো আপন জনে।

দ্বিতীয় অঙ্ক

১

চন্দ্রদ্বীপ। রাজা রামচন্দ্র রায়ের কক্ষ

রামচন্দ্র, রমাই ভাঁড়, ফর্নাণ্ডিজ ও মন্ত্রী

রামচন্দ্র। (তামাকু টানিয়া) ওহে রমাই!

রমাই। আজ্ঞা মহারাজ!

রামচন্দ্র। হাঃ হাঃ হাঃ।

মন্ত্রী। হোঃ হোঃ হোঃ।

ফর্নাণ্ডিজ। (হাততালি দিয়া) হিঃ হিঃ হিঃ— হিঃ হিঃ হিঃ।

রামচন্দ্র। খবর কী হে?

রমাই। পরম্পরায় শুনা গেল, সেনাপতি মশাইয়ের ঘরে চোর পড়েছিল।

রামচন্দ্র। (চোখ টিপিয়া) তার পরে?

রমাই। নিবেদন করি মহারাজ! (ফর্নাণ্ডিজ তাঁর কোর্তার বোতাম খুলছেন ও দিচ্ছেন) আজ দিন তিন-চার ধরে সেনাপতি মশাইয়ের ঘরে রাত্রে চোর আনাগোনা করছিল। সাহেবের ব্রাহ্মণী জানতে পেরে কর্তাকে অনেক ঠেলাঠেলি করেন, কিন্তু কোনোমতেই কর্তার ঘুম ভাঙাতে পারেন নি।

রামচন্দ্র। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।

মন্ত্রী। হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ।

সেনাপতি। হিঃ হিঃ হিঃ।

রমাই। তার পর দিনের বেলায় গৃহিণীর নিগ্রহ আর সইতে না পেরে জোড় হস্তে বললেন, "দোহাই তোমার, আজ রাত্রে চোর ধরব।" রাত্রি দুই দণ্ডের সময় গিন্নি বললেন, "ওগো চোর এসেছে।" কর্তা বললেন, "ঐ যাঃ, ঘরে যে আলো জ্বলছে!" চোরকে ডেকে বললেন, "আজ তুই বড়ো বেঁচে গেলি। ঘরে আলো আছে, আজ নিরাপদে পালাতে পারবি, কাল আসিস দেখি— অন্ধকারে কেমন না ধরা পড়িস।"

রামচন্দ্র। হা হা হা হা।

মন্ত্রী। হো হো হো হো হো।

সেনাপতি। হি।

রামচন্দ্র। তার পরে?

রমাই। জানি না, কী কারণে চোরের যথেষ্ট ভয় হল না, তার পর-রাত্রেও ঘরে এল। গিন্নি বললেন, "সর্বনাশ হল, ওঠো।" কর্তা বললেন, "তুমি ওঠো-না।" গিন্নি বললেন, "আমি উঠে কী করব?" কর্তা বললেন, "কেন, ঘরে একটা আলো জ্বালাও না, কিছু যে দেখতে পাচ্ছি না।" গিন্নি বিষম ক্রুদ্ধ; কর্তা ততোধিক ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, "দেখো দেখি। তোমার জন্যই তো যথাসর্বস্ব গেল। আলোটা জ্বালাও। বন্দুকটা আনো।" ইতিমধ্যে চোর কাজকর্ম সেরে বললে, "মশাই, এক ছিলিম তামাক খাওয়াতে পারেন? বড়ো পরিশ্রম হয়েছে।" কর্তা বিষম ধমক দিয়ে বললেন, "রোস বেটা! আমি তামাক সেজে দিচ্ছি। কিন্তু আমার কাছে আসবি তো এই বন্দুকে তোর মাথা উড়িয়ে দেব।" তামাক খেয়ে চোর বললে, "মশাই, আলোটা যদি জ্বালেন তো বড়ো উপকার হয়। সিঁদকাটিটা পড়ে গেছে, খুঁজে পাচ্ছি না।" সেনাপতি বললেন, "বেটার ভয় হয়েছে। তফাতে থাক্, কাছে আসিস নে।" বলে তাড়াতাড়ি আলো জ্বালিয়ে দিলেন। ধীরে সুস্থে জিনিসপত্র বেঁধে চোর তো চলে গেল। কর্তা গিন্নিকে বললেন, "বেটা বিষম ভয় পেয়েছে।"

রামচন্দ্র। রমাই, শুনেছ আমি শ্বশুরালয়ে যাচ্ছি?

রমাই। (মুখভঙ্গি করিয়া) অসারং খলু সংসারং সারং শ্বশুরমন্দিরং! (সকলের হাস্য) কথাটা মিথ্যা নয় মহারাজ! (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) শ্বশুরমন্দিরের সকলই সার— আহারটা, সমাদরটা— দুধের সরটি পাওয়া যায়, মাছের মুড়োটি পাওয়া যায়— সকলই সারপদার্থ! কেবল সর্বাপেক্ষা অসার ঐ যিনি—

রামচন্দ্র। (হাসিয়া) সে কী হে, তোমার অর্ধাঙ্গ—

রমাই। (জোড়হস্তে ব্যাকুলভাবে) মহারাজ, তাকে অর্ধাঙ্গ বলবেন না। তিন জন্ম তপস্যা করলে আমি বরঞ্চ একদিন তার অর্ধাঙ্গ হতে পারব এমন ভরসা আছে। আমার মতন পাঁচটা অর্ধাঙ্গ জুড়লেও তার আয়তনে কুলোয় না।

যথাক্রমে সকলের হাস্য

রামচন্দ্র। আমি তো শুনেছি, তোমার ব্রাহ্মণী বড়োই শান্তস্বভাবা, ঘরকন্নায় বিশেষ পটু।

রমাই। সে কথায় কাজ কী! ঘরে আর সকল রকমই জঞ্জাল আছে, কেবল আমি তিষ্ঠতে পারি

না। প্রত্যুষে গৃহিণী এমনি ঝেঁটিয়ে দেন যে একেবারে মহারাজের দুয়ারে এসে পড়ি।

সকলের হাস্য

রামচন্দ্র। ওহে রমাই, তোমাকে এবার যে যেতে হবে, সেনাপতিকে সঙ্গে নেব। (সেনাপতিকে) যাত্রার জন্য সমস্ত উদ্‌যোগ করো। আমার চৌষট্টি দাঁড়ের নৌকা যেন প্রস্তুত থাকে।

[মন্ত্রী ও সেনাপতির প্রস্থান

রামচন্দ্র। রমাই, তুমি তো সমস্ত শুনেছ। গতবারে শ্বশুরালয়ে আমাকে বড়োই মাটি করেছিল।

রমাই। আজ্ঞে হাঁ, মহারাজের লেজ বানিয়ে দিয়েছিল।

রামচন্দ্র। (কাষ্ঠ হাসিয়া তাম্রকূট-সেবন)

রমাই। আপনার এক শ্যালক এসে আমাকে বললেন, বাসরঘরে তোমাদের রাজার লেজ প্রকাশ পেয়েছে। তিনি রামচন্দ্র না রামদাস? এমন তো পূর্বে জানতাম না। আমি তৎক্ষণাৎ বললুম, "পূর্বে জানবেন কী করে? পূর্বে তো ছিল না। আপনাদের ঘরে বিবাহ করতে এসেছেন, তাই যস্মিন্‌ দেশে যদাচার।"

রামচন্দ্র। রমাই, এবারে গিয়ে জিতে আসতে হবে। যদি জয় হয় তবে তোমাকে আমার আংটি উপহার দেব।

রমাই। মহারাজ, জয়ের ভাবনা কী? রমাইকে যদি অন্তঃপুরে নিয়ে যেতে পারেন, তবে স্বয়ং শাশুড়িঠাকরুনকে পর্যন্ত মনের সাধে ঘোল খাইয়ে আসতে পারি।

রামচন্দ্র। তার ভাবনা? তোমাকে আমি অন্তঃপুরেই নিয়ে যাব।

রমাই। আপনার অসাধ্য কী আছে?

২

পথপার্শ্বে ধনঞ্জয় বৈরাগী ও মাধবপুরের একদল প্রজা

১। বাবাঠাকুর, রাজার কাছে যাচ্ছ, কিন্তু তিনি তোমাকে সহজে ছাড়বেন না।

ধনঞ্জয়। ছাড়বেন কেন বাপসকল! আদর করে ধরে রাখবেন।

১। সে আদরের ধরা নয়।

ধনঞ্জয়। ধরে রাখতে কষ্ট আছে বাপ— পাহারা দিতে হয়— যে-সে লোককে কি রাজা এত আদর করে? রাজবাড়িতে কত লোক যায়, দরজা থেকেই ফেরে— আমাকে ফেরাবে না।

গান

আমাকে যে বাঁধবে ধরে এই হবে যার সাধন,
সে কি অমনি হবে!
আপনাকে সে বাঁধা দিয়ে আমায় দেবে বাঁধন,
সে কি অমনি হবে!
আমাকে যে দুঃখ দিয়ে আনবে আপন বশে,
সে কি অমনি হবে!
তার আগে তার পাষাণ হিয়া গলবে করুণ রসে,
সে কি অমনি হবে!
আমাকে যে কাঁদাবে তার ভাগ্যে আছে কাঁদন,
সে কি অমনি হবে!

২। বাবাঠাকুর, তোমার গায়ে যদি রাজা হাত দেন তা হলে কিন্তু আমরা সইতে পারব না।

ধনঞ্জয়। আমার এই গা যাঁর তিনি যদি সইতে পারেন বাবা, তবে তোমাদেরও সইবে। যেদিন

থেকে জন্মেছি আমার এই গায়ে তিনি কত দুঃখই সইলেন— কত মার খেলেন, কত ধুলোই মাখলেন— হায় হায়—

কে বলেছে তোমায় বঁধু, এত দুঃখ সইতে ?
আপনি কেন এলে, বঁধু, আমার বোঝা বইতে ?
প্রাণের বন্ধু, বুকের বন্ধু,
সুখের বন্ধু, দুখের বন্ধু,
তোমায় দেব না দুখ পাব না দুখ,
হেরব তোমার প্রসন্ন মুখ,
আমি সুখে দুঃখে পারব বন্ধু চিরানন্দে রইতে—
তোমার সঙ্গে বিনা কথায় মনের কথা কইতে।

৩। বাবা, আমরা রাজাকে গিয়ে কী বলব ?

ধনঞ্জয়। বলব, আমরা খাজনা দেব না।

৩। যদি শুধোয় কেন দিবি নে ?

ধনঞ্জয়। বলব, ঘরের ছেলেমেয়েকে কাঁদিয়ে যদি তোমাকে টাকা দিই তা হলে আমাদের ঠাকুর কষ্ট পাবে। যে অন্নে প্রাণ বাঁচে সেই অন্নে ঠাকুরের ভোগ হয় ; তিনি যে প্রাণের ঠাকুর। তার বেশি যখন ঘরে থাকে তখন তোমাকে দিই— কিন্তু ঠাকুরকে ফাঁকি দিয়ে তোমাকে খাজনা দিতে পারব না।

৪। বাবা, এ কথা রাজা শুনবে না।

ধনঞ্জয়। তবু শোনাতে হবে। রাজা হয়েছে বলেই কি সে এমন হতভাগা যে ভগবান তাকে সত্য কথা শুনতে দেবেন না ? ওরে, জোর করে শুনিয়ে আসব।

৫। ও ঠাকুর, তাঁর জোর যে আমাদের চেয়ে বেশি— তাঁরই জিত হবে।

ধনঞ্জয়। দূর বাঁদর, এই বুঝি তোদের বুদ্ধি ! যে হারে তার বুঝি জোর নেই ! তার জোর যে একেবারে বৈকুণ্ঠ পর্যন্ত পৌঁছোয় তা জানিস ?

৬। কিন্তু ঠাকুর, আমরা দূরে ছিলুম, লুকিয়ে বাঁচতুম— একেবারে রাজার দরজায় গিয়ে পড়ব, শেষে দায়ে ঠেকলে আর পালাবার পথ থাকবে না।

ধনঞ্জয়। দেখ্ পাঁচকড়ি, অমন চাপাচুপি দিয়ে রাখলে ভালো হয় না। যতদূর পর্যন্ত হবার তা হতে দে, নইলে কিছুই শেষ হতে চায় না। যখন চূড়ান্ত হয় তখনই শান্তি হয়।

৭। তোরা অত ভয় করছিস কেন ? বাবা যখন আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন উনি আমাদের বাঁচিয়ে আনবেন।

ধনঞ্জয়। তোদের এই বাবা যার ভরসায় চলছে তার নাম কর্। বেটারা কেবল তোরা বাঁচতেই চাস্— পণ করে বসেছিস যে মরবি নে। কেন, মরতে দোষ কী হয়েছে ? যিনি মারেন তাঁর গুণগান্ করবি নে বুঝি ! ওরে, সেই গানটা ধর্।—

গান

বলো ভাই, ধন্য হরি।
বাঁচান বাঁচি, মারেন মরি।
ধন্য হরি সুখের নাটে,
ধন্য হরি রাজ্যপাটে।
ধন্য হরি শ্মশান-ঘাটে—
ধন্য হরি, ধন্য হরি।
সুধা দিয়ে মাতান যখন
ধন্য হরি, ধন্য হরি।

ব্যথা দিয়ে কাঁদান যখন
ধন্য হরি, ধন্য হরি।
আত্মজনের কোলে বুকে
ধন্য হরি হাসিমুখে—
ছাই দিয়ে সব ঘরের সুখে
ধন্য হরি, ধন্য হরি।
আপনি কাছে আসেন হেসে
ধন্য হরি, ধন্য হরি।
খুঁজিয়ে বেড়ান দেশে দেশে
ধন্য হরি, ধন্য হরি।
ধন্য হরি স্থলে জলে,
ধন্য হরি ফুলে ফলে,
ধন্য হৃদয়পদ্মদলে
চরণ-আলোয় ধন্য করি।

৩

বিভার কক্ষ

রামমোহনের প্রবেশ ও প্রণাম

বিভা। মোহন, তুই এতদিন আসিস নি কেন?

রামমোহন। তা মা, কুপুত্র যদি-বা হয়, কুমাতা কখনো নয়, তুমি কোন্ আমাকে মনে করেছ? সে কথা বলো। একবার ডাকলেই তো হত। অমনি লজ্জা হল। আর মুখে উত্তরটি নেই! না না, মা, অবসর পাই নে বলেই আসতে পারি নে— নইলে মনে মনে ঐ চরণপদ্ম দুখানি কখনো তো ভুলি নে।

বিভা। মোহন, তুই বোস, তোদের দেশের গল্প আমায় বল্।

রাম। মা, তোমার জন্য চারগাছি শাঁখা এনেছি, তোমাকে ঐ হাতে পরতে হবে, আমি দেখব।

মহিষীর প্রবেশ

বিভা। (স্বর্ণালংকার খুলিয়া, হাতে শাঁখা পরিয়া) এই দেখো মা। মোহন তোমার চুড়ি খুলে আমায় চারগাছি শাঁখা পরিয়ে দিয়েছে।

মহিষী। (হাসিয়া) তা বেশ তো মানিয়েছে। মোহন, এইবার তোর সেই আগমনী গানটি গা। তোর গান শুনতে আমার বড়ো ভালো লাগে।

রামমোহন। গান

সারা বরষ দেখি নে মা,
মা তুই আমার কেমন ধারা?
নয়নতারা হারিয়ে আমার
অন্ধ হল নয়নতারা।
এলি কি পাষাণী ওরে?
দেখব তোরে আঁখি ভরে;
কিছুতেই থামে না যে মা,
পোড়া এ নয়নের ধারা।

মহিষী। মোহন চল্, তোকে খাইয়ে আনি গে।

[রামমোহন ও মহিষীর প্রস্থান

সুরমা ও বসন্ত রায়ের প্রবেশ

বসন্ত রায়। সুরমা, ও সুরমা, একবার দেখে যাও। তোমাদের বিভার মুখখানি দেখো। বয়স্ যদি না যেত তো আজ তোর ঐ মুখ দেখে এইখানে মাথা ঘুরে পড়তুম আর মরতুম। হায় হায়— মরবার বয়স গেছে! যৌবনকালে ঘড়ি ঘড়ি মরতুম। বুড়োবয়সে রোগ না হলে আর মরণ হয় না।

গান

হাসিরে কি লুকাবি লাজে,
চপলা সে বাঁধা পড়ে না যে।
রুধিয়া অধর-দ্বারে
ঝাঁপিতে চাহিলি তারে,
অমনি সে ছুটে এল নয়নমাঝে!

৪

প্রমোদসভা। নৃত্যগীত

রামচন্দ্র রায়

নটীর গান

পরজ বসন্ত। কাওয়ালি

না বলে যেয়ো না চলে মিনতি করি!
গোপনে জীবন মন লইয়া হরি।
সারা নিশি জেগে থাকি,
ঘুমে ঢুলে পড়ে আঁখি,
ঘুমোলে হারাই পাছে সে ভয়ে মরি।
চকিতে চমকি বঁধু, তোমারে খুঁজি—
থেকে থেকে মনে হয় স্বপন বুঝি!
নিশিদিন চাহে হিয়া
পরান পসারি দিয়া
অধীর চরণ তব বাঁধিয়া ধরি।

রামচন্দ্র রায় মাঝে মাঝে বাহবা দিতেছেন, মাঝে মাঝে উৎকণ্ঠিত হইয়া দ্বারের দিকে চাহিতেছেন।

রামচন্দ্র। (দ্বারের কাছে উঠিয়া আসিয়া অনুচরের প্রতি) রমাইয়ের খবর কী?

অনুচর। কিছু তো জানি নে।

রামচন্দ্র। এখনো ফিরল না কেন? ধরা পড়ে নি তো?

অনুচর। হুজুর, বলতে তো পারি নে।

রামচন্দ্র। (ফিরিয়া আসিয়া আসনে বসিয়া) গাও, গাও, তোমরা গাও! কিন্তু ওটা নয়— একটা জলদ তাল লাগাও!

নটীর গান

ভৈরবী। কাওয়ালি

ও যে মানে না মানা।
আঁখি ফিরাইলে বলে, 'না, না, না।'

যত বলি 'নাই রাতি,
মলিন হয়েছে বাতি'
মুখপানে চেয়ে বলে, 'না না না।'
বিধুর বিকল হয়ে খেপা পবনে
ফাগুন করিছে হাহা ফুলের বনে।
আমি যত বলি 'তবে
এবার যে যেতে হবে'
দুয়ারে দাঁড়ায়ে বলে, 'না, না, না।'

রামচন্দ্র। এ কী রকম হল! গান শুনে যে কেবলই মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে!

রামমোহনের প্রবেশ

রামমোহন। একবার উঠে আসুন।

রামচন্দ্র। কেন, উঠব কেন?

রামমোহন। শীঘ্র আসুন, আর দেরি করবেন না।

রামচন্দ্র। চমৎকার গান জমেছে— এখন বিরক্ত করিস নে।

রামমোহন। যুবরাজ ডেকে পাঠিয়েছেন— বিশেষ কথা আছে।

রামচন্দ্র। আচ্ছা, তোমরা গান করো, আমি আসছি। রমাইয়ের কী হল জান? এখনো সে এল না কেন?

৫

প্রতাপাদিত্যের শয়নকক্ষ

প্রতাপাদিত্য ও লছমন সর্দার

প্রতাপাদিত্য। দেখো লছমন, আজ রাত্রে আমি রামচন্দ্র রায়ের ছিন্ন মুণ্ড দেখতে চাই।

লছমন। (সেলাম করিয়া) যো হুকুম মহারাজ!

রাজশ্যালকের প্রবেশ

রাজশ্যালক। (পদতলে পড়িয়া) মহারাজ, মার্জনা করুন, বিভার কথা একবার মনে করুন। অমন কাজ করবেন না।

প্রতাপাদিত্য। কী মুশকিল! আজ রাত্রে এরা আমাকে ঘুমোতে দেবে না নাকি?

পাশ ফিরিয়া শয়ন

রাজশ্যালক। মহারাজ, রাজজামাতা এখন অন্তঃপুরে আছেন। তাঁকে মার্জনা করুন। লছমনকে সেখানে যেতে নিষেধ করুন। তাতে আপনার অন্তঃপুরের অবমাননা হবে।

প্রতাপাদিত্য। এখন আমার ঘুমোবার সময়। কাল সকালে তোমাদের দরবার শোনা যাবে। তুমি বলছ রাজজামাতা এখন অন্তঃপুরে? আচ্ছা, লছমন!

লছমন। মহারাজ!

প্রতাপাদিত্য। কাল সকালে রামচন্দ্র যখন শয়নঘর হতে বাহিরে আসবে তখন আমার আদেশ পালন করবে। এখন সব যাও— আমার ঘুমের ব্যাঘাত কোরো না।

[লছমন ও রাজশ্যালকের প্রস্থান

বসন্ত রায়ের প্রবেশ

বসন্ত রায়। প্রতাপ! (প্রতাপাদিত্য নিরুত্তরে নিদ্রার ভান করিয়া রহিলেন) বাবা প্রতাপ! (প্রতাপাদিত্য নিরুত্তর) বাবা প্রতাপ, এও কি সম্ভব?

প্রতাপাদিত্য। (দ্রুত বিছানায় উঠিয়া বসিয়া) কেন সম্ভব নয়?

বসন্ত রায়। ছেলেমানুষ, অপরিণামদর্শী, সে কি তোমার ক্রোধের যোগ্য পাত্র?

প্রতাপাদিত্য। ছেলেমানুষ! আগুনে হাত দিলে হাত পুড়ে যায় এ বোঝবার বয়স তার হয় নি? ছেলেমানুষ! কোথাকার একটা লক্ষ্মীছাড়া মূর্খ ব্রাহ্মণ, নির্বোধদের কাছে দাঁত দেখিয়ে যে রোজকার করে খায়, তাকে স্ত্রীলোক সাজিয়ে আমার মহিষীর সঙ্গে বিদ্রূপ করবার জন্যে এনেছে— এতটা বুদ্ধি যার জোগাতে পারে, তার ফল কী হতে পারে সে বুদ্ধিটা আর তার মাথায় জোগাল না! দুঃখ এই, বুদ্ধিটা যখন মাথায় জোগাবে তখন তার মাথাও শরীরে থাকবে না।

বসন্ত রায়। আহা, সে ছেলেমানুষ। সে কিছুই বোঝে না।

প্রতাপাদিত্য। দেখো পিতৃব্যঠাকুর, যশোরের রায়-বংশের কিসে মান-অপমান সে জ্ঞান যদি তোমার থাকবে তবে কি ঐ পাকা মাথার উপর মোগল-বাদশার শিরোপা জড়িয়ে বেড়াতে পার। তোমার ঐ মাথাটা ধূলিতে লুটাবার সাধ ছিল, বিধাতার বিড়ম্বনায় তাতে বাধা পড়ল। এই তোমাকে স্পষ্টই বললুম। খুড়ামহাশয়, এখন আমার নিদ্রার সময়।

বসন্ত রায়ের দিকে পিছন করিয়া চোখ বুজিয়া শয়ন

বসন্ত রায়। প্রতাপ, আমি সব বুঝেছি। তুমি যখন একবার ছুরি তোল তখন সে ছুরি একজনের উপর পড়তেই চায়, আমি তার লক্ষ্য হতে সরে পড়লুম বলে আর-একজন তার লক্ষ্য হয়েছে। ভালো প্রতাপ, তোমার ক্ষুধিত ক্রোধ একজনকে যদি গ্রাস করতেই চায় তবে আমাকেই করুক। প্রতাপ! (প্রতাপ নিদ্রার ভানে নিরুত্তর) প্রতাপ! (প্রতাপ নিরুত্তর) বাবা প্রতাপ, একবার বিভার কথা ভেবে দেখো। (প্রতাপ নিরুত্তর) করুণাময় হরি!

[বসন্ত রায়ের প্রস্থান

৬

নটনটীগণ

প্রথমা। কই, এখনো তো ফিরলেন না!

দ্বিতীয়া। আর তো ভাই, পারি নে। ঘুম পেয়ে আসছে।

তৃতীয়া। ফের কি সভা জমবে নাকি?

প্রথমা। কেউ যে জেগে আছে তা তো বোধ হচ্ছে না। এতবড়ো রাজবাড়ি সমস্ত যেন হাঁ হাঁ করছে।

দ্বিতীয়া। চাকররাও সব হঠাৎ কে কোথায় যেন চলে গেল!

তৃতীয়া। বাতিগুলো সব নিবে আসছে, কেউ জ্বালিয়ে দেবে না?

প্রথমা। আমার কেমন ভয় করছে ভাই!

দ্বিতীয়া। (বাদকদিগকে দেখাইয়া দিয়া) ওরাও যে-সব ঘুমোতে লাগল— কী মুশকিলেই পড়া গেল। ওদের তুলে দে-না। কেমন গা ছম্ ছম্ করছে।

তৃতীয়া। মিছে না ভাই! একটা গান ধর্। ওগো, তোমরা ওঠো ওঠো।

বাদকগণ। (ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া) অ্যাঁ অ্যাঁ! এসেছেন নাকি?

প্রথমা। তোমরা একবার বেরিয়ে গিয়ে দেখো-না গো! কেউ কোথাও নেই। আমাদের আজকে বিদায় দেবে-না নাকি?

একজন বাদক। (বাহিরে গিয়া ফিরিয়া আসিয়া) ও দিকে যে সব বন্ধ।

প্রথমা। অ্যাঁ! বন্ধ! আমাদের কি কয়েদ করলে নাকি?

দ্বিতীয়া। দূর! কয়েদ করতে যাবে কেন?

তৃতীয়া। গান

নয়ন মেলে দেখি আমায় বাঁধন বেঁধেছে।
গোপনে কে এমন করে ফাঁদ ফেঁদেছে?
বসন্তরজনীশেষে
বিদায় নিতে গেলেম হেসে,
যাবার বেলায় বঁধু আমায় কাঁদিয়ে কেঁদেছে।

প্রথমা। তোর সকল সময়েই গান। ভালো লাগছে না। কী হল বুঝতে পারছি নে।

৭

অন্তঃপুরের প্রাঙ্গণ

বিভা, উদয়াদিত্য, রামচন্দ্র রায় ও সুরমা। বসন্ত রায়ের প্রবেশ

বসন্ত রায়কে দেখিয়া মুখে কাপড় ঢাকিয়া বিভা কাঁদিয়া উঠিল

বসন্ত রায়। (উদয়াদিত্যের হাত ধরিয়া) দাদা, একটা উপায় করো।

উদয়াদিত্য। অন্তঃপুরের প্রহরীদের জন্যে আমি ভাবি নে। সদর-দরজায় এই প্রহরে যে দুজন পাহারা দেয় তারাও আমার বশ আছে। কিন্তু দেখলুম বড়ো ফটক বন্ধ, সে তো পার হবার উপায় নেই।

বসন্ত রায়। উপায় নেই বললে চলবে কেন? উপায় যে করতেই হবে। দাদা, চলো।

উদয়াদিত্য। যদি-বা ফটক পার হওয়া যায়, এ রাজ্য থেকে পালাবে কী করে?

রামচন্দ্র। আমার চৌষট্টি দাঁড়ের ছিপ রয়েছে, একবার তাতে চড়ে বসতে পারলে আমি আর কাউকে ভয় করি নে।

বসন্ত রায়। সে নৌকা কোথায় আছে ভাই?

উদয়াদিত্য। সে নৌকা আমি রাজবাটীর দক্ষিণ পাশের খালের মধ্যে আনিয়ে রেখেছি। কিন্তু সে পর্যন্ত পৌঁছব কী করে?

রামচন্দ্র। রামমোহন কোথায় গেল?

উদয়াদিত্য। সে বন্ধ ফটকের উপর খাঁচার সিংহের মতো বৃথা ধাক্কা মারছে— তাতে কোনো ফল হবে না।

বিভা। খাল তো দূরে নয়। তোমার দক্ষিণের ঘরের জানালার একেবারে নীচেই তো খাল।

উদয়াদিত্য। সে যে অনেক নীচে। লাফিয়ে পড়া চলে না তো।

সুরমা। (উদয়াদিত্যকে মৃদুস্বরে) আমাদের এখানে যে দাঁড়িয়ে থাকলে কোনো ফল হবে তা তো বোধ হয় না। মহারাজ কি শুতে গিয়েছেন?

বসন্ত রায়। হাঁ শুতে গিয়েছেন, রাত তো কম হয় নি।

সুরমা। মা কি একবার তাঁর কাছে গিয়ে—

উদয়াদিত্য। মা এ-সমস্ত কিছুই জানেন না। জানলে তিনি কান্নাকাটি করে এমনি গোলমাল বাধিয়ে তুলবেন যে, আর কোনো উপায় থাকবে না। জানই তো তিনি মহারাজের কাছে কিছু বলতে গেলে সমস্তই উলটো হবে— মাঝের থেকে কেবল তিনিই অস্থির হয়ে উঠবেন।

সুরমা। বিভা, কাঁদিস নে বিভা। এ কখনো ঘটতেই পারে না। এ একটা স্বপ্ন— এ সমস্তই কেটে যাবে।

রামমোহনের প্রবেশ

রামচন্দ্র। কী রামমোহন— কী করবি বল্।

রামমোহন। যতক্ষণ আমার প্রাণ আছে ততক্ষণ—

রামচন্দ্র। আরে তোর প্রাণ নিয়ে আমার কী হবে ? এখন পালাবার উপায় কী ?

রামমোহন। মহারাজ, তুমি যদি ভয় না কর, আমি এক কাজ করতে পারি।

রামচন্দ্র। কী বল্‌।

রামমোহন। তোমাকে পিঠে করে নিয়ে রাজবাটীর ছাতের উপর থেকে আমি খালের মধ্যে লাফিয়ে পড়তে পারি।

বসন্ত রায়। কী সর্বনাশ ! সে কি হয় !

রামচন্দ্র। না, সে হবে না। আর-একটা সহজ উপায় কিছু বল্‌।

রামমোহন। যুবরাজ, আমাকে গোটাকতক মোটা চাদর এনে দাও— পাকিয়ে শক্ত করে দক্ষিণের দরজার সঙ্গে বেঁধে নীচে ঝুলিয়ে দিই।

উদয়াদিত্য। ঠিক বলেছিস রামমোহন। বিপদের সময় সব চেয়ে সহজ কথাটাই মাথায় আসে না। চল্‌ চল্‌।

বিভা। মোহন, কোনো ভয় নেই তো ?

রামমোহন। কোনো ভয় নেই মা ! আমি দড়ি বেয়ে স্বচ্ছন্দে নামিয়ে নিয়ে যাব। জয় মা কালী !

৮

অন্তঃপুর

মহিষী

মহিষী। কী হল বুঝতে পারছি নে তো। সকলকেই খাওয়ালুম কিন্তু মোহনকে কোথাও দেখতে পাচ্ছি নে কেন ? বামী !

বামীর প্রবেশ

এদিককার খাওয়াদাওয়া তো সব শেষ হল— মোহনকে খুঁজে পাচ্ছি নে কেন ?

বামী। মা, তুমি অত ভাবছ কেন ? তুমি শুতে যাও, রাত যে পুইয়ে এল, তোমার শরীরে সইবে কেন ?

মহিষী। সে কি হয় ! আমি যে তোকে নিজে বসিয়ে খাওয়াব বলে রেখেছি।

বামী। সে নিশ্চয় রাজকুমারীর মহলে গেছে, তিনি তাকে খাইয়েছেন। তুমি চলো, শুতে চলো।

মহিষী। আমি তো ও মহলে খোঁজ করতে যাচ্ছিলুম, দেখি সব দরজা বন্ধ— এর মানে কী, কিছু তো বুঝতে পারছি নে।

বামী। বাড়িতে গোলমাল দেখে রাজকুমারী তাঁর মহলের দরজা বন্ধ করেছেন। অনেক দিন পরে জামাই এসেছেন, আজ লোকজনের ভিড় সইবে কেন ? চলো, তুমি শুতে চলো।

মহিষী। কী জানি বামী, আজ ভালো লাগছে না। প্রহরীদের ডাকতে বললুম, তাদের কারও কোনো সাড়াই পাওয়া গেল না।

বামী। যাত্রা হচ্ছে, তারা তাই আমোদ করতে গেছে।

মহিষী। মহারাজ জানতে পারলে যে তাদের আমোদ বেরিয়ে যাবে। উদয়ের মহলও যে বন্ধ, তারা ঘুমিয়েছে বুঝি !

বামী। ঘুমোবেন না ! বল কী ! রাত কম হয়েছে ?

মহিষী। গানবাজনা ছিল, জামাইকে নিয়ে একটু আমোদ-আহ্লাদ করবে না ! ওরা মনে কী ভাববে বল্‌ তো ? এ সমস্তই ঐ বউমার কাণ্ড। একটু বিবেচনা নেই। রোজই তো ঘুমোচ্ছে— একটা দিন কি আর—

বামী। মা, সে-সব কথা কাল হবে— আজ চলো।

মহিষী। মঙ্গলার সঙ্গে তোর দেখা হয়েছে তো?
বামী। হয়েছে বৈকি।
মহিষী। ওষুধের কথা বলেছিস?
বামী। সে-সব ঠিক হয়ে গেছে।

৯

শয়নকক্ষ

প্রতাপাদিত্য, প্রহরী, পীতাম্বর। অনুচরের প্রবেশ

প্রতাপাদিত্য। কত রাত আছে?
পীতাম্বর। এখনো চার দণ্ড রাত আছে।
প্রতাপাদিত্য। কী যেন একটা গোলমাল শুনলুম।
পীতাম্বর। আজ্ঞে হাঁ, তাই শুনেই আমি আসছি।
প্রতাপাদিত্য। কী হয়েছে?
পীতাম্বর। আসবার সময় দেখলুম, বাইরের প্রহরীরা দ্বারে নেই।
প্রতাপাদিত্য। অন্তঃপুরের প্রহরীরা?
পীতাম্বর। হাত-পা-বাঁধা পড়ে আছে।
প্রতাপাদিত্য। তারা কী বললে?
পীতাম্বর। আমার কথায় কোনো জবাব দিলে না— হয়তো অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে।
প্রতাপাদিত্য। রামচন্দ্র রায় কোথায়? উদয়াদিত্য, বসন্ত রায় কোথায়?
পীতাম্বর। বোধ করি তাঁরা অন্তঃপুরেই আছেন।
প্রতাপাদিত্য। বোধ করি! তোমার বোধ করার কথা কে জিজ্ঞাসা করছে? মন্ত্রীকে ডাকো।

[পীতাম্বরের প্রস্থান

মন্ত্রীর প্রবেশ

মন্ত্রী। মহারাজ, রাজজামাতা—
প্রতাপাদিত্য। রামচন্দ্র রায়—
মন্ত্রী। তিনি রাজপুরী পরিত্যাগ করে গেছেন।
প্রতাপাদিত্য। (দাঁড়াইয়া উঠিয়া) পরিত্যাগ করে গেছে। প্রহরীরা গেল কোথা?
মন্ত্রী। বহির্দ্বারের প্রহরীরা পালিয়ে গেছে।
প্রতাপাদিত্য। (মুষ্টি বদ্ধ করিয়া) পালিয়ে গেছে! পালাবে কোথায়? যেখানে থাকে তাদের খুঁজে আনতে হবে। অন্তঃপুরের প্রহরীদের এখনই ডেকে নিয়ে এসো। অন্তঃপুরের পাহারায় কে কে ছিল?
মন্ত্রী। সীতারাম আর ভাগবত।
প্রতাপাদিত্য। ভাগবত ছিল? সে তো হুঁশিয়ার। সেও কি উদয়ের সঙ্গে যোগ দিলে?
মন্ত্রী। সে হাত-পা-বাঁধা পড়ে আছে।
প্রতাপাদিত্য। হাত-পা-বাঁধা আমি বিশ্বাস করি নে। হাত-পা ইচ্ছা করে বাঁধিয়েছে। আচ্ছা, সীতারামকে নিয়ে এসো। সেই গর্দভের কাছ থেকে কথা বের করা শক্ত হবে না।

মন্ত্রীর প্রস্থান ও সীতারামকে লইয়া পুনঃপ্রবেশ

প্রতাপাদিত্য। অন্তঃপুরের দ্বার খোলা হল কী করে?

সীতারাম। (করজোড়ে) দোহাই মহারাজ, আমার কোনো দোষ নেই।
প্রতাপাদিত্য। সে কথা তোকে কে জিজ্ঞাসা করছে ?
সীতারাম। আজ্ঞা না, মহারাজ ! যুবরাজ— যুবরাজ আমাকে বলপূর্বক বেঁধে অন্তঃপুর হতে বেরিয়েছিলেন।

ব্যস্তভাবে বসন্ত রায়ের প্রবেশ

সীতারাম। যুবরাজকে নিষেধ করলুম, তিনি শুনলেন না।
বসন্ত রায়। হাঁ, হাঁ সীতারাম, কী বললি ? অধর্ম করিস নে সীতারাম, উদয়াদিত্যের এতে কোনো দোষ নেই।
সীতারাম। আজ্ঞা না, যুবরাজের কোনো দোষ নেই।
প্রতাপাদিত্য। তবে তোর দোষ ?
সীতারাম। আজ্ঞা না।
প্রতাপাদিত্য। তবে কার দোষ ?
সীতারাম। আজ্ঞা, যুবরাজ—
প্রতাপাদিত্য। তাঁর সঙ্গে আর কে ছিল ?
সীতারাম। আজ্ঞা, বউরানীমা—
প্রতাপাদিত্য। বউরানী ! ঐ সেই শ্রীপুরের (বসন্ত রায়ের দিকে চাহিয়া)— উদয়াদিত্যের এ অপরাধের মার্জনা নেই।
বসন্ত রায়। বাবা প্রতাপ, উদয়ের এতে কোনো দোষ নেই।
প্রতাপাদিত্য। দোষ নেই ? তুমি দোষ নেই বলছ বলেই তাকে বিশেষরূপে শাস্তি দেব। তুমি মাঝে পড়ে মীমাংসা করতে এসেছ কেন ? শোনো পিতৃব্যঠাকুর ! তুমি যদি দ্বিতীয় বার যশোরে এসে উদয়াদিত্যের সঙ্গে দেখা কর তবে তার প্রাণ বাঁচানো দায় হবে।
বসন্ত রায়। (কিয়ৎকাল চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া) ভালো প্রতাপ, আজ সন্ধ্যাবেলায় তবে আমি চললেম।

[প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক

১

উদয়াদিত্যের ঘরের অলিন্দ

উদয়াদিত্য ও মাধবপুরের একদল প্রজা

উদয়াদিত্য। ওরে, তোরা মরতে এসেছিস এখানে ? মহারাজ খবর পেলে রক্ষা রাখবেন না। পালা পালা।
১। আমাদের মরণ সর্বত্রই। পালাব কোথায় ?
২। তা মরতে যদি হয় তো তোমার সামনে দাঁড়িয়ে মরব।
উদয়াদিত্য। তোদের কী চাই বল্ দেখি।
অনেকে। আমরা তোমাকে চাই।
উদয়াদিত্য। আমাকে নিয়ে তোদের কোনো লাভ হবে না রে— দুঃখই পাবি।
৩। আমাদের দুঃখই ভালো কিন্তু তোমাকে আমরা নিয়ে যাব।
৪। আমাদের মাধবপুরে ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত কাঁদছে, সে কি কেবল ভাত না পেয়ে ? তা নয়।

তুমি চলে এসেছ বলে। তোমাকে আমরা ধরে নিয়ে যাব।

উদয়াদিত্য। আরে চুপ কর্, চুপ কর্। ও কথা বলিস নে।

৫। রাজা তোমাকে ছাড়বে না। আমরা তোমাকে জোর করে নিয়ে যাব। আমরা রাজাকে মানি নে— আমরা তোমাকে রাজা করব।

প্রতাপাদিত্যের প্রবেশ

প্রতাপাদিত্য। কাকে মানিস নে রে! তোরা কাকে রাজা করবি?

প্রজাগণ। মহারাজ, পেন্নাম হই।

১। আমরা তোমার কাছে দরবার করতে এসেছি।

প্রতাপাদিত্য। কিসের দরবার?

১। আমরা যুববাজকে চাই।

প্রতাপাদিত্য। বলিস কী রে!

সকলে। হাঁ মহারাজ, আমরা যুবরাজকে মাধবপুরে নিয়ে যাব।

প্রতাপাদিত্য। আর ফাঁকি দিবি? খাজনা দেবার নামটি করবি নে?

সকলে। অন্ন বিনে মরছি যে!

প্রতাপাদিত্য। মরতে তো সকলকেই হবে। বেটারা রাজার দেনা বাকি রেখে মরবি?

১। আচ্ছা, আমরা না খেয়েই খাজনা দেব, কিন্তু যুবরাজকে আমাদের দাও। মরি তো ওঁরই হাতে মরব।

প্রতাপাদিত্য। সে বড়ো দেরি নেই। তোদের সর্দার কোথায় রে?

২। (প্রথমকে দেখাইয়া) এই যে আমাদেব গণেশ সর্দার।

প্রতাপাদিত্য। ও নয়— সেই বৈরাগীটা।

১। আমাদের ঠাকুর! তিনি তো পুজোয় বসেছেন। এখনই আসবেন। ঐ যে এসেছেন।

ধনঞ্জয় বৈরাগীর প্রবেশ

ধনঞ্জয়। দয়া যখন হয় তখন সাধনা না করেই পাওয়া যায়। ভয় ছিল কাঙালদের দরজা থেকেই ফিরতে হয়-বা। প্রভুর কৃপা হল, রাজাকে অমনি দেখতে পেলুম। (উদযাদিত্যের প্রতি) আর এই আমাদের হৃদয়ের রাজা। ওকে রাজা বলতে যাই, বন্ধু বলে ফেলি!

উদয়াদিত্য। ধনঞ্জয়!

ধনঞ্জয়। কী রাজা! কী ভাই!

উদয়াদিত্য। এখানে কেন এলে?

ধনঞ্জয়। তোমাকে না দেখে থাকতে পারি নে যে!

উদয়াদিত্য। মহারাজ রাগ করছেন।

ধনঞ্জয়। বাগই সই। আগুন জ্বলছে, তবু পতঙ্গ মরতে যায়।

প্রতাপাদিত্য। তুমি এই-সমস্ত প্রজাদের খেপিয়েছ?

ধনঞ্জয়। খেপাই বৈকি! নিজে খেপি, ওদেরও খেপাই, এই তো আমার কাজ।

গান

আমারে পাড়ায় পাড়ায় খেপিয়ে বেড়ায়
কোন্ খেপা সে।
ওরে আকাশ জুড়ে মোহন সুরে
কী যে বাজে কোন বাতাসে।

ওরে খেপার দল, গান ধর্ রে— হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন ? রাজাকে পেয়েছিস, আনন্দ করে নে। রাজা আমাদের মাধবপুরের নৃত্যটা দেখে নিক।

সকলে মিলিয়া নৃত্যগীত

গেল রে গেল বেলা, পাগলের কেমন খেলা—
ডেকে সে আকুল করে, দেয় না ধরা।
তারে কানন-গিরি খুঁজে ফিরি,
কেঁদে মরি কোন্ হুতাশে !

(প্রতাপাদিত্যের মুখের দিকে চাহিয়া) আহা, আহা, রাজা আমার, অমন নিষ্ঠুর সেজে এ কী লীলা হচ্ছে ! ধরা দেবে না বলে পণ করেছিলে, আমরা ধরব বলে কোমর বেঁধে বেরিয়েছি।

প্রতাপাদিত্য। দেখো বৈরাগী, তুমি অমন পাগলামি করে আমাকে ভোলাতে পারবে না। এখন কাজের কথা হোক। মাধবপুরের প্রায় দু বছরের খাজনা বাকি— দেবে কি না বলো।

ধনঞ্জয়। না মহারাজ, দেব না।

প্রতাপাদিত্য। দেবে না ! এতবড়ো আস্পর্ধা !

ধনঞ্জয়। যা তোমার নয় তা তোমাকে দিতে পারব না।

প্রতাপাদিত্য। আমার নয় !

ধনঞ্জয়। আমাদের ক্ষুধার অন্ন তোমার নয়। যিনি আমাদের প্রাণ দিয়েছেন এ অন্ন যে তাঁর, এ আমি তোমাকে দিই কী বলে ?

প্রতাপাদিত্য। তুমিই প্রজাদের বারণ করেছ খাজনা দিতে ?

ধনঞ্জয়। হাঁ মহারাজ, আমিই তো বারণ করেছি। ওরা মূর্খ, ওরা তো বোঝে না— পেয়াদার ভয়ে সমস্তই দিয়ে ফেলতে চায়। আমিই বলি, আরে আরে, এমন কাজ করতে নেই— প্রাণ দিবি তাঁকে প্রাণ দিয়েছেন যিনি। তোদের রাজাকে প্রাণহত্যার অপরাধী করিস নে।

প্রতাপাদিত্য। দেখো ধনঞ্জয়, তোমার কপালে দুঃখ আছে।

ধনঞ্জয়। যে দুঃখ কপালে ছিল তাকে আমার বুকের উপর বসিয়েছি মহারাজ— সেই দুঃখই তো আমাকে ভুলে থাকতে দেয় না। যেখানে ব্যথা সেইখানেই হাত পড়ে— ব্যথা আমার বেঁচে থাক্।

প্রতাপাদিত্য। দেখো বৈরাগী, তোমার চাল নেই, চুলো নেই, কিন্তু এরা সব গৃহস্থ মানুষ, এদের কেন বিপদে ফেলতে চাচ্ছ ? (প্রজাদের প্রতি) দেখ্ বেটারা, আমি বলছি তোরা সব মাধবপুরে ফিরে যা। বৈরাগী, তুমি এইখানেই রইলে।

প্রজাগণ। আমাদের প্রাণ থাকতে সে তো হবে না।

ধনঞ্জয়। কেন হবে না রে ! তোদের বুদ্ধি এখনো হল না ? রাজা বললে বৈরাগী তুমি রইলে, তোরা বললি না তা হবে না— আর বৈরাগী লক্ষ্মীছাড়াটা কি ভেসে এসেছে ? তার থাকা না-থাকা কেবল রাজা আর তোরা ঠিক করে দিবি ?

গান

রইল বলে রাখলে কারে ?
হুকুম তোমার ফলবে কবে ?
তোমার টানাটানি টিকবে না ভাই,
রবার যেটা সেটাই রবে।
যা খুশি তাই করতে পার—
গায়ের জোরে রাখ মার ;
যাঁর গায়ে সব ব্যথা বাজে
তিনি যা সন সেটাই সবে।

অনেক তোমার টাকাকড়ি,
অনেক দড়া অনেক দড়ি,
অনেক অশ্ব অনেক করী—
অনেক তোমার আছে ভবে।
ভাবছ হবে তুমিই যা চাও,
জগৎটাকে তুমিই নাচাও,
দেখবে হঠাৎ নয়ন খুলে
হয় না যেটা সেটাও হবে।

মন্ত্রীর প্রবেশ

প্রতাপাদিত্য। তুমি ঠিক সময়েই এসেছ। এই বৈরাগীকে এইখানেই ধরে রেখে দাও। ওকে মাধবপুরে যেতে দেওয়া হবে না।

মন্ত্রী। মহারাজ—

প্রতাপাদিত্য। কী, হুকুমটা তোমার মনের মতো হচ্ছে না বুঝি?

উদয়াদিত্য। মহারাজ, বৈরাগীঠাকুর সাধুপুরুষ।

প্রজারা। মহারাজ, এ আমাদের সহ্য হবে না। মহারাজ, অকল্যাণ হবে।

ধনঞ্জয়। আমি বলছি, তোরা ফিরে যা। হুকুম হয়েছে আমি দুদিন রাজার কাছে থাকব, বেটাদের সেটা সহ্য হল না।

প্রজারা। আমরা এইজন্যেই কি দরবার করতে এসেছিলুম? আমরা যুবরাজকেও পাব না, তোমাকেও হারাব?

ধনঞ্জয়। দেখ্, তোদের কথা শুনলে আমার গা জ্বালা করে। হারাবি কি রে বেটা? আমাকে তোদের গাঁঠে বেঁধে রেখেছিলি? তোদের কাজ হয়ে গেছে, এখন পালা, সব পালা।

প্রজারা। মহারাজ, আমরা কি আমাদের যুবরাজকে পাব না?

প্রতাপাদিত্য। না।

২

অন্তঃপুর

সুরমা ও বিভা

সুরমা। বিভা, ভাই বিভা, তোর চোখে যদি জল দেখতুম তা হলে আমার মনটা যে খোলসা হত। তোর হয়ে যে আমার কাঁদতে ইচ্ছা করে ভাই। সব কথাই কি এমনি করে চেপে রাখতে হয়?

বিভা। কোনো কথাই তো চাপা রইল না বউরানী। ভগবান তো লজ্জা রাখলেন না!

সুরমা। আমি কেবল এই কথাই ভাবি যে জগতে সব দাহই জুড়িয়ে যায়। আজকের মতো এমন কপাল-পোড়া সকাল তো রোজ আসবে না; সংসার লজ্জা দিতেও যেমন, লজ্জা মিটিয়ে দিতেও তেমনি! সব ভাঙাচোরা জুড়ে আবার দেখতে দেখতে ঠিক হয়ে যায়।

বিভা। ঠিক নাও যদি হয়ে যায় তাতেই বা কী? যেটা হয় সেটা তো সইতেই হয়।

সুরমা। শুনেছিস তো বিভা, মাধবপুর থেকে ধনঞ্জয় বৈরাগী এসেছেন্। তাঁর তো খুব নাম শুনেছি, বড়ো ইচ্ছা করে তাঁর গান শুনি। গান শুনবি বিভা? ঐ দেখ, কেবল অতটুকু মাথা নাড়লে হবে না। লোক দিয়ে বলে পাঠিয়েছি, আজ যেন একবার মন্দিরে গান গাইতে আসেন; তা হলে আমরা উপরের ঘর থেকে শুনতে পাব। ও কী, পালাচ্ছিস কোথায়?

বিভা। দাদা আসছেন।

সুরমা। তা এলই বা দাদা।
বিভা। না, আমি যাই বউরানী!

[প্রস্থান

সুরমা। আজ ওর দাদার কাছেও মুখ দেখাতে পারছে না।

উদয়াদিত্যের প্রবেশ

সুরমা। আজ ধনঞ্জয় বৈরাগীকে আমাদের মন্দিরে গান গাবার জন্যে ডেকে পাঠিয়েছি।
উদয়াদিত্য। সে তো হবে না।
সুরমা। কেন?
উদয়াদিত্য। তাঁকে মহারাজ কয়েদ করেছেন।
সুরমা। কী সর্বনাশ! অমন সাধুকে কয়েদ করেছেন?
উদয়াদিত্য। ওটা আমার উপব রাগ কবে। তিনি জানেন আমি বৈরাগীকে ভক্তি করি— মহারাজের কঠিন আদেশেও আমি তাঁর গায়ে হাত দিই নি— সেইজন্যে আমাকে দেখিয়ে দিলেন রাজকার্য কেমন করে করতে হয়।
সুরমা। কিন্তু এগুলো যে অমঙ্গলেব কথা— শুনলে ভয় হয়। কী করা যাবে?
উদয়াদিত্য। মন্ত্রী আমার অনুরোধে বৈবাগীকে গারদে না দিয়ে তাঁর বাড়িতে লুকিয়ে রাখতে রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু ধনঞ্জয় কিছুতেই রাজি হলেন না। তিনি বললেন, আমি গারদেই যাব, সেখানে যত কয়েদি আছে তাদের প্রভুব নামগান শুনিয়ে আসব। তিনি যেখানেই থাকুন তাঁর জন্যে কাউকেই ভাবতে হবে না— তাঁর ভাবনার লোক উপরে আছেন।
সুরমা। মাধবপুবেব প্রজাদের জন্যে আমি সব সিধে সাজিয়ে রেখেছি— কোথায় সব পাঠাব?
উদয়াদিত্য। গোপনে পাঠাতে হবে। নির্বোধগুলো আমাকে রাজা রাজা করে চেঁচাচ্ছিল, মহারাজ সেটা শুনতে পেয়েছেন— নিশ্চয় তাঁর ভালো লাগে নি। এখন তোমার ঘর থেকে তাদের খাবার পাঠানো হলে মনে কী সন্দেহ করবেন বলা যায় না।
সুরমা। আচ্ছা, সে আমি বিভাকে দিয়ে পাঠিয়ে দেব। কিন্তু আমি ভাবছি, কাল রাত্রে যারা পাহারায় ছিল সেই সীতারাম-ভাগবতের কী দশা হবে!
উদয়াদিত্য। মহারাজ ওদের গায়ে হাত দেবেন না— সে ভয় নেই।
সুরমা। কেন?
উদয়াদিত্য। মহারাজ কখনো ছোটো শিকারকে বধ করেন না। দেখলে না, রমাই ভাঁড়কে তিনি ছেড়ে দিলেন?
সুরমা। কিন্তু শাস্তি তো তিনি একজন কাউকে না দিয়ে থাকবেন না।
উদয়াদিত্য। সে তো আমি আছি।
সুরমা। ও কথা বোলো না।
উদয়াদিত্য। বলতে বারণ কর তো বলব না। কিন্তু বিপদের জন্যে কি প্রস্তুত হতে হবে না?
সুরমা। আমি থাকতে তোমার বিপদ ঘটবে কেন? সব বিপদ আমি নেব।
উদয়াদিত্য। তুমি নেবে? তার চেয়ে বিপদ আমার আর আছে নাকি? যাই হোক, সীতারাম-ভাগবতের অন্নবস্ত্রের একটা ব্যবস্থা করে দিতে হবে।
সুরমা। তুমি কিন্তু কিছু কোরো না। তাদের জন্যে যা করবার ভার সে আমি নিয়েছি।
উদয়াদিত্য। না, না, এতে তুমি হাত দিয়ো না।
সুরমা। আমি দেব না তো কে দেবে? ও তো আমার কাজ। আমি সীতারাম-ভাগবতের স্ত্রীদের ডেকে পাঠিয়েছি।
উদয়াদিত্য। সুরমা, তুমি বড়ো অসাবধান।

সুরমা। আমার জন্যে তুমি কিছু ভেবো না। আসল ভাবনার কথা কী জান ?

উদয়াদিত্য। কী বলো দেখি ?

সুরমা। ঠাকুরজামাই তাঁর ভাঁড়কে নিয়ে যে কাণ্ডটি করলেন বিভা সেজন্যে লজ্জায় মরে গেছে।

উদয়াদিত্য। লজ্জার কথা বৈকি।

সুরমা। এতদিন স্বামীর অনাদরে বাপের 'পরেই তার অভিমান ছিল— আজ যে তার সে অভিমান করবারও মুখ রইল না। বাপের নিষ্ঠুরতার চেয়ে তার স্বামীর এই নীচতা তাকে অনেক বেশি বেজেছে। একে তো ভারি চাপা মেয়ে, তার পরে এই কাণ্ড। আজ থেকে দেখো, ওর স্বামীর কথা আমার কাছেও বলতে পারবে না। স্বামীর গর্ব যে স্ত্রীলোকের ভেঙেছে জীবন তার পক্ষে বোঝা, বিশেষত বিভার মতো মেয়ে।

উদয়াদিত্য। ভগবান বিভাকে দুঃখ যথেষ্ট দিলেন, তেমনি সহ্য করবার শক্তিও দিয়েছেন।

সুরমা। সে শক্তির অভাব নেই— বিভা তোমারই তো বোন বটে !

উদয়াদিত্য। আমার শক্তি যে তুমি।

সুরমা। তাই যদি হয় তো সে'ও তোমারই শক্তিতে।

উদয়াদিত্য। আমার কেবলই ভয় হয় তোমাকে যদি হারাই তা হলে—

সুরমা। তা হলে তোমার কোনো অনিষ্ট হবে না। দেখো একদিন ভগবান প্রমাণ করিয়ে দেবেন যে, তোমার মহত্ত্ব একলা তোমাতেই আছে।

উদয়াদিত্য। আমার সে প্রমাণে কাজ নেই।

সুরমা। ভাগবতের স্ত্রী অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে।

উদয়াদিত্য। আচ্ছা চললুম, কিন্তু দেখো।

[প্রস্থান

ভাগবতের স্ত্রীর প্রবেশ

সুরমা। ভোর-রাত্রে আমি যে টাকা আর কাপড় পাঠিয়েছি তা তোদের হাতে গিয়ে পৌঁচেছে তো ?

ভাগবতের স্ত্রী। পৌঁচেছে মা, কিন্তু তাতে আমাদের কতদিন চলবে ? তোমরা আমাদের সর্বনাশ করলে।

সুরমা। ভয় নেই কাম্মিনী ! আমার যতদিন খাওয়া-পরা জুটবে তোদেরও জুটবে। আজও কিছু নিয়ে যা। কিন্তু এখানে বেশিক্ষণ থাকসি নে। [উভয়ের প্রস্থান

মহিষী ও বামীর প্রবেশ

মহিষী। এত বড়ো একটা কাণ্ড হয়ে গেল, আমি জানতেও পারলুম না।

বামী। মহারানীমা, জেনেই বা লাভ হত কী ? তুমি তো ঠেকাতে পারতে না।

মহিষী। সকালে উঠে আমি ভাবছি হল কী— জামাই বুঝি রাগ করেই গেল। এ দিকে যে এমন সর্বনাশের উদ্‌যোগ হচ্ছিল তা মনে আনতেও পারি নি। তুই সে রাত্রেই জানতিস, আমাকে ভাঁড়িয়েছিলি।

বামী। জানলে তুমি যে ভয়েই মরে যেতে। তা মা, আর ও কথায় কাজ নেই— যা হয়ে গেছে সে হয়ে গেছে।

মহিষী। হয়ে চুকলে তো বাঁচতুম— এখন যে আমার উদয়ের জন্যে ভয় হচ্ছে।

বামী। ভয় খুব ছিল কিন্তু সে কেটে গেছে।

মহিষী। কী করে কাটল ?

বামী। মহারাজার রাগ বউরানীর উপর পড়েছে। তিনিও আচ্ছা মেয়ে যা হোক— আমাদের মহারাজের ভয়ে যম কাঁপে কিন্তু ওঁর ভয়-ডর নেই। যাতে তাঁরই উপরে সব রাগ পড়ে তিনি ইচ্ছে করেই যেন তার জোগাড় করছেন।

মহিষী। তার জন্যে তো বেশি জোগাড় করবার দরকার দেখি নে। মহারাজ যে ওকে বিদায় করতে পারলেই বাঁচেন। এবারে আর তো ঠেকিয়ে রাখতে পারা যাবে না। তা তোকে যা বলেছিলুম সেটা ঠিক আছে তো?

বামী। সে-সমস্তই তৈরি হয়ে রয়েছে, সেজন্যে ভেবো না।

মহিষী। আর দেরি করিস নে, আজকেরই যাতে—

বামী। সে আমাকে বলতে হবে না, কিন্তু—

মহিষী। যা হয় হবে— অত ভাবতে পারি নে— ওকে বিদায় করতে পারলেই আপাতত মহারাজের রাগ পড়ে যাবে, নইলে উদয়কে বাঁচাতে পারা যাবে না। তুই যা, শীঘ্র কাজ সেরে আয়।

বামী। আমি সে ঠিক করেই এসেছি— এতক্ষণে হয়তো—

মহিষী। কি জানি বামী, ভয়ও হয়।

৩

প্রতাপাদিত্যের কক্ষ

মহিষী ও প্রতাপাদিত্য

প্রতাপাদিত্য। মহিষী!

মহিষী। কি মহারাজ?

প্রতাপাদিত্য। এ-সব কাজ কি আমাকে নিজের হাতে করতে হবে।

মহিষী। কী কাজ?

প্রতাপাদিত্য। ঐ-যে আমি তোমাকে বলেছিলুম, শ্রীপুরের মেয়েকে তার পিত্রালয়ে দূর করে দিতে হবে— এ কাজটা কি আমার সৈন্য-সেনাপতি নিয়ে করতে হবে?

মহিষী। আমি তার জন্যে বন্দোবস্ত করছি।

প্রতাপাদিত্য। বন্দোবস্ত! এর আবার বন্দোবস্ত কিসের? আমার রাজ্যে ক-জন পালকির বেহারা জুটবে না নাকি?

মহিষী। সেজন্যে নয় মহারাজ!

প্রতাপাদিত্য। তবে কী জন্যে?

মহিষী। দেখো, তবে খুলে বলি। ঐ বউ আমার উদয়কে যেন জাদু করে রেখেছে সে তো তুমি জান। ওকে যদি বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিই তা হলে—

প্রতাপাদিত্য। এমন জাদু তো ভেঙে দিতে হবে— এ বাড়ি থেকে ঐ মেয়েটাকে নির্বাসিত করে দিলেই জাদু ভাঙবে।

মহিষী। মহারাজ, এ-সব কথা তোমরা বুঝবে না— সে আমি ঠিক করেছি।

প্রতাপাদিত্য। কী ঠিক করেছ জানতে চাই।

মহিষী। আমি বামীকে দিয়ে মঙ্গলার কাছ থেকে ওষুধ আনিয়েছি।

প্রতাপাদিত্য। ওষুধ কিসের জন্যে?

মহিষী। ওকে ওষুধ খাওয়ালেই ওর জাদু কেটে যাবে। মঙ্গলার ওষুধ অব্যর্থ, সকলেই জানে।

প্রতাপাদিত্য। আমি তোমার ওষুধ-টষুধ বুঝি নে। আমি এক ওষুধ জানি— শেষকালে সেই ওষুধ প্রয়োগ করব। আমি তোমাকে বলে রাখছি, কাল যদি ঐ শ্রীপুরের মেয়ে শ্রীপুরে ফিরে না যায় তা হলে আমি উদয়কে সুদ্ধ নির্বাসনে পাঠাব। এখন যা করতে হয় করো গে।

মহিষী। আর তো বাঁচি নে! কী যে করব মাথামুণ্ডু ভেবে পাই নে।

[প্রস্থান

উদয়াদিত্যের প্রবেশ

প্রতাপাদিত্য। সীতারাম-ভাগবতের বেতন বন্ধ হয়েছে সে কি রাজকোষে অর্থ নেই বলে?

উদয়াদিত্য। না মহারাজ, আমি বলপূর্বক তাদের কর্তব্যে বাধা দিয়েছি, আমাকে তারই দণ্ড দেবার জন্যে।

প্রতাপাদিত্য। বউমা তাদের গোপনে অর্থসাহায্য করছেন।

উদয়াদিত্য। আমিই তাঁকে সাহায্য করতে বলেছি।

প্রতাপাদিত্য। আমার ইচ্ছার অপমান করবার জন্যে?

উদয়াদিত্য। না মহারাজ, যে দণ্ড আমারই প্রাপ্য তা নিজে গ্রহণ করবার জন্যে।

প্রতাপাদিত্য। আমি আদেশ করছি, ভবিষ্যতে তাদের আর যেন অর্থসাহায্য না করা হয়।

উদয়াদিত্য। আমার প্রতি আরো গুরুতর শাস্তির আদেশ হল।

প্রতাপাদিত্য। আর বউমাকে বোলো, তিনি আমাকে একেবারেই ভয় করেন না— দীর্ঘকাল তাঁকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে বলেই এরকম ঘটতে পেরেছে, কিন্তু তিনি জানতে পারবেন স্পর্ধা প্রকাশ করা নিরাপদ নয়। তিনি মনে রাখেন যেন আমার রাজবাড়ি আমার রাজত্বের বাইরে নয়।

[উভয়ের প্রস্থান

মহিষী ও বামীর প্রবেশ

মহিষী। ওষুধের কী করলি?

বামী। সে তো এনেছি— পানের সঙ্গে সেজে দিয়েছি।

মহিষী। খাঁটি ওষুধ তো?

বামী। খুব খাঁটি।

মহিষী। খুব কড়া ওষুধ হওয়া চাই, এক দিনেই যাতে কাজ হয়! মহারাজ বলেছেন, কালকের মধ্যে যদি সুরমা বিদায় না হয় তা হলে উদয়কে সুদ্ধ নির্বাসনে পাঠাবেন। আমি যে কী কপাল করেছিলুম!

বামী। কড়া ওষুধ তো বটে। বড়ো ভয় হয় মা, কী হতে কী ঘটে।

মহিষী। ভয়ভাবনা করবার সময় নেই বামী! একটা-কিছু করতেই হবে। মহারাজকে তো জানিস— কেঁদেকেটে মাথা খুঁড়ে তাঁর কথা নড়ানো যায় না। উদয়ের জন্যে আমি দিনরাত্রি ভেবে মরছি। ঐ বউটাকে বিদায় করতে পারলে তবু মহারাজের রাগ একটু কম পড়বে। ও যেন ওঁর চক্ষুশূল হয়েছে।

বামী। তা তো জানি। কিন্তু ওষুধের কথা তো বলা যায় না। দেখো, শেষকালে মা, আমি যেন বিপদে না পড়ি। আর আমার বাজুবন্দর কথাটা মনে রেখো।

মহিষী। সে আমাকে বলতে হবে না। তোকে তো গোটছড়াটা আগাম দিয়েছি।

বামী। শুধু গোট নয় মা, বাজুবন্দ চাই।

[প্রস্থান

উদয়াদিত্যের প্রবেশ

মহিষী। বাবা উদয়, সুরমাকে বাপের বাড়ি পাঠানো যাক!

উদয়াদিত্য। কেন মা, সুরমা কী অপরাধ করেছে?

মহিষী। কী জানি বাছা, আমরা মেয়েমানুষ কিছু বুঝি না, বউমাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে মহারাজার রাজকার্যের যে কী সুযোগ হবে, মহারাজই জানেন।

উদয়াদিত্য। মা, রাজবাড়িতে যদি আমার স্থান হয়ে থাকে তবে সুরমার কি হবে না? কেবল স্থানটুকুমাত্রই তার ছিল, তার বেশি তো আর কিছু সে পায় নি!

মহিষী। (সরোদনে) কী জানি বাবা, মহারাজ কখন কী যে করেন কিছুই বুঝতে পারি নে। কিন্তু তাও বলি বাছা, আমাদের বউমা বড়ো ভালো মেয়ে নয়। ও রাজবাড়িতে প্রবেশ করে অবধিই এখানে আর শান্তি নেই। হাড় জ্বালাতন হয়ে গেল। তা, ও দিনকতক বাপের বাড়িতেই যাক-না কেন, দেখা যাক— কী বল বাছা ? ও দিনকতক এখান থেকে গেলেই দেখতে পাবে, বাড়ির শ্রী ফেরে কি না।

[উদয় নীরব থাকিয়া কিয়ৎকাল পরে প্রস্থান

সুরমার প্রবেশ

সুরমা। কই, এখানে তো তিনি নেই।

মহিষী। পোড়ামুখী, আমার বাছাকে তুই কী করলি ? আমার বাছাকে আমায় ফিরিয়ে দে। এসে অবধি তুই তার কী সর্বনাশ না করলি ? অবশেষে— সে রাজার ছেলে— তার হাতে বেড়ি না দিয়ে কি তুই ক্ষান্ত হবি নে ?

সুরমা। কোনো ভয় নেই মা ! বেড়ি এবার ভাঙল। আমি বুঝতে পারছি আমার বিদায় হবার সময় হয়ে এসেছে— আর বড়ো দেরি নেই। আমি আর দাঁড়াতে পারছি নে। বুকের ভিতর যেন আগুনে জ্বলে যাচ্ছে। তোমার পায়ের ধুলো নিতে এলুম। অপরাধ যা-কিছু করেছি মাপ কোরো। ভগবান করুন যেন আমি গেলেই শান্তি হয়।

[পদধূলি লইয়া প্রস্থান

মহিষী। ওষুধ খেয়েছে বুঝি ! বিপদ কিছু ঘটবে না তো ? যে যা বলুক, বউমা কিন্তু লক্ষ্মী মেয়ে। ওকে এমন জোর করে বিদায় করলে কি ধর্মে সইবে ? বামী, বামী !

বামীর প্রবেশ

বামী। কী মা ?

মহিষী। ওষুধটা কি বড্ড কড়া হয়েছে ?

বামী। তুমি তো কড়া ওষুধের কথাই বলেছিলে।

মহিষী। কিন্তু বিপদ ঘটবে না তো ?

বামী। আপদবিপদের কথা বলা যায় কি ?

মহিষী। সত্যি বলছি বামী, আমার মনটা কেমন করছে। ওষুধটা কি খেয়েছে— ঠিক জানিস ?

বামী। বেশিক্ষণ নয়— এই খানিকক্ষণ হল খেয়েছে।

মহিষী। দেখলুম, মুখ একেবারে সাদা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। কী করলুম কে জানে ! হরি, রক্ষা করো।

বামী। তোমরা তো ওকে বিদায় করতেই চেয়েছিলে !

মহিষী। না না, ছি ছি— অমন কথা বলিস নে। দেখ্ আমি তোকে আমার এই গলার হারগাছটা দিচ্ছি, তুই শিগ্‌গির দৌড়ে গিয়ে মঙ্গলার কাছ থেকে এর উলটো ওষুধ নিয়ে আয় গে। যা বামী, যা ! শিগগির যা !

[বামীর প্রস্থান

বিভার সরোদনে প্রবেশ

বিভা। মা মা, কী হল মা !

মহিষী। কী হয়েছে বিভু ?

বিভা। বউদিদির এমন হল কেন মা ! তোমরা তাকে কী করলে মা ? কী খাওয়ালে ?

মহিষী। (উচ্চস্বরে) ওরে বামী, বামী ! শিগগির দৌড়ে যা— ওরে, ওষুধ নিয়ে আয়।

উদয়াদিত্যের প্রবেশ

মহিষী। বাবা উদয়, কী হয়েছে বাপ !

উদয়াদিত্য। সুরমা বিদায় হয়েছে মা, এবার আমি বিদায় হতে এসেছি— আর এখানে নয়।

মহিষী। (কপালে করাঘাত করিয়া) কী সর্বনাশ হল রে! কী সর্বনাশ হল!
উদয়াদিত্য। (প্রণাম করিয়া) চললুম তবে।
মহিষী। (হাত ধরিয়া) কোথায় যাবি বাপ? আমাকে মেরে ফেলে দিয়ে যা!
বিভা। (পা জড়াইয়া) কোথায় যাবে দাদা! আমাকে কার হাতে দিয়ে যাবে?
উদয়াদিত্য। তোকে কার হাতে দিয়ে যাব! আমি হতভাগা ছাড়া তোর কে আছে? ওরে বিভা, তুইই আমাকে টেনে রাখলি— নইলে এ পাপ-বাড়িতে আমি আর এক মুহূর্ত থাকতুম না।
বিভা। বুক ফেটে গেল দাদা, বুক ফেটে গেল।
উদয়াদিত্য। দুঃখ করিস নে বিভা, যে গেছে সে সুখে গেছে। এ বাড়িতে এসে সেই সোনার লক্ষ্মী এই আজ প্রথম আরাম পেল।

৪

প্রাসাদের দ্বারের বাহিরে

মাধবপুরের প্রজাদল

১। (উচ্চস্বরে) আমরা এখানে হত্যা দিয়ে পড়ে থাকব।
২। আমরা এখানে না খেয়ে মরব।

প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী। এরা সব বৈরাগীঠাকুরের চেলা, এদের গায়ে হাত দিতে ভয় করে। কিন্তু যেরকম গোলমাল লাগিয়েছে, এখনই মহারাজের কানে যাবে— মুশকিলে পড়ব। কী বাবা, তোমরা মিছে চেঁচামেচি করছ কেন বলো তো?
সকলে। আমরা রাজার কাছে দরবার করব।
প্রহরী। আমার পরামর্শ শোন্ বাবা— দরবার করতে গিয়ে মরবি। তোরা নেহাত ছোটো বলেই মহারাজ তোদের গায়ে হাত দেন নি— কিন্তু হাঙ্গামা যদি করিস তো একটি প্রাণীও রক্ষা পাবি নে।
১। আমরা আর তো কিছু চাই নে, যে গারদে বাবা আছেন আমরাও সেখানে থাকতে চাই।
প্রহরী। ওরে, চাই বললেই হবে এমন দেশ এ নয়।
২। আচ্ছা, আমরা আমাদের যুবরাজকে দেখে যাব।
প্রহরী। তিনি তোদের ভয়েই লুকিয়ে বেড়াচ্ছেন।
৩। তাঁকে না দেখে আমরা যাব না।
সকলে। (উর্ধ্বস্বরে) দোহাই যুবরাজ বাহাদুর!

উদয়াদিত্যের প্রবেশ

উদয়াদিত্য। আমি তোদের হুকুম করছি তোরা দেশে ফিরে যা।
১। তোমার হুকুম মানব— আমাদের ঠাকুরও হুকুম করেছেন তাঁর হুকুমও মানব— কিন্তু তোমাকে আমরা নিয়ে যাব।
উদয়াদিত্য। আমায় নিয়ে কী হবে?
১। তোমাকে আমাদের রাজা করব।
উদয়াদিত্য। তোদের তো বড়ো আস্পর্ধা হয়েছে! এমন কথা মুখে আনিস! তোদের কি মরবার জায়গা ছিল না?
২। মরতে হয় মরব, কিন্তু আমাদের আর দুঃখ সহ্য হয় না।
৩। আমাদের যে বুক কেমন করে ফাটছে তা বিধাতাপুরুষ জানেন।
৪। রাজা, তোমার দুঃখে আমাদের কলিজা জ্বলে গেল।

৫। আমাদের মা-লক্ষ্মী কোথায় গেল রাজা ?

১। আমাদের দয়া করেছিল বলেই সে গেল।

২। এ রাজ্যে কেউ আমাদের মুখ তুলে চায় নি— সন্তানের সেই অনাদর কেবল আমাদের মা'র মনে সয় নি।

৩। দুবেলা মা আমাদের কত যত্ন করে কত খাবার পাঠিয়েছে। সেই মাকে রাখতে পারলুম না রে !

৪। কিন্তু রাজা, তুমি মুখ ফিরিয়ে চলেছ কোথায় ? তোমাকে ছাড়ছি নে।

৫। আমরা জোর করে নিয়ে যাব, কেড়ে নিয়ে যাব।

উদয়াদিত্য। আচ্ছা শোন্, আমি বলি— তোরা যদি দেরি না করে এখনই দেশে চলে যাস তা হলে আমি মহারাজের কাছে নিজে মাধবপুরে যাবার দরবার করব।

১। সঙ্গে আমাদের ঠাকুরকেও নিয়ে যাবে ?

উদয়াদিত্য। চেষ্টা করব। কিন্তু আর দেরি না— এই মুহূর্তে তোরা এখান থেকে বিদায় হ।

প্রজারা। আচ্ছা, আমরা বিদায় হলুম। জয় হোক। তোমার জয় হোক।

৫

চন্দ্রদ্বীপ। রাজা রামচন্দ্রের কক্ষ

রামচন্দ্র, মন্ত্রী, দেওয়ান, রমাই ও অন্যান্য সভাসদগণ

রামচন্দ্র গদির উপর তাকিয়া হেলান দিয়া গুড়গুড়ি টানিতে টানিতে
সম্মুখস্থ একজন অপরাধীর বিচার করিতেছেন

রামচন্দ্র। বেটা, তোর এতবড়ো যোগ্যতা !

অপরাধী। (সরোদনে) দোহাই মহারাজ, আমি এমন কাজ করি নি।

মন্ত্রী। বেটা, প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে আর আমাদের মহারাজের তুলনা ?

দেওয়ান। বেটা, জানিস নে, যখন প্রতাপাদিত্যের বাপ প্রথম রাজা হয় তখন তাকে রাজটিকা পরাবার জন্যে সে আমাদের মহারাজার স্বর্গীয় পিতামহের কাছে আবেদন করে। অনেক কাঁদাকাটা করাতে তিনি তাঁর বাঁ পায়ের কড়ে আঙুল দিয়ে তাকে টিকা পরিয়ে দেন।

রমাই। বিক্রমাদিত্যের বেটা প্রতাপাদিত্য, ওরা তো দুই পুরুষে রাজা। প্রতাপাদিত্যের পিতামহ ছিল কেঁচো, কেঁচোর পুত্র হল জোঁক, বেটা প্রজার রক্ত খেয়ে খেয়ে বিষম ফুলে উঠল, সেই জোঁকের পুত্র আজ মাথা খুঁড়ে খুঁড়ে মাথাটা কুলোপানা করে তুলেছে আর চক্র ধরতে শিখেছে। আমরা পুরুষানুক্রমে রাজসভায় ভাঁড়বৃত্তি করে আসছি; আমরা বেদে, আমরা জাতসাপ চিনি নে ?

রামচন্দ্র। আচ্ছা, যা— এ যাত্রা বেঁচে গেলি, ভবিষ্যতে সাবধান থাকিস।

[মন্ত্রী রমাই ও রামচন্দ্র ব্যতীত সকলের প্রস্থান

রমাই। আপনি তো চলে এলেন, এ দিকে যুবরাজ বাবাজি বিষম গোলে পড়লেন। রাজার অভিপ্রায় ছিল, কন্যাটি বিধবা হলে হাতের লোহা আর বালা দুগাছি বিক্রি করে রাজকোষে কিঞ্চিৎ অর্থাগম হয়। যুবরাজ তাতে ব্যাঘাত করলেন। তা নিয়ে তম্বি কত !

রামচন্দ্র। (হাসিতে হাসিতে) বটে !

মন্ত্রী। মহারাজ, শুনতে পাই, প্রতাপাদিত্য আজকাল আপসোসে সারা হচ্ছেন। এখন কী উপায়ে মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাবেন তাই ভেবে তাঁর আহারনিদ্রা নেই।

রামচন্দ্র। সত্যি নাকি ? [হাস্য ও তাম্রকূটসেবন]

মন্ত্রী। আমি বললুম, আর মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে কাজ নেই। তোমাদের ঘরে মহারাজ বিবাহ করেছেন এতেই তোমাদের সাত পুরুষ উদ্ধার হয়ে গেছে। তার পরে আবার তোমাদের মেয়েকে ঘরে

এনে ঘর নিচু করা, এত পুণ্য এখনো তোমরা কর নি। কেমন হে ঠাকুর?

রমাই। তার সন্দেহ আছে? মহারাজ, আপনি যে পাঁকে পা দিয়েছেন সে তো পাঁকের বাবার ভাগ্যি, কিন্তু তাই বলে ঘরে ঢোকবার সময় পা ধুয়ে আসবেন না তো কী?

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। মহারাজ, আহার প্রস্তুত।

[রমাই ও মন্ত্রীর প্রস্থান

রামমোহন মালের প্রবেশ

রামমোহন। (করজোড়ে) মহারাজ!

রামচন্দ্র। কী রামমোহন?

রামমোহন। মহারাজ, আজ্ঞা দিন, আমি মাঠাকরুনকে আনতে যাই।

রামচন্দ্র। সে কি কথা!

রামমোহন। আজ্ঞে হাঁ। অন্তঃপুর অন্ধকার হয়ে আছে, আমি তা দেখতে পারি নে। অন্দরে যাই, মহারাজের ঘরে কাকেও দেখতে পাই নে, আমার যেন প্রাণ কেমন করতে থাকে। আমার মা-লক্ষ্মী ঘরে এসে ঘর আলো করুন, দেখে চক্ষু সার্থক করি।

রামচন্দ্র। রামমোহন, তুমি পাগল হয়েছ? সে মেয়েকে আমি ঘরে আনি?

রামমোহন। (নেত্র বিস্ফারিত করিয়া) কেন মহারাজ!

রামচন্দ্র। বল কী রামমোহন? প্রতাপাদিত্যের মেয়েকে আমি ঘরে আনব?

রামমোহন। কেন আনবেন না হুজুর? আপনার রানীকে আপনি যদি ঘরে এনে তাঁর সম্মান না রাখেন তা হলে কি আপনার সম্মানই রক্ষা হবে?

রামচন্দ্র। যদি প্রতাপাদিত্য মেয়েকে না দেয়?

রামমোহন। (বক্ষ ফুলাইয়া) কী বললে মহারাজ? যদি না দেয়? এতবড়ো সাধ্য কার যে দেবে না! আমার মা-জননী, আমাদের ঘরের মা-লক্ষ্মী, কার সাধ্য তাঁকে আমাদের কাছ হতে কেড়ে রাখতে পারে। আমার মাকে আমি আনব, তুমিই বা বারণ করবার কে?

[প্রস্থানোদ্যম

রামচন্দ্র। (তাড়াতাড়ি) রামমোহন, যেয়ো না, শোনো শোনো। আচ্ছা, তুমি আনতে যাচ্ছ যাও— তাতে আপত্তি নেই; কিন্তু দেখো, এ কথা যেন কেউ শুনতে না পায়। রমাই কিংবা মন্ত্রীর কানে এ কথা যেন কোনোমতে না ওঠে।

রামমোহন। যে আজ্ঞা মহারাজ!

চতুর্থ অঙ্ক

১

মন্ত্রী ও প্রতাপাদিত্য

প্রতাপাদিত্য। মাধবপুরের প্রজারা দরখাস্ত নিয়ে দিল্লিতে চলেছিল, হাতে হাতে ধরা পড়েছিল— সেও কি তুমি অবিশ্বাস কর?

মন্ত্রী। আজ্ঞে না মহারাজ, অবিশ্বাস করছি নে।

প্রতাপাদিত্য। ওরা তাতে লিখেছে, আমি দিল্লীশ্বরের শত্রু; ওদের ইচ্ছা আমাকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে উদয়কে সিংহাসন দেওয়া হয়— এ কথাগুলো তো ঠিক?

মন্ত্রী। আজ্ঞে হাঁ, সে দরখাস্ত তো আমি দেখেছি।

প্রতাপাদিত্য। এর চেয়ে তুমি আর কী প্রমাণ চাও?

মন্ত্রী। কিন্তু এর মধ্যে আমাদের যুবরাজ আছেন এ কথা আমি কিছুতে বিশ্বাস করতে পারি নে।

প্রতাপাদিত্য। তোমার বিশ্বাস কিংবা তোমার আন্দাজের উপর নির্ভর করে তো আমি রাজকার্য চালাতে পারি নে। যদি বিপদ ঘটে তবে, 'ঐ যা, মন্ত্রী আমার ভুল বিশ্বাস করেছিল' বলে তো নিষ্কৃতি পাব না।

মন্ত্রী। কিন্তু যুবরাজকে যে সন্দেহে কারাদণ্ড দিয়েছেন তার যদি কোনো মূল না থাকে তা হলেও রাজকার্যের মঙ্গল হবে না।

প্রতাপাদিত্য। রাজ্য রক্ষা সহজ ব্যাপার নয় মন্ত্রী! অপরাধ নিশ্চয় প্রমাণ হলে তার পরে দণ্ড দেওয়াই যে রাজার কর্তব্য তা আমি মনে করি নে! যেখানে সন্দেহ করা যায় কিংবা যেখানে ভবিষ্যতেও অপরাধের সম্ভাবনা আছে সেখানেও রাজা দণ্ড দিতে বাধ্য।

মন্ত্রী। আপনি রাগ করবেন, কিন্তু আমি এ ক্ষেত্রে সন্দেহ কিংবা ভবিষ্যৎ অপরাধের সম্ভাবনা পর্যন্ত কল্পনা করতে পারি নে।

প্রতাপাদিত্য। মাধবপুরের প্রজারা এখানে এসেছিল কি না?

মন্ত্রী। হাঁ।

প্রতাপাদিত্য। তারা ওকেই রাজা করতে চেয়েছিল কি না?

মন্ত্রী। হাঁ, চেয়েছিল।

প্রতাপাদিত্য। তুমি বলতে চাও এ-সকলের মধ্যে উদয়ের কোনো হাত ছিল না?

মন্ত্রী। যদি হাত থাকত তা হলে এত প্রকাশ্যে এ কথার আলোচনা হত না।

প্রতাপাদিত্য। আচ্ছা আচ্ছা, তোমার নিঃসংশয় নিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত হয়েই বসে থাকো— কিন্তু আমি বরঞ্চ নির্দোষকে দণ্ড দেব কিন্তু যেখানে রাজ্যের কিছুমাত্র অহিত ঘটবার আশঙ্কা আছে সেখানে বিপদটা একেবারে ঘাড়ে এসে পড়ার জন্যে পথ চেয়ে বসে থাকব না। রাজার দায়িত্ব মন্ত্রীর দায়িত্বের চেয়ে ঢের বেশি!

মন্ত্রী। অন্তত বৈরাগীঠাকুরকে ছেড়ে দিন মহারাজ! প্রজাদের মনে একসঙ্গে এতগুলো বেদনা চাপাবেন না।

প্রতাপাদিত্য। আচ্ছা, সে আমি বিবেচনা করে দেখব।

২

রায়গড়। বসন্ত রায়ের প্রাসাদ। বসন্ত রায় একাকী আসীন

পাঠানের প্রবেশ ও সেলাম

বসন্ত রায়। খাঁসাহেব, এসো এসো। সাহেব, তোমার মুখ এমন মলিন দেখছি কেন? মেজাজ ভালো তো?

পাঠান। মেজাজের কথা আর বলবেন না মহারাজ! একটি বয়েত আছে— রাত্রি বলে, আমার কি হাসবার ক্ষমতা আছে? যখন চাঁদ হাসে তখনই আমি হাসি, নইলে সব অন্ধকার! মহারাজ, আমরাই বা কে? আপনি না হাসলে যে আমাদের হাসি ফুরিয়ে যায়! আমাদের আর সুখ নেই প্রভু!

বসন্ত রায়। সে কী কথা সাহেব! আমার তো অসুখ কিছুই নেই।

পাঠান। এখন আপনার আর তেমন গানবাজনা শুনি নে। আপনার যে সেতার কোলে-কোলেই থাকত সে তো আর দেখতেই পাই নে।

বসন্ত রায়। সেতার! সেতারে তো নাড়া দিলেই বেজে ওঠে। কিন্তু মানুষের মনে যখন সুর লাগে না তখন কার সাধ্য তাকে বাজায়।

সীতারামের প্রবেশ

সীতারাম। জয় হোক মহারাজ!

প্রণাম

বসন্ত রায়। আরে সীতারাম যে! ভালো আছিস তো? মুখ শুকনো যে? খবর সব ভালো তো? শীঘ্র বল্‌।

সীতারাম। খবর বড়ো খারাপ— সব বলছি।

পাঠান। হুজুর, তবে এখন আসি।

[সেলাম ও প্রস্থান

বসন্ত রায়। সীতারাম, কী হয়েছে সব বল্‌ বল্‌! আমার প্রাণ বড়ো অধীর হচ্ছে। আমার দাদার—

সীতারাম। নিবেদন করছি মহারাজ! যুবরাজকে আমাদের মহারাজ কারাদণ্ড দিয়েছেন।

বসন্ত রায়। কারাদণ্ড! সে কী কথা! কেন, উদয় কী অপরাধ করেছিল?

সীতারাম। সে তো আমরা কিছু বুঝতে পারলুম না। হঠাৎ একদিন শুনলুম যুবরাজ বন্দী।

বসন্ত রায়। অ্যাঁ! বন্দী!

সীতারাম। আজ্ঞা হাঁ মহারাজ!

বসন্ত রায়। সীতারাম, এ কী কথা! তাকে কি একেবারে জেলখানায় ফৌজ পাহারায় বন্ধ করে রেখেছে?

সীতারাম। আজ্ঞে হাঁ মহারাজ!

বসন্ত রায়। তাকে কি একবার বেরোতেও দেয় না?

সীতারাম। আজ্ঞা না।

বসন্ত রায়। সে একলা কারাগারে?

সীতারাম। হাঁ মহারাজ!

বসন্ত রায়। প্রতাপ আমাকে বন্দী করুক-না— আমি আপনি গিয়ে ধরা দিচ্ছি।

সীতারাম। তাতে কোনো ফল হবে না।

বসন্ত রায়। কিন্তু কী হবে সীতারাম! কী করা যায়?

সীতারাম। আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে। আপনাকে যেতে হচ্ছে। একবার যশোরে চলুন।

বসন্ত রায়। সে তো যাবই। একবার তো প্রতাপকে বলে কয়ে চেষ্টা করে দেখতেই হবে

৩

চন্দ্রদ্বীপ। রামচন্দ্রের কক্ষ

রামচন্দ্র, মন্ত্রী, রমাই, দেওয়ান ও ফর্নাণ্ডিজ

রামমোহন প্রবেশ করিয়া জোড়হস্তে দণ্ডায়মান

রামচন্দ্র। (বিস্মিত ভাবে) কী হল রামমোহন?

রামমোহন। সকলই নিষ্ফল হয়েছে।

রামচন্দ্র। (চমকিয়া) আনতে পারলি নে?

রামমোহন। আজ্ঞে না মহারাজ! কুলগ্নে যাত্রা করেছিলুম।

রামচন্দ্র। (ক্রুদ্ধ হইয়া) বেটা, তোকে যাত্রা করতে কে বলেছিল? তখন তোকে বার বার করে বারণ করলুম, তখন যে তুই বুক ফুলিয়ে গেলি, আর আজ—

রামমোহন। (কপালে হাত দিয়া) মহারাজ, আমার অদৃষ্টের দোষ।

রামচন্দ্র। (আরো ক্রুদ্ধ হইয়া) রামচন্দ্র রায়ের অপমান! তুই বেটা, আমার নাম করে ভিক্ষা চাইতে গেলি, আর প্রতাপাদিত্য দিলে না! এতবড়ো অপমান আমাদের বংশে আর কখনো হয় নি।

রামমোহন। (নত শির তুলিয়া) ও কথা বলবেন না। প্রতাপাদিত্য যদি না দিতেন, আমি যেমন করে পারি আনতুম। প্রতাপাদিত্য রাজা বটেন, কিন্তু আমার রাজা তো নন।

রামচন্দ্র। ওরে হতভাগা বেটা, তবে হল না কেন? (রামমোহন নীরব) রামমোহন, শীঘ্র বল্।

রামমোহন। মহারাজ, তাঁর ভাই আজ কারাগারে।

রামচন্দ্র। তাতে কী হল?

রামমোহন। ভাইয়ের এই বিপদের দিনে তাঁকে একলা ফেলে চলে আসেন, এমন মা কি আমার?

রামচন্দ্র। বটে! আসতে চাইলেন না বটে! আমার লোক গিয়ে ফিরে এল!

রামমোহন। রাগ করেন কেন মহারাজ! রাগ যদি করতে হয় তা হলে যারা আপনার বুদ্ধি নষ্ট করেছে তাদের উপর রাগ করুন।

রামচন্দ্র। তার মানে কী হল?

রামমোহন। যুবরাজ যে আজ বন্দী তার গোড়াকার কথাটা কি এরই মধ্যে ভুললেন? এ-সমস্ত তো আমাদেরই জন্যে! এমন স্থলে আমাদের মহারানীমাকেও তো জোর করে বলতে পারলুম না যে আমাদের কর্মের ফল তোমার ভাইয়ের উপরে চাপিয়ে তুমি চলে এসো।

রামচন্দ্র। বেরো বেটা, বেরো তুই! এখনই আমার সুমুখ হতে দূর হয়ে যা।

রামমোহন। যাচ্ছি মহারাজ; কিন্তু এ কথা বলে যাব যে, সতীলক্ষ্মী যদি এবার তাঁর ভাইকে ছেড়ে চলে আসতেন তা হলে তাঁর স্বামীর পাপ বৃদ্ধি হত— সেই ভয়েই তিনি হৃদয় পাষাণ করে রইলেন, আসতে পারলেন না।

[প্রস্থান

মন্ত্রী। মহারাজ, আর-একটি বিবাহ করুন।

দেওয়ান। মন্ত্রী ঠিক কথাই বলেছেন। তা হলে প্রতাপাদিত্য এবং তাঁর কন্যাকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হবে।

রমাই। এ শুভকার্যে আপনার বর্তমান শ্বশুরমশাইকে একখানা নিমন্ত্রণপত্র পাঠাতে ভুলবেন না, নইলে কী জানি তিনি মনে দুঃখ করতে পারেন।

সকলে। হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ! হাঃ হাঃ! হোঃ হোঃ হোঃ!

রমাই। বরণ করবার জন্য এয়োস্ত্রীদের মধ্যে যশোরে আপনার শাশুড়িঠাকরুনকে ডেকে পাঠাবেন; আর মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ— প্রতাপাদিত্যের মেয়েকে যখন এক থাল মিষ্টান্ন পাঠাবেন তখন তার সঙ্গে দুটো কাঁচা রম্ভা পাঠিয়ে দেবেন।

রামচন্দ্র। হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ! হাঃ হাঃ!

[সভাসদগণের হাস্য। সকলের অলক্ষ্যে ফর্নাণ্ডিজের প্রস্থান

দেওয়ান। তা মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ, যদি ইতর লোকের ভাগ্যেই মিষ্টান্ন থাকে তা হলে তো যশোরেই সমস্ত মিষ্টান্ন খরচ হয়ে যায়, চন্দ্রদ্বীপে আর খাবার উপযুক্ত লোক থাকে না।

রামচন্দ্র। আমার শ্বশুরকে এখনই একটা চিঠি লিখে দিতে হচ্ছে।

মন্ত্রী। কী লিখব?

রমাই। লেখো, তোমার রাজত্ব এবং রাজকন্যা তোমারই থাক্— জগতে শালা-শ্বশুরের অভাব নেই।

সকলে। হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ! হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ! ওঃ হোঃ হোঃ!

মন্ত্রী। তা বেশ, ঐ কথাই গুছিয়ে লেখা যাবে।

রামচন্দ্র। আজই ও চিঠি রওনা করে দিয়ো।

৪

যশোহর। প্রতাপাদিত্যের কক্ষ

বসন্ত রায়ের প্রবেশ

বসন্ত রায়। বাবা প্রতাপ, উদয়কে আর কেন কষ্ট দাও ? পদে পদেই যদি সে তোমাদের কাছে অপরাধ করে তবে তাকে এই বুড়োর কাছে দাও-না। (প্রতাপ নিরুত্তর) তুমি যা মনে করে উদয়কে শাস্তি দিচ্ছ সেই অপরাধ যে যথার্থ আমার। আমিই যে রামচন্দ্র রায়কে রক্ষা করবার জন্যে চক্রান্ত করেছিলুম।

প্রতাপাদিত্য। খুড়োমশায়, বৃথা কথা বলে আমার কাছে কোনোদিন কেউ কোনো ফল পায় নি।

বসন্ত রায়। ভালো, আমার আর-একটি ক্ষুদ্র প্রার্থনা আছে। আমি একবার কেবল উদয়কে দেখে যেতে চাই— আমাকে তার সেই কারাগৃহে প্রবেশ করতে কেউ যেন বাধা না দেয় এই অনুমতি দাও।

প্রতাপাদিত্য। সে হতে পারবে না।

বসন্ত রায়। তা হলে আমাকে তার সঙ্গে একসঙ্গে বন্দী করে রাখো। আমাদের দুজনেরই অপরাধ এক, দণ্ডও এক হোক— যতদিন সে কারাগারে থাকবে আমিও থাকব।

[নীরবে প্রতাপের প্রস্থান

সীতারামের প্রবেশ ও প্রণাম

বসন্ত রায়। কী সীতারাম, খবর কী ?

সীতারাম। খবর পরে বলব। এখন শীঘ্র একবার আপনাকে আমার সঙ্গে আসতে হবে। বিলম্ব করবেন না।

বসন্ত রায়। কেন সীতারাম ? কোথায় যেতে হবে ?

বসন্ত রায়ের কানে কানে সীতারামের ভাষণ

(বিস্ফারিত নেত্রে) অ্যাঁ ! সত্যি নাকি !

সীতারাম। মহারাজ, কথা কবার সময় নেই, শীঘ্র আসুন।

বসন্ত রায়। একবার বিভার সঙ্গে দেখাটা করে আসি-না ?

সীতারাম। না, সে হয় না— আর দেরি না।

বসন্ত রায়। তবে কাজ নেই— চলো। (অগ্রসর হইয়া) কিন্তু বেশি দেরি হত না— একবার দেখা করেই চলে আসতুম।

সীতারাম। না মহারাজ, তা হলে বিপদ হবে।

[প্রস্থান

৫

কারাগার

উদয়াদিত্য। অনুচরের প্রবেশ

উদয়াদিত্য। লোচনদাস !

লোচনদাস। যুবরাজ !

উদয়াদিত্য। যুবরাজ কাকে বলছ ?

লোচনদাস। আজ্ঞে, আপনাকে।

উদয়াদিত্য। আমার এই যৌবরাজ্য যেন পরম শত্রুর ভাগ্যেও না পড়ে। লোচন !

লোচনদাস। আজ্ঞে।

উদয়াদিত্য। সময় এখন কত ? বিভার কি আসবার সময় হয় নি ?

লোচনদাস। আজ্ঞে, এখনো কিছু দেরি আছে। মায়ের ভোগ সারা হলে তিনি নিজের হাতে প্রসাদ নিয়ে আসবেন।

উদয়াদিত্য। সন্ধ্যারতি এতক্ষণে হয়ে গেছে বোধ হয়?

লোচনদাস। আজ্ঞে হাঁ, হয়ে গেছে।

উদয়াদিত্য। পাখিরা সব বাসায় ফিরে গেছে। নহবতখানায় এতক্ষণে ইমন-কল্যাণের সুর বাজছে। লোচন, বিভার শ্বশুরবাড়ি থেকে কি আজও লোক আসে নি?

লোচনদাস। একবার মোহন এসেছিল।

উদয়াদিত্য। তবে? বিভা কি—

লোচনদাস। দিদিঠাকরুন আপনাকে একলা রেখে যেতে পারলেন না।

উদয়াদিত্য। সে হবে না, সে হবে না! তাকে যেতে হবে! যেতেই হবে! আমার জন্যে ভাবনা নেই— আমার সমস্ত সইবে। এই-যে তার ফুলগুলি এখনো শুকোয় নি। সকালবেলায় পুজোর পরে প্রসাদী ফুল এনে দিয়ে গেল— তখন তার মুখে দেবীকে প্রত্যক্ষ দেখতে পেয়েছিলুম।

লোচনদাস। আহা, দেবীই বটে!

উদয়াদিত্য। কিন্তু তাকে যেতেই হবে। আমি সইতে পারব। তাকে ধরে রাখব না।

বাহিরে। আগুন! আগুন!

প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী। আগুন লেগেছে! পালান পালান!

৬

খালের ধারে নৌকার সম্মুখে

সীতারামের সহিত যুবরাজের দ্রুত প্রবেশ

সীতারাম। এই নৌকা, এই নৌকা, আসুন, উঠে পড়ুন—

নৌকার ভিতর হইতে বসন্ত রায়ের অবতরণ

বসন্ত রায়। দাদা এসেছিস? আয় দাদা আয়!

বাহু প্রসারণ

উদয়াদিত্য। দাদামশায়!

আলিঙ্গন

বসন্ত রায়। কী দাদা?

উদয়াদিত্য। (উদ্‌ভ্রান্তভাবে চারি দিকে চাহিয়া) দাদামশায়!

বসন্ত রায়। এই যে আমি দাদা— কেন ভাই?

উদয়াদিত্য। (দুই হস্ত ধরিয়া) আজ আমি ছাড়া পেয়েছি— তোমাকে পেয়েছি। আর আমার সুখের কী অবশিষ্ট রইল? এ মুহূর্ত আর কতক্ষণ থাকবে?

সীতারাম। (করজোড়ে) যুবরাজ, নৌকায় উঠুন।

উদয়াদিত্য। (চমকিত হইয়া) কেন? নৌকায় কেন?

সীতারাম। নইলে এখনই আবার প্রহরীরা আসবে, এখনই ধরে ফেলবে।

উদয়াদিত্য। (বিস্মিত হইয়া) আমরা কি পালিয়ে যাচ্ছি?

বসন্ত রায়। (হাত ধরিয়া) হাঁ ভাই— আমি তোকে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছি। এ যে পাষাণ-হৃদয়ের দেশ।

সীতারাম। যুবরাজ, আমি তোমাকে উদ্ধার করবার জন্যে কারাগারে আগুন লাগিয়েছি।

উদয়াদিত্য। কী সর্বনাশ! মরবি যে!

সীতারাম। তুমি যতদিন কয়েদে ছিলে প্রতিদিনই আমি মরেছি।

উদয়াদিত্য। (অনেকক্ষণ ভাবিয়া) না, আমি পালাতে পারব না।

বসন্ত রায়। কেন দাদা, এ বুড়োকে কি ভুলে গেছিস?

উদয়াদিত্য। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) না না— আমি কারাগারে ফিরে যাই।

বসন্ত রায়। (হাত চাপিয়া ধরিয়া) কেমন করে যাবি যা দেখি! আমি যেতে দেব না।

উদয়াদিত্য। এ হতভাগাকে নিয়ে কেন বিপদ ডাকছ?

বসন্ত রায়। দাদা, তোর জন্য যে বিভাও কারাবাসিনী হয়ে উঠল। তার এই নবীন বয়সে সে কি তার সমস্ত জীবনের সুখ জলাঞ্জলি দেবে?

উদয়াদিত্য। চলো, চলো, চলো। সীতারাম, প্রাসাদে তিনখানি পত্র পাঠাতে চাই।

সীতারাম। নৌকাতেই লিখে দেবেন। ঐখানেই চলুন।

[প্রস্থান

ধনঞ্জয়ের প্রবেশ

নৃত্যগীত

ওরে আগুন, আমার ভাই,
আমি তোমারি জয় গাই।
তোমার শিকল-ভাঙা এমন রাঙা মূর্তি দেখি নাই।
তুমি দু হাত তুলে আকাশ-পানে
মেতেছ আজ কিসের গানে।
এ কী আনন্দময় নৃত্য অভয়, বলিহারি যাই।
যে দিন ভবের মেয়াদ ফুরোবে ভাই,
আগল যাবে সরে,
সে দিন হাতের দড়ি পায়ের বেড়ি
দিবি রে ছাই করে।
সে দিন আমার অঙ্গ তোমার অঙ্গে
ওই নাচনে নাচবে রঙ্গে,
সকল দাহ মিটবে দাহে
ঘুচবে সব বালাই।

৭

প্রতাপাদিত্যের কক্ষ

প্রতাপাদিত্য ও মন্ত্রী

প্রতাপাদিত্য। দৈবাৎ আগুন লাগার কথা আমি এক বর্ণ বিশ্বাস করি নে। এর মধ্যে চক্রান্ত আছে। খুড়ো কোথায়?

মন্ত্রী। তাঁকে দেখা যাচ্ছে না।

প্রতাপাদিত্য। হুঁ। তিনিই এই অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়ে ছোঁড়াটাকে নিয়ে পালিয়েছেন।

মন্ত্রী। তিনি সরল লোক— এ-সকল বুদ্ধি তো তাঁর আসে না।

প্রতাপাদিত্য। বাইরে থেকে যাকে সরল বলে বোধ না হবে তার কুটিল বুদ্ধি বৃথা।

মন্ত্রী। কারাগার ভস্মসাৎ হয়ে গেছে, আমার আশঙ্কা হচ্ছে যদি—

প্রতাপাদিত্য। কোনো আশঙ্কা নেই, আমি বলছি উদয়কে নিয়ে খুড়োমহারাজ পালিয়েছেন।

দ্বারীর প্রবেশ

দ্বারী। মহারাজ, পত্র—

প্রতাপাদিত্য। কার পত্র ?

দ্বারী। হুজুর, যুবরাজের হাতে লেখা।

প্রতাপাদিত্য। কে এনেছে ?

দ্বারী। একজন নৌকার মাঝি।

প্রতাপাদিত্য। সে কোথায় গেল ?

দ্বারী। সে পালিয়েছে।

[প্রস্থান

প্রতাপাদিত্য। (পত্রপাঠান্তে) এই দেখো মন্ত্রী, উদয় আমার কাছে মাপ চেয়েছে।

মন্ত্রী। (করজোড়ে) তাঁকে মাপ করুন মহারাজ !

প্রতাপাদিত্য। তাকে মাপ করব না তো কী ! সে আমার দণ্ডেরও যোগ্য নয়। কিন্তু— মুক্তিয়ার খাঁ !

মুক্তিয়ার খাঁর প্রবেশ

মুক্তিয়ার। খোদাবন্দ।

সেলাম

প্রতাপাদিত্য। অশ্ব প্রস্তুত আছে— তুমি এখনই যাও ! কাল রাত্রে আমি বসন্ত রায়ের ছিন্ন মুণ্ড দেখতে চাই।

মুক্তিয়ার। যো হুকুম মহারাজ !

[প্রস্থান

প্রতাপাদিত্য। সেই বৈরাগীটার খবর পেয়েছ ?

মন্ত্রী। না মহারাজ !

প্রতাপাদিত্য। সে বোধ হয় পালিয়েছে। সে যদি থাকে তো আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়ো।

মন্ত্রী। কেন মহারাজ, তাঁকে আবার কিসের প্রয়োজন ?

প্রতাপাদিত্য। আর কিছু নয়— সেই ভাঁড়টাকে নিয়ে একটু আমোদ করতে পারতুম— তার কথা শুনতে মজা আছে।

ধনঞ্জয়ের প্রবেশ

ধনঞ্জয়। জয় হোক মহারাজ ! আপনি তো আমাকে ছাড়তেই চান না, কিন্তু কোথা থেকে আগুন ছুটির পরোয়ানা নিয়ে হাজির। কিন্তু না বলে যাই কী করে ! তাই হুকুম নিতে এলুম।

প্রতাপাদিত্য। ক-দিন কাটল কেমন ?

ধনঞ্জয়। সুখে কেটেছে— কোনো ভাবনা ছিল না। এ-সব তারই লুকোচুরি খেলা— ভেবেছিল গারদে লুকোবে, ধরতে পারব না— কিন্তু ধরেছি, চেপে ধরেছি, তার পরে খুব হাসি, খুব গান। বড়ো আনন্দে গেছে— আমার গারদ-ভাইকে মনে থাকবে।

গান

ওরে শিকল, তোমায় কোলে করে
দিয়েছি ঝংকার।
তুমি আনন্দে ভাই রেখেছিলে
ভেঙে অহংকার।
তোমায় নিয়ে ক'রে খেলা।

সুখে দুঃখে কাটল বেলা,
অঙ্গ বেড়ি দিলে বেড়ি
   বিনা দামের অলংকার।
তোমার 'পরে করি নে রোষ,
দোষ থাকে তো আমারি দোষ,
ভয় যদি রয় আপন মনে
   তোমায় দেখি ভয়ংকর।
অন্ধকারে সারা রাতি
ছিলে আমার সাথের সাথি,
সেই দয়াটি স্মরি তোমায়
   করি নমস্কার।

প্রতাপাদিত্য। বল কী বৈরাগী! গারদে তোমার এত আনন্দ কিসের?

ধনঞ্জয়। মহারাজ, রাজ্যে তোমার যেমন আনন্দ তেমনি আনন্দ— অভাব কিসের? তোমাকে সুখ দিতে পারেন আর আমাকে পারেন না?

প্রতাপাদিত্য। এখন তুমি যাবে কোথায়?

ধনঞ্জয়। রাস্তায়।

প্রতাপাদিত্য। বৈরাগী, আমার এক-একবার মনে হয় তোমার ঐ রাস্তাই ভালো— আমার এই রাজ্যটা কিছু না।

ধনঞ্জয়। মহারাজ, রাজ্যটাও তো রাস্তা। চলতে পারলেই হল! ওটাকে যে পথ বলে জানে সেই তো পথিক— আমরা কোথায় লাগি! তা হলে অনুমতি যদি হয় তো এবারকার মতো বেরিয়ে পড়ি।

প্রতাপাদিত্য। আচ্ছা, কিন্তু মাধবপুরে যেয়ো না।

ধনঞ্জয়। সে কেমন করে বলি! যখন নিয়ে যাবে তখন কার বাবার সাধ্য বলে যে যাব না!

পঞ্চম অঙ্ক

রায়গড়। বসন্ত রায়ের প্রাসাদসংলগ্ন প্রান্তর

উদয়াদিত্যের প্রবেশ

উদয়াদিত্য। মহারাজ যে দাদামশায়কে সহজে নিষ্কৃতি দেবেন তার সম্ভাবনা নেই। আমি এখানে থেকে তাঁর এই বিপদ ঘনিয়ে তোলা কোনোমতেই উচিত হচ্ছে না। আর দেরি করা না। আজই আমাকে পালাতে হবে। দাদামশায়কে বলে যাওয়া মিথ্যা। তিনি কিছুতেই ছাড়বেন না। উঃ— আজ সমস্ত দিনটা আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে, দুই-এক ফোঁটা বৃষ্টিও পড়ছে— দেখি দাদামশায় কী করছেন, তাঁকে— ও দিকে কে একটা লোক সরে গেল, ও আবার কে?

পশ্চাৎ হইতে মুক্তিয়ার খাঁর প্রবেশ ও সেলাম

সম্মুখ হইতে দুইজন সৈন্যের প্রবেশ ও সেলাম

উদয়াদিত্য। কে! মুক্তিয়ার খাঁ? কী খবর?

মুক্তিয়ার। জনাব, আমাদের মহারাজের কাছ থেকে আদেশ নিয়ে এসেছি।

উদয়াদিত্য। কী আদেশ মুক্তিয়ার?

উদয়াদিত্যের হস্তে মুক্তিয়ার খাঁর আদেশপত্র প্রদান

উদয়াদিত্য। এর জন্য এত সৈন্যের প্রয়োজন কী? আমাকে একখানা পত্র লিখে আদেশ করলেই

তো আমি যেতুম। আমি তো আপনিই যাচ্ছিলুম, যাব বলেই স্থির করেছি। তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন কী? এখনই চলো। এখনই যশোরে ফিরে যাই।

মুক্তিয়ার। (করজোড়ে) এখনই ফিরতে পারব না তো হুজুর, আমার যে আরো কাজ আছে।

উদয়াদিত্য। (ভীত হইয়া) কেন! কী কাজ?

মুক্তিয়ার। আরো এক আদেশ আছে, তা পালন না করে যেতে পারব না।

উদয়াদিত্য। কী আদেশ? বলছ না কেন?

মুক্তিয়ার। রায়গড়ের রাজার প্রতি মহারাজা প্রাণদণ্ডের আদেশ করেছেন।

উদয়াদিত্য। (চমকিয়া উচ্চস্বরে) না— করেন নি! মিথ্যা কথা!

মুক্তিয়ার। আজ্ঞে যুবরাজ, মিথ্যে নয়। আমার কাছে মহারাজের স্বাক্ষরিত পত্র আছে।

উদয়াদিত্য। (সেনাপতির হাত ধরিয়া) মুক্তিয়ার খাঁ, তুমি ভুল বুঝেছ। মহারাজ আদেশ করেছেন যে যদি উদয়াদিত্যকে না পাও তা হলে বসন্ত রায়ের— আমি যখন আপনি ধরা দিচ্ছি, তখন আর কী? আমাকে এখনই নিয়ে চলো— এখনই নিয়ে চলো— বন্দী করে নিয়ে চলো, আর দেরি কোরো না।

মুক্তিয়াব। যুবরাজ, আমি ভুল বুঝি নি। মহারাজ স্পষ্ট আদেশ করেছেন—

উদয়াদিত্য। তুমি নিশ্চয় ভুল বুঝেছ, তাঁর অভিপ্রায় এরূপ নয়। আচ্ছা চলো, যশোরে চলো। আমি মহারাজের সাক্ষাতে তোমাদের বুঝিয়ে দেব। তিনি যদি দ্বিতীয় বার আদেশ করেন সম্পন্ন কোরো।

মুক্তিয়ার। (করজোড়ে) যুবরাজ, মার্জনা করুন। তা পারব না।

উদয়াদিত্য। (অধীরভাবে) মুক্তিয়ার, মনে আছে আমি এককালে সিংহাসন পাব? আমার কথা রাখো, আমাকে সন্তুষ্ট করো।

মুক্তিয়ার খাঁ নীরব

(সেনাপতির হাত দৃঢ়ভাবে ধরিয়া) মুক্তিয়ার খাঁ, বৃদ্ধ নিরপরাধ পুণ্যাত্মাকে বধ করলে নরকেও তোমার স্থান হবে না!

মুক্তিয়ার। মনিবের আদেশ পালন করতে পাপ নেই।

উদয়াদিত্য। মিথ্যা কথা! যে ধর্মশাস্ত্রে তা বলে সে ধর্মশাস্ত্রও মিথ্যা। নিশ্চয় জেনো মুক্তিয়ার, পাপ আদেশ পালন করলে পাপ।

মুক্তিয়ার খাঁ নীরব

তবে আমাকে ছেড়ে দাও, আমি গড়ে ফিরে যাই। তোমার সৈন্যসামন্ত নিয়ে সেখানে যেয়ো— আমি তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করছি। সেখানে রণক্ষেত্রে জয়লাভ করে তার পর তোমার আদেশ পালন কোরো।

কতিপয় সৈন্যের প্রবেশ ও উদয়াদিত্যকে বেষ্টন

উদয়াদিত্য। (উচ্চস্বরে) দাদামশায়, সাবধান!

সৈন্যগণ-কর্তৃক বন্দী

দাদামশায়, সাবধান!

জনৈক পথিকের প্রবেশ

পথিক। কে গো?

উদয়াদিত্য। যাও যাও— গড়ে ছুটে যাও— মহারাজকে সাবধান করে দাও।

মুক্তিয়ার। বাঁধো ওকে।

[পথিক গ্রেপ্তার

২

কতিপয় বালককে লইয়া বসন্ত রায়

বসন্ত রায়। বাবা, খুব ভালো করে শিখে নাও। এবারকার রাসলীলায় খুব ধুম হবে। আমি নিজে পদ রচনা করেছি— একেবারে নিখুঁত করে গাইতে হবে। রায়গড়ে এবার আমাদের উদয় এসেছে— আমার সেই বঁধু (গাহিতে গাহিতে)

শিশুকাল হতে বঁধুর সহিতে
পরানে পরানে লেহা।

বাবা, ধরো, তোমাদের গান, ধরো—

ভৈরবী

ওকে ধরিলে তো ধরা দেবে না,
ওকে দাও ছেড়ে, দাও ছেড়ে!
মন নাই যদি দিল, নাই দিল,
মন নেয় যদি নিক কেড়ে।
এ কী খেলা মোরা খেলেছি,
শুধু নয়নের জল ফেলেছি,
ওরই জয় যদি হয় জয় হোক,
মোরা হারি যদি, যাই হেরে!
একদিন মিছে আদরে
মনে গরব সোহাগ না ধরে,
শেষে দিন না ফুরাতে ফুরাতে
সব গরব দিয়েছে সেরে।
ভেবেছিনু ওকে চিনেছি,
বুঝি বিনা পণে ওকে কিনেছি
ও যে আমাদেরি কিনে নিয়েছে,
ও যে তাই আসে, তাই ফেরে।

দাদা এখনো কেন এল না? ওরে, দাদা কি ফিরেছে?

অনুচর। না, তিনি তো ফেরেন নি।

বসন্ত রায়। দাদা যে অনেকক্ষণ বেরিয়েছে রে! সঙ্গে লোক আছে তো?

অনুচর। না, তিনি লোক ফিরিয়ে দিয়েছেন।

বসন্ত রায়। ওরে, তোরা একজন কেউ যা। ও কে ও? এ কী! এ যে মুক্তিয়ার খাঁ। খাঁসাহেব, ভালো তো?

মুক্তিয়ার খাঁর প্রবেশ

মুক্তিয়ার। (সেলাম করিয়া) হাঁ মহারাজ!

বসন্ত রায়। আহারাদি হয়েছে?

মুক্তিয়ার। আজ্ঞা হাঁ। গোপনে কিছু কথা আছে।

বসন্ত রায়। আচ্ছা, তোমরা সব যাও।

[সকলের প্রস্থান

আজ তবে তোমার এখানে থাকবার বন্দোবস্ত করে দিই।

মুক্তিয়ার। আজ্ঞা না, প্রয়োজন নেই। কাজ সেরে এখনই যেতে হবে।

বসন্ত রায়। না, তা হবে না খাঁসাহেব, আজ তোমাকে ছাড়ব না। আজ এখানে থাকতেই হবে।

লোকজন তো সঙ্গে অনেক দেখছি। কোথাও লড়াইয়ে বেরিয়েছ নাকি ? রসদের বন্দোবস্ত করে দিতে হবে তো। ওরে—

মুক্তিয়ার। না মহারাজ, কিছুই করতে হবে না, শীঘ্রই যাব।

বসন্ত রায়। কেন বলো দেখি, বিশেষ কাজ আছে বুঝি ? প্রতাপ ভালো আছে তো ?

মুক্তিয়ার। মহারাজ ভালো আছেন।

বসন্ত রায়। তবে কী তোমার কাজ শীঘ্র বলো, বিশেষ জরুরি শুনে উদ্‌বেগ হচ্ছে। প্রতাপের তো কোনো বিপদ ঘটে নি ?

মুক্তিয়ার। আজ্ঞা না, তাঁর কোনো বিপদ ঘটে নি। মহারাজের একটি আদেশ পালন করতে এসেছি।

বসন্ত রায়। কী আদেশ এখনই বলো।

আদেশপত্র বাহির করিয়া বসন্ত রায়ের হস্তে প্রদান এবং বসন্ত রায়ের পত্র পাঠ। দ্বারে সৈন্যগণের সমাবেশ

বসন্ত রায়। এ কি প্রতাপের লেখা !

মুক্তিয়ার। হাঁ।

বসন্ত রায়। খাঁসাহেব, এ কি প্রতাপের স্বহস্তে লেখা !

মুক্তিয়ার। হাঁ মহারাজ !

বসন্ত রায়। খাঁসাহেব, আমি প্রতাপকে নিজের হাতে মানুষ করেছি। (কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া) প্রতাপ যখন এতটুকু ছিল সে আমাকে এক মুহূর্ত ছেড়ে থাকতে চাইত না। দাদা কোথায় ? উদয় কোথায় ?

মুক্তিয়ার। তিনি বন্দী হয়েছেন, মহারাজের নিকট বিচারের জন্যে পাঠানো হয়েছে।

বসন্ত রায়। উদয় বন্দী হয়েছে ! বন্দী হয়েছে খাঁসাহেব ! আমি একবার তাকে কি দেখতে পাব না ?

মুক্তিয়ার। (করজোড়ে) না জনাব, হুকুম নেই।

বসন্ত রায়। (মুক্তিয়ার খাঁর হাত ধরিয়া) একবার তাকে দেখতে দেবে না খাঁসাহেব ?

মুক্তিয়ার। আমি আদেশপালক ভৃত্য মাত্র।

বসন্ত রায়। এসো সাহেব, তোমার অন্য আদেশটাও পালন করো।

মুক্তিয়ার। (মাটি ছুঁইয়া সেলাম করিয়া জোড়হস্তে) মহারাজ, আমাকে মার্জনা করবেন— আমি প্রভুর আদেশ পালন করছি মাত্র, আমার কোনো দোষ নেই।

বসন্ত রায়। না সাহেব, তোমার দোষ কী ? তোমার কোনো দোষ নেই। প্রতাপকে বোলো, এই পাপে তার প্রয়োজন ছিল না— আমি আর কতদিনই বা বাঁচতুম। আমি মরতে ভয় করি নে। কিন্তু এইখানেই পাপের শান্তি হোক, শান্তি হোক— আর নয়। উদয়কে যেন— খাঁসাহেব, কী আর বলব— ঈশ্বর যা করেন তাই হবে— আমাদের কেবল কান্নাই সার।

৩

প্রতাপাদিত্যের কক্ষ

বন্দীভাবে উদয়াদিত্য

প্রতাপাদিত্য। কোন্ শাস্তি তোমার উপযুক্ত ?

উদয়াদিত্য। আপনি যা আদেশ করেন।

প্রতাপাদিত্য। তুমি আমার এ রাজ্যের যোগ্য নও।

উদয়াদিত্য। না মহারাজ, আমি যোগ্য নই। আপনার এই সিংহাসন হতে আমাকে অব্যাহতি দিন, এই ভিক্ষা।

প্রতাপাদিত্য। তুমি যা বলছ তা যে সত্যই তোমার হৃদয়ের ভাব তা কী করে জানব?

উদয়াদিত্য। আজ আমি মা-কালীর চরণ স্পর্শ করে শপথ করব— আপনার রাজ্যের সূচ্যগ্র ভূমিও আমি কখনো শাসন করব না, সমরাদিত্যই আপনার রাজ্যের উত্তরাধিকারী।

প্রতাপাদিত্য। তুমি তবে কী চাও?

উদয়াদিত্য। মহারাজ, আমি আর কিছুই চাই নে— কেবল আমাকে পিঞ্জরের পশুর মতো গারদে পুরে রাখবেন না। আমাকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করুন, আমি একাকী কাশী চলে যাই।

প্রতাপাদিত্য। আচ্ছা, বেশ। আমি এর ব্যবস্থা করছি।

উদয়াদিত্য। আমার আর-একটি প্রার্থনা আছে মহারাজ! আমি বিভাকে নিজে তার শ্বশুরবাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসবার অনুমতি চাই।

প্রতাপাদিত্য। তার আবার শ্বশুরবাড়ি কোথায়?

উদয়াদিত্য। তাই যদি মনে করেন তবে সেই অনাথা কন্যাকে আমার কাছে থাকবার অনুমতি দিন। এখানে তো তার সুখও নেই, কর্মও নেই।

প্রতাপাদিত্য। তার মাতার কাছে অনুমতি নিতে পার।

উদয়াদিত্য। তাঁর অনুমতি নিয়েছি।

মহিষী ও বিভার প্রবেশ

মহিষী। বাবা উদয়, তবে কি তুই কাশী যাওয়াই স্থির করলি? আমাকেও তোর সঙ্গে নিয়ে চল্।

[প্রতাপের প্রস্থান

(সরোদনে) বাছা, এই বয়সে তুই যদি সংসার ছেড়ে গেলি, আমি কোন্ প্রাণে সংসার নিয়ে থাকব? রাজ্য-সংসার পরিত্যাগ করে তুই সন্ন্যাসী হয়ে থাকবি— আর আমার মুখে এই রাজবাড়ির অন্ন যে বিষের মতো ঠেকবে!

রোদন

উদয়াদিত্য। মা, মিথ্যা কেন কাঁদছ? যে মুক্তি পেয়েছে তার জন্যেও আবার কান্না! আমাকে আশীর্বাদ করে বিদায় করো।

মহিষী। রাজবাড়িতে জন্ম দিয়ে তোকে চিরদিন কেবল দুঃখ দিয়েছি— আমার ভাগ্য দিয়ে যখন তোর সুখ হল না তখন আমি আর তোকে কী বলে এখানে রাখব? ঈশ্বর তোকে যেখানে রাখেন সুখে রাখুন— কিন্তু বাবা, বিভার কী হবে?

উদয়াদিত্য। কী করে বলব মা! মহারাজের কাছে হুকুম নিয়েছি, ওকে শ্বশুরবাড়ি পৌঁছে দেব। সেখানে যদি সুখে থাকে তো ভালো— না যদি থাকে তবু ভালো— ভগবান যদি প্রসন্ন থাকেন ওর ভালো তো কেউ কেড়ে নেবে না।

বিভা। দাদা, দাদামহাশয় কেমন আছেন?

প্রতাপাদিত্যের পুনঃপ্রবেশ

প্রতাপাদিত্য। এসো উদয়, কালীর মন্দিরে এসো— মা'র পা ছুঁয়ে শপথ করবে এসো।

[সকলের প্রস্থান

৪

বাটীর বাহিরে

উদয়াদিত্য ও ধনঞ্জয়

ধনঞ্জয়। আজ রাস্তায় মিলন— আজ বড়ো আনন্দ। আজ আর ভণ্ডামির কোনো দরকার নেই— আজ আর যুবরাজ নয়। আজ তো তুমি ভাই! আয় ভাই, কোলাকুলি করে নিই। (কোলাকুলি) দাদা, যেখানে দীনদরিদ্র সবাই এসে মেলে সেই দরাজ জায়গাটাতে এসে দাঁড়িয়েছ, আজ আর কিছু ভাবনা নেই।

গান

সকল ভয়ের ভয় যে তারে
কোন্ বিপদে কাড়বে?
প্রাণের সঙ্গে যে প্রাণ গাঁথা
কোন্ কালে সে ছাড়বে?
নাহয় গেল সবই ভেসে—
রইবে তো সেই সর্বনেশে!
যে লাভ সকল ক্ষতির শেষে
সে লাভ কেবল বাড়বে।
সুখ নিয়ে ভাই ভয়ে থাকি,
আছে আছে দেয় সে ফাঁকি
দুঃখে যে সুখ থাকে বাকি
কেই বা সে সুখ নাড়বে?
যে পড়েছে পড়ার শেষে
ঠাঁই পেয়েছে তলায় এসে,
ভয় মিটেছে বেঁচেছে সে—
তাবে কে আর পাড়বে?

উদয়াদিত্য। বৈরাগীঠাকুর, আমি তোমার সঙ্গ ধরলুম, আর ছাড়ছি নে কিন্তু।

ধনঞ্জয়। তুমি ছাড়লে আমি ছাড়ি কই ভাই? মনে বেশ আনন্দ আছে তো? খুঁতমুত কিছু নেই তো?

উদয়াদিত্য। কিছু না— বেশ আছি।

ধনঞ্জয়। তবে দাও একটু পায়ের ধুলো!

উদয়াদিত্য। ও কী কর! ও কী কর! অপরাধ হবে যে।

ধনঞ্জয়। দাদা, এত বড়ো বোঝা নিজের হাতে ভগবান যার কাঁধ থেকে নামিয়ে দেন সে যে মহাপুরুষ। তোমাকে দেখে আজ আমার সর্ব গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। একবার দিদিকে আনো— তাকে একবার দেখি।

উদয়াদিত্য। সে তোমাকে দেখবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে আছে— তাকে ডেকে আনছি।

বিভার প্রবেশ ও বৈরাগীকে প্রণাম

ধনঞ্জয়। ভয় নেই দিদি, ভয় নেই, কোনো ভয় নেই। এই দেখ্-না, আমাকে দেখ্-না— আমি তাঁর রাস্তার ছেলে— রাস্তার কোলে-কোলেই দিন কেটে গেল, দিনরাত্রি একেবারে ধুলোয় ধুলোময় হয়ে বেড়াই, মায়ের আদরে লাল হয়ে উঠি। আমার মায়ের এই ধুলোঘরে আজ তোমার নতুন নিমন্ত্রণ— কিন্তু মনে কোনো ভয় রেখো না।

বিভা। বৈরাগীঠাকুর, তুমি কোথায় যাচ্ছ? তুমি কি আমাদের সঙ্গে যাবে?

ধনঞ্জয়। কোথায় যাব সে কথা আমার মনেই থাকে না। ঐ রাস্তাই তো আমাকে মজিয়েছে। এই মাটি দেখলে আমাকে মাটি করে দেয়।

গান

সারি গানের সুর

গ্রামছাড়া ওই রাঙা মাটির পথ
আমার মন ভুলায় রে!
ওরে কার পানে মন হাত বাড়িয়ে
লুটিয়ে যায় ধুলায় রে!
ও যে আমায় ঘরের বাহির করে,
পায়ে পায়ে পায়ে ধরে—
ও যে কেড়ে আমায় নিয়ে যায় রে,
যায় রে কোন্ চুলায় রে!
ও কোন্ বাঁকে কী ধন দেখাবে,
কোন্ খানে কী দায় ঠেকাবে,
কোথায় গিয়ে শেষ মেলে যে—
ভেবেই না কুলায় রে!

উদয়াদিত্য। ঠাকুর, তুমি কি ভাবছ বিভা আমার পথের সঙ্গিনী? ওকে আমি ওর শ্বশুরবাড়ি পৌঁছে দিতে যাচ্ছি।

ধনঞ্জয়। বেশ, বেশ, হরি যেখানে নিয়ে যান সেখানেই ভালো। দেখি তিনি কোন্‌খানে পৌঁছিয়ে দেন— আমিও সঙ্গে আছি। কোনো ভয় নেই দিদি, কোনো ভয় নেই।

৫

বরবেশে রামচন্দ্র

সম্মুখে নৃত্যগীত

রামচন্দ্র। রমাই, তুমি যাও— লোকজনদের দেখো গে।

[রমাইয়ের প্রস্থান

সেনাপতি, তুমি এখানে বোসো, রমাইয়ের হাসি আমার ভালো লাগছে না।

ফর্নাণ্ডিজ। মহারাজ, রমাইয়ের হাসি গন্ধকের আলোর মতো, তার ধোঁয়ায় দম আটকে আসে।

রামচন্দ্র। ঠিক বলেছ সেনাপতি, আমার ইচ্ছা হচ্ছিল উঠে চলে যাই, আজ গানবাজনা ভালো জমছে না ফর্নাণ্ডিজ।

ফর্নাণ্ডিজ। না মহারাজ, জমছে না। আমার এই বুকে বাজছে, আর-একদিনের কথা মনে পড়ছে।

রামচন্দ্র। গুজবটা কি সত্যি?

ফর্নাণ্ডিজ। কিসের গুজব?

রামচন্দ্র। ঐ তাঁরা কি যশোর থেকে আসছেন?

ফর্নাণ্ডিজ। হাঁ মহারাজ, যশোরের একটি লোকের কাছে শুনলুম তাঁদের আসবার কথা হচ্ছে। আমাকে যদি আদেশ করেন মহারাজ, আমি তাঁদের এগিয়ে আনবার জন্যে যাই।

রামচন্দ্র। এগিয়ে আনবে? তা হলে কিন্তু মন্ত্রী রমাই সবাই হাসবে।

ফর্নাণ্ডিজ। মহারাজ যদি আদেশ করেন তাদের হাসিসুদ্ধ মুখটা আমি একেবারে সাফ করে দিতে পারি !

রামচন্দ্র। না, না, গোলমাল করে কাজ নেই। কিন্তু সেনাপতি, আমি তোমাকে গোপনে বলছি, কাউকে বোলো না, আমি তাকে কিছুতে ভুলতে পারছি নে ! কালই রাত্রে আমি তাকে স্বপ্নে দেখেছি।

ফর্নাণ্ডিজ। মহারাজ, আমি আর কী বলব— তাঁর জন্যে প্রাণ দিলে যদি কোনো কাজেও না লাগে তবুও দিতে ইচ্ছা হচ্ছে।

রামচন্দ্র। দেখো সেনাপতি, এক্ কাজ করলে হয় না ?

ফর্নাণ্ডিজ। কী বলুন।

রামচন্দ্র। মোহন যদি একবার খবর পায় যে তাঁরা আসছেন তা হলে সে আপনি ছুটে যাবে। একবার কোনোমতে তাকে সংবাদটা জানাও-না। কিন্তু দেখো, আমার নাম কোরো না।

ফর্নাণ্ডিজ। যে আজ্ঞা মহারাজ !

[প্রস্থান

রমাইয়ের প্রবেশ

রমাই। মহারাজ, যশোর থেকে তো কেউ নিমন্ত্রণ রাখতে এল না ! রাগ করলে বা !

রামচন্দ্র। হা হা হা হা।

রমাই। আপনার প্রথম পক্ষের শ্বশুর তো সেবার তাঁর কন্যার সিঁথির সিঁদুরের উপর হাত বুলোবার চেষ্টায় ছিলেন— এবারে তাঁকে—

রামমোহনের দ্রুত প্রবেশ

রামমোহন। চুপ ! আর একটি কথা যদি কও তা হলে—

রমাই। বুঝেছি বাবা, আর বলতে হবে না।

রামমোহন। মহারাজ, হাসবেন না মহারাজ ! আজকের দিনে অনেক সহ্য করেছি, কিন্তু মহারাজার ঐ হাসি সহ্য করতে পারছি নে।

রামচন্দ্র। ফের বেয়াদবি করছিস !

রামমোহন। আমার বেয়াদবি ! বেয়াদবি কে করলে বুঝলে না !

ফর্নাণ্ডিজ। মোহন, একটা কথা আছে ভাই, একটু এ দিকে এসো।

[উভয়ের প্রস্থান

রামচন্দ্র। ওরা সব গান বন্ধ করে হাঁ করে বসে রইল কেন ? ওদের একটু গাইতে বলো-না। আজ সব যেন কেমন ঝিমিয়ে পড়ছে।

উপসংহার

নদীতীরে নৌকা

বিভা ও রামমোহন

বিভা। মোহন !

রামমোহন। মা, আজ তুমি এলে ?

বিভা। হাঁ মোহন। তুই কি আমায় নিতে এলি ?

রামমোহন। না মা, অত ব্যস্ত হোয়ো না, আজ থাক্।

বিভা। কেন মোহন, আজ কেন নয় ?

রামমোহন। আজ দিন ভালো নয় যে মা, আজ দিন ভালো নয়।

বিভা। ভালো দিন নয়? তবে আজ এত উৎসবের আয়োজন কেন? বরাবর দেখলুম রাস্তায় আলোর মালা— বাঁশি বাজছে। আজ বুঝি শুভলগ্ন পড়েছে?

রামমোহন। শুভলগ্ন! মিথ্যে কথা। সমস্ত ভুল।

বিভা। মোহন, তোর কথা আমি বুঝতে পারছি নে, কী হয়েছে আমাকে সত্যি করে বল্! মহারাজ কি রাগ করেছেন?

রামমোহন। রাগ করেছেন বৈকি।

বিভা। তিনি তো আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

রামমোহন। দেরি হয়ে গেছে মা, দেরি হয়ে গেছে। অনেক দেরি হয়ে গেছে।

বিভা। অনেক দেরি হয়ে গেছে? সময় একেবারে ফুরিয়ে গেছে?

রামমোহন। ফুরিয়ে গেছে— সব ফুরিয়ে গেছে। সময় গেলে আর ফেরে না।

বিভা। কে বললে ফেরে না? আমি তপস্যা করে ফেরাব— আমি জীবন-মন দিয়ে ফেরাব। মোহন, এখনই তুই আমাকে নিয়ে যা। দেরি হয়ে থাকে, আর এক মুহূর্ত দেরি করব না।

রামমোহন। যুবরাজ কোথায় গেছেন?

বিভা। তিনি খবর নিতে গেছেন।

রামমোহন। তিনি ফিরে আসুন-না।

বিভা। না মোহন, আর বিলম্ব নয়। তিনি কি খবর পেয়েছেন আমি এসেছি? দাদা বললেন, তিনি নৌকার ছাত থেকে দেখেছেন ময়ূরপংখি সাজানো হচ্ছে।

রামমোহন। হাঁ, সাজানো হচ্ছে বটে—

বিভা। এখনো কি সাজানো শেষ হয় নি?

রামমোহন। ঐ ময়ূরপংখির সাজসজ্জায় আগুন লাগুক, আগুন লাগুক!

বিভা। মোহন, তোর মুখে এ কী কথা! তুই যখন আনতে গেলি আসতে পারি নি বলে এত রাগ করেছিস? তুইও আমার দুঃখ বুঝতে পারিস নি মোহন?

মোহন নিরুত্তর

এই দেখ্, তোর দেওয়া সেই শাঁখাজোড়া পরে এসেছি— আজকের দিনে তুই আমার উপর রাগ করিস নে।

রামমোহন। আমাকে আর দগ্ধ কোরো না! মিথ্যে দিয়ে তোমার কাছে আর কথা চাপা দিতে পারলুম না। মা জননী, এ রাজ্যের লক্ষ্মী তুমি, কিন্তু এ রাজ্যে তোমার আজ আর স্থান নেই! চলো মা, তুমি ফিরে চলো— তোমার এই পাদপদ্মের দাস, এই অধম সন্তান তোমার সঙ্গে যাবে।

বিভা। মোহন, যা তোর বলবার আছে সব তুই বল্। আমি যে কত দুঃখ বইতে পারি তা কি তুই জানিস নে?

রামমোহন। সন্তান যখন ডাকতে গেল তখন কেন এলি নে, তখন কেন এলি নে— আমার পোড়া কপাল, তোকে কেন আনতে পারলুম না!

বিভা। ওরে মোহন, জগতে এমন কোনো সুখ নেই যার লোভে আমি সেদিন দাদাকে ফেলে আসতে পারতুম— এতে আমার কপালে যা থাকে তাই হবে।

রামমোহন। তবে শোন্ মা, সেই ময়ূরপংখি তোর জন্যে নয়।

বিভা। নাই হল মোহন, দুঃখ কিসের? আমি হেঁটে চলে যাব।

রামমোহন। যাবি কোথায়? সেখানে যে আজ আর-এক রানী আসছেন।

বিভা। আর-এক রানী!

রামমোহন। হাঁ, আর-এক রানী। আজ মহারাজের বিবাহ।

বিভা। ওঃ! আজ বিবাহের লগ্ন!

রামমোহন। এক বিবাহের লগ্নে মহারাজ তোমাদের ঘরে গিয়েছিলেন— আজ কোন্ বিবাহের লগ্নে তুমি তাঁর ঘরের সামনে এসে পৌঁছোলে? আর আমার এমন কপাল, আজ আমি বেঁচে আছি। চল্ মা, ফিরে চল্, আর এক দণ্ড নয়— ঐ বাঁশি আমার কানে বিষ ঢালছে! ওরে, আর-একদিন কী বাঁশি শুনেছিলুম সেই কথা মনে পড়ছে। চল্ চল্ ফিরে চল্! অমন চুপ করে বসে রইলে কেন মা! কেমন করে যে কাঁদতে হয় তাও কি একেবারে ভুলে গেলে? মা, কোন্ দিকে তাকিয়ে আছ মা? তোমার এই সন্তানের মুখের দিকে একবার চাও।

বিভা। মোহন, আমার একটি কথা রাখতে হবে।

রামমোহন। কী কথা?

বিভা। আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হবে। যদি না যাস আমি একলা যাব।

রামমোহন। সে আজ ময়ূরপংখিতে চড়বে, আর তুমি আজ হেঁটে যাবে?

বিভা। হেঁটে যাওয়াই আমাকে সাজে— আমি হেঁটেই যাব। তুই সঙ্গে যাবি নে?

রামমোহন। আমি সঙ্গে যাব না তো কে যাবে? কিন্তু মা, সে সভায় আজ তুমি কিসের জন্যে যাবে?

বিভা। কিসের জন্যে যাব? সেখানে আমার কোনো আশা নেই বলেই যাব। আমার রাগ অভিমান, আমার সমস্ত বাসনা বিসর্জন করব বলেই যাব। আমি কি এতদূরে এসে অমনি চলে যাব! যে আজ আসছে তাকে আশীর্বাদ করে যাব না? নিজের হাতে করে তার হাতে আমার রাজাকে সমর্পণ করব।

রামমোহন। তার পরে?

বিভা। তার পরে? ভগবানের পৃথিবীতে অভাগাদেরও আশ্রয় মেলে। আমারও মিলবে।

রামমোহন। সেইসঙ্গে আমারও মিলবে। আমি তোমাকে আনতে পারি নি, কিন্তু তুমি আমাকে নিয়ে যাবে মা।

বিভা। মোহন, আমাকে দুঃখ সইতে হবে সে কথাটা হঠাৎ আমি ভুলে গিয়েছিলুম— ভেবেছিলুম যা ভোগ হবার তা বুঝি হয়ে চুকে গেছে।

রামমোহন। কেন মা, তুমি সতীলক্ষ্মী, তুমি দুঃখ কেন পাও!

বিভা। মোহন, সেদিন অপরাধ যে সত্যি হয়েছিল— সে কথা তো আর ভোলবার নয়। সে অপরাধের শাস্তি না হয়ে তো মিটবে না। সে শাস্তি আমিই নিলুম— প্রায়শ্চিত্ত আমাকে দিয়েই হবে।

রামমোহন। মা, তোমার পিতার হাতের আঘাত সেও তুমিই মাথায় করে নিয়েছ— আবার তোমার স্বামীর হাতের আঘাত সেও তুমিই নিলে। কিন্তু আমি বলছি মা, সকলের চেয়ে বড়ো দণ্ড পেলে তোমার স্বামী। সে আজ দ্বারের কাছে থেকেও তোমাকে হারালে।

উদয়াদিত্যের প্রবেশ

উদয়াদিত্য। ওরে বিভা!

বিভা। দাদা, সব জানি; কিছু ভেবো না।

উদয়াদিত্য। এখন কী করবি বোন?

বিভা। ভেবেছিলুম রাজবাড়িতে একবার যাব, কিন্তু যাব না।

রামমোহন। মা, যেয়ো না, যেয়ো না। গেলে তোমার অপমান হত— সেই অপমানে তোমার স্বামীর পাপ আরো বাড়ত।

বিভা। আমার মান অপমান সব চুকে গেছে। কিন্তু দাদার অপমান হত যে। দাদা, এবার নৌকা ফেরাও।

উদয়াদিত্য। তুই কোথায় যাবি বিভা?

বিভা। তোমার সঙ্গে কাশী যাব।

উদয়াদিত্য। হায় রে অদৃষ্ট!

বিভা। দাদা, আমি আজ মুক্তি পেয়েছি। এখন তোমার চরণসেবা করে আমার জীবন আনন্দে কাটবে। মোহন, তুই তোর প্রভুর কাছে ফিরে যা।

রামমোহন। ঐ দেখো মা, ফেরবার পথে আগুন লেগেছে, ঐ-যে মশালের আলো— ঐ-যে ময়ূরপংখি চলেছে। ও পথ আমার পথ নয়।

ধনঞ্জয়ের প্রবেশ

বিভা। বৈরাগীঠাকুর!

ধনঞ্জয়। কেন দিদি?

বিভা। আমাকে তোমাদের সঙ্গ দিয়ো ঠাকুর!

উদয়াদিত্য। ঠাকুর, শেষকালে বিভাকেও আমাদের পথ নিতে হল!

ধনঞ্জয়। সে তো বেশ কথা! দয়াময় হরি! কী আনন্দ! তোমার এ কী আনন্দ! ছাড় না, কিছুতেই ছাড় না। শ্বশুরবাড়ির রাস্তার ধারেও ডাকাতের মতো বসে আছ। দিদি, এই মাঝরাস্তায় আমাদের পাগল প্রভুর তলব পড়েছে! একেবারে জোর তলব। চল্ চল্। চল্ চল্। পা ফেলে চল্। খুশি হয়ে চল্। হাসতে হাসতে চল্। রাস্তা এমন করে পরিষ্কার করে দিয়েছে— আর ভয় কিসের!

গান

আমি ফিরব না রে, ফিরব না আর ফিরব না রে—
এমন হাওয়ার মুখে ভাসল তরী,
কূলে ভিড়ব না আর ভিড়ব না রে!
ছড়িয়ে গেছে সুতো ছিঁড়ে,
তাই খুঁটে আজ মরব কি রে!
এখন ভাঙা ঘরের কুড়িয়ে খুঁটি
বেড়া ঘিরব না আর ঘিরব না রে!
ঘাটের রশি গেছে কেটে,
কাঁদব কি তাই বক্ষ ফেটে?
এখন পালের রশি ধরব কষি,
এ রশি ছিঁড়ব না আর ছিঁড়ব না রে!

রাজা

রাজা

১

অন্ধকার ঘর

রানী সুদর্শনা ও তাঁহার দাসী সুরঙ্গমা

সুদর্শনা। আলো, আলো কই। এ ঘরে কি একদিনও আলো জ্বলবে না।

সুরঙ্গমা। রানীমা, তোমার ঘরে-ঘরেই তো আলো জ্বলছে— তার থেকে সরে আসবার জন্যে কি একটা ঘরেও অন্ধকার রাখবে না।

সুদর্শনা। কোথাও অন্ধকার কেন থাকবে।

সুরঙ্গমা। তা হলে যে আলোও চিনবে না, অন্ধকারও চিনবে না।

সুদর্শনা। তুই যেমন এই অন্ধকার ঘরের দাসী তেমনি তোর অন্ধকারের মতো কথা, অর্থই বোঝা যায় না। বল্ তো এ ঘরটা আছে কোথায়। কোথা দিয়ে এখানে আসি, কোথা দিয়ে বেরোই, প্রতিদিনই ধাঁধা লাগে।

সুরঙ্গমা। এ ঘর মাটির আবরণ ভেদ করে পৃথিবীর বুকের মাঝখানে তৈরি। তোমার জন্যেই রাজা বিশেষ করে করেছেন!

সুদর্শনা। তাঁর ঘরের অভাব কী ছিল যে এই অন্ধকার ঘরটা বিশেষ করে করেছেন!

সুরঙ্গমা। আলোর ঘরে সকলেরই আনাগোনা— এই অন্ধকারে কেবল একলা তোমার সঙ্গে মিলন।

সুদর্শনা। না না, আমি আলো চাই— আলোর জন্যে অস্থির হয়ে আছি। তোকে আমি আমার গলার হার দেব যদি এখানে একদিন আলো আনতে পারিস।

সুরঙ্গমা। আমার সাধ্য কী মা— যেখানে তিনি অন্ধকার রাখেন আমি সেখানে আলো জ্বালব!

সুদর্শনা! এত ভক্তি তোর! অথচ শুনেছি, তোর বাপকে রাজা শাস্তি দিয়েছেন। সে কি সত্যি।

সুরঙ্গমা। সত্যি। বাবা জুয়ো খেলত। রাজ্যের যত যুবক আমাদের ঘরে জুটত— মদ খেত আর জুয়ো খেলত।

সুদর্শনা। তুই কী করতিস।

সুরঙ্গমা। মা, তবে সব শুনেছ। আমি নষ্ট হবার পথে গিয়েছিলুম। বাবা ইচ্ছে করেই আমাকে সে পথে দাঁড় করিয়েছিলেন। আমার মা ছিল না।

সুদর্শনা। রাজা যখন তোর বাপকে নির্বাসিত করে দিলেন তখন তোর রাগ হয় নি?

সুরঙ্গমা। খুব রাগ হয়েছিল— ইচ্ছে হয়েছিল, কেউ যদি রাজাকে মেরে ফেলে তো বেশ হয়।

সুদর্শনা। রাজা তোর বাপের কাছ থেকে ছাড়িয়ে এনে কোথায় রাখলেন?

সুরঙ্গমা। কোথায় রাখলেন কে জানে। কিন্তু কী কষ্ট গেছে! আমাকে যেন ছুঁচ ফোটাত, আগুনে পোড়াত।

সুদর্শনা। কেন, তোর এত কষ্ট কিসের ছিল।

সুরঙ্গমা। আমি যে নষ্ট হবার পথে গিয়েছিলুম— সে পথ বন্ধ হতেই মনে হল আমার যেন কোনো আশ্রয়ই রইল না। আমি কেবল খাঁচায়-পোরা বুনো জন্তুর মতো কেবল গর্জে বেড়াতুম এবং সবাইকে

আঁচড়ে কামড়ে ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করত।

সুদর্শনা। রাজাকে তখন তোর কী মনে হত।

সুরঙ্গমা। উঃ, কী নিষ্ঠুর! কী নিষ্ঠুর! কী অবিচলিত নিষ্ঠুরতা!

সুদর্শনা। সেই রাজার 'পরে তোর এত ভক্তি হল কী করে।

সুরঙ্গমা। কী জানি মা! এত অটল, এত কঠোর ব'লেই এত নির্ভর, এত ভরসা। নইলে আমার মতো নষ্ট আশ্রয় পেত কেমন করে।

সুদর্শনা। তোর মন বদল হল কখন।

সুরঙ্গমা। কী জানি কখন হয়ে গেল। সমস্ত দুরন্তপনা হার মেনে একদিন মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তখন দেখি, যত ভয়ানক ততই সুন্দর। বেঁচে গেলুম, বেঁচে গেলুম, জন্মের মতো বেঁচে গেলুম।

সুদর্শনা। আচ্ছা সুরঙ্গমা, মাথা খা, সত্যি করে বল্ আমার রাজাকে দেখতে কেমন। আমি একদিনও তাঁকে চোখে দেখলুম না। অন্ধকারেই আমার কাছে আসেন, অন্ধকারেই যান। কত লোককে জিজ্ঞাসা করি, কেউ স্পষ্ট করে জবাব দেয় না। সবাই যেন কী-একটা লুকিয়ে রাখে।

সুরঙ্গমা। আমি সত্যি বলছি রানী, ভালো করে বলতে পারব না। তিনি কি সুন্দর— না, লোকে যাকে সুন্দর বলে তিনি তা নন।

সুদর্শনা। বলিস কী! সুন্দর নন?

সুরঙ্গমা। না রানীমা! সুন্দর বললে তাঁকে ছোটো করে বলা হবে।

সুদর্শনা। তোর সব কথা ঐ এক-রকম। কিছু বোঝা যায় না।

সুরঙ্গমা। কী করব মা, সব কথা তো বোঝানো যায় না। বাপের বাড়িতে অল্প বয়সে অনেক পুরুষ দেখেছি, তাদের সুন্দর বলতুম। তারা আমার দিনরাত্রিকে, আমার সুখদুঃখকে কী নাচন নাচিয়ে বেড়িয়েছিল সে আজও ভুলতে পারি নি। আমার রাজা কি তাদের মতো? সুন্দর! কক্খনো না।

সুদর্শনা। সুন্দর নয়?

সুরঙ্গমা। হাঁ, তাই বলব— সুন্দর নয়। সুন্দর নয় ব'লেই এমন অদ্ভুত, এমন আশ্চর্য। যখন বাপের কাছ থেকে কেড়ে আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে গেল তখন সে ভয়ানক দেখলুম। আমার সমস্ত মন এমন বিমুখ হল যে, কটাক্ষেও তাঁর দিকে তাকাতে চাইতুম না। তার পরে এখন এমন হয়েছে যে যখন সকালবেলায় তাঁকে প্রণাম করি তখন কেবল তাঁর পায়ের তলার মাটির দিকেই তাকাই, আর মনে হয়— এই আমার ঢের, আমার নয়ন সার্থক হয়ে গেছে।

সুদর্শনা। তোর সব কথা বুঝতে পারি নে, তবু শুনতে বেশ ভালো লাগে। কিন্তু যাই বলিস, তাঁকে দেখবই। আমার কবে বিবাহ হয়েছিল মনেও নেই; তখন আমার জ্ঞান ছিল না। মা'র কাছে শুনেছি তাঁকে দৈবজ্ঞ বলেছিল, তাঁর মেয়ে যাঁকে স্বামীরূপে পাবে পৃথিবীতে তাঁর মতো পুরুষ আর নেই। মাকে কতবার জিজ্ঞাসা করেছি, আমার স্বামীকে দেখতে কেমন। তিনি ভালো করে উত্তর দিতেই চান না; বলেন, আমি কি দেখেছি— আমি ঘোমটার ভিতর থেকে ভালো করে দেখতেই পাই নি। যিনি সুপুরুষের শ্রেষ্ঠ তাঁকে দেখব এ লোভ কি ছাড়া যায়!

সুরঙ্গমা। ঐ-যে মা, একটা হাওয়া আসছে।

সুদর্শনা। হাওয়া? কোথায় হাওয়া।

সুরঙ্গমা। ঐ-যে গন্ধ পাচ্ছ না?

সুদর্শনা। না, কই, গন্ধ পাচ্ছি নে তো।

সুরঙ্গমা। বড়ো দরজাটা খুলেছে— তিনি আসছেন, ভিতরে আসছেন।

সুদর্শনা। তুই কেমন করে টের পাস।

সুরঙ্গমা। কী জানি মা। আমার মনে হয় যেন আমার বুকের ভিতরে পায়ের শব্দ পাচ্ছি। আমি তাঁর এই অন্ধকার ঘরের সেবিকা কিনা, তাই আমার একটা বোধ জন্মে গেছে— আমার বোঝবার জন্যে কিছুই দেখবার দরকার হয় না।

সুদর্শনা। আমার যদি তোর মতো হয় তা হলে যে বেঁচে যাই।

সুরঙ্গমা। হবে মা, হবে। তুমি দেখব দেখব করে যে অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে রয়েছ সেইজন্যে কেবল দেখবার দিকেই তোমার সমস্ত মন পড়ে রয়েছে। সেইটে যখন ছেড়ে দেবে তখন সব আপনি সহজ হয়ে যাবে।

সুদর্শনা। দাসী হয়ে তোর এত সহজ হল কী করে? রানী হয়ে আমার হয় না কেন?

সুরঙ্গমা। আমি যে দাসী, সেইজন্যেই এত সহজ হল। আমাকে যেদিন তিনি এই অন্ধকার ঘরের ভার দিয়ে বললেন 'সুরঙ্গমা, এই ঘরটা প্রতিদিন তুমি প্রস্তুত করে রেখো এই তোমার কাজ' তখন আমি তাঁর আজ্ঞা মাথায় করে নিলুম— আমি মনে মনেও বলি নি, 'যারা তোমার আলোর ঘরে আলো জ্বালে তাদের কাজটি আমাকে দাও।' তাই যে কাজটি নিলুম তার শক্তি আপনি জেগে উঠল, কোনো বাধা পেল না। ঐ-যে তিনি আসছেন— ঘরের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন। প্রভু!

বাহিরে গান

খোলো খোলো দ্বার, রাখিয়ো না আর
বাহিরে আমায় দাঁড়ায়ে।
দাও, সাড়া দাও, এই দিকে চাও,
এসো দুই বাহু বাড়ায়ে।
কাজ হয়ে গেছে সারা,
উঠেছে সন্ধ্যাতারা,
আলোকের খেয়া হয়ে গেল দেয়া
অস্তসাগর পারায়ে।
এসেছি দুয়ারে এসেছি, আমারে
বাহিরে রেখো না দাঁড়ায়ে।
ভরি লয়ে ঝারি এনেছ কি বারি,
সেজেছ কি শুচি দুকূলে।
বেঁধেছ কি চুল, তুলেছ কি ফুল,
গেঁথেছ কি মালা মুকুলে।
ধেনু এল গোঠে ফিরে,
পাখিরা এসেছে নীড়ে,
পথ ছিল যত জুড়িয়া জগত
আঁধারে গিয়েছে হারায়ে।
তোমারি দুয়ারে এসেছি, আমারে
বাহিরে রেখো না দাঁড়ায়ে॥

সুরঙ্গমা। তোমার দুয়োর কে বন্ধ রাখতে পারে রাজা! ও তো বন্ধ নেই, কেবল ভেজানো আছে; একটু ছোঁও যদি আপনি খুলে যাবে। সেটুকুও করবে না? নিজে উঠে গিয়ে না খুলে দিলে ঢুকবে না?

গান

এ যে মোর আবরণ
ঘুচাতে কতক্ষণ।
নিশ্বাসবায়ে উড়ে চলে যায়
তুমি কর যদি মন।

যদি পড়ে থাকি ভূমে
ধূলাব ধরণী চুমে,
তুমি তারি লাগি দ্বারে রবে জাগি
এ কেমন তব পণ।
রথের চাকার রবে
জাগাও জাগাও সবে,
আপনার ঘরে এসো বলভরে
এসো এসো গৌরবে.।
ঘুম টুটে যাক চলে,
চিনি যেন প্রভু ব'লে—
ছুটে এসে দ্বারে করি আপনারে
চরণে সমর্পণ ॥

রানী, যাও তবে, দরজাটা খুলে দাও, নইলে আসবেন না।

সুদর্শনা। আমি এ ঘরের অন্ধকারে কিছুই ভালো করে দেখতে পাই নে— কোথায় দরজা কে জানে। তুই এখানকার সব জানিস, তুই আমার হয়ে খুলে দে।

[সুরঙ্গমার দ্বার-উদ্‌ঘাটন, প্রণাম ও প্রস্থান

তুমি আমাকে আলোয় দেখা দিচ্ছ না কেন।

[1]রাজা। আলোয় তুমি হাজার হাজার জিনিসের সঙ্গে মিশিয়ে আমাকে দেখতে চাও ? এই গভীর অন্ধকারে আমি তোমার একমাত্র হয়ে থাকি-না কেন।

সুদর্শনা। সবাই তোমাকে দেখতে পায়, আমি রানী হয়ে দেখতে পাব না ?

রাজা। কে বললে দেখতে পায়। মূঢ় যারা তারা মনে করে 'দেখতে পাচ্ছি'।

সুদর্শনা। তা হোক, আমাকে দেখা দিতেই হবে।

রাজা। সহ্য করতে পারবে না— কষ্ট হবে।

সুদর্শনা। সহ্য হবে না— তুমি বল কী ! তুমি যে কত সুন্দর, কত আশ্চর্য, তা এই অন্ধকারেই বুঝতে পারি, আর আলোতে বুঝতে পারব না ? বাইরে যখন তোমার বীণা বাজে তখন আমার এমনি হয় যে, আমার নিজেকে সেই বীণার গান বলে মনে হয়। তোমার ঐ সুগন্ধ উত্তরীয়টা যখন আমার গায়ে এসে ঠেকে তখন আমার মনে হয়, আমার সমস্ত অঙ্গটা বাতাসে ঘন আনন্দের সঙ্গে মিলে গেল। তোমাকে দেখলে আমি সইতে পারব না, এ কী কথা !

রাজা। আমার কোনো রূপ কি তোমার মনে আসে না।

সুদর্শনা.। একরকম করে আসে বৈকি ! নইলে বাঁচব কী করে।

রাজা। কী রকম দেখেছ।

সুদর্শনা। সে তো একরকম নয়। নববর্ষার দিনে জলভরা মেঘে আকাশের শেষ প্রান্তে বনের রেখা যখন নিবিড় হয়ে ওঠে, তখন বসে বসে মনে করি আমার রাজার রূপটি বুঝি এইরকম— এমনি নেমে-আসা, এমনি ঢেকে-দেওয়া, এমনি চোখ-জুড়ানো, এমনি হৃদয়-ভরানো, চোখের পল্লবটি এমনি ছায়ামাখা, মুখের হাসিটি এমনি গভীরতার-মধ্যে-ডুবে-থাকা। আবার, শরৎকালে আকাশের পর্দা যখন দূরে উড়ে চলে যায় তখন মনে হয়, তুমি স্নান করে তোমার শেফালিবনের পথ দিয়ে চলেছ, তোমার গলায় কুন্দফুলের মালা, তোমার বুকে শ্বেতচন্দনের ছাপ, তোমার মাথায় হালকা সাদা কাপড়ের উষ্ণীষ, তোমার চোখের দৃষ্টি দিগন্তের পারে— তখন মনে হয়, তুমি আমার পথিক বন্ধু ; তোমার সঙ্গে

[1] রাজাকে এ নাটকের কোথাও রঙ্গমঞ্চে দেখা যাইবে না।

যদি চলতে পারি তা হলে দিগন্তে দিগন্তে সোনার সিংহদ্বার খুলে যাবে, শুভ্রতার ভিতর-মহলে প্রবেশ করব। আর, যদি না পারি, তবে এই বাতায়নের ধারে বসে কোন্-এক অনেক দূরের জন্যে দীর্ঘনিশ্বাস উঠতে থাকবে, কেবলই দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি, অজ্ঞাত বনের পথশ্রেণী আর অনাঘ্রাত ফুলের গন্ধের জন্যে বুকের ভিতরটা কেঁদে কেঁদে ঝুরে ঝুরে মরবে। আর বসন্তকালে এই-যে সমস্ত বন রঙে রঙিন, এখন আমি তোমাকে দেখতে পাই কানে কুণ্ডল, হাতে অঙ্গদ, গায়ে বসন্তী রঙের উত্তরীয়, হাতে অশোকের মঞ্জরী, তানে তানে তোমার বীণার সব-কটি সোনার তার উতলা।

রাজা। এত বিচিত্ররূপ দেখছ, তবে কেন সব বাদ দিয়ে কেবল একটি বিশেষ মূর্তি দেখতে চাচ্ছ। সেটা যদি তোমার মনের মতো না হয় তবে তো সমস্ত গেল।

সুদর্শনা। মনের মতো হবে নিশ্চয় জানি।

রাজা। মন যদি তার মতো হয় তবেই সে মনের মতো হবে। আগে তাই হোক।

সুদর্শনা। সত্য বলছি, এই অন্ধকারের মধ্যে যখন তোমাকে দেখতে না পাই অথচ তুমি আছ বলে জানি, তখন এক-একবার কেমন-একটা ভয়ে আমার বুকের ভিতরটা কেঁপে ওঠে!

রাজা। সে ভয়ে দোষ কী। প্রেমের মধ্যে ভয় না থাকলে তার রস হালকা হয়ে যায়।

সুদর্শনা। আচ্ছা, আমি জিজ্ঞাসা করি, এই অন্ধকারের মধ্যে তুমি আমাকে দেখতে পাও?

রাজা। পাই বৈকি।

সুদর্শনা। কেমন করে দেখতে পাও। আচ্ছা, কী দেখ।

রাজা। দেখতে পাই, যেন অনন্ত আকাশের অন্ধকার আমার আনন্দের টানে ঘুরতে ঘুরতে কত নক্ষত্রের আলো টেনে নিয়ে এসে একটি জায়গায় রূপ ধরে দাঁড়িয়েছে। তার মধ্যে কত যুগের ধ্যান, কত আকাশের আবেগ, কত ঋতুর উপহার।

সুদর্শনা। আমার এত রূপ! তোমার কাছে যখন শুনি বুক ভরে ওঠে। কিন্তু ভালো করে প্রত্যয় হয় না; নিজের মধ্যে তো দেখতে পাই নে।

রাজা। নিজের আয়নায় দেখা যায় না— ছোটো হয়ে যায়। আমার চিত্তের মধ্যে যদি দেখতে পাও তো দেখবে, সে কত বড়ো! আমার হৃদয়ে তুমি যে আমার দ্বিতীয়, তুমি সেখানে কি শুধু তুমি!

সুদর্শনা। বলো বলো, এমনি করে বলো! আমার কাছে তোমার কথা গানের মতো বোধ হচ্ছে— যেন অনাদিকালের গান, যেন জন্ম-জন্মান্তর শুনে এসেছি। সে কি তুমিই শুনিয়েছ, আর আমাকেই শুনিয়েছ। না, যাকে শুনিয়েছ সে আমার চেয়ে অনেক বড়ো, অনেক সুন্দর; তোমার গানে সেই অলোকসুন্দরীকে দেখতে পাই— সে কি আমার মধ্যে, না তোমার মধ্যে। তুমি আমাকে যেমন করে দেখছ তাই একবার এক নিমেষের জন্য আমাকে দেখিয়ে দাও-না। তোমার কাছে অন্ধকার বলে কি কিছুই নেই। সেইজন্যেই তো তোমাকে কেমন আমার ভয় করে। এই-যে কঠিন কালো লোহার মতো অন্ধকার, যা আমার উপর ঘুমের মতো, মূর্ছার মতো, মৃত্যুর মতো, তোমার দিকে তার কিছুই নেই! তবে এ জায়গায় তোমার সঙ্গে আমি কেমন করে মিলব। না না, হবে না মিলন, হবে না। এখানে নয়, এখানে নয়। যেখানে আমি গাছপালা পশুপাখি মাটিপাথর সমস্ত দেখছি সেইখানেই তোমাকে দেখব।

রাজা। আচ্ছা, দেখো, কিন্তু তোমাকে নিজে চিনে নিতে হবে; কেউ তোমাকে বলে দেবে না— আর বলে দিলেই বা বিশ্বাস কী?

সুদর্শনা। আমি চিনে নেব, চিনে নেব, লক্ষ লোকের মধ্যে চিনে নেব। ভুল হবে না।

রাজা। আজ বসন্তপূর্ণিমার উৎসবে তুমি তোমার প্রাসাদের শিখরের উপরে দাঁড়িয়ো— চেয়ে দেখো— আমার বাগানে সহস্র লোকের মধ্যে আমাকে দেখবার চেষ্টা কোরো।

সুদর্শনা। তাদের মধ্যে দেখা দেবে তো?

রাজা। বার বার করে সকল দিক থেকেই দেখা দেব। সুরঙ্গমা!

সুরঙ্গমার প্রবেশ

সুরঙ্গমা। কী প্রভু!

রাজা। আজ বসন্তপূর্ণিমার উৎসব।

সুরঙ্গমা। আমাকে কী কাজ করতে হবে।

রাজা। আজ তোমার সাজের দিন, কাজের দিন নয়। আজ আমার পুষ্পবনের আনন্দে তোমাকে যোগ দিতে হবে।

সুরঙ্গমা। তাই হবে প্রভু!

রাজা। রানী আজ আমাকে চোখে দেখতে চান।

সুরঙ্গমা। কোথায় দেখবেন।

রাজা। যেখানে পঞ্চমে বাঁশি বাজবে, ফুলের কেশরের ফাগ উড়বে, জ্যোৎস্নায় ছায়ায় গলাগলি হবে— সেই আমাদের দক্ষিণের কুঞ্জবনে।

সুরঙ্গমা। সে লুকোচুরির মধ্যে কি দেখা যাবে! সেখানে যে হাওয়া উতলা, সবই চঞ্চল। চোখে ধাঁদা লাগবে না?

রাজা। রানীর কৌতূহল হয়েছে।

সুরঙ্গমা। কৌতূহলের জিনিস হাজার হাজার আছে— তুমি কি তাদের সঙ্গে মিলে কৌতূহল মেটাবে। তুমি আমার তেমন রাজা নও। রানী, তোমার কৌতূহলকে শেষকালে কেঁদে ফিরে আসতে হবে।

গান

কোথা বাইরে দূরে যায় রে উড়ে হায় রে হায়,
তোমার চপল আঁখি বনের পাখি বনে পালায়।
আজি হৃদয়মাঝে যদি গো বাজে প্রেমের বাঁশি
তবে আপনি সেধে আপনা বেঁধে পরে সে ফাঁসি,
তবে ঘুচে গো ত্বরা ঘুরিয়া মরা হেথা হোথায়—
আহা, আজি সে আঁখি বনের পাখি বনে পালায়।
চেয়ে দেখিস না রে হৃদয়দ্বারে কে আসে যায়।
তোরা শুনিস কানে বারতা আনে দখিনবায়!
আজি ফুলের বাসে সুখের হাসে আকুল গানে
চির- বসন্ত যে তোমারি খোঁজে এসেছে প্রাণে।
তারে বাহিরে খুঁজি ঘুরিয়া বুঝি পাগলপ্রায়—
তোমার চপল আঁখি বনের পাখি বনে পালায়॥

২

পথ

প্রথম পথিক। ওগো মশায়!

প্রহরী। কেন গো।

দ্বিতীয়। রাস্তা কোথায়। আমরা বিদেশী, আমাদের রাস্তা বলে দাও।

প্রহরী। কিসের রাস্তা।

তৃতীয়। ঐ-যে শুনেছি আজ কোথায় উৎসব হবে। কোন্ দিক দিয়ে যাওয়া যাবে।

প্রহরী। এখানে সব রাস্তাই রাস্তা। যে দিক দিয়ে যাবে ঠিক পৌঁছবে। সামনে চলে যাও।

[প্রস্থান

প্রথম। শোনো একবার, কথা শোনো। বলে, সবই এক রাস্তা। তাই যদি হবে তবে এতগুলোর দরকার ছিল কী?

দ্বিতীয়। তা ভাই, রাগ করিস কেন। যে দেশের যেমন ব্যবস্থা! আমাদের দেশে তো রাস্তা নেই বললেই হয়— বাঁকাচোরা গলি, সে তো গোলকধাঁধা। আমাদের রাজা বলে, খোলা রাস্তা না থাকাই ভালো; রাস্তা পেলেই প্রজারা বেরিয়ে চলে যাবে। এ দেশে উলটো, যেতেও কেউ ঠেকায় না, আসতেও কেউ মানা করে না— তবু মানুষও তো ঢের দেখছি— এমন খোলা পেলে আমাদের রাজ্য উজাড় হয়ে যেত!

প্রথম। ওহে জনার্দন, তোমার ঐ একটা বড়ো দোষ।

জনার্দন। কী দোষ দেখলে।

প্রথম। নিজের দেশের তুমি বড়ো নিন্দে কর। খোলা রাস্তাটাই বুঝি ভালো হল? বলো তো ভাই কৌণ্ডিল্য, খোলা রাস্তাটাকে বলে কিনা ভালো।

কৌণ্ডিল্য। ভাই ভবদত্ত, বরাবরই তো দেখে আসছ জনার্দনের ঐ একরকম তেড়া বুদ্ধি। কোন্ দিন বিপদে পড়বেন— রাজার কানে যদি যায় তা হলে ম'লে ওঁকে শ্মশানে ফেলবার লোক খুঁজে পাবেন না।

ভবদত্ত। আমাদের তো ভাই এই খোলা রাস্তার দেশে এসে অবধি খেয়ে-শুয়ে সুখ নেই— দিনরাত গা-ঘিনঘিন করছে। কে আসছে কে যাচ্ছে তার কোনো ঠিক-ঠিকানাই নেই— রাম রাম!

কৌণ্ডিল্য। সেও তো ঐ জনার্দনের পরামর্শ শুনেই এসেছি। আমাদের গুষ্টিতে এমন কখনো হয় নি। আমার বাবাকে তো জান— কতবড়ো মহাত্মালোক ছিল— শাস্ত্রমতে ঠিক উনপঞ্চাশ হাত মেপে গণ্ডি কেটে তার মধ্যেই সমস্ত জীবনটা কাটিয়ে দিলে— একদিনের জন্যে তার বাইরে পা ফেলে নি। মৃত্যুর পর কথা উঠল, ঐ উনপঞ্চাশ হাতের মধ্যেই তো দাহ করতে হয়। সে এক বিষম মুশকিল। শেষকালে শাস্ত্রী বিধান দিলে যে, উনপঞ্চাশে যে দুটো অঙ্ক আছে তার বাইরে যাবার জো নেই, অতএব ঐ চার নয় উনপঞ্চাশকে উলটে নিয়ে নয়-চার চুরানব্বই করে দাও। তবেই তো তাকে বাড়ির বাইরে পোড়াতে পারি, নইলে ঘরেই দাহ করতে হত। বাবা, এত আঁটাআঁটি! এ কি যে-সে দেশ পেয়েছ!

ভবদত্ত। বটেই তো, মরতে গেলেও ভাবতে হবে, এ কি কম কথা!

কৌণ্ডিল্য। সেই দেশের মাটিতে শরীর, তবু জনার্দন বলে কিনা খোলা রাস্তাই ভালো!

[সকলের প্রস্থান

বালকগণকে লইয়া ঠাকুরদার প্রবেশ

ঠাকুরদা। ওরে, দক্ষিনে হাওয়ার সঙ্গে সমান পাল্লা দিতে হবে, হার মানলে চলবে না— আজ সব রাস্তাই গানে ভাসিয়ে দিয়ে চলব।

গান

আজি দখিনদুয়ার খোলা—
এসো হে, এসো হে, এসো হে আমার
বসন্ত এসো।
দিব হৃদয়দোলায় দোলা,
এসো হে, এসো হে, এসো হে, আমার
বসন্ত এসো।
নব শ্যামল শোভন রথে
এসো বকুলবিছানো পথে,

এসো বাজায়ে ব্যাকুল বেণু
মেখে পিয়ালফুলের রেণু—
এসো হে, এসো হে, এসো হে, আমার
বসন্ত এসো।
এসো ঘনপল্লবপুঞ্জে—
এসো হে, এসো হে, এসো হে।
এসো বনমল্লিকাকুঞ্জে
এসো হে, এসো হে, এসো হে।
মৃদু মধুর মদির হেসে
এসো পাগল হাওয়ার দেশে,
তোমার উতলা উত্তরীয়
তুমি আকাশে উড়ায়ে দিয়ো—
এসো হে, এসো হে, এসো হে, আমার
বসন্ত এসো ॥

[সকলের প্রস্থান

নাগরিকদল

প্রথম। যা বলিস ভাই, আজকের দিনটাতে আমাদের রাজার দেখা দেওয়া উচিত ছিল। তার রাজ্যে বাস করছি, একদিনও তাকে দেখলুম না, এ কি কম দুঃখের কথা।

দ্বিতীয়। ওর ভিতরকার কথাটা তোরা কেউ জানিস নে। কাউকে যদি না বলিস তো বলি।

প্রথম। এক পাড়াতেই তো বসত করছি; কবে কার কথা কাকে বলেছি। ঐ-যে তোমাদের রাহুকদাদা কুয়ো খুঁড়তে খুঁড়তে গুপ্তধন পেলে, সে কি আমি সাধ করে ফাঁস করেছি। সব তো জান।

দ্বিতীয়। জানি বৈকি, সেইজন্যেই তো বলছি— কথাটা যদি চেপে রাখতে পার তো বলি, নইলে বিপদ ঘটতে পারে।

তৃতীয়। তুমিও তো আচ্ছা লোক হে বিরূপাক্ষ! বিপদই যদি ঘটতে পারে তবে ঘটাবার জন্যে অত ব্যস্ত হও কেন। কে তোমার কথাটা নিয়ে দিনরাত্রি সামলে বেড়ায়।

বিরূপাক্ষ। কথাটা উঠে পড়ল নাকি সেইজন্যেই— তা বেশ, নাই বললেম। আমি বাজে কথা বলবার লোকই নই। রাজা দেখা দেন না সে কথাটা তোমরাই তুললে— তাই তো আমি বললেম, সাধে দেখা দেন-না।

প্রথম। ওহে বিরূপাক্ষ, বলেই ফেলো-না।

বিরূপাক্ষ। তা, তোমাদের কাছে বলতে দোষ নেই, তোমরা হলে বন্ধু-মানুষ। (মৃদুস্বরে) রাজাকে দেখতে বড়ো বিকট, সেইজন্যে পণ করেছে কাউকে দেখা দেবে না।

প্রথম। তাই তো বটে। আমরা বলি, ভালো রে ভালো, সকল দেশেই রাজাকে দেখে দেশসুদ্ধ লোকের আত্মাপুরুষ বাঁশপাতার মতো হী হী করে কাঁপতে থাকে, আর আমাদেরই রাজাকে দেখা যায় না কেন। কিছু না হোক, একবার যদি চোখ পাকিয়ে বলে 'বেটার শির লেও' তা হলেও যে বুঝি রাজা বলে একটা-কিছু আছে। বিরূপাক্ষের কথাটা মনে নিচ্ছে হে।

তৃতীয়। কিচ্ছু মনে নিচ্ছে না। ওর সিকি পয়সাও বিশ্বাস করি নে।

বিরূপাক্ষ। কী বললে হে বিশু! তুমি বলতে চাও আমি মিছে কথা বলেছি?

বিশ্ববসু। তা বলতে চাই নে, কিন্তু কথাটা তাই বলে মানতে পারব না— এতে রাগই কর আর যাই কর।

বিরূপাক্ষ। তুমি মানবে কেন। তুমি তোমার বাপখুড়োকেই মান না, এত বুদ্ধি তোমার। এ রাজত্বে

রাজা যদি গা ঢাকা দিয়ে না বেড়াত তা হলে কি এখানে তোমার ঠাঁই হত। তুমি তো নাস্তিক বললেই হয়।

বিশ্ববসু। ওহে আস্তিক, অন্য রাজার দেশ হলে তোমার জিভ কেটে কুকুরকে দিয়ে খাওয়াত, তুমি বল কিনা আমাদের রাজাকে বিকট দেখতে!

বিরূপাক্ষ। দেখো বিশু, মুখ সামলে কথা কও।

বিশ্ববসু। মুখ যে কার সামলানো দরকার সে আর বলে কাজ নেই।

প্রথম। চুপ চুপ, এ-সব ভালো হচ্ছে না। আমাকে সুদ্ধ বিপদে ফেলবে দেখছি। আমি এ-সব কথার মধ্যে নেই।

[সকলের প্রস্থান

ঠাকুরদাকে একদল লোকের টানাটানি করিয়া লইয়া প্রবেশ

প্রথম। ঠাকুরদা, তোমাকে আজ এমন করে সাজালে কে। মালাটি কোন্ নিপুণ হাতের গাঁথা।

ঠাকুরদা। ওরে বোকারা, সব কথাই কি খোলসা করে বলতে হবে নাকি। কিছু ঢাকা থাকবে না?

দ্বিতীয়। দরকার নেই দাদা, তোমার তো সব ফাঁস হয়েই আছে। আমাদের কবিকেশরী তোমার নামে যে গান বেঁধেছে শোন নি বুঝি? সে যে ঘরে ঘরে রটে গেছে।

ঠাকুরদা। একটা ঘরই যথেষ্ট, ঘরে ঘরে শুনে বেড়াবার কি সময় আছে।

তৃতীয়। ওটা তোমার নেহাত ফাঁকা বড়াই। ঠাকরুনদিদি তোমাকে আঁচলে বেঁধে রাখে বটে। পাড়ার যেখানে যাই সেখানেই তুমি, ঘরে থাক কখন।

ঠাকুরদা। ওরে, তোদের ঠাকরুনদিদির আঁচল লম্বা আছে। পাড়ার যেখানে যাই সে আঁচল ছাড়িয়ে যাবার জো নেই। তা, কবি কী বলছেন শুনি।

তৃতীয়। তিনি বলছেন—

গান

যেখানে রূপের প্রভা নয়নলোভা
সেখানে তোমার মতন ভোলা কে— ঠাকুরদাদা!
যেখানে রসিক-সভা পরম শোভা
সেখানে এমন রসের ঝোলা কে— ঠাকুরদাদা!

ঠাকুরদা। আরে চুপ চুপ! এমন বসন্তের দিনে তোরা এ কী গান ধরলি রে!

প্রথম। কেন ধরলুম জান না?—

যেখানে গলাগলি কোলাকুলি
তোমারি বেচাকেনা সেই হাটে,
পড়ে না পদধূলি পথ ভুলি
যেখানে ঝগড়া করে ঝগড়াটে।
যেখানে ভোলাভুলি খোলাখুলি
সেখানে তোমার মতন খোলা কে— ঠাকুরদাদা!

ঠাকুরদা। যদি তোরা তোদের সেই কবির কাছে বিধান নিতিস তা হলে শুনতে পেতিস, এই ফাল্গুন মাসের দিনে ঠাকুরদা প্রভৃতি পুরোনো জিনিস মাত্রই একেবারে বর্জনীয়। আমার নামে গান বেঁধে আজ রাগ-রাগিণীর অপব্যয় করিস নে, তোরা সরস্বতীর বীণার তারে মরচে ধরিয়ে দিবি যে।

দ্বিতীয়। ঠাকুরদা, তুমি তো রাস্তাতেই সভা জমালে, উৎসবে যাবে কখন। চলো আমাদের দক্ষিণ-বনে।

ঠাকুরদা। ভাই, আমার ঐ দশা, আমি রাস্তা থেকেই চাখতে চাখতে চলি, তার পরে ভোজটা তো আছেই। আদাবন্তে চ মধ্যে চ।

দ্বিতীয়। দেখো দাদা, আজকের দিনে মনে একটা কথা বড়ো লাগছে।

ঠাকুরদা। কী বল্‌ দেখি।

দ্বিতীয়। এবার দেশবিদেশের লোক এসেছে। সবাই বলছে, সবই দেখছি ভালো, কিন্তু রাজা দেখি নে কেন। কাউকে জবাব দিতে পারি নে। আমাদের দেশে ঐটে একটা বড়ো ফাঁকা রয়ে গেছে।

ঠাকুরদা। ফাঁকা! আমাদের দেশে রাজা এক জায়গায় দেখা দেয় না বলেই তো সমস্ত রাজ্যটা একেবারে রাজায় ঠাসা হয়ে রয়েছে— তাকে বল ফাঁকা! সে যে আমাদের সবাইকেই রাজা করে দিয়েছে! এই-যে অন্য রাজাগুলো, তারা তো উৎসবটাকে দ'লে ম'লে ছারখার করে দিলে— তাদের হাতি-ঘোড়া লোক-লশকরের তাড়ায় দক্ষিণ-হাওয়ার দাক্ষিণ্য আর রইল না, বসন্তর যেন দম আটকাবার জো হয়েছে। কিন্তু আমাদের রাজা নিজে জায়গা জোড়ে না, সবাইকে জায়গা ছেড়ে দেয়। কবিকেশরীর সেই গানটা তো জানিস।

গান

আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে,
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে।—
আমরা সবাই রাজা।
আমরা যা খুশি তাই করি,
তবু তাঁর খুশিতেই চরি,
আমরা নই বাঁধা নই দাসের রাজার ত্রাসের দাসত্বে,
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে।—
আমরা সবাই রাজা।
রাজা সবারে দেন মান,
সে মান আপনি ফিরে পান,
মোদের খাটো করে রাখে নি কেউ কোনো অসত্যে,
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে।—
আমরা সবাই রাজা।
আমরা চলব আপন মতে,
শেষে মিলব তারি পথে।
মোরা মরব না কেউ বিফলতার বিষম আবর্তে,
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে।—
আমরা সবাই রাজা॥

তৃতীয়। কিন্তু দাদা, যা বল, তাঁকে দেখতে পায় না বলে লোকে অনায়াসে তাঁর নামে যা খুশি বলে সেইটে অসহ্য হয়।

প্রথম। এই দেখো-না, আমাকে গাল দিলে শাস্তি আছে, কিন্তু রাজাকে গাল দিলে কেউ তার মুখ বন্ধ করবারই নেই।

ঠাকুরদা। ওর মানে আছে। প্রজার মধ্যে যে রাজাটুকু আছে তারই গায়ে আঘাত লাগে, তার বাইরে যিনি তাঁর গায়ে কিছুই বাজে না। সূর্যের যে তেজ প্রদীপে আছে তাতে ফুঁটুকু সয় না, কিন্তু হাজার লোকে মিলে সূর্যে ফুঁ দিলে সূর্য অম্লান হয়েই থাকেন।

বিশ্ববসু ও বিরূপাক্ষের প্রবেশ

বিশ্ববসু। এই-যে ঠাকুরদা, এই দেখো, এই লোকটা রটিয়ে বেড়াচ্ছে— আমাদের রাজাকে কুৎসিত দেখতে, তাই তিনি দেখা দেন না।

ঠাকুরদা। এতে রাগ কর কেন বিশু। ওর রাজা কুৎসিত বৈকি, নইলে তার রাজ্যে বিরূপাক্ষের মতো অমন চেহারা থাকে কেন। স্বয়ং ওর বাপ-মা'ও তো ওকে কার্তিক নাম দেন নি। ও আয়নাতে যেমন আপনার মুখটি দেখে, আর রাজার চেহারা তেমনি ধ্যান করে।

বিরূপাক্ষ। ঠাকুরদা, আমি নাম করব না, কিন্তু এমন লোকের কাছে খবরটা শুনেছি যাকে বিশ্বাস না করে থাকবার জো নেই।

ঠাকুরদা। নিজের চেয়ে কাকে বেশি বিশ্বাস করবে বলো।

বিরূপাক্ষ। না, আমি তোমাকে প্রমাণ করে দিতে পারি।

প্রথম। লোকটার লজ্জা নেই হে। একে তো যা না বলবার তাই বলে, তার পরে আবার সেটা প্রমাণ করে দিতে চায়!

দ্বিতীয়। ওহে, দাও-না ওকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে একেবারে মাটি-প্রমাণ করে দাও না।

ঠাকুরদা। আরে ভাই, রাগ কোরো না। ওর রাজা কুৎসিত এই বলে বেড়িয়েই ও বেচারা আজ উৎসব করতে বেরিয়েছিল। যাও ভাই বিরূপাক্ষ, ঢের লোক পাবে যারা তোমার কথা বিশ্বাস করবে, তাদের নিয়ে দল বেঁধে আজ আমোদ করো গে।

[সকলের প্রস্থান

বিদেশী দলের পুনঃপ্রবেশ

কৌণ্ডিল্য। সত্যি বলছি ভাই, রাজা আমাদের এমনি অভ্যেস হয়ে গেছে যে এখানে কোথাও রাজা না দেখে মনে হচ্ছে দাঁড়িয়ে আছি, কিন্তু পায়ের তলায় যেন মাটি নেই!

ভবদত্ত। দেখো ভাই কৌণ্ডিল্য, আসল কথাটা হচ্ছে এদের মূলেই রাজা নেই। সকলে মিলে একটা গুজব রটিয়ে রেখেছে।

কৌণ্ডিল্য। আমারও তো তাই মনে হয়েছে। আমরা তো জানি দেশের মধ্যে সকলের চেয়ে বেশি করে চোখে পড়ে রাজা— নিজেকে খুব কষে না দেখিয়ে তো ছাড়ে না।

জনার্দন। কিন্তু এ রাজ্যে আগাগোড়া যেমন নিয়ম দেখছি, রাজা না থাকলে তো এমন হয় না।

ভবদত্ত। এতকাল রাজার দেশে বাস করে এই বুদ্ধি হল তোমার! নিয়মই যদি থাকবে তা হলে রাজা থাকবার আর দরকার কী।

জনার্দন। এই দেখো-না, আজ এত লোক মিলে আনন্দ করছে, রাজা না থাকলে এরা এমন করে মিলতেই পারত না।

ভবদত্ত। ওহে জনার্দন, আসল কথাটাই যে তুমি এড়িয়ে যাচ্ছ। একটা নিয়ম আছে সেটা তো দেখছি, উৎসব হচ্ছে সেটাও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, সেখানে তো কোনো গোল বাধছে না— কিন্তু রাজা কোথায়, তাকে দেখলে কোথায় সেইটে বলো।

জনার্দন। আমার কথাটা হচ্ছে এই যে, তোমরা তো এমন রাজ্য জান যেখানে রাজা কেবল চোখেই দেখা যায়, কিন্তু রাজ্যের মধ্যে তার কোনো পরিচয় নেই; সেখানে কেবল ভূতের কীর্তন— কিন্তু এখানে দেখো—

কৌণ্ডিল্য। আবার ঘুরে ফিরে সেই একই কথা। তুমি ভবদত্তর আসল কথাটার উত্তর দাও-না হে— হাঁ কি না, রাজাকে দেখেছ কি দেখ নি।

ভবদত্ত। রেখে দাও ভাই কৌণ্ডিল্য। ওর সঙ্গে মিথ্যে বকাবকি করা। ওর ন্যায়শাস্ত্রটা পর্যন্ত এ-দেশী রকমের হয়ে উঠছে। বিনা-চক্ষে ও যখন দেখতে শুরু করেছে তখন আর ভরসা নেই। বিনা-অন্নে কিছুদিন ওকে আহার করতে দিলে আবার বুদ্ধিটা সাধারণ লোকের মতো পরিষ্কার হয়ে আসতে পারে।

[সকলের প্রস্থান

বাউলের দল

আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে,
তাই হেরি তায় সকল খানে।
আছে সে নয়ন-তারায় আলোক-ধারায়, তাই না হারায়—
ওগো তাই দেখি তায় যেথায় সেথায়
তাকাই আমি যে দিক -পানে।
আমি তার মুখের কথা
শুনব বলে গেলাম কোথা,
শোনা হল না, শোনা হল না।
আজ ফিরে এসে নিজের দেশে
এই-যে শুনি,
শুনি তাহার বাণী আপন গানে।
কে তোরা খুঁজিস তারে
কাঙাল-বেশে দ্বারে দ্বারে,
দেখা মেলে না, মেলে না।
ও তোরা আয় রে ধেয়ে, দেখ্ রে চেয়ে
আমার বুকে—
ওরে দেখ্ রে আমার দুই নয়ানে ॥

[প্রস্থান

একদল পদাতিক

প্রথম পদাতিক। সরে যাও সব, সবে যাও। তফাত যাও।

প্রথম পথিক। ইস, তাই তো ! মস্ত লোক বটে। লম্বা পা ফেলে চলছেন। কেন রে বাপু, সরব কেন। আমরা সব পথের কুকুর নাকি।

দ্বিতীয় পদাতিক। আমাদেব রাজা আসছেন।

দ্বিতীয় পথিক। রাজা ? কোথাকার রাজা।

প্রথম পদাতিক। আমাদের এই দেশের রাজা।

প্রথম পথিক। লোকটা পাগল হল নাকি। আমাদের দেশের রাজা পাইক নিয়ে হাঁকতে হাঁকতে আবার রাস্তায় কবে বেরোয়।

দ্বিতীয় পদাতিক। মহারাজ আজ আর গোপন থাকবেন না, তিনি স্বয়ং আজ উৎসব করবেন।

দ্বিতীয় পথিক। সত্যি নাকি ভাই।

দ্বিতীয় পদাতিক। ঐ দেখো-না, নিশেন উড়ছে।

দ্বিতীয় পথিক। তাই তো রে, ওটা নিশেনই তো বটে।

দ্বিতীয় পদাতিক। নিশেনে কিংশুক ফুল আঁকা আছে দেখছ না ?

দ্বিতীয় পথিক। ওরে, কিংশুক ফুলই তো বটে। মিথ্যে বলে নি, একেবারে লাল টক্‌টক্ করছে।

প্রথম পদাতিক। তবে ! কথাটা যে বড়ো বিশ্বাস হল না !

দ্বিতীয় পথিক। না দাদা, আমি তো অবিশ্বাস করি নি। ঐ কুম্ভই গোলমাল করেছিল। আমি একটি কথাও বলি নি।

প্রথম পদাতিক। বেটা বোধ হয় শূন্যকুম্ভ, তাই আওয়াজ বেশি।

দ্বিতীয় পদাতিক। লোকটা কে হে। তোমাদের কে হয়।

দ্বিতীয় পথিক। কেউ না, কেউ না। আমাদের গ্রামের যে মোড়ল ও তার খুড়শ্বশুর— অন্য পাড়ায় বাড়ি।

দ্বিতীয় পদাতিক। হাঁ হাঁ, খুড়শ্বশুর-গোছের চেহারা বটে, বুদ্ধিটাও নেহাত খুড়শ্বশুরে ধাঁচার।

কুম্ভ। অনেক দুঃখে বুদ্ধিটা এইরকম হয়েছে। এই-যে সেদিন কোথা থেকে এক রাজা বেরোল, নামের গোড়ায় তিন-শো-পঁয়তাল্লিশটা শ্রী লাগিয়ে ঢাক পিটোতে পিটোতে শহর ঘুরে বেড়ালো— আমি তার পিছনে কি কম ফিরেছি। কত ভোগ দিলেম, কত সেবা করলেম, ভিটেমাটি বিকিয়ে যাবার জো হল। শেষকালে তার রাজাগিরি রইল কোথায়। লোকে যখন তার কাছে তালুক চায়, মুলকু চায়, সে তখন পাঁজিপুঁথি খুলে শুভদিন কিছুতেই খুঁজে পায় না। কিন্তু আমাদের কাছে খাজনা নেবার বেলায় মঘা অশ্লেষা ত্র্যস্পর্শ কিছুই তো বাধত না!

দ্বিতীয় পদাতিক। হাঁ হে কুম্ভ, আমাদের রাজাকে তুমি সেইরকম মেকি রাজা বলতে চাও!

প্রথম পদাতিক। ওহে খুড়শ্বশুর, এবার খুড়শাশুড়ির কাছে থেকে বিদায় নিয়ে এসো গে, আর দেরি নেই।

কুম্ভ। না বাবা, রাগ কোরো না। আমি কান মলছি, নাকে খত দিচ্ছি— যতদূর সরতে বল ততদূরই সরে দাঁড়াতে রাজি আছি।

দ্বিতীয় পদাতিক। আচ্ছা বেশ, এইখানে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকো। রাজা এলেন বলে। আমরা এগিয়ে গিয়ে রাস্তা ঠিক করে রাখি।

[পদাতিকদের প্রস্থান

দ্বিতীয় পথিক। কুম্ভ, তোমার ঐ মুখের দোষেই তুমি মরবে।

কুম্ভ। না ভাই মাধব, ও মুখের দোষ নয়, ও কপালের দোষ। যে বারে মিছে রাজা বেরোল একটি কথাও কই নি, অত্যন্ত ভালোমানুষের মতো নিজের সর্বনাশ করেছি; আর এবার হয়তো-বা সত্যি রাজা বেরিয়েছে, তাই বেফাঁস কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। ওটা কপাল।

মাধব। আমি এই বুঝি, রাজা সত্যি হোক মিথ্যে হোক মেনে চলতেই হবে। আমরা কি রাজা চিনি যে বিচার করব! অন্ধকারে ঢেলা মারা— যত বেশি মারবে একটা-না-একটা লেগে যাবে। আমি ভাই এক-ধাব থেকে গড় করে যাই— সত্যি হলে লাভ; মিথ্যে হলেই-বা লোকসান কী।

কুম্ভ। ঢেলাগুলো নেহাত ঢেলা হলে ভাবনা ছিল না— দামি জিনিস— বাজে খরচ কবতে গিয়ে ফতুর হতে হয়।

মাধব। ঐ-যে আসছেন রাজা। আহা, রাজার মতো রাজা বটে! কী চেহারা! যেন ননির পুতুল। কেমন হে কুম্ভ, এখন কী মনে হচ্ছে।

কুম্ভ। দেখাচ্ছে ভালো— কী জানি ভাই, হতে পারে।

মাধব। ঠিক যেন রাজাটি গড়ে রেখেছে। ভয় হয় পাছে রোদ্দুর লাগলে গলে যায়।

রাজবেশধারীর প্রবেশ

মাধব। জয় মহারাজের! দর্শনের জন্যে সকাল থেকে দাঁড়িয়ে। দয়া রাখবেন।

কুম্ভ। বড়ো ধাঁদা ঠেকছে, ঠাকুরদাকে ডেকে আনি।

[প্রস্থান

আর-এক দল পথিক

প্রথম পথিক। ওরে, রাজা রে, রাজা! দেখবি আয়।

দ্বিতীয় পথিক। মনে রেখো রাজা, আমি কুশলীবস্তুর উদয়দত্তর নাতি। আমার নাম বিরাজদত্ত। রাজা বেরিয়েছে শুনেই ছুটেছি, লোকের কারও কথায় কান দিই নি— আমি সকলের আগে তোমাকে মেনেছি।

তৃতীয় পথিক। শোনো একবার, আমি যে ভোর থেকে এখানে দাঁড়িয়ে— তখনো কাক ডাকে নি— এতক্ষণ ছিলে কোথায়। রাজা, আমি বিক্রমস্থলীর ভদ্রসেন, ভক্তকে স্মরণ রেখো।

রাজবেশী। তোমাদের ভক্তিতে বড়ো প্রীত হলেম।

বিরাজদত্ত। মহারাজ, আমাদের অভাব বিস্তর। এতদিন দর্শন পাই নি, জানাব কাকে?

রাজবেশী। তোমাদের সমস্ত অভাব মিটিয়ে দেব। [প্রস্থান

প্রথম পথিক। ওরে, পিছিয়ে থাকলে চলবে না— ভিড়ে মিশে গেলে রাজার চোখে পড়ব না।

দ্বিতীয় পথিক। দেখ্ দেখ্, একবার নরোত্তমের কাণ্ডখানা দেখ্। আমরা এত লোক আছি— সবাইকে ঠেলেঠুলে কোথা থেকে এক তালপাতার পাখা নিয়ে রাজাকে বাতাস করতে লেগে গেছে।

মাধব। তাই তো হে, লোকটার আস্পর্ধা তো কম নয়!

দ্বিতীয় পথিক। ওকে জোর করে ধরে সরিয়ে দিতে হচ্ছে— ও কি রাজার পাশে দাঁড়াবার যুগ্যি।

মাধব। ওহে, রাজা কি আর এটুকু বুঝবে না? এ যে অতিভক্তি।

প্রথম পথিক। না হে না, রাজারা বোঝে না কিছু। হয়তো ঐ তালপাখার হাওয়া খেয়েই ভুলবে।

[সকলের প্রস্থান

ঠাকুরদাকে লইয়া কুম্ভের প্রবেশ

কুম্ভ। এখনই এই রাস্তা দিয়েই যে গেল।

ঠাকুরদা। রাস্তা দিয়ে গেলেই রাজা হয় নাকি রে।

কুম্ভ। না দাদা, একেবারে স্পষ্ট চোখে দেখা গেল— একজন না, দুজন না, রাস্তার দু ধারের লোক তাকে দেখে নিয়েছে।

ঠাকুরদা। সেইজন্যেই তো সন্দেহ। কবে আমার রাজা রাস্তার লোকের চোখ ধাঁদিয়ে বেড়ায়! এমন উৎপাত তো কোনোদিন করে না।

কুম্ভ। তা, আজকে যদি মর্জি হয়ে থাকে বলা যায় কি।

ঠাকুরদা। বলা যায় রে, বলা যায়। আমার রাজার মর্জি বরাবর ঠিক আছে, ঘড়ি-ঘড়ি বদলায় না।

কুম্ভ। কিন্তু কী বলব দাদা— একেবারে ননির পুতুলটি। ইচ্ছে করে, সর্বাঙ্গ দিয়ে তাকে ছায়া করে রাখি।

ঠাকুরদা। তোর এমন বুদ্ধি কবে হল। আমার রাজা ননির পুতুল, আর তুই তাকে ছায়া করে রাখবি!

কুম্ভ। যা বল দাদা, দেখতে বড়ো সুন্দর। আজ তো এত লোক জুটেছে, অমনটি কাউকে দেখলুম না।

ঠাকুরদা। আমার রাজা যদি-বা দেখা দিত তোদের চোখেই পড়ত না। দশের সঙ্গে তাকে আলাদা বলে চেনাই যায় না— সে সকলের সঙ্গেই মিশে যায় যে।

কুম্ভ। ধ্বজা দেখতে পেলুম যে গো।

ঠাকুরদা। ধ্বজায় কী দেখলি।

কুম্ভ। কিংশুক ফুল আঁকা— একেবারে চোখ ঠিকরে যায়।

ঠাকুরদা। আমার রাজার ধ্বজায় পদ্মফুলের মাঝখানে বজ্র আঁকা।

কুম্ভ। লোকে বলে, এই উৎসবে রাজা বেরিয়েছে।

ঠাকুরদা। বেরিয়েছে বৈকি। কিন্তু সঙ্গে পাইক নেই, বাদ্যি নেই, আলো নেই, কিছু না।

কুম্ভ। কেউ বুঝি ধরতেই পারে না।

ঠাকুরদা। হয়তো কেউ কেউ পারে।

কুম্ভ। যে পারে সে বোধ হয় যা চায় তাই পায়।

ঠাকুরদা। সে যে কিচ্ছু চায় না। ভিক্ষুকের কর্ম নয় রাজাকে চেনা। ছোটো ভিক্ষুক বড়ো ভিক্ষুককেই রাজা বলে মনে করে বসে। আজ যে লোকটা গা-ভরা গয়না পরে রাস্তার দুই ধারের লোকের দুই চক্ষুর কাছে ভিক্ষে চেয়ে বেড়িয়েছে, তোরা লোভীরা তাকেই রাজা বলে ঠাউরে বসে আছিস!— ঐ-যে আমার পাগলা আসছে। আয় ভাই, আয়— আর তো বাজে বকতে পারি নে— একটু মাতামাতি করে নেওয়া যাক।

পাগলের প্রবেশ ও গান

তোরা যে যা বলিস ভাই,
আমার সোনার হরিণ চাই।
সেই মনোহরণ চপল-চরণ
সোনার হরিণ চাই।
সে যে চমকে বেড়ায়, দৃষ্টি এড়ায়,
যায় না তারে বাঁধা।
তার নাগাল পেলে পালায় ঠেলে,
লাগায় চোখে ধাঁদা।
তবু ছুটব পিছে মিছে মিছে
পাই বা নাহি পাই—
আমি আপন-মনে মাঠে বনে
উধাও হয়ে ধাই।
তোরা পাবার জিনিস হাটে কিনিস,
রাখিস ঘরে ভরে।
যাহা যায় না পাওয়া তারি হাওয়া
লাগল কেন মোরে।
আমার যা ছিল তা দিলেম কোথা
যা নেই তারি ঝোঁকে।
আমার ফুরোয় পুঁজি, ভাবিস বুঝি
মরি তাহার শোকে!
ওরে, আছি সুখে হাস্যমুখে,
দুঃখ আমার নাই।
আমি আপন-মনে মাঠে বনে
উধাও হয়ে ধাই॥

৩

কুঞ্জবনের দ্বারে

ঠাকুরদা ও উৎসববালকগণ

ঠাকুরদা। ওরে, দরজার কাছে এসেছি, এবার খুব কষে দরজায় ঘা লাগা।

গান

আজি কমলমুকুলদল খুলিল!
দুলিল রে দুলিল!
মানসসরসে রসপুলকে
পলকে পলকে ঢেউ তুলিল।
গগন মগন হল গন্ধে,
সমীরণ মূর্ছে আনন্দে,
গুন গুন গুঞ্জনছন্দে

মধুকর ঘিরি ঘিরি বন্দে—
নিখিলভুবনমন ভুলিল,
মন ভুলিল রে
মন ভুলিল ॥

[প্রস্থান

অবন্তী কোশল কাঞ্চী প্রভৃতি রাজগণ

অবন্তী। এখানকার রাজা কি আমাদেরও দেখা দেবে না।

কাঞ্চী। এর রাজত্ব করবার প্রণালী কিরকম! রাজার বনে উৎসব, সেখানেও সাধারণ লোকের কারও কোনো বাধা নেই?

কোশল। আমাদের জন্যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জায়গা তৈরি করে রাখা উচিত ছিল।

কাঞ্চী। জোর করে নিজেরা তৈরি করে নেব।

কোশল। এই-সব দেখেই সন্দেহ হয় এখানে রাজা নেই, একটা ফাঁকি চলে আসছে।

অবন্তী। ওহে, তা হতে পারে। কিন্তু এখানকার মহিষী সুদর্শনা নিতান্ত ফাঁকি নয়।

কোশল। সেই লোভেই তো এসেছি। যিনি দেখা দেন না তাঁর জন্যে আমার বিশেষ ঔৎসুক্য নেই, কিন্তু যিনি দেখবার যোগ্য তাঁকে না দেখে ফিরে গেলে ঠকতে হবে।

কাঞ্চী। একটা ফন্দি দেখাই যাক-না।

অবন্তী। ফন্দি জিনিসটা খুব ভালো, যদি তার মধ্যে নিজে আটকা না পড়া যায়।

কাঞ্চী। এ কী ব্যাপার! নিশেন উড়িয়ে এ দিকে কে আসে! এ কোথাকার রাজা।

পদাতিকগণের প্রবেশ

কাঞ্চী। তোমাদের রাজা কোথাকার।

প্রথম পদাতিক। এই দেশের। তিনি আজ উৎসব করতে বেরিয়েছেন।

[প্রস্থান

কোশল। একি কথা! এখানকার রাজা বেরিয়েছে!

অবন্তী। তাই তো, তা হলে এঁকে দেখেই ফিরতে হবে— অন্য দর্শনীয়টা রইল।

কাঞ্চী। শোন কেন। এখানে রাজা নেই বলেই যে-খুশি নির্ভাবনায় আপনাকে রাজা বলে পরিচয় দেয়। দেখছ-না, যেন সেজে এসেছে— অত্যন্ত বেশি সাজ।

অবন্তী। কিন্তু লোকটাকে দেখাচ্ছে ভালো, চোখ ভোলাবার মতো চেহারাটা আছে।

কাঞ্চী। চোখ ভুলতে পারে, কিন্তু ভালো করে তাকালেই ভুল থাকে না। আমি তোমাদের সামনেই ওর ফাঁকি ধরে দিচ্ছি।

রাজবেশীর প্রবেশ

রাজবেশী। রাজগণ, স্বাগত। এখানে তোমাদের অভ্যর্থনার কোনো ত্রুটি হয় নি তো?

রাজগণ। (কপট বিনয়ে নমস্কার করিয়া) কিছু না।

কাঞ্চী। যে অভাব ছিল তা মহারাজের দর্শনেই পূর্ণ হয়েছে।

রাজবেশী। আমি সাধারণের দর্শনীয় নই, কিন্তু তোমরা আমার অনুগত এইজন্য একবার দেখা দিতে এলুম।

কাঞ্চী। অনুগ্রহের এত আতিশয্য সহ্য করা কঠিন।

রাজবেশী। আমি অধিকক্ষণ থাকব না।

কাঞ্চী। সেটা অনুভবেই বুঝেছি; বেশিক্ষণ স্থায়ী হবার ভাব দেখছি নে।

রাজবেশী। ইতিমধ্যে যদি কোনো প্রার্থনা থাকে—

কাঞ্চী। আছে বৈকি। কিন্তু অনুচরদের সামনে জানাতে লজ্জা বোধ করি।

রাজবেশী। (অনুবর্তীদের প্রতি) ক্ষণকালের জন্য তোমরা দূরে যাও। এইবার তোমাদের প্রার্থনা অসংকোচে জানাতে পার।

কাঞ্চী। অসংকোচেই জানাব— তোমারও যেন লেশমাত্র সংকোচ না হয়।

রাজবেশী। না, সে আশঙ্কা কোরো না।

কাঞ্চী। এসো তবে— মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে আমাদের প্রত্যেককে প্রণাম করো।

রাজবেশী। বোধ হচ্ছে, আমার ভৃত্যগণ বারুণী মদ্যটা রাজশিবিরে কিছু মুক্তহস্তেই বিতরণ করেছে।

কাঞ্চী। ভণ্ডরাজ, মদ যাকে বলে সেটা তোমার ভাগেই অতিমাত্রায় পড়েছে, সেইজন্যেই এখন ধুলোয় লোটাবার অবস্থা হয়েছে।

রাজবেশী। রাজগণ, পরিহাসটা রাজোচিত নয়।

কাঞ্চী। পরিহাসের অধিকার যাদের আছে তারা নিকটেই প্রস্তুত আছে। সেনাপতি!

রাজবেশী। আর প্রয়োজন নেই। স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি আপনারা আমার প্রণম্য। মাথা আপনিই নত হচ্ছে, কোনো তীক্ষ্ণ উপায়ে তাকে ধুলায় টানার দরকার হবে না। আপনারা যখন আমাকে চিনেছেন তখন আমিও আপনাদের চিনে নিলুম। অতএব এই আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। যদি দয়া করে পালাতে দেন তা হলে বিলম্ব করব না।

কাঞ্চী। পালাবে কেন। তোমাকেই আমরা এখানকার রাজা করে দিচ্ছি— পরিহাসটা শেষ করেই যাওয়া যাক। দলবল কিছু আছে?

রাজবেশী। আছে। রাস্তার লোক যে দেখছে আমার পিছনে ছুটে আসছে। আরম্ভে যখন আমার দল বেশি ছিল না তখন সবাই আমাকে সন্দেহ করছিল, লোক যত বেড়ে গেল সন্দেহ ততই দূর হল। এখন ভিড়ের লোক নিজেদের ভিড় দেখেই মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে, আমাকে কোনো কষ্ট পেতে হচ্ছে না।

কাঞ্চী। বেশ কথা। এখন থেকে আমরা তোমার সাহায্য করব। কিন্তু তোমাকে আমাদেরও একটা কাজ করে দিতে হবে।

রাজবেশী। আপনাদের দত্ত আদেশ এবং মুকুট আমি মাথায় করে রাখব।

কাঞ্চী। আপাতত আর কিছু চাই নে, রানী সুদর্শনাকে দেখতে চাই। সেইটে তোমাকে করে দিতে হবে।

রাজবেশী। যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি হবে না।

কাঞ্চী। তোমার সাধ্যের উপর ভরসা নেই, আমাদের বুদ্ধিমত চলতে হবে। আচ্ছা, এখন তুমি কুঞ্জে প্রবেশ করে রাজ-আড়ম্বরে উৎসব করো গে।

[রাজগণ ও রাজবেশীব প্রস্থান

ঠাকুরদা ও কুম্ভের প্রবেশ

কুম্ভ। ঠাকুরদা, তোমার কথা আমি তেমন বুঝি নে, কিন্তু তোমাকে বুঝি। তা, আমার রাজায় কাজ নেই, তোমার পাছেই রয়ে গেলুম। কিন্তু ঠকলুম না তো?

ঠাকুরদা। আমাকে নিয়েই যদি সম্পূর্ণ চলে তা হলে ঠকলি নে, আমার চেয়ে বেশি যদি কিছু দরকার থাকে তা হলে ঠকলি বৈকি।

কুম্ভ। ঠাকুরদা, উৎসব শুরু হয়েছে, এবার ভিতরে চলো।

ঠাকুরদা। না রে, আগে দ্বারের কাজটা সেরে নিই, তার পরে ভিতরে। এখানে সকল আগন্তুকের সঙ্গে একবার মিলে নিতে হবে। ঐ আমার অকিঞ্চনের দল আসছে।

অকিঞ্চনের দল। ঠাকুরদা, তোমাকে খুঁজে আজ আমাদের দেরি হয়ে গেল।

ঠাকুরদা। আজ আমি দ্বারে, আজ আমাকে অন্য জায়গায় খুঁজলে মিলবে কেন।

প্রথম। তুমি যে আমাদের উৎসবের সূত্রধর।

ঠাকুরদা। তাই তো আমি দ্বারে।

দ্বিতীয়। আজ তুমি বুঝি এই কুম্ভ সুধন মুষল তোষল এদের নিয়েই আছ? দেশ-বিদেশের কত রাজা এল, তাদের সঙ্গে পরিচয় করে নেবে না?

ঠাকুরদা। ভাই, এরা সব সরল লোক। চুপ করে কেবল এদের পাশে দাঁড়িয়ে থাকলেও এরা ভাবে, এদের যেন কত সেবা করলুম। আর যারা মস্ত লোক তাদের কাছেও মুণ্ডটাও যদি খসিয়ে দেওয়া যায় তারা মনে করে, লোকটা বাজে জিনিস দিয়ে ঠকিয়ে গেল।

প্রথম। এখন চলো দাদা।

ঠাকুরদা। না ভাই, আজ আমার এইখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চলা। সকলের চলাচলেই আমার মন ছুটছে তবে আর কী; এইবারে শুরু করা যাক।

সকলের গান

মোদের কিছু নাই রে নাই
আমরা ঘরে বাইরে গাই—
তাইরে নাইরে নাইরে না।
যতই দিবস যায় রে যায়
গাই রে সুখে হায় রে হায়—
তাইরে নাইরে নাইরে না।
যারা সোনার চোরাবালির 'পরে
পাকা ঘরের ভিত্তি গড়ে
তাদের সামনে মোরা গান গেয়ে যাই—
তাইরে নাইরে নাইরে না।
যখন থেকে থেকে গাঁঠের পানে
গাঁঠ-কাটারা দৃষ্টি হানে
তখন শূন্য ঝুলি দেখায়ে গাই—
তাইরে নাইরে নাইরে না।
যখন দ্বারে আসে মরণ-বুড়ি
মুখে তাহার বাজাই তুড়ি,
তখন তান দিয়ে গান জুড়ি রে ভাই—
তাইরে নাইরে নাইরে না।
এ যে বসন্তরাজ এসেছে আজ,
বাইরে তাহার উজ্জ্বল সাজ,
ওরে অন্তরে তার বৈরাগী গায়—
তাইরে নাইরে নাইরে না।
সে যে উৎসবদিন চুকিয়ে দিয়ে,
ঝরিয়ে দিয়ে, শুকিয়ে দিয়ে,
দুই রিক্ত হাতে তাল দিয়ে গায়—
তাইরে নাইরে নাইরে না।

প্রস্থান

একদল স্ত্রীলোকের প্রবেশ

প্রথমা। ঠাকুরদা।

ঠাকুরদা। কী ভাই।

প্রথমা। আজ বসন্তপূর্ণিমার চাঁদের সঙ্গে মালা-বদল করব এই পণ করে ঘর থেকে বেরিয়েছি।

ঠাকুরদা। কিন্তু পণ রক্ষা হওয়া কঠিন দেখছি।

দ্বিতীয়া। কেন বলো তো।

ঠাকুরদা। তোমাদের ঠাকরুনদিদি কেবল একখানিমাত্র মালা আমার গলায় পরিয়েছেন।

তৃতীয়া। দেখেছ দেখেছ, ঠাকুরদার বিনয়টা একবার দেখেছ!

দ্বিতীয়া। হায় রে হায়, আকাশের চাঁদের এতদূর অধঃপতন হল!

ঠাকুরদা। যে ফাঁদ তোমরা পেতেছ, ধরা না দিয়ে বাঁচে কী করে।

প্রথমা। তবে তাই বলো, আমাদের ফাঁদের গুণ।

ঠাকুরদা। চাঁদেরও গুণ আছে, উপযুক্ত ফাঁদ দেখলে সে আপনি ধরা দেয়।

তৃতীয়া। আচ্ছা ঠাকরুনদিদির হিসেবটা কিরকম। আজ উৎসবের দিনে নাহয় দুটো বেশি করেই মালা দিতেন।

ঠাকুরদা। যতই দিতেন কুলোত না, সেইজন্যে আজ একটিমাত্র দিয়েছেন। একটির কোনো বালাই নেই।

দ্বিতীয়া। ঠাকুরদা, তুমি দরজা ছেড়ে নড়বে না?

ঠাকুরদা। হাঁ ভাই, সকলকে এগিয়ে দেব, তার পর সব-শেষে আমি।

[স্ত্রীলোকদের প্রস্থান

নাচের দলের প্রবেশ

ঠাকুরদা। আরে, এসো এসো।

প্রথম। আমাদের নটরাজ তুমি, তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম।

ঠাকুরদা। আমি দরজার কাছে খাড়া আছি; জানি, এইখান দিয়েই সবাইকে যেতে হবে। তোমাদের দেখলেই পা-দুটো ছট্‌ফট্ করে। একবার নাচিয়ে দিয়ে যাও।

নৃত্য ও গীত

মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ।
তারি সঙ্গে কী মৃদঙ্গে সদা বাজে
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ।
হাসিকান্না হীরাপান্না দোলে ভালে,
কাঁপে ছন্দে ভালোমন্দ তালে তালে,
নাচে জন্ম, নাচে মৃত্যু পাছে পাছে
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ।
কী আনন্দ, কী আনন্দ, কী আনন্দ—
দিবারাত্রি নাচে মুক্তি, নাচে বন্ধ,
সে তরঙ্গে ছুটি রঙ্গে পাছে পাছে
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ॥

ঠাকুরদা। যাও যাও ভাই, তোমরা নেচে বেড়াও গে, নাচিয়ে বেড়াও গে যাও।

[নাচের দলের প্রস্থান

নাগরিকদল

প্রথম। ঠাকুরদা, আমাদের রাজা নেই এ কথা দুশো বার বলব।

ঠাকুরদা। কেবলমাত্র দুশো বার? এত কঠিন সংযমের দরকার কী— পাঁচশো বার বল্‌-না!

দ্বিতীয়। ফাঁকি দিয়ে কতদিন তোমরা মানুষকে ভুলিয়ে রাখবে।

ঠাকুরদা। নিজেও ভুলেছি ভাই।

তৃতীয়। আমরা চারি দিকে প্রচার করে বেড়াব, আমাদের রাজা নেই।

ঠাকুরদা। কার সঙ্গে ঝগড়া করবে বলো। তোমাদের রাজা তো কারও কানে ধরে বলছেন না 'আমি আছি'। তিনি তো বলেন, তোমরাই আছ। তাঁর সবই তো তোমাদেরই জন্যে।

প্রথম। এই তো, আমরা রাস্তা দিয়ে চেঁচিয়ে যাচ্ছি— 'রাজা নেই'। যদি রাজা থাকে সে কী করতে পারে করুক-না।

ঠাকুরদা। কিচ্ছু করবে না।

দ্বিতীয়। আমার পঁচিশ বছরের ছেলেটা সাত দিনের জ্বরে মারা গেল। দেশে যদি ধর্মের রাজা থাকবে তবে কি এমন অকালমৃত্যু ঘটে।

ঠাকুরদা। ওরে, তবু তো এখনো তোর দু ছেলে আছে— আমার যে একে একে পাঁচ ছেলে মারা গেল, একটি বাকি রইল না।

তৃতীয়। তবে?

ঠাকুরদা। তবে কী রে। ছেলে তো গেলই, তাই বলে কি ঝগড়া করে রাজাকেও হারাব। এমনি বোকা!

প্রথম। ঘরে যাদের অন্ন জোটে না তাদের আবার রাজা কিসের!

ঠাকুরদা। ঠিক বলেছিস ভাই। তা সেই অন্ন-রাজাকেই খুঁজে বের কর্! ঘরে বসে হাহাকার করলেই তো তিনি দর্শন দেবেন না।

দ্বিতীয়। আমাদের রাজার বিচারটা কিরকম দেখো না। ঐ আমাদের ভদ্রসেন, রাজা বলতে সে একেবারে অজ্ঞান হয়ে পড়ে, কিন্তু তার ঘরের এমন দশা যে চামচিকেগুলোরও থাকবার কষ্ট হয়।

ঠাকুরদা। আমার দশাটাই দেখ্‌-না। রাজার দরজায় সমস্ত দিনই তো খাটছি— আজ পর্যন্ত দুটো পয়সা পুরস্কার মিলল না।

তৃতীয়। তবে?

ঠাকুরদা। তবে কী রে। তাই নিয়েই তো আমার অহংকার। বন্ধুকে কি কেউ কোনোদিন পুরস্কার দেয়। তা, যা ভাই, আনন্দ করে বলে বেড়া গে— রাজা নেই। আজ আমাদের নানা সুরের উৎসব— সব সুরই ঠিক এক তানে মিলবে।

গান

বসন্তে কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের মেলা রে।
দেখিস নে কি শুকনো পাতা ঝরা ফুলের খেলা রে।
যে ঢেউ ওঠে তারি সুরে
বাজে কি গান সাগর জুড়ে।
যে ঢেউ পড়ে তাহারো সুর জাগছে সারা বেলা রে।
বসন্তে আজ দেখ রে তোরা ঝরা ফুলের খেলা রে।
আমার প্রভুর পায়ের তলে
শুধুই কি রে মানিক জ্বলে।
চরণে তাঁর লুটিয়ে কাঁদে লক্ষ মাটির ঢেলা রে।

আমার গুরুর আসন-কাছে
সুবোধ ছেলে ক'জন আছে।
অবোধ জনে কোল দিয়েছেন, তাই আমি তাঁর চেলা রে।
উৎসবরাজ দেখেন চেয়ে ঝরা ফুলের খেলা রে ॥

৪

প্রাসাদশিখর

সুদর্শনা ও সখী রোহিণী

সুদর্শনা। ওলো রোহিণী, তুই আমার রাজাকে কি কখনো দেখিস নি।

রোহিণী। শুনেছি প্রজারা সবাই দেখেছে, কিন্তু চিনেছে খুব অল্প লোকে। সেইজন্যে যখনই কাউকে দেখে মনটা চমকে ওঠে তখনই মনে করি, এই বুঝি হবে রাজা। আবার দুদিন পরে ভুল ভাঙে।

সুদর্শনা। ভুল তোরা করতে পারিস, কিন্তু আমার ভুল হতে পারে না। আমি হলুম রানী। ঐ তো আমার রাজাই বটে।

রোহিণী। তোমাকে তিনি কত মান দিয়েছেন ; তিনি কি তোমাকে চেনাতে দেরি করতে পারেন।

সুদর্শনা। ঐ মূর্তি দেখলেই চিত্ত যে আপনি খাঁচার পাখির মতো চঞ্চল হয়ে ওঠে। ওর কথা ভালো করে জিজ্ঞাসা করে এসেছিস তো ?

রোহিণী। এসেছি বৈকি। যাকে জিজ্ঞাসা করি সেই তো বলে— রাজা।

সুদর্শনা। কোথাকার রাজা।

রোহিণী। আমাদেরই রাজা।

সুদর্শনা। ঐ যার মাথায় ফুলের ছাতা ধরে আছে তার কথাই তো বলছিস ?

রোহিণী। হাঁ, ঐ যাঁর পতাকায় কিংশুক আঁকা।

সুদর্শনা। আমি তো দেখবামাত্রই চিনেছি, বরঞ্চ তোর মনে সন্দেহ এসেছিল।

রোহিণী। আমাদের যে সাহস অল্প, তাই ভয় হয়, কী জানি যদি ভুল করি তবে অপরাধ হবে

সুদর্শনা। আহা, যদি সুরঙ্গমা থাকত তা হলে কোনো সংশয় থাকত না।

রোহিণী। সুরঙ্গমাই আমাদের সকলের চেয়ে সেয়ানা হল বুঝি !

সুদর্শনা। তা যা বলিস। সে তাঁকে ঠিক চেনে।

রোহিণী। এ কথা আমি কক্‌খনো মানব না। ও তার ভান। বললেই হল চিনি, কেউ তো পরীক্ষা করে নিতে পারবে না। আমরা যদি ওর মতো নির্লজ্জ হতুম তা হলে অমন কথা আমাদেরও মুখে আটকাত না।

সুদর্শনা। না না, সে তো বলে না কিছু।

রোহিণী। ভাব দেখায়। সে যে বলার চেয়ে আরো বেশি। কত ছলই যে জানে ! ঐজন্যেই তো আমাদের কেউ তাকে দেখতে পারে না।

সুদর্শনা। যাই হোক, সে থাকলে একবার তাকে জিজ্ঞাসা করে দেখতুম।

রোহিণী। সে তো কখনো কোথাও বেরোয় না— আজ দেখি সে সাজসজ্জা করে উৎসব করতে বেরিয়েছে। তার রঙ্গ দেখে হেসে বাঁচি নে।

সুদর্শনা। আজ যে প্রভুর হুকুম, তাই সে সেজেছে।

রোহিণী। তা বেশ মহারানী, আমাদের কথায় কাজ কী। যদি ইচ্ছা করেন তাকেই ডেকে আনি, তার মুখ থেকেই সন্দেহভঞ্জন হোক। তার ভাগ্য ভালো, রানীর কাছে রাজার পরিচয় সে'ই করিয়ে দেবে।

সুদর্শনা। না না, পরিচয় কাউকে করাতে হবে না— তবু কথাটা সকলেরই মুখে শুনতে ইচ্ছে করে।

রোহিণী। সকলেই তো বলছে— ঐ দেখো-না, তাঁর জয়ধ্বনি এখান থেকে শোনা যাচ্ছে।

সুদর্শনা। তবে এক কাজ কর্; পদ্মপাতায় করে এই ফুলগুলি তাঁর হাতে দিয়ে আয় গে।

রোহিণী। যদি জিজ্ঞাসা করেন, কে দিলে।

সুদর্শনা। তার কোনো উত্তর দিতে হবে না— তিনি ঠিক বুঝতে পারবেন। তাঁর মনে ছিল, আমি চিনতেই পারব না— ধরা পড়েছেন সেটা না জানিয়ে ছাড়ছি নে। (ফুল লইয়া রোহিণীর প্রস্থান) আমার মন আজ এমনি চঞ্চল হয়েছে— এমন তো কোনোদিন হয় না। এই পূর্ণিমার আলো মদের ফেনার মতো চারি দিকে উপচিয়ে পড়ছে, আমাকে যেন মাতাল করে তুলেছে। ওগো বসন্ত, যে-সব ভীরু লাজুক ফুল পাতার আড়ালে গভীর রাত্রে ফোটে, যেমন করে তাদের গন্ধ উড়িয়ে নিয়ে চলেছ তেমনি তুমি আমার মনকে হঠাৎ কোথায় উদাস করে দিলে, তাকে মাটিতে পা ফেলতে দিলে না!— ওরে প্রতিহারী।

প্রতিহারী। (প্রবেশ করিয়া) কী মহারানী।

সুদর্শনা। ঐ-যে আম্রবনের বীথিকার ভিতর দিয়ে উৎসব-বালকেরা আজ গান গেয়ে যাচ্ছে— ডাক্ ডাক্, ওদের ডেকে নিয়ে আয়— একটু গান শুনি। (প্রতিহারীর প্রস্থান) ভগবান চন্দ্রমা, আজ আমার এই চঞ্চলতার উপরে তুমি যেন কেবলই কটাক্ষপাত করছ! তোমার স্মিত কৌতুকে সমস্ত আকাশ যেন ভরে গেছে— কোথাও আমার আর লুকোবার জায়গা নেই— আমি কেমন আপনার দিকে চেয়ে আপনি লজ্জা পাচ্ছি! ভয় লজ্জা সুখ দুঃখ সব মিলে আমার বুকের মধ্যে আজ নৃত্য করছে— শরীরের রক্ত নাচছে, চারি দিকের জগৎ নাচছে, সমস্ত ঝাপসা ঠেকছে।

বালকগণের প্রবেশ

এসো এসো, তোমরা সব মূর্তিমান কিশোর বসন্ত, ধরো, তোমাদের গান ধরো। আমার সমস্ত শরীর মন গান গাইছে, অথচ আমাব কণ্ঠে সুব আসছে না। তোমরা আমার হয়ে গান গেয়ে যাও।

বালকগণের গান

বিরহ মধুর হল আজি
মধুরাতে।
গভীর রাগিণী উঠে বাজি
বেদনাতে।
ভরি দিয়া পূর্ণিমানিশা
অধীর অদর্শনতৃষা
কী করুণ মরীচিকা আনে
আঁখিপাতে!
সুদূরের সুগন্ধধারা
বায়ুভরে
পরানে আমার পথহারা
ঘুরে মরে।
কার বাণী কোন্ সুরে তালে
মর্মরে পল্লবজালে,
বাজে মম মঞ্জীররাজি
সাথে সাথে॥

সুদর্শনা। হয়েছে হয়েছে, আর না। তোমাদের এই গান শুনে চোখে জল ভরে আসছে। আমার মনে হচ্ছে, যা পাবার জিনিস তাকে হাতে পাবার জো নেই ; তাকে হাতে পাবার দরকার নেই। এমনি করে খোঁজার মধ্যেই সমস্ত পাওয়া যেন সুধাময় হয়ে আছে। কোন্ মাধুর্যের সন্ন্যাসী তোমাদের এই গান শিখিয়ে দিয়েছে গো— ইচ্ছে করছে, চোখে-দেখা কানে-শোনা ঘুচিয়ে দিই, হৃদয়ের ভিতরটাতে যে গহন পথের কুঞ্জবন আছে সেইখানকার ছায়ার মধ্যে উদাস হয়ে চলে যাই। ওগো কুমার তাপসগণ, তোমাদের আমি কী দেব বলো! আমার গলায় এ কেবল রত্নের মালা, এ কঠিন হার তোমাদের কণ্ঠে পীড়া দেবে— তোমরা যে ফুলের মালা পরেছ ওর মতো কিছুই আমার কাছে নেই।

[প্রণাম করিয়া বালকগণের প্রস্থান

রোহিণীর প্রবেশ

সুদর্শনা। ভালো করি নি, ভালো করি নি রোহিণী। তোর কাছে সমস্ত বিবরণ শুনতে আমার লজ্জা করছে। এইমাত্র হঠাৎ বুঝতে পেরেছি, যা সকলের চেয়ে বড়ো পাওয়া তা ছুঁয়ে পাওয়া নয়, তেমনি যা সকলের চেয়ে বড়ো দেওয়া তা হাতে করে দেওয়া নয়। তবু বল্, কী হল বল্।

রোহিণী। আমি তো রাজার হাতে ফুল দিলুম, কিন্তু তিনি যে কিছু বুঝলেন এমন তো মনে হল না।

সুদর্শনা। বলিস কী! তিনি বুঝতে পারলেন না?

রোহিণী। না, তিনি অবাক হয়ে চেয়ে পুতুলটির মতো বসে রইলেন। কিছু বুঝলেন না এইটে পাছে ধরা পড়ে সেইজন্যে একটি কথা কইলেন না।

সুদর্শনা। ছি ছি ছি, আমার যেমন প্রগল্‌ভতা তেমনি শাস্তি হয়েছে। তুই আমার ফুল ফিরিয়ে আনলি নে কেন।

রোহিণী। ফিরিয়ে আনব কী করে। পাশে ছিলেন কাঞ্চীর রাজা। তিনি খুব চতুর— চকিতে সমস্ত বুঝতে পারলেন ; মুচকে হেসে বললেন, 'মহারাজ, মহিষী সুদর্শনা আজ বসন্তসখার পূজার পুষ্পে মহারাজের অভ্যর্থনা করছেন।' শুনে হঠাৎ তিনি সচেতন হয়ে উঠে বললেন, 'আমার রাজসম্মান পরিপূর্ণ হল।' আমি লজ্জিত হয়ে ফিরে আসছিলুম, এমন সময়ে কাঞ্চীর রাজা মহারাজের গলা থেকে স্বহস্তে এই মুক্তার মালাটি খুলে নিয়ে আমাকে বললেন, 'সখী, তুমি যে সৌভাগ্য বহন করে এনেছ তার কাছে পরাভব স্বীকার করে মহারাজের কণ্ঠের মালা তোমার হাতে আত্মসমর্পণ করছে।'

সুদর্শনা। কাঞ্চীর রাজাকে বুঝিয়ে দিতে হল! আজকের পূর্ণিমার উৎসব আমার অপমান একেবারে উদ্‌ঘাটিত করে দিলে। তা হোক, যা, তুই যা। আমি একটু একলা থাকতে চাই। (রোহিণীর প্রস্থান) আজ এমন করে আমার দর্প চূর্ণ হয়েছে, তবু সেই মোহন রূপের কাছ থেকে মন ফেরাতে পারছি নে। অভিমান আর রইল না— পরাভব, সর্বত্রই পরাভব— বিমুখ হয়ে থাকব সে শক্তিটুকুও নেই। কেবল ইচ্ছে করছে, ঐ মালাটা রোহিণীর কাছ থেকে চেয়ে নিই। কিন্তু ও কী মনে করবে। রোহিণী!

রোহিণী। (প্রবেশ করিয়া) কী মহারানী।

সুদর্শনা। আজকের ব্যাপারে তুই কি পুরস্কার পাবার যোগ্য।

রোহিণী। তোমার কাছে না হোক, যিনি দিয়েছেন তাঁর কাছ থেকে পেতে পারি।

সুদর্শনা। না না, ওকে দেওয়া বলে না, ও জোর করে নেওয়া।

রোহিণী। তবু, রাজকণ্ঠের অনাদরের মালাকেও অনাদর করি এমন স্পর্ধা আমার নয়।

সুদর্শনা। এ অবজ্ঞার মালা তোর গলায় দেখতে আমার ভালো লাগছে না। দে, ওটা খুলে দে। ওর বদলে আমার হাতের কঙ্কণটা তোকে দিলুম— এই নিয়ে তুই চলে যা। (রোহিণীর প্রস্থান) হার হল, আমার হার হল। এ মালা ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া উচিত ছিল— পারলুম না। এ যে কাঁটার মালার মতো আমার আঙুলে বিঁধছে, তবু ত্যাগ করতে পারলুম না। উৎসবদেবতার হাত থেকে এই কি আমি পেলুম— এই অগৌরবের মালা।

৫

কুঞ্জদ্বার

ঠাকুরদা ও একদল লোক

ঠাকুরদা। কী ভাই, হল তোমাদের ?

প্রথম। খুব হল ঠাকুরদা। এই দেখো-না, একেবারে লালে লাল করে দিয়েছে। কেউ বাকি নেই।

ঠাকুরদা। বলিস কী। রাজাগুলোকে সুদ্ধ রাঙিয়েছে নাকি।

দ্বিতীয়। ওরে বাস রে! কাছে ঘেঁষে কে। তারা সব বেড়ার মধ্যে খাড়া হয়ে রইল।

ঠাকুরদা। হায় হায়, বড়ো ফাঁকিতে পড়েছে। একটুও রঙ ধরাতে পারলি নে ? জোর করে ঢুকে পড়তে হয়।

তৃতীয়। ও দাদা, তাদের রাঙা সে আর-এক রঙের। তাদের চক্ষু রাঙা, তাদের পাইকগুলোর পাগড়ি রাঙা ; তার উপরে খোলা তলোয়ারের যেরকম ভঙ্গি দেখলুম, একটু কাছে ঘেঁষলেই একেবারে চরম রাঙা রাঙিয়ে দিত।

ঠাকুরদা। বেশ করেছিস— ঘেঁষিস নি। পৃথিবীতে ওদের নির্বাসনদণ্ড— ওদের তফাতে রেখে চলতেই হবে। এখন বাড়ি চলেছিস বুঝি ?

দ্বিতীয়। হাঁ দাদা, রাত তো আড়াই পহর হয়ে গেল। তুমি যে ভিতরে গেলে না ?

ঠাকুরদা। এখনো ডাক পড়ল না— দ্বারেই আছি।

তৃতীয়। তোমার শম্ভু-সুধনরা সব গেল কোথায়।

ঠাকুরদা। তাদের ঘুম পেয়ে গেল— শুতে গেছে।

প্রথম। তারা কি তোমার সঙ্গে অমন খাড়া জাগতে পারে। [প্রস্থান

বাউলের দল

গান

যা ছিল কালো ধলো
তোমার রঙে রঙে রাঙা হল।
যেমন রাঙাবরন তোমার চরণ
তার সনে আর ভেদ না র'ল।
রাঙা হল বসন ভূষণ, রাঙা হল শয়ন স্বপন—
মন হল কেমন দেখ্ রে, যেমন
রাঙা কমল টলমল ॥

ঠাকুরদা। বেশ ভাই, বেশ। খুব খেলা জমেছিল ?

বাউল। খুব খুব। সব লালে লাল। কেবল আকাশের চাঁদটাই ফাঁকি দিয়েছে— সাদাই রয়ে গেল।

ঠাকুরদা। বাইরে থেকে দেখাচ্ছে যেন বড়ো ভালোমানুষ। ওর সাদা চাদরটা খুলে দেখতিস যদি তা হলে ওর বিদ্যে ধরা পড়ত। চুপিচুপি ও যে আজ কত রঙ ছড়িয়েছে, এখানে দাঁড়িয়ে সব দেখেছি। অথচ ও নিজে কি এমনি সাদাই থেকে যাবে।

গান

আহা, তোমার সঙ্গে প্রাণের খেলা
প্রিয় আমার ওগো প্রিয় !
বড়ো উতলা আজ পরান আমার
খেলাতে হার মানবে কি ও।

কেবল তুমিই কি গো এমনি ভাবে
রাঙিয়ে মোরে পালিয়ে যাবে।
তুমি সাধ করে নাথ, ধরা দিয়ে
আমারও রঙ বক্ষে নিয়ো—
এই হৃৎকমলের রাঙা রেণু
রাঙাবে ওই উত্তরীয় ॥

[প্রস্থান

স্ত্রীলোকদের প্রবেশ

প্রথমা। ওমা, ওমা! যেখানে দেখে গিয়েছিলুম সেইখানেই দাঁড়িয়ে আছে গো!
দ্বিতীয়া। আমাদের বসন্তপূর্ণিমার চাঁদ, এত রাত হল তবু একটুও পশ্চিমের দিকে হেলল না।
প্রথমা। আমাদের অচঞ্চল চাঁদটি কার জন্যে পথ চেয়ে আছে ভাই।
ঠাকুরদা। যে তাকে পথে বের করবে তারই জন্যে।
তৃতীয়া। ঘর ছেড়ে এবার পথের মানুষ খুঁজবে বুঝি?
ঠাকুরদা। হাঁ ভাই, সর্বনাশের জন্যে মন কেমন করছে।

গান

আমার সকল নিয়ে বসে আছি
সর্বনাশের আশায়।
আমি তার লাগি পথ চেয়ে আছি
পথে যে জন ভাসায়।

দ্বিতীয়া। আমাদের তো পথে ভাসাবার শক্তি নেই, পথ ছেড়ে দিয়ে যাওয়াই ভালো। ধরা যে দেবে না তার কাছে ধরা দিয়ে লাভ কী।
ঠাকুরদা। তার কাছে ধরা দিলে ধরা দেওয়াও যা, ছাড়া পাওয়াও তা।

যে জন দেয় না দেখা, যায় যে দেখে,
ভালোবাসে আড়াল থেকে,
আমার মন মজেছে সেই গভীরের
গোপন ভালোবাসায় ॥

[স্ত্রীলোকদের প্রস্থান

নাচের দলের প্রবেশ

ঠাকুরদা। ও ভাই, রাত তো অর্ধেকের বেশি পার হয়ে এল, কিন্তু মনের মাতন এখনো যে থামতে চাইছে না। তোরা তো বাড়ি চলেছিস, তোদের শেষ নাচটা নাচিয়ে দিয়ে যা।

গান

আমার ঘুর লেগেছে— তাধিন তাধিন।
তোমার পিছন পিছন নেচে নেচে
ঘুর লেগেছে তাধিন তাধিন।
তোমার তালে আমার চরণ চলে,
শুনতে না পাই কে কী বলে—
তাধিন তাধিন।
তোমার গানে আমার প্রাণে যে কোন্
পাগল ছিল সেই জেগেছে—
তাধিন তাধিন।

আমার লাজের বাঁধন সাজের বাঁধন
খসে গেল ভজন সাধন—
তাধিন তাধিন।
বিষম নাচের বেগে দোলা লেগে
ভাবনা যত সব ভেগেছে—
তাধিন তাধিন।

[নাচের দলের প্রস্থান

সুরঙ্গমার প্রবেশ

সুরঙ্গমা। এতক্ষণ কী করছিলে ঠাকুরদা।

ঠাকুরদা। দ্বারের কাজে ছিলুম।

সুরঙ্গমা। সে কাজ তো শেষ হল। একটি মানুষও নেই— সবাই চলে গেছে।

ঠাকুরদা। এবার তবে ভিতরে চলি।

সুরঙ্গমা। কোন্‌খানে বাঁশি বাজছে, এবার বাতাসে কান দিলে বোঝা যাবে।

ঠাকুরদা। সবাই যখন নিজের তালপাতার ভেঁপু বাজাচ্ছিল তখন বিষম গোল।

সুরঙ্গমা। উৎসবে ভেঁপুর ব্যবস্থা তিনিই করে রেখেছেন।

ঠাকুরদা। তাঁর বাঁশি কারও বাজনা ছাপিয়ে ওঠে না, তা না হলে লজ্জায় আর সকলের তান বন্ধ হয়ে যেত।

সুরঙ্গমা। দেখো ঠাকুরদা, আজ এই উৎসবের ভিতরে ভিতরে কেবলই আমার মনে হচ্ছে, রাজা আমাকে এবার দুঃখ দেবেন।

ঠাকুরদা। দুঃখ দেবেন!

সুরঙ্গমা। হাঁ ঠাকুরদা। এবার আমাকে দূরে পাঠিয়ে দেবেন, অনেক দিন কাছে আছি সে তাঁর সইছে না।

ঠাকুরদা। এবার তবে কাঁটাবনের পার থেকে তোমাকে দিয়ে পারিজাত তুলিয়ে আনাবেন। সেই দুর্গমের খবরটা আমরা যেন পাই ভাই।

সুরঙ্গমা। তোমার নাকি কোনো খবর পেতে বাকি আছে! রাজার কাজে কোন্ পথটাতেই বা তুমি না চলেছ। হঠাৎ নতুন হুকুম এলে আমাদেরই পথ খুঁজে বেড়াতে হয়।

গান

পুষ্প ফুটে কোন্ কুঞ্জবনে
কোন্ নিভৃতে রে, কোন্ গহনে।
মাতিল আকুল দক্ষিণবায়ু
সৌরভচঞ্চল সঞ্চরণে
কোন্ নিভৃতে রে, কোন্ গহনে।
কাটিল ক্লান্ত বসন্তনিশা
বাহির-অঙ্গন-সঙ্গী-সনে।
উৎসবরাজ কোথায় বিরাজে—
কে লয়ে যাবে সে ভবনে,
কোন্ নিভৃতে রে, কোন্ গহনে॥

[সুরঙ্গমার প্রস্থান

রাজবেশী ও কাঞ্চীরাজের প্রবেশ

কাঞ্চী। তোমাকে যেমন পরামর্শ দিয়েছি ঠিক সেইরকম কোরো। ভুল না হয়।

রাজবেশী। ভুল হবে না।

কাঞ্চী। কবভোদ্যানের মধ্যেই রানীর প্রাসাদ।

রাজবেশী। হাঁ মহারাজ, সে আমি দেখে নিয়েছি।

কাঞ্চী। সেই উদ্যানে আগুন লাগিয়ে দেবে— তার পরে অগ্নিদাহের গোলমালের মধ্যে কার্যসিদ্ধি কবতে হবে।

বাজবেশী। কিছু অন্যথা হবে না।

কাঞ্চী। দেখো হে ভণ্ডরাজ, আমার কেবলই মনে হচ্ছে, আমরা মিথ্যে ভয়ে ভয়ে চলছি, এ দেশে রাজা নেই।

রাজবেশী। সেই অরাজকতা দূর করবার জন্যেই তো আমার চেষ্টা। সাধারণ লোকের জন্যে সত্য হোক মিথ্যে হোক একটা রাজা চাইই— নইলে অনিষ্ট ঘটে।

কাঞ্চী। হে সাধু, লোকহিতের জন্যে তোমার এই আশ্চর্য ত্যাগস্বীকার আমাদের সকলেরই পক্ষে একটা দৃষ্টান্ত। ভাবছি যে, এই হিতকার্যটা নিজেই করব। (সহসা ঠাকুরদাকে দেখিয়া) কে হে, কে তুমি। কোথায় লুকিয়ে ছিলে।

ঠাকুরদা। লুকিয়ে থাকি নি। অত্যন্ত ক্ষুদ্র বলে আপনাদের চোখে পড়ি নি।

রাজবেশী। ইনি এ দেশের বাজাকে নিজের বন্ধু বলে পরিচয় দেন, নির্বোধেরা বিশ্বাস করে।

ঠাকুরদা। বুদ্ধিমানদের কিছুতেই সন্দেহ ঘোচে না, তাই নির্বোধ নিয়েই আমাদের কারবার।

কাঞ্চী। তুমি আমাদের সব কথা শুনেছ?

ঠাকুরদা। আপনারা আগুন লাগাবার পরামর্শ করছিলেন।

কাঞ্চী। তুমি আমাদের বন্দী, চলো শিবিরে।

ঠাকুরদা। আজ তবে বুঝি এমনি করেই তলব পড়ল?

কাঞ্চী। বিড় বিড় করে বকছ কী?

ঠাকুরদা। আমি বলছি, দেশের টান কাটিয়ে কিছুতেই নড়তে পারছিলেম না, তাই বুঝি ভিতর-মহলে টেনে নিয়ে যাবার জন্যে মনিবের পেয়াদা এল।

কাঞ্চী। লোকটা পাগল নাকি।

রাজবেশী। ওর কথা ভারি এলোমেলো— বোঝাই যায় না।

কাঞ্চী। কথা যত কম বোঝা যায় অবুঝরা ততই ভক্তি করে। কিন্তু আমাদের কাছে সে ফন্দি খাটবে না। আমরা স্পষ্ট কথার কারবারি।

ঠাকুরদা। যে আজ্ঞে মহারাজ, চুপ করলুম।

৬

করভোদ্যান

রোহিণী। ব্যাপারখানা কী। কিছু তো বুঝতে পারছি নে। (মালীদের প্রতি) তোরা সব তাড়াতাড়ি কোথায় চলেছিস।

প্রথম মালী। আমরা বাইরে যাচ্ছি।

রোহিণী। বাইরে কোথায় যাচ্ছিস।

দ্বিতীয় মালী। তা জানি নে, আমাদের রাজা ডেকেছে।

রোহিণী। রাজা তো বাগানেই আছে। কোন্ রাজা।

প্রথম মালী। বলতে পারি নে।

দ্বিতীয় মালী। চিরদিন যে রাজার কাজ করছি সেই রাজা।

রোহিণী। তোরা সবাই চলে যাবি!

প্রথম মালী। হাঁ, সবাই যাব, এখনই যেতে হবে। নইলে বিপদে পড়ব।

[প্রস্থান

রোহিণী। এরা কী বলে বুঝতে পারি নে— ভয় করছে। যে নদীর পাড়ি ভেঙে পড়বে সেই পাড়ি ছেড়ে যেমন জন্তুরা পালায় এই বাগান ছেড়ে তেমনি সবাই পালিয়ে যাচ্ছে।

কোশলরাজের প্রবেশ

কোশল। রোহিণী, তোমাদের রাজা এবং কাঞ্চীরাজ কোথায় গেল জান।

রোহিণী। তাঁরা এই বাগানেই আছেন, কিন্তু কোথায় কিছুই জানি নে।

কোশল। তাদের মন্ত্রণাটা ঠিক বুঝতে পারছি নে। কাঞ্চীরাজকে বিশ্বাস করে ভালো করি নি।

[প্রস্থান

রোহিণী। রাজাদের মধ্যে কী একটা ব্যাপার চলছে। শীঘ্র একটা দুর্দৈব ঘটবে। আমাকে সুদ্ধ জড়াবে না তো?

অবন্তীরাজ। (প্রবেশ করিয়া) রোহিণী, রাজারা সব কোথায় গেল জান।

রোহিণী। তাঁরা কে কোথায় তার ঠিকানা করা শক্ত। এইমাত্র কোশলরাজ এখানে ছিলেন।

অবন্তী। কোশলরাজের জন্যে ভাবনা নেই। তোমাদের রাজা এবং কাঞ্চীরাজ কোথায়।

রোহিণী। অনেকক্ষণ তাঁদের দেখি নি।

অবন্তী। কাঞ্চীরাজ কেবলই আমাদের এড়িয়ে এড়িয়ে বেড়াচ্ছে। নিশ্চয় ফাঁকি দেবে। এর মধ্যে থেকে ভালো করি নি। সখী, এ বাগান থেকে বেরোবার পথটা কোথায় জান।

রোহিণী। আমি তো জানি নে।

অবন্তী। দেখিয়ে দিতে পারে এমন কোনো লোক নেই?

রোহিণী। মালীরা সব বাগান ছেড়ে গেছে।

অবন্তী। কেন গেল।

রোহিণী। তাদের কথা ভালো বুঝতে পারলুম না। তারা বললে, রাজা তাদের শীঘ্র বাগান ছেড়ে যেতে বলেছেন।

অবন্তী। রাজা! কোন্ রাজা।

রোহিণী। তারা স্পষ্ট করে বলতে পারলে না।

অবন্তী। এ তো ভালো কথা নয়। যেমন করেই হোক এখান থেকে বেরোবার পথ খুঁজে বের করতেই হবে। আর এক মুহূর্ত এখানে নয়।

[দ্রুত প্রস্থান

রোহিণী। চিরদিন তো এই বাগানেই আছি কিন্তু আজ মনে হচ্ছে যেন বাঁধা পড়ে গেছি, বেরিয়ে পড়তে না পারলে নিষ্কৃতি নেই। রাজাকে দেখতে পেলে যে বাঁচি। পরশু যখন তাঁকে রানীর ফুল দিলুম তখন তিনি তো একরকম আত্মবিস্মৃত ছিলেন— তার পর থেকে তিনি আমাকে কেবলই পুরস্কার দিচ্ছেন। এই অকারণ পুরস্কারে আমার ভয় আরো বাড়ছে।— এত রাতে পাখিরা সব কোথায় উড়ে চলেছে? এরা হঠাৎ এমন ভয় পেল কেন। এখন তো এদের ওড়বার সময় নয়। রানীর পোষা হরিণী ও দিকে দৌড়ল কোথায়। চপলা, চপলা! আমার ডাক শুনলই না। এমন তো কখনোই হয় না। চার দিকের দিগন্ত মাতালের চোখের মতো হঠাৎ লাল হয়ে উঠেছে। যেন চার দিকেই অকালে সূর্যাস্ত হচ্ছে। বিধাতার এ কী উন্মত্ততা আজ! ভয় হচ্ছে। রাজার দেখা কোথায় পাই।

৭

রানীর প্রাসাদ-দ্বার

রাজবেশী। এ কী কাণ্ড করেছ কাঞ্চীরাজ।

কাঞ্চী। আমি কেবল এই প্রাসাদের কাছটাতেই আগুন ধরাতে চেয়েছিলুম, সে আগুন যে এত শীঘ্র এমন চার দিকে ধরে উঠবে সে তো আমি মনেও করি নি। এ বাগান থেকে বেরোবার পথ কোথায় শীঘ্র বলে দাও।

রাজবেশী। পথ কোথায় আমি তো কিছুই জানি নে। যারা আমাদের এখানে এনেছিল তাদের একজনকেও দেখছি নে।

কাঞ্চী। তুমি তো এ দেশের লোক— পথ নিশ্চয় জান।

রাজবেশী। অন্তঃপুরের বাগানে কোনোদিনই প্রবেশ করি নি।

কাঞ্চী। সে আমি বুঝি নে, তোমাকে পথ বলতেই হবে, নইলে তোমাকে দু-টুকরো করে কেটে ফেলব।

রাজবেশী। তাতে প্রাণ বেরোবে, পথ বেরোবার কোনো উপায় হবে না।

কাঞ্চী। তবে কেন বলে বেড়াচ্ছিলে তুমিই এখানকার রাজা।

রাজবেশী। আমি রাজা না, রাজা না। (মাটিতে পড়িয়া জোড়করে) কোথায় আমার রাজা, রক্ষা করো। আমি পাপিষ্ঠ, আমাকে রক্ষা করো। আমি বিদ্রোহী, আমাকে দণ্ড দাও, কিন্তু রক্ষা করো।

কাঞ্চী। অমন শূন্যতার কাছে চীৎকার করে লাভ কী। ততক্ষণ পথ বের করবার চেষ্টা করা যাক।

রাজবেশী। আমি এইখানেই পড়ে রইলুম— আমার যা হবার তাই হবে।

কাঞ্চী। সে হবে না। পুড়ে মরি তো একলা মরব না, তোমাকে সঙ্গী নেব।

নেপথ্য হইতে। রক্ষা করো রাজা, রক্ষা করো। চারি দিকে আগুন।

কাঞ্চী। মূঢ়, ওঠ্, আর দেরি না।

সুদর্শনা। (প্রবেশ করিয়া) রাজা, রক্ষা করো। আগুনে ঘিরেছে।

রাজবেশী। কোথায় রাজা। আমি রাজা নই।

সুদর্শনা। তুমি রাজা নও!

রাজবেশী। আমি ভণ্ড, আমি পাষণ্ড। (মুকুট মাটিতে ফেলিয়া) আমার ছলনা ধূলিসাৎ হোক।

[কাঞ্চীরাজের সহিত প্রস্থান

সুদর্শনা। রাজা নয়! এ রাজা নয়! তবে ভগবান হুতাশন, দগ্ধ করো আমাকে; আমি তোমারই হাতে আত্মসমর্পণ করব। হে পাবন, আমার লজ্জা, আমার বাসনা পুড়িয়ে ছাই করে ফেলো।

রোহিণী। (প্রবেশ করিয়া) রানী, ও দিকে কোথায় যাও। তোমার অন্তঃপুরের চার দিকে আগুন ধরে গেছে, ওর মধ্যে প্রবেশ কোরো না।

সুদর্শনা। আমি তারই মধ্যে প্রবেশ করব। এ আমারই মরবারই আগুন।

প্রাসাদে প্রবেশ

৮

অন্ধকার কক্ষ

রাজা। ভয় নেই, তোমার ভয় নেই। আগুন এ ঘরে এসে পৌঁছবে না।

সুদর্শনা। ভয় আমার নেই— কিন্তু লজ্জা! লজ্জা যে আগুনের মতো আমার সঙ্গে সঙ্গে এসেছে। আমার মুখ-চোখ, আমার সমস্ত হৃদয়টাকে রাঙা করে রেখেছে।

রাজা। এ দাহ মিটতে সময় লাগবে।

সুদর্শনা। কোনোদিন মিটবে না, কোনোদিন মিটবে না।

রাজা। হতাশ হোয়ো না রানী।

সুদর্শনা। তোমার কাছে মিথ্যা বলব না রাজা— আমি আর-এক জনের মালা গলায় পরেছি।

রাজা। ও মালাও যে আমার, নইলে সে পাবে কোথা থেকে। সে আমার ঘর থেকে চুরি করে এনেছে।

সুদর্শনা। কিন্তু এ যে তারই হাতের দেওয়া। তবু তো ত্যাগ করতে পারলুম না। যখন চার দিকে আগুন আমার কাছে এগিয়ে এল তখন একবার মনে করলুম, এই মালাটা আগুনে ফেলে দিই। কিন্তু পারলুম না। আমার পাপিষ্ঠ মন বললে, ঐ হার গলায় নিয়ে পুড়ে মরব। আমি তোমাকে বাইরে দেখব বলে পতঙ্গের মতো এ কোন্ আগুনে ঝাঁপ দিলুম। আমিও মরি নে, আগুনও নেবে না, এ কী জ্বালা!

রাজা। তোমার সাধ তো মিটেছে, আমাকে তো আজ দেখে নিলে।

সুদর্শনা। আমি কি তোমাকে এমন সর্বনাশের মধ্যে দেখতে চেয়েছিলুম! কী দেখলুম জানি নে, কিন্তু বুকের মধ্যে এখনো কাঁপছে।

রাজা। কেমন দেখলে রানী।

সুদর্শনা। ভয়ানক, সে ভয়ানক। সে আমার স্মরণ করতেও ভয় হয়। কালো, কালো, তুমি কালো। আমি কেবল মুহূর্তের জন্যে চেয়েছিলুম। তোমার মুখের উপর আগুনের আভা লেগেছিল— আমার মনে হল, ধূমকেতু যে আকাশে উঠেছে সেই আকাশের মতো তুমি কালো। তখনই চোখ বুজে ফেললুম, আর চাইতে পারলুম না— ঝড়ের মেঘের মতো কালো, কূলশূন্য সমুদ্রের মতো কালো— তারই তুফানের উপরে সন্ধ্যার রক্তিমা।

রাজা। আমি তো তোমাকে পূর্বেই বলেছি, যে লোক আগে থাকতে প্রস্তুত না হয়েছে সে যখন আমাকে হঠাৎ দেখে সইতে পারে না; আমাকে বিপদ বলে মনে ক'রে আমার কাছ থেকে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাতে চায়। এমন কতবার দেখেছি। সেইজন্যে সেই দুঃখ থেকে বাঁচিয়ে ক্রমে ক্রমে তোমার কাছে পরিচয় দিতে চেয়েছিলুম।

সুদর্শনা। কিন্তু পাপ এসে সমস্ত ভেঙে দিলে— এখন আর যে তোমার সঙ্গে তেমন করে পরিচয় হতে পারবে তা মনে করতেও পারি নে।

রাজা। হবে রানী, হবে। যে কালো দেখে আজ তোমার বুক কেঁপে গেছে সেই কালোতেই একদিন তোমার হৃদয় স্নিগ্ধ হয়ে যাবে। নইলে আমার ভালোবাসা কিসের।

গান

আমি রূপে তোমায় ভোলাব না,
ভালোবাসায় ভোলাব।
আমি হাত দিয়ে দ্বার খুলব না গো,
গান দিয়ে দ্বার খোলাব।
ভরাব না ভূষণভারে,
সাজাব না ফুলের হারে,
সোহাগ আমার মালা করে
গলায় তোমার পরাব।
জানবে না কেউ কোন্ তুফানে
তরঙ্গদল নাচবে প্রাণে।
চাঁদের মতো অলখ টানে
জোয়ারে ঢেউ তোলাব॥

সুদর্শনা। হবে না, হবে না; শুধু তোমার ভালোবাসায় কী হবে। আমার ভালোবাসা যে মুখ ফিরিয়েছে। রূপের নেশা আমাকে লেগেছে— সে নেশা আমাকে ছাড়বে না, সে যেন আমার দুই

চক্ষে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে, আমার স্বপন সুদ্ধ ঝল্‌মল্‌ করছে। এই আমি তোমাকে সব কথা বললুম, এখন আমাকে শাস্তি দাও।

রাজা। শাস্তি শুরু হয়েছে।

সুদর্শনা। কিন্তু তুমি যদি আমাকে ত্যাগ না কর আমি তোমাকে ত্যাগ করব।

রাজা। যতদূর সাধ্য চেষ্টা করে দেখো।

সুদর্শনা। কিছু চেষ্টা করতে হবে না— তোমাকে আমি সইতে পারছি নে। ভিতরে ভিতরে তোমার উপর রাগ হচ্ছে। কেন তুমি আমাকে— জানি নে, আমাকে তুমি কী করেছ ! কিন্তু কেন তুমি এমনতরো। কেন আমাকে লোকে বলেছিল, তুমি সুন্দর। তুমি যে কালো, কালো— তোমাকে আমার কখনো ভালো লাগবে না। আমি যা ভালোবাসি তা আমি দেখেছি— তা ননির মতো কোমল, শিরীষ ফুলের মতো সুকুমার, তা প্রজাপতির মতো সুন্দর।

রাজা। তা মরীচিকার মতো মিথ্যা এবং বুদ্‌বুদের মতো শূন্য।

সুদর্শনা। তা হোক, কিন্তু আমি পারছি নে, তোমার কাছে দাঁড়াতে পারছি নে। আমাকে এখান থেকে যেতেই হবে। তোমার সঙ্গে মিলন সে আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। সে মিলন মিথ্যা হবে, আমার মন অন্য দিকে যাবে।

রাজা। একটুও চেষ্টা করবে না ?

সুদর্শনা। কাল থেকে চেষ্টা করছি— কিন্তু যতই চেষ্টা করছি ততই মন আরো বিদ্রোহী হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আমি অশুচি, আমি অসতী, তোমার কাছে থাকলে এই ঘৃণা কেবলই আমাকে আঘাত করবে। তাই আমার ইচ্ছে করছে— দূরে চলে যাই, এত দূরে যাই যেখানে তোমাকে আমার আর মনে আনতে হবে না।

রাজা। আচ্ছা, তুমি যতদূরে পার ততদূরেই চলে যাও।

সুদর্শনা। তুমি হাত দিয়ে পথ আটকাও না বলেই তোমার কাছ থেকে পালাতে মনে এত দ্বিধা হয়। তুমি কেশের গুচ্ছ ধরে জোর করে আমাকে টেনে রেখে দাও-না কেন। তুমি আমাকে মারো-না কেন। মারো, মারো, আমাকে মারো। তুমি আমাকে কিছু বলছ না, সেইজন্যেই আরো অসহ্য বোধ হচ্ছে।

রাজা। কিছু বলছি নে, কে তোমাকে বললে।

সুদর্শনা। অমন করে নয়, অমন করে নয়, চীৎকার করে বলো, বজ্রগর্জনে বলো— আমার কান থেকে অন্য সকল কথা ডুবিয়ে দিয়ে বলো— আমাকে এত সহজে ছেড়ে দিয়ো না, যেতে দিয়ো না।

রাজা। ছেড়ে দেব, কিন্তু যেতে দেব কেন।

সুদর্শনা। যেতে দেবে না ? আমি যাবই।

রাজা। আচ্ছা যাও।

সুদর্শনা। দেখো, তা হলে আমার দোষ নেই। তুমি আমাকে জোর করে ধরে রাখতে পারতে, কিন্তু রাখলে না— আমাকে বাঁধলে না। আমি চললুম। তোমার প্রহরীদের হুকুম দাও, আমাকে ঠেকাক।

রাজা। কেউ ঠেকাবে না। ঝড়ের মুখে ছিন্ন মেঘ যেমন অবাধে চলে তেমনি তুমি অবাধে চলে যাও।

সুদর্শনা। ক্রমেই বেগ বেড়ে উঠছে, এবার নোঙর ছিঁড়ল। হয়তো ডুবব, কিন্তু আর ফিরব না।

[দ্রুত প্রস্থান

সুরঙ্গমার প্রবেশ ও গান

ভয়েরে মোর আঘাত করো
ভীষণ, হে ভীষণ।
কঠিন করে চরণ-'পরে
প্রণত করো মন।

বেঁধেছ মোরে নিত্যকাজে
প্রাচীরে-ঘেরা ঘরের মাঝে,
নিত্য মোরে বেঁধেছে সাজে
সাজের আভরণ।
এসো হে ওহে আকস্মিক,
ঘিরিয়া ফেলো সকল দিক—
মুক্ত পথে উড়ায়ে নিক
নিমেষে এ জীবন।
তাহার পরে প্রকাশ হোক
উদার তব সহাস চোখ,
তব অভয় শান্তিময়
স্বরূপ পুরাতন ॥

সুদর্শনা। (পুনঃ প্রবেশ করিয়া) রাজা, রাজা!

সুরঙ্গমা। তিনি চলে গেছেন।

সুদর্শনা। চলে গেছেন। আচ্ছা বেশ, তা হলে তিনি আমাকে একেবারে ছেড়েই দিলেন। আমি ফিরে এলুম, কিন্তু তিনি অপেক্ষা করলেন না। আচ্ছা, ভালোই হল— তা হলে আমি মুক্ত। সুরঙ্গমা, আমাকে ধরে রাখবার জন্যে তিনি কি তোকে বলেছেন।

সুরঙ্গমা। না, তিনি কিছুই বলেন নি।

সুদর্শনা। কেনই-বা বলবেন। বলবার তো কথা নয়। তা হলে আমি মুক্ত। আচ্ছা সুরঙ্গমা, একটা কথা রাজাকে জিজ্ঞাসা করব মনে করেছিলুম, কিন্তু মুখে বেধে গেল। বল্ দেখি, বন্দীদের তিনি কি প্রাণদণ্ড দিয়েছেন।

সুরঙ্গমা। প্রাণদণ্ড? আমার রাজা তো কোনোদিন বিনাশ করে শাস্তি দেন না।

সুদর্শনা। তা হলে ওদের কী হল।

সুরঙ্গমা। ওদের তিনি ছেড়ে দিয়েছেন। কাঞ্চীরাজ পরাভব স্বীকার করে দেশে ফিরে গেছেন।

সুদর্শনা। শুনে বাঁচলুম।

সুরঙ্গমা। রানীমা, তোমার কাছে আমার একটি প্রার্থনা আছে।

সুদর্শনা। প্রার্থনা কি মুখে জানাতে হবে মনে করেছিস। রাজার কাছ থেকে এ পর্যন্ত আমি যত আভরণ পেয়েছি সব তোকেই দিয়ে যাব— এ অলংকার আমাকে আর শোভা পায় না।

সুরঙ্গমা। মা, আমি যাঁর দাসী তিনি আমাকে নিরাভরণ করেই সাজিয়েছেন। সেই আমার অলংকার। লোকের কাছে গর্ব করতে পারি এমন কিছুই তিনি আমাকে দেন নি।

সুদর্শনা। তবে তুই কী চাস।

সুরঙ্গমা। আমি তোমার সঙ্গে যাব।

সুদর্শনা। কী বলিস তুই! তোর প্রভুকে ছেড়ে দূরে যাবি, এ কিরকম প্রার্থনা।

সুরঙ্গমা। দূরে নয় মা, তুমি যখন বিপদের মুখে চলেছ, তিনি কাছেই থাকবেন।

সুদর্শনা। পাগলের মতো বকিস নে। আমি রোহিণীকে সঙ্গে নিতে চেয়েছিলুম, সে গেল না। তুই কোন্ সাহসে যেতে চাস।

সুরঙ্গমা। সাহস আমার নেই, শক্তিও আমার নেই। কিন্তু আমি যাব— সাহস আপনি আসবে, শক্তিও হবে।

সুদর্শনা। না, তোকে আমি নিতে পারব না। তোর কাছে থাকলে আমার বড়ো গ্লানি হবে, সে আমি সইতে পারব না।

সুরঙ্গমা। মা, তোমার সমস্ত ভালোমন্দ আমি নিজের গায়ে মেখে নিয়েছি। আমাকে পর করে রাখতে পারবে না— আমি যাবই।

গান

আমি তোমার প্রেমে হব সবার
কলঙ্কভাগী।
আমি সকল দাগে হব দাগি।
তোমার পথের কাঁটা করব চয়ন—
যেথা তোমার ধুলার শয়ন
সেথা আঁচল পাতব আমার
তোমার রাগে অনুরাগী!
আমি শুচি আসন টেনে টেনে
বেড়াব না বিধান মেনে—
যে পঙ্কে ওই চরণ পড়ে
তাহারি ছাপ বক্ষে মাগি॥

৯

সুদর্শনার পিতা কান্যকুব্জরাজ ও মন্ত্রী

কান্যকুব্জ। সে আসবার পূর্বেই আমি সমস্ত খবর পেয়েছি।

মন্ত্রী। রাজকন্যা নগরের বাহিরে নদীকূলে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁকে অভ্যর্থনা করে আনবার জন্যে লোকজন পাঠিয়ে দিই?

কান্যকুব্জ। হতভাগিনী স্বামীকে ত্যাগ করে আসছে, অভ্যর্থনা করে তার সেই লজ্জা ঘোষণা করে দেবে? অন্ধকার হোক, রাস্তায় যখন লোক থাকবে না তখন সে গোপনে আসবে।

মন্ত্রী। প্রাসাদে তাঁর বাসের ব্যবস্থা করে দিই?

কান্যকুব্জ। কিছু করতে হবে না। ইচ্ছা ক'রে সে আপনার একেশ্বরী রানীর পদ ত্যাগ করে এসেছে— এখানে রাজগৃহে তাকে দাসীর কাজে নিযুক্ত থাকতে হবে।

মন্ত্রী। মনে বড়ো কষ্ট পাবেন।

কান্যকুব্জ। যদি তাকে কষ্ট থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করি তা হলে পিতা-নামের যোগ্য নই।

মন্ত্রী। যেমন আদেশ করেন তাই হবে।

কান্যকুব্জ। সে যে আমার কন্যা এ কথা যেন প্রকাশ না হয়— তা হলে বিষম অনর্থপাত ঘটবে!

মন্ত্রী। অনর্থের আশঙ্কা কেন করেন মহারাজ।

কান্যকুব্জ। নারী যখন আপন প্রতিষ্ঠা থেকে ভ্রষ্ট হয় তখন সংসারে সে ভয়ংকর বিপদ হয়ে দেখা দেয়। তুমি জান না, আমার এই কন্যাকে আমি আজ কী রকম ভয় করছি। সে আমার ঘরের মধ্যে শনিকে সঙ্গে করে নিয়ে আসছে।

১০

অন্তঃপুর

সুদর্শনা। যা যা সুরঙ্গমা, তুই যা! আমার মধ্যে একটা রাগের আগুন জ্বলছে— আমি কাউকে সহ্য করতে পারছি নে। তুই অমন শান্ত হয়ে থাকিস, ওতে আমার আরো রাগ হয়।

সুরঙ্গমা। কার উপর রাগ করছ মা!

সুদর্শনা। সে আমি জানি নে, কিন্তু আমার ইচ্ছে করছে— সমস্ত ছারখার হয়ে যাক! অতবড়ো রানীর পদ এক মুহূর্তে বিসর্জন দিয়ে এলুম, সে কি এমনি কোণে লুকিয়ে ঘর ঝাঁট দেবার জন্যে। মশাল জ্বলে উঠবে না? ধরণী কেঁপে উঠবে না? আমার পতন কি শিউলি ফুলের খসে পড়া। সে কি নক্ষত্রের পতনের মতো অগ্নিময় হয়ে দিগন্তকে বিদীর্ণ করে দেবে না।

সুরঙ্গমা। দাবানল জ্বলে ওঠবার আগে গুমরে গুমরে ধোঁওয়ায়— এখনো সময় যায় নি।

সুদর্শনা। রানীর মহিমা ধূলিসাৎ করে দিয়ে বাইরে চলে এলুম, এখানে আর কেউ নেই যে আমার সঙ্গে মিলবে? একলা— একলা আমি! আমার এতবড়ো ত্যাগ গ্রহণ করে নেবার জন্যে কেউ এক পা'ও বাড়াবে না?

সুরঙ্গমা। একলা তুমি না— একলা না।

সুদর্শনা। সুরঙ্গমা, তোর কাছে সত্যি করে বলছি, আমাকে পাবার জন্যে প্রাসাদে আগুন লাগিয়েছিল, এতেও আমি রাগ করতে পারি নি— ভিতরে ভিতরে আনন্দে আমার বুক কেঁপে কেঁপে উঠছিল। এতবড়ো অপরাধ! এতবড়ো সাহস! সেই সাহসেই আমার সাহস জাগিয়ে দিলে, সেই আনন্দেই আমার সমস্ত ফেলে দিয়ে আসতে পারলুম। কিন্তু সে কি কেবল আমার কল্পনা! আজ কোথাও তার চিহ্ন দেখি নে কেন।

সুরঙ্গমা। তুমি যার কথা মনে ভাবছ সে তো আগুন লাগায় নি, আগুন লাগিয়েছিল কাঞ্চীরাজ।

সুদর্শনা। ভীরু! ভীরু! অমন মনোমোহন রূপ— তার ভিতরে মানুষ নেই। এমন অপদার্থের জন্যে নিজেকে এতবড়ো বঞ্চনা করেছি? লজ্জা! লজ্জা! কিন্তু সুরঙ্গমা, তোর রাজার কি উচিত ছিল না আমাকে এখনো ফেরাবার জন্যে আসে। (সুরঙ্গমা নিরুত্তর) তুই ভাবছিস, ফেরবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছি! কখনো না। রাজা এলেও আমি ফিরতুম না। কিন্তু সে একবার বারণও করলে না! চলে যাবার দ্বার একেবারে খোলা রইল! বাইরের নিরাবরণ রাস্তা রানী বলে আমার জন্যে একটু বেদনা বোধ করলে না? সেও তোর রাজার মতোই কঠিন? দীনতম পথের ভিক্ষুকও তার কাছে যেমন আমিও তেমনি! চুপ করে রইলি যে। বল্‌-না, তোর রাজার এ কিরকম ব্যবহার!

সুরঙ্গমা। সে তো সবাই জানে— আমার রাজা নিষ্ঠুর, কঠিন, তাকে কি কেউ কোনোদিন টলাতে পারে।

সুদর্শনা। তবে তুই তাকে দিনরাত্রি এমন ডাকিস কেন।

সুরঙ্গমা। সে যেন এইরকম পর্বতের মতোই চিরদিন কঠিন থাকে— আমার কান্নায়, আমার ভাবনায় সে যেন টল্‌মল্‌ না করে। আমার দুঃখ আমারই থাক্‌, সেই কঠিনেরই জয় হোক।

সুদর্শনা। সুরঙ্গমা, দেখ্‌ তো, ঐ মাঠের পারে পূর্বদিগন্তে যেন ধুলো উড়ছে।

সুরঙ্গমা। হাঁ, তাই তো দেখছি।

সুদর্শনা। ঐ-যে, রথের ধ্বজার মতো দেখাচ্ছে না?

সুরঙ্গমা। হাঁ, ধ্বজাই তো বটে।

সুদর্শনা। তবে তো আসছে! তবে তো এল!

সুরঙ্গমা। কে আসছে।

সুদর্শনা। আবার কে! তোর রাজা। থাকতে পারবে কেন। এতদিন চুপ করে আছে এই আশ্চর্য।

সুরঙ্গমা। না, এ আমার রাজা নয়।

সুদর্শনা। না বৈকি! তুমি তো সব জান! ভারি কঠিন তোমার রাজা! কিছুতেই টলেন না! দেখি কেমন না টলেন। আমি জানতুম সে ছুটে আসবে। কিন্তু মনে রাখিস সুরঙ্গমা, আমি তাকে একদিনের জন্যেও ডাকি নি। আমার কাছে তোমার রাজা কেমন করে হার মানে এবার দেখে নিয়ো। সুরঙ্গমা, যা একবার বেরিয়ে গিয়ে দেখে আয় গে। (সুরঙ্গমার প্রস্থান) রাজা এসে আমাকে ডাকলেই বুঝি যাব? কখনো না। আমি যাব না, যাব না।

সুরঙ্গমার প্রবেশ

সুরঙ্গমা। মা, এ আমার রাজা নয়।

সুদর্শনা। নয়? তুই সত্যি বলছিস? এখনো আমাকে নিতে এল না?

সুরঙ্গমা। না, আমার রাজা এমন করে ধুলো উড়িয়ে আসে না। সে কখন আসে কেউ টেরই পায় না।

সুদর্শনা। এ বুঝি তবে—

সুরঙ্গমা। কাঞ্চীরাজের সঙ্গে সেই আসছে।

সুদর্শনা। তার নাম কী জানিস।

সুরঙ্গমা। তার নাম সুবর্ণ।

সুদর্শনা। তবে তো সে আসছে। ভেবেছিলুম, আবর্জনার মতো বুঝি বাইরে এসে পড়েছি, কেউ নেবে না— কিন্তু আমার বীর তো আমাকে উদ্ধার করতে আসছে। সুবর্ণকে তুই জানতিস?

সুরঙ্গমা। যখন বাপের বাড়ি ছিলুম তখন সে জুয়োখেলার দলে—

সুদর্শনা। না না, তোর মুখে আমি তাব কোনো কথা শুনতে চাই নে। সে আমার বীর, সে আমার পরিত্রাণকর্তা। তার পরিচয় আমি নিজেই পাব। কিন্তু সুরঙ্গমা, তোর রাজা কেমন বল তো। এত হীনতা থেকেও আমাকে উদ্ধার করতে এল না? আমার আর দোষ দিতে পারবি নে। আমি এখানে দিনরাত্রি দাসীগিরি করে তার জন্যে চিবজীবন অপেক্ষা করে থাকতে পারব না। তোর মতো দীনতা করা আমার দ্বারা হবে না। আচ্ছা, সত্যি বল্, তুই তোর রাজাকে খুব ভালোবাসিস?

সুরঙ্গমার গান

আমি কেবল তোমার দাসী।
কেমন করে আনব মুখে তোমায় ভালোবাসি!
গুণ যদি মোর থাকত তবে
অনেক আদর মিলত ভবে,
বিনামূল্যের কেনা আমি শ্রীচরণপ্রয়াসী ॥

১১

শিবির

কাঞ্চী। (কান্যকুব্জের দূতের প্রতি) তোমাদের রাজাকে গিয়ে বলো গে, আমরা তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করতে আসি নি। রাজ্যে ফিরে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছি, কেবল সুদর্শনাকে এখানকার দাসীশালা থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবার জন্যেই অপেক্ষা।

দূত। মহারাজ, স্মরণ রাখবেন, রাজকন্যা তাঁর পিতৃগৃহে আছেন।

কাঞ্চী। কন্যা যতদিন কুমারী থাকে ততদিনই পিতৃগৃহে তার আশ্রয়।

দূত। কিন্তু পতিকুলের সঙ্গেও তাঁর সম্বন্ধ আছে।

কাঞ্চী। সে সম্বন্ধ তিনি ত্যাগ করেই এসেছেন।

দূত। জীবন থাকতে সে সম্বন্ধ ত্যাগ করা যায় না; মাঝে মাঝে বিচ্ছেদ ঘটে, কিন্তু অবসান ঘটতেই পারে না।

কাঞ্চী। সেজন্য কোনো সংকোচ বোধ করতে হবে না; কারণ, তাঁর স্বামীই স্বয়ং তাঁকে ফিরিয়ে নিতে এসেছেন। রাজন্!

সুবর্ণ। কী মহারাজ!

কাঞ্চী। তোমার মহিষীকে কি পিতৃগৃহে দাসীত্বে নিযুক্ত রেখে তুমি স্থির থাকবে।

সুবর্ণ। এমন কাপুরুষ আমি না।

দূত। এ যদি আপনার পরিহাস-বাক্য না হয় তা হলে রাজভবনে আতিথ্য নিতে দ্বিধা কিসের।

কাঞ্চী। রাজন্!

সুবর্ণ। কী মহারাজ।

কাঞ্চী। তুমি কি তোমার মহিষীকে ভিক্ষা করে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।

সুবর্ণ। এও কি কখনো হয়!

দূত। তবে কী ইচ্ছা করেন।

কাঞ্চী। সেও কি বলতে হবে।

সুবর্ণ। তা তো বটেই। সে তো বুঝতেই পারছেন।

কাঞ্চী। মহারাজ যদি সহজে তাঁর কন্যাকে আমাদের হাতে সমর্পণ না করেন ক্ষত্রিয়ধর্ম-অনুসারে বলপূর্বক নিয়ে যাব, এই আমার শেষ কথা।

দূত। মহারাজ, আমাদের রাজাকেও ক্ষত্রিয়ধর্ম পালন করতে হবে। তিনি তো কেবল স্পর্ধাবাক্য শুনেই আপনার হাতে কন্যা দিয়ে যেতে পারেন না।

কাঞ্চী। এইরকম উত্তর শোনবার জন্যেই প্রস্তুত হয়ে এসেছি, এই কথা রাজাকে জানাও গে।

[দূতের প্রস্থান

সুবর্ণ। কাঞ্চীরাজ, দুঃসাহসিকতা হচ্ছে।

কাঞ্চী। তাই যদি না হবে তবে এমন কাজে প্রবৃত্ত হয়ে সুখ কী।

সুবর্ণ। কান্যকুব্জরাজকে ভয় না করলেও চলে, কিন্তু—

কাঞ্চী। 'কিন্তু'কে ভয় করতে আরম্ভ করলে জগতে নিরাপদ জায়গা খুঁজে পাওয়া যায় না।

সুবর্ণ। সত্য বলি মহারাজ, ঐ কিন্তুটি দেখা দেন না, কিন্তু ওঁর কাছ থেকে নিরাপদে পালাবার জায়গা জগতে কোথাও নেই।

কাঞ্চী। নিজের মনে ভয় থাকলেই ঐ কিন্তুর জোর বেড়ে ওঠে।

সুবর্ণ। ভেবে দেখুন-না, বাগানে কী কাণ্ডটা হল। আপনি আটঘাট বেঁধেই তো কাজ করেছিলেন, তার মধ্যেও কোথা দিয়ে কিন্তু এসে ঢুকে পড়ল। তিনিই তো রাজা, তাঁকে মানব না ভেবেছিলুম— আর না মেনে থাকবার জো রইল না।

কাঞ্চী। ভয়ে মানুষের বুদ্ধি নষ্ট হয়, তখন মানুষ যা-তা মেনে বসে। সেদিন যা ঘটেছিল সেটা অকস্মাৎ ঘটেছিল।

সুবর্ণ। আপনি যাঁকে অকস্মাৎ বলছেন আমি তাঁকেই কিন্তু বললেম। কোনোমতে তাঁকে বাঁচিয়ে চললেই তবে বাঁচন।

সৈনিকের প্রবেশ

সৈনিক। মহারাজ, কোশলরাজ অবন্তীরাজ ও কলিঙ্গের রাজা সসৈন্যে আসছেন সংবাদ পেলুম।

[প্রস্থান

কাঞ্চী। যা ভয় করছিলুম তাই হল। সুদর্শনার পলায়ন-সংবাদ রটে গিয়েছে। এখন সকলে মিলে কাড়াকাড়ি করে সকলকেই ব্যর্থ হতে হবে।

সুবর্ণ। কাজ নেই মহারাজ! এ-সমস্ত ভালো লক্ষণ নয়। আমি নিশ্চয় বলছি, আমাদের রাজাই এই গোপন সংবাদটা রটিয়ে দিয়েছেন।

কাঞ্চী। কেন। তাতে তাঁর লাভ কী।

সুবর্ণ। লোভীরা পরস্পর কাটাকাটি ছেঁড়াছিঁড়ি করে মরবে— মাঝের থেকে যাঁর ধন তিনিই নিয়ে যাবেন।

কাঞ্চী। এখন বেশ বুঝছি, কেন তোমাদের রাজা দেখা দেন না। ভয়ে তাঁকে সর্বত্রই দেখা যাবে,

এই তাঁর কৌশল। কিন্তু এখনো আমি বলছি, তোমাদের রাজা আগাগোড়াই ফাঁকি।

সুবর্ণ। কিন্তু মহারাজ, আমাকে ছেড়ে দিন।

কাঞ্চী। তোমাকে ছাড়তে পারছি নে, তোমাকে এই কাজে আমার বিশেষ প্রয়োজন।

সৈনিকের প্রবেশ

সৈনিক। বিরাট পাঞ্চাল ও বিদর্ভ -রাজও এসেছেন। তাঁদের শিবির নদীর ও পারে।

[প্রস্থান

কাঞ্চী। আরম্ভে আমাদের সকলকে মিলে কাজ করতে হবে। কান্যকুব্জের সঙ্গে যুদ্ধটা আগে হয়ে যাক, তার পরে একটা উপায় করা যাবে।

সুবর্ণ। আমাকে ঐ উপায়টার মধ্যে যদি না টানেন তা হলে নিশ্চিন্ত হতে পারি। আমি অতি হীন ব্যক্তি, আমার দ্বারা—

কাঞ্চী। দেখো হে ভণ্ড, উপায় জিনিসটাই হচ্ছে হীন। সিঁড়ি বল, রাস্তা বল, পায়ের তলাতেই থাকে। উপায় যদি উচ্চশ্রেণীর হয়, তাকে ব্যবহারে লাগাতে অনেক চিন্তার দরকার করে। তোমার মতো লোককে নিয়ে কাজ চালাবার সুবিধে এই যে, কোনোপ্রকার ভণ্ডামি করতে হয় না। কিন্তু আমার মন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করতে গেলেও চুরিকে লোকহিত নাম না দিলে শুনতে খারাপ লাগে।

সুবর্ণ। কিন্তু দেখেছি, মন্ত্রীমশায় কথাটার আসল অর্থটাই বুঝে নেন।

কাঞ্চী। এই ভাষাতত্ত্বটুকু তার জানা না থাকলে তাকে মন্ত্রী না করে গোয়ালঘরের ভার দিতুম। যাই, রাজাগুলোকে একবার বোড়ের মতো চেলে দিয়ে আসি গে। সকলেরই যদি রাজার চাল হয় তা হলে চতুরঙ্গ খেলা চলে না।

১২

অন্তঃপুর

সুদর্শনা। যুদ্ধ এখনো চলছে ?

সুরঙ্গমা। হাঁ, এখনো চলছে।

সুদর্শনা। যুদ্ধে যাবার পূর্বে বাবা এসে বললেন, তুই একজনের হাত থেকে ছেড়ে এসে আজ সাতজনকে টেনে আনলি। ইচ্ছে করছে, তোকে সাত টুকরো করে ওদের সাতজনের মধ্যে ভাগ করে দিই। সত্যিই যদি তাই করতেন, ভালো হত। সুরঙ্গমা!

সুরঙ্গমা। কী মা!

সুদর্শনা। তোর রাজার যদি রক্ষা করবার শক্তি থাকত তা হলে আজ তিনি কি নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারতেন।

সুরঙ্গমা। মা, আমাকে কেন বলছ। আমার রাজার হয়ে উত্তর দেবার শক্তি কি আমার আছে। উত্তর যদি দেন তো নিজেই এমনি করে দেবেন যে, কারও বুঝতে কিছু বাকি থাকবে না। যদি না দেন তা হলে সকলকেই নির্বাক্ হয়ে থাকতে হবে। আমি কিছুই বুঝি নে জানি, সেইজন্যে কোনোদিন তাঁর বিচার করি নে।

সুদর্শনা। যুদ্ধে কে কে যোগ দিয়েছে বল্ তো।

সুরঙ্গমা। সাতজন রাজাই যোগ দিয়েছে।

সুদর্শনা। আর কেউ না ?

সুরঙ্গমা। সুবর্ণ যুদ্ধের পূর্বেই গোপনে পালাবার চেষ্টা করছিল— কাঞ্চীরাজ তাকে শিবিরে বন্দী করে রেখেছেন।

সুদর্শনা। আমার মৃত্যুই ভালো ছিল। কিন্তু রাজা, রাজা, আমার পিতাকে রক্ষা করবার জন্যে যদি

আসতে তা হলে তোমার যশ বাড়ত বৈ কমত না। আমার অপরাধে তিনি শাস্তি পান কেন ?

সুরঙ্গমা। সংসারে আমরা তো কেউ একলা নই মা, ভালোমন্দ সকলকেই ভাগ করে নিতে হয়— সেইজন্যেই ভয়, নইলে একলার জন্যে ভয় কিসের।

সুদর্শনা। দেখ্, সুরঙ্গমা, আমি যখন থেকে এখানে এসেছি কতবার হঠাৎ মনে হয়েছে, আমার জানলার নীচে থেকে যেন বীণা বাজছে।

সুরঙ্গমা। তা হবে, কেউ হয়তো বাজায়।

সুদর্শনা। সেখানটা ঘন বন, অন্ধকার, মাথা বাড়িয়ে কতবার দেখতে চেষ্টা করি, ভালো করে কিছু দেখতে পাই নে।

সুরঙ্গমা। হয়তো কোনো পথিক ছায়ায় বসে বিশ্রাম করে আর বাজায়।

সুদর্শনা। তা হবে। কিন্তু আমার মনে পড়ে আমার সেই বাতায়নটি। সন্ধ্যার সময় সেজে এসে আমি সেখানে দাঁড়াতুম আর আমাদের সেই দীপ-নেবানো বাসরঘরের অন্ধকার থেকে গানের পর গান, তানের পর তান ফোয়ারার মুখের ধারার মতো উচ্ছ্বসিত হয়ে আমার সামনে এসে যেন নানা লীলায় ঝরে ঝরে পড়ত। সেই গানই তো কোন্ অন্ধকারের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে কোন্ অন্ধকারের দিকে আমাকে ডেকে নিয়ে যেত।

সুরঙ্গমা। আহা মা, সে কী অন্ধকার! সেই অন্ধকারের দাসী আমি।

সুদর্শনা। আমার জন্যে সেখান থেকে তুই কেন এলি।

সুরঙ্গমা। আমার রাজা আবার হাতে ধরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন, এই আদরটুকু পাবার জন্যে।

সুদর্শনা। না না, তিনি আসবেন না। তিনি আমাদের একেবারে ছেড়ে দিয়েছেন। কেনই বা না ছাড়বেন। অপরাধ তো কম করি নি।

সুরঙ্গমা। যদি ছেড়ে দিতেই পারেন তা হলে তাঁকে আর দরকার নেই, তা হলে তিনি নেই, তা হলে আমার সেই অন্ধকার একেবারে শূন্য— তার মধ্যে থেকে বীণা বাজে নি, কেউ ডাকে নি— সমস্ত বঞ্চনা।

দ্বারীর প্রবেশ

সুদর্শনা। কে তুমি।

দ্বারী। আমি এই প্রাসাদের দ্বারী।

সুদর্শনা। কী খবর, শীঘ্র বলো।

দ্বারী। আমাদের মহারাজ বন্দী হয়েছেন।

সুদর্শনা। বন্দী হয়েছেন! মা গো বসুন্ধরা!

মূর্ছা

১৩

বন্দী কান্যকুব্জরাজ, অন্যান্য রাজগণ ও সুবর্ণ

কাঞ্চী। রাজগণ, রণক্ষেত্রের কাজ শেষ হল ?

কলিঙ্গ। কই শেষ হল। বীরত্বের পুরস্কারটি গ্রহণ করবার পূর্বেই আর-একবার তো বীরত্বের পরিচয় দিতে হবে।

কাঞ্চী। মহারাজ, এখানে তো আমরা জয়মাল্য নিতে আসি নি, বরমাল্য নিতে এসেছি।

বিদর্ভ। সেই মালা কি জয়লক্ষ্মীর হাত থেকে নিতে হবে না।

কাঞ্চী। না মহারাজ, পুষ্পধনুর অন্তঃপুরেই সে মালা গাঁথা হচ্ছে। রক্ত-মাখা হাতে সেটা ছিন্ন করতে গেলে ফুল ধুলায় লুটিয়ে পড়বে।

কলিঙ্গ। কিন্তু মহারাজ, পঞ্চশর আমাদের সাতজনের দাবি মেটাবেন কী করে।

কাঞ্চী। তা যদি বলেন, সাতজনের দাবি তো রণচণ্ডীও মেটাতে পারেন না।

কোশল। কাঞ্চীরাজ, তোমার প্রস্তাবটি কী পরিষ্কার করেই বলো।

কাঞ্চী। আমার প্রস্তাব এই, স্বয়ংবরসভায় রাজকন্যা স্বয়ং যাঁর গলায় মালা দেবেন, এই বসন্তের সফলতা তিনিই লাভ করবেন।

বিদর্ভ। এ প্রস্তাব উত্তম, আমার এতে সম্মতি আছে।

সকলে। আমাদেরও আছে।

কান্যকুব্জ। রাজগণ, আমাকে বধ করুন, অথবা দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করছি, আপনারা আসুন—আমাকে জীবিত-মৃত্যুর হাতে সমর্পণ করবেন না।

কাঞ্চী। আপনার কন্যা পতিকুল ত্যাগ করে এসেছেন। তার অধিক দুঃখ আমরা আপনাকে দিচ্ছি নে। এখন যে প্রস্তাব করলেম তাতে তিনি সম্মান লাভ করবেন।

কোশল। শুভলগ্নে কালই স্বয়ংবরের দিন স্থির হোক।

কাঞ্চী। সেই ভালো।

বিদর্ভ। আমরা আয়োজনে প্রবৃত্ত হই গে।

কাঞ্চী। কলিঙ্গরাজ, বন্দী এখন আপনার আশ্রয়েই রইলেন।

[কাঞ্চী ব্যতীত অন্য রাজগণের প্রস্থান

কাঞ্চী। ওহে ভণ্ডরাজ!

সুবর্ণ। কী আদেশ।

কাঞ্চী। এখন মহারথীরা সরবেন। এবার শিখণ্ডীকে সামনে নিয়ে অগ্রসর হতে হবে।

সুবর্ণ। মহারাজের কথাটা স্পষ্ট বুঝতে পারছি নে।

কাঞ্চী। সেখানে তোমাকে আমার ছত্রধর হয়ে বসতে হবে।

সুবর্ণ। কিংকর প্রস্তুত আছে, কিন্তু তাতে মহারাজের উপকারটা কী হবে।

কাঞ্চী। ওহে সুবর্ণ, দেখতে পাচ্ছি তোমার বুদ্ধিটা কম বলেই অহংকারটাও কম। রানী সুদর্শনা তোমাকে কী চক্ষে দেখেছেন সেটা এখনো তোমার ধারণার মধ্যে প্রবেশ করে নি দেখছি। যাই হোক, তিনি তো রাজসভায় ছত্রধরের গলায় মালা দিতে পারবেন না, অথচ অধিক দূরে যেতেও মন সরবে না; অতএব যেমন করেই হোক, এ মালা আমারই রাজছত্রের ছায়ায় এসে পড়বে।

সুবর্ণ। মহারাজ, আমার সম্বন্ধে এই-যে সব অমূলক কল্পনা করছেন, এ অতি ভয়ানক কল্পনা। দোহাই আপনার, আমাকে এই মিথ্যা বিপত্তিজালের মধ্যে জড়াবেন না— আমাকে মুক্তি দিন।

কাঞ্চী। কাজটি শেষ হয়ে গেলেই তোমাকে মুক্তি দিতে এক মুহূর্তও বিলম্ব করব না। উদ্দেশ্যসিদ্ধি হয়ে গেলেই উপায়টাকে কেউ আর চিরস্মরণীয় করে রাখে না।

১৪

বাতায়ন

সুদর্শনা ও সুরঙ্গমা

সুদর্শনা। তা হলে স্বয়ংবরসভায় আমাকে যেতেই হবে? নইলে পিতার প্রাণরক্ষা হবে না?

সুরঙ্গমা। কাঞ্চীরাজ তো এইরকম বলেছেন।

সুদর্শনা। এই কি রাজার উচিত কথা। তিনি কি নিজের মুখে বলেছেন?

সুরঙ্গমা। না, তাঁর দূত সুবর্ণ এসে জানিয়ে গেছে।

সুদর্শনা। ধিক্, ধিক্ আমাকে।

সুরঙ্গমা। সেইসঙ্গে কতকগুলি শুকনো ফুল দিয়ে আমাকে বললে, তোমার রানীকে বোলো,

বসন্ত-উৎসবের এই স্মৃতিচিহ্ন বাইরে যত মলিন হয়ে আসছে অন্তরে ততই নবীন হয়ে বিকশিত হচ্ছে।

সুদর্শনা। চুপ কর্, চুপ কর্, আমাকে আর দগ্ধ করিস নে।

সুরঙ্গমা। ঐ দেখো, সভায় রাজারা সব বসেছেন। ঐ যাঁর গায়ে কোনো আভরণ নেই, কেবল মুকুটে একটি ফুলের মালা জড়ানো, উনিই হচ্ছেন কাঞ্চীর রাজা। সুবর্ণ তাঁর পিছনে ছাতা ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

সুদর্শনা। ঐ সুবর্ণ! তুই সত্যি বলছিস?

সুরঙ্গমা। হাঁ মা, আমি সত্যি বলছি।

সুদর্শনা। ওকেই আমি সেদিন দেখেছিলুম? না, না। সে আমি আলোতে অন্ধকারে বাতাসে গন্ধেতে মিলে আর-একটা কী দেখেছিলুম। ও নয়, ও নয়।

সুরঙ্গমা। সকলে তো বলে, ওকে চোখে দেখতে সুন্দর।

সুদর্শনা। ঐ সুন্দরেও মন ভোলে! আমার এ পাপ-চোখকে কী দিয়ে ধুলে এর গ্লানি চলে যাবে।

সুরঙ্গমা। সেই কালোর মধ্যে ডুবিয়ে ধুতে হবে— সেই আমার রাজার সকল-রূপ-ডোবানো রূপের মধ্যে। রূপের কালি যা-কিছু চোখে লেগেছে সব যাবে।

সুদর্শনা। কিন্তু সুরঙ্গমা, এমন ভুলেও মানুষ ভোলে কেন।

সুরঙ্গমা। ভুল ভাঙবে বলে ভোলে।

প্রতিহারী। (প্রবেশ করিয়া) স্বয়ংবরসভায় রাজারা অপেক্ষা করে আছেন।

[প্রস্থান

সুদর্শনা। সুরঙ্গমা, আমার অবগুণ্ঠনের চাদরখানা নিয়ে আয় গে।

[সুরঙ্গমার প্রস্থান

রাজা, আমার রাজা! তুমি আমাকে ত্যাগ করেছ, উচিত বিচারই করেছ। কিন্তু আমার অন্তরেব কথা কি তুমি জানবে না। (বুকের বসনের ভিতর হইতে ছুরিকা বাহির করিয়া) দেহে আমার কলুষ লেগেছে, এ দেহ আজ আমি সবার সমক্ষে ধুলোয় লুটিয়ে যাব। কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে আমার দাগ লাগে নি— বুক চিরে সেটা কি তোমাকে আজ জানিয়ে যেতে পাবব না। তোমার সেই মিলনের অন্ধকাব ঘরটি আমার হৃদয়ের ভিতরে আজ শূন্য হয়ে রয়েছে— সেখানকার দরজা কেউ খোলে নি প্রভু। সে কি খুলতে তুমি আর আসবে না। তবে দ্বারের কাছে তোমার বীণা আর বাজবে না? তবে আসুক মৃত্যু, আসুক— সে তোমার মতোই কালো, তোমাব মতোই সুন্দর, তোমার মতোই সে মন হবণ করতে জানে। সে তুমিই, সে তুমি।

গান

এ অন্ধকার ডুবাও তোমার অতল অন্ধকারে,
ওহে অন্ধকারের স্বামী!
এসো নিবিড়, এসো গভীর, এসো জীবনপারে,
আমার চিত্তে এসো নামি।
এ দেহমন মিলায়ে যাক, হইয়া যাক হারা,
ওহে অন্ধকারের স্বামী!
বাসনা মোর, বিকৃতি মোর, আমার ইচ্ছাধারা
ওই চরণে যাক থামি।
নির্বাসনে বাঁধা আছি দুর্বাসনার ডোরে,
ওহে অন্ধকারের স্বামী।
সব বাঁধনে তোমার সাথে বন্দী করো মোরে,
ওহে, আমি বাঁধনকামী।

আমার প্রিয়, আমার শ্রেয়, আমার হে পরম,
ওহে অন্ধকারের স্বামী—
সকল ঝ'রে সকল ভ'রে আসুক সে চরম,
ওগো, মরুক-না এই আমি ॥

১৫

স্বয়ংবরসভা

রাজগণ

বিদর্ভ। ওহে কাঞ্চীরাজ, তোমার অঙ্গে যে কোনো আভরণ রাখ নি।

কাঞ্চী। কোনো আশা নেই ব'লে। আভরণে যে পরাভবকে দ্বিগুণ লজ্জা দেবে।

কলিঙ্গ। যত আভরণ সমস্তই ছত্রধরের অঙ্গে দেখছি।

বিরাট। এর দ্বারা কাঞ্চীরাজ বাহ্য শোভার হীনতা প্রচার করতে চান। নিজের দেহে ওঁর পৌরুষের অভিমান অন্য কোনো আভরণ রাখতেই দেয় নি।

কোশল। ওঁর কৌশল জানি, সমস্ত আভরণধারীদের মাঝখানে উনি আভরণবর্জনের দ্বারাই নিজের মহিমা প্রমাণ করতে চান।

পাঞ্চাল। সেটা কি উনি ভালো করছেন। সকলেই জানে, রমণীর চোখ পতঙ্গের মতো— আভরণের দীপ্তিতে সকলের আগে ছুটে এসে পড়ে।

কলিঙ্গ। কিন্তু, আর কত বিলম্ব হবে।

কাঞ্চী। অধীর হবেন না কলিঙ্গরাজ, বিলম্বেই ফল মধুর হয়ে দেখা দেয়।

কলিঙ্গ। ফল নিশ্চয় পাব জানলে বিলম্ব সইত। ভোগের আশা অনিশ্চিত, তাই দর্শনের আশায় উৎসুক আছি।

কাঞ্চী। আপনার নবীন যৌবন, এ বয়সে বারংবার আশাকে ত্যাগ করলেও সে প্রগল্‌ভা নারীর মতো ফিরে ফিরে আসে— আমাদের আর সেদিন নেই।

কলিঙ্গ। কিন্তু শুভলগ্ন যে উত্তীর্ণ হয়ে যায়!

কাঞ্চী। ভয় নেই, শুভগ্রহও দুর্লভ দর্শনের জন্যে অপেক্ষা করবে। যদি নির্বোধ নাও করে তবে প্রিয়দর্শনে অশুভগ্রহেরও দৃষ্টি প্রসন্ন হয়ে উঠবে।

বিদর্ভ। বিরাটরাজ, আপনি যাত্রা করেছিলেন কবে।

বিরাট। সুসময় দেখেই বেরিয়েছিলুম। দৈবজ্ঞ বলেছিল, যাত্রা সফল হবেই।

পাঞ্চাল। আমরা সকলেই তো শুভযোগ দেখে বেরিয়েছি, কিন্তু কৃপণ বিধাতা তো একটি বৈ ফল রাখেন নি।

কোশল। এই ফলটি ত্যাগ করানোই হয়তো শুভগ্রহের কাজ।

কাঞ্চী। এ কী উদাসীনের মতো কথা বলছ কোশলরাজ! ফল ত্যাগ করাবার জন্যে এত আয়োজনের কী দরকার ছিল।

কোশল। ছিল বৈকি। কামনা না করে তো ত্যাগ করা যায় না। কাঞ্চীরাজ, আমাদের আসনগুলো যেন কেঁপে উঠল। এ কি ভূমিকম্প নাকি।

কাঞ্চী। ভূমিকম্প? তা হবে।

বিদর্ভ। কিংবা হয়তো আর-কোনো রাজার সৈন্যদল এসে পড়ল।

কলিঙ্গ। তা হতে পারে, কিন্তু তা হলে তো দূতের মুখে সংবাদ পাওয়া যেত।

বিদর্ভ। আমার কাছে এটা কিন্তু দুর্লক্ষণ বলে মনে হচ্ছে।।

কাঞ্চী। ভয়ের চক্ষে সব লক্ষণই দুর্লক্ষণ।
বিদর্ভ। অদৃষ্টপুরুষকে ভয় করি, সেখানে বীরত্ব খাটে না।
পাঞ্চাল। বিদর্ভরাজ, আজকেকার শুভকার্যে দ্বিধা জন্মিয়ে দিয়ো না।
কাঞ্চী। অদৃষ্ট যখন দৃষ্ট হবেন তখন তাঁর সঙ্গে বোঝাপড়া করা যাবে।
বিদর্ভ। তখন হয়তো সময় থাকবে না। আমার আশঙ্কা হচ্ছে, যেন একটা—
কাঞ্চী। ঐ 'যেন একটা'র কথা তুলবেন না— ওটা আমাদেরই সৃষ্টি, অথচ আমাদেরই বিনাশ করে।
কলিঙ্গ। বাইরে বাজনা বাজছে নাকি।
পাঞ্চাল। বাজনা বলেই বোধ হচ্ছে।
কাঞ্চী। তবে আর কী, নিশ্চয়ই রানী সুদর্শনা। বিধাতা এতক্ষণ পরে আমাদের ভাগ্যফল নিয়ে আসছেন— এ তাঁরই পায়ের শব্দ। (জনান্তিকে) সুবর্ণ, অমনতরো সংকুচিত হয়ে আবার আড়ালে আপনাকে লুকিয়ে রেখো না। তোমার হাতে আমার রাজছত্র কাঁপছে যে।

যোদ্ধৃবেশে ঠাকুরদার প্রবেশ

কলিঙ্গ। ও কী ও! ও কে!
পাঞ্চাল। বিনা আহ্বানে প্রবেশ করে লোকটা কে হে।
বিরাট। স্পর্ধা তো কম নয়! কলিঙ্গরাজ, তুমি একে রোধ করো।
কলিঙ্গ। আপনারা বয়োজ্যেষ্ঠ থাকতে আমার অগ্রসর হওয়া অশোভন হবে।
বিদর্ভ। শোনা যাক-না কী বলে।
ঠাকুরদা। রাজা এসেছেন।
বিদর্ভ। (সচকিত হইয়া) রাজা!
পাঞ্চাল। কোন্ রাজা।
কলিঙ্গ। কোথাকার রাজা।
ঠাকুরদা। আমার রাজা।
বিরাট। তোমার রাজা!
কলিঙ্গ। কে।
কোশল। কে সে।
ঠাকুরদা। আপনারা সকলেই জানেন তিনি কে। তিনি এসেছেন।
বিদর্ভ। এসেছেন?
কোশল। কী তাঁর অভিপ্রায়।
ঠাকুরদা। তিনি আপনাদের আহ্বান করেছেন।
কাঞ্চী। ইস্! আহ্বান! কী ভাবে আহ্বান করেছেন।
ঠাকুরদা। তাঁর আহ্বান যিনি যেভাবে গ্রহণ করতে ইচ্ছা কবেন বাধা নেই— সকলপ্রকার অভ্যর্থনাই প্রস্তুত আছে।
বিরাট। তুমি কে।
ঠাকুরদা। আমি তাঁর সেনাপতিদের মধ্যে একজন।
কাঞ্চী। সেনাপতি? মিথ্যে কথা। ভয় দেখাতে এসেছ? তুমি মনে করেছ তোমার ছদ্মবেশ আমার কাছে ধরা পড়ে নি? তোমাকে বিলক্ষণ চিনি। তুমি আবার সেনাপতি!
ঠাকুরদা। আপনি আমাকে ঠিক চিনেছেন। আমার মতো অক্ষম কে আছে। তবু আমাকেই আজ তিনি সেনাপতির বেশ পরিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন— বড়ো বড়ো বীরদের ঘরে বসিয়ে রেখেছেন।
কাঞ্চী। আচ্ছা, উপযুক্ত সমারোহে আমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাব— কিন্তু উপস্থিত একটা কাজ আছে,

সেটা শেষ হওয়া পর্যন্ত তাঁকে অপেক্ষা করতে হবে।

ঠাকুরদা। যখন তিনি আহ্বান করেন তখন তিনি আর অপেক্ষা করেন না।

কোশল। আমি তাঁর আহ্বান স্বীকার করছি। এখনই যাব।

বিদর্ভ। কাঞ্চীরাজ, অপেক্ষা করার কথাটা ভালো ঠেকছে না। আমি চললুম।

কলিঙ্গ। আপনি প্রবীণ, আমরা আপনারই অনুসরণ করব।

পাঞ্চাল। ওহে কাঞ্চীরাজ, পিছনে চেয়ে দেখো, তোমার রাজছত্র ধুলায় লুটোচ্ছে ; তোমার ছত্রধর কখন পালিয়েছে জানতেও পার নি।

কাঞ্চী। আচ্ছা, আমিও যাচ্ছি রাজদূত ! কিন্তু সভায় নয়, রণক্ষেত্রে।

ঠাকুরদা। রণক্ষেত্রেই আমার প্রভুর সঙ্গে আপনার পরিচয় হবে, সেও অতি উত্তম প্রশস্ত স্থান।

বিরাট। ওহে, আমরা সকলে হয়তো কাল্পনিক ভয়ে ভঙ্গ দিচ্ছি— শেষকালে দেখছি একা কাঞ্চীরাজেরই জিত হবে।

পাঞ্চাল। তা হতে পারে। ফলটা প্রায় হাতের কাছে এসেছে, এখন ভীরুতা করে সেটা ফেলে যাওয়া ভালো হচ্ছে না।

কলিঙ্গ। কাঞ্চীর সঙ্গে যোগ দেওয়াই শ্রেয়। ও যখন এতটা সাহস করছে তখন ও কি কিছু বিবেচনা না করেই করছে।

১৬

সুদর্শনা ও সুরঙ্গমা

সুদর্শনা। যুদ্ধ তো শেষ হয়ে গেল। এখন আমার রাজা আসবেন কখন।

সুরঙ্গমা। তা তো বলতে পারি নে— পথ চেয়ে বসে আছি।

সুদর্শনা। সুরঙ্গমা, বুকের ভিতরটাতে আনন্দে এমন কাঁপছে যে, বেদনাবোধ হচ্ছে। লজ্জাতেও মরে যাচ্ছি— মুখ দেখাব কেমন করে !

সুরঙ্গমা। এবার একেবারে হার মেনে তাঁর কাছে যাও, তা হলে আর লজ্জা থাকবে না।

সুদর্শনা। স্বীকার তো করতেই হবে চিরদিনের মতো আমার হার হয়ে গেছে, কিন্তু এতদিন গর্ব করে তাঁর কাছে সকলের চেয়ে বেশি আদরের দাবি করে এসেছি কিনা— সেটা একেবারে ছেড়ে দিতে পারছি নে। সবাই যে বলত, আমার অনেক রূপ, অনেক গুণ ! সবাই যে বলত, আমার উপরে রাজার অনুগ্রহের অন্ত নেই ! সেইজন্যেই তো সকলের সামনে আমার হৃদয় নত হতে এত লজ্জা বোধ করছে।

সুরঙ্গমা। অভিমান না ঘুচলে তো লজ্জাও ঘুচবে না।

সুদর্শনা। তাঁর কাছ থেকে আদর পাবার ইচ্ছা যে কিছুতে মন থেকে ঘুচতে চায় না।

সুরঙ্গমা। সব ঘুচবে রানীমা ! কেবল একটি ইচ্ছা থাকবে, নিজেকে নিবেদন করবার ইচ্ছা।

সুদর্শনা। সেই আঁধার ঘরের ইচ্ছা— দেখা নয়, শোনা নয়, চাওয়া নয়, কেবল গভীরের মধ্যে আপনাকে ছেড়ে দেওয়া ! সুরঙ্গমা, সেই আশীর্বাদ কর্ যেন—

সুরঙ্গমা। কী বল তুমি ! আমি আশীর্বাদ করব কিসের !

সুদর্শনা। সকলের কাছে নত হয়ে আমি আশীর্বাদ নেব। সবাই বলত, এত প্রসাদ রাজা আর কাউকে দেন নি। তাই শুনে হৃদয় এত শক্ত হয়েছে যে, আমার রাজাকেও আঘাত করতে পেরেছি। এত শক্ত হয়েছে যে, নুইতে লজ্জা করছে। এ লজ্জা কাটাতে হবে— সমস্ত পৃথিবীর কাছে নিচু হবার দিন আমার এসেছে। কিন্তু কই, রাজা এখনো কেন আমাকে নিতে আসছেন না। আরো কিসের জন্যে তিনি অপেক্ষা করছেন।

সুরঙ্গমা। আমি তো বলেছি, আমার রাজা নিষ্ঠুর— বড়ো নিষ্ঠুর।

সুদর্শনা। সুরঙ্গমা, তুই যা, একবার তাঁর খবর নিয়ে আয় গে।

সুরঙ্গমা। কোথায় তাঁর খবর নেব তা তো কিছুই জানি নে। ঠাকুরদাকে ডাকতে পাঠিয়েছি— তিনি এলে হয়তো তাঁর কাছ থেকে সংবাদ পাওয়া যাবে।

ঠাকুরদার প্রবেশ

সুদর্শনা। শুনেছি, তুমি আমার রাজার বন্ধু— আমার প্রণাম গ্রহণ করো, আমাকে আশীর্বাদ করো।

ঠাকুরদা। কর কী, কর কী রানী! আমি কারও প্রণাম গ্রহণ করি নে। আমার সঙ্গে সকলের হাসির সম্বন্ধ।

সুদর্শনা। তোমার সেই হাসি দেখিয়ে দাও, আমাকে সুসংবাদ দিয়ে যাও। বলো, আমার রাজা কখন আমাকে নিতে আসবেন।

ঠাকুরদা। ঐ তো বড়ো শক্ত কথা জিজ্ঞাসা করলে। আমার বন্ধুর ভাবগতিক কিছুই বুঝি নে, তার আর বলব কী। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল— তিনি যে কোথায় তার সন্ধান নেই।

সুদর্শনা। চলে গিয়েছেন!

ঠাকুরদা। সাড়াশব্দ তো কিছুই পাই নে।

সুদর্শনা। চলে গিয়েছেন! তোমার বন্ধু এমনি বন্ধু!

ঠাকুরদা। সেইজন্যে লোকে তাকে নিন্দেও করে, সন্দেহও করে। কিন্তু আমার রাজা তাতে খেয়ালও করে না।

সুদর্শনা। চলে গেলেন! ওরে ওরে, কী কঠিন, কী কঠিন! একেবারে পাথর, একেবারে বজ্র! সমস্ত বুক দিয়ে ঠেলছি— বুক ফেটে গেল— কিন্তু নড়ল না!

ঠাকুরদা, এমন বন্ধুকে নিয়ে তোমার চলে কী করে।

ঠাকুরদা। চিনে নিয়েছি যে— সুখে দুঃখে তাকে চিনে নিয়েছি— এখন আর সে কাঁদাতে পারে না।

সুদর্শনা। আমাকেও সে কি চিনতে দেবে না।

ঠাকুরদা। দেবে বৈকি— নইলে এত দুঃখ দিচ্ছে কেন। ভালো করে চিনিয়ে তবে ছাড়বে। সে তো সহজ লোক নয়।

সুদর্শনা। আচ্ছা আচ্ছা, দেখ্‌ব তার কতবড়ো নিষ্ঠুরতা। এই জানলার কাছে আমি চুপ করে পড়ে থাকব, এক পা নড়ব না— দেখি সে কেমন না আসে।

ঠাকুরদা। দিদি, তোমার বয়স অল্প, জেদ করে অনেক দিন পড়ে থাকতে পার। কিন্তু আমার যে এক মুহূর্ত গেলেও লোকসান বোধ হয়। পাই না-পাই একবার খুঁজতে বেরোব।

[প্রস্থান

সুদর্শনা। চাই নে, তাকে চাই নে। সুরঙ্গমা, তোর রাজাকে আমি চাই নে। কিসের জন্যে সে যুদ্ধ করতে এল। আমার জন্যে একেবারেই না? কেবল বীরত্ব দেখাবার জন্যে?

সুরঙ্গমা। দেখাবার ইচ্ছে তাঁর যদি থাকত তা হলে এমন করে দেখাতেন, কারও আর সন্দেহ থাকত না। দেখালেন আর কই।

সুদর্শনা। যা যা, চলে যা— তোর কথা অসহ্য বোধ হচ্ছে। এত নত করলে তবু সাধ মিটল না? বিশ্বসুদ্ধ লোকের সামনে আমাকে এইখানে ফেলে রেখে দিয়ে চলে গেল?

১৭

নাগরিকদল

প্রথম। ওহে, এতগুলো রাজা একত্র হয়ে লড়াই বাধিয়ে দিলে, ভাবলুম খুব তামাশা হবে— কিন্তু দেখতে দেখতে কী যে হয়ে গেল ভালো বোঝাই গেল না।

দ্বিতীয়। দেখলে না ? ওদের নিজেদের মধ্যেই গোলমাল বেধে গেল— কেউ যে কাউকে বিশ্বাস করে না।

তৃতীয়। পরামর্শ ঠিক রইল না যে। কেউ এগোতে চায়, কেউ পিছোতে চায় ; কেউ এ দিকে যায়, কেউ ও দিকে যায়, একে কি আর যুদ্ধ বলে।

প্রথম। ওরা তো লড়াইয়ের দিকে চোখ রাখে নি— ওরা পরস্পরের দিকেই চোখ রেখেছিল।

দ্বিতীয়। কেবলই ভাবছিল— লড়াই করে মরব আমি, আর তার ফল ভোগ করবে আর-কেউ।

তৃতীয়। কিন্তু লড়েছিল কাঞ্চীরাজ, সে কথা বলতেই হবে।

প্রথম। সে যে হেরেও হারতে চায় না।

দ্বিতীয়। শেষকালে অস্ত্রটা একেবারে তার বুকে এসে লাগল।

তৃতীয়। তার আগে সে যে পদে পদেই হারছিল তা যেন টেরও পাচ্ছিল না।

প্রথম। অন্য রাজারা তো তাকে ফেলে কে কোথায় পালাল তার ঠিক নেই।

দ্বিতীয়। কিন্তু শুনেছি, কাঞ্চীরাজ মরে নি।

তৃতীয়। না, চিকিৎসায় বেঁচে গেল, কিন্তু তার বুকের মধ্যে যে হারের চিহ্নটা আঁকা রইল সে তো আর এ জন্মে মুছবে না।

প্রথম। রাজারা কেউ পালিয়ে রক্ষা পায় নি, সবাই ধরা পড়েছে। কিন্তু বিচারটা কিরকম হল।

দ্বিতীয়। আমি শুনেছি, সকল রাজারই দণ্ড হয়েছে, কেবল কাঞ্চীর রাজাকে বিচার-কর্তা নিজের সিংহাসনের দক্ষিণপার্শ্বে বসিয়ে স্বহস্তে তার মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দিয়েছে।

তৃতীয়। এটা কিন্তু একেবারেই বোঝা গেল না।

দ্বিতীয়। বিচারটা যেন কেমন বেখাপ রকম শোনাচ্ছে।

প্রথম। তা তো বটেই। অপরাধ যা-কিছু করেছে সে তো ঐ কাঞ্চীর রাজা। এরা তো একবার লোভে, একবার ভয়ে, কেবল এগোচ্ছিল আর পিছোচ্ছিল।

তৃতীয়। এ কেমন হল। যেন বাঘটা গেল বেঁচে আর তার লেজটা গেল কাটা।

দ্বিতীয়। আমি যদি বিচারক হতুম তা হলে কাঞ্চীকে কি আর আস্ত রাখতুম। ওর আর চিহ্ন দেখাই যেত না।

তৃতীয়। কী জানি ভাই, মস্ত মস্ত বিচারকর্তা— ওদের বুদ্ধি একরকমের !

প্রথম। ওদের বুদ্ধি বলে কিছু আছে কি। ওদের সবই মর্জি। কেউ তো বলবার লোক নেই।

দ্বিতীয়। যা বলিস ভাই, আমাদের হাতে শাসনের ভার যদি পড়ত তা হলে এর চেয়ে ঢের ভালো করে চালাতে পারতুম।

তৃতীয়। সে কি একবার করে বলতে।

১৮

পথ

ঠাকুরদা ও কাঞ্চীরাজ

ঠাকুরদা। এ কী কাঞ্চীরাজ, তুমি পথে যে !

কাঞ্চী। তোমার রাজা আমায় পথেই বের করেছে।

ঠাকুরদা। ঐ তো তার স্বভাব।

কাঞ্চী। তার পরে আর নিজের দেখা নেই।

ঠাকুরদা। সেও তার এক কৌতুক।

কাঞ্চী। কিন্তু আমাকে এমন করে আর কতদিন এড়াবে। যখন কিছুতেই তাকে রাজা বলে মানতেই চাই নি তখন কোথা থেকে কালবৈশাখীর মতো এসে এক মুহূর্তে আমার ধ্বজা পতাকা ভেঙে উড়িয়ে ছারখার করে দিলে ; আর, আজ তার কাছে হার মানবার জন্যে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি, তার আর দেখাই নেই।

ঠাকুরদা। তা হোক, সে যত বড়ো রাজাই হোক, হার-মানার কাছে তাকে হার মানতেই হবে। কিন্তু রাজন্, রাত্রে বেরিয়েছ যে ?

কাঞ্চী। ঐ লজ্জাটুকু এখনো ছাড়তে পারি নি। কাঞ্চীর রাজা থালায় মুকুট সাজিয়ে তোমার রাজার মন্দির খুঁজে বেড়াচ্ছে এই যদি দিনের আলোয় লোকে দেখে তা হলে যে তারা হাসবে।

ঠাকুরদা। লোকের ঐ দশা বটে। যা দেখে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে যায়, তাই দেখেই বাঁদররা হাসে।

কাঞ্চী। কিন্তু ঠাকুরদা, তোমার এ কী কাণ্ড ! সেই উৎসবের ছেলেদের এখানেও জুটিয়ে এনেছ ? কিন্তু সেখানে যারা তোমার পিছে পিছে ঘুরত তাদের দেখছি নে বড়ো।

ঠাকুরদা। আমার শম্ভু-সুধনের দল ? তারা এবার লড়াইয়ে মরেছে।

কাঞ্চী। মরেছে ?

ঠাকুরদা। হাঁ, তারা আমাকে বললে, ঠাকুরদা, পণ্ডিতরা যা বলে আমরা কিছুই বুঝতে পারি নে, তুমি যে গান গাও তার সঙ্গেও গলা মেলাতে পারি নে, কিন্তু একটা কাজ আমরা করতে পারি— আমরা মরতে পারি। আমাদের যুদ্ধে নিয়ে যাও, জীবনটা সার্থক করে আসি। তা, যেমন কথা তেমন কাজ। সকলের আগে গিয়ে তারা দাঁড়াল, সকলের আগেই তারা প্রাণ দিয়ে বসে আছে।

কাঞ্চী। সিধে রাস্তা ধরে সব বুদ্ধিমানদের চেয়ে এগিয়ে গেল আর-কি। এখন এই ছেলের দল নিয়ে কী বাল্যলীলাটা চলছে।

ঠাকুরদা। এবারকার বসন্ত-উৎসবটা নানা ক্ষেত্রে নানারকম হয়ে গেল, তাই সকল পালার মধ্যে দিয়ে এদের ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি। সেদিন বাগানের মধ্যে দিয়ে দিব্যি লাল হয়ে উঠেছিল— রণক্ষেত্রেও মন্দ জমে নি। সে তো চুকল, আজ আবার আমাদের বড়ো রাস্তার বড়োদিন। আজ ঘরের মানুষদের পথে বের করবার জন্যে দক্ষিণ-হাওয়ার মতো দলবল নিয়ে বেরিয়েছি। ধর্ তো রে ভাই, তোদের সেই দরজায় ঘা দেবার গানটা ধর্।

গান

আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে।
তব অবগুণ্ঠিত কুণ্ঠিত জীবনে
 কোরো না বিড়ম্বিত তারে।
আজি খুলিয়ো হৃদয়দল খুলিয়ো,
আজি ভুলিয়ো আপন-পর ভুলিয়ো,
এই সংগীতমুখরিত গগনে
তব গন্ধ তরঙ্গিয়া তুলিয়ো।
এই বাহির ভুবনে দিশা হারায়ে
দিয়ো ছড়ায়ে মাধুরী ভারে ভারে।
অতি নিবিড় বেদনা বনমাঝে রে
আজি পল্লবে পল্লবে বাজে রে।
দূরে গগনে কাহার পথ চাহিয়া
আজি ব্যাকুল বসুন্ধরা সাজে রে।

মোর পরানে দখিনবায়ু লাগিছে—
কারে দ্বারে দ্বারে কর হানি মাগিছে।
এই সৌরভবিহ্বলা রজনী
কার চরণে ধরণীতলে জাগিছে।
ওগো সুন্দর, বল্লভ, কান্ত,
তব গম্ভীর আহ্বান কারে॥

১৯

পথ

সুদর্শনা ও সুরঙ্গমা

সুদর্শনা। বেঁচেছি, বেঁচেছি সুরঙ্গমা! হার মেনে তবে বেঁচেছি। ওরে বাস্‌ রে! কী কঠিন অভিমান! কিছুতেই গলতে চায় না। আমার রাজা কেন আমার কাছে আসতে যাবে, আমিই তাঁর কাছে যাব, এই কথাটা কোনোমতেই মনকে বলাতে পারছিলুম না। সমস্ত রাতটা সেই জানালায় পড়ে ধুলোয় লুটিয়ে কেঁদেছি, দক্ষিনে হাওয়া বুকের বেদনার মতো হুহু করে বয়েছে, আর কৃষ্ণচতুর্দশীর অন্ধকারে বউ-কথা-কও চার' পহর রাত কেবলই ডেকেছে— সে যেন অন্ধকারের কান্না।

সুরঙ্গমা। আহা, কালকের রাতটা মনে হয়েছিল যেন কিছুতেই আর পোহাতে চায় না।

সুদর্শনা। কিন্তু বললে বিশ্বাস করবি নে, তারই মধ্যে বার বার আমার মনে হচ্ছিল, কোথায় তার বীণা বাজছিল। যে নিষ্ঠুর তার কঠিন হাতে কি অমন মিনতির সুর বাজে। ব্যইরের লোক আমার অসম্মানটাই দেখে গেল, কিন্তু গোপন রাত্রের সেই সুরটা কেবল আমার হৃদয় ছাড়া আর তো কেউ শুনল না। সে বীণা তুই কি শুনেছিলি সুরঙ্গমা! না, সে আমার স্বপ্ন?

সুরঙ্গমা। সেই বীণা শুনব বলেই তো তোমার কাছে কাছে আছি। অভিমান-গলানো সুর বাজবে জেনেই কান পেতে পড়ে ছিলুম।

সুদর্শনা। তার পণটাই রইল, পথে বের করলে তবে ছাড়লে। মিলন হলে এই কথাটাই তাকে বলব যে, আমিই এসেছি, তোমার আসার অপেক্ষা করি নি। বলব, চোখের জল ফেলতে ফেলতে এসেছি, কঠিন পথ ভাঙতে ভাঙতে এসেছি। এ গর্ব আমি ছাড়ব না।

সুরঙ্গমা। কিন্তু সে গর্বও তোমার টিকবে না। সে যে তোমারও আগে এসেছিল, নইলে তোমাকে বের করে কার সাধ্য।

সুদর্শনা। তা হয়তো এসেছিল। আভাস পেয়েছিলুম, কিন্তু বিশ্বাস করতে পারি নি। যতক্ষণ অভিমান করে বসে ছিলুম ততক্ষণ মনে হয়েছিল, সেও আমাকে ছেড়ে গিয়েছে। অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে যখনই রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম তখনই মনে হল— সেও বেরিয়ে এসেছে, রাস্তা থেকেই তাকে পাওয়া শুরু করেছি। এখন আমার মনে আর কোনো ভাবনা নেই। তার জন্যে এত যে দুঃখ, এই দুঃখই আমাকে তার সঙ্গ দিচ্ছে। এত কষ্টের রাস্তা আমার পায়ের তলায় যেন সুরে সুরে বেজে উঠছে। এ যেন আমার বীণা, আমার দুঃখের বীণা— এরই বেদনার গানে তিনি এই কঠিন পাথরে এই শুকনো ধুলোয় আপনি বেরিয়ে এসেছেন, আমার হাত ধরেছেন— সেই আমার অন্ধকার ঘরের মধ্যে যেমন করে হাত ধরতেন— হঠাৎ চমকে উঠে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠত— এও সেইরকম। কে বললে তিনি নেই! সুরঙ্গমা, তুই কি বুঝতে পারছিস নে তিনি লুকিয়ে এসেছেন?

সুরঙ্গমার গান

অন্ধকারের মাঝে আমায় ধরেছ দুই হাতে।
কখন তুমি এলে, হে নাথ, মৃদুচরণপাতে।

ভেবেছিলেম, জীবনস্বামী,
তোমায় বুঝি হারাই আমি—
আমায় তুমি হারাবে না বুঝেছি আজ রাতে।
যে নিশীথে আপন হাতে নিবিয়ে দিলেম আলো
তারই মাঝে তুমি তোমার ধ্রুবতারা জ্বালো।
তোমার পথে চলা যখন
ঘুচে গেল, দেখি তখন—
আপনি তুমি আমার পথে লুকিয়ে চল সাথে ॥

সুদর্শনা। ও কে ও ! চেয়ে দেখ্ সুরঙ্গমা, এত রাত্রে এই আঁধার পথে আরো একজন পথিক বেরিয়েছে যে !

সুরঙ্গমা। মা, এ যে কাঞ্চীর রাজা দেখছি।

সুদর্শনা। কাঞ্চীর রাজা ?

সুরঙ্গমা। ভয় কোরো না মা !

সুদর্শনা। ভয় ! ভয় কেন করব। ভয়ের দিন আমার আর নেই।

কাঞ্চীরাজ। (প্রবেশ করিয়া) মা, তুমিও চলেছ বুঝি ? আমিও এই এক পথেরই পথিক। আমাকে কিছুমাত্র ভয় কোরো না।

সুদর্শনা। ভালোই হয়েছে কাঞ্চীরাজ, আমরা দুজনে তাঁর কাছে পাশাপাশি চলেছি, এ ঠিক হয়েছে। ঘর ছেড়ে বেরোবার মুখেই তোমার সঙ্গে আমার যোগ হয়েছিল, আজ ঘরে ফেরবার পথে সেই যোগই যে এমন শুভযোগ হয়ে উঠবে তা আগে কে মনে করতে পারত।

কাঞ্চী। কিন্তু মা, তুমি যে হেঁটে চলেছ এ তো তোমাকে শোভা পায় না। যদি অনুমতি কর তা হলে এখনই রথ আনিয়ে দিতে পারি।

সুদর্শনা। না না, অমন কথা বোলো না— যে পথ দিয়ে তাঁর কাছ থেকে দূরে এসেছি সেই পথের সমস্ত ধুলোটা পা দিয়ে মাড়িয়ে মাড়িয়ে ফিরব, তবেই আমার বেরিয়ে আসা সার্থক হবে। রথে করে নিয়ে গেলে আমাকে ফাঁকি দেওয়া হবে।

সুরঙ্গমা। মহারাজ, তুমিও তো আজ ধুলোয়। এ পথে তো হাতি ঘোড়া রথ কারও দেখি নি।

সুদর্শনা। যখন রানী ছিলুম তখন কেবল সোনারুপোর মধ্যেই পা ফেলেছি, আজ তাঁর ধুলোর মধ্যে চলে আমার সেই ভাগ্যদোষ খণ্ডিয়ে নেব। আজ আমার সেই ধুলোমাটির রাজার সঙ্গে পদে পদে এই ধুলোমাটিতে মিলন হচ্ছে— এ সুখের খবর কে জানত।

সুরঙ্গমা। রানীমা, ঐ দেখো, পূর্ব দিকে চেয়ে দেখো, ভোর হয়ে আসছে। আর দেরি নেই মা— তাঁর প্রাসাদের সোনার চূড়ার শিখর দেখা যাচ্ছে।

গান

ভোর হল বিভাবরী, পথ হল অবসান।
শুন ওই লোকে লোকে উঠে আলোকেরই গান।
ধন্য হলি ওরে পান্থ,
রজনী জাগরক্লান্ত,
ধন্য হল মরি মরি ধুলায় ধূসর প্রাণ।
বনের কোলের কাছে
সমীরণ জাগিয়াছে।
মধুভিক্ষু সারে সারে
আগত কুঞ্জের দ্বারে।

হল তব যাত্রা সারা,
মোছ মোছ অশ্রুধারা,
লজ্জাভয় গেল ঝরি, ঘুচিল রে অভিমান ॥

ঠাকুরদার প্রবেশ

ঠাকুরদা। ভোর হল দিদি, ভোর হল।

সুদর্শনা। তোমাদের আশীর্বাদে পৌঁচেছি ঠাকুরদা, পৌঁচেছি।

ঠাকুরদা। কিন্তু আমাদের রাজার রকম দেখেছ? রথ নেই, বাদ্য নেই, সমারোহ নেই।

সুদর্শনা। বল কী, সমারোহ নেই? ঐ-যে আকাশ একেবারে রাঙা, ফুলগন্ধের অভ্যর্থনায় বাতাস একেবারে পরিপূর্ণ।

ঠাকুরদা। তা হোক। আমাদের রাজা যত নিষ্ঠুর হোক, আমরা তো তেমন কঠিন হতে পারি নি— আমাদের যে ব্যথা লাগে। এই দীনবেশে তুমি রাজভবনে যাচ্ছ, এ কি আমরা সহ্য করতে পারি। একটু দাঁড়াও, আমি ছুটে গিয়ে তোমার রানীর বেশটা নিয়ে আসি।

সুদর্শনা। না না না! সে রানীর বেশ তিনি আমাকে চিরদিনের মতো ছাড়িয়েছেন, সবার সামনে আমাকে দাসীর বেশ পরিয়েছেন— বেঁচেছি, বেঁচেছি। আমি আজ তাঁর দাসী— যে-কেউ তাঁর আছে, আমি আজ সকলের নীচে।

ঠাকুরদা। শত্রুপক্ষ তোমার এ দশা দেখে পরিহাস করবে সেইটে আমাদের অসহ্য হয়।

সুদর্শনা। শত্রুপক্ষের পরিহাস অক্ষয় হোক, তারা আমার গায়ে ধুলো দিক। আজকের দিনের অভিসারে সেই ধুলোই যে আমার অঙ্গরাগ।

ঠাকুরদা। এর উপরে আর কথা নেই। এখন আমাদের বসন্ত-উৎসবের শেষ খেলাটাই চলুক— ফুলের রেণু এখন থাক্, দক্ষিনে হাওয়ায় এবার ধুলো উড়িয়ে দিক। সকলে মিলে আজ ধূসর হয়ে প্রভুর কাছে যাব। গিয়ে দেখব তার গায়েও ধুলো মাখা। তাকে বুঝি কেউ ছাড়ে মনে করছ? যে পায়, তার গায়ে মুঠো মুঠো ধুলো দেয় যে! সে ধুলো সে ঝেড়েও ফেলে না।

কাঞ্চী। ঠাকুরদা, তোমাদের এই ধুলোর খেলায় আমাকে ভুলো না। আমার এই রাজবেশটাকে এমনি মাটি করে নিয়ে যেতে হবে যাতে একে আর চেনা না যায়।

ঠাকুরদা। সে আর দেরি হবে না ভাই! যেখানে নেবে এসেছ এখানে যত তোমার মিথ্যে মান সব ঘুচে গেছে, এখন দেখতে দেখতে রঙ ফিরে যাবে। আর, এই আমাদের রানীকে দেখো— ও নিজের উপর ভারি রাগ করেছিল— মনে করেছিল, গয়না ফেলে দিয়ে নিজের ভুবনমোহন রূপকে লাঞ্ছনা দেবে— কিন্তু, সে রূপ অপমানের আঘাতে আরো ফুটে পড়েছে, সে যেন কোথাও আর কিছু ঢাকা নেই। আমাদের রাজাটির নিজের নাকি রূপের সম্পর্ক নেই, তাই তো এই বিচিত্র রূপ সে এত ভালোবাসে, এই রূপই তো তার বক্ষের অলংকার। সেই রূপ আপনার গর্বের আবরণ ঘুচিয়ে দিয়েছে। আজ আমার রাজার ঘরে কী সুরে যে এতক্ষণে বীণা বেজে উঠেছে তাই শোনবার জন্যে প্রাণটা ছট্‌ফট্ করছে।

সুরঙ্গমা। ঐ-যে সূর্য উঠল।

২০

অন্ধকার ঘর

সুদর্শনা। প্রভু, যে আদর কেড়ে নিয়েছ সে আদর আর ফিরিয়ে দিয়ো না। আমি তোমার চরণের দাসী, আমাকে সেবার অধিকার দাও।

রাজা। আমাকে সইতে পারবে?

সুদর্শনা। পারব রাজা, পারব। আমার প্রমোদবনে, আমার রানীর ঘরে, তোমাকে দেখতে চেয়েছিলুম বলেই তোমাকে এমন বিরূপ দেখেছিলুম— সেখানে তোমার দাসের অধম দাসকেও তোমার চেয়ে চোখে সুন্দর ঠেকে। তোমাকে তেমন করে দেখবার তৃষ্ণা আমার একেবারে ঘুচে গেছে। তুমি সুন্দর নও প্রভু, সুন্দর নও, তুমি অনুপম।

রাজা। তোমারই মধ্যে আমার উপমা আছে।

সুদর্শনা। যদি থাকে তো সেও অনুপম। আমার মধ্যে তোমার প্রেম আছে, সেই প্রেমেই তোমার ছায়া পড়ে, সেইখানেই তুমি আপনার রূপ আপনি দেখতে পাও। সে আমার কিছুই নয়, সে তোমার।

রাজা। আজ এই অন্ধকার ঘরের দ্বার একেবারে খুলে দিলুম। এখানকার লীলা শেষ হল। এসো, এবার আমার সঙ্গে এসো, বাইরে চলে এসো— আলোয়।

সুদর্শনা। যাবার আগে আমার অন্ধকারের প্রভুকে, আমার নিষ্ঠুরকে, আমার ভয়ানককে প্রণাম করে নিই।

অচলায়তন

আন্তরিক শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপে
এই অচলায়তন নাটকখানি
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের নামে
উৎসর্গ করিলাম।

শিলাইদহ
১৫ আষাঢ় ১৩১৮

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অচলায়তন

১

অচলায়তনের গৃহ

গান

পঞ্চক। তুমি ডাক দিয়েছ কোন্ সকালে
কেউ তা জানে না,
আমার মন যে কাঁদে আপন মনে,
কেউ তা মানে না।
ফিরি আমি উদাস প্রাণে,
তাকাই সবার মুখের পানে,
তোমার মতন এমন টানে
কেউ তো টানে না।

মহাপঞ্চকের প্রবেশ

মহাপঞ্চক। গান! আবার গান।

পঞ্চক। দাদা, তুমি তো দেখলে— তোমাদের এখানকার মন্ত্র-তন্ত্র আচার-আচমন সূত্র-বৃত্তি কিছুই পারলুম না।

মহাপঞ্চক। সে তো দেখতে বাকি নেই— কিন্তু সেটা কি খুব আনন্দ করবার বিষয়? তাই নিয়ে কি গলা ছেড়ে গান গাইতে হবে?

পঞ্চক। একমাত্র ঐটেই যে পারি।

মহাপঞ্চক। পারি! ভারি অহংকার। গান তো পাখিও গাইতে পারে। সেই যে বজ্রবিদারণ-মন্ত্রটা আজ সাত দিন ধরে তোমার মুখস্থ হল না, আজ তার কী করলে?

পঞ্চক। সাত দিন যেমন হয়েছে অষ্টম দিনেও অনেকটা সেইরকম। বরঞ্চ একটু খারাপ।

মহাপঞ্চক। খারাপ! তার মানে কী হল?

পঞ্চক। জিনিসটা যতই পুরোনো হচ্ছে মন ততই লাগছে না, ভুল ততই করছি— ভুল যতই বেশি বার করছি ততই সেইটেই পাকা হয়ে যাচ্ছে। তাই, গোড়ায় তোমরা যেটা বলে দিয়েছিলে আর আজ আমি যেটা আওড়াচ্ছি, দুটোর মধ্যে অনেকটা তফাত হয়ে গেছে। চেনা শক্ত।

মহাপঞ্চক। সেই তফাতটা ঘোচাতে হবে নির্বোধ।

পঞ্চক। সহজেই ঘোচে যদি তোমাদেরটাকেই আমার মতো করে নাও। নইলে আমি তো পারব না।

মহাপঞ্চক। পারবে না কী! পারতেই হবে।

পঞ্চক। তা হলে আর-একবার সেই গোড়া থেকে চেষ্টা করে দেখি— একবার মন্ত্রটা আউড়ে দিয়ে যাও।

মহাপঞ্চক। আচ্ছা বেশ, আমার সঙ্গে আবৃত্তি করে যাও। ওঁ তট তট তোতয় তোতয় স্ফট স্ফট

স্ফোটয় স্ফোটয় ঘুণ ঘুণ ঘুণাপয় ঘুণাপয় স্বর বসত্বানি। চুপ করে রইলে যে!

পঞ্চক। ওঁ তট তট তোতয় তোতয়— আচ্ছা দাদা।

মহাপঞ্চক। আবার দাদা। মন্ত্রটা শেষ করো বলছি।

পঞ্চক। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি— এ মন্ত্রটার ফল কী?

মহাপঞ্চক। এ মন্ত্র প্রত্যহ সূর্যোদয়-সূর্যাস্তে উনসত্তর বার করে জপ করলে নব্বই বৎসর পরমায়ু হয়।

পঞ্চক। রক্ষা করো দাদা। এটা জপ করতে গিয়ে আমার এক বেলাকেই নব্বই বছর মনে হয়— দ্বিতীয় বেলায় মনে হয় মরেই গেছি।

মহাপঞ্চক। আমার ভাই হয়েও তোমার এই দশা! তোমার জন্যে আমাদের এই অচলায়তনের সকলের কাছে কি আমার কম লজ্জা!

পঞ্চক। লজ্জার তো কোনো কারণ নেই দাদা।

মহাপঞ্চক। কারণ নেই?

পঞ্চক। না। তোমার পাণ্ডিত্যে সকলে আশ্চর্য হয়ে যায়। কিন্তু তার চেয়ে ঢের বেশি আশ্চর্য হয় তুমি আমারই দাদা বলে।

মহাপঞ্চক। এই বানরটার উপর রাগ করাও শক্ত। দেখো পঞ্চক, তুমি তো আর বালক নও— তোমার এখন বিচার করে দেখবার বয়স হয়েছে।

পঞ্চক। তাই তো বিপদে পড়েছি। আমি যা বিচার করি তোমাদের বিচার একেবারে তার উলটো দিকে চলে, অথচ তার জন্য যা দণ্ড সে আমাকে একলাই ভোগ করতে হয়।

মহাপঞ্চক। পিতার মৃত্যুর পর কী দরিদ্র হয়ে, সকলের কী অবজ্ঞা নিয়েই এই আয়তনে আমরা প্রবেশ করেছিলুম, আর আজ কেবল নিজের শক্তিতে সেই অবজ্ঞা কাটিয়ে কত উপরে উঠেছি— আমার এই দৃষ্টান্তও কি তোমাকে একটু সচেষ্ট করে না?

পঞ্চক। সচেষ্ট করবার তো কথা নয়। তুমি যে নিজগুণেই দৃষ্টান্ত হয়ে বসে আছ, ওর মধ্যে আমার চেষ্টার তো কিছুমাত্র দরকার হয় না। তাই নিশ্চিন্ত আছি।

মহাপঞ্চক। ঐ শঙ্খ বাজল। এখন আমার সপ্তকুমারিকাগাথা পাঠের সময়। কিন্তু বলে যাচ্ছি, সময় নষ্ট কোরো না।

[প্রস্থান

গান

পঞ্চক।

বেজে ওঠে পঞ্চমে স্বর,
কেঁপে ওঠে বন্ধ এ ঘর,
বাহির হতে দুয়ারে কর
কেউ তো হানে না।
আকাশে কার ব্যাকুলতা,
বাতাস বহে কার বারতা,
এ পথে সেই গোপন কথা
কেউ তো আনে না।
তুমি ডাক দিয়েছ কোন্ সকালে
কেউ তা জানে না॥

ছাত্রদলের প্রবেশ

প্রথম ছাত্র। ওহে পঞ্চক।

পঞ্চক। না ভাই, আমাকে বিরক্ত কোরো না।

দ্বিতীয় ছাত্র। কেন ? হল কী তোমার ?

পঞ্চক। ওঁ তট তট তোতয় তোতয়—

তৃতীয় ছাত্র। এখনো তট তট তোতয় তোতয় ঘুচল না ? ও যে আমাদের কোন্ কালে শেষ হ' গেছে তা মনেও আনতে পারি নে।

প্রথম ছাত্র। না ভাই, পঞ্চককে একটু পড়তে দাও ; নইলে ওর কী গতি হবে ! এখনো ও বেচা তট তট করে মরছে— আমাদের যে ধ্বজাগ্রকেয়ূরী পর্যন্ত শেষ হয়ে গেছে !

দ্বিতীয় ছাত্র। আচ্ছা পঞ্চক, এখনো তুমি চক্রেশমন্ত্র শেখ নি ?

পঞ্চক। না।

তৃতীয় ছাত্র। মরীচি ?

পঞ্চক। না।

প্রথম ছাত্র। মহামরীচি ?

পঞ্চক। না।

দ্বিতীয় ছাত্র। পর্ণশবরী ?

পঞ্চক। না।

দ্বিতীয় ছাত্র। আচ্ছা বলো দেখি, হরেত পক্ষীর নখাগ্রে যে পরিমাণ ধূলিকণা লাগে সেই পরিমা' যদি—

পঞ্চক। আরে ভাই, হরেত পক্ষীই কোনো জন্মে দেখি নি তো তার নখাগ্রের ধূলিকণা !

প্রথম ছাত্র। হরেত পক্ষী তো আমরাও কেউ দেখি নি। শুনেছি, সে দধিসমুদ্রের পারে মহাজম্বুদ্বীপে বাস করে। কিন্তু এ-সমস্ত তো জানা চাই, নিতান্ত মূর্খ হয়ে জীবনটাকে মাটি করলে তো চলবে না।

দ্বিতীয় ছাত্র। পঞ্চক, তুমি আর বৃথা সময় নষ্ট কোরো না। তোমার কাছে তো কেউ বেশি আশা করে না। অন্তত শৃঙ্গভেরিব্রত, কাকচঞ্চুপরীক্ষা, ছাগলোমশোধন, দ্বাবিংশপিশাচভয়ভঞ্জন— এগুলো তো জানা চাইই ; নইলে তুমি অচলায়তনের ছাত্র বলে লোকসমাজে পরিচয় দেবে কোন্ লজ্জায় ?

তৃতীয় ছাত্র। চলো বিশ্বম্ভর, আমরা যাই। ও একটু পড়ুক।

গমনোদ্যত

পঞ্চক। ওহে বিশ্বম্ভর। তট তট তোতয় তোতয়—

বিশ্বম্ভর। কেন। আবার ডাকো কেন ?

পঞ্চক। সঞ্জীব, জয়োত্তম, তট তট তোতয় তোতয়—

সঞ্জীব। কী হয়েছে ? পড়ো-না !

পঞ্চক। দোহাই তোমাদের, একেবারে চলে যেয়ো না। ঐ শব্দগুলো আওড়াতে আওড়াতে মাঝে মাঝে বুদ্ধিমান জীবের মুখ দেখলে তবু আশ্বাস হয় যে, জগৎটা বিধাতাপুরুষের প্রলাপ নয়।

জয়োত্তম। না হে, মহাপঞ্চক বড়ো রাগ করেন। তিনি মনে করেন, তোমার যে কিছু হচ্ছে না তার কারণ আমরা।

পঞ্চক। আমি যে কারও কোনো সাহায্য না নিয়ে কেবলমাত্র নিজগুণেই অকৃতার্থ হতে পারি, দাদা আমার এটুকু ক্ষমতাও স্বীকার করেন না, এতেই আমি বড়ো দুঃখিত হই। আচ্ছা ভাই, তোমরা ঐখানে একটু তফাতে বসে কথাবার্তা কও। যদি দেখ একটু অন্যমনস্ক হয়েছি, আমাকে সতর্ক করে দিয়ো। স্ফট স্ফট স্ফোটয় স্ফোটয়—

জয়োত্তম। আচ্ছা বেশ, এইখানে আমরা বসছি।

সঞ্জীব। বিশ্বম্ভর, তুমি যে বললে এবার আমাদের আয়তনে গুরু আসবেন, সেটা শুনলে কার কাছ থেকে ?

বিশ্বম্ভর। কী জানি, কারা সব বলা-কওয়া করছিল। কেমন করে চারি দিকেই রটে গিয়েছে যে, চাতুর্মাস্যের সময় গুরু আসবেন।

পঞ্চক। ওহে বিশ্বম্ভর, বল কি ? আমাদের গুরু আসবেন নাকি ?

সঞ্জীব। আবার পঞ্চক ! তোমার কাজ তুমি করো-না।

পঞ্চক। ঘুণ ঘুণ ঘুণাপয় ঘুণাপয়—

জয়োত্তম। কিন্তু অধ্যাপকদের কারও কাছে শুনেছ কি ? মহাপঞ্চক কী বলেন ?

বিশ্বম্ভর। তাঁকে জিজ্ঞাসা করাই বৃথা। মহাপঞ্চক কারও প্রশ্নের উত্তর দিয়ে সময় নষ্ট করেন না। আজকাল তিনি আর্যঅষ্টোত্তরশত নিয়ে পড়েছেন— তাঁর কাছে ঘেঁষে কে !

পঞ্চক। চলো-না ভাই, আচার্যদেবের কাছে যাই। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেই—

জয়োত্তম। আবার ! ফের !

পঞ্চক। ঘুণ ঘুণ ঘুণাপয় ঘুণাপয়—

জয়োত্তম। আমার তো উনিশ বছর বয়স হল— এর মধ্যে একবারও আমাদের গুরু এ আয়তনে আসেন নি। আজ তিনি হঠাৎ আসতে যাবেন এটা বিশ্বাস করতে পারি নে।

সঞ্জীব। তোমার তর্কটা কেমনতরো হল হে জয়োত্তম ? উনিশ বছর আসেন নি বলে বিশ বছরে আসাটা অসম্ভব হল কোন্ যুক্তিতে ?

বিশ্বম্ভর। তা হলে অঙ্কশাস্ত্রটাই অপ্রমাণ হয়ে যায়। তবে তো উনিশ পর্যন্ত বিশ নেই বলে উনিশের পরেও বিশ থাকতে পারে না।

সঞ্জীব। শুধু অঙ্ক কেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটাও টেঁকে না। কারণ, যা এ মুহূর্তে ঘটে নি তা ও মুহূর্তেই বা ঘটে কী করে।

জয়োত্তম। আরে, ঐটেই তো আমার তর্ক। কে বললে ঘটে ? যা পূর্বে ঘটে নি তা কিছুতেই পরে ঘটতে পারে না। আচ্ছা, এসো, কিছু যে ঘটে সেইটে প্রমাণ করে দাও।

পঞ্চক। (জয়োত্তমের কাঁধে চড়িয়া) প্রমাণ ? এই দেখো প্রমাণ। ঘুণ ঘুণ ঘুণাপয় ঘুণাপয়—

জয়োত্তম। আঃ পঞ্চক ! কর কী ! নাবো বলছি— আঃ নাবো।

পঞ্চক। আমি যে তোমার কাঁধে চড়েছি সেটা প্রমাণ না করে দিলে আমি কিছুতেই নাবছি নে। ঘুণ ঘুণ ঘুণাপয় ঘুণাপয়—

মহাপঞ্চকের প্রবেশ

মহাপঞ্চক। পঞ্চক, তুমি বড়ো উৎপাত করছ।

পঞ্চক। দাদা, এরাই গোল করছিল। আমি আরো থামিয়ে দেবার জন্যেই এসেছি। তট তট তোতয় তোতয় স্ফট স্ফট—

মহাপঞ্চক। তোমার নিজের কাজ অবহেলা করবার একটা উপলক্ষ জুটলেই তোমাকে সংবরণ করা অসম্ভব।

বিশ্বম্ভর। দেখুন, একটা জনশ্রুতি শুনতে পাচ্ছি, বর্ষার আরম্ভে আমাদের গুরু নাকি এখানে আসবেন।

মহাপঞ্চক। আসবেন কি না তা নিয়ে আন্দোলন না করে যদিই আসেন তার জন্যে প্রস্তুত হও।

পঞ্চক। তিনি যদি আসেন তিনিই প্রস্তুত হবেন। এ দিক থেকে আবার আমরাও প্রস্তুত হতে গেলে হয়তো মিথ্যে একটা গোলমাল হবে।

মহাপঞ্চক। ভারি বুদ্ধিমানের মতোই কথা বললে !

পঞ্চক। অন্নের গ্রাস যখন মুখের কাছে এগোয় তখন মুখ স্থির হয়ে সেটা গ্রহণ করে— এ তো সোজা কথা। আমার ভয় হয়, গুরু এসে হয়তো দেখবেন, আমরা যে দিক দিয়ে প্রস্তুত হতে গিয়েছি সে দিকটা উলটো। সেইজন্যে আমি কিছু করি নে।

মহাপঞ্চক। পঞ্চক, আবার তর্ক?

পঞ্চক। তর্ক করতে পারি নে বলে রাগ কর, আবার দেখি পারলেও রাগ'!

মহাপঞ্চক। যাও তুমি।

পঞ্চক। যাচ্ছি, কিন্তু বলো-না, গুরু কি সত্যই আসবেন?

মহাপঞ্চক। তাঁর সময় হলেই তিনি আসবেন। [প্রস্থান

সঞ্জীব। মহাপঞ্চক কোনো কথার শেষ উত্তর দিয়েছেন এমন কখনোই শুনি নি।

জয়োত্তম। কোনো কথার শেষ উত্তর নেই বলেই দেন না। মূর্খ যারা তারাই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, যারা অল্প জানে তারাই জবাব দেয়; আর যারা বেশি জানে তারা জানে যে জবাব দেওয়া যায় না।

পঞ্চক। সেইজন্যেই উপাধ্যায়মশায় যখন শাস্ত্র থেকে প্রশ্ন করেন তোমরা জবাব দাও, কিন্তু আমি একেবারে মূক হয়ে থাকি।

জয়োত্তম। কিন্তু প্রশ্ন না করতেই যে কথাগুলো বল তাতেই—

পঞ্চক। হাঁ, তাতেই আমার খ্যাতি রটে গেছে, নইলে কেউ আমাকে চিনতেই পারত না।

বিশ্বম্ভর। দেখো পঞ্চক, যদি গুরু আসেন তা হলে তোমার জন্যে আমাদের সকলকেই লজ্জা পেতে হবে।

সঞ্জীব। আটান্ন প্রকার আচমনবিধির মধ্যে পঞ্চক বড়োজোর পাঁচটা প্রকরণ এতদিনে শিখেছে।

পঞ্চক। সঞ্জীব, আমার মনে আঘাত দিয়ো না। অত্যুক্তি করছ।

সঞ্জীব। অত্যুক্তি!

পঞ্চক। অত্যুক্তি নয় তো কী! তুমি বলছ পাঁচটা শিখেছি। আমি দুটোর বেশি একটাও শিখি নি। তৃতীয় প্রকরণে মধ্যমাঙ্গুলির কোন্ পর্বটা কতবার কতখানি জলে ডুবোতে হবে সেটা ঠিক করতে গিয়ে অন্য আঙুলের অস্তিত্বই ভুলে যাই। কেবল একমাত্র বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটা আমার খুব অভ্যাস হয়ে গেছে। হাসছ কেন? বিশ্বাস করছ না বুঝি?

জয়োত্তম। বিশ্বাস করা শক্ত।

পঞ্চক। সেদিন উপাধ্যায়মশায় যখন পরীক্ষা করতে এলেন তখন তাঁকে ঐ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ পর্যন্ত দেখিয়ে বিস্মিত করবার চেষ্টায় ছিলুম, কিন্তু তিনি চোখ পাকিয়ে তর্জনী তুললেন, আমার আর এগোল না।

বিশ্বম্ভর। না পঞ্চক, এবার গুরু আসার জন্যে তোমাকে প্রস্তুত হতে হবে।

পঞ্চক। পঞ্চক পৃথিবীতে যেমন অপ্রস্তুত হয়ে জন্মেছে তেমনি অপ্রস্তুত হয়েই মরবে; ওর ঐ একটি মহদ্‌গুণ আছে. ওর কখনো বদল হয় না।

সঞ্জীব। তোমার সেই গুণে উপাধ্যায়মশায়কে যে মুগ্ধ করতে পেরেছ তা তো বোধ হয় না।

পঞ্চক। আমি তাঁকে কত বোঝাবার চেষ্টা করি যে, বিদ্যা সম্বন্ধে আমার একটুও নড়চড় নেই— ঐ যাকে বল ধ্রুবনক্ষত্র— তাতে সুবিধা এই যে, এখানকার ছাত্ররা কে কতদূর এগোল তা আমার সঙ্গে তুলনা করলেই বোঝা যাবে।

জয়োত্তম। তোমার আশ্চর্য এই সুযুক্তিতে উপাধ্যায়মশায়ের বোধ হয়—

পঞ্চক। না, কিছু না— তাঁর মনে কিছুমাত্র বিকার ঘটল না। আমার সম্বন্ধে পূর্বে তাঁর যে ধারণা ছিল সেইটেই দেখলুম আরো পাকা হল।

সঞ্জীব। আমরা যদি উপাধ্যায়মশায়কে তোমার মতন অমন যা-তা বলতুম তা হলে রক্ষা থাকত না। কিন্তু পঞ্চকের বেলায়—

পঞ্চক। তার মানে আছে। কুতর্কটা আমার পক্ষে এমনি সুন্দর স্বাভাবিক যে, সেটা আমার মুখে ভারি মিষ্ট শোনায়। সকলেই খুশি হয়ে বলে, ঠিক হয়েছে, পঞ্চকের মতোই কথা হয়েছে। কিন্তু ঘোরতর বুদ্ধির পরিচয় না দিতে পারলে তোমাদের আদর নেই, এমনি তোমরা হতভাগ্য।

জয়োত্তম। যাও ভাই পঞ্চক, আর বোকো না। আমরা চললুম। তুমি একটু মন দিয়ে পড়ো।

[তিনজনের প্রস্থান

পঞ্চক। হবে না, আমার কিছুই হবে না। এখানকার একটা মন্ত্রও আমার খাটল না

গান

দূরে কোথায় দূরে দূরে
মন বেড়ায় গো ঘুরে ঘুরে
যে বাঁশিতে বাতাস কাঁদে
সেই বাঁশিটির সুরে সুরে।
যে পথ সকল দেশ পারায়ে
উদাস হয়ে যায় হারায়ে,
সে পথ বেয়ে কাঙাল পরান
যেতে চায় কোন্ অচিন পুরে।

ও কী ও! কান্না শুনি যে! এ নিশ্চয়ই সুভদ্র। আমাদের এই আয়তনে ওর চোখের জল আর শুকোল না। ওর কান্না আমি সইতে পারি নে!

[প্রস্থান

বালক সুভদ্রকে লইয়া পঞ্চকের পুনঃপ্রবেশ

পঞ্চক। তোর কোনো ভয় নেই ভাই, কোনো ভয় নেই। তুই আমার কাছে বল্, কী হয়েছে বল্।

সুভদ্র। আমি পাপ করেছি।

পঞ্চক। পাপ করেছিস? কী পাপ?

সুভদ্র। সে আমি বলতে পারব না! ভয়ানক পাপ। আমার কী হবে!

পঞ্চক। তোর সব পাপ আমি কেড়ে নেব, তুই বল্।

সুভদ্র। আমি আমাদের আয়তনেব উত্তর দিকের—

পঞ্চক। উত্তর দিকের?

সুভদ্র। হাঁ, উত্তর দিকের জানলা খুলে—

পঞ্চক। জানলা খুলে কী করলি?

সুভদ্র। বাইরেটা দেখে ফেলেছি!

পঞ্চক। দেখে ফেলেছিস? শুনে লোভ হচ্ছে যে!

সুভদ্র। হাঁ পঞ্চকদাদা। কিন্তু বেশিক্ষণ না— একবার দেখেই তখনই বন্ধ করে ফেলেছি। কোন্ প্রায়শ্চিত্ত করলে আমার পাপ যাবে?

পঞ্চক। ভুলে গেছি ভাই। প্রায়শ্চিত্ত বিশ-পঁচিশ হাজার রকম আছে। আমি যদি এই আয়তনে না আসতুম তা হলে তার বারো-আনাই কেবল পুঁথিতে লেখা থাকত; আমি আসার পর প্রায় তার সব-কটাই ব্যবহারে লাগাতে পেরেছি, কিন্তু মনে রাখতে পারি নি।

বালকদলের প্রবেশ

প্রথম বালক। অ্যাঁ, সুভদ্র! তুমি বুঝি এখানে?

দ্বিতীয় বালক। জান পঞ্চকদাদা, সুভদ্র কী ভয়ানক পাপ করেছে?

পঞ্চক। চুপ চুপ। ভয় নেই সুভদ্র। কাঁদছিস কেন ভাই। প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় তো করবি। প্রায়শ্চিত্ত করতে ভারি মজা। এখানে রোজই একঘেয়ে রকমের দিন কাটে, প্রায়শ্চিত্ত না থাকলে তো মানুষ টিকতেই পারত না।

প্রথম বালক। (চুপি চুপি) জান পঞ্চকদাদা, সুভদ্র উত্তর দিকের জানলা—

পঞ্চক। আচ্ছা আচ্ছা, সুভদ্রের মতো তোদের অমন সাহস আছে?

দ্বিতীয় বালক। আমাদের আয়তনের উত্তর দিকটা যে একজটা দেবীর

তৃতীয় বালক। সে দিক থেকে আমাদের আয়তনে যদি একটুও হাওয়া ঢোকে তা হলে যে সে—

পঞ্চক। তা হলে কী?

তৃতীয় বালক। সে যে ভয়ানক।

পঞ্চক। কী ভয়ানক, শুনিই-না।

তৃতীয় বালক। জানি নে, কিন্তু সে ভয়ানক।

সুভদ্র। পঞ্চকদাদা, আমি আর কখনো খুলব না পঞ্চকদাদা। আমার কী হবে?

পঞ্চক। শোন্ বলি সুভদ্র, কিসে কী হয় আমি ভাই কিছুই জানি নে। কিন্তু যাই হোক-না, আমি তাতে একটুও ভয় করি নে।

সুভদ্র। ভয় কর না?

সকল ছেলে। ভয় কর না?

পঞ্চক। না। আমি তো বলি, দেখিই-না কী হয়।

সকলে। (কাছে ঘেঁষিয়া) আচ্ছা দাদা, তুমি বুঝি অনেক দেখেছ?

পঞ্চক। দেখেছি বৈকি। ও মাসে শনিবারে যেদিন মহাময়ূরী দেবীর পূজা পড়ল সেদিন আমি কাঁসার থালায় ইঁদুরের গর্তের মাটি রেখে তার উপর পাঁচটা শেয়াল কাঁটার পাতা আর তিনটে মাষকলাই সাজিয়ে নিজে আঠারো বার ফুঁ দিয়েছি।

সকলে। অ্যাঁ! কী ভয়ানক! আঠারো বার!

সুভদ্র। পঞ্চকদাদা, তোমার কী হল।

পঞ্চক। তিনদিনের দিনে যে সাপটা এসে আমাকে নিশ্চয় কামড়াবে কথা ছিল সে আজ পর্যন্ত আমাকে খুঁজে বের করতে পারে নি।

প্রথম বালক। কিন্তু ভয়ানক পাপ করেছ তুমি।

দ্বিতীয় বালক। মহাময়ূরী দেবী ভয়ানক রাগ করেছেন।

পঞ্চক। তাঁর রাগটা কিরকম সেইটে দেখবার জন্যেই তো এ কাজ করেছি।

সুভদ্র। কিন্তু পঞ্চকদাদা, যদি তোমাকে সাপে কামড়াত।

পঞ্চক। তা হলে এ সম্বন্ধে মাথা থেকে পা পর্যন্ত কোথাও কোনো সন্দেহ থাকত না।

প্রথম বালক। কিন্তু পঞ্চকদাদা, আমাদের উত্তর দিকের জানলাটা—

পঞ্চক। সেটাও আমাকে একবার খুলে দেখতে হবে স্থির করেছি।

সুভদ্র। তুমিও খুলে দেখবে?

পঞ্চক। হাঁ ভাই সুভদ্র, তা হলে তুই তোর দলের একজন পাবি।

প্রথম বালক। না পঞ্চকদাদা, পায়ে পড়ি পঞ্চকদাদা, তুমি—

পঞ্চক। কেন রে, তোদের তাতে ভয় কী?

দ্বিতীয় বালক। সে যে ভয়ানক।

পঞ্চক। ভয়ানক না হলে মজা কিসের?

তৃতীয় বালক। সে যে ভয়ানক পাপ।

প্রথম বালক। মহাপঞ্চকদাদা আমাদের বলে দিয়েছেন, ওতে মাতৃহত্যার পাপ হয়; কেননা উত্তর দিকটা যে একজটা দেবীর।

পঞ্চক। মাতৃহত্যা করলুম না অথচ মাতৃহত্যার পাপটা করলুম, সেই মজাটা কিরকম দেখতে আমার ভয়ানক কৌতূহল।

প্রথম বালক। তোমার ভয় করবে না?

পঞ্চক। কিছু না। ভাই সুভদ্র, তুই কী দেখলি বল্ দেখি।

দ্বিতীয় বালক। না না, বলিস নে।

তৃতীয় বালক। না, সে আমরা শুনতে পারব না— কী ভয়ানক!

প্রথম বালক। আচ্ছা, একটু, খুব একটুখানি বল্‌ ভাই।

সুভদ্র। আমি দেখলুম— সেখানে পাহাড়, গোরু চরছে—

বালকগণ। (কানে আঙুল দিয়া) ও বাবা! না না, আর শুনব না। আর বোলো না সুভদ্র। ঐ যে উপাধ্যায়মশায় আসছেন। চল্‌ চল্‌—আর না।

পঞ্চক। কেন। এখন তোমাদের কী।

প্রথম বালক। বেশ, তাও জান না বুঝি। আজ যে পূর্বফাল্গুনী নক্ষত্র—

পঞ্চক। তাতে কী।

দ্বিতীয় বালক। আজ কাকিনী সরোবরের নৈর্ঋত-কোণে ঢোঁড়াসাপের খোলস খুঁজতে হবে না?

পঞ্চক। কেন রে?

প্রথম বালক। তুমি কিছু জান না পঞ্চকদাদা! সেই খোলস কালো রঙের ঘোড়ার লেজের সাতগাছি চুল দিয়ে বেঁধে পুড়িয়ে ধোঁয়া করতে হবে যে।

দ্বিতীয় বালক। আজ যে পিতৃপুরুষেরা সেই ধোঁয়া ঘ্রাণ করতে আসবেন।

পঞ্চক। তাতে তাঁদের কষ্ট হবে না?

প্রথম বালক। পুণ্য হবে যে, ভয়ানক পুণ্য।

[বালকগণের প্রস্থান

উপাধ্যায়ের প্রবেশ

উপাধ্যায়। পঞ্চককে শিশুদের দলেই প্রায় দেখতে পাই।

পঞ্চক। এই আয়তনে ওদের সঙ্গেই আমার বুদ্ধির একটু মিল হয়। ওরা একটু বড়ো হলেই আর তখন—

উপাধ্যায়। কিন্তু তোমার সংসর্গে যে ওরা অসংযত হয়ে উঠছে। সেদিন পটুবর্ম আমার কাছে এসে নালিশ করেছে, শুক্রবারের প্রথম প্রহরেই উপতিষ্য তার গায়ের উপর হাই তুলে দিয়েছে।

পঞ্চক। তা দিয়েছে বটে। আমি স্বয়ং সেখানে উপস্থিত ছিলুম।

উপাধ্যায়। সে আমি অনুমানেই বুঝেছি, নইলে এতবড়ো আয়ুক্ষয়কর অনিয়মটা ঘটবে কেন। শুনেছি, তুমি নাকি সকলের সাহস বাড়িয়ে দেবার জন্য পটুবর্মকে ডেকে তোমার গায়ের উপর একশো বার হাই তুলতে বলেছিলে?

পঞ্চক। আপনি ভুল শুনেছেন।

উপাধ্যায়। ভুল শুনেছি?

পঞ্চক। একলা পটুবর্মকে নয়, সেখানে যত ছেলে ছিল প্রত্যেককেই আমার গায়ের উপর অন্তত দশটা করে হাই তুলে যাবার জন্যে ডেকেছিলুম— পক্ষপাত করি নি।

উপাধ্যায়। প্রত্যেককেই ডেকেছিলে?

পঞ্চক। প্রত্যেককেই। আপনি বরঞ্চ জিজ্ঞাসা করে জানবেন। কেউ সাহস করে এগোল না। তারা হিসেব করে দেখলে, পনেরো জন ছেলেতে মিলে দেড়শো হাই তুললে তাতে আমার সমস্ত আয়ু ক্ষয় হয়ে গিয়েও আরো অনেকটা বাকি থাকে, সেই উদ্‌বৃত্তটাকে নিয়ে যে কী হবে তাই স্থির করতে না পেরে তারা মহাপঞ্চকদাদাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে গেল, তাতেই তো আমি ধরা পড়ে গেছি।

উপাধ্যায়। দেখো, তুমি মহাপঞ্চকের ভাই বলে এতদিন অনেক সহ্য করেছি, কিন্তু আর চলবে না। আমাদের গুরু আসছেন শুনেছ?

পঞ্চক। গুরু আসছেন? নিশ্চয় সংবাদ পেয়েছেন?

উপাধ্যায়। হাঁ। কিন্তু এতে তোমার উৎসাহের তো কোনো কারণ নেই।

পঞ্চক। আমারই তো গুরুর দরকার বেশি, আমার যে কিছুই শেখা হয় নি।

সুভদ্রের প্রবেশ

সুভদ্র। উপাধ্যায়মশায়।

পঞ্চক। আরে, পালা পালা। উপাধ্যায়মশায়ের কাছ থেকে একটু পরমার্থতত্ত্ব শুনছি, এখন বিরক্ত করিস নে, একেবারে দৌড়ে পালা।

উপাধ্যায়। কী সুভদ্র, তোমার বক্তব্য কী শীঘ্র বলে যাও।

সুভদ্র। আমি ভয়ানক পাপ করেছি।

পঞ্চক। ভারি পণ্ডিত কিনা! পাপ করেছি! পালা বলছি।

উপাধ্যায়। (উৎসাহিত হইয়া) ওকে তাড়া দিচ্ছ কেন। সুভদ্র, শুনে যাও।

পঞ্চক। আর রক্ষা নেই, পাপের একটুকু গন্ধ পেলে একেবারে মাছির মতো ছোটে।

উপাধ্যায়। কী বলছিলে?

সুভদ্র। আমি পাপ করেছি।

উপাধ্যায়। পাপ করেছ? আচ্ছা বেশ। তা হলে বোসো। শোনা যাক।

সুভদ্র। আমি আয়তনের উত্তর দিকের—

উপাধ্যায়। বলো, বলো, উত্তর দিকের দেওয়ালে আঁক কেটেছ?

সুভদ্র। না, আমি উত্তর দিকের জানলায়—

উপাধ্যায়। বুঝেছি, কুনুই ঠেকিয়েছ। তা হলে তো সে দিকে আমাদের যতগুলি যজ্ঞের পাত্র আছে সমস্তই ফেলা যাবে। সাত মাসের বাছুরকে দিয়ে ঐ জানলা না চাটাতে পারলে শোধন হবে না।

পঞ্চক। এটা আপনি ভুল বলছেন। ক্রিয়াসংগ্রহে আছে ভূমিকুষ্মাণ্ডের বোঁটা দিয়ে একবার—

উপাধ্যায়। তোমার তো স্পর্ধা কম দেখি নে। কুলদত্তের ক্রিয়াসংগ্রহের অষ্টাদশ অধ্যায়টি কি কোনোদিন খুলে দেখা হয়েছে?

পঞ্চক। (জনান্তিকে) সুভদ্র, যাও তুমি।— কিন্তু কুলদত্তকে তো আমি—

উপাধ্যায়। কুলদত্তকে মান না? আচ্ছা, ভরদ্বাজ মিশ্রের প্রয়োগপ্রজ্ঞপ্তি তো মানতেই হবে— তাতে—

সুভদ্র। উপাধ্যায়মশাই, আমি ভয়ানক পাপ করেছি।

পঞ্চক। আবার! সেই কথাই তো হচ্ছে। তুই চুপ কর্।

উপাধ্যায়। সুভদ্র, উত্তরের দেয়ালে যে আঁক কেটেছ সে চতুষ্কোণ, না গোলাকার?

সুভদ্র। আঁক কাটি নি। আমি জানলা খুলে বাইরে চেয়েছিলুম।

উপাধ্যায়। (বসিয়া পড়িয়া) আঃ সর্বনাশ! করেছিস কী! আজ তিনশো পঁয়তাল্লিশ বছর ঐ জানলা কেউ খোলে নি তা জানিস?

সুভদ্র। আমার কী হবে।

পঞ্চক। (সুভদ্রকে আলিঙ্গন করিয়া) তোমার জয়জয়কার হবে সুভদ্র। তিনশো পঁয়তাল্লিশ বছরের আগল তুমি ঘুচিয়েছ। তোমার এই অসামান্য সাহস দেখে উপাধ্যায়মশায়ের মুখে আর কথা নেই।

[সুভদ্রকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান

উপাধ্যায়। জানি নে কী সর্বনাশ হবে। উত্তরের অধিষ্ঠাত্রী যে একজটা দেবী। বালকের দুই চক্ষু মুহূর্তেই পাথর হয়ে গেল না কেন তাই ভাবছি। যাই, আচার্যদেবকে জানাই গে।

[প্রস্থান

আচার্য ও উপাচার্যের প্রবেশ

আচার্য। এতকাল পরে আমাদের গুরু আসছেন।

উপাচার্য। তিনি প্রসন্ন হয়েছেন।

আচার্য। প্রসন্ন হয়েছেন ? তা হবে। হয়তো প্রসন্নই হয়েছেন। কিন্তু কেমন করে জানব ?

উপাচার্য। নইলে তিনি আসবেন কেন ?

আচার্য। এক-এক সময়ে মনে ভয় হয় যে, হয়তো অপরাধের মাত্রা পূর্ণ হয়েছে বলেই তিনি আসছেন।

উপাচার্য। না, আচার্যদেব, এমন কথা বলবেন না। আমরা কঠোর নিয়ম সমস্তই নিঃশেষে পালন করেছি— কোনো ত্রুটি ঘটে নি।

আচার্য। কঠোর নিয়ম ? হাঁ, সমস্তই পালিত হয়েছে।

উপাচার্য। বজ্রশুদ্ধিব্রত আমাদের আয়তনে এইবার নিয়ে ঠিক সাতাত্তর বার পূর্ণ হয়েছে। আর কোনো আয়তনে এ কি সম্ভবপর হয়।

আচার্য। না, আর কোথাও হতে পারে না।

উপাচার্য। কিন্তু তবু আপনার মনে এমন দ্বিধা হচ্ছে কেন ?

আচার্য। দ্বিধা ? তা দ্বিধা হচ্ছে সে কথা স্বীকার করি। (কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া) দেখো সূতসোম, অনেক দিন থেকে মনের মধ্যে বেদনা জেগে উঠছে, কাউকে বলতে পারছি নে। আমি এই আয়তনের আচার্য ; আমার মনকে যখন কোনো সংশয় বিদ্ধ করতে থাকে তখন একলা চুপ করে বহন করতে হয়। এতদিন তাই বহন করে এসেছি। কিন্তু যেদিন পত্র পেয়েছি গুরু আসছেন সেইদিন থেকে মনকে আর যেন চুপ করিয়ে রাখতে পারছি নে। সে কেবলই আমাদের প্রতিদিনের সকল কাজেই বলে বলে উঠছে— বৃথা, বৃথা, সমস্তই বৃথা।

উপাচার্য। আচার্যদেব, বলেন কী। বৃথা, সমস্তই বৃথা ?

আচার্য। সূতসোম, আমরা এখানে কতদিন হল এসেছি মনে পড়ে কি ? কত বছর হবে ?

উপাচার্য। সময় ঠিক করে বলা বড়ো কঠিন। এখানে মনের পক্ষে প্রাচীন হয়ে উঠতে বয়সের দরকার হয় না। আমার তো মনে হয় আমি জন্মের বহু পূর্ব হতেই এখানে স্থির হয়ে বসে আছি।

আচার্য। দেখো সূতসোম, প্রথম যখন এখানে সাধনা আরম্ভ করেছিলুম তখন নবীন বয়স, তখন আশা ছিল সাধনার শেষে একটা-কিছু পাওয়া যাবে। সেইজন্যে সাধনা যতই কঠিন হচ্ছিল উৎসাহ আরো বেড়ে উঠছিল। তার পরে সেই সাধনার চক্রে ঘুরতে ঘুরতে একেবারেই ভুলে বসেছিলুম যে সিদ্ধি বলে কিছু-একটা আছে। আজ গুরু আসবেন শুনে হঠাৎ মনটা থমকে দাঁড়াল— আজ নিজেকে জিজ্ঞাসা করলুম, ওরে পণ্ডিত, তোর সব শাস্ত্রই তো পড়া হল, সব ব্রতই তো পালন করলি, এখন বল্ মূর্খ, কী পেয়েছিস। কিছু না কিছু না, সূতসোম। আজ দেখছি— এই অতিদীর্ঘকালের সাধনা কেবল আপনাকেই আপনি প্রদক্ষিণ করেছে— কেবল প্রতিদিনের অন্তহীন পুনরাবৃত্তি রাশীকৃত হয়ে জমে উঠেছে।

উপাচার্য। বোলো না, বোলো না, এমন কথা বোলো না। আচার্যদেব, আজ কেন হঠাৎ তোমার মন এত উদ্‌ভ্রান্ত হল !

আচার্য। সূতসোম, তোমার মনে কি তুমি শান্তি পেয়েছ ?

উপাচার্য। আমার তো এক মুহূর্তের জন্যে অশান্তি নেই।

আচার্য। অশান্তি নেই ?

উপাচার্য। কিছুমাত্র না। আমার অহোরাত্র একেবারে নিয়মে বাঁধা। সে হাজার বছরের বাঁধন। ক্রমেই সে পাথরের মতো বজ্রের মতো শক্ত হয়ে জমে গেছে। এক মুহূর্তের জন্যেও কিছুই ভাবতে হয় না। এর চেয়ে আর শান্তি কী হতে পারে ?

আচার্য। না না, তবে আমি ভুল করছিলুম সূতসোম, ভুল করছিলুম। যা আছে এই ঠিক, এইই ঠিক। যে করেই হোক এর মধ্যে শান্তি পেতেই হবে।

উপাচার্য। সেইজন্যেই তো অচলায়তন ছেড়ে আমাদের কোথাও বেরোনো নিষেধ। তাতে যে মনের বিক্ষেপ ঘটে— শান্তি চলে যায়।

আচার্য। ঠিক, ঠিক—ঠিক বলেছ সুতসোম। অচেনার মধ্যে গিয়ে কোথায় তার অন্ত পাব? এখানে সমস্তই জানা, সমস্তই অভ্যস্ত--এখানকার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর এখানকারই সমস্ত শাস্ত্রের ভিতর থেকে পাওয়া যায়— তার জন্যে একটুও বাইরে যাবার দরকার হয় না। এই তো নিশ্চল শান্তি। গুরু, তুমি যখন আসবে, কিছু সরিয়ো না কিছু আঘাত কোরো না— চারি দিকেই আমাদের শান্তি, সেই বুঝে পা ফেলো। দয়া কোরো, দয়া কোরো আমাদের। আমাদের পা আড়ষ্ট হয়ে গেছে, আমাদের আর চলবার শক্তি নেই। অনেক বৎসর অনেক যুগ যে এমনি করেই কেটে গেল— প্রাচীন, প্রাচীন, সমস্ত প্রাচীন হয়ে গেছে— আজ হঠাৎ বোলো না যে নূতনকে চাই— আমাদের আর সময় নেই।

উপাচার্য। আচার্যদেব, তোমাকে এমন বিচলিত হতে কখনো দেখি নি।

আচার্য। কী জানি, আমার কেমন মনে হচ্ছে কেবল একলা আমিই না, চারি দিকে সমস্তই বিচলিত হয়ে উঠেছে। আমার মনে হচ্ছে আমাদের এখানকার দেয়ালের প্রত্যেক পাথরটা পর্যন্ত বিচলিত। তুমি এটা অনুভব করতে পারছ না সুতসোম?

উপাচার্য। কিছুমাত্র না। এখানকার অটল স্তব্ধতার লেশমাত্র বিচ্যুতি দেখতে পাচ্ছি নে। আমাদের তো বিচলিত হবার কথাও না। আমাদের সমস্ত শিক্ষা কোন্ কালে সমাধা হয়ে গেছে। আমাদের সমস্ত লাভ সমাপ্ত, সমস্ত সঞ্চয় পর্যাপ্ত।

আচার্য। আজ আমার একটু একটু মনে পড়ছে বহুপূর্বে সব প্রথমে সেই ভোরের বেলা অন্ধকার থাকতে থাকতে যাঁর কাছে শিক্ষা আরম্ভ করেছিলুম তিনি গুরুই— তিনি পুঁথি নন, শাস্ত্র নন, বৃত্তি নন, তিনি গুরু। তিনি যা ধরিয়ে দিলেন তাই নিয়ে আরম্ভ করলুম— এতদিন মনে করে নিশ্চিন্ত ছিলুম সেইটেই বুঝি আছে, ঠিক চলছে— কিন্তু—

উপাচার্য। ঠিক আছে, ঠিক চলছে আচার্যদেব, ভয় নেই। প্রভু, আমাদের এখানে সেই প্রথম উষার বিশুদ্ধ অন্ধকারকে হাজার বছরেও নষ্ট হতে দিই নি। তারই পবিত্র অস্পষ্ট ছায়ার মধ্যে আমরা আচার্য এবং ছাত্র, প্রবীণ এবং নবীন, সকলেই স্থির হয়ে বসে আছি। তুমি কি বলতে চাও এতদিন পরে কেউ এসে সেই আমাদের ছায়া নাড়িয়ে দিয়ে যাবে! সর্বনাশ! সেই ছায়া!

আচার্য। সর্বনাশই তো!

উপাচার্য। তা হলে হবে কী! এতদিন যারা স্তব্ধ হয়ে আছে তাদের কি আবার উঠতে হবে?

আচার্য। আমি তো তাই সামনে দেখছি। সে কি আমার স্বপ্ন! অথচ আমার তো মনে হচ্ছে এই-সমস্তই স্বপ্ন— এই পাথরের প্রাচীর, এই বন্ধ দরজা, এই-সব নানা রেখার গণ্ডি, এই স্তূপাকার পুঁথি, এই অহোরাত্র মন্ত্রপাঠের গুঞ্জনধ্বনি— সমস্তই স্বপ্ন।

উপাচার্য। ঐ-যে পঞ্চক আসছে। পাথরের মধ্যে কি ঘাস বেরোয়! এমন ছেলে আমাদের আয়তনে কী করে সম্ভব হল! শিশুকাল থেকেই ওর ভিতর এমন-একটা প্রবল অনিয়ম আছে, তাকে কিছুতেই দমন করা গেল না। ঐ বালককে আমার ভয় হয়। ঐ আমাদের দুর্লক্ষণ। এই আয়তনের মধ্যে ও কেবল তোমাকেই মানে। তুমি ওকে একটু ভর্ৎসনা করে দিয়ো।

আচার্য। আচ্ছা, তুমি যাও। আমি ওর সঙ্গে একটু নিভৃতে কথা কয়ে দেখি।

[উপাচার্যের প্রস্থান

পঞ্চকের প্রবেশ

আচার্য। (পঞ্চকের গায়ে হাত দিয়া) বৎস পঞ্চক!

পঞ্চক। করলেন কী! আমাকে ছুঁলেন?

আচার্য। কেন, বাধা কী আছে?

পঞ্চক। আমি যে আচার রক্ষা করতে পারি নি।

আচার্য। কেন পার নি বৎস?

পঞ্চক। প্রভু, কেন, তা আমি বলতে পারি নে। আমার পারবার উপায় নেই।

আচার্য। সৌম্য, তুমি তো জানো, এখানকার যে নিয়ম সেই নিয়মকে আশ্রয় করে হাজার বছর হাজার হাজার লোক নিশ্চিন্ত আছে। আমরা যে-খুশি তাকে কি ভাঙতে পারি ?

পঞ্চক। আচার্যদেব, যে নিয়ম সত্য তাকে ভাঙতে না দিলে তার যে পরীক্ষা হয় না।

আচার্য। নিয়মের জন্য ভয় নয়, কিন্তু যে লোক ভাঙতে যাবে তারই বা দুর্গতি ঘটতে দেব কেন ?

পঞ্চক। আমি কোনো তর্ক করব না। আপনি নিজমুখে যদি আদেশ করেন যে, আমাকে সমস্ত নিয়ম পালন করতেই হবে তা হলে পালন করব। আমি আচার-অনুষ্ঠান কিছুই জানি নে, আমি আপনাকেই জানি।

আচার্য। আদেশ করব— তোমাকে ! সে আর আমার দ্বারা হয়ে উঠবে না।

পঞ্চক। কেন আদেশ করবেন না প্রভু।

আচার্য। কেন ? বলব বৎস ? তোমাকে যখন দেখি আমি মুক্তিকে যেন চোখে দেখতে পাই। এত চাপেও যখন দেখলুম তোমার মধ্যে প্রাণ কিছুতেই মরতে চায় না তখনই আমি প্রথম বুঝতে পারলুম মানুষের মন মন্ত্রের চেয়ে সত্য, হাজার বছরের অতিপ্রাচীন আচারের চেয়ে সত্য। যাও বৎস, তোমার পথে তুমি যাও। আমাকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা কোরো না।

পঞ্চক। আচার্যদেব, আপনি জানেন না কিন্তু আপনিই আমাকে নিয়মের চাকার নীচে থেকে টেনে নিয়েছেন।

আচার্য। কেমন করে বৎস ?

পঞ্চক। তা জানি নে, কিন্তু আপনি আমাকে এমন একটা-কিছু দিয়েছেন যা আচারের চেয়ে নিয়মের চেয়ে অনেক বেশি।

আচার্য। তুমি কী কর না-কর আমি কোনোদিন জিজ্ঞাসা করি নে, কিন্তু আজ একটি কথা জিজ্ঞাসা করব। তুমি কি অচলায়তনের বাইরে গিয়ে শোণপাংশু-জাতির সঙ্গে মেশ ?

পঞ্চক। আপনি কি এর উত্তর শুনতে চান ?

আচার্য। না না, থাক্, বোলো না। কিন্তু শোণপাংশুরা যে অত্যন্ত ম্লেচ্ছ। তাদের সহবাস কি—

পঞ্চক। তাদের সম্বন্ধে আপনার কি কোনো বিশেষ আদেশ আছে।

আচার্য। না না, আদেশ আমার কিছুই নেই। যদি ভুল করতে হয় তবে ভুল করো গে— তুমি ভুল করো গে— আমাদের কথা শুনো না। আমাদের গুরু আসছেন পঞ্চক— তাঁর কাছে তোমার মতো বালক হয়ে যদি বসতে পারি— তিনি যদি আমার জরার বন্ধন খুলে দেন, আমাকে ছেড়ে দেন, তিনি যদি অভয় দিয়ে বলেন আজ থেকে ভুল করে করে সত্য জানবার অধিকার তোমাকে দিলুম, আমার মনের উপর থেকে হাজার দু-হাজার বছরের পুরাতন ভার যদি তিনি নামিয়ে দেন !

পঞ্চক। ঐ উপাচার্য আসছেন— বোধ করি কাজের কথা আছে— বিদায় হই।

[প্রস্থান

উপাধ্যায় ও উপাচার্যের প্রবেশ

উপাচার্য। (উপাধ্যায়ের প্রতি) আচার্যদেবকে তো বলতেই হবে। উনি নিতান্ত উদ্‌বিগ্ন হবেন— কিন্তু দায়িত্ব যে ওঁরই।

আচার্য। উপাধ্যায়, কোনো সংবাদ আছে নাকি ?

উপাধ্যায়। অত্যন্ত মন্দ সংবাদ।

আচার্য। অতএব সেটা সত্বর বলা উচিত।

উপাচার্য। উপাধ্যায়, কথাটা বলে ফেলো। এ দিকে প্রতিকারের সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। আমাদের গ্রহাচার্য বলছেন আজ তিন প্রহর সাড়ে তিন দণ্ডের মধ্যে দ্ব্যাত্মকচরাংশলগ্নে যা-কিছু করবার সময়— সেটা অতিক্রম করলেই গোপরিক্রমণ আরম্ভ হবে, তখন প্রায়শ্চিত্তের কেবল এক পাদ হবে

বিপ্র, অর্ধ পাদ বৈশ্য, বাকি সমস্তটাই শূদ্র।

উপাধ্যায়। আচার্যদেব, সুভদ্র আমাদের আয়তনের উত্তর দিকের জানলা খুলে বাইরে দৃষ্টিপাত করেছে।

আচার্য। উত্তর দিকটা তো একজটা দেবীর।

উপাধ্যায়। সেই তো ভাবনা। আমাদের আয়তনের মন্ত্রঃপূত রুদ্ধ বাতাসকে সেখানকার হাওয়া কতটা দূর পর্যন্ত আক্রমণ করেছে বলা তো যায় না।

উপাচার্য। এখন কথা হচ্ছে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কী।

আচার্য। আমার তো স্মরণ হয় না। উপাধ্যায় বোধ করি—

উপাধ্যায়। না, আমিও তো মনে আনতে পারি নে। আজ তিনশো বছর এ প্রায়শ্চিত্তটার প্রয়োজন হয় নি— সবাই ভুলেই গেছে। ঐ-যে মহাপঞ্চক আসছে— যদি কারও জানা থাকে তো সে ওর।

মহাপঞ্চকের প্রবেশ

উপাধ্যায়। মহাপঞ্চক, সব শুনেছ বোধ করি।

মহাপঞ্চক। সেইজন্যেই তো এলুম ; আমরা এখন সকলেই অশুচি, বাহিরের হাওয়া আমাদের আয়তনে প্রবেশ করেছে।

উপাচার্য। এর প্রায়শ্চিত্ত কী, আমাদের কারও স্মরণ নেই—তুমিই বলতে পারো।

মহাপঞ্চক। ক্রিয়াকল্পতরুতে এর কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না— একমাত্র ভগবান জ্বলনানন্তকৃত আধিকর্মিক বর্ষায়ণে লিখছে অপরাধীকে ছয় মাস মহাতামস সাধন করতে হবে।

উপাচার্য। মহাতামস ?

মহাপঞ্চক। হাঁ, আলোকের এক রশ্মিমাত্র সে দেখতে পাবে না। কেননা আলোকের দ্বারা যে অপরাধ অন্ধকারের দ্বারাই তার ক্ষালন।

উপাচার্য। তা হলে, মহাপঞ্চক, সমস্ত ভার তোমার উপর রইল।

উপাধ্যায়। চলো, আমিও তোমার সঙ্গে যাই। ততক্ষণ সুভদ্রকে হিঙ্গুমর্দনকুণ্ডে স্নান করিয়ে আনি গে।

সকলের গমনোদ্যম

আচার্য। শোনো, প্রয়োজন নেই।

উপাধ্যায়। কিসের প্রয়োজন নেই ?

আচার্য। প্রায়শ্চিত্তের।

মহাপঞ্চক। প্রয়োজন নেই বলছেন ! আধিকর্মিক বর্ষায়ণ খুলে আমি এখনই দেখিয়ে দিচ্ছি—

আচার্য। দরকার নেই— সুভদ্রকে কোনো প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে না, আমি আশীর্বাদ করে তার—

মহাপঞ্চক। এও কি কখনো সম্ভব হয় ? যা কোনো শাস্ত্রে নেই আপনি কি তাই—

আচার্য। না, হতে দেব না, যদি কোনো অপরাধ ঘটে সে আমার। তোমাদের ভয় নেই।

উপাধ্যায়। এরকম দুর্বলতা তো আপনার কোনোদিন দেখি নি। এই তো সেবার অষ্টাঙ্গশুদ্ধি উপবাসে তৃতীয় রাত্রে বালক কুশলশীল 'জল জল' করে পিপাসায় প্রাণত্যাগ করলে কিন্তু তবু তার মুখে যখন এক বিন্দু জল দেওয়া গেল না তখন তো আপনি নীরব হয়ে ছিলেন। তুচ্ছ মানুষের প্রাণ আজ আছে কাল নেই, কিন্তু সনাতন ধর্মবিধি তো চিরকালের।

সুভদ্রকে লইয়া পঞ্চকের প্রবেশ

পঞ্চক। ভয় নেই সুভদ্র, তোর কোনো ভয় নেই।— এই শিশুটিকে অভয় দাও প্রভু।

আচার্য। বৎস, তুমি কোনো পাপ কর নি বৎস, যারা বিনা অপরাধে তোমাকে হাজার হাজার বৎসর ধরে মুখ বিকৃত করে ভয় দেখাচ্ছে পাপ তাদেরই। এসো পঞ্চক।

[সুভদ্রকে কোলে লইয়া পঞ্চকের সঙ্গে প্রস্থান

উপাধ্যায়। এ কী হল উপাচার্যমশায়!

মহাপঞ্চক। আমরা অশুচি হয়ে রইলুম, আমাদের যাগযজ্ঞ ব্রত-উপবাস সমস্তই পণ্ড হতে থাকল, এ তো সহ্য করা শক্ত।

উপাধ্যায়। এ সহ্য করা চলবেই না। আচার্য কি শেষে আমাদের ম্লেচ্ছের সঙ্গে সমান করে দিতে চান!

মহাপঞ্চক। উনি আজ সুভদ্রকে বাঁচাতে গিয়ে সনাতনধর্মকে বিনাশ করবেন! এ কী রকম বুদ্ধিবিকার ওঁর ঘটল! এ অবস্থায় ওঁকে আচার্য বলে গণ্য করাই চলবে না।

উপাচার্য। সে কি হয়! যিনি একবার আচার্য হয়েছেন তাঁকে কি আমাদের ইচ্ছামত—

মহাপঞ্চক। উপাচার্যমশায়, আপনাকেও আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে হবে।

উপাচার্য। নূতন কিছুতে যোগ দেবার বয়স আমার নয়।

উপাধ্যায়। আজ বিপদের সময় বয়স-বিচার!

উপাচার্য। ধর্মকে বাঁচাবার জন্যে যা করবার করো। আমাকে দাঁড়াতে হবে আচার্যদেবের পাশে। আমরা একসঙ্গে এসেছিলুম, যদি বিদায় হবার দিন এসে থাকে তবে একসঙ্গেই বাহির হয়ে যাব।

মহাপঞ্চক। কিন্তু একটা কথা চিন্তা করে দেখবেন। আচার্যদেবের অভাবে আপনারই আচার্য হবার অধিকার।

উপাচার্য। মহাপঞ্চক, সেই প্রলোভনে আমি আচার্যদেবের বিরুদ্ধে দাঁড়াব? এ কথা বলবার জন্যে তুমি যে মুখ খুলেছ সে কি এখানকার উত্তর দিকের জানলা খোলার চেয়ে কম পাপ!

[প্রস্থান

মহাপঞ্চক। চলো উপাধ্যায়, আর বিলম্ব নয়। আচার্য অদীনপুণ্য যতক্ষণ এ আয়তনে থাকবেন ততক্ষণ ক্রিয়াকর্ম সমস্ত বন্ধ, ততক্ষণ আমাদের অশৌচ।

২

পাহাড়-মাঠ

পঞ্চকের গান

এ পথ গেছে কোন্‌খানে গো কোন্‌খানে—
তা কে জানে তা কে জানে।
কোন্ পাহাড়ের পারে, কোন্ সাগরের ধারে,
কোন্ দুরাশার দিক-পানে—
তা কে জানে তা কে জানে।
এ পথ দিয়ে কে আসে যায় কোন্‌খানে
তা কে জানে তা কে জানে।
কেমন যে তার বাণী, কেমন হাসিখানি,
যায় সে কাহার সন্ধানে
তা কে জানে তা কে জানে।

পশ্চাতে আসিয়া শোণপাংশুদলের নৃত্য

পঞ্চক। ও কী রে! তোরা কখন পিছনে এসে নাচতে লেগেছিস?

প্রথম শোণপাংশু। আমরা নাচবার সুযোগ পেলেই নাচি, পা-দুটোকে স্থির রাখতে পারি নে

দ্বিতীয় শোণপাংশু। আয় ভাই, ওকে সুদ্ধ কাঁধে করে নিয়ে একবার নাচি।

পঞ্চক। আরে না না, আমাকে ছুঁস নে রে, ছুঁস নে।

তৃতীয় শোণপাংশু। ঐ রে! ওকে অচলায়তনের ভূতে পেয়েছে। শোণপাংশুকে ও ছোঁবে না।

পঞ্চক। জানিস, আমাদের গুরু আসবেন?

প্রথম শোণপাংশু। সত্যি নাকি! তিনি মানুষটি কী রকম? তাঁর মধ্যে নতুন কিছু আছে?

পঞ্চক। নতুনও আছে, পুরোনোও আছে।

দ্বিতীয় শোণপাংশু। আচ্ছা, এলে খবর দিয়ো— একবার দেখব তাঁকে।

পঞ্চক। তোরা দেখবি কী রে। সর্বনাশ। তিনি তো শোণপাংশুদের গুরু নন। তাঁর কথা তোদের কানে পাছে এক অক্ষরও যায় সেজন্যে তোদের দিকের প্রাচীরের বাইরে সাত সার রাজার সৈন্য পাহারা দেবে। তোদেরও তো গুরু আছে— তাকে নিয়েই—

তৃতীয় শোণপাংশু। গুরু! আমাদের আবার গুরু কোথায়! আমরা তো হলুম দাদাঠাকুরের দল। এ পর্যন্ত আমরা তো কোনো গুরুকে মানি নি।

প্রথম শোণপাংশু। সেইজন্যেই তো ও-জিনিসটা কী রকম দেখতে ইচ্ছা করে।

দ্বিতীয় শোণপাংশু। আমাদের মধ্যে একজন, তার নাম চণ্ডক— তার কী জানি ভারি লোভ হয়েছে; সে ভেবেছে তোমাদের কোনো গুরুর কাছে মন্ত্র নিয়ে আশ্চর্য কী-একটা ফল পাবে— তাই সে লুকিয়ে চলে গেছে!

তৃতীয় শোণপাংশু। কিন্তু শোণপাংশু ব'লে কেউ তাকে মন্ত্র দিতে চায় না; সেও ছাড়বার ছেলে নয়, সে লেগেই রয়েছে। তোমরা মন্ত্র দাও না বলেই মন্ত্র আদায় করবার জন্যে তার এত জেদ।

প্রথম শোণপাংশু। কিন্তু পঞ্চকদাদা, আমাদের ছুঁলে কি তোমার গুরু রাগ করবেন?

পঞ্চক। বলতে পারি নে— কী জানি যদি অপরাধ নেন। ওরে তোরা যে সবাই সবরকম কাজই করিস—সেইটে যে বড়ো দোষ। তোরা চাষ করিস তো?

প্রথম শোণপাংশু। চাষ করি বৈকি, খুব করি। পৃথিবীতে জন্মেছি পৃথিবীকে সেটা খুব ক'ষে বুঝিয়ে দিয়ে তবে ছাড়ি।

গান

আমরা চাষ করি আনন্দে।
মাঠে মাঠে বেলা কাটে সকাল হতে সন্ধে!
রৌদ্র ওঠে, বৃষ্টি পড়ে   বাঁশের বনে পাতা নড়ে,
বাতাস ওঠে ভরে ভরে চষা মাটির গন্ধে।
সবুজ প্রাণের গানের লেখা   রেখায় রেখায় দেয় রে দেখা,
মাতে রে কোন্ তরুণ কবি নৃত্যদোদুল ছন্দে।
ধানের শিষে পুলক ছোটে   সকল ধরা হেসে ওঠে,
অঘ্রানেরই সোনার রোদে পূর্ণিমারই চন্দ্রে।

পঞ্চক। আচ্ছা, নাহয় তোরা চাষই করিস সেও কোনোমতে সহ্য হয়— কিন্তু কে বলছিল তোরা কাঁকুড়ের চাষ করিস।

প্রথম শোণপাংশু। করি বৈকি।

পঞ্চক। কাঁকুড়! ছি ছি! খেঁসারিডালেরও চাষ করিস বুঝি?

তৃতীয় শোণপাংশু। কেন করব না? এখান থেকেই তো কাঁকুড় খেঁসারিডাল তোমাদের বাজারে যায়।

পঞ্চক। তা তো যায়, কিন্তু জানিস নে কাঁকুড় আর খেঁসারিডাল যারা চাষ করে তাদের আমরা ঘরে ঢুকতে দিই নে।

প্রথম শোণপাংশু। কেন?

পঞ্চক। কেন কী রে! ওটা যে নিষেধ।

প্রথম শোণপাংশু। কেন নিষেধ?

পঞ্চক। শোনো একবার! নিষেধ, তার আবার কেন! সাধে তোদের মুখদর্শন পাপ! এই সহজ কথাটা বুঝিস নে যে কাঁকুড় আর খেঁসারিডালের চাষটা ভয়ানক খারাপ।

দ্বিতীয় শোণপাংশু। কেন? ওটা কি তোমরা খাও না?

পঞ্চক। খাই বৈকি, খুব আদর করে খাই— কিন্তু ওটা যারা চাষ করে তাদের ছায়া মাড়াই নে।

দ্বিতীয় শোণপাংশু। কেন?

পঞ্চক। ফের কেন! তোরা যে এতবড়ো নিরেট মূর্খ তা জানতুম না। আমাদের পিতামহ বিষ্কম্ভী কাঁকুড়ের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সে-খবর রাখিস নে বুঝি?

দ্বিতীয় শোণপাংশু। কাঁকুড়ের মধ্যে কেন?

পঞ্চক। আবার কেন! তোরা যে ঐ এক কেন'র জ্বালায় আমাকে অতিষ্ঠ করে তুললি।

তৃতীয় শোণপাংশু। আর, খেঁসারির ডাল?

পঞ্চক। একবার কোন্ যুগে একটা খেঁসারিডালের গুঁড়ো উপবাসের দিন কোন্ এক মস্ত বুড়োর ঠিক গোঁফের উপর উড়ে পড়েছিল; তাতে তাঁর উপবাসের পুণ্যফল থেকে ষষ্টিসহস্র ভাগের এক ভাগ কম পড়ে গিয়েছিল; তাই তখনই সেইখানে দাঁড়িয়ে উঠে তিনি জগতের সমস্ত খেঁসারিডালের খেতের উপর অভিশাপ দিয়ে গেছেন। এতবড়ো তেজ। তোরা হলে কী করতিস বল্ দেখি।

প্রথম শোণপাংশু। আমাদের কথা বল কেন? উপবাসের দিনে খেঁসারিডাল যদি গোঁফের উপর পর্যন্ত এগিয়ে আসে তা হলে তাকে আরো একটু এগিয়ে নিই।

পঞ্চক। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সত্যি করে বলিস্— তোরা কি লোহার কাজ করে থাকিস?

প্রথম শোণপাংশু। লোহার কাজ করি বৈকি, খুব করি।

পঞ্চক। রাম! রাম! আমরা সনাতন কাল থেকে কেবল তামা-পিতলের কাজ করে আসছি। লোহা গলাতে পারি কিন্তু সব দিন নয়। ষষ্ঠীর দিনে যদি মঙ্গলবার পড়ে তবেই স্নান করে আমরা হাপর ছুঁতে পারি, কিন্তু তাই বলে লোহা পিটোনো—সে তো হতেই পারে না!

তৃতীয় শোণপাংশু। আমরা লোহার কাজ করি তাই লোহাও আমাদের কাজ করে।

গান

কঠিন লোহা কঠিন ঘুমে ছিল অচেতন,
ও তার ঘুম ভাঙাইনু রে!
লক্ষযুগের অন্ধকারে ছিল সংগোপন,
ওগো, তায় জাগাইনু রে।
পোষ মেনেছে হাতের তলে,
যা বলাই সে তেমনি বলে,
দীর্ঘ দিনের মৌন তাহার আজ ভাগাইনু রে।
অচল ছিল, সচল হয়ে
ছুটেছে ওই জগৎ জয়ে,
নির্ভয়ে আজ দুই হাতে তার রাশ বাগাইনু রে।

পঞ্চক। সেদিন উপাধ্যায়মশায় একঘর ছাত্রের সামনে বললেন শোণপাংশু জাতটা এমনই বিশ্রী যে, তারা নিজের হাতে লোহার কাজ করে। আমি তাঁকে বললুম, ও বেচারারা পড়াশুনো কিছুই করে নি সে আমি জানি— এমন-কি, এই পৃথিবীটা যে ত্রিশিরা রাক্ষসীর মাথামুড়োনো চুলের জটা দিয়ে

তৈরি তাও ঐ মূর্খেরা জানে না, আবার সে কথা বলতে গেলে মারতে আসে— তাই ব'লে ভালোমন্দর জ্ঞান কি ওদের এতটুকুও নেই যে, লোহার কাজ নিজের হাতে করবে। আজ তো স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি, যার যে বংশে জন্ম তার সেইরকম বুদ্ধিই হয়।

প্রথম শোণপাংশু। কেন, লোহা কী অপরাধটা করেছে।

পঞ্চক। আরে, ওটা যে লোহা সে তো তোকে মানতেই হবে।

প্রথম শোণপাংশু। তা তো হবে।

পঞ্চক। তবে আর কি— এই বুঝে নে-না।

দ্বিতীয় শোণপাংশু। তবু একটা তো কারণ আছে।

পঞ্চক। কারণ নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু কেবল সেটা পুঁথির মধ্যে। সুতরাং মহাপঞ্চকদাদা ছাড়া আর অতি অল্প লোকেরই জানবার সম্ভাবনা আছে। সাধে মহাপঞ্চকদাদাকে ওখানকার ছাত্রেরা একেবারে পূজা করে! যা হোক ভাই, তোরা যে আমাকে ক্রমেই আশ্চর্য করে দিলি রে। তোরা তো খেঁসারিডাল চাষ করছিস আবার লোহাও পিটোচ্ছিস, এখনো তোরা কোনো দিক থেকে কোনো পাঁচ-চোখ কিংবা সাত-মাথাওয়ালার কোপে পড়িস নি?

প্রথম শোণপাংশু। যদি পড়ি তবে আমাদেরও লোহা আছে, তারও কোপ বড়ো কম নয়।

পঞ্চক। আচ্ছা, তোদের মন্ত্র কেউ পড়ায় নি?

দ্বিতীয় শোণপাংশু। মন্ত্র! কিসের মন্ত্র।

পঞ্চক। এই মনে কর্ যেমন বজ্রবিদারণ মন্ত্র— তট তট তোতয় তোতয়—

তৃতীয় শোণপাংশু। ওর মানে কী!

পঞ্চক। আবার! মানে! তোর আস্পর্ধা তো কম নয়। সব কথাতেই মানে! কেয়ূরী মন্ত্রটা জানিস?

প্রথম শোণপাংশু। না।

পঞ্চক। মরীচি?

প্রথম শোণপাংশু। না।

পঞ্চক। মহাশীতবতী?

প্রথম শোণপাংশু। না।

পঞ্চক। উষ্ণীষবিজয়?

প্রথম শোণপাংশু। না।

পঞ্চক। নাপিত ক্ষৌর করতে করতে যেদিন তোদের বাঁ গালে রক্ত পাড়িয়ে দেয় সেদিন করিস কী।

তৃতীয় শোণপাংশু। সেদিন নাপিতের দুই গালে চড় কষিয়ে দিই।

পঞ্চক। না রে না, আমি বলছি সেদিন নদী পার হবার দরকার হলে তোরা খেয়া-নৌকোয় উঠতে পারিস?

তৃতীয় শোণপাংশু। খুব পারি।

পঞ্চক। ওরে, তোরা আমাকে মাটি করলি রে। আমি আর থাকতে পারছি নে। তোদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে আর সাহস হচ্ছে না। এমন জবাব যদি আর-একটা শুনতে পাই তা হলে তোদের বুকে করে পাগলের মতো নাচব, আমার জাত-মান কিছু থাকবে না। ভাই, তোরা সব কাজই করতে পাস? তোদের দাদাঠাকুর কিছুতেই তোদের মানা করে না?

শোণপাংশুগণের গান

সব কাজে হাত লাগাই মোরা সব কাজেই
বাধাবাঁধন নেই গো নেই।

দেখি, খুঁজি বুঝি,
কেবল ভাঙি, গড়ি, যুঝি,
মোরা সব দেশেতেই বেড়াই ঘুরে সব সাজেই।
পারি, নাইবা পারি,
নাহয় জিতি কিংবা হারি,
যদি অমনিতে হাল ছাড়ি, মরি সেই লাজেই।
আপন হাতের জোরে
আমরা তুলি সৃজন করে,
আমরা প্রাণ দিয়ে ঘর বাঁধি, থাকি তার মাঝেই।

পঞ্চক। সর্বনাশ করলে রে— আমার সর্বনাশ করলে! আমার আর ভদ্রতা রাখলে না। এদের তালে তালে আমারও পা-দুটো নেচে উঠছে। আমাকে সুদ্ধ এরা টানবে দেখছি। কোন্ দিন আমিও লোহা পিটব রে, লোহা পিটব— কিন্তু খেঁসারির ডাল— না না, পালা ভাই, পালা তোরা। দেখছিস নে, পড়ব ব'লে পুঁথি সংগ্রহ করে এনেছি।

দ্বিতীয় শোণপাংশু। ও কী পুঁথি দাদা? ওতে কী আছে?

পঞ্চক। এ আমাদের দিক্‌চক্রচন্দ্রিকা—এতে বিস্তর কাজের কথা আছে রে।

প্রথম শোণপাংশু। কিরকম?

পঞ্চক। দশটা দিকের দশরকম রঙ গন্ধ আর স্বাদ আছে কি না এতে তার সমস্ত খোলসা করে লিখেছে। দক্ষিণ দিকের রঙটা হচ্ছে রুইমাছের পেটের মতো, ওর গন্ধটা দধির গন্ধ, স্বাদটা ঈষৎ মিষ্টি; পুব দিকের রঙটা হচ্ছে সবুজ, গন্ধটা মদমত্ত হাতির মতো, স্বাদটা বকুলের ফলের মতো কষা— নৈর্ঋত কোণের—

দ্বিতীয় শোণপাংশু। আর বলতে হবে না দাদা। কিন্তু দশ দিকে তো আমরা এ-সব রঙ গন্ধ দেখতে পাই নে।

পঞ্চক। দেখতে পেলে তো দেখাই যেত। যে ঘোর মূর্খ সেও দেখত। এ-সব কেবল পুঁথিতে পড়তে পাওয়া যায়, জগতে কোথাও দেখবার জো নেই।

প্রথম শোণপাংশু। তা হলে দাদা তুমি পুঁথিই পড়ো, আমরা চললুম।

দ্বিতীয় শোণপাংশু। এদের মতো চোখকান বুজে যদি আমাদের বসে বসে ভাবতে হত তা হলে তো আমরা পাগল হয়ে যেতুম।

তৃতীয় শোণপাংশু। চল্ ভাই, ঘুরে আসি, শিকারের সন্ধান পেয়েছি। নদীর ধারে গণ্ডারের পায়ের চিহ্ন দেখা গেছে।

[প্রস্থান

পঞ্চক। এই শোণপাংশুগুলো বাইরে থাকে বটে, কিন্তু দিনরাত্রি এমনি পাক খেয়ে বেড়ায় যে, বাহিরটাকে দেখতেই পায় না। এরা যেখানে থাকে সেখানে একেবারে অস্থিরতার চোটে চতুর্দিক ঘুলিয়ে যায়। এরা একটু থেমেছে অমনি সমস্ত আকাশটা যেন গান গেয়ে উঠেছে। এই শোণপাংশুদের দেখছি ওরা চুপ করলেই আর কিছু শুনতে পায় না— ওরা নিজের গোলমালটা শোনে সেইজন্যে এত গোল করতে ভালোবাসে। কিন্তু এই আলোতে ভরা নীল আকাশটা আমার রক্তের ভিতরে গিয়ে কথা কচ্ছে, আমার সমস্ত শরীরটা গুন্ গুন্ করে বেড়াচ্ছে।

গান

ঘরেতে ভ্রমর এলো গুন্‌গুনিয়ে।
আমারে কার কথা সে যায় শুনিয়ে।
আলোতে কোন্ গগনে
মাধবী জাগল বনে,

এলো সেই ফুল জাগানোর খবর নিয়ে।
সারাদিন সেই কথা সে যায় শুনিয়ে।
কেমনে রহি ঘরে,
মন যে কেমন করে,
কেমনে কাটে যে দিন দিন গুনিয়ে।
কী মায়া দেয় বুলায়ে ;
দিল সব কাজ ভুলায়ে,
বেলা যায় গানের সুরে জাল বুনিয়ে।
আমারে কার কথা সে যায় শুনিয়ে।

শোণপাংশুদলের পুনঃপ্রবেশ

প্রথম শোণপাংশু। ও ভাই পঞ্চক, দাদাঠাকুর আসছে।
দ্বিতীয় শোণপাংশু। এখন রাখো তোমার পুঁথি রাখো—দাদাঠাকুর আসছে।

দাদাঠাকুরের প্রবেশ

প্রথম শোণপাংশু। দাদাঠাকুর!
দাদাঠাকুর। কী রে?
দ্বিতীয় শোণপাংশু। দাদাঠাকুর।
দাদাঠাকুর। কী চাই রে?
তৃতীয় শোণপাংশু। কিছু চাই নে—একবার তোমাকে ডেকে নিচ্ছি।
পঞ্চক। দাদাঠাকুর!
দাদাঠাকুর। কী ভাই, পঞ্চক যে।
পঞ্চক। ওরা সবাই তোমায় ডাকছে, আমারও কেমন ডাকতে ইচ্ছে হল। যতই ভাবছি ওদের দলে মিশব না ততই আরো জড়িয়ে পড়ছি।
প্রথম শোণপাংশু। আমাদের দাদাঠাকুরকে নিয়ে আবার দল কিসের। উনি আমাদের সব দলের শতদল পদ্ম।

গান

এই একলা মোদের হাজার মানুষ
দাদাঠাকুর।
এই আমাদের মজার মানুষ
দাদাঠাকুর।
এই তো নানা কাজে,
এই তো নানা সাজে,
এই আমাদের খেলার মানুষ
দাদাঠাকুর।
সব মিলনে মেলার মানুষ
দাদাঠাকুর।
এই তো হাসির দলে,
এই তো চোখের জলে,
এই তো সকল ক্ষণের মানুষ
দাদাঠাকুর।

এই তো ঘরে ঘরে,
এই তো বাহির করে,
এই আমাদের কোণের মানুষ
দাদাঠাকুর।
এই আমাদের মনের মানুষ
দাদাঠাকুর।

পঞ্চক। ও ভাই, তোদের দাদাঠাকুরকে নিয়ে তোরা তো দিনরাত মাতামাতি করছিস, একবার আমাকে ছেড়ে দে, আমি একটু নিরালায় বসে কথা কই। ভয় নেই, ওঁকে আমাদের অচলায়তনে নিয়ে গিয়ে কপাট দিয়ে রাখব না।

প্রথম শোণপাংশু। নিয়ে যাও-না। সে তো ভালোই হয়। তা হলে কপাটের বাপের সাধ্য নেই বন্ধ থাকে। উনি গেলে তোমাদের অচলায়তনের পাথরগুলো-সুদ্ধ নাচতে আরম্ভ করবে, পুঁথিগুলোর মধ্যে বাঁশি বাজবে।

দ্বিতীয় শোণপাংশু। আচ্ছা, আয় ভাই, আমাদেব কাজগুলো সেরে আসি। দাদাঠাকুরকে নিয়ে পঞ্চকদাদা একটু বসুক।

[প্রস্থান

পঞ্চক। ঐ শোণপাংশুগুলো গেছে, এইবার তোমার পায়ের ধুলো নিই দাদাঠাকুর। ওরা দেখলে হেসে অস্থির হত তাই ওদের সামনে কিছু করি নে।

দাদাঠাকুর। দরকার কী ভাই পায়ের ধুলোয়।

পঞ্চক। নিতে ইচ্ছে করে। বুকের ভিতরটা যখন ভরে ওঠে, তখন বুঝি তার ভারে মাথা নিচু হয়ে পড়ে— ভক্তি না করে যে বাঁচি নে।

দাদাঠাকুর। ভাই, আমিও থাকতে পারি নে। স্নেহ যখন আমার হৃদয়ে ধরে না, তখন সেই স্নেহই আমার ভক্তি।

পঞ্চক। অচলায়তনে প্রণাম করে করে ঘাড়ে ব্যথা হয়ে গেছে। তাতে নিজেকেই কেবল ছোটো করেছি, বড়োকে পাই নি।

দাদাঠাকুর। এই আমার সবার বাড়া বড়োর মধ্যে এসে যখন বসি তখন যা করি তাই প্রণাম হয়ে ওঠে। এই-যে খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মন তোমাকে আশীর্বাদ করছে— এও আমার প্রণাম।

পঞ্চক। দাদাঠাকুর, তোমার দুই চোখ দিয়ে এই-যে তুমি কেবল সেই বড়োকে দেখছ, তোমাকে যখন দেখি তখন তোমার সেই দেখাটিকেও আমি যেন পাই। তখন পশুপাখি গাছপালা আমার কাছে আর কিছুই ছোটো থাকে না। এমন-কি, তখন ঐ শোণপাংশুদের সঙ্গে মাতামাতি করতেও আমার আর বাধে না।

দাদাঠাকুর। আমিও যে ওদের সঙ্গে খেলে বেড়াই সে খেলা আমার কাছে মস্ত খেলা। আমাব মনে হয় আমি ঝরনার ধারার সঙ্গে খেলছি, সমুদ্রের ঢেউয়ের সঙ্গে খেলছি।

পঞ্চক। তোমার কাছে সবই বড়ো হয়ে গিয়েছে।

দাদাঠাকুর। না ভাই, বড়ো হয় নি, সত্য হয়ে উঠেছে— সত্য যে বড়োই, ছোটোই তো মিথ্যা।

পঞ্চক। তোমার বাধা কেটে গেছে দাদাঠাকুর, সব বাধা কেটে গেছে। এমন হাসতে খেলতে, মিলতে মিশতে, কাজ করতে, কাজ ছাড়তে কে পারে! তোমার ঐ ভাব দেখে আমার মনটা ছট্‌ফট্ করতে থাকে। ঐ-যে কী-একটা আছে— চরম, না পরম, না কী, তা কে বলবে— তার জন্যে দিনরাত যেন আমার মন কেমন করে। থেকে থেকে এক-একবার চমকে উঠি, আর ভাবি এইবার বুঝি হল, বুঝি পাওয়া গেল। দাদাঠাকুর, শুনছি আমাদের গুরু আসবেন।

দাদাঠাকুর। গুরু! কী বিপদ। ভারি উৎপাত করবে তা হলে তো।

পঞ্চক। একটু উৎপাত হলে যে বাঁচি। চুপচাপ থেকে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছে।

দাদাঠাকুর। তোমার যে শিক্ষা কাঁচা রয়েছে, মনে ভয় হচ্ছে না?

পঞ্চক। আমার ভয় সব চেয়ে কম— আমার একটি ভুলও হবে না।

দাদাঠাকুর। হবে না?

পঞ্চক। একেবারে কিছুই জানি নে, ভুল করবার জায়গাই নেই। নির্ভয়ে চুপ করে থাকব।

দাদাঠাকুর। আচ্ছা বেশ, তোমার গুরু এলে তাঁকে দেখে নেওয়া যাবে। এখন তুমি আছ কেমন বলো তো।

পঞ্চক। ভয়ানক টানাটানির মধ্যে আছি ঠাকুর। মনে মনে প্রার্থনা করছি গুরু এসে যে দিকে হোক এক দিকে আমাকে ঠিক করে রাখুন— হয় এখানকার খোলা হাওয়ার মধ্যে অভয় দিয়ে ছাড়া দিন, নয় তো খুব কষে পুঁথি চাপা দিয়ে রাখুন ; মাথা থেকে পা পর্যন্ত আগাগোড়া একেবারে সমান চ্যাপটা হয়ে যাই।

দাদাঠাকুর। তা, তোমার গুরু তোমার উপর যত পুঁথির চাপই চাপান-না কেন, তার নীচের থেকে তোমাকে আস্ত টেনে বের করে আনতে পারব।

পঞ্চক। তা তুমি পারবে সে আমি জানি। কিন্তু দেখো ঠাকুর, একটা কথা তোমাকে বলি— অচলায়তনের মধ্যে ঐ-যে আমরা দরজা বন্ধ করে আছি, দিব্যি আছি। ওখানে আমাদের সমস্ত বোঝাপড়া একেবারে শেষ হয়ে গেছে। ওখানকার মানুষ সেইজন্যে বড়ো নিশ্চিন্ত। কিছুতে কারও একটু সন্দেহ হবার জো নেই। যদি দৈবাৎ কারও মনে এমন প্রশ্ন ওঠে যে, আচ্ছা ঐ-যে চন্দ্রগ্রহণের দিনে শোবার ঘরের দেওয়ালে তিনবার সাদা ছাগলের দাড়ি বুলিয়ে দিয়ে আওড়াতে হয় "হুন হুন তিষ্ঠ তিষ্ঠ বন্ধ বন্ধ অমৃতের হুঁ ফট স্বাহা" এর কারণটা কী— তা হলে কেবলমাত্র চারটে সুপুরি আর এক মাষা সোনা হাতে করে যাও তখনই মহাপঞ্চকদাদার কাছে, এমনি উত্তরটি পাবে যে আর কথা সরবে না। হয় সেটা মানো, নয় কানমলা খেয়ে বেরিয়ে যাও, মাঝে অন্য রাস্তা নেই। তাই সমস্তই চমৎকার সহজ হয়ে গেছে। কিন্তু ঠাকুর, সেখান থেকে বের করে তুমি আমাকে এই যে-জায়গাটাতে এনেছ এখানে কোনো মহাপঞ্চকদাদার টিকি দেখবার জো নেই— বাঁধা জবাব পাই কার কাছে। সব কথারই বারো-আনা বাকি থেকে যায়। তুমি এমন করে মনটাকে উতলা করে দিলে— তার পর?

দাদাঠাকুর। তার পরে?

গান

যা হবার তা হবে।
যে আমাকে কাঁদায় সে কি অমনি ছেড়ে রবে।
পথ হতে যে ভুলিয়ে আনে, পথ যে কোথায় সেই তা জানে,
ঘর যে ছাড়ায় হাত সে বাড়ায় সেই তো ঘরে লবে।

পঞ্চক। এতবড়ো ভরসা তুমি কেমন করে দিচ্ছ ঠাকুর! তুমি কোনো ভয় কোনো ভাবনাই রাখতে দেবে না, অথচ জন্মাবধি আমাদের ভয়ের অন্ত নেই। মৃত্যুভয়ের জন্যে অমিতায়ুর্ধারিণী মন্ত্র পড়ছি, শত্রুভয়ের জন্যে মহাসাহস্রপ্রমর্দিনী, ঘরের ভয়ের জন্যে গৃহমাতৃকা, বাইরের ভয়ের জন্যে অভয়ংকরী, সাপের ভয়ের জন্যে মহাময়ূরী, বজ্রভয়ের জন্যে বজ্রগান্ধারী, ভূতের ভয়ের জন্যে চণ্ডভট্টারিকা, চোরের ভয়ের জন্যে হরাহরহৃদয়া। এমন আর কত নাম করব।

দাদাঠাকুর। আমার বন্ধু এমন মন্ত্র আমাকে পড়িয়েছেন যে তাতে চিরদিনের জন্য ভয়ের বিষদাঁত ভেঙে যায়।

পঞ্চক। তোমাকে দেখে তা বোঝা যায়। কিন্তু সেই বন্ধুকে পেলে কোথা ঠাকুর।

দাদাঠাকুর। পাবই বলে সাহস করে বুক বাড়িয়ে দিলুম, তাই পেলুম। কোথাও যেতে হয় নি।

পঞ্চক। সে কী রকম?

দাদাঠাকুর। যে ছেলের ভরসা নেই সে অন্ধকারে বিছানায় মাকে না দেখতে পেলেই কাঁদে, আর যার ভরসা আছে সে হাত বাড়ালেই মাকে তখনই বুক ভরে পায়। তখন ভয়ের অন্ধকারটাই আরো নিবিড় মিষ্টি হয়ে ওঠে। মা তখন যদি জিজ্ঞাসা করে, 'আলো চাই ?' ছেলে বলে, 'তুমি থাকলে আমার আলোও যেমন অন্ধকারও তেমনি।'

পঞ্চক। দাদাঠাকুর, আমার অচলায়তন ছেড়ে অনেক সাহস করে তোমার কাছ অবধি এসেছি, কিন্তু তোমার ঐ বক্ষ পর্যন্ত যেতে সাহস করতে পারছি নে।

দাদাঠাকুর। কেন, তোমার ভয় কিসের ?

পঞ্চক। খাঁচায় যে পাখিটার জন্ম, সে আকাশকেই সব চেয়ে ডরায়। সে লোহার শলাগুলোর মধ্যে দুঃখ পায় তবু দরজাটা খুলে দিলে তার বুক দুর্‌ দুর্‌ করে, ভাবে, 'বন্ধ না থাকলে বাঁচব কী করে'। আপনাকে যে নির্ভয়ে ছেড়ে দিতে শিখি নি। এইটেই আমাদের চিরকালের অভ্যাস।

দাদাঠাকুর। তোমরা অনেকগুলো তালা লাগিয়ে সিন্ধুক বন্ধ করে রাখাকেই মস্ত লাভ মনে কর— কিন্তু সিন্ধুকে-যে আছে কী তার খোঁজ রাখ না।

পঞ্চক। আমার দাদা বলে, জগতে যা-কিছু আছে সমস্তকে দূর করে ফেলতে পারলে তবেই আসল জিনিসকে পাওয়া যায়। সেইজন্যেই দিনরাত্রি আমরা কেবল দূরই করছি— আমাদের কতটা গেল সেই হিসাবটাই আমাদের হিসাব— সে হিসাবের অন্তও পাওয়া যাচ্ছে না।

দাদাঠাকুর। তোমার দাদা তো ঐ বলে, কিন্তু আমার দাদা বলে, যখন সমস্ত পাই তখনই আসল জিনিসকে পাই। সেইজন্যে ঘরে আমি দরজা দিতে পারি নে— দিনরাত্রি সব খুলে রেখে দিই। আচ্ছা পঞ্চক, তুমি যে তোমাদের আয়তন থেকে বেরিয়ে আস কেউ তা জানে না ?

পঞ্চক। আমি জানি যে আমাদের আচার্য জানেন। কোনোদিন তাঁর সঙ্গে এ নিয়ে কোনো কথা হয় নি— তিনিও জিজ্ঞাসা করেন না, আমিও বলি নে। কিন্তু আমি যখন বাইরে থেকে ফিরে যাই তিনি আমাকে দেখলেই বুঝতে পারেন। আমাকে তখন কাছে নিয়ে বসেন, তাঁর চোখের যেন একটা কী ক্ষুধা তিনি আমাকে দেখে মেটান। যেন বাইরের আকাশটাকে তিনি আমার মুখের মধ্যে দেখে নেন। ঠাকুর, যেদিন তোমার সঙ্গে আচার্যদেবকে মিলিয়ে দিতে পারব সেদিন আমার অচলায়তনের সব দুঃখ ঘুচবে।

দাদাঠাকুর। সেদিন আমারও শুভদিন হবে।

পঞ্চক। ঠাকুর, আমাকে কিন্তু তুমি বড়ো অস্থির করে তুলেছ। এক-এক সময় ভয় হয় বুঝি কোনোদিন আর মন শান্ত হবে না।

দাদাঠাকুর। আমিই কি স্থির আছি ভাই ? আমার মধ্যে ঢেউ উঠেছে বলেই তোমারও মধ্যে ঢেউ তুলছি।

পঞ্চক। কিন্তু তবে যে তোমার ঐ শোণপাংশুরা বলে তোমার কাছে তারা খুব শান্তি পায়, কই, শান্তি কোথায় ! আমি তো দেখি নে।

দাদাঠাকুর। ওদের যে শান্তি চাই। নইলে কেবলই কাজের ঘর্ষণে ওদের কাজের মধ্যেই দাবানল লেগে যেত, ওদের পাশে কেউ দাঁড়াতে পারত না।

পঞ্চক। তোমাকে দেখে ওরা শান্তি পায় ?

দাদাঠাকুর। এই পাগল যে পাগলও হয়েছে শান্তিও পেয়েছে। তাই সে কাউকে খ্যাপায়, কাউকে বাঁধে। পূর্ণিমার চাঁদ সাগরকে উতলা করে যে মন্ত্রে, সেই মন্ত্রেই পৃথিবীকে ঘুম পাড়িয়ে রাখে।

পঞ্চক। ঢেউ তোলো ঠাকুর, ঢেউ তোলো, কূল ছাপিয়ে যেতে চাই। আমি তোমায় সত্যি বলছি আমার মন খেপেছে, কেবল জোর পাচ্ছি নে— তাই দাদাঠাকুর, মন কেবল তোমার কাছে আসতে চায়— তুমি জোর দাও— তুমি জোর দাও— তুমি আর দাঁড়াতে দিয়ো না।

গান

আমি কারে ডাকি গো
আমাব বাঁধন দাও গো টুটে।
আমি হাত বাড়িয়ে আছি
আমায় লও কেড়ে লও লুটে।
তুমি ডাকো এমনি ডাকে
যেন লজ্জা ভয় না থাকে
যেন সব ফেলে যাই, সব ঠেলে যাই,
যাই ধেয়ে যাই ছুটে।
আমি স্বপন দিয়ে বাঁধা,
কেবল ঘুমের ঘোরের বাধা,
সে যে জড়িয়ে আছে প্রাণের কাছে
মুদিয়ে আঁখিপুটে ;
ওগো দিনের পরে দিন
আমার কোথায় হল লীন,
কেবল ভাষাহারা অশ্রুধারায
পরান কেঁদে উঠে।

আচ্ছা দাদাঠাকুর, তোমাকে আর কাঁদতে হয় না ? তুমি যাব কথা বল তিনি তোমার চোখের জল মুছিয়েছেন ?

দাদাঠাকুর। তিনি চোখের জল মোছান, কিন্তু চোখেব জল গোচান না।

পঞ্চক। কিন্তু দাদা, আমি তোমার ঐ শোণপাংশুদের দেখি আব মনে ভাবি, ওরা চোখের জল ফেলতে শেখে নি। ওদের কি তুমি একেবারেই কাঁদাতে চাও না।

দাদাঠাকুর। যেখানে আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়ে না সেখানে খাল কেটে জল আনতে হয়। ওদেবও রসের দরকার হবে, তখন দূর থেকে বয়ে আনবে। কিন্তু দেখেছি ওবা বর্ষণ চায় না, তাতে ওদের কাজ কামাই যায়, সে ওরা কিছুতেই সহ্য কবতে পারে না, ঐবকমই ওদেব স্বভাব।

পঞ্চক। ঠাকুর, আমি তো সেই বর্ষণেব জন্যে তাকিয়ে আছি। যতদূর শুকোবার তা শুকিয়েছে, কোথাও একটু সবুজ আর কিছু বাকি নেই, এইবার তো সময় হয়েছে— মনে হচ্ছে যেন দূর থেকে গুরু গুরু ডাক শুনতে পাচ্ছি। বুঝি এবার ঘন নীল মেঘে তপ্ত আকাশ জুড়িয়ে যাবে, ভরে যাবে।

গান

দাদাঠাকুর। বুঝি এল, বুঝি এল, ওরে প্রাণ,
এবার ধর্‌ দেখি তোর গান।
ঘাসে ঘাসে খবর ছোটে
ধরা বুঝি শিউরে ওঠে,
দিগন্তে ওই স্তব্ধ আকাশ পেতে আছে কান।

পঞ্চক। ঠাকুর, আমার বুকের মধ্যে কী আনন্দ যে লাগছে সে আমি বলে উঠতে পারি নে। এই মাটিকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছা করে। ডাকো ডাকো, তোমার একটা ডাক দিয়ে এই আকাশ ছেয়ে ফেলো।

গান

আজ যেমন করে গাইছে আকাশ
তেমনি করে গাও গো।

যেমন করে চাইছে আকাশ
তেমনি করে চাও গো।
আজ হাওয়া যেমন পাতায় পাতায়
মর্মরিয়া বনকে কাঁদায়,
তেমনি আমার বুকের মাঝে
কাঁদিয়া কাঁদাও গো।

শুনছ দাদা, ঐ কাঁসর বাজছে।

দাদাঠাকুর। হাঁ বাজছে।

পঞ্চক। আমার আর থাকবার জো নেই।

দাদাঠাকুর। কেন।

পঞ্চক। আজ আমাদের দীপকেতন পূজা।

দাদাঠাকুর। কী করতে হবে।

পঞ্চক। আজ ডুমুরতলা থেকে মাটি এনে সেইটে পঞ্চগব্য দিয়ে মেখে বিরোচন মন্ত্র পড়তে হবে। তার পরে সেই মাটিতে ছোটো ছোটো মন্দির গড়ে তার উপরে ধ্বজা বসিয়ে দিতে হবে। এমন হাজারটা গড়ে তবে সূর্যাস্তের পরে জলগ্রহণ।

দাদাঠাকুর। ফল কী হবে।

পঞ্চক। প্রেতলোকে পিতামহদের ঘর তৈরি হয়ে যাবে।

দাদাঠাকুর। যারা ইহলোকে আছে তাদের জন্যে—

পঞ্চক। তাদের জন্যে ঘর এত সহজে তৈরি হয় না। চললুম ঠাকুর, আবার কবে দেখা হবে জানি নে। তোমার এই হাতের স্পর্শ নিয়ে চললুম—এ-ই আমার সঙ্গে সঙ্গে যাবে—এ-ই আমার নাগপাশ-বাঁধন আলগা করে দেবে। ঐ আসছে শোণপাংশুর দল— আমরা এখানে বসে আছি দেখে ওদের ভালো লাগছে না, ওরা ছট্‌ফট্‌ করছে। তোমাকে নিয়ে ওরা হুটোপাটি করতে চায়— করুক, ওরাই ধন্য, ওরা দিনরাত তোমাকে কাছে পায়।

দাদাঠাকুর। হুটোপাটি করলেই কি কাছে পাওয়া যায়। কাছে আসবার রাস্তাটা কাছের লোকের চোখেই পড়ে না।

শোণপাংশুদলের প্রবেশ

প্রথম শোণপাংশু। ও কী ভাই পঞ্চক, যাও কোথায়?

পঞ্চক। আমার সময় হয়ে গেছে, আমাকে যেতেই হবে।

দ্বিতীয় শোণপাংশু। বাঃ, সে কি হয়? আজ আমাদের বনভোজন, আজ তোমাকে ছাড়ছি নে।

পঞ্চক। না ভাই, সে হবে না—ঐ কাঁসর বাজছে।

তৃতীয় শোণপাংশু। কিসের কাঁসর বাজছে?

পঞ্চক। তোরা বুঝবি নে। আজ দীপকেতন পূজা— আজ ছেলেমানুষি না। আমি চললুম। (কিছুদূর গিয়া হঠাৎ ছুটিয়া ফিরিয়া আসিয়া)

গান

হারে রে রে রে রে—
আমায় ছেড়ে দে রে দে রে।
যেমন ছাড়া বনের পাখি
মনের আনন্দে রে।
ঘন শ্রাবণধারা
যেমন বাঁধনহারা

বাদল বাতাস যেমন ডাকাত
আকাশ লুটে ফেরে।
হারে রে রে রে রে
আমায় রাখবে ধরে কে রে।
দাবানলের নাচন যেমন
সকল কানন ঘেরে।
বজ্র যেমন বেগে
গর্জে ঝড়ের মেঘে
অট্টহাস্য সকল বিঘ্নবাধার বক্ষ চেরে।

প্রথম শোণপাংশু। বেশ বেশ পঞ্চকদাদা, তা হলে চলো আমাদের বনভোজনে।

পঞ্চক। বেশ, চলো। (একটু থামিয়া দ্বিধা করিয়া) কিন্তু ভাই, ঐ বন পর্যন্তই যাব, ভোজন পর্যন্ত নয়।

দ্বিতীয় শোণপাংশু। সে কি হয়! সকলে মিলে ভোজন না করলে আনন্দ কিসের!

পঞ্চক। না রে, তোদের সঙ্গে ঐ জায়গাটাতে আনন্দ চলবে না।

দ্বিতীয় শোণপাংশু। কেন চলবে না? চালালেই চলবে।

পঞ্চক। চালালেই চলে এমন কোনো জিনিস আমাদের ত্রিসীমানায় আসতে পারে না তা জানিস? মারলে চলে না, ঠেললে চলে না, দশটা হাতি জুড়ে দিলে চলে না, আর তুই বলিস কিনা চালালেই চলবে!

তৃতীয় শোণপাংশু। আচ্ছা, ভাই, কাজ কী। তুমি বনেই চলো, আমাদের সঙ্গে খেতে বসতে হবে না।

পঞ্চক। খুব হবে রে খুব হবে। আজ খেতে বসবই, খাবই— আজ সকলের সঙ্গে বসেই খাব— আনন্দে আজ ক্রিয়াকল্পতরুর ডালে ডালে আগুন লাগিয়ে দেব— পুড়িয়ে সব ছাই করে ফেলব। দাদাঠাকুর, তুমি ওদের সঙ্গে খাবে না?

দাদাঠাকুর। আমি রোজই খাই।

পঞ্চক। তবে তুমি আমাকে খেতে বলছ না কেন।

দাদাঠাকুর। আমি কাউকে বলি নে ভাই, নিজে বসে যাই।

পঞ্চক। না দাদা, আমার সঙ্গে অমন করলে চলবে না। আমাকে তুমি হুকুম করো, তা হলে আমি বেঁচে যাই। আমি নিজের সঙ্গে কেবলই তর্ক করে মরতে পারি নে।

দাদাঠাকুর। অত সহজে তোমাকে বেঁচে যেতে দেব না পঞ্চক। যেদিন তোমার আপনার মধ্যে হুকুম উঠবে সেইদিন আমি হুকুম করব।

একদল শোণপাংশুর প্রবেশ

দাদাঠাকুর। কী রে, এত ব্যস্ত হয়ে ছুটে এলি কেন?

প্রথম শোণপাংশু। চণ্ডককে মেরে ফেলেছে।

দাদাঠাকুর। কে মেরেছে?

দ্বিতীয় শোণপাংশু। স্থবিরপত্তনের রাজা।

পঞ্চক। আমাদের রাজা? কেন, মারতে গেল কেন।

দ্বিতীয় শোণপাংশু। স্থবিরক হয়ে ওঠবার জন্যে চণ্ডক বনের মধ্যে এক পোড়ো মন্দিরে তপস্যা করছিল। ওদের রাজা মন্থরগুপ্ত সেই খবর পেয়ে তাকে কেটে ফেলেছে।

তৃতীয় শোণপাংশু। আগে ওদের দেশের প্রাচীর পঁয়ত্রিশ হাত উঁচু ছিল, এবার আশি হাত উঁচু

করবার জন্যে লোক লাগিয়ে দিয়েছে, পাছে পৃথিবীর সব লোক লাফ দিয়ে গিয়ে হঠাৎ স্থবিরক হয়ে ওঠে।

চতুর্থ শোণপাংশু। আমাদের দেশ থেকে দশজন শোণপাংশু ধরে নিয়ে গেছে, হয়তো ওদের কালঝণ্টি দেবীর কাছে বলি দেবে।

দাদাঠাকুর। চলো তবে।

প্রথম শোণপাংশু। কোথায়।

দাদাঠাকুর। স্থবিরপত্তনে!

দ্বিতীয় শোণপাংশু। এখনই?

দাদাঠাকুর। হাঁ, এখনই।

সকলে। ওরে, চল্‌ রে চল্‌।

দাদাঠাকুর। আমাদের রাজার আদেশ আছে— ওদের পাপ যখন প্রাচীরের আকার ধরে আকাশের জ্যোতি আচ্ছন্ন করতে উঠবে তখন সেই প্রাচীর ধুলোয় লুটিয়ে দিতে হবে।

প্রথম শোণপাংশু। দেব ধুলোয় লুটিয়ে।

সকলে। দেব লুটিয়ে।

দাদাঠাকুর। ওদের সেই ভাঙা প্রাচীরের উপর দিয়ে রাজপথ তৈরি করে দেব।

সকলে। হাঁ, রাজপথ তৈরি করে দেব।

দাদাঠাকুর। আমাদের রাজার বিজয়রথ তার উপর দিয়ে চলবে।

সকলে। হাঁ, চলবে। চলবে।

পঞ্চক। দাদাঠাকুর, এ কী ব্যাপার!

দাদাঠাকুর। এই আমাদের বনভোজন।

প্রথম শোণপাংশু। চলো পঞ্চক, তুমি চলো।

দাদাঠাকুর। না না, পঞ্চক না। যাও ভাই, তুমি তোমার অচলায়তনে ফিরে যাও। যখন সময় হবে দেখা হবে।

পঞ্চক। কী জানি ঠাকুর, যদিও আমি কোনো কর্মেরই না, তবু ইচ্ছে করছে তোমাদের সঙ্গে ছুটে বেরিয়ে পড়ি।

দাদাঠাকুর। না পঞ্চক, তোমার গুরু আসবেন, তুমি অপেক্ষা করো গে।

পঞ্চক। তবে ফিরে যাই। কিন্তু ঠাকুর, যতবার বাইরে এসে তোমার সঙ্গে দেখা হয় ততবার ফিরে গিয়ে অচলায়তনে আমাকে যেন আর ধরে না। হয় ওটাকে বড়ো করে দাও, নয় আমাকে আর বাড়তে দিয়ো না।

দাদাঠাকুর। আয় রে, তবে যাত্রা করি।

৩

অচলায়তন

মহাপঞ্চক উপাধ্যায় সঞ্জীব বিশ্বম্ভর জয়োত্তম

বিশ্বম্ভর। আচার্য অদীনপুণ্য যদি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ না করেন তবে তিনি যেমন আছেন থাকুন, কিন্তু আমরা তাঁর কোনো অনুশাসন মানব না।

জয়োত্তম। তিনি বলেন, তাঁর গুরু তাঁকে যে আসনে বসিয়েছেন তাঁর গুরুই তাঁকে সেই আসন থেকে নামিয়ে দেবেন সেইজন্যে তিনি অপেক্ষা করছেন।

একটি ছাত্রের প্রবেশ

মহাপঞ্চক। কী হে তৃণাঞ্জন।

তৃণাঞ্জন। আজ দ্বাদশী, আজ আমার লোকেশ্বর ব্রতের পারণের দিন। কিন্তু কী করব, আমাদের আচার্য যে কে তার তো কোনো ঠিক হল না— আমাদের যে সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ড পণ্ড হতে বসল এর কী করা যায়!

মহাপঞ্চক। সে তো আমি তোমাদের বলে রেখেছি— এখন আশ্রমে যা-কিছু কাজ হচ্ছে, সমস্তই নিষ্ফল হচ্ছে।

উপাধ্যায়। শুধু নিষ্ফল হচ্ছে তা নয়, আমাদের অপরাধ ক্রমেই জমে উঠছে।

সঞ্জীব। এ যে বড়ো সর্বনেশে কথা।

জয়োত্তম। কিন্তু আমাদের গুরু আসবার তো দেরি নেই, এর মধ্যে আর কত অনিষ্টই বা হবে।

সঞ্জীব। আরে রাখো তোমার তর্ক। অনিষ্ট হতে সময় লাগে না। মরার পক্ষে এক মুহূর্তই যথেষ্ট।

অধ্যেতার প্রবেশ

উপাধ্যায়। কী গো অধ্যেতা, ব্যাপার কী।

অধ্যেতা। তোমরা তো আমাকে বলে এলে সুভদ্রকে মহাতামসে বসাতে— কিন্তু বসায় কার সাধ্য।

মহাপঞ্চক। কেন, কী বিঘ্ন ঘটেছে।

অধ্যেতা। মূর্তিমান বিঘ্ন রয়েছে তোমার ভাই!

মহাপঞ্চক। পঞ্চক?

অধ্যেতা। হাঁ। আমি সুভদ্রকে হিঙ্গুমর্দন কুণ্ডে স্নান করিয়ে সবে উঠেছি এমন সময় পঞ্চক এসে তাকে কেড়ে নিয়ে গেল।

মহাপঞ্চক। না, এই নরাধমকে নিয়ে আর চলল না। অনেক সহ্য করেছি। এবার ওকে নির্বাসন দেওয়াই স্থির। কিন্তু অধ্যেতা, তুমি এটা সহ্য করলে?

অধ্যেতা। আমি কি তোমার পঞ্চককে ভয় করি! স্বয়ং আচার্য অদীনপুণ্য এসে তাকে আদেশ করলেন, তাই তো সে সাহস পেলে।

তৃণাঞ্জন। আচার্য অদীনপুণ্য!

সঞ্জীব। স্বয়ং আমাদের আচার্য।

বিশ্বম্ভর। ক্রমে এ-সব হচ্ছে কী। এতদিন এই আয়তনে আছি, কখনো তো এমন অনাচারের কথা শুনি নি। যে স্নাত তাকে তার ব্রত থেকে ছিন্ন করে আনা! আর স্বয়ং আমাদের আচার্যের এই কীর্তি!

জয়োত্তম। তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা করেই দেখা যাক-না।

বিশ্বম্ভর। না না, আচার্যকে আমরা—

মহাপঞ্চক। কী করবে আচার্যকে, বলেই ফেলো।

বিশ্বম্ভর। তাই তো ভাবছি কী করা যায়। তাকে নাহয়— আপনি বলে দিন-না কী করতে হবে।

মহাপঞ্চক। আমি বলছি তাঁকে সংযত করে রাখতে হবে।

সঞ্জীব। কেমন করে?

মহাপঞ্চক। কেমন করে আবার কী! মত্ত হস্তীকে যেমন করে সংযত করতে হয় তেমনি করে।

জয়োত্তম। আমাদের আচার্যদেবকে কি তা হলে—

মহাপঞ্চক। হাঁ, তাঁকে বদ্ধ করে রাখতে হবে। চুপ করে রইলে যে! পারবে না?

তৃণাঞ্জন। কেন পারব না। আপনি যদি আদেশ করেন তা হলেই—

জয়োত্তম। কিন্তু শাস্ত্রে কি এর—

মহাপঞ্চক। শাস্ত্রে বিধি আছে।

তৃণাঞ্জন। তবে আর ভাবনা কী ?

উপাধ্যায়। মহাপঞ্চক, তোমার কিছুই বাধে না, আমার কিন্তু ভয় হচ্ছে।

আচার্যের প্রবেশ

আচার্য। বৎস, এতদিন তোমরা আমাকে আচার্য বলে মেনেছ, আজ তোমাদের সামনে আমার বিচারের দিন এসেছে। আমি স্বীকার করছি অপরাধের অন্ত নেই, অন্ত নেই, তার প্রায়শ্চিত্ত আমাকেই করতে হবে।

তৃণাঞ্জন। তবে আর দেরি করেন কেন। এ দিকে যে আমাদের সর্বনাশ হয়!

জয়োত্তম। দেখো তৃণাঞ্জন, আঁস্তাকুড়ের ছাই দিয়ে তোমার এই মুখের গর্তটা ভরিয়ে দিতে হবে। একটু থামো না।

আচার্য। গুরু চলে গেলেন, আমরা তাঁর জায়গায় পুঁথি নিয়ে বসলুম ; তার শুকনো পাতায় ক্ষুধা যতই মেটে না ততই পুঁথি কেবল বাড়াতে থাকি। খাদ্যের মধ্যে প্রাণ যতই কমে তার পরিমাণ ততই বেশি হয়। সেই জীর্ণ পুঁথির ভাণ্ডারে প্রতিদিন তোমরা দলে দলে আমার কাছে তোমাদের তরুণ হৃদয়টি মেলে ধরে কী চাইতে এসেছিলে ? অমৃতবাণী ? কিন্তু আমার তালু যে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে ! রসনায় যে রসের লেশমাত্র নেই ! এবার নিয়ে এসো সেই বাণী, গুরু, নিয়ে এসো হৃদয়ের বাণী ! প্রাণকে প্রাণ দিয়ে জাগিয়ে দিয়ে যাও !

পঞ্চক। (ছুটিয়া প্রবেশ করিয়া) তোমার নববর্ষার সজল হাওয়ায় উড়ে যাক সব শুকনো পাতা— আয় রে নবীন কিশলয়— তোরা ছুটে আয়, তোরা ফুটে বেরো। ভাই জয়োত্তম, শুনছ না, আকাশের ঘন নীল মেঘের মধ্যে মুক্তির ডাক উঠেছে— 'আজ নৃত্য কর্ রে নৃত্য কর্'।

গান

ওরে ওরে ওরে, আমার মন মেতেছে,
তারে আজ থামায় কে রে !
সে যে আকাশ-পানে হাত পেতেছে,
তারে আজ নামায় কে রে !

প্রথম জয়োত্তমের, পরে বিশ্বম্ভরের, পরে সঞ্জীবের নৃত্যগীতে যোগ

মহাপঞ্চক। পঞ্চক, নির্লজ্জ বানর কোথাকার, থাম্ বলছি, থাম্ !

গান

পঞ্চক। ওরে, আমার মন মেতেছে
আমারে থামায় কে রে।

মহাপঞ্চক। উপাধ্যায়, আমি তোমাকে বলি নি একজটা দেবীর শাপ আরম্ভ হয়েছে ? দেখছ, কী করে তিনি আমাদের সকলের বুদ্ধিকে বিচলিত করে তুলছেন— ক্রমে দেখবে অচলায়তনের একটি পাথরও আর থাকবে না।

পঞ্চক। না থাকবে না, থাকবে না, পাথরগুলো সব পাগল হয়ে যাবে ; তারা কে কোথায় ছুটে বেরিয়ে পড়বে, তারা গান ধরবে—

ওরে ভাই, নাচ্ রে ও ভাই, নাচ্ রে—
আজ ছাড়া পেয়ে বাঁচ্ রে—
লাজ ভয় ঘুচিয়ে দে রে।
তোরে আজ থামায় কে রে !

মহাপঞ্চক। উপাধ্যায়, হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছ কী ! সর্বনাশ শুরু হয়েছে, বুঝতে পারছ না ! ওরে সব ছন্নমতি মূর্খ, অভিশপ্ত বর্বর, আজ তোদের নাচবার দিন ?

পঞ্চক। সর্বনাশের বাজনা বাজলেই নাচ শুরু হয় দাদা।

মহাপঞ্চক। চুপ কর্ লক্ষ্মীছাড়া! ছাত্রগণ, তোমরা আত্মবিস্মৃত হোয়ো না। ঘোর বিপদ আসন্ন সে কথা স্মরণ রেখো।

বিশ্বম্ভর। আচার্যদেব, পায়ে ধরি, সুভদ্রকে আমাদের হাতে দিন, তাকে তার প্রায়শ্চিত্ত থেকে নিরস্ত করবেন না।

আচার্য। না বৎস, এমন অনুরোধ কোরো না।

সঞ্জীব। ভেবে দেখুন, সুভদ্রের কতবড়ো ভাগ্য। মহাতামস কজন লোকে পারে। ও যে ধরাতলে দেবত্ব লাভ করবে।

আচার্য। গায়ের জোরে দেবতা গড়বার পাপে আমাকে লিপ্ত কোরো না। সে মানুষ, সে শিশু, সেইজন্যই সে দেবতাদের প্রিয়।

তৃণাঞ্জন। দেখুন, আপনি আমাদের আচার্য, আমাদের প্রণম্য, কিন্তু যে অন্যায় আজ করছেন, তাতে আমরা বলপ্রয়োগ করতে বাধ্য হব।

আচার্য। করো, বলপ্রয়োগ করো, আমাকে মেনো না, আমাকে মারো, আমি অপমানেরই যোগ্য, তোমাদের হাত দিয়ে আমার যে শাস্তি আরম্ভ হল তাতেই বুঝতে পারছি গুরুর আবির্ভাব হয়েছে। কিন্তু সেইজন্যেই বলছি শাস্তির কারণ আর বাড়তে দেব না। সুভদ্রকে তোমাদের হাতে দিতে পারব না।

তৃণাঞ্জন। পারবেন না?

আচার্য। না।

মহাপঞ্চক। তা হলে আর দ্বিধা করা নয়। তৃণাঞ্জন, এখন তোমাদের উচিত ওঁকে জোর করে ধরে নিয়ে ঘরে বন্ধ করা। ভীরু, কেউ সাহস করছ না? আমাকেই তবে এ কাজ করতে হবে?

জয়োত্তম। খবরদার— আচার্যদেবের গায়ে হাত দিতে পারবে না।

বিশ্বম্ভর। না না, মহাপঞ্চক, ওঁকে অপমান করলে আমরা সইতে পারব না।

সঞ্জীব। আমরা সকলে মিলে পায়ে ধরে ওঁকে রাজি করাব। একা সুভদ্রের প্রতি দয়া করে উনি কি আমাদের সকলের অমঙ্গল ঘটাবেন?

তৃণাঞ্জন। এই অচলায়তনের এমন কত শিশু উপবাসে প্রাণত্যাগ করেছে— তাতে ক্ষতি কী হয়েছে!

সুভদ্রের প্রবেশ

সুভদ্র। আমাকে মহাতামস ব্রত করাও।

পঞ্চক। সর্বনাশ করলে! ঘুমিয়ে পড়েছে দেখে আমি এখানে এসেছিলুম, কখন জেগে চলে এসেছে।

আচার্য। বৎস সুভদ্র, এসো আমার কোলে। যাকে পাপ বলে ভয় করছ সে পাপ আমার— আমিই প্রায়শ্চিত্ত করব।

তৃণাঞ্জন। না না, আয় রে আয় সুভদ্র, তুই মানুষ না, তুই দেবতা।

সঞ্জীব। তুই ধন্য।

বিশ্বম্ভর। তোর বয়সে মহাতামস করা আর কারও ভাগ্যে ঘটে নি। সার্থক তোর মা তোকে গর্ভে ধারণ করেছিল।

উপাধ্যায়। আহা সুভদ্র, তুই আমাদের অচলায়তনেরই বালক বটে।

মহাপঞ্চক। আচার্য, এখনো কি তুমি জোর করে এই বালককে এই মহাপুণ্য থেকে বঞ্চিত করতে চাচ্ছ?

আচার্য। হায় হায় এই দেখেই তো আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। তোমরা যদি ওকে কাঁদিয়ে

আমার হাত থেকে ছিঁড়ে কেড়ে নিয়ে যেতে তা হলেও আমার এত বেদনা হত না। কিন্তু দেখছি হাজার বছরের নিষ্ঠুর বাহু অতটুকু শিশুর মনকেও পাথরের মুঠোয় চেপে ধরেছে, একেবারে পাঁচ আঙুলের দাগ বসিয়ে দিয়েছে রে। কখন সময় পেল সে ? সে কি গর্ভের মধ্যেও কাজ করে !

পঞ্চক। সুভদ্র, আয় ভাই, প্রায়শ্চিত্ত করতে যাই— আমিও যাব তোর সঙ্গে।

আচার্য। বৎস, আমিও যাব।

সুভদ্র। না না, আমাকে যে একলা থাকতে হবে— লোক থাকলে যে পাপ হবে !

মহাপঞ্চক। ধন্য শিশু, তুমি তোমার ঐ প্রাচীন আচার্যকে আজ শিক্ষা দিলে। এসো তুমি আমার সঙ্গে।

আচার্য। না, আমি যতক্ষণ তোমাদের আচার্য আছি ততক্ষণ আমার আদেশ ব্যতীত কোনো ব্রত আরম্ভ বা শেষ হতেই পারে না। আমি নিষেধ করছি। সুভদ্র, আচার্যের কথা অমান্য কোরো না— এসো পঞ্চক, ওকে কোলে করে নিয়ে এসো।

[সুভদ্রকে লইয়া পঞ্চকের ও আচার্যের এবং উপাধ্যায়ের প্রস্থান

মহাপঞ্চক। ধিক্। তোমাদের মতো ভীরুদের দুর্গতি হতে রক্ষা করে এমন সাধ্য কারও নেই। তোমরা নিজেও মরবে, অন্য সকলকেও মারবে। তোমাদের উপাধ্যায়টিও তেমনি হয়েছেন— তাঁরও আর দেখা নেই।

পদাতিকের প্রবেশ

পদাতিক। রাজা আসছে।

মহাপঞ্চক। ব্যাপারখানা কী ! এ যে আমাদের রাজা মন্থবগুপ্ত।

রাজার প্রবেশ

রাজা। নরদেবগণ, তোমাদের সকলকে নমস্কার।

সকলে। জয়োস্তু রাজন্।

মহাপঞ্চক। কুশল তো ?

রাজা। অত্যন্ত মন্দ সংবাদ। প্রত্যন্তদেশের দূতেরা এসে খবর দিল যে দাদাঠাকুরের দল এসে আমাদের রাজ্যসীমার প্রাচীর ভাঙতে আরম্ভ করেছে।

মহাপঞ্চক। দাদাঠাকুরের দল কারা ?

রাজা। ঐ-যে শোণপাংশুরা।

মহাপঞ্চক। শোণপাংশুরা যদি আমাদের প্রাচীর ভাঙে তা হলে যে সমস্ত লণ্ডভণ্ড করে দেবে।

রাজা। সেইজন্যেই তো ছুটে এলুম। তোমাদের কাছে আমার প্রশ্ন এই যে, আমাদের প্রাচীর ভাঙল কেন ?

মহাপঞ্চক। শিখাসচ্ছন্দ মহাভৈরব তো আমাদের প্রাচীর রক্ষা করছেন।

রাজা। তিনি অনাচারী শোণপাংশুদের কাছে আপন শিখা নত করলেন ! নিশ্চয়ই তোমাদের মন্ত্র-উচ্চারণ অশুদ্ধ হচ্ছে, তোমাদের ক্রিয়াপদ্ধতিতে স্খলন হচ্ছে, নইলে এ যে স্বপ্নের অতীত।

মহাপঞ্চক। আপনি সত্যই অনুমান করেছেন মহারাজ।

সঞ্জীব। একজটা দেবীর শাপ তো আর ব্যর্থ হতে পারে না।

রাজা। একজটা দেবীর শাপ ! সর্বনাশ ! কেন তাঁর শাপ।

মহাপঞ্চক। যে উত্তর দিকে তাঁর অধিষ্ঠান এখানে একদিন সেই দিককার জানলা খোলা হয়েছে।

রাজা। (বসিয়া পড়িয়া) তবে তো আর আশা নেই।

মহাপঞ্চক। আচার্য অদীনপুণ্য এ-পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে দিচ্ছেন না।

তৃণাঞ্জন। তিনি জোর করে আমাদের ঠেকিয়ে রেখেছেন।

রাজা। তবে তো মিথ্যা আমি সৈন্য জড়ো করতে বলে এলুম। দাও, দাও, অদীনপুণ্যকে এখনই নির্বাসিত করে দাও।

মহাপঞ্চক। আগামী অমাবস্যায়—

রাজা। না না, এখন তিথিনক্ষত্র দেখবার সময় নেই। বিপদ আসন্ন। সংকটের সময় আমি আমার রাজ-অধিকার খাটাতে পারি— শাস্ত্রে তার বিধান আছে।

মহাপঞ্চক। হাঁ আছে। কিন্তু আচার্য কে হবে?

রাজা। তুমি, তুমি। এখনই আমি তোমাকে আচার্যের পদে প্রতিষ্ঠিত করে দিলুম। দিক্‌পালগণ সাক্ষী রইলেন, এই ব্রহ্মচারীরা সাক্ষী রইলেন।

মহাপঞ্চক। অদীনপুণ্যকে কোথায় নির্বাসিত করতে চান?

রাজা। আয়তনের বাহিরে নয়— কী জানি যদি শত্রুপক্ষের সঙ্গে যোগ দেন। আমার পরামর্শ এই যে, আয়তনের প্রান্তে যে দর্ভকদের পাড়া আছে এ-কয়দিন সেইখানে তাঁকে বদ্ধ করে রেখো।

জয়োত্তম। আচার্য অদীনপুণ্যকে দর্ভকদের পাড়ায়! তারা যে অন্ত্যজ পতিত জাতি।

মহাপঞ্চক। যিনি স্পর্ধাপূর্বক আচার লঙ্ঘন করেন, অনাচারীদের মধ্যে বাস করলেই তবে তাঁর চোখ ফুটবে। মনে কোরো না আমার ভাই বলে পঞ্চককে ক্ষমা করব— তারও সেইখানে গতি।

রাজা। দেখো মহাপঞ্চক, তোমার উপরই নির্ভর, যুদ্ধে জেতা চাই। আমার হার যদি হয় তবে সে তোমাদের অচলায়তনেরই অক্ষয় কলঙ্ক।

মহাপঞ্চক। কোনো ভয় করবেন না।

৪

দর্ভকপল্লী

পঞ্চক। নির্বাসন, আমার নির্বাসন রে! বেঁচে গেছি, বেঁচে গেছি। কিন্তু এখনো মনটাকে তার খোলসের ভিতর থেকে টেনে বার করতে পারছি নে কেন!

গান

এই মৌমাছিদের ঘরছাড়া কে করেছে রে।
তোরা আমায় বলে দে, ভাই, বলে দে রে।
ফুলের গোপন পরান-মাঝে
নীরব সুরে বাঁশি বাজে—
ওদের সেই বাঁশিতে কেমনে মন হরেছে রে।
যে মধুটি লুকিয়ে আছে
দেয় না ধরা কারো কাছে
ওদের সেই মধুতে কেমনে মন ভরেছে রে।

দর্ভকদলের প্রবেশ

প্রথম দর্ভক। দাদাঠাকুর!

পঞ্চক। ও কী ও। দাদাঠাকুর বলছিস কাকে? আমার গায়ে দাদাঠাকুর নাম লেখা হয়ে গেছে নাকি?

প্রথম দর্ভক। তোমাদের কী খেতে দেব ঠাকুর?

পঞ্চক। তোদের যা আছে তাই আমরা খাব।

দ্বিতীয় দর্ভক। আমাদের খাবার? সে কি হয়? সে যে সব ছোঁওয়া হয়ে গেছে।

পঞ্চক। সেজন্যে ভাবিস নে ভাই। পেটের খিদে যে আগুন, সে কারও ছোঁওয়া মানে না, সবই পবিত্র করে। ওরে, তোরা সকালবেলায় করিস কী বল্‌ তো। ষড়ক্ষরিত দিয়ে একবার ঘটশুদ্ধি করে নিবি নে?

তৃতীয় দর্ভক। ঠাকুর, আমরা নীচ দর্ভকজাত— আমরা ও-সব কিছুই জানি নে। আজ কত পুরুষ ধরে এখানে বাস করে আসছি, কোনোদিন তো তোমাদের পায়ের ধুলা পড়ে নি। আজ তোমাদের মন্ত্র পড়ে আমাদের বাপ-পিতামহকে উদ্ধার করে দাও ঠাকুর।

পঞ্চক। সর্বনাশ! বলিস কী! এখানেও মন্ত্র পড়তে হবে! তা হলে নির্বাসনের দরকার কী ছিল? তা, সকালবেলা তোরা কী করিস বল্‌ তো?

প্রথম দর্ভক। আমরা শাস্ত্র জানি নে, আমরা নামগান করি।

পঞ্চক। সে কী রকম ব্যাপার? শোনা দেখি একটা।

দ্বিতীয় দর্ভক। ঠাকুর, সে তুমি শুনে হাসবে।

পঞ্চক। আমিই তো ভাই এতদিন লোক হাসিয়ে আসছি— তোরা আমাকেও হাসাবি! শুনেও মন খুশি হয়। আমি যে কী মূল্যের মানুষ সে তোরা খবর পাস নি বলে এখনো আমার হাসিকে ভয় করিস। কিছু ভাবিস নে— নির্ভয়ে শুনিয়ে দে।

প্রথম দর্ভক। আচ্ছা ভাই আয় তবে— গান ধর।

গান

ও অকূলের কূল, ও অগতির গতি,
ও অনাথের নাথ, ও পতিতের পতি!
ও নয়নের আলো, ও রসনার মধু,
ও রতনের হার, ও পরানের বঁধু!
ও অপরূপ রূপ, ও মনোহর কথা,
ও চরমের সুখ, ও মরমের ব্যথা!
ও ভিখারির ধন, ও অবলার বোল—
ও জনমের দোলা, ও মরণের কোল!

পঞ্চক। দে ভাই, আমার মন্ত্রতন্ত্র সব ভুলিয়ে দে, আমার বিদ্যাসাধ্যি সব কেড়ে নে, দে আমাকে তোদের ঐ গান শিখিয়ে দে।

প্রথম দর্ভক। আমাদের গান?

পঞ্চক। হাঁ রে হাঁ, ঐ অধমের গান, অক্ষমের কান্না। তোদের এই মূর্খের বিদ্যা এই কাঙালের সম্বল খুঁজেই তো আমার পড়াশুনা কিছু হল না, আমার ক্রিয়াকর্ম সমস্ত নিষ্ফল হয়ে গেল! ও ভাই, আর-একটা শোনা— অনেক দিনকার তৃষ্ণা অল্পে মেটে না।

দর্ভকদলের গান

আমরা তারেই জানি তারেই জানি সাথের সাথি।
তারেই করি টানাটানি দিবারাতি।
সঙ্গে তারি চরাই ধেনু,
বাজাই বেণু,
তারি লাগি বটের ছায়ায় আসন পাতি।
তারে হালের মাঝি করি
চালাই তরী,
ঝড়ের বেলায় ঢেউয়ের খেলায় মাতামাতি।

সারাদিনের কাজ ফুরালে
সন্ধ্যাকালে
তাহারি পথ চেয়ে ঘরে জ্বালাই বাতি।

আচার্যের প্রবেশ

আচার্য। সার্থক হল আমার নির্বাসন।

প্রথম দর্ভক। বাবাঠাকুর, আমাদের সমস্ত পাড়া আজ ত্রাণ পেয়ে গেল। এতদিন তোমার চরণধুলো তো এখানে পড়ে নি।

আচার্য। সে আমার অভাগ্য, সে আমারই অভাগ্য।

দ্বিতীয় দর্ভক। বাবা, তোমার স্নানের জল কাকে দিয়ে তোলাব। এখানে তো—

আচার্য। বাবা, তোরাই তুলে আনবি।

প্রথম দর্ভক। আমরা তুলে আনব! সে কি হয়!

আচার্য। হাঁ বাবা, তোদের তোলা জলে আজ আমার অভিষেক হবে।

দ্বিতীয় দর্ভক। ওরে চল্ তবে ভাই, চল্। আমাদের পাটলা নদী থেকে জল আনি গে। [প্রস্থান

আচার্য। দেখো পঞ্চক, কাল এখানে এসে আমার ভারি গ্লানি বোধ হচ্ছিল।

পঞ্চক। আমি তো কাল রাত্রে ঘরের বাইরে শুয়েই কাটিয়ে দিয়েছি।

আচার্য। যখন এইরকম অত্যন্ত কুণ্ঠিত হয়ে আপনাকে আদ্যোপান্ত পাপলিপ্ত মনে করে বসে আছি এমন সময় ওরা সন্ধ্যাবেলায় ওদের কাজ থেকে ফিরে এসে সকলে মিলে গান ধরলে—

পারের কাণ্ডারী গো, এবার ঘাট কি দেখা যায়?
নামবে কি সব বোঝা এবার, ঘুচবে কি সব দায়?

শুনতে শুনতে মনে হল আমার যেন একটা পাথরের দেহ গলে গেল। দিনের পর দিন কী ভার বয়েই বেড়িয়েছি! কিন্তু কতই সহজ সরল প্রাণ নিয়ে সেই পারের কাণ্ডারীর খেয়ায় চড়ে বসা!

পঞ্চক। আমি দেখছি দর্ভক জাতের একটা গুণ— ওরা একেবারে স্পষ্ট করে নাম নিতে জানে। আর তট তট তোতয় তোতয় করতে করতে আমার জিবের এমনি দশা হয়েছে যে, সহজ কথাটা কিছুতেই মুখ দিয়ে বেরোতে চায় না। আচার্যদেব, কেবল ভালো করে না ডাকতে পেরেই আমাদের বুকের ভিতরটা এমন শুকিয়ে এসেছে, একবার খুব করে গলা ছেড়ে ডাকতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু গলা খোলে না যে— রাজ্যের পুঁথি পড়ে পড়ে গলা বুজে গিয়েছে প্রভু। এমন হয়েছে আজ কান্না এলেও বেধে যায়।

আচার্য। সেইজন্যেই তো ভাবছি আমাদের গুরু আসবেন কবে। জঞ্জাল সব ঠেলে ফেলে দিয়ে আমাদের প্রাণটাকে একেবারে সরল করে দিন— হাতে করে ধরে সকলের সঙ্গে মিল করিয়ে দিন।

পঞ্চক। মনে হচ্ছে যেন ভিজে মাটির গন্ধ পাচ্ছি, কোথায় যেন বর্ষা নেমেছে।

আচার্য। ঐ, পঞ্চক, শুনতে পাচ্ছ কি?

পঞ্চক। কী বলুন দেখি?

আচার্য। আমার মনে হচ্ছে যেন সুভদ্র কাঁদছে।

পঞ্চক। এখান থেকে কি শোনা যাবে? এ বোধ হয় আর-কোনো শব্দ।

আচার্য। তা হবে পঞ্চক, আমি তার কান্না আমার বুকের মধ্যে করে এনেছি। তার কান্নাটা এমন করে আমাকে বেজেছে কেন জান? সে যে কান্না রাখতে পারে না তবু কিছুতে মানতে চায় না সে কাঁদছে।

পঞ্চক। এতক্ষণে ওরা তাকে মহাতামসে বসিয়েছে— আর সকলে মিলে খুব দূরে থেকে বাহবা দিয়ে বলছে সুভদ্র দেবশিশু। আর কিছু না, আমি যদি রাজা হতুম তা হলে ওদের সবাইকে কানে ধরে

দেবতা করে দিতুম— কিছুতে ছাড়তুম না।

আচার্য। ওরা ওদের দেবতাকে কাঁদাচ্ছে পঞ্চক। সেই দেবতারই কান্নায় এ রাজ্যের সকল আকাশ আকুল হয়ে উঠেছে। তবু ওদের পাষাণের বেড়া এখনো শতধা বিদীর্ণ হয়ে গেল না।

পঞ্চক। প্রভু, আমরা তাঁকে সকলে মিলে কত কাঁদালুম তবু তাড়াতে পারলুম না। তাঁকে যে-ঘরে বসালুম সে-ঘরের আলো সব নিবিয়ে দিলুম-- তাঁকে আর দেখতে পাই নে— তবু তিনি সেখানে বসে আছেন।

গান

সকল জনম ভ'রে
ও মোর দরদিয়া—
কাঁদি কাঁদাই তোরে
ও মোর দরদিয়া!
আছ হৃদয়মাঝে,
সেথা কতই ব্যথা বাজে
ওগো এ কি তোমার সাজে
ও মোর দরদিয়া!
এই দুয়ার-দেওয়া ঘরে
কভু আঁধার নাহি সরে,
তবু আছ তারি 'পরে
ও মোর দরদিয়া!
সেথা আসন হয় নি পাতা,
সেথা মালা হয় নি গাঁথা;
আমার লজ্জাতে হেঁট মাথা
ও মোর দরদিয়া।

উপাচার্যের প্রবেশ

আচার্য। একি সূতসোম! আমার কী সৌভাগ্য। কিন্তু তুমি এখানে এলে যে?

উপাচার্য। আর কোথা যাব বলো। তুমি চলে আসামাত্র অচলায়তন যে কী কঠিন হয়ে উঠল, কী শুকিয়ে গেল সে আমি বলতে পারি নে। এখন এসো একবার কোলাকুলি করি।

আচার্য। আমাকে ছুঁয়ো না— কাল থেকে ঘটশুদ্ধি ভূতশুদ্ধি কিছুই করি নি।

উপাচার্য। তা হোক, তা হোক। তোমারও আলিঙ্গন যদি অশুচি হয় তবে সেই অশুচিতার পুণ্যদীক্ষাই আমাকে দাও।

কোলাকুলি

পঞ্চক। উপাচার্যদেব, অচলায়তনে তোমার কাছে যত অপরাধ করেছি আজ এই দর্ভকপাড়ায় সে-সমস্ত ক্ষমা করে নাও।

উপাচার্য। এসো বৎস, এসো।

আলিঙ্গন

আচার্য। সূতসোম, গুরু তো শীঘ্রই আসছেন, এখন তুমি সেখান থেকে চলে এলে কী করে।

উপাচার্য। সেইজন্যেই চলে এলুম। গুরু আসছেন, তুমি নেই! আর মহাপঞ্চক এসে গুরুকে বরণ করে নেবে— এও দাঁড়িয়ে থেকে দেখতে হবে! ঐ শাস্ত্রের কীটটা গুরুকে আহ্বান করে আনবার যোগ্য এমন কথা যদি স্বয়ং মহামহর্ষি জলধরগর্জিতঘোষ-সুস্বরনক্ষত্রশঙ্কুসুমিত এসেও বলেন তবু আমি মানতে পারব না।

পঞ্চক। আঃ দেখতে দেখতে কী মেঘ করে এল! শুনছ আচার্যদেব, বজ্রের পর বজ্র! আকাশকে একেবারে দিকে দিকে দগ্ধ করে দিলে যে!

আচার্য। ঐ-যে নেমে এল বৃষ্টি— পৃথিবীর কত দিনের পথ-চাওয়া বৃষ্টি— অরণ্যের কত রাতের স্বপ্ন-দেখা বৃষ্টি।

পঞ্চক। মিটল এবার মাটির তৃষ্ণা— এই যে কালো মাটি— এই যে সকলের পায়ের নিচেকার মাটি।

ডালিতে কেয়াফুল কদম্বফুল লইয়া বাদ্যসহ দর্ভকদলের প্রবেশ

আচার্য। বাবা, তোমাদের এ কী সমারোহ! আজ এ কী কাণ্ড!

প্রথম দর্ভক। বাবাঠাকুর, আজ তোমাদের নিয়েই সমারোহ। কখনো পাই নে, আজ পেয়েছি।

দ্বিতীয় দর্ভক। আমরা তো শাস্ত্র কিছুই জানি নে— তোমাদের দেবতা আমাদের ঘরে আসে না।

তৃতীয় দর্ভক। কিন্তু আজ দেবতা কী মনে করে অতিথি হয়ে এই অধমদের ঘরে এসেছেন।

প্রথম দর্ভক। তাই আমাদের যা আছে তাই দিয়ে তোমাদের সেবা করে নেব।

দ্বিতীয় দর্ভক। আমাদের মন্ত্র নেই বলে আমরা শুধু কেবল গান গাই।

মাদল বাজাইয়া নৃত্যগীত

উতল ধারা বাদল ঝরে,
সকল বেলা একা ঘরে।
সজল হাওয়া বহে বেগে,
পাগল নদী উঠে জেগে,
আকাশ ঘেরে কাজল মেঘে,
তমালবনে আঁধার করে।
ওগো বঁধূ দিনের শেষে
এলে তুমি কেমন বেশে।
আঁচল দিয়ে শুকাব জল
মুছাব পা আকুল কেশে।
নিবিড় হবে তিমির রাতি,
জ্বেলে দেব প্রেমের বাতি,
পরানখানি দিব পাতি
চরণ রেখো তাহার 'পরে।

আচার্য। পঞ্চক, আমাদেরও এমনি করে ডাকতে হবে— বজ্ররবে যিনি দরজায় ঘা দিয়েছেন তাঁকে ঘরে ডেকে নাও— আর দেরি কোরো না।

ভুলে গিয়ে জীবন মরণ
লব তোমায় করে বরণ,
করিব জয় শরমত্রাসে
দাঁড়াব আজ তোমার পাশে
বাঁধন বাধা যাবে জ্বলে,
সুখদুঃখ দেব দলে,
ঝড়ের রাতে তোমার সাথে
বাহির হব অভয় ভরে।

সকলে। উতল ধারা বাদল ঝরে—
দুয়ার খুলে এলে ঘরে।

চোখে আমার ঝলক লাগে,
সকল মনে পুলক জাগে,
চাহিতে চাই মুখের বাগে
নয়ন মেলে কাঁপি ডরে।

পঞ্চক। ঐ আবার বজ্র।
আচার্য। দ্বিগুণ বেগে বৃষ্টি এল।
উপাচার্য। আজ সমস্ত রাত এমনি করেই কাটবে।

৫

অচলায়তন

মহাপঞ্চক তৃণাঞ্জন সঞ্জীব বিশ্বম্ভর জয়োত্তম

মহাপঞ্চক। তোমরা অত ব্যস্ত হয়ে পড়ছ কেন! কোনো ভয় নেই।

তৃণাঞ্জন। তুমি তো বলছ ভয় নেই, এই যে খবর এল শত্রুসৈন্য অচলায়তনের প্রাচীর ফুটো করে দিয়েছে।

মহাপঞ্চক। এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। শিলা জলে ভাসে! ম্লেচ্ছরা অচলায়তনের প্রাচীর ফুটো করে দেবে! পাগল হয়েছ!

সঞ্জীব। কে যে বললে দেখে এসেছে।

মহাপঞ্চক। সে স্বপ্ন দেখেছে।

জয়োত্তম। আজই তো আমাদের গুরুর আসবার কথা।

মহাপঞ্চক। তার জন্যে সমস্ত আয়োজন ঠিক হয়ে গেছে; কেবল যে ছেলের মা-বাপ ভাই-বোন কেউ মরে নি এমন নবম গর্ভের সন্তান এখনো জুটিয়ে আনতে পারলে না— দ্বারে দাঁড়িয়ে কে যে মহারক্ষা পড়বে ঠিক করতে পারছি নে।

সঞ্জীব। গুরু এলে তাঁকে চিনে নেবে কে। আচার্য অদীনপুণ্য তাঁকে জানতেন। আমরা তো কেউ তাঁকে দেখি নি।

মহাপঞ্চক। আমাদের আয়তনে যে শাঁক বাজায় সেই বৃদ্ধ তাঁকে দেখেছে। আমাদের পূজার ফুল যে জোগায় সেও তাঁকে জানে।

বিশ্বম্ভর। ঐ-যে উপাধ্যায় ব্যস্ত হয়ে ছুটে আসছেন।

মহাপঞ্চক। নিশ্চয় গুরু আসবার সংবাদ পেয়েছেন। কিন্তু মহারক্ষা-পাঠের কী করা যায়! ঠিক লক্ষণসম্পন্ন ছেলে তো পাওয়া গেল না।

উপাধ্যায়ের প্রবেশ

মহাপঞ্চক। কতদূর।

উপাধ্যায়। কতদূর কী! এসে পড়েছে যে!

মহাপঞ্চক। কই দ্বারে তো এখনো শাঁক বাজালে না।

উপাধ্যায়। বিশেষ দরকার দেখি নে— কারণ দ্বারের চিহ্নও দেখতে পাচ্ছি নে— ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে।

মহাপঞ্চক। বল কী! দ্বার ভেঙেছে?

উপাধ্যায়। শুধু দ্বার নয়, প্রাচীরগুলোকে এমনি সমান করে শুইয়ে দিয়েছে যে তাদের সম্বন্ধে আর কোনো চিন্তা করবার নেই।

মহাপঞ্চক। কিন্তু আমাদের দৈবজ্ঞ যে গণনা করে স্পষ্ট দেখিয়ে দিয়ে গেল যে—

উপাধ্যায়। তার চেয়ে ঢের স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে শত্রুসৈন্যদেব রক্তবর্ণ টুপিগুলো।

ছাত্রগণ। কী সর্বনাশ!

সঞ্জীব। কিসের মন্ত্র তোমার মহাপঞ্চক!

তৃণাঞ্জন। আমি তো তখনই বলেছিলুম এ-সব কাজ এই কাঁচাবয়সের পুঁথিপড়া অকালপক্কদের দিয়ে হবার নয়।

বিশ্বম্ভর। কিন্তু এখন করা যায় কী?

তৃণাঞ্জন। আমাদের আচার্যদেবকে এখনই ফিরিয়ে আনি গে। তিনি থাকলে এ বিপত্তি ঘটতেই পারত না। হাজার হোক লোকটা পাকা।

সঞ্জীব। কিন্তু দেখো মহাপঞ্চক, আমাদের আয়তনের যদি কোনো বিপত্তি ঘটে তা হলে তোমাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলব।

উপাধ্যায়। সে পরিশ্রমটা তোমাদের করতে হবে না, উপযুক্ত লোক আসছে।

মহাপঞ্চক। তোমরা মিথ্যা বিচলিত হচ্ছ। বাইরের প্রাচীর ভাঙতে পারে, কিন্তু ভিতরের লোহার দরজা বন্ধ আছে। সে যখন ভাঙবে তখন চন্দ্রসূর্য নিবে যাবে। আমি অভয় দিচ্ছি তোমরা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে অচলায়তনেব রক্ষক-দেবতার আশ্চর্য শক্তি দেখে নাও।

উপাধ্যায়। তার চেয়ে দেখি কোন্ দিক দিয়ে বেরোবার রাস্তা।

তৃণাঞ্জন। আমাদেরও তো সেই ইচ্ছা। কিন্তু এখান থেকে বেরোবার পথ যে জানিই নে। কোনোদিন বেরোতে হবে বলে স্বপ্নেও মনে করি নি।

সঞ্জীব। শুনছ— ঐ শুনছ, ভেঙে পড়ল সব।

ছাত্রগণ। কী হবে আমাদের! নিশ্চয় দরজা ভেঙেছে।

তৃণাঞ্জন। ধরো মহাপঞ্চককে। বাঁধো ওকে। একজটা দেবীর কাছে ওকে বলি দেবে চলো।

মহাপঞ্চক। সেই কথাই ভালো। দেবীর কাছে আমাকে বলি দেবে চলো। তাঁর রোষ শান্তি হবে। এমন নিষ্পাপ বলি তিনি আর পাবেন কোথায়।

বালকদলের প্রবেশ

উপাধ্যায়। কী রে, তোরা সব নৃত্য করছিস কেন?

প্রথম বালক। আজ এ কী মজা হল!

উপাধ্যায়। মজাটা কী রকম শুনি?

দ্বিতীয় বালক। আজ চার দিক থেকেই আলো আসছে— সব যেন ফাঁক হয়ে গেছে।

তৃতীয় বালক। এত আলো তো আমরা কোনোদিন দেখি নি।

প্রথম বালক। কোথাকার পাখির ডাক এখান থেকেই শোনা যাচ্ছে।

দ্বিতীয় বালক। এ-সব পাখির ডাক আমরা তো কোনোদিন শুনি নি। এ তো আমাদের খাঁচার ময়নার মতো একেবারেই নয়।

প্রথম বালক। আজ আমাদের খুব ছুটতে ইচ্ছে করছে। তাতে কি দোষ হবে মহাপঞ্চকদাদা?

মহাপঞ্চক। আজকের কথা ঠিক বলতে পারছি নে। আজ কোনো নিয়ম রক্ষা করা চলবে বলে বোধ হচ্ছে না।

প্রথম বালক। আজ তা হলে আমাদের ষড়াসন বন্ধ?

মহাপঞ্চক। হাঁ, বন্ধ।

সকলে। ওরে কী মজা রে মজা!

দ্বিতীয় বালক। আজ পঙ্ক্তিধৌতির দরকার নেই?

মহাপঞ্চক। না।

সকলে। ওরে কী মজা! আঃ আজ চার দিকে কী আলো।

জয়োত্তম। আমারও মনটা নেচে উঠেছে বিশ্বম্ভর। এ কি ভয়, না আনন্দ, কিছুই বুঝতে পারছি নে।

বিশ্বম্ভর। আজ একটা অদ্ভুত কাণ্ড হচ্ছে জয়োত্তম।

সঞ্জীব। কিন্তু ব্যাপারটা যে কী ভেবে উঠতে পারছি নে। ওরে ছেলেগুলো, তোরা হঠাৎ এত খুশি হয়ে উঠলি কেন বল্ দেখি।

প্রথম বালক। দেখছ না সমস্ত আকাশটা যেন ঘরের মধ্যে দৌড়ে এসেছে।

দ্বিতীয় বালক। মনে হচ্ছে ছুটি— আমাদের ছুটি।

তৃতীয় বালক। সকাল থেকে পঞ্চকদাদার সেই গানটা কেবলই আমরা গেয়ে বেড়াচ্ছি।

জয়োত্তম। কোন্ গান?

প্রথম বালক। সেই যে—

গান

আলো, আমার আলো, ওগো
আলো ভুবনভরা।
আলো নয়ন-ধোওয়া আমার
আলো হৃদয়হরা।
নাচে আলো নাচে— ও ভাই
আমার প্রাণের কাছে,
বাজে আলো বাজে— ও ভাই
হৃদয়-বীণার মাঝে;
জাগে আকাশ ছোটে বাতাস
হাসে সকল ধরা।
আলো, আমার আলো, ওগো
আলো ভুবনভরা।
আলোর স্রোতে পাল তুলেছে
হাজার প্রজাপতি।
আলোর ঢেউয়ে উঠল নেচে
মল্লিকা মালতী।
মেঘে মেঘে সোনা— ও ভাই
যায় না মানিক গোনা,
পাতায় পাতায় হাসি— ও ভাই
পুলক রাশি রাশি,
সুরনদীর কূল ডুবেছে
সুধা-নিঝর-ঝরা।
আলো, আমার আলো, ওগো
আলো ভুবনভরা।

[বালকদের প্রস্থান

জয়োত্তম। দেখো মহাপঞ্চকদাদা, আমার মনে হচ্ছে ভয় কিছুই নেই— নইলে ছেলেদের মন এমন অকারণে খুশি হয়ে উঠল কেন।

মহাপঞ্চক। ভয় নেই সে তো আমি বরাবর বলে আসছি।

শঙ্খবাদক ও মালীর প্রবেশ

উভয়ে। গুরু আসছেন।
সকলে। গুরু!
মহাপঞ্চক। শুনলে তো। আমি নিশ্চয় জানতুম তোমার আশঙ্কা বৃথা।
সকলে। ভয় নেই আর ভয় নেই।
তৃণাঞ্জন। মহাপঞ্চক যখন আছেন তখন কি আমাদের ভয় থাকতে পারে।
সকলে। জয় আচার্য মহাপঞ্চকের।

যোদ্ধৃবেশে দাদাঠাকুরের প্রবেশ

শঙ্খবাদক ও মালী। (প্রণাম করিয়া) জয় গুরুজির জয়।

সকলে স্তম্ভিত

মহাপঞ্চক। উপাধ্যায়, এই কি গুরু?
উপাধ্যায়। তাই তো শুনছি।
মহাপঞ্চক। তুমি কি আমাদের গুরু?
দাদাঠাকুর। হাঁ। তুমি আমাকে চিনবে না, কিন্তু আমিই তোমাদের গুরু।
মহাপঞ্চক। তুমি গুরু? তুমি আমাদের সমস্ত নিয়ম লঙ্ঘন করে এ কোন্ পথ দিয়ে এলে! তোমাকে কে মানবে?
দাদাঠাকুর। আমাকে মানবে না জানি, কিন্তু আমিই তোমাদের গুরু।
মহাপঞ্চক। তুমি গুরু? তবে এই শত্রুবেশে কেন?
দাদাঠাকুর। এই তো আমার গুরুর বেশ। তুমি যে আমার সঙ্গে লড়াই করবে— সেই লড়াই আমার গুরুর অভ্যর্থনা।
মহাপঞ্চক। কেন তুমি আমাদের প্রাচীর ভেঙে দিয়ে এলে।
দাদাঠাকুর। তুমি কোথাও তোমার গুরুর প্রবেশের পথ রাখ নি।
মহাপঞ্চক। তুমি কি মনে করেছ তুমি অস্ত্র হাতে করে এসেছ বলে আমি তোমার কাছে হার মানব।
দাদাঠাকুর। না, এখনই না। কিন্তু দিনে দিনে হার মানতে হবে, পদে পদে।
মহাপঞ্চক। আমাকে নিরস্ত্র দেখে ভাবছ আমি তোমাকে আঘাত করতে পারি নে?
দাদাঠাকুর। আঘাত করতে পার কিন্তু আহত করতে পার না— আমি যে তোমার গুরু।
মহাপঞ্চক। উপাধ্যায়, তোমরা এঁকে প্রণাম করবে নাকি?
উপাধ্যায়। দয়া করে উনি যদি আমাদের প্রণাম গ্রহণ করেন তা হলে প্রণাম করব বৈকি— তা নইলে যে—
মহাপঞ্চক। না, আমি তোমাকে প্রণাম করব না।
দাদাঠাকুর। আমি তোমার প্রণাম গ্রহণ করব না— আমি তোমাকে প্রণত করব।
মহাপঞ্চক। তুমি আমাদের পূজা নিতে আস নি?
দাদাঠাকুর। আমি তোমাদের পূজা নিতে আসি নি, অপমান নিতে এসেছি।
মহাপঞ্চক। তোমার পশ্চাতে অস্ত্রধারী এ কারা?
দাদাঠাকুর। এরা আমার অনুবর্তী— এরা শোণপাংশু।
সকলে। শোণপাংশু!
মহাপঞ্চক। এরাই তোমার অনুবর্তী?
দাদাঠাকুর। হাঁ।

মহাপঞ্চক। এই মন্ত্রহীন কর্মকাণ্ডহীন ম্লেচ্ছদল!

দাদাঠাকুর। এসো তো, তোমাদের মন্ত্র এদের শুনিয়ে দাও। এদের কর্মকাণ্ড কী রকম তাও ক্রমে দেখতে পাবে।

শোণপাংশুদের গান

যিনি সকল কাজের কাজি, মোরা
তাঁরি কাজের সঙ্গী।
যাঁর নানারঙের রঙ্গ, মোরা
তাঁরি রসের রঙ্গী।
তাঁর বিপুল ছন্দে ছন্দে
মোরা যাই চলে আনন্দে,
তিনি যেমনি বাজান ভেরী, মোদের
তেমনি নাচের ভঙ্গি।
এই জন্মমরণ-খেলায়
মোরা মিলি তাঁরি মেলায়
এই দুঃখসুখের জীবন মোদের
তাঁরি খেলার অঙ্গী।
ওরে ডাকেন তিনি যবে
তাঁর জলদমন্দ্র রবে
ছুটি পথের কাঁটা পায়ে দ'লে
সাগরগিরি লঙ্ঘি।

মহাপঞ্চক। আমি এই আয়তনের আচার্য— আমি তোমাকে আদেশ করছি তুমি এখন ঐ ম্লেচ্ছদলকে সঙ্গে নিয়ে বাহির হয়ে যাও।

দাদাঠাকুর। আমি যাকে আচার্য নিযুক্ত করব সেই আচার্য; আমি যা আদেশ করব সেই আদেশ।

মহাপঞ্চক। উপাধ্যায়, আমরা এমন করে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না। এসো আমরা এদের এখান থেকে বাহির করে দিয়ে আমাদের আয়তনের সমস্ত দরজাগুলো আবার একবার দ্বিগুণ দৃঢ় করে বন্ধ করি।

উপাধ্যায়। এরাই আমাদের বাহির করে দেবে, সেই সম্ভাবনাটাই প্রবল বলে বোধ হচ্ছে!

প্রথম শোণপাংশু। অচলায়তনের দরজার কথা বলছ— সে আমরা আকাশের সঙ্গে দিব্যি সমান করে দিয়েছি।

উপাধ্যায়। বেশ করেছ ভাই। আমাদের ভারি অসুবিধা হচ্ছিল। এত তালাচাবির ভাবনাও ভাবতে হত!

মহাপঞ্চক। পাথরের প্রাচীর তোমরা ভাঙতে পার, লোহার দরজা তোমরা খুলতে পার, কিন্তু আমি আমার ইন্দ্রিয়ের সমস্ত দ্বার রোধ করে এই বসলুম— যদি প্রায়োপবেশনে মরি তবু তোমাদের হাওয়া তোমাদের আলো লেশমাত্র আমাকে স্পর্শ করতে দেব না।

প্রথম শোণপাংশু। এ পাগলটা কোথাকার রে! এই তলোয়ারের ডগা দিয়ে ওর মাথার খুলিটা একটু ফাঁক করে দিলে ওর বুদ্ধিতে একটু হাওয়া লাগতে পারে।

মহাপঞ্চক। কিসের ভয় দেখাও আমায়? তোমরা মেরে ফেলতে পার, তার বেশি ক্ষমতা তোমাদের নেই।

প্রথম শোণপাংশু। ঠাকুর, এই লোকটাকে বন্দী করে নিয়ে যাই— আমাদের দেশের লোকের ভারি মজা লাগবে।

দাদাঠাকুর। ওকে বন্দী করবে তোমরা? এমন কী বন্ধন তোমাদের হাতে আছে।

দ্বিতীয় শোণপাংশু। ওকে কি কোনো শাস্তিই দেব না।

দাদাঠাকুর। শাস্তি দেবে! ওকে স্পর্শ করতেও পারবে না। ও আজ যেখানে বসেছে সেখানে তোমাদের তলোয়ার পৌঁছয় না।

বালকদলের প্রবেশ

সকলে। তুমি আমাদের গুরু?

দাদাঠাকুর। হাঁ, আমি তোমাদের গুরু।

সকলে। আমরা প্রণাম করি।

দাদাঠাকুর। বৎস, তোমরা মহাজীবন লাভ করো।

প্রথম বালক। ঠাকুর, তুমি আমাদের কী করবে।

দাদাঠাকুর। আমি তোমাদের সঙ্গে খেলব।

সকলে। খেলবে!

দাদাঠাকুর। নইলে তোমাদের গুরু হয়ে সুখ কিসের।

সকলে। কোথায় খেলবে?

দাদাঠাকুর। আমার খেলার মস্ত মাঠ আছে।

প্রথম বালক। মস্ত। এই ঘরের মতো মস্ত?

দাদাঠাকুর। এর চেয়ে অনেক বড়ো।

দ্বিতীয় বালক। এর চেয়েও বড়ো? ঐ আঙিনাটার মতো?

দাদাঠাকুর। তার চেয়ে বড়ো।

দ্বিতীয় বালক। তার চেয়ে বড়ো! উঃ কী ভয়ানক!

প্রথম বালক। সেখানে খেলতে গেলে পাপ হবে না?

দাদাঠাকুর। কিসের পাপ।

দ্বিতীয় বালক। খোলা জায়গায় গেলে পাপ হয় না?

দাদাঠাকুর। না বাছা, খোলা জায়গাতেই সব পাপ পালিয়ে যায়।

সকলে। কখন নিয়ে যাবে।

দাদাঠাকুর। এখানকার কাজ শেষ হলেই।

জয়োত্তম। (প্রণাম করিয়া) প্রভু, আমিও যাব।

বিশ্বম্ভর। সঞ্জীব, আর দ্বিধা করলে কেবল সময় নষ্ট হবে। প্রভু, ঐ বালকদের সঙ্গে আমাদেরও ডেকে নাও।

সঞ্জীব। মহাপঞ্চকদাদা, তুমিও এসো-না!

মহাপঞ্চক। না, আমি না।

৬

দর্ভকপল্লী

গান

পঞ্চক। আমি যে সব নিতে চাই, সব নিতে ধাই রে।
আমি আপনাকে ভাই মেলব যে বাইরে।
পালে আমার লাগল হাওয়া,
হবে আমার সাগর যাওয়া,
ঘাটে তরী নাই বাঁধা নাই রে।

সুখে দুখে বুকের মাঝে
পথের বাঁশি কেবল বাজে,
সকল কাজে শুনি যে তাই রে।
পাগলামি আজ লাগল পাখায়,
পাখি কি আর থাকবে শাখায়?
দিকে দিকে সাড়া যে পাই রে।

আচার্যের প্রবেশ

পঞ্চক। দূরে থেকে নানাপ্রকার শব্দ শুনতে পাচ্ছি আচার্যদেব! অচলায়তনে বোধ হয় খুব সমারোহ চলছে।

আচার্য। সময় তো হয়েছে। কালই তো তাঁর আসবার কথা ছিল। আমার মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। একবার সুতসোমকে ওখানে পাঠিয়ে দিই।

পঞ্চক। তিনি আজ একাদশীর তর্পণ করবেন বলে কোথায় ইন্দ্রতৃণ পাওয়া যায় সেই খোঁজে বেরিয়েছেন।

দর্ভকদলের প্রবেশ

পঞ্চক। কী ভাই, তোরা এত ব্যস্ত কিসের?

প্রথম দর্ভক। শুনছি অচলায়তনে কারা সব লড়াই করতে এসেছে।

আচার্য। লড়াই কিসের? আজ তো গুরু আসবার কথা।

দ্বিতীয় দর্ভক। না না, লড়াই হচ্ছে খবর পেয়েছি। সমস্ত ভেঙেচুরে একাকার করে দিলে যে।

তৃতীয় দর্ভক। বাবাঠাকুর, তোমরা যদি হুকুম কর আমরা যাই ঠেকাই গিয়ে।

আচার্য। ওখানে তো লোক ঢের আছে, তোমাদের ভয় নেই বাবা।

প্রথম দর্ভক। লোক তো আছে কিন্তু তারা লড়াই করতে পারবে কেন?

দ্বিতীয় দর্ভক। শুনেছি কতরকম মন্ত্রলেখা তাগাতাবিজ দিয়ে তারা দুখানা হাত আগাগোড়া কষে বেঁধে রেখেছে। খোলে না, পাছে কাজ করতে গেলেই তাদের হাতের গুণ নষ্ট হয়।

পঞ্চক। আচার্যদেব, এদের সংবাদটা সত্যই হবে। কাল সমস্ত রাত মনে হচ্ছিল চার দিকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন ভেঙেচুরে পড়ছে। ঘুমের ঘোরে ভাবছিলুম স্বপ্ন বুঝি।

আচার্য। তবে কি গুরু আসেন নি?

পঞ্চক। হয়তো বা দাদা ভুল করে আমার গুরুরই সঙ্গে লড়াই বাধিয়ে বসেছেন! আটক নেই। রাত্রে তাঁকে হঠাৎ দেখে হয়তো যমদূত বলে ভুল করেছিলেন।

প্রথম দর্ভক। আমরা শুনেছি কে বলছিল গুরুও এসেছেন।

আচার্য। গুরুও এসেছেন! সে কী রকম হল!

পঞ্চক। তবে লড়াই করতে কারা এসেছে বল্ তো?

প্রথম দর্ভক। লোকের মুখে শুনি তাদের নাকি বলে দাদাঠাকুরের দল।

পঞ্চক। দাদাঠাকুরের দল! বল্ বল্ শুনি, ঠিক বলছিস তো রে?

দ্বিতীয় দর্ভক। হাঁ, সকলেই তো বলছে দাদাঠাকুরের দল।

পঞ্চক। ওরে কী আনন্দ রে কী আনন্দ!

আচার্য। একি পঞ্চক, হঠাৎ তুমি এরকম উন্মত্ত হয়ে উঠলে কেন?

পঞ্চক। প্রভু, আমার মনের একটা বাসনা ছিল কোনো সুযোগে যদি আমাদের দাদাঠাকুরের সঙ্গে গুরুর মিলন করিয়ে দিতে পারি, তা হলে দেখে নিই কে হারে কে জেতে!

আচার্য। পঞ্চক, তোমার কথা আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি নে। তুমি দাদাঠাকুর বলছ কাকে?

পঞ্চক। আচার্যদেব, ঐটে আমার গোপন কথা, অনেকদিন থেকেই মনে রেখে দিয়েছি। এখন তোমাকে বলব না প্রভু, যদি তিনি এসে থাকেন তা হলে একেবারে চোখে চোখে মিলিয়ে দেব।

প্রথম দর্ভক। বাবাঠাকুর, হুকুম করো, একবার ওদের সঙ্গে লড়ে আসি— দেখিয়ে দিই এখানে মানুষ আছে।

পঞ্চক। আয় না ভাই আমিও তোদের সঙ্গে চলব রে।

দ্বিতীয় দর্ভক। তুমিও লড়বে নাকি ঠাকুর?

পঞ্চক। হাঁ, লড়ব।

আচার্য। কী বলছ পঞ্চক! তোমাকে লড়তে কে ডাকছে!

পঞ্চক। আমার প্রাণ ডাকছে। একটা কিসের মায়াতে মন জড়িয়ে রয়েছে প্রভু। যেন কেবলই স্বপ্ন দেখছি— আর যতই জোর করছি কিছুতেই জাগতে পারছি নে। কেবল এমন বসে বসে হবে না দেব! একেবারে লড়াইয়ের মাঝখানে গিয়ে পড়তে না পারলে কিছুতেই এ ঘোর কাটবে না।

গান

আর নহে আর নয়।
আমি করি নে আর ভয়।
আমার ঘুচল বাঁধন ফলল সাধন,
হল বাঁধন ক্ষয়।
ওই আকাশে ওই ডাকে,
আমায় আর কে ধরে রাখে।
আমি সকল দুয়ার খুলেছি আজ
যাব সকলময়।
ওরা বসে বসে মিছে
শুধু মায়াজাল গাঁথিছে,
ওরা কী যে গোনে ঘরের কোণে
আমায় ডাকে পিছে।
আমার অস্ত্র হল গড়া,
আমার বর্ম হল পরা,
এবার ছুটবে ঘোড়া পবনবেগে
করবে ভুবন জয়।

মালীর প্রবেশ

মালী। আচার্যদেব, আমাদের গুরু আসছেন।

আচার্য। বলিস কী! গুরু? তিনি এখানে আসছেন? আমাকে আহ্বান করলেই তো আমি যেতুম।

প্রথম দর্ভক। এখানে তোমাদের গুরু এলে তাঁকে বসাব কোথায়!

দ্বিতীয় দর্ভক। বাবাঠাকুর, তুমি এখানে তাঁর বসবার জায়গাকে একটু শোধন করে নাও— আমরা তফাতে সরে যাই।

আর-একদল দর্ভকের প্রবেশ

প্রথম দর্ভক। বাবাঠাকুর, এ তোমাদের গুরু নয়— সে এ পাড়ায় আসবে কেন! এ যে আমাদের গোঁসাই!

দ্বিতীয় দর্ভক। আমাদের গোঁসাই?

প্রথম দর্ভক। হাঁ রে হাঁ, আমাদের গোঁসাই। এমন সাজ তার আর কখনো দেখি নি! একেবারে চোখ ঝলসে যায়।

তৃতীয় দর্ভক। ঘরে কী আছে রে ভাই সব বের কর্।

দ্বিতীয় দর্ভক। বনের জাম আছে রে।

চতুর্থ দর্ভক। আমার ঘরে খেজুর আছে।

প্রথম দর্ভক। কালো গোরুর দুধ শিগ্‌গির দুয়ে আনো দাদা।

দাদাঠাকুরের প্রবেশ

আচার্য। (প্রণাম করিয়া) জয় গুরুজির জয়!

পঞ্চক। এ কী! এ যে দাদাঠাকুর! গুরু কোথায়?

দর্ভকদল। গোঁসাইঠাকুর। প্রণাম হই। খবর দিয়ে এলে না কেন? তোমার ভোগ যে তৈরি হয় নি।

দাদাঠাকুর। কেন ভাই, তোদের ঘরে আজ রান্না চড়ে নি নাকি? তোরাও মন্ত্র নিয়ে উপোস করতে আরম্ভ করেছিস নাকি রে?

প্রথম দর্ভক। আমরা আজ শুধু মাষকলাই আর ভাত চড়িয়েছি। ঘরে আর কিছু ছিল না।

দাদাঠাকুর। আমারও তাতেই হয়ে যাবে।

পঞ্চক। দাদাঠাকুর, আমার ভারি গর্ব ছিল এ রাজ্যে একলা আমিই কেবল চিনি তোমাকে। কারও যে চিনতে আর বাকি নেই।

প্রথম দর্ভক। ঐ তো আমাদের গোঁসাই, পূর্ণিমার দিনে এসে আমাদের পিঠে খেয়ে গেছে, তার পর এই কতদিন পরে দেখা। চল্ ভাই, আমাদের যা আছে সব সংগ্রহ করে আনি।

[প্রস্থান

দাদাঠাকুর। আচার্য, তুমি এ কী করেছ?

আচার্য। কী যে করেছি তা বোঝবারও শক্তি আমার নেই। তবে এইটুকু বুঝি— আমি সব নষ্ট করেছি।

দাদাঠাকুর। যিনি তোমাকে মুক্তি দেবেন তাঁকেই তুমি কেবল বাঁধবার চেষ্টা করেছ।

আচার্য। কিন্তু বাঁধতে তো পারি নি ঠাকুর! তাঁকে বাঁধছি মনে করে যতগুলো পাক দিয়েছি সব পাক কেবল নিজের চারি দিকেই জড়িয়েছি। যে হাত দিয়ে সেই বাঁধন খোলা যেতে পারত সেই হাতটা সুদ্ধ বেঁধে ফেলেছি।

দাদাঠাকুর। যিনি সব জায়গায় আপনি ধরা দিয়ে বসে আছেন তাঁকে একটা জায়গায় ধরতে গেলেই তাঁকে হারাতে হয়।

আচার্য। তিনি যে আছেন এই খবরটা মনের মধ্যে পৌঁছায় নি বলেই মনে করে বসেছিলুম তাঁকে বুঝি কৌশল করে গড়ে তুলতে হয়। তাই দিনরাত বসে বসে এত ব্যর্থ চেষ্টার জাল পাকিয়েছি।

দাদাঠাকুর। তোমার যে কারাগারটাতে তোমার নিজেকেই আঁটে না সেইখানে তাঁকে শিকল পরাবার আয়োজন না করে তাঁরই এই খোলা মন্দিরের মধ্যে তোমার আসন পাতবার জন্যে প্রস্তুত হও।

আচার্য। আদেশ করো প্রভু। ভুল করেছিলুম জেনেও সে ভুল ভাঙতে পারি নি। পথ হারিয়েছি তা জানতুম, যতই চলছি ততই পথ হতে কেবল বেশি দূরে গিয়ে পড়ছি তাও বুঝতে পেরেছিলুম, কিন্তু ভয়ে থামতে পারছিলুম না। এই চক্রে হাজার বার ঘুরে বেড়ানোকেই পথ খুঁজে পাবার উপায় বলে মনে করেছিলুম।

দাদাঠাকুর। যে চক্র কেবল অভ্যাসের চক্র, যা কোনো জায়গাতেই নিয়ে যায় না, কেবল নিজের

মধ্যেই ঘুরিয়ে মারে, তার থেকেই বের করে সোজা রাস্তায় বিশ্বের সকল যাত্রীর সঙ্গে দাঁড় করিয়ে দেবার জন্যেই আমি আজ এসেছি।

আচার্য। ধন্য করেছ। কিন্তু এতদিন আস নি কেন প্রভু? আমাদের আয়তনের পাশেই এই দর্ভকপাড়ায় তুমি আনাগোনা করছ আর কত বৎসর হয়ে গেল আমাদের আর দেখা দিলে না!

দাদাঠাকুর। এদের দেখা দেওয়ার রাস্তা যে সোজা। তোমাদের সঙ্গে দেখা করা তো সহজ করে রাখ নি।

পঞ্চক। ভালোই করেছি, তোমার শক্তি পরীক্ষা করে নিয়েছি। তুমি আমাদের পথ সহজ করে দেবে কিন্তু তোমার পথ সহজ নয়। এখন আমি ভাবছি তোমাকে ডাকব কী বলে? দাদাঠাকুর, না গুরু?

দাদাঠাকুর। যে জানতে চায় না যে আমি তাকে চালাচ্ছি আমি তার দাদাঠাকুর, আর যে আমার আদেশ নিয়ে চলতে চায় আমি তার গুরু।

পঞ্চক। প্রভু, তুমি তা হলে আমার দুইই। আমাকে আমিই চালাচ্ছি, আর আমাকে তুমিই চালাচ্ছ এই দুটোই আমি মিশিয়ে জানতে চাই। আমি শোণপাংশু না, তোমাকে মেনে চলতে ভয় নেই। তোমার মুখের আদেশকেই আনন্দে আমার মনের ইচ্ছা করে তুলতে পারব। এবার তবে তোমার সঙ্গে তোমারই বোঝা মাথায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ি ঠাকুর।

দাদাঠাকুর। আমি তোমার জায়গা ঠিক করে রেখেছি।

পঞ্চক। কোথায় ঠাকুর?

দাদাঠাকুর। ঐ অচলায়তনে।

পঞ্চক। আবার অচলায়তনে! আমার কারাদণ্ডের মেয়াদ ফুরোয় নি?

দাদাঠাকুর। কারাগার যা ছিল সে তো আমি ভেঙে ফেলেছি, এখন সেই উপকরণ দিয়ে সেইখানেই তোমাকে মন্দির গেঁথে তুলতে হবে।

পঞ্চক। ঠাকুর, আমি তোমাকে জোড়হাত করে বলছি, আর আমাকে বসিয়ে রাখার কাজে লাগিয়ো না। তোমার ঐ বীরবেশে আমার মন ভুলেছে— তোমাকে এমন মনোহর আর কখনো দেখি নি।

দাদাঠাকুর। ভয় নেই পঞ্চক। অচলায়তনে আর সেই শান্তি দেখতে পাবে না। তার দ্বার ফুটো করে দিয়ে আমি তার মধ্যেই লড়াইয়ের ঝোড়ো হাওয়া এনে দিয়েছি। নিজের নাসাগ্রভাগের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বসে থাকবার দিন এখন চিরকালের মতো ঘুচিয়ে দিয়েছি।

পঞ্চক। কিন্তু অচলায়তনের লোকে যে আমাকে আপন বলে গ্রহণ করবে না প্রভু।

দাদাঠাকুর। আমি বলছি তুমি অচলায়তনের লোকের সকলের চেয়ে আপন।

পঞ্চক। কিন্তু দাদাঠাকুর, আমি কেবল একলা, একলা, ওরা আমাকে সবাই ঠেলে রেখে দেবে।

দাদাঠাকুর। ওরা তোমাকে গ্রহণ করতে চাচ্ছে না, সেইজন্যেই ওখানে তোমার সব চেয়ে দরকার। ওরা তোমাকে ঠেলে দিচ্ছে বলেই তুমি ওদের ঠেলতে পারবে না।

পঞ্চক। আমাকে কী করতে হবে?

দাদাঠাকুর। যে যেখানে ছড়িয়ে আছে সবাইকে ডাক দিয়ে আনতে হবে।

পঞ্চক। সবাইকে কি কুলোবে?

দাদাঠাকুর। না যদি কুলোয় তা হলে এমনি করে দেয়াল আবার আর-একদিন ভাঙতেই হবে সেই বুঝে গেঁথো— আমার আর কাজ বাড়িয়ো না।

পঞ্চক। শোণপাংশুদের—

দাদাঠাকুর। হাঁ, ওদেরও ডেকে এনে বসাতে হবে, ওরা একটু বসতে শিখুক।

পঞ্চক। ওদের বসিয়ে রাখা! সর্বনাশ! তার চেয়ে ওদের ভাঙতে চুরতে দিলে ওরা বেশি ঠাণ্ডা থাকে। ওরা যে কেবল ছটফট করাকেই মুক্তি মনে করে।

দাদাঠাকুর। ছোটো ছেলেকে পাকা বেল দিলে সে ভারি খুশি হয়ে মনে করে এটা খেলার গোলা। কেবল সেটাকে গড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। ওরাও সেইরকম স্বাধীনতাকে বাইরে থেকে ভারি একটা মজার জিনিস বলে জানে— কিন্তু জানে না স্থির হয়ে বসে তার ভিতর থেকে সার পদার্থটা বের করে নিতে হয়। কিছুদিনের জন্যে তোমার মহাপঞ্চকদাদার হাতে ওদের ভার দিলেই খানিকটা ঠাণ্ডা হয়ে ওরা নিজের ভিতরের দিকটাতে পাক ধরাবার সময় পাবে।

পঞ্চক। তা হলে আমার মহাপঞ্চকদাদাকে কি ঐখানেই—

দাদাঠাকুর। হাঁ ঐখানেই বৈকি। তার ওখানে অনেক কাজ। এতদিন ঘর বন্ধ করে অন্ধকারে ও মনে করছিল চাকাটা খুব চলছে, কিন্তু চাকাটা কেবল এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ঘুরছিল তা সে দেখতেও পায় নি। এখন আলোতে তার দৃষ্টি খুলে গেছে, সে আর সে-মানুষ নেই। কী করে আপনাকে আপনি ছাড়িয়ে উঠতে হয় সেইটে শেখাবার ভার ওর উপর। ক্ষুধাতৃষ্ণা-লোভভয়-জীবনমৃত্যুর আবরণ বিদীর্ণ করে আপনাকে প্রকাশ করার রহস্য ওর হাতে আছে।

আচার্য। আর এই চির-অপরাধীর কী বিধান করলে প্রভু?

দাদাঠাকুর। তোমাকে আর কাজ করতে হবে না আচার্য। তুমি আমার সঙ্গে এসো।

আচার্য। বাঁচালে প্রভু, আমাকে রক্ষা করলে। আমার সমস্ত চিত্ত শুকিয়ে পাথর হয়ে গেছে— আমাকে আমারই এই পাথরের বেড়া থেকে বের করে আনো। আমি কোনো সম্পদ চাই নে— আমাকে একটু রস দাও।

দাদাঠাকুর। ভাবনা নেই আচার্য, ভাবনা নেই— আনন্দের বর্ষা নেমে এসেছে— তার ঝর ঝর শব্দে মন নৃত্য করছে আমার। বাইরে বেরিয়ে এলেই দেখতে পাবে চারি দিক ভেসে যাচ্ছে। ঘরে বসে ভয়ে কাঁপছে কারা। এ ঘনঘোর বর্ষার কালো মেঘে আনন্দ, তীক্ষ্ণ বিদ্যুতে আনন্দ, বজ্রের গর্জনে আনন্দ। আজ মাথার উষ্ণীষ যদি উড়ে যায় তো উড়ে যাক, গায়ের উত্তরীয় যদি ভিজে যায় তো ভিজে যাক— আজ দুর্যোগ একে বলে কে! আজ ঘরের ভিত যদি ভেঙে গিয়ে থাকে যাক-না— আজ একেবারে বড়ো রাস্তার মাঝখানে হবে মিলন।

সুভদ্রের প্রবেশ

সুভদ্র। গুরু!

দাদাঠাকুর। কী বাবা?

সুভদ্র। আমি যে-পাপ করেছি তার তো প্রায়শ্চিত্ত শেষ হল না!

দাদাঠাকুর। তার আর কিছু বাকি নেই।

সুভদ্র। বাকি নেই?

দাদাঠাকুর। না। আমি সমস্ত চুরমার করে ধুলোয় লুটিয়ে দিয়েছি।

সুভদ্র। একজটা দেবী—

দাদাঠাকুর। একজটা দেবী! উত্তরের দিকের দেয়ালটা ভাঙবামাত্রই একজটা দেবীর সঙ্গে আমাদের এমনি মিল হয়ে গেল যে, সে আর কোনোদিন জটা দুলিয়ে কাউকে ভয় দেখাবে না। এখন তাকে দেখলে মনে হবে সে আকাশের আলো— তার সমস্ত জটা আষাঢ়ের নবীন মেঘের মধ্যে জড়িয়ে গিয়েছে।

সুভদ্র। এখন আমি কী করব।

পঞ্চক। এখন তুমি আছ ভাই আর আমি আছি। দুজনে মিলে কেবলই উত্তর দক্ষিণ পুব পশ্চিমের সমস্ত দরজা-জানলাগুলো খুলে খুলে বেড়াব।

উপাচার্য। (প্রবেশ করিয়া) তৃণ পাওয়া গেল না— কোথাও তৃণ পাওয়া গেল না।

আচার্য। সূতসোম, তুমি বুঝি তৃণ খুঁজেই বেড়াচ্ছিলে?

উপাচার্য। হাঁ, ইন্দ্রতৃণ, সে তো কোথাও পাওয়া গেল না। হায় হায়! এখন আমি করি কী! এমন

জায়গাতেও মানুষ বাস করে!

আচার্য। থাক্ তোমার তৃণ। এ দিকে একবার চেয়ে দেখো।

উপাচার্য। এ কী! এ যে আমাদের গুরু! এখানে! এই দর্ভকদের পাড়ায়! এখন উপায় কী! ওঁকে কোথায়—

দর্ভকগণের অর্ঘ্য লইয়া প্রবেশ

প্রথম দর্ভক। গোঁসাই, এই-সব তোমার জন্যে এনেছি। কেতনের মাসি পরশু পিঠে তৈরি করেছিল, তারই কিছু বাকি আছে—

উপাচার্য। আরে আরে, সর্বনাশ করলে রে! করিস কী! উনি যে আমাদের গুরু।

দ্বিতীয় দর্ভক। তোমাদের গুরু আবার কোথায়? এ তো আমাদের গোঁসাই।

দাদাঠাকুর। দে ভাই, আর কিছু এনেছিস?

দ্বিতীয় দর্ভক। হাঁ, জাম এনেছি।

তৃতীয় দর্ভক। কিছু দই এনেছি।

দাদাঠাকুর। সব এখানে রাখ্। এসো ভাই পঞ্চক, এসো আচার্য অদীনপুণ্য— নতুন আচার্য আর পুরাতন আচার্য এসো, এদের ভক্তির উপর ভাগ করে নিয়ে আজকের দিনটাকে সার্থক করি।

বালকগণের প্রবেশ

সকলে। গুরু!

দাদাঠাকুর। এসো বাছা, তোমরা এসো।

প্রথম বালক। কখন আমরা বের হব?

দাদাঠাকুর। আর দেরি নেই— এখনই বের হতে হবে।

দ্বিতীয় বালক। এখন কী করব?

দাদাঠাকুর। এই-যে তোমাদের ভোগ তৈরি হয়েছে।

প্রথম বালক। ও ভাই, এই-যে জাম— কী মজা।

দ্বিতীয় বালক। ওরে ভাই, খেজুর— কী মজা।

তৃতীয় বালক। গুরু, এতে কোনো পাপ নেই?

দাদাঠাকুর। কিছু না—পুণ্য আছে।

প্রথম বালক। সকলের সঙ্গে এইখানে বসে খাব?

দাদাঠাকুর। হাঁ, এইখানেই।

শোণপাংশুদলের প্রবেশ

প্রথম শোণপাংশু। দাদাঠাকুর!

দ্বিতীয় শোণপাংশু। আর তো পারি নে। দেয়াল তো একটাও বাকি রাখি নি। এখন কী করব? বসে বসে পা ধরে গেল যে।

দাদাঠাকুর। ভয় নেই রে। শুধু শুধু বসিয়ে রাখব না। তোদের কাজ দেব।

সকলে। কী কাজ দেবে?

দাদাঠাকুর। আমাদের পঞ্চকদাদার সঙ্গে মিলে ভাঙা ভিতের উপর আবার গাঁথতে লেগে যেতে হবে।

সকলে। বেশ, বেশ, রাজি আছি।

দাদাঠাকুর। ঐ ভিতের উপর কাল যুদ্ধের রাত্রে স্থবিরকের রক্তের সঙ্গে শোণপাংশুর রক্ত মিলে গিয়েছে।

সকলে। হাঁ মিলেছে।

দাদাঠাকুর। সেই মিলনেই শেষ করলে চলবে না। এবার আর লাল নয়, এবার একেবারে শুভ্র। নূতন সৌধের সাদা ভিতকে আকাশের আলোর মধ্যে অভ্রভেদী করে দাঁড় করাও। মেলো তোমরা দুই দলে, লাগো তোমাদের কাজে।

সকলে। তাই লাগব। পঞ্চকদাদা, তা হলে তোমাকে উঠতে হচ্ছে, অমন করে ঠাণ্ডা হয়ে বসে থাকলে চলবে না। ত্বরা করো। আর দেরি না।

পঞ্চক। প্রস্তুত আছি। গুরু তবে প্রণাম করি। আচার্যদেব আশীর্বাদ করো।

ডাকঘর

ডাকঘর

১

মাধব দত্ত। মুশকিলে পড়ে গেছি। যখন ও ছিল না, তখন ছিলই না— কোনো ভাবনাই ছিল না। এখন ও কোথা থেকে এসে আমার ঘর জুড়ে বসল ; ও চলে গেলে আমার এ ঘর যেন আর ঘরই থাকবে না। কবিরাজমশায়, আপনি কি মনে করেন ওকে—

কবিরাজ। ওর ভাগ্যে যদি আয়ু থাকে, তা হলে দীর্ঘকাল বাঁচতেও পারে ; কিন্তু আয়ুর্বেদে যেরকম লিখছে তাতে তো—

মাধব দত্ত। বলেন কী!

কবিরাজ। শাস্ত্রে বলছেন, পৈত্তিকান্ সন্নিপাতজান্ কফবাতসমুদ্‌ভবান্—

মাধব দত্ত। থাক্ থাক্, আপনি আর ঐ শ্লোকগুলো আওড়াবেন না— ওতে আরো আমার ভয় বেড়ে যায়। এখন কী করতে হবে সেইটে বলে দিন।

কবিরাজ। (নস্য লইয়া) খুব সাবধানে রাখতে হবে।

মাধব দত্ত। সে তো ঠিক কথা, কিন্তু কী বিষয়ে সাবধান হতে হবে সেইটে স্থির করে দিয়ে যান।

কবিরাজ। আমি তো পূর্বেই বলেছি, ওকে বাইরে একেবারে যেতে দিতে পারবেন না।

মাধব দত্ত। ছেলেমানুষ, ওকে দিনরাত ঘরের মধ্যে ধরে রাখা যে ভারি শক্ত।

কবিরাজ। তা কী করবেন বলেন। এই শরৎকালের রৌদ্র আর বায়ু দুই-ই ঐ বালকের পক্ষে বিষবৎ— কারণ কিনা শাস্ত্রে বলছে, অপস্মারে জ্বরে কাশে কামলায়াং হলীমকে—

মাধব দত্ত। থাক্ থাক্, আপনার শাস্ত্র থাক্। তা হলে ওকে বন্ধ করেই রেখে দিতে হবে— অন্য কোনো উপায় নেই?

কবিরাজ। কিছু না, কারণ, পবনে তপনে চৈব—

মাধব দত্ত। আপনার ও চৈব নিয়ে আমার কী হবে বলেন তো। ও থাক্-না— কী করতে হবে সেইটে বলে দিন। কিন্তু আপনার ব্যবস্থা বড়ো কঠোর। রোগের সমস্ত দুঃখ ও-বেচারা চুপ করে সহ্য করে— কিন্তু আপনার ওষুধ খাবার সময় ওর কষ্ট দেখে আমার বুক ফেটে যায়।

কবিরাজ। সেই কষ্ট যত প্রবল তার ফলও তত বেশি— তাই তো মহর্ষি চ্যবন বলেছেন, ভেষজং হিতবাক্যঞ্চ তিক্তং আশুফলপ্রদং। আজ তবে উঠি দত্তমশায়!

[প্রস্থান

ঠাকুরদার প্রবেশ

মাধব দত্ত। ঐ রে ঠাকুরদা এসেছে! সর্বনাশ করলে!

ঠাকুরদা। কেন? আমাকে তোমার ভয় কিসের?

মাধব দত্ত। তুমি যে ছেলে খেপাবার সদ্দার।

ঠাকুরদা। তুমি তো ছেলেও নও, তোমার ঘরেও ছেলে নেই— তোমার খেপবার বয়সও গেছে— তোমার ভাবনা কী।

মাধব দত্ত। ঘরে যে ছেলে একটি এনেছি।

ঠাকুরদা। সে কিরকম।

মাধব দত্ত। আমার স্ত্রী যে পোষ্যপুত্র নেবার জন্যে ক্ষেপে উঠেছিল।

ঠাকুরদা। সে তো অনেকদিন থেকে শুনছি, কিন্তু তুমি যে নিতে চাও না।

মাধব দত্ত। জান তো ভাই, অনেক কষ্টে টাকা করেছি, কোথা থেকে পরের ছেলে এসে আমার বহু পরিশ্রমের ধন বিনা পরিশ্রমে ক্ষয় করতে থাকবে, সে কথা মনে করলেও আমার খারাপ লাগত। কিন্তু এই ছেলেটিকে আমার যে কিরকম লেগে গিয়েছে—

ঠাকুরদা। তাই এর জন্যে টাকা যতই খরচ করছ, ততই মনে করছ, সে যেন টাকার পরম ভাগ্য।

মাধব দত্ত। আগে টাকা রোজগার করতুম, সে কেবল একটা নেশার মতো ছিল— না করে কোনোমতে থাকতে পারতুম না। কিন্তু এখন যা টাকা করছি, সবই ঐ ছেলে পাবে জেনে উপার্জনে ভারি একটা আনন্দ পাচ্ছি।

ঠাকুরদা। বেশ, বেশ ভাই, ছেলেটি কোথায় পেলে বলো দেখি।

মাধব দত্ত। আমার স্ত্রীর গ্রামসম্পর্কে ভাইপো। ছোটোবেলা থেকে বেচারার মা নেই। আবার সেদিন তার বাপও মারা গেছে।

ঠাকুরদা। আহা! তবে তো আমাকে তার দরকার আছে।

মাধব দত্ত। কবিরাজ বলছে তার ঐটুকু শরীরে একসঙ্গে বাত পিত্ত শ্লেষ্মা যেরকম প্রকুপিত হয়ে উঠেছে, তাতে তার আর বড়ো আশা নেই। এখন একমাত্র উপায় তাকে কোনোরকমে এই শরতের রৌদ্র আর বাতাস থেকে বাঁচিয়ে ঘরে বন্ধ করে রাখা। ছেলেগুলোকে ঘরের বার করাই তোমার এই বুড়োবয়সের খেলা—তাই তোমাকে ভয় করি।

ঠাকুরদা। মিছে বল নি— একেবারে ভয়ানক হয়ে উঠেছি আমি, শরতের রৌদ্র আর হাওয়ারই মতো। কিন্তু ভাই, ঘরে ধরে রাখবার মতো খেলাও আমি কিছু জানি। আমার কাজকর্ম একটু সেরে আসি, তার পরে ঐ ছেলেটির সঙ্গে ভাব করে নেব।

[প্রস্থান

অমল গুপ্তের প্রবেশ

অমল। পিসেমশায়!

মাধব দত্ত। কী অমল?

অমল। আমি কি ঐ উঠোনটাতেও যেতে পারব না?

মাধব দত্ত। না বাবা!

অমল। ঐ যেখানটাতে পিসিমা জাঁতা দিয়ে ডাল ভাঙেন। ঐ দেখো-না, যেখানে ভাঙা ডালের খুদগুলি দুই হাতে তুলে নিয়ে লেজের উপর ভর দিয়ে বসে কাঠবিড়ালি কুটুস কুটুস করে খাচ্ছে— ওখানে আমি যেতে পারব না?

মাধব দত্ত। না বাবা!

অমল। আমি যদি কাঠবিড়ালি হতুম তবে বেশ হত। কিন্তু পিসেমশায়, আমাকে কেন বেরোতে দেবে না?

মাধব দত্ত। কবিরাজ যে বলেছে বাইরে গেলে তোমার অসুখ করবে।

অমল। কবিরাজ কেমন করে জানলে?

মাধব দত্ত। বল কী অমল! কবিরাজ জানবে না! সে যে এত বড়ো বড়ো পুঁথি পড়ে ফেলেছে!

অমল। পুঁথি পড়লেই কি সমস্ত জানতে পারে?

মাধব দত্ত। বেশ! তাও বুঝি জান না!

অমল। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) আমি যে পুঁথি কিছুই পড়ি নি—তাই জানি নে।

মাধব দত্ত। দেখো, বড়ো বড়ো পণ্ডিতেরা সব তোমারই মতো— তারা ঘর থেকে তো বেরোয় না।

অমল। বেরোয় না ?

মাধব দত্ত। না, কখন বেরোবে বলো। তারা বসে বসে কেবল পুঁথি পড়ে— আর-কোনো দিকেই তাদের চোখ নেই। অমলবাবু, তুমিও বড়ো হলে পণ্ডিত হবে— বসে বসে এই এত বড়ো বড়ো সব পুঁথি পড়বে—সবাই দেখে আশ্চর্য হয়ে যাবে।

অমল। না না, পিসেমশায়, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমি পণ্ডিত হব না— পিসেমশায়, আমি পণ্ডিত হব না।

মাধব দত্ত। সে কী কথা অমল ! যদি পণ্ডিত হতে পারতুম, তা হলে আমি তো বেঁচে যেতুম।

অমল। আমি, যা আছে সব দেখব—কেবলই দেখে বেড়াব।

মাধব দত্ত। শোনো একবার ! দেখবে কী ? দেখবার এত আছেই বা কী ?

অমল। আমাদের জানলার কাছে বসে সেই-যে দূরে পাহাড় দেখা যায়— আমার ভারি ইচ্ছে করে ঐ পাহাড়টা পার হয়ে চলে যাই।

মাধব দত্ত। কী পাগলের মতো কথা ! কাজ নেই কর্ম নেই, খামকা পাহাড়টা পার হয়ে চলে যাই ! কী যে বলে তার ঠিক নেই। পাহাড়টা যখন মস্ত বেড়ার মতো উঁচু হয়ে আছে তখন তো বুঝতে হবে ওটা পেরিয়ে যাওয়া বারণ— নইলে এত বড়ো বড়ো পাথর জড়ো করে এতবড়ো একটা কাণ্ড করার দরকার কী ছিল !

অমল। পিসেমশায়, তোমার কি মনে হয় ও বারণ করছে ? আমার ঠিক বোধ হয় পৃথিবীটা কথা কইতে পারে না, তাই অমনি করে নীল আকাশে হাত তুলে ডাকছে। অনেক দূরের যারা ঘরের মধ্যে বসে থাকে তারাও দুপুরবেলা একলা জানলার ধারে বসে ঐ ডাক শুনতে পায়। পণ্ডিতরা বুঝি শুনতে পায় না ?

মাধব দত্ত। তারা তো তোমার মতো খেপা নয়— তারা শুনতে চায়ও না।

অমল। আমার মতো খেপা আমি কালকে একজনকে দেখেছিলুম।

মাধব দত্ত। সত্যি নাকি ? কী রকম শুনি।

অমল। তার কাঁধে এক বাঁশের লাঠি। লাঠির আগায় একটা পুঁটুলি বাঁধা। তার বাঁ হাতে একটা ঘটি। পুরানো একজোড়া নাগরাজুতো পরে সে এই মাঠের পথ দিয়ে ঐ পাহাড়ের দিকেই যাচ্ছিল। আমি তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলুম, তুমি কোথায় যাচ্ছ ? সে বললে, কী জানি, যেখানে হয়। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কেন যাচ্ছ ? সে বললে, কাজ খুঁজতে যাচ্ছি। আচ্ছা পিসেমশায়, কাজ কি খুঁজতে হয় ?

মাধব দত্ত। হয় বৈকি। কত লোক কাজ খুঁজে বেড়ায়।

অমল। বেশ তো। আমিও তাদের মতো কাজ খুঁজে বেড়াব।

মাধব দত্ত। খুঁজে যদি না পাও ?

অমল। খুঁজে যদি না পাই তো আবার খুঁজব। তার পরে সেই নাগরাজুতোপরা লোকটা চলে গেল— আমি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলুম। সেই যেখানে ডুমুরগাছের তলা দিয়ে ঝরনা বয়ে যাচ্ছে, সেইখানে সে লাঠি নামিয়ে রেখে ঝরনার জলে আস্তে আস্তে পা ধুয়ে নিলে— তার পরে পুঁটুলি খুলে ছাতু বের করে জল দিয়ে মেখে নিয়ে খেতে লাগল। খাওয়া হয়ে গেলে আবার পুঁটুলি বেঁধে ঘাড়ে করে নিলে— পায়ের কাপড় গুটিয়ে নিয়ে সেই ঝরনার ভিতর নেমে জল কেটে কেটে কেমন পার হয়ে চলে গেল। পিসিমাকে বলে রেখেছি ঐ ঝরনার ধারে গিয়ে একদিন আমি ছাতু খাব।

মাধব দত্ত। পিসিমা কী বললে ?

অমল। পিসিমা বললেন, তুমি ভালো হও, তার পর তোমাকে ঐ ঝরনার ধারে নিয়ে গিয়ে ছাতু খাইয়ে আনব। কবে আমি ভালো হব ?

মাধব দত্ত। আর তো দেরি নেই বাবা !

অমল। দেরি নেই? ভালো হলেই কিন্তু আমি চলে যাব।

মাধব দত্ত। কোথায় যাবে?

অমল। কত বাঁকা বাঁকা ঝরনার জলে আমি পা ডুবিয়ে ডুবিয়ে পার হতে হতে চলে যাব— দুপুরবেলায় সবাই যখন ঘরে দরজা বন্ধ করে শুয়ে আছে, তখন আমি কোথায় কতদূরে কেবল কাজ খুঁজে খুঁজে বেড়াতে বেড়াতে চলে যাব।

মাধব দত্ত। আচ্ছা বেশ, আগে তুমি ভালো হও, তার পরে তুমি—

অমল। তার পরে আমাকে পণ্ডিত হতে বোলো না পিসেমশায়!

মাধব দত্ত। তুমি কী হতে চাও বলো।

অমল। এখন আমার কিছু মনে পড়ছে না—আচ্ছা আমি ভেবে বলব।

মাধব দত্ত। কিন্তু তুমি অমন করে যে-সে বিদেশী লোককে ডেকে ডেকে কথা বোলো না।

অমল। বিদেশী লোক আমার ভারি ভালো লাগে।

মাধব দত্ত। যদি তোমাকে ধরে নিয়ে যেত?

অমল। তা হলে তো সে বেশ হত। কিন্তু আমাকে তো কেউ ধরে নিয়ে যায় না— সব্বাই কেবল বসিয়ে রেখে দেয়।

মাধব দত্ত। আমার কাজ আছে, আমি চললুম— কিন্তু বাবা দেখো, বাইরে যেন বেরিয়ে যেয়ো না।

অমল। যাব না। কিন্তু পিসেমশায়, রাস্তার ধারের এই ঘরটিতে আমি বসে থাকব।

২

দইওআলা। দই—দই—ভালো দই!

অমল। দইওআলা, দইওআলা, ও দইওআলা!

দইওআলা। ডাকছ কেন? দই কিনবে?

অমল। কেমন করে কিনব! আমার তো পয়সা নেই।

দইওআলা। কেমন ছেলে তুমি। কিনবে না তো আমার বেলা বইয়ে দাও কেন?

অমল। আমি যদি তোমার সঙ্গে চলে যেতে পারতুম তো যেতুম।

দইওআলা। আমার সঙ্গে!

অমল। হাঁ। তুমি যে কত দূর থেকে হাঁকতে হাঁকতে চলে যাচ্ছ, শুনে আমার মন কেমন করছে।

দইওআলা। (দধির বাঁক নামাইয়া) বাবা, তুমি এখানে বসে কী করছ?

অমল। কবিরাজ আমাকে বেরোতে বারণ করেছে, তাই আমি সারাদিন এইখেনেই বসে থাকি।

দইওআলা। আহা, বাছা তোমার কী হয়েছে?

অমল। আমি জানি নে। আমি তো কিচ্ছু পড়ি নি, তাই আমি জানি নে আমার কী হয়েছে। দইওআলা, তুমি কোথা থেকে আসছ?

দইওআলা। আমাদের গ্রাম থেকে আসছি।

অমল। তোমাদের গ্রাম? অনে—ক দূরে তোমাদের গ্রাম?

দইওআলা। আমাদের গ্রাম সেই পাঁচমুড়া পাহাড়ের তলায়। শামলী নদীর ধারে।

অমল। পাঁচমুড়া পাহাড়— শামলী নদী— কী জানি, হয়তো তোমাদের গ্রাম দেখেছি— কবে সে আমার মনে পড়ে না।

দইওআলা। তুমি দেখেছ? পাহাড়তলায় কোনোদিন গিয়েছিলে নাকি?

অমল। না, কোনোদিন যাই নি। কিন্তু আমার মনে হয় যেন আমি দেখেছি। অনেক পুরোনোকালের খুব বড়ো বড়ো গাছের তলায় তোমাদের গ্রাম— একটি লাল রঙের রাস্তার ধারে। না?

দইওআলা। ঠিক বলেছ বাবা।

অমল। সেখানে পাহাড়ের গায়ে সব গোরু চরে বেড়াচ্ছে।

দইওআলা। কী আশ্চর্য! ঠিক বলছ। আমাদের গ্রামে গোরু চরে বৈকি, খুব চরে।

অমল। মেয়েরা সব নদী থেকে জল তুলে মাথায় কলসি করে নিয়ে যায়— তাদের লাল শাড়ি পরা।

দইওআলা। বা! বা! ঠিক কথা। আমাদের সব গয়লাপাড়ার মেয়েরা নদী থেকে জল তুলে তো নিয়ে যায়ই। তবে কিনা তারা সবাই যে লাল শাড়ি পরে তা নয়— কিন্তু বাবা, তুমি নিশ্চয় কোনোদিন সেখানে বেড়াতে গিয়েছিলে!

অমল। সত্যি বলছি দইওআলা, আমি একদিনও যাই নি। কবিরাজ যেদিন আমাকে বাইরে যেতে বলবে সেদিন তুমি নিয়ে যাবে তোমাদের গ্রামে?

দইওআলা। যাব বৈকি বাবা, খুব নিয়ে যাব!

অমল। আমাকে তোমার মতো ঐরকম দই বেচতে শিখিয়ে দিয়ো। ঐরকম বাঁক কাঁধে নিয়ে— ঐরকম খুব দূরের রাস্তা দিয়ে।

দইওআলা। মরে যাই! দই বেচতে যাবে কেন বাবা? এত এত পুঁথি পড়ে তুমি পণ্ডিত হয়ে উঠবে।

অমল। না, না, আমি কক্‌খনো পণ্ডিত হব না। আমি তোমাদের রাঙা রাস্তার ধারে তোমাদের বুড়ো বটের তলায় গোয়ালপাড়া থেকে দই নিয়ে এসে দূরে দূরে গ্রামে গ্রামে বেচে বেচে বেড়াব। কী রকম করে তুমি বল, দই, দই, দই— ভালো দই। আমাকে সুরটা শিখিয়ে দাও।

দইওআলা। হায় পোড়াকপাল! এ সুরও কি শেখবার সুর!

অমল। না, না, ও আমার শুনতে খুব ভালো লাগে। আকাশের খুব শেষ থেকে যেমন পাখির ডাক শুনলে মন উদাস হয়ে যায়— তেমনি ঐ রাস্তার মোড় থেকে ঐ গাছের সারির মধ্যে দিয়ে যখন তোমার ডাক আসছিল, আমার মনে হচ্ছিল— কী জানি কী মনে হচ্ছিল!

দইওআলা। বাবা, এক ভাঁড় দই তুমি খাও।

অমল। আমার তো পয়সা নেই।

দইওআলা। না না না না— পয়সার কথা বোলো না। তুমি আমার দই একটু খেলে আমি কত খুশি হব।

অমল। তোমার কি অনেক দেরি হয়ে গেল?

দইওআলা। কিচ্ছু দেরি হয় নি বাবা, আমার কোনো লোকসান হয় নি। দই বেচতে যে কত সুখ সে তোমার কাছে শিখে নিলুম।

[প্রস্থান

অমল। (সুর করিয়া) দই, দই, দই, ভালো দই! সেই পাঁচমুড়া পাহাড়ের তলায় শামলী নদীর ধারে গয়লাদের বাড়ির দই। তারা ভোরের বেলায় গাছের তলায় গোরু দাঁড় করিয়ে দুধ দোয়, সন্ধ্যাবেলায় মেয়েরা দই পাতে, সেই দই। দই, দই, দই—ই, ভালো দই! এই-যে রাস্তায় প্রহরী পায়চারি করে বেড়াচ্ছে।

প্রহরী, প্রহরী, একটিবার শুনে যাও-না প্রহরী!

প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী। অমন করে ডাকাডাকি করছ কেন? আমাকে ভয় কর না তুমি?

অমল। কেন, তোমাকে কেন ভয় করব?

প্রহরী। যদি তোমাকে ধরে নিয়ে যাই।

অমল। কোথায় ধরে নিয়ে যাবে? অনেক দূরে? ঐ পাহাড় পেরিয়ে?

প্রহরী। একেবারে রাজার কাছে যদি নিয়ে যাই।

অমল। রাজার কাছে? নিয়ে যাও-না আমাকে। কিন্তু আমাকে যে কবিরাজ বাইরে যেতে বারণ করেছে। আমাকে কেউ কোত্থাও ধরে নিয়ে যেতে পারবে না— আমাকে কেবল দিনরাত্রি এখানেই বসে থাকতে হবে।

প্রহরী। কবিরাজ বারণ করেছে? আহা, তাই বটে— তোমার মুখ যেন সাদা হয়ে গেছে। চোখের কোলে কালি পড়েছে। তোমার হাত দুখানিতে শিরগুলি দেখা যাচ্ছে।

অমল। তুমি ঘণ্টা বাজাবে না প্রহরী?

প্রহরী। এখনো সময় হয় নি।

অমল। কেউ বলে 'সময় বয়ে যাচ্ছে', কেউ বলে 'সময় হয় নি'। আচ্ছা, তুমি ঘণ্টা বাজিয়ে দিলেই তো সময় হবে?

প্রহরী। সে কি হয়! সময় হলে তবে আমি ঘণ্টা বাজিয়ে দিই।

অমল। বেশ লাগে তোমার ঘণ্টা— আমার শুনতে ভারি ভালো লাগে— দুপুরবেলা আমাদের বাড়িতে যখন সকলেরই খাওয়া হয়ে যায়— পিসেমশায় কোথায় কাজ করতে বেরিয়ে যান, পিসিমা রামায়ণ পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েন, আমাদের খুদে কুকুরটা উঠোনে ঐ কোণের ছায়ায় লেজের মধ্যে মুখ গুঁজে ঘুমোতে থাকে— তখন তোমার ঐ ঘণ্টা বাজে— ঢং ঢং ঢং, ঢং ঢং ঢং। তোমার ঘণ্টা কেন বাজে?

প্রহরী। ঘণ্টা এই কথা সবাইকে বলে, সময় বসে নেই, সময় কেবলই চলে যাচ্ছে।

অমল। কোথায় চলে যাচ্ছে? কোন্ দেশে?

প্রহরী। সে কথা কেউ জানে না।

অমল। সে দেশ বুঝি কেউ দেখে আসে নি? আমার ভারি ইচ্ছে করছে ঐ সময়ের সঙ্গে চলে যাই— যে দেশের কথা কেউ জানে না সেই অনেক দূরে।

প্রহরী। সে দেশে সবাইকে যেতে হবে বাবা!

অমল। আমাকেও যেতে হবে?

প্রহরী। হবে বৈকি!

অমল। কিন্তু কবিরাজ যে আমাকে বাইরে যেতে বারণ করেছে।

প্রহরী। কোন্‌দিন কবিরাজই হয়তো স্বয়ং হাতে ধরে নিয়ে যাবেন!

অমল। না না, তুমি তাকে জান না, সে কেবলই ধরে রেখে দেয়।

প্রহরী। তার চেয়ে ভালো কবিরাজ যিনি আছেন, তিনি এসে ছেড়ে দিয়ে যান।

অমল। আমার সেই ভালো কবিরাজ কবে আসবেন? আমার যে আর বসে থাকতে ভালো লাগছে না।

প্রহরী। অমন কথা বলতে নেই বাবা!

অমল। না— আমি তো বসেই আছি— যেখানে আমাকে বসিয়ে রেখেছে সেখান থেকে আমি তো বেরোই নে— কিন্তু তোমার ঐ ঘণ্টা বাজে ঢং ঢং ঢং— আর আমার মন-কেমন করে। আচ্ছা প্রহরী!

প্রহরী। কী বাবা?

অমল। আচ্ছা, ঐ-যে রাস্তার ওপারের বড়ো বাড়িতে নিশেন উড়িয়ে দিয়েছে, আর ওখানে সব লোকজন কেবলই আসছে যাচ্ছে— ওখানে কী হয়েছে?

প্রহরী। ওখানে নতুন ডাকঘর বসেছে।

অমল। ডাকঘর? কার ডাকঘর?

প্রহরী। ডাকঘর আর কার হবে? রাজার ডাকঘর।— এ ছেলেটি ভারি মজার।

অমল। রাজার ডাকঘরে রাজার কাছ থেকে সব চিঠি আসে?

প্রহরী। আসে বৈকি। দেখো, একদিন তোমার নামেও চিঠি আসবে।

অমল। আমার নামেও চিঠি আসবে ? আমি যে ছেলেমানুষ।

প্রহরী। ছেলেমানুষকে রাজা এতটুকু-টুকু ছোট্ট ছোট্ট চিঠি লেখেন।

অমল। বেশ হবে। আমি কবে চিঠি পাব ? আমাকেও তিনি চিঠি লিখবেন তুমি কেমন করে জানলে ?

প্রহরী। তা নইলে তিনি ঠিক তোমার এই খোলা জানলাটার সামনেই অতবড়ো একটা সোনালি রঙের নিশেন উড়িয়ে ডাকঘর খুলতে যাবেন কেন ?— ছেলেটাকে আমার বেশ ল্যাগছে।

অমল। আচ্ছা, রাজার কাছ থেকে আমার চিঠি এলে আমাকে কে এনে দেবে ?

প্রহরী। রাজার যে অনেক ডাক-হরকরা আছে— দেখ নি বুকে গোল গোল সোনার তক্‌মা প'রে তারা ঘুরে বেড়ায়।

অমল। আচ্ছা, কোথায় তারা ঘোরে ?

প্রহরী। ঘরে ঘরে, দেশে দেশে।— এর প্রশ্ন শুনলে হাসি পায়।

অমল। বড়ো হলে আমি রাজার ডাক-হরকরা হব।

প্রহরী। হা হা হা হা ! ডাক-হরকরা ! সে ভারি মস্ত কাজ ! রোদ নেই বৃষ্টি নেই, গরিব নেই বড়োমানুষ নেই, সকলের ঘরে ঘরে চিঠি বিলি করে বেড়ানো— সে খুব জবর কাজ !

অমল। তুমি হাসছ কেন ! আমার ঐ কাজটাই সকলের চেয়ে ভালো লাগছে। না না, তোমার কাজও খুব ভালো— দুপুরবেলা যখন রোদ্দুর ঝাঁ ঝাঁ করে, তখন ঘণ্টা বাজে ঢং ঢং ঢং— আবার এক-এক দিন রাত্রে হঠাৎ বিছানায় জেগে উঠে দেখি ঘরের প্রদীপ নিবে গেছে, বাইরের কোন অন্ধকারের ভিতর দিয়ে ঘণ্টা বাজছে ঢং ঢং ঢং।

প্রহরী। ঐ যে মোড়ল আসছে— আমি এবার পালাই। ও যদি দেখতে পায় তোমার সঙ্গে গল্প করছি, তা হলেই মুশকিল বাধাবে।

অমল। কই মোড়ল, কই, কই ?

প্রহরী। ঐ যে, অনেক দূরে। মাথায় একটা মস্ত গোলপাতার ছাতি।

অমল। ওকে বুঝি রাজা মোড়ল করে দিয়েছে ?

প্রহরী। আরে না। ও আপনি মোড়লি করে। যে ওকে না মানতে চায় ও তার সঙ্গে দিনরাত এমনি লাগে যে ওকে সকলেই ভয় করে। কেবল সকলের সঙ্গে শত্রুতা করেই ও আপনার ব্যাবসা চালায়। আজ তবে যাই, আমার কাজ কামাই যাচ্ছে। আমি আবার কাল সকালে এসে তোমাকে সমস্ত শহরের খবর শুনিয়ে যাব।

[প্রস্থান

অমল। রাজার কাছ থেকে রোজ একটা করে চিঠি যদি পাই তা হলে বেশ হয়— এই জানলার কাছে বসে বসে পড়ি। কিন্তু আমি তো পড়তে পারি নে ! কে পড়ে দেবে ? পিসিমা তো রামায়ণ পড়ে। পিসিমা কি রাজার লেখা পড়তে পারে ? কেউ যদি পড়তে না পারে জমিয়ে রেখে দেব, আমি বড়ো হলে পড়ব। কিন্তু ডাক-হরকরা যদি আমাকে না চেনে ! মোড়লমশায়, ও মোড়লমশায়— একটা কথা শুনে যাও।

মোড়লের প্রবেশ

মোড়ল। কে রে ! রাস্তার মধ্যে আমাকে ডাকাডাকি করে ! কোথাকার বাঁদর এটা !

অমল। তুমি মোড়লমশায়, তোমাকে তো সবাই মানে।

মোড়ল। (খুশি হইয়া) হাঁ, হাঁ, মানে বৈকি। খুব মানে।

অমল। রাজার ডাক-হরকরা তোমার কথা শোনে ?

মোড়ল। না শুনে তার প্রাণ বাঁচে ? বাস রে, সাধ্য কী !

অমল। তুমি ডাক-হরকরাকে বলে দেবে আমারই নাম অমল— আমি এই জানলার কাছটাতে বসে থাকি।

মোড়ল। কেন বলো দেখি।

অমল। আমার নামে যদি চিঠি আসে—

মোড়ল। তোমার নামে চিঠি! তোমাকে কে চিঠি লিখবে?

অমল। রাজা যদি চিঠি লেখে তা হলে—

মোড়ল। হা হা হা হা! এ ছেলেটা তো কম নয়। হা হা হা হা! রাজা তোমাকে চিঠি লিখবে! তা লিখবে বৈকি! তুমি যে তাঁর পরম বন্ধু! কদিন তোমার সঙ্গে দেখা না হয়ে রাজা শুকিয়ে যাচ্ছে, খবর পেয়েছি। আর বেশি দেরি নেই, চিঠি হয়তো আজই আসে কি কালই আসে।

অমল। মোড়লমশায়, তুমি অমন করে কথা কচ্ছ কেন? তুমি কি আমার উপর রাগ করেছ?

মোড়ল। বাস রে। তোমার উপর রাগ করব! এত সাহস আমার! রাজার সঙ্গে তোমার চিঠি চলে!— মাধব দত্তের বড়ো বাড় হয়েছে দেখছি। দু-পয়সা জমিয়েছে কিনা, এখন তার ঘরে রাজা-বাদশার কথা ছাড়া আর কথা নেই। রোসো-না, ওকে মজা দেখাচ্ছি। ওরে ছোঁড়া, বেশ, শীঘ্রই যাতে রাজার চিঠি তোদের বাড়িতে আসে, আমি তার বন্দোবস্ত করছি।

অমল। না, না, তোমাকে কিছু করতে হবে না।

মোড়ল। কেন রে? তোর খবর আমি রাজাকে জানিয়ে দেব— তিনি তা হলে আর দেরি করতে পারবেন না— তোমাদের খবর নেওয়ার জন্যে এখনই পাইক পাঠিয়ে দেবেন!— না, মাধব দত্তর ভারি আস্পর্ধা— রাজার কানে একবার উঠলে দুরস্ত হয়ে যাবে।

[প্রস্থান

অমল। কে তুমি মল ঝম্ ঝম্ করতে করতে চলেছ—একটু দাঁড়াও-না ভাই।

বালিকার প্রবেশ

বালিকা। আমার কি দাঁড়াবার জো আছে! বেলা বয়ে যায় যে।

অমল। তোমার দাঁড়াতে ইচ্ছা করছে না— আমারও এখানে আর বসে থাকতে ইচ্ছা করে না।

বালিকা। তোমাকে দেখে আমার মনে হচ্ছে যেন সকালবেলাকার তারা— তোমার কী হয়েছে বলো তো।

অমল। জানি নে কী হয়েছে, কবিরাজ আমাকে বেরোতে বারণ করেছে।

বালিকা। আহা, তবে বেরিয়ো না— কবিরাজের কথা মেনে চলতে হয়— দুরন্তপনা করতে নেই, তা হলে লোকে দুষ্টু বলবে। বাইরের দিকে তাকিয়ে তোমার মন ছটফট করছে, আমি বরঞ্চ তোমার এই আধখানা দরজা বন্ধ করে দিই।

অমল। না, না, বন্ধ কোরো না— এখানে আমার আর-সব বন্ধ কেবল এইটুকু খোলা। তুমি কে বলো-না— আমি তো তোমাকে চিনি নে!

বালিকা। আমি সুধা।

অমল। সুধা?

সুধা। জান না? আমি এখানকার মালিনীর মেয়ে।

অমল। তুমি কী কর?

সুধা। সাজি ভরে ফুল তুলে নিয়ে এসে মালা গাঁথি। এখন ফুল তুলতে চলেছি।

অমল। ফুল তুলতে চলেছ? তাই তোমার পা দুটি অমন খুশি হয়ে উঠেছে— যতই চলেছ, মল বাজছে ঝম্ ঝম্ ঝম্। আমি যদি তোমার সঙ্গে যেতে পারতুম তা হলে উঁচু ডালে যেখানে দেখা যায় না সেইখান থেকে আমি তোমাকে ফুল পেড়ে দিতুম।

সুধা। তাই বৈকি! ফুলের খবর আমার চেয়ে তুমি নাকি বেশি জান!

অমল। জানি, আমি খুব জানি। আমি সাত ভাই চম্পার খবর জানি। আমার মনে হয়, আমাকে

যদি সবাই ছেড়ে দেয় তা হলে আমি চলে যেতে পারি খুব ঘন বনের মধ্যে যেখানে রাস্তা খুঁজে পাওয়া যায় না। সরু ডালের সব-আগায় যেখানে মনুয়া পাখি বসে বসে দোলা খায় সেইখানে আমি চাঁপা হয়ে ফুটতে পারি। তুমি আমার পারুলদিদি হবে?

সুধা। কী বুদ্ধি তোমার! পারুলদিদি আমি কী করে হব! আমি যে সুধা— আমি শশী মালিনীর মেয়ে। আমাকে রোজ এত এত মালা গাঁথতে হয়। আমি যদি তোমার মতো এইখানে বসে থাকতে পারতুম তা হলে কেমন মজা হত!

অমল। তা হলে সমস্ত দিন কী করতে?

সুধা। আমার বেনে-বউ পুতুল আছে, তার বিয়ে দিতুম। আমার পুষি মেনি আছে, তাকে নিয়ে— যাই, বেলা বয়ে যাচ্ছে, দেরি হলে ফুল আর থাকবে না।

অমল। আমার সঙ্গে আর-একটু গল্প করো-না, আমার খুব ভালো লাগছে।

সুধা। আচ্ছা বেশ, তুমি দুষ্টুমি কোরো না, লক্ষ্মী ছেলে হয়ে এইখানে স্থির হয়ে বসে থাকো, আমি ফুল তুলে ফেরবার পথে তোমার সঙ্গে গল্প করে যাব।

অমল। আর আমাকে একটি ফুল দিয়ে যাবে?

সুধা। ফুল অমনি কেমন করে দেব? দাম দিতে হবে যে।

অমল। আমি যখন বড়ো হব তখন তোমাকে দাম দেব। আমি কাজ খুঁজতে চলে যাব ঐ ঝরনা পার হয়ে, তখন তোমাকে দাম দিয়ে যাব।

সুধা। আচ্ছা বেশ।

অমল। তুমি তা হলে ফুল তুলে আসবে?

সুধা। আসব।

অমল। আসবে?

সুধা। আসব।

অমল। আমাকে ভুলে যাবে না? আমার নাম অমল। মনে থাকবে তোমার?

সুধা। না, ভুলব না। দেখো, মনে থাকবে। [প্রস্থান

ছেলের দলের প্রবেশ

অমল। ভাই, তোমরা সব কোথায় যাচ্ছ ভাই? একবার একটুখানি এইখানে দাঁড়াও-না।

ছেলেরা। আমরা খেলতে চলেছি।

অমল। কী খেলবে তোমরা ভাই?

ছেলেরা। আমরা চাষ-খেলা খেলব।

প্রথম। (লাঠি দেখাইয়া) এই যে আমাদের লাঙল।

দ্বিতীয়। আমরা দুজনে দুই গোরু হব।

অমল। সমস্ত দিন খেলবে?

ছেলেরা। হাঁ, সমস্ত দি—ন।

অমল। তার পরে সন্ধ্যার সময় নদীর ধার দিয়ে দিয়ে বাড়ি ফিরে আসবে?

ছেলেরা। হাঁ, সন্ধ্যার সময় ফিরব।

অমল। আমার এই ঘরের সামনে দিয়েই ফিরো ভাই।

ছেলেরা। তুমি বেরিয়ে এসো-না, খেলবে চলো।

অমল। কবিরাজ আমাকে বেরিয়ে যেতে মানা করেছে।

ছেলেরা। কবিরাজ! কবিরাজের মানা তুমি শোন বুঝি! চল্ ভাই চল্, আমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে।

অমল। না ভাই, তোমরা আমার এই জানলার সামনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে একটু খেলা করো— আমি একটু দেখি।

ছেলেরা। এখেনে কী নিয়ে খেলব?

অমল। এই যে আমার সব খেলনা পড়ে রয়েছে— এ-সব তোমরাই নাও ভাই— ঘরের ভিতরে একলা খেলতে ভালো লাগে না— এ-সব ধুলোয় ছড়ানো পড়েই থাকে— এ আমার কোনো কাজে লাগে না।

ছেলেরা। বা, বা, বা, কী চমৎকার খেলনা! এ যে জাহাজ! এ যে জটাইবুড়ি! দেখছিস ভাই? কেমন সুন্দর সেপাই!— এ-সব তুমি আমাদের দিয়ে দিলে? তোমার কষ্ট হচ্ছে না?

অমল। না, কিছু কষ্ট হচ্ছে না, সব তোমাদের দিলুম।

ছেলেরা। আর কিন্তু ফিরিয়ে দেব না।

অমল। না, ফিরিয়ে দিতে হবে না।

ছেলেরা। কেউ তো বকবে না?

অমল। কেউ না, কেউ না। কিন্তু রোজ সকালে তোমরা এই খেলনাগুলো নিয়ে আমার এই দরজার সামনে খানিকক্ষণ ধরে খেলো। আবার এগুলো যখন পুরোনো হয়ে যাবে আমি নতুন খেলনা আনিয়ে দেব।

ছেলেরা। বেশ ভাই, আমরা রোজ এখানে খেলে যাব। ও ভাই, সেপাইগুলোকে এখানে সব সাজা— আমরা লড়াই-লড়াই খেলি। বন্দুক কোথায় পাই? ঐ-যে একটা মস্ত শরকাঠি পড়ে আছে— ঐটেকে ভেঙে ভেঙে নিয়ে আমরা বন্দুক বানাই। কিন্তু ভাই, তুমি যে ঘুমিয়ে পড়ছ!

অমল। হাঁ, আমার ভারি ঘুম পেয়ে আসছে। জানি নে কেন আমার থেকে থেকে ঘুম পায়। অনেকক্ষণ বসে আছি আমি, আর বসে থাকতে পারছি নে— আমার পিঠ ব্যথা করছে।

ছেলেরা। এখন যে সবে এক প্রহর বেলা— এখনই তোমার ঘুম পায় কেন? ঐ শোনো এক প্রহরের ঘণ্টা বাজছে।

অমল। হাঁ, ঐ যে বাজছে ঢং ঢং ঢং— আমাকে ঘুমোতে যেতে ডাকছে।

ছেলেরা। তবে আমরা এখন যাই, আবার কাল সকালে আসব।

অমল। যাবার আগে তোমাদের একটা কথা আমি জিজ্ঞাসা করি ভাই। তোমরা তো বাইরে থাক, তোমরা ঐ রাজার ডাকঘরের ডাক-হরকরাদের চেন?

ছেলেরা। হাঁ চিনি বৈকি, খুব চিনি।

অমল। কে তারা, নাম কী?

ছেলেরা। একজন আছে বাদল হরকরা, একজন আছে শরৎ— আরো কত আছে।

অমল। আচ্ছা, আমার নামে যদি চিঠি আসে তারা কি আমাকে চিনতে পারবে?

ছেলেরা। কেন পারবে না? চিঠিতে তোমার নাম থাকলেই তারা তোমাকে ঠিক চিনে নেবে।

অমল। কাল সকালে যখন আসবে তাদের একজনকে ডেকে এনে আমাকে চিনিয়ে দিয়ো-না।

ছেলেরা। আচ্ছা দেব।

৩

অমল শয্যাগত

অমল। পিসেমশায়, আজ আর আমার সেই জানলার কাছেও যেতে পারব না? কবিরাজ বারণ করেছে?

মাধব দত্ত। হাঁ বাবা। সেখানে রোজ রোজ বসে থেকেই তো তোমার ব্যামো বেড়ে গেছে।

অমল। না পিসেমশায়, না— আমার ব্যামোর কথা আমি কিছুই জানি নে কিন্তু সেখানে থাকলে আমি খুব ভালো থাকি।

মাধব দত্ত। সেখানে বসে বসে তুমি এই শহরের যত রাজ্যের ছেলেবুড়ো সকলের সঙ্গেই ভাব করে নিয়েছ— আমার দরজার কাছে রোজ যেন একটা মস্ত মেলা বসে যায়— এতেও কি কখনো শরীর টেকে ! দেখো দেখি, আজ তোমার মুখখানা কীরকম ফ্যাকাশে হয়ে গেছে !

অমল। পিসেমশায়, আমার সেই ফকির হয়তো আজ আমাকে জানলার কাছে না দেখতে পেয়ে চলে যাবে।

মাধব দত্ত। তোমার আবার ফকির কে ?

অমল। সেই যে রোজ আমার কাছে এসে নানা দেশবিদেশের কথা বলে যায়— শুনতে আমার ভারি ভালো লাগে।

মাধব দত্ত। কই আমি তো কোনো ফকিরকে জানি নে।

অমল। এই ঠিক তার আসবার সময় হয়েছে— তোমার পায়ে পড়ি, তুমি তাকে একবার বলে এসো-না, সে যেন আমার ঘরে এসে একবার বসে।

ফকিরবেশে ঠাকুরদার প্রবেশ

অমল। এই-যে, এই-যে ফকির— এসো আমার বিছানায় এসে বসো।

মাধব দত্ত। এ কী। এ যে—

ঠাকুরদা। (চোখ ঠারিয়া) আমি ফকির।

মাধব দত্ত। তুমি যে কী নও তা তো ভেবে পাই নে!

অমল। এবারে তুমি কোথায় গিয়েছিলে ফকির ?

ফকির। আমি ক্রৌঞ্চদ্বীপে গিয়েছিলুম—সেইখান থেকেই এইমাত্র আসছি।

মাধব দত্ত। ক্রৌঞ্চদ্বীপে ?

ফকির। এতে আশ্চর্য হও কেন ? তোমাদের মতো আমাকে পেয়েছ ? আমার তো যেতে কোনো খরচ নেই। আমি যেখানে খুশি যেতে পারি।

অমল। (হাততালি দিয়া) তোমার ভারি মজা। আমি যখন ভালো হব তখন তুমি আমাকে চেলা করে নেবে বলেছিলে, মনে আছে ফকির ?

ঠাকুরদা। খুব মনে আছে। বেড়াবার এমন সব মন্ত্র শিখিয়ে দেব যে সমুদ্রে পাহাড়ে অরণ্যে কোথাও কিছুতে বাধা দিতে পারবে না।

মাধব দত্ত। এ-সব কী পাগলের মতো কথা হচ্ছে তোমাদের !

ঠাকুরদা। বাবা অমল, পাহাড়-পর্বত-সমুদ্রকে ভয় করি নে— কিন্তু তোমার এই পিসেটির সঙ্গে যদি আবার কবিরাজ এসে জোটেন তা হলে আমার মন্ত্রকে হার মানতে হবে।

অমল। না, না, পিসেমশায়, তুমি কবিরাজকে কিছু বোলো না।— এখন আমি এইখানেই শুয়ে থাকব, কিচ্ছু করব না— কিন্তু যেদিন আমি ভালো হব সেইদিনই আমি ফকিরের মন্ত্র নিয়ে চলে যাব— নদী-পাহাড়-সমুদ্রে আমাকে আর ধরে রাখতে পারবে না।

মাধব দত্ত। ছি, বাবা, কেবলই অমন যাই-যাই করতে নেই— শুনলে আমার মন কেমন খারাপ হয়ে যায়।

অমল। ক্রৌঞ্চদ্বীপ কিরকম দ্বীপ আমাকে বলো-না ফকির !

ঠাকুরদা। সে ভারি আশ্চর্য জায়গা। সে পাখিদের দেশ— সেখানে মানুষ নেই। তারা কথা কয় না, চলে না, তারা গান গায় আর ওড়ে।

অমল। বাঃ, কী চমৎকার ! সমুদ্রের ধারে ?

ঠাকুরদা। সমুদ্রের ধারে বৈকি।

অমল। সব নীল রঙের পাহাড় আছে ?

ঠাকুরদা। নীল পাহাড়েই তো তাদের বাসা। সন্ধের সময় সেই পাহাড়ের উপর সূর্যাস্তের আলো

এসে পড়ে আর ঝাঁকে ঝাঁকে সবুজ রঙের পাখি তাদের বাসায় ফিরে আসতে থাকে— সেই আকাশের রঙে পাখির রঙে পাহাড়ের রঙে সে এক কাণ্ড হয়ে ওঠে।

অমল। পাহাড়ে ঝরনা আছে ?

ঠাকুরদা। বিলক্ষণ ! ঝরনা না থাকলে কি চলে ! একেবারে হীরে গালিয়ে ঢেলে দিচ্ছে। আর, তার কী নৃত্য ! নুড়িগুলোকে ঠুং-ঠাং ঠুং-ঠাং করে বাজাতে বাজাতে কেবলই কল্ কল্ ঝর্ ঝর্ করতে করতে ঝরনাটি সমুদ্রের মধ্যে গিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে। কোনো কবিরাজের বাবার সাধ্য নেই তাকে একদণ্ড কোথাও আটকে রাখে। পাখিগুলো আমাকে নিতান্ত তুচ্ছ একটা মানুষ বলে যদি একঘরে করে না রাখত তা হলে ঐ ঝরনার ধারে তাদের হাজার হাজার বাসার একপাশে বাসা বেঁধে সমুদ্রের ঢেউ দেখে দেখে সমস্ত দিনটা কাটিয়ে দিতুম।

অমল। আমি যদি পাখি হতুম তা হলে—

ঠাকুরদা। তা হলে একটা ভারি মুশকিল হত। শুনলুম, তুমি নাকি দইওআলাকে বলে রেখেছ বড়ো হলে তুমি দই বিক্রি করবে— পাখিদের মধ্যে তোমার দইয়ের ব্যাবসাটা তেমন বেশ জমত না। বোধ হয় ওতে তোমার কিছু লোকসানই হত।

মাধব দত্ত। আর তো আমার চলল না। আমাকে সুদ্ধ তোমরা খেপিয়ে দেবে দেখছি। আমি চললুম।

অমল। পিসেমশায়, আমার দইওআলা এসে চলে গেছে ?

মাধব দত্ত। গেছে বৈকি। তোমার ঐ শখের ফকিরের তলপি বয়ে ক্রৌঞ্চদ্বীপের পাখির বাসায় উড়ে বেড়ালে তার তো পেট চলে না। সে তোমার জন্য এক ভাঁড় দই রেখে গেছে। বলে গেছে, তাদের গ্রামে তার বোনঝির বিয়ে— তাই সে কলমিপাড়ায় বাঁশির ফরমাশ দিতে যাচ্ছে— তাই বড়ো ব্যস্ত আছে।

অমল। সে যে বলেছিল, আমার সঙ্গে তার ছোটো বোনঝিটির বিয়ে দেবে।

ঠাকুরদা। তবে তো বড়ো মুশকিল দেখছি।

অমল। বলেছিল, সে আমার টুকটুকে বউ হবে— তার নাকে নোলক, তার লাল ডুরে শাড়ি। সে সকালবেলা নিজের হাতে কালো গোরু দুইয়ে নতুন মাটির ভাঁড়ে আমাকে ফেনাসুদ্ধ দুধ খাওয়াবে, আর সন্ধের সময় গোয়ালঘরে প্রদীপ দেখিয়ে এসে আমার কাছে বসে সাত ভাই চম্পার গল্প করবে।

ঠাকুরদা। বা, বা, খাসা বউ তো ! আমি যে ফকির মানুষ আমারই লোভ হয়। তা বাবা ভয় নেই, এবারকার মতো বিয়ে দিক-না, আমি তোমাকে বলছি, তোমার দরকার হলে কোনোদিন ওর ঘরে বোনঝির অভাব হবে না।

মাধব দত্ত। যাও, যাও। আর তো পারা যায় না।

[প্রস্থান

অমল। ফকির, পিসেমশাই তো গিয়েছেন— এইবার আমাকে চুপিচুপি বলো-না ডাকঘরে কি আমার নামে রাজার চিঠি এসেছে।

ঠাকুরদা। শুনেছি তো তাঁর চিঠি রওনা হয়ে বেরিয়েছে। সে-চিঠি এখন পথে আছে।

অমল। পথে ? কোন্ পথে ! সেই যে বৃষ্টি হয়ে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেলে অনেক দূরে দেখা যায়, সেই ঘন বনের পথে ?

ঠাকুরদা। তবে তো তুমি সব জান দেখছি, সেই পথেই তো।

অমল। আমি সব জানি ফকির !

ঠাকুরদা। তাই তো দেখতে পাচ্ছি— কেমন করে জানলে ?

অমল। তা আমি জানি নে। আমি যেন চোখের সামনে দেখতে পাই— মনে হয় যেন আমি অনেকবার দেখেছি— সে অনেকদিন আগে— কতদিন তা মনে পড়ে না। বলব ? আমি দেখতে পাচ্ছি, রাজার ডাক-হরকরা পাহাড়ের উপর থেকে একলা কেবলই নেমে আসছে— বাঁ হাতে তার

লণ্ঠন, কাঁধে তার চিঠির থলি। কত দিন কত রাত ধরে সে কেবলই নেমে আসছে। পাহাড়ের পায়ের কাছে ঝরনার পথ যেখানে ফুরিয়েছে সেখানে বাঁকা নদীর পথ ধরে সে কেবলই চলে আসছে— নদীর ধারে জোয়ারির খেত, তারই সরু গলির ভিতর দিয়ে দিয়ে সে কেবল আসছে— তার পরে আখের খেত— সেই আখের খেতের পাশ দিয়ে উঁচু আল চলে গিয়েছে, সেই আলের উপর দিয়ে সে কেবলই চলে আসছে— রাতদিন একলাটি চলে আসছে ; খেতের মধ্যে ঝিঁঝি পোকা ডাকছে— নদীর ধারে একটিও মানুষ নেই, কেবল কাদাখোঁচা লেজ দুলিয়ে দুলিয়ে বেড়াচ্ছে— আমি সমস্ত দেখতে পাচ্ছি। যতই সে আসছে দেখছি, আমার বুকের ভিতরে ভারি খুশি হয়ে হয়ে উঠছে।

ঠাকুরদা। অমন নবীন চোখ তো আমার নেই তবু তোমার দেখার সঙ্গে সঙ্গে আমিও দেখতে পাচ্ছি।

অমল। আচ্ছা ফকির, যাঁর ডাকঘর তুমি সেই রাজাকে জান ?

ঠাকুরদা। জানি বৈকি। আমি যে তাঁর কাছে রোজ ভিক্ষা নিতে যাই।

অমল। সে তো বেশ ! আমি ভালো হয়ে উঠলে আমিও তাঁর কাছে ভিক্ষা নিতে যাব। পারব না যেতে ?

ঠাকুরদা। বাবা, তোমার আর ভিক্ষার দরকার হবে না, তিনি তোমাকে যা দেবেন অমনিই দিয়ে দেবেন।

অমল। না, না, আমি তাঁর দরজার সামনে পথের ধারে দাঁড়িয়ে জয় হোক বলে ভিক্ষা চাইব— আমি খঞ্জনি বাজিয়ে নাচব—সে বেশ হবে, না ?

ঠাকুরদা। সে খুব ভালো হবে। তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলে আমারও পেট ভরে ভিক্ষা মিলবে। তুমি কী ভিক্ষা চাইবে ?

অমল। আমি বলব, আমাকে তোমার ডাক-হরকরা করে দাও, আমি অমনি লণ্ঠন হাতে ঘরে ঘরে তোমার চিঠি বিলি করে বেড়াব। জান ফকির, আমাকে একজন বলেছে আমি ভালো হয়ে উঠলে সে আমাকে ভিক্ষা করতে শেখাবে। আমি তার সঙ্গে যেখানে খুশি ভিক্ষা করে বেড়াব।

ঠাকুরদা। কে বলো দেখি ?

অমল। ছিদাম।

ঠাকুরদা। কোন্ ছিদাম ?

অমল। সেই যে অন্ধ খোঁড়া। সে রোজ আমার জানলার কাছে আসে। ঠিক আমার মতো একজন ছেলে তাকে চাকার গাড়িতে করে ঠেলে ঠেলে নিয়ে বেড়ায়। আমি তাকে বলেছি, আমি ভালো হয়ে উঠলে তাকে ঠেলে ঠেলে নিয়ে বেড়াব।

ঠাকুরদা। সে তো বেশ মজা হবে দেখছি।

অমল। সেই আমাকে বলেছে কেমন করে ভিক্ষা করতে হয় আমাকে শিখিয়ে দেবে। পিসেমশায়কে আমি বলি ওকে ভিক্ষা দিতে, তিনি বলেন ও মিথ্যা কানা, মিথ্যা খোঁড়া। আচ্ছা, ও যেন মিথ্যা কানা-ই হল, কিন্তু চোখে দেখতে পায় না—সেটা তো সত্যি।

ঠাকুরদা। ঠিক বলেছ বাবা, ওর মধ্যে সত্যি হচ্ছে ঐটুকু যে, ও চোখে দেখতে পায় না— তা ওকে কানা বল আর না-ই বল। তা ও ভিক্ষা পায় না, তবে তোমার কাছে বসে থাকে কী করতে।

অমল। ওকে যে আমি শোনাই কোথায় কী আছে। বেচারা দেখতে পায় না। তুমি যে-সব দেশের কথা আমাকে বল সে-সব আমি ওকে শুনিয়ে দিই। তুমি সেদিন আমাকে সেই যে হালকা দেশের কথা বলেছিলে, যেখানে কোনো জিনিসের কোনো ভার নেই— যেখানে একটু লাফ দিলেই অমনি পাহাড় ডিঙিয়ে চলে যাওয়া যায়, সেই হালকা দেশের কথা শুনে ও ভারি খুশি হয়ে উঠেছিল। আচ্ছা ফকির, সে দেশে কোন্ দিক দিয়ে যাওয়া যায় ?

ঠাকুরদা। ভিতরের দিক দিয়ে সে একটা রাস্তা আছে, সে হয়তো খুঁজে পাওয়া শক্ত।

অমল। ও বেচারা যে অন্ধ, ও হয়তো দেখতেই পাবে না— ওকে কেবল ভিক্ষাই করে বেড়াতে

হবে। তাই নিয়ে ও দুঃখ করছিল— আমি ওকে বললুম ভিক্ষা করতে গিয়ে তুমি যে কত বেড়াতে পাও, সবাই তো সে পায় না।

ঠাকুরদা। বাবা, ঘরে বসে থাকলেই বা এত কিসের দুঃখ?

অমল। না, না, দুঃখ নেই। প্রথমে যখন আমাকে ঘরের মধ্যে বসিয়ে রেখে দিয়েছিল আমার মনে হয়েছিল যেন দিন ফুরোচ্ছে না, আমাদের রাজার ডাকঘর দেখে অবধি এখন আমার রোজই ভালো লাগে— এই ঘরের মধ্যে বসে বসেই ভালো লাগে— একদিন আমার চিঠি এসে পৌঁছোবে, সে কথা মনে করলেই আমি খুব খুশি হয়ে চুপ করে বসে থাকতে পারি। কিন্তু রাজার চিঠিতে কী যে লেখা থাকবে তা তো আমি জানি নে।

ঠাকুরদা। তা না-ই জানলে। তোমার নামটি তো লেখা থাকবে— তা হলেই হল।

মাধব দত্তের প্রবেশ

মাধব দত্ত। তোমরা দুজনে মিলে এ কী ফেসাদ বাধিয়ে বসে আছ বলো দেখি?

ঠাকুরদা। কেন, হয়েছে কী?

মাধব দত্ত। শুনছি, তোমরা নাকি রটিয়েছ, রাজা তোমাদেরই চিঠি লিখবেন বলে ডাকঘর বসিয়েছেন।

ঠাকুরদা। তাতে হয়েছে কী?

মাধব দত্ত। আমাদের পঞ্চানন মোড়ল সেই কথাটি রাজার কাছে লাগিয়ে বেনামি চিঠি লিখে দিয়েছে।

ঠাকুরদা। সকল কথাই রাজার কানে ওঠে, সে কি আমরা জানি নে?

মাধব দত্ত। তবে সামলে চল-না কেন। রাজাবাদশার নাম করে অমন যা-তা কথা মুখে আনো কেন? তোমরা যে আমাকে সুদ্ধ মুশকিলে ফেলবে।

অমল। ফকির, রাজা কি রাগ করবে?

ঠাকুরদা। অমনি বললেই হল! রাগ করবে! কেমন রাগ করে দেখি-না। আমার মতো ফকির আর তোমার মতো ছেলের উপর রাগ ক'রে সে কেমন রাজাগিরি ফলায় তা দেখা যাবে।

অমল। দেখো ফকির, আজ সকালবেলা থেকে আমার চোখের উপর থেকে-থেকে অন্ধকার হয়ে আসছে; মনে হচ্ছে সব যেন স্বপ্ন। একেবারে চুপ করে থাকতে ইচ্ছে করছে। কথা কইতে আর ইচ্ছে করছে না। রাজার চিঠি কি আসবে না? এখনই এই ঘর যদি সব মিলিয়ে যায়— যদি—

ঠাকুরদা। (অমলকে বাতাস করিতে করিতে) আসবে, চিঠি আজই আসবে।

কবিরাজের প্রবেশ

কবিরাজ। আজ কেমন ঠেকছে?

অমল। কবিরাজমশায়, আজ খুব ভালো বোধ হচ্ছে— মনে হচ্ছে যেন সব বেদনা চলে গেছে।

কবিরাজ। (জনান্তিকে মাধব দত্তের প্রতি) ঐ হাসিটি তো ভালো ঠেকছে না। ঐ-যে বলছে খুব ভালো বোধ হচ্ছে ঐটেই হল খারাপ লক্ষণ। আমাদের চক্রধরদত্ত বলছেন—

মাধব দত্ত। দোহাই কবিরাজমশায়, চক্রধরদত্তের কথা রেখে দিন। এখন বলুন ব্যাপারখানা কী।

কবিরাজ। বোধ হচ্ছে, আর ধরে রাখা যাবে না। আমি তো নিষেধ করে গিয়েছিলুম কিন্তু বোধ হচ্ছে বাইরের হাওয়া লেগেছে।

মাধব দত্ত। না কবিরাজমশায়, আমি ওকে খুব করেই চারি দিক থেকে আগলে সামলে রেখেছি। ওকে বাইরে যেতে দিই নে— দরজা তো প্রায়ই বন্ধ রাখি।

কবিরাজ। হঠাৎ আজ একটা কেমন হাওয়া দিয়েছে— আমি দেখে এলুম, তোমাদের সদর-দরজার ভিতর দিয়ে হু হু করে হাওয়া বইছে। ওটা একেবারেই ভালো নয়। ও-দরজাটা বেশ ভালো করে তালাচাবি-বন্ধ করে দাও। না-হয় দিন দুই-তিন তোমাদের এখানে লোক-আনাগোনা বন্ধই

থাক্-না। যদি কেউ এসে পড়ে খিড়কি-দরজা আছে। ঐ-যে জানলা দিয়ে সূর্যাস্তের আভাটা আসছে, ওটাও বন্ধ করে দাও, ওতে রোগীকে বড়ো জাগিয়ে রেখে দেয়।

মাধব দত্ত। অমল চোখ বুজে রয়েছে, বোধ হয় ঘুমোচ্ছে। ওর মুখ দেখে মনে হয় যেন— কবিরাজমশায়, যে আপনার নয় তাকে ঘরে এনে রাখলুম, তাকে ভালোবাসলুম, এখন বুঝি আর তাকে রাখতে পারব না।

কবিরাজ। ওকি! তোমার ঘরে যে মোড়ল আসছে! এ কী উৎপাত! আমি আসি ভাই! কিন্তু তুমি যাও, এখনই ভালো করে দরজাটা বন্ধ করে দাও। আমি বাড়ি গিয়েই একটা বিষবড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি— সেইটে খাইয়ে দেখো— যদি রাখবার হয় তো সেইটেতেই টেনে রাখতে পারবে।

[মাধব দত্ত ও কবিরাজের প্রস্থান

মোড়লের প্রবেশ

মোড়ল। কী রে ছোঁড়া!

ঠাকুরদা। (তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া) আরে আরে, চুপ চুপ!

অমল। না ফকির, তুমি ভাবছ আমি ঘুমোচ্ছি। আমি ঘুমোই নি। আমি সব শুনছি। আমি যেন অনেক দূরের কথাও শুনতে পাচ্ছি। আমার মনে হচ্ছে, আমার মা আমার বাবা যেন শিয়রের কাছে কথা কচ্ছেন।

মাধব দত্তের প্রবেশ

মোড়ল। ওহে মাধব দত্ত, আজকাল তোমাদের যে খুব বড়ো বড়ো লোকের সঙ্গে সম্বন্ধ!

মাধব দত্ত। বলেন কী, মোড়লমশায়! এমন পরিহাস করবেন না। আমরা নিতান্তই সামান্য লোক।

মোড়ল। তোমাদের এই ছেলেটি যে রাজার চিঠির জন্যে অপেক্ষা করে আছে।

মাধব দত্ত। ও ছেলেমানুষ, ও পাগল, ওর কথা কি ধরতে আছে!

মোড়ল। না-না, এতে আর আশ্চর্য কী? তোমাদের মতো এমন যোগ্য ঘর রাজা পাবেন কোথায়? সেইজন্যেই দেখছ-না, ঠিক তোমাদের জানলার সামনেই রাজার নতুন ডাকঘর বসেছে? ওরে ছোঁড়া, তোর নামে রাজার চিঠি এসেছে যে।

অমল। (চমকিয়া উঠিয়া) সত্যি!

মোড়ল। এ কি সত্যি না হয়ে যায়! তোমার সঙ্গে রাজার বন্ধুত্ব! (একখানা অক্ষরশূন্য কাগজ দিয়া) হা হা হা হা, এই যে তাঁর চিঠি।

অমল। আমাকে ঠাট্টা কোরো না। ফকির, ফকির, তুমি বলো-না, এই কি সত্যি তাঁর চিঠি?

ঠাকুরদা। হাঁ বাবা, আমি ফকির তোমাকে বলছি এই সত্য তাঁর চিঠি।

অমল। কিন্তু, আমি যে এতে কিছুই দেখতে পাচ্ছি নে— আমার চোখে আজ সব সাদা হয়ে গেছে! মোড়লমশায়, বলে দাও-না, এ-চিঠিতে কী লেখা আছে।

মোড়ল। রাজা লিখছেন, আমি আজকালের মধ্যেই তোমাদের বাড়িতে যাচ্ছি, আমার জন্যে তোমাদের মুড়ি-মুড়কির ভোগ তৈরি করে রেখো— রাজভবন আর আমার এক দণ্ড ভালো লাগছে না। হা হা হা হা!

মাধব দত্ত। (হাত জোড় করিয়া) মোড়লমশায়, দোহাই আপনার, এ-সব কথা নিয়ে পরিহাস করিবেন না।

ঠাকুরদা। পরিহাস! কিসের পরিহাস! পরিহাস করেন, এমন সাধ্য আছে ওঁর!

মাধব। আরে! ঠাকুরদা, তুমিও খেপে গেলে নাকি!

ঠাকুরদা। হাঁ, আমি খেপেছি। তাই আজ এই সাদা কাগজে অক্ষর দেখতে পাচ্ছি। রাজা লিখছেন তিনি স্বয়ং অমলকে দেখতে আসছেন, তিনি তাঁর রাজকবিরাজকেও সঙ্গে করে আনছেন।

অমল। ফকির, ঐ-যে, ফকির, তাঁর বাজনা বাজছে, শুনতে পাচ্ছ না ?

মোড়ল। হা হা হা হা ! উনি আরো একটু না খেপলে তো শুনতে পাবেন না।

অমল। মোড়লমশায়, আমি মনে করতুম, তুমি আমার উপর রাগ করেছ— তুমি আমাকে ভালোবাস না। তুমি যে সত্যি রাজার চিঠি আনবে এ আমি মনে করি নি— দাও, আমাকে তোমার পায়ের ধুলো দাও।

মোড়ল। না, এ ছেলেটার ভক্তিশ্রদ্ধা আছে। বুদ্ধি নেই বটে, কিন্তু মনটা ভালো।

অমল। এতক্ষণে চার প্রহর হয়ে গেছে বোধ হয়। ঐ যে ঢং ঢং ঢং— ঢং ঢং ঢং। সন্ধ্যাতারা কি উঠেছে ফকির ? আমি কেন দেখতে পাচ্ছি নে ?

ঠাকুরদা। ওরা যে জানলা বন্ধ করে দিয়েছে, আমি খুলে দিচ্ছি।

বাহিরে দ্বারে আঘাত

মাধব দত্ত। ওকি ও ! ও কে ও ! এ কী উৎপাত ?

(বাহির হইতে) খোলো দ্বার।

মাধব দত্ত। কে তোমরা ?

(বাহির হইতে) খোলো দ্বার।

মাধব দত্ত। মোড়লমশায়, এ তো ডাকাত নয় !

মোড়ল। কে রে ? আমি পঞ্চানন মোড়ল। তোদের মনে ভয় নেই নাকি ? দেখো একবার, শব্দ থেমেছে। পঞ্চাননের আওয়াজ পেলে আর রক্ষা নেই। যত বড়ো ডাকাতই হোক-না—

মাধব দত্ত। (জানলা দিয়া মুখ বাড়াইয়া) দ্বার যে ভেঙে ফেলেছে, তাই আর শব্দ নেই।

রাজদূতের প্রবেশ

রাজদূত। মহারাজ আজ রাত্রে আসবেন।

মোড়ল। কী সর্বনাশ !

অমল। কত রাত্রে দূত ? কত রাত্রে ?

দূত। আজ দুই প্রহর রাত্রে।

অমল। যখন আমার বন্ধু প্রহরী নগরের সিংহদ্বারে ঘণ্টা বাজাবে ঢং ঢং ঢং, ঢং ঢং ঢং— তখন ?

দূত। হাঁ, তখন। রাজা তাঁর বালক-বন্ধুটিকে দেখবার জন্যে তাঁর সকলের চেয়ে বড়ো কবিরাজকে পাঠিয়েছেন।

রাজকবিরাজের প্রবেশ

রাজকবিরাজ। একি ! চারি দিকে সমস্তই যে বন্ধ ! খুলে দাও, খুলে দাও, যত দ্বার-জানলা আছে সব খুলে দাও।— (অমলের গায়ে হাত দিয়া) বাবা, কেমন বোধ করছ ?

অমল। খুব ভালো, খুব ভালো কবিরাজমশায়। আমার আর কোনো অসুখ নেই, কোনো বেদনা নেই। আঃ, সব খুলে দিয়েছ— সব তারাগুলি দেখতে পাচ্ছি— অন্ধকারের ওপারকার সব তারা।

রাজকবিরাজ। অর্ধরাত্রে যখন রাজা আসবেন তখন তুমি বিছানা ছেড়ে উঠে তাঁর সঙ্গে বেরোতে পারবে ?

অমল। পারব, আমি পারব। বেরোতে পারলে আমি বাঁচি। আমি রাজাকে বলব, এই অন্ধকার আকাশে ধ্রুবতারাটিকে দেখিয়ে দাও। আমি সে তারা বোধ হয় কতবার দেখেছি কিন্তু সে যে কোন্‌টা সে তো আমি চিনি নে।

রাজকবিরাজ। তিনি সব চিনিয়ে দেবেন। (মাধবের প্রতি) এই ঘরটি রাজার আগমনের জন্যে পরিষ্কার করে ফুল দিয়ে সাজিয়ে রাখো। (মোড়লকে নির্দেশ করিয়া) ঐ লোকটিকে তো এ-ঘরে রাখা চলবে না।

অমল। না, না, কবিরাজমশায়, উনি আমার বন্ধু। তোমরা যখন আস নি উনিই আমাকে রাজার চিঠি এনে দিয়েছিলেন।

রাজকবিরাজ। আচ্ছা, বাবা, উনি যখন তোমার বন্ধু তখন উনিও এ-ঘরে রইলেন।

মাধব দত্ত। (অমলের কানে কানে) বাবা, রাজা তোমাকে ভালোবাসেন, তিনি স্বয়ং আজ আসছেন— তাঁর কাছে আজ কিছু প্রার্থনা কোরো। আমাদের অবস্থা তো ভালো নয়। জান তো সব।

অমল। সে আমি সব ঠিক করে রেখেছি, পিসেমশায়— সে তোমার কোনো ভাবনা নেই।

মাধব দত্ত। কী ঠিক করেছ বাবা?

অমল। আমি তাঁর কাছে চাইব, তিনি যেন আমাকে তাঁর ডাকঘরের হরকরা করে দেন— আমি দেশে দেশে ঘরে ঘরে তাঁর চিঠি বিলি করব।

মাধব দত্ত। (ললাটে করাঘাত করিয়া) হায় আমার কপাল!

অমল। পিসেমশায়, রাজা আসবেন, তাঁর জন্যে কী ভোগ তৈরি রাখবে।

দূত। তিনি বলে দিয়েছেন তোমাদের এখানে তাঁর মুড়ি-মুড়কির ভোগ হবে।

অমল। মুড়ি-মুড়কি! মোড়লমশায়, তুমি তো আগেই বলে দিয়েছিলে, রাজার সব খবরই তুমি জান! আমরা তো কিছুই জানতুম না।

মোড়ল। আমার বাড়িতে যদি লোক পাঠিয়ে দাও তা হলে রাজার জন্যে ভালো ভালো কিছু—

রাজকবিরাজ। কোনো দরকার নেই। এইবার তোমরা সকলে স্থির হও। এল, এল, ওর ঘুম এল। আমি বালকের শিয়রের কাছে বসব— ওর ঘুম আসছে। প্রদীপের আলো নিবিয়ে দাও— এখন আকাশের তারাটি থেকে আলো আসুক, ওর ঘুম এসেছে।

মাধব দত্ত। (ঠাকুরদার প্রতি) ঠাকুরদা, তুমি অমন মূর্তিটির মতো হাতজোড় করে নীরব হয়ে আছ কেন? আমার কেমন ভয় হচ্ছে। এ যা দেখছি এ-সব কি ভালো লক্ষণ! এরা আমার ঘর অন্ধকার করে দিচ্ছে কেন! তারার আলোতে আমার কী হবে!

ঠাকুরদা। চুপ করো অবিশ্বাসী! কথা কোয়ো না।

সুধার প্রবেশ

সুধা। অমল।

রাজকবিরাজ। ও ঘুমিয়ে পড়েছে।

সুধা। আমি যে ওর জন্যে ফুল এনেছি— ওর হাতে কি দিতে পারব না?

রাজকবিরাজ। আচ্ছা, দাও তোমার ফুল।

সুধা। ও কখন জাগবে?

রাজকবিরাজ। এখনই, যখন রাজা এসে ওকে ডাকবেন।

সুধা। তখন তোমরা ওকে একটি কথা কানে কানে বলে দেবে?

রাজকবিরাজ। কী বলব?

সুধা। বোলো যে, 'সুধা তোমাকে ভোলে নি'।

ফাল্গুনী

উৎসর্গ

যাহারা ফাল্গুনীর ফল্গুনদীটিকে বৃদ্ধকবির চিত্তমরুর
তলদেশ হইতে উপরে টানিয়া আনিয়াছে তাহাদের
এবং সেইসঙ্গে
সেই বালকদলের সকল নাটের কাণ্ডারী
আমার সকল গানের ভাণ্ডারী
শ্রীমান দিনেন্দ্রনাথের হস্তে
এই নাট্যকাব্যটিকে কবি-বাউলের একতারার মতো
সমর্পণ করিলাম

১৫ ফাল্গুন ১৩২২

পাত্রগণ

রাজা
মন্ত্রী
শ্রুতিভূষণ
কবিশেখর
নববসন্তের দূতগণ
শীত
নবযৌবনের দল

চন্দ্রহাস	...	উক্ত দলের প্রিয়সখা
দাদা	...	উক্ত দলের প্রবীণ যুবক
জীবন সর্দার	...	উক্ত দলের নেতা

অন্ধ বাউল
মাঝি
কোটাল
অনাথ কলু ইত্যাদি

এই নাট্যকাব্যে নবযৌবনের দল যেখানে কথাবার্তা কহিতেছে সেখানে চন্দ্রহাস, দাদা ও সর্দার ছাড়া আর কাহারও নাম নির্দিষ্ট নাই। দলের অন্য সকলে যে যেটা খুশি বলিতে পারে এবং তাহাদের লোকসংখ্যারও সীমা করিয়া দেওয়া হয় নাই।

সূচনা

রাজোদ্যান

চুপ, চুপ, চুপ কর্ তোরা।
কেন, কী হয়েছে।
মহারাজের মন খারাপ হয়েছে।
সর্বনাশ!
কে রে। কে বাজায় বাঁশি।
কেন ভাই, কী হয়েছে।
মহারাজের মন খারাপ হয়েছে।
সর্বনাশ!
ছেলেগুলো দাপাদাপি করছে কার।
আমাদের মণ্ডলদের।
মণ্ডলকে সাবধান করে দে। ছেলেগুলোকে ঠেকাক।
মন্ত্রী কোথায় গেলেন।
এই যে এখানেই আছি।
খবর পেয়েছেন কি।
কী বলো দেখি।
মহারাজের মন খারাপ হয়েছে।
কিন্তু প্রত্যন্তবিভাগ থেকে যুদ্ধের সংবাদ এসেছে যে।
যুদ্ধ চলুক কিন্তু তার সংবাদটা এখন চলবে না।
চীন-সম্রাটের দূত অপেক্ষা করছেন।
অপেক্ষা করতে দোষ নেই কিন্তু সাক্ষাৎ পাবেন না।
ঐ-যে মহারাজ আসছেন।
জয় হোক মহারাজের!
মহারাজ, সভায় যাবার সময় হল।
যাবার সময় হল বৈকি, কিন্তু সভায় যাবার নয়।
সে কি কথা মহারাজ!
সভা ভাঙবার ঘণ্টা বেজেছে শুনতে পেয়েছি।
কই, আমরা তো কেউ—
তোমরা শুনবে কী করে। ঘণ্টা একেবারে আমারই কানের কাছে বাজিয়েছে।
এতবড়ো স্পর্ধা কার হতে পারে।
মন্ত্রী, এখনো বাজাচ্ছে।
মহারাজ, দাসের স্থূলবুদ্ধি মাপ করবেন, বুঝতে পারলুম না।
এই চেয়ে দেখো—
মহারাজের চুল—
ওখানে একজন ঘণ্টা-বাজিয়েকে দেখতে পাচ্ছ না?
দাসের সঙ্গে পরিহাস?
পরিহাস আমার নয় মন্ত্রী, যিনি পৃথিবীসুদ্ধ জীবের কানে ধরে পরিহাস করেন এ তাঁরই। গত

রজনীতে আমার গলায় মল্লিকার মালা পরাবার সময় মহিষী চমকে উঠে বললেন, এ কী মহারাজ, আপনার কানের কাছে দুটো পাকাচুল দেখছি যে !

মহারাজ, এজন্য খেদ করবেন না— রাজবৈদ্য আছেন, তিনি—

এ বংশের প্রথম রাজা ইক্ষ্বাকুরও রাজবৈদ্য ছিলেন, তিনি কি করতে পেরেছিলেন। —মন্ত্রী, যমরাজ আমার কানের কাছে তাঁর নিমন্ত্রণপত্র ঝুলিয়ে রেখে দিয়েছেন। মহিষী এ দুটো চুল তুলে ফেলতে চেয়েছিলেন, আমি বললুম, কী হবে, রানী। যমের পত্রই যেন সরালুম কিন্তু যমের পত্রলিখককে তো সরানো যায় না। অতএব এ পত্র শিরোধার্য করাই গেল। এখন তা হলে—

যে আজ্ঞা, এখন তা হলে রাজকার্যের আয়োজন—

কিসের রাজকার্য। রাজকার্যের সময় নেই— শ্রুতিভূষণকে ডেকে আনো।

সেনাপতি বিজয়বর্মা—

না, বিজয়বর্মা না, শ্রুতিভূষণ।

মহারাজ, এ দিকে চীন-সম্রাটের দূত—

তাঁর চেয়ে বড়ো সম্রাটের দূত অপেক্ষা করছেন— ডাকো শ্রুতিভূষণকে।

মহারাজ, প্রত্যন্তসীমার সংবাদ—

মন্ত্রী, প্রত্যন্ততম সীমার সংবাদ এসেছে, ডাকো শ্রুতিভূষণকে।

মহারাজের শ্বশুর—

আমি যাঁর কথা বলছি তিনি আমার শ্বশুর নন। ডাকো শ্রুতিভূষণকে। আমাদেব কবিশেখর তাঁর কল্পমঞ্জরী কাব্য নিয়ে—

নিয়ে তিনি তাঁর কল্পদ্রুমের শাখায় প্রশাখায় আনন্দে সঞ্চরণ করুন, ডাকো শ্রুতিভূষণকে।

যে আদেশ, তাঁকে ডাকতে পাঠাচ্ছি।

বোলো, সঙ্গে যেন তাঁর বৈরাগ্যবারিধি পুঁথিটা আনেন।

প্রতিহারী, বাইরে ঐ কারা গোল করছে, বারণ করো, আমি একটু শান্তি চাই।

নাগপত্তনে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে, প্রজারা সাক্ষাৎ প্রার্থনা করে।

আমার তো সময় নেই মন্ত্রী, আমি শান্তি চাই।

তারা বলছে তাদের সময় আরো অনেক অল্প— তারা মৃত্যুর দ্বার প্রায় লঙ্ঘন করেছে— তারা ক্ষুধাশান্তি চায়।

ক্ষুধাশান্তি ! এ সংসারে কি ক্ষুধার শান্তি আছে। ক্ষুধানলের শান্তি চিতানলে।

তা হলে মহারাজ ঐ হতভাগ্যদের—

ঐ হতভাগ্যদের প্রতি এই হতভাগ্যের উপদেশ এই যে, কাল-ধীবরের জাল ছিন্ন করবার জন্যে ছটফট করা বৃথা, আজই হোক কালই হোক সে টেনে তুলবেই।

অতএব—

অতএব শ্রুতিভূষণকে প্রয়োজন এবং তাঁর বৈরাগ্যবারিধি পুঁথি।

প্রজারা তা হলে দুর্ভিক্ষ—

দেখো মন্ত্রী, ভিক্ষা তো অন্নের নয়, ভিক্ষা আয়ুর। সেই ভিক্ষায় জগৎ জুড়ে দুর্ভিক্ষ— কী রাজার কী প্রজার— কে কাকে রক্ষা করবে।

অতএব—

অতএব শ্মশানেশ্বর শিব যেখানে ডমরুধ্বনি করছেন সেইখানেই সকলের সব প্রার্থনা ছাইচাপা পড়বে— তবে কেন মিছে গলা ভাঙা। এই যে শ্রুতিভূষণ, প্রণাম।

শুভমস্তু।

শ্রুতিভূষণমশায়, মহারাজকে একটু বুঝিয়ে বলবেন যে অবসাদগ্রস্ত নিরুৎসাহকে লক্ষ্মী পরিহার করেন।

শ্রুতিভূষণ, মন্ত্রী আপনাকে কী বলছেন।

উনি বলছেন লক্ষ্মীর স্বভাবসম্বন্ধে মহারাজকে কিছু উপদেশ দিতে।

আপনার উপদেশ কী।

বৈরাগ্যবারিধিতে একটি চৌপদী আছে—

যে পদ্মে লক্ষ্মীর বাস, দিন-অবসানে
সেই পদ্ম মুদে দল সকলেই জানে।
গৃহ যার ফুটে আর মুদে পুনঃপুনঃ
সে লক্ষ্মীরে ত্যাগ করো, শুন মূঢ় শুন।

অহো, আপনার উপদেশের এক ফুৎকারেই আশা-প্রদীপের জ্বলন্ত শিখা নির্বাপিত হয়ে যায়। আমাদের আচার্য বলেছেন না—

দন্তং গলিতং পলিতং মুণ্ডং
তদপি ন মুঞ্চতি আশাভাণ্ডং।

মহারাজ, আশার কথা যদি তুললেন তবে বারিধি থেকে আর-একটি চৌপদী শোনাই—

শৃঙ্খল বাঁধিয়া রাখে এই জানি সবে,
আশার শৃঙ্খল কিন্তু অদ্ভুত এ ভবে।
সে যাহারে বাঁধে সেই ঘুরে মরে পাকে,
সে-বন্ধন ছাড়ে যারে স্থির হয়ে থাকে।

হায় হায় অমূল্য আপনার বাণী। শ্রুতিভূষণকে এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা এখনই— ও কি মন্ত্রী, আবার কারা গোল করছে।

সেই দুর্ভিক্ষগ্রস্ত প্রজারা।

ওদের এখনি শান্ত হতে বলো।

তা হলে মহারাজ, শ্রুতিভূষণকে ওদের কাছে পাঠিয়ে দিন-না— আমরা ততক্ষণ যুদ্ধের পরামর্শটা—

না না, যুদ্ধ পরে হবে, শ্রুতিভূষণকে ছাড়তে পারছি নে।

মহারাজ, স্বর্ণমুদ্রা দেবার কথা বলছিলেন কিন্তু সে দান যে ক্ষয় হয়ে যাবে। বৈরাগ্যবারিধি লিখছেন—

স্বর্ণদান করে যেই করে দুঃখ দান,
যত স্বর্ণ ক্ষয় হয় ব্যথা পায় প্রাণ।
শত দাও, লক্ষ দাও, হয়ে যায় শেষ,
শূন্য ভাণ্ড ভরি শুধু থাকে মনঃক্লেশ।

আহা শরীর রোমাঞ্চিত হল। প্রভু কি তা হলে—

না, আমি সহস্র মুদ্রা চাই নে।

দিন দিন, একটু পদধূলি দিন। সহস্র মুদ্রা চান না! এতবড়ো কথা!

মহারাজ, এই সহস্র মুদ্রা অক্ষয় হয়ে যাতে মহারাজের পুণ্যফলকে অসীম করে আমি এমন-কিছু চাই। গোধনসমেত আপনার ঐ কাঞ্চনপুর জনপদটি যদি ব্রহ্মত্র দান করেন কেবলমাত্র ঐটুকুতেই আমি সন্তুষ্ট থাকব ; কারণ বৈরাগ্যবারিধি বলছেন—

বুঝেছি শ্রুতিভূষণ, এর জন্যে আর বৈরাগ্যবারিধির প্রমাণ দরকার নেই। মন্ত্রী, কাঞ্চনপুর জনপদটি যাতে শ্রুতিভূষণের বংশে চিরন্তন— আবার কী, বার বার কেন চীৎকার করছে।

চীৎকারটা বার বার করছে বটে কিন্তু কারণটা একই রয়ে গেছে। ওরা সেই মহারাজের দুর্ভিক্ষকাতর প্রজা।

মহারাজ, ব্রাহ্মণী মহারাজকে বলতে বলেছেন তিনি তাঁর সর্বাঙ্গে মহারাজের যশোঝংকার ধ্বনিত

করতে চান কিন্তু আভরণের অভাববশত শব্দ বড়োই ক্ষীণ হয়ে বাজছে।

মন্ত্রী !

মহারাজ !

ব্রাহ্মণীর আভরণের অভাবমোচন করতে যেন বিলম্ব না হয়।

আর মন্ত্রীমশায়কে বলে দিন, আমরা সর্বদাই পরমার্থচিন্তায় রত, বৎসরে বৎসরে গৃহসংস্কারের চিন্তায় মন দিতে হলে চিত্তবিক্ষেপ হয়। অতএব রাজশিল্পী যদি আমার গৃহটি সুদৃঢ় করে নির্মাণ করে দেয় তা হলে তার তলদেশে শান্তমনে বৈরাগ্যসাধন করতে পারি।

মন্ত্রী, রাজশিল্পীকে যথাবিধি আদেশ করে দাও।

মহারাজ, এ বৎসর রাজকোষে ধনাভাব।

সে তো প্রতি বৎসরেই শুনে আসছি। মন্ত্রী, তোমাদের উপর ভার ধন বৃদ্ধি করবার, আর আমার উপর ভার অভাব বৃদ্ধি করবার। এই দুইয়ে মিলে সন্ধি করে হয় ধনাভাব।

মহারাজ, মন্ত্রীকে দোষ দিতে পারি নে। উনি দেখছেন আপনার অর্থ, আর আমরা দেখছি আপনার পরমার্থ, সুতরাং উনি যেখানে দেখতে পাচ্ছেন অভাব আমরা সেখানে দেখতে পাচ্ছি ধন। বৈরাগ্যবারিধিতে লিখছেন—

রাজকোষ পূর্ণ হয়ে তবু শূন্যমাত্র,
যোগ্য হাতে যাহা পড়ে লভে সৎপাত্র।
পাত্র নাই ধন আছে, থেকেও না থাকা,
পাত্র হাতে ধন, সেই রাজকোষ পাকা।

আহা হা ! আপনাদের সঙ্গ অমূল্য।

কিন্তু মহারাজের সঙ্গ কত মূল্যবান, শ্রুতিভূষণমশায় তা বেশ জানেন। তা হলে আসুন শ্রুতিভূষণ, বৈরাগ্যসাধনের ফর্দ যা দিলেন সেটা সংগ্রহ করা যাক।

চলুন তবে চলুন, বিলম্বে কাজ নেই। মন্ত্রী এই সামান্য বিষয় নিয়ে যখন এত অধীর হয়েছেন তখন ওঁকে শান্ত করে এখনি আবার ফিরে আসছি।

আমার সর্বদা ভয় হয় পাছে আপনি রাজাশ্রয় ছেড়ে অরণ্যে চলে যান।

মহারাজ, মনটা মুক্ত থাকলে কিছুই ত্যাগ করতে হয় না— এই রাজগৃহে যতক্ষণ আমার সন্তোষ আছে ততক্ষণ এই আমার অরণ্য। এক্ষণে তবে আসি। মন্ত্রী, চলো চলো।

ঐ যে কবিশেখর আসছে— আমার তপস্যা ভাঙলে বুঝি ! ওকে ভয় করি। ওরে পাকাচুল কান ঢেকে থাক্ রে, কবির বাণী যেন প্রবেশপথ না পায়।

মহারাজ, আপনার এই কবিকে নাকি বিদায় করতে চান।

কবিত্ব যে বিদায়-সংবাদ পাঠালে, এখন কবিকে রেখে হবে কী।

সংবাদটা কোথায় পৌঁছল।

ঠিক আমার কানের উপর। চেয়ে দেখো।

পাকাচুল ? ওটাকে আপনি ভাবছেন কী।

যৌবনের শ্যামকে মুছে ফেলে সাদা করার চেষ্টা।

কারিকরের মতলব বোঝেন নি। ঐ সাদা ভূমিকার উপরে আবার নূতন রঙ লাগবে।

কই, রঙের আভাস তো দেখি নে।

সেটা গোপনে আছে। সাদার প্রাণের মধ্যে সব রঙেরই বাসা।

চুপ চুপ, চুপ করো, কবি চুপ করো।

মহারাজ, এ যৌবন ম্লান যদি হল তো হোক-না। আরেক যৌবনলক্ষ্মী আসছেন, মহারাজের কেশে তিনি তাঁর শুভ্র মল্লিকার মালা পাঠিয়ে দিয়েছেন— নেপথ্যে সেই মিলনের আয়োজন চলছে।

আরে, আরে, তুমি দেখছি বিপদ বাধাবে কবি। যাও যাও তুমি যাও— ওরে, শ্রুতিভূষণকে দৌড়ে

ডেকে নিয়ে আয়।

তাঁকে কেন মহারাজ!

বৈরাগ্য সাধন করব।

সেই খবর শুনেই তো ছুটে এসেছি, এ সাধনায় আমিই তো আপনার সহচর।

তুমি!

হাঁ মহারাজ, আমরাই তো পৃথিবীতে আছি মানুষের আসক্তি মোচন করবার জন্য।

বুঝতে পারলুম না।

এতদিন কাব্য শুনিয়ে এলুম তবু বুঝতে পারলেন না? আমাদের কথার মধ্যে বৈরাগ্য, সুরের মধ্যে বৈরাগ্য, ছন্দের মধ্যে বৈরাগ্য। সেইজন্যই তো লক্ষ্মী আমাদের ছাড়েন, আমরাও লক্ষ্মীকে ছাড়বার জন্যে যৌবনের কানে মন্ত্র দিয়ে বেড়াই।

তোমাদের মন্ত্রটা কী।

আমাদের মন্ত্র এই যে, ওরে ভাই, ঘরের কোণে তোদের থলি-থালি আঁকড়ে বসে থাকিস নে— বেড়িয়ে পড়্ প্রাণের সদর রাস্তায় ওরে যৌবনের বৈরাগীর দল।

সংসারের পথটাই বুঝি তোমার বৈরাগ্যের পথ হল?

তা নয়তো কী মহারাজ! সংসারে যে কেবলই সরা, কেবলই চলা; তারই সঙ্গে সঙ্গে যে-লোক একতারা বাজিয়ে নৃত্য করতে করতে কেবলই সরে, কেবলই চলে, সে-ই তো বৈরাগী, সে-ই তো পথিক, সে-ই তো কবি-বাউলের চেলা।

তা হলে শান্তি পাব কী করে।

শান্তির উপরে তো আমাদের একটুও আসক্তি নেই, আমরা যে বৈরাগী।

কিন্তু ধ্রুব সম্পদটি তো পাওয়া চাই।

ধ্রুব সম্পদে আমাদের একটুও লোভ নেই, আমরা যে বৈরাগী।

সে কী কথা।— বিপদ বাধাবে দেখছি। ওরে শ্রুতিভূষণকে ডাক্।

আমরা অধ্রুব মন্ত্রের বৈরাগী। আমরা কেবলই ছাড়তে ছাড়তে পাই, তাই ধ্রুবটাকে মানি নে।

এ তোমার কিরকম কথা।

পাহাড়ের গুহা ছেড়ে যে-নদী বেরিয়ে পড়েছে তার বৈরাগ্য কি দেখেন নি মহারাজ। সে অনায়াসে আপনাকে ঢেলে দিতে দিতেই আপনাকে পায়। নদীর পক্ষে ধ্রুব হচ্ছে বালির মরুভূমি— তার মধ্যে সেঁধলেই বেচারা গেল। তার দেওয়া যেমনি ঘোচে অমনি তার পাওয়াও ঘোচে।

ঐ শোনো কবিশেখর, কান্না শোনো। ঐ তো তোমার সংসার!

ওরা মহারাজের দুর্ভিক্ষকাতর প্রজা।

আমার প্রজা? বল কী কবি। সংসারের প্রজা ওরা। এ দুঃখ কি আমি সৃষ্টি করেছি। তোমার কবিত্বমন্ত্রের বৈরাগীরা এ দুঃখের কী প্রতিকার করতে পারে বলো তো।

মহারাজ, এ দুঃখকে তো আমরাই বহন করতে পারি। আমরা যে নিজেকে ঢেলে দিয়ে বয়ে চলেছি। নদী কেমন ক'রে ভার বহন করে দেখেছেন তো? মাটির পাকা রাস্তাই হল যাকে বলেন ধ্রুব, তাই তো ভারকে কেবলই সে ভারী করে তোলে; বোঝা তার উপর দিয়ে আর্তনাদ করতে করতে চলে, আর তারও বুক ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায়। নদী আনন্দে বয়ে চলে, তাই তো সে আপনার ভার লাঘব করেছে ব'লেই বিশ্বের ভার লাঘব করে। আমরা ডাক দিয়েছি সকলের সব সুখ-দুঃখকে চলার লীলায় বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে। আমাদের বৈরাগীর ডাক। আমাদের বৈরাগীর সর্দার যিনি, তিনি এই সংসারের পথ দিয়ে নেচে চলেছেন, তাই তো বসে থাকতে পারি নে—

পথ দিয়ে কে যায় গো চলে
ডাক দিয়ে সে যায়।
আমার ঘরে থাকাই দায়।

পথের হাওয়ায় কী সুর বাজে,
বাজে আমার বুকের মাঝে,
বাজে বেদনায়।
আমার ঘরে থাকাই দায়।

পূর্ণিমাতে সাগর হতে
ছুটে এল বান,
আমার লাগল প্রাণে টান।

আপন মনে মেলে আঁখি
আর কেন বা পড়ে থাকি
কিসের ভাবনায়।
আমার ঘরে থাকাই দায়॥

যাক গে শ্রুতিভূষণ। ওহে কবিশেখর, আমার কী মুশকিল হয়েছে জানো। তোমার কথা আমি এক বিন্দুবিসর্গও বুঝতে পারি নে, অথচ তোমার সুরটা আমার বুকে গিয়ে বাজে। আর শ্রুতিভূষণের ঠিক তার উলটো ; তার কথাগুলো খুবই স্পষ্ট বোঝা যায় হে— ব্যাকরণের সঙ্গেও মেলে— কিন্তু সুরটা— সে কী আর বলব।

মহারাজ, আমাদের কথা তো বোঝবার জন্যে হয় নি, বাজবার জন্যে হয়েছে।

এখন তোমার কাজটা কী বলো তো কবি।

মহারাজ, ঐ-যে তোমার দরজার বাইরে কান্না উঠেছে ঐ কান্নার মাঝখান দিয়ে এখন ছুটতে হবে।

ওহে কবি, বল কী তুমি। এ-সমস্ত কেজো লোকের কাজ, দুর্ভিক্ষের মধ্যে তোমরা কী করবে !

কেজো লোকেরা কাজ বেসুরো করে ফেলে, তাই সুর বাঁধবার জন্যে আমাদের ছুটে আসতে হয়।

ওহে কবি, আর-একটু স্পষ্ট ভাষায় কথা কও।

মহারাজ, ওরা কর্তব্যকে ভালোবাসে ব'লে কাজ করে, আমরা প্রাণকে ভালোবাসি ব'লে কাজ করি— এইজন্যে ওরা আমাদের গাল দেয়, বলে নিষ্কর্মা, আমরা ওদের গাল দিই, বলি নির্জীব।

কিন্তু জিতটা হল কার।

আমাদের, মহারাজ, আমাদের।

তার প্রমাণ ?

পৃথিবীতে যা-কিছু সকলের বড়ো তার প্রমাণ নেই। পৃথিবীতে যত কবি যত কবিত্ব সমস্ত যদি ধুয়ে-মুছে ফেলতে পার তা হলেই প্রমাণ হবে এতদিন কেজো লোকেরা তাদের কাজের জোরটা কোথা থেকে পাচ্ছিল, তাদের ফসলখেতের মূলের রস জুগিয়ে এসেছে কারা। মহারাজ, আপনার দরজার বাইরে ঐ-যে কান্না উঠেছে সে কান্না থামায় কারা। যারা বৈরাগ্যবারিধির তলায় ডুব মেরেছে তারা নয়, যারা বিষয়কে আঁকড়ে ধরে রয়েছে তারা নয়, যারা কাজের কৌশলে হাত পাকিয়েছে তারাও নয়, যারা কর্তব্যের শুষ্ক রুদ্রাক্ষের মালা জপছে তারাও নয়, যারা অপর্যাপ্ত প্রাণকে বুকের মধ্যে পেয়েছে ব'লেই জগতের কিছুতে যাদের উপেক্ষা নেই, জয় করে তারা, ত্যাগ করেও তারাই, বাঁচতে জানে তারা, মরতেও জানে তারা, তারা জোরের সঙ্গে দুঃখ পায়, তারা জোরের সঙ্গে দুঃখ দূর করে— সৃষ্টি করে তারাই, কেননা তাদের মন্ত্র আনন্দের মন্ত্র, সব চেয়ে বড়ো বৈরাগ্যের মন্ত্র।

ওহে কবি, তা হলে তুমি আমাকে কী করতে বল।

উঠতে বলি মহারাজ, চলতে বলি। ঐ-যে কান্না, ও-যে প্রাণের কাছে প্রাণের আহ্বান। কিছু করতে পারব কি না সে পরের কথা— কিন্তু ডাক শুনে যদি ভিতরে সাড়া না দেয়, প্রাণ যদি না দুলে ওঠে তবে অকর্তব্য হল ব'লে ভাবনা নয়, তবে ভাবনা মরেছি ব'লে।

কিন্তু মরবই যে কবিশেখর, আজ হোক আর কাল হোক।

কে বললে মহারাজ, মিথ্যা কথা। যখন দেখছি বেঁচে আছি তখন জানছি যে বাঁচবই; যে আপনার সেই বাঁচাটাকে সব দিক থেকে যাচাই করে দেখলে না সে-ই বলে মরব— সে-ই বলে "নলিনীদলগত জলমতি তরলং তদ্বৎ জীবনমতিশয় চপলং।"

কী বল হে কবি, জীবন চপল নয়?

চপল বৈকি, কিন্তু অনিত্য নয়। চপল জীবনটা চিরদিন চপলতা করতে করতেই চলবে। মহারাজ, আজ তুমি তার চপলতা বন্ধ ক'রে মরবার পালা অভিনয় আরম্ভ করতে বসেছ।

ঠিক বলছ কবি? আমরা বাঁচবই?

বাঁচবই।

যদি বাঁচবই তবে বাঁচার মতো করেই বাঁচতে হবে— কী বল।

হাঁ, মহারাজ।

প্রতিহারী!

কী মহারাজ।

ডাকো, ডাকো, মন্ত্রীকে এখনই ডাকো।

কী মহারাজ।

মন্ত্রী, আমাকে এতক্ষণ বসিয়ে রেখেছ কেন।

ব্যস্ত ছিলুম।

কিসে।

বিজয়বর্মাকে বিদায় করে দিতে।

কী মুশকিল। বিদায় করবে কেন। যুদ্ধের পরামর্শ আছে যে।

চীনের সম্রাটের দূতের জন্যে বাহনের ব্যবস্থা—

কেন, বাহন কিসের।

মহারাজের তো দর্শন হবে না, তাই তাঁকে ফিরিয়ে দেবার—

মন্ত্রী, আশ্চর্য করলে দেখছি— রাজকার্য কি এমনি করেই চলবে। হঠাৎ তোমার হল কী।

তার পরে আমাদের কবিশেখরের বাসা ভাঙবার জন্যে লোকের সন্ধান করছিলুম— আর তো কেউ রাজি হয় না, কেবল দিঙনাগের বংশে যাঁরা অলংকারের আর ব্যাকরণশাস্ত্রের টোল খুলেছেন তাঁরা দলে দলে শাবল হাতে ছুটে আসছেন।

সর্বনাশ! মন্ত্রী, পাগল হলে নাকি। কবিশেখরের বাসা ভেঙে দেবে?

ভয় নেই মহারাজ, বাসাটা একেবারে ভাঙতে হবে না। শ্রুতিভূষণ খবর পেয়েই স্থির করেছেন কবিশেখরের ঐ বাসাটা আজ থেকে তিনিই দখল করবেন।

কী বিপদ। সরস্বতী যে তা হলে তাঁর বীণাখানা আমার মাথার উপর আছড়ে ভেঙে ফেলবেন। না, না, সে হবে না।

আর-একটা কাজ ছিল—শ্রুতিভূষণকে কাঞ্চনপুরের সেই বৃহৎ জনপদটা—

ওহো, সেই জনপদটার দানপত্র তৈরি হয়েছে বুঝি? সেটা কিন্তু আমাদের এই কবিশেখরকে—

সে কী কথা মহারাজ। আমার পুরস্কার তো জনপদ নয়— আমরা জনপদের সেবা তো কখনো করি নি— তাই ঐ পদপ্রাপ্তিটা আশাও করি নে।

আচ্ছা, তবে ওটা শ্রুতিভূষণের জন্যই থাক্।

আর, মহারাজ, দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজাদের বিদায় করবার জন্যে সৈন্যদলকে আহ্বান করেছি।

মন্ত্রী, আজ দেখছি পদে পদে তোমার বুদ্ধির বিভ্রাট ঘটছে। দুর্ভিক্ষকাতর প্রজাদের বিদায় করবার ভালো উপায় অন্ন দিয়ে, সৈন্য দিয়ে নয়।

মহারাজ!

কী প্রতিহারী।

বৈরাগ্যবারিধি নিয়ে শ্রুতিভূষণ এসেছেন।

সর্বনাশ করলে! ফেরাও তাকে ফেরাও। মন্ত্রী, দেখো হঠাৎ যেন শ্রুতিভূষণ না এসে পড়ে। আমার দুর্বল মন, হয়তো সামলাতে পারব না, হয়তো অন্যমনস্ক হয়ে বৈরাগ্যবারিধির ডুব-জলে গিয়ে পড়ব। ওহে কবিশেখর, আমাকে কিছুমাত্র সময় দিয়ো না— প্রাণটাকে জাগিয়ে রাখো— একটা যা-হয়-কিছু করো— যেমন এই ফাল্গুনের হাওয়াটা যা-খুশি-তাই করছে তেমনিতরো। হাতে কিছু তৈরি আছে হে? একটা নাটক, কিংবা প্রকরণ, কিংবা রূপক, কিংবা ভান, কিংবা—

তৈরি আছে— কিন্তু সেটা নাটক, কি প্রকরণ, কি রূপক, কি ভান তা ঠিক বলতে পারব না।

যা রচনা করেছ তার অর্থ কি কিছু গ্রহণ করতে পারব।

না মহারাজ। রচনা তো অর্থগ্রহণ করবার জন্যে নয়।

তবে?

সেই রচনাকেই গ্রহণ করবার জন্যে। আমি তো বলেছি আমার এ-সব জিনিস বাঁশির মতো, বোঝবার জন্যে নয়, বাজবার জন্যে।

বল কী হে কবি, এর মধ্যে তত্ত্বকথা কিছুই নেই?

কিচ্ছু না।

তবে তোমার ও-রচনাটা বলছে কী।

ও বলছে, আমি আছি। শিশু জন্মাবামাত্র চেঁচিয়ে ওঠে, সেই কান্নার মানে জানেন মহারাজ? শিশু হঠাৎ শুনতে পায় জল-স্থল-আকাশ তাকে চার দিক থেকে ব'লে উঠেছে— "আমি আছি।"— তারই উত্তরে ঐ প্রাণটুকু সাড়া পেয়ে ব'লে ওঠে— "আমি আছি।" আমার রচনা সেই সদ্যোজাত শিশুর কান্না, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ডাকের উত্তরে প্রাণের সাড়া।

তার বেশি আর কিচ্ছু না?

কিচ্ছু না। আমার রচনার মধ্যে প্রাণ ব'লে উঠেছে, সুখে দুঃখে, কাজে বিশ্রামে, জন্মে মৃত্যুতে, জয়ে পরাজয়ে, লোকে লোকান্তরে জয়— এই আমি-আছির জয়, জয়— এই আনন্দময় আমি-আছির জয়।

ওহে কবি, তত্ত্ব না থাকলে আজকের দিনে তোমার এ জিনিস চলবে না।

সে কথা সত্য মহারাজ। আজকের দিনের আধুনিকেরা উপার্জন করতে চায়, উপলব্ধি করতে চায় না। ওরা বুদ্ধিমান।

তা হলে শ্রোতা কাদের ডাকা যায়। আমার রাজবিদ্যালয়ের নবীন ছাত্রদের ডাকব কি।

না মহারাজ, তারা কাব্য শুনেও তর্ক করে। নতুন-শিং-ওঠা হরিণশিশুর মতো ফুলের গাছকেও গুঁতো মেরে মেরে বেড়ায়।

তবে?

ডাক দেবেন যাদের চুলে পাক ধরেছে।

সে কী কথা কবি।

হাঁ মহারাজ, সেই প্রৌঢ়দেরই যৌবনটি নিরাসক্ত যৌবন। তারা ভোগবতী পার হয়ে আনন্দলোকের ডাঙা দেখতে পেয়েছে। তারা আর ফল চায় না, ফলতে চায়।

ওহে কবি, তবে তো এতদিন পরে ঠিক আমার কাব্য শোনবার বয়েস হয়েছে। বিজয়বর্মাকেও ডাকা যাক।

ডাকুন।

চীন-সম্রাটের দূতকে?

ডাকুন।

আমার শ্বশুর এসেছেন শুনছি—

তাঁকে ডাকতে পারেন— কিন্তু শ্বশুরের ছেলেগুলির সম্বন্ধে সন্দেহ আছে।
তাই ব'লে শ্বশুরের মেয়ের কথাটা ভুলো না কবি।
আমি ভুললেও তাঁর সম্বন্ধে ভুল হবার আশঙ্কা নেই।
আর শ্রুতিভূষণকে ?
না মহারাজ, তাঁর প্রতি তো আমার কিছুমাত্র বিদ্বেষ নেই, তাঁকে কেন দুঃখ দিতে যাব।
কবি, তা হলে প্রস্তুত হও গে।
না মহারাজ, আমি অপ্রস্তুত হয়েই কাজ করতে চাই। বেশি বানাতে গেলেই সত্য ছাই-চাপা পড়ে।
চিত্রপট—
চিত্রপটে প্রয়োজন নেই— আমার দরকার চিত্তপট— সেইখানে শুধু সুরের তুলি বুলিয়ে ছবি জাগাব।
এ নাটকে গান আছে নাকি।
হাঁ মহারাজ, গানের চাবি দিয়েই এর এক-একটি অঙ্কের দরজা খোলা হবে।
গানের বিষয়টা কী।
শীতের বস্ত্রহরণ।
এ তো কোনো পুরাণে পড়া যায় নি।
বিশ্বপুরাণে এই গীতের পালা আছে। ঋতুর নাট্যে বৎসরে বৎসরে শীত-বুড়োটার ছদ্মবেশ খসিয়ে তার বসন্ত-রূপ প্রকাশ করা হয়, দেখি পুরাতনটাই নূতন।
এ তো গেল গানের কথা, বাকিটা ?
বাকিটা প্রাণের কথা।
সে কী রকম।
যৌবনের দল একটা বুড়োর পিছনে ছুটে চলেছে। তাকে ধরবে বলে পণ। গুহার মধ্যে ঢুকে যখন ধরলে তখন—
তখন কী দেখলে।
কী দেখলে সেটা যথাসময়ে প্রকাশ হবে।
কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারলুম না। তোমার গানের বিষয় আর তোমার নাট্যের বিষয়টা আলাদা নাকি।
না মহারাজ, বিশ্বের মধ্যে বসন্তের যে লীলা চলছে আমাদের প্রাণের মধ্যে যৌবনের সেই একই লীলা। বিশ্বকবির সেই গীতিকাব্য থেকেই তো ভাব চুরি করেছি।
তোমার নাটকের প্রধান পাত্র কে কে।
এক হচ্ছে সর্দার।
সে কে।
যে আমাদের কেবলই চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আর-একজন হচ্ছে চন্দ্রহাস।
সে কে।
যাকে আমরা ভালোবাসি— আমাদের প্রাণকে সে-ই প্রিয় করেছে।
আর কে আছে।
দাদা— প্রাণের আনন্দটাকে যে অনাবশ্যক বোধ করে, কাজটাকেই যে সার মনে করেছে।
আর কেউ আছে ?
আর আছে এক অন্ধ বাউল।
অন্ধ ?
হাঁ মহারাজ, চোখ দিয়ে দেখে না ব'লেই সে তার দেহ মন প্রাণ সমস্ত দিয়ে দেখে।
তোমার নাটকের প্রধান পাত্রদের মধ্যে আর কে আছে।

আপনি আছেন।

আমি!

হাঁ মহারাজ, আপনি যদি এর ভিতরে না থেকে বাইরেই থাকেন তা হলে কবিকে গাল দিয়ে বিদায় ক'রে ফের শ্রুতিভূষণকে নিয়ে বৈরাগ্যবারিধির চৌপদী ব্যাখ্যায় মন দেবেন। তা হলে মহারাজের আর মুক্তির আশা নেই। স্বয়ং বিশ্বকবি হার মানবেন— ফাল্গুনের দক্ষিণ হাওয়া দক্ষিণা না পেয়েই বিদায় হবে।

ফাল্গুনী

প্রথম দৃশ্যের গীতি-ভূমিকা
নবীনের আবির্ভাব

১
বেণুবনের গান

ওগো দখিন হাওয়া, পথিক হাওয়া,
দোদুল দোলায় দাও দুলিয়ে।
নূতন পাতার পুলক-ছাওয়া
পরশখানি দাও বুলিয়ে।
আমি পথের ধারের ব্যাকুল বেণু
হঠাৎ তোমার সাড়া পেনু,
আহা, এসো আমার শাখায় শাখায়
প্রাণের গানের ঢেউ তুলিয়ে।

ওগো দখিন হাওয়া, পথিক হাওয়া,
পথের ধারে আমার বাসা।
জানি তোমার আসা-যাওয়া,
শুনি তোমার পায়ের ভাষা।
আমায় তোমার ছোঁওয়া লাগলে পরে
একটুকুতেই কাঁপন ধরে,
আহা, কানে-কানে একটি কথায়
সকল কথা নেয় ভুলিয়ে॥

২
পাখির নীড়ের গান

আকাশ আমায় ভরল আলোয়,
আকাশ আমি ভরব গানে।
সুরের আবীর হানব হাওয়ায়,
নাচের আবীর হাওয়ায় হানে।

ওরে পলাশ, ওরে পলাশ,
রাঙা রঙের শিখায় শিখায়
দিকে দিকে আগুন জ্বলাস,
আমার মনের রাগরাগিণী
রাঙা হল রঙিন তানে।
দখিন হাওয়ায় কুসুমবনের
বুকের কাঁপন থামে না যে।
নীল আকাশে সোনার আলোয়
কচি পাতার নূপুর বাজে।
ওরে শিরীষ, ওরে শিরীষ,
মৃদু হাসির অন্তরালে
গন্ধজালে শূন্য ঘিরিস।
তোমার গন্ধ আমার কণ্ঠে
আমার হৃদয় টেনে আনে॥

৩

ফুলন্ত গাছের গান

ওগো নদী, আপন বেগে
পাগল-পারা,
আমি স্তব্ধ চাঁপার তরু
গন্ধভরে তন্দ্রাহারা।
আমি সদা অচল থাকি,
গভীর চলা গোপন রাখি,
আমার চলা নবীন পাতায়,
আমার চলা ফুলের ধারা।

ওগো নদী, চলার বেগে
পাগল-পারা,
পথে পথে বাহির হয়ে
আপন-হারা।
আমার চলা যায় না বলা,
আলোর পানে প্রাণের চলা,
আকাশ বোঝে আনন্দ তার,
বোঝে নিশার নীরব তারা॥

প্রথম দৃশ্য

সূত্রপাত

পথ

যুবকদলের প্রবেশ

গান

ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে বনে বনে—
ডালে ডালে ফুলে ফলে পাতায় পাতায় রে,
আড়ালে আড়ালে কোণে কোণে।
রঙে রঙে রঙিল আকাশ,
গানে গানে নিখিল উদাস,
যেন চল-চঞ্চল নব পল্লবদল
মর্মরে মোর মনে মনে।
ফাগুন লেগেছে বনে বনে।

হেরো হেরো অবনীর রঙ্গ
গগনের করে তপোভঙ্গ।
হাসির আঘাতে তার মৌন রহে না আর
কেঁপে কেঁপে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে।
বাতাস ছুটিছে বনময় রে,
ফুলের না জানে পরিচয় রে।
তাই বুঝি বারে বারে কুঞ্জের দ্বারে দ্বারে
শুধায়ে ফিরিছে জনে জনে।
ফাগুন লেগেছে বনে বনে ॥

ফাগুনের গুণ আছে রে ভাই, গুণ আছে।

বুঝলি কী করে।

নইলে আমাদের এই দাদাকে বাইরে টেনে আনে কিসের জোরে।

তাই তো— দাদা আমাদের চৌপদীছন্দের বোঝাই নৌকো— ফাগুনের গুণে বাঁধা পড়ে কাগজ-কলমের উলটো মুখে উজিয়ে চলেছে।

চন্দ্রহাস। ওরে ফাগুনের গুণ নয় রে। আমি চন্দ্রহাস, দাদার তুলট কাগজের হলদে পাতাগুলো পিয়াল বনের সবুজ পাতার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছি ; দাদা খুঁজতে বের হয়েছে।

তুলট কাগজগুলো গেছে আপদ গেছে, কিন্তু দাদার সাদা চাদরটা তো কেড়ে নিতে হচ্ছে।

চন্দ্রহাস। তাই তো, আজ পৃথিবীর ধুলোমাটি পর্যন্ত শিউরে উঠেছে আর এ পর্যন্ত দাদার গায়ে বসন্তর আমেজ লাগল না!

দাদা। আহা, কী মুশকিল। বয়েস হয়েছে যে।

পৃথিবীর বয়েস অন্তত তোমার চেয়ে কম নয়, কিন্তু নবীন হতে ওর লজ্জা নেই।

চন্দ্রহাস। দাদা, তুমি বসে বসে চৌপদী লিখছ, আর এই চেয়ে দেখো, সমস্ত জল স্থল কেবল নবীন হবার তপস্যা করছে।

দাদা, তুমি কোটরে বসে কবিতা লেখ কী করে।

দাদা। আমার কবিতা তো তোদের কবিশেখরের কল্পমঞ্জরীর মতো শৌখিন কাব্যের ফুলের চাষ

নয় যে কেবল বাইরের হাওয়ায় দোল খাবে। এতে সার আছে রে, ভার আছে।

যেমন কচু। মাটির দখল ছাড়ে না।

দাদা। শোন্ তবে বলি—

ঐ রে দাদা এবার চৌপদী বের করবে।

এল রে এল চৌপদী এল। আর ঠেকানো গেল না।

ভো ভো পথিকবৃন্দ, সাবধান, দাদার মত্ত চৌপদী চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

চন্দ্রহাস। না দাদা, তুমি ওদের কথায় কান দিয়ো না। শোনাও তোমার চৌপদী। কেউ না টিকতে পারে আমি শেষ পর্যন্ত টিকে থাকব। আমি ওদের মতো কাপুরুষ নই।

আচ্ছা বেশ, আমরাও শুনব।

যেমন করে পারি শুনবই।

খাড়া দাঁড়িয়ে শুনব। পালাব না।

চৌপদীর চোট যদি লাগে তো বুকে লাগবে, পিঠে লাগবে না।

কিন্তু দোহাই দাদা, একটা। তার বেশি নয়।

দাদা। আচ্ছা, তবে তোরা শোন্—

বংশে শুধু বংশী যদি বাজে
বংশ তবে ধ্বংস হবে লাজে।
বংশ নিঃস্ব নহে বিশ্বমাঝে
যেহেতু সে লাগে বিশ্বকাজে।

আর-একটু ধৈর্য ধরো ভাই, এর মানেটা—

আবার মানে!

একে চৌপদী—তার উপর আবার মানে।

দাদা। একটু বুঝিয়ে দিই— অর্থাৎ বাঁশে যদি কেবলমাত্র বাঁশিই বাজত তা হলে—

না, আমরা বুঝব না।

কোনোমতেই বুঝব না।

কার সাধ্য আমাদের বোঝায়।

আমরা কিচ্ছু বুঝব না ব'লেই আজ বেরিয়ে পড়েছি।

আজ কেউ যদি আমাদের জোর ক'রে বোঝাতে চায় তা হলে আমরা জোর ক'রে ভুল বুঝব।

দাদা। ও শ্লোকটার অর্থ হচ্ছে এই যে, বিশ্বের হিত যদি না করি তবে—

তবে? তবে বিশ্ব হাঁপ ছেড়ে বাঁচে।

দাদা। ঐ কথাটাকেই আর-একটু স্পষ্ট করে বলেছি—

অসংখ্য নক্ষত্র জ্বলে সশঙ্ক নিশীথে।
অম্বরে লম্বিত তারা লাগে কার হিতে।
শূন্যে কোন্ পুণ্য আছে আলোক বাঁটিতে।
মর্তে এলে কর্মে লাগে মাটিতে হাঁটিতে।

ওহে, তবে আমাদের কথাটাকেও আর-একটু পষ্ট ক'রে বলতে হল দেখছি। ধরো, দাদাকে ধরো—ওকে আড়কোলা ক'রে নিয়ে চলো ওর কোটরে।

দাদা। তোরা অত ব্যস্ত হচ্ছিস কেন বল্ তো। বিশেষ কাজ আছে?

বিশেষ কাজ।

অত্যন্ত জরুরি।

দাদা। কাজটা কী শুনি।

বসন্তের ছুটিতে আমাদের খেলাটা কী হবে তাই খুঁজে বের করতে বেরিয়েছি।
দাদা। খেলা ? দিনরাতই খেলা ?

গান

সকলে। মোদের যেমন খেলা তেমনি যে কাজ
জানিস নে কি ভাই।
তাই কাজকে কভু আমরা না ডরাই।
খেলা মোদের লড়াই করা,
খেলা মোদের বাঁচা মরা,
খেলা ছাড়া কিছুই কোথাও নাই।

ঐ যে আমাদের সর্দার আসছে ভাই।
আমাদের সর্দার !
সর্দার। কী রে, ভারি গোল বাধিয়েছিস যে।
চন্দ্রহাস। তাই বুঝি থাকতে পারলে না ?
সর্দার। বেরিয়ে আসতে হল।
ঐ জন্যেই গোল করি।
সর্দার। ঘরে বুঝি টিকতে দিবি নে ?
তুমি ঘরে টিকলে আমরা বাইরে টিকি কী করে।
চন্দ্রহাস। এতবড়ো বাইরেটা পত্তন করতে তো চন্দ্র সূর্য তারা কম খরচ হয় নি, এটাকে আমরা যদি কাজে লাগাই তবে বিধাতার মুখরক্ষা হবে।
সর্দার। তোদের কথাটা কী হচ্ছে বল্ তো।
কথাটা হচ্ছে এই—
মোদের যেমন খেলা তেমনি যে কাজ
জানিস নে কি ভাই।

সর্দার। খেলতে খেলতে ফুটেছে ফুল,
খেলতে খেলতে ফল যে ফলে,
খেলারই ঢেউ জলে স্থলে।
ভয়ের ভীষণ রক্তরাগে।
খেলার আগুন যখন লাগে
ভাঙাচোরা জ্ব'লে যে হয় ছাই।

সকলে। মোদের যেমন খেলা তেমনি যে কাজ
জানিস নে কি ভাই॥
আমাদের এই খেলাটাতেই দাদার আপত্তি।
দাদা। কেন আপত্তি করি বলব ? শুনবি ?
বলতে পারো দাদা, কিন্তু শুনব কি না তা বলতে পারি নে।
দাদা। সময় কাজেরই বিত্ত, খেলা তাহে চুরি।
সিঁধ কেটে দণ্ডপল লহ ভুরি ভুরি।
কিন্তু চোরাধন নিয়ে নাহি হয় কাজ।
তাই তো খেলারে বিজ্ঞ দেয় এত লাজ।

চন্দ্রহাস। বল কী তুমি দাদা। সময় জিনিসটাই যে খেলা, কেবল চলে যাওয়াই তার লক্ষ্য।
দাদা। তা হলে কাজটা?
চন্দ্রহাস। চলার বেগে যে ধুলো ওড়ে কাজটা তাই, ওটা উপলক্ষ।
দাদা। আচ্ছা সর্দার, তুমি এর নিষ্পত্তি করে দাও।
সর্দার। আমি কিছুরই নিষ্পত্তি করি নে। সংকট থেকে সংকটে নিয়ে চলি— ঐ আমার সর্দারি।
দাদা। সব জিনিসের সীমা আছে কিন্তু তোদের যে কেবলই ছেলেমান্‌ষি!
তার কারণ, আমরা যে কেবলই ছেলেমানুষ! সব জিনিসের সীমা আছে কেবল ছেলেমান্‌ষির সীমা নেই।

দাদাকে ঘেরিয়া নৃত্য

দাদা। তোদের কি কোনোকালেই বয়েস হবে না।
না, হবে না বয়েস, হবে না।
বুড়ো হয়ে মরব, তবু বয়েস হবে না।
বয়েস হলেই সেটাকে মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে নদী পার করে দেব।
মাথা মুড়োবার খরচ লাগবে না ভাই— তার মাথাভরা টাক!

গান

আমাদের পাকবে না চুল গো—মোদের
পাকবে না চুল।
আমাদের ঝরবে না ফুল গো—মোদের
ঝরবে না ফুল।
আমরা ঠেকব না তো কোনো শেষে,
ফুরয় না পথ কোনো দেশে রে।
আমাদের ঘুচবে না ভুল গো—মোদের
ঘুচবে না ভুল।

সর্দার। আমরা নয়ন মুদে করব না ধ্যান,
করব না ধ্যান।
নিজের মনের কোণে খুঁজব না জ্ঞান।
খুঁজব না জ্ঞান,
আমরা ভেসে চলি স্রোতে স্রোতে
সাগরপানে শিখর হতে রে,
আমাদের মিলবে না কূল গো— মোদের
মিলবে না কূল ॥

এই উঠতি বয়সেই দাদার যেরকম মতিগতি, তাতে কোন্ দিন উনি সেই বুড়োর কাছে মন্তর নিতে যাবেন— আর দেরি নেই।
সর্দার। কোন্ বুড়ো রে।
চন্দ্রহাস। সেই যে মান্ধাতার আমলের বুড়ো। কোন্ গুহার মধ্যে তলিয়ে থাকে, মরবার নাম করে না।
সর্দার। তার খবর তোরা পেলি কোথা থেকে।
যার সঙ্গে দেখা হয় সবাই তার কথা বলে।

পুঁথিতে তার কথা লেখা আছে।

সর্দার। তার চেহারাটা কী রকম।

কেউ বলে, সে সাদা, মড়ার মাথার খুলির মতো ; কেউ বলে, সে কালো, মড়ার চোখের কোটরের মতো।

কেন, তুমি কি তার খবর রাখ না সর্দার।

সর্দার। আমি তাকে বিশ্বাস করি নে।

বাঃ, তুমি যে উলটো কথা বললে। সেই বুড়োই তো সব চেয়ে বেশি করে আছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পাঁজরের ভিতরে তার বাসা।

পণ্ডিতজি বলে, বিশ্বাস যদি কাউকে না করতে হয় সে কেবল আমাদের। আমরা আছি কি নেই তার কোনো ঠিকানাই নেই।

চন্দ্রহাস। আমরা যে ভারি কাঁচা, আমরা যে একেবারে নতুন, ভবের রাজ্যে আমাদের পাকা দলিল কোথায়।

সর্দার। সর্বনাশ করলে দেখছি। তোরা পণ্ডিতের কাছে আনাগোনা শুরু করেছিস নাকি।

তাতে ক্ষতি কী সর্দার।

সর্দার। পুঁথির বুলির দেশে ঢুকলে যে একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে যাবি। কার্তিকমাসের সাদা কুয়াশার মতো। তোদের মনের মধ্যে একটুও রক্তের রঙ থাকবে না। আচ্ছা, এক কাজ কর্। তোরা খেলার কথা ভাবছিলি ?

হাঁ সর্দার, ভাবনায় আমাদের চোখে ঘুম ছিল না।

আমাদের ভাবনার চোটে পাড়ার লোক রাজদরবারে নালিশ করতে ছুটেছিল।

সর্দার। একটা নতুন খেলা বলতে পারি।

বলো, বলো, বলো।

সর্দার। তোরা সবাই মিলে বুড়োটাকে ধরে নিয়ে আয়।

নতুন বটে, কিন্তু এটা ঠিক খেলা কি না জানি নে।

সর্দার। আমি বলছি, এ তোরা পারবি নে।

পারব না ? বল কী। নিশ্চয়ই পারব।

সর্দার। কখনো পারবি নে।

আচ্ছা যদি পারি ?

সর্দার। তা হলে গুরু ব'লে আমি তোদের মানব।

গুরু ! সর্বনাশ ! আমাদের সুদ্ধ বুড়ো বানিয়ে দেবে ?

সর্দার। তবে কী চাস্ বল্।

তোমার সর্দারি আমরা কেড়ে নেব।

সর্দার। তা হলে তো বাঁচি রে ! তোদের সর্দারি কি সোজা কাজ। এমনই অস্থির করে রেখেছিস যে হাড়গুলো সুদ্ধ উলটো-পালটা হয়ে গেছে।—তা হলে রইল কথা ?

চন্দ্রহাস। হাঁ, রইল কথা। দোলপূর্ণিমার দিনে তাকে ঝোলার উপর দোলাতে দোলাতে তোমার কাছে হাজির করে দেব।

কিন্তু তাকে নিয়ে কী করবে সর্দার।

সর্দার। বসন্ত-উৎসব করব।

বল কী। তা হলে যে আমের বোলগুলো ধরতে ধরতেই আঁটি হয়ে যাবে।

আর কোকিলগুলো পেঁচা হয়ে সব লক্ষ্মীর খোঁজে বেরবে।

চন্দ্রহাস। আর ভ্রমরগুলো অনুস্বার বিসর্গের চোটে বাতাসটাকে ঘুলিয়ে দিয়ে মন্তর জপতে থাকবে।

সর্দার। আর তোদের খুলিটা সুবুদ্ধিতে এমনই বোঝাই হবে যে এক পা নড়তে পারবি নে।

সর্বনাশ!

সর্দার। আর ঐ ঝুমকো-লতায় যেমন গাঁঠে গাঁঠে ফুল ধরেছে তেমনই তোদের গাঁঠে গাঁঠে বাত ধরবে।

সর্বনাশ!

সর্দার। আর তোরা সবাই নিজের দাদা হয়ে নিজের কান মলতে থাকবি।

সর্বনাশ!

সর্দার। আর—

আর কাজ কী সর্দার। থাক্ বুড়োধরা খেলা। ওটা বরঞ্চ শীতের দিনেই হবে। এবার তোমাকে নিয়েই—

সর্দার। তোদের দেখছি আগে থাকতেই বুড়োর ছোঁয়াচ লেগেছে।

কেন, কী লক্ষণটা দেখলে।

সর্দার। উৎসাহ নেই? গোড়াতেই পেছিয়ে গেলি? দেখ্‌ই-না কী হয়।

আচ্ছা বেশ। রাজি।

চল্ রে, সব চল্।

বুড়োর খোঁজে চল্।

যেখানে পাই তাকে পাকা চুলটার মতো পট্ করে উপড়ে আনব।

শুনেছি উপড়ে আনার কাজে তারই হাত পাকা। নিড়ুনি তার প্রধান অস্ত্র।

ভয়ের কথা রাখ্। খেলতেই যখন বেরলুম তখন ভয়, চৌপদী, পণ্ডিত, পুঁথি, এ-সব ফেলে যেতে হবে।

গান

আমাদের ভয় কাহারে।
বুড়ো বুড়ো চোর ডাকাতে
কী আমাদের করতে পারে।
আমাদের রাস্তা সোজা, নাইকো গলি,
নাইকো ঝুলি, নাইকো থলি,
ওরা আর যা কাড়ে কাড়ুক, মোদের
পাগ্‌লামি কেউ কাড়বে না রে।
আমরা চাই নে আরাম, চাই নে বিরাম,
চাই নে যে ফল, চাই নে রে নাম,
মোরা ওঠায় পড়ায় সমান নাচি,
সমান খেলি জিতে হারে—
আমাদের ভয় কাহারে॥

দ্বিতীয় দৃশ্যের গীতি-ভূমিকা
প্রবীণের দ্বিধা

১

দুরন্ত প্রাণের গান

আমরা খুঁজি খেলার সাথি ।
ভোর না হতে জাগাই তাদের
ঘুমায় যারা সারা রাতি ।
আমরা ডাকি পাখির গলায়,
আমরা নাচি বকুলতলায়,
মন ভোলাবার মন্ত্র জানি,
হাওয়াতে ফাঁদ আমরা পাতি ।

মরণকে তো মানি নে রে,
কালের ফাঁসি ফাঁসিয়ে দিয়ে
লুঠ-করা ধন নিই যে কেড়ে ।
আমরা তোমার মনোচোরা,
ছাড়ব না গো তোমায় মোরা,
চলেছ কোন্ আঁধার-পানে
সেথাও জ্বলে মোদের বাতি ॥

২

শীতের বিদায়-গান

ছাড়্ গো তোরা ছাড়্ গো,
আমি চলব সাগর-পার গো ।
বিদায়-বেলায় এ কী হাসি,
ধরলি আগমনীর বাঁশি ।
যাবার সুরে আসার সুরে
করলি একাকার গো ।

সবাই আপনপানে
আমায় আবার কেন টানে ।
পুরানো শীত পাতা-ঝরা,
তারে এমন নূতন-করা ?
মাঘ মরিল ফাগুন হয়ে
খেয়ে ফুলের মার গো ॥

৩

নবযৌবনের গান

আমরা নূতন প্রাণের চর।
আমরা থাকি পথে ঘাটে
নাই আমাদের ঘর।
নিয়ে পক্ক পাতার পুঁজি
পালাবে শীত ভাবছ বুঝি।
ও-সব কেড়ে নেব, উড়িয়ে দেব
দখিন হাওয়ার 'পর।

তোমায় বাঁধব নূতন ফুলের মালায়
বসন্তের এই বন্দীশালায়।
জীর্ণ জরার ছদ্মরূপে
এড়িয়ে যাবে চুপে চুপে ?
তোমার সকল ভূষণ ঢাকা আছে
নাই যে অগোচর গো॥

৪

উদ্‌ভ্রান্ত শীতের গান

ছাড়্ গো আমায় ছাড়্ গো--
আমি চলব সাগর-পার গো।
রঙের খেলার, ভাই রে,
আমার সময় হাতে নাই রে।
তোমাদের ওই সবুজ ফাগে
চক্ষে আমার ধাঁদা লাগে,
আমায় তোদের প্রাণের দাগে
দাগিস নে ভাই, আর গো॥

দ্বিতীয় দৃশ্য

সন্ধান

ঘাট

ওগো ঘাটের মাঝি, ঘাটের মাঝি, দরজা খোলো।

মাঝি। কেন গো, তোমরা কাকে চাও।

আমরা বুড়োকে খুঁজতে বেরিয়েছি।

মাঝি। কোন্ বুড়োকে।

চন্দ্রহাস। কোন্-বুড়োকে না। বুড়োকে।

মাঝি। তিনি কে।

চন্দ্রহাস। আহা, আদ্যিকালের বুড়ো।

মাঝি। ও, বুঝেছি। তাকে নিয়ে করবে কী।

বসন্ত-উৎসব করব।

মাঝি। বুড়োকে নিয়ে বসন্ত-উৎসব! পাগল হয়েছ?

পাগল হঠাৎ হই নি। গোড়া থেকেই এই দশা।

আর অন্তিম পর্যন্তই এই ভাব।

গান

আমাদের খেপিয়ে বেড়ায় যে
কোথায় লুকিয়ে থাকে রে।
ছুটল বেগে ফাগুন হাওয়া
কোন্ খেপামির নেশায় পাওয়া।
ঘূর্ণা হাওয়ায় ঘুরিয়ে দিল সূর্যতারাকে।

মাঝি। ওহে, তোমাদের হাওয়ার জোর আছে— দরজায় ধাক্কা লাগিয়েছে।

এখন সেই বুড়োটার খবর দাও।

মাঝি। সেই যে বুড়িটা রাস্তার মোড়ে ব'সে চরকা কাটে তাকে জিজ্ঞাসা করলে হয় না?

জিজ্ঞাসা করেছিলুম— সে বলে, সামনে দিয়ে কত ছায়া যায়, কত ছায়া আসে, কাকেই বা চিনি।

ও যে একই জায়গায় ব'সে থাকে, ও কারও ঠিকানা জানে না।

মাঝি, তুমি ঘাটে ঘাটে অনেক ঘুরেছ, তুমি নিশ্চয় বলতে পার কোথায় সেই—

মাঝি। ভাই, আমার ব্যাবসা হচ্ছে পথ ঠিক করা— কাদের পথ, কিসের পথ, সে আমার জানবার দরকার হয় না। আমার দৌড় ঘাট পর্যন্ত, ঘর পর্যন্ত না।

আচ্ছা চলো তো, পথগুলো পরখ করে দেখা যাক।

গান

কোন্ খেপামির তালে নাচে
পাগল সাগরনীর।
সেই তালে যে পা ফেলে যাই,
রইতে নারি স্থির।
চল্ রে সোজা, ফেল্ রে বোঝা,
রেখে দে তোর রাস্তা খোঁজা,
চলার বেগে পায়ের তলায়
রাস্তা জেগেছে॥

মাঝি। ঐ যে কোটাল আসছে, ওকে জিজ্ঞাসা করলে হয়— আমি পথের খবর জানি, ও পথিকের খবর জানে।

ওহে কোটাল হে, কোটাল হে।

কোটাল। কে গো, তোমরা কে।

আমাদের যা দেখছ তাই, পরিচয় দেবার কিছুই নেই।

কোটাল। কী চাই।

চন্দ্রহাস। বুড়োকে খুঁজতে বেরিয়েছি।

কোটাল। কোন্ বুড়োকে।

সেই চিরকালের বুড়োকে।

কোটাল। এ তোমাদের কেমন খেয়াল। তোমরা খোঁজ তাকে ? সে-ই তো তোমাদের খোঁজ করছে।

চন্দ্রহাস। কেন বলো তো।

কোটাল। সে নিজের হিমরক্তটা গরম করে নিতে চায়, তপ্ত যৌবনের 'পরে তার বড়ো লোভ।

চন্দ্রহাস। আমরা তাকে কষে গরম করে দেব, সে-ভাবনা নেই। এখন দেখা পেলে হয়। তুমি তাকে দেখেছ ?

কোটাল। আমার রাতের বেলার পাহারা — দেখি ঢের লোক, চেহারা বুঝি নে। কিন্তু বাপু, তাকেই সকলে বলে ছেলেধরা, উলটে তোমরা তাকে ধরতে চাও— এটা যে পুরো পাগলামি।

দেখেছ ? ধরা পড়েছি। পাগলামিই তো। চিনতে দেরি হয় না।

কোটাল। আমি কোটাল, পথ-চলতি যাদের দেখি সবাই এক ছাঁদের। তাই অদ্ভুত কিছু দেখলেই চোখে ঠেকে।

ঐ শোনো ! পাড়ার ভদ্রলোকমাত্রই ঐ কথা বলে— আমরা অদ্ভুত।

আমরা অদ্ভুত বৈকি, কোনো ভুল নেই।

কোটাল। কিন্তু তোমরা ছেলেমান্‌ষি করছ।

ঐ রে, আবার ধরা পড়েছি। দাদাও ঠিক ঐ কথাই বলে।

অতি প্রাচীন কাল থেকে আমরা ছেলেমান্‌ষিই করছি।

ওতে আমরা একেবারে পাকা হয়ে গেছি।

চন্দ্রহাস। আমাদের এক সর্দার আছে, সে ছেলেমান্‌ষিতে প্রবীণ। সে নিজের খেয়ালে এমনি হুহু করে চলেছে যে তার বয়েসটা কোন্ পিছনে খসে পড়ে গেছে, হুঁশ নেই।

কোটাল। আর তোমরা ?

আমরা সব বয়সের গুটি-কাটা প্রজাপতি।

কোটাল। (জনান্তিকে মাঝির প্রতি) পাগল রে, একেবারে উন্মাদ পাগল !

মাঝি। বাপু, এখন তোমরা কী করবে।

চন্দ্রহাস। আমরা যাব।

কোটাল। কোথায়।

চন্দ্রহাস। সেটা আমরা ঠিক করি নি।

কোটাল। যাওয়াটাই ঠিক করেছ কিন্তু কোথায় যাবে সেটা ঠিক কর নি ?

চন্দ্রহাস। সেটা চলতে চলতে আপনি ঠিক হয়ে যাবে।

কোটাল। তার মানে কী হল।

তার মানে হচ্ছে—

গান

চলি গো, চলি গো, যাই গো চলে।
পথের প্রদীপ জ্বলে গো
গগন-তলে।
বাজিয়ে চলি পথের বাঁশি,
ছড়িয়ে চলি চলার হাসি,
রঙিন বসন উড়িয়ে চলি
জলে স্থলে।

কোটাল। তোমরা বুঝি কথার জবাব দিতে হলে গান গাও ?

হাঁ। নইলে ঠিক জবাবটা বেরয় না। সাদা কথায় বলতে গেলে ভারি অস্পষ্ট হয়, বোঝা যায় না।

কোটাল। তোমাদের বিশ্বাস, তোমাদের গানগুলো খুব পষ্ট?
চন্দ্রহাস। হাঁ, ওতে সুর আছে কিনা।

গান

পথিক ভুবন ভালোবাসে
পথিকজনে রে।
এমন সুরে তাই সে ডাকে
ক্ষণে ক্ষণে রে।
চলার পথের আগে আগে
ঋতুর ঋতুর সোহাগ জাগে,
চরণঘায়ে মরণ মরে
পলে পলে॥

কোটাল। কোনো সহজ মানুষকে তো কথা বলতে বলতে গান গাইতে শুনি নি।
আবার ধরা পড়ে গেছি রে, আমরা সহজ মানুষ না।
কোটাল। তোমাদের কোনো কাজকর্ম নেই বুঝি?
না। আমাদের ছুটি।
কোটাল। কেন বলো তো।
চন্দ্রহাস। পাছে সময় নষ্ট হয়।
কোটাল। এটা তো বোঝা গেল না।
ঐ দেখো— তা হলে আবার গান ধরতে হল।
কোটাল। না, তার দরকার নেই। আর বেশি বোঝবার আশা রাখি নে।
সবাই আমাদের বোঝবার আশা ছেড়ে দিয়েছে।
কোটাল। এমন হলে তোমাদের চলবে কী করে।
চন্দ্রহাস। আর তো কিছুই চলবার দরকার নেই— শুধু আমরাই চলি।
কোটাল। (মাঝির প্রতি) পাগল রে! উন্মাদ পাগল!
চন্দ্রহাস। এই যে এতক্ষণ পরে দাদা আসছে।
কী দাদা, পিছিয়ে পড়েছিলে কেন।

চন্দ্রহাস। ওরে আমরা চলি উনপঞ্চাশ বায়ুর মতো, আমাদের ভিতরে পদার্থ কিছুই নেই; আর দাদা চলে শ্রাবণের মেঘ— মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়িয়ে ভারমোচন করতে হয়। পথের মধ্যে ওকে শ্লোকরচনায় পেয়েছিল।

দাদা। চন্দ্রহাস, দৈবাৎ তোমার মুখে এই উপমাটি উপাদেয় হয়েছে। ওর মধ্যে একটু সার কথা আছে। আমি ওটি চৌপদীতে গেঁথে নিচ্ছি।

চন্দ্রহাস। না, না, এখন থাক্ দাদা। আমরা কাজে বেরিয়েছি। তোমার চৌপদীর চার পা, কিন্তু চলবার বেলা এতবড়ো খোঁড়া জন্তু জগতে দেখতে পাওয়া যায় না।

দাদা। আপনি কে।
মাঝি। আমি ঘাটের মাঝি।
দাদা। আর আপনি?
কোটাল। আমি পাড়ার কোটাল।
দাদা। তা উত্তম হল— আপনাদের কিছু শোনাতে ইচ্ছা করি। বাজে জিনিস না— কাজের কথা।
মাঝি। বেশ, বেশ। আহা, বলেন, বলেন।
কোটাল। আমাদের গুরু বলেছিলেন, ভালো কথা বলবার লোক অনেক মেলে কিন্তু ভালো কথা

যে-মরদ খাড়া দাঁড়িয়ে শুনতে পারে তাকেই শাবাশ। ওটা ভাগ্যের কথা কিনা। তা, বলো ঠাকুর, বলো।

দাদা। আজ পথে যেতে যেতে দেখলুম, রাজপুরুষ একজন বন্দীকে নিয়ে চলেছে। শুনলুম, সে কোনো শ্রেষ্ঠী, তার টাকার লোভেই রাজা মিথ্যা ছুতো করে তাকে ধরেছে। শুনে আমি নিকটেই মুদির দোকানে বসে এই শ্লোকটি রচনা করেছি। দেখো বাপু, আমি বানিয়ে একটি কথাও লিখি নে। আমি যা লিখব রাস্তায় ঘাটে তা মিলিয়ে নিতে পারবে।

ঠাকুর, কী লিখেছ শুনি।

দাদা।

আত্মরস লক্ষ্য ছিল ব'লে
ইক্ষু মরে ভিক্ষুর কবলে।
ওরে মূর্খ, ইহা দেখি শিক্ষ—
ফল দিয়ে রক্ষা পায় বৃক্ষ।

বুঝেছ ? রস জমায় বলেই ইক্ষু বেটা মরে, যে গাছ ফল দেয় তাকে তো কেউ মারে না।

কোটাল। ওহে মাঝি, খাসা লিখেছে হে !

মাঝি। ভাই কোটাল, কথাটির মধ্যে সার আছে।

কোটাল। শুনলে মানুষের চৈতন্য হয়। আমাদের কায়েতের পো এখানে থাকলে ওটা লিখে নিতুম রে। পাড়ায় খবর পাঠিয়ে দে।

সর্বনাশ করলে ,রে :

চন্দ্রহাস। ও ভাই মাঝি, তুমি যে বললে আমাদের সঙ্গে বেরবে, দাদার চৌপদী জমলে তো আর—

মাঝি। আরে রসুন মশায়, পাগলামি রেখে দিন। ঠাকুরকে পেয়েছি, দুটো ভালো কথা শুনে নিই— বয়েস হয়ে এল, কোন্ দিন মরব।

ভাই, সেইজন্যেই তো বলছি, আমাদের সঙ্গ পেয়েছ, ছেড়ো না।

চন্দ্রহাস। দাদাকে চিরদিনই পাবে কিন্তু আমরা একবার ম'লে বিধাতা দ্বিতীয়বার আর এমন ভুল করবেন না।

(বাহির হইতে) ওগো কোটাল, কোটাল, কোটাল !

কে রে ! অনাথ কলু দেখছি। কী হয়েছে।

কলু। সেই যে ছেলেটাকে পুষেছিলুম, তাকে বুঝি কাল রাত্রে ভুলিয়ে নিয়ে গেছে সেই ছেলেধরা।

কোন্ ছেলেধরা।

কলু। সেই বুড়ো।

চন্দ্রহাস। বুড়ো ? বলিস কী রে।

কলু। আপনারা অত খুশি হন কেন।

ওটা আমাদের একটা বিশ্রী স্বভাব। আমরা খামকা খুশি হয়ে উঠি।

কোটাল। পাগল ! একেবারে উন্মাদ পাগল !

চন্দ্রহাস। তাকে তুমি দেখেছ হে ?

কলু। বোধ হয় কাল রাত্রে তাকেই দূর থেকে দেখেছিলুম।

কী রকম চেহারাটা।

কলু। কালো, আমাদের এই কোটাল দাদার চেয়েও। একেবারে রাত্রের সঙ্গে মিশিয়ে গেছে। আর বুকে দুটো চক্ষু জোনাক-পোকার মতো জ্বলছে।

ওহে, বসন্ত-উৎসবে তো মানাবে না।

চন্দ্রহাস। ভাবনা কী। তেমন যদি দেখি তবে এবার নাহয় পূর্ণিমায় উৎসব না করে অমাবস্যায়

করা যাবে। অমাবস্যার বুকে তো চোখের অভাব নেই।

কোটাল। ওহে বাপু, তোমরা ভালো কাজ করছ না।

না, আম্‌রা ভালো কাজ করছি নে।

আবার ধরা পড়েছি রে, আমরা ভালো কাজ করছি নে।

কী করব, অভ্যাস নেই।

যেহেতু আমরা ভালোমানুষ নই।

কোটাল। এ কি ঠাট্টা পেয়েছ। এতে বিপদ আছে।

বিপদ ? সেইটেই তো ঠাট্টা।

গান

ভালোমানুষ নই রে মোরা
ভালোমানুষ নই।
গুণের মধ্যে ওই আমাদের
গুণের মধ্যে ওই।
দেশে দেশে নিন্দে রটে,
পদে পদে বিপদ ঘটে,
পুঁথির কথা কই নে মোরা
উলটো কথা কই।

কোটাল। ওহে বাপু, তোমরা যে কোন্ সর্দারের কথা বলছিলে, সে গেল কোথায়। সে সঙ্গে থাকলে যে তোমাদের সামলাতে পারত।

সে সঙ্গে থাকে না পাছে সামলাতে হয়।

সে আমাদের পথে বের করে দিয়ে নিজে সরে দাঁড়ায়।

কোটাল। এ তার কেমনতরো সর্দারি।

চন্দ্রহাস। সর্দারি করে না বলেই তাকে সর্দার করেছি।

কোটাল। দিব্যি সহজ কাজটি তো সে পেয়েছে।

চন্দ্রহাস। না ভাই, সর্দারি করা সহজ, সর্দার হওয়া সহজ নয়।

গান

জন্ম মোদের ত্র্যহস্পর্শে,
সকল অনাসৃষ্টি।
ছুটি নিলেন বৃহস্পতি,
রইল শনির দৃষ্টি।
অযাত্রাতে নৌকো ভাসা,
রাখি নে ভাই ফলের আশা,
আমাদের আর নাই যে গতি
ভেসেই চলা বৈ॥

দাদা, চলো তবে, বেরিয়ে পড়ি।

কোটাল। না না, ঠাকুর, ওদের সঙ্গে কোথায় মরতে যাবে।

মাঝি। তুমি আমাদের শোলোক শোনাও, পাড়ার মানুষ সব এল বলে। এ-সব কথা শোনা ভালো।

দাদা। না ভাই, এখান থেকে আমি নড়ছি নে।

তা হলে আমরা নড়ি। পাড়ার মানুষ আমাদের সইতে পারে না।

পাড়াকে আমরা নাড়া দিই, পাড়া আমাদের তাড়া দেয়।

ঐ যে চৌপদীর গন্ধ পেয়েছে, মউমাছির গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে।

পাড়ার লোক। ওরে মাঝির এখানে পাঠ হবে।

কে গো। তোমরাই পাঠ করবে নাকি।

আমরা অন্য অনেক অসহ্য উৎপাত করি কিন্তু পাঠ করি নে।

ঐ পুণ্যের জোরেই আমরা রক্ষা পাব।

পাড়ার লোক। এরা বলে কী রে। হেঁয়ালি নাকি।

চন্দ্রহাস। আমরা যা নিজে বুঝি তাই বলি ; হঠাৎ হেঁয়ালি বলে ভ্রম হয়। আর তোমরা যা খুবই বোঝ দাদা তাই তোমাদের বুঝিয়ে বলবে, হঠাৎ গভীর জ্ঞানের কথা বলে মনে হবে।

একজন বালকের প্রবেশ

বালক। আমি পারলুম না। কিছুতে তাকে ধরতে পারলুম না।

কাকে ভাই।

বালক। ঐ তোমরা যে-বুড়োর খোঁজ করছিলে তাকে।

তাকে দেখেছ নাকি।

বালক। সে বোধ হয় রথে চড়ে গেল।

কোন্ দিকে।

বালক। কিছুই ঠাওরাতে পারলুম না। কিন্তু তার চাকার ঘূর্ণিহাওয়ায় এখনো ধুলো উড়ছে।

চল্ তবে চল্।

শুকনো পাতায় আকাশ ছেয়ে দিয়ে গেছে।

[প্রস্থান

কোটাল। পাগল ! উন্মাদ পাগল !

তৃতীয় দৃশ্যের গীতি-ভূমিকা

প্রবীণের পরাভব

১

বসন্তের হাসির গান

ওর ভাব দেখে যে পায় হাসি। হায় হায় রে।
মরণ-আয়োজনের মাঝে
বসে আছেন কিসের কাজে
প্রবীণ প্রাচীন প্রবাসী। হায় হায় রে।
এবার দেশে যাবার দিনে
আপনাকে ও নিক-না চিনে,
সবাই মিলে-সাজাও ওকে
নবীন রূপের সন্ন্যাসী। হায় হায় রে।
এবার ওকে মজিয়ে দে রে
হিসাব-ভুলের বিষম ফেরে।

কেড়ে নে ওর থলি-থালি,
আয় রে নিয়ে ফুলের ডালি,
গোপন প্রাণের পাগলাকে ওর
বাইরে দে আজ প্রকাশি। হায় হায় রে ॥

২

আসন্ন মিলনের গান

আর নাই যে দেরি, নাই যে দেরি।
সামনে সবার পড়ল ধরা
তুমি যে ভাই আমাদেরি।
হিমের বাহু-বাঁধন টুটি
পাগলা ঝোরা পাবে ছুটি,
উত্তরে এই হাওয়া তোমার
বইবে উজান কুঞ্জ ঘেরি।

আর নাই যে দেরি, নাই যে দেরি।
শুনছ না কি জলে স্থলে
জাদুকরের বাজল ভেরি।
দেখছ না কি এই আলোকে
খেলছে হাসি রবির চোখে,
সাদা তোমার শ্যামল হবে
ফিরব মোরা তাই যে হেরি ॥

তৃতীয় দৃশ্য

সন্দেহ

মাঠ

সবাই বলে ঐ, ঐ, ঐ— তার পরে চেয়ে দেখলেই দেখা যায় শুধু ধুলো আর শুকনো পাতা।
তার রথের ধ্বজাটা মেঘের মধ্যে যেন একবার দেখা দিয়েছিল।
কিন্তু দিক ভুল হয়ে যায়। এই ভাবি পুবে, এই ভাবি পশ্চিমে।
এমনি করে সমস্ত দিন ধুলো আর ছায়ার পিছনে ঘুরে ঘুরেই হয়রান হয়ে গেলুম। বেলা যে গেল রে ভাই, বেলা যে গেল!
সত্যি কথা বলি, যতই বেলা যাচ্ছে ততই মনে ভয় ঢুকছে।
মনে হচ্ছে, ভুল করেছি।
সকালবেলাকার আলো কানে কানে বললে, শাবাশ, এগিয়ে চলো— বিকেলবেলাকার আলো তাই নিয়ে ভারি ঠাট্টা করছে।
ঠকলুম বুঝি রে!
দাদার চৌপদীগুলোর উপরে ক্রমে শ্রদ্ধা বাড়ছে।
ভয় হচ্ছে আমরাও চৌপদী লিখতে বসে যাব— বড়ো দেরি নেই।
আর পাড়ার লোক আমাদের ঘিরে বসবে।

আর এমনি তাদের ভয়ানক উপকার হতে থাকবে যে, তারা এক পা নড়বে না।
আমরা রাত্রিবেলাকার পাথরের মতো ঠাণ্ডা হয়ে বসে থাকব।
আর তারা আমাদের চার দিকে কুয়াশার মতো ঘন হয়ে জমবে।
ও ভাই, আমাদের সর্দার এ-সব কথা শুনলে বলবে কী।
ওরে, আমার ক্রমে বিশ্বাস হচ্ছে সর্দারই আমাদের ঠকিয়েছে। সে আমাদের মিথ্যে ফাঁকি দিয়ে খাটিয়ে নেয়, নিজে সে কুঁড়ের সর্দার।
ফিরে চল্ রে। এবার সর্দারের সঙ্গে লড়ব।
বলব, আমরা চলব না— দুই পা কাঁধের উপর মুড়ে বসব। পা দুটো লক্ষ্মীছাড়া, পথে পথেই ঘুরে মরল।
হাত দুটোকে পিছনের দিকে বেঁধে রাখব।
পিছনের কোনো বালাই নেই রে, যত মুশকিল এই সামনেটাকে নিয়ে।
শরীরে যতগুলো অঙ্গ আছে তার মধ্যে পিঠটাই সত্যি কথা বলে। সে বলে চিত হয়ে পড়্, চিত হয়ে পড়্।
কাঁচা বয়সে বুকটা বুক ফুলিয়ে চলে কিন্তু পরিণামে সেই পিঠের উপরেই ভর— পড়তেই হয় চিত হয়ে।
গোড়াতেই যদি চিতপাত দিয়ে শুরু করা যেত তা হলে মাঝখানে উৎপাত থাকত না রে।
আমাদের গ্রামের ছায়ার নীচে দিয়ে সেই যে ইরা নদী বয়ে চলেছে তার কথা মনে পড়ছে ভাই।
সেদিন মনে হয়েছিল, সে বলছে, চল্, চল্, চল্— আজ মনে হচ্ছে ভুল শুনেছিলুম, সে বলছে, ছল, ছল, ছল। সংসারটা সবই ছল রে!
সে কথা আমাদের পণ্ডিত গোড়াতেই বলেছিল।
এবারে ফিরে গিয়েই একেবারে সোজা সেই পণ্ডিতের চণ্ডীমণ্ডপে।
পুঁথি ছাড়া আর এক পা চলা নয়।
কী ভুলটাই করেছিলুম। ভেবেছিলুম চলাটাই বাহাদুরি। কিন্তু না-চলাই যে গ্রহ নক্ষত্র জল হাওয়া সমস্তর উলটো। সেটাই তো তেজের কথা হল।
ওরে বীর, কোমর বাঁধ্ রে— আমরা চলব না।
ওরে পালোয়ান, তাল ঠুকে বসে পড়্, আমরা চলব না।
চলচ্চিত্তং চলদ্বিত্তং— আমাদের চিত্তেও কাজ নেই, বিত্তেও কাজ নেই; আমরা চলব না।
চলজ্জীবনযৌবনং— আমাদের জীবনও থাক্, যৌবনও থাক্, আমরা চলব না।
যেখান থেকে যাত্রা শুরু করেছি ফিরে চল্।
না রে, সেখানে ফিরতে হলেও চলতে হবে।
তবে?
তবে আর কী। যেখানে এসে পড়েছি এইখানেই বসে পড়ি।
মনে করি এইখানেই বরাবর বসে আছি।
জন্মাবার ঢের আগে থেকে।
মরার ঢের পরে পর্যন্ত।
ঠিক বলেছিস্, তা হলে মনটা স্থির থাকবে। আর-কোথাও থেকে এসেছি জানলেই আর-কোথাও যাবার জন্যে মন ছটফট করে।
আর-কোথাওটা বড়ো সর্বনেশে দেশ রে!
সেখানে দেশটা সুদ্ধ চলে। তার পথগুলো চলে।
কিন্তু আমরা—

গান

মোরা চলব না।
মুকুল ঝরে ঝরুক, মোরা ফলব না।
সূর্য তারা আগুন ভুগে
জ্বলে মরুক যুগে যুগে,
আমরা যতই পাই-না জ্বালা
জ্বলব না।
বনের শাখা কথা বলে,
কথা জাগে সাগর-জলে,
এই ভুবনে আমরা কিছুই
বলব না।
কোথা হতে লাগে রে টান,
জীবনজলে ডাকে রে বান,
আমরা তো এই প্রাণের টলায়
টলব না॥

ওরে হাসি রে হাসি!

ঐ হাসি শোনা যাচ্ছে।

বাঁচা গেল, এতক্ষণে একটা হাসি শোনা গেল।

যেন গুমোটের ঘোমটা খুলে গেল।

এ যেন বৈশাখের এক পশলা বৃষ্টি।

কার হাসি ভাই।

শুনেই বুঝতে পারছিস নে, আমাদের চন্দ্রহাসের হাসি?

কী আশ্চর্য হাসি ওর।

যেন ঝরনার মতো, কালো পাথরটাকে ঠেলে নিয়ে চলে।

যেন সূর্যের আলো, কুয়াশার তাড়কা রাক্ষসীকে তলোয়ার দিয়ে টুকরো টুকরো করে কাটে।

যাক, আমাদের চৌপদীর ফাঁড়া কাটল। এবার উঠে পড়্।

এবার কাজ ছাড়া কথা নেই— চরাচরমিদং সর্বং কীর্তির্যস্য স জীবতি।

ও আবার কী রকম কথা হল। ঈশানকে এখনো চৌপদীর ভূত ছাড়ে নি।

কীর্তি? নদী কি নিজের ফেনাকে গ্রাহ্য করে। কীর্তি তো আমাদের ফেনা— ছড়াতে ছড়াতে চলে যাব। ফিরে তাকাব না।

এসো ভাই চন্দ্রহাস এসো, তোমার হাসিমুখ যে!

চন্দ্রহাস। বুড়োর রাস্তার সন্ধান পেয়েছি।

কার কাছ থেকে।

চন্দ্রহাস। এই বাউলের কাছ থেকে।

ও কী। ও যে অন্ধ!

চন্দ্রহাস। সেইজন্যে ওকে রাস্তা খুঁজতে হয় না, ও ভিতর থেকে দেখতে পায়।

কী হে ভাই, ঠিক নিয়ে যেতে পারবে তো?

বাউল। ঠিক নিয়ে যাব।

কেমন ক'রে।

বাউল। আমি যে পায়ের শব্দ শুনতে পাই।

কান তো আমাদেরও আছে, কিন্তু—

বাউল। আমি যে সব দিয়ে শুনি— শুধু কান দিয়ে না।

চন্দ্রহাস। রাস্তায় যাকে জিজ্ঞাসা করি বুড়োর কথা শুনলেই আঁতকে ওঠে, কেবল দেখি এরই ভয় নেই।

ও বোধ হয় চোখে দেখতে পায় না বলেই ভয় করে না।

বাউল। না গো, আমি কেন ভয় করি নে বলি। একদিন আমার দৃষ্টি ছিল। যখন অন্ধ হলুম ভয় হল দৃষ্টি বুঝি হারালুম। কিন্তু চোখওয়ালার দৃষ্টি অস্ত যেতেই অন্ধের দৃষ্টির উদয় হল। সূর্য যখন গেল তখন দেখি অন্ধকারের বুকের মধ্যে আলো। সেই অবধি অন্ধকারকে আমার আর ভয় নেই।

তা হলে এখন চলো। ঐ তো সন্ধ্যাতারা উঠেছে।

বাউল। আমি গান গাইতে গাইতে যাই, তোমরা আমার পিছনে পিছনে এসো। গান না গাইলে আমি রাস্তা পাই নে।

সে কী কথা হে।

বাউল। আমার গান আমাকে ছাড়িয়ে যায়— সে এগিয়ে চলে, আমি পিছনে চলি।

গান

ধীরে বন্ধু ধীরে ধীরে
চলো তোমার বিজন মন্দিরে।
জানি নে পথ, নাই যে আলো,
ভিতর বাহির কালোয় কালো,
তোমার চরণশব্দ বরণ করেছি
আজ এই অরণ্যগভীরে।

ধীরে বন্ধু ধীরে ধীরে।
চলো অন্ধকারের তীরে তীরে।
চলব আমি নিশীথরাতে
তোমার হাওয়ার ইশারাতে,
তোমার বসনগন্ধ বরণ করেছি
আজ এই বসন্তসমীরে॥

চতুর্থ দৃশ্যের গীতি-ভূমিকা

নবীনের জয়

১

প্রত্যাগত যৌবনের গান

বিদায় নিয়ে গিয়েছিলেম
বারে বারে।
ভেবেছিলেম ফিরব না রে।
এই তো আবার নবীন বেশে
এলেম তোমার হৃদয়-দ্বারে।
কে গো তুমি।— আমি বকুল;
কে গো তুমি।— আমি পারুল;

তোমরা কে বা ।— আমরা আমের মুকুল গো
এলেম আবার আলোর পারে ।

এবার যখন ঝরব মোরা
ধরার বুকে
ঝরব তখন হাসিমুখে ।
অফুরানের আঁচল ভ'রে
মরব মোরা প্রাণের সুখে ।
তুমি কে গো ।— আমি শিমুল ;
তুমি কে গো ।— কামিনী ফুল ;
তোমরা কে বা ।— আমরা নবীন পাতা গো
শালের বনে ভারে ভারে ॥

২

নূতন আশার গান

এই কথাটাই ছিলেম ভুলে—
মিলব আবার সবার সাথে
ফাল্গুনের এই ফুলে ফুলে ।

অশোক বনে আমার হিয়া
নূতন পাতায় উঠবে জিয়া,
বুকের মাতন টুটবে বাঁধন
যৌবনেরি কূলে কূলে
ফাল্গুনের এই ফুলে ফুলে ।

বাঁশিতে গান উঠবে পুরে
নবীন রবির বাণী-ভরা
আকাশবীণার সোনার সুরে ।
আমার মনের সকল কোণে
ভরবে গগন আলোক-ধনে,
কান্নাহাসির বন্যারই নীর
উঠবে আবার দুলে দুলে
ফাল্গুনের এই ফুলে ফুলে ॥

৩

বোঝাপড়ার গান

এবার তো যৌবনের কাছে
মেনেছ, হার মেনেছ ?
মেনেছি ।
আপন মাঝে নূতনকে আজ জেনেছ ?
জেনেছি ।

আবরণকে বরণ করে
ছিলে কাহার জীর্ণ ঘরে।
আপনাকে আজ বাহির করে এনেছ ?
এনেছি।
এবাব আপন প্রাণের কাছে
মেনেছ, হার মেনেছ ?
মেনেছি।
মরণ মাঝে অমৃতকে জেনেছ ?
জেনেছি।
লুকিয়ে তোমার অমরপুরী
ধুলা-অসুর করে চুরি,
তাহারে আজ মরণ আঘাত হেনেছ ?
হেনেছি ॥

৪

নবীন রূপের গান

এতদিন যে বসেছিলেম
পথ চেয়ে আর কাল গুনে,
দেখা পেলেম ফাল্গুনে।
বালক বীরের বেশে তুমি করলে বিশ্বজয়—
এ কী গো বিস্ময়।
অবাক আমি তরুণ গলার
গান শুনে।
গন্ধে উদাস হাওয়ার মতো
উড়ে তোমার উত্তরী,
কর্ণে তোমার কৃষ্ণচূড়ার মঞ্জরী।
তরুণ হাসির আড়ালে কোন
আগুন ঢাকা রয়—
এ কী গো বিস্ময়।
অস্ত্র তোমার গোপন রাখ
কোন্ তূণে ॥

চতুর্থ দৃশ্য

প্রকাশ

গুহাদ্বার

দেখ্ দেখি ভাই, আবার আমাদের ফেলে রেখে চন্দ্রহাস কোথায় গেল।
ওকে কি ধরে রাখবার জো আছে।
বসে বিশ্রাম করি আমরা, ও চ'লে বিশ্রাম করে।
অন্ধ বাউলকে নিয়ে সে নদীর ওপারে চলে গেছে।

আর কিছু নয়, ঐ অন্ধের অন্ধতার মধ্যে সেঁধিয়ে গিয়ে তবে ও ছাড়বে।

তাই আমাদের সর্দার ওকে ডুবুরি বলে।

চন্দ্রহাস একটু সরে গেলেই আর আমাদের খেলার রস থাকে না।

ও কাছে থাকলে মনে হয় কিছু হোক বা না হোক তবু মজা আছে। এমন-কি, বিপদের আশঙ্কা থাকলে মনে হয় সে আরো বেশি মজা।

আজ এই রাত্রে ওর জন্যে মনটা কেমন করছে।

দেখছিস এখানকার হাওয়াটা কেমনতরো ?

এখানে আকাশটা যেন যাবার বেলাকার বন্ধুর মতো মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

যারা সেখানে বলছিল চল্ চল্, তারা এখানে বলছে যাই যাই।

কথাটা একই, সুরটা আলাদা।

মনটার ভিতরে কেমন ব্যথা দিচ্ছে, তবু লাগছে ভালো।

ঝাউগাছের বীথিকার ভিতর দিয়ে কোথা থেকে এই একটা নদীর স্রোত চলে আসছে, এ যেন কোন্ দুপুররাতের চোখের জল।

পৃথিবীর দিকে এমন করে কখনো আমরা দেখি নি।

উর্ধ্বশ্বাসে যখন সামনে ছুটি তখন সামনের দিকেই চোখ থাকে; চার পাশের দিকে নয়।

বিদায়ের বাঁশিতে যখন কোমল ধৈবত লাগে তখনই সকলের দিকে চোখ মেলি।

আর দেখি বড়ো মধুর। যদি সবাই চলে চলে না যেত তা হলে কি কোনো মাধুরী চোখে পড়ত।

চলার মধ্যে যদি কেবলই তেজ থাকত তা হলে যৌবন শুকিয়ে যেত। তার মধ্যে কান্না আছে তাই যৌবনকে সবুজ দেখি।

এই জায়গাটাতে এসে শুনতে পাচ্ছি, জগৎটা কেবল পাব পাব বলছে না— সঙ্গে সঙ্গেই বলছে, ছাড়ব, ছাড়ব।

সৃষ্টির গোধূলিলগ্নে 'পাব'র সঙ্গে 'ছাড়ব'র বিয়ে হয়ে গেছে রে— তাদের মিল ভাঙলেই সব ভেঙে যাবে।

অন্ধ বাউল আমাদের এ কোন্ দেশে আনলে ভাই।

ঐ তারাগুলোর দিকে তাকাচ্ছি আর মনে হচ্ছে, যুগে যুগে যাদের ফেলে এসেছি তাদের অনিমেষ দৃষ্টিতে সমস্ত রাত একেবারে ছেয়ে রয়েছে।

ফুলগুলোর মধ্যে কারা বলছে মনে রেখো, মনে রেখো। তাদের নাম তো মনে নেই, কিন্তু মন যে উদাস হয়ে ওঠে।

একটা গান না গাইলে বুক ফেটে যাবে।

গান

তুই ফেলে এসেছিস কারে। (মন, মন রে আমার)
তাই জনম গেল, শান্তি পেলি না রে। (মন, মন রে আমার)
যে পথ দিয়ে চলে এলি
সে পথ এখন ভুলে গেলি,
কেমন করে ফিরবি তাহার দ্বারে। (মন, মন রে আমার)
নদীর জলে থাকি রে কান পেতে,
কাঁপে যে প্রাণ পাতার মর্মরেতে।
মনে হয় রে পাব খুঁজি
ফুলের ভাষা যদি বুঝি,
যে-পথ গেছে সন্ধ্যাতারার পারে॥ (মন, মন রে আমার)

এবার আমাদের বসন্ত-উৎসবে এ কী রকম সুর লাগছে।

এ যেন ঝরা পাতার সুর।

এতদিন বসন্ত তার চোখের জলটা আমাদের কাছে লুকিয়েছিল।

ভেবেছিল আমরা বুঝতে পারব না, আমরা যে যৌবনে দুরন্ত।

আমাদের কেবল হাসি দিয়ে ভুলোতে চেয়েছিল।

কিন্তু আজ আমরা আমাদের মনকে মজিয়ে নেব এই সমুদ্রপারের দীর্ঘনিশ্বাসে।

প্রিয়া, এই পৃথিবী আমাদের প্রিয়া। এই সুন্দরী পৃথিবী। সে চাচ্ছে আমাদের যা আছে সমস্তই— আমাদের হাতের স্পর্শ, আমাদের হৃদয়ের গান—

চাচ্ছে যা আমাদের আপনার মধ্যে আপনার কাছ থেকেও লুকিয়ে আছে।

ও যে কিছু পায় কিছু পায় না, এইজন্যেই ওর কান্না। পেতে পেতেই সব হারিয়ে যায়।

ওগো পৃথিবী, তোমাকে আমরা ফাঁকি দেব না।

গান

আমি যাব না গো অমনি চলে।
মালা তোমার দেব গলে।
অনেক সুখে অনেক দুখে
তোমার বাণী নিলেম বুকে,
ফাগুনশেষে যাবার বেলা
আমার বাণী যাব বলে।
কিছু হল, অনেক বাকি ;
ক্ষমা আমায় করবে না কি।
গান এসেছে, সুর আসে নাই
হল না যে শোনানো তাই,
সে-সুর আমার রইল ঢাকা
নয়নজলে নয়নজলে ॥

ও ভাই, কে যেন গেল বোধ হচ্ছে।

আরে, গেল গেল গেল, এ ছাড়া আর তো কিছুই বোধ হচ্ছে না।

আমার গায়ের উপর কোন্ পথিকের কাপড় ঠেকে গেল।

নিয়ে চলো পথিক, নিয়ে চলো তোমাব সঙ্গে, হাওয়া যেমন ফুলের গন্ধ নিয়ে যায়।

কাকে ধরে আনবার জন্যে বেরিয়েছিলুম, কিন্তু ধরা দেবার জন্যেই মন আকুল হল।

বাউলের প্রবেশ

এই যে আমাদের বাউল। আমাদের এ কোথায় এনেছ, এখানে সমস্ত পথিক-জগতের নিশ্বাস আমাদের গায়ে লাগছে— সমস্ত তারাগুলোর।

আমরা খেলাচ্ছলে বেরিয়েছিলুম কিন্তু খেলাটা যে কী তা ভুলেই গেছি।

আমরা তাকেই ধরতে বেরিয়েছিলুম পৃথিবীর মধ্যে যে বুড়ো।

রাস্তায় সবাই বললে সে ভয়ংকর। সে কেবলমাত্র একটা মুণ্ডু, একটা হাঁ, যৌবনের চাঁদকে গিলে খাবার জন্যেই তার একমাত্র লোভ।

কিন্তু ভয় ভেঙে গেছে। মনের ভিতর বলছে সে যদি আমাকে চায় তবে আমিও বসে থাকব না। ফুল যাচ্ছে, পাতা যাচ্ছে, নদীর জল যাচ্ছে— তার পিছন পিছন আমিও যাব।

ও ভাই বাউল, তোমার একতারাতে একটা সুর লাগাও। রাত কত হল কে জানে। হয়তো বা ভোর হয়ে এল।

বাউলের গান

সবাই যারে সব দিতেছে
তার কাছে সব দিয়ে ফেলি।
কবার আগে চাবার আগে
আপনি আমায় দেব মেলি।
নেবার বেলা হলেম ঋণী,
ভিড় করেছি, ভয় করি নি,
এখনো ভয় করব না রে,
দেবার খেলা এবার খেলি।
প্রভাত তারি সোনা নিয়ে
বেরিয়ে পড়ে নেচে-কুঁদে।
সন্ধ্যা তারে প্রণাম করে
সব সোনা তার দেয় রে শুধে।
ফোটা ফুলের আনন্দ রে
ঝরা ফুলেই ফলে ধরে,
আপনাকে ভাই ফুরিয়ে দেওয়া
চুকিয়ে দে তুই বেলাবেলি ॥

ওহে বাউল, চন্দ্রহাস এখনো এল না কেন।

বাউল। সে যে গেছে, তা জানো না?

গেছে? কোথায় গেছে।

বাউল। সে বললে, আমি তাকে জয় করে আনব।

কাকে।

বাউল। যাকে সবাই ভয় করে। সে বললে, নইলে আমার কিসের যৌবন।

বাঃ, এ তো বেশ কথা! দাদা গেল পাড়ার লোককে চৌপদী শোনাতে, আর চন্দ্রহাস কোথায় গেল ঠিকানাই নেই!

বাউল। সে বললে, যুগে যুগে মানুষ লড়াই করেছে, আজ বসন্তের হাওয়ায় তারই ঢেউ।

তারই ঢেউ?

বাউল। হাঁ। খবর এসেছে মানুষের লড়াই শেষ হয় নি।

বসন্তের এই কি খবর।

বাউল। যারা ম'রে অমর, বসন্তের কচি পাতায় তারাই পত্র পাঠিয়েছে। দিগ্‌দিগন্তে তারা রটাচ্ছে— "আমরা পথের বিচার করি নি— আমরা পাথেয়ের হিসাব রাখি নি— আমরা ছুটে এসেছি, আমরা ফুটে বেরিয়েছি। আমরা যদি ভাবতে বসতুম তা হলে বসন্তের দশা কী হত।"

চন্দ্রহাস তাই বুঝি খেপে উঠেছে?

বাউল। সে বললে—

গান

বসন্তে ফুল গাঁথল আমার
জয়ের মালা।
বইল প্রাণে দখিন হাওয়া
আগুন-জ্বালা।
পিছের বাঁশি কোণের ঘরে
মিছে রে ওই কেঁদে মরে,

মরণ এবার আনল আমার
বরণ-ডালা।
যৌবনেরই ঝড় উঠেছে
আকাশ পাতালে।
নাচের তালের ঝংকারে তার
আমায় মাতালে।
কুড়িয়ে নেবার ঘুচল পেশা,
উড়িয়ে দেবার লাগল নেশা,
আরাম বলে, "এল আমার
যাবার পালা।"

কিন্তু সে গেল কোথায়।

বাউল। সে বললে, আমি পথ চেয়ে চুপ করে বসে থাকতে পারব না। আমি এগিয়ে গিয়ে ধরব। আমি জয় করে আনব।

কিন্তু গেল কোন্ দিকে।

বাউল। সেই গুহার মধ্যে চলে গেছে।

সে কী কথা। সে যে ঘোর অন্ধকার।

কোনো খবর না নিয়েই একেবারে—

বাউল। সে নিজেই খবর নিতে গেছে।

ফিরবে কখন।

তুইও যেমন! সে কি আর ফিরবে।

কিন্তু চন্দ্রহাস গেলে আমাদের জীবনের রইল কী।

আমাদের সর্দারের কাছে কী জবাব দেব।

এবার সর্দারও আমাদের ছাড়বে।

যাবার সময় আমাদের কী বলে গেল সে।

বাউল। বললে, আমার জন্যে অপেক্ষা কোরো, আমি আবার ফিরে আসব।

ফিরে আসবে? কেমন করে জানব।

বাউল। সে তো বললে, আমি জয়ী হয়ে ফিরে আসব।

তা হলে আমরা সমস্ত রাত অপেক্ষা করে থাকব।

বাউল, কোথায় আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

বাউল। এই-যে গুহার ভিতর থেকে নদীর জল বেরিয়ে আসছে এরই মুখের কাছে।

ঐ গুহায় কোন্ রাস্তা দিয়ে গেল। ওখানে যে কালো খাঁড়ার মতো অন্ধকার।

বাউল। রাত্রের পাখিগুলোর ডানার শব্দ ধরে গেছে।

তুমি সঙ্গে গেলে না কেন।

বাউল। আমাকে তোমাদের আশ্বাস দেবার জন্যে রেখে গেল।

কখন গেছে বলো তো।

বাউল। অনেকক্ষণ— রাতের প্রথম প্রহরেই।

এখন বোধ হয় তিন প্রহর পেরিয়ে গেছে। কেমন একটা ঠাণ্ডা হাওয়া দিয়েছে— গা সির্ সির্ করছে।

দেখ্ ভাই, স্বপ্ন দেখেছি যেন তিন জন মেয়েমানুষ চুল এলিয়ে দিয়ে—

তোর স্বপ্নের কথা রেখে দে। ভালো লাগছে না।

সব লক্ষণগুলো কেমন খারাপ ঠেকছে।

পেঁচাটা ডাকছিল, এতক্ষণ কিছু মনে হয় নি— কিন্তু—
মাঠের ওপারে কুকুরটা কী রকম বিশ্রী সুরে চেঁচাচ্ছে শুনছিস!
ঠিক যেন তার পিঠের উপর ডাইনি সওয়ার হয়ে তাকে চাবকাচ্ছে।
যদি ফেরবার হত চন্দ্রহাস এতক্ষণে ফিরত।
রাতটা কেটে গেলে বাঁচা যায়।
শোন্ রে ভাই, ঐ মেয়েমানুষের কান্না!
ওরা তো কাঁদছেই—কেবল কাঁদছেই, অথচ কাউকে ধরে রাখতে পারছে না।
নাঃ, আর পারা যায় না—চুপ করে বসে থাকলেই যত কুলক্ষণ দেখা যায়।
চল্ আমরাও যাই—পথ চললেই ভয় থাকে না।
পথ দেখাবে কে।
ঐ যে বাউল আছে।
কী হে, তুমি পথ দেখাতে পারো?
বাউল। পারি।
বিশ্বাস করতে সাহস হয় না। তুমি চোখে না দেখে পথ বের কর শুধু গান গেয়ে?
তুমি চন্দ্রহাসকে কী রাস্তা দেখিয়ে দিলে। যদি সে ফিরে আসে তবে তোমাকে বিশ্বাস করব।
ফিরে যদি না আসে তা হলে কিন্তু—
চন্দ্রহাসকে যে আমরা এত ভালোবাসতুম তা জানতুম না।
এতদিন ওকে নিয়ে আমরা যা-খুশি তাই করেছি।
যখন খেলি তখন খেলাটাই হয় বড়ো, যার সঙ্গে খেলি তাকে নজর করি নে।
এবার যদি সে ফেরে, তাকে মুহূর্তের জন্যে অনাদর করব না।
আমার মনে হচ্ছে আমরা কেবলই তাকে দুঃখ দিয়েছি।
তার ভালোবাসা সব দুঃখকে ছাড়িয়ে উঠেছিল।
সে যে কী সুন্দর ছিল যখন তাকে চোখে দেখলুম তখন সেটা চোখে পড়ে নি।

গান

চোখের আলোয় দেখেছিলেম
চোখের বাহিরে।
অন্তরে আজ দেখব, যখন
আলোক নাহি রে।
ধরায় যখন দাও না ধরা
হৃদয় তখন তোমায় ভরা,
এখন তোমার আপন আলোয়
তোমায় চাহি রে।
তোমায় নিয়ে খেলেছিলেম
খেলার ঘরেতে।
খেলার পুতুল ভেঙে গেছে
প্রলয় ঝড়েতে।
থাক্ তবে সেই কেবল খেলা,
হোক-না এখন প্রাণের মেলা—
তারের বীণা ভাঙল, হৃদয়-
বীণায় গাহি রে॥

ঐ বাউলটা চুপ করে বসে থাকে, কথা কয় না, ভালো লাগছে না।

ও কেমন যেন একটা অলক্ষণ।
যেন কালবৈশাখীর প্রথম মেঘ।
দাও ভাই দাও, ওকে বিদায় করে দাও।
না, না, ও বসে আছে তবু একটা ভরসা আছে।
দেখছ না ওর মুখে কিচ্ছু ভয় নেই।
মনে হচ্ছে ওর কপালে যেন কী সব খবর আসছে।
ওর সমস্ত গা যেন অনেক দূরের কাকে দেখতে পাচ্ছে। ওর আঙুলের আগায় চোখ ছড়িয়ে আছে।
ওকে দেখলেই বুঝতে পারি কে আসছে অন্ধকারের ভিতর দিয়ে পথ করে।
ঐ দেখো, জোড়হাত করে উঠে দাঁড়িয়েছে।
পুবের দিকে মুখ করে কাকে প্রণাম করছে।
ওখানে তো কিচ্ছুই নেই— একটু আলোর রেখাও না।
একবার জিজ্ঞাসাই করো-না, ও কী দেখছে— কাকে দেখছে।
না, না, এখন ওকে কিছু বোলো না।
আমার কী মনে হচ্ছে জান? যেন ওর মধ্যে সকাল হয়েছে।
যেন ওর ভুরুর মাঝখানে অরুণের আলো খেয়া-নৌকোটির মতো এসে ঠেকেছে।
ওর মনটা ভোরবেলাকার আকাশের মতো চুপ।
এখনই যেন পাখির গানের ঝড় উঠবে— তার আগে সমস্ত থম্‌থমে।
ঐ-যে একটু একটু একতারাতে ঝংকার দিচ্ছে, ওর মন গান গাচ্ছে।
চুপ করো চুপ করো, ঐ গান ধরেছে।

বাউলের গান

হবে জয়, হবে জয়, হবে জয় রে
ওহে বীর, হে নির্ভয়।
জয়ী প্রাণ, চিরপ্রাণ,
জয়ী রে আনন্দগান,
জয়ী প্রেম, জয়ী ক্ষেম,
জয়ী জ্যোতির্ময় রে।
এ আঁধার হবে ক্ষয়, হবে ক্ষয় রে,
ওহে বীর, হে নির্ভয়।
ছাড়ো ঘুম, মেলো চোখ,
অবসাদ দূর হোক,
আশার অরুণালোক
হোক অভ্যুদয় রে॥

ঐ-যে!
চন্দ্রহাস, চন্দ্রহাস!
রোস্‌ রোস্‌, ব্যস্ত হোস্‌ নে— এখনো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না।
না, ও চন্দ্রহাস ছাড়া আর কেউ হতে পারে না।
বাঁচলুম, বাঁচলুম।
এসো এসো চন্দ্রহাস।
এতক্ষণ আমাদের ছেড়ে কী করলে ভাই বলো।

যাকে ধরতে গিয়েছিলে তাকে ধরতে পেরেছ ?
চন্দ্রহাস। ধরেছি, তাকে ধরেছি।
কই, তাকে তো দেখছি নে।
চন্দ্রহাস। সে আসছে— এখনই আসছে।
কী তুমি দেখলে আমাকে বলো ভাই।
চন্দ্রহাস। সে তো আমি বলতে পারব না।
কেন।
চন্দ্রহাস। সে তো আমি চোখ দিয়ে দেখি নি।
তবে ?
চন্দ্রহাস। আমার সব দিয়ে দেখেছিলুম।
তা হোক-না, বলো-না ভাই।
চন্দ্রহাস। আমার সমস্ত দেহ মন যদি কণ্ঠ হত বলতে পারত।
কাকে তুমি ধরেছ তাও কি বুঝতে পারলে না।
জগতের সেই বিরাট বুড়োটাকে ?
যে-বুড়োটা অগস্ত্যের মতো পৃথিবীর যৌবনসমুদ্র শুষে খেতে চায় ?
সেই যে ভয়ংকর ? যে অন্ধকারের মতো ? যার বুকে চোখ ?
যার পা উলটো দিকে ? যে পিছনে হেঁটে চলে ?
নরমুণ্ড যার গলায় ? শ্মশানে যার বাস ?
চন্দ্রহাস। আমি তো বলতে পারি নে। সে আসছে, এখনই তাকে দেখতে পাব।
ভাই বাউল, তুমি দেখেছ তাকে ?
বাউল। হাঁ, এই তো দেখছি।
কই।
বাউল। এই-যে।
ঐ-যে বেরিয়ে এল, বেরিয়ে এল।
ঐ-যে কে গুহা থেকে বেরিয়ে এল।
আশ্চর্য ! আশ্চর্য !
চন্দ্রহাস। এ কী, এ যে তুমি !
তুমি ! সেই আমাদের সর্দার !
আমাদের সর্দার রে !
বুড়ো কোথায়।
সর্দার। কোথাও তো নেই।
কোথাও না ?
সর্দার। না।
তবে সে কী।
সর্দার। সে স্বপ্ন।
চন্দ্রহাস। তবে তুমিই চিরকালের ?
সর্দার। হাঁ।
চন্দ্রহাস। আর আমরাই চিরকালের ?
সর্দার। হাঁ।

পিছন থেকে যারা তোমাকে দেখলে তারা যে তোমাকে কত লোকে কত রকম মনে করলে তার ঠিক নেই।

সেই ধুলোর ভিতর থেকে আমরা তো তোমাকে চিনতে পারি নি।
তখন তোমাকে হঠাৎ বুড়ো বলে মনে হল।
তার পর গুহার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলে। এখন মনে হচ্ছে যেন তুমি বালক।
যেন তোমাকে এই প্রথম দেখলুম।
চন্দ্রহাস। এ তো বড়ো আশ্চর্য! তুমি বারে বারেই প্রথম, তুমি ফিরে ফিরেই প্রথম।
ভাই চন্দ্রহাস, তোমারই হার হল। বুড়োকে ধরতে পারলে না।
চন্দ্রহাস। আর দেরি না—এবার উৎসব শুরু হোক। সূর্য উঠেছে।
ভাই বাউল, তুমি যদি অমন চুপ করে থাক তা হলে মূর্ছিত হয়ে পড়বে। একটা গান ধরো।

বাউলের গান

তোমায় নতুন করেই পাব বলে
হারাই ক্ষণে ক্ষণ,
ও মোর ভালোবাসার ধন।
দেখা দেবে বলে তুমি
হও যে অদর্শন,
ও মোর ভালোবাসার ধন।

ওগো তুমি আমার নও আড়ালেব,
তুমি আমার চিরকালের,
ক্ষণকালের লীলাব স্রোতে
হও যে নিমগন,
ও মোর ভালোবাসার ধন।

আমি তোমায় যখন খুঁজে ফিরি
ভয়ে কাঁপে মন,
প্রেমে আমার ঢেউ লাগে তখন।

তোমার শেষ নাহি, তাই শূন্য সেজে
শেষ করে দাও আপনাকে যে,
ওই হাসি রে দেয় ধুয়ে মোর
বিরহের রোদন,
ও মোর ভালোবাসার ধন॥

ঐ-যে গুন গুন শব্দ শোনা যাচ্ছে।
শুনছি বটে।
ও তো মধুকরের দল নয়, পাড়ার লোক।
তা হলে দাদা আসছে চৌপদী নিয়ে।
দাদা। সর্দার নাকি।
সর্দার। কী, দাদা।
দাদা। ভালোই হয়েছে। চৌপদীগুলো শুনিয়ে দিই।
না, না, গুলো নয়, গুলো নয়। একটা।

দাদা। আচ্ছা ভাই, ভয় নেই, একটাই হবে।

সূর্য এল পূর্বদ্বারে তূর্য বাজে তার।
রাত্রি বলে, ব্যর্থ নহে এ মৃত্যু আমার,
এত বলি পদপ্রান্তে করে নমস্কার।
ভিক্ষাঝুলি স্বর্ণে ভরি গেল অন্ধকার ॥

অর্থাৎ—
আবার অর্থাৎ!
না, এখানে অর্থাৎ চলবে না।
দাদা। এর মানে—
না, মানে না। মানে বুঝব না এই আমাদের প্রতিজ্ঞা।
দাদা। এমন মরিয়া হয়ে উঠলে কেন।
আজ আমাদের উৎসব।
দাদা। উৎসব নাকি। তা হলে আমি পাড়ায়—
চন্দ্রহাস। না, তোমাকে পাড়ায় যেতে দিচ্ছি নে।
দাদা। আমাকে দরকার আছে না কি।
আছে।
দাদা। আমার চৌপদী—
চন্দ্রহাস। তোমার চৌপদীকে আমরা এমনি রাঙিয়ে দেব যে তার অর্থ আছে কি না আছে বোঝা দায় হবে।
সুতরাং অর্থ না থাকলে মানুষের যে দশা হয় তোমার তাই হবে।
অর্থাৎ পাড়ার লোকে তোমাকে ত্যাগ করবে।
কোটাল তোমাকে বলবে অবোধ।
পণ্ডিত বলবে অর্বাচীন।
ঘরের লোক বলবে অনাবশ্যক।
বাইরের লোক বলবে অদ্ভুত।
চন্দ্রহাস। আমরা তোমার মাথায় পরাব নব পল্লবের মুকুট।
তোমার গলায় পরাব নব মল্লিকার মালা।
পৃথিবীতে এই আমরা ছাড়া আর কেউ তোমার আদর বুঝবে না।

সকলে মিলিয়া
উৎসবের গান

আয় রে তবে মাত্‌ রে সবে আনন্দে
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে।
পিছনপানের বাঁধন হতে
চল্‌ ছুটে আজ বন্যাস্রোতে,
আপনাকে আজ দখিন হাওয়ায়
ছড়িয়ে দে রে দিগন্তে,
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে।

বাঁধন যত ছিন্ন করো আনন্দে
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে।
অকূল প্রাণের সাগর-তীরে
ভয় কী রে তোর ক্ষয়-ক্ষতিরে।
যা আছে রে সব নিয়ে তোর
ঝাঁপ দিয়ে পড়্ অনন্তে
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে ॥

২০ ফাল্গুন ১৩২১

সহজে অভিনয়যোগ্য করিবার অভিপ্রায়ে অচলায়তন নাটকটি "গুরু" নামে এবং কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত এবং লঘুতর আকারে প্রকাশ করা হইল।

শান্তিনিকেতন
১লা ফাল্গুন
১৩২৪

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গুরু

১

অচলায়তন

একদল বালক

প্রথম। ওরে ভাই শুনেছিস?
দ্বিতীয়। শুনেছি— কিন্তু চুপ কর।
তৃতীয়। কেন বল দেখি?
দ্বিতীয়। কী জানি বললে যদি অপরাধ হয়?
প্রথম। কিন্তু উপাধ্যায়মশায় নিজে যে আমাকে বলেছেন।
তৃতীয়। কী বলেছেন বল-না।
প্রথম। গুরু আসছেন।
সকলে। গুরু আসছেন!
তৃতীয়। ভয় করছে না ভাই?
দ্বিতীয়। ভয় করছে।
প্রথম। আমার ভয় করছে না, মনে হচ্ছে মজা।
তৃতীয়। কিন্তু ভাই গুরু কী?
দ্বিতীয়। তা জানি নে।
তৃতীয়। কে জানে?
দ্বিতীয়। এখানে কেউ জানে না।
প্রথম। শুনেছি গুরু খুব বড়ো, খুব মস্ত বড়ো।
তৃতীয়। তা হলে এখানে কোথায় ধরবে?
প্রথম। পঞ্চকদাদা বলেন অচলায়তনে তাঁকে কোথাও ধরবে না।
তৃতীয়। কোথাও না?
প্রথম। কোথাও না।
তৃতীয়। তা হলে কী হবে?
প্রথম। ভারি মজা হবে।

[প্রস্থান

পঞ্চকের প্রবেশ

পঞ্চক। গান

তুমি ডাক দিয়েছ কোন্ সকালে কেউ তা জানে না।
আমার মন যে কাঁদে আপন মনে কেউ তা মানে না॥

ওরে ভাই, কে আছিস ভাই। কাকে ডেকে বলব, গুরু আসছেন।

সঞ্জীবের প্রবেশ

সঞ্জীব। তাই তো শুনেছি। কিন্তু কে এসে খবর দিলে বলো তো।

পঞ্চক। কে দিলে তা তো কেউ বলে না।

সঞ্জীব। কিন্তু গুরু আসছেন বলে তুমি তো তৈরি হচ্ছ না পঞ্চক?

পঞ্চক। বাঃ, সেইজন্যেই তো পুঁথিপত্র সব ফেলে দিয়েছি।

সঞ্জীব। সেই বুঝি তোমার তৈরি হওয়া?

পঞ্চক। আরে, গুরু যখন না থাকেন তখনই পুঁথিপত্র। গুরু যখন আসবেন তখন ঐ-সব জঞ্জাল সরিয়ে দিয়ে সময় খোলসা করতে হবে। আমি সেই পুঁথি বন্ধ করবার কাজে ভয়ানক ব্যস্ত।

সঞ্জীব। তাই তো দেখছি।

[প্রস্থান

পঞ্চক। গান

ফিরি আমি উদাস প্রাণে, তাকাই সবার মুখের পানে,
তোমার মতো এমন টানে কেউ তো টানে না।

ওহে জয়োত্তম, তুমি কাঁধে কিসের বোঝা নিয়ে চলেছ? বোঝা ফেলো। গুরু আসছেন যে।

জয়োত্তম। আরে ছুঁয়ো না; এ-সব মাঙ্গল্য। গুরুর জন্যে সিংহদ্বার সাজাতে চলেছি।

পঞ্চক। গুরু কোন্ দ্বার দিয়ে ঢুকবেন তা জানবে কী করে?

জয়োত্তম। তা তো বটেই। অচলায়তনে জানবার লোক কেবল তুমিই আছ।

পঞ্চক। তোমরাও জান না, আমিও জানি নে— তফাতটা এই যে, তোমরা বোঝা বয়ে মর, আমি হালকা হয়ে বসে আছি।

জয়োত্তম। আচ্ছা, এখন পথ ছাড়ো, আমার সময় নেই।

[প্রস্থান

পঞ্চক। গান

বেজে ওঠে পঞ্চমে স্বর, কেঁপে ওঠে বন্ধ এ ঘর,
বাহির হতে দুয়ারে কর কেউ তো হানে না।

মহাপঞ্চকের প্রবেশ

মহাপঞ্চক। গান! অচলায়তনে গান! মতিভ্রম হয়েছে!

পঞ্চক। এবার দাদা, স্বয়ং তোমাকেও গান ধরতে হবে। একধার থেকে মতিভ্রমের পালা আরম্ভ হল।

মহাপঞ্চক। আমি মহাপঞ্চক, গান ধরব! ঠাট্টা আমার সঙ্গে!

পঞ্চক। ঠাট্টা নয়। অচলায়তনে এবার মন্ত্র ঘুচে গান আরম্ভ হবে। এই বোবা পাথরগুলো থেকে সুর বেরোবে।

মহাপঞ্চক। কেন বলো তো?

পঞ্চক। গুরু আসছেন যে! তাই আমার কেবলই মন্তরে ভুল হচ্ছে।

মহাপঞ্চক। গুরু এলে তোমার জন্যে লজ্জায় মুখ দেখাতে পারব না।

পঞ্চক। তার জন্যে ভাবনা কী? নির্লজ্জ হয়ে একলা আমিই মুখ দেখাব।

মহাপঞ্চক। মন্তরে ভুল হলে গুরু তোমাকে আয়তন থেকে দূর করে দেবেন।

পঞ্চক। সেই ভরসাতেই তাঁর জন্যে অপেক্ষা করে আছি।

মহাপঞ্চক। অমিতায়ুর্ধারণী মন্ত্রটা—

পঞ্চক। সেই মন্ত্রটা স্বয়ং গুরুর কাছ থেকে শিখব বলেই তো আগাগোড়া ভোলবার চেষ্টায় আছি। সেইজন্যেই গান ধরেছি দাদা।

মহাপঞ্চক। ঐ শঙ্খ বাজল। এখন আমার সপ্তকুমারিকা গাথা পাঠের সময়। কিন্তু বলে যাচ্ছি, সময় নষ্ট কোরো না। গুরু আসছেন।

পঞ্চক। গান

আকাশে কার ব্যাকুলতা, বাতাস বহে কার বারতা,
এ পথে সেই গোপন কথা কেউ তো আনে না ॥

ও কী ও! কান্না শুনি যে! এ নিশ্চয়ই সুভদ্র। আমাদের এই অচলায়তনে ঐ বালকের চোখের জল আর শুকোল না। ওর কান্না আমি সইতে পারি নে।

প্রস্থান ও বালক সুভদ্রকে লইয়া পুনঃপ্রবেশ

পঞ্চক। তোর কোনো ভয় নেই ভাই, কোনো ভয় নেই। তুই আমার কাছে বল— কী হয়েছে বল।

সুভদ্র। আমি পাপ করেছি।

পঞ্চক। পাপ করেছিস! কী পাপ?

সুভদ্র। সে আমি বলতে পারব না। ভয়ানক পাপ। আমার কী হবে?

পঞ্চক। তোর সব পাপ আমি কেড়ে নেব, তুই বল।

সুভদ্র। আমি আমাদের আয়তনের উত্তর দিকের—

পঞ্চক। উত্তর দিকের?

সুভদ্র। হাঁ, উত্তর দিকের জানলা খুলে—

পঞ্চক। জানলা খুলে কী করলি?

সুভদ্র। বাইরেটা দেখে ফেলেছি।

পঞ্চক। দেখে ফেলেছিস? শুনে লোভ হচ্ছে যে।

সুভদ্র। হাঁ পঞ্চকদাদা। কিন্তু বেশিক্ষণ না— একবার দেখেই তখনই বন্ধ করে ফেলেছি। কোন প্রায়শ্চিত্ত করলে আমার পাপ যাবে?

পঞ্চক। ভুলে গেছি ভাই। প্রায়শ্চিত্ত বিশ-পঁচিশ হাজার রকম আছে; আমি যদি এই আয়তনে না আসতুম তা হলে তার বারো-আনাই কেবল পুঁথিতে লেখা থাকত— আমি আসার পর প্রায় তার সব-কটাই ব্যবহারে লাগাতে পেরেছি, কিন্তু মনে রাখতে পারি নি।

বালকদলের প্রবেশ

প্রথম। অ্যাঁ, সুভদ্র! তুমি বুঝি এখানে!

দ্বিতীয়। জান পঞ্চকদাদা, সুভদ্র কী ভয়ানক পাপ করেছে?

পঞ্চক। চুপ চুপ! ভয় নেই, সুভদ্র, কাঁদছিস কেন ভাই? প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় তো করবি। প্রায়শ্চিত্ত করতে ভারি মজা। এখানে রোজই একঘেয়ে রকমের দিন কাটে, প্রায়শ্চিত্ত না থাকলে তো মানুষ টিকতেই পারত না।

প্রথম। (চুপিচুপি) জান পঞ্চকদাদা, সুভদ্র উত্তর দিকের জানলা—

পঞ্চক। আচ্ছা, আচ্ছা, সুভদ্রের মতো তোদের অত সাহস আছে?

দ্বিতীয়। আমাদের আয়তনের উত্তর দিকটা যে একজটা দেবীর!

তৃতীয়। সেদিক থেকে আমাদের আয়তনে যদি একটুও হাওয়া ঢোকে তা হলে যে সে—

পঞ্চক। তা হলে কী?

তৃতীয়। সে যে ভয়ানক।

পঞ্চক। কী ভয়ানক শুনিই-না।

তৃতীয়। জানি নে, কিন্তু সে ভয়ানক।

সুভদ্র। পঞ্চকদাদা, আমি আর কখনো খুলব না পঞ্চকদাদা। আমার কী হবে?

পঞ্চক। শোন বলি সুভদ্র, কিসে কী হয় আমি ভাই কিছুই জানি নে— কিন্তু যাই হোক-না, আমি তাতে একটুও ভয় করি নে।

সুভদ্র। ভয় কর না?

সকল ছেলে। ভয় কর না?

পঞ্চক। না। আমি তো বলি, দেখিই-না কী হয়।

সকলে। (কাছে ঘেঁষিয়া) আচ্ছা দাদা, তুমি বুঝি অনেক দেখেছ?

পঞ্চক। দেখেছি বৈকি। ও মাসে শনিবারে যেদিন মহাময়ূরী দেবীর পূজা পড়ল, সেদিন আমি কাঁসার থালায় ইঁদুরের গর্তের মাটি রেখে, তার উপর পাঁচটা শেয়ালকাঁটার পাতা আর তিনটে মাষকলাই সাজিয়ে নিজে আঠারো বার ফুঁ দিয়েছি।

সকলে। অ্যাঁ! কী ভয়ানক! আঠারো বার!

সুভদ্র। পঞ্চকদাদা, তোমার কী হল?

পঞ্চক। তিনদিনের দিন যে সাপটা এসে আমাকে নিশ্চয় কামড়াবে কথা ছিল, সে আজ পর্যন্ত আমাকে খুঁজে বের করতে পারে নি।

প্রথম। কিন্তু ভয়ানক পাপ করেছ তুমি।

দ্বিতীয়। মহাময়ূরী দেবী ভয়ানক রাগ করেছেন।

পঞ্চক। তার রাগটা কী রকম সেইটে দেখবার জন্যেই তো এ কাজ করেছি!

সুভদ্র। কিন্তু পঞ্চকদাদা, যদি তোমাকে সাপে কামড়াত!

পঞ্চক। তা হলে মাথা থেকে পা পর্যন্ত কোথাও কোনো সন্দেহ থাকত না— ভাই সুভদ্র, জানলা খুলে তুই কী দেখলি বল দেখি।

দ্বিতীয়। না না, বলিস নে।

তৃতীয়। না, সে আমরা শুনতে পারব না— কী ভয়ানক!

প্রথম। আচ্ছা, একটু— খুব একটুখানি বল ভাই।

সুভদ্র। আমি দেখলুম সেখানে পাহাড়, গোরু চরছে—

বালকগণ। (কানে আঙুল দিয়া) ও বাবা, না না, আর শুনব না। আর বোলো না সুভদ্র। ঐ-যে উপাধ্যায়মশায় আসছেন। চল চল— আর না।

পঞ্চক। কেন? এখন তোমাদের কী?

প্রথম। বেশ, তাও জান না বুঝি? আজ যে পূর্বফল্গুনী নক্ষত্র—

পঞ্চক। তাতে কী?

দ্বিতীয়। আজ কাকিনী সরোবরের নৈর্ঋত কোণে ঢোঁড়া সাপের খোলস খুঁজতে হবে না?

পঞ্চক। কেন রে?

প্রথম। তুমি কিছু জান না পঞ্চকদাদা। সেই খোলস কালো রঙের ঘোড়ার লেজের সাতগাছি চুল দিয়ে বেঁধে পুড়িয়ে ধোঁয়া করতে হবে যে।

দ্বিতীয়। আজ যে পিতৃপুরুষেরা সেই ধোঁয়া ঘ্রাণ করতে আসবেন।

পঞ্চক। তাতে তাঁদের কষ্ট হবে না?

প্রথম। পুণ্য হবে যে, ভয়ানক পুণ্য।

[সুভদ্র ব্যতীত বালকগণের প্রস্থান

উপাধ্যায়ের প্রবেশ

সুভদ্র। উপাধ্যায়মশায়!

পঞ্চক। আরে পালা পালা। উপাধ্যায়মশায়ের কাছ থেকে একটু পরমার্থতত্ত্ব শুনতে হবে, এখন বিরক্তি করিস নে, একেবারে দৌড়ে পালা।

উপাধ্যায়। কী সুভদ্র, তোমার বক্তব্য কী শীঘ্র বলে যাও।

সুভদ্র। আমি ভয়ানক পাপ করেছি।

পঞ্চক। ভারি পণ্ডিত কিনা। পাপ করেছি! পালা বলছি।

উপাধ্যায়। (উৎসাহিত হইয়া) পাপ করেছ? ওকে তাড়া দিচ্ছ কেন? সুভদ্র, শুনে যাও।

পঞ্চক। আর রক্ষা নেই, পাপের এতটুকু গন্ধ পেলে একেবারে মাছির মতো ছোটে।

উপাধ্যায়। কী বলছিলে?

সুভদ্র। আমি পাপ করেছি।

উপাধ্যায়। পাপ করেছ? আচ্ছা বেশ। তা হলে বোসো। শোনা যাক।

সুভদ্র। আমি আয়তনের উত্তর দিকের—

উপাধ্যায়। বলো, বলো, উত্তর দিকের দেয়ালে আঁক কেটেছ?

সুভদ্র। না, আমি উত্তর দিকের জানলায়—

উপাধ্যায়। বুঝেছি, কনুই ঠেকিয়েছ। তা হলে তো সেদিকে আমাদের যতগুলি যজ্ঞের পাত্র আছে সমস্তই ফেলা যাবে। সাত মাসের বাছুরকে দিয়ে ঐ জানলা না চাটাতে পারলে শোধন হবে না।

পঞ্চক। এটা আপনি ভুল বলছেন। ক্রিয়াসংগ্রহে আছে, ভূমিকুষ্মাণ্ডের বোঁটা দিয়ে একবার—

উপাধ্যায়। তোমার তো স্পর্ধা কম দেখি নে। কুলদত্তের ক্রিয়াসংগ্রহের অষ্টাদশ অধ্যায়টি কি কোনোদিন খুলে দেখা হয়েছে?

পঞ্চক। (জনান্তিকে) সুভদ্র, যাও তুমি।— কিন্তু কুলদত্তকে তো আমি—

উপাধ্যায়। কুলদত্তকে মান না? আচ্ছা, ভরদ্বাজ মিশ্রের প্রয়োগপ্রজ্ঞপ্তি তো মানতেই হবে—তাতে—

সুভদ্র। উপাধ্যায়মশায়, আমি ভয়ানক পাপ করেছি।

পঞ্চক। আবার! সেই কথাই তো হচ্ছে। তুই চুপ কর।

উপাধ্যায়। সুভদ্র, উত্তরের দেয়ালে যে আঁক কেটেছ সে চতুষ্কোণ, না গোলাকার?

সুভদ্র। আঁক কাটি নি। আমি জানলা খুলে বাইরে চেয়েছিলুম।

উপাধ্যায়। (বসিয়া পড়িয়া) আঃ সর্বনাশ! করেছিস কী? আজ তিনশো পঁয়তাল্লিশ বছর ঐ জানলা কেউ খোলে নি তা জানিস?

সুভদ্র। আমার কী হবে?

পঞ্চক। (সুভদ্রকে আলিঙ্গন করিয়া) তোমার জয়জয়কার হবে সুভদ্র। তিনশো পঁয়তাল্লিশ বছরের আগল তুমি ঘুচিয়েছ। তোমার এই অসামান্য সাহস দেখে উপাধ্যায়মশায়ের মুখে আর কথা নেই। গুরু আসার পথ তুমিই প্রথম খোলসা করে দিলে।

[সুভদ্রকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান

উপাধ্যায়। জানি নে কী সর্বনাশ হবে। উত্তরের অধিষ্ঠাত্রী যে একজটা দেবী! বালকের দুই চক্ষু মুহূর্তেই পাথর হয়ে গেল না কেন তাই ভাবছি। যাই আচার্যদেবকে জানাই গে।

[প্রস্থান

আচার্য ও উপাচার্যের প্রবেশ

আচার্য। এতকাল পরে আমাদের গুরু আসছেন।

উপাচার্য। তিনি প্রসন্ন হয়েছেন।

আচার্য। প্রসন্ন হয়েছেন? তা হবে। হয়তো প্রসন্নই হয়েছেন; কিন্তু কেমন করে জানব?

উপাচার্য। নইলে তিনি আসবেন কেন?

আচার্য। এক-এক সময়ে মনে ভয় হয় যে, হয়তো অপরাধের মাত্রা পূর্ণ হয়েছে বলেই তিনি আসছেন।

উপাচার্য। না, আচার্যদেব, এমন কথা বলবেন না। আমরা কঠোর নিয়ম সমস্তই নিঃশেষে পালন করেছি— কোনো ত্রুটি ঘটে নি।

আচার্য। কঠোর নিয়ম ? হাঁ, সমস্তই পালিত হয়েছে।

উপাচার্য। বজ্রশুদ্ধিব্রত আমাদের আয়তনে এইবার নিয়ে ঠিক সাতাত্তর বার পূর্ণ হয়েছে। আর কোনো আয়তনে এ কি সম্ভবপর হয় !

আচার্য। না, আর কোথাও হতে পারে না।

উপাচার্য। কিন্তু তবু আপনার মনে এমন দ্বিধা হচ্ছে কেন ?

আচার্য। সূতসোম, তোমার মনে কি তুমি শান্তি পেয়েছ ?

উপাচার্য। আমার তো একমুহূর্তের জন্যে অশান্তি নেই।

আচার্য। অশান্তি নেই ?

উপাচার্য। কিছুমাত্র না। আমার অহোরাত্র একেবারে নিয়মে বাঁধা। এর চেয়ে আর শান্তি কী হতে পারে ?

আচার্য। ঠিক, ঠিক— ঠিক বলেছ সূতসোম। অচেনার মধ্যে গিয়ে কোথায় তার অন্ত পাব ? এখানে সমস্তই জানা, সমস্তই অভ্যস্ত— এখানকার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর এখানকারই সমস্ত শাস্ত্রের ভিতর থেকে পাওয়া যায়— তার জন্যে একটুও বাইরে যাবার দরকার হয় না। এই তো নিশ্চল শান্তি !

উপাচার্য। আচার্যদেব, আপনাকে এমন বিচলিত হতে কখনো দেখি নি।

আচার্য। কী জানি, আমার কেমন মনে হচ্ছে, কেবল একলা আমিই না, চারি দিকে সমস্তই বিচলিত হয়ে উঠছে। আমার মনে হচ্ছে, আমাদের এখানকার দেয়ালের প্রত্যেক পাথরটা পর্যন্ত বিচলিত। তুমি এটা অনুভব করতে পারছ না সূতসোম ?

উপাচার্য। কিছুমাত্র না। এখানকার অটল স্তব্ধতার লেশমাত্র বিচ্যুতি দেখতে পাচ্ছি নে। আমাদের তো বিচলিত হবার কথাও না। আমাদের সমস্ত শিক্ষা কোন্ কালে সমাধা হয়ে গেছে। আমাদের সমস্ত লাভ সমাপ্ত, সমস্ত সঞ্চয় পর্যাপ্ত। ঐ-যে পঞ্চক আসছে। পাথরের মধ্যে কি ঘাস বেরোয় ? এমন ছেলে আমাদের আয়তনে কী করে সম্ভব হল ! ঐ আমাদের দুর্লক্ষণ। এই আয়তনের মধ্যে ও কেবল আপনাকেই মানে। আপনি ওকে একটু ভর্ৎসনা করে দেবেন।

আচার্য। আচ্ছা তুমি যাও। আমি ওর সঙ্গে একটু নিভৃতে কথা কয়ে দেখি।

[উপাচার্যের প্রস্থান

পঞ্চকের প্রবেশ

আচার্য। (পঞ্চকের গায়ে হাত দিয়া) বৎস পঞ্চক !

পঞ্চক। করলেন কী ! আমাকে ছুঁলেন ?

আচার্য। কেন, বাধা কী আছে ?

পঞ্চক। আমি যে আচার রক্ষা করতে পারি নি।

আচার্য। কেন পার নি বৎস ?

পঞ্চক। প্রভু, কেন, তা আমি বলতে পারি নে। আমার পারবার উপায় নেই।

আচার্য। সৌম্য, তুমি তো জান, এখানকার যে নিয়ম সেই নিয়মকে আশ্রয় করে হাজার বছর হাজার হাজার লোক নিশ্চিন্ত আছে। আমরা যে খুশি তাকে কি ভাঙতে পারি ?

পঞ্চক। আচার্যদেব, যে-নিয়ম সত্য তাকে ভাঙতে না দিলে তার যে পরীক্ষা হয় না। তাই কি ঠিক নয় ?

আচার্য। যাও বৎস, তোমার পথে তুমি যাও। আমাকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা কোরো না।

পঞ্চক। আচার্যদেব, আপনি জানেন না কিন্তু আপনিই আমাকে নিয়মের চাকার নীচে থেকে টেনে নিয়েছেন।

আচার্য। কেমন করে বৎস ?

পঞ্চক। তা জানি নে, কিন্তু আপনি আমাকে এমন একটা-কিছু দিয়েছেন যা আচারের চেয়ে, নিয়মের চেয়ে অনেক বেশি।

আচার্য। তুমি কী কর না-কর আমি কোনোদিন জিজ্ঞাসা করি নে, কিন্তু আজ একটি কথা জিজ্ঞাসা করব। তুমি কি অচলায়তনের বাইরে গিয়ে যূনক জাতির সঙ্গে মেশ ?

পঞ্চক। আপনি কি এর উত্তর শুনতে চান ?

আচার্য। না না থাক্, বোলো না। কিন্তু যূনকেরা যে অত্যন্ত ম্লেচ্ছ। তাদের সহবাস কি—

পঞ্চক। তাদের সম্বন্ধে আপনার কি কোনো বিশেষ আদেশ আছে ?

আচার্য। না না, আদেশ আমার কিছুই নেই। যদি ভুল করতে হয় তবে ভুল করো গে— তুমি ভুল করো গে— আমাদের কথা শুনো না।

পঞ্চক। ঐ উপাচার্য আসছেন— বোধ করি কাজের কথা আছে— বিদায় হই।

[প্রস্থান

উপাধ্যায় ও উপাচার্যের প্রবেশ

উপাচার্য। (উপাধ্যায়ের প্রতি) আচার্যদেবকে তো বলতেই হবে। উনি নিতান্ত উদ্‌বিগ্ন হবেন— কিন্তু দায়িত্ব যে ওঁরই।

আচার্য। উপাধ্যায়, কোনো সংবাদ আছে নাকি ?

উপাধ্যায়। অত্যন্ত মন্দ সংবাদ।

আচার্য। অতএব সেটা সত্বর বলা উচিত।

উপাধ্যায়। আচার্যদেব, সুভদ্র আমাদের আয়তনের উত্তর দিকের জানলা খুলে বাইরে দৃষ্টিপাত করেছে।

আচার্য। উত্তর দিকটা তো একজটা দেবীর।

উপাধ্যায়। সেই তো ভাবনা। আমাদের আয়তনের মন্ত্রপূত রুদ্ধ বাতাসকে সেখানকার হাওয়া কতটা দূর পর্যন্ত আক্রমণ করেছে বলা তো যায় না।

উপাচার্য। এখন কথা হচ্ছে, এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কী।

আচার্য। আমার তো স্মরণ হয় না। উপাধ্যায় বোধ করি—

উপাধ্যায়। না, আমিও তো মনে আনতে পারি নে। আজ তিনশো বছর এ প্রায়শ্চিত্তটার প্রয়োজন হয় নি— সবাই ভুলেই গেছে। ঐ-যে মহাপঞ্চক আসছে— যদি কারও জানা থাকে তো সে ওর।

মহাপঞ্চকের প্রবেশ

উপাধ্যায়। মহাপঞ্চক, সব শুনেছ বোধ করি।

মহাপঞ্চক। সেইজন্যেই তো এলুম ; আমরা এখন সকলেই অশুচি, বাহিরের হাওয়া আমাদের আয়তনে প্রবেশ করেছে।

উপাচার্য। এর প্রায়শ্চিত্ত কী, আমাদের কারও স্মরণ নেই। তুমিই হয়তো বলতে পার।

মহাপঞ্চক। ক্রিয়াকল্পতরুতে এর কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না— একমাত্র ভগবান জ্বলনানন্তকৃত আধিকর্মিক বর্ষায়ণে লিখছে, অপরাধীকে ছয়মাস মহাতামস সাধন করতে হবে।

উপাচার্য। মহাতামস ?

মহাপঞ্চক। হাঁ, ওকে অন্ধকারে রেখে দিতে হবে, আলোকের এক রশ্মিমাত্রও দেখতে পাবে না। কেননা, আলোকের দ্বারা যে-অপরাধ অন্ধকারের দ্বারাই তার ক্ষালন।

উপাচার্য। তা হলে, মহাপঞ্চক, সমস্ত ভার তোমার উপর রইল।

উপাধ্যায়। চলো আমিও তোমার সঙ্গে যাই। ততক্ষণ সুভদ্রকে হিঙ্গুমর্দনকুণ্ডে স্নান করিয়ে আনি গে।

[সকলের গমনোদ্যম

আচার্য। শোনো, প্রয়োজন নেই।

উপাধ্যায়। কিসের প্রয়োজন নেই ?

আচার্য। প্রায়শ্চিত্তের।

মহাপঞ্চক। প্রয়োজন নেই বলছেন ! আধিকর্মিক বর্ষায়ণ খুলে আমি এখনই দেখিয়ে দিচ্ছি—

আচার্য। দরকার নেই— সুভদ্রকে কোনো প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে না, আমি আশীর্বাদ করে তার—

মহাপঞ্চক। এও কি কখনো সম্ভব হয় ? যা কোনো শাস্ত্রে নেই আপনি কি তাই—

আচার্য। না, হতে দেব না, যদি কোনো অপরাধ ঘটে সে আমার। তোমাদের ভয় নেই।

উপাধ্যায়। এরকম দুর্বলতা তো আপনার কোনোদিন দেখি নি ! এই তো সেবার অষ্টাঙ্গশুদ্ধি উপবাসে তৃতীয় রাত্রে বালক কুশলশীল জল জল করে পিপাসায় প্রাণত্যাগ করলে কিন্তু তবু তার মুখে যখন এক বিন্দু জল দেওয়া গেল না, তখন তো আপনি নীরব হয়ে ছিলেন। তুচ্ছ মানুষের প্রাণ আজ আছে কাল নেই, কিন্তু সনাতন ধর্মবিধি তো চিরকালের।

সুভদ্রকে লইয়া পঞ্চকের প্রবেশ

পঞ্চক। ভয় নেই সুভদ্র, তোর কোনো ভয় নেই— এই শিশুটিকে অভয় দাও প্রভু।

আচার্য। বৎস, তুমি কোনো পাপ কর নি। যারা বিনা অপরাধে তোমাকে হাজার হাজার বৎসর ধরে মুখ বিকৃত করে ভয় দেখাচ্ছে, পাপ তাদেরই। এসো পঞ্চক।

[সুভদ্রকে কোলে লইয়া পঞ্চকের সঙ্গে প্রস্থান

উপাধ্যায়। এ কী হল উপাচার্যমশায় ?

[উপাচার্যের প্রস্থান

মহাপঞ্চক। আমরা অশুচি হয়ে রইলুম, আমাদের যাগযজ্ঞ ব্রত-উপবাসে সকলই পণ্ড হতে থাকল, এ তো সহ্য করা শক্ত।

উপাধ্যায়। এ সহ্য করা চলবেই না। আচার্য কি শেষে আমাদের ম্লেচ্ছের সঙ্গে সমান করে দিতে চান ?

মহাপঞ্চক। উনি আজ সুভদ্রকে বাঁচাতে গিয়ে সনাতন ধর্মকে বিনাশ করবেন ! এ কী রকম বুদ্ধিবিকার ওঁর ঘটল ! এ অবস্থায় ওঁকে আচার্য বলে গণ্য করাই চলবে না।

সঞ্জীব, বিশ্বম্ভর, জয়োত্তমের প্রবেশ

সঞ্জীব। এতদিন এখানে সব ঠিক চলছিল। যেই গুরু আসবেন রব উঠল অমনি কেন এই-সব অনাচার ঘটতে লাগল ?

বিশ্বম্ভর। আচার্য অদীনপুণ্য যদি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ না করেন, তবে তিনি যেমন আছেন থাকুন কিন্তু আমরা তাঁর কোনো অনুশাসন মানব না।

জয়োত্তম। তিনি বলেন, তাঁর গুরু তাঁকে যে আসনে বসিয়েছেন তাঁর গুরুই তাঁকে সেই আসন থেকে নামিয়ে দেবেন, সেইজন্যে তিনি অপেক্ষা করছেন।

অধ্যেতার প্রবেশ

উপাধ্যায়। কী গো অধ্যেতা, ব্যাপার কী ?

অধ্যেতা। সুভদ্রকে মহাতামসে বসায় কার সাধ্য ?

মহাপঞ্চক। কেন কী বিঘ্ন ঘটেছে ?

অধ্যেতা। মূর্তিমান বিঘ্ন রয়েছে তোমার ভাই।

মহাপঞ্চক। পঞ্চক ?

অধ্যেতা। হাঁ। আমি ডাকতেই সুভদ্র ছুটে এল, কিন্তু পঞ্চক তাকে কেড়ে নিয়ে গেল।

মহাপঞ্চক। না, এই নরাধমকে নিয়ে আর চলল না। অনেক সহ্য করেছি। এবার ওকে নির্বাসন দেওয়াই স্থির। কিন্তু অধ্যেতা, তুমি এটা সহ্য করলে?

অধ্যেতা। আমি কি তোমার পঞ্চককে ভয় করি? স্বয়ং আচার্য অদীনপুণ্য এসে তাকে আদেশ করলেন, তাই তো সে সাহস পেলে।

সঞ্জীব। স্বয়ং আমাদের আচার্য!

বিশ্বম্ভর। ক্রমে এ-সব হচ্ছে কী! এতদিন এই আয়তনে আছি, কখনো তো এমন অনাচারের কথা শুনি নি। আর স্বয়ং আমাদের আচার্যের এই কীর্তি!

জয়োত্তম। তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা করেই দেখা যাক-না।

বিশ্বম্ভর। না না, আচার্যকে আমরা—

মহাপঞ্চক। কী করবে আচার্যকে, বলেই ফেলো।

বিশ্বম্ভর। তাই তো ভাবছি কী করা যায়। তাঁকে নাহয়— আপনি বলে দিন-না কী করতে হবে।

মহাপঞ্চক। আমি বলছি তাঁকে সংযত করে রাখতে হবে।

সঞ্জীব। কেমন করে?

মহাপঞ্চক। কেমন করে আবার কী? মত্ত হস্তীকে যেমন করে সংযত করতে হয় তেমনি করে।

জয়োত্তম। আমাদেব আচার্যদেবকে কি তা হলে—

মহাপঞ্চক। হাঁ, তাঁকে বন্ধ করে বাখতে হবে। চুপ করে রইলে যে! পারবে না?

আচার্যের প্রবেশ

আচার্য। বৎস, এতদিন তোমরা আমাকে আচার্য বলে মেনেছ, আজ তোমাদের সামনে আমার বিচারের দিন এসেছে। আমি স্বীকার করছি অপরাধের অন্ত নেই, অন্ত নেই, তার প্রায়শ্চিত্ত আমাকেই করতে হবে।

সঞ্জীব। তবে আর দেরি করেন কেন? এ দিকে যে আমাদের সর্বনাশ হয়।

আচার্য। গুরু চলে গেলেন, আমরা তাঁর জায়গায় পুঁথি নিয়ে বসলুম; সেই জীর্ণ পুঁথিব ভাণ্ডারে প্রতিদিন তোমরা দলে দলে আমার কাছে তোমাদের তরুণ হৃদয়টি মেলে ধরে কী চাইতে এসেছিলে? অমৃতবাণী? কিন্তু আমার তালু যে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। রসনায় যে রসের লেশমাত্র নেই। এবার নিয়ে এসো সেই বাণী, গুরু, নিয়ে এসো হৃদয়ের বাণী। প্রাণকে প্রাণ দিয়ে জাগিয়ে দিয়ে যাও।

পঞ্চক। (ছুটিয়া প্রবেশ করিয়া) তোমার নববর্ষার সজল হাওয়ায় উড়ে যাক সব শুকনো পাতা— আয় রে নবীন কিশলয়— তোরা ছুটে আয়, তোরা ফুটে বেরো। ভাই জয়োত্তম, শুনছ না, আকাশের ঘননীল মেঘের মধ্যে মুক্তির ডাক উঠেছে— আজ নৃত্য করো রে নৃত্য করো।

গান

ওরে ওরে ওরে আমার মন মেতেছে,
তারে আজ থামায় কে রে।
সে যে আকাশ পানে হাত পেতেছে,
তারে আজ নামায় কে রে।

প্রথমে জয়োত্তমের, পরে বিশ্বম্ভরের, পরে সঞ্জীবের নৃত্যগীতে যোগ

মহাপঞ্চক। পঞ্চক, নির্লজ্জ বানব কোথাকার, থাম বলছি থাম!

পঞ্চক।

গান

ওরে আমার মন মেতেছে,
আমারে থামায় কে রে।

মহাপঞ্চক। উপাধ্যায়, আমি তোমাকে বলি নি একাজটা দেবীর শাপ আরম্ভ হয়েছে? দেখছ, কী

করে তিনি আমাদের সকলের বুদ্ধিকে বিচলিত করে তুলছেন— ক্রমে দেখবে অচলায়তনের একটি পাথরও আর থাকবে না।

পঞ্চক। না, থাকবে না, থাকবে না, পাথরগুলো সব পাগল হয়ে যাবে ; তারা কে কোথায় ছুটে বেরিয়ে পড়বে, তারা গান ধরবে—

ওরে ভাই, নাচ রে, ও ভাই, নাচ রে,—
আজ ছাড়া পেয়ে বাঁচ রে,—
লাজভয় ঘুচিয়ে দে রে ;
তোরে আজ থামায় কে রে !

মহাপঞ্চক। উপাধ্যায়, হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছ কী। সর্বনাশ শুরু হয়েছে, বুঝতে পারছ না। ওরে সব ছন্নমতি মূর্খ, অভিশপ্ত বর্বর, আজ তোদের নাচবার দিন ?

পঞ্চক। সর্বনাশের বাজনা বাজলেই নাচ শুরু হয় দাদা।

মহাপঞ্চক। চুপ কর লক্ষ্মীছাড়া ! ছাত্রগণ, তোমরা আত্মবিস্মৃত হোয়ো না। ঘোর বিপদ আসন্ন, সে কথা স্মরণ রেখো।

বিশ্বম্ভর। আচার্যদেব, পায়ে ধরি, সুভদ্রকে আমাদের হাতে দিন, তাকে তার প্রায়শ্চিত্ত থেকে নিরস্ত করবেন না।

আচার্য। না বৎস, এমন অনুরোধ কোরো না।

সঞ্জীব। ভেবে দেখুন, সুভদ্রের কতবড়ো ভাগ্য। মহাতামস ক-জন লোকে পারে। ও-যে ধরাতলে দেবত্ব লাভ করবে !

আচার্য। গায়ের জোরে দেবতা গড়বার পাপে আমাকে লিপ্ত কোরো না। সে মানুষ, সে শিশু, সেইজন্যেই সে দেবতাদের প্রিয়।

জয়োত্তম। দেখুন, আপনি আমাদের আচার্য, আমাদের প্রণম্য, কিন্তু যে অন্যায় কাজ করছেন, তাতে আমরা বলপ্রয়োগ করতে বাধ্য হব।

আচার্য। করো, বলপ্রয়োগ করো, আমাকে মেনো না, আমাকে মারো, আমি অপমানেরই যোগ্য, তোমাদের হাত দিয়ে আমার যে শাস্তি আরম্ভ হল, তাতেই বুঝতে পারছি গুরুর আবির্ভাব হয়েছে। কিন্তু সেইজন্যেই বলছি শাস্তির কারণ আর বাড়তে দেব না। সুভদ্রকে তোমাদের হাতে দিতে পারব না।

বিশ্বম্ভর। পারবেন না ?

আচার্য। না।

মহাপঞ্চক। তা হলে আর দ্বিধা করা নয়। বিশ্বম্ভর, এখন তোমাদের উচিত ওঁকে জোর করে ধরে নিয়ে ঘরে বন্ধ করা। ভীরু, কেউ সাহস করছ না ? আমাকেই তবে এ কাজ করতে হবে ?

জয়োত্তম। খবরদার— আচার্যদেবের গায়ে হাত দিতে পারবে না।

বিশ্বম্ভর। না না, মহাপঞ্চক, ওঁকে অপমান করলে আমরা সইতে পারব না।

সঞ্জীব। আমরা সকলে মিলে পায়ে ধরে ওঁকে রাজি করাব। একা সুভদ্রের প্রতি দয়া করে উনি কি আমাদের সকলের অমঙ্গল ঘটাবেন ?

বিশ্বম্ভর। এই অচলায়তনের এমন কত শিশু উপবাসে প্রাণত্যাগ করেছে— তাতে ক্ষতি কী হয়েছে ?

সুভদ্রের প্রবেশ

সুভদ্র। আমাকে মহাতামস ব্রত করাও।

পঞ্চক। সর্বনাশ করলে ! ঘুমিয়ে পড়েছে দেখে আমি এখানে এসেছিলুম কখন জেগে উঠে চলে এসেছে।

আচার্য। বৎস সুভদ্র, এসো আমার কোলে। যাকে পাপ বলে ভয় করছ সে পাপ আমার— আমিই প্রায়শ্চিত্ত করব।

বিশ্বম্ভর। না না, আয় রে আয় সুভদ্র, তুই মানুষ না, তুই দেবতা।

সঞ্জীব। তুই ধন্য।

বিশ্বম্ভর। তোর বয়সে মহাতামস করা আর কারও ভাগ্যে ঘটে নি। সার্থক তোর মা তোকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন।

উপাধ্যায়। আহা সুভদ্র, তুই আমাদের অচলায়তনেরই বালক বটে।

মহাপঞ্চক। আচার্য, এখনো কি তুমি জোর করে এই বালককে এই মহাপুণ্য থেকে বঞ্চিত করতে চাচ্ছ?

আচার্য। হায় হায়, এই দেখেই তো আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। তোমরা যদি ওকে কাঁদিয়ে আমার হাত থেকে ছিঁড়ে কেড়ে নিয়ে যেতে তা হলেও আমার এত বেদনা হত না। কিন্তু দেখছি হাজার বছরের নিষ্ঠুর মুষ্টি অতটুকু শিশুর মনকেও চেপে ধরেছে, একেবারে পাঁচ আঙুলের দাগ বসিয়ে দিয়েছে রে! কখন সময় পেল সে? সে কি গর্ভের মধ্যেও কাজ করে?

পঞ্চক। সুভদ্র, আয় ভাই, প্রায়শ্চিত্ত করতে যাই— আমিও যাব তোর সঙ্গে।

আচার্য। বৎস, আমিও যাব।

সুভদ্র। না না, আমাকে যে একলা থাকতে হবে— লোক থাকলে যে পাপ হবে।

মহাপঞ্চক। ধন্য শিশু, তুমি তোমার ঐ প্রাচীন আচার্যকে আজ শিক্ষা দিলে! এসো তুমি আমার সঙ্গে।

আচার্য। না, আমি যতক্ষণ তোমাদের আচার্য আছি ততক্ষণ আমার আদেশ ব্যতীত কোনো ব্রত আরম্ভ বা শেষ হতেই পারে না। আমি নিষেধ করছি। সুভদ্র, আচার্যের কথা অমান্য কোরো না— এসো পঞ্চক, ওকে কোলে করে নিয়ে এসো।

[সুভদ্রকে লইয়া পঞ্চকের ও আচার্যের এবং উপাধ্যায়ের প্রস্থান

মহাপঞ্চক। ধিক! তোমাদের মতো ভীরুদের দুর্গতি হতে রক্ষা করে এমন সাধ্য কারও নেই। তোমরা নিজেও মরবে, অন্য সকলকেও মারবে।

পদাতিকের প্রবেশ

পদাতিক। স্থবিরপত্তনের রাজা আসছেন।

মহাপঞ্চক। ব্যাপারখানা কী! এ-যে আমাদের রাজা মন্থরগুপ্ত!

রাজার প্রবেশ

রাজা। নরদেবগণ, তোমাদের সকলকে নমস্কার।

সকলে। জয়োস্তু রাজন্।

মহাপঞ্চক। কুশল তো?

রাজা। অত্যন্ত মন্দ সংবাদ। প্রত্যন্তদেশের দূতেরা এসে খবর দিল যে, দাদাঠাকুরের দল এসে আমাদের রাজ্যসীমার কাছে বাসা বেঁধেছে।

মহাপঞ্চক। দাদাঠাকুরের দল কারা?

রাজা। ঐ-যে যূনকরা।

মহাপঞ্চক। যূনকরা যদি একবার আমাদের প্রাচীর ভাঙে তা হলে যে সমস্ত লণ্ডভণ্ড করে দেবে!

রাজা। সেইজন্যেই তো ছুটে এলুম। চণ্ডক বলে একজন যূনক আমাদের স্থবিরক সম্প্রদায়ের মন্ত্র পাবার জন্যে গোপনে তপস্যা করছিল। আমি সংবাদ পেয়েই তার শিরশ্ছেদ করেছি।

মহাপঞ্চক। ভালোই করেছেন। কিন্তু এ দিকে আমাদের অচলায়তনের মধ্যেই যে পাপ প্রবেশ করেছে তার কী করলেন? আমাদের পরাভবের আর দেরি কী?

রাজা। সে কী কথা!

সঞ্জীব। আয়তনে একজটা দেবীর শাপ লেগেছে।

রাজা। একজটা দেবীর শাপ! সর্বনাশ! কেন তাঁর শাপ?

মহাপঞ্চক। যে উত্তর দিকে তাঁর অধিষ্ঠান এখানে একদিন সেই দিককার জানালা খোলা হয়েছে।

রাজা। (বসিয়া পড়িয়া) তবে তো আর আশা নেই।

মহাপঞ্চক। আচার্য অদীনপুণ্য এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে দিচ্ছেন না।

বিশ্বম্ভর। তিনি জোর করে আমাদের ঠেকিয়ে রেখেছেন।

রাজা। দাও, দাও, অদীনপুণ্যকে এখনই নির্বাসিত করে দাও!

মহাপঞ্চক। আগামী অমাবস্যায়—

রাজা। না না, এখন তিথিনক্ষত্র দেখবার সময় নেই। বিপদ আসন্ন। সংকটের সময় আমি আমার রাজ-অধিকার খাটাতে পারি— শাস্ত্রে তার বিধান আছে।

মহাপঞ্চক। হাঁ আছে। কিন্তু আচার্য কে হবে?

রাজা। তুমি, তুমি। এখনই আমি তোমাকে আচার্যের পদে প্রতিষ্ঠিত করে দিলুম। দিক্‌পালগণ সাক্ষী, এই ব্রহ্মচারীগণ সাক্ষী।

মহাপঞ্চক। অদীনপুণ্যকে কোথায় নির্বাসিত করতে চান?

রাজা। আয়তনের বাইরে নয়। কী জানি যদি যূনকদের সঙ্গে যোগ দেন। আয়তনের প্রান্তে যে দর্ভকপাড়া আছে সেইখানে তাঁকে বন্ধ করে রেখো।

জয়োত্তম। আচার্য অদীনপুণ্যকে দর্ভকদেব পাড়ায়! তারা যে অন্ত্যজজাতি— অশুচি পতিত!

মহাপঞ্চক। যিনি স্পর্ধাপূর্বক আচার লঙ্ঘন করেন, অনাচারীদের মধ্যে নির্বাসনই তাঁর উচিত দণ্ড। মনে কোরো না আমার ভাই বলে পঞ্চককে ক্ষমা করব। তারও সেই দর্ভকপাড়ায় গতি।

দূতের প্রবেশ

দূত। শুনলুম গুরু খুব কাছে এসেছেন।

রাজা। কে বললে?

দূত। চারি দিকেই কথা উঠেছে।

রাজা। তা হলে তো তাঁর অভ্যর্থনার আয়োজন করতে হবে। মহাপঞ্চক, অচলায়তনের সমস্ত জানলা বন্ধ করে শুদ্ধিমন্ত্র পাঠ করাতে থাকো।

মহাপঞ্চক। জানলা বন্ধ সম্বন্ধে ভাববেন না। মন্ত্রের ভার আমি নিচ্ছি।

[রাজার প্রস্থান

পঞ্চক কোথায়?

জয়োত্তম। শুনলুম সে প্রাচীর ডিঙিয়ে যূনকদের কাছে গেছে।

মহাপঞ্চক। পাষণ্ড! আর যেন সে আয়তনে ফিরে না আসে। গুরু আসবার আগেই এখানকার সমস্ত উপদ্রব দূর করা চাই। ওহে ব্রহ্মচারীগণ, মন্ত্র পড়বার জন্যে স্নান করে প্রস্তুত হয়ে এসো।

২

পাহাড় মাঠ

পঞ্চকের গান

এ পথ গেছে কোন্‌খানে গো কোন্‌খানে—
তা কে জানে তা কে জানে।
কোন্ পাহাড়ের পারে, কোন্ সাগরের ধারে,
কোন্ দুরাশার দিকপানে—
তা কে জানে তা কে জানে।

এ পথ দিয়ে কে আসে যায় কোন্‌খানে
তা কে জানে তা কে জানে।
কেমন যে তার বাণী, কেমন হাসিখানি,
যায় সে কাহার সন্ধানে
তা কে জানে তা কে জানে।

পশ্চাতে আসিয়া যূনকদলের নৃত্য

পঞ্চক। ও কী রে! তোরা কখন পিছনে এসে নাচতে লেগেছিলি?

প্রথম যূনক। আমরা নাচবার সুযোগ পেলেই নাচি, পা দুটোকে স্থির রাখতে পারি নে।

দ্বিতীয় যূনক। আয় ভাই, ওকে সুদ্ধ কাঁধে করে নিয়ে একবার নাচি।

পঞ্চক। আরে না না, আমাকে ছুঁস নে রে, ছুঁস নে।

তৃতীয় যূনক। ঐ রে! ওকে অচলায়তনের ভূতে পেয়েছে। যূনককে ও ছোঁবে না।

পঞ্চক। জানিস, আমাদের গুরু আসবেন?

প্রথম যূনক। সত্যি নাকি? তিনি মানুষটি কী রকম? তাঁর মধ্যে নতুন কিছু আছে?

পঞ্চক। নতুনও আছে, পুরোনোও আছে।

দ্বিতীয় যূনক। আচ্ছা, এলে খবর দিয়ো— একবার দেখব তাঁকে।

পঞ্চক। তোরা দেখবি কী রে! সর্বনাশ! তিনি তো যূনকদের গুরু নন। তাঁর কথা তোদের কানে পাছে এক অক্ষরও যায় সেজন্যে তোদের দিকের প্রাচীরের বাইরে সাত সার রাজার সৈন্য পাহারা দেবে। তোদেরও তো গুরু আছে— তাকে নিয়েই—

তৃতীয় যূনক। গুরু! আমাদের আবার গুরু কোথায়? আমরা তো হলুম দাদাঠাকুরের দল। এ পর্যন্ত আমরা তো কোনো গুরুকে মানি নি।

প্রথম যূনক। সেইজন্যেই তো ও জিনিসটা কী রকম দেখতে ইচ্ছা করে।

দ্বিতীয় যূনক। আমাদের মধ্যে একজন, তার নাম চণ্ডক— তার কী জানি ভারি লোভ হয়েছে; সে ভেবেছে তোমাদের কোনো গুরুর কাছে মন্ত্র নিয়ে আশ্চর্য কী-একটা ফল পাবে— তাই সে লুকিয়ে চলে গেছে।

তৃতীয় যূনক। কিন্তু যূনক বলে কেউ তাকে মন্ত্র দিতে চায় না। সেও ছাড়বার ছেলে নয়, সে লেগেই রয়েছে। তোমরা মন্ত্র দাও না বলেই মন্ত্র আদায় করবার জন্যে তার এত জেদ।

প্রথম যূনক। কিন্তু পঞ্চকদাদা, আমাদের ছুঁলে কি তোমার গুরু রাগ করবেন?

পঞ্চক। বলতে পারি নে— কী জানি যদি অপরাধ নেন। ওরে, তোরা যে সবাই সব রকম কাজই করিস— সেইটে যে বড়ো দোষ। তোরা চাষ করিস তো?

প্রথম যূনক। চাষ করি বৈকি, খুব করি। পৃথিবীতে জন্মেছি, পৃথিবীকে সেটা খুব কষে বুঝিয়ে দিয়ে তবে ছাড়ি।

গান

আমরা চাষ করি আনন্দে।
মাঠে মাঠে বেলা কাটে সকাল হতে সন্ধে।
রৌদ্র ওঠে, বৃষ্টি পড়ে, বাঁশের বনে পাতা নড়ে,
বাতাস ওঠে ভরে ভরে চষা মাটির গন্ধে।
সবুজ প্রাণের গানের লেখা, রেখায় রেখায় দেয় রে দেখা,
মাতে রে কোন্ তরুণ কবি নৃত্যদোদুল ছন্দে।
ধানের শিষে পুলক ছোটে, সকল ধরা হেসে ওঠে,
অঘ্রানেরি সোনার রোদে পূর্ণিমারি চন্দ্রে ॥

পঞ্চক। আচ্ছা, নাহয় তোরা চাষই করিস, সেও কোনোমতে সহ্য হয়— কিন্তু কে বলছিল তোরা কাঁকুড়ের চাষ করিস?

প্রথম যূনক। করি বৈকি।

পঞ্চক। কাঁকুড়! ছি ছি! খেঁসারিডালেরও চাষ করিস বুঝি?

তৃতীয় যূনক। কেন করব না? এখান থেকেই তো কাঁকুড় খেঁসারিডাল তোমাদের বাজারে যায়।

পঞ্চক। তা তো যায়, কিন্তু জানিস নে কাঁকুড় আর খেঁসারিডাল যারা চাষ করে তাদের আমরা ঘরে ঢুকতে দিই নে।

প্রথম যূনক। কেন?

পঞ্চক। কেন কী রে! ওটা যে নিষেধ।

প্রথম যূনক। কেন নিষেধ?

পঞ্চক। শোনো একবার! নিষেধ, তার আবার কেন! সাধে তোদের মুখদর্শন পাপ। এই সহজ কথাটা বুঝিস নে যে, কাঁকুড় আর খেঁসারিডালের চাষটা ভয়ানক খারাপ।

দ্বিতীয় যূনক। কেন? ওটা কি তোমরা খাও না।

পঞ্চক। খাই বৈকি, খুব আদর করে খাই— কিন্তু ওটা যারা চাষ করে তাদের ছায়া মাড়াই নে।

দ্বিতীয় যূনক। কেন?

পঞ্চক। ফের কেন? তোরা যে এতবড়ো নিরেট মূর্খ তা জানতুম না। আমাদের পিতামহ বিষ্কম্ভী কাঁকুড়ের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সে খবর রাখিস নে বুঝি?

দ্বিতীয় যূনক। কাঁকুড়ের মধ্যে কেন?

পঞ্চক। আবার কেন? তোরা যে ঐ এক কেনর জ্বালায় আমাকে অতিষ্ঠ করে তুললি।

তৃতীয় যূনক। আর খেঁসারির ডাল?

পঞ্চক। একবার কোন্ যুগে একটা খেঁসারিডালের গুঁড়ো উপবাসের দিন কোন্-এক মস্ত বুড়োর ঠিক গোঁফের উপর উড়ে পড়েছিল; তাতে তাঁর উপবাসের পুণ্যফল থেকে ষষ্টিসহস্র ভাগের এক ভাগ কম পড়ে গিয়েছিল; তাই তখনই সেইখানে দাঁড়িয়ে উঠে তিনি জগতের সমস্ত খেঁসারিডালের খেতের উপর অভিশাপ দিয়ে গেছেন। এতবড়ো তেজ! তোরা হলে কি করতিস বল দেখি!

প্রথম যূনক। আমাদের কথা বল কেন? উপবাসের দিনে খেঁসারিডাল যদি গোঁফের উপর পর্যন্ত এগিয়ে আসে তা হলে তাকে আরো একটু এগিয়ে নিই।

পঞ্চক। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সত্যি করে বলিস— তোরা কি লোহার কাজ করে থাকিস?

প্রথম যূনক। লোহার কাজ করি বৈকি, খুব করি।

পঞ্চক। রাম রাম! আমরা সনাতন কাল থেকে কেবল তামা-পিতলের কাজ করে আসছি। লোহা গলাতে পারি কিন্তু সব দিন নয়। ষষ্ঠীর দিনে যদি মঙ্গলবার পড়ে তবেই স্নান করে আমরা হাপর ছুঁতে পারি কিন্তু তাই বলে লোহা পিটোনো সে তো হতেই পারে না।

প্রথম যূনক। কেন, লোহা কী অপরাধটা করেছে?

পঞ্চক। আরে ওটা যে লোহা সে তো তোকে মানতেই হবে।

প্রথম যূনক। তা তো হবে।

পঞ্চক। তবে আর কী— এই বুঝে নে না।

দ্বিতীয় যূনক। তবু একটা তো কারণ আছে।

পঞ্চক। কারণ নিশ্চয়ই আছে কিন্তু কেবল সেটা পুঁথির মধ্যে। আচ্ছা, তোদের মন্ত্র কেউ পড়ায় নি?

দ্বিতীয় যূনক। মন্ত্র! কিসের মন্ত্র?

পঞ্চক। এই মনে কর, যেমন বজ্রবিদারণ মন্ত্র— তট তট তোতয় তোতয়—

তৃতীয় যূনক। ওর মানে কী?

পঞ্চক। আবার! মানে! তোর আস্পর্ধা তো কম নয়। সব কথাতেই মানে! কেয়ূরী মন্ত্রটা জানিস?

প্রথম যূনক। না।

পঞ্চক। মরীচী?

প্রথম যূনক। না।

পঞ্চক। মহাশীতবতী?

প্রথম যূনক। না।

পঞ্চক। উষ্ণীষবিজয়?

প্রথম যূনক। না।

পঞ্চক। নাপিত ক্ষৌর করতে করতে যেদিন তোদের বাঁ গালে রক্ত পাড়িয়ে দেয় সেদিন করিস কী?

তৃতীয় যূনক। সেদিন নাপিতের দুই গালে চড় কষিয়ে দিই।

পঞ্চক। না রে না, আমি বলছি সেদিন নদী পার হবার দরকার হলে তোরা খেয়া নৌকোয় উঠতে পারিস?

তৃতীয় যূনক। খুব পারি।

পঞ্চক। ওরে, তোরা আমাকে মাটি করলি রে। আমি আর থাকতে পারছি নে। তোদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে আর সাহস হচ্ছে না। এমন জবাব যদি আর-একটা শুনতে পাই তা হলে তোদের বুকে করে পাগলের মতো নাচব, আমার জাতমান কিছু থাকবে না। ভাই, তোরা সব কাজই করতে পাস? তোদের দাদাঠাকুর কিছুতেই তোদের মানা করে না?

যূনকগণের গান

সব কাজে হাত লাগাই মোরা, সব কাজেই।
বাধাবাঁধন নেই গো নেই।
দেখি, খুঁজি, বুঝি,
কেবল ভাঙি, গড়ি, যুঝি,
মোরা সব দেশেতেই বেড়াই ঘুরে সব সাজেই।
পারি, নাই বা পারি,
নাহয় জিতি কিংবা হারি,
যদি অমনিতে হাল ছাড়ি, মরি সেই লাজেই।
আপন হাতের জোরে
আমরা তুলি সৃজন করে,
আমরা প্রাণ দিয়ে ঘর বাঁধি, থাকি তার মাঝেই।

পঞ্চক। সর্বনাশ করলে রে— আমার সর্বনাশ করলে! আমার আর ভদ্রতা রাখলে না। এদের তালে তালে আমারও পা দুটো নেচে উঠছে। আমাকে সুদ্ধ এরা টানবে দেখছি। কোন্‌দিন আমিও লোহা পিটোব রে লোহা পিটোব— কিন্তু খেঁসারির ডাল— না না, পালা ভাই, পালা তোরা। দেখছিস না, পড়ব বলে পুঁথি সংগ্রহ করে এনেছি।

আর-একদল যূনকের প্রবেশ

প্রথম যূনক। ও ভাই পঞ্চক, দাদাঠাকুর আসছে।

দ্বিতীয় যূনক। এখন রাখো তোমার পুঁথি, রাখো— দাদাঠাকুর আসছে।

দাদাঠাকুরের প্রবেশ

প্রথম যূনক। দাদাঠাকুর!

দাদাঠাকুর। কী রে?

দ্বিতীয় যূনক। দাদাঠাকুর!

দাদাঠাকুর। কী চাই রে?

তৃতীয় যূনক। কিছু চাই নে— একবার তোমাকে ডেকে নিচ্ছি।

পঞ্চক। দাদাঠাকুর!

দাদাঠাকুর। কী ভাই, পঞ্চক যে!

পঞ্চক। ওরা সবাই তোমায় ডাকছে, আমারও কেমন ডাকতে ইচ্ছে হল। যতই ভাবছি ওদের দলে মিশব না ততই আরো জড়িয়ে পড়ছি।

প্রথম যূনক। আমাদের দাদাঠাকুরকে নিয়ে আবার দল কিসের? উনি আমাদের সব দলের শতদল পদ্ম।

পঞ্চক। ও ভাই, তোদের দাদাঠাকুরকে নিয়ে তোরা তো দিনরাত মাতামাতি করছিস, একবার আমাকে ছেড়ে দে, আমি একটু নিরালায় বসে কথা কই। ভয় নেই, ওঁকে আমাদের অচলায়তনে নিয়ে গিয়ে কপাট দিয়ে রাখব না।

প্রথম যূনক। নিয়ে যাও-না। সে তো ভালোই হয়। তা হলে কপাটের বাপের সাধ্য নেই বন্ধ থাকে। উনি গেলে তোমাদের অচলায়তনের পাথরগুলো সুদ্ধ নাচতে আরম্ভ করবে, পুঁথিগুলোর মধ্যে বাঁশি বাজবে।

পঞ্চক। দাদাঠাকুর, শুনছি আমাদের গুরু আসছেন।

দাদাঠাকুর। গুরু! কী বিপদ! ভারি উৎপাত করবে তা হলে তো।

পঞ্চক। একটু উৎপাত হলে যে বাঁচি। চুপচাপ থেকে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছে।

দাদাঠাকুর। আচ্ছা বেশ, তোমার গুরু এলে তাকে দেখে নেওয়া যাবে। এখন তুমি আছ কেমন বলো তো?

পঞ্চক। ভয়ানক টানাটানির মধ্যে আছি ঠাকুর। মনে মনে প্রার্থনা করছি গুরু এসে যে দিকে হোক এক দিকে আমাকে ঠিক করে রাখুন— হয় এখানকার খোলা হাওয়ার মধ্যে অভয় দিয়ে ছাড়া দিন, নয় তো খুব কষে পুঁথি চাপা দিয়ে রাখুন; মাথা থেকে পা পর্যন্ত আগাগোড়া একেবারে সমান চ্যাপ্টা হয়ে যাই।

একদল যূনকের প্রবেশ

দাদাঠাকুর। কী রে, এত ব্যস্ত হয়ে ছুটে এলি কেন?

প্রথম যূনক। চণ্ডককে মেরে ফেলেছে।

দাদাঠাকুর। কে মেরেছে?

দ্বিতীয় যূনক। স্থবিরপত্তনের রাজা।

পঞ্চক। আমাদের রাজা? কেন, মারতে গেল কেন?

দ্বিতীয় যূনক। স্থবিরক হয়ে ওঠবার জন্যে চণ্ডক বনের মধ্যে এক পোড়ো মন্দিরে তপস্যা করছিল। ওদের রাজা মন্থরগুপ্ত সেই খবর পেয়ে তাকে কেটে ফেলেছে।

তৃতীয় যূনক। আগে ওদের দেশের প্রাচীর পঁয়ত্রিশ হাত উঁচু ছিল, এবার আশি হাত উঁচু করবার জন্যে লোক লাগিয়ে দিয়েছে, পাছে পৃথিবীর সব লোক লাফ দিয়ে গিয়ে হঠাৎ স্থবিরক হয়ে ওঠে।

চতুর্থ যূনক। আমাদের দেশ থেকে দশজন যূনক ধরে নিয়ে গেছে, হয়তো ওদের কালঝণ্টি দেবীর কাছে বলি দেবে।

দাদাঠাকুর। চলো তবে।

প্রথম যূনক। কোথায়?
দাদাঠাকুর। স্থবিরপত্তনে।
দ্বিতীয় যূনক। এখনই?
দাদাঠাকুর। হাঁ এখনই।
সকলে। ওরে, চল্ রে চল্।
দাদাঠাকুর। আমাদের রাজার আদেশ আছে ওদের পাপ যখন প্রাচীরের আকার ধরে আকাশের জ্যোতি আচ্ছন্ন করতে উঠবে তখন সেই প্রাচীর ধুলোয় লুটিয়ে দিতে হবে।
প্রথম যূনক। দেব ধুলোয় লুটিয়ে।
সকলে। দেব লুটিয়ে।
দাদাঠাকুর। ওদের সেই ভাঙা প্রাচীরের উপর দিয়ে রাজপথ তৈরি করে দেব।
সকলে। হাঁ, রাজপথ তৈরি করে দেব।
দাদাঠাকুর। আমাদের রাজার বিজয়রথ তার উপর দিয়ে চলবে।
সকলে। হাঁ, চলবে, চলবে।
পঞ্চক। দাদাঠাকুর, এ কী ব্যাপার?
প্রথম যূনক। চলো, পঞ্চক, তুমি চলো।
দাদাঠাকুর। না না, পঞ্চক না। যাও ভাই, তুমি তোমার অচলায়তনে ফিরে যাও। যখন সময় হবে দেখা হবে।
পঞ্চক। কী জানি ঠাকুর, যদিও আমি কোনো কর্মের না, তবুও ইচ্ছে করছে তোমাদের সঙ্গে ছুটে বেরিয়ে পড়ি।
দাদাঠাকুর। না পঞ্চক, তোমার গুরু আসবেন, তুমি অপেক্ষা করো গে।

[প্রস্থান

৩

দর্ভকপল্লী

পঞ্চক ও দর্ভকদল

পঞ্চক। নির্বাসন, আমার নির্বাসন রে! বেঁচে গেছি, বেঁচে গেছি!
প্রথম দর্ভক। তোমাদের কী খেতে দেব ঠাকুর?
পঞ্চক। তোদের যা আছে তাই আমরা খাব।
দ্বিতীয় দর্ভক। আমাদের খাবার? সে কি হয়? সে যে সব ছোঁওয়া হয়ে গেছে।
পঞ্চক। সেজন্য ভাবিস নে ভাই। পেটের খিদে যে আগুন, সে কারও ছোঁয়া মানে না, সবই পবিত্র করে। ওরে, তোরা সকালবেলায় করিস কী বল তো। ষড়ক্ষরিত দিয়ে একবার ঘটশুদ্ধি করে নিবি নে?
তৃতীয় দর্ভক। ঠাকুর, আমরা নীচ দর্ভক জাত— আমরা ও-সব কিছুই জানি নে। আজ কত পুরুষ ধরে এখানে বাস করে আসছি, কোনোদিন তো তোমাদের পায়ের ধুলো পড়ে নি। আজ তোমাদের মন্ত্র পড়ে আমাদের বাপ-পিতামহকে উদ্ধার করে দাও ঠাকুর।
পঞ্চক। সর্বনাশ! বলিস কী? এখানেও মন্ত্র পড়তে হবে! তা হলে নির্বাসনের দরকার কী ছিল? তা, সকালবেলা তোরা কী করিস বল তো?
প্রথম দর্ভক। আমরা শাস্ত্র জানি নে, আমরা নাম গান করি।
পঞ্চক। সে কী রকম ব্যাপার? শোনা দেখি একটা।
দ্বিতীয় দর্ভক। ঠাকুর, সে তুমি শুনে হাসবে।

পঞ্চক। আমিই তো ভাই, এতদিন লোক হাসিয়ে আসছি— তোরা আমাকেও হাসাবি— শুনেও মন খুশি হয়। কিছু ভাবিস নে— নির্ভয়ে শুনিয়ে দে।

প্রথম দর্ভক। আচ্ছা ভাই, আয় তবে— গান ধর।

গান

ও অকূলের কূল, ও অগতির গতি,
ও অনাথের নাথ, ও পতিতের পতি।
ও নয়নের আলো, ও রসনার মধু,
ও রতনের হার, ও পরানের বঁধু।
ও অপরূপ রূপ, ও মনোহর কথা,
ও চরমের সুখ, ও মরমের ব্যথা।
ও ভিখারির ধন, ও অবোলার বোল—
ও জনমের দোলা, ও মরণের কোল।

পঞ্চক। দে ভাই, আমার মন্ত্রতন্ত্র সব ভুলিয়ে দে, আমার বিদ্যাসাধ্যি সব কেড়ে নে, দে আমাকে তোদের ঐ গান শিখিয়ে দে।

আচার্যের প্রবেশ

প্রথম দর্ভক। বাবাঠাকুর, আমাদের সমস্ত পাড়া আজ ত্রাণ পেয়ে গেল। এতদিন তোমার চরণধুলো তো এখানে পড়ে নি।

আচার্য। সে আমার অভাগ্য, সে আমারই অভাগ্য।

দ্বিতীয় দর্ভক। বাবা, তোমার স্নানের জল কাকে দিয়ে তোলাব ? এখানে তো—

আচার্য। বাবা, তোরাই তুলে আনবি।

প্রথম দর্ভক। আমরা তুলে আনব— সে কি হয় !

আচার্য। হাঁ বাবা, তোদের তোলা জলে আজ আমার অভিষেক হবে।

দ্বিতীয় দর্ভক। ওরে চল্ তবে ভাই চল্। আমাদের পাটলা নদী থেকে জল আনি গে।

[দর্ভকদলের প্রস্থান

পঞ্চক। মনে হচ্ছে যেন ভিজে মাটির গন্ধ পাচ্ছি, কোথায় যেন বর্ষা নেমেছে।

আচার্য। ঐ, পঞ্চক শুনতে পাচ্ছ কি ?

পঞ্চক। কী বলুন দেখি ?

আচার্য। আমার মনে হচ্ছে যেন সুভদ্র কাঁদছে।

পঞ্চক। এখান থেকে কি শোনা যাবে ? এ বোধ হয় আর কোনো শব্দ।

আচার্য। তা হবে পঞ্চক, আমি তার কান্না আমার বুকের মধ্যে করে এনেছি। তার কান্নাটা এমন করে আমাকে বেজেছে কেন জান ? সে যে কান্না রাখতে পারে না তবু কিছুতে মানতে চায় না সে কাঁদছে।

পঞ্চক। এতক্ষণে ওরা তাকে মহাতামসে বসিয়েছে— আর সকলে মিলে খুব দূরে থেকে বাহবা দিয়ে বলছে, সুভদ্র দেবশিশু। আর কিছু না, আমি যদি রাজা হতুম তা হলে ওদের সবাইকে কানে ধরে দেবতা করে দিতুম— কিছুতে ছাড়তুম না।

আচার্য। ওরা ওদের দেবতাকে কাঁদাচ্ছে পঞ্চক। সেই দেবতারই কান্নায় এ রাজ্যের সকল আকাশ আকুল হয়ে উঠেছে। তবু ওদের পাষাণের বেড়া এখনো শতধা বিদীর্ণ হয়ে গেল না।

দর্ভকদলের প্রবেশ

পঞ্চক। কী ভাই, তোরা এত ব্যস্ত কিসের ?

প্রথম দর্ভক। শুনছি অচলায়তনে কারা সব লড়াই করতে এসেছে।

আচার্য। লড়াই কিসের ? আজ তো গুরু আসবার কথা।

দ্বিতীয় দর্ভক। না না, লড়াই হচ্ছে, খবর পেয়েছি। সমস্ত ভেঙেচুরে একাকার করে দিলে যে।

তৃতীয় দর্ভক। বাবাঠাকুর, তোমরা যদি হুকুম কর আমরা যাই ঠেকাই গিয়ে।

আচার্য। ওখানে তো লোক ঢের আছে, তোমাদের ভয় নেই বাবা।

প্রথম দর্ভক। লোক তো আছে, কিন্তু তারা লড়াই করতে পারবে কেন ?

দ্বিতীয় দর্ভক। শুনেছি কতরকম মন্ত্রলেখা তাগাতাবিজ দিয়ে তারা দুখানা হাত আগাগোড়া কষে বেঁধে রেখেছে। খোলে না, পাছে কাজ করতে গেলেই তাদের হাতের গুণ নষ্ট হয়।

পঞ্চক। আচার্যদেব, এদের সংবাদটা সত্যই হবে। কাল সমস্ত রাত মনে হচ্ছিল, চার দিকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন ভেঙেচুরে পড়ছে। ঘুমের ঘোরে ভাবছিলুম, স্বপ্ন বুঝি।

আচার্য। তবে কি গুরু আসেন নি ?

পঞ্চক। হয়তো বা দাদা ভুল করে আমার গুরুরই সঙ্গে লড়াই বাধিয়ে বসেছেন। আটক নেই। রাত্রে তাঁকে হঠাৎ দেখে হয়তো যমদূত বলে ভুল করেছিলেন।

প্রথম দর্ভক। আমরা শুনেছি, কে বলছিল গুরুও এসেছেন।

আচার্য। গুরুও এসেছেন ! সে কী রকম হল ?

পঞ্চক। তবে লড়াই করতে কারা এসেছে বলো তো।

প্রথম দর্ভক। লোকের মুখে শুনি তাদের নাকি বলে, দাদাঠাকুরের দল।

পঞ্চক। দাদাঠাকুরের দল ! বল্ বল্ শুনি, ঠিক বলছিস তো রে ?

প্রথম দর্ভক। বাবাঠাকুর, হুকুম করো, একবার ওদের সঙ্গে লড়ে আসি— দেখিয়ে দিই, এখানে মানুষ আছে।

পঞ্চক। আয়-না ভাই, আমিও তোদের সঙ্গে চলব রে।

দ্বিতীয় দর্ভক। তুমিও লড়বে নাকি ঠাকুর ?

পঞ্চক। হাঁ লড়ব।

আচার্য। কী বলছ পঞ্চক ! তোমাকে লড়তে কে ডাকছে ?

মালীর প্রবেশ

মালী। আচার্যদেব, আমাদের গুরু আসছেন।

আচার্য। বলিস কী ? গুরু ? তিনি এখানে আসছেন ? আমাকে আহ্বান করলেই তো আমি যেতুম।

প্রথম দর্ভক। এখানে তোমাদের গুরু এলে তাঁকে বসাব কোথায় ?

দ্বিতীয় দর্ভক। বাবাঠাকুর, তুমি এখানে তাঁর বসবার জায়গাটাকে একটু শোধন করে নাও— আমরা তফাতে সরে যাই।

আর-একদল দর্ভকের প্রবেশ

প্রথম দর্ভক। বাবাঠাকুর, এ তোমাদের গুরু নয়— সে এ পাড়ায় আসবে কেন ? এ-যে আমাদের গোঁসাই।

দ্বিতীয় দর্ভক। আমাদের গোঁসাই ?

প্রথম দর্ভক। হাঁ রে হাঁ, আমাদের গোঁসাই ! এমন সাজ তার আর কখনো দেখি নি। একেবারে চোখ ঝলসে যায়।

তৃতীয় দর্ভক। ঘরে কী আছে রে ভাই, সব বের কর।

দ্বিতীয় দর্ভক। বনের জাম আছে রে।

চতুর্থ দর্ভক। আমার ঘরে খেজুর আছে।

প্রথম দর্ভক। কালো গোরুর দুধ শিগগির দুয়ে আন দাদা

দাদাঠাকুরের প্রবেশ

আচার্য। (প্রণাম করিয়া) জয় গুরুজির জয়!

পঞ্চক। এ কি! এ যে দাদাঠাকুর! গুরু কোথায়?

দর্ভকদল। গোঁসাই ঠাকুর! প্রণাম হই। খবর দিয়ে এলে না কেন? তোমার ভোগ যে তৈরি হয় নি।

দাদাঠাকুর। কেন ভাই, তোদের ঘরে আজ রান্না চড়ে নি নাকি? তোরাও মন্ত্র নিয়ে উপোস করতে আরম্ভ করেছিস না কি রে?

প্রথম দর্ভক। আমরা আজ শুধু মাষকলাই আর ভাত চড়িয়েছি। ঘরে আর-কিছু ছিল না।

দাদাঠাকুর। আমারও তাতেই হয়ে যাবে।

পঞ্চক। দাদাঠাকুর, আমার ভারি গর্ব ছিল এ রাজ্যে একলা আমিই কেবল চিনি তোমাকে। কারও যে চিনতে আর বাকি নেই!

প্রথম দর্ভক। ঐ তো আমাদের গোঁসাই— পূর্ণিমার দিনে এসে আমাদের পিঠে খেয়ে গেছে, তার পর এই কতদিন পরে দেখা। চল ভাই, আমাদের যা আছে সব সংগ্রহ করে আনি।

[প্রস্থান

দাদাঠাকুর। আচার্য, তুমি এ কী করেছ!

আচার্য। কী যে করেছি তা বোঝবারও শক্তি আমার নেই। তবে এইটুকু বুঝি— আমি সব নষ্ট করেছি।

দাদাঠাকুর। যিনি তোমাকে মুক্তি দেবেন তাঁকেই তুমি কেবল বাঁধবার চেষ্টা করেছ।

আচার্য। কিন্তু বাঁধতে তো পারি নি ঠাকুর। তাঁকে বাঁধছি মনে করে যতগুলো পাক দিয়েছি সব পাক কেবল নিজের চার দিকেই জড়িয়েছি। যে হাত দিয়ে সেই বাঁধন খোলা যেতে পারত সেই হাতটা সুদ্ধ বেঁধে ফেলেছি।

দাদাঠাকুর। যিনি সব জায়গায় আপনি ধরা দিয়ে বসে আছেন তাঁকে একটা জায়গায় ধরতে গেলেই তাঁকে হারাতে হয়।

আচার্য। আদেশ করো প্রভু। ভুল করেছিলুম জেনেও সে ভুল ভাঙতে পারি নি। পথ হারিয়েছি তা জানতুম, যতই চলছি ততই পথ হতে কেবল বেশি দূরে গিয়ে পড়ছি তাও বুঝতে পেরেছিলুম, কিন্তু ভয়ে থামতে পারছিলুম না। এই চক্রে হাজার বার ঘুরে বেড়ানোকেই পথ খুঁজে পাবার উপায় বলে মনে করেছিলুম।

দাদাঠাকুর। যে চক্র কেবল অভ্যাসের চক্র, যা কোনো জায়গাতেই নিয়ে যায় না, কেবল নিজের মধ্যেই ঘুরিয়ে মারে, তার থেকেই বের করে সোজা রাস্তায় বিশ্বের সকল যাত্রীর সঙ্গে দাঁড় করিয়ে দেবার জন্যেই আমি আজ এসেছি।

আচার্য। ধন্য করেছ!— কিন্তু এতদিন আস নি কেন প্রভু? আমাদের আয়তনের পাশেই এই দর্ভকপাড়ায় তুমি আনাগোনা করছ, আর কত বৎসর হয়ে গেল আমাদের আর দেখা দিলে না।

দাদাঠাকুর। এদের দেখা দেওয়ার রাস্তা যে সোজা। তোমাদেব সঙ্গে দেখা করা তো সহজ করে রাখ নি।

পঞ্চক। ভালোই করেছি, তোমার শক্তি পরীক্ষা করে নিয়েছি। তুমি আমাদের পথ সহজ করে দেবে, কিন্তু তোমার পথ সহজ নয়। এখন, আমি ভাবছি তোমাকে ডাকব কী বলে? দাদাঠাকুর, না গুরু।

দাদাঠাকুর। যে জানতে চায় না যে, আমি তাকে চালাচ্ছি আমি তার দাদাঠাকুর, আর যে আমার আদেশ নিয়ে চলতে চায় আমি তার গুরু।

পঞ্চক। প্রভু, তুমি তা হলে আমার দুইই। আমাকে আমিই চালাচ্ছি আর আমাকে তুমিই চালাচ্ছ, এই দুটোই আমি মিশিয়ে জানতে চাই। আমি তো যূনক নই, তোমাকে মেনে চলতে ভয় নেই। তোমার মুখের আদেশকেই আনন্দে আমার মনের ইচ্ছা করে তুলতে পারব। এবার তবে তোমার সঙ্গে তোমারই বোঝা মাথায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ি ঠাকুর।

দাদাঠাকুর। আমি তোমার জায়গা ঠিক করে রেখেছি।

পঞ্চক। কোথায় ঠাকুর?

দাদাঠাকুর। ঐ অচলায়তনে।

পঞ্চক। আবার অচলায়তনে? আমার কারাদণ্ডের মেয়াদ ফুরোয় নি?

দাদাঠাকুর। কারাগার যা ছিল সে তো আমি ভেঙে ফেলেছি, এখন সেই উপকরণ দিয়ে সেইখানেই তোমাকে মন্দির গেঁথে তুলতে হবে।

পঞ্চক। কিন্তু অচলায়তনের লোকে যে আমাকে আপন বলে গ্রহণ করবে না প্রভু।

দাদাঠাকুর। ওরা তোমাকে গ্রহণ করতে চাচ্ছে না, সেইজন্যেই ওখানে তোমার সব চেয়ে দরকার। ওরা তোমাকে *ঠেলে* দিচ্ছে বলেই তুমি ওদের *ঠেলতে* পারবে না।

পঞ্চক। আমাকে কী করতে হবে?

দাদাঠাকুর। যে যেখানে ছড়িয়ে আছে সবাইকে ডাক দিয়ে আনতে হবে।

পঞ্চক। সবাইকে কি কুলোবে?

দাদাঠাকুর। না যদি কুলোয় তা হলে দেয়াল আবার আর-একদিন ভাঙতেই হবে। আমি এখন চললুম অচলায়তনের দ্বার খুলতে।

[প্রস্থান

৪

অচলায়তন

মহাপঞ্চক, সঞ্জীব, বিশ্বম্ভর, জয়োত্তম

মহাপঞ্চক। তোমরা অত ব্যস্ত হয়ে পড়ছ কেন? কোনো ভয় নেই।

বিশ্বম্ভর। তুমি তো বলছ ভয় নেই, এই-যে খবর এল, শত্রুসৈন্য অচলায়তনের প্রাচীর ফুটো করে দিয়েছে।

মহাপঞ্চক। এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। শিলা জলে ভাসে! ম্লেচ্ছরা অচলায়তনের প্রাচীর ফুটো করে দেবে! পাগল হয়েছ?

সঞ্জীব। কে যে বললে দেখে এসেছে।

মহাপঞ্চক। সে স্বপ্ন দেখেছে।

জয়োত্তম। আজই তো আমাদের গুরুর আসবার কথা।

মহাপঞ্চক। তাঁর জন্যে সমস্ত আয়োজন ঠিক হয়ে গেছে; কেবল যে ছেলের মা-বাপ ভাই-বোন কেউ মরে নি এমন নবম গর্ভের সন্তান এখনো জুটিয়ে আনতে পারলে না— দ্বারে দাঁড়িয়ে কে যে মহারক্ষা পড়বে ঠিক করতে পারছি নে।

সঞ্জীব। গুরু এলে তাঁকে চিনে নেবে কে? আচার্য অদীনপুণ্য তাঁকে জানতেন। আমরা তো কেউ তাঁকে দেখি নি।

মহাপঞ্চক। আমাদের আয়তনে যে শাঁখ বাজায় সেই বৃদ্ধ তাঁকে দেখেছে। আমাদের পূজার ফুল যে জোগায় সেও তাঁকে জানে।

বিশ্বম্ভর। ঐ যে উপাধ্যায় ব্যস্ত হয়ে ছুটে আসছেন।

মহাপঞ্চক। নিশ্চয় গুরু আসার সংবাদ পেয়েছেন। কিন্তু মহারক্ষা পাঠের কী করা যায়। ঠিক লক্ষণসম্পন্ন ছেলে তো পাওয়া গেল না।

উপাধ্যায়ের প্রবেশ

মহাপঞ্চক। কত দূর ?

উপাধ্যায়। কত দূর কী ? এসে পড়েছে যে।

মহাপঞ্চক। কই দ্বারে তো এখনো শাঁখ বাজালে না ?

উপাধ্যায়। বিশেষ দরকার দেখি নে— কারণ দ্বারের চিহ্নও দেখতে পাচ্ছি নে— ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে।

মহাপঞ্চক। বল কী, দ্বার ভেঙেছে ?

উপাধ্যায়। শুধু দ্বার নয়, প্রাচীরগুলোকে এমনি সমান করে শুইয়ে দিয়েছে যে তাদের সম্বন্ধে আর কোনো চিন্তা করবার দরকার নেই। ঐ দেখছ না আলো।

মহাপঞ্চক। কিন্তু আমাদের দৈবজ্ঞ যে গণনা করে স্পষ্ট দেখিয়ে দিয়ে গেল যে—

উপাধ্যায়। তার চেয়ে ঢের স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে শত্রুসৈন্যদের রক্তবর্ণ টুপিগুলো। এই যে সব ফাঁক হয়ে গেছে।

ছাত্রগণ। কী সর্বনাশ!

সঞ্জীব। কিসের মন্ত্র তোমার মহাপঞ্চক ?

বিশ্বম্ভর। আমি তো তখনই বলেছিলুম, এ-সব কাজ এই কাঁচা বয়সের পুঁথিপড়া অকালপক্বদের দিয়ে হবার নয়।

সঞ্জীব। কিন্তু এখন করা যায় কী ?

জয়োত্তম। আমাদের আচার্যদেবকে এখনই ফিরিয়ে আনি গে। তিনি থাকলে এ বিপত্তি ঘটতেই পারত না। হাজার হোক লোকটা পাকা।

সঞ্জীব। কিন্তু দেখো মহাপঞ্চক, আমাদের আয়তনের যদি কোনো বিপত্তি ঘটে তা হলে তোমাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলব।

উপাধ্যায়। সে পরিশ্রমটা তোমাদের করতে হবে না, উপযুক্ত লোক আসছে।

মহাপঞ্চক। তোমরা মিথ্যা বিচলিত হচ্ছ। বাইরের প্রাচীর ভাঙতে পারে, কিন্তু ভিতরের লোহার দরজা বন্ধ আছে। সে যখন ভাঙবে তখন চন্দ্রসূর্য নিবে যাবে। আমি অভয় দিচ্ছি তোমরা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে অচলায়তনের রক্ষক-দেবতার আশ্চর্য শক্তি দেখে নাও।

উপাধ্যায়। তার চেয়ে দেখি কোন্ দিক দিয়ে বেরোবার রাস্তা।

বিশ্বম্ভর। আমাদেরও তো সেই ইচ্ছা। কিন্তু এখান থেকে বেরোবার পথ যে জানিই নে। কোনোদিন বেরোতে হবে বলে স্বপ্নেও মনে করি নি।

সঞ্জীব। শুনছ— ঐ শুনছ, ভেঙে পড়ল সব।

ছাত্রগণ। কী হবে আমাদের। নিশ্চয় দরজা ভেঙেছে। এই যে একেবারে নীল আকাশ।

বালকদলের প্রবেশ

উপাধ্যায়। কী রে তোরা সব নৃত্য করছিস কেন ?

প্রথম বালক। আজ এ কী মজা হল।

উপাধ্যায়। মজাটা কী রকম শুনি ?

দ্বিতীয় বালক। আজ চার দিক থেকেই আলো আসছে— সব যেন ফাঁক হয়ে গেছে।

তৃতীয় বালক। এত আলো তো আমরা কোনোদিন দেখি নি।

প্রথম বালক। কোথাকার পাখির ডাক এখান থেকেই শোনা যাচ্ছে।

দ্বিতীয় বালক। এ-সব পাখির ডাক আমরা তো কোনোদিন শুনি নি। এ তো আমাদের খাঁচার ময়নার মতো একেবারেই নয়।

প্রথম বালক। আজ আমাদের খুব ছুটতে ইচ্ছে করছে। তাতে কি দোষ হবে মহাপঞ্চকদাদা ?

মহাপঞ্চক। আজকের কথা ঠিক বলতে পারছি নে। আজ কোনো নিয়ম রক্ষা করা চলবে বলে বোধ হচ্ছে না।

প্রথম বালক। আজ তা হলে আমাদের ষড়াসন বন্ধ?

মহাপঞ্চক। হাঁ, বন্ধ।

সকলে। ওরে কী মজা রে কী মজা।

দ্বিতীয় বালক। আজ পঙ্‌ক্তিধৌতির দরকার নেই?

মহাপঞ্চক। না।

সকলে। ওরে কী মজা। আঃ আজ চার দিকে কী আলো।

জয়োত্তম। আমারও মনটা নেচে উঠেছে বিশ্বম্ভর! এ কি ভয়, না আনন্দ, কিছুই বুঝতে পারছি নে।

বিশ্বম্ভর। আজ একটা অদ্ভুত কাণ্ড হচ্ছে জয়োত্তম।

সঞ্জীব। কিন্তু ব্যাপারটা যে কী, ভেবে উঠতে পারছি নে। ওরে ছেলেগুলো, তোরা হঠাৎ এত খুশি হয়ে উঠলি কেন বল দেখি।

প্রথম বালক। দেখছ না, সমস্ত আকাশটা যেন ঘরের মধ্যে দৌড়ে এসেছে।

দ্বিতীয় বালক। মনে হচ্ছে ছুটি— আমাদের ছুটি।

[বালকদের প্রস্থান

জয়োত্তম। দেখো মহাপঞ্চকদাদা, আমার মনে হচ্ছে ভয় কিছুই নেই— নইলে ছেলেদের মন এমন অকারণে খুশি হয়ে উঠল কেন?

মহাপঞ্চক। ভয় নেই সে তো আমি বরাবর বলে আসছি।

শঙ্খবাদক ও মালীর প্রবেশ

উভয়ে। গুরু আসছেন।

সকলে। গুরু!

মহাপঞ্চক। শুনলে তো। আমি নিশ্চয় জানতুম তোমাদের আশঙ্কা বৃথা।

সকলে। ভয় নেই আর ভয় নেই।

বিশ্বম্ভর। মহাপঞ্চক যখন আছেন তখন কি আমাদের ভয় থাকতে পারে।

সকলে। জয় আচার্য মহাপঞ্চকের।

যোদ্ধৃবেশে দাদাঠাকুরের প্রবেশ

শঙ্খবাদক ও মালী। (প্রণাম করিয়া) জয় গুরুজির জয়!

সকলে স্তম্ভিত

মহাপঞ্চক। উপাধ্যায়, এই কি গুরু?

উপাধ্যায়। তাই তো শুনছি।

মহাপঞ্চক। তুমি কি আমাদের গুরু?

দাদাঠাকুর। হাঁ! তুমি আমাকে চিনবে না কিন্তু আমিই তোমাদের গুরু।

মহাপঞ্চক। তুমি গুরু? তুমি আমাদের সমস্ত নিয়ম লঙ্ঘন করে এ কোন্ পথ দিয়ে এলে? তোমাকে কে মানবে?

দাদাঠাকুর। আমাকে মানবে না জানি, কিন্তু আমিই তোমাদের গুরু।

মহাপঞ্চক। তুমি গুরু? তবে এই শত্রুবেশে কেন?

দাদাঠাকুর। এই তো আমার গুরুর বেশ। তুমি যে আমার সঙ্গে লড়াই করবে— সেই লড়াই আমার গুরুর অভ্যর্থনা।

মহাপঞ্চক। কেন তুমি আমাদের প্রাচীর ভেঙে দিয়ে এলে?

দাদাঠাকুর। তুমি কোথাও তোমার গুরুর প্রবেশের পথ রাখ নি।

মহাপঞ্চক। তুমি কি মনে করেছ তুমি অস্ত্র হাতে করে এসেছ বলে আমি তোমার কাছে হার মানব?

দাদাঠাকুর। না, এখনই না। কিন্তু দিনে দিনে হার মানতে হবে, পদে পদে।

মহাপঞ্চক। আমাকে নিরস্ত্র দেখে ভাবছ আমি তোমাকে আঘাত করতে পারি নে?

দাদাঠাকুর। আঘাত করতে পার কিন্তু আহত করতে পার না— আমি যে তোমার গুরু।

মহাপঞ্চক। উপাধ্যায়, তোমরা এঁকে প্রণাম করবে নাকি?

উপাধ্যায়। দয়া করে উনি যদি আমাদের প্রণাম গ্রহণ করেন তা হলে প্রণাম করব বৈকি— তা নইলে যে—

মহাপঞ্চক। না, আমি তোমাকে প্রণাম করব না।

দাদাঠাকুর। আমি তোমার প্রণাম গ্রহণ করব না— আমি তোমাকে প্রণত করব।

মহাপঞ্চক। তুমি আমাদের পূজা নিতে আস নি?

দাদাঠাকুর। আমি তোমাদের পূজা নিতে আসি নি, অপমান নিতে এসেছি।

মহাপঞ্চক। তোমার পশ্চাতে অস্ত্রধারী এ কারা?

দাদাঠাকুর। এরা আমার অনুবর্তী— এরা যূনক।

সকলে। যূনক!

মহাপঞ্চক। এরাই তোমার অনুবর্তী?

দাদাঠাকুর। হাঁ।

মহাপঞ্চক। এই মন্ত্রহীন কর্মকাণ্ডহীন ম্লেচ্ছদল! আমি এই আয়তনের আচার্য— আমি তোমাকে আদেশ করছি তুমি এখনই ঐ ম্লেচ্ছদলকে সঙ্গে নিয়ে বাহির হয়ে যাও।

দাদাঠাকুর। আমি যাকে আচার্য নিযুক্ত করব সেই আচার্য; আমি যা আদেশ করব সেই আদেশ।

মহাপঞ্চক। উপাধ্যায়, আমরা এমন করে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না। এসো আমরা এদের এখান থেকে বাহির করে দিয়ে আমাদের আয়তনের সমস্ত দরজাগুলো আবার একবার দ্বিগুণ দৃঢ় করে বন্ধ করি।

উপাধ্যায়। এরাই আমাদের বাহির করে দেবে, সেই সম্ভাবনাটাই প্রবল বলে বোধ হচ্ছে।

প্রথম যূনক। অচলায়তনের দরজার কথা বলছ— সে আরো আকাশের সঙ্গে দিব্যি সমান করে দিয়েছি।

উপাধ্যায়। বেশ করেছ ভাই। আমাদের ভারি অসুবিধা হচ্ছিল। এত তালাচাবির ভাবনাও ভাবতে হত।

মহাপঞ্চক। পাথরের প্রাচীর তোমরা ভাঙতে পার, লোহার দরজা তোমরা খুলতে পার, কিন্তু আমি আমার ইন্দ্রিয়ের সমস্ত দ্বার রোধ করে এই বসলুম— যদি প্রায়োপবেশনে মরি তবু তোমাদের হাওয়া তোমাদের আলো লেশমাত্র আমাকে স্পর্শ করতে দেব না।

প্রথম যূনক। এ পাগলটা কোথাকার রে। এই তলোয়ারের ডগা দিয়ে ওর মাথার খুলিটা ফাঁক করে দিলে ওর বুদ্ধিতে একটু হাওয়া লাগতে পারে।

মহাপঞ্চক। কিসের ভয় দেখাও আমায়। তোমরা মেরে ফেলতে পার, তার বেশি ক্ষমতা তোমাদের নেই।

প্রথম যূনক। ঠাকুর, এই লোকটাকে বন্দী করে নিয়ে যাই— আমাদের দেশের লোকের ভারি মজা লাগবে।

দাদাঠাকুর। ওকে বন্দী করবে তোমরা? এমন কী বন্ধন তোমাদের হাতে আছে।

দ্বিতীয় যূনক। ওকে কি কোনো শাস্তিই দেব না?

দাদাঠাকুর। শাস্তি দেবে! ওকে স্পর্শ করতেও পারবে না। ও আজ যেখানে বসেছে সেখানে তোমাদের তলোয়ার পৌঁছোয় না।

বালকদলের প্রবেশ

সকলে। তুমি আমাদের গুরু?
দাদাঠাকুর। হাঁ, আমি তোমাদের গুরু।
সকলে। আমরা প্রণাম করি।
দাদাঠাকুর। বৎস, তোমরা মহাজীবন লাভ করো।
প্রথম বালক। ঠাকুর, তুমি আমাদের কী করবে?
দাদাঠাকুর। আমি তোমাদের সঙ্গে খেলব।
সকলে। খেলবে?
দাদাঠাকুর। নইলে তোমাদের গুরু হয়ে সুখ কিসের?
সকলে। কোথায় খেলবে?
দাদাঠাকুর। আমার খেলার মস্ত মাঠ আছে।
প্রথম বালক। মস্ত! এই ঘরের মতো মস্ত?
দাদাঠাকুর। এর চেয়ে অনেক বড়ো।
দ্বিতীয় বালক। এর চেয়েও বড়ো? ঐ আঙিনাটার মতো?
দাদাঠাকুর। তার চেয়ে বড়ো।
দ্বিতীয় বালক। তার চেয়ে বড়ো! উঃ কী ভয়ানক!
প্রথম বালক। সেখানে খেলতে গেলে পাপ হবে না?
দাদাঠাকুর। কিসের পাপ?
দ্বিতীয় বালক। খোলা জায়গায় গেলে পাপ হয় না?
দাদাঠাকুর। খোলা জায়গাতেই সব পাপ পালিয়ে যায়।
সকলে। কখন নিয়ে যাবে?
দাদাঠাকুর। এখানকার কাজ শেষ হলেই।
জয়োত্তম। (প্রণাম করিয়া) প্রভু, আমিও যাব।
বিশ্বম্ভর। সঞ্জীব, আর দ্বিধা করলে কেবল সময় নষ্ট হবে। প্রভু, ঐ বালকের সঙ্গে আমাদেরও ডেকে নাও।
সঞ্জীব। মহাপঞ্চকদাদা, তুমিও এসো-না।
মহাপঞ্চক। না, আমি না।

সুভদ্রের প্রবেশ

সুভদ্র। গুরু!
দাদাঠাকুর। কী বাবা।
সুভদ্র। আমি যে পাপ করেছি তার তো প্রায়শ্চিত্ত শেষ হল না।
দাদাঠাকুর। তার আর কিছু বাকি নেই।
সুভদ্র। বাকি নেই?
দাদাঠাকুর। না। আমি সমস্ত চুরমার করে ধুলোয় লুটিয়ে দিয়েছি।
সুভদ্র। একজটা দেবী—
দাদাঠাকুর। একজটা দেবী! উত্তরের দিকের দেয়ালটা ভাঙবামাত্রই একজটা দেবীর সঙ্গে আমাদের এমনি মিল হয়ে গেল যে সে আর কোনো দিন জটা দুলিয়ে কাউকে ভয় দেখাবে না। এখন তাকে দেখলে মনে হবে সে আকাশের আলো— তার সমস্ত জটা আষাঢ়ের নবীন মেঘের মধ্যে জড়িয়ে গিয়েছে।

সুভদ্র। এখন আমি কী করব?

পঞ্চক। এখন তুমি আছ ভাই, আর আমি আছি। দুজনে মিলে কেবলই উত্তর দক্ষিণ পুব পশ্চিমের সমস্ত দরজাজানালাগুলো খুলে খুলে বেড়াব।

যূনক ও দর্ভকদলের প্রবেশ ও গুরুকে প্রদক্ষিণ করিয়া গান

ভেঙেছে দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়,
তোমারি হউক জয়।
তিমির-বিদার উদার অভ্যুদয়,
তোমারি হউক জয়।
হে বিজয়ী বীর, নবজীবনের প্রাতে
নবীন আশার খড়্গ তোমার হাতে,
জীর্ণ আবেশ কাটো সুকঠোর ঘাতে,
বন্ধন হোক ক্ষয়।
তোমারি হউক জয়।
এসো দুঃসহ, এসো এসো নির্দয়,
তোমারি হউক জয়।
এসো নির্মল, এসো এসো নির্ভয়,
তোমারি হউক জয়।
প্রভাতসূর্য, এসেছ রুদ্রসাজে,
দুঃখের পথে তোমার তূর্য বাজে,
অরুণবহ্নি জ্বালাও চিত্তমাঝে
মৃত্যুর হোক লয়।
তোমারি হউক জয়।

অরূপরতন

ভূমিকা

সুদর্শনা রাজাকে বাহিরে খুঁজিয়াছিল। সেখানে বস্তুকে চোখে দেখা যায়, হাতে ছোঁওয়া যায়, ভাণ্ডারে সঞ্চয় করা যায়, যেখানে ধনজন খ্যাতি, সেইখানে সে বরমাল্য পাঠাইয়াছিল। বুদ্ধির অভিমানে সে নিশ্চয় স্থির করিয়াছিল যে, বুদ্ধির জোরে সে বাহিরেই জীবনের সার্থকতা লাভ করিবে। তাহার সঙ্গিনী সুরঙ্গমা তাহাকে বলিয়াছিল, অন্তরের নিভৃত কক্ষে যেখানে প্রভু স্বয়ং আসিয়া আহ্বান করেন সেখানে তাঁহাকে চিনিয়া লইলে তবেই বাহিরে সর্বত্র তাঁহাকে চিনিয়া লইতে ভুল হইবে না ;— নহিলে যাহারা মায়ার দ্বারা চোখ ভোলায় তাহাদিগকে রাজা বলিয়া ভুল হইবে। সুদর্শনা এ কথা মানিল না। সে সুবর্ণের রূপ দেখিয়া তাহার কাছে মনে মনে আত্মসমর্পণ করিল। তখন কেমন করিয়া তাহার চারি দিকে আগুন লাগিল, অন্তরের রাজাকে ছাড়িতেই কেমন করিয়া তাহাকে লইয়া বাহিরের নানা মিথ্যা রাজার দলে লড়াই বাধিয়া গেল, সেই অগ্নিদাহের ভিতর দিয়া কেমন করিয়া আপন রাজার সহিত তাহার পরিচয় ঘটিল, কেমন করিয়া দুঃখের আঘাতে তাহার অভিমান ক্ষয় হইল এবং অবশেষে কেমন করিয়া হার মানিয়া প্রাসাদ ছাড়িয়া পথে দাঁড়াইয়া তবে সে তাহার সেই প্রভুর সঙ্গলাভ করিল, যে-প্রভু সকল দেশে, সকল কালে, সকল রূপে, আপন অন্তরের আনন্দরসে যাঁহাকে উপলব্ধি করা যায়— এ নাটকে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

এই নাট্য-রূপকটি 'রাজা' নাটকের অভিনয়যোগ্য সংক্ষিপ্ত সংস্করণ— নূতন করিয়া পুনর্লিখিত।

মাঘ ১৩২৬ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রস্তাবনা

গান

চোখ যে ওদের ছুটে চলে গো—
ধনের বাটে মানের বাটে রূপের হাটে
দলে দলে গো ॥
দেখবে বলে করেছে পণ,
দেখবে কারে জানে না মন,
প্রেমের দেখা দেখে যখন
চোখ ভেসে যায় চোখের জলে গো ॥
আমায় তোরা ডাকিস না রে,
আমি যাব খেয়ার ঘাটে অরূপ রসের পারাবারে
উদাস হাওয়া লাগে পালে,
পারের পানে যাবার কালে
চোখ দুটোরে ডুবিয়ে যাব
অকূল সুধা-সাগর তলে গো ॥

অরূপরতন

১

প্রাসাদকুঞ্জ

সুরঙ্গমা। প্রভু, একটা কথা আছে।

নেপথ্যে। কী বলো।

সুরঙ্গমা। রাজকন্যা সুদর্শনা যে তোমাকেই বরণ করতে চায়, তাকে কি দয়া করবে না?

নেপথ্যে। সে কি আমাকে চেনে?

সুরঙ্গমা। না প্রভু, সে তোমাকে চিনতে চায়। তুমি তাকে নিজেই চিনিয়ে দেবে, নইলে তার সাধ্য কী।

নেপথ্যে। অনেক বাধা আছে।

সুরঙ্গমা। তাই তো তাকে কৃপা করতে হবে।

নেপথ্যে। বহু দুঃখে যে আবরণ দূর হয়।

সুরঙ্গমা। সেই দুঃখই তাকে দিয়ো, তাকে দিয়ো।

নেপথ্যে। আমার নাম নিয়ে সকলের চেয়ে বড়ো হবে, এই অহংকারে সে আমাকে চায়।

সুরঙ্গমা। এই সুযোগে তার অহংকার দাও ভেঙে। সকলের নীচে নামিয়ে তোমার পায়ের কাছে নিয়ে এসো তাকে।

নেপথ্যে। সুদর্শনাকে বোলো, আমি তাকে গ্রহণ করব অন্ধকারে।

সুরঙ্গমা। বাঁশি বাজবে না? আলো জ্বলবে না? সমারোহ হবে না?

নেপথ্যে। না।

সুরঙ্গমা। বরণডালায় সে কি ফুলের মালা তোমাকে দেবে না?

নেপথ্যে। সে ফুল এখনো ফোটে নি।

সুরঙ্গমা। সেই ভালো মহারাজ। অন্ধকারেই বীজ থাকে, অঙ্কুরিত হলে আপনিই আসে আলোয়।

বাহির হতে আহ্বান। 'সুরঙ্গমা'!

সুরঙ্গমা। ঐ আসছেন রাজকুমারী সুদর্শনা।

সুদর্শনার প্রবেশ

সুদর্শনা। তোমার এখানে আকাশে যেন অর্ঘ্য সাজানো, যেন শিশির-ধোওয়া সকালবেলার স্পর্শ। তুমি এখানকার বাতাসে কী ছিটিয়ে দিয়েছ বলো দেখি।

সুরঙ্গমা। সুর ছিটিয়েছি।

সুদর্শনা। আমাকে সেই রাজাধিরাজের কথা বলো সুরঙ্গমা, আমি শুনি।

সুরঙ্গমা। মুখের কথায় বলে উঠতে পারি নে।

সুদর্শনা। বলো, তিনি কি খুব সুন্দর?

সুরঙ্গমা। সুন্দর? একদিন সুন্দরকে নিয়ে খেলতে গিয়েছিলুম, খেলা ভাঙল যেদিন, বুক ফেটে গেল, সেইদিন বুঝলুম সুন্দর কাকে বলে। একদিন তাকে ভয়ংকর বলে ভয় পেয়েছি, আজ তাকে

ভয়ংকর বলে আনন্দ করি— তাকে বলি তুমি ঝড়, তাকে বলি তুমি দুঃখ, তাকে বলি তুমি মরণ, সব শেষে বলি— তুমি আনন্দ।

গান

আমি যখন ছিলেম অন্ধ,
সুখের খেলায় বেলা গেছে পাই নি তো আনন্দ ॥
খেলাঘরের দেয়াল গেঁথে
খেয়াল নিয়ে ছিলেম মেতে,
ভিত ভেঙে যেই আসলে ঘরে
ঘুচল আমার বন্ধ,
সুখের খেলা আর রোচে না
পেয়েছি আনন্দ ॥
ভীষণ আমার, রুদ্র আমার,
নিদ্রা গেল ক্ষুদ্র আমার,
উগ্র ব্যথায় নূতন করে
বাঁধলে আমার ছন্দ।
যেদিন তুমি অগ্নিবেশে
সব-কিছু মোর নিলে এসে,
সেদিন আমি পূর্ণ হলেম ঘুচল আমার দ্বন্দ্ব,
দুঃখ সুখের পারে তোমায় পেয়েছি আনন্দ ॥

সুদর্শনা। প্রথমটা তুমি তাঁকে চিনতে পার নি?

সুরঙ্গমা। না।

সুদর্শনা। কিন্তু দেখো তাঁকে চিনতে আমার একটুও দেরি হবে না। আমার কাছে তিনি সুন্দর হয়ে দেখা দেবেন।

সুরঙ্গমা। তার আগে একটা কথা তোমাকে মেনে নিতে হবে।

সুদর্শনা। নেব, আমার কিছুতে দ্বিধা নেই।

সুরঙ্গমা। তিনি বলেছেন, অন্ধকারেই তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে।

সুদর্শনা। চিরদিন?

সুরঙ্গমা। সে-কথা বলতে পারি নে।

সুদর্শনা। আচ্ছা আমি সবই মেনে নিচ্ছি। কিন্তু আমার কাছে তিনি লুকিয়ে থাকতে পারবেন না : দিন যদি স্থির হয়ে থাকে সবাইকে তো জানাতে হবে।

সুরঙ্গমা। জানিয়ে কী করবে। সে অন্ধকারে সকলের তো স্থান নেই।

সুদর্শনা। আমি রাজাধিরাজকে লাভ করেছি সে-কথা কাউকে জানাতে পারব না?

সুরঙ্গমা। জানাতে পার কিন্তু কেউ বিশ্বাস করবে না।

সুদর্শনা। এতবড়ো কথাটা বিশ্বাস করবে না, সে কি হয়?

সুরঙ্গমা। লোক ডেকে প্রমাণ দিতে পারবে না যে।

সুদর্শনা। পারবই, নিশ্চয় পারব।

সুরঙ্গমা। আচ্ছা, চেষ্টা দেখো।

সুদর্শনা। সুরঙ্গমা, তোমার মতো আমি অত বেশি নম্র নই, আমি শক্ত আছি। সকলের কাছে তিনি আমাকে স্বীকার করে নেবেন— এ তিনি এড়াতে পারবেন না।

সুরঙ্গমা। সে-কথা আজকে ভাববার দরকার নেই রাজকুমারী, তুমি নিজে তাঁকে সম্পূর্ণ স্বীকার করে নিয়ো, তা হলেই সব সহজ হবে।

সুদর্শনা। ও-কথা কেন বলছ? আমি তো সেইজন্যেই প্রস্তুত হয়ে রয়েছি। আর কিন্তু বিলম্ব কোরো না।

সুরঙ্গমা। তাঁর দিকে সমস্তই প্রস্তুত হয়েই আছে। আজ আমরা তবে বিদায় হই।

সুদর্শনা। কোথায় যাচ্ছ?

সুরঙ্গমা। বসন্ত-উৎসব কাছে এল, তার আয়োজন করতে হবে।

সুদর্শনা। কী রকমের আয়োজনটা হওয়া চাই।

সুরঙ্গমা। মাধবীকুঞ্জকে তো তাড়া দিতে হয় না। আমের বনের মুকুল আপনি ধরে। আমাদের মানুষের শক্তিতে যার যেটা দেবার সেটা সহজে প্রকাশ হতে চায় না। কিন্তু সেদিন সেটা আবৃত থাকলে চলবে না। কেউ দেবে গান, কেউ দেবে নাচ।

সুদর্শনা। আমি সেদিন কী দেব সুরঙ্গমা।

সুরঙ্গমা। সে-কথা তুমিই বলতে পার।

সুদর্শনা। আমি নিজ হাতে মালা গেঁথে সুন্দরকে অর্ঘ্য পাঠাব।

সুরঙ্গমা। সে-ই ভালো।

সুদর্শনা। তাঁকে দেখব কী করে।

সুরঙ্গমা। সে তিনিই জানেন।

সুদর্শনা। আমাকে কোথায় যেতে হবে?

সুরঙ্গমা। কোথাও না, এইখানেই।

সুদর্শনা। কী বল সুরঙ্গমা, অন্ধকারের সভা এইখানেই? যেখানে চিরদিন আছি এইখানেই? সাজতে হবে না?

সুরঙ্গমা। নাই-বা সাজলে; একদিন তিনিই সাজাবেন যে-সাজে তোমাকে মানায়।

গান

প্রভু, বলো বলো কবে
তোমার পথের ধুলার রঙে রঙে
আঁচল রঙিন হবে।
তোমার বনের রাঙা ধূলি
ফুটায় পূজার কুসুমগুলি,
সেই ধূলি হায় কখন আমায়
আপন করি লবে॥
প্রণাম দিতে চরণতলে
ধুলার কাঙাল যাত্রিদলে
চলে যারা, আপন ব'লে
চিনবে আমায় সবে॥

সুদর্শনা। আমার তো আর একটুও দেরি করতে ইচ্ছে করছে না।

সুরঙ্গমা। কোরো না দেরি— তাঁকে ডাকো, এইখানেই দয়া করবেন।

সুদর্শনা। সুরঙ্গমা, আমি তো মনে করি যে ডাকছি, সাড়া পাই নে। বোধ হয় ডাকতে জানি নে তুমি আমার হয়ে ডাকো-না— তোমার কণ্ঠ তিনি চেনেন।

সুরঙ্গমার গান

খোলো খোলো দ্বার, রাখিয়ো না আর
বাহিরে আমায় দাঁড়ায়ে।
দাও সাড়া দাও, এই দিকে চাও
এসো দুই বাহু বাড়ায়ে ॥
কাজ হয়ে গেছে সারা,
উঠেছে সন্ধ্যাতারা,
আলোকের খেয়া হয়ে গেল দেয়া
অস্তসাগর পারায়ে ॥
ভরি লয়ে ঝারি এনেছি তো বারি
সেজেছি তো শুচি দুকূলে,
বেঁধেছি তো চুল, তুলেছি তো ফুল
গেঁথেছি তো মালা মুকুলে।
ধেনু এল গোঠে ফিরে
পাখিরা এসেছে নীড়ে,
পথ ছিল যত জুড়িয়া জগত
আঁধারে গিয়েছে হারায়ে ॥

ধীরে ধীরে আলো নিবে গিয়ে অন্ধকার হয়ে গেল

সুদর্শনা। অন্ধকারে আমি যে কিছুই দেখতে পাচ্ছি নে। তুমি এর মধ্যে আছ?

নেপথ্যে। এই তো আমি আছি।

সুদর্শনা। আমি তোমাকে বরণ করব, সে কি না দেখেই?

নেপথ্যে। চোখে দেখতে গেলে ভুল দেখবে— অন্তরে দেখো মন শুদ্ধ করে।

সুদর্শনা। ভয়ে যে আমার বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠছে।

নেপথ্যে। প্রেমের মধ্যে ভয় না থাকলে রস নিবিড় হয় না।

সুদর্শনা। এই অন্ধকারে তুমি আমাকে দেখতে পাচ্ছ?

নেপথ্যে। হাঁ পাচ্ছি।

সুদর্শনা। কী রকম দেখছ?

নেপথ্যে। আমি দেখতে পাচ্ছি তোমার মধ্যে দেহ নিয়েছে যুগযুগান্তরের ধ্যান, লোকলোকান্তরের আলোক, বহু শত শরৎ-বসন্তের ফুল ফল। তুমি বহুপুরাতনের নূতন রূপ।

সুদর্শনা। বলো বলো এমনি করে বলো। মনে হচ্ছে যেন অনাদিকালের গান জন্মজন্মান্তর থেকে শুনে আসছি। কিন্তু প্রভু, এ যে কঠিন কালো লোহার মতো অন্ধকার, এ যে আমার উপর চেপে আছে ঘুমের মতো, মূর্ছার মতো, মৃত্যুর মতো। এ জায়গায় তোমাতে আমাতে মিল হবে কেমন করে? না না, হবে না মিলন, হবে না। এখানে নয়, চোখের দেখার জগতেই তোমাকে দেখব— সেইখানেই যে আমি আছি।

নেপথ্যে। আচ্ছা দেখো। তোমাকে নিজে চিনে নিতে হবে।

সুদর্শনা। চিনে নেব, লক্ষ লোকের মধ্যে চিনে নেব, ভুল হবে না।

নেপথ্যে। বসন্ত-পূর্ণিমার উৎসবে সকল লোকের মধ্যে আমাকে দেখবার চেষ্টা কোরো। সুরঙ্গমা।

সুরঙ্গমা। কী প্রভু।

নেপথ্যে। বসন্ত-পূর্ণিমার উৎসব তো এল।

সুরঙ্গমা। আমাকে কী কাজ করতে হবে ?

নেপথ্যে। আজ তোমার কাজের দিন নয়, সাজের দিন। পুষ্পবনের আনন্দে মিলিয়ে দিয়ো প্রাণের আনন্দ।

সুরঙ্গমা। তাই হবে প্রভু।

নেপথ্যে। সুদর্শনা আমাকে চোখে দেখতে চান।

সুরঙ্গমা। কোথায় দেখবেন ?

নেপথ্যে। যেখানে পঞ্চমে বাঁশি বাজবে, পুষ্পকেশরের ফাগ উড়বে, আলোয় ছায়ায় হবে গলাগলি সেই দক্ষিণের কুঞ্জবনে।

সুরঙ্গমা। চোখে ধাঁধা লাগবে না ?

নেপথ্যে। সুদর্শনার কৌতূহল হয়েছে।

সুরঙ্গমা। কৌতূহলের জিনিস তো পথে ঘাটে ছড়াছড়ি। তুমি যে কৌতূহলের অতীত।

গান

কোথা বাইরে দূরে যায় রে উড়ে, হায় রে হায়,
তোমার চপল আঁখি বনের পাখি বনে পালায়॥
ওগো হৃদয়ে যবে মোহন রবে বাজবে বাঁশি,
তখন আপনি সেধে ফিরবে কেঁদে পরবে ফাঁসি,
তখন ঘুচবে ত্বরা ঘুরিয়া মরা হেথা হোথায়—
আহা আজি সে আঁখি বনের পাখি বনে পালায়॥
চেয়ে দেখিস না রে হৃদয়-দ্বারে কে আসে যায়,
তোরা শুনিস কানে বারতা আনে দখিন বায়।
আজি ফুলের বাসে সুখের হাসে আকুল গানে
চির বসন্ত যে তোমারি খোঁজে এসেছে প্রাণে,
তারে বাহিরে খুঁজি ফিরিছ বুঝি পাগল প্রায়,
আহা আজি সে আঁখি বনের পাখি বনে পালায়॥

[উভয়ের প্রস্থান

২

উৎসব-ক্ষেত্র

বিদেশী পথিকদল ও প্রহরীর প্রবেশ

বিরাজদত্ত। ওগো মশায়।

প্রহরী। কেন গো ?

ভদ্রসেন। রাস্তা কোথায় ? এখানে রাজাও দেখি নে রাস্তাও দেখি নে। আমরা বিদেশী, আমাদের রাস্তা বলে দাও।

প্রহরী। কিসের রাস্তা ?

মাধব। ঐ যে শুনেছি আজ অধরা-রাজার দেশে উৎসব হবে। কোন্ দিক দিয়ে যাওয়া যাবে ?

প্রহরী। এখানে সব রাস্তাই রাস্তা। যেদিক দিয়ে যাবে ঠিক পৌঁছোবে। সামনে চলে যাও।

বিরাজদত্ত। শোনো একবার কথা শোনো। বলে, সবই এক রাস্তা। তাই যদি হবে তবে এতগুলোর দরকার ছিল কী ?

মাধব। তা ভাই রাগ করিস কেন? যে দেশের যেমন ব্যবস্থা। আমাদের দেশে তো রাস্তা নেই বললেই হয়— বাঁকাচোরা গলি, সে তো গোলকধাঁধা। আমাদের রাজা বলে, খোলা রাস্তা না থাকাই ভালো— রাস্তা পেলেই প্রজারা বেরিয়ে চলে যাবে। এদেশে উলটো, যেতেও কেউ ঠেকায় না, আসতেও কেউ মানা করে না— তবু মানুষও তো ঢের দেখছি— এমন খোলা পেলে আমাদের রাজ্য উজাড় হয়ে যেত।

বিরাজদত্ত। ওহে মাধব, তোমার ঐ একটা বড়ো দোষ।

মাধব। কী দোষ দেখলে?

বিরাজদত্ত। নিজের দেশের তুমি বড়ো নিন্দে কর। খোলা রাস্তাটাই বুঝি ভালো হল? বলো তো ভাই ভদ্রসেন, খোলা রাস্তাটাকে বলে কিনা ভালো।

ভদ্রসেন। ভাই বিরাজদত্ত, বরাবরই তো দেখে আসছ মাধবের ঐ একরকম ত্যাড়া বুদ্ধি। কোন্‌দিন বিপদে পড়বেন— রাজার কানে যদি যায় তাহলে ম'লে ওকে শ্মশানে ফেলবার লোক পাবেন না।

বিরাজদত্ত। আমাদের তো ভাই এই খোলা রাস্তার দেশে এসে অবধি খেয়ে শুয়ে সুখ নেই— দিনরাত গা-ঘিনঘিন করছে। কে আসছে কে যাচ্ছে তার কোনো ঠিক-ঠিকানাই নেই— রাম রাম।

ভদ্রসেন। সেও তো ঐ মাধবের পরামর্শ শুনেই এসেছি। আমাদের গুষ্টিতে এমন কখনো হয় নি। আমার বাবাকে তো জান— কতবড়ো মহাত্মা লোক ছিল— শাস্ত্রমতে ঠিক উনপঞ্চাশ হাত মেপে গণ্ডি কেটে তার মধ্যেই সমস্ত জীবনটা কাটিয়ে দিলে— এক দিনের জন্যে তার বাইরে পা ফেলে নি। মৃত্যুর পর কথা উঠল ঐ উনপঞ্চাশ হাতের মধ্যেই তো দাহ করতে হয়— সে এক বিষম মুশকিল— শেষকালে শাস্ত্রী বিধান দিলে উনপঞ্চাশে যে দুটো অঙ্ক আছে তার বাইরে যাবার জো নেই; অতএব ওই চার নয় উনপঞ্চাশকে উলটে নিয়ে নয় চার চুরানব্বই করে দাও— তবেই তো তাকে বাড়ির বাইরে পোড়াতে পারি, নইলে ঘরেই দাহ করতে হত। বাবা, এত আঁটাআঁটি! এ কি যে-সে দেশ পেয়েছ!

বিরাজদত্ত। বটেই তো, মরতে গেলেও ভাবতে হবে এ কি কম কথা।

ভদ্রসেন। সেই দেশের মাটিতে শরীর, তবু মাধব বলে কিনা, খোলা রাস্তাই ভালো।

[সকলের প্রস্থান

সদলে ঠাকুরদার প্রবেশ

ঠাকুরদা। ওরে দক্ষিনে হাওয়ার সঙ্গে সমান পাল্লা দিতে হবে— হার মানলে চলবে না— আজ সব রাস্তাই গানে ভাসিয়ে দিয়ে চলব।

মেয়ের দলের প্রবেশ

প্রথমা। ঠাকুরদা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, উৎসবটা হচ্ছে কোথায়?

ঠাকুরদা। যেদিকে চাইবে সেইদিকেই।

প্রথমা। একেই বলে তোমাদের রাজাধিরাজের উৎসব!

ঠাকুরদা। আমরা তো তাই বলি।

দ্বিতীয়া। আমাদের দেশের সব চেয়ে খুদে সামন্তরাজও এর চেয়ে ঘটা করে পথে বেরোয়।

ঠাকুরদা। নিজেকে না চেনাতে পারলে তারা যে বঞ্চিত।

তৃতীয়া। আর তোমরা যে কোন্‌ না-দেখা রাজার কথা বলছ?

ঠাকুরদা। তাঁকে না চিনতে পারলে আমরাই বঞ্চিত।

প্রথমা। চেনবার উপায়টা কী করেছ?

ঠাকুরদা। তাঁর সঙ্গে সুর মেলাচ্ছি। এই যে দখিন হাওয়া দিয়েছে, আমের বোল ধরেছে, সমান সুরে সাড়া দিতে পারলে ভিতরে ভিতরে জানাজানি হয়।

দ্বিতীয়া। তোমাদের কর্তারা ঢাকঢোলের বায়না দেন নি বুঝি? তোমাদের উপরেই সব বরাত?

ঠাকুরদা। তা নয় তো কী। ভাড়া করে সমারোহ ? তোমরা আমরা আছি কী করতে ? ওরে তোরা ধর-না ভাই গান।

গান

আজি দখিন দুয়ার খোলা—
এসো হে, এসো হে, এসো হে, আমার
বসন্ত এসো।
দিব হৃদয়-দোলায় দোলা,
এসো হে, এসো হে, এসো হে, আমার
বসন্ত এসো।
নব শ্যামল শোভন রথে
এসো বকুল-বিছানো পথে,
এসো বাজায়ে ব্যাকুল বেণু,
মেখে পিয়াল ফুলের রেণু,
এসো হে, এসো হে, এসো হে, আমার
বসন্ত এসো।
এসো ঘনপল্লবপুঞ্জে
এসো হে, এসো হে, এসো হে।
এসো বনমল্লিকাকুঞ্জে
এসো হে, এসো হে, এসো হে।
মৃদু মধুর মদির হেসে
এসো পাগল হাওয়ার দেশে,
তোমার উতলা উত্তরীয়
তুমি আকাশে উড়ায়ে দিয়ো,
এসো হে, এসো হে, এসো হে, আমার
বসন্ত এসো॥

[মেয়েদের প্রস্থান

পুব দুয়ারটা হল। এবার চলো পশ্চিম দুয়ারটার দিকে।

দেশী পথিকদলের প্রবেশ

কৌণ্ডিল্য। ঠাকুরদা, এই প্রাচীন বয়সে ছেলের দলকে নিয়ে মেতে বেড়াচ্ছ যে ?
ঠাকুরদা। নবীনকে ডাক দিতে বেরিয়েছি।
জনার্দন। সেটা কি তোমাকে শোভা পায় ?
ঠাকুরদা। ওরে পাকা পাতাই তো ঝরবার সময় নতুন পাতাকে জাগিয়ে দিয়ে যায়।

গান

আমার জীর্ণ পাতা যাবার বেলায় বারে বারে
ডাক দিয়ে যায় নতুন পাতার দ্বারে দ্বারে।

কৌণ্ডিল্য। ডাক দিয়েছ সে তো দেখতে পাচ্ছি, পাড়া অস্থির করে তুলেছ। কিন্তু এর দরকার ছিল কি।
ঠাকুরদা। আমারই নবীন বয়সকে ওদের মধ্যে খুঁজে পাচ্ছি— বুড়োটা ঢাকা পড়ে গেল।

গান

তাই তো আমার এই জীবনের বনচ্ছায়ে
ফাগুন আসে ফিরে ফিরে দখিন বায়ে,
নতুন সুরে গান উড়ে যায় আকাশ পারে,
নতুন রঙে ফুল ফোটে তাই ভারে ভারে ॥

কৌণ্ডিল্য। তা তুমি নতুন হয়েই রইলে সে-কথা সত্যি, বুড়ো হবার সময় পেলে না।
ঠাকুরদা। নিজে নতুন না হলে সেই নতুনকে যে পাই নে।

গান

ওগো আমার নিত্য নতুন, দাঁড়াও হেসে
চলব তোমার নিমন্ত্রণে নবীন বেশে।
দিনের শেষে নিবল যখন পথের আলো,
সাগরতীরে যাত্রা আমার যেই ফুরাল,
তোমার বাঁশি বাজে সাঁঝের অন্ধকারে
শূন্যে আমার উঠল তারা সারে সারে ॥

কৌণ্ডিল্য। রাখো দাদা, তোমার গান রাখো। আজকের দিনে একটা কথা মনে বড়ো লাগছে।
ঠাকুরদা। কী বলো দেখি।
কৌণ্ডিল্য। এবার দেশবিদেশের লোক এসেছে, সবাই বলছে সবই দেখেছি ভালো কিন্তু রাজা দেখি নে কেন— কাউকে জবাব দিতে পারি নে। এখানে ঐটে বড়ো একটা ফাঁকা রয়ে গেছে।
ঠাকুরদা। ফাঁকা! আমাদের এই দেশে রাজা এক জায়গায় দেখা দেয় না বলেই তো সমস্ত রাজ্যটা একেবারে রাজায় ঠাসা হয়ে রয়েছে— তাকে বল ফাঁকা! সে যে আমাদের সবাইকেই রাজা করে দিয়েছে।

গান

আমরা সবাই রাজা আমাদের এই
রাজার রাজত্বে।
নইলে মোদের রাজার সনে
মিলব কী স্বত্বে ॥
আমরা যা খুশি তাই করি
তবু তাঁর খুশিতেই চরি,
আমরা নই বাঁধা নই দাসের রাজার
ত্রাসের দাসত্বে।
নইলে মোদের রাজার সনে
মিলব কী স্বত্বে।
রাজা সবারে দেন মান
সে মান আপনি ফিরে পান,
মোদের খাটো করে রাখে নি কেউ
কোনো অসত্যে,
নইলে মোদের রাজার সনে
মিলব কী স্বত্বে।

আমরা চলব আপন মতে
শেষে মিলব তাঁরি পথে,
মোরা মরব না কেউ বিফলতার
বিষম আবর্তে।
নইলে মোদের রাজার সনে
মিলব কী স্বত্বে ?

কুম্ভ। কিন্তু দাদা, যা বল তাঁকে দেখতে পায় না বলে লোকে অনায়াসে তাঁর নামে যা খুশি বলে, সেইটে অসহ্য হয়।

জনার্দন। এই দেখো-না, আমাকে গাল দিলে শাস্তি আছে কিন্তু রাজাকে গাল দিলে কেউ তার মুখ বন্ধ করবার নেই।

ঠাকুরদা। ওর মানে আছে ; প্রজার মধ্যে যে-রাজাটুকু মিশিয়ে আছে তারই গায়ে আঘাত লাগে, তাকে ছাড়িয়ে যিনি তাঁর গায়ে কিছুই বাজে না। সূর্যের যে তেজ প্রদীপে আছে তাতে ফুঁটুকু সয় না, কিন্তু হাজার লোকে মিলে সূর্যে ফুঁ দিলে সূর্য অম্লান হয়েই থাকেন।

[সকলের প্রস্থান

বিদেশীদলের পুনঃপ্রবেশ

বিরাজদত্ত। দেখো ভাই ভদ্রসেন, আসল কথাটা হচ্ছে, এদের মূলেই রাজা নেই। সকলে মিলে একটা গুজব রটিয়ে রেখেছে।

ভদ্রসেন। আমারও তো তাই মনে হয়েছে। সকল দেশেই রাজাকে দেখে দেশসুদ্ধ লোকের আত্মাপুরুষ বাঁশপাতার মতো হীহী করে কাঁপতে থাকে, আর এখানে রাজাকে খুঁজেও মেলে না ! কিছু না হোক, মাঝে মাঝে বিনা কারণে এক-একবার যদি চোখ পাকিয়ে বলে, বেটার শির লেও, তা হলেও বুঝি রাজার মতো রাজা আছে বটে।

মাধব। কিন্তু এ-রাজ্যে আগাগোড়া যেমন নিয়ম দেখছি, রাজা না থাকলে তো এমন হয় না।

বিরাজদত্ত। এতকাল রাজার দেশে বাস করে এই বুদ্ধি হল তোমার ? নিয়মই যদি থাকবে তা হলে রাজা থাকবার দরকার কী ?

মাধব। এই দেখো-না, আজ এত লোক মিলে আনন্দ করছে— রাজা না থাকলে এরা এমন করে মিলতেই পারত না।

বিরাজদত্ত। ওহে মাধব, আসল কথাটাই যে তুমি এড়িয়ে যাচ্ছ। একটা নিয়ম আছে— সেটা তো দেখছি, উৎসব হচ্ছে সেটাও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, সেখানে তো কোনো গোল বাধছে না— কিন্তু রাজা কোথায়, তাকে দেখলে কোথায়, সেইটে বলো।

মাধব। আমার কথাটা হচ্ছে এই যে, তোমরা তো এমন রাজ্য জান যেখানে রাজা কেবল চোখেই দেখা যায় কিন্তু রাজ্যের মধ্যে তার কোনো পরিচয় নেই, সেখানে কেবল ভূতের কীর্তন— কিন্তু এখানে দেখো—

ভদ্রসেন। আবার ঘুরে ফিরে সেই একই কথা ! তুমি বিরাজদত্তর আসল কথাটার উত্তর দাও-না হে— হাঁ, কি, না ? রাজাকে দেখেছ, কি, দেখ নি ?

বিরাজদত্ত। রেখে দাও ভাই ভদ্রসেন, ওর ন্যায়শাস্ত্রটা পর্যন্ত এ-দেশী রকমের হয়ে উঠছে। বিনা চক্ষে ও যখন দেখতে শুরু করেছে তখন আর ভরসা নেই। বিনা অন্নে কিছুদিন ওকে আহার করতে দিলে আবার বুদ্ধিটা সাধারণ লোকের মতো পরিষ্কার হয়ে আসতে পারে।

[সকলের প্রস্থান

বাউলের প্রবেশ

গান

আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে
তাই হেরি তায় সকল খানে।
আছে সে নয়নতারায় আলোকধারায়,
তাই না হারায়,
ওগো তাই দেখি তায় যেথায় সেথায়
তাকাই আমি যেদিক পানে ॥
আমি তার মুখের কথা
শুনব বলে গেলাম কোথা,
শোনা হল না, হল না,
আজ ফিরে এসে নিজের দেশে
এই যে শুনি,
শুনি তাহার বাণী আপন গানে ॥
কে তোরা খুঁজিস তারে
কাঙাল-বেশে দ্বারে দ্বারে,
দেখা মেলে না, মেলে না—
ও তোরা আয় রে ধেয়ে দেখ রে চেয়ে
আমার বুকে—
ওরে দেখ্ রে আমার দুই নয়ানে ॥

[প্রস্থান

একদল পদাতিক ও দেশী পথিকের প্রবেশ

প্রথম পদাতিক। সরে যাও সব, সরে যাও। তফাত যাও।

কৌণ্ডিল্য। ইস, তাই তো। মস্ত লোক বটে। লম্বা পা ফেলে চলছেন। কেন রে বাপু, সবব কেন ? আমরা সব পথের কুকুর নাকি ?

দ্বিতীয় পদাতিক। আমাদের রাজা আসছেন।

জনার্দন। রাজা ? কোথাকার রাজা ?

প্রথম পদাতিক। আমাদের এই দেশের রাজা।

কুম্ভ। লোকটা পাগল হল নাকি ? আমাদের এই অবাক দেশের রাজা পাইক নিয়ে হাঁকতে হাঁকতে আবার রাস্তায় কবে বেরোয় ?

দ্বিতীয় পদাতিক। মহারাজ আজ আর গোপন থাকবেন না, তিনি স্বয়ং আজ উৎসব করবেন।

জনার্দন। সত্যি না কি ভাই ?

দ্বিতীয় পদাতিক। ঐ দেখো-না নিশেন উড়ছে।

কৌণ্ডিল্য। তাই তো রে, ওটা নিশেনই তো বটে।

দ্বিতীয় পদাতিক। নিশেনে কিংশুক ফুল আঁকা আছে, দেখছ না ?

কুম্ভ। ওরে কিংশুক ফুলই তো বটে, মিথ্যে বলে নি— একেবারে টকটক করছে।

প্রথম পদাতিক। তবে ! কথাটা যে বড়ো বিশ্বাস হল না !

জনার্দন। না দাদা, আমি তো অবিশ্বাস করি নি। ঐ কুম্ভই গোলমাল করেছিল। আমি একটি কথাও বলি নি।

প্রথম পদাতিক। ওটা বোধ হয় শূন্যকুম্ভ, তাই আওয়াজ বেশি।

দ্বিতীয় পদাতিক। লোকটা কে হে? তোমাদের কে হয়?

কৌণ্ডিল্য। কেউ না, কেউ না। আমাদের গ্রামের যে মোড়ল, ও তার খুড়শ্বশুর— অন্য পাড়ায় বাড়ি।

দ্বিতীয় পদাতিক। হাঁ হাঁ, খুড়শ্বশুর গোছের চেহারা বটে, বুদ্ধিটাও নেহাত খুড়শ্বশুরে ধাঁচার।

কুম্ভ। অনেক দুঃখে বুদ্ধিটা এইরকম হয়েছে। এই যে সেদিন কোথা থেকে এক রাজা বেরোল, নামের গোড়ায় তিনশো পঁয়তাল্লিশটা শ্রী লাগিয়ে ঢাক পিটোতে পিটোতে শহর ঘুরে বেড়াল— আমি তার পিছনে কি কম ফিরেছি? কত ভোগ দিলেম, কত সেবা করলেম, ভিটেমাটি বিকিয়ে যাবার জো হল। শেষকালে তার রাজাগিরি রইল কোথায়? লোকে যখন তার কাছে তালুক চায়, মুলুক চায় সে তখন পাঁজিপুঁথি খুলে শুভদিন কিছুতেই খুঁজে পায় না। কিন্তু আমাদের কাছে খাজনা নেবার বেলায় মঘা অশ্লেষা ত্র্যহস্পর্শ কিছুই তো বাধত না।

দ্বিতীয় পদাতিক। হাঁ হে কুম্ভ, আমাদের রাজাকে তুমি সেই রকম মেকি রাজা বলতে চাও।

কুম্ভ। না বাবা, রাগ কোরো না। আমি নাকে খত দিচ্ছি— যতদূর সরতে বল ততদূরই সরে দাঁড়াব।

দ্বিতীয় পদাতিক। আচ্ছা, বেশ এইখানে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকো। রাজা এলেন বলে— আমরা এগিয়ে গিয়ে রাস্তা ঠিক করে রাখি।

[পদাতিকদের প্রস্থান

জনার্দন। কুম্ভ, তোমার ঐ মুখের দোষেই তুমি মরবে!

কুম্ভ। না ভাই জনার্দন, ও মুখের দোষ নয়, ও কপালের দোষ। যেবারে মিছে রাজা বেরোল একটি কথাও কই নি— অত্যন্ত ভালোমানুষের মতো নিজের সর্বনাশ করেছি— আর এবার হয়তো-বা সত্যি রাজা বেরিয়েছে, তাই বেফাঁস কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। ওটা কপাল।

জনার্দন। আমি এই বুঝি, রাজা সত্যি হোক মিথ্যে হোক, মেনে চলতেই হবে। আমরা কি রাজা চিনি যে বিচার করব। অন্ধকারে ঢেলা মারা— যত বেশি মারবে একটা না একটা লেগে যাবে। আমি তাই একধার থেকে গড় করে যাই— সত্যি হলে লাভ, মিথ্যে হলেই বা লোকসান কী।

কুম্ভ। ঢেলাগুলো নেহাত ঢেলা হলে ভাবনা ছিল না— দামি জিনিস— বাজে খরচ করতে গিয়ে ফতুর হতে হয়।

কৌণ্ডিল্য। ঐ যে আসছেন রাজা। আহা রাজার মতন রাজা বটে। কী চেহারা। যেন ননির পুতুল। কেমন হে কুম্ভ, এখন কী মনে হচ্ছে।

কুম্ভ। দেখাচ্ছে ভালো— কী জানি ভাই, হতে পারে।

কৌণ্ডিল্য। ঠিক যেন রাজাটি গড়ে রেখেছে। ভয় হয়, পাছে রোদ্দুর লাগলে গলে যায়।

রাজবেশধারীর প্রবেশ

সকলে। জয় মহারাজের জয়।

জনার্দন। দর্শনের জন্য সকাল থেকে দাঁড়িয়ে। দয়া রাখবেন।

কুম্ভ। বড়ো ধাঁধা ঠেকছে, ঠাকুরদাকে ডেকে আনি।

[সকলের প্রস্থান

বিদেশী পথিকদলের প্রবেশ

মাধব। ওরে রাজা রে রাজা। দেখবি আয়।

বিরাজদত্ত। মনে রেখো রাজা, আমি কুশলীবস্তুর উদয়দত্তর নাতি। আমার নাম বিরাজদত্ত। রাজা বেরিয়েছে শুনেই ছুটেছি, লোকের কারো কথায় কান দিই নি— আমি সকলের আগে তোমাকে মেনেছি।

ভদ্রসেন। শোনো একবার, আমি যে ভোর থেকে এখানে দাঁড়িয়ে— তখনো কাক ডাকে নি— এতক্ষণ ছিলে কোথায় ? রাজা, আমি বিক্রমস্থলীর ভদ্রসেন— ভক্তকে স্মরণ রেখো।

রাজবেশী। তোমাদের ভক্তিতে বড়ো প্রীত হলেম।

বিরাজদত্ত। মহারাজ, আমাদের অভাব বিস্তর— এতদিন দর্শন পাই নি, জানাব কাকে ?

রাজবেশী। তোমাদের সমস্ত অভাব মিটিয়ে দেব।

[রাজবেশীর প্রস্থান

দেশী পথিকদের প্রবেশ

কৌণ্ডিল্য। ওরে পিছিয়ে থাকলে চলবে না— ভিড়ে মিশে গেলে রাজার চোখে পড়ব না।

বিরাজদত্ত। দেখ্ দেখ্ একবার নরোত্তমের কাণ্ডখানা দেখ্ ! আমরা এত লোক আছি, সবাইকে ঠেলেঠুলে কোথা থেকে এক তালপাতার পাখা নিয়ে রাজাকে বাতাস করতে লেগে গেছে।

কৌণ্ডিল্য। তাই তো হে, লোকটার আস্পর্ধা তো কম নয়।

মাধব। ওকে জোর করে ধরে সরিয়ে দিতে হচ্ছে— ও কি রাজার পাশে দাঁড়াবার যুগ্যি।

কৌণ্ডিল্য। ওহে রাজা কি আর এটুকু বুঝবে না ? এ যে অতিভক্তি।

বিরাজদত্ত। না হে না— রাজাদের যদি মগজই থাকবে তা হলে মুকুট থাকবার দরকার কী। ঐ তালপাখার হাওয়া খেয়েই ভুলবে।

[সকলের প্রস্থান

ঠাকুরদাকে লইয়া কুম্ভের প্রবেশ

কুম্ভ। এখনই এই রাস্তা দিয়েই যে গেল।

ঠাকুরদা। রাস্তা দিয়ে গেলেই রাজা হয় নাকি রে।

কুম্ভ। দাদা, একেবারে স্পষ্ট চোখে দেখা গেল— একজন না দুজন না, রাস্তার দুধারের লোক তাকে দেখে নিয়েছে।

ঠাকুরদা। সেইজন্যেই তো সন্দেহ। কবে আমার রাজা রাস্তার লোকের চোখ ধাঁধিয়ে বেড়ায়।

কুম্ভ। তা আজকে যদি মর্জি হয়ে থাকে, বলা যায় কী।

ঠাকুরদা। বলা যায় রে বলা যায়— আমার রাজার মর্জি বরাবর ঠিক আছে— ঘড়ি-ঘড়ি বদলায় না।

কুম্ভ। কিন্তু কী বলব দাদা— একেবারে ননির পুতুলটি। ইচ্ছে করে সর্বাঙ্গ দিয়ে তাকে ছায়া ক'রে রাখি।

ঠাকুরদা। তোর এমন বুদ্ধি কবে হল ? আমার রাজা ননির পুতুল, আর তুই তাকে ছায়া করে রাখবি।

কুম্ভ। যা বল দাদা, দেখতে বড়ো সুন্দর— আজ তো এত লোক জুটেছে অমনটি কাউকে দেখলুম না।

ঠাকুরদা। আমার রাজা তোদের চোখেই পড়ত না।

কুম্ভ। ধ্বজা দেখতে পেলুম যে গা। লোকে যে বলে, এই উৎসবে রাজা বেরিয়েছে।

ঠাকুরদা। বেরিয়েছে বৈকি। কিন্তু সঙ্গে পাইক নেই, বাদ্যি নেই।

কুম্ভ। কেউ বুঝি ধরতেই পারে না ?

ঠাকুরদা। হয়তো কেউ কেউ পারে।

কুম্ভ। যে পারে সে বোধ হয় যা চায় তাই পায় ?

ঠাকুরদা। সে কিচ্ছু চায় না। ভিক্ষুকের কর্ম নয় রাজাকে চেনা। ছোটো ভিক্ষুক বড়ো ভিক্ষুককেই রাজা বলে মনে করে বসে।

[সকলের প্রস্থান

রাজা বিজয়বর্মা, বিক্রমবাহু ও বসুসেনের প্রবেশ

বসুসেন। এই উৎসবের রাজা কি আমাদেরও দেখা দেবে না?

বিক্রম। এর রাজত্ব করবার প্রণালী কী রকম? রাজার বনে উৎসব, সেখানেও সাধারণ লোকের কারো কোনো বাধা নেই?

বিজয়। আমাদের জন্যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জায়গা তৈরি করে রাখা উচিত ছিল।

বিক্রম। জোর করে নিজেরা তৈরি করে নেব।

বিজয়। এই-সব দেখেই সন্দেহ হয়, এখানে রাজা নেই, একটা ফাঁকি চলে আসছে।

বিক্রম। কিন্তু কান্তিকরাজকন্যা সুদর্শনা তো দৃষ্টিগোচর।

বিজয়। তাঁকে দেখা চাই। যিনি দেখা দেন না তাঁর জন্যে আমার ঔৎসুক্য নেই, কিন্তু যিনি দেখবার যোগ্য তাঁকে না দেখে ফিরে গেলে ঠকতে হবে।

বিক্রম। একটা ফন্দি দেখাই যাক-না।

বসুসেন। ফন্দি জিনিসটা খুব ভালো, যদি তার মধ্যে নিজে আটকা না পড়া যায়।

বিক্রম। এদিকে এরা কারা আসছে? সঙ না কি? রাজা সেজেছে!

বিজয়। এ তামাশা এখানকার রাজা সইতে পারে কিন্তু আমরা সইব না তো।

বসুসেন। কোথাকার গ্রাম্যরাজা হতেও পারে।

পদাতিকগণের প্রবেশ

বিক্রম। তোমাদের রাজা কোথাকার?

প্রথম পদাতিক। এই দেশের। তিনি আজ উৎসব করতে বেরিয়েছেন।

[পদাতিকগণের প্রস্থান

বিজয়। এ কী কথা! এখানকার রাজা বেরিয়েছে!

বসুসেন। তাই তো। তা হলে এঁকেই দেখে ফিরতে হবে! অন্য দর্শনীয়টা?

বিক্রম। শোনো কেন? এখানে রাজা নেই বলেই যে-খুশি নির্ভাবনায় আপনাকে রাজা বলে পরিচয় দেয়। দেখছ-না যেন সেজে এসেছে— অত্যন্ত বেশি সাজ।

বসুসেন। কিন্তু লোকটাকে দেখাচ্ছে ভালো, চোখ ভোলাবার মতো চেহারাটা আছে।

বিক্রম। চোখ ভুলতে পারে কিন্তু ভালো করে তাকালেই ভুল থাকে না। আমি তোমাদের সামনেই ওর ফাঁকি ধরে দিচ্ছি।

রাজবেশী সুবর্ণের প্রবেশ

সুবর্ণ। রাজগণ, স্বাগত। এখানে তোমাদের অভ্যর্থনার কোনো ত্রুটি হয় নি তো?

রাজগণ। (কপট বিনয়ে নমস্কার করিয়া) কিছু না।

বিক্রম। যে অভাব ছিল তা মহারাজের দর্শনেই পূর্ণ হয়েছে।

সুবর্ণ। আমি সাধারণের দর্শনীয় নই কিন্তু তোমরা আমার অনুগত, এইজন্যই একবার দেখা দিতে এলুম।

বিক্রম। অনুগ্রহের এত আতিশয্য সহ্য করা কঠিন।

সুবর্ণ। আমি অধিকক্ষণ থাকব না।

বিক্রম। সেটা অনুভবেই বুঝেছি— বেশিক্ষণ স্থায়ী হবার ভাব দেখছি নে।

সুবর্ণ। ইতিমধ্যে যদি কোনো প্রার্থনা থাকে—

বিক্রম। আছে বৈকি। কিন্তু অনুচরদের সামনে জানাতে লজ্জা বোধ করি।

সুবর্ণ। (অনুবর্তীদের প্রতি) ক্ষণকালের জন্য তোমরা দূরে যাও— (রাজগণের প্রতি) এইবার তোমাদের প্রার্থনা অসংকোচে জানাতে পারো।

বিক্রম। অসংকোচেই জানাব— তোমারও যেন লেশমাত্র সংকোচ না হয়।

সুবর্ণ। না, সে আশঙ্কা কোরো না।

বিক্রম। এসো তবে— মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে আমাদের প্রত্যেককে প্রণাম করো।

সুবর্ণ। বোধ হচ্ছে আমার ভৃত্যগণ বারুণী মদ্যটা রাজশিবিরে কিছু মুক্তহস্তেই বিতরণ করেছে।

বিক্রম। ভণ্ডরাজ, মদ যাকে বলে সেটা তোমার ভাগ্যেই অতিমাত্রায় পড়েছে, সেইজন্যেই এখন ধুলোয় লোটাবার অবস্থা হয়েছে।

সুবর্ণ। রাজগণ, পরিহাসটা রাজোচিত নয়।

বিক্রম। পরিহাসের অধিকার যাদের আছে তারা নিকটেই প্রস্তুত। সেনাপতি!

সুবর্ণ। আর প্রয়োজন নেই। স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি আপনারা আমার প্রণম্য। মাথা আপনি নত হচ্ছে, কোনো তীক্ষ্ণ উপায়ে তাকে ধুলায় টানবার দরকার হবে না। আপনারা যখন আমাকে চিনেছেন তখন আমিও আপনাদের চিনে নিলুম। অতএব এই আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। যদি দয়া করে পালাতে অনুমতি দেন তা হলে বিলম্ব করব না।

বিক্রম। পালাবে কেন? তোমাকেই আমরা এখানকার রাজা করে দিচ্ছি— পরিহাসটা শেষ করেই যাওয়া যাক। দলবল কিছু আছে?

সুবর্ণ। আছে। আরম্ভে যখন আমার দল বেশি ছিল না, তখন সবাই সন্দেহ করছিল— লোক যত বেড়ে গেল, সন্দেহ ততই দূর হল। এখন ভিড়ের লোক নিজেদের ভিড় দেখেই মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে, আমাকে কোনো কষ্ট পেতে হচ্ছে না।

বিক্রম। বেশ কথা। এখন থেকে আমরা তোমায় সাহায্য করব। কিন্তু তোমাকে আমাদেরও একটা কাজ করে দিতে হবে।

সুবর্ণ। আপনাদের দত্ত আদেশ এবং মুকুট আমি মাথায় করে রাখব।

বিক্রম। আর কিছু চাই নে, রাজকুমারী সুদর্শনাকে দেখতে চাই— সেইটে তোমাকে করে দিতে হবে।

সুবর্ণ। যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি হবে না।

বিক্রম। তোমার সাধ্যের উপর ভরসা নেই, আমাদের বুদ্ধিমত চলতে হবে। আমার পরামর্শ শোনো, ভুল কোরো না।

সুবর্ণ। ভুল হবে না।

বিক্রম। করভোদ্যানের মধ্যেই রাজকুমারী সুদর্শনার প্রাসাদ।

সুবর্ণ। হাঁ মহারাজ।

বিক্রম। সেই উদ্যানে আগুন লাগাবে। তার পর অগ্নিদাহের গোলমালে কাজ সিদ্ধ করব।

সুবর্ণ। অন্যথা হবে না।

বিক্রম। দেখো হে ভণ্ডরাজ, আমরা মিথ্যা সাবধান হচ্ছি, এদেশে রাজা নেই।

সুবর্ণ। আমি সেই অরাজকতা দূর করতে বেরিয়েছি, সাধারণের জন্যে সত্য হোক মিথ্যা হোক, একটা রাজা খাড়া করা চাই; নইলে অনিষ্ট ঘটে। একটা কথা বুঝতে পারছি নে মহারাজ।

বিক্রম। আমার অনেক কথাই তুমি বুঝতে পারবে না। তবু বলো, শুনি।

সুবর্ণ। রাজকুমারীর পিতা-মহারাজের কাছে দূত পাঠিয়ে কন্যাকে যথারীতি প্রার্থনা করুন-না।

বিক্রম। সে তো সকলেই করে থাকে। আমি তো সকলের দলে নই। আগুন করবে আমার ঘটকালি, আমি বিপদ ঘটিয়ে বিপদের পারে যাব।

সুবর্ণ। আপনি তো পারে যাবেন মহারাজ, আমি সামান্য লোক, পার পর্যন্ত না পৌঁছোতেও পারি।

বিক্রম। অসম্ভব নয়। কিন্তু তাতে কী আসে যায়। সামান্য লোক কাজে লাগবে এই যথেষ্ট, তার পরে থাকবে কি না-থাকবে সেটা ভাববার কথাই নয়।— চলো আর বিলম্ব কোরো না।

বিজয়। দেখো দেখো, সেই লোকটা আবার একদল লোক নিয়ে আসছে।

বসুসেন। ও যেন উৎসবের খেয়া পার করছে ; নতুন নতুন দলকে দ্বারের কাছ পর্যন্ত পৌঁছে দিচ্ছে।

সদলে ঠাকুরদার প্রবেশ

বিজয়। কী হে, তুমি যে কখন কোথা দিয়ে ঘুরে আসছ, তার ঠিকানা পাবার জো নেই।

ঠাকুরদা। আমরা নটরাজের চেলা, তিনি ঘুরছেন আর ঘুরিয়ে বেড়াচ্ছেন। কোথাও দাঁড়িয়ে থাকবার জো কী— শিঙা যে বেজে উঠছে।

নৃত্য ও গীত

মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ।
তারি সঙ্গে কী মৃদঙ্গে সদা বাজে
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ ॥
হাসিকান্না হীরাপান্না দোলে ভালে,
কাঁপে ছন্দে ভালোমন্দ তালে তালে,
নাচে জন্ম নাচে মৃত্যু পাছে পাছে,
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ।
কী আনন্দ, কী আনন্দ, কী আনন্দ
দিবারাত্রি নাচে মুক্তি নাচে বন্ধ,
সে তরঙ্গে ছুটি রঙ্গে পাছে পাছে
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ ॥

[প্রস্থান

বসুসেন। লোকটার মধ্যে কিছু কৌতুক আছে।

বিক্রম। কিন্তু এ-সব লোকের কৌতুকে যোগ দেওয়া কিছু নয়— প্রশ্রয় দেওয়া হয়— চলো সরে যাই।

[রাজাদের প্রস্থান

৩

কুঞ্জ-বাতায়ন

সুরঙ্গমার গান

বাহিরে ভুল হানবে যখন
অন্তরে ভুল ভাঙবে কি ?
বিষাদ-বিষে জ্বলে শেষে
তোমার প্রসাদ মাঙবে কি ?
রৌদ্রদাহ হলে সারা
নামবে কি ওর বর্ষাধারা ?
লাজের রাঙা মিটলে, হৃদয়
প্রেমের রঙে রাঙবে কি ?

যতই যাবে দূরের পানে
বাঁধন ততই কঠিন হয়ে
টানবে না কি ব্যথার টানে ?
অভিমানের কালো মেঘে
বাদল হাওয়া লাগবে বেগে,
নয়নজলের আবেগ তখন
কোনোই বাধা মানবে কি ?

সুদর্শনার প্রবেশ

সুদর্শনা। সুরঙ্গমা, ভুল তোরা করতে পারিস, কিন্তু আমার কখনোই ভুল হতে পারে না— আমি হব রানী। ঐ তো আমার রাজাই বটে।

সুরঙ্গমা। কাকে তুমি রাজা বলছ ?

সুদর্শনা। ঐ যার মাথায় ফুলের ছাতা ধরে আছে।

সুরঙ্গমা। ঐ যাঁর পতাকায় কিংশুক আঁকা ?

সুদর্শনা। আমি তো দেখবামাত্রই চিনেছি, তোর মনে কেন সন্দেহ আসছে।

সুরঙ্গমা। ও তোমার রাজা নয়। আমি যে ওকে চিনি।

সুদর্শনা। ও কে ?

সুরঙ্গমা। ও সুবর্ণ। ও জুয়ো খেলে বেড়ায়।

সুদর্শনা। মিথ্যে কথা বলিস নে। সবাই ওকে রাজা বলছে। তুই বুঝি সকলের চেয়ে বেশি জানিস।

সুরঙ্গমা। ও যে সবাইকে মিথ্যে লোভ দেখাচ্ছে, সেইজন্যে সবাই ওর বশ হয়েছে। যখন ভুল ভাঙবে তখন হায় হায় করে মরবে।

সুদর্শনা। তোর বড়ো অহংকার হয়েছে। তুই আমার চেয়ে চিনিস ?

সুরঙ্গমা। যদি আমার অহংকার থাকত, তা হলে আমি চিনতে পারতুম না।

সুদর্শনা। আমি ওকেই মালা পাঠিয়ে দিয়েছি।

সুরঙ্গমা। সে মালা সাপ হয়ে তোমাকে এসে দংশন করবে।

সুদর্শনা। আমাকে অভিসম্পাত ? তোর তো আস্পর্ধা কম নয় ! যা এখান থেকে চলে, আমি তোর মুখ দেখব না।

[সুরঙ্গমার প্রস্থান

আমার মন আজ এমনই চঞ্চল হয়েছে ! এমন তো কোনোদিন হয় না। সুরঙ্গমা !

সুরঙ্গমার প্রবেশ

সুদর্শনা। আমার মালা কি ভুল পথেই গেছে ?

সুরঙ্গমা। হাঁ।

সুদর্শনা। আবার সেই একই কথা ? আচ্ছা বেশ, ভুল করেছি, বেশ করেছি। তিনি কেন নিজে দেখা দিয়ে ভুল ভাঙিয়ে দেন না ? কিন্তু তোর কথা মানব না। যা আমার কাছ থেকে— মিছিমিছি আমার মনে ধাঁধা লাগিয়ে দিস নে।

[সুরঙ্গমার প্রস্থান

ভগবান চন্দ্রমা, আজ আমার চঞ্চলতার উপরে তুমি কেবলই কটাক্ষপাত করছ। স্মিত কৌতুকে সমস্ত আকাশ ভরে গেল যে ! প্রতিহারী !

প্রতিহারীর প্রবেশ

প্রতিহারী। কী রাজকুমারী ?

সুদর্শনা। ঐ যে আম্রবনবীথিকায় উৎসববালকেরা গান গেয়ে যাচ্ছে, ডাক্ ডাক্, ওদের ডেকে নিয়ে আয়। একটু গান শুনি।

[প্রতিহারীর প্রস্থান

বালকগণের প্রবেশ

এসো এসো সব মূর্তিমান কিশোর বসন্ত, ধরো তোমাদের গান। আমার সমস্ত দেহমন গান গাইছে, কণ্ঠে আসছে না। আমার হয়ে তোমরা গাও।

বালকগণের গান

কার হাতে এই মালা তোমার পাঠালে
আজ ফাগুনদিনের সকালে।
তার বর্ণে তোমার নামের রেখা,
গন্ধে তোমার ছন্দ লেখা,
সেই মালাটি বেঁধেছি মোর কপালে
আজ ফাগুনদিনের সকালে ॥
গানটি তোমার চলে এল আকাশে
আজ ফাগুন দিনের বাতাসে।
ওগো আমার নামটি তোমার সুরে
কেমন করে দিলে জুড়ে,
লুকিয়ে তুমি ওই গানেরি আড়ালে,
আজ ফাগুনদিনের সকালে ॥

সুদর্শনা। হয়েছে, হয়েছে, আর না। তোমাদের এই গান শুনে চোখে জল ভরে আসছে— আমার মনে হচ্ছে যা পাবার জিনিস তাকে হাতে পাবার জো নেই— তাকে হাতে পাবার দরকার নেই।

[প্রণাম করিয়া বালকগণের প্রস্থান

কুঞ্জদ্বার

ঠাকুরদা ও দেশী পথিকদের প্রবেশ

ঠাকুরদা। কী ভাই, হল তোমাদের ?

কৌণ্ডিল্য। খুব হল ঠাকুরদা। এই দেখো-না একেবারে লালে লাল করে দিয়েছে। কেউ বাকি নেই।

ঠাকুরদা। বলিস কী ? রাজাগুলোকে সুদ্ধ রাঙিয়েছে না কি ?

জনার্দন। ওরে বাস রে ! কাছে ঘেঁষে কে ! তারা সব বেড়ার মধ্যে খাড়া হয়ে রইল।

ঠাকুরদা। হায় হায়, বড়ো ফাঁকিতে পড়েছে। একটুও রঙ ধরাতে পারলি নে ? জোর করে ঢুকে পড়তে হয়।

কুম্ভ। ও দাদা, তাদের রাঙা, সে আর-এক রঙের। তাদের চক্ষু রাঙা, তাদের পাইকগুলোর পাগড়ি রাঙা, তার উপরে খোলা তলোয়ারের যে রকম দেখলুম একটু কাছে ঘেঁষলেই একেবারে চরম রাঙা রাঙিয়ে দিত।

ঠাকুরদা। বেশ করেছিস ঘেঁষিস নি। পৃথিবীতে ওদের নির্বাসনদণ্ড— ওদের তফাতে রেখে চলতেই হবে।

বাউলের প্রবেশ ও গান

যা ছিল কালো ধলো
তোমার রঙে রঙে রাঙা হল।
যেমন রাঙাবরন তোমার চরণ
তার সনে আর ভেদ না র'ল।
রাঙা হল বসন ভূষণ,
রাঙা হল শয়ন স্বপন,
মন হল কেমন দেখ্ রে, যেমন
রাঙা কমল টলোমলো!

ঠাকুরদা। বেশ ভাই, বেশ— খুব খেলা জমেছিল?

বাউল। খুব খুব। সব লালে লাল। কেবল আকাশের চাঁদটাই ফাঁকি দিয়েছে— সাদাই রয়ে গেল।

ঠাকুরদা। বাইরে থেকে দেখাচ্ছে যেন বড়ো ভালোমানুষ। ওর সাদা চাদরটা খুলে দেখতিস যদি তা হলে ওর বিদ্যে ধরা পড়ত। চুপি চুপি ও যে আজ কত রঙ ছড়িয়েছে এখানে দাঁড়িয়ে সব দেখেছি। অথচ ও নিজে কি এমনি সাদাই থেকে যাবে?

গান

আহা তোমার সঙ্গে প্রাণের খেলা
প্রিয় আমার ওগো প্রিয়।
বড়ো উতলা আজ পরান আমার
খেলাতে হার মানবে কি ও?
কেবল তুমিই কি গো এমনি ভাবে
রাঙিয়ে মোরে পালিয়ে যাবে?
তুমি সাধ করে নাথ ধরা দিয়ে
আমারও রঙ বক্ষে নিয়ো—
এই হৃৎকমলের রাঙা রেণু
রাঙাবে ওই উত্তরীয়।

[সকলের প্রস্থান

সুবর্ণ ও রাজা বিক্রমবাহুর প্রবেশ

সুবর্ণ। এ কী কাণ্ড করেছ রাজা বিক্রমবাহু?

বিক্রম। আমি কেবল এই প্রাসাদের কাছটাতেই আগুন ধরাতে চেয়েছিলুম, সে আগুন যে এত শীঘ্র এমন চারি দিক ধরে উঠবে সে আমি মনেও করি নি। এ বাগান থেকে বেরোবার পথ কোথায় শীঘ্র বলে দাও।

সুবর্ণ। পথ কোথায় আমি তো কিছুই জানি নে। যারা আমাদের এখানে এনেছিল তাদের একজনকেও দেখছি নে।

বিক্রম। তুমি তো এদেশেরই লোক— পথ নিশ্চয় জান।

সুবর্ণ। অন্তঃপুরের বাগানে কোনোদিনই প্রবেশ করি নি।

বিক্রম। সে আমি বুঝি নে, তোমাকে পথ বলতেই হবে, নইলে তোমাকে দু-টুকরো করে কেটে ফেলব।

সুবর্ণ। তাতে প্রাণ বেরোবে, পথ বেরোবার কোনো উপায় হবে না।

বিক্রম। তবে কেন বলে বেড়াচ্ছিলে তুমিই এখানকার রাজা?

সুবর্ণ। আমি রাজা না, রাজা না। (মাটিতে পড়িয়া জোড়করে) কোথায় আমার রাজা, রক্ষা করো। আমি পাপিষ্ঠ, আমাকে রক্ষা করো। আমি বিদ্রোহী, আমাকে দণ্ড দাও, কিন্তু রক্ষা করো।

বিক্রম। অমন শূন্যতার কাছে চীৎকার করে লাভ কী? ততক্ষণ পথ বের করবার চেষ্টা করা যাক।

সুবর্ণ। আমি এইখানেই পড়ে রইলুম— আমার যা হবার তাই হবে।

বিক্রম। সে হবে না। পুড়ে মরি তো একলা মরব না— তোমাকে সঙ্গী নেব।

নেপথ্য হইতে। রক্ষা করো, রক্ষা করো! চারি দিকে আগুন!

বিক্রম। মূঢ়, ওঠো, আর দেরি না।

সুদর্শনার প্রবেশ

সুদর্শনা। রাজা, রক্ষা করো। আগুনে ঘিরেছে।

সুবর্ণ। কোথায় রাজা? আমি রাজা নই।

সুদর্শনা। তুমি রাজা নও?

সুবর্ণ। আমি ভণ্ড, আমি পাষণ্ড! (মুকুট মাটিতে ফেলিয়া) আমার ছলনা ধুলিসাৎ হোক।

[রাজা বিক্রমের সহিত প্রস্থান

সুদর্শনা। রাজা নয়? এ রাজা নয়? তবে ভগবান হুতাশন, দগ্ধ করো আমাকে; আমি তোমারই হাতে আত্মসমর্পণ করব।

নেপথ্যে। ও দিকে কোথায় যাও। তোমার অন্তঃপুরের চারি দিকে আগুন ধরে গেছে, ওর মধ্যে প্রবেশ কোরো না।

সুরঙ্গমার প্রবেশ

সুরঙ্গমা। এসো।

সুদর্শনা। কোথায় যাব?

সুরঙ্গমা। ঐ আগুনের ভিতর দিয়েই চলো।

সুদর্শনা। সে কী কথা?

সুরঙ্গমা। আগুনকে বিশ্বাস করো, যাকে বিশ্বাস করেছিলে, এ তার চেয়ে ভালো।

সুদর্শনা। রাজা কোথায়?

সুরঙ্গমা। রাজাই আছেন ঐ আগুনের মধ্যে। তিনি সোনাকে পুড়িয়ে নেবেন।

সুদর্শনা। সত্যি বলছিস?

সুরঙ্গমা। আমি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি, আগুনের ভিতরকার রাস্তা জানি।

[উভয়ের প্রস্থান

গানের দলের প্রবেশ

গান

আগুনে হল আগুনময়।
জয় আগুনের জয়।
মিথ্যা যত হৃদয় জুড়ে
এইবেলা সব যাক-না পুড়ে,
মরণ-মাঝে তোর জীবনের হোক রে পরিচয়॥

আগুন এবার চলল রে সন্ধানে
কলঙ্ক তোর লুকিয়ে কোথায় প্রাণে।
আড়াল তোমার যাক-না ঘুচে,
লজ্জা তোমার যাক রে মুছে,
চিরদিনের মতো তোমার ছাই হয়ে যাক ভয়॥

[গানের দলের প্রস্থান

সুদর্শনা ও সুরঙ্গমার পুনঃপ্রবেশ

সুরঙ্গমা। ভয় নেই, তোমার ভয় নেই।

সুদর্শনা। ভয় আমার নেই— কিন্তু লজ্জা! লজ্জা যে আগুনের মতো আমার সঙ্গে সঙ্গে এসেছে। আমার মুখ চোখ, আমার সমস্ত হৃদয়টাকে রাঙা করে রেখেছে।

সুরঙ্গমা। এ দাহ মিটতে সময় লাগবে।

সুদর্শনা। কোনোদিন মিটবে না, কোনোদিন মিটবে না।

সুরঙ্গমা। হতাশ হোয়ো না। তোমার সাধ তো মিটেছে, আগুনের মধ্যেই তো আজ দেখে নিলে।

সুদর্শনা। আমি কি এমন সর্বনাশের মধ্যে দেখতে চেয়েছিলুম? কী দেখলুম জানি নে, কিন্তু বুকের মধ্যে এখনো কাঁপছে।

সুরঙ্গমা। কেমন দেখলে?

সুদর্শনা। ভয়ানক, সে ভয়ানক। সে আমার স্মরণ করতেও ভয় হয়। কালো, কালো। আমার মনে হল ধূমকেতু যে আকাশে উঠেছে সেই আকাশের মতো কালো— ঝড়ের মেঘের মতো কালো— কূলশূন্য সমুদ্রের মতো কালো।

[প্রস্থান

সুরঙ্গমা। যে কালো দেখে আজ তোমার বুক কেঁপে গেছে সেই কালোতেই এক দিন তোমার হৃদয় স্নিগ্ধ হয়ে যাবে। নইলে ভালোবাসা কিসের?

গান

আমি রূপে তোমায় ভোলাব না,
ভালোবাসায় ভোলাব।
আমি হাত দিয়ে দ্বার খুলব না গো
গান দিয়ে দ্বার খোলাব॥
ভরাব না ভূষণভারে,
সাজাব না ফুলের হারে,
প্রেমকে আমার মালা করে
গলায় তোমার দোলাব॥
জানবে না কেউ কোন্ তুফানে
তরঙ্গদল নাচবে প্রাণে,
চাঁদের মতো অলখ টানে
জোয়ারে ঢেউ তোলাব॥

সুদর্শনার পুনঃপ্রবেশ

সুদর্শনা। কিন্তু কেন সে আমাকে জোর করে পথ আটকায় না? কেশের গুচ্ছ ধরে কেন সে আমাকে টেনে রেখে দেয় না? আমাকে কিছু সে বলছে না, সেইজন্যেই আরো অসহ্য বোধ হচ্ছে।

সুরঙ্গমা। রাজা কিছু বলছে না, কে তোমাকে বললে?

সুদর্শনা। অমন করে নয়, চীৎকার করে বজ্রগর্জনে— আমার কান থেকে অন্য সকল কথা ডুবিয়ে দিয়ে। রাজা আমাকে এত সহজে ছেড়ে দিয়ো না, যেতে দিয়ো না।

সুরঙ্গমা। ছেড়ে দেবেন, কিন্তু যেতে দেবেন কেন?

সুদর্শনা। যেতে দেবেন না? আমি যাবই।

সুরঙ্গমা। আচ্ছা যাও।

সুদর্শনা। আমার দোষ নেই। আমাকে জোর করে তিনি ধরে রাখতে পারতেন কিন্তু রাখলেন না। আমাকে বাঁধলেন না— আমি চললুম। এইবার তাঁর প্রহরীদের হুকুম দিন, আমাকে ঠেকাক।

সুরঙ্গমা। কেউ ঠেকাবে না। ঝড়ের মুখে ছিন্ন মেঘ যেমন অবাধে চলে তেমনি তুমি অবাধে চলে যাও।

সুদর্শনা। ক্রমেই বেগ বেড়ে উঠছে— এবার নোঙর ছিঁড়ল। হয়তো ডুবব কিন্তু আর ফিরব না।

[দ্রুত প্রস্থান

৪

রাজপথ

নাগরিকদলের প্রবেশ

প্রথম। এটি ঘটালেন আমাদের রাজকন্যা সুদর্শনা।

দ্বিতীয়। সকল সর্বনাশের মূলেই স্ত্রীলোক আছে। বেদেই তো আছে— কী আছে বলো-না হে বটুকেশ্বর— তুমি বামুনের ছেলে।

তৃতীয়। আছে, আছে বৈকি। বেদে যা খুঁজবে তাই পাওয়া যাবে— অষ্টাবক্র বলেছেন, নারীণাঞ্চ নখিনাঞ্চ শৃঙ্গিণাং শস্ত্রপাণিনাং— অর্থাৎ কিনা—

দ্বিতীয়। আরে, বুঝেছি বুঝেছি— আমি থাকি তর্করত্নপাড়ায়— অনুস্বার-বিসর্গের একটা ফোঁটা আমার কাছে এড়াবার জো নেই।

প্রথম। আমাদের এ হল যেন কলির রামায়ণ। কোথা থেকে ঘরে ঢুকে পড়ল দশমুণ্ড রাবণ, আচমকা লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে দিল।

তৃতীয়। যুদ্ধের হাওয়া তো চলছে, এ দিকে রাজকন্যা যে কোথায় অদর্শন হয়েছেন কেউ খোঁজ পায় না। মহারাজ তো বন্দী, এ দিকে কে যে লড়াই চালাচ্ছে তারও কোনো ঠিকানা নেই।

দ্বিতীয়। কিন্তু আমি ভাবছি, এখন আমাদের উপায় কী? আমাদের ছিল এক রাজা, এখন সাতটা হতে চলল, বেদে পুরাণে কোথাও তো এর তুলনা মেলে না।

প্রথম। মেলে বৈকি— পঞ্চপাণ্ডবের কথা ভেবে দেখো।

তৃতীয়। আরে সে হল পঞ্চপতি—

প্রথম। একই কথা। তারা হল পতি, এরা হল নৃপতি। কোনোটারই বাড়াবাড়ি সুবিধে নয়।

তৃতীয়। আমাদের পাঁচকড়ি একেবারে বেদব্যাস হয়ে উঠল হে— রামায়ণ মহাভারত ছাড়া কথাই কয় না।

দ্বিতীয়। তোরা তো রামায়ণ মহাভারত নিয়ে পথের মধ্যে আসর জমিয়েছিস, এ দিকে আমাদের নিজের কুরুক্ষেত্রে কী ঘটছে খবর কেউ রাখিস নে।

প্রথম। ওরে বাবা— সেখানে যাবে কে? খবর যখন আসবে তখন ঘাড়ের উপর এসে আপনি পড়বে— জানতে বাকি থাকবে না।

দ্বিতীয়। ভয় কিসের রে?

প্রথম। তা তো সত্যি। তুমি যাও-না।

তৃতীয়। আচ্ছা, চলো-না ধনঞ্জয়ের ওখানে। সে সব খবর জানে।

দ্বিতীয়। না জানলেও বানিয়ে দিতে জানে। [সকলের প্রস্থান

সুদর্শনা ও সুরঙ্গমার প্রবেশ

সুদর্শনা। একদিন আমাকে সকলে সৌভাগ্যবতী বলত, আমি যেখানে যেতুম সেখানেই ঐশ্বর্যের আলো জ্বলে উঠত। আজ আমি এ কী অকল্যাণ সঙ্গে করে এনেছি। তাই আমি ঘর ছেড়ে পথে এলুম।

সুরঙ্গমা। মা, যতক্ষণ না সেই রাজার ঘরে পৌঁছোবে ততক্ষণ তো পথই বন্ধু।

সুদর্শনা। চুপ কর, চুপ কর, তার কথা আর বলিস নে।

সুরঙ্গমা। তুমি যে তাঁর কাছেই ফিরে যাচ্ছ।

সুদর্শনা। কখনোই না।

সুরঙ্গমা। কার উপরে রাগ করছ মা!

সুদর্শনা। আমি তার নাম করতেও চাই নে।

সুরঙ্গমা। আচ্ছা, নাম কোরো না, তাঁর সবুর সইবে।

সুদর্শনা। আমি পথে বেরোলুম, সঙ্গে সে এল না!

সুরঙ্গমা। সমস্ত পথ জুড়ে আছেন তিনি।

সুদর্শনা। একবার বারণও করলে না? চুপ করে রইলি যে? বল্-না, তোর রাজার এ কী রকম ব্যবহার!

সুরঙ্গমা। সে তো সবাই জানে, আমার রাজা নিষ্ঠুর। তাঁকে কি কেউ কোনোদিন টলাতে পারে?

সুদর্শনা। তবে তুই এমন দিনরাত ডাকিস কেন?

সুরঙ্গমা। সে যেন এমনি পর্বতের মতোই চিরদিন কঠিন থাকে। আমার দুঃখ আমার থাক্, সেই কঠিনেরই জয় হোক।

[সুদর্শনার প্রস্থান

সুরঙ্গমার গান

ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর
তোমার প্রেম তোমারে এমন করে
করেছে নিষ্ঠুর।
তুমি বসে থাকতে দেবে না যে,
দিবানিশি তাই তো বাজে
পরান মাঝে এমন কঠিন সুর॥
ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর,
তোমার লাগি দুঃখ আমার
হয় যেন মধুর।
তোমার খোঁজা খোঁজায় মোরে,
তোমার বেদন কাঁদায় ওরে,
আরাম যত করে কোথায় দূর॥

[সুরঙ্গমার প্রস্থান

রাজা বিক্রম ও সুবর্ণের প্রবেশ

বিক্রম। কে যে বললে সুদর্শনা এই পথ দিয়ে পালিয়েছে। যুদ্ধে তার বাপকে বন্দী করা মিথ্যে হবে যদি সে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যায়।

সুবর্ণ। পালিয়ে যদি গিয়ে থাকে, তা হলে তো বিপদ কেটে গেছে। এখন ক্ষান্ত হোন।

বিক্রম। কেন বলো তো?

সুবর্ণ। দুঃসাহসিকতা হচ্ছে।

বিক্রম। তাই যদি না হবে, তবে কাজে প্রবৃত্ত হয়ে সুখ কী?

সুবর্ণ। কান্তিকরাজকে ভয় না করলেও চলে কিন্তু—

বিক্রম। ঐ কিন্তুটাকে ভয় করতে শুরু করলে জগতে টেকা দায় হয়।

সুবর্ণ। মহারাজ, ঐ কিন্তুটাকে নাহয় মন থেকে উড়িয়ে দিলেন, কিন্তু ও যে বাইরে থেকেই হঠাৎ উড়ে এসে দেখা দেয়। ভেবে দেখুন-না, বাগানে কী কাণ্ডটা হল। খুব করেই আটঘাট বেঁধেছিলেন, তার মধ্যে কোথা থেকে অগ্নিমূর্তি ধরে ঢুকে পড়ল একটা কিন্তু।

বসুসেন ও বিজয়বর্মার প্রবেশ

বসুসেন। অন্তঃপুর ঘুরে এলুম, কোথাও তো তাকে পাওয়া গেল না। দৈবজ্ঞ যে বলেছিল, আমাদের যাত্রা শুভ, সেটা বুঝি মিথ্যা হল।

বিজয়। পাওয়ার চেয়ে না পাওয়াতেই হয়তো শুভ, কে বলতে পারে?

বিক্রম। এ কী উদাসীনের মতো কথা বলছ।

বসুসেন। এ কী! ভূমিকম্প না কি!

বিক্রম। ভূমিই কাঁপছে বটে, কিন্তু তাই বলে পা কাঁপতে দেওয়া হবে না।

বসুসেন। এটা দুর্লক্ষণ।

বিক্রম। কোনো লক্ষণই দুর্লক্ষণ নয়, যদি সঙ্গে ভয় না থাকে।

বসুসেন। দৃষ্ট কিছুকে ভয় করি নে কিন্তু অদৃষ্ট পুরুষের সঙ্গে লড়াই চলে না।

বিক্রম। অদৃষ্ট দৃষ্ট হয়েই আছেন, তখন তাঁর সঙ্গে খুবই লড়াই চলে।

দূতের প্রবেশ

দূত। মহারাজ, সৈন্যরা প্রায় সকলে পালিয়েছে।

বিক্রম। কেন?

দূত। তাদের মধ্যে অকারণে কেমন একটা আতঙ্ক ঢুকে গেল— কাউকে আর ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না।

বিক্রম। আচ্ছা, তাদের ফিরিয়ে আনছি। যুদ্ধের পর হারা চলে কিন্তু যুদ্ধের আগে হার মানতে পারব না।

[বিক্রমবাহু ও দূতের প্রস্থান

বিজয়। যার জন্য যুদ্ধ সেও পালায়, যাদের নিয়ে যুদ্ধ তারাও পালায়, এখন আমাদেরই কি পালানো দোষের।

বসুসেন। মনে ধাঁধা লেগেছে, কিছু স্থির করতে পারছি নে।

[উভয়ের প্রস্থান

সুরঙ্গমার প্রবেশ

গান

বসন্ত, তোর শেষ করে দে রঙ্গ,
ফুল ফোটাবার খ্যাপামি, তার
উদ্দাম তরঙ্গ॥
উড়িয়ে দেবার, ছড়িয়ে দেবার
মাতন তোমার থামুক এবার,
নীড়ে ফিরে আসুক তোমার
পথহারা বিহঙ্গ॥

সাধের মুকুল কতই পড়ল ঝরে
তারা ধুলা হল, ধুলা দিল ভরে।
প্রখর তাপে জরো-জরো
ফল ফলাবার শাসন ধরো,
হেলাফেলার পালা তোমার
এই বেলা হোক ভঙ্গ ॥

সুদর্শনার প্রবেশ

সুদর্শনা। এ কী হল ? ঘুরে ফিরে সেই একই জায়গায় এসে পড়ছি। ঐ-যে গোলমাল শোনা যাচ্ছে, মনে হচ্ছে আমার চারি দিকেই যুদ্ধ চলছে। ঐ-যে আকাশ ধুলোয় অন্ধকার। আমি কি এই ঘূর্ণি ধুলোর সঙ্গে সঙ্গেই অনন্তকাল ঘুরে বেড়াব ? এর থেকে বেরোই কেমন করে ?

সুরঙ্গমা। তুমি যে কেবল চলে যেতেই চাচ্ছ, ফিরতে চাচ্ছ না, সেইজন্য কোথাও পৌঁছোতে পাচ্ছ না।

সুদর্শনা। কোথায় ফেরবার কথা তুই বলছিস ?

সুরঙ্গমা। আমাদের রাজার কাছে। আমি বলে রাখছি, যে-পথ তাঁর কাছে না নিয়ে যাবে সে-পথের অন্ত পাবে না কোথাও।

সৈনিকের প্রবেশ

সুদর্শনা। কে তুমি ?
সৈনিক। আমি নগরের রাজপ্রাসাদের দ্বারী।
সুদর্শনা। শীঘ্র বলো সেখানকার খবর কী।
সৈনিক। মহারাজ বন্দী হয়েছেন।
সুদর্শনা। কে বন্দী হয়েছেন ?
সৈনিক। আপনার পিতা।
সুদর্শনা। আমার পিতা! কার বন্দী হয়েছেন ?
সৈনিক। রাজা বিক্রমবাহুর।

[সৈনিকের প্রস্থান

সুদর্শনা। রাজা, রাজা, দুঃখ তো আমি সইতে প্রস্তুত হয়েই বেরিয়েছিলেম, কিন্তু আমার দুঃখ চার দিকে ছড়িয়ে দিলে কেন ? যে আগুন আমার বাগানে লেগেছিল সেই আগুন কি আমি সঙ্গে করে নিয়ে চলেছি। আমার পিতা তোমার কাছে কী দোষ করেছেন ?

সুরঙ্গমা। আমরা যে কেউ একলা নই। ভালোমন্দ সবাইকেই ভাগ করে নিতে হয়। সেইজন্যেই তো ভয়, একলার জন্যে ভয় কিসের ?

সুদর্শনা। সুরঙ্গমা!

সুরঙ্গমা। কী রাজকুমারী!

সুদর্শনা। তোর রাজার যদি রক্ষা করবার শক্তি থাকত, তা হলে আজ তিনি কি নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারতেন ?

সুরঙ্গমা। আমাকে কেন বলছ ? আমার রাজার হয়ে উত্তর দেবার শক্তি কি আমার আছে ? উত্তর যদি দেন তো নিজেই এমনি করে দেবেন যে কারও কিছু বুঝতে বাকি থাকবে না।

সুদর্শনা। রাজা, আমার পিতাকে রক্ষা করবার জন্যে যদি তুমি আসতে, তা হলে তোমার যশ বাড়ত বই কমত না।

প্রস্থানোদ্যম

সুরঙ্গমা। কোথায় যাচ্ছ ?

সুদর্শনা। রাজা বিক্রমের শিবিরে। আমাকে বন্দী করুন তিনি, আমার পিতাকে ছেড়ে দিন। আমি নিজেকে যতদূর নত করতে পারি করব, দেখি কোথায় এসে ঠেকলে তোর রাজার সিংহাসন নড়ে।

[উভয়ের প্রস্থান

বসুসেন ও বিজয়বর্মার প্রবেশ

বসুসেন। যুদ্ধের আরম্ভেই যুদ্ধ শেষ হয়ে আছে, ভাঙা সৈন্য কুড়িয়ে এনে কখনো লড়াই চলে ?

বিজয়। বিক্রমবাহুকে কিছুতেই ফেরাতে পারলুম না।

বসুসেন। সে আত্মবিনাশের নেশায় উন্মত্ত।

বিজয়। কিন্তু কে আমাকে বললে, রণক্ষেত্রে সে যেমনি গিয়ে পৌঁচেছে অমনি তার বুকে লেগেছে ঘা। এতক্ষণে তার কী হল কিছুই বলা যায় না।

বসুসেন। আমার কাছে এইটেই সব চেয়ে অদ্ভুত ঠেকছে যে, আমরা আয়োজন করলুম কতদিন থেকে, সমারোহ হল ঢের, কিন্তু শেষ হবার বেলায় এক পলকেই কী যে হয়ে গেল ভালো বুঝতে পারা গেল না।

বিজয়। রাত্রির সমস্ত তারা যেমন প্রভাতসূর্যের এক কটাক্ষেই নিবে যায়।

বসুসেন। এখন চলো।

বিজয়। কোথায় ?

বসুসেন। ধরা দিতে।

বিজয়। ধরা দিতে, না পালাতে ?

বসুসেন। পালানোর চেয়ে ধরা দেওয়া সহজ হবে।

[উভয়ের প্রস্থান

সুরঙ্গমার প্রবেশ

গান

এখনো গেল না আঁধার,
　　এখনো রহিল বাধা।
এখনো মরণ-ব্রত
　　জীবনে হল না সাধা।
কবে যে দুঃখজ্বালা
হবে রে বিজয়মালা,
ঝলিবে অরুণরাগে
　　নিশীথরাতের কাঁদা।
এখনো নিজেরি ছায়া
　　রচিছে কত যে মায়া।
এখনো কেন যে মিছে
চাহিছে কেবলই পিছে,
চকিতে বিজলি আলো
　　চোখেতে লাগাল ধাঁধা॥

সুদর্শনার প্রবেশ

সুরঙ্গমা। এ লজ্জা কাটবে!

সুদর্শনা। কাটবে বৈকি সুরঙ্গমা— সমস্ত পৃথিবীর কাছে আমার নিচু হবার দিন এসেছে। কিন্তু কই, রাজা এখনো কেন আমাকে নিতে আসছেন না? আরো কিসের জন্যে তিনি অপেক্ষা করছেন?

সুরঙ্গমা। আমি তো বলেছি, আমার রাজা নিষ্ঠুর— বড়ো নিষ্ঠুর।

সুদর্শনা। সুরঙ্গমা, তুই যা একবার তাঁর খবর নিয়ে আয় গে।

সুরঙ্গমা। কোথায় তাঁর খবর নেব তা তো কিছুই জানি নে। ঠাকুরদাকে ডাকতে পাঠিয়েছি— তিনি এলে হয়তো তাঁর কাছ থেকে সংবাদ পাওয়া যাবে।

সুদর্শনা। হায় কপাল, লোককে ডেকে ডেকে তাঁর খবর নিতে হবে আমার এমন দশা হয়েছে! না না, দুঃখ করব না। যা হওয়া উচিত ছিল তাই হয়েছে, ভালোই হয়েছে, কিছু অন্যায় হয় নি।

ঠাকুরদার প্রবেশ

সুদর্শনা। শুনেছি তুমি আমার রাজার বন্ধু— আমার প্রণাম গ্রহণ করো, আমাকে আশীর্বাদ করো।

ঠাকুরদা। করো কী, করো কী। আমি কারও প্রণাম গ্রহণ করি নে। আমার সঙ্গে সকলের হাসির সম্বন্ধ।

সুদর্শনা। তোমার সেই হাসি দেখিয়ে দাও— আমাকে সুসংবাদ দিয়ে যাও। বলো আমার রাজা কখন আমাকে নিতে আসবেন?

ঠাকুরদা। ঐ তো বড় শক্ত কথা জিজ্ঞাসা করলে। আমার বন্ধুর ভাবগতিক কিছুই বুঝি নে, তার আর বলব কী। যুদ্ধ তো শেষ হয়ে গেল, তিনি যে কোথায় তার কোনো সন্ধান নেই।

সুদর্শনা। চলে গিয়েছেন?

ঠাকুরদা। সাড়াশব্দ তো কিছুই পাই নে।

সুদর্শনা। চলে গিয়েছেন! তোমার বন্ধু এমনি বন্ধু!

ঠাকুরদা। সেইজন্যে লোকে তাকে নিন্দেও করে সন্দেহও করে। কিন্তু আমার রাজা তাতে খেয়ালও করে না।

সুদর্শনা। চলে গেলেন? ওরে, ওরে, কী কঠিন, কী কঠিন! একেবারে পাথর একেবারে বজ্র! সমস্ত বুক দিয়ে ঠেলেছি— বুক ফেটে গেল— কিন্তু নড়ল না! ঠাকুরদা, এমন বন্ধুকে নিয়ে তোমার চলে কী করে?

ঠাকুরদা। চিনে নিয়েছি যে— সুখে দুঃখে তাকে চিনে নিয়েছি— এখন আর সে কাঁদাতে পারে না।

সুদর্শনা। আমাকেও কি সে চিনতে দেবে না?

ঠাকুরদা। দেবে বৈকি। নইলে এত দুঃখ দিচ্ছে কেন? ভালো করে চিনিয়ে তবে ছাড়বে, সে তো সহজ লোক নয়।

সুদর্শনা। আচ্ছা আচ্ছা, দেখব তার কতবড়ো নিষ্ঠুরতা। পথের ধারে আমি চুপ করে পড়ে থাকব— এক পা-ও নড়ব না— দেখি সে কেমন না আসে।

ঠাকুরদা। দিদি, তোমার বয়স অল্প— জেদ করে অনেকদিন পড়ে থাকতে পারো— কিন্তু আমার যে এক মুহূর্ত গেলেও লোকসান হয়। পাই না-পাই একবার খুঁজতে বেরোব।

[প্রস্থান

সুদর্শনা। চাই নে, তাকে চাই নে! সুরঙ্গমা, তোর রাজাকে আমি চাই নে। কিসের জন্যে সে যুদ্ধ করতে এল? আমার জন্যে একেবারেই না? কেবল বীরত্ব দেখাবার জন্যে?

সুরঙ্গমা। দেখাবার ইচ্ছে তাঁর যদি থাকত তা হলে এমন করে দেখাতেন কারও আর সন্দেহ থাকত না। দেখান আর কই?

সুদর্শনা। যা যা চলে যা— তোর কথা অসহ্য বোধ হচ্ছে। এত নত করলে তবু সাধ মিটল না ? বিশ্বসুদ্ধ লোকের সামনে এইখানে ফেলে রেখে দিয়ে চলে গেল ?

[উভয়ের প্রস্থান

নাগরিক দলের প্রবেশ

প্রথম। ওহে, এতগুলো রাজা একত্র হয়ে লড়াই বাধিয়ে দিলে, ভাবলুম, খুব তামাশা হবে— কিন্তু দেখতে দেখতে কী যে হয়ে গেল, বোঝাই গেল না।

দ্বিতীয়। দেখলে না, ওদের নিজেদের মধ্যে গোলমাল লেগে গেল, কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না।

তৃতীয়। পরামর্শ ঠিক রইল না যে। কেউ এগোতে চায় কেউ পিছোতে চায়— কেউ এদিকে যায় কেউ ওদিকে যায়, একে কি আর যুদ্ধ বলে ? কিন্তু লড়েছিল রাজা বিক্রমবাহু, সে কথা বলতেই হবে।

প্রথম। সে যে হেরেও হারতে চায় না।

দ্বিতীয়। শেষকালে অস্ত্রটা তার বুকে এসে লাগল।

তৃতীয়। সে যে পদে পদেই হারছিল, তা যেন টেরও পাচ্ছিল না।

প্রথম। অন্য রাজারা তো তাকে ফেলে কে কোথায় পালাল, তার ঠিক নেই।

[সকলের প্রস্থান

অন্য দলের প্রবেশ

প্রথম। শুনেছি বিক্রমবাহু মরে নি।

তৃতীয়। না, কিন্তু বিক্রমবাহুর বিচারটা কিরকম হল ?

দ্বিতীয়। শুনেছি বিচারকর্তা স্বহস্তে রাজমুকুট পরিয়ে দিয়েছে।

তৃতীয়। এটা কিন্তু একেবারেই বোঝা গেল না।

দ্বিতীয়। বিচারটা যেন কেমন বেখাপ রকম শোনাচ্ছে।

প্রথম। তা তো বটেই। অপরাধ যা কিছু করেছে, সে তো ঐ বিক্রমবাহুই।

দ্বিতীয়। আমি যদি বিচারক হতুম, তা হলে কি আর আস্ত রাখতুম ? ওর আর চিহ্ন দেখাই যেত না !

তৃতীয়। কী জানি, বিচারকর্তাকে দেখি নে, তার বুদ্ধিটাও দেখা যায় না।

প্রথম। ওদের বুদ্ধি ব'লে কিছু আছে কি ! এর মধ্যে সবই মর্জি। কেউ তো বলবার লোক নেই।

দ্বিতীয়। যা বলিস ভাই, আমাদের হাতে শাসনের ভার যদি পড়ত, তা হলে এর চেয়ে ঢের ভালো করে চালাতে পারতুম।

তৃতীয়। সে কি একবার করে বলতে !

[সকলের প্রস্থান

ঠাকুরদাদা ও বিক্রমবাহুর প্রবেশ

ঠাকুরদাদা। একি বিক্রমরাজ, তুমি পথে যে।

বিক্রম। তোমার রাজা আমাকে পথেই বের করেছে।

ঠাকুরদাদা। ঐ তো তার স্বভাব।

বিক্রম। তার পরে আর নিজের দেখা নেই।

ঠাকুরদাদা। সেও তার এক কৌতুক।

বিক্রম। কিন্তু আমাকে এমন করে আর কতদিন এড়াবে ? যখন কিছুতেই তাকে রাজা বলে মানতেই চাই নি তখন কোথা থেকে কালবৈশাখীর মতো এসে এক মুহূর্তে আমার ধ্বজা পতাকা ভেঙে উড়িয়ে ছারখার করে দিলে, আর আজ তার কাছে হার মানবার জন্যে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি, তার আর দেখাই নেই।

ঠাকুরদাদা। তা হোক, সে যতবড়ো রাজাই হোক, হার-মানার কাছে তাকে হার মানতেই হবে। কিন্তু রাজন্, রাত্রে বেরিয়েছ যে।

বিক্রম। ঐ লজ্জাটুকু এখনো ছাড়তে পারি নি। রাজা বিক্রম থালায় মুকুট সাজিয়ে তোমার রাজার মন্দির খুঁজে বেড়াচ্ছে, এই যদি দিনের আলোয় লোকে দেখে তা হলে যে তারা হাসবে।

ঠাকুরদাদা। লোকের ঐ দশা বটে। যা দেখে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে যায় তাই দেখেই বাঁদররা হাসে।

বিক্রম। কিন্তু ঠাকুরদা, তুমিও পথে যে?

ঠাকুরদাদা। আমিও সর্বনাশের পথ চেয়ে আছি।

গান

আমার সকল নিয়ে বসে আছি
সর্বনাশের আশায়।
আমি তার লাগি পথ চেয়ে আছি।
পথে যে জন ভাসায় ॥

বিক্রম। কিন্তু ঠাকুরদা, যে ধরা দেবে না তার কাছে ধরা দিয়ে লাভ কী বলো।

ঠাকুরদাদা। তার কাছে রা দিলে এক সঙ্গেই ধরাও দেওয়া হয় ছাড়াও পাওয়া যায়।

যে জন দেয় না দেখা— যায় যে দেখে,
ভালোবাসে আড়াল থেকে,
আমার মন মজেছে সেই গভীরের
গোপন ভালোবাসায় ॥

[উভয়ের প্রস্থান

সুরঙ্গমার প্রবেশ

গান

পথের সাথি, নমি বারংবার।
পথিক জনের লহো নমস্কার ॥
ওগো বিদায়, ওগো ক্ষতি
ওগো দিনশেষের পতি,
ভাঙা-বাসার লহো নমস্কার ॥
ওগো নব প্রভাতজ্যোতি,
ওগো চিরদিনের গতি,
নব আশার লহো নমস্কার ॥
জীবনরথের হে সারথি,
আমি নিত্য পথের পথী,
পথে চলার লহো নমস্কার ॥

সুদর্শনার প্রবেশ

সুদর্শনা। বেঁচেছি, বেঁচেছি সুরঙ্গমা! হার মেনে তবে বেঁচেছি। ওরে বাস রে। কী কঠিন অভিমান! কিছুতেই গলতে চায় না। আমার রাজা কেন আমার কাছে আসতে যাবে— আমিই তার কাছে যাব, এই কথাটা কোনোমতেই মনকে বলাতে পারছিলুম না। সমস্ত রাতটা পথে পড়ে ধুলোয় লুটিয়ে কেঁদেছি— দক্ষিনে হাওয়া বুকের বেদনার মতো হুহু করে বয়েছে, আর কৃষ্ণচতুর্দশীর অন্ধকারে বউ-কথা-কও চার পহর রাত কেবলই ডেকেছে— সে যেন অন্ধকারের কান্না!

সুরঙ্গমা। আহা কালকের রাতটা মনে হয়েছিল যেন কিছুতেই আর পোহাতে চায় না।

সুদর্শনা। কিন্তু বললে বিশ্বাস করবি নে, তারই মধ্যে বার বার আমার মনে হচ্ছিল কোথায় যেন তার বীণা বাজছে। যে নিষ্ঠুর, তার কঠিন হাতে কি অমন মিনতির সুর বাজে ? বাইরের লোক আমার অসম্মানটাই দেখে গেল— কিন্তু গোপন রাত্রের সেই সুরটা কেবল আমার হৃদয় ছাড়া আর তো কেউ শুনল না। সে বীণা তুই কি শুনেছিলি সুরঙ্গমা। না, সে আমার স্বপ্ন ?

সুরঙ্গমা। সেই বীণা শুনব বলেই তো তোমার কাছে কাছে আছি। অভিমান-গলানো সুর বাজবে জেনেই কান পেতে পড়ে ছিলুম।

[উভয়ের প্রস্থান

গানের দলের প্রবেশ

গান

আমার অভিমানের বদলে আজ
নেব তোমার মালা।
আজ নিশিশেষে শেষ করে দিই
চোখের জলের পালা ॥
আমার কঠিন হৃদয়টারে
ফেলে দিলেম পথের ধারে,
তোমার চরণ দেবে তারে মধুর
পরশ পাষাণ-গালা ॥
ছিল আমার আঁধারখানি,
তারে তুমিই নিলে টানি,
তোমার প্রেম এল যে আগুন হয়ে
করল তারে আলা।
সেই যে আমার কাছে আমি
ছিল সবার চেয়ে দামি
তারে উজাড় করে সাজিয়ে দিলেম
তোমার বরণডালা ॥

[প্রস্থান

সুদর্শনা ও সুরঙ্গমার পুনঃপ্রবেশ

সুদর্শনা। তার পণটাই রইল— পথে বের করলে তবে ছাড়লে ! মিলন হলে এই কথাটাই তাকে বলব যে, আমিই এসেছি, তোমার আসার অপেক্ষা করি নি। বলব চোখের জল ফেলতে ফেলতে এসেছি— কঠিন পথ ভাঙতে ভাঙতে এসেছি। এ গর্ব আমি ছাড়ব না।

সুরঙ্গমা। কিন্তু সে গর্বও তোমার টিকবে না। সে যে তোমারও আগে এসেছিল নইলে তোমাকে বার করে কার সাধ্য।

সুদর্শনা। তা হয়তো এসেছিল— আভাস পেয়েছিলুম কিন্তু বিশ্বাস করতে পারি নি। যতক্ষণ অভিমান করে বসেছিলুম ততক্ষণ মনে হয়েছিল সেও আমাকে ছেড়ে গিয়েছে— অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে যখনই রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম তখনই মনে হল সেও বেরিয়ে এসেছে, রাস্তা থেকেই তাকে পাওয়া শুরু করেছি। এখন আমার মনে আর কোনো ভাবনা নেই। তার জন্যে এত যে দুঃখ এই দুঃখই আমাকে তার সঙ্গ দিচ্ছে। এত কষ্টের রাস্তা আমার পায়ের তলায় যেন সুরে সুরে বেজে উঠছে। এ যেন আমার বীণা, আমার দুঃখের বীণা ; এরই বেদনার গানে তিনি এই কঠিন পাথরে, এই

শুকনো ধুলোয়, আপনি বেরিয়ে এসেছেন। আমার হাত ধরেছেন। সেই আমার অন্ধকারের মধ্যে যেমন করে হাত ধরতেন, হঠাৎ চমকে উঠে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠত, এও সেইরকম। কে বললে তিনি নেই! সুরঙ্গমা, তুই কি বুঝতে পারছিস নে তিনি লুকিয়ে এসেছেন?

সুরঙ্গমার গান

আমার আর হবে না দেরি,
আমি শুনেছি ওই বাজে তোমার ভেরী ॥
তুমি কি নাথ দাঁড়িয়ে আছ
আমার যাবার পথে,
মনে হয় যে ক্ষণে ক্ষণে
মোর বাতায়ন হতে
তোমায় যেন হেরি ॥
আমার স্বপন হল সারা
এখন প্রাণে বীণা বাজায় ভোরের তারা।
দেবার মতো যা ছিল মোর
নাই কিছু আর হাতে,
তোমার আশীর্বাদের মালা
নেব কেবল মাথে
আমার ললাট ঘেরি ॥

সুদর্শনা। ও কে ও! চেয়ে দেখ্ সুরঙ্গমা, এত রাত্রে এই আঁধারে পথে আরো একজন পথিক বেরিয়েছে যে!

সুরঙ্গমা। মা, এ যে বিক্রম রাজা দেখছি!

সুদর্শনা। বিক্রম রাজা?

সুরঙ্গমা। ভয় কোরো না।

সুদর্শনা। ভয়! ভয় কেন করব। ভয়ের দিন আমার আর নেই।

রাজা বিক্রমবাহুর প্রবেশ

বিক্রম। তুমিও চলেছ বুঝি। আমিও এই এক পথেরই পথিক। আমাকে কিছুমাত্র ভয় কোরো না।

সুদর্শনা। ভালোই হয়েছে বিক্রমরাজ— আমরা দুজনে তাঁর কাছে পাশাপাশি চলেছি এ ঠিক হয়েছে। ঘর ছেড়ে বেরোবার মুখেই তোমার সঙ্গে আমার যোগ হয়েছিল— আজ ঘরে ফেরবার পথে সেই যোগই যে এমন শুভযোগ হয়ে উঠবে তা আগে কে মনে করতে পারত!

বিক্রম। কিন্তু তুমি যে হেঁটে চলেছ এ তো তোমাকে শোভা পায় না। যদি অনুমতি কর তা হলে এখনই রথ আনিয়ে দিতে পারি।

সুদর্শনা। না না, অমন কথা বোলো না— যে-পথ দিয়ে তাঁর কাছ থেকে দূরে এসেছি, সেই পথের সমস্ত ধুলোটা পা দিয়ে মাড়িয়ে মাড়িয়ে ফিরব তবেই আমার বেরিয়ে আসা সার্থক হবে। রথে করে নিয়ে গেলে আমাকে ফাঁকি দেওয়া হবে।

সুরঙ্গমা। মহারাজ, তুমিও তো আজ ধুলোয়। এ পথে তো হাতি ঘোড়া রথ কারও দেখি নি।

সুদর্শনা। যখন প্রাসাদে ছিলুম তখন কেবল সোনারুপোর মধ্যেই পা ফেলেছি— আজ তাঁর ধুলোর মধ্যে চলে আমার সেই ভাগ্যদোষ খণ্ডিয়ে নেব। আজ আমার সেই ধুলোমাটির রাজার সঙ্গে পদে পদে এই ধুলোমাটিতে মিলন হচ্ছে, এ সুখের খবর কে জানত।

সুরঙ্গমা। ঐ দেখো, পূর্বদিকে চেয়ে দেখো ভোর হয়ে আসছে। আর দেরি নেই— তাঁর প্রাসাদের সোনার চূড়ার শিখর দেখা যাচ্ছে।

ঠাকুরদার প্রবেশ

ঠাকুরদা। ভোর হল, দিদি ভোর হল।

সুদর্শনা। তোমাদের আশীর্বাদে পৌঁচেছি।

ঠাকুরদা। কিন্তু আমাদের রাজার রকম দেখেছ? রথ নেই, বাদ্য নেই, সমারোহ নেই।

সুদর্শনা। বল কী, সমারোহ নেই? ঐ যে আকাশ একেবারে রাঙা, ফুলগন্ধের অভ্যর্থনায় বাতাস একেবারে পরিপূর্ণ।

ঠাকুরদা। তা হোক, আমাদের রাজা যত নিষ্ঠুর হোক আমরা তো তেমন কঠিন হতে পারি নে— আমাদের যে ব্যথা লাগে। এই দীনবেশে তুমি রাজভবনে যাচ্ছ, এ কি আমরা সহ্য করতে পারি? একটু দাঁড়াও, আমি ছুটে গিয়ে তোমার জন্যে রানীর বেশ নিয়ে আসি।

সুদর্শনা। না না না। সে বেশ তিনি আমাকে চির দিনের মতো ছাড়িয়েছেন— সবার সামনে আমাকে দাসীর বেশ পরিয়েছেন— বেঁচেছি বেঁচেছি— আমি আজ তাঁর দাসী— যে-কেউ তাঁর আছে, আমি আজ সকলের নীচে।

ঠাকুরদা। শত্রুপক্ষ তোমার এ দশা দেখে পরিহাস করবে, সেইটে আমাদের অসহ্য হয়।

সুদর্শনা। শত্রুপক্ষের পরিহাস অক্ষয় হোক— তারা আমার গায়ে ধুলো দিক! আজকের দিনের অভিসারে সেই ধুলোই আমার অঙ্গরাগ।

ঠাকুরদা। এর উপরে আর কথা নেই। এখন আমাদের বসন্ত-উৎসবের শেষ খেলাটাই চলুক— ফুলের রেণু এখন থাক্‌, দক্ষিনে হাওয়ায় এবার ধুলো উড়িয়ে দিক। সকলে মিলে আজ ধূসর হয়ে প্রভুর কাছে যাব। গিয়ে দেখব তাঁর গায়েও ধুলো মাখা। তাঁকে বুঝি কেউ ছাড়ে, মনে করছ? যে পায় তাঁর গায়ে মুঠো মুঠো ধুলো দেয় যে।

বিক্রম। ঠাকুরদা, তোমাদের এই ধুলোর খেলায় আমাকেও ভুলো না। আমার এই রাজবেশটাকে এমনি মাটি করে নিয়ে যেতে হবে যাতে একে আর চেনা না যায়।

ঠাকুরদা। সে আর দেরি হবে না ভাই। যেখানে নেবে এসেছ এখানে যত তোমার মিথ্যে মান সব ঘুচে গেছে— এখন দেখতে দেখতে রঙ ফিরে যাবে। আর এই আমাদের রানীকে দেখো, ও নিজের উপর ভারি রাগ করেছিল। মনে করেছিল গয়না ফেলে দিয়ে নিজের ভুবনমোহন রূপকে লাঞ্ছনা দেবে! কিন্তু সে রূপ অপমানের আঘাতে আরো ফুটে পড়েছে— সে যেন কোথাও আর কিছু ঢাকা নেই। আমাদের রাজাটির নিজের নাকি রূপের সম্পর্ক নেই তাই তো বিচিত্র রূপ সে এত ভালোবাসে, এই রূপই তো তার বক্ষের অলংকার। সেই রূপ আপন গর্বের আবরণ ঘুচিয়ে দিয়েছে— আজ আমার রাজার ঘরে কী সুরে যে এতক্ষণে বীণা বেজে উঠেছে, তাই শোনবার জন্যে প্রাণটা ছটফট করছে।

সুরঙ্গমা। ঐ-যে সূর্য উঠল।

[সকলের প্রস্থান

গান

ভোর হল বিভাবরী, পথ হল অবসান।
শুন ওই লোকে লোকে উঠে আলোকেরই গান ॥
ধন্য হলি ওরে পান্থ
রজনীজাগরক্লান্ত,
ধন্য হল মরি মরি ধুলায় ধূসর প্রাণ ॥
বনের কোলের কাছে
সমীরণ জাগিয়াছে;

মধুভিক্ষু সারে সারে
আগত কুঞ্জের দ্বারে ।
হল তব যাত্রা সারা,
মোছো মোছো অশ্রুধারা,
লজ্জা ভয় গেল ঝরি,
ঘুচিল রে অভিমান ॥

অন্ধকার ঘর

সুদর্শনা । প্রভু, যে আদর কেড়ে নিয়েছ সে আদর আর ফিরিয়ে দিয়ো না । আমি তোমার চরণের দাসী, আমাকে সেবার অধিকার দাও ।

রাজা । আমাকে সইতে পারবে ?

সুদর্শনা । পারব রাজা, পারব । আমার প্রমোদবনে আমার রানীর ঘরে তোমাকে দেখতে চেয়েছিলুম— সেখানে তোমার দাসের অধম দাসকেও তোমার চেয়ে চোখে সুন্দর ঠেকে । তোমাকে তেমন করে দেখবার তৃষ্ণা আমার একেবারে ঘুচে গেছে— তুমি সুন্দর নও প্রভু, সুন্দর নও, তুমি অনুপম ।

রাজা । তোমারই মধ্যে আমার উপমা আছে ।

সুদর্শনা । যদি থাকে তো সেও অনুপম ।

রাজা । আজ এই অন্ধকার ঘরের দ্বার একেবারে খুলে দিলুম— এখানকার লীলা শেষ হল । এসো, এবার আমার সঙ্গে এসো, বাইরে চলে এসো— আলোয় ।

সুদর্শনা । যাবার আগে আমার অন্ধকারের প্রভুকে আমার নিষ্ঠুরকে আমার ভয়ানককে প্রণাম করে নিই ।

[প্রস্থান

—

গান

অরূপ বীণা রূপের আড়ালে লুকিয়ে বাজে,
সে বীণা আজি উঠিল বাজি হৃদয়-মাঝে ॥
ভুবন আমার ভরিল সুরে,
ভেদ ঘুচে যায় নিকটে দূরে,
সেই রাগিণী লেগেছে আমার সকল কাজে ॥
হাতে পাওয়ার চোখে চাওয়ার সকল বাঁধন,
গেল কেটে আজ সফল হল সকল কাঁদন ।
সুরের রসে হারিয়ে যাওয়া
সেই তো দেখা সেই তো পাওয়া,
বিরহ মিলন মিলে গেল আজ সমান সাজে ॥

—

ঋণশোধ

গান

হৃদয়ে ছিলে জেগে ;
দেখি আজ শরৎ মেঘে
      কেমনে আজকে ভোরে
      গেল গো গেল সরে
            তোমার ওই আঁচলখানি
            শিশিরের ছোঁওয়া লেগে ॥
কী যে গান গাহিতে চাই,
বাণী মোর খুঁজে না পাই ।
      সে যে ওই শিউলিদলে
      ছড়াল কাননতলে,
            সে যে ওই ক্ষণিক ধারায়
            উড়ে যায় বায়ুবেগে ॥

পাত্রগণ

সম্রাট বিজয়াদিত্য

শেখর কবি

ঠাকুরদাদা

লক্ষেশ্বর

উপনন্দ

রাজা সোমপাল

রাজদূত

অমাত্য

বালকগণ

ভূমিকা

রাজসভা

সম্রাট বিজয়াদিত্য ও মন্ত্রী

মন্ত্রী। মহারাজ, এই হচ্ছে রাজনীতি।

বিজয়াদিত্য। কী তোমার রাজনীতি ?

মন্ত্রী। রাজ্য রাখতে গেলে রাজ্য বাড়াতে হবে। ও যেন মানুষের দেহের মতো, বৃদ্ধি যেমনি বন্ধ হয় ক্ষয়ও তেমনি শুরু হতে থাকে।

বিজয়াদিত্য। রাজ্য যতই বাড়বে তাকে রক্ষা করবার দায়ও তো ততই বাড়বে— তা হলে থামবে কোথায় ?

মন্ত্রী। কোথাও না। কেবলই জয় করতে হবে, কেননা প্রতাপ জিনিসটা যেখানে থামে সেইখানে নিবে যায়।

বিজয়াদিত্য। তা হলে তোমার পরামর্শ কী ?

মন্ত্রী। আমাদের উত্তর-পশ্চিম সীমানায় যে মানিকপুর আছে সেইটে জয় করে নেবার এই অবসর উপস্থিত হয়েছে।

বিজয়াদিত্য। সেই অবসর আমি দিলুম উড়িয়ে। আমার রাজনীতির কথা আমি তোমাকে বলব ?

মন্ত্রী। বলুন।

বিজয়াদিত্য। রাজ্যের লোভ মিটবে বলেই আমি রাজত্ব করি, বাড়বে বলে নয়। রাজা হয়েছি বলেই দেখতে পেয়েছি রাজ্যটা কিছুই নয়।

মন্ত্রী। বলেন কী মহারাজ ? ওর মধ্যে কোনো সত্যই কি—

বিজয়াদিত্য। ওর মধ্যে একমাত্র সত্য হচ্ছে রাজা হওয়া। আমি রাজা হতে চাই।

মন্ত্রী। সেইজন্যেই তো—

বিজয়াদিত্য। সেইজন্যেই তো আমি রাজ্যে লোভ করতে চাই নে। কোনো সাম্রাজ্যই তো আজ পর্যন্ত টেকে নি— যে সাম্রাজ্য যতই বড়োই হোক। কিন্তু একবারের মতো যে সত্যকার রাজা হতে পেরেছে চিরকালের মতো সে বেঁচে রইল।

মন্ত্রী। কিন্তু সৈন্যদল প্রস্তুত আছে।

বিজয়াদিত্য। ভালোই হয়েছে।

মন্ত্রী। তবে কি—

বিজয়াদিত্য। তাদের লাগিয়ে দাও শারদোৎসবের কাজে।

সেনাপতির প্রবেশ

সেনাপতি। মহারাজ, শরৎকালে জয়যাত্রায় বেরোবার নিয়ম— মহারাজের পূর্বপুরুষেরা—

বিজয়াদিত্য। আমিও বেরোব ঠিক করেছি।

সেনাপতি। তা হলে আদেশ করুন কী ভাবে প্রস্তুত হতে হবে।

বিজয়াদিত্য। তোমাদের কাউকে সঙ্গে আসতে হবে না।

সেনাপতি। বলেন কী মহারাজ ?

বিজয়াদিত্য। আমি একলা যাব।

সেনাপতি। সে কী কথা ?

বিজয়াদিত্য। সে তোমরা বুঝবে না। কবি কোথায় ?

মন্ত্রী। তাঁকে আমরা পাঠিয়ে দিচ্ছি। [উভয়ের প্রস্থান

শেখরের প্রবেশ

বিজয়াদিত্য। কবি!

শেখর। কী মহারাজ।

বিজয়াদিত্য। আমার পিতার সিংহাসনে এক বছর মাত্র আমি বসেছি— কিন্তু মনে হচ্ছে আমাদের বংশে যতদিন যত রাজা হয়েছে সকলের বয়স একত্র হয়ে আমার ঘাড়ে চেপে বসেছে। রাজাকে নবীন করবার কী উপায় আমাকে বলে দাও তো।

শেখর। সিংহাসন থেকে একবার মাটিতে পা ফেলেন দিকি! ঐ মাটির মধ্যে জীবন-যৌবনের জাদুমন্ত্র রয়েছে।

বিজয়াদিত্য। আমার সিংহাসনের খাঁচার দরজা আমি চিরদিনের মতো খুলে রাখতে চাই— যাতে মাটির সঙ্গে আমার সহজ আনাগোনা চলে।

শেখর। যাতে শিউলির মালার সঙ্গে আপনার মুক্তোর মালার অদল-বদল হয়। তা হলে এই শরৎকালে আপনার ঐ রাজবেশটা একবার খোলেন— আপন বলে চিনতে কারও ভুল হবে না।

বিজয়াদিত্য। আছে আমার সন্ন্যাসীর বেশ— ধুলোর সঙ্গে তার সুর মেলে। কবি তোমাকেও কিন্তু আমার সঙ্গে যেতে হবে।

শেখর। না মহারাজ, আমাকে যদি সঙ্গে নেন তা হলে আপনার 'পরে মন্ত্রী আর সেনাপতির বিষম অশ্রদ্ধা হবে, আর আমার 'পরে হবে রাগ।

বিজয়াদিত্য। ঠিক বটে। মন্ত্রীর মনে এই বড়ো ক্ষোভ যে, রাজত্ব পাবার যে পিতৃঋণ, সে শোধ করবার জন্যে আমার মন নেই।

শেখর। আমার মস্ত দোষ এই যে, আমি কেবল স্মরণ করাই, এই-যে বিশ্ব আমাদের চিত্তে অমৃত ঢেলে দিচ্ছে তার ঋণ আমাদের শোধ করতে হবে।

বিজয়াদিত্য। অমৃতের বদলে অমৃত দিয়ে তবে তো সেই ঋণ শোধ করতে হয়। তোমার হাতে সেই শক্তি আছে। তোমার কবিতার ভিতর দিয়ে তুমি বিশ্বকে অমৃত ফিরিয়ে দিচ্ছ। কিন্তু আমার কী ক্ষমতা আছে বলো। আমি তো কেবলমাত্র রাজত্ব করি।

শেখর। প্রেমও যে অমৃত, মহারাজ। আজ সকালের সোনার আলোয় পাতায় পাতায় শিশির যখন বীণায় ঝংকারের মতো ঝলমল করে উঠল তখন সেই সুরের জবাবটি ভালোবাসার আনন্দ ছাড়া আর কিছুতে নেই। আমার কথা যদি বলেন সেই আনন্দ আজ আমার চিত্তে অসীম বিরহ-বেদনায় উপচে পড়ছে—

গান

আজি শরত তপনে প্রভাত স্বপনে
কী জানি পরান কী যে চায়—
ওই শেফালির শাখে কী বলিয়া ডাকে
বিহগ বিহগী কী যে গায়।

বিজয়াদিত্য। তুমি আমাকে ঘরে টিকতে দিলে না দেখছি। চললেম আমি অমৃতের ঋণ শোধ করতে।

শেখর।

গান

আজ মধুর বাতাসে হৃদয় উদাসে
রহে না আবাসে মন হায়!
কোন্ কুসুমের আশে কোন্ ফুলবাসে
সুনীল আকাশে মন ধায়।

বিজয়াদিত্য। কবি, ভালোবাসা তো দেব, কিন্তু কোথায় দেব ?

শেখর। মহারাজ, যেদিন সময় আসে, যেদিন ডাক পড়ে, সেদিন বাজে-খরচের দিন, একেবারে ঢেলে দিতে হয়, পথে পথে বনে বনে। আজ সেই দিন এসেছে— আমার মন দিশেহারা হয়েছে।

গান

আমি যদি রচি গান অথির পরান
সে গান শোনাব কারে আর।
আমি যদি গাঁথি মালা লয়ে ফুলডালা
কাহারে পরাব ফুলহার !
আমি আমার এ প্রাণ যদি করি দান
দিব প্রাণ তবে কার পায় ?
সদা ভয় হয় মনে, পাছে অযতনে
মনে মনে কেহ ব্যথা পায়।

বিজয়াদিত্য। বুঝেছি, কবি, আজ আর কথা নেই, আজ অমৃতের ঋণ শোধ করতে বেরোব। তুমি একবার মন্ত্রীকে ডেকে দাও।

[শেখরের প্রস্থান

মন্ত্রীর প্রবেশ

বিজয়াদিত্য। মন্ত্রী, আমি আজই বাহির হব।

মন্ত্রী। তার আয়োজন—

বিজয়াদিত্য। বিনা আয়োজনে।

মন্ত্রী। মহারাজ, কী এমন বিশেষ কর্তব্য আছে যে—

বিজয়াদিত্য। আছে কর্তব্য। আমি সেই বীনকারকে ডাকতে যাব।

মন্ত্রী। বীনকার ? সেই সুরসেন ? আমি এখনই লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি।

বিজয়াদিত্য। না না, রাজার ডাকে বীণার ঠিক সুরটি বাজে না। আমি তার দরজার বাইরে মাটিতে বসে শুনব, তার পরে যদি ডাক পড়ে তবে ঘরের ভিতরে গিয়ে বসে শুনব।

মন্ত্রী। মহারাজ, এ কী কথা বলছেন ?

বিজয়াদিত্য। সিংহাসনে সুর পৌঁছোয় না। শ্রোতার আসন থেকে আমাকে চিরদিন বঞ্চিত করতে পারবে না। আমি মাটিতে বসব মেঠো ফুলের সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তিতে। কবিকে ডেকে দাও তো মন্ত্রী।

মন্ত্রী। দিচ্ছি, এখনই দিচ্ছি।

[মন্ত্রীর প্রস্থান

শেখরের প্রবেশ

বিজয়াদিত্য। কবি, আমার বেরোবার সময় হল। যাবার আগে সেই মেঠো ফুলের গানটা শুনিয়ে দাও।

গান

শেখর।

যখন সারা নিশি ছিলেম শুয়ে
বিজন ভুঁয়ে
মেঠো ফুলের পাশাপাশি;
তখন শুনেছিলেম তারার বাঁশি।

যখন সকাল বেলা খুঁজে দেখি স্বপ্নে শোনা সে সুর এ কি
আমার মেঠো ফুলের চোখের জলে উঠে ভাসি।
এ সুর আমি খুঁজেছিলেম রাজার ঘরে
শেষে ধরা দিল ধরার ধূলির 'পরে।
এ যে ঘাসের কোলে আলোর ভাষা
আকাশ থেকে ভেসে-আসা,
এ যে মাটির কোলে মানিক-খসা হাসিরাশি।

মন্ত্রীর প্রবেশ

মন্ত্রী। মহারাজ, বেতসিনীতীরে পিঞ্জরীতে বীনকার সুরসেনের বাস। যখন আপনি সেখানে যাওয়াই স্থির করেছেন তখন সেইসঙ্গে একটা রাজকার্যও সম্পন্ন করতে পারেন।

বিজয়াদিত্য। সেখানে রাজকার্য আছে না কি ?

মন্ত্রী। হাঁ মহারাজ। পিঞ্জরীর রাজা সোমপাল প্রকাশ্য সভায় সর্বদাই মহারাজের নামে স্পর্ধাবাক্য ব্যবহার করে থাকেন। তাঁকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন।

বিজয়াদিত্য। বড়ো কৌতূহল হচ্ছে, মন্ত্রী। স্তুতিবাক্য অনেক শুনেছি, কিন্তু কোনোদিন নিজের কানে স্পর্ধাবাক্য শুনি নি।

মন্ত্রী। ভগবানের কৃপায় কোনোদিন যেন না শুনতে হয়।

বিজয়াদিত্য। রাজা হবার ঐ তো বিড়ম্বনা। পরিহাস করে তোমরা আমাদের বল পৃথিবীপতি কিন্তু পৃথিবীকে সিংহাসনের মাপে ছোটো করে তোমরা আমাদের খেলনা বানিয়ে দিয়েছ— সব দেখা দেখতে পাই নে, সব শোনা শোনবার জো নেই।

মন্ত্রী। যাদের সব দেখাই দেখতে হয়, সব শোনাই শুনতে হয় তারাই তো হতভাগ্য।

বিজয়াদিত্য। সেই হতভাগ্যদের দশাই আমি পরীক্ষা করে দেখব। সোমপালের স্পর্ধাবাক্য আমি নিজের কানে শুনব।

মন্ত্রী। তা হলে শেখরই মহারাজের সঙ্গে যাবেন, আর কেউ না ?

শেখর। না মন্ত্রী, এ-যাত্রায় আমার প্রয়োজন নেই। জানলার দরকার হয় যেখানে প্রাচীর আছে— যেখানে খোলা আকাশ সেখানে জানলায় কী হবে— রাজসভায় কবিকে না হলে চলে না।

মন্ত্রী। তোমার কথা বুঝলেম না।

[প্রস্থান

শেখর। মহারাজ, চার দিকের ভ্রূভঙ্গি দেখে বুঝতে পারছি আপনি চলে গেলে কবির পক্ষে এখানে অরাজক হবে। আমিও আপনারই পথ ধরলেম।

বিজয়াদিত্য। ভালো হল কবি, আজ শরতের নিমন্ত্রণ রাখতে চলেছি— তুমি সঙ্গে না থাকলে তার প্রতিসম্ভাষণের বাণী পেতেম কোথায় ?

ঋণশোধ

বেতসিনী নদীর তীর

বালকগণ

গান

মেঘের কোলে রোদ হেসেছে
বাদল গেছে টুটি,
আজ আমাদের ছুটি, ও ভাই,
আজ আমাদের ছুটি।
কী করি আজ ভেবে না পাই,
পথ হারিয়ে কোন্ বনে যাই,
কোন্ মাঠে যে ছুটে বেড়াই,
সকল ছেলে জুটি।
কেয়াপাতার নৌকো গড়ে
সাজিয়ে দেব ফুলে,
তালদিঘিতে ভাসিয়ে দেব,
চলবে দুলে দুলে।
রাখাল-ছেলের সঙ্গে ধেনু
চরাব আজ বাজিয়ে বেণু,
মাখব গায়ে ফুলের রেণু
চাঁপার বনে লুটি।
আজ আমাদের ছুটি, ও ভাই,
আজ আমাদের ছুটি।

লক্ষেশ্বর। (ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া) ছেলেগুলো তো জ্বালালে। ওরে চোবে। ওরে গির্‌ধারিলাল। ধর্ তো ছোঁড়াগুলোকে ধর্ তো।

ছেলেরা। (দূরে ছুটিয়া গিয়া হাততালি দিয়া) ওরে লক্ষ্মীপেঁচা বেরিয়েছে রে, লক্ষ্মীপেঁচা বেরিয়েছে।

লক্ষেশ্বর। হনুমন্ত সিং, ওদের কান পাকড়ে আন্ তো ; একটাকেও ছাড়িস নে।

ঠাকুরদাদার প্রবেশ

ঠাকুরদাদা। কী হয়েছে লখাদাদা ? মার-মূর্তি কেন ?

লক্ষেশ্বর। আরে দেখো-না ! সকাল বেলা কানের কাছে চেঁচাতে আরম্ভ করেছে।

ঠাকুরদাদা। আজ যে শরতে ওদের ছুটি, একটু আমোদ করবে না ? গান গাইলেও তোমার কানে খোঁচা মারে ! হায় রে হায়, ভগবান তোমাকে এত শাস্তিও দিচ্ছেন !

লক্ষেশ্বর। গান গাবার বুঝি সময় নেই ? আমার হিসাব লিখতে ভুল হয়ে যায় যে। আজ আমার সমস্ত দিনটাই মাটি করলে।

ঠাকুরদাদা। তা ঠিক ! হিসেব ভুলিয়ে দেবার ওস্তাদ ওরা। ওদের সাড়া পেলে আমার বয়সের হিসাবে প্রায় পঞ্চাশ পঞ্চান্ন বছরের গরমিল হয়ে যায়। ওরে বাঁদরগুলো, আয় তো রে ! চল্ তোদের পঞ্চাননতলার মাঠটা ঘুরিয়ে আনি। যাও দাদা, তোমার দপ্তর নিয়ে বোসো গে ! আর হিসেবে ভুল হবে না।

[লক্ষেশ্বরের প্রস্থান

ঠাকুরদাদাকে ঘিরিয়া ছেলেদের নৃত্য

প্রথম। হাঁ ঠাকুরদা চলো।

দ্বিতীয়। আমাদের আজ গল্প বলতে হবে।

তৃতীয়। না গল্প না, বটতলায় বসে আজ ঠাকুরদার পাঁচালি হবে।

চতুর্থ। বটতলায় না, ঠাকুরদা আজ পারুলডাঙায় চলো।

ঠাকুরদাদা। চুপ, চুপ, চুপ। অমন গোলমাল লাগাস যদি তো লখাদাদা আবার ছুটে আসবে।

লক্ষেশ্বরের পুনঃপ্রবেশ

লক্ষেশ্বর। কোন্ পোড়ারমুখো আমার কলম নিয়েছে রে।

[ছেলেদের লইয়া ঠাকুরদাদার প্রস্থান

উপনন্দের প্রবেশ

লক্ষেশ্বর। কী রে তোর প্রভু কিছু টাকা পাঠিয়ে দিলে ? অনেক পাওনা বাকি।

উপনন্দ। কাল রাত্রে আমার প্রভুর মৃত্যু হয়েছে।

লক্ষেশ্বর। মৃত্যু ! মৃত্যু হলে চলবে কেন ? আমার টাকাগুলোর কী হবে ?

উপনন্দ। তাঁর তো কিছুই নেই। যে বীণা বাজিয়ে উপার্জন করে তোমার ঋণ শোধ করতেন সেই বীণাটি আছে মাত্র !

লক্ষেশ্বর। বীণাটি আছে মাত্র ! কী শুভ সংবাদটাই দিলে।

উপনন্দ। আমি শুভ সংবাদ দিতে আসি নি। আমি একদিন পথের ভিক্ষুক ছিলেম, তিনিই আমাকে আশ্রয় দিয়ে তাঁর বহুদুঃখের অন্নের ভাগে আমাকে মানুষ করেছেন। তোমার কাছে দাসত্ব করে আমি সেই মহাত্মার ঋণ শোধ করব।

লক্ষেশ্বর। বটে ! তাই বুঝি তাঁর অভাবে আমার বহুদুঃখের অন্নে ভাগ বসাবার মতলব করেছ। আমি তত বড়ো গর্দভ নই। আচ্ছা, তুই কী করতে পারিস বল্ দেখি !

উপনন্দ। আমি চিত্রবিচিত্র করে পুঁথি নকল করতে পারি। তোমার অন্ন আমি চাই নে। আমি নিজে উপার্জন করে যা পারি খাব— তোমার ঋণও শোধ করব।

লক্ষেশ্বর। আমাদের বীনকারটিও যেমন নির্বোধ ছিল ছেলেটাকেও দেখছি ঠিক তেমনি করেই বানিয়ে গেছে। হতভাগা ছোঁড়াটা পরের দায় ঘাড়ে নিয়েই মরবে। এক-একজনের ঐ-রকম মরাই স্বভাব।— আচ্ছা বেশ, মাসের ঠিক তিন তারিখের মধ্যেই নিয়মমত টাকা দিতে হবে। নইলে—

উপনন্দ। নইলে আবার কী ! আমাকে ভয় দেখাচ্ছ মিছে। আমার কী আছে যে তুমি আমার কিছু করবে। আমি আমার প্রভুকে স্মরণ করে ইচ্ছা করেই তোমার কাছে বন্ধন স্বীকার করেছি। আমাকে ভয় দেখিয়ো না বলছি।

লক্ষেশ্বর। না না, ভয় দেখাব না। তুমি লক্ষ্মীছেলে, সোনার চাঁদ ছেলে। টাকাটা ঠিকমত দিয়ো বাবা। নইলে আমার ঘরে দেবতা আছে তার ভোগ কমিয়ে দিতে হবে— সেটাতে তোমারই পাপ হবে।

[উপনন্দের প্রস্থান

ঐ-যে আমার ছেলেটা এইখানে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে ! আমি কোন্‌খানে টাকা পুঁতে রাখি ও নিশ্চয় সেই খোঁজে ফেরে। ওদেরই ভয়েই তো আমাকে এক সুরঙ্গ হতে আর-এক সুরঙ্গে টাকা বদল করে বেড়াতে হয়। ধনপতি, এখানে কেন রে ! তোর মতলবটা কী বল্‌ দেখি !

ধনপতি। ছেলেরা আজ সকলেই এই বেতসিনীর ধারে আমোদ করবে বলে আসছে— আমাকে ছুটি দিলে আমিও তাদের সঙ্গে খেলি।

লক্ষেশ্বর। বেতসিনীর ধারে ! ঐ রে খবর পেয়েছে বুঝি। বেতসিনীর ধারেই তো আমি সেই গজমোতির কৌটো পুঁতে রেখেছি। (ধনপতির প্রতি) না না, খবরদার বলছি, সে-সব না। চল্‌ শীঘ্র চল্‌, নামতা মুখস্থ করতে হবে।

ধনপতি। (নিশ্বাস ফেলিয়া) আজ এমন সুন্দর দিনটা !

লক্ষেশ্বর। দিন আবার সুন্দর কী রে। এইরকম বুদ্ধি মাথায় ঢুকলেই ছোঁড়াটা মরবে আর কি। যা বলছি, ঘরে যা। (ধনপতির প্রস্থান) ভারি বিশ্রী দিন। আশ্বিনের এই রোদ্দুর দেখলে আমার সুদ্ধ মাথা খারাপ করে দেয়, কিছুতে কাজে মন দিতে পারি নে। মনে করছি মলয়দ্বীপে গিয়ে কিছু চন্দন জোগাড় করবার জন্যে বেরিয়ে পড়লে হয়।

শেখর কবির প্রবেশ

এ লোকটা আবার এখানে কে আসে ? কে হে তুমি ? এখানে তুমি কী করতে ঘুরে বেড়াচ্ছ ?

শেখর। আমি সন্ধান করতে বেরিয়েছি।

লক্ষেশ্বর। ভাব দেখে তাই বুঝেছি। কিন্তু কিসের সন্ধানে বলো দেখি ?

শেখর। সেইটে এখনো ঠিক করতে পারি নি।

লক্ষেশ্বর। বয়স তো কম নয়, তবু এখনো ঠিক হয় নি ? তবে কী উপায়ে ঠিক হবে।

শেখর। ঠিক জিনিসে যেমনি চোখ পড়বে।

লক্ষেশ্বর। ঠিক জিনিস কি এইরকম মাঠে-ঘাটে ছড়ানো থাকে।

শেখর। তাই তো শুনেছি। ঘরের মধ্যে সন্ধান করে তো পেলেম না।

লক্ষেশ্বর। লোকটা বলে কী ? তুমি ঘরে বাইরে সন্ধান করবার ব্যাবসা ধরেছ— রাজা খবর পেলে যে তোমাকে আর ঘরের বার হতে দেবে না। পাহারা বসিয়ে দেবে।

শেখর। আমি রাজাকে সুদ্ধ এই ব্যাবসা ধরাব— যা মাঠে-ঘাটে ছড়ানো আছে তাই সংগ্রহ করবার বিদ্যে তাঁকে শেখাতে চাই।

লক্ষেশ্বর। কথাটা আর-একটু স্পষ্ট করে বলো তো।

শেখর। তা হলে একেবারেই বুঝতে পারবে না।

লক্ষেশ্বর। ওহে বাপু, তোমার ঐ সন্ধানের কাজটা ঠিক আমার এই ঘরের কাছটাতে না হয়ে কিছু তফাতে হলে আমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারি।

শেখর। আমাকে দেখে তোমার ভয় হচ্ছে কেন বলো তো।

লক্ষেশ্বর। সত্যি কথা বলব ? তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি রাজার চর। কোথা থেকে কী আদায় করা যেতে পারে রাজাকে সেই সন্ধান দেওয়াই তোমার মতলব।

শেখর। আদায় করবার জায়গা তো আমি খুঁজি বটে ! তোমার বুদ্ধি আছে হে।

লক্ষেশ্বর। আছে বৈকি। সেইজন্যেই হাত জোড় করে বলছি আমার ঘরটার দিকে উঁকি দিয়ো না— আমি তোমাকে খুশি করে দেব।

শেখর। তোমার চেহারা দেখেই বুঝেছি সন্ধান করবার মতো ঘর তোমার নয়।

লক্ষেশ্বর। আশ্চর্য তোমার বুদ্ধি বটে। এ নইলে রাজকর্মচারী হবে কোন্‌ গুণে ? রাজা বেছে বেছে লোক রাখে বটে। অকিঞ্চনের মুখ দেখলেই চিনতে পার ?

শেখর। তা পারি। অতএব তোমার ঘরে আমার আনাগোনা চলবে না।

লক্ষেশ্বর। তোমার উপরে ভক্তি হচ্ছে। তা হলে আর বিলম্ব কোরো না— এইখান থেকে একটুখানি—

শেখর। আমি তফাতেই যাচ্ছি— তফাতে যাব বলেই বেরিয়েছি।

[প্রস্থান

লক্ষেশ্বর। "তফাতে যাব বলেই বেরিয়েছি!" লোকটা যখন কথা কয় সব ঝাপসা ঠেকে। রাজারা স্পষ্ট কথা সহ্য করতে পারে না, তাই বোধ হয় দায়ে পড়ে এইরকম অভ্যেস করেছে।

[প্রস্থান

পুঁথি প্রভৃতি লইয়া উপনন্দের প্রবেশ ও একটি কোণে লিখিতে বসা

ঠাকুরদাদা ও বালকগণের প্রবেশ

গান

আজ ধানের খেতে রৌদ্রছায়ায়
লুকোচুরি খেলা।
নীল আকাশে কে ভাসালে
সাদা মেঘের ভেলা।

একজন বালক। ঠাকুরদা, তুমি আমাদের দলে।

দ্বিতীয় বালক। না ঠাকুরদা, সে হবে না, তুমি আমাদের দলে।

ঠাকুরদাদা। না ভাই, আমি ভাগাভাগির খেলায় নেই ; সে সব হয়ে বয়ে গেছে। আমি সকল দলের মাঝখানে থাকব, কাউকে বাদ দিতে পারব না। এবার গানটা ধর্।

গান

আজ ভ্রমর ভোলে মধু খেতে
উড়ে বেড়ায় আলোয় মেতে,
আজ কিসের তরে নদীর চরে
চখাচখীর মেলা।

অন্য দল আসিয়া। ঠাকুরদা, এই বুঝি! আমাদের তুমি ডেকে আনলে না কেন। তোমার সঙ্গে আড়ি। জন্মের মতো আড়ি।

ঠাকুরদাদা। এত বড়ো দণ্ড! নিজেরা দোষ করে আমাকে শাস্তি! আমি তোদের ডেকে বের করব, না তোরা আমাকে ডেকে বাইরে টেনে আনবি। না ভাই, আজ ঝগড়া না, গান ধর্।

গান

ওরে যাব না, আজ ঘরে রে ভাই
যাব না আজ ঘরে।
ওরে আকাশ ভেঙে বাহিরকে আজ
নেব রে লুঠ করে।
যেন জোয়ার জলে ফেনার রাশি
বাতাসে আজ ছুটছে হাসি,
আজ বিনা কাজে বাজিয়ে বাঁশি
কাটবে সকল বেলা।

প্রথম বালক। ঠাকুরদা, ঐ দেখো কে আসছে, ওকে তো কখনো দেখি নি।

ঠাকুরদাদা। পাগড়ি দেখে মনে হচ্ছে লোকটা পরদেশী।

প্রথম বালক। পরদেশী। ভারি মজা!
দ্বিতীয় বালক। আমি পরদেশী হব ঠাকুরদা।
তৃতীয় বালক। আমিও হব পরদেশী— কী মজা!
সকলে। আমরা সবাই পরদেশী হব।
প্রথম বালক। আমাদের ঐরকম পাগড়ি বানিয়ে দাও ঠাকুরদা, তোমার পায়ে পড়ি।

শেখরের প্রবেশ

প্রথম বালক। তুমি পরদেশী?
শেখর। ঠিক বলেছ।
দ্বিতীয় বালক। তুমি কী কর?
শেখর। আমি সব জায়গায়ই দেশ খুঁজে বেড়াই।
তৃতীয় বালক। তার মানে কী, পরদেশী?
শেখর। দেখো-না, শরৎকালে রাজারা দেশ জয় করতে বেরোয়— তার আসল কারণ পৃথিবীর অধীশ্বর হলেও এখনো তারা দেশ খুঁজে পায় নি, কোনো কালে পাবেও না।
প্রথম বালক। কেন পাবে না?
শেখর। তারা নির্বোধ, মনে করে লড়াই করে দেশ পাওয়া যায়। বিনা লড়াইয়ে যারা জয় করতে জানে তারাই আপন দেশ খুঁজে পায়।
দ্বিতীয় বালক। তুমি খুঁজে পেয়েছ?
শেখর। বড়ো শক্ত। কেননা, মানুষে লুকিয়ে রাখে। ঐ বাড়িটার কাছে সন্ধানে গিয়েছিলেম, একটা মানুষ ছুটে এসে বললে, এ তোমার জায়গা নয়, এ আমার।
সকলে। ও বুঝেছি। লক্ষ্মীপেঁচা।
প্রথম বালক। তার কোটরের কাছে গেলেই সে ঠোকর দিতে আসে।
দ্বিতীয় বালক। কিন্তু পরদেশী, আমাদের কাছে তোমার কোনো ভয় নেই।
শেখর। বাবা, তা হলে তোমাদের মধ্যেই আমার দেশ খুঁজে পাব।

গান

আমারে ডাক দিল কে ভিতর পানে—
ওরা যে ডাকতে জানে।
আশ্বিনে ওই শিউলি শাখে
মৌমাছিরে যেমন ডাকে
প্রভাতে সৌরভের গানে।
ঘর-ছাড়া আজ ঘর পেল যে,
আপন মনে রইল মজে।
হাওয়ায় হাওয়ায় কেমন করে
খবর যে তার পৌঁছোল রে,
ঘর-ছাড়া ওই মেঘের কানে।

ঠাকুরদাদা। ও ভাই, আমার জায়গা তোমাকে ছেড়ে দিলেম।
শেখর। ছাড়তে হবে কেন? দুজনেরই জায়গা আছে।
ঠাকুরদাদা। তোমাকে চিনে নিয়েছি। তুমি মন ভোলাতে জান।
শেখর। আমার নিজের মন ভুলেছে বলেই আমি মন ভুলিয়ে বেড়াই।
প্রথম বালক। তার মানে কী পরদেশী? কেমন করে মন ভোলে?

শেখর। গান

কেন যে মন ভোলে আমার মন জানে না।
তারে মানা করে কে, আমার মন মানে না।
কেউ বোঝে না তারে,
সে যে বোঝে না আপনারে,
সবাই লজ্জা দিয়ে যায়, সে তো কানে আনে না।
তার খেয়া গেল পারে
সে যে রইল নদীর ধারে।
কাজ করে সব সারা (ওই) এগিয়ে গেল কারা
আনমনা মন সেদিকপানে দৃষ্টি হানে না।

ঠাকুরদাদা। তোমাকে ছাড়ছি নে ভাই, নিজের মনের কথা তোমার মুখ থেকে শুনে নেব।

ছেলেরা। আমরা তোমাকে ছাড়ব না।

শেখর। তোমরা ছাড়লে আমিই বুঝি তোমাদের ছাড়ব মনে করছ? একবার চার দিকটা ঘুরে আসছি— কোথায় এলুম একবার বুঝে নিই।

[প্রস্থান

প্রথম বালক। ঠাকুরদা, ঐ দেখো, ঐ দেখো সন্ন্যাসী আসছে।

দ্বিতীয় বালক। বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে, আমরা সন্ন্যাসীকে নিয়ে খেলব। আমরা সব চেলা সাজব।

তৃতীয় বালক। আমরা ওঁর সঙ্গে বেরিয়ে যাব, কোন্ দেশে চলে যাব কেউ খুঁজেও পাবে না।

ঠাকুরদাদা। আরে চুপ, চুপ।

সকলে। সন্ন্যাসী ঠাকুব, সন্ন্যাসী ঠাকুর।

ঠাকুরদাদা। আরে থাম্ থাম্। ঠাকুর রাগ করবে।

সন্ন্যাসীর প্রবেশ

বালকগণ। সন্ন্যাসী ঠাকুর, তুমি কি আমাদের উপর রাগ করবে? আজ আমরা সব তোমার চেলা হব।

সন্ন্যাসী। হা হা হা হা! এ তো খুব ভালো কথা। তার পরে আবার তোমরা সব শিশু-সন্ন্যাসী সেজো, আমি তোমাদের বুড়ো চেলা সাজব। এ বেশ খেলা, এ চমৎকার খেলা।

ঠাকুরদাদা। প্রণাম হই। আপনি কে?

সন্ন্যাসী। আমি ছাত্র।

ঠাকুরদাদা। আপনি ছাত্র!

সন্ন্যাসী। হাঁ, পুঁথিপত্র সব পোড়াবার জন্যে বের হয়েছি।

ঠাকুরদাদা। ও ঠাকুর, বুঝেছি। বিদ্যের বোঝা সমস্ত ঝেড়ে ফেলে দিব্যি একেবারে হালকা হয়ে সমুদ্রে পাড়ি দেবেন।

সন্ন্যাসী। চোখের পাতার উপরে পুঁথির পাতাগুলো আড়াল করে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে— সেইগুলো খসিয়ে ফেলতে চাই।

ঠাকুরদাদা। বেশ, বেশ, আমাকেও একটু পায়ের ধুলো দেবেন। প্রভু, আপনার নাম বোধ করি শুনেছি— আপনি তো স্বামী অপূর্বানন্দ?

ছেলেরা। সন্ন্যাসী ঠাকুর, ঠাকুরদা কী মিথ্যে বকছেন। এমনি করে আমাদের ছুটি বয়ে যাবে।

সন্ন্যাসী। ঠিক বলেছ, বৎস, আমারও ছুটি ফুরিয়ে আসছে।

ছেলেরা। তোমার কতদিনের ছুটি ?

সন্ন্যাসী। খুব অল্পদিনের। আমার গুরুমশায় তাড়া করে বেরিয়েছেন, তিনি বেশি দূরে নেই, এলেন বলে।

ছেলেরা। ও বাবা, তোমারও গুরুমশায় !

প্রথম বালক। সন্ন্যাসী ঠাকুর, চলো আমাদের যেখানে হয় নিয়ে চলো। তোমার যেখানে খুশি।

ঠাকুরদাদা। আমিও পিছনে আছি, ঠাকুর, আমাকেও ভুলো না।

সন্ন্যাসী। আহা, ও ছেলেটি কে ? গাছের তলায় এমন দিনে পুঁথির মধ্যে ডুবে রয়েছে !

বালকগণ। উপনন্দ।

প্রথম বালক। ভাই উপনন্দ, এসো ভাই। আমরা আজ সন্ন্যাসী ঠাকুরের চেলা সেজেছি, তুমিও চলো আমাদের সঙ্গে। তুমি হবে সর্দার চেলা।

উপনন্দ। না ভাই, আমার কাজ আছে।

ছেলেরা। কিচ্ছু কাজ নেই, তুমি এসো।

উপনন্দ। আমার পুঁথি নকল করতে অনেকখানি বাকি আছে।

ছেলেরা। সে বুঝি কাজ ! ভারি তো কাজ ! ঠাকুর, তুমি ওকে বলো-না। ও আমাদের কথা শুনবে না। কিন্তু উপনন্দকে না হলে মজা হবে না।

সন্ন্যাসী। (পাশে বসিয়া) বাছা, তুমি কী কাজ করছ। আজ তো কাজের দিন না।

উপনন্দ। (সন্ন্যাসীর মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া, পায়ের ধুলা লইয়া) আজ ছুটির দিন— কিন্তু আমার ঋণ আছে, শোধ করতে হবে, তাই আজ কাজ করছি।

ঠাকুরদাদা। উপনন্দ, জগতে তোমার আবার ঋণ কিসের ভাই !

উপনন্দ। ঠাকুরদা, আমার প্রভু মারা গিয়েছেন ; তিনি লক্ষেশ্বরের কাছে ঋণী ; সেই ঋণ আমি পুঁথি লিখে শোধ দেব।

ঠাকুরদাদা। হায় হায়, তোমার মতো কাঁচা বয়সের ছেলেকেও ঋণ শোধ করতে হয় ! আর এমন দিনেও ঋণশোধ। ঠাকুর, আজ নতুন উত্তরে হাওয়ায় ওপারে কাশের বনে ঢেউ দিয়েছে, এপারে ধানের খেতের সবুজে চোখ একেবারে ডুবিয়ে দিলে, শিউলি বন থেকে আকাশে আজ পুজোর গন্ধ ভরে উঠেছে, এরই মাঝখানে ঐ ছেলেটি আজ ঋণশোধের আয়োজনে বসে গেছে— এও কি চক্ষে দেখা যায় ?

সন্ন্যাসী। বল কী, এর চেয়ে সুন্দর কি আর কিছু আছে। ঐ ছেলেটিই তো আজ শারদার বরপুত্র হয়ে তাঁর কোল উজ্জ্বল করে বসেছে। তিনি তাঁর আকাশের সমস্ত সোনার আলো দিয়ে ওকে বুকে চেপে ধরেছেন। আহা, আজ এই বালকের ঋণশোধের মতো এমন শুভ্র ফুলটি কি কোথাও ফুটেছে, চেয়ে দেখো তো। লেখো, লেখো, বাবা, তুমি লেখো, আমি দেখি। তুমি পঙ্‌ক্তির পর পঙ্‌ক্তি লিখছ, আর ছুটির পর ছুটি পাচ্ছ— তোমার এত ছুটির আয়োজন আমরা তো পণ্ড করতে পারব না। দাও বাবা, একটা পুঁথি আমাকে দাও, আমিও লিখি। এমন দিনটা সার্থক হোক।

ঠাকুরদাদা। আছে আছে, চশমাটা ট্যাঁকে আছে, আমিও বসে যাই-না।

প্রথম বালক। ঠাকুর, আমরাও লিখব। সে বেশ মজা হবে।

দ্বিতীয় বালক। হাঁ হাঁ, সে বেশ মজা হবে।

উপনন্দ। বল কী ঠাকুর, তোমাদের যে ভারি কষ্ট হবে।

সন্ন্যাসী। সেইজন্যেই বসে গেছি। আজ আমরা সব মজা করে কষ্ট করব। কী বল, বাবাসকল। আজ একটা কিছু কষ্ট না করলে আনন্দ হচ্ছে না।

সকলে। (হাততালি দিয়া) হাঁ, হাঁ, নইলে মজা কিসের।

প্রথম বালক। দাও, দাও, আমাকে একটা পুঁথি দাও।

দ্বিতীয় বালক। আমাকেও একটা দাও-না।

উপনন্দ। তোমরা পারবে তো ভাই?

প্রথম বালক। খুব পারব। কেন পারব না।

উপনন্দ। শ্রান্ত হবে না তো?

দ্বিতীয় বালক। কক্‌খনো না।

উপনন্দ। খুব ধরে ধরে লিখতে হবে কিন্তু।

প্রথম বালক। তা বুঝি পারি নে? আচ্ছা তুমি দেখো।

উপনন্দ। ভুল থাকলে চলবে না।

দ্বিতীয় বালক। কিচ্ছু ভুল থাকবে না!

প্রথম বালক। এ বেশ মজা হচ্ছে। পুঁথি শেষ করব তবে ছাড়ব।

দ্বিতীয় বালক। নইলে ওঠা হবে না।

তৃতীয় বালক। কী বল ঠাকুরদা, আজ লেখা শেষ করে দিয়ে তবে উপনন্দকে নিয়ে নৌকো বাচ করতে যাব। বেশ মজা!

ছেলেরা। এই-যে পরদেশী, আমাদের পরদেশী।

শেখরের প্রবেশ

সন্ন্যাসী। একি! তুমি পরদেশী না কি?

শেখর। পরদেশী আমার সাজমাত্র, আসলে আমি সবদেশী।

সন্ন্যাসী। সাজের দরকার কী ছিল?

শেখর। রাজাকে সাজতে হয় সন্ন্যাসী, রাজা যে কী জিনিস সেই বোঝবার জন্যে। যে-মানুষ সব দেশেই দেশকে খুঁজতে চায় তাকে পরদেশী সাজতে হয়। এই আমাদের ঠাকুরদা বুড়ো হয়ে বসে আছেন ওটাও ওঁর সাজমাত্র— উনি যে বালক সেটা উনি বার্ধক্যের ভিতর দিয়ে খুব ভালো করে চিনে নিচ্ছেন।

ঠাকুরদাদা। ভাই, এ খবর তুমি পেলে কোথা থেকে।

শেখর। সাজের ভিতর থেকে মানুষকে খুঁজে বের করা, সেই তো আমার কাজ। ঠাকুরদা, আমি আগে থাকতে তোমাকে বলে রাখছি এই যে মানুষটিকে দেখছ, উনি বড়ো যে-সে লোক নন— একদিন হয়তো চিনতে পারবে।

ঠাকুরদাদা। সে আমি কিছু কিছু চিনেছি— নিজের বুদ্ধির গুণে নয় ওঁরই দীপ্তির গুণে।

সন্ন্যাসী। আর এই পরদেশীকে কিরকম ঠেকছে ঠাকুরদা।

ঠাকুরদাদা। সে আর কী বলব, যেন একেবারে চিরদিনের চেনা।

সন্ন্যাসী। ঠিক বলেছ, আমার পক্ষেও তাই। কিন্তু আবার ক্ষণে ক্ষণে মনে হয় যেন ওঁকে চেনবার জো নেই। উনি যে কিসের খোঁজে কখন কোথায় ফেরেন তা বোঝা শক্ত।

গান

শেখর। আমি তারেই খুঁজে বেড়াই যে রয় মনে, আমার মনে।
ও সে আছে বলে
আকাশ জুড়ে ফোটে তারা রাতে, প্রাতে ফুল ফুটে রয় বনে।
সে আছে বলে চোখের তারার আলোয়
এত রূপের খেলা রঙের মেলা অসীম সাদায় কালোয়,
ও সে সঙ্গে থাকে বলে
আমার অঙ্গে অঙ্গে পুলক লাগায় দখিন সমীরণে।
তারি বাণী হঠাৎ উঠে পুরে
আনমনা কোন তানের মাঝে আমার গানের সুরে।

দুখের দোলে হঠাৎ মোরে দোলায়
কাজের মাঝে লুকিয়ে থেকে
আমারে কাজ ভোলায়।
সে মোর চিরদিনের বলে
তারি পুলকে মোর পলকগুলি ভরে ক্ষণে ক্ষণে।

প্রথম বালক। কিন্তু আর লিখতে ভালো লাগছে না।

দ্বিতীয় বালক। না, আর নয়।

সকলে। আজ এই পর্যন্ত থাক্।

উপনন্দ। আমাকে বাঁচালে। এখন পুঁথিগুলি ফিরে দাও।

প্রথম বালক। আচ্ছা পরদেশী, তুমি এত গান গাও কেন ?

শেখর। আর কোনো গুণ যদি থাকত তা হলে গাইতেম না। ঐ দেখো-না কেন, তোমাদের সেই লক্ষ্মীপেঁচা তো গান গায় না।

সকলে। না, সে চেঁচায়।

শেখর। তার মানে, সার বস্তুর দ্বারা ভরতি হয়ে ও একেবারে নিরেট।

দ্বিতীয় বালক। পরদেশী, তোমার দেশের গল্প তুমি আমাদের শোনাবে ?

শেখর। আমার দেশের গল্প ভারি অদ্ভুত !

সকলে। আমরা অদ্ভুত গল্প শুনব।

শেখর। আচ্ছা, তা হলে চলো, কোপাই নদীর ধার দিয়ে একবার পারুলডাঙায় তোমাদের ঘুরিয়ে নিয়ে আসি গে। চলতে চলতে গল্প হবে।

সন্ন্যাসী। এই দেখো, ওর সঙ্গে আমরা পারব না— আমাদের সব চেলা ভাঙিয়ে নিলে।

শেখর। ভাঙিয়ে নেওয়া সহজ, কিন্তু টিকিয়ে রাখা শক্ত। এখনই ফিরে আসবে !

[বালকদলের সঙ্গে শেখরের প্রস্থান

সন্ন্যাসী। বাবা উপনন্দ, তোমার প্রভুর কী নাম ছিল।

উপনন্দ। সুরসেন।

সন্ন্যাসী। সুরসেন ! বীণাচার্য !

উপনন্দ। হাঁ ঠাকুর, তুমি তাঁকে জানতে ?

সন্ন্যাসী। আমি তাঁর বীণা শুনব আশা করেই এখানে এসেছিলেম।

উপনন্দ। তাঁর কি এত খ্যাতি ছিল !

ঠাকুরদাদা। তিনি কি এত বড়ো গুণী ! তুমি তাঁর বাজনা শোনবার জন্যেই এদেশে এসেছ ? তবে তো আমরা তাঁকে চিনি নি।

সন্ন্যাসী। এখানকার রাজা ?

ঠাকুরদাদা। এখানকার রাজা তো কোনোদিন তাঁকে জানেন নি, চক্ষেও দেখেন নি। তুমি তাঁর বীণা কোথায় শুনলে !

সন্ন্যাসী। তোমরা হয়তো জান না বিজয়াদিত্য বলে একজন রাজা—

ঠাকুরদাদা। বল কী ঠাকুর ! আমরা অত্যন্ত মূর্খ, গ্রাম্য, তাই বলে বিজয়াদিত্যের নাম জানব না এও কি হয় ? তিনি যে আমাদের চক্রবর্তী সম্রাট।

সন্ন্যাসী। তা হবে। তা সেই লোকটির সভায় একদিন সুরসেন বীণা বাজিয়েছিলেন তখন শুনেছিলেম। রাজা তাঁকে রাজধানীতে রাখবার জন্যে অনেক চেষ্টা করেও কিছুতেই পারেন নি।

ঠাকুরদাদা। হায় হায়, এত বড়ো লোকের আমরা কোনো আদর করতে পারি নি !

সন্ন্যাসী। বাবা উপনন্দ, তোমার সঙ্গে তাঁর কিরকমে সম্বন্ধ হল ?

উপনন্দ। ছোটো বয়সে আমার বাপ মারা গেলে আমি অন্য দেশ থেকে এই নগরে আশ্রয়ের জন্যে এসেছিলেম। সেদিন শ্রাবণমাসের সকাল বেলায় আকাশ ভেঙে বৃষ্টি পড়ছিল, আমি লোকনাথের মন্দিরের এককোণে দাঁড়াব বলে প্রবেশ করছিলেম। পুরোহিত আমাকে বোধ হয় নীচ জাত মনে করে তাড়িয়ে দিলেন। সেদিন সকালে সেইখানে বসে আমার প্রভু বীণা বাজাচ্ছিলেন। তিনি তখনই মন্দির ছেড়ে এসে আমার গলা জড়িয়ে ধরলেন— বললেন, এসো বাবা, আমার ঘরে এসো। সেইদিন থেকে ছেলের মতো তিনি আমাকে কাছে রেখে মানুষ করেছেন— লোকে তাঁকে কত কথা বলেছে তিনি কান দেন নি। আমি তাঁকে বলেছিলেম, প্রভু, আমাকে বীণা বাজাতে শেখান, আমি তা হলে কিছু কিছু উপার্জন করে আপনার হাতে দিতে পারব ; তিনি বললেন, বাবা, এ বিদ্যা পেট ভরাবার নয় ; আমার আর-এক বিদ্যা জানা আছে তাই তোমাকে শিখিয়ে দিচ্ছি। এই বলে আমাকে রঙ দিয়ে চিত্র করে পুঁথি লিখতে শিখিয়েছেন। যখন অত্যন্ত অচল হয়ে উঠত তখন তিনি মাঝে মাঝে বিদেশে গিয়ে বীণা বাজিয়ে টাকা নিয়ে আসতেন। এখানে তাঁকে সকলে পাগল বলেই জানত।

সন্ন্যাসী। সুরসেনের বীণা শুনতে পেলেম না, কিন্তু বাবা উপনন্দ, তোমার কল্যাণে তাঁর আর-এক বীণা শুনে নিলুম, এর সুর কোনোদিন ভুলব না। বাবা, লেখো, লেখো। আমরা ততক্ষণ আমাদের দলবলের খবর নিয়ে আসি গে।

[প্রস্থান

শেখর ও রাজা সোমপালের প্রবেশ

শেখর। বিজয়াদিত্যকে তুমি হার মানাতে চাও, তা হলে আগে ঐ অপূর্বানন্দ সন্ন্যাসীকে বশ করো। রাজা সোমপাল, তিনিও নিশ্চয় তোমার মনেব কথা জানেন।

সোমপাল। কোথায় তাঁকে পাব।

শেখর। তিনি এখানেই এসেছেন আমি জানি। কাছাকাছি কোথাও আছেন।

সোমপাল। দেখো আমি লোক চিনি। তোমাকে দেখে আমার মনে হচ্ছে তোমার দ্বারা আমার কাজ উদ্ধার হবে।

শেখর। তা হতেও পারে, অসম্ভব নয়। বিজয়াদিত্যকে বশ করবার ফন্দি আমি হয়তো তোমাকে কিছু কিছু বলে দিতে পারব।

সোমপাল। দেখো, তোমাকে আমি রাজমন্ত্রী করে দেব।

শেখর। আমার যদি মন্ত্রণা চাও তা হলে আমাকে মন্ত্রী কোরো না। মন্ত্রণা দেওয়াই যার কাজ তার মন্ত্রণা কোনো রাজার ভালো লাগে না। বিজয়াদিত্যের সভায় যে একজন কবি আছে, আমি দেখেছি—

সোমপাল। আরে ছি ছি, সে-ও আবার কবি হল! ঐ তো রায়শেখরের কথা বলছ?

শেখর। হাঁ, সেই বটে।

সোমপাল। সে আমার বিদূষকেরও যোগ্য নয়।

শেখর। একেবারেই নয়।

সোমপাল। বিজয়াদিত্য যেমন রাজা তার কবিটিও তেমনি।

শেখর। তাই তো অনেকে বলে। তোমার সভায় তাকে—

সোমপাল। আমার সভায় যতক্ষণ আমি আছি ততক্ষণ কিছুতেই—

শেখর। নিশ্চয়ই। ততক্ষণ সে—

সোমপাল। সে-কথা পরে হবে। এখন সন্ন্যাসীকে তুমি খুঁজে বের করো ; দেখা হলেই তাকে আমার রাজসভায় পাঠিয়ে দিয়ো, বিলম্ব কোরো না। আমি বরঞ্চ আমার দূতকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

[উভয়ের প্রস্থান

সন্ন্যাসী ও ঠাকুরদাদার প্রবেশ

সন্ন্যাসী। উপনন্দ, ঐ যে পরদেশী এসেছে— ওকে দেখে তোমার মনে হয় না কি, তোমার আচার্য সুরসেনেরই ও জুড়ি?

উপনন্দ। আমার মনে হচ্ছিল আমি যেন তাঁরই বীণা শুনছি।

সন্ন্যাসী। তুমি যেমন তাঁকে পেয়েছিলে তেমনি করেই এই মানুষটিকে পাবে।

উপনন্দ। উনি কি আমাকে নেবেন?

সন্ন্যাসী। ওর মুখ দেখেই কি বুঝতে পার নি?

উপনন্দ। পেরেছি। আমার প্রভুই বুঝি ওঁকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

লক্ষেশ্বরের প্রবেশ

লক্ষেশ্বর। আ সর্বনাশ! যেখানটিতে আমি কৌটো পুঁতে রেখেছিলুম ঠিক সেই জায়গাটিতেই যে উপনন্দ বসে গেছে! আমি ভেবেছিলেম ছোঁড়াটা বোকা বুঝি তাই পরের ঋণ শুধতে এসেছে। তা তো নয় দেখছি! পরের ঘাড় ভাঙাই ওর ব্যাবসা। আমার গজমোতির খবর পেয়েছে। একটা সন্ন্যাসীকেও কোথা থেকে জুটিয়ে এনেছে দেখছি। সন্ন্যাসী হাত চেলে জায়গাটা বের করে দেবে। উপনন্দ!

উপনন্দ। কী।

লক্ষেশ্বর। ওঠ্ ওঠ্ ঐ জায়গা থেকে। এখানে কী করতে এসেছিস?

উপনন্দ। অমন করে চোখ রাঙাও কেন? এ কি তোমার জায়গা নাকি?

লক্ষেশ্বর। এটা আমার জায়গা কি না সে খোঁজে তোমার দরকার কী হে বাপু! ভারি সেয়ানা দেখছি! তুমি বড়ো ভালোমানুষটি সেজে আমার কাছে এসেছিলে। আমি বলি সত্যিই বুঝি প্রভুর ঋণশোধ করবার জন্যেই ছোঁড়াটা আমার কাছে এসেছে— কেননা, সেটা রাজার আইনেও আছে—

উপনন্দ। আমি তো সেইজন্যেই এখানে পুঁথি লিখতে এসেছি।

লক্ষেশ্বর। সেইজন্যেই এসেছ বটে! আমার বয়স কত আন্দাজ করছ বাপু। আমি কি শিশু।

সন্ন্যাসী। কেন বাবা, তুমি কী সন্দেহ করছ?

লক্ষেশ্বর। কী সন্দেহ করছি! তুমি তা কিছু জান না! বড়ো সাধু! ভণ্ড সন্ন্যাসী কোথাকার!

ঠাকুরদাদা। আরে কী বলিস লখা। আমার ঠাকুরকে অপমান!

উপনন্দ। এই রঙ-বাটা নোড়া দিয়ে তোমার মুখ গুঁড়িয়ে দেব-না? টাকা হয়েছে বলে অহংকার! কাকে কী বলতে হয় জান না!

[সন্ন্যাসীর পশ্চাতে লক্ষেশ্বরের লুক্কায়ন

সন্ন্যাসী। আরে কর কী ঠাকুরদা, কর কী বাবা! লক্ষেশ্বর তোমাদের চেয়ে ঢের বেশি মানুষ চেনে। যেমনি দেখেছে অমনি ধরা পড়ে গেছে। ভণ্ড সন্ন্যাসী যাকে বলে! বাবা লক্ষেশ্বর, এত দেশের এত মানুষ ভুলিয়ে এলেম, তোমাকে ভোলাতে পারলেম না।

লক্ষেশ্বর। না, ঠিক ঠাওরাতে পারছি নে। হয়তো ভালো করি নি। আবার শাপ দেবে কি কী করবে! তিনখানা জাহাজ এখনো সমুদ্রে আছে। (পায়ের ধুলা লইয়া) প্রণাম হই ঠাকুর! হঠাৎ চিনতে পারি নি। বিরূপাক্ষের মন্দিরে আমাদের ঐ বিকটানন্দ বলে একটা সন্ন্যাসী আছে আমি বলি সেই ভণ্ডটাই বুঝি! ঠাকুরদা, তুমি এক কাজ করো। সন্ন্যাসী ঠাকুরকে আমার ঘরে নিয়ে যাও, আমি ওঁকে কিছু ভিক্ষে দিয়ে দেব। আমি চললেম বলে। তোমরা এগোও।

ঠাকুরদাদা। তোমার বড়ো দয়া! তোমার ঘরের এক মুঠো চাল নেবার জন্যে ঠাকুর সাত সিন্ধু পেরিয়ে এসেছেন!

সন্ন্যাসী। বল কী ঠাকুরদা! এক মুঠো চাল যেখানে দুর্লভ সেখান থেকে সেটি নিতে হবে বৈকি! বাবা লক্ষেশ্বর, চলো তোমার ঘরে।

লক্ষেশ্বর। আমি পরে যাচ্ছি, তোমরা এগোও। উপনন্দ, তুমি আগে ওঠো। ওঠো, শীঘ্র ওঠো বলছি, তোলো তোমার পুঁথিপত্র।

উপনন্দ। আচ্ছা তবে উঠলেম, কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার কোনো সম্বন্ধ রইল না।

লক্ষেশ্বর। না থাকলেই যে বাঁচি বাবা! আমার সম্বন্ধে কাজ কী। এতদিন তো আমার বেশ চলে যাচ্ছিল।

উপনন্দ। আমি যে ঋণ স্বীকার করেছিলেম তোমার কাছে এই অপমান সহ্য করেই তার থেকে মুক্তি গ্রহণ করলেম। বাস, চুকে গেল।

[প্রস্থান

লক্ষেশ্বর। ওরে! সব ঘোড়সওয়ার আসে কোথা থেকে! রাজা আমার গজমোতির খবর পেলে নাকি! এর চেয়ে উপনন্দ যে ছিল ভালো। এখন কী করি। (সন্ন্যাসীকে ধরিয়া) ঠাকুর, তোমার পায়ে ধরি, তুমি ঠিক এইখানটিতে বোসো— এই যে এইখানে— আর-একটু বাঁ দিকে সরে এসো— এই হয়েছে। খুব চেপে বোসো। রাজাই আসুক আর সম্রাটই আসুক তুমি কোনোমতেই এখান থেকে উঠো না। তা হলে আমি তোমাকে খুশি করে দেব।

ঠাকুরদাদা। আরে লখা করে কী। হঠাৎ খেপে গে নাকি।

লক্ষেশ্বর। ঠাকুর, আমি তবে একটু আড়ালে যাই। আমাকে দেখলেই রাজার টাকার কথা মনে পড়ে যায়। শত্রুরা লাগিয়েছে আমি সব টাকা পুঁতে রেখেছি— শুনে অবধি রাজা যে কত জায়গায় কূপ খুঁড়তে আরম্ভ করেছেন তার ঠিকানা নেই। জিজ্ঞাসা করলে বলেন, প্রজাদের জলদান করছেন। কোন্‌দিন আমার ভিটেবাড়ির ভিত কেটে জলদানের হুকুম হবে, সেই ভয়ে রাত্রে ঘুমোতে পারি নে।

[প্রস্থান

রাজদূতের প্রবেশ

রাজদূত। সন্ন্যাসীঠাকুর, প্রণাম হই। আপনিই তো অপূর্বানন্দ?

সন্ন্যাসী। কেউ কেউ আমাকে তাই বলেই তো জানে।

রাজদূত। আপনার অসামান্য ক্ষমতার কথা চারি দিকে রাষ্ট্র হয়ে গেছে। আমাদের মহারাজ সোমপাল আপনার সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছা করেন।

সন্ন্যাসী। যখনই আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন তখনই আমাকে দেখতে পাবেন।

রাজদূত। আপনি তা হলে যদি একবার—

সন্ন্যাসী। আমি একজনের কাছে প্রতিশ্রুত আছি এইখানেই আমি অচল হয়ে বসে থাকব। অতএব আমার মতো অকিঞ্চন অকর্মণ্যকেও তোমার রাজার যদি বিশেষ প্রয়োজন থাকে তা হলে তাঁকে এইখানেই আসতে হবে।

রাজদূত। রাজোদ্যান অতি নিকটেই— ঐখানেই তিনি অপেক্ষা করছেন।

সন্ন্যাসী। যদি নিকটেই হয় তবে তো তাঁর আসতে কোনো কষ্ট হবে না।

রাজদূত। যে আজ্ঞা, তবে ঠাকুরের ইচ্ছা তাঁকে জানাই গে। [প্রস্থান

ঠাকুরদাদা। প্রভু, এখানে রাজসমাগমের সম্ভাবনা হয়ে এল, আমি তবে বিদায় হই।

সন্ন্যাসী। ঠাকুরদা, তুমি আমার শিশু বন্ধুগুলিকে নিয়ে ততক্ষণ আসর জমিয়ে রাখো, আমি বেশি বিলম্ব করব না।

ঠাকুরদাদা। রাজার উৎপাতই ঘটুক আর অরাজকতাই হোক আমি প্রভুর চরণ ছাড়ছি নে।

[প্রস্থান

লক্ষেশ্বরের প্রবেশ

লক্ষেশ্বর। ঠাকুর, তুমিই অপূর্বানন্দ! তবে তো বড়ো অপরাধ হয়ে গেছে। আমাকে মাপ করতে হবে।

সন্ন্যাসী। তুমি আমাকে ভণ্ডতপস্বী বলেছ এই যদি তোমার অপরাধ হয় আমি তোমাকে মাপ করলেম।

লক্ষেশ্বর। বাবাঠাকুর, শুধু মাপ করতে তো সকলেই পারে— সে ফাঁকিতে আমার কী হবে। আমাকে একটা-কিছু ভালো রকম বর দিতে হচ্ছে। যখন দেখা পেয়েছি তখন শুধু হাতে ফিরছি নে।

সন্ন্যাসী। কী বর চাই।

লক্ষেশ্বর। লোকে যতটা মনে করে ততটা নয়, তবে কিনা আমার অল্পস্বল্প কিছু জমেছে— সে অতি যৎসামান্য— তাতে আমার মনের আকাঙ্ক্ষা তো মিটছে না। শরৎকাল এসেছে, আর ঘরে বসে থাকতে পারছি নে— এখন বাণিজ্যে বেরোতে হবে। কোথায় গেলে সুবিধা হতে পারে আমাকে সেই সন্ধানটি বলে দিতে হবে— আমাকে আর যেন ঘুরে বেড়াতে না হয়।

সন্ন্যাসী। আমিও সেই সন্ধানেই আছি, আর যেন ঘুরতে না হয়।

লক্ষেশ্বর। বল কী ঠাকুর!

সন্ন্যাসী। আমি সত্যই বলছি।

লক্ষেশ্বর। ওঃ, তবে সেই কথাটাই বলো। বাবা, তোমরা আমাদের চেয়েও সেয়ানা।

সন্ন্যাসী। তার সন্দেহ আছে ?

লক্ষেশ্বর। (কাছে ঘেঁষিয়া বসিয়া মৃদুস্বরে) সন্ধান কিছু পেয়েছ ?

সন্ন্যাসী। কিছু পেয়েছি বৈকি। নইলে এমন করে ঘুরে বেড়াব কেন ?

লক্ষেশ্বর। (সন্ন্যাসীর পা চাপিয়া ধরিয়া) বাবাঠাকুর, আর-একটু খোলসা করে বলো। তোমার পা ছুঁয়ে বলছি আমিও তোমাকে একেবারে ফাঁকি দেব না। কী খুঁজছ বলো তো, আমি কাউকে বলব না।

সন্ন্যাসী। তবে শোনো। লক্ষ্মী যে সোনার পদ্মটির উপরে পা দুখানি রাখেন আমি সেই পদ্মটির খোঁজে আছি।

লক্ষেশ্বর। ও বাবা! সে তো কম কথা নয়। তা হলে যে একেবারে সকল ল্যাঠাই চোকে। ঠাকুর, ভেবে ভেবে এ তো তুমি আচ্ছা বুদ্ধি ঠাওরেছ। কোনোগতিকে পদ্মটি যদি জোগাড় করে আনো তা হলে লক্ষ্মীকে আর তোমার খুঁজতে হবে না, লক্ষ্মীই তোমাকে খুঁজে বেড়াবেন ; এ নইলে আমাদের চঞ্চলা ঠাকরুনটিকে তো জব্দ করবার জো নেই। তোমার কাছে তাঁর পা দুখানিই বাঁধা থাকবে। তা তুমি সন্ন্যাসী মানুষ, একলা পেরে উঠবে ? এতে তো খরচপত্র আছে। এক কাজ করো-না বাবা, আমরা ভাগে ব্যাবসা করি।

সন্ন্যাসী। তা হলে তোমাকে যে সন্ন্যাসী হতে হবে। বহুকাল সোনা ছুঁতেই পাবে না।

লক্ষেশ্বর। সে যে শক্ত কথা।

সন্ন্যাসী। সব ব্যাবসা যদি ছাড়তে পার তবেই এ ব্যাবসা চলবে।

লক্ষেশ্বর। শেষকালে দু কূল যাবে না তো ? যদি একেবারে ফাঁকিতে না পড়ি তা হলে তোমার তল্পি বয়ে তোমার পিছন পিছন চলতে রাজি আছি। সত্যি বলছি ঠাকুর, কারও কথায় বড়ো সহজে বিশ্বাস করি নে— কিন্তু তোমার কথাটা কেমন মনে লাগছে। আচ্ছা! আচ্ছা রাজি! তোমার চেলাই হব ঐ রে রাজা আসছে! আমি তবে একটু আড়ালে দাঁড়াই গে।

বন্দিগণের গান

রাজরাজেন্দ্র জয় জয়তু জয় হে!
ব্যাপ্ত পরতাপ তব বিশ্বময় হে!
দুষ্টদলদলন তব দণ্ড ভয়কারী,
শত্রুজনদর্পহর দীপ্ত তরবারি,
সংকট শরণ্য তুমি দৈন্যদুখহারী,
মুক্ত অবরোধ তব অভ্যুদয় হে!

রাজা সোমপালের প্রবেশ

সোমপাল। প্রণাম হই ঠাকুর।

সন্ন্যাসী। জয় হোক। কী বাসনা তোমার।

সোমপাল। সে-কথা নিশ্চয় তোমার অগোচর নেই। আমি অখণ্ড রাজ্যের অধীশ্বর হতে চাই প্রভু!

সন্ন্যাসী। তা হলে গোড়া থেকে শুরু করো। তোমার খণ্ডরাজ্যটি ছেড়ে দাও।

সোমপাল। পরিহাস নয় ঠাকুর! বিজয়াদিত্যের প্রতাপ আমার অসহ্য বোধ হয়, আমি তার সামন্ত হয়ে থাকতে পারব না।

সন্ন্যাসী। রাজন্, তবে সত্য কথা বলি, আমার পক্ষেও সে ব্যক্তি অসহ্য হয়ে উঠেছে।

সোমপাল। বল কী ঠাকুর!

সন্ন্যাসী। এক বর্ণও মিথ্যা বলছি নে। তাকে বশ করবার জন্যেই আমি মন্ত্রসাধনা করছি।

সোমপাল। তাই তুমি সন্ন্যাসী হয়েছ?

সন্ন্যাসী। তাই বটে।

সোমপাল। মন্ত্রে সিদ্ধি লাভ হবে?

সন্ন্যাসী। অসম্ভব নেই।

সোমপাল। তা হলে ঠাকুর, আমার কথা মনে রেখো। তুমি যা চাও আমি তোমাকে দেব। যদি সে বশ মানে তা হলে আমার কাছে যদি—

সন্ন্যাসী। তা বেশ, সেই চক্রবর্তী সম্রাটকে আমি তোমার সভায় ধরে আনব।

সোমপাল। কিন্তু বিলম্ব করতে ইচ্ছা করছে না। শরৎকাল এসেছে— সকাল বেলা উঠে বেতসিনীর জলের উপর যখন আশ্বিনের রৌদ্র পড়ে তখন আমার সৈন্যসামন্ত নিয়ে দিগ্‌বিজয়ে বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। যদি আশীর্বাদ কর তা হলে—

সন্ন্যাসী। কোনো প্রয়োজন নেই; শরৎকালেই আমি তাকে তোমার কাছে সমর্পণ করব, এই তো উপযুক্ত কাল। তুমি তাকে নিয়ে কী করবে।

সোমপাল। আমার একটা কোনো কাজে লাগিয়ে দেব— তার অহংকার দূর করতে হবে।

সন্ন্যাসী। এ তো খুব ভালো কথা। যদি তার অহংকার চূর্ণ করতে পার তা হলে ভারি খুশি হব।

সোমপাল। ঠাকুর, চলো আমার রাজভবনে।

সন্ন্যাসী। সেটি পারছি নে। আমার দলের লোকদের অপেক্ষায় আছি। তুমি যাও বাবা। আমার জন্যে কিছু ভেবো না। তোমার মনের বাসনা যে আমাকে ব্যক্ত করে বলেছ এতে আমার ভারি আনন্দ হচ্ছে। বিজয়াদিত্যের যে এত শত্রু জমে উঠেছে তা তো আমি জানতেম না!

সোমপাল। তবে বিদায় হই। প্রণাম! [প্রস্থান

(পুনশ্চ ফিরিয়া আসিয়া) আচ্ছা ঠাকুর, তুমি তো বিজয়াদিত্যকে জান, সত্য করে বলো দেখি, লোকে তার সম্বন্ধে যতটা রটনা করে ততটা কি সত্য?

সন্ন্যাসী। কিছুমাত্র না। লোকে তাকে একটা মস্ত রাজা বলে মনে করে কিন্তু সে নিতান্তই সাধারণ মানুষের মতো। তার সাজসজ্জা দেখেই লোকে ভুলে গেছে।

সোমপাল। বলো কী ঠাকুর! হা হা হা হা! আমিও তাই ঠাউরেছিলেম। অ্যাঁ! নিতান্তই সাধারণ মানুষ!

সন্ন্যাসী। আমার ইচ্ছে আছে, আমি তাকে সেইটে আচ্ছা করে বুঝিয়ে দেব। সে যে রাজার পোশাক পরে ফাঁকি দিয়ে অন্য পাঁচ জনের চেয়ে নিজেকে মস্ত একটা কিছু বলে মনে করে আমি তার সেই ভুলটা একেবারে ঘুচিয়ে দেব।

সোমপাল। ঠাকুর, তুমি সব ফাঁস করে দাও। ও যে মিথ্যে রাজা, ভুয়ো রাজা, সে যেন আর ছাপা না থাকে। ওর বড়ো অহংকার হয়েছে।

সন্ন্যাসী। আমি তো সেই চেষ্টাতেই আছি। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, যতক্ষণ না আমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় আমি সহজে ছাড়ব না.।

সোমপাল। প্রণাম!

[প্রস্থান

উপনন্দের প্রবেশ

উপনন্দ। ঠাকুর, আমার মনের ভার তো গেল না।

সন্ন্যাসী। কী হল বাবা!

উপনন্দ। মনে করেছিলেম লক্ষেশ্বর যখন আমাকে অপমান করেছে তখন ওর কাছে আমি আর ঋণ স্বীকার করব না। তাই পুঁথিপত্র নিয়ে ঘরে ফিরে গিয়েছিলেম। সেখানে আমার প্রভুর বীণাটি নিয়ে তার ধুলো ঝাড়তে গিয়ে তারগুলি বেজে উঠল— অমনি আমার মনটার ভিতর যে কেমন হল সে আমি বলতে পারি নে। সেই বীণার কাছে লুটিয়ে পড়ে বুক ফেটে আমার চোখের জল পড়তে লাগল। মনে হল আমার প্রভুর কাছে আমি অপরাধ করেছি। লক্ষেশ্বরের কাছে আমার প্রভু ঋণী হয়ে রইলেন আর আমি নিশ্চিন্ত হয়ে আছি! ঠাকুর, এ তো আমার কোনোমতেই সহ্য হচ্ছে না। ইচ্ছে করছে আমার প্রভুর জন্যে আজ আমি অসাধ্য কিছু একটা করি। আমি তোমাকে মিথ্যা বলছি নে, তাঁর ঋণ শোধ করতে যদি আজ প্রাণ দিতে পারি তা হলে আমার খুব আনন্দ হবে— মনে হবে আজকের এই সুন্দর শরতের দিন আমার পক্ষে সার্থক হল।

সন্ন্যাসী। বাবা, তুমি যা বলছ সত্যই বলছ।

উপনন্দ। ঠাকুর, তুমি তো অনেক দেশ ঘুরেছ, আমার মতো অকর্মণ্যকেও হাজার কার্ষাপণ দিয়ে কিনতে পারেন এমন মহাত্মা কেউ আছেন? তা হলেই ঋণটা শোধ হয়ে যায়। এ নগরে যদি চেষ্টা করি তা হলে বালক বলে ছোটো জাত বলে সকলে আমাকে খুব কম দাম দেবে।

সন্ন্যাসী। না বাবা, তোমার মূল্য এখানে কেউ বুঝবে না। আমি ভাবছি কী, যিনি তোমার প্রভুকে অত্যন্ত আদর করতেন সেই বিজয়াদিত্য বলে রাজাটার কাছে গেলে কেমন হয়?

উপনন্দ। বিজয়াদিত্য? তিনি যে আমাদের সম্রাট!

সন্ন্যাসী। তাই নাকি?

উপনন্দ। তুমি জান না বুঝি?

সন্ন্যাসী। তা হবে। নাহয় তাই হল।

উপনন্দ। আমার মতো ছেলেকে তিনি কি দাম দিয়ে কিনবেন?

সন্ন্যাসী। বাবা, বিনামূল্যে কেনবার মতো ক্ষমতা তাঁর যদি থাকে তা হলে বিনামূল্যেই কিনবেন। কিন্তু তোমার ঋণটুকু শোধ করে না দিতে পারলে তাঁর এত ঋণ জমবে যে তাঁর রাজভাণ্ডার লজ্জিত হবে, এ আমি তোমাকে সত্যই বলছি।

উপনন্দ। ঠাকুর, এও কি সম্ভব?

সন্ন্যাসী। বাবা, জগতে কেবল কি এক লক্ষেশ্বরই সম্ভব, তার চেয়ে বড়ো সম্ভাবনা কি আর কিছুই নেই?

উপনন্দ। আচ্ছা, যদি সে সম্ভব হয় তো হবে, কিন্তু আমি ততদিন পুঁথিগুলি নকল করে কিছু কিছু শোধ করতে থাকি— নইলে আমার মনে বড়ো গ্লানি হচ্ছে।

সন্ন্যাসী। ঠিক কথা বলেছ বাবা। বোঝা মাথায় তুলে নাও, কারও প্রত্যাশায় ফেলে রেখে সময় বইয়ে দিয়ো না।

উপনন্দ। তা হলে চললেম ঠাকুর। তোমার কথা শুনে আমি মনে কত যে বল পেয়েছি সে আমি বলে উঠতে পারি নে।

[প্রস্থান

লক্ষেশ্বরের প্রবেশ

লক্ষেশ্বর। ঠাকুর, অনেক ভেবে দেখলেম— পারব না। তোমার চেলা হওয়া আমার কর্ম নয়। যা পেয়েছি তা অনেক দুঃখে পেয়েছি, তোমার এক কথায় সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে শেষকালে হায়-হায় করে মরব! আমার বেশি আশায় কাজ নেই।

সন্ন্যাসী। সে কথাটা বুঝলেই হল।

লক্ষেশ্বর। ঠাকুর, এবার একটুখানি উঠতে হচ্ছে।

সন্ন্যাসী। (উঠিয়া) তা হলে তোমার কাছ থেকে ছুটি পাওয়া গেল।

লক্ষেশ্বর। (মাটি ও শুষ্কপত্র সরাইয়া কৌটা বাহির করিয়া) ঠাকুর, এইটুকুর জন্যে আজ সকাল থেকে সমস্ত হিসাব কিতাব ফেলে রেখে এই জায়গাটার চার দিকে ভূতের মতো ঘুরে বেড়িয়েছি। এই-যে গজমোতি, এ আমি তোমাকে আজ প্রথম দেখালেম। আজ পর্যন্ত কেবলই এটাকে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়িয়েছি; তোমাকে দেখাতে পেরে মনটা তবু একটু হালকা হল। (সন্ন্যাসীর হাতের কাছে অগ্রসর করিয়াই তাড়াতাড়ি ফিরাইয়া লইয়া) না, হল না! তোমাকে যে এত বিশ্বাস করলেম, তবু এ জিনিস একটিবার তোমার হাতে তুলে দিই এমন শক্তি আমার নেই। এই-যে আলোতে এটাকে তুলে ধরেছি আমার বুকের ভিতরে যেন গুর্‌গুর্‌ করছে। আচ্ছা ঠাকুর, বিজয়াদিত্য কেমন লোক বলো তো। তাকে বিক্রি করতে গেলে সে তো দাম না দিয়ে এটা আমার কাছ থেকে জোর করে কেড়ে নেবে না? আমার ঐ এক মুশকিল হয়েছে। আমি এটা বেচতেও পারছি নে, রাখতেও পারছি নে, এর জন্যে আমার রাত্রে ঘুম হয় না। বিজয়াদিত্যকে তুমি বিশ্বাস কর?

সন্ন্যাসী। সব সময়েই কি তাকে বিশ্বাস করা যায়?

লক্ষেশ্বর। সেই তো মুশকিলের কথা। আমি দেখছি, এটা মাটিতেই পোঁতা থাকবে, হঠাৎ কোন্‌দিন মরে যাব, কেউ সন্ধানও পাবে না।

সন্ন্যাসী। রাজাও না, সম্রাটও না, ঐ মাটিই সব ফাঁকি দিয়ে নেবে। তোমাকেও নেবে, আমাকেও নেবে।

লক্ষেশ্বর। তা নিক গে, কিন্তু আমার কেবলই ভাবনা হয়, আমি মরে গেলে কোথা থেকে কে এসে হঠাৎ হয়তো খুঁড়তে খুঁড়তে ওটা পেয়ে যাবে। যাই হোক ঠাকুর, কিন্তু তোমার মুখে ঐ সোনার পদ্মর কথাটা আমার কাছে বড়ো ভালো লাগে। আমার কেমন মনে হচ্ছে, ওটা তুমি হয়তো খুঁজে বের করতে পারবে। কিন্তু তা হোক গে, আমি তোমার চেলা হতে পারব না। প্রণাম।

[প্রস্থান

ঠাকুরদাদা ও শেখরের প্রবেশ

সন্ন্যাসী। ওহে পরদেশী, তুমি তো মানুষের ভিতরকার মতলব সব দেখতে পাও। তুমি জান আমি বেরিয়েছিলুম বিশ্বের ঋণশোধ করতে।

ঠাকুরদাদা। কী ঋণ প্রভু, আমাকে একটু বুঝিয়ে বলবেন না?

সন্ন্যাসী। আনন্দের ঋণ ঠাকুরদা। শরতে যে সোনার আলোয় সুধা ঢেলে দিয়েছে— তার শোধ করতে চাই যদি তো হৃদয় ঢেলে দিতে হবে। ওহে উদাসী, তুমি বল কী?

শেখর।

গান

দেওয়া নেওয়া ফিরিয়ে দেওয়া
তোমায় আমায়
জনম জনম এই চলেছে
মরণ কভু তারে থামায়?
যখন তোমার গানে আমি জাগি
আকাশে চাই তোমার লাগি,

আবার একতারাতে আমার গানে
মাটির পানে তোমায় নামায়।
ওগো তোমার সোনার আলোর ধারা
তার ধারি ধার,
আমার কালো মাটির ফুল ফুটিয়ে
শোধ করি তার।
আমার শরৎ-রাতের শেফালি বন
সৌরভেতে মাতে যখন,
তখন পালটা সে তান লাগে তব
শ্রাবণ-রাতের প্রেম-বরিষায়।

সন্ন্যাসী। এই ঋণশোধের ছবি আমি দেখে নিলেম ঐ উপনন্দের মধ্যে। ওই তো প্রেমের ঋণ প্রেম দিয়ে শুধছে। উপনন্দকে তুমি দেখেছ ?

শেখর। হাঁ তাঁকে দেখে নিয়েছি, বুঝেও নিয়েছি। ছেলেদের মুখে উপনন্দ আর ঠাকুরদা এই দুই নাম বাজছে। তাদের কাছে থেকে ওর সব খবর পেলুম।

সন্ন্যাসী। ওকে সবাই ভালোবাসে, কেননা ও যে দুঃখের শোভায় সুন্দর।

শেখর। ঠাকুর, যদি তাকিয়ে দেখ তবে দেখবে সব সুন্দরই দুঃখের শোভায় সুন্দর। এই যে ধানের খেত আজ সবুজ ঐশ্বর্যে ভরে উঠেছে এর শিকড়ে শিকড়ে পাতায় পাতায় ত্যাগ। মাটি থেকে জল থেকে হাওয়া থেকে যা-কিছু ও পেয়েছে সমস্তই আপন প্রাণের ভিতর দিয়ে একেবারে নিংড়ে নিয়ে মঞ্জরীতে মঞ্জরীতে উৎসর্গ করে দিলে। তাই তো চোখ জুড়িয়ে গেল।

সন্ন্যাসী। ঠিক বলেছ উদাসী, প্রেমের আনন্দে উপনন্দ দুঃখের ভিতর দিয়ে জীবনের ভরা খেতের ফসল ফলিয়ে তুললে।

শেখর। ঐ দুঃখের রতনমালা বিশ্বের কণ্ঠে ঝলমল করছে।

গান

তোমার সোনার থালায় সাজাব আজ
দুখের অশ্রুধার।
জননী গো, গাঁথব তোমার
গলার মুক্তাহার।
চন্দ্রসূর্য পায়ের কাছে
মালা হয়ে জড়িয়ে আছে,
তোমার বুকে শোভা পাবে আমার
দুখের অলংকার।
ধনধান্য তোমারি ধন
কী করবে তা কও,
দিতে চাও তো দিয়ো আমায়,
নিতে চাও তো লও।
দুঃখ আমার ঘরের জিনিস,
খাঁটি রতন তুই তো চিনিস,
তোর প্রসাদ দিয়ে তারে কিনিস,
এ মোর অহংকার॥

লক্ষেশ্বরের প্রবেশ

লক্ষেশ্বর। এই যে, এ লোকটি এখানে এসে জুটেছে। (চোখ টিপিয়া) ঠাকুরদা, এঁকে চিনতে পেরেছ কি, ইনি একজন সন্ধানী লোক।

শেখর। সেইজন্যেই তো তোমাকে ছেড়ে এখন এঁকে ধরেছি।

লক্ষেশ্বর। এঁকে দেখে ঠাউরেছ ওঁর সঞ্চয় কিছু আছে, আমার মতো অকিঞ্চন না।

শেখর। ঠিক বটে। সেইজন্যে লেগে আছি, আদায় না করে ছাড়ছি নে।

লক্ষেশ্বর। কিন্তু এতক্ষণ তোমরা তিনজনে মিলে চুপিচুপি কী পরামর্শ করছিলে বলো দেখি?

সন্ন্যাসী। আমাদের সেই সোনার পদ্মের পরামর্শ।

লক্ষেশ্বর। অ্যাঁ! এরই মধ্যে সমস্ত ফাঁস করে বসে আছ? বাবা, তুমি এই ব্যাবসাবুদ্ধি নিয়ে সোনার পদ্মর আমদানি করবে? তবেই হয়েছে। তুমি যেই মনে করলে আমি রাজি হলেম না অমনি তাড়াতাড়ি অংশীদার খুঁজতে লেগে গেছ! কিন্তু এ-সব কি ঠাকুরদার কর্ম। ওঁর পুঁজিই বা কী।

সন্ন্যাসী। তুমি খবর পাও নি। কিন্তু একেবারে পুঁজি নেই তা নয়। ভিতরে ভিতরে জমিয়েছে।

লক্ষেশ্বর। (ঠাকুরদাদার পিঠ চাপড়াইয়া) সত্যি না কি ঠাকুরদা? বড়ো তো ফাঁকি দিয়ে আসছ! তোমাকে তো চিনতেম না। লোকে আমাকেই সন্দেহ করে, তোমাকে তো স্বয়ং রাজাও সন্দেহ করে না। তা হলে এতদিনে খানাতল্লাশি পড়ে যেত। আমি তো, দাদা, গুপ্তচরের ভয়ে ঘরে চাকরবাকর রাখি নে।

ঠাকুরদাদা। তবে যে আজ সকালে ছেলে তাড়াবার বেলায় উর্ধ্বস্বরে চোবে, তেওয়ারি, গিরধারিলালকে হাঁক পাড়ছিলে!

লক্ষেশ্বর। যখন নিশ্চয় জানি হাঁক পাড়লেও কেউ আসবে না, তখন উর্ধ্বস্বরের জোরেই আসর গরম করে তুলতে হয়। কিন্তু বলে তো ভালো করলেম না। মানুষের সঙ্গে কথা কবার তো বিপদই ঐ। সেইজন্যেই কারও কাছে ঘেঁষি নে। দেখো দাদা, ফাঁস করে দিয়ো না!

ঠাকুরদাদা। ভয় নেই তোমার।

লক্ষেশ্বর। ভয় না থাকলেও তবু ভয় ঘোচে কই। ঐ যে ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ আসছে। ঐ দেখছ না দূরে— আকাশে যে ধুলো উড়িয়ে দিয়েছে! সবাই খবর পেয়েছে স্বামী অপূর্বানন্দ এসেছেন। এবার পায়ের ধুলো নিয়ে তোমার পায়ের তেলো হাঁটু পর্যন্ত খইয়ে দেবে। যাই হোক তুমি যে-রকম আলগা মানুষ দেখছি, সেই কথাটা আর কারও কাছে ফাঁস কোরো না— অংশীদার আর বাড়িয়ো না।

[প্রস্থান

সন্ন্যাসী। ঠাকুরদা, আর তো দেরি করলে চলবে না। লোকজন জুটতে আরম্ভ করেছে, 'পুত্র দাও' 'ধন দাও' করে আমাকে একেবারে মাটি করে দেবে। ছেলেগুলিকে এইবেলা ডাকো। তারা ধন চায় না, পুত্র চায় না, তাদের সঙ্গে খেলা জুড়ে দিলেই পুত্রধনের কাঙালরা আমাকে ত্যাগ করবে।

ঠাকুরদাদা। ছেলেদের আর ডাকতে হবে না। ঐ যে আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। এল বলে।

[দ্রুত প্রস্থান

শেখরকে সঙ্গে লইয়া ছেলেদের প্রবেশ

ছেলেরা। সন্ন্যাসী ঠাকুর! সন্ন্যাসী ঠাকুর!

সন্ন্যাসী। কী বাবা।

ছেলেরা। তুমি আমাদের নিয়ে খেলো।

সন্ন্যাসী। সে কি হয় বাবা! আমার কি সে ক্ষমতা আছে? তোমরা আমাকে নিয়ে খেলাও!

ছেলেরা। কী খেলা খেলবে?

সন্ন্যাসী। আমরা আজ শারদোৎসব খেলব।

প্রথম বালক। সে বেশ হবে।

দ্বিতীয় বালক। সে বেশ মজা হবে।

তৃতীয় বালক। সে কী খেলা ঠাকুর?

চতুর্থ বালক। সে কেমন করে খেলতে হয়?

সন্ন্যাসী। এই পরদেশীকে তোমাদের সহায় করো, এ মানুষটি সকল খেলাই খেলতে জানে।

প্রথম বালক। সে বেশ মজা হবে।

দ্বিতীয় বালক। পরদেশী, তুমি বলে দাও আমাদের কী করতে হবে।

শেখর। আচ্ছা, তা হলে চলো তোমাদের সাজিয়ে নিয়ে আসি গে।

[বালকগণকে লইয়া কবির প্রস্থান

একদল লোকের প্রবেশ

প্রথম ব্যক্তি। ওরে সন্ন্যাসী কোথায় গেল রে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। কই বাবা, সন্ন্যাসী কই।

ঠাকুরদাদা। এই যে আমাদের সন্ন্যাসী।

প্রথম ব্যক্তি। ও যেন খেলার সন্ন্যাসী। সত্যিকার সন্ন্যাসী কোথায় গেলেন।

সন্ন্যাসী। সত্যিকার সন্ন্যাসী কি সহজে মেলে। আমি একদল ছেলেকে নিয়ে সন্ন্যাসী সন্ন্যাসী খেলছি।

প্রথম ব্যক্তি। ও তোমার কী রকম খেলা গা!

দ্বিতীয় ব্যক্তি। ওতে যে অপরাধ হবে।

তৃতীয় ব্যক্তি। ফেলো, ফেলো, তোমার জটা ফেলো!

চতুর্থ ব্যক্তি। ওরে দেখ্-না গেরুয়া পরেছে! কিন্তু এটা দামি জিনিস রে।

প্রথম ব্যক্তি। বাবা, তোমার এই শখের সন্ন্যাসীর সাজ কেন।

সন্ন্যাসী। আমি যে কবির কাছে দীক্ষা নিয়েছিলুম।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। কবির কাছে? এ যে শুনি নতুন কথা। আমাদের গাঁয়ে আছে ভূষণ কবি, কৈবত্তর পো, লেখে ভালো, কিন্তু দীক্ষা দিতে এলে তার ঘরে আগুন লাগিয়ে দিতুম-না!

প্রথম ব্যক্তি। তবে যে আমাদের কে একজন বললে কোথাকার কোন্ একজন স্বামী এসেছে।

সন্ন্যাসী। যদি-বা এসে থাকে তাকে দিয়ে তোমাদের কোনো কাজ হবে না।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। কেন? সে ভণ্ড না কি?

সন্ন্যাসী। তা নয় তো কী?

তৃতীয় ব্যক্তি। বাবা, তোমার চেহারাটি কিন্তু ভালো। তুমি মন্ত্রতন্ত্র কিছু শিখেছ?

সন্ন্যাসী। শেখবার ইচ্ছা তো আছে কিন্তু শেখায় কে?

তৃতীয় ব্যক্তি। একটি লোক আছে বাবা— সে থাকে ভৈরবপুরে, লোকটা বেতালসিদ্ধ। একটি লোকের ছেলে মারা যাচ্ছিল, তার বাপ এসে ধরে পড়তেই লোকটা করলে কী, সেই ছেলেটার প্রাণপুরুষকে একটা নেকড়ে বাঘের মধ্যে চালান করে দিলে। বললে বিশ্বাস করবে না, ছেলেটা মোলো বটে কিন্তু নেকড়েটা আজও দিব্যি বেঁচে আছে। না, হাসছ কী, আমার সম্বন্ধী স্বচক্ষে দেখে এসেছে। সেই নেকড়েটাকে মারতে গেলে বাপ লাঠি হাতে ছুটে আসে। তাকে দুবেলা ছাগল খাইয়ে লোকটা ফতুর হয়ে গেল। বিদ্যে যদি শিখতে চাও তো সেই সন্ন্যাসীর কাছে যাও।

প্রথম ব্যক্তি। ওরে, চল্ রে, বেলা হয়ে গেল। সন্ন্যাসী ফন্নাসী সব মিথ্যে। সে-কথা আমি তো তখনই বলেছিলেম। আজকালকার দিনে কি আর সে-রকম যোগবল আছে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। সে তো সত্যি। কিন্তু আমাকে যে কালুর মা বললে তার ভাগনে নিজের চক্ষে দেখে এসেছে সন্ন্যাসী একটান গাঁজা টেনে কলকেটা যেমনি উপুড় করলে অমনি তার মধ্যে থেকে এক ভাঁড় মদ আর একটা আস্ত মড়ার মাথার খুলি বেরিয়ে পড়ল!

তৃতীয় ব্যক্তি। বল কী, নিজের চক্ষে দেখেছে!

দ্বিতীয় ব্যক্তি। হাঁ রে, নিজের চক্ষে বৈকি।

তৃতীয় ব্যক্তি। আছে রে আছে, সিদ্ধপুরুষ আছে ; ভাগ্যে যদি থাকে তবে তো দর্শন পাব। তা চল্-না ভাই, কোন্ দিকে গেল একবার দেখে আসি গে।

[প্রস্থান

লক্ষেশ্বরের প্রবেশ

লক্ষেশ্বর। দেখো ঠাকুর, তোমার মন্তর যদি ফিরিয়ে না নাও তো ভালো হবে না বলছি। কী মুশকিলেই ফেলেছ, আমার হিসাবের খাতা মাটি হয়ে গেল। একবার মনটা বলে যাই সোনার পদ্মর খোঁজে, আবার বলি থাক গে ও-সব বাজে কথা। একবার মনে ভাবি, এবার বুঝি তবে ঠাকুরদাই জিতলে-বা, আবার ভাবি মরুক গে ঠাকুরদা! ঠাকুর, এ তো ভালো কথা নয়। চেলা-ধরা ব্যাবসা দেখছি তোমার! কিন্তু সে হবে না, কোনোমতেই হবে না। চুপ করে হাসছ কী। আমি বলছি আমাকে পারবে না— আমার শক্ত হাড়। লক্ষেশ্বর কোনোদিন তোমার চেলাগিরিতে ভিড়বে না।

[প্রস্থান

ফুল লইয়া ছেলেদের সঙ্গে শেখরের প্রবেশ

সন্ন্যাসী। এবার অর্ঘ্য সাজানো যাক। এ যে টগর, এই বুঝি মালতী, শেফালিকাও অনেক এনেছ দেখছি। সমস্তই শুভ্র, শুভ্র, শুভ্র! এবারে সকলে মিলে শারদোৎসবের আবাহন গানটি ধরো। কবি, তুমি ধরিয়ে দাও। ঠাকুরদা, তুমিও যোগ দিয়ো।

গান

আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ, আমরা
গেঁথেছি শেফালি মালা।
নবীন ধানের মঞ্জরী দিয়ে
সাজিয়ে এনেছি ডালা।
এসো গো শারদলক্ষ্মী, তোমার
শুভ্র মেঘের রথে,
এসো নির্মল নীল পথে,
এসো ধৌত শ্যামল আলো-ঝলমল
বনগিরি-পর্বতে।
এসো মুকুটে পরিয়া শ্বেত শতদল
শীতল শিশির-ঢালা॥
ঝরা মালতীর ফুলে
আসন-বিছানো নিভৃত কুঞ্জে
ভরা গঙ্গার কূলে,
ফিরিছে মরাল ডানা পাতিবারে
তোমার চরণমূলে।
গুঞ্জর তান তুলিয়ো তোমার
সোনার বীণার তারে
মৃদু মধু ঝংকারে,
হাসিঢালা সুর গলিয়া পড়িবে
ক্ষণিক অশ্রুধারে।

রহিয়া রহিয়া যে পরশমণি
ঝলকে অলককোণে,
পলকের তরে সকরুণ করে
বুলায়ো বুলায়ো মনে।
সোনা হয়ে যাবে সকল ভাবনা,
আঁধার হইবে আলা ॥

শেখর। পৌঁচেছে, গান আকাশের পারে গিয়ে পৌঁচেছে। দ্বার খুলেছে তাঁর। দেখতে পাচ্ছ কি, শারদা বেরিয়েছেন। দেখতে পাচ্ছ না? আচ্ছা তা হলে আগে ধ্যানের গানটি গেয়ে নিই।

গান

লেগেছে অমল ধবল পালে মন্দ মধুর হাওয়া।
দেখি নাই কভু দেখি নাই এমন তরণী বাওয়া।
কোন্ সাগরের পার হতে আনে
কোন্ সুদূরের ধন!
ভেসে যেতে চায় মন,
ফেলে যেতে চায় এই কিনারায়
সব চাওয়া সব পাওয়া।
পিছনে ঝরিছে ঝর ঝর জল
গুরু গুরু দেয়া ডাকে,
মুখে এসে পড়ে অরুণ কিরণ
ছিন্ন মেঘের ফাঁকে।
ওগো কাণ্ডারী, কে গো তুমি, কার
হাসিকান্নার ধন।
ভেবে মরে মোর মন
কোন্ সুরে আজ বাঁধিবে যন্ত্র
কী মন্ত্র হবে গাওয়া ॥

এবারে আর দেখতে পাই নি বলবার জো নেই।
প্রথম বালক। কই দেখিয়ে দাও-না।
শেখর। ঐ-যে সাদা মেঘ ভেসে আসছে।
দ্বিতীয় বালক। হাঁ হাঁ, ভেসে আসছে।
তৃতীয় বালক। হাঁ, আমিও দেখেছি।
শেখর। ঐ-যে আকাশ ভরে গেল।
প্রথম বালক। কিসে?
শেখর। কিসে! এই তো স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে আলোতে, আনন্দে। বাতাসে শিশিরের পরশ পাচ্ছ না?
দ্বিতীয় বালক। হাঁ, পাচ্ছি।
শেখর। তবে আর-কি! চক্ষু সার্থক হয়েছে, শরীর পবিত্র হয়েছে, মন প্রশান্ত হয়েছে। এসেছেন, এসেছেন, আমাদের মাঝখানেই এসেছেন। দেখছ না বেতসিনী নদীর ভাবটা! আর ধানের খেত কী রকম চঞ্চল হয়ে উঠেছে। এবার বরণের গানটা ধরিয়ে দিই। গাও।

গান

আমার নয়ন-ভুলানো এলে !
আমি কী হেরিলাম হৃদয় মেলে !

শেখর। সমস্ত বনে বনে নদীর ধারে ধারে গেয়ে আসি গে।

[ছেলেদের লইয়া গাহিতে গাহিতে শেখরের প্রস্থান

লক্ষেশ্বরের প্রবেশ

ঠাকুরদাদা। এ কী হল ! লখা গেরুয়া ধরেছে যে !

লক্ষেশ্বর। সন্ন্যাসী ঠাকুর, এবার আর কথা নেই। আমি তোমারই চেলা। এই নাও আমার গজমোতির কৌটো— এই আমার মণিমাণিক্যের পেটিকা তোমারই কাছে রইল। দেখো ঠাকুর, সাবধানে রেখো।

সন্ন্যাসী। তোমার এমন মতি কেন হল লক্ষেশ্বর ?

লক্ষেশ্বর। সহজে হয় নি প্রভু ! সম্রাট বিজয়াদিত্যের সৈন্য আসছে। এবার আমার ঘরে কি আর কিছু থাকবে ? তোমার গায়ে তো কেউ হাত দিতে পারবে না, এ-সমস্ত তোমার কাছেই রাখলেম। তোমার চেলাকে তুমি রক্ষা করো বাবা, আমি তোমার শরণাগত।

সোমপালের প্রবেশ

সোমপাল। সন্ন্যাসী ঠাকুর !

সন্ন্যাসী। বোসো, বোসো, তুমি যে হাঁপিয়ে পড়েছ। একটু বিশ্রাম করো।

সোমপাল। বিশ্রাম করবার সময় নেই। ঠাকুর, চরের মুখে সংবাদ পাওয়া গেল যে, বিজয়াদিত্যের পতাকা দেখা দিয়েছে— তাঁর সৈন্যদল আসছে।

সন্ন্যাসী। বল কী। বোধ হয় শরৎকালের আনন্দে তাঁকে আর ঘরে টিকতে দেয় নি। তিনি রাজ্যবিস্তার করতে বেরিয়েছেন।

সোমপাল। কী সর্বনাশ ! রাজ্যবিস্তার করতে বেরিয়েছেন !

সন্ন্যাসী। বাবা, এতে দুঃখিত হলে চলবে কেন ? তুমিও তো রাজ্যবিস্তার করবার উদ্‌যোগে ছিলে।

সোমপাল। না, সে হল স্বতন্ত্র কথা। তাই বলে আমার এই রাজ্যটুকুতে— তা সে যাই হোক, আমি তোমার শরণাগত। এই বিপদ হতে আমাকে বাঁচাতেই হবে, বোধ হয় কোনো দুষ্টলোক তাঁর কাছে লাগিয়েছে যে আমি তাকে লঙ্ঘন করতে ইচ্ছা করেছি ; তুমি তাঁকে বোলো সে-কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা, সর্বৈব মিথ্যা। আমি কি এমনি উন্মত্ত ? আমার রাজচক্রবর্তী হবার দরকার কী ? আমার শক্তিই বা এমন কী আছে ?

সন্ন্যাসী। ঠাকুরদা !

ঠাকুরদাদা। কী প্রভু !

সন্ন্যাসী। দেখো, আমি গেরুয়া পরে এবং গুটিকতক ছেলেকে মাত্র নিয়ে শারদোৎসব কেমন জমিয়ে তুলেছিলেম আর ঐ চক্রবর্তী সম্রাটটা তার সমস্ত সৈন্যসামন্ত নিয়ে এমন দুর্লভ উৎসব কেবল নষ্টই করতে পারে। লোকটা কী রকম দুর্ভাগা দেখেছ !

সোমপাল। চুপ করো, চুপ করো ঠাকুর ! কে আবার কোন্ দিক থেকে শুনতে পাবে।

সন্ন্যাসী। ঐ বিজয়াদিত্যের পরে আমার—

সোমপাল। আরে, চুপ চুপ ! তুমি সর্বনাশ করবে দেখছি। তাঁর প্রতি তোমার মনের ভাব যাই থাক্ সে তুমি মনেই রেখে দাও !

সন্ন্যাসী। তোমার সঙ্গে পূর্বেও তো সে-বিষয়ে কিছু আলোচনা হয়ে গেছে।

সোমপাল। কী মুশকিলেই পড়লেম! সে-সব কথা কেন ঠাকুর, সে এখন থাক্-না! ওহে লক্ষেশ্বর, তুমি এখানে বসে বসে কী শুনছ! এখান থেকে যাও-না!

লক্ষেশ্বর। মহারাজ, যাই এমন আমার সাধ্য কী আছে! একেবারে পাথর দিয়ে চেপে রেখেছে। যমে না নড়ালে আমার আর নড়চড় নেই। নইলে মহারাজের সামনে আমি যে ইচ্ছাসুখে বসে থাকি এমন আমার স্বভাবই নয়।

বিজয়াদিত্যের অমাত্যগণের প্রবেশ

মন্ত্রী। জয় হোক মহারাজাধিরাজচক্রবর্তী বিজয়াদিত্য!

[ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম

সোমপাল। আরে করেন কী, করেন কী! আমাকে পরিহাস করছেন নাকি! আমি বিজয়াদিত্য নই। আমি তাঁর চরণাশ্রিত সামন্ত সোমপাল।

মন্ত্রী। মহারাজ, সময় তো অতীত হয়েছে, এক্ষণে রাজধানীতে ফিরে চলুন।

সন্ন্যাসী। ঠাকুরদা, পূর্বেই তো বলেছিলেম পাঠশালা ছেড়ে পালিয়েছি কিন্তু গুরুমশায় পিছন পিছন তাড়া করেছেন।

ঠাকুরদাদা। প্রভু এ কী কাণ্ড! আমি তো স্বপ্ন দেখছি নে!

সন্ন্যাসী। স্বপ্ন তুমিই দেখছ কি এঁরাই দেখছেন তা নিশ্চয় করে কে বলবে?

ঠাকুরদাদা। তবে কি—

সন্ন্যাসী। হাঁ, এঁরা কয়জনে আমাকে বিজয়াদিত্য বলেই তো জানেন।

ঠাকুরদাদা। প্রভু, আমিই তো তবে জিতেছি। এই কয় দণ্ডে আমি তোমার যে পরিচয়টি পেয়েছি তা এঁরা পর্যন্ত পান নি! কিন্তু বড়ো সংকটে ফেললে তো ঠাকুর।

লক্ষেশ্বর। আমিও বড়ো সংকটে পড়েছি মহারাজ। আমি সম্রাটের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে সন্ন্যাসীর হাতে ধরা দিয়েছি, এখন আমি যে কার হাতে আছি সেটা ভেবেই পাচ্ছি নে।

সোমপাল। মহারাজ দাসকে কি পরীক্ষা করতে বেরিয়েছিলেন?

সন্ন্যাসী। না সোমপাল, আমি নিজের পরীক্ষাতেই বেরিয়েছিলেম।

সোমপাল। মহারাজ, আপনি যে শরতের বিজয়যাত্রায় বেরিয়েছেন আজ তার পরিচয় পাওয়া গেল। আজ আমার হার মেনে আনন্দ।

উপনন্দের প্রবেশ

উপনন্দ। ঠাকুর! এ কী, রাজা যে! এরা সব কারা!

পলায়নোদ্যম

সন্ন্যাসী। এসো এসো, বাবা, এসো। কী বলছিলে বলো। (উপনন্দ নিরুত্তর) এঁদের সামনে বলতে লজ্জা করছ? আচ্ছা, তবে সোমপাল একটু অবসর নাও। তোমরাও—

উপনন্দ। সে কী কথা। ইনি যে আমাদের রাজা, এঁর কাছে আমাকে অপরাধী কোরো না। আমি তোমাকে বলতে এসেছিলেম এই কদিন পুঁথি লিখে আজ তার পারিশ্রমিক তিন কাহন পেয়েছি। এই দেখো।

সন্ন্যাসী। আমার হাতে দাও বাবা! তুমি ভাবছ এই তোমার বহুমূল্য তিন কার্যাপণ আমি লক্ষেশ্বরের হাতে ঋণশোধের জন্য দেব? এ আমি নিজে নিলেম। আমি এখানে শারদার উৎসব করেছি, এ আমার তারই দক্ষিণা। কী বলো বাবা!

উপনন্দ। ঠাকুর, তুমি নেবে!

সন্ন্যাসী। নেব বৈকি। তুমি ভাবছ সন্ন্যাসী হয়েছি বলেই আমার কিছুতে লোভ নেই? এ-সব জিনিসে আমার ভারি লোভ।

লক্ষেশ্বর। সর্বনাশ! তবেই হয়েছে। ডাইনের হাতে পুত্র সমর্পণ করে বসে আছি দেখছি!
সন্ন্যাসী। ওগো শ্রেষ্ঠী!
শ্রেষ্ঠী। আদেশ করুন।
সন্ন্যাসী। এই লোকটিকে হাজার কার্যাপণ গুণে দাও।
শ্রেষ্ঠী। যে আদেশ।
উপনন্দ। তবে ইনিই কি আমাকে কিনে নিলেন।
সন্ন্যাসী। উনি তোমাকে কিনে নেন ওঁর এমন সাধ্য কী। তুমি আমার।
উপনন্দ। (পা জড়াইয়া ধরিয়া) আমি কোন্ পুণ্য করেছিলেম যে আমার এমন ভাগ্য হল!
সন্ন্যাসী। ওগো সুভূতি!
মন্ত্রী। আজ্ঞা!
সন্ন্যাসী। আমার পুত্র নেই বলে তোমরা সর্বদা আক্ষেপ করতে। এবারে সন্ন্যাসধর্মের জোরে এই পুত্রটি লাভ করেছি।
লক্ষেশ্বর। হায় হায়, আমার বয়স বেশি হয়ে গেছে ব'লে কী সুযোগটাই পেরিয়ে গেল!
মন্ত্রী। বড়ো আনন্দ! তা ইনি কোন্ রাজগৃহে—
সন্ন্যাসী। ইনি যে-গৃহে জন্মেছেন সে-গৃহে জগতের অনেক বড়ো বড়ো বীর জন্মগ্রহণ করেছেন— পুরাণ ইতিহাস খুঁজে সে আমি তোমাকে পরে দেখিয়ে দেব। লক্ষেশ্বর!
লক্ষেশ্বর। কী আদেশ।
সন্ন্যাসী। বিজয়াদিত্যের হাত থেকে তোমার মণিমাণিক্য আমি রক্ষা করেছি, এই তোমাকে ফিরে দিলেম।
লক্ষেশ্বর। মহারাজ, যদি গোপনে ফিরিয়ে দিতেন তা হলেই যথার্থ রক্ষা করতেন, এখন রক্ষা করে কে!
সন্ন্যাসী। এখন বিজয়াদিত্য স্বয়ং রক্ষা করবেন, তোমার ভয় নেই। কিন্তু, তোমার কাছে আমার কিছু প্রাপ্য আছে।
লক্ষেশ্বর। সর্বনাশ করলে!
সন্ন্যাসী। ঠাকুরদা সাক্ষী আছেন।
লক্ষেশ্বর। এখন সকলেই মিথ্যে সাক্ষ্য দেবে।
সন্ন্যাসী। আমাকে ভিক্ষা দিতে চেয়েছিলে। তোমার কাছে এক মুঠো চাল পাওনা আছে। রাজার মুষ্টি কি ভরাতে পারবে?
লক্ষেশ্বর। মহারাজ, আমি সন্ন্যাসীর মুষ্টি দেখেই কথাটা পেড়েছিলেম।
সন্ন্যাসী। তবে তোমার ভয় নেই, যাও।
লক্ষেশ্বর। মহারাজ, ইচ্ছে করেন যদি তবে এইবার কিছু উপদেশ দিতে পারেন।
সন্ন্যাসী। এখনো দেরি আছে।
লক্ষেশ্বর। তবে প্রণাম হই। চার দিকে সকলেই কৌটোটার দিকে বড্ড তাকাচ্ছে।

[প্রস্থান

সন্ন্যাসী। রাজা সোমপাল, তোমার কাছে আমার একটি প্রার্থনা আছে।
সোমপাল। সে কী কথা! সমস্তই মহারাজের, যে আদেশ করবেন—
সন্ন্যাসী। তোমার রাজ্য থেকে আমি একটি বন্দী নিয়ে যেতে চাই।
সোমপাল। যাকে ইচ্ছা নাম করুন, সৈন্য পাঠিয়ে দিচ্ছি। নাহয় আমি নিজেই যাব।
সন্ন্যাসী। বেশি দূরে পাঠাতে হবে না। (ঠাকুরদাদাকে দেখাইয়া) তোমার এই প্রজাটিকে চাই।
সোমপাল। কেবল মাত্র এঁকে! মহারাজ যদি ইচ্ছা করেন তবে আমার রাজ্যে যে শ্রুতিধর

স্মৃতিভূষণ আছেন তাকে আপনাব সভায় নিয়ে যেতে পাবেন।

সন্ন্যাসী। না, অত বড়ো লোককে নিয়ে আমার সুবিধা হবে না, আমি ঐকেই চাই। আমার প্রাসাদে অনেক জিনিস আছে, কেবল বয়সা নেই।

ঠাকুরদাদা। বয়সে মিলবে না প্রভু, গুণেও না ; তবে কিনা ভক্তি দিয়ে সমস্ত অমিল ভরিয়ে তুলতে পারব এই ভরসা আছে।

সন্ন্যাসী। ঠাকুরদা, সময় খারাপ হলে বন্ধুরা পালায়, তাই তো দেখছি। আমার উৎসবের বন্ধুরা এখন সব কোথায় ? রাজদ্বারের গন্ধ পেয়েই দৌড় দিয়েছে নাকি !

ঠাকুরদাদা। কারও পালাবার পথ কি রেখেছ ? আটঘাট ঘিরে ফেলেছ যে। ঐ আসছে।

শেখরের সঙ্গে বালকগণের প্রবেশ

সকলে। সন্ন্যাসী ঠাকুর, সন্ন্যাসী ঠাকুর !

সন্ন্যাসী। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) এসো বাবা, সব এসো।

সকলে। একী ! এ যে রাজা ! আরে পালা, পালা !

পলায়নোদ্যম

ঠাকুরদাদা। আরে পালাস নে ! পালাস নে !

সন্ন্যাসী। তোমরা পালাবে কী, উনিই পালাচ্ছেন। যাও সোমপাল, সভা প্রস্তুত করো গে, আমি যাচ্ছি।

সোমপাল। যে আদেশ।

[প্রস্থান

বালকেরা। আমরা বনে পথে সব জায়গায় গেয়ে গেয়ে এসেছি, এইবার এখানে গান শেষ করি।

শেখর। হাঁ ভাই, তোরা ঠাকুরকে প্রদক্ষিণ করে করে গান গা।

সকলের গান

আমার নয়ন-ভুলানো এলে !
আমি কী হেরিলাম হৃদয় মেলে !
শিউলিতলার পাশে পাশে,
ঝরা ফুলের রাশে রাশে,
শিশির-ভেজা ঘাসে ঘাসে
অরুণরাঙা চরণ ফেলে
নয়ন-ভুলানো এলে !
আলোছায়ার আঁচলখানি
লুটিয়ে পড়ে বনে বনে,
ফুলগুলি ওই মুখে চেয়ে
কী কথা কয় মনে মনে।
তোমায় মোরা করব বরণ,
মুখের ঢাকা করো হরণ,
ওইটুকু ওই মেঘাবরণ
দু-হাত দিয়ে ফেলো ঠেলে !
নয়ন-ভুলানো এলে !

বনদেবীর দ্বারে দ্বারে
শুনি গভীর শঙ্খধ্বনি,
আকাশবীণার তারে তারে
জাগে তোমার আগমনী।
কোথায় সোনার নূপুর বাজে—
বুঝি আমার হিয়ার মাঝে,
সকল ভাবে, সকল কাজে
পাষাণ-গালা সুধা ঢেলে
নয়ন-ভুলানো এলে!

গ্রন্থপরিচয়

বর্তমান রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহে প্রথম খণ্ডে মুদ্রিত নাট্যগ্রন্থগুলির প্রথম সংস্করণ, অন্যান্য বিশেষ সংস্করণ, বর্তমানে স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রচলিত সংস্করণ, রবীন্দ্র-রচনাবলী-সংস্করণ, ইহাদের পার্থক্য সংক্ষেপে ও সাধারণভাবে নির্দেশ করা গেল।

বাল্মীকিপ্রতিভা

'বাল্মীকিপ্রতিভা' ১২৮৭ সালের ফাল্গুনে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। "দ্বিতীয় সংস্করণ" (ফাল্গুন ১২৯২) গ্রন্থের দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পাদটীকায় লিখিত আছে—

"অনেকগুলি গান পরিবর্তিত আকারে অথবা বিশুদ্ধ আকারে কালমৃগয়া গীতিনাট্য হইতে গৃহীত।"

কালমৃগয়া অনেকটা অংশ বাল্মীকিপ্রতিভায় গৃহীত হইয়াছে বলিয়া কালমৃগয়া পরে আর ছাপানো হয় নাই, একথা জীবনস্মৃতিতে উল্লিখিত আছে। কালমৃগয়া হইতে নিম্নোক্ত গানগুলি বাল্মীকিপ্রতিভার দ্বিতীয় সংস্করণে ঈষৎ পরিবর্তিত অথবা যথাযথ আকারে গৃহীত হয়—

আঃ, বেঁচেছি এখন
এনেছি মোরা, এনেছি মোরা
রিম্ ঝিম্ ঘন ঘন রে বরষে
এই বেলা সবে মিলে চলো হো
গহনে গহনে যা রে তোরা
চল্ চল্ ভাই, ত্বরা করে মোরা আগে যাই
কে এল আজি এ ঘোর নিশীথে
প্রাণ নিয়ে তো সটকেছি রে
সর্দারমশাই, দেরি না সয়

দ্বিতীয় সংস্করণে প্রথম সংস্করণের "নিশুম্ভমর্দিনী অম্বে" গানটি বর্জিত হয় ও নিম্নোক্ত গানগুলি নূতন সন্নিবিষ্ট হয়—

সহে না, সহে না, কাঁদে পরান
ওই মেঘ করে বুঝি গগনে
মরি, ও কাহার বাছা
ছাড়ব না ভাই, ছাড়ব না
এত রঙ্গ শিখেছ কোথায়
রাঙাপদপদ্মযুগে
কী দোষে বাঁধিলে আমায়
রাজা মহারাজা কে জানে
আছে তোমার বিদ্যেসাধ্যি জানা
আঃ কাজ কী গোলমালের
অহো, আস্পর্দা একি তোদের

আয় মা, আমার সাথে
কোথায় জুড়াতে আছে ঠাঁই
কেন রাজা, ডাকিস কেন
বলব কী আর বলব খুড়ো
রাখ্‌ রাখ্‌ ফেল ধনু
দেখ্‌ দেখ্‌ দুটো পাখি
নমি নমি ভারতী
শ্যামা, এবার ছেড়ে চলেছি মা
বাণী বীণাপাণি করুণাময়ী

'বাল্মীকিপ্রতিভা'র প্রথম এবং দ্বিতীয় সংস্করণে, গ্রন্থশেষে সরস্বতীর আশিসবচনের পূর্বে বাল্মীকির একটি সরস্বতীর-বন্দনা ছিল ('হৃদয়ে রাখ গো দেবী')। 'গান' গ্রন্থের প্রথম প্রকাশকালে (সেপ্টেম্বর ১৯০৮) উহা বাল্মীকিপ্রতিভা হইতে বর্জিত হয়; বর্তমান গ্রন্থেও নাই। সামান্য আরো দু-একটি পরিবর্তন ব্যতীত, বর্তমান মুদ্রণ দ্বিতীয় সংস্করণের অনুবৃত্তি বলা যায়।

প্রকাশকাল অনুযায়ী 'বাল্মীকিপ্রতিভা' রবীন্দ্রনাথের প্রথম মুদ্রিত নাট্যগ্রন্থ বিবেচনায় রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহে গ্রন্থারম্ভে মুদ্রিত হইল। অবশ্য পাঠ দ্বিতীয় সংস্করণ অনুযায়ী গৃহীত।

রুদ্রচণ্ড

'রুদ্রচণ্ড' কবির প্রথম নাটক (গীতিনাট্য নহে)। ইহা ১৮০৩ শকে [২৫ জুন ১৮৮১] প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৩। 'রুদ্রচণ্ড' পুনর্মুদ্রিত হয় নাই। ইহার দুইটি গান গীতবিতানে তথা স্বরবিতানে সংকলিত; উহার সংক্ষিপ্ত ও সংহত আকারে "ফুলের ইতিহাস" নামে শিশুকাব্যে স্থান পাইয়াছে।

'রুদ্রচণ্ডে'র গান দুইটি ১৩০৩ সালে প্রকাশিত 'কাব্যগ্রন্থাবলী'র "কৈশোরক" অংশে স্থান পাইয়াছিল।

কালমৃগয়া

এই গীতিনাট্য ১২৮৯ সালের অগ্রহায়ণ মাসে [৫ ডিসেম্বর ১৮৮২] প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৩৮। বর্তমানে ইহা তৃতীয় খণ্ড গীতবিতানে পুনর্মুদ্রিত।

'বাল্মীকিপ্রতিভা'র দ্বিতীয় সংস্করণে সন্নিবিষ্ট "অনেকগুলি গান পরিবর্তিত আকারে অথবা বিশুদ্ধ আকারে 'কালমৃগয়া' গীতিনাট্য হইতে গৃহীত।" ২৩ ডিসেম্বর ১৮৮২ (শনিবার) তারিখে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকো-ভবনে 'বিদ্বজ্জনসমাগম' সম্মিলন উপলক্ষে 'কালমৃগয়া' অভিনীত হয়। রবীন্দ্রনাথ অন্ধ মুনি ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দশরথের ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে বলিয়াছেন—

বাল্মীকিপ্রতিভার গান সম্বন্ধে এই নূতন পন্থায় উৎসাহ বোধ করিয়া এই শ্রেণীর আরো একটা গীতিনাট্য লিখিয়াছিলাম। তাহার নাম কালমৃগয়া। দশরথ-কর্তৃক অন্ধমুনির পুত্রবধ তাহার নাট্যবিষয়। তেতলার ছাদে স্টেজ খাটাইয়া ইহার অভিনয় হইয়াছিল— ইহার করুণরসে শ্রোতারা অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছিলেন। পরে, এই গীতিনাট্যের অনেকটা অংশ বাল্মীকিপ্রতিভার সঙ্গে মিশাইয়া দিয়াছিলাম বলিয়া ইহা গ্রন্থাবলীর মধ্যে প্রকাশিত হয় নাই। ...অভিনয়ে

আমিই প্রধান পদ গ্রহণ করিয়াছিলাম।

—প্রথম সংস্করণ, পৃ. ১৩৯, ১৪১

'কালমৃগয়া'র প্রথম তিনটি দৃশ্যের গানগুলি এবং চতুর্থ দৃশ্যের প্রথম তিনটি গান প্রতিভাসুন্দরী দেবী -কৃত স্বরলিপিসহ ১২৯২ সালে শ্রাবণ-ভাদ্র-আশ্বিন-কার্তিক, পৌষ ও মাঘ সংখ্যা 'বালক' পত্রিকায় বাহির হয়।

প্রকৃতির প্রতিশোধ

'প্রকৃতির প্রতিশোধ' ১২৯১ সালে গ্রন্থাকারে প্রকশিত হয়।

প্রকৃতির প্রতিশোধের ভাদ্র ১৩৩৫ সালে প্রকাশিত স্বতন্ত্র সংস্করণে প্রথম সংস্করণের চর্তুদশ দৃশ্যটি নাই। ইহা ছাড়াও অনেক অংশ পরিবর্জিত ও পরিমার্জিত। রবীন্দ্র-রচনাবলী ও নাট্য-সংগ্রহ-ধৃত প্রকৃতির প্রতিশোধ এই ভাদ্র ১৩৩৫ সংস্করণের আধারে।

প্রকৃতির প্রতিশোধের সমসাময়িক 'আলোচনা' (দ্র· রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ-২য়) গ্রন্থে কবি প্রকৃতির প্রতিশোধের অন্তর্নিহিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ('আলোচনা' গ্রন্থ এখন অপ্রচলিত।) জীবনস্মৃতিতে এ-সম্বন্ধে কবি লিখিয়াছেন—

"আলোচনা নাম দিয়া যে ছোটো ছোটো গদ্য প্রবন্ধ বাহির করিয়াছিলাম তাহার গোড়ার দিকেই প্রকৃতির প্রতিশোধের ভিতরকার ভাবটির একটি তত্ত্বব্যাখ্যা লিখিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। সীমা যে সীমাবদ্ধ নহে, তাহা যে অতলস্পর্শ গভীরতাকে এক কণার মধ্যে সংহত করিয়া দেখাইতেছে, ইহা লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে। তত্ত্ব হিসাবে সে ব্যাখ্যার কোনো মূল্য আছে কি না এবং কাব্যহিসাবে প্রকৃতির প্রতিশোধের স্থান কী তাহা জানি না, কিন্তু আজ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, এই একটিমাত্র আইডিয়া অলক্ষ্যভাবে নানা বেশে আজ পর্যন্ত আমার সমস্ত রচনাকে অধিকার করিয়া আসিয়াছে।"

'বঙ্গভাষার লেখক' (১৯১১) গ্রন্থে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

"আমি বালক বয়সে প্রকৃতির প্রতিশোধ লিখিয়াছিলাম ...তাহাতে এই কথা ছিল যে, এই বিশ্বকে গ্রহণ করিয়া, এই সংসারকে বিশ্বাস করিয়া, এই প্রত্যক্ষকে শ্রদ্ধা করিয়া, আমরা যথার্থভাবে অনন্তকে উপলব্ধি করিতে পারি। যে জাহাজে অনন্তকোটি লোক যাত্রা করিয়া বাহির হইয়াছে তাহা হইতে লাফ দিয়া পড়িয়া সাঁতারের জোরে সমুদ্র পার হইবার চেষ্টা সফল হইবার নহে।"

'প্রকৃতির প্রতিশোধ' এর পাঠপঞ্জীকৃত নূতন সংস্করণ (বৈশাখ ১৩৮৪) ও পুলিনবিহারী সেন -প্রণীত রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জী, প্রথম খণ্ড (১৩৮০) গ্রন্থে প্রাসঙ্গিক অন্যান্য তথ্য সংকলিত।

নলিনী

এই নাট্যকাব্যটি ১২৯১ সালে [১০ মে ১৮৮৪] প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৩৬। ইহা পুনর্মুদ্রিত হয় নাই।

নলিনীর আংশিক রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবনে বর্তমান। ইহার আলোচনা হইতে নলিনীর রচনা সম্পর্কে কিছু তথ্যও জানা যায়; দ্রষ্টব্য রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-বিবরণ: নলিনী। বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ ১৩৭৫, পৃ. ১৭৯।

পরবর্তী 'মায়ার খেলা' (১২৯৫) গীতিনাট্যের বিজ্ঞপ্তিতে 'নলিনী'র সহিত উহার সাদৃশ্যের বিষয়ে কবি ইঙ্গিত করিয়াছেন। কিন্তু উল্লেখ করা যায়, 'নলিনী' ও 'ভগ্নহৃদয়'

উভয় রচনারই মূলগত প্রেরণা 'মায়ার খেলা'য় সার্থকভাবে পুনশ্চ সক্রিয় হইয়াছে।

মায়ার খেলা

'মায়ার খেলা' ১২৯৫ সালের অগ্রহায়ণে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণে বিজ্ঞাপন ও তাহার সহিত মুদ্রিত নাট্যের সংক্ষিপ্ত আখ্যায়িকা, পাঠক সাধারণের সুবিধার জন্য রবীন্দ্র-রচনাবলীর ন্যায় নাট্য-সংগ্রহে পুনর্মুদ্রিত হইল। এগুলি প্রচলিত সংস্করণে ছিল না।

প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, 'আমার পূর্বরচিত একটি অকিঞ্চিৎকর গদ্য-নাটিকার সহিত এই গ্রন্থের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে।' এই গদ্য-নাটিকা 'নলিনী' (১২৯১)।

'মায়ার খেলা'র প্রথম ও প্রচল সংস্করণে (গীতবিতান ৩ বা স্বরবিতান ৪৮ -ধৃত) প্রভেদ সামান্য। নাট্য-সংগ্রহতেও রচনাবলীর মতোই 'মায়ার খেলা' গীতবিতান ১৩৩৮ অনুযায়ী মুদ্রিত।

রাজা ও রানী

'রাজা ও রানী' ১২৯৬ সালে শ্রাবণে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণ ও অধুনা প্রচলিত (বিশ্বভারতী পুনর্মুদ্রণ, ১৩৩৪) সংস্করণের মধ্যে কতকগুলি প্রভেদ সাধারণভাবে নির্দেশ করা গেল। স্থানে স্থানে সামান্য পরিবর্তন ব্যতীত, প্রচলিত সংস্করণই নাট্য-সংগ্রহে অনুসৃত হইয়াছে।

প্রথম সংস্করণের প্রথম অঙ্কে পঞ্চম দৃশ্যে "নারায়ণী॥ মিছে না। ঢেঁকির স্বর্গেও সুখ নেই।"— এই ছত্রের পর অতিথির প্রবেশ ও অতিথি (রামচরণ), নারায়ণী ও দেবদত্তের কথোপকথন ছিল। ইহা বর্তমানে নাই।

বর্তমানে দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যের শেষে যে ত্রিবেদীর প্রবেশ ও উক্তি আছে, প্রথম সংস্করণে তাহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দৃশ্য (দ্বিতীয় অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্য) ছিল।

প্রথম সংস্করণের চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য ছিল, জালন্ধর রণক্ষেত্রে বিক্রমদেবের শিবিরদ্বারে সুমিত্রা ও সেনাপতির কথোপকথন। শিবিরপ্রবেশার্থিনী সুমিত্রাকে সেনাপতি বাধা দিতেছেন, ইহাই এই দৃশ্যে বর্ণিত ছিল। এই দৃশ্য বর্তমান সংস্করণে নাই।

প্রথম সংস্করণের পঞ্চম অঙ্কের সপ্তম দৃশ্য ছিল কাশ্মীর প্রাসাদে রেবতী, যুধাজিৎ, প্রহরী ও চন্দ্রসেনের কথোপকথন। কুমারকে বন্দী করিবার উদ্যমে রেবতী যুধাজিৎকে উত্তেজিত করিতেছেন, ইহাই এই দৃশ্যের প্রধান বিষয় ছিল। এই দৃশ্য বর্তমান সংস্করণে নাই।

প্রথম সংস্করণের পঞ্চম অঙ্কের দশম দৃশ্য ছিল কাশ্মীরে বৃদ্ধ করমচাঁদ, হনুমন্ত ও অন্যান্যের কথোপকথন। কুমার কাশ্মীরে ফিরিয়া আসিবেন, বিক্রমজিৎ স্বয়ং তাঁহাকে রাজটিকা পরাইবেন, এইরূপ সংবাদ শুনিয়া স্ত্রীপুরুষ-সাধারণের আনন্দপ্রকাশ ও উৎসবের আয়োজন এই দৃশ্যে বর্ণিত আছে। এই দৃশ্য বর্তমান সংস্করণে নাই।

ইহা ছাড়া অন্যান্য দৃশ্যেও মাঝে মাঝে অংশবিশেষ পরিবর্জিত ও পরিবর্তিত।

রাজা ও রানীর কাহিনী লইয়া কবি উত্তরকালে গদ্যনাট্য 'তপতী' (১৩৩৬) রচনা করেন। তপতীর ভূমিকায় তিনি রাজা ও রানী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"রাজা ও রানী আমার অল্প বয়সের রচনা, সেই আমার প্রথম নাটক লেখার চেষ্টা।

"সুমিত্রা ও বিক্রমের সম্বন্ধের মধ্যে একটি বিরোধ আছে— সুমিত্রার মৃত্যুতে সেই বিরোধের

সমাধা হয়। বিক্রমের যে প্রচণ্ড আসক্তি পূর্ণভাবে সুমিত্রাকে গ্রহণ করবার অন্তরায় ছিল, সুমিত্রার মৃত্যুতে সেই আসক্তির অবসান হওয়াতে সেই শান্তির মধ্যেই সুমিত্রার সত্য-উপলব্ধি বিক্রমের পক্ষে সম্ভব হল, এইটেই রাজা ও রানীর মূলকথা।

"রচনার দোষে এই ভাবটি পরিস্ফুট হয় নি। কুমার ও ইলার প্রেমের বৃত্তান্ত অপ্রাসঙ্গিকতার দ্বারা নাটককে বাধা দিয়েছে এবং নাটকের শেষ অংশে কুমার যে অসংগত প্রাধান্য লাভ করেছে তাতে নাট্যের বিষয়টি হয়েছে ভারগ্রস্ত ও দ্বিধাবিভক্ত। এই নাটকের অন্তিমে কুমারের মৃত্যু-দ্বারা চমৎকার-উৎপাদনের চেষ্টা প্রকাশ পেয়েছে— এই মৃত্যু আখ্যানধারার অনিবার্য পরিণাম নয়।

"অনেক দিন ধরে রাজা ও রানীর ত্রুটি আমাকে পীড়া দিয়েছে। কিছুদিন পূর্বে শ্রীমান গগনেন্দ্রনাথ যখন এই নাটকটি অভিনয়ের উদ্‌যোগ করেন তখন এটাকে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত ও পরিবর্তিত করে একে অভিনয়যোগ্য করবার চেষ্টা করেছিলুম। দেখলুম এমনতরো অসম্পূর্ণ সংস্কারের দ্বারা সংশোধন সম্ভব নয়। তখনই স্থির করেছিলুম এ নাটক আগাগোড়া নূতন করে না লিখলে এর সদ্গতি হতে পারে না। লিখে বইটার সম্বন্ধে আমার সাধ্যমত দায়িত্ব শোধ করেছি।"

তপতী-রচনার কিছুদিন পূর্বে রাজা ও রানী অভিনয়ের জন্য সংক্ষিপ্ত ও পরিবর্তিত করিবার কথা কবি যে উল্লেখ করিয়াছেন, সেই অভিনয়-কালে (১৯২৯) এই সংস্করণের নাম ছিল 'ভৈরবের বলি'। ভৈরবের বলির অভিনয়পত্রীতে উহাকে 'রবীন্দ্রনাথের রাজা ও রানীর কবি-কৃত নূতন সংস্করণ' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সংক্ষেপণ ও পরিবর্তন পাণ্ডুলিপি-আকারে রক্ষিত আছে। সম্প্রতি রাজা ও রানীর পাঠান্তর-সংবলিত সংস্করণে ভৈরবের বলি প্রসঙ্গে বিস্তারিত তথ্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। রাজা ও রানী নাটক সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক অন্যান্য তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য, পাঠান্তর-সংবলিত সংস্করণ রাজা ও রানী (১৩৯৩) এবং পুলিনবিহারী সেন -প্রণীত রবীন্দ্র-গ্রন্থপঞ্জী, প্রথম খণ্ড (১৩৮০)।

বিসর্জন

'বিসর্জন' 'রাজর্ষি' উপন্যাসের প্রথমাংশ হইতে নাট্যাকারে রচিত' ও ১২৯৭ সালে গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়।

১৩০৩ সালে প্রকাশিত 'কাব্যগ্রন্থাবলী'র সংকলনের বিসর্জনের বহুল পরিবর্তন সাধিত হয়; অনেকগুলি দৃশ্য সংক্ষিপ্ত হয়, নূতন-লিখিত কোনো কোনো অংশ যোজিত হয়, কোনো কোনো অংশ পরিবর্তিত হয়, ও কয়েকটি দৃশ্য সম্পূর্ণ বর্জিত হয়। এই-সকল পরিবর্তনের ফলে প্রথম সংস্করণে প্রকটিত অনেকগুলি চরিত্রও সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়, যথা— হাসি, হাসির কাকা কেদারেশ্বর, অপর্ণার অন্ধ পিতা ইত্যাদি।

১৩০৬ সালে বিসর্জনের 'দ্বিতীয় সংস্করণ' প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণের প্রধান পরিবর্তন— পঞ্চম অঙ্কের শেষ দৃশ্যে 'পুষ্প-অর্ঘ্য লইয়া গোবিন্দমাণিক্যের প্রবেশ' ও তৎপরবর্তি অংশের যোজনা।

'কাব্যগ্রন্থাবলী' সংস্করণ ও দ্বিতীয় সংস্করণের উল্লেখযোগ্য অন্য পার্থক্য পঞ্চম অঙ্কের দৃশ্যবিভাগ-গত। 'কাব্যগ্রন্থাবলী' সংস্করণের পঞ্চম অঙ্কের চারিটি স্বতন্ত্র দৃশ্য দ্বিতীয় সংস্করণে দুইটি দৃশ্যে পরিণত হয়; 'কাব্যগ্রন্থাবলী' সংস্করণের পঞ্চম অঙ্কের প্রথম ও চতুর্থ দৃশ্য যুক্ত করিয়া দ্বিতীয় সংস্করণে পঞ্চম অঙ্কের দ্বিতীয় (বা শেষ) দৃশ্য করা হয়; 'কাব্যগ্রন্থাবলী' সংস্করণের পঞ্চম অঙ্কের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দৃশ্য যুক্ত করিয়া দ্বিতীয় সংস্করণে প্রথম দৃশ্য করা হয়। পঞ্চম অঙ্কের এই দৃশ্যবিভাগে প্রচলিত সংস্করণ, রচনাবলী-সংস্করণ এবং নাট্য-

সংগ্রহ-সংস্করণ 'কাব্যগ্রন্থাবলী' সংস্করণেরই অনুরূপ, দ্বিতীয় সংস্করণের শেষ দৃশ্যে নূতন-যোজিত অংশটি প্রচলিত সংস্করণে রচনাবলীতে ও নাট্য-সংগ্রহে মুদ্রিত আছে।

১৩৩৩ সালে বিসর্জনের একটি নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ইহাতে 'প্রথম সংস্করণের অনকেগুলি পরিত্যক্ত অংশ [দৃশ্য চরিত্র ও সংলাপ] পুনরুদ্ধার করা হইয়াছে; এবং ১৩৩০ সালে লেখা সম্পূর্ণ নূতন একটি অংশও যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সেইজন্য [এই] সংস্করণে কবি অঙ্ক ও দৃশ্য বিভাগ সম্পূর্ণ নূতন করিয়া সাজাইয়াছেন।' এই সংস্করণ পরে পরিত্যক্ত হয় এবং 'কাব্যগ্রন্থাবলী' সংস্করণ ও দ্বিতীয় সংস্করণ অবলম্বনে একটি নূতন সংস্করণ (জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮?) প্রকাশিত হয়, উহাই বর্তমানে প্রচলিত।

রবীন্দ্র-রচনাবলী মুদ্রণ কালে প্রচলিত সংস্করণই অনুশৃত হইয়াছিল তবে পুরাতন সংস্করণগুলির সহায়তায় বিভিন্ন স্থানে পাঠসংশোধন করা হইয়াছিল। শেষ দৃশ্যের বিশেষ একটি সংশোধন করা হয় রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপির সাহায্যে। নাট্য-সংগ্রহে রবীন্দ্র-রচনাবলীর পাঠই মুদ্রিত হইল।

বিসর্জনের প্রচলিত (১৩৮১) সংস্করণে গ্রন্থপরিচয় অংশে এই নাটক সম্পর্কে কবির উক্তি যেমন বহুশঃ উদ্ধৃত হইয়াছে, তেমনি ইহার বিভিন্ন-সংস্করণ-গত বৈশিষ্ট্যের বিষয়েও অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত আলোচনা আছে।

চিত্রাঙ্গদা

চিত্রাঙ্গদা ১২৯৯ সালের ২৮ ভাদ্র তারিখে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। এই কাহিনীটি পরবর্তীকালে কবি নৃত্যনাট্যে রূপান্তরিত করেন; তাহা 'নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা' নামে (১৩৪৩) স্বরলিপিসহ প্রচারিত।

প্রথম প্রকাশকালে চিত্রাঙ্গদা অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর -কর্তৃক 'চিত্রাঙ্কিত' হয়, উৎসর্গপত্রে তাহার উল্লেখ আছে। ১৩৭৩ বঙ্গাব্দের ২৮ ভাদ্র এই 'চিত্রাঙ্কিত' সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ হইয়াছে।

দ্বিতীয় সংস্করণে (১৩০১) ও ১৩০৩ সালের কাব্যগ্রন্থাবলী-সংকলনে চিত্রাঙ্গদার স্থানে স্থানে পাঠ পরিবর্তন হইয়াছিল; প্রচলিত স্বতন্ত্র সংস্করণ এই তিনটির কোনো-একটির সম্পূর্ণ অনুরূপ নহে। উল্লিখিত সংস্করণগুলির পাঠ তুলনা করিয়া তাহা হইতে কবির নির্দেশানুযায়ী পাঠ রবীন্দ্র-রচনাবলীর ন্যায় নাট্য-সংগ্রহেও গ্রহণ করা হইয়াছে।

'চিত্রাঙ্গদা'র পাঠভেদ-সংবলিত সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে (১৩০১)। গ্রন্থপরিচয়ে চিত্রাঙ্গদার রচনাকাল, সংস্করণ ও পুনর্মুদ্রণের বিবরণ ও আনুষঙ্গিক তথ্য, পরে পাঠভেদপঞ্জী সংকলিত। চিত্রাঙ্গদার ইংরেজি ভাষান্তর chitra-রচনাকালীন পরিবর্তনের তালিকাও ইহাতে সংযোজিত হইয়াছে।

গোড়ায় গলদ

গোড়ায় গলদ ১২৯৯ সালের ৩১ ভাদ্র তারিখে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। পরবর্তীকালে ইহা 'গদ্যগ্রন্থাবলী'র প্রহসন খণ্ডের অন্তর্গত হয়। বহুকাল পরে গ্রন্থখানি পুর্নলিখিত হইয়া 'শেষরক্ষা' (১৩৩৫) নামে প্রকাশিত হয়।

বিদায় অভিশাপ

বিদায়-অভিশাপ চিত্রাঙ্গদার সহিত একত্র গ্রথিত হইয়া ১৩০১ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

পঞ্চভূত গ্রন্থে 'কাব্যের তাৎপর্য' প্রবন্ধে কবির 'পারিপার্শ্বিক' পঞ্চভূতের জবানিতে বিদায়-অভিশাপের নানারূপ ব্যাখ্যা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে স্রোতস্বিনী মন্তব্য করিতেছেন—

'কচ-দেবযানী-সংবাদেও মানবহৃদয়ের এক অতিচিরন্তন এবং সাধারণ বিষাদকাহিনী বিবৃত আছে, সেটাকে যাঁহারা অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করেন এবং বিশেষ তত্ত্বকেই প্রাধান্য দেন তাঁহারা কাব্যরসের অধিকারী নহেন।'

সর্বশেষে কবি বলিতেছেন—

'এই পর্যন্ত বলিতে পারি, যখন কবিতাটা লিখিতে বসিয়াছিলাম তখন কোনো অর্থই মাথায় ছিল না ; তোমাদের কল্যাণে এখন দেখিতেছি, লেখাটা বড়ো নিরর্থক হয় নাই— অর্থ অভিধানে কুলাইয়া উঠিতেছে না। কাব্যের একটা গুণ এই যে, কবির সৃজনশক্তি পাঠকের সৃজনশক্তি উদ্রেক করিয়া দেয় ; তখন স্ব স্ব প্রকৃতি-অনুসারে কেহ বা সৌন্দর্য, কেহ বা নীতি, কেহ বা তত্ত্ব সৃজন করিতে থাকেন।... তথাপি মোটের উপর শ্রীমতী স্রোতস্বিনীর সহিত আমার মতবিরোধ দেখিতেছি না।'

মালিনী

মালিনী সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় -কর্তৃক প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থাবলীর (আশ্বিন ১৩০৩) অন্তর্গত হইয়া প্রথম প্রকাশিত হয়।

বৈকুণ্ঠের খাতা

বৈকুণ্ঠের খাতা ১৩০৩ সালের চৈত্রে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। পরে গদ্যগ্রন্থাবলীর 'প্রহসন' খণ্ডে 'গোড়ায় গলদ'-এর সহিত মুদ্রিত হয়।

কাহিনী

কাহিনী ১৩০৬ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

কাহিনীর অন্তর্গত 'পতিতা' এবং 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতা দুইটি 'নাট্য' বলিয়া গ্রহণীয় না হওয়ায় নাট্য-সংগ্রহে মুদ্রিত হইল না।

হাস্যকৌতুক

মজুমদার লাইব্রেরি -কর্তৃক প্রকাশিত গদ্যগ্রন্থাবলীর ষষ্ঠ ভাগ রূপে হাস্যকৌতুক ১৩১৪ সালে প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

সংকলিত হেঁয়ালিনাট্যগুলি সমস্তই ১২৯২ সালের 'বালক' মাসিকপত্রে এবং ১২৯৩ ও ১২৯৪ সালের 'ভারতী ও বালক' পত্রে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। নিম্নে কালানুক্রমিক তালিকা

দেওয়া গেল—

রোগের চিকিৎসা	জ্যৈষ্ঠ ১২৯২	আর্য ও অনার্য	চৈত্র ১২৯২
পেটে ও পিঠে	আষাঢ় ১২৯২	সূক্ষ্মবিচার	বৈশাখ ১২৯৩
ছাত্রের পরীক্ষা	শ্রাবণ ১২৯২	অন্ত্যেষ্টিসৎকার	
অভ্যর্থনা	ভাদ্র ১২৯২		ভাদ্র-আশ্বিন ১২৯৩
চিন্তাশীল	আশ্বিন-কার্তিক ১২৯২	আশ্রমপীড়া	কার্তিক ১২৯৩
ভাব ও অভাব	অগ্রহায়ণ ১২৯২	রসিক	ফাল্গুন ১২৯৩
রোগীর বন্ধু	পৌষ ১২৯২	গুরুবাক্য	চৈত্র ১২৯৩
খ্যাতির বিড়ম্বনা	মাঘ ১২৯২	একান্নবর্তী পরিবার	বৈশাখ ১২৯৪

হেঁয়ালিনাট্যের প্রথম-প্রকাশকালে ভূমিকাস্বরূপ বালকপত্রে যাহা মুদ্রিত, এ স্থলে সংকলন করা গেল—

সূর্যের আলো না হইলে গাছ ভালো করিয়া বাড়ে না, আমোদ-প্রমোদ না থাকিলে মানুষের মনও ভালো করিয়া বাড়িতে পারে না।

'আমোদ-প্রমোদ করো' এ কথা যে বলিতে হয় এই আশ্চর্য। কিন্তু আমাদের দেশে এ কথাও বলা আবশ্যক। আমরা হৃদয়-মনের সহিত আমোদ কবিতে জানি না। আমাদের আমোদের মধ্যে প্রফুল্লতা নাই, উল্লাস নাই, উচ্ছ্বাস নাই। তাস পাশা দাবা পরনিন্দা ইহাতে হৃদয়ের বা শরীরের স্বাস্থ্য-সম্পাদন করে না। এ-সকল নিতান্তই বুড়োমি, কুনোমি, কুঁড়েমি। দায়ে পড়িয়া, কাজে পড়িয়া, ভাবনায় পড়িয়া সময়ের প্রভাবে আমরা তো সহজেই বুড়ো হইয়া পড়িতেছি, এজন্য কাহাকেও অধিক আয়োজন করিতে হয় না। ইহার উপরেও যদি খেলার সময়, আমোদের সময়, আমরা ইচ্ছা করিয়া বুড়োমির চর্চা করি, তবে যৌবনকে গলা টিপিয়া বধ করা হয়। যতদিন যৌবন থাকে ততদিন উৎসাহ থাকে, প্রতি মুহূর্তে হৃদয় বাড়িতে থাকে, নূতন নূতন ভাব নূতন নূতন জ্ঞান সহজে গ্রহণ করিতে পারি— নূতন কাজ করিতে অনিচ্ছা বোধ হয় না— বিশ্বসুদ্ধ লোক এবং অনুষ্ঠানের উপর অবিশ্বাস জন্মে না— আশা উদ্যমকে বিসর্জন দিয়া পবম বিজ্ঞ হইয়া তাম্রকূটের ধূম ও পরনিন্দা লইয়া দাওয়ায় বসিয়া একাধিপত্য করিতে ইচ্ছা যায় না। হৃদয়ের যৌবন চলিয়া গেলে হৃদয়ের বৃদ্ধি আব হয় না, শামুকের মতো জড়তার খোলার মধ্যে সংকুচিত হইয়া বাস করিতে হয়, আপনাকে এমনি মস্ত লোক বলিয়া বোধ হয় যে দাম্ভিক নিরুদ্যমে ফুলিয়া উঠিয়া শীতকালের ভেকটি হইয়া বসিয়া থাকি— আর-কোনো লোকের কোনো কাজ দেখিলে অত্যন্ত হাসি আসে।

বিশুদ্ধ আমোদ-প্রমোদ মাত্রকেই আমরা ছেলেমানুষি জ্ঞান করি— বিজ্ঞলোকের, কাজের লোকের পক্ষে সেগুলো নিতান্ত অযোগ্য বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ইহা আমরা বুঝি না যে, যাহারা বাস্তবিক কাজ করিতে জানে তাহারাই আমোদ করিতে জানে। যাহারা কাজ করে না তাহারা আমোদও করে না। ইংরাজেরা কাজ না করিয়া থাকিতে পারে না, আমোদ নহিলেও তাহাদের চলে না। ইংরাজেরা জ্ঞানে বৃদ্ধের মতো, কাজে যুবার মতো, খেলায় বালকের মতো। আসল কথা এই যে, বালকের মতো না খেলিলে যুবার মতো কাজ করা যায় না, যুবার মতো কাজ না করিলে বৃদ্ধের মতো জ্ঞান পাকিয়া উঠে না। ক্ষেত্রেই যেমন শস্য পাকিয়া থাকে, গোলাবাড়িতে পাকে না, তেমনি কার্যক্ষেত্রেই জ্ঞান পাকিয়া থাকে— জড়তার মধ্যে তাম্রকূটের ধোঁয়ায় পাকিয়া

উঠে না। মানুষের মতো মানুষ হইতে গেলে বালক বৃদ্ধ যুবা এই তিনই হইতে হয়। কেবলই বৃদ্ধ হইতে গেলে বিনাশ পাইতে হয়, কেবলই বালক হইতে গেলে উন্নতি হয় না। আমরা বাঙালিরা যদি যথার্থ মহৎ জাতি হইতে চাই তবে আমরা খেলাও করিব, কাজও করিব, চিন্তা করিব। আমরা প্রফুল্ল হইয়া খেলা করিব, উদ্যোগী হইয়া কাজ করিব ও গম্ভীর হইয়া চিন্তা করিব।

ইংরেজদের 'শারাড'-নামক একপ্রকার খেলা আছে, আমরা বাংলায় তাহাকে হেঁয়ালি-নাট্য বলিলাম। তাহার মর্মটা বলিয়া দিই। দুই-তিনজন লোকে ষড়যন্ত্র করিয়া এমন একটা কথা বাহির করিতে হইবে যাহা দুই-তিন ভাগে ভাঙিয়া ফেলা যাইতে পারে। প্রত্যেক ভাগের একটা অর্থ থাকা চাই। মনে করো 'পাগোল' শব্দ। এই শব্দকে পা এবং গোল এই দুই ভাগে ভাগ করিলে প্রত্যেক ভাগের একটা অর্থ পাওয়া যায়। তার পর উপস্থিতমত মুখে মুখে একটা নাটক বানাইয়া লইতে হইবে ; সেই নাটকের মধ্যে কোনো স্থানে কথায় কথায় পা শব্দ এবং গোল শব্দ, এবং পাগল শব্দের সমস্তটা ব্যবহার করিতে হইবে, পরে শ্রোতারা আন্দাজ করিয়া বলিয়া দিবেন কোন্ শব্দ অবলম্বন করিয়া এই নাট্যাভিনয় করা হইল। না বলিতে পারিলে তাঁহাদের হার হইল।

আমরা নিম্নে হেঁয়ালি-নাট্যের একটা উদাহরণ দিতেছি। পাঁচজন কিংবা চারজনে মিলিয়া এই হেঁয়ালি-নাট্য অভিনয় করিবেন, এবং বাকি সকলকে এই নাট্যের মধ্যে প্রচ্ছন্ন শব্দটা বাহির করিয়া দিতে হইবে।

—বালক। জ্যৈষ্ঠ ১২৯২, পৃ· ৮৮-৮৯

ব্যঙ্গকৌতুক

ব্যঙ্গকৌতুক ১৩১৪ সালে গদ্যগ্রন্থাবলীর সপ্তম ভাগ রূপে প্রকাশিত হয়।

নাট্য-সংগ্রহে ব্যঙ্গকৌতুকের নাট্য-ভাগ প্রকাশিত।

ব্যঙ্গকৌতুকের বর্তমানে প্রচলিত সংস্করণে (১৩৪৫) 'স্বর্গে চক্রটেবিল বৈঠক' নামে একটি নূতন রচনা সংকলিত আছে। ইহা প্রথম সংস্করণের বহু পরবর্তী রচনা বলিয়া নাট্য-সংগ্রহে অন্তর্ভূক্ত হয় নাই।

শারদোৎসব

শারদোৎসব ১৩১৫ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

কবি স্বযং বিভিন্ন উপলক্ষে শারদোৎসবের মর্মব্যাখ্যা করিয়াছেন। নিম্নে তাহা সংকলিত হইল।

১৩২৬ সালে শান্তিনিকেতন আশ্রমে শারদোৎসব অভিনয় উপলক্ষে কবি এই নাটকের 'ভিতরের কথাটি' শান্তিনিকেতন পত্রে মুদ্রিত একটি প্রবন্ধে এই ভাবে লিপিবদ্ধ করেন—

আগামী ছুটির পূর্বরাত্রে আশ্রমে শারদোৎসব অভিনয়ের প্রস্তাব হইয়াছে। তাহার আয়োজনও চলিতেছে। শারদোৎসব নাটকটি বিশেষভাবে ছেলেদের উপযোগী করিয়াই তৈরি হইয়াছিল ; তাহার বাহিরের ধারাটি ছেলেদের বুঝিবার পক্ষে কঠিন নহে, কেবল তাহার ভিতরের কথাটি হয়তো ছেলেরা ঠিক বোঝে না।

সমস্ত নাটককে ব্যাপ্ত করিয়া যে ভাবটা আছে সেটা আমাদের আশ্রমের বালকদের পক্ষে সহজ। বিশেষ বিশেষ ফুলে-ফলে হাওয়ায়-আলোকে আকাশে-পৃথিবীতে বিশেষ বিশেষ ঋতুর উৎসব চলিতেছে। সেই উৎসব মানুষ যদি অন্যমনস্ক হইয়া অন্তরের মধ্যে গ্রহণ না করে তবে সে পার্থিব জীবনের একটি বিশুদ্ধ এবং মহৎ আনন্দ হইতে বঞ্চিত হয়। মানুষের সঙ্গে মানুষের নানা কাজে নানা খেলায় মিলনের নানা উপলক্ষ আছে। মিলন ঠিকমত ঘটিলেই, অর্থাৎ তাহা কেবলমাত্র হাটের মেলা বাটের মেলা না হইলে সেই মিলন নিজেকে কোনো-না-কোনো উৎসব-আকারে প্রকাশ করে। আমরা এই সংখ্যার শান্তিনিকেতনে অন্য প্রবন্ধে বলিয়াছি, মিলন যেখানেই ঘটে, অর্থাৎ বহুর ভিতরকার মূল ঐক্যটি যেখানেই ধরা পড়ে, যাহারা বাহিরে পৃথক বলিয়া প্রতীয়মান তাহাদের অন্তরের নিত্য সম্বন্ধ যেখানেই উপলব্ধ হয়, সেখানেই সৃষ্টির অহেতুক অনির্বচনীয় লীলা প্রকাশ পায়। বহুর বিচিত্র ঐক্যসম্বন্ধই সৃষ্টি। মানুষ যেখানে বিচ্ছিন্ন সেখানে তাহার সৃজনকার্য দুর্বল ; সভ্যতা শব্দের অর্থই এই, মানুষের মিলনজাত একটি বৃহৎ জগৎ— এই জগতে ঘরবাড়ি রাস্তাঘাট বিধিব্যবস্থা ধর্মকর্ম শিল্পসাহিত্য আমোদ-আহ্লাদ সমস্তই একটি বিরাট সৃষ্টি। এই সৃজনের মূলশক্তি মানুষের সত্য সম্বন্ধ। মানুষ যেখানে বিচ্ছিন্ন, যেখানে বিরুদ্ধ, সেখানে তাহার সৃজনকার্য নিস্তেজ। সেখানে সে কেবল কলে-চালানো পুতুলের মতো চিরাভ্যাসের পুনরাবৃত্তি করিয়া চলে, আপন জ্ঞান প্রাণ প্রেমকে নব নব আকারে প্রকাশ করে না। মিলনের শক্তিই সৃজনের শক্তি।

মানুষ যদি কেবলমাত্র মানুষের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করিত তবে লোকালয়ই মানুষের একমাত্র মিলনের ক্ষেত্র হইত। কিন্তু মানুষের জন্ম তো কেবল লোকালয়ে নহে, এই বিশাল বিশ্বে তাহার জন্ম। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে তাহার প্রাণের গভীর সম্বন্ধ আছে। তাহার ইন্দ্রিয়বোধের তারে তারে প্রতি মুহূর্তে বিশ্বের স্পন্দন নানা রূপে রসে জাগিয়া উঠিতেছে।

বিশ্বপ্রকৃতির কাজ আমাদের প্রাণের মহলে আপনিই চলিতেছে। কিন্তু মানুষের প্রধান সৃজনের ক্ষেত্র তাহার চিত্তমহলে। এই মহলে যদি দ্বার খুলিয়া আমরা বিশ্বকে আহ্বান করিয়া না লই, তবে বিরাটের সঙ্গে আমাদের পূর্ণ মিলন ঘটে না। বিশ্ব-প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের চিত্তের মিলনের অভাব আমাদের মানবপ্রকৃতির পক্ষে একটা প্রকাণ্ড অভাব।

যে মানুষের মধ্যে সেই মিলন বাধা পায় নাই সেই মানুষের জীবনের তারে তারে প্রকৃতির গান কেমন করিয়া বাজে, ইংরেজ কবি ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ Three Years She Grew নামক কবিতায় অপূর্ব সুন্দর করিয়া বলিয়াছেন। প্রকৃতির সহিত অবাধ মিলনে ল্যুসি'র দেহমন কী অপরূপ সৌন্দর্যে গড়িয়া উঠিবে তাহারই বর্ণনা উপলক্ষে কবি লিখিতেছেন—

'প্রকৃতির নির্বাক্‌ ও নিশ্চেতন পদার্থের যে নিরাময় শান্তি ও নিঃশব্দতা তাহাই এই বালিকার মধ্যে নিশ্বসিত হইবে। ভাসমান মেঘ-সকলের মহিমা তাহারই জন্য এবং তাহারই জন্য উইলো বৃক্ষের অবনম্রতা, ঝড়ের গতির মধ্যে যে একটা শ্রী তাহার কাছে প্রকাশিত তাহারই নীরব আত্মীয়তা আপন অবাধ ভঙ্গিতে এই কুমারীর দেহখানি গড়িয়া তুলিবে। নিশীথরাত্রির তারাগুলি হইবে তাহার ভালোবাসার ধন ; আর, যে-সকল নিভৃতনিলয়ে নির্ঝরিণীগুলি বাঁকে বাঁকে উচ্ছলিত হইয়া নাচিয়া চলে সেইখানে কান পাতিয়া থাকিতে থাকিতে কলধ্বনির মাধুর্যটি তাহার মুখশ্রীর উপরে ধীরে সঞ্চারিত হইতে থাকিবে।'

পূর্বেই বলিয়াছি ফুল ফল ফসলের মধ্যে প্রকৃতির সৃষ্টিকার্য কেবলমাত্র এক-মহলা ; মানুষ যদি তাহার দুই মহলেই আপন সঞ্চয়কে পূর্ণ না করে তবে সেটা তাহার পক্ষে বড়ো লাভ নহে। হৃদয়ের মধ্যে প্রকৃতির প্রবেশের বাধা অপসারিত করিলে তবেই প্রকৃতির সহিত তাহার মিলন সার্থক হয়, সুতরাং সেই মিলনেই তাহার প্রাণমন বিশেষ শক্তি বিশেষ পূর্ণতা লাভ করে।

মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের উৎসব ঘরে ঘরে বারে বারে ঘটিতেছে। কিন্তু প্রকৃতির সভায় ঋতু-উৎসবের নিমন্ত্রণ যখন গ্রহণ করি তখন আমাদের মিলন আরো অনেক বড়ো হইয়া উঠে। তখন আমরা আকাশ-বাতাস গাছপালা পশুপক্ষী সকলের সঙ্গে মিলি ; অর্থাৎ, যে প্রকৃতির মধ্যে আমরা মানুষ তাহার সঙ্গে সত্য সম্বন্ধ আমরা অন্তরের মধ্যে স্বীকার করি। সেই স্বীকার কখনোই নিষ্ফল নহে। কারণ পূর্বেই বলিয়াছি, সম্বন্ধেই সৃষ্টির প্রকাশ। প্রকৃতির মধ্যে যখন কেবল আছি মাত্র তখন তাহা না থাকারই শামিল, কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের প্রাণমনের সম্বন্ধ-অনুভবেই আমরা সৃজনক্রিয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্য লাভ করি ; চিত্তের দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিলে আপনার মধ্যে এই সৃজনশক্তিকে কাজ করিবার বাধা দেওয়া হয়।

তাই নব ঋতুর অভ্যুদয়ে যখন সমস্ত জগৎ নূতন রঙের উত্তরীয় পরিয়া চারি দিক হইতে সাড়া দিতে থাকে তখন মানুষের হৃদয়কেও সে আহ্বান করে— সেই হৃদয়ে যদি কোনো রঙ না লাগে, কোনো গান না জাগিয়া উঠে, তাহা হইলে মানুষ সমস্ত জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে।

সেই বিচ্ছেদ দূর করিবার জন্য আমাদের আশ্রমে আমরা প্রকৃতির ঋতু-উৎসবগুলিকে নিজেদের মধ্যে স্বীকার করিয়া লইয়াছি। শারদোৎসব সেই ঋতু-উৎসবেরই নাটকের পালা। নাটকের পাত্রগণের মধ্যে এই উৎসবের বাধা কে ? লক্ষেশ্বর— সেই বণিক আপনার স্বার্থ লইয়া, টাকা উপার্জন লইয়া, সকলকে সন্দেহ করিয়া, ভয় করিয়া, ঈর্ষা করিয়া সকলের কাছ হইতে আপনার সমস্ত সম্পদ গোপন করিয়া বেড়াইতেছে। এই উৎসবের পুরোহিত কে ? সেই রাজা যিনি আপনাকে ভুলিয়া সকলের সঙ্গে মিলিতে বাহির হইয়াছেন, লক্ষ্মীর সৌন্দর্যের শতদল পদ্মটিকে যিনি চান। সেই পদ্ম যে চায়, সোনাকে সে তুচ্ছ করে ; লোভকে সে বিসর্জন দেয় বলিয়াই লাভ সহজ হইয়া সুন্দর হইয়া তাহার হাতে আপনি ধরা দেয়।

কিন্তু এই যে সুন্দরকে খুঁজিবার কথা বলা হইল সে কী ? সে কোথায় ? সে কি একটা পেলব সামগ্রী, একটা শৌখিন পদার্থ ? এই কথারই উত্তরটি এই নাটকের মাঝখানে রহিয়াছে।

শারদোৎসবের ছুটির মাঝখানে বসিয়া উপনন্দ তার প্রভুর ঋণ শোধ করিতেছে ; রাজসন্ন্যাসী এই প্রেমঋণ পরিশোধের, এই অক্লান্ত আত্মোৎসর্গের সৌন্দর্যটি দেখিতে পাইলেন। তাঁর তখনই মনে হইল, শারদোৎসবের মূল অর্থটি এই ঋণশোধের সৌন্দর্য। শরতে এই যে নদী ভরিয়া উঠিল কূলে কূলে, এই যে খেত ভরিয়া উঠিল শস্যের ভারে, ইহার মধ্যে একটি ভাব আছে, সে এই : প্রকৃতি আপনার ভিতরে যে অমৃতশক্তি পাইয়াছে সেটাকে বাহিরে নানা রূপে নানা রসে শোধ করিয়া দিতেছে। সেই শোধ করাটাই প্রকাশ। প্রকাশ যেখানে সম্পূর্ণ হয় সেইখানেই ভিতরের ঋণ বাহিরে ভালো করিয়া শোধ করা হয় ; সেই শোধের মধ্যেই সৌন্দর্য।

দেবতা আপনাকেই কি মানুষের মধ্যে দেন নাই ? সেই দানকে যখন অক্লান্ত তপস্যার অকৃপণ ত্যাগের দ্বারা মানুষ শোধ করিতে থাকে তখনই দেবতা তাহার মধ্য হইতে আপনার দান অর্থাৎ আপনাকে নূতন আকারে ফিরিয়া পান, আর তখনই কি তাহার মনুষ্যত্ব সম্পূর্ণ হইয়া উঠে না ? সেই প্রকাশ যতই বাধা কাটাইয়া উঠিতে থাকে ততই কি তাহা সুন্দর উজ্জ্বল হয় না ? বাধা কোথায় কাটে না ? যেখানে আলস্য, যেখানে বীর্যহীনতা, যেখানে আত্মাবমাননা। যেখানে মানুষ জ্ঞানে প্রেমে কর্মে দেবতা হইয়া উঠিতে সর্বপ্রযত্নে প্রয়াস না পায় সেখানে নিজের মধ্যে সে দেবত্বের ঋণ অস্বীকার করে। যেখানে ধনকে সে আঁকড়িয়া থাকে, স্বার্থকেই চরম আশ্রয় বলিয়া মনে করে, সেখানে দেবতার ঋণকে সে নিজের ভোগে লাগাইয়া একেবারে ফুঁকিয়া দিতে চায়— তাহাকে যে অমৃত দেওয়া হইয়াছিল, যে অমৃতের উপলব্ধিতে মৃত্যুকে তুচ্ছ করিতে পারে, ক্ষতিকে অবজ্ঞা করিতে পারে, দুঃখকে গলার হার করিয়া লয়, জীবনের প্রকাশের মধ্য দিয়া সেই অমৃতকে তখন সে শোধ করিয়া দেয় না। বিশ্বপ্রকৃতিতে ও মানবপ্রকৃতিতে এই অমৃতের

প্রকাশকেই বলে সৌন্দর্য : আনন্দরূপমমৃতম্।

রাজসন্ন্যাসী উপনন্দকে দেখাইয়া দিয়া বলিয়াছেন, এই ঋণশোধেই যথার্থ ছুটি, যথার্থ মুক্তি। নিজের মধ্যে অমৃতের প্রকাশ যতই সম্পূর্ণ হইতে থাকে ততই বন্ধন মোচন হয়; কর্মকে এড়াইয়া, তপস্যায় ফাঁকি দিয়া, পরিত্রাণলাভ হয় না। তাই তিনি উপনন্দকে বলিয়াছেন, 'তুমি পঙ্‌ক্তির পর পঙ্‌ক্তি লিখছ আর ছুটির পর ছুটি পাচ্ছ।'

এই লইয়া সন্ন্যাসীতে ঠাকুরদাদাতে যে কথাবার্তা হইয়াছে নীচে তাহা উদ্‌ধৃত করিলাম—

সন্ন্যাসী। আমি অনেক দিন ভেবেছি জগৎ এমন আশ্চর্য সুন্দর কেন ?... আজ স্পষ্ট প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি— জগৎ আনন্দের ঋণ শোধ করছে। বড়ো সহজে করছে না, নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে সমস্ত ত্যাগ ক'রে করছে।... কোথাও সাধনার এতটুকু বিশ্রাম নেই, সেইজন্যেই এত সৌন্দর্য।

ঠাকুরদাদা। এক দিকে অনন্ত ভাণ্ডার থেকে তিনি কেবলই ঢেলে দিচ্ছেন আর-এক দিকে কঠিন দুঃখে তারই শোধ চলছে।... এই দুঃখের জোরেই পাওয়ার সঙ্গে দেওয়ার ওজন বেশ সমান থেকে যাচ্ছে, মিলনটি সুন্দর হয়ে উঠেছে।

সন্ন্যাসী। ঠাকুর্দা, যেখানে আলস্য, যেখানে কৃপণতা, যেখানেই ঋণশোধে ঢিল পড়ে যাচ্ছে, সেইখানেই সমস্ত কুশ্রী...

ঠাকুরদাদা। সেইখানেই যে এক পক্ষে কম পড়ে যায়, অন্য পক্ষের সঙ্গে মিলন পুরো হতে পায় না।

সন্ন্যাসী। লক্ষ্মী যখন মানবের মর্তলোকে আসেন তখন দুঃখিনী হয়েই আসেন; তাঁর সেই তপস্বিনীরূপেই ভগবান মুগ্ধ। শত দুঃখের দলে তাঁর পদ্ম সংসারে ফুটেছে।[১]

লক্ষ্মী সৌন্দর্য ও সম্পদের দেবী; গৌরী যেমন তপস্যা করিয়া শিবকে পাইয়াছিলেন, মর্তলোকে লক্ষ্মীও তেমনি দুঃখের সাধনার দ্বারাই ভগবানের সহিত মিলন লাভ করেন। যে মানুষ বা যে জাতির মধ্যে এই ত্যাগ নাই, তপস্যা নাই, দুঃখস্বীকারের জড়তা, সেখানে লক্ষ্মী নাই, সুতরাং সেখানে ভগবানের প্রেম আকৃষ্ট হয় না।

উপনন্দ তাহার প্রভুর নিকট হইতে প্রেম পাইয়াছিল, ত্যাগস্বীকারের দ্বারা প্রতিদানের পথ বাহিয়া সে যতই সেই প্রেমদানের সমান ক্ষেত্রে উঠিতেছে ততই সে মুক্তির আনন্দ উপলব্ধি করিতেছে। দুঃখই তাহাকে এই আনন্দের অধিকারী করে; ঋণের সহিত ঋণশোধের বৈষম্যই বন্ধন এবং তাহাই কুশ্রীতা।

—শান্তিনিকেতন পত্র। আশ্বিন ও কার্তিক ১৩২৬

শারদোৎসবের 'ভিতরকার ধুয়ো' সম্বন্ধে সবুজ পত্রে 'আমার ধর্ম' প্রবন্ধে কবি লিখিয়াছেন—

শারদোৎসব থেকে আরম্ভ করে ফাল্গুনী পর্যন্ত যতগুলি নাটক লিখেছি, যখন বিশেষ করে মন দিয়ে দেখি তখন দেখতে পাই প্রত্যেকের ভিতরকার ধুয়োটা ঐ একই। রাজা বেরিয়েছেন সকলের সঙ্গে মিলে শারদোৎসব করবার জন্যে। তিনি খুঁজছেন তাঁর সাথি। পথে দেখলেন ছেলেরা শরৎপ্রকৃতির আনন্দে যোগ দেবার জন্যে উৎসব করতে বেরিয়েছে। কিন্তু একটি ছেলে ছিল— উপনন্দ— সমস্ত খেলাধুলো ছেড়ে সে তার প্রভুর ঋণ শোধ করবার জন্যে নিভৃতে বসে একমনে কাজ করছিল। রাজা বললেন, তাঁর সত্যকার সাথি মিলেছে, কেননা ঐ ছেলেটির সঙ্গেই শরৎপ্রকৃতির সত্যকার আনন্দের যোগ: ঐ ছেলেটি দুঃখের সাধনা দিয়ে আনন্দের ঋণ শোধ করছে সেই দুঃখেরই রূপ মধুরতম। বিশ্বই যে এই দুঃখ-তপস্যায় রত অসীমের যে দান সে নিজের মধ্যে পেয়েছে, অশ্রান্ত প্রয়াসের বেদনা দিয়ে সেই দানের সে শোধ করছে।

১ কবি-কর্তৃক মূল নাটকের কয়েকটি বাক্য বর্জিত; সংকলিত অংশেও সামান্য পাঠভেদ আছে

প্রত্যেক ঘাসটি নিরলস চেষ্টার দ্বারা আপনাকে প্রকাশ করছে. এই প্রকাশ করতে গিয়েই সে আপন অন্তর্নিহিত সত্যের ঋণ শোধ করছে ; এই-যে নিরন্তর বেদনায় তার আত্মোৎসর্জন, এই দুঃখই তো তার শ্রী, এই তো তার উৎসব, এতেই তো সে শরৎপ্রকৃতিকে সুন্দর করেছে, আনন্দময় করেছে। বাইরে থেকে দেখলে একে খেলা মনে হয়, কিন্তু এ তো খেলা নয়, এর মধ্যে লেশমাত্র বিরাম নেই। যেখানে আপন সত্যের ঋণশোধে শৈথিল্য সেখানেই প্রকাশে বাধা, সেইখানেই কদর্যতা, সেইখানেই নিরানন্দ। আত্মার প্রকাশ আনন্দময়, এইজন্যেই সে দুঃখকে মৃত্যুকে স্বীকার করতে পারে ; ভয়ে কিংবা আলস্যে কিংবা সংশয়ে এই দুঃখের পথকে যে লোক এড়িয়ে চলে জগতে সেই আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়। শারদোৎসবের ভিতরকার কথাটাই এই— ও তো গাছতলায় বসে বসে বাঁশির সুর শোনবার কথা নয়।

—সবুজ পত্র। আশ্বিন ও কার্তিক ১৩২৪

ভানুসিংহের পত্রাবলীতে প্রকাশিত একটি চিঠিতে (২৮ ভাদ্র ১৩২৯) কবি শারদোৎসব সম্বন্ধে লিখিতেছেন—

ওটা হচ্ছে ছুটির নাটক। ওর সময়ও ছুটির, ওর বিষয়ও ছুটির। রাজা ছুটি নিয়েছে রাজত্ব থেকে, ছেলেরা ছুটি নিয়েছে পাঠশালা থেকে। তাদের আর-কোনো মহৎ উদ্দেশ্য নেই কেবল একমাত্র হচ্ছে— 'বিনা কাজে বাজিয়ে বাঁশি কাটবে সকল বেলা'। ওর মধ্যে একটা উপনন্দ কাজ করছে, কিন্তু সেও তার ঋণ থেকে ছুটি পাবার কাজ।

—ভানুসিংহের পত্রাবলী। পত্রসংখ্যা ৫২

১৩২৯ ভাদ্রে কলিকাতায় শারদোৎসব-অভিনয়ের সময় উহার একটি 'ভূমিকা' কবি রচনা করেন। অভিনয়পত্রী হইতে নিম্নে তাহা যথাযথ মুদ্রিত হইল—

শারদোৎসবের

ভূমিকা

রাজা। আমাদের সব প্রস্তুত তো ?

মন্ত্রী। হাঁ মহারাজ, এক রকম প্রস্তুত, কিন্তু—

রাজা। কিন্তু ! কিন্তু আবার কিসের ! আমাদের শারদ-উৎসবের ভিতরেও কিন্তু এসে পড়ে ! এ তো রাষ্ট্রনীতি নয়।

মন্ত্রী। উৎসবের আয়োজনের মধ্যে একটি কবি আছেন যে, কাজেই কিন্তুর অভাব হয় না।

রাজা। আমাদের কবিশেখরের কথা বলছ ? তা, তাঁর উপরে তো ভার ছিল উৎসব উপলক্ষে একটা যাত্রার পালা তৈরি করবার জন্যে।

মন্ত্রী। আপনি তো তাঁকে জানেন ; সুবিধা অসুবিধা, স্থান কাল পাত্র, এ-সবের দিকে তাঁর একেবারেই দৃষ্টি নেই। তিনি আপন খেয়ালমতই চলেন।

রাজা। তা, হয়েছে কী ? লোকটা পালিয়েছে নাকি ?

মন্ত্রী। এক রকম পালানোই বৈকি। সভাপণ্ডিত-মশায় ঠিক করে দিয়েছিলেন, এবারকার উৎসবের জন্যে শুম্ভনিশুম্ভ-বধের পালা তৈরি করে দিতে হবে। এ কথা হয়েছিল সেই মহাদ্বাদশীর দিনে। কাল শুনি কবি সে পালা তৈরিই করে নি।

রাজা। কী সর্বনাশ ! এ মানুষকে নিয়ে দেখছি আর চলল না। সখা, তুমি কেনারাম পাঁচালিওয়ালার উপর ভার দিলে না কেন, তা হলে তো এ বিভ্রাট ঘটত না। পুরবাসীরা সবাই এসে জুটেছেন, এখন উপায় ?

মন্ত্রী। কবি বলছেন, তিনি তাঁর মনের মতো ছোটো একটা পালা লিখেছেন।

রাজা। তাতে আছে কী?

মন্ত্রী। তা তো বলতে পারি নে। সংক্ষেপে যা বর্ণনা করলেন তাতে ভাবটা কিছুই বুঝতে পারলেম না। বললেন যে, সেটা গানেতে গন্ধেতে রঙেতে রসেতে মিশিয়ে একটা কিছুই-না গোছের জিনিস।

রাজা। কিছুই-না গোছের জিনিস! এ কি পরিহাস নাকি?

মন্ত্রী। শুধু পরিহাস নয় মহারাজ, এ দুর্দৈব।

রাজা। তাতে গল্প কিছু আছে?

মন্ত্রী। নেই বললেই হয়!

রাজা। যুদ্ধ?

মন্ত্রী। না।

রাজা। কোনো রকমের রক্তপাত?

মন্ত্রী। না।

রাজা। আত্মহত্যা? পতন ও মূর্ছা?

মন্ত্রী। একেবারেই না।

রাজা। আদিরস? বীররস? করুণরস?

মন্ত্রী। না, কোনোটাই না। কবি বলেন, তিনি যা রচনা করেছেন তা শরৎকালের উপযোগী খুব হালকা রকমের ব্যাপার। তার মধ্যে ভার একটুও নেই।

রাজা। তাকে শরৎকালের উপযোগী বলবার মানে কী হল?

মন্ত্রী। কবি বলেন, শরৎকালের মেঘ যে হালকা, তার কোনো প্রয়োজন নেই, তার জলভার নেই, সে নিঃসম্বল সন্ন্যাসী।

রাজা। এ কথা সত্য বটে।

মন্ত্রী। কবি বলেন, শরৎকালের শিউলিফুলের মধ্যে যেন কোনো আসক্তি নেই, যেমন সে ফোটে তেমনি সে ঝরে পড়ে।

রাজা। এ কথা মানতে হয়।

মন্ত্রী। কবি বলেন, শরৎকালের কাশের স্তবক না বাগানের না বনের; সে হেলাফেলায় মাঠে ঘাটে নিজের অকিঞ্চনতার ঐশ্বর্য বিস্তার করে বেড়াচ্ছে। সে সন্ন্যাসী।

রাজা। এ কথা কবি বেশ বলেছে।

মন্ত্রী। কবি বলেন, শরতে কাঁচা ধানের যে খেত দেখি কেবল আছে তার রঙ, কেবল আছে তার দোলা। আর-কোনো দায় যদি তার থাকে সে কথা সে একেবারে লুকিয়েছে।

রাজা। ঠিক কথা।

মন্ত্রী। তাই কবি বলেন, তাঁর শারদোৎসবের যে পালা সে ওই রকমই হালকা, ওই রকমই নিরর্থক। সে পালায় কাজের কথা নেই, সে পালায় আছে ছুটির খুশি।

রাজা। বাঃ, এ তো মন্দ শোনাচ্ছে না। ওর মধ্যে রাজা কেউ আছে?

মন্ত্রী। একজন আছেন। কিন্তু তিনি কিছু দিনের জন্যে রাজত্ব থেকে ছুটি নিয়ে সন্ন্যাসীবেশে মাঠে ঘাটে বিনা কাজে দিন কাটিয়ে বেড়াচ্ছেন।

রাজা। বাঃ বাঃ, শুনে লোভ হয় যে। আর কে আছে?

মন্ত্রী। আর আছে সব ছেলের দল।

রাজা। ছেলের দল! তাদের নিয়ে কী হবে?

মন্ত্রী। কবি বলেন, ওই ছেলেদের প্রাণের মধ্যেই তো আসল ছুটির চেহারা। ওরা কাঁচা ধানের খেতের মতোই নিজে না জেনে, কাউকে না জানিয়ে, ছুটির ভিতরেই ফসলের আয়োজন করছে।

রাজা। তা, ওই ছেলের দলকে ভালো করে শেখানো হয়েছে?

মন্ত্রী। একেবারেই না।

রাজা। কী সর্বনাশ! তা হলে—

মন্ত্রী। কবি বলেন, বুড়োরা ছেলেদের যদি শেখাতে যায় তা হলে তো ছেলেরা পেকে যাবে— ছেলেই থাকবে না। সেইজন্যে ওদের নাট্য শেখানোই হয় নি। কবি বলেন, সহজে খুশি হবার বিদ্যে ওদের কাছ থেকে আমরাই শিখব।

রাজা। কিন্তু, মন্ত্রী, সহজে খুশি হবার বিদ্যে তো পুরবাসীদের বিদ্যা নয়। এই-সব হালকা এই-সব কাঁচা, এই-সব না-শেখা ব্যাপারের মূল্য কি তাদের কাছে আছে?

মন্ত্রী। সে কথা আমি কবিকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম। তিনি বললেন, ওজন যার কিছু নেই তার আবার মূল্য কিসের? হেমন্তের পাকা ধানেরই মূল্য আছে, ভাদ্রের কাঁচা খেতের আবার মূল্য কী? একটুখানি হাসি, একটুখানি খুশি, এই হলেই দেনাপাওনা চুকে যাবে।

রাজা। আচ্ছা বেশ, শুম্ভনিশুম্ভ তা হলে এখন থাক— আসুক ছেলের দল, আসুক সন্ন্যাসীবেশে রাজা। তা হলে কবিকে একবার ডেকে দাও-না, তার সঙ্গে একবার কথা কয়ে নিই।

মন্ত্রী। তাঁকে ডাকব কি মহারাজ, তিনি নিজেই যে এই পালায় সাজছেন।

রাজা। বল কী, তার শিক্ষা হল কোথায়?

মন্ত্রী। তার শিক্ষা হয়ই নি।

রাজা। তবে? সে কি হাত পা নেড়ে, গলা ছেড়ে দিয়ে আসর জমাতে পারবে? সে যে আনাড়ি।

মন্ত্রী। পাছে যারা হাত পা নাড়তে শিক্ষা পেয়েছে তাদের ডাকা হয় এই ভয়েই সে নিজেই সন্ন্যাসী সাজবার ভার নিয়েছে। সে বলে, পালার বিষয়টা যেমন অনর্থক— পালার নটের দলও তেমনি অশিক্ষিত।

রাজা। তা, এ নিয়ে এখন পরিতাপ করে কোনো লাভ নেই। তা হলে আরম্ভ করে দাও। একটা সুবিধে এই যে, বেশি-কিছু আশা করব না, সুতরাং বেশি-কিছু নৈরাশ্যের আশঙ্কা থাকবে না। গোড়ায় একটা গান হবে তো?

মন্ত্রী। হবে বৈকি। এই যে, গানের দল আপনার পাশেই বসে।

—অনুষ্ঠানপত্র। শারদোৎসব। ভাদ্র ১৩২৯

শান্তিনিকেতনে শারদোৎসবের প্রথম অভিনয় (১৩১৫) উপলক্ষে কবি এই নাটকের জন্য একটি নান্দী রচনা করিয়াছিলেন। উহা গ্রন্থে মুদ্রিত হয় নাই, নিম্নে সংকলিত হইল—

শরতে হেমন্তে শীতে বসন্তে নিদাঘে বরষায়
অনন্ত সৌন্দর্যধারে যাঁহার আনন্দ বহি যায়
সেই অপরূপ, সেই অরূপ, রূপের নিকেতন
নব নব ঋতুরসে ভ'রে দিন সবাকার মন।
প্রফুল্ল শেফালিকুঞ্জ যাঁর পায়ে ঢালিছে অঞ্জলি,
কাশের মঞ্জরীরাশি যাঁর পানে উঠিছে চঞ্চলি—
স্বর্ণদীপ্তি আশ্বিনের স্নিগ্ধ হাস্যে সেই রসময়

নির্মল শারদরূপে কেড়ে নিন সবার হৃদয়।

—ভারতী। কার্তিক ১৩১৫, পৃ. ৩৩৫

শারদোৎসব নানা স্থানে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হইয়া, নূতন ভূমিকা ও চরিত্র লইয়া, ১৩২৮ আশ্বিনের পূর্বে 'ঋণশোধ' নাটকে রূপান্তরিত হয়। ঋণশোধ রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহে (প্রথম খণ্ড) সংকলিত হয়েছে; বর্তমানে স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রচলিত নাই।

মুকুট

মুকুট ১৯০৮ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার যে কয়টি গল্পের নাট্যরূপ দিয়াছেন 'মুকুট' তাহার মধ্যে প্রথম। 'ক্ষুদ্র উপন্যাস' বলিয়া কথিত এই গল্প ১২৯২ বঙ্গাব্দের 'বালক' পত্রে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল।

প্রায়শ্চিত্ত

'প্রায়শ্চিত্ত' ১৩১৬ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। 'প্রায়শ্চিত্ত' পরে পুনর্লিখিত হইয়া 'পরিত্রাণ' (১৩৩৬) নামে প্রকাশিত। 'পরিত্রাণ' রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহে সংকলিত হয়েছে।

রাজা

'রাজা' ১৩১৭ সালের পৌষ মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। পরবর্তী সংস্করণের সূচনায় জানানো হয়—

এই 'রাজা' প্রথমে খাতায় যেমনটি লিখিয়াছিলাম তাহার কতকটা কাটিয়া ছাঁটিয়া বদল করিয়া [প্রথম সংস্করণ] ছাপানো হইয়াছিল। হয়তো তাহাতে কিছু ক্ষতি হইয়া থাকিবে এই আশঙ্কা করিয়া সেই মূল লেখাটি অবলম্বন করিয়া বর্তমান সংস্করণ ছাপানো হইল।

—লেখকের নিবেদন। রাজা

এই 'বর্তমান সংস্করণ'ই (চৈত্র ১৩২৭) এখন প্রচলিত, রবীন্দ্র-রচনাবলীর মতোই নাট্য-সংগ্রহেও পুনর্মুদ্রিত হইল।

রাজা অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ পরে অন্যান্য নাটকাদি লিখিয়াছেন।

অরূপরতন (মাঘ ১৩২৬) 'নাট্যরূপকটি রাজা নাটকের অভিনয়যোগ্য সংক্ষিপ্ত সংস্করণ—নূতন করিয়া পুনর্লিখিত।'

'যে বৌদ্ধ আখ্যান অবলম্বন করে রাজা নাটক রচিত[১] তারই আভাসে শাপমোচন কথিকাটি রচনা করা হল' (পৌষ ১৩৩৮)।

উত্তর কালে রবীন্দ্রনাথ রাজা নাটকটির পুনর্লিখনে পুনরায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ হয় নাই— পাণ্ডুলিপি-আকারে রবীন্দ্রসদনে সংরক্ষিত আছে।

'আমার ধর্ম'[২] প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গক্রমে রাজা নাটকের সম্পর্কে এরূপ আলোচনা করিয়াছেন—

১ দ্রষ্টব্য, Rajendralal Mitra, "Story of Kusa *The Sanskrit Buddhist Story of Nepal*, pp 142-45

২ 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থের তৃতীয় প্রবন্ধ ; দ্র রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৭ (সুলভ সংস্করণ ১৪)।

'রাজা' নাটকে সুদর্শনা আপন অরূপ রাজাকে দেখতে চাইলে, রূপের মোহে মুগ্ধ হয়ে ভুল রাজার গলায় দিলে মালা, তার পরে সেই ভুলের মধ্যে দিয়ে পাপের মধ্যে দিয়ে যে অগ্নিদাহ ঘটালে, যে বিষম যুদ্ধ বাধিয়ে দিলে, অন্তরে বাহিরে যে ঘোর অশান্তি জাগিয়ে তুললে, তাতেই তো তাকে সত্যমিলনে পৌঁছিয়ে দিলে। প্রলয়ের মধ্যে দিয়ে সৃষ্টির পথ। তাই উপনিষদে আছে তিনি তাপের দ্বারা তপ্ত হয়ে এই সমস্ত-কিছু সৃষ্টি করলেন। আমাদের আত্মা যা সৃষ্টি করছে তাতে পদে পদে ব্যথা। কিন্তু তাকে যদি ব্যথাই বলি তবে শেষ কথা বলা হল না ; সেই ব্যথাতেই সৌন্দর্য, তাতেই আনন্দ।

—সবুজপত্র। আশ্বিন-কার্তিক ১৩২৪

অরূপরতনের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

সুদর্শনা রাজাকে বাহিরে খুঁজিয়াছিল। যেখানে বস্তুকে চোখে দেখা যায়, হাতে ছোঁওয়া যায়, ভাণ্ডারে সঞ্চয় করা যায়, যেখানে ধনজনখ্যাতি, সেইখানে সে বরমাল্য পাঠাইয়াছিল। বুদ্ধির অভিমানে সে নিশ্চয় স্থির করিয়াছিল যে, বুদ্ধির জোরে সে বাহিরেই জীবনের সার্থকতা লাভ করিবে। তাহার সঙ্গিনী সুরঙ্গমা তাহাকে নিষেধ করিয়াছিল। বলিয়াছিল, অন্তরের নিভৃত কক্ষে যেখানে প্রভু স্বয়ং আসিয়া আহ্বান করেন সেখানে তাঁহাকে চিনিয়া লইলে তবেই বাহিরে সর্বত্র তাঁহাকে চিনিয়া লইতে ভুল হইবে না ; নহিলে যাহারা মায়ার দ্বারা চোখ ভোলায় তাহাদিগকে রাজা বলিয়া ভুল হইবে। সুদর্শনা এ কথা মানিল না। সে সুবর্ণের রূপ দেখিয়া তাহার কাছে মনে মনে আত্মসমর্পণ করিল। তখন কেমন করিয়া তাহার চারি দিকে আগুন লাগিল, অন্তরের রাজাকে ছাড়িতেই কেমন করিয়া তাহাকে লইয়া বাহিরের নানা মিথ্যা-রাজার দলে লড়াই বাধিয়া গেল— সেই অগ্নিদাহের ভিতর দিয়া কেমন করিয়া আপন রাজার সহিত তাহার পরিচয় ঘটিল, কেমন করিয়া দুঃখের আঘাতে তাহার অভিমান ক্ষয় হইল এবং অবশেষে কেমন করিয়া হার মানিয়া প্রাসাদ ছাড়িয়া পথে দাঁড়াইয়া তবে সে তাহার সেই প্রভুর সঙ্গলাভ করিল, যে প্রভু কোনো বিশেষ রূপে বিশেষ স্থানে বিশেষ দ্রব্যে নাই, যে প্রভু সকল দেশে সকল কালে, আপন অন্তরের আনন্দরসে যাঁহাকে উপলব্ধি করা যায়— এ নাটকে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

—অরূপরতন। মাঘ ১৩২৬

অচলায়তন

'অচলায়তন' ১৩১৮ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

অচলায়তন, ১৩১৮ সালের আশ্বিন মাসের প্রবাসীতে সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ এই উপলক্ষে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটি পত্রে (পোস্টমার্ক : শান্তিনিকেতন ১৪ জুলাই ১৯১১) লেখেন—

'শেষকালে নাটকটা প্রবাসীর কবলের মধ্যেই পড়ল। অনেক লোকের চক্ষে পড়বে এবং এই নিয়ে কাগজপত্রে বিস্তর মারামারি-কাটাকাটি চলবে এই আমার একটা মস্ত সান্ত্বনা।'

এই অনুমান ব্যর্থ হয় নাই।

প্রবাসীতে নাটকটি প্রকাশিত হইলে অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'আর্য্যাবর্ত্ত' মাসিক পত্রে (কার্তিক ১৩১৮) ইহার একটি সমালোচনা প্রকাশ করেন ; ইহাতে নাটকটির প্রশস্তি ও তিরস্কার দুইই ছিল। ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ এই সমালোচনার উত্তর দেন ; পত্রটি 'আর্য্যাবর্ত্তে' (অগ্রহায়ণ ১৩১৮) প্রকাশিত হয় ; নিম্নে তাহা মুদ্রিত হইল—

'নিজের লেখা সম্বন্ধে কোনোপ্রকার ওকালতি করিতে যাওয়া ভদ্ররীতি নহে। সে রীতি আমি সাধারণত মানিয়া থাকি। কিন্তু আপনার মতো বিচারক যখন আমার কোনো গ্রন্থের সমালোচনা করেন তখন প্রথার খাতিরে ঔদাসীন্যের ভান করা আমার দ্বারা হইয়া উঠে না।

'সাহিত্যের দিক দিয়া আপনি অচলায়তনের উপর যে রায় লিখিয়াছেন তাহার বিরুদ্ধে আপনার নিকট আমি কোনো আপিল রুজু করিব না। আপনি যে ডিগ্রী দিয়াছেন সে আমার যথেষ্ট হইয়াছে।

'কিন্তু ওই-যে একটা উদ্দেশ্যের কথা তুলিয়া আমার উপরে একটা মস্ত অপরাধ চাপাইয়াছেন সেটা আমি চুপচাপ করিয়া মানিয়া লইতে পারিব না। কেবলমাত্র ঝোঁক দিয়া পড়ার দ্বারা বাক্যের অর্থ দুই-তিন-রকম হইতে পারে। কোনো কাব্য বা নাটকের উদ্দেশ্যটা সাহিত্যিক বা অসাহিত্যিক তাহাও কোনো কোনো স্থলে ঝোঁকের দ্বারা সংশয়াপন্ন হইতে পারে। পাখি পিঞ্জরের বাহিরে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইতেছে ইহা কাব্যের কথা, কিন্তু পিঞ্জরের নিন্দা করিয়া খাঁচাওয়ালার প্রতি খোঁচা দেওয়া হইতেছে এমনভাবে সুর করিয়াও হয়তো পড়া যাইতে পারে। মুক্তির জন্য পাখির কাতরতাকে ব্যক্ত করিতে হইলে খাঁচার কথাটা একেবারেই বাদ দিলে চলে না। পাখির বেদনাকে সত্য করিয়া দেখাইতে হইলে খাঁচার বদ্ধতা ও কঠিনতাকে পরিস্ফুট করিতেই হয়।

'জগতের যেখানেই ধর্মকে অভিভূত করিয়া আচার আপনি বড়ো হইয়া উঠে সেখানেই মানুষের চিত্তকে সে রুদ্ধ করিয়া দেয়, এটা একটা বিশ্বজনীন সত্য। সেই রুদ্ধ চিত্তের বেদনাই কাব্যের বিষয়, এবং আনুষঙ্গিক ভাবে শুষ্ক আচারের কদর্যতা স্বতই সেইসঙ্গে ব্যক্ত হইতে থাকে।

'ধর্মকে প্রকাশ করিবার জন্য, গতি দিবার জন্যই, আচারের সৃষ্টি ; কিন্তু কালে কালে ধর্ম যখন সেই-সমস্ত আচারকে নিয়মসংযমকে অতিক্রম করিয়া বড়ো হইয়া উঠে, অথবা ধর্ম যখন সচল নদীর মতো আপনার ধারাকে অন্য পথে লইয়া যায়, তখন পূর্বতন নিয়মগুলি অচল হইয়া শুষ্ক নদীপথের মতো পড়িয়া থাকে— বস্তুত তখন তাহা তপ্ত মরুভূমি, তৃষাহরা তাপনাশিনী স্রোতস্বিনীর সম্পূর্ণ বিপরীত। সেই শুষ্ক পথটাকেই সনাতন বলিয়া সম্মান করিয়া নদীর ধারার সন্ধান যদি একেবারে পরিত্যাগ করা যায় তবে মানবাত্মাকে পিপাসিত করিয়া রাখা হয়। সেই পিপাসিত মানবাত্মার ক্রন্দন কি সাহিত্যে প্রকাশ করা হইবে না, পাছে পুরাতন নদীপথের প্রতি অনাদর দেখানো হয় ?

'আপনি যাহা বলিয়াছেন সে কথা সত্য। সকল ধর্মসমাজেই এমন অনেক পুরাতন প্রথা সঞ্চিত হইতে থাকে যাহার ভিতর হইতে প্রাণ সরিয়া গিয়াছে। অথচ চিরকালের অভ্যাস-বশত মানুষ তাহাকেই প্রাণের সামগ্রী বলিয়া আঁকড়িয়া থাকে— তাহাতে কেবলমাত্র তাহার অভ্যাস তৃপ্ত হয়, কিন্তু তাহার প্রাণের উপবাস ঘুচে না— এমনি করিয়া অবশেষে এমন একদিন আসে যখন ধর্মের প্রতিই তাহার অশ্রদ্ধা জন্মে— এ কথা ভুলিয়া যায় যাহাকে সে আশ্রয় করিয়াছিল তাহা ধর্মই নহে, ধর্মের পরিত্যক্ত আবর্জনা মাত্র।

'এমন অবস্থায় সকল দেশেই সকল কালেই মানুষকে কেহ-না-কেহ শুনাইয়াছে যে, আচারই ধর্ম নহে, বাহ্যিকতায় অন্তরের ক্ষুধা মেটে না এবং নিরর্থক অনুষ্ঠান মুক্তির পথ নহে, তাহা বন্ধন। অভ্যাসের প্রতি আসক্ত মানুষ কোনো দিন এ কথা শুনিয়া খুশি হয় নাই এবং যে এমন কথা বলে তাহাকে পুরস্কৃত করে নাই— কিন্তু ভালো লাগুক আর না লাগুক এ কথা তাহাকে বারংবার শুনিতেই হইবে।

'প্রত্যেক মানুষের একটা অহং আছে। সেই অহং'এর আবরণ হইতে মুক্ত হইবার জন্য

সাধকমাত্রের একটা ব্যগ্রতা আছে। তাহার কারণ কী। তাহার কারণ এই, মানুষের নিজের বিশেষত্ব যখন তাহার আপনাকেই ব্যক্ত করিতে থাকে, আপনার চেয়ে বড়োকে নহে, তখন সে আপনার অস্তিত্বের উদ্দেশ্যকেই ব্যর্থ করে। আপনার অহংকার, আপনার স্বার্থ, আপনার সমস্ত রাগদ্বেষকে ভেদ করিয়া ভক্ত যখন আপনার সমস্ত চিন্তায় ও কর্মে ভগবানের ইচ্ছাকে ও তাঁহার আনন্দকেই প্রকাশ করিতে থাকেন তখন তাঁহার মানবজীবন সার্থক হয়।

'ধর্মসমাজেরও সেইরূপ একটা অহং আছে। তাহার অনেক রীতি-পদ্ধতি নিজেকেই চরমরূপে প্রকাশ করিতে থাকে। চিরন্তনকে আচ্ছন্ন করিয়া নিজের অহংকারকেই সে জয়ী করে। তখন তাহাকে পরাভূত করিতে না পারিলে সত্যধর্ম পীড়িত হয়। সেই পীড়া যে সাধক অনুভব করিয়াছে সে এমন গুরুকে খোঁজে যিনি এই-সমস্ত সামাজিক অহংকে অপসারিত করিয়া ধর্মের মুক্ত স্বরূপকে দেখাইয়া দিবেন। মানবসমাজে যখনই কোনো গুরু আসিয়াছেন তিনি এই কাজই করিয়াছেন।

'আপনি প্রশ্ন করিয়াছেন, উপায় কী। 'শুধু আলো, শুধু প্রীতি' লইয়াই কি মানুষের পেট ভরিবে। অর্থাৎ আচার-অনুষ্ঠানের বাধা দূর করিলেই কি মানুষ কৃতার্থ হইবে। তাই যদি হইবে তবে ইতিহাসে কোথাও তাহার কোনো দৃষ্টান্ত দেখা যায় না কেন।

'কিন্তু এরূপ প্রশ্ন কি অচলায়তনের লেখককে জিজ্ঞাসা করা ঠিক হইয়াছে। অচলায়তনের গুরু কি ভাঙিবার কথাতেই শেষ করিয়াছেন। গড়িবার কথা বলেন নাই? পঞ্চক যখন তাড়াতাড়ি বন্ধন ছাড়াইয়া উধাও হইয়া যাইতে চাহিয়াছিল তখন তিনি কি বলেন নাই 'না, তা যাইতে পারিবে না— যেখানে ভাঙা হইল এইখানেই আবার প্রশস্ত করিয়া গড়িতে হইবে'? গুরুর আঘাত নষ্ট করিবার জন্য নহে, বড়ো করিবার জন্যই। তাঁহার উদ্দেশ্য ত্যাগ করা নহে, সার্থক করা। মানুষের স্থূল দেহ যখন মানুষের মনকে অভিভূত করে তখন সেই দেহগত রিপুকে আমরা নিন্দা করি, কিন্তু তাহা হইতে কি প্রমাণ হয় প্রেতত্ব লাভই মানুষের পূর্ণতা। স্থূল দেহের প্রয়োজন আছে। কিন্তু সেই দেহ মানুষের উচ্চতর সত্তার বিরোধী হইবে না, তাহার অনুগত হইবে, এ কথা বলার দ্বারা দেহকে নষ্ট করিতে বলা হয় না।

'অচলায়তনে মন্ত্রমাত্রের প্রতি তীব্র শ্লেষ প্রকাশ করা হইয়াছে এ কথা কখনোই সত্য হইতে পারে না, যেহেতু মন্ত্রের সার্থকতা সম্বন্ধে আমার মনে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু মন্ত্রের যথার্থ উদ্দেশ্য মননে সাহায্য করা। ধ্যানের বিষয়ের প্রতি মনকে অভিনিবিষ্ট করিবার উপায় মন্ত্র। আমাদের দেশে উপাসনার এই-যে আশ্চর্য পন্থা সৃষ্ট হইয়াছে, ইহা ভারতবর্ষের বিশেষ মাহাত্ম্যের পরিচয়।

'কিন্তু সেই মন্ত্রকে মনন-ব্যাপার হইতে যখন বাহিরে বিক্ষিপ্ত করা হয়, মন্ত্র যখন তাহার উদ্দেশ্যকে অভিভূত করিয়া নিজেই চরম পদ অধিকার করিতে চায়, তখন তাহার মতো মননের বাধা আর কী হইতে পারে। কতকগুলি বিশেষ শব্দসমষ্টির মধ্যে কোনো অলৌকিক শক্তি আছে এই বিশ্বাস যখন মানুষের মনকে পাইয়া বসে তখন সে আর সেই শব্দের উপরে উঠিতে চায় না। তখন মনন ঘুচিয়া গিয়া সে উচ্চারণের ফাঁদেই জড়াইয়া পড়ে। তখন চিত্তকে যাহা মুক্ত করিবে বলিয়াই রচিত তাহাই চিত্তকে বদ্ধ করে। এবং ক্রমে দাঁড়ায় এই, মন্ত্র পড়িয়া দীর্ঘ জীবন লাভ করা, মন্ত্র পড়িয়া শত্রু জয় করা ইত্যাদি নানাপ্রকার নিরর্থক দুশ্চেষ্টায় মানুষের মূঢ় মন প্রলুব্ধ হইয়া ঘুরিতে থাকে। এইরূপে মন্ত্রই যখন মননের স্থান অধিকার করিয়া বসে তখন মানুষের পক্ষে তাহা অপেক্ষা শুষ্ক জিনিস আর কী হইতে পারে। যেখানে মন্ত্রের এরূপ ভ্রষ্টতা সেখানে মানুষের দুর্গতি আছেই। সেই-সমস্ত কৃত্রিম বন্ধন-জাল হইতে মানুষ আপনাকে উদ্ধার করিয়া ভক্তির সজীবতা ও সরসতা -লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে, ইতিহাসে বারংবার ইহার প্রমাণ দেখা গিয়াছে। যাগযজ্ঞ মন্ত্রতন্ত্র যখনই অত্যন্ত প্রবল হইয়া মানুষের মনকে চারি দিকে বেষ্টন

করিয়া ধরে তখনই তো মানবের গুরু মানবের হৃদয়ের দাবি মিটাইবার জন্য দেখা দেন ; তিনি বলেন, পাথরের টুকরা দিয়া রুটির টুকরার কাজ চালানো যায় না, বাহ্য অনুষ্ঠানকে দিয়া অন্তরের শূন্যতা পূর্ণ করা চলে না। কিন্তু তাই বলিয়া এ কথা কেহই বলে না যে, মন্ত্র যেখানে মননের সহায়, বাহিরের অনুষ্ঠান যেখানে অন্তরের ভাবস্ফূর্তির অনুগত, সেখানে তাহা নিন্দনীয়। ভাব তো রূপকে কামনা করে, কিন্তু রূপ যদি ভাবকে মারিয়া একলা রাজত্ব করিতে চায় তবে বিধাতার দণ্ডবিধি -অনুসারে তাহার কপালে মৃত্যু আছেই। কেননা, সে যত দিনই বাঁচিবে তত দিনই কেবলই মানুষের মনকে মারিতে থাকিবে। ভাবের পক্ষে রূপের প্রয়োজন আছে বলিয়াই রূপের মধ্যে লেশমাত্র অসতীত্ব এমন নিদারুণ। যেখানেই সে নিজেকে প্রবল করিতে চাহিবে সেইখানেই সে নির্লজ্জ, সে অকল্যাণের আকর। কেননা, ভাব যে রূপকে টানিয়া আনে সে যে প্রেমের টান, আনন্দের টান— রূপ যখন সেই ভাবকে চাপা দেয় তখন সে সেই প্রেমকে আঘাত করে, আনন্দকে আচ্ছন্ন করে— সেইজন্য যাহারা ভাবের ভক্ত তাহারা রূপের এইরূপ ভ্রষ্টাচার একেবারে সহিতে পারে না। কিন্তু রূপে তাহাদের পরমানন্দ, যখন ভাবের সঙ্গে তাহার পূর্ণ মিলন দেখে। কিন্তু শুধু রূপের দাসখত মানুষের সকলের অধম দুর্গতি। যাঁহারা মহাপুরুষ তাঁহারা মানুষকে এই দুর্গতি হইতেই উদ্ধার করিতে আসেন। তাই অচলায়তনে এই আশার কথাই বলা হইয়াছে যে, যিনি গুরু তিনি সমস্ত আশ্রয় ভাঙিয়া চুরিয়া দিয়া একটা শূন্যতা বিস্তার করিবার জন্য আসিতেছেন না ; তিনি স্বভাবকে জাগাইবেন, অভাবকে ঘুচাইবেন, বিরুদ্ধকে মিলাইবেন ; যেখানে অভ্যাসমাত্র আছে সেখানে লক্ষ্যকে উপস্থিত করিবেন, এবং যেখানে তপ্ত বালু-বিছানো খাদ পড়িয়া আছে মাত্র সেখানে প্রাণপরিপূর্ণ রসের ধারাকে বহাইয়া দিবেন। এ কথা কেবল যে আমাদেরই দেশের সম্বন্ধে খাটে তাহা নহে ; ইহা সকল দেশেই সকল মানুষেরই খাটে। অবশ্য এই সর্বজনীন সত্য অচলায়তনে ভারতবর্ষীর রূপ ধাবণ করিয়াছে ; তাহা যদি না করিত তবে উহা অপাঠ্য হইত।

'মনে করিয়াছিলাম সংক্ষেপে বলিব। কিন্তু 'নিজেব কথা পাঁচ কাহন' হইয়া পড়ে ; বিশেষত শ্রোতা যদি সহৃদয় ও ক্ষমাপরায়ণ হন। ইতিপূর্বেও আপনার প্রতি জুলুম করিয়া সাহস বাড়িয়া গেছে ; এবারেও প্রশ্রয় পাইব এ ভরসা মনে আছে। ইতি ৩রা অগ্রহায়ণ ১৩১৮, শান্তিনিকেতন'

আর্য্যাবর্তের যে সংখ্যাতে (অগ্রহায়ণ ১৩১৮) রবীন্দ্রনাথের এই প্রত্যুত্তর মুদ্রিত হয় সেই সংখ্যাতেই অক্ষয়চন্দ্র সরকার, ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ফোয়ারা' গ্রন্থের সমালোচনা-প্রসঙ্গে, পূর্বসংখ্যা আর্য্যাবর্তে প্রকাশিত তাঁহার অচলায়তন আলোচনার ও রবীন্দ্রনাথের বিরূপ সমালোচনা করেন। অক্ষয়চন্দ্রের আলোচনা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে পত্রোত্তরে লেখেন—

'আমার লেখা পড়িয়া অনেকে বিচলিত হইবেন এ কথা আমি নিশ্চিত জানিতাম ; আমি শীতলভোগের বরাদ্দ আশাও কবি নাই। অচলায়তন লেখায় যদি কোনো চঞ্চলতাই না আনে তবে উহা বৃথা লেখা হইয়াছে বলিয়া জানিব। সংস্কারের জড়তাকে আঘাত করিব, অথচ তাহা আহত হইবে না, ইহাকেই বলে নিষ্ফলতা। অবস্থাবিশেষে ক্রোধের উত্তেজনাই সত্যকে স্বীকার করিবার প্রথম লক্ষণ, এবং বিরোধই সত্যকে গ্রহণ করিবার আরম্ভ। যদি কেহ এমন অদ্ভুত সৃষ্টিছাড়া কথা বলেন ও বিশ্বাস করেন যে, জগতের মধ্যে কেবল আমাদের দেশেই ধর্মে ও সমাজে কোথাও কোনো কৃত্রিমতা ও বিকৃতি নাই, অথচ বাহিরে দুর্গতি আছে, তবে সত্যের সংঘাত তাঁহার পক্ষে সুখকর হইবে না, তিনি সত্যকে আপনার শত্রু বলিয়া গণ্য করিবেন। তাঁহাদেব মন রক্ষা করিযা যে চলিবে হয় তাহাকে মূঢ় নয় তাহাকে ভীরু হইতে হইবে। নিজের

দেশের আদর্শকে যে ব্যক্তি যে পরিমাণে ভালোবাসিবে সে'ই তাহার বিকারকে সেই পরিমাণেই আঘাত করিবে, ইহাই শ্রেয়স্কর। ভালোমন্দ সমস্তকেই সমান নির্বিচারে সর্বাঙ্গে মাখিয়া নিশ্চল হইয়া বসিয়া থাকাকেই প্রেমের পরিচয় বলিতে পারি না। দেশের মধ্যে এমন অনেক আবর্জনা স্তূপাকার হইয়া উঠিয়াছে যাহা আমাদের বুদ্ধিকে শক্তিকে ধর্মকে চারি দিকে আবদ্ধ করিয়াছে ; সেই কৃত্রিম বন্ধন হইতে মুক্তি পাইবার জন্য এ দেশে মানুষের আত্মা অহরহ কাঁদিতেছে— সেই কান্নাই ক্ষুধার কান্না, মারীর কান্না, অকালমৃত্যুর কান্না, অপমানের কান্না। সেই কান্নাই নানা নাম ধরিয়া আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে এমন একটা ব্যাকুলতার সঞ্চার করিযাছে, সমস্ত দেশকে নিরানন্দ করিয়া রাখিয়াছে, এবং বাহিরের সকল আঘাতের সম্বন্ধেই তাহাকে এমন একান্তভাবে অসহায় করিয়া তুলিয়াছে। ইহার বেদনা কি প্রকাশ করিব না। কেবল মিথ্যা কথা বলিব এবং সেই বেদনার কারণকে দিনরাত্রি প্রশ্রয় দিতেই থাকিব ? অন্তরে যে-সকল মর্মান্তিক বন্ধন আছে বাহিরের শৃঙ্খল তাহারই স্থূল প্রকাশ মাত্র। অন্তরের সেই পাপগুলাকে কেবলই বাপু বাছা বলিয়া নাচাইব, আর ধিক্কার দিবার বেলায় ঐ বাহিরের শিকলটাই আছে ? আমাদের পাপ আছে বলিয়াই শাস্তি আছে। যত লড়াই ঐ শাস্তির সঙ্গে ? আর, যত মমতা ঐ পাপের প্রতি ? তবে কি এই কথাই সত্য যে আমাদের কোথাও পাপ নাই, আমরা বিধাতার অন্যায় বহন করিতেছি ? যদি তাহা সত্য না হয়, যদি পাপ থাকে, তবে সে পাপের বেদনা আমাদের সাহিত্যে কোথায় প্রকাশ পাইতেছে ? আমরা কেবলই আপনাকে ভুলাইতে চেষ্টা করিতেছি যে, সমস্ত অপরাধ বাহিরের দিকেই। আপনার মধ্যে যেখানে সকলের চেয়ে বড়ো শত্রু আছে, যেখানে সকলের চেয়ে ভীষণ লড়াই প্রতীক্ষা করিতেছে, সেদিকে কেবলই আমরা মিথ্যার আড়াল দিয়া আপনাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু আমি আপনাকে বলিতেছি, আমার পক্ষে প্রতিদিন ইহা অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের সমস্ত-দেশ-ব্যাপী এই বন্দীশালাকে একদিন আমিও নানা মিষ্ট নাম দিয়া ভালোবাসিতে চেষ্টা করিয়াছি ; কিন্তু তাহাতে অন্তরাত্মা তৃপ্তি পায় নাই— এই পাষাণ-প্রাচীরের চারি দিকেই তাহার মাথা ঠেকিয়া সে কোনো আশার পথ দেখিতেছে না। বাস রে ! এমন নীরন্ধ্র বেষ্টন, এমন আশ্চর্য পাকা গাঁথনি ! বাহাদুরি আছে বটে, কিন্তু শ্রেয় আছে কি। চারি দিকে তাকাইয়া শ্রেয় কোন্‌খানে দেখা যাইতেছে জিজ্ঞাসা করি। ঘরে বাহিরে কোথায় সে আছে। অচলায়তনে আমার সেই বেদনা প্রকাশ পাইয়াছে। শুধু বেদনা নয়, আশাও আছে। ইতিহাসে সর্বত্রই কৃত্রিমতার জাল যখন জটিলতম দৃঢ়তম হইয়াছে তখনই গুরু আসিয়া তাহা ছেদন করিয়াছেন। আমাদেরও গুরু আসিতেছেন। দ্বার রুদ্ধ, পথ দুর্গম, বেড়া বিস্তর, তবু তিনি আসিতেছেন। তাঁহাকে আমরা স্বীকার করিব না, বাধা দিব, মারিব ; তবু তিনি আসিতেছেন ইহা নিশ্চিত। দোহাই আপনাদের, মনে করিবেন না, অচলায়তনে আমি গালি দিয়াছি বা উপদেশ দিয়াছি। আমি প্রাণের ব্যাকুলতায় শিকল নাড়া দিয়াছি ; সে শিকল আমার, এবং সে শিকল সকলের। নাড়া দিলে হয়তো পাযে বাজে। বাজিবে না তো কী ! শিকল যে শিকলই সেই কথাটা যেমন করিয়া হউক জানাইতেই হইবে। যে নিজে অনুভব করিতেছে সে অনুভব না করাইয়া বাঁচিবে কী করিয়া। ইহাতে মার খাইতে হয় তো মার খাইব। তাই বলিয়া নিরস্ত হইতে পারিব না। গালিকেই আমার চেষ্টার সার্থকতা মনে করিয়া আমি মাথায় করিয়া লইব, আর-কোনো পুরস্কার চাই না। ইতি ২৭শে অগ্রহায়ণ ১৩১৮'

ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত সলিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই চিঠিগুলি রক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি অনুগ্রহপূর্বক এগুলি আমাদের ব্যবহার করিতে দিয়াছেন।

অধ্যাপক এডওআর্ড টমসন রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁহার পুস্তকে অচলায়তনে কোনো কোনো

ইংরেজি গ্রন্থের ছায়া আছে, এইরূপ উক্তি[১] করেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে একটি চিঠিতে (৩ আষাঢ় ১৩৩৪) রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে লেখেন—

Castle of Indolence এবং Faerie Queen আমি পড়ি নি— Princess-এর সঙ্গে অচলায়তনের সুদূরতম সাদৃশ্য আছে বলে আমার বোধ হয় না। আমাদের নিজেদের দেশে মঠ-মন্দিরের অভাব নেই— আকৃতি ও প্রকৃতিতে অচলায়তনের সঙ্গে তাদেরই মিল আছে।'

আমার ধর্ম প্রবন্ধে অচলায়তন-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

যে বোধে আমাদের আত্মা আপনাকে জানে সে বোধের অভ্যুদয় হয় বিরোধ অতিক্রম ক'রে, আমাদের অভ্যাসের এবং আরামের প্রাচীরকে ভেঙে ফেলে। যে বোধে আমাদের মুক্তি 'দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি'— দুঃখের দুর্গম পথ দিয়ে সে তার জয়ভেরী বাজিয়ে আসে— আতঙ্কে সে দিগ্‌দিগন্ত কাঁপিয়ে তোলে। তাকে শত্রু বলেই মনে করি ; তার সঙ্গে লড়াই করে তবে তাকে স্বীকার করতে হয়। কেননা, নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। অচলায়তনে এই কথাটাই আছে।

মহাপঞ্চক। তুমি কি আমাদের গুরু।

দাদাঠাকুর। হাঁ। তুমি আমাকে চিনবে না, কিন্তু আমিই তোমাদের গুরু।

মহাপঞ্চক। তুমি গুরু ? তুমি আমাদের সমস্ত নিয়ম লঙ্ঘন করে এ কোন্ পথ দিয়ে এলে ; তোমাকে কে মানবে।

দাদাঠাকুর। আমাকে মানবে না জানি, কিন্তু আমিই তোমাদের গুরু।

মহাপঞ্চক। তুমি গুরু ? তবে এই শত্রুবেশে কেন।

দাদাঠাকুর। এই তো আমার গুরুর বেশ। তুমি যে আমার সঙ্গে লড়াই করলে— সেই লড়াই আমার গুরুর অভ্যর্থনা।...

মহাপঞ্চক। আমি তোমাকে প্রণাম করব না।

দাদাঠাকুর। আমি তোমার প্রণাম গ্রহণ করব না, আমি তোমাকে প্রণত করব।

মহাপঞ্চক। তুমি আমাদের পূজা নিতে আস নি ?

দাদাঠাকুর। আমি তোমাদের পূজা নিতে আসি নি, অপমান নিতে এসেছি।

আমি তো মনে করি আজ য়ুরোপে যে যুদ্ধ বেধেছে সে ঐ গুরু এসেছেন বলে। তাঁকে অনেক দিনের টাকার প্রাচীর, মানের প্রাচীর, অহংকারের প্রাচীর ভাঙতে হচ্ছে। তিনি আসবেন বলে কেউ প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু তিনি যে সমারোহ করে আসবেন, তার জন্যে আয়োজন অনেক দিন থেকে চলছিল।' —সবুজ পত্র। আশ্বিন-কার্তিক ১৩২৪

অচলায়তনের দুইখানি রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত। তন্মধ্যে যেটি প্রথম পাঠ বলিয়া গণ্য তাহার শেষে রচনার স্থান-কালের উল্লেখ আছে : ১৫ই আষাঢ়। ১৩১৮। শিলাইদা

১। Its fable was probably suggested by *The Princess*, and, more remotely, *The Castle of Indolence* and *The Faerie Queen*— Edward Thompson in *Rabindranath Tagore Poet and Dramatist* p 225

ডাকঘর

'ডাকঘর' ১৩১৮ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

অচলায়তন গ্রন্থাকারে ডাকঘরের পরে প্রকাশিত হয়; কিন্তু ডাকঘর রচনার পূর্বে অচলায়তন লিখিত ও সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, এইজন্য রবীন্দ্র-রচনাবলীর ন্যায় নাট্য-সংগ্রহেও উহা ডাকঘরের পূর্বে মুদ্রিত হইয়াছে।

ডাকঘর রচনার স্থান-কাল সম্পর্কে আভাস পাওয়া যায় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্রে (দ্র· শারদীয় দেশ, ১৩৭৩, পত্র ৩, ৪, ৫)। ডাকঘরের স্পষ্ট উল্লেখ আছে চতুর্থ পত্রে ; এই পোস্ট্‌কার্ড্‌ সম্ভবত ১ আশ্বিন ১৩১৮ তারিখে শান্তিনিকেতন হইতে লেখা হয়। রবীন্দ্রনাথের 'রাসমণির ছেলে' ভারতী পত্রে ১৩১৮ আশ্বিনে প্রচারিত, এটি রচনার পূর্বেই 'ডাকঘর' রচিত, ইহাও অনুমান করার কারণ আছে।

"'ডাকঘর' যখন লিখি তখন হঠাৎ আমার অন্তরের মধ্যে আবেগের তরঙ্গ জেগে উঠেছিল।··· প্রবল একটা আবেগ এসেছিল ভিতরে। চল চল বাইরে, যাবার আগে তোমাকে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে হবে— সেখানকার মানুষের সুখদুঃখের উচ্ছ্বাসের পরিচয় পেতে হবে। সে সময় বিদ্যালয়ের কাজে বেশ ছিলাম। কিন্তু হঠাৎ কি হল। রাত দুটো-তিনটের সময় অন্ধকার ছাদে এসে মনটা পাখা বিস্তার করল।··· আমার মনে হচ্ছিল একটা কিছু ঘটবে, হয়তো মৃত্যু। স্টেশনে যেন তাড়াতাড়ি লাফিয়ে উঠতে হবে সেই রকমের একটা আনন্দ আমার মনে জাগছিল। যেন এখান হতে যাচ্ছি। বেঁচে গেলুম। এমন করে যখন ডাকছেন তখন আমার দায় নেই। কোথাও যাবার ডাক ও মৃত্যুর কথা··· 'ডাকঘরে'··· প্রকাশ করলুম।··· মনের মধ্যে যা অব্যক্ত অথচ চঞ্চল তাকে কোনো রূপ দিতে পারলে শান্তি আসে।··· এর মধ্যে গল্প নেই। এ গদ্য-লিরিক।··· আমার মনের মধ্যে বিচ্ছেদের বেদনা ততটা ছিল না। চলে যাওয়ার মধ্যে যে বিচিত্র আনন্দ তা আমাকে ডাক দিয়েছিল।"

১৩২২ পৌষে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে 'তাঁর নাটকের বিষয়ে ধারাবাহিক কতগুলি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। ৪ঠা পৌষের বক্তৃতার বিষয় ছিল ডাকঘর।' স্বর্গীয় কালীমোহন ঘোষ উহার যে অনুলেখন রাখিয়া গিয়াছেন, উপরে তাহারই কিয়দংশ 'রবীন্দ্রসংগীত' গ্রন্থ হইতে সংকলন করা গেল। ডাকঘর নাটক-রচনার প্রায় সমকালীন একটি পত্রে (২২ আশ্বিন ১৩১৮) এই কথাই কবির নিজের লেখায় ব্যক্ত হইয়াছে—

'মা, আমি দূরদেশে যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্চি।··· আমার মন এই কথা বল্‌চে যে, যে পৃথিবীতে জন্মেছি সেই পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করে নিয়ে তবে তার কাছ থেকে বিদায় নেব। এর পরে আর ত সময় হবে না। সমস্ত পৃথিবীর নদী গিরি সমুদ্র এবং লোকালয় আমাকে ডাক দিচ্চে— আমার চারিদিকের ক্ষুদ্র পরিবেষ্টনের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়বার জন্যে মন উৎসুক হয়ে পড়েছে।··· আমাদের কর্ম্ম ও সংস্কারের আবর্জ্জনা দিনে দিনে জমে উঠে চারদিকে একটা বেড়া তৈরি করে তোলে। আমরা চিরজীবন আমাদের নিজের সেই বেড়ার মধ্যেই থাকি, জগতের মধ্যে থাকি নে। অন্ততঃ মাঝে মাঝে সেই বেড়া ভেঙে বৃহৎ জগৎটাকে দেখে এলে বুঝতে পারি আমাদের জন্মভূমিটি কত বড়— বুঝতে পারি জেলখানাতেই আমাদের জন্ম নয়। তাই আমার সকলের চেয়ে বড় যাত্রার পূর্ব্বে এই একটি ছোট যাত্রা দিয়ে তার ভূমিকা করতে চাচ্চি— এখন থেকে একটি একটি করে বেড়ি ভাঙতে হবে তারই আয়োজন।'

—শ্রীমতী নির্ঝরিণী সরকারকে লিখিত, পত্র ১৯, চিঠিপত্র ৭

দীনবন্ধু সি· এফ· এন্ডরুজকেও কবি অনুরূপ কথাই লেখেন—

I remember, at the time when I wrote it [*The Post Office*], my own feeling which inspired me to write it. Amal represents the man whose soul has received the call of the open road— he seeks freedom from the enclosure of habits sanctioned by the prudent and from walls of rigid opinion built for him by the respectable.

—dated June 4, 1921, included in *Letters to a Friend.*

রবীন্দ্রনাথ ১৭ ২ ১৯৩৯ তারিখের একখানি চিঠিতে পরিহাসচ্ছলে লেখেন, 'ডাকঘরের অমল মরেছে বলে সন্দেহ যারা করে তারা অবিশ্বাসী— রাজবৈদ্যের হাতে কেউ মরে না— কবিরাজটা ওকে মারতে বসেছিল বটে।'

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে ১৯১৭ অক্টোবরের জোড়াসাঁকোর 'বিচিত্রা' ভবনে ডাকঘরের যে অভিনয় হয় তাহার প্রযোজনাতে কয়েকটি গান ছিল। 'আমি চঞ্চল হে' 'গ্রামছাড়া ওই রাঙামাটির পথ' এবং 'বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে' এই তিনটি গানের উল্লেখ দেখা যায় সীতা দেবী -প্রণীত 'পুণ্যস্মৃতি' গ্রন্থে (শ্রাবণ ১৩৪৯, পৃ ২৫৮-৬০)। (শেষ দুটি গান রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছিলেন এবং তিনি ঠাকুরদার ভূমিকাতেও অভিনয় করিয়াছিলেন এরূপ জানা যায়।) ১৯১৭ ডিসেম্বরের শেষে ও ১৯১৮ জানুয়ারির প্রথমে ডাকঘরের পুনরভিনয় হইয়াছিল মনে হয়। কারণ, ১৯১৭ খৃস্টাব্দের ২৬, ২৮, ২৯ ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতায় ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন হয় ; জানা যায় ঐ সময়ে লোকমান্য টিলক, মিসেস বেসান্ট, গান্ধীজি, মালবীয়জি প্রভৃতি নেতৃবৃন্দকে আমন্ত্রণ করিয়া একদিন বিশেষ অভিনয়ের ব্যবস্থা হইয়াছিল। তদুপলক্ষে মুদ্রিত বা পরে পুনর্মুদ্রিত ৪ জানুয়ারির ১৯১৮ তারিখের ইংরেজি অনুষ্ঠানপত্রে জানা যায় যে, 'ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে' গানটি এই অভিনয়ে গাওয়া হয়। ইংরাজি অনুষ্ঠানপত্রে আরো জানি, ঠাকুরদাই (রবীন্দ্রনাথ) কখনো ভিক্ষুক কখনো প্রহরী আর কখনো ফকির সাজিয়াছেন।

সুতরাং মোটের উপর ইহা বলা যাইতে পারে যে, ১৯১৭ খৃস্টাব্দের শেষভাগে ও ১৯১৮ সনের জানুয়ারিতে 'বিচিত্রা' ভবনে ডাকঘরের অভিনয়কালে, বিভিন্ন সময়ে, এই গানগুলি ব্যবহৃত হইয়া থাকিবে—

আমি চঞ্চল হে
গ্রামছাড়া ওই রাঙা মাটির পথ
বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে
ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে

উক্ত অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ প্রভৃতি ঠাকুরপরিবারের অনেকেই অভিনয় করেন, অমলের ভূমিকায় শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের আশামুকুল দাস এবং সুধার ভূমিকায় অবনীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা সুরূপা।

১৩৪৬ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ ডাকঘর নাটকের নবতর অভিনয়ের উদ্‌যোগ করেন ও তদুপলক্ষে অনেকগুলি নূতন গান রচনাও করেন। গানগুলি বর্তমানে গীতবিতান গ্রন্থে সংকলিত রহিয়াছে ; গীতিসংযুক্ত বা পরিবর্তিত 'ডাকঘর' নাটকের কোনো পাণ্ডুলিপি অদ্যাপি পাওয়া যায় নাই। (শেষ পর্যন্ত কবির ভগ্নস্বাস্থ্যে অনুচিত পীড়নের শঙ্কায়, এই নাট্যাভিনয়ের চেষ্টা হইতে তাঁহাকে নিবৃত্ত করা হয়)— নিম্নে গানগুলির উল্লেখ করা গেল—

১ আমরা দূর আকাশের নেশায় মাতাল
২ বাহির হলেম আমি আপন ভিতর হতে

৩ শুনি ওই রুনুঝুনু পায়ে পায়ে নূপুরধ্বনি
৪ এই তো ভরা হল ফুলে ফুলে ফুলের ডালা
৫ সুরের জালে কে জড়ালে আমার মন
৬ কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা
৭ সমুখে শান্তিপারাবার। রচনা : ৩ ডিসেম্বর ১৯৩৯

এ স্থলে ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ১, ৬ -সংখ্যক গানের স্বরলিপি বিভিন্ন সাময়িক পত্রে এবং ২, ৩, ও ৭ -সংখ্যক গানের স্বরলিপি যথাক্রমে ৬০, ৫৩ ও ৫৫ -সংখ্যক স্বরবিতান গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। ৬ -সংখ্যক গানের স্বরলিপিকার শ্রীশান্তিদেব ঘোষ, অন্যান্য গানের স্বরলিপি শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদারের সৌজন্যে।

ডাকঘর নাটক *The Post Office* (1914) রূপে অনূদিত হইয়া বিদেশে আদৃত ও অভিনীত হয়।

ফাল্গুনী

ফাল্গুনী ১৯১৬ খৃস্টাব্দে (১৩২২) গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

গীতিভূমিকার গানগুলি ও সর্বশেষের উৎসবের গানটি একত্রে 'বসন্তের পালা' নামে নাটকের প্রবেশকরূপে, এবং নাটক অংশটি 'ফাল্গুনী' নামে ১৩২১ সালের চৈত্র মাসের সবুজ পত্রে সম্পূর্ণ পত্রিকাটি জুড়িয়া প্রকাশিত হয়। এই দুইটি অংশের রবীন্দ্রনাথ যে-দুইটি ভূমিকা লিখিয়াছিলেন তাহা সবুজ পত্র হইতে নিম্নে যথাক্রমে মুদ্রিত হইল :

ভূমিকা : বসন্তের পালা

আর কয়েক পৃষ্ঠা পরে পাঠক ফাল্গুনী বলিয়া একটা নাটকের ধরনের ব্যাপার দেখিতে পাইবেন। এই বসন্তের পালার গানগুলি তম্বুরার মতো তাহারই মূল সুরকয়টি ধরাইয়া দিতেছে। অতএব এগুলি কানে করিয়া লইলে খেয়াল-নাটকের চেহারাটি ধরিবার সুবিধা হইতে পারে।

একদা এপ্রেলের পয়লা তারিখে কবি তাঁর কয়েকজন বন্ধুকে হোটেলে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ভোজটা খুব রীতিমত জমিয়াছিল ; তার পরে পরিণামে যখন বিল শোধের জন্য অর্থ বাহির করিবার দরকার হইল তখন কবির আর দেখা পাওয়া গেল না। সেদিনকার এই ছিল কৌতুক। এবারকার এপ্রেলেরও কৌতুকটা সেই একই, গোড়াতেই তাহা বলিয়া রাখা ভালো। সবুজ পাতার পাত পাড়িয়া যে-বাসন্তিক ভোজের উদ্যোগ হইল কবি শেষ পর্যন্ত তাহাতে যোগ দিবেন কিন্তু যখন সেই ভয়ংকর পরিণামের সময়টা উপস্থিত হইবে, যখন সকলে চীৎকার শব্দে অর্থ দাবি করিতে থাকিবে তখন, হে কবি,— "অন্যে বাক্য ক'বে কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর !"

ভূমিকা : ফাল্গুনী

বসন্তে ঘরছাড়ার দল পাড়া ছাড়িয়াছে। পাড়া জুড়াইয়াছে। ইহাদেরই বসন্ত-যাপনের কাহিনী কবি লিখিতেছেন। লেখাটা নাট্য কি না তাহা স্থির হয় নাই, ইহা রূপক কি না তাহা লইয়া তর্ক উঠিবে এবং যিনি লিখিতেছেন তিনি কবি কি না সে-সম্বন্ধে মতভেদ আছে। আর যা-ই হউক ইহা ইতিহাস নহে। ইহার সত্য-মিথ্যার জন্য মূলে তিনিই দায়ী যিনি জগতে বসন্তের মতো এত বড়ো প্রলাপের অবতারণা করিয়াছেন।

এই ঘরছাড়া দলের মধ্যে বয়স নানা রকমের আছে। কারও কারও চুল পাকিয়াছে কিন্তু সে-খবরটা এখনো তাদের মনের মধ্যে পৌঁছায় নাই। ইহারা যাকে দাদা বলে তার বয়স সব চেয়ে কম। সে সবে চতুষ্পাঠী হইতে উপাধি লইয়া বাহির হইয়াছে। এখনো বাহিরের হাওয়া তাকে বেশ করিয়া লাগে নাই। এইজন্য যে সব চেয়ে প্রবীণ। আশা আছে বয়স যতই বাড়িবে

সে অন্যদের মতোই কাঁচা হইয়া উঠিবে। বিশ ত্রিশ বছর সময় লাগিতে পারে।

ইহারা যাকে সর্দার বলিয়া ডাকে সর্দার ছাড়া তার অন্য কোনো পরিচয় খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। আমার ভয় হইতেছে তত্ত্বজ্ঞানীরা ইহাকে কোনো একটা তত্ত্বের দলে ফেলিয়া ইহার পঞ্চত্ব ঘটাইতে পারেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস লোকটা তত্ত্বকথা নহে, সত্যকারই সর্দার। এই লোকটির কাজ চালাইয়া লওয়া— পথ হইতে পথে, লক্ষ্য হইতে লক্ষ্যে, খেলা হইতে খেলায়। কেহ যে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে সেটা তার অভিপ্রায় নয়। কিন্তু যেহেতু সত্যকার সর্দার মাত্রেই বাহিরে হাঙ্গামা করে না ভিতরে কথা কয়, এই লোকটিকে রঙ্গমঞ্চে না দেখা গেলেই ইহার পরিচয় সুস্পষ্ট হইবে।

এই কাণ্ডটার দৃশ্য পথে ঘাটে বনে বাদাড়ে। বিশেষ করিয়া তাহার উল্লেখ করার দরকার নাই। যে দলের কথা বলিয়াছি কোনো তালিকায় তাহাদের জনসংখ্যা এ পর্যন্ত নির্দিষ্ট হয় নাই। এজন্য তাহাদের সংখ্যার কোনো পরিচয় দেওয়া গেল না। আর, দলের কে যে কোন্ কথাটা বলিতেছে তারও নিদর্শন রাখিলাম না। যে যেটা খুশি বলিতে পারে। কেবল উহাদের মধ্যে যারা কোনো কারণে বিশেষ ব্যক্তি হইয়া উঠিয়াছে তাদেরই কথাগুলোর সঙ্গে তাদের নামের যোগ থাকিবে।

নক্ষত্রলোকের যে-কবি নীহারিকার কাব্য লেখেন তিনি আপন খেয়ালমত অনেকখানি আলো ঝাপসা করিয়া আঁকিয়াছেন, তারই মাঝে মাঝে একটা-একটা তারা ফুটিয়া ওঠে। বেশ দেখা যাইতেছে, এই মর্তের লেখকটা তাঁরই নকল করিবার চেষ্টা করে। আলোর নকল কতটা করিতে পারে জানি না কিন্তু ঝাপসা নকল করিতে চমৎকার হাত পাকাইয়াছে। খুব বড়ো দূরবীন এবং খুব জোরালো অণুবীক্ষণ লাগাইয়াও ইহার মধ্যে বস্তু খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। আর অর্থ? অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যম্।

যত বড়ো লেখা তার চেয়ে ভূমিকা বড়ো হইলে লোকের সুবিধা হয়, এমন-কি, ভূমিকাটাই রাখিয়া লেখাটা বাদ দিতে পারিলেও কোনো উৎপাত থাকে না।— কিন্তু ফাল্গুন প্রায় শেষ হইয়া আসিল, সময় আর বেশি নাই।

ফাল্গুনীর সবুজ পত্রে প্রকাশিত ভূমিকাসংবলিত পাঠের এবং গীতিভূমিকার গানগুলির পাণ্ডুলিপি রবীন্দ্র-ভবনে রক্ষিত আছে। বর্তমান সংস্করণের পাঠ তাহার সাহায্যে স্থানে স্থানে সংশোধিত হইল। পাণ্ডুলিপি-অনুসারে ফাল্গুনী-রচনার তারিখ ও স্থান, ২০ ফাল্গুন ১৩২১, সুরুল।

যে-সকল গানের রচনার তারিখ ও স্থান পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া গিয়াছে নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

ওগো দখিন হাওয়া, পথিক হাওয়া	১২ ফাল্গুন রাত্রি ১৩২১ সুরুল
আকাশ আমায় ভরল আলোয়	১৩ ফাল্গুন রাত্রি [১৩২১] সুরুল
ওগো নদী, আপন বেগে	২৩ ফাল্গুন ১৩২১ রেলপথে
আমরা খুঁজি খেলার সাথি	১৩ ফাল্গুন [১৩২১] সুরুল
ছাড়্ গো তোরা ছাড়্ গো	১২ ফাল্গুন রাত্রি [১৩২১] সুরুল
আমরা নূতন প্রাণের চর	১৩ ফাল্গুন প্রভাত [১৩২১] সুরুল
চলি গো, চলি গো, যাই গো চ'লে	২৩ ফাল্গুন ১৩২১ রেলপথে
ওর ভাব দেখে যে পায় হাসি	১৩ ফাল্গুন [১৩২১] সুরুল
আর নাই যে দেরি	১৪ ফাল্গুন প্রভাত [১৩২১] সুরুল
বিদায় নিয়ে গিয়েছিলেম	১৩ ফাল্গুন রাত্রি [১৩২১] সুরুল
এই কথাটাই ছিলেম ভুলে	১৩ ফাল্গুন [১৩২১] সুরুল
এবার তো যৌবনের কাছে	১৩ ফাল্গুন [১৩২১] সুরুল

এতদিন যে বসেছিলেম	১৫ ফাল্গুন রাত্রি [১৩২১] সুরুল
চোখের আলোয় দেখেছিলেম	২১ ফাল্গুন প্রাতে [১৩২১] সুরুল
তোমায় নতুন করে পাব ব'লে	২০ ফাল্গুন রাত্রি [১৩২১] সুরুল
আয় রে তবে মাত্ রে সবে আনন্দে	১৩ ফাল্গুন [১৩২১] সুরুল

চতুর্থ দৃশ্যের 'আমি যাব না গো অমনি চলে' গানটির একটি স্বতন্ত্র পাঠ পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া গিয়াছে :

আমি বিদায় নিয়ে যাব না গো চ'লে
মালাখানি না পরায়ে গলে।
অনেক গভীর রাতে অনেক ভোরে
তোমার বাণী নিলেম বুকে ক'রে,
ফাগুনশেষে এবার যাবার বেলা
আমার বাণী তোমায় যাব ব'লে।
কিছু হল রইল অনেক বাকি।
ক্ষমা আমায় তুমি করবে না কি।
গান এসেছে সুর আসে নি প্রাণে,
শোনানো তাই হয় নি তোমার কানে,
বাকি যাহা রইল, যাব রাখি'
নয়নজলে আমার নয়নজলে ॥

বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষ নিবারণের সাহায্য-কল্পে ১৩২২ সালের মাঘ মাসে কলিকাতায় ফাল্গুনী নাটকের অভিনয় হয়। ফাল্গুনীব প্রচলিত সংস্করণের 'সূচনা' অংশ সেই উপলক্ষে রচিত হয় (মাঘ ১৩২২) এবং 'বৈরাগ্য সাধন' নামে ১৩২২ সালের মাঘ মাসের সবুজ পত্রে প্রকাশিত হয়। বর্তমান সংস্করণের সূচনা অংশে 'পথ দিয়ে কে যায় গো চলে' গানটি সবুজ পত্রের পাঠ-অনুযায়ী সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হইয়াছে।

১৩২২ সালের এই অভিনয়ের অব্যবহিত পূর্বে শান্তিনিকেতন হইতে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি পত্রে এবং রবীন্দ্রনাথ-কৃত অভিনয়সূচীর একটি অসম্পূর্ণ খসড়া হইতে ফাল্গুনীর অভিনয় ও সূচনা-সংযোজন-সংক্রান্ত অনেক তথ্য জানা যায়। পত্র কয়খানি পুলিনবিহারী সেনের সংগ্রহে ছিল ; বর্তমানে শান্তিনিকেতন-রবীন্দ্রভবন-সংগ্রহভুক্ত। প্রাসঙ্গিক অংশগুলি নিম্নে মুদ্রিত হইল।

১

গগন, ফাল্গুনীর সম্বন্ধে ভাবনার কথা এই যে, ও জিনিসটি অত্যন্ত delicate— ওর একটু সূত্র ছিন্ন হয়ে গেলেই ওর খেই খুঁজে পাওয়া শক্ত হয়। যারা অভিনয় আরম্ভ হবার কিছু পরে আসবে তারা একেবারেই আগাগোড়া এ-জিনিসটার মানে বুঝতে পারবে না। অভিনয় শুরু হবার পরে প্রোগ্রাম পড়বারও সময় থাকবে না, কেননা একবারও যবনিকা পড়বে না। তাই গোড়ায় খুব ছোট্ট একটা-কিছু যদি করা যায় তা হলেও চলে— তা হলে অন্তত লোকজনের আনাগোনাটাও তার উপর দিয়ে কেটে যায়। আর-একটা কথা— অভিনয় হবার দিনের আগে যদি প্রোগ্রাম বিক্রি হয় তা হলে সেটাতে করে বিজ্ঞাপনও হবে, শ্রোতাদের বোঝবারও সুবিধা হতে পারবে। এটা ভেবে দেখো। প্রোগ্রামের নাম দিয়ো নাট্যবিষয়সার। দাদার চৌপদীগুলো প্রোগ্রামে ছাপানো থাকলে মন্দ হয় না। যে যে দৃশ্যে তার যে যে চৌপদী আছে সেই সেই দৃশ্যের গানগুলি যেমন ছাপা হবে অমনি তারই সঙ্গে 'দাদার চৌপদী' এই heading দিয়ে চৌপদীগুলোও ছাপিয়ে দিয়ো। তার কারণ, চৌপদীগুলো stage-এ প্রথমটা শোনবামাত্রই তার মানে বোঝা যায় না।

চেষ্টা করছি আমাদের শিশুগাইয়ের দল বাড়িয়ে তুলতে ।… দু-একটি বড়ো মেয়ের গলাও পাবার চেষ্টা করছি— এখানে কিছুকাল এসে থেকে শিখে যেতে পারে এমন বেশ গলাওয়ালা মেয়ের সন্ধান আছে কি । ছেলের দলের মধ্যে দু-চারটি মেয়েকে সুন্দর করে সাজিয়ে দিলে বেশ দেখতে হবে । রাস্তা দিয়ে পথিক-চলাচলের by play-টা তোমরা করে নিতে পারবে ? সমস্তক্ষণই আমাদের অভিনয়ের পিছন দিয়ে কেবল এইরকম যাতায়াত চালালে বেশ হয় ।

… ফাল্গুনীর কথাটা মনের মধ্যে সর্বদাই জাগিয়ে রেখো— ভাবতে ভাবতে ক্রমে ক্রমে এক-একটা suggestion মনে এসে পড়বে । চোখ এবং কান দুইয়েরই একেবারে পেট ভরিয়ে তুলতে হবে । তার পরে মানে বুঝতে না পারে না-ই পারলে— বুঝিয়ে দেওয়ার চেয়ে মজিয়ে দেওয়াটাই দরকার ।

২

প্রোগ্রাম নিশ্চয় পেয়েছ । তাতে 'বশীকরণ' নাম বদলে 'বহুবিবাহ' করে দিয়েছি ।

তোমাদের রিহার্সেল কী রকম চলছে । মেয়ে সাজাবার সমস্যা কী রকম সমাধান করলে ।…

বহুবিবাহে মনোরমা এবং মাতাজি একই লোককে সাজানো যেতে পারে মনে রেখো । মনোরমাকে একটিও কথা বলতে হয় নি— সে audience-এর দিকে পিঠ করে ঘোমটা দিয়ে চুপ করে বসে থাকবে— গোঁফ দাড়ি থাকলেও ক্ষতি হবে না— নেপথ্য থেকে একজন কেউ ওর গানটা গেয়ে দেবে ।

অবশ্য, মাতাজিকে স্পষ্ট করে দর্শন দিতে হবে । তাকে দিব্য করে ত্রিপুণ্ড্র প্রভৃতি এঁকে রুদ্রাক্ষের মালা জড়িয়ে হাতে এক ত্রিশূল দিয়ে ভৈরবী-গোছের চেহারা করে দিতে হবে ।— অথচ দেখতে ভালো হওয়া চাই ।

ফাল্গুনীর সর্দার যে সাজবে সে যখন গুহা থেকে বেরিয়ে আসবে তখন তার হাতে ধনুর্বাণ দিতে হবে । সেটা তৈরি রেখো । সর্দারকে একটু বেশ সাজানো চাই । অন্য যারা আছে তারা নানা রঙ-বেরঙের চাদর উড়িয়ে পাগড়ি জড়িয়ে বেশ সরগরম করে তুলবে ।

বাউলকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত একেবারে ধবধবে সাদা করে দিয়ো ।

৩

ফাল্গুনীটা এতই ছোটো যে যারা দশটাকা দিয়ে আসবে তারা দুঃখিত হবে । ওর সঙ্গে একটা ফাউ না দিলে কি চলবে । না-হয় বৈকুণ্ঠের খাতাটা জুড়ে দাও-না । বহুবিবাহটা ছোটো আছে, ধাঁ করে মুখস্থ হয়ে যাবে— চারু, দ্বিজেন বাগচী, সুরেশ, মণিলাল প্রভৃতিকে এতে লাগিয়ে দাও-না । নিতান্তই যদি না পার আমার addition[৪]-ওয়ালা বইটা আমাকে পাঠিয়ে দিয়ো, দেখি যদি এখানে কোনোরকম করে করে-তুলতে পারি । আমাদের পক্ষে খুবই শক্ত, তবু তোমরা যখন আমাদের পরিত্যাগই করলে তখন একবার প্রাণপণে চেষ্টা করব আত্মশক্তিতে কী করতে পারি ।…

বাংলা প্রোগ্রামটা তুমি মনোমোহন ঘোষকে দিয়ে ইংরেজি করিয়ে নাও— এখন আমার এত কম সময় যে ও-ভার আমি নিতে পারব না ।

৪

কাল সন্ধেবেলায় তোমার টেলিগ্রাফের তাড়া পেয়ে কালই লিখে ফেলেছি । সংক্ষেপে হলে চলবে না— কাজেই একটু ফলিয়ে ছেলেদের গানগুলো তর্জমা করে একটু বেশ পড়াবার যোগ্য করে তুলতে হল ।…

৪ সংযোজনাংশ পরে দ্রষ্টব্য ।

ভাবছিলুম উঠোনে স্টেজ না করে আটচালা বেঁধে তোমাদের দক্ষিণের আঙিনায় স্টেজ করলে কেমন হয়। এখন থেকেই সাজাতে পার— গাছপালা পোঁতা সহজ হয়, হয়তো seats বেশি ধরতে পারে, সামনের রোয়াকে এবং দোতলায় মেয়েদের জায়গা করা যায়, ইত্যাদি সুবিধা আছে। হোগলার চাল করলে একপশলা বৃষ্টিও কেটে যেতে পারে।

কাপড়ের কী করলে। আমার জন্যে যে সাদা ঝোলা করবে তার হাতের আস্তিনটা খুব ঝোলানো করতে হবে— মসলিনের কাপড় হলে সাদাটা বেশ খুলবে ভালো। মেয়ে যারা থাকবে, তাদের পেশোয়াজ গোছের সাজেই বোধ হয় মানাবে। কী বল।...

ব্যস্ত আছি। বৈকুণ্ঠের খাতার তালিমটা যেন ভালোরকম দেওয়া হয়— প্রম্‌প্‌টিঙের উপরেই কান পেতে থেকো না— ভালো মুখস্থ না হলে জমে না। মুশকিল, আমি ওখানে নেই— থাকলে জবরদস্তি করে খাড়া করে তুলতে পারতুম।

৫

আমিও সে-কথা ভাবছিলুম। বৈকুণ্ঠের খাতার সঙ্গে ফাল্গুনীকে জুড়ে দিলে বড্ড বড়ো হবে। তা ছাড়া দুটোর মধ্যে মিল থাকবে না। তাই ভাবছি, ফাল্গুনীরই একটা introduction গোছের scene জুড়ে দেব— সেটা ছোটো হবে, তাতে মেয়ে থাকবে না, আর যারা দেরিতে আসবে তাদের disturbance-টা ঐটের উপর দিয়েই যাবে। এটা রাজা ও রাজসভাসদ্‌দের ব্যাপার হবে। একটু কাপড়চোপড় হয়তো বেড়ে যাবে— কিন্তু এর অভিনয় তোমাদেরই ঘাড়ে ফেলব। কাল থেকে লিখতে শুরু করব।...

তোমরাই শুধু ব্যস্ত আছ তা নয়— আমরাও ভয়ানক ব্যস্ত। তোমাকে চিঠি লিখছি যেন স্বপ্নে লিখছি— মনটা কোথায় বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে বলতে পারি নে।

... একা ফাল্গুনীতেই যাতে আগুন জ্বলে ওঠে সেই চেষ্টা করা যাবে। তোমরা stage effect জমাবার ভারটা নিয়ো— আমরা গানে ও অভিনয়ে আছি।

ইংরেজি synopsis-টা পড়লে বুঝতে পারবে ছেলেদের কাকে কী রকম সাজাতে হবে। বেণুবন, পাখি, ফুটন্ত চাঁপা, বকুল, পারুল, আমের বোল, শালের কচি পাতা ইত্যাদি।

ফাল্গুনীর আরম্ভে বহুবিবাহ (বশীকরণ) প্রহসন সংযোজনের যে-প্রস্তাব এই পত্রগুলিতে উল্লিখিত আছে সুহৃৎকুমার মুখোপাধ্যায় সৌজন্যে প্রাপ্ত রবীন্দ্রনাথ-কৃত তাহার খসড়া 'অভিনয়সূচি' অতঃপর মুদ্রিত হইল।

অভিনয়সূচি

বহুবিবাহ প্রহসন

কেমন করিয়া একটিকে লইয়াই বহুবিবাহ ঘটিতে পারে এই প্রহসনে তাহাই প্রমাণিত হইয়াছে।

প্রথম দৃশ্য : আশুর বাড়ি

অন্নদা স্ত্রী-সত্ত্বেও দৈবদুর্যোগে স্ত্রীহারা। তিনি আশুর সহিত দ্বিতীয় স্ত্রী-সন্ধানের আলোচনায় রত। ৪৯ নম্বরের রামবৈরাগীর গলিতে পশ্চিম হইতে এক বিধবা তাঁহার বিবাহযোগ্যা কুমারী কন্যা মনোরমার যোগ্য পাত্র খুঁজিতেছেন। তাহাকে দেখিতে যাইবার পরামর্শ। কুমারব্রতধারী আশু যোগবিদ্যা চান, তিনি স্ত্রী চান না। তাঁহার অনুবর্তী রাধাচরণ সংবাদ দিল যে, মন্ত্রে তন্ত্রে সিদ্ধা মাতাজি ২২ নম্বর ভেড়াতলায় যোগবিদ্যা দান করিবার যোগ্য পাত্র খুঁজিতেছেন। অন্নদা কন্যার সন্ধানে চলিল ৪৯ নম্বরে, আশু যোগবিদ্যার সন্ধানে চলিল ২২ নম্বরে।

দ্বিতীয় দৃশ্য : ২২ নম্বর ভেড়াতলা

মাতাজি অনুভব করিয়াছেন, মন্ত্রসাধনার পক্ষে ২২ নম্বরটি অনুকূল নহে। বাড়ি বদল করিতে চান। বাড়িওয়ালার ৪৯ নম্বরের বাড়িতে পশ্চিম হইতে কন্যাসহ এক বিধবা মহিলা আসিয়াছেন। স্থির হইল তাঁহার ৪৯ নম্বরের সহিত মাতাজির ২২ নম্বরের বাসা বদল করা হইবে।

তৃতীয় দৃশ্য : ২২ নম্বর ভেড়াতলা

কন্যার মা আশঙ্কা করিতেছেন, যে-ছেলেটি মেয়ে দেখিতে আসিবে পাছে সে ৪৯ নম্বরে গিয়া খবর না পায়। এমন সময় যোগবিদ্যাপ্রার্থী আশু আসিয়া উপস্থিত। তাহার প্রার্থনার কিরূপ পূরণ হইল এই দৃশ্যে প্রকাশ পাইবে। গান। কী বলে করিব নিবেদন—

চতুর্থ দৃশ্য . ৪৯ নম্বর রামবৈরাগীর গলি

বিবাহযোগ্যা কন্যা দেখিতে আসিয়া ৪৯ নম্বরে অন্নদার কেমন করিয়া যোগবিদ্যার পরিচয় লাভ ঘটিল এই দৃশ্যে তাহাই বর্ণিত। গান। এবার বুঝি সোনার মৃগ—

সমাপ্ত

ফাল্গুনী : গীতিনাট্য

এককেই কোন্ পথে হারাইয়া ফিরিয়া ফিরিয়া পাই, সেই রহস্য এই গীতিনাট্যে প্রকাশ হইয়াছে।

ভূমিকা

ফাল্গুনে বনে বনে নববসন্তের চর ও অনুচরগণের আবির্ভাব।

বেণুবনেব গান

দখিন হাওয়া—

পাখির নীড়েব গান

আকাশ আমায—

ফুলন্ত গাছের গান

ওগো নদী—

প্রথম দৃশ্য : বনপথ

নবযৌবনের দল প্রাণের বেগে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। দলেব মধ্যে প্রবীণ দাদা প্রাণের চাঞ্চল্য অশ্রদ্ধা করেন। তিনি উপদেশগর্ভ চৌপদী রচনা করিয়া তাহার অর্থ ব্যাখ্যা করিতে উৎসুক— নবযৌবনের দল তাহাতে কর্ণপাত করিতে অনিচ্ছুক। নবযৌবনদলের নেতা জীবনসর্দারের প্রবেশ। কথাপ্রসঙ্গে স্থির হইল, জগতে চিরকালের যে-বুড়োটা যৌবন-উৎসবের আলোটাকে ফুঁ দিয়া নিবাইয়া অন্ধকার করিয়া দেয় তাহাকে বন্দী করিয়া আনিয়া এবার বসন্ত-উৎসবের খেলা খেলিতে হইবে। গান। ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে—

বহুবিবাহ (বশীকরণ) প্রহসনটিকে ফাল্গুনীর পূর্বে জুড়িবার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ যাহা লিখিয়াছিলেন, পরপৃষ্ঠায় তাহা মুদ্রিত হইল :[১]

১. 'অন্নদা। হতে পারে না কী বলছ। হয়েছে, আবার হতে পারে না কী। একবার হয়েছে, এই আবার দু-বার হল, তুমি বলছ হতে পারে না! ('বশীকরণ', পঞ্চম অঙ্ক, রবীন্দ্র-রচনাবলী সপ্তম খণ্ড, পৃ· ৩৮৩, সুলভ চতুর্থ পৃ· ৩৬৯)— এই উক্তির অনুবৃত্তিরূপে সংযোজনাংশটি পড়িতে হইবে।

[অন্নদা] বহুবিবাহ কাকে বলে এবার সেটা নতুন করে বুঝেছি।

আশু। কী রকম শুনি।

অন্নদা। একের সঙ্গেই আমাদের বহুবার করে মিলন হচ্ছে। একটি পুরাতনকেই আমরা বারে বারে নূতন করে পাচ্ছি।

আশু। আমি তো এই তত্ত্ব তোমাকে এর আগে বোঝাতে চেয়েছিলুম, তখন তুমি কান দেও নি।

অন্নদা। এখন ভালো গুরু পেয়েছি বলেই সব বোঝা এত সহজ হয়ে গেছে। তোমাকেও কতবার আমি বোঝাতে চেয়েছি, মন্ত্র জিনিসটা খুবই সত্য সন্দেহ নেই, কিন্তু সে তো পুঁথির মন্ত্র নয়— মন্ত্র আছে চোখে মুখে হাসিতে ইশারায়। আমার কথা বিশ্বাস কর নি— এখন মন্ত্রদাতা যেমনি পেয়েছ অমনি সব সন্দেহ ঘুচে গেছে।

আশু। চললেম। এক ঘণ্টার মধ্যেই যাবার কথা আছে। আর কুড়ি মিনিট বাকি।

অন্নদা। একটা কথা বলে নিই। তোমার তো অনেক কবিবন্ধু আছে— আমাদের এই বহুবিবাহের উৎসবে একটি নাটক ফরমাশ দিতে চাই।

আশু। বিষয়টা কী হবে বলো দেখি।

অন্নদা। হারাধনকে ফিরে পাওয়া।

আশু। যেমন মৃত্যুর ভিতর দিয়ে আমরা পুরোনো জীবনকে আবার নতুন করে পাই।

অন্নদা। আশু, তোমার ও-সব তত্ত্বকথা রাখো। এখন আমার কবিত্বে ভারি দরকার। এমনি হয়েছে যদি শিগগির একটা কাব্য জুটিয়ে না দিতে পার তা হলে আমিই লিখতে বসে যাব— সম্পাদক, পাঠক, মাস্টারমশায়, পুলিসম্যান, কাউকে মানব না। সেই বিপদ থেকে গৌড়জনকে রক্ষা করো।

আশু। আচ্ছা বেশ, বিষয়টা তা হলে এই রইল— শীতের ভিতর দিয়ে একই বসন্তের বার বার নতুন হয়ে ফিরে ফিরে আসা। যখন মনে হচ্ছে সবই ঝরে পড়ল তার পরেই দেখি সবই গজিয়ে উঠছে, বনলক্ষ্মীর আঁচল যেই শূন্য হয় অমনিই তা দেখতে দেখতে ভরে ওঠে। এমনি করে একই ধনকে বার বার করে পাওয়া।

অন্নদা। বাহবা আশু! এ'কেই তো বলে কবিত্ব! কিন্তু বহুবিবাহ করলুম আমি, আর তোমার মাথায় তার কবিত্ব গজিয়ে উঠল কী করে।

আশু। বলব? বাইশ নম্বরে আমি যাঁর কাছে আজ মন্ত্র নিয়ে এসেছি, মনে হল এ-মন্ত্র তাঁরই চোখ মুখ হাসি থেকে যেন আমি বারে বারে নিয়েছি— নতুন নতুন নম্বরের গলিতে, নতুন নতুন ভাষায়। তোমার মহীমোহিনী যেমন তোমার একবারই মোহিনী নয়, আমার মনোরমাও তেমনি আমার লক্ষ যৌবনের লক্ষবারকার মনোরমা।

অন্নদা। হয়েছে, হয়েছে হে, আর বলতে হবে না। জীবনের লুকোচুরি খেলার রসটি আমরা দুই বন্ধুই ঠিক এই মুহূর্তে ধরতে পেরেছি।

আশু। (মহীমোহিনীর দিকে ফিরিয়া) দেবী, তোমাদের কল্যাণে আমরা অমৃতকে চক্ষে দেখেছি— আমরা চিরজীবনকে পাকড়াও করেছি। আমরা এখন থেকে পৃথিবীর সেই বুড়োটাকে আর বিশ্বাস করব না— তার মুখোশ খসে গেছে, সে চিরযৌবন, সে চিরপ্রাণ। তাকে যেমনি ধরতে যাই অমনি দেখি, সে নেই— তার জায়গায় তোমরা— হে চিরসুন্দর, হে চিরআনন্দ!

অন্নদা। আরে আরে আশু, কর কী, কর কী। তুমি আমার মুখের সব কথাই যে কেড়ে নিলে, কিছু আর বাকি রাখলে না! ভুলে যাচ্ছ, তোমার কুড়ি মিনিটের আর বারো মিনিট মাত্র বাকি।

আশু। ঠিক বটে, চললুম।

অন্নদা। কাজ সারা হলে তোমার কবিকে একবার ঠেলে তুলো— ভুলো না। ফাল্গুন মাসে

ত্রিশটা বই দিন নেই।

আশু। পাঁজির ফাল্গুনের সঙ্গে আমাদের ফাল্গুনের মিলবে না। আমাদের ফাল্গুনের দিন বেড়ে গেছে।

—শনিবারের চিঠি, মাঘ ১৩৪৮

১৯২৫ খৃস্টাব্দের বর্ষাকালে ঢাকায় একবার ফাল্গুনীর অভিনয় হয়। রবীন্দ্রনাথ সেই উপলক্ষে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিম্নমুদ্রিত কথোপকথনটুকু নাটকের সূচনার শেষে যোজনার জন্য পাঠান :

কবি, তুমি যে এই ভরা বাদলের মাঝখানে ফাল্গুনের তলব করে বসলে, এ তোমার কী রকম খ্যাপামি।

এ খ্যাপামি শিখেছি সেই খ্যাপার কাছ থেকে যিনি জ্যৈষ্ঠের হোমহুতাশনের ভরা দাহনের মধ্যে সজলজলদস্নিগ্ধকান্ত আষাঢ়ের অভিষেক-উৎসবের নিমন্ত্রণপত্র জারি করে বসেন কদম্বের নবকিশলয়ে। যিনি পাতাঝরা উত্তরে হাওয়ার সুর এক মুহূর্তে ফিরিয়ে দিয়ে বনসভায় দক্ষিণ হাওয়ার আসর জমিয়ে তোলেন। বর্ষার শিঙাখানা কেড়ে নিয়ে তাতেই যদি বসন্তের বাঁশি বাজিয়ে তুলতে না পারি তবে আমি কবি কিসের।

পুষ্পবনে পুষ্প নাহি
আছে অন্তরে।
পরানে বসন্ত এল
কার মন্তরে॥

মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে একটি পত্রে (শিলাইদহ, ২০ মাঘ ১৩২২) রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন :

ফাল্গুনীর ভিতরকার কথাটি এতই সহজ যে, ঘটা করে তার অর্থ বোঝাতে সংকোচ বোধ হয়।

জগৎটার দিকে চেয়ে দেখলে দেখা যায় যে, যদিচ তার উপর দিয়ে যুগ যুগ চলে যাচ্ছে তবু সে জীর্ণ নয়— আকাশের আলো উজ্জ্বল, তার নীলিমা নির্মল। ধরণীর মধ্যে রিক্ততা নেই, তার শ্যামলতা অম্লান— অথচ খণ্ড খণ্ড করে দেখতে গেলে দেখি ফুল ঝরছে, পাতা শুকচ্ছে, ডাল মরছে। জরামৃত্যুর আক্রমণ চারি দিকেই দিনরাত চলেছে, তবুও বিশ্বের চিরনবীনতা নিঃশেষ হল না। Facts-এর দিকে দেখি জরা মৃত্যু, Truth-এর দিকে দেখি অক্ষয় জীবন যৌবন। শীতের মধ্যে এসে যে-মুহূর্তে বনের সমস্ত ঐশ্বর্য দেউলে হল বলে মনে হল সেই মুহূর্তেই বসন্তের অসীম সমারোহ বনে বনে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ল। জরাকে, মৃত্যুকে ধরে রাখতে গেলেই দেখি, সে আপন ছদ্মবেশ ঘুচিয়ে প্রাণের জয়পতাকা উড়িয়ে দাঁড়ায়। পিছন দিক থেকে যেটাকে জরা বলে মনে হয় সামনের দিক থেকে সেইটেকেই দেখি যৌবন। তা যদি না হত তা হলে অনাদি কালের এই জগৎটা আজ শতজীর্ণ হয়ে পড়ত— এর উপরে যেখানে পা দিতুম সেইখানেই ধসে যেত।

বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে প্রতি ফাল্গুনে চিরপুরাতন এই যে চিরনূতন হয়ে জন্মাচ্ছে, মানুষপ্রকৃতির মধ্যেও পুরাতনের সেই লীলা চলছে। প্রাণশক্তিই মৃত্যুর ভিতর দিয়ে আপনাকে বারে বারে নূতন করে উপলব্ধি করছে। যা চিরকালই আছে তাকে কালে কালে হারিয়ে হারিয়ে না যদি পাওয়া যায় তবে তার উপলব্ধিই থাকে না।

ফাল্গুনীর যুবকের দল প্রাণের উদ্দাম বেগে প্রাণকে নিঃশেষ করেই প্রাণকে অধিক করে পাচ্ছে। সর্দার বলছে, ভয় নেই, বুড়োকে আমি বিশ্বাসই করি নে— আচ্ছা দেখ্, যদি তাকে ধরতে পারিস তো ধর্। প্রাণের প্রতি গভীর বিশ্বাসের জোরে চন্দ্রহাস মৃত্যুর গুহার মধ্যে প্রবেশ করে সেই প্রাণকেই নূতন করে— চিরন্তন করে দেখতে পেলে। যুবকের দল বুঝতে পারলে

জীবনকে যৌবনকে বারে বারে হারাতে হবে, নইলে ফিরে পাবার উৎসব হতে পারবে না। শীত না থাকলে ফাল্গুনের মহোৎসবের মহাসমারোহ তো মারা যেত।

'আমার ধর্ম' প্রবন্ধে প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন :

জীবনকে সত্য বলে জানতে গেলে মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে তার পরিচয় চাই। যে মানুষ ভয় পেয়ে মৃত্যুকে এড়িয়ে জীবনকে আঁকড়ে রয়েছে, জীবনের পরে তার যথার্থ শ্রদ্ধা নেই বলে জীবনকে সে পায় নি। তাই সে জীবনের মধ্যে বাস করেও মৃত্যুর বিভীষিকায় প্রতিদিন মরে। যে লোক নিজে এগিয়ে গিয়ে মৃত্যুকে বন্দী করতে ছুটেছে, সে দেখতে পায়, যাকে সে ধরেছে সে মৃত্যুই নয়— সে জীবন। যখন সাহস করে তার সামনে দাঁড়াতে পারি নে, তখন পিছন দিকে তার ছায়াটা দেখি। সেইটে দেখে ডরিয়ে ডরিয়ে মরি। নির্ভয়ে যখন তার সামনে গিয়ে দাঁড়াই, তখন দেখি যে সর্দার জীবনের পথে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যায়, সেই সর্দারই মৃত্যুর তোরণদ্বারের মধ্যে আমাদের বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। ফাল্গুনীর গোড়াকার কথাটা হচ্ছে এই যে, যুবকেরা বসন্ত-উৎসব করতে বেরিয়েছে। কিন্তু এই উৎসব তো শুধু আমোদ করা নয়, এ তো অনায়াসে হবার জো নেই। জরার অবসাদ, মৃত্যুর ভয় লঙ্ঘন ক'রে তবে সেই নবজীবনের আনন্দে পৌঁছনো যায়। তাই যুবকেরা বললে— আনব সেই জরাবুড়োকে বেঁধে, সেই মৃত্যুকে বন্দী করে। মানুষের ইতিহাসে তো এই লীলা, এই বসন্ত-উৎসব বারে বারে দেখতে পাই। জরা সমাজকে ঘনিয়ে ধরে, প্রথা অচল হয়ে বসে, পুরাতনের অত্যাচার নূতন প্রাণকে দলন ক'রে নির্জীব করতে চায়— তখন মানুষ মৃত্যুর মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে, বিপ্লবের ভিতর দিয়ে নববসন্তের উৎসবের আয়োজন করে। সেই আয়োজনই তো য়ুরোপে চলছে। সেখানে নূতন যুগের বসন্তের হোলি খেলা আরম্ভ হয়েছে। মানুষের ইতিহাস আপন চিরনবীন অমর মূর্তি প্রকাশ করবে বলে মৃত্যুকে তলব করেছে। মৃত্যুই তার প্রসাধনে নিযুক্ত হয়েছে। তাই ফাল্গুনীতে বাউল বলছে— "যুগে যুগে মানুষ লড়াই করেছে, আজ বসন্তের হাওয়ায় তারই ঢেউ। যারা ম'রে অমর, বসন্তের কচি পাতায় তারা পত্র পাঠিয়েছে। দিগ্‌দিগন্তে তারা রটাচ্ছে— আমরা পথের বিচার করি নি, আমরা পাথেয়ের হিসাব রাখি নি, আমরা ছুটে এসেছি, আমরা ফুটে বেরিয়েছি। আমরা যদি ভাবতে বসতুম তা হলে বসন্তের দশা কী হত।"— বসন্তের কচি পাতায় এই যে পত্র, এ কাদের পত্র। যে-সব পাতা ঝরে গিয়েছে— তারাই মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে আপন বাণী পাঠিয়েছে। তারা যদি শাখা আঁকড়ে থাকতে পারত, তা হলে জরাই অমর হত— তা হলে পুরাতন পুঁথির তুলট কাগজে সমস্ত অরণ্য হলদে হয়ে যেত, সেই শুকনো পাতার সর্‌ সর্‌ শব্দে আকাশ শিউরে উঠত। কিন্তু পুরাতনই মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে আপন চিরনবীনতা প্রকাশ করে— এ-ই তো বসন্তের উৎসব। তাই বসন্ত বলে— যারা মৃত্যুকে ভয় করে, তারা জীবনকে চেনে না; তারা জরাকে বরণ ক'রে জীবন্মৃত হয়ে থাকে— প্রাণবান বিশ্বের সঙ্গে তাদের বিচ্ছেদ ঘটে।—

চন্দ্রহাস। এ কী। এ যে তুমি! সেই আমাদের সর্দার? বুড়ো কোথায়।
সর্দার। কোথাও তো নেই।
চন্দ্রহাস। কোথাও না? তবে সে কী।
সর্দার। সে স্বপ্ন।
চন্দ্রহাস। তবে তুমিই চিরকালের?
সর্দার। হাঁ।
চন্দ্রহাস। আর আমরাই চিরকালের?
সর্দার। হাঁ।
চন্দ্রহাস। পিছন থেকে যারা তোমাকে দেখলে, তারা যে তোমাকে কতরকম মনে করলে

তার ঠিক নেই। তখন তোমাকে হঠাৎ বুড়ো বলে মনে হল। তার পর গুহার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলে— এখন মনে হচ্ছে তুমি বালক— যেন তোমাকে এই প্রথম দেখলুম। এ তো বড়ো আশ্চর্য, তুমি বারে বারেই প্রথম, তুমি ফিরে ফিরেই প্রথম।

—সবুজ পত্র, আশ্বিন-কার্তিক ১৩২৪

গুরু

'গুরু' ১৩২৪ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই নাটকটি অচলায়তনের "কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত এবং লঘুতর" আকার। এই রূপান্তরে রবীন্দ্রনাথ অচলায়তনের অনেক অংশ বর্জন করেন এবং কয়েকটি নূতন অংশ যোগ করেন।

বর্তমান সংস্করণের পাঠ প্রস্তুত করবার কাজে সুহৃদ কুমার মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে গুরুর পাণ্ডুলিপি ব্যবহার করিবার সুযোগ পাওয়া গিয়াছে।

গুরু প্রসঙ্গে অচলায়তনের গ্রন্থ পরিচয় (রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ প্রথম খণ্ড) দ্রষ্টব্য।

অরূপরতন

'অরূপরতন' ১৩২৬ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। "এই নাট্য-রূপকটি রাজা নাটকের অভিনয়যোগ্য সংক্ষিপ্ত সংস্করণ, নূতন করিয়া পুনর্লিখিত।" অভিনয় উপলক্ষে ১৩৯২ সালে অরূপরতনের পুনঃপরিবর্তিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়— নাট্য-সংগ্রহে এই সংস্করণের পাঠ মুদ্রিত হইয়াছে।

অরূপরতন প্রসঙ্গে রাজার গ্রন্থপরিচয় (রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ প্রথম খণ্ড) দ্রষ্টব্য।

ঋণশোধ

'ঋণশোধ' ১৩২৮ (১৯২১) সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ইহা শারদোৎসবের রূপান্তর।

১৩২৮ সালের আশ্বিনে শান্তিনিকেতনে অভিনয়োপলক্ষে ইহাতে কয়েকটি নূতন অংশ যোজিত হয়, অভিনয়সৌকর্যের জন্য কোনো কোনো অংশ বর্জিত হয় ; এই পরিবর্তনগুলি কোথাও মুদ্রিত আকারে নাই। প্রমথনাথ বিশী এই অভিনয়ে শ্রুতিকার ছিলেন, তাঁহার সৌজন্যে অভিনয়ের সময়ে তাঁহার যে পুস্তকখানি ব্যবহৃত হইয়াছিল তাহা দেখিবার সুযোগ হইয়াছে ; অভিনয়-উপলক্ষে নূতন-লিখিত বলিয়া নির্দিষ্ট অংশগুলি উহা হইতে নীচে মুদ্রিত হইল :

১ পৃ ৯৯৩, 'সকল ছেলে জুটি'র পরে বসিবে। তুলনীয় পৃ ৯৯৭

[প্রথম বালক।] ও ভাই, ও কে আসছে ?
[দ্বিতীয় বালক।] ও পরদেশী।

বিজয়াদিত্যের প্রবেশ

বিজয়াদিত্য। না ভাই, আমি সবদেশী।
ছেলেরা। তুমি কী কর ?
বিজয়াদিত্য। আমি সব জায়গাতেই আপন দেশ দেখে বেড়াই।
[ছেলেরা।] তার মানে কী ?

১. এই উদ্ধৃতাংশের সর্বত্র পত্রাঙ্কদ্বারা রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ (প্রথম) খণ্ডের পৃষ্ঠাসংখ্যা নির্দেশ করা হইয়াছে।

বিজয়াদিত্য। দেখো না, রাজাগুলো দেশ পাবার জন্যে লড়াই করে মরে। তার মানে, পৃথিবীর রাজা তবু নিজের দেশ পায় নি।

ছেলেরা। তুমি পেয়েছ ?

বিজয়াদিত্য। পেয়েছি কি না পরীক্ষা করতে বেরিয়েছি।

ছেলেরা। বেশ মজা, আমরাও সবদেশী হব। তোমাকে আমরা ছাড়ব না।

বিজয়াদিত্য। তোমরা ছাড়লে আমিই কি তোমাদের ছাড়ব ? কী করবে আমাকে নিয়ে ?

ছেলেরা। আজ আমাদের ছুটি, তোমাকে নিয়ে আজ তোমার সেই সবদেশে বেরিয়ে যাব।

বিজয়াদিত্য। আচ্ছা বেশ, তা হলে আমি আমার সবদেশীর সাজ পরে আসি গে।

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দলের প্রবেশ

পৃ ৯৯৬, সপ্তবিংশ ছত্র, 'ঝগড়া না, গান ধর্।' বর্জিত। তাহার পরে বসিবে,

ছেলেরা। ঐ যে সবদেশী এসেছে।

সন্ন্যাসীর প্রবেশ

পৃ ১০০০, একাদশ-দ্বাদশ ছত্র, 'নৌকো বাচ করতে যাব। বেশ মজা।' ইহার পরে বসিবে

প্রথম বালক। কিন্তু লেখা শেষ করতে করতে আমাদের ছুটি ফুরিয়ে যাবে।

ছেলেরা। এই লেখার খেলা কিন্তু আর ভালো লাগছে না।

পৃ ১০০১, নবম ছত্র, 'উপনন্দ। আমাকে বাঁচালে। এখন পুঁথিগুলি ফিরে দাও।' ইহার বসিবে

তোমরা অন্য খেলা খেলো গে।

সন্ন্যাসী। গান

'কোন্ খেলা যে খেলব কখন ভাবি বসে সেই কথাটাই' ইত্যাদি

পৃ ১০০১, ত্রয়োদশ ছত্র, 'সকলে। না, সে চেঁচায়।' ইহার পরে বসিবে

তুমি কিন্তু যেয়ো না সন্ন্যাসী— আমরা কোপাই নদীর ধারে ছুটোছুটি করে আবার এখনি চলে আসছি।

[প্রস্থান

পৃ ১০০৪, ঊনবিংশ ছত্র, 'রাত্রে ঘুমোতে পারি নে [প্রস্থান।' ইহার পরে বসিবে

সন্ন্যাসী। ঐ লক্ষেশ্বরের কথাগুলি….[2] শরতের আলোর উপর ওর হিসাবের খাতার কালো ছাপ একেবারে লেপে দিয়ে যায়।

ঠাকুরদা। আর ওর আওয়াজটা এমন যে আশ্বিনে হাওয়ার শ্বাসরোধ হতে থাকে।

সন্ন্যাসী। ঠাকুরদা, তোমার গান দিয়ে হাওয়াটাকে শোধন করে বসিয়ে দিয়ে যাও।

ঠাকুরদা। গান

'শরৎ আলোর কমলবনে' ইত্যাদি

[লক্ষেশ্বরকে আসিতে দেখিয়া দ্রুত প্রস্থান

২ পাণ্ডুলিপি নষ্ট হইয়াছে

পৃ ১০০৮, শেষ হইতে অষ্টম ছত্রে 'ওহে উদাসী, তুমি বল কী ?' বর্জিত ; তাহার পরে নিম্নমুদ্রিত ছত্র বসিবে

এমনি করে চক্র চলেছে, পাচ্ছি আর দিচ্ছি।

পৃ ১০০৮-১০০৯, শেখরের গান বর্জিত।

পৃ ১০১১, চতুর্থ ছত্র বর্জিত; তৎপরিবর্তে বসিবে

সন্ন্যাসী। আচ্ছা এক কাজ করো, কাশবন থেকে কাশ তুলে আনো আর আঁচল ভরে আনো ধানের মঞ্জরী। শিউলিফুলের মালা তোমাদের তো গাঁথাই আছে। সেগুলো সব নিয়ে এসো।

পৃ ১০১১, ত্রয়োবিংশ ছত্রের অনুবৃত্তি

ওরে ভাই তার একটা গান শুনবি ?

ওরে রে লক্ষ্মণ, এ কী কুলক্ষণ
বিপদ ঘটেছে বিলক্ষণ
(ভাই) জানকীরে দিয়ে এসো বন।

পৃ ১০১৩, শেষ ছত্র, 'এবার বরণের গানটা ধরিয়ে দিই। গাও।' ইহার পরিবর্তে

ঠাকুরদা, এবার সুরে সুর মেলাবার রঙে রঙ মেলাবার গানটা ধরো।

গান

'সবার রঙে রঙ মেশাতে হবে' ইত্যাদি।

এই নূতন অংশগুলি সন্নিবেশের প্রয়োজনে, এবং সহজে অভিনয়যোগ্য করিবার জন্য কোনো কোনো অংশ বর্জিতও হইয়াছিল ; পাদটীকায় সেই বর্জিত অংশগুলি নির্দিষ্ট হইল।[৩] এইরূপ বর্জনের পর সংগতিরক্ষার্থ, কোনো কোনো স্থলে সংলাপ বর্জন না করিয়াও বক্তা-পরিবর্তনের নির্দেশ বইখানিতে আছে ; যেমন শেখরের উক্তি অন্যের মুখে বসানো হইয়াছে।

ঋণশোধের সহিত শারদোৎসবের প্রধান পার্থক্য, ঋণশোধে ভূমিকা ও শেখরচরিত্রের সন্নিবেশ।

ঋণশোধ প্রসঙ্গে শারদোৎসবের গ্রন্থপরিচয় দ্রষ্টব্য

৩ পৃ ৯৯৫-৯৯৬ 'শেখর কবির প্রবেশ' হইতে 'অভ্যাস' করেছে [প্রস্থান।' পর্যন্ত বর্জিত।

পৃ ৯৯৭-৯৮ 'ঠাকুরদা, ঐ দেখো' হইতে 'এ চমৎকার খেলা' পর্যন্ত বর্জিত।

৯৯৮ পৃষ্ঠায় কবিশেখরের কেন যে মন ভোলে, গানটিতে 'সে তো কানে আনে না'র পর, 'ছেলেবা। পরদেশী তোমার সঙ্গী কি কেউ নেই।' এই বাক্যটি বসাইবার, ও গানের পরবর্তী দুই ছত্র 'আমার খেয়া গেল পারে, আমি রইনু নদীর ধারে।' এইরূপ পরিবর্তনের নির্দেশ আলোচ্য গ্রন্থখানিতে রহিয়াছে। সম্ভবত অন্য কোনো বারের অভিনয়ে, যে বারে এই বর্জিত বলিয়া নির্দিষ্ট অংশ অভিনীত হইয়াছিল, তাহাতে এই বাক্যটি ব্যবহৃত হইয়াছিল।

পৃ ১০০০-০১ 'ছেলেরা। এই যে পরদেশী, আমাদের পরদেশী' হইতে 'সকলে। আজ এই পর্যন্ত থাক্।' পর্যন্ত বর্জিত।

পৃ ১০০১ 'শেখর। তার মানে' হইতে '[বালকদলের সঙ্গে শেখরের প্রস্থান।' পর্যন্ত বর্জিত।

পৃ ১০০২-০৩ 'শেখর ও রাজা সোমপালের প্রবেশ' হইতে 'ওঁকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন।' পর্যন্ত বর্জিত।

পৃ ১০০৪ 'রাজদূতের প্রবেশ' হইতে 'চরণ ছাড়ছি নে [প্রস্থান।' পর্যন্ত বর্জিত।

পৃ ১০০৫ ত্রয়োবিংশ-চতুর্বিংশ ছত্র, 'এ নইলে... জো নেই।' বর্জিত।

পৃ ১০০৫ বন্দিগণের গান বর্জিত।

পৃ ১০০৮ 'ঠাকুরদাদা ও শেখরের প্রবেশ এর পরিবর্তে 'ঠাকুরদাদার প্রবেশ।'

পৃ ১০০৯ দ্বাদশ ও চতুর্দশ ছত্র, 'উপনন্দকে তুমি দেখেছ' হইতে 'ওর সব খবর পেলুম।' পর্যন্ত বর্জিত।

পৃ ১০১০ প্রথম-ষষ্ঠ ছত্র, 'লক্ষেশ্বর। এই যে, এ লোকটি' হইতে 'আদায় না করে ছাড়ছি নে।' পর্যন্ত বর্জিত।

'কিন্তু এতক্ষণ তোমরা তিনজনে'র পরিবর্তে 'এতক্ষণ তোমরা দুজনে' হইবে।

পৃ ১০১৩ 'লেগেছে অমল ধবল পালে'র পরিবর্তে 'হৃদয়ে ছিলে জেগে।'

পৃ ১০১৪ 'আমার নয়ন-ভুলানো এলে' গানটি বর্জিত।